বিষয়-সূচী

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা]   [মাঘ—১৩৪৩

বঙ্গশ্রী—চিত্র-সূচী (মাঘ)

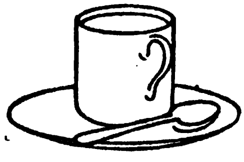
সুখের সংসার নিজের হাতেই গড়তে হয়



কোনো কোনো সংসার নিরানন্দ—যেন সেখানে প্রাণ নেই। কোনো সংসার আবার হাসিখু
আনন্দে উজ্জ্বল। আনন্দের সংসার মেয়েরাই গড়ে তোলে।

যে দরদী স্ত্রী স্বামীর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আনন্দময় করে তুলতে চায়, সে বাড়ীতে আমন্ত্রণ ব
এমন লোক, যাদের সংসর্গ তার স্বামীর ভালো লাগে। সব চেয়ে ভালো নিমন্ত্রণই হচ্ছে চায়ের নিমন্ত্র
তৃপ্তিকর এক পেয়ালা চা সামনে থাক্‌লে আলাপ জমে উঠে; বাড়িতে হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গতার হাওয়া ব
এই আনন্দের পাত্রই প্রতিদিন নতুন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায়। বাড়ীতে যদি চায়ের মজ্‌লি
না থাকে, আজ থেকেই তা শুরু করুন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

শজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয়

বঙ্গশ্রী

263

ষাণ্মাসিক সূচী—৪র্থ বর্ষ—২য় খণ্ড

(শ্রাবণ—মাঘ—১৩৪৩)

লেখক-সূচী

চিত্র-সূচী

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা



ধানের নৌকা

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

ধান্যশ্রী

মাঘ—১৩৪৩

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভারতবাসীর মিলন হয় না কেন?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায় সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া আমরা প্রধানতঃ যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটী উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি ;

(২) ভারতবর্ষে সমস্যাসমূহের উদ্ভব হয় কেন ;

(৩) ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের পূরণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ ব্যবস্থার প্রয়োজন ;

(৪) যে যে ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের পূরণ হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কোন্ শ্রেণীর সংগঠনের প্রয়োজন।

উপরোক্ত চতুর্থ বিষয়ের আলোচনাকালে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে একটী প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিতে না পারিলে, যে যে ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের পূরণ হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে কিছুতেই প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হইবে না

কোন দেশের কোন কংগ্রেসকে প্রকৃতপক্ষে দেশীয় কংগ্রেস নামের যোগ্য করিতে হইলে, এই কংগ্রেসে যাদৃশ কার্য্যোদ্দেশ্য এবং কার্য্যতালিকা গৃহীত হইলে দেশবাসী প্রত্যেকের পক্ষে উহাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে এবং কাহারও পক্ষে তাহাতে যোগ দেওয়া অসম্ভব না হয়, তাদৃশ কার্য্যোদ্দেশ্য এবং কার্য্যতালিকা ঐ কংগ্রেসে পরিগৃহীত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে কার্য্যোদ্দেশ্য (creed) এবং কার্য্যতালিকা (programme) গৃহীত হইলে দেশের কাহারও পক্ষে ঐ কংগ্রেসে যোগদান করা অসম্ভব হয়, সেই কংগ্রেসকে নামতঃ কংগ্রেস বলিলেও, যুক্তিসঙ্গতভাবে কার্য্যতঃ কংগ্রেস বলা চলে না। যে প্রতিষ্ঠানে দেশের একজনেরও পক্ষে যোগদান করা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেস বলিয়া অভিহিত করিলে উহা "কাণা ছেলেকে পদ্মলোচন" বলিয়া অভিহিত করার অনুরূপ হইয়া থাকে। কারণ, "কংগ্রেস" এই ইংরাজী শব্দটীর যাহা অর্থ, তাহাতে উহাকে দেশের সর্ব্বসাধারণের মিলনক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে হয়। যাহাতে সকলে মিলিত হইতে পারে, এবংবিধ বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও হয়ত কোন কংগ্রেসে দেশের সকলে স্ব স্ব অজ্ঞতা অথবা দ্বেষ-হিংসার জন্য ঐ কংগ্রেসে মিলিত হয় না। এতাদৃশ অবস্থায় ঐ কংগ্রেসকে প্রকৃত কংগ্রেস বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের জন্যই দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে

উহাতে যোগদান করা সম্ভব হয় না, তাহাকে কোনক্রমেই প্রকৃত কংগ্রেস বলা যাইতে পারে না।

এই হিসাবে বর্ত্তমান ভারতীয় কংগ্রেসকে প্রকৃত কংগ্রেস বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। তাহার কারণ স্বাধীনতা অথবা পূর্ণ-স্বরাজ ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যোদ্দেশ্য এবং আইন-অমান্য, অসহযোগ এবং সমাজতান্ত্রিকতা প্রভৃতি উহার কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, জমীদার, কৃষক প্রভৃতি যাহারা জমির মালিক এবং শিল্পী ও বণিক্‌গণের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব মূলধনের দ্বারা কারবার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীনতার, অথবা আইন-অমান্যের, অথবা অসহযোগের, অথবা সমাজতান্ত্রিকতার আন্দোলনে যোগদান করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও আমরা 'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়'-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

এই আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, যাহাতে প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত হয়, তাহা করিতে হইলে যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, তন্মধ্যে জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবন্ধনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান।

এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে, "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় কি?" তাহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যে যে উপায়ে ঐ সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে, তন্মধ্যে যাহাতে ভারতবাসীর পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান।

"কি করিলে ভারতবাসীর পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে", তাহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যাহাতে ইংরাজের সহিত কাহারও কোন বিদ্বেষ না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমাদিগের ঐক্যবন্ধন হওয়া সম্ভব হইতে পারে। আমরা ইংরাজকে তাড়াইয়া দিতে ও ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিতে চাহিয়াছি বলিয়া আমরা যাহাতে মিলিত হইয়া ক্ষমতাশালী না হইতে পারি, ইংরাজ পরোক্ষভাবে তাহার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজের সহিত ভ্রাতৃভাব পোষণ করিয়া যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই দুইটি দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান যুগপৎ হইতে পারে, যখন ভারতবাসী তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, তখন ভারতবাসী যাহাতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হীনবল হইয়া পড়ে, তাহার চেষ্টায় ইংরাজের ব্যতিব্যস্ত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিলুপ্ত হইবে। হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে, আমাদিগের মতে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু ও ইংরাজের আন্তরিক মিলন, অথবা মুসলমান ও ইংরাজের আন্তরিক মিলন যাহাতে হয়, তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়া ভারতবাসীর পরস্পরের আন্তরিক মিলন হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়েও আমাদের দেশের ভাবুকগণ একমতাবলম্বী নহেন। কাযেই, স্বতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, ভারতবাসীর মিলন হয় না কেন?

আমাদের মতে, ভারতবাসীর পরস্পরের মিলন না হইবার কারণ বহু। তন্মধ্যে প্রধান কারণ দুইটি, যথা, (১) খাদ্যাদির অপ্রাচুর্য্য, (২) সুশিক্ষার অভাব। আমাদের অমিলনের এই দুইটি কারণ ছাড়া আর যে সমস্ত কারণ আছে, তাহার সকলই ঐ দুইটি কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

জগতের ভৌগোলিক অবস্থা এবং ইতিহাস যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে জগতে এমন একদিন ছিল, যখন প্রত্যেক দেশে সেই দেশের মানুষের আহার, বিহার, শিক্ষা, কর্ম্ম-প্রযত্ন এবং বিশ্রামের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার প্রত্যেক বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। তখন কোন দেশের মানুষের স্বীয় দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইবার কথা ভাবিবারই প্রয়োজন হয় নাই।

ক্রমে ক্রমে জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষের আহার-বিহারাদির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে, কোন কোন দেশে তাহার প্রাচুর্য্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখন ঐ ঐ দেশে প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে কোন কোন বস্তুর প্রাচুর্য্য কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন দেশে কোন বস্তুরই সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই এবং তখনও কোন দেশের মানুষের অন্নবস্ত্রের জন্য স্বীয় দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গমনাগমন করিতে হয় নাই।

প্রায় এক হাজার বৎসর আগে সর্ব্বপ্রথমে ইয়োরোপের স্থানে স্থানে, মানুষের প্রয়োজনে যাহা যাহা লাগে, তাহার অনেক বস্তুর অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছিল এবং ঐ ঐ স্থানের মানুষ স্ব স্ব অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বিপৎসঙ্কুল রাস্তায় ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইতেছিলেন, কারণ ভারতবর্ষে যে জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য অত্যধিক, তাহা তখনও ইঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভারত ও চীন ছাড়া জগতের প্রত্যেক দেশেই মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত কেহই নিজ নিজ দেশে যাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপত্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করেন নাই। তখনও ভারতবর্ষে প্রাচুর্য্য এত অধিক ছিল যে, জগতের অন্যান্য দেশের পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে স্ব স্ব অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইত।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচুর্য্য কমিতে আরম্ভ করে এবং ভারতবর্ষ হইতে সকল দেশের অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা অসম্ভব হয়। এইরূপে গত তিনশত বৎসর হইতে জগতের বহুদেশে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করিবার আয়োজনের সাড়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যে বিদ্যা থাকিলে **স্বাস্থ্যকর বস্তু অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে** উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, সেই বিদ্যা অদ্যাবধি জগতের কোন দেশ লাভ করিতে পারে নাই। ঐ বিদ্যা একদিন একমাত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল এবং ভারতবাসিগণ উহা সারা জগৎকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহাদের আলস্যের ফলে এক্ষণে তাঁহারা পর্য্যন্ত উহা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং আধুনিক জগতে বিদ্যা ও শিল্পের নামে যাহা যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি মানুষের উপকার সাধন করা ত' দূরের কথা, বস্তুত পক্ষে তাহাদের অপকারই সাধন করিতেছে।

গত ত্রিশ বৎসর হইতে ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি এতাদৃশভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সারা দেশে জমী হইতে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্দ্বারা, ভারতবর্ষের রপ্তানী (export) সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইলেও, সমগ্র ভারতবাসীর সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পূর্ণভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এই ত্রিশ বৎসর হইতেই ভারতবাসীর মধ্যে অর্দ্ধাশনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি অনশনের মাত্রা এত বৃদ্ধি পায় নাই।

গত ৪ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩২ সাল হইতে ভারতবর্ষের জমীর উৎপাদিকা শক্তি আরও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিলেও ভারতবর্ষের সমগ্র জমী হইতে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্দ্বারা, সমগ্র অধিবাসীর যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেওয়া সম্ভব হয় না। অথচ, কোন মানুষ স্বভাবতঃ অভাবগ্রস্ত থাকিতে চাহে না, ফলে স্ব স্ব অভাব পূরণ করিবার জন্য মানুষের মধ্যে এত মারামারি আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি সম্পূর্ণভাবে অনায়াসে পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে এত মারামারির উদ্ভব হইতে পারিত না।

মানুষ ইয়োরোপেই জন্মগ্রহণ করুক, আর আফ্রিকা অথবা ভারতবর্ষেই জন্ম গ্রহণ করুক, মানুষ মুসলমানই হউক আর খৃষ্টানই হউক, আর হিন্দুই হউক, মানুষ যে মানুষ, মানুষের শরীরবিধানের কর্ম্ম (physiological function) এবং তাহার শরীরের গঠন (anatomical composition) যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে মূলতঃ এক, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইলে যে বিদ্যা ও শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের আর্থিক অভাব এতাদৃশ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না এবং মানুষের মধ্যে অমিলন এতাদৃশ ভাবে পরিলক্ষিত হইত না। হিন্দুই

হউক, আর মুসলমানই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, ইংরাজই হউক, আর তুর্কীই হউক, আর ভারতবাসীই হউক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মলমূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি; আহার, বিহার, শিক্ষা, কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং বিশ্রামের লালসা; বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্য যে সকল মানুষেরই আছে, তাহা যথাযথভাবে লক্ষ্য করিলে ধর্ম্ম ও জাতি লইয়া মানুষের মধ্যে এত বিদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে কি?

কেহ কেহ মনে করেন যে, মানুষের অমিলন স্বভাব-সম্মত এবং ঐ স্বভাবের জন্যই মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন হওয়া কখনও সম্ভব হয় না। এই কথা যে সত্য নহে, তাহা মানুষের নিজের অবস্থার দিকে ও বিশ্ব-দুনিয়ার দিকে তাকাইয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যে মানুষের অস্তিত্ব কতকগুলি পরমাণুর মিলনে, চক্ষুকর্ণাদি কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের মিলনে, হস্তপদাদি কতক-গুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলনে, মিলন সেই মানুষের স্বভাব-সম্মত নহে, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাবিতে পারা যায় কি?

যে মানুষের অভ্যন্তরে বায়ুর অমিলন, তেজের অমিলন অথবা রসের অমিলন ঘটিলেই তাহা অসুস্থ এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই মানুষের অস্তিত্ব অমিলনে সংরক্ষিত হইতে পারে, ইহা ভাবিতে গেলে কি বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় না?

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মিলনই মানুষের স্বভাবসম্মত এবং বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে যে এত অমিলন অথবা দলাদলির উদ্ভব হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অপ্রাচুর্য্য এবং সুশিক্ষার অভাব।

এই দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য এবং সুশিক্ষার প্রসার সংসাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত মিলন সংঘটিত করা সম্ভব হইবে না। অথচ, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা পূরণের উপায়প্রসঙ্গে আমরাই বলিয়াছি, ভারতবর্ষের কোন সমস্যার পূরণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীকে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐক্যবন্ধন ব্যতীত যদি কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মিলন হওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা এখনও অপেক্ষাকৃত আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ, তাঁহারা যদি মিলিত হইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এখনও তাঁহাদিগের পক্ষে আংশিকভাবে মিলিত হইয়া দেশের ও দশের কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে। যাঁহারা অপরিণতবয়স্ক, অথবা ঋণগ্রস্ত, অথবা পিতৃপুরুষদিগের বিত্তের উপর নির্ভরশীল, অথবা বিফল জীবনের হতাশায় প্রপীড়িত, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশের কার্য্যের নামে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব করা, অথবা উচ্ছৃঙ্খল মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু দেশের ও দশের প্রকৃত কার্য্য করা কখনও সম্ভব হইবে না। যে দিন হইতে ভারতের কংগ্রেসের নেতৃত্ব-ভার গান্ধীজীর স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে দেশ ও দশের অবস্থা কোথা হইতে কোথায় উপনীত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের উক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

গান্ধীজী যখন প্রথমে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বভার লইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স যে অপেক্ষাকৃত অপরিণত ছিল এবং ব্যাবহারিক জীবনেও তিনি যে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। গত আঠার বছরে ভারতের আর্থিক অবস্থা কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজীর পরি-চালনার সময়ে ভারতের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হওয়া ত' দূরের কথা, উহা যে ক্রমশঃই খারাপ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাঁহারা স্বীয় ক্ষমতাবলে দেশের ও দশের ধনোৎপন্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবিকার্জ্জন করিতে অক্ষম,

তাঁহাদের হস্তে কোন দেশের নেতৃত্বভার অর্পিত হইলে, সেই দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা যে উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়, তাহাও জওহরলালজীর নেতৃত্বকালে দেশের অবস্থা হইতে পরিলক্ষিত হইবে।

আমরা এখনও আমাদিগের দেশবাসীকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

আমাদের মতে, যাহাতে গান্ধীজী ও জওহরলালজীর নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়া, যাঁহারা স্বীয় সদ্‌ভাবের উপার্জ্জন-বলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিণত-বয়স্ক ও অগ্রণী, তাঁহারা যাহাতে আমাদের কংগ্রেসের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, তাহার ব্যবস্থা যখন দেশবাসী করিতে উদ্যত হইবেন, তখন দেশের প্রকৃত সুপ্রভাতের উদয় হইবে। [ক্রমশঃ

আবির্ভাব

— শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অসীম কালের সৃষ্টিসাগর-বিপ্লবের ওই নৃত্য গানে,
উঠ্‌ল জেগে রুদ্রশিব আজ সুন্দরেরি ছন্দদানে।
বিশ্বজোড়া প্রলয় পাপের দহনপুরীর ছদ্মদলে,
জাগ্‌ল বুঝি ত্রাণের দয়াল অগ্নিবোঁটার পদ্মদলে।
গর্জ্জেছে ওই মাভৈঃ বাণী বল্‌ছে ডেকে জগৎস্বামী,
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি॥

অন্যায়েরি বন্যা-প্লাবন বিপ্লবেরি ঝঞ্ঝাবাতে,
আর্ত্ত মানব ডর কি রে এই ভাগবতেরি মৃত্তিকাতে।
লক্ষ ধ্যানীর তপ্ত ধ্যানের অশ্রুঝরণ গঙ্গাজলে,
উঠ্‌ছে গড়ে' পথটি আমার ত্রাণের লাগি ভক্তদলে।
মর্ত্তলোকের চক্রবালে আঁধার যে ওই যায় রে নামি',
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি॥

ভদ্রবেশী বর্ব্বরতায় দুর্ব্বলেরি ক্রন্দনেতে,
বিশ্বে আজি পথটি আমার সিক্ত হবে চন্দনেতে।
বজ্র ঝলুক ঝঞ্ঝা দুলুক উঠুক কেঁপে সৃষ্টি-দোলা,
আমার ভাবী আবির্ভাবের পদধ্বনির এ হিন্দোলা।
ভক্তসাধুর নির্য্যাতনের কাঁটার ঘায়ে জাগব আমি,
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি।

মানব-মনের দর্পী অসুর গর্ব্বিত ওই ক্ষণে ক্ষণে,
স্পর্দ্ধাতে আজ বসতে চাহে শাশ্বত মোর সিংহাসনে।
দর্পিত সেই স্পর্দ্ধালোকের পাহাড়পুরীর শৃঙ্গ হেরি,
রুদ্র নরসিংহ হয়ে ফাট্‌তে মম নেই যে দেরী!
কাঁদছে ধ্রুব-প্রহ্লাদেরা আর কি পারি থাক্‌তে আমি,—
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি॥

বিশ্বব্যাপী দুঃখেতে আজ উঠ্‌ছে কেঁদে সৃষ্টিখানা,
ওইটে আমার ডঙ্কা নিশান কারুর যে তা' নেইকো জানা।
ছন্দ আমার দুলিয়ে দেছে যুগের কবি বীণ্ দোলাতে,
আসছি নেমে যুগ-মনীষীর ধ্যান-দেবতার হিন্দোলাতে।
আর্ত্ত হাহাকারের তলায় পোহায় যে ওই দুঃখ-যামি,
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি॥

লাঞ্ছনারি উঠ্‌ছে কাঁদন নারীর সতীধর্ম্ম তলে,
লাগ্‌ল তারি অশ্রু আঘাত আজকে মম মর্ম্মদলে।
কাঁদছে কবি, শিল্পী কাঁদে, কাঁদছে যোগী দার্শনিক,
কাঁদছে নীতি, ধর্ম্ম কাঁদে, উঠ্‌ছে কেঁদে সর্ব্ব দিক।
আনন্দ ওই উঠ্‌ছে কেঁদে, ছন্দে তারি কাঁপ্‌ছি আমি,
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি॥

আসব আমি কোন্ ক্ষণে যে কোন্ প্রকটের ছন্দ-দ্বারে,
ঝড়ের দোলে বর্ষারাতে পূর্ণিমা কি অন্ধকারে।
কেউ জানে না নামব কখন ক্ষুদ্র হয়ে সঙ্গোপনে,
ত্রাণের শিশু অন্তরালে বাড়ছি নিতি বৃন্দাবনে।
ধর্ম্ম গ্লানির চক্রবালে মর্ম্মদাহের পোহায় যামি,
ঐ কেঁপেছে পথটি আমার, আর দূরে নয়—সম্ভবামি॥

ইউরোপে অশান্তি

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতি আজ দ্বিধা-বিভক্ত। ফ্যাসিজম্ ও ডেমক্রেসী, এই দুই মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে। জার্ম্মানীর নাৎসি মতবাদ ও ইতালির ফ্যাসিজম্ এতদুভয়ের মধ্যে নীতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উভয় মতবাদেরই ভাবধারা অভিন্ন, অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী এই দুইটি রাজ্য ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মান সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। তদবধি ইহারা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালন করিতেছে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অধিনায়ক হের হিট্‌লার ইতালির সহিত মিত্রতা করিয়া এই দুইটি রাজ্যকে পুনরায় জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা এমন জটিল হইয়া উঠিল যে, হের হিট্‌লার বাধ্য হইয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, পরিশেষে রাজ্য দুইটির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং উহাদের সহিত মিতালি করিলেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী, ইতালি, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী সমসূত্রে আবদ্ধ।

ভার্সাই সন্ধির ফলে মধ্য-ইউরোপে চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া নামক দুইটি রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটি রাজ্য ও রুমানিয়া বর্ত্তমানে কোন দলে যোগ না দিলেও, জার্ম্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইহাদের সাহস হইবে না। জার্ম্মানীর পূর্ব্বে ও রুশিয়ার পশ্চিমে পোলাণ্ড রাজ্যও ভার্সাই-সন্ধিপ্রসূত। বলটিক সাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্টোনিয়া নামক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও ঐ সন্ধির ফলে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বল্টিক সাগরে বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর বিশেষ প্রভুত্ব, সুতরাং যদি যুদ্ধ বাঁধে, তাহা হইলে ইহারা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহস পাইবে না। বলকান্ রাজ্যগুলি, অর্থাৎ বুলগেরিয়া, আলবানিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক—ইহারা যুদ্ধ বাঁধিলে নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া অনুমান হয়। গ্রীসের বর্ত্তমান রাজা ইংলণ্ডের ডিউক অব কেণ্টের শ্যালক। ইনি রুমানিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে উভয়ের মধ্যে মনের মিল না হওয়ায় রুমানিয়ার রাজকুমারী বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিয়াছেন। রাজকুমারী বর্ত্তমানে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া অধ্যয়নে ব্যাপৃতা হইয়া রহিয়াছেন। গ্রীসে বর্ত্তমান রাজার মৃত্যু হইলে, ডিউক অব কেণ্টের পুত্র ঐ রাজ্য পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। গ্রীসেও আবার সম্প্রতি রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রাজা আর পূর্ব্বের ন্যায় একচ্ছত্র অধীশ্বর নহেন। রাষ্ট্র-পরিষদ্ কর্ত্তৃক রাজার কতকগুলি অধিকার করায়ত্ত হইয়াছে।

তুরস্ক বর্ত্তমানে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মিশর ও ইরাকের স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে তুরস্কের বলবৃদ্ধি হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বিশেষ কোন সংবাদ নাই। এই হাঙ্গামার পরিস্থিতির উপর যে এশিয়া-মাইনরের দলপুষ্টির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, সাউদী আরব, পারস্য ও আফগানিস্থান—ইহারা সকলে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আরব ও প্যালেষ্টাইনে ইতালির পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইত; কিন্তু মসুল তৈল-খনিসংক্রান্ত ব্যাপারের পর হইতে ইতালির আধিপত্য কিছু খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইরাকের (কিরকুক) খনি হইতে যে পেট্রোল উৎপন্ন হয়, উহা ইংলণ্ড ও ফরাসীর পেট্রোল-সংগ্রহের প্রধান উৎস। ইরাকের খনি-অঞ্চল একটি সম্মিলিত যৌথ কারবারের অধিকারে আছে। এই খনি হইতে উত্থিত তৈল পরিস্রুত হইয়া পাইপ-যোগে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী হাইফা বন্দরে নীত হয়। তথা হইতে ইংরাজের ও ফরাসীর জাহাজগুলি তৈল সংগ্রহ করে। এই পাইপ বার শত মাইলব্যাপী। ইঞ্জিনিয়ারিংএর ইহা একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই পাইপ প্যালেষ্টাইনের উপর দিয়া হাইফা বন্দরে পৌছিয়াছে। ইরাক ও প্যালে-

ষ্টাইনে যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তজ্জন্য ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। ইরাককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ফরাসী তদীয় শাসনভার ত্যাগ করিয়া, ইরাক ও লেবাননকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভার্সাই সন্ধির ফলে ফরাসী ইরাকের ও ইংরাজ প্যালেষ্টাইনের শাসনভার পাইয়াছিলেন। ফরাসী ইরাক ত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইংরাজ প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করেন নাই। ইউরোপের জাতি-সঙ্ঘের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনকে নিজের অধিকারে রাখিবে বলিয়া মনে হয়।

মসুলের তৈল-খনিতে ইতালির কিছু অধিকার ছিল। এই স্থানের তৈলও পাইপযোগে ত্রিপোলী বন্দরে আনীত হয়। ইতালির সহিত যখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে মসুলের খনি লইয়া ইংরাজ ও ইতালীয় পরিচালকদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, ফলে ইংরাজ পরিচালকগণ পদত্যাগ করেন। এই সকল কারণে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় ফরাসী ইতালির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং ইংরাজও ইতালীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। কয়েকমাস হইল মসুলের বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। ইতালিকে টাকা দিয়া মসুল-খনিতে তাহার যে অংশ ছিল তাহা ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বলটিক্ সাগরে বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর এক প্রকার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর উত্তরাঞ্চলে কিয়েল নামক একটি খাল কাটিয়া জার্ম্মানী বলটিক্ সাগরের সহিত উত্তর-সাগরের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। যুদ্ধ বাঁধিলে এই খাল-পথে জার্ম্মানীর সৈন্য ও রসদ প্রভৃতি পশ্চিমে প্রেরণ করার সুবিধা হইবে, আর ডেনমার্ক ঘুরিয়া উত্তর-সাগরে আসিতে হইবে না। এই সুবিধায় জার্ম্মানীর যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা বোধ হয় না। ইউরোপের যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীর উপনিবেশগুলি সব হস্তচ্যুত হইয়াছে। যদিও জার্ম্মানী পুনরায় রাইনল্যাণ্ড ফিরিয়া পাইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। জার্ম্মানীর লোকসংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু খাদ্যের বড়ই অভাব। ব্যবসা-বাণিজ্য তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। একদিকে জাপানী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা, অপরদিকে মার্ক-এর (জার্ম্মানীর মুদ্রা) মূল্যহ্রাস, তাহার উপর বৈদেশিক বাজারে মহাজনী পণ্যারহ্রাস—এই সকল বিবিধ কারণে জার্ম্মানীর বৈদেশিক বাণিজ্য বড়ই কম হইয়া পড়িয়াছে। তবে জার্ম্মানী পণ্য উৎপাদন না করিলেও, যুদ্ধের অস্ত্রাদি উৎপন্ন করিয়াছে প্রচুর। কিন্তু, জার্ম্মানী এক বিরাট ভুল করিয়া বসিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত জার্ম্মানীর বিবাদ তাহার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এই বিবাদের মূল কারণ হইল, হিটলারের দাম্ভিকতা।

জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-গুরু বিস্‌মার্ক বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জার্ম্মানী যেন কদাচ রুশিয়ার সহিত শত্রুতা না করে। হিটলার গুরুর সে আদেশ পালন করেন নাই। সোভিয়েটের উপর হিটলারের আক্রোশের প্রধান কারন হইল তাঁহার ইহুদী-বিদ্বেষ। হিটলার জার্ম্মানী হইতে ইহুদীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছেন। রুশিয়ায়ও বর্ত্তমানে ইহুদীদিগের প্রভুত্ব নাই। ট্রট্স্কি, কেমেনেফ্, জেনোভিয়েফ্ প্রভৃতি নেতা বর্ত্তমানে নির্ব্বাসিত। রুশিয়ার বর্ত্তমান অধিনায়ক ষ্টালিন একজন রুশীয় খৃষ্টান; সুতরাং হিটলারের রুশ-বিদ্বেষ পোষণ করিবার বর্ত্তমানে কোন কারণ নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপন, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি উৎপন্ন করিবার প্রণালী বর্ত্তমান যুগোপযোগী এই সকল শিক্ষা জার্ম্মানী রুশিয়াকে দিয়াছে। জার্ম্মানীর রুশিয়ায় বিশেষ সমাদর ছিল। সেই সমাদর হিটলারের হঠকারিতায় আজ বিনষ্ট হইয়াছে।

হিটলারের সংগঠন করিবার শক্তি অপূর্ব্ব, তিনি অতিশয় তেজস্বী, কিন্তু তিনি কূট-নীতিজ্ঞ নহেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত বিবাদ করিবার ভরসা ইংরাজও রাখেন না।

পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতিসকলের মধ্যে রুশিয়া আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রুশিয়ায় সেচ-খাল, রাস্তাঘাট, রেলপথ, কলকারখানা, খনি প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় কিছুরই অভাব নাই। যে সাইবেরিয়া মরুসদৃশ ছিল, সেই সাইবেরিয়া আজ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

রুশিয়ায় খনিজ তৈল উৎপন্ন হইতেছে প্রচুর। কোন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের সে দেশে আর অভাব নাই। এমন কি, সুবর্ণ পর্য্যন্ত রুশিয়ায় পাওয়া যাইতেছে। রুশিয়ার যুদ্ধের সরঞ্জাম, বিশেষতঃ বিমান-বহর অপূর্ব্ব। রুশিয়ায় সুশিক্ষিত সৈন্য অসংখ্য। রুশিয়া আজ পৃথিবীতে সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী। সেই রুশিয়ার সহিত বিবাদ করিয়া জার্ম্মানী বা জাপান কেহই ভাল করে নাই।

রুশিয়ায় রাষ্ট্র-মত সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ ঐ দেশে বলশেভিজম্ নামে খ্যাত হইয়াছে। হিটলার ও ইতালির অধিনায়ক মুসোলিনী উভয়েই এই মতবাদের নিন্দা করিয়া থাকেন; এদিকে কিন্তু ফরাসীর সহিত রুশিয়ার মিতালি হইয়া গিয়াছে। ফরাসী দেশেও সমাজতন্ত্রবাদ প্রাধান্য পাইতেছে। অবশ্য, ফরাসীর সহিত রুশিয়ার মিতালিতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ উহারা রাজনীতিশাস্ত্র অনুসারে 'সহজ মিত্র'। এই মিতালি যে জার্ম্মানীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও সুইজারল্যাণ্ড বেশ শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে। রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ইহারা আন্দোলিত হয় নাই। পোল্যাণ্ডও একরূপ শান্তিতে বাস করিতেছে। এই নূতন রাজ্যটি সম্প্রতি কৃষি বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে। ডেনমার্কের অবস্থাতেও কোন চাঞ্চল্য নাই, তবে যুদ্ধ বাঁধিলে কি হয় বলা যায় না। নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ড একরূপ বেশ আছে। ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির দেশে রাজনীতির কূট-জাল সহজে বিস্তার লাভ করিতে পারে না।

স্পেন রাজ্যে ও ভূমধ্যসাগরে বর্ত্তমানে অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে। স্পেনের বিদ্রোহ বর্ত্তমান ইউরোপের কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুই দলের সংগ্রামের ফলে মধ্যযুগের ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী স্পেন রাজ্য আজ ধ্বংসের পথে উঠিয়াছে। এই দেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ প্রভৃতি অনেক ধ্বংস হইয়াছে। লোক-ক্ষয় হইয়াছে প্রচুর। এখনও সংগ্রামের বিরাম নাই। ইতালি, জার্ম্মানী ও রুশিয়া দুই দলকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। আবার, এদিকে লণ্ডনে এক নিরপেক্ষ বৈঠক চলিতেছে। এই বৈঠক নিষেধ করিতেছে যে, কোন দলকে যেন সাহায্য করা না হয়

স্পেনের বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্র সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশিয়ার শাসনতন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই জন্য রুশিয়া স্পেন সরকারকে সাহায্য করিতেছে। বিদ্রোহী দল ফ্যাসিষ্ট। ইহারা সম্ভবতঃ সেখানে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। রাজা আল্‌ফন্‌সোকে আবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই বিদ্রোহী দলের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। এই জন্য ইতালি ও জার্ম্মানী বিদ্রোহী দলকে সাহায্য করিতেছে। বিদ্রোহী দলের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো আফ্রিকা হইতে অনেক মূর সৈন্য আমদানী করিয়া তাহাদিগকে পুরোভাগে রাখিয়া দেশের ভাইদের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছেন। পর্ত্তুগালও না কি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই ভূমধ্যসাগরে নিরাপত্তা কামনা করেন; সুতরাং তাঁহারা স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে ইতালিকে চটাইতে পারেন না। ইতালি ভূমধ্যসাগরের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যাহা হউক, স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের ফলাফলের উপর ইউরোপের শান্তি নির্ভর করিতেছে। তবে, ব্যাপার যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, স্পেনের এই অন্তর্যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গই দাবাগ্নির হেতু হইবে। আর এই যুদ্ধে যদি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ অবতরণ করেন, তাহা হইলে সেই যুদ্ধ শুধু ইউরোপে নহে, সমগ্র এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান ভারত ও শিল্প-প্রদর্শনী

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

এ যুগের সমগ্র আয়োজন ও আন্দোলনে একটা লঘু গর্ব্ব ও বিলাসব্যসনের আড়ম্বর আছে। সেজন্য এখন সব জিনিবকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা যায় না। একদিকে নাগরিক ঐশ্বর্য্যের ভিতর ধনমত্ততার যে উৎকট নাট্যলীলা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে মনে হয়, ভারতবর্ষ বুঝি এই উদ্দাম স্রোতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আকাশযান, অগ্নিশকট, লৌহবর্ত্ম, তারবিহীন বার্ত্তা, ভারতকে জড়াইয়াছে নব্য নাগপাশে। অপরদিকে গ্রাম্য ভারত রিক্ততার শেষ কমণ্ডলু হাতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও বিভ্রাট পল্লীর শেষ সীমান্তকেও ভস্ম করিয়াছে। শিল্পীর শিল্প গিয়াছে—বসন-ভূষণের বৈচিত্র্য যে ব্যবস্থায় চালিত হইত, তাহা একেবারে বিশুষ্ক ও জর্জ্জরিত হইয়াছে। কাজেই পল্লী-ভারতের জীবনযাত্রায় ও নগরের প্রদর্শনীতে একটা বিরাট ব্যবধান স্পষ্ট হইয়াছে।



ধোবিঘাট। [শিল্পী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

গত বড়দিনের বন্ধে কলিকাতা শহরে একটি শিল্প-প্রদর্শ অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন। কলা-পরিষদের এ বিরাট সমারোহ আমাদের কৃষকদের, মুটেদের শ্রমিকদের কি আনন্দ দান করিতে পারে? ইহারা কি বর্জ্জিত জাতি? আনন্দভোগের বৈচিত্র্যে ইহাদের দাম নাই সেকালের মেলা, শোভাযাত্রা ও সঙ্ প্রভৃতি নানাভা দরিদ্রদের চিত্তবিনোদন করিত। একাল একান্তভা সীমান্তপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে নূতন সীমান্ত রচি হইতেছে। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ আজ সক সকল হইতে পৃথক্। সকলের মেলামেশার সুযোগ ক্রম দূরে-পরাহত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এ রকমে প্রদর্শনীর সার্থকতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। অপর দিকে এ রকমের আয়োজনকে বর্জ্জনের উৎসাহও সমীচীন হয় না।

কাব্যে যেমন সকল স্তরের নরনারীর সুখ-দুঃখের বার্ত্তা পাওয়া যায়, তেমনই চিত্র ও ভাস্কর্য্যেও আমরা জাতিহৃদয়ের বিরাট স্পন্দন পাই। সে স্পন্দন অন্যত্র পাওয়া কঠিন। জাতির যথার্থ হৃদয়ারণ্য এসব ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করা সহজ। এ জন্য যাঁহারা চিন্তাশীল লোক, যাঁহারা সমাজ-ব্যবস্থায় নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চান, তাঁহারা দেশের সাহিত্যের ও শিল্পের সহিত পরিচিত হইতে উৎসুক হন এবং এই সমস্ত বাহনের সাহায্যে নিজেদের কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ করেন। এ দিক্ হইতে কলা-পরিষদের এই চিত্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

দারিদ্র্য-পীড়িত, রুগ্ন ও অর্থ-নৈতিক বিভ্রাটে সন্ত্রস্ত ভারত নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করিতে চায়। যতই অবগুণ্ঠনে নিজেদের রিক্ততা ঢাকিবার চেষ্টা করা হয়, ততই তাহা ক্রন্দন-মুখর হইয়া উঠে। এই সত্য আশ্চর্য্যভাবে এই চিত্রসংগ্রহে ধরা পড়িয়াছে। ধনীদের আসবাব ও আভরণের নয়নলোভন প্রদর্শনী ভারগ্রস্ত হইয়াছে। বিলাসব্যসনের শত দিক্ স্বর্ণ রুদ্ধ হইয়া এক অলীক আলেখ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহাই

কি যথার্থ ভারতের রূপ? প্রদর্শনীতে পৌরাণিক কাব্যের নায়ক-নায়িকারা, স্বর্গের দেবদেবীগণ শিল্পীর তুলিকায় এক



মৎস্যজীবী। [শিল্পী—শ্রীবিমল দে

মায়াজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। বিজয়বর্গীর "ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়", "কৈলাসের মহাদেব"; নন্দলালের "রাধার বিরহ"; প্রমোদ চাটুয্যের "মিলনে" আছে উক্ত বিলাসের রক্তিম ছায়া। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাস্তবতা বসন্তসেনার গর্ব্বিত রাজ্যে নিবদ্ধ ছিল না। মৃচ্ছকটিককার সে যুগের যে উৎকট বিলাসবৈভবের নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সকল যুগে উদ্‌ভ্রান্ত সভ্যতার শোণিত নাগরিক উচ্ছ্বাসের শতরন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া এক অলীক ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে সৌন্দর্য্যের উদ্বেলিত উপঢৌকন আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার প্রতি স্তরে পূতিগন্ধ ও পয়ঃপ্রণালীর আবর্জ্জনা। তাহাতে সারল্যের স্বচ্ছতা থাকে না এবং হৃদ্যতার শ্রীও ভুলিতে হয়। বর্ত্তমান সভ্যতাও নানা উপাদানে অন্তরালে একটা উৎকট অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। সে অবস্থাকে দূর করার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে

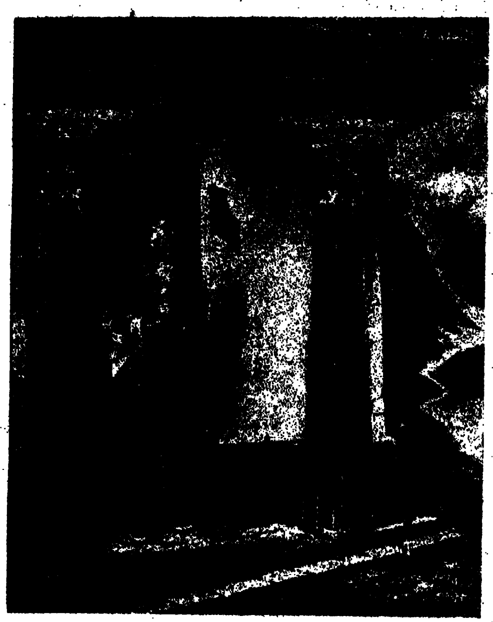
সন্দেহ নাই। কিন্তু রোগের বীজ লক্ষ্য করিলেই তবে একটা ব্যবস্থা চলে। আধুনিক যুগে ধনী-দরিদ্রের ভিতরকার উৎকট ব্যবধান, সবল ও দুর্ব্বলের ভিতর নির্ম্মম সম্পর্ক-বর্জ্জনের পরম উৎসাহের ভিতর দেখা যায় ভারতের অসহায় অবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রদর্শনী সে অবস্থার প্রতি একটা অসামান্য আলোকপাত করিয়াছে।

যাদুঘরের বিরাট অট্টালিকায়, রাজা-মহারাজা-বন্দিত বিরাট রূপযজ্ঞের ভিতর স্থান পাইয়াছে গরীবের ভদ্রাসন ও অসহায়ের আবেদন। এ সবকে মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। এ সব সত্য লক্ষ পথে বর্ত্তমান ভারতের প্রাঙ্গনে আসিয়া পড়িবে। তাই দেখি, গোবর্দ্ধন আশ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আঁকেন নাই; এমন একটা সাধারণ ব্যাপার আঁকিয়াছেন, যাহার দিকে কেহ চোখ ফিরাইয়া চাহে না। শিল্পীর রচনার বিষয় "ধোবার ঘাট"। ইহার ভিতরও কি সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে?



সূর্য্যালোকিত রাজপথ ঃ পুরুলিয়া। [শিল্পী—এ. দিনার

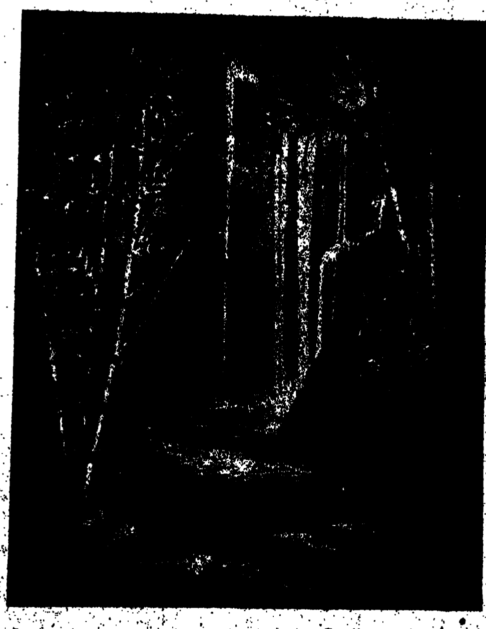
ইদানীং ফ্যাক্টরী হইতে কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে—গরীবের চালাঘরকে কে গ্রাহ্য করে? শিল্পী কিন্তু ইহাতে



প্রার্থনা।　　[শিল্পী—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তিনি সাহসের সহিত আমাদের সম্মুখে লইয়া আসিয়াছেন এক জীর্ণ ও দুঃসহ জীবনের সংবাদ। ইন্দ্রপুরীও নয়, ড্রইংরুমও নয়—কতকগুলি খোড়ো-ঘরের ভিতরকার রিক্ততা ও কঠিন শ্রমের পরিচয়। এই ত যথার্থ বর্ত্তমান ভারত—নগ্ন, বর্জ্জিত ও কৌপীনবস্ত্র। বিমল দে দর্শকদের আর এক রাজ্যে উপস্থিত করিয়া আনন্দ হইয়াছেন। সমুদ্রতীরে গরীব জেলেদের কটিবাস পরিয়া যে জীবন-মৃত্যুর অভিনয় হয়, শিল্পী তাই দেখাইয়া ধন্য হইয়াছেন। একদিকে অসীমের অকূল প্রসার, অন্যদিকে সীমার চরমসীমান্ত। এই দুইটি বিপরীতের সঙ্গম হইয়াছে এই ক্ষুদ্র ছবিটিতে। মানুষের সুখ-দুঃখের অশ্রান্ত নাট্যলীলা ধরণীর সব জায়গাতেই বিস্তৃত হয়। শৈলশীর্ষ, বিরাট প্রান্তর ও ক্ষুদ্র বেলা সব জায়গাকেই মানুষ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মানুষ কি বিচিত্র। একদিকে তাহাকে ঐশ্বর্য্যে স্ফীত করিয়া ব্যর্থ আয়োজন নিরন্ত হইতেছে, আবার রিক্ততার মুকুট পরাইয়াও তাহাকে উজ্জ্বলিত করা হইতেছে।

কলা-পরিষদের প্রদর্শনীতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সকল শ্রেণীর শিল্পীই যোগদান করিয়াছেন। ভারতের দারিদ্র্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কদের চোখে পড়িয়াছে কি না জানি না। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পীর চোখে পড়িয়াছে। শিল্পী এ. ডি. মিলারের "সূর্য্যালোকিত পথ, পুরুলিয়া, Sunlit Street, Purulia" নামক চিত্রে এ দেশের কুটিরের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সামান্য বসনভূষণে ঢাকা বর্ত্তমান ভারতীয় নরনারী, জীবন-নাটকের বার্ত্তা এমন করিয়াই অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্থাপিত করিতেছে। শিল্পীর সহানুভূতি, রসবোধ ও প্রকাশকারুতা এ সব চিত্রকে মহিমাদান করিয়াছে। রাজার অট্টালিকায় গৌরব নাই, কিন্তু তুলিকার সাহায্যে বর্ণপ্রয়োগের লীলা এ সব জায়গাকেও সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছে। বধূরাণী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অসামান্য প্রতিভা ভারতের পর্ব্বতপ্রদেশের গৌরব আঁকিবার প্রসঙ্গেও এই রিক্ততার বাণী উপস্থিত করিয়াছে। পার্ব্বত্য নারীর জরাজীর্ণ দুর্ব্বলতা ও দারিদ্র্যের সংগ্রামের ভিতরও বিনম্র প্রার্থনা কিরূপ চিত্তহরণ করে—চিত্রে তাহা সুস্পষ্ট



তিব্বতের প্রপাত।　　[শিল্পী—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

হইয়াছে। এ সব জাতিরাও ভারতীয়। ভারতবর্ষ বহু জাতির মাতৃভূমি। ঐ মন্দিরে কোন আয়োজন দেখা

না, দেয়াল ভাঙিয়া পড়িতেছে—ইষ্টক নগ্ন হইয়াছে। হার ভিতরও ভক্তি ও নিষ্ঠা অক্ষত ও অভগ্ন আছে। এই



প্রত্যাবর্ত্তন। [শিল্পী—শ্রীসমরেন্দ্রকুমার রায়

পাত্ত বিষয়। সভ্যতার উষ্ণ শিখা এখনও ইহাদের হৃদয়কে দগ্ধ করে নাই। এখনও অর্থনৈতিক আবর্ত্তনের ধ্বংসলীলা ইহাদিগকে জগৎ হইতে মুছিয়া ফেলে নাই—শিল্পীর প্রতিভা এই সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য-রচনার বিষয়গত সীমা নাই—কাজেই সব কিছু লইয়াই রচনা করা চলে। কেবল রচয়িতার দৃষ্টি চাই। সেই দ্রষ্টার দৃষ্টিতেই এরূপ বিচিত্র সমারোহের ভিতরও পল্লী-জীবন ও দারিদ্র্যের অবস্থার মধ্যে ভারতের বাণীকে মুক্ত করা সম্ভব

সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য গোবর্দ্ধন আশের "সর্ব্বনাশ" চিত্র। মনে হয়, সত্যকারের কোন ঘটনা চোখের সামনে ধরা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও অভাবপীড়িত ভারতের ইহা খাঁটি প্রতিচ্ছবি। সমগ্র ভারতের মূর্ত্তি এই সামান্য চিত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এ যুগের বিলাসব্যসনপূর্ণ নগরে বাস করিয়াও যে শিল্পীরা দেশকে ভোলে নাই, ভুলিতে পারে না, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

অবনী সেনের একটি চিত্রে পল্লী-জীবনের আর একটি দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়াছে। সকল দেশের সর্ব্বাধিক সম্পদ্ ভারবাহী বা লাঙ্গল-পরিচালক পশু। শিল্পী এই সব পশুচিত্র-

রকমের ব্যাপার শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব হয়। তাঁহার "তিব্বতের প্রপাত"ও লক্ষ্যণীয়।

পার্ব্বত্য জাতি ব্যতীত দারিদ্র্যক্লিষ্ট অন্য জাতিও ভারতে আছে। শিল্পী সমরেন্দ্রকুমার রায় "প্রত্যাবর্ত্তন, They get back" নামক চিত্রে দরিদ্র ও বিনীত সাঁওতাল-জগতের একটি ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। একটি পরিবার সামান্য বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া সারাদিনের শ্রমের পর দিনান্তে কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—ইহাই চিত্রের প্রতি-



রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। এই চিত্রেও দারিদ্র্যের একটি চরম অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের সর্ব্বধ্বংসী দৈন্য নগ্ন করার উৎসাহের জন্য এই সব চিত্রের শিল্পীরা ধন্যবাদের পাত্র। এত বৃহৎ আয়োজন ব্যর্থ হইত, যদি দরিদ্রের ক্রন্দন, অসহায়ের আক্ষেপ, পীড়িতের যন্ত্রণা ইহার ভিতর ফলিত না হইত। নানা রকমের চিত্রসংগ্রহের উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায় ভারতের বুভুক্ষু অন্তর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে এ রকমের আয়োজনের বহুমুখী সার্থকতা স্পষ্ট হইবে।

এবার এ প্রদর্শনী বহু চিত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রায় এক হাজার চিত্রসংগ্রহ কলা-পরিষদের সফলতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। অনেক পুরস্কারও দেওয়া হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কলিকাতার এই অনুষ্ঠানকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ভারতের সকল দেশের সামন্তরাজ ও শিল্পীগণের সম্বন্ধে এই প্রদর্শনী এক নূতন ঐক্যের সূত্রপাত করিয়াছে। ভারতবর্ষের নব-জাগরণের সাহিত্যে ও শিল্পে বাঙ্গলা দেশের সাধনা যে অপরাজেয়, এই প্রদর্শনী তাহার পরিচয় দান করিয়াছে।

বলা বাহুল্য আবদুর রহমান চুঘতাই, নন্দলাল বসু দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রমোদ চাটুর্য্যে, ঠাকুর সিং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণও এই প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাইয়াছেন। শিল্পী যামিনী রায়ের একটা সংগ্রহও প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি চিত্রও ছিল। অতুল বাবুর প্রতিচিত্র, এস্ রায়ের রচনা, কামাখ্যা নাগের ও ভক্তদাস ভাস্কর প্রভৃতি মূর্ত্তিকারের ভাস্কর্য্য এ দেশের একটা বহুমূল্য সাধনার বার্ত্তা বহন করিয়াছে। সমগ্র ভারত এই বার্ত্তাকে শিরোধার্য্য করিয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।*

* ফটোগুলি ফটো সোসাইটি (১০৭-বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট) কর্ত্তৃক গৃহীত।

ঝড়

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী

বাতাস বহিছে ধীরে ধীরে
সাঁঝ হতে দেরী নাই আর,
আধ-আলো আধ ছায়া মাঝে
হেথা হোথা মৃদু আঁধিয়ার।
ছোট গাছে ছোট নীড় রচি
দু'টি পাখী বসে পাশাপাশি
এ' উহার পানে রহে চেয়ে
যেন কত ভালবাসা বাসি—
মাঝে মাঝে কিচ্ কিচ্ করি
কি যে বলে ওরাই তা জানে,
উড়ে যায় ঝটপট করে
আর বার ধায় বাসাপানে।
ছোট প্রাণ ছোট সুখদুখ
কলগানে ভরি নিজ হিয়া,
ছোট ওই নীড় রচিয়াছে
খড়কুটো তৃণ দিয়া।

হেনকালে ঝড় আসে বেগে
মেঘে মেঘে ছাইল আকাশ,
গাছপালা ভাঙ্গে মড়্ মড়ি
ধেয়ে চলে পাগল বাতাস।
ঘন-ঘোর আঁধার ধরণী
আলো নাই শুধু অন্ধকার
বাতাসের সাথে যেন ওই
শোনা যায় কোন্ হাহাকার।
—ক্ষণপরে ঝড় থামে যবে
বাতাস বহিছে মৃদু মৃদু,
ছোট নীড় ভেঙ্গে চুরমার
পাখী দু'টি কেঁদে ফিরে শুধু—
হয় তো নীড়ের মাঝে ছিল
উহাদের নাড়ীছেঁড়া ধন,
তাই ওরা ডুকারিয়া কাঁদে
কে বুঝিবে প্রাণের বেদন॥

অন্তঃপুর

বিবাহের দুর্দ্দশা

—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

আদিম যুগ হইতেই পুরুষ ভবঘুরে, অস্থির ও সংঘর্ষপ্রিয়। কিন্তু সন্তানের একান্ত মঙ্গলেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া, নারী বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার ইত্যাদি পাতিয়া পুরুষকে স্নেহের ডোরে বাঁধিতে চাহিয়াছেন। আজ এ সবই উল্টাইয়া গিয়াছে, কারণ হোটেল আজ ঘর-সংসারের স্থান লইয়াছে, ব্যভিচার ও বিবাহ একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে, মেয়েদের আজ বিবাহে ঘোর অনিচ্ছা হইয়াছে। কারণ তাহাদের অনবরত চারিদিক হইতে suggestion দিয়া শেখান হইতেছে যে, বিবাহ করা অনাবশ্যক; পুরুষের মত নারীর সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার, পুরুষের মত মনের ভাব আনিয়া, রোজগার করিয়া পুরুষের অধীনতামুক্ত হইয়া স্বাধীন হওয়াই আজ নারীর জীবনের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মনোভাব অস্বাভাবিক।

স্বাধীনতা প্রকৃত কি তাহা যিনি জানেন, তিনি বুঝিবেন যে, পুরুষের অধীনতামুক্ত হইলেই স্বাধীনতা আসে না। যাহাই কেন না হউক, নারী সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমান হইতে পারে না, প্রকৃতিদেবী সে পথে অনেক অপরিহার্য্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। নর ও নারী পরস্পরের পূরক (complementary), নর ও নারী পৃথক্ অবস্থায় অসম্পূর্ণ, দুইজনে মিলিয়া তবে তাহারা পূর্ণ হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ কথা আজ অগ্রাহ্য করা হইতেছে। কাজেই বলা হয় যে, গৃহ নারীর কারাগার স্বরূপ (Shaw)। কিন্তু অন্ততঃ গরীবের ঘরে এ কথা অচল এবং আমরা শতকরা ৯০ জন গরীব। বলা হয়, মাতা হওয়া নারীর জীবনে শত শত ব্যাপারের মধ্যে একটি এবং তাহাও নিছক একটি ঘটনা মাত্র। নারীর জীবনে মাতৃত্বকে এইরূপে মুখ চাপিয়া গুমখুন করাই আজিকার দিনে বিকট বাহাদুরী। আপনার লাঙ্গুল কাটিয়া লাঙ্গুলহীন হইতে উপদেশ দেওয়ার প্রবৃত্তি যে শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আপনাদের সুবিধাতে লাগাইবার ফন্দী, তাহা কে বুঝিতে চাহে? তদুপরি এই জাতীয় যুক্তিরও একটা সম্মোহনী শক্তি আছে।

প্রকৃতির সর্ব্বত্র অক্লান্ত উদ্যম—সৃষ্টি করা। যাঁহারা জীববিজ্ঞান জানেন এবং প্রকৃতির সৃষ্টি করিবার শত কোটী অব্যর্থ, অমোঘ কৌশলের কার্য্য জীব-জগতে সর্ব্বত্র দেখিতেছেন, তাঁহারা নারীর বিবাহে বা মাতৃত্বে অনিচ্ছাকে সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নারী অনেক স্থলে বিবাহ করিয়াও মাতৃত্বের দায় হইতে উদ্ধার পাইতে চাহিতেছেন, এ বিষয়ে সর্ব্ব বাধা দূর করা হইতেছে এবং নারী অনেক ক্ষেত্রে মাতৃত্ব-বৃত্তিকে আমোদের বাধা বা কষ্টকর বলিয়াই মাতৃত্ব সংহার করিতেছেন। কৃত্রিম উপায়ে মাতা হইবার কথাও উঠিয়াছে।

আজ সর্ব্বত্রই খাটুনি কমাইবার অশেষ প্রকার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে প্রচুর অবকাশ কেহ কেহ পাইতেছেন। গর্ভনিরোধ ব্যবস্থার প্রসারের সহিত এই অবকাশ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই প্রচুর অবকাশের প্রকৃত সদ্ব্যবহার কয়জন করেন? অথচ অবকাশই সয়তানের সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ, এ কথা সকলেই জানে। অবকাশের সদ্ব্যবহার-কল্পে অশেষ আয়োজন হওয়া সত্বেও, মনীষিগণ বিশেষ উৎকন্ঠিত হইয়াছেন; বিশেষ করিয়া নারীদের অবকাশ বিষয়ে (Wells)।

অনেক দুঃখে বলিতে হয় যে, আধুনিক কেতাবী শিক্ষার একটি 'যশ' এই যে, ইহাতে নানাবিধ বিষয়ে ভাসাভাসা জ্ঞান অনেকেরই হয়, কিন্তু যথার্থ খেদ, আকাঙ্ক্ষা (fundamental needs), ইহাতে অধিক ক্ষেত্রেই মিটান সম্ভব হয় না। কিন্তু কূটতর্ক করিবার মত অনেক দুর্ব্বোধ্য, অথবা ফাঁকা অথচ গালভরা কথা (যাহাদের যথার্থ মর্ম্ম সাধারণতঃ প্রায় কেহই তলাইয়া বুঝিতে পারে না) প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য জন্মে। ফলে কূটতর্ক একটি "চারুকলা"তে (fine art) পরিণত হইয়াছে। তাই কথায় কথায় আজ বিবাহ ও মাতৃত্বে এত অবহেলা দেখা যায়। সংযমশিক্ষা ইহার উদ্দেশ্য নহে, বরং অনেক স্থানে তাহার বিপরীত কারণেই এই রূপ করা হয়।

এ কথাও অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, নারীর জীবিকার্জ্জন-বৃদ্ধির সহিত নারীর আনীত বিবাহ-বিচ্ছেদসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিবাহিত জীবন উত্তরোত্তর অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে (Lindsay, McDougall)। অনেক নারী এই দুইটি ব্যাপার ভাল বলিয়াই মনে করিতে শিখিয়াছেন, কারণ পুরুষের হৃদয়হীনতাই না কি অনেক নারীর সকল দুঃখের মূল। যেখানে শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থা দুইই বিকৃত, সেখানে নারীও পুরুষের সমান অন্যায় বা অত্যাচার করিতেছে, ইতিহাস এবং দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রমাণের অভাব হয় না। পুরুষ ও নারীর অত্যাচারে প্রকারভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মাত্রা সমান থাকে। এ সব কথা দোষ হিসাবে বলা হইতেছে না, প্রকৃত কথা বলিবারই চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য পুরুষ চিরকালই অধিক অত্যাচারী। কিন্তু যেরূপ তাণ্ডব পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, পরে কি হয় বলা যায় না।

ব্যায়াম, ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ শরীর ও মনের পক্ষে ততক্ষণ ভাল, যতক্ষণ মাত্রা থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, এ দেশে অধুনা মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য, অভিনয়, সন্তরণ, ব্যায়াম-ক্রীড়াদি দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, একটা মাতামাতি ও বাড়াবাড়ির ভাব অনেক স্থানে আসিয়াছে। নারীদের পক্ষে ক্রীড়া ও ব্যায়ামাধিক্য ভাল নহে, কোন কোন মনীষীর এই মত দেখা যায়। ইহাতে নারীর শরীর ও মনের অনেক সদ্‌গুণ খর্ব্ব বা লোপ হয়, নারীকে অতিমাত্রায় জেদী ও সংঘর্ষপ্রিয় করে। ইহার ধাক্কা স্বামী ও সন্তানেরই অধিক ক্ষেত্রে ভোগ করিতে হয় (New Health, 1936)। আবার প্রতিযোগিতা বা পুরস্কারের তীব্র আকর্ষণ সর্ব্বদাই লোকচক্ষের সম্মুখে আনে, লোকের কাছে বাহাদুরী অথবা বাহবা পাইবার উৎকট প্রলোভন আনে। ফলে নারীর ধর্ম্ম, শ্লীলতা, লজ্জা-সরম ধুইয়া মুছিয়া সর্ব্বদা লোকের কাছে বাহবা ও কৃতিত্ব দেখাইবার প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি করে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ কি এই মনোবৃত্তিকে একটি অস্বাভাবিক বৃত্তি (perversion) বলেন না? যদি তাহা নাও হয়, তথাপি ইহার ফল এ কালে কি হইতে পারে?—যে কালে প্রায় প্রত্যহ নারীধর্ষণ হয়, যে কালে নারীকে রক্ষা করিবার সাধ্য নারী বা পুরুষ কাহারও নাই, যে কালে নারীর মর্য্যাদাজ্ঞান সাধারণের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেও চলে, যে কালে বিজ্ঞাপনে, সংবাদপত্রে, প্লাকার্ডে, কথা-সাহিত্যের মধ্যে, সিনেমায়, অনেক-ক্ষেত্রে নারীকে শুধু উপভোগের সামগ্রী করিয়াই চারিদিকে দেখান হয়?—অথচ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান অতি-মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও এই সমস্তেরই কোন প্রতিবাদ করা দূরের কথা, মনে হয় নারী যেন মানিয়াই লন।

'নারীর লজ্জাই ভূষণ', সকল মূল্যবান্ কথার মতই এ যুগে এই কথাও হেঁদোকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা এ দেশে চিরকালই মানা হইত। অভিভাবক বা আত্মীয়েরাই আজ বাল্যকাল হইতে মেয়েদের লজ্জার মাথা খাইতেছেন। লজ্জাতে ভালবাসার টান বৃদ্ধি পায়, স্থায়ী হয়, ইহাতে নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করিতে শিখায়। 'ভড়পুঁটুলী' হওয়া এক কথা, 'বেহায়া' হওয়া আর এক কথা। নারী চিরকাল আত্ম-সম্মান-প্রয়াসী, আজ ইহা আরও অধিক কাম্য। কিন্তু লজ্জা-সরম, বা শ্লীলতাই যে নারীর চিরকাল আত্ম-সম্মান বর্দ্ধিত করিবার ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার একমাত্র পন্থা, তাহা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে নারী আজ শুধু ভোগ ও আমোদে সহচরী হইয়া পড়িয়া তাঁহার যাবতীয় উচ্চ গুণ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। বাস্তবিক লজ্জা-সরম যে নারীর

শরীর ও মনের বর্ম স্বরূপ, রক্ষাকবচ স্বরূপ, এ কথা Havelock Ellis সাহেবও স্বীকার করেন। আবার ব্যায়াম-ক্রীড়াদি করিলে শরীরের ক্ষয় পূরণ করিবার মত উপযুক্ত আহার চাই, কিন্তু অধিকাংশ গৃহস্থ তাহা যোগাইতে অক্ষম, কারণ গৃহস্থ-সংসারে শত শত খরচা, কোনটারই আজ কুলান হয় না, তাহার উপর ব্যায়াম-ক্রীড়া নৃত্যাদিতে খরচা বৃদ্ধিই হয়, কমে না। সুতরাং যখন প্রাইজ-প্রতিযোগিতার নেশা পাইয়া বসে, তখন অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে শরীর ক্ষয় হয়, অনেক স্থলে তাহা পূরণ না হইয়া উৎকট ব্যাধি, এমন কি যক্ষ্মা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। শরীরের এবং অবস্থার উপযুক্ত ব্যায়াম ঘরে বসিয়াও করা যায়। প্রাচীন রোম বা গ্রীস দেশে বিবাহ ও সন্তানবৃদ্ধিকামনায় যে সব ব্যবস্থা করা হইত, ভারতবর্ষে তাহার সার্থকতা কি? আমাদের দেশে এখনও অধিক মেয়েকে বিবাহ করিতে হয়, কিন্তু নৃত্য-ব্যায়াম-ক্রীড়াদিকুশলী গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের যদি সন্তান-সম্ভাবনা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সুস্থ সবল সন্তান প্রসব বা পালন করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়। সাধারণতঃ তাহাদের চিত্ত সংসারে আটক থাকিতে চাহে না। আধুনিক নৃত্য অনেক সময়ে পরোক্ষভাবে যৌন বৃত্তি চরিতার্থকর এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত বৃত্তির উত্তেজক (Medical Critic and Guide, 1919)। বিদেশে ও এদেশে নৃত্য-গীতের আবহাওয়ায় অনেক বিবাহ ঘটে বা ভাঙ্গে এবং বিবাহ ভিন্ন সর্ব্বনাশও ঘটায়। অবশ্য আজ এ সব কথা অনেকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু যাহাই কেন মনে করা হউক, আজিও সকল দেশেই প্রণয় নিছক কামের ছদ্মবেশেই দেখা দেয়। প্রণয়ে বিপদ আছে হিংসাও আছে, প্রকৃতি কখনও কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যতিক্রম মার্জ্জনা করে না, ইহার মধ্যে ঘোর প্রতিক্রিয়ারূপে অবসাদ, রিক্ততা, আক্ষেপ আছেই এবং সময় সময় জীবনব্যাপী রোগ ও সন্তানের সর্ব্বনাশ আছে।

যাহারা নৃত্য-গীত কিছুতে যোগ না দেয়, তাহারা অনেকে পড়াশুনার নামে গৃহকর্ম্ম করে খুব কম। কিন্তু মাতৃত্ব ব্যাপার এমনই যে, ইহাতে সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ ভিন্ন সুসন্তান প্রায়শঃ জন্মে না। যদি বেকন, গ্যেটে বা নিউটনের মাতারা তাঁহাদের সমস্ত শক্তি সন্তানের জন্ত নিয়োজিত না করিতেন, তবে এরূপ সন্তানের জননী হইতে পারিতেন না (Guyau)। প্রতিভার কথা না ধরিলেও বলা চলে যে, আমাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যশূন্য দেশে সুস্থ স্বাভাবিক সন্তান জন্ম দিতে গেলে মাতার পূর্ণ শক্তি এবং পিতারও পূর্ণ শক্তি আবশ্যক। এই কারণে কেহ কেহ বলেন যে, নারীর "বাড়িবার বয়সে" তাহার সকল প্রকার চাপ বন্ধ করা আবশ্যক। অবশ্য যাঁহারা মাতা হইতে চাহেন না বা বিবাহে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এ সব কথা অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু এমন কোন নারী আছেন, যিনি অন্তরে অন্তরে মাতা হইতে চাহেন না?

দেখা যায় যে,'সভ্যতা'র শিখরে যে সব দেশ উঠিয়াছে, সেখানেও সুধু সন্তান-বুভুক্ষা তাড়িত হইয়া অনেক নারী বিপথে যায়। কেহ জানিয়া, কেহ বা না জানিয়া এরূপ করে (Lindsay)। তথাপি মাতৃত্ব-হন্তারক হইয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করাই না কি সভ্যতার নিদর্শন! বলা হয় যে "প্রকৃতি বিজয়" করিয়াই মানুষ সভ্যতা স্থাপনা ও উন্নতি করিয়াছে। এ কথাটি নিছক বৃথা গর্ব্ব, কারণ মানুষ ও তাহার যাবতীয় শক্তিসমূহ কোনটিই প্রকৃতির বহির্ভূত নহে, সবটাই প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং মানুষের সকল ভাব ও কার্য্য প্রকৃতিরই কার্য্য। এত দম্ভ করা সত্ত্বেও আজ মানুষ,"স্বাভাবিক" (natural অথবা human) বলিয়া মানুষের সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিতে চায় (J. S. Mill), বিশেষ করিয়া তাহার আহার ও দাম্পত্যবৃত্তির দুর্ব্বলতাসমূহকে। ফলে দাম্পত্য বৃত্তিচালিত সভ্যতার গতি আদিম অসভ্য যুগের পুনরভিনয় করিতে ব্যস্ত। এই দুইটি ব্যাপারে মানুষ প্রকৃতিদেবীর পরমভক্ত, দাসানুদাস, চরম উন্মোদ!

মজার কথা এই যে, আজ জগৎব্যাপী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, দাম্পত্যবৃত্তি অবদমিত করিলে জীবনদহনকারী স্নায়ুরোগ জন্মিয়া মানুষকে জীবন্মৃত করিয়া রাখে, কারণ কামের ন্যায় বলশালী প্রবৃত্তি মানুষের আর নাই। কিন্তু আধুনিক Biologyর জন্মদাতা Darwinএর মতেও মানুষ অপেক্ষা বলশালী প্রেরণা মানুষের আর

নাই। অথচ এই মাতৃত্ববৃত্তিকে খর্ব্ব, দলিত, ধ্বংস করিবার আয়োজন বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র চলিতেছে। এইরূপ বুদ্ধি হইবার কারণ সহজেই অনুমেয়—একটি মুখরোচক, অপরটি স্বার্থ-ত্যাগ ও বেদনার উপর দণ্ডায়মান। যদি সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী বলিয়া কামকে সর্ব্ববাধামুক্ত করার জগদ্ব্যাপী আয়োজন হয়, তবে মাতৃত্বকেও সেই কারণেই সর্ব্ব-বাধামুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নয় কি? সন্তানই যে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় স্থায়ী করে, গভীরতর করে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

অধুনা মাসিক পত্র, নভেল, সিনেমা, সংবাদ পত্র, রেডিও, ভূরিপ্রচার (propaganda), এমন কি স্কুল-কলেজ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করে, শিক্ষার ব্যবস্থা দেয়, তাহার অধিকাংশই বিদেশীয় ভাবধারায় ভরপূর ও তাহার অনুকরণকারী এবং স্বদেশীয় অনেক কিছুর পদাঘাতকারী। ইহার সমস্ত কিছুই অধিকক্ষেত্রে সহরজাত, বিদেশীয় অনুকরণে সিদ্ধহস্ত। আমাদের দেশে কিন্তু শতকরা ৮০ জনের বেশী পল্লীবাসী। আমরা শতকরা ৯২ জন নিরক্ষর, শতকরা ৩৫ জন একবেলার অধিক আহার পাই না, শতকরা ৯৫ জন কদন্নভোজী, অপুষ্ট-দেহ-মন, সহস্র চাপে রিক্ত ও দুঃখী বা রোগী। এই সব কথাগুলি দেশবাসী কাহারও এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা মরণোন্মুখ জাতি। সুতরাং আজ অনুকরণবশে আমরা বিদেশীয় সব কিছু লইতে গেলে (আমরা তাহাই মনে প্রাণে করিতেছি), আমাদের দুর্দ্দশার বৃদ্ধি ভিন্ন উঁহাদের আপাতমনোরম বহিরাবরণ পর্য্যন্ত আমাদের আয়ত্ত হইতে পারে না।

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেদের অভাব-অভিযোগ, আমোদ-প্রমোদ, ভাব-ভাবা, আশা-ভরসা, আদান-প্রদানের সহিত দেশের মেরুদণ্ড যাহারা, তাহাদের কতটুকু যোগ-সূত্রে আছে? অথচ "শিক্ষিত"—এই গর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্বও আমরা কার্য্যক্ষেত্রে ভুলিয়া যাই। এই ছোট কথাটি মনে থাকে না বলিয়াই আজ আমরা এত বিদেশীয় ব্যবস্থা সমাজমধ্যে চালাইতেছি। একবারও ভাবি না, ইহাতে [illegible] দেশবাসীদের কি উপকার বা অপকার সাধিত হইবে। ব্যসন-বিলাস যাহাদের করিবার উপায় নাই, বহিরাড়ম্বর তাহাদের কি কাজে লাগিবে? আমাদের স্বদেশীয় সংস্কৃতির আদর্শমধ্যে যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ্ নিহিত আছে, তাহা অনুভব-সীমার মধ্যেও আনিতে অক্ষম হইয়া তোতাপাখীর মত বিদেশী বুলি আওড়াইতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। ফলে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তোষ, উচ্চগতি, প্রীতি, দরদ-মমতাদি মনে স্থান পায় না। সুধু বাহ্যদৃশ্যে ভুলিয়া নূতনের উন্মাদনায়, বিলাসিতার মোহে, শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া, জীবন হইতে নীতিকে দূর করিয়া দিয়া, যথার্থই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছি। সুতরাং, সমাজরক্ষার মূল যাহা কিছু, তাহা মুমূর্ষু অবস্থায় হাড় কয়খানি বজায় রাখিয়া কোন মতে টিকিয়া আছে। সমাজও এই প্রকারে মরণোন্মুখ অবস্থায় প্রলাপগ্রস্ত রোগীর মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। বিবাহও তাহারই অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা যে জাতীয় মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ, তাহা কি বুঝিবার সময় আজও আসে নাই?

এই সব মর্ম্মান্তিক কথা বা প্রশ্ন জলিত-মস্তিষ্ক হইয়াই করিতে হয়, কারণ দেখা যায় যে, Bertrand Russel প্রমুখ আমাদের 'গুরু'গণ এবং অনেক নভেল-লেখক বলেন যে, মানুষের দাম্পত্যবৃত্তি একটি নিতান্ত অরাজক ব্যাপার; ইহার স্বভাব এই যে, ইহা এক‌ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিলে মরিয়া যায়, সর্ব্বদাই ইহা বিভিন্নক্ষেত্রে আত্মবিকাশ লাভ করিতে চায় এবং ভালবাসা ভিন্ন বিবাহ গণিকাবৃত্তির তুল্য। এই কয়টি কথা সাবধানে বুঝিলে প্রতীয়মান হইবে যে; (১) বিবাহ জীবনব্যাপী হওয়া অসম্ভব, (২) নিত্য নূতন ক্ষেত্রে মিলিত হওয়াই ভালবাসার সার্থকতা ও আত্ম-বিকাশের অনুকূল, (৩) যাহাদের যে কোন কারণে ভাল-বাসা কম হইয়াছে বা গাত্রসহ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করা আবশ্যক, (৪) যে-কোন ক্ষেত্রে ভালবাসা হউক, তাহাতে বাধা যতই থাকুক, তাহার সহিত মিলন চাই। ইত্যাদি।

আমরা এই সব যুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাই না। তবে, গোটা-দুই কথা বলিব। উপরোক্ত মনোভাব যাঁহা-দের, তাঁহারা কাম ও ভালবাসা দুইকে একই দেখেন বলি-য়াই এই সব কথা বলিতে সাহস পান। Herbert

Spencer হইতে আরম্ভ করিয়া Havelock Ellis, H. G. Wells প্রভৃতি মহারথিগণ পর্য্যন্ত একবাক্যে স্বীকার করেন যে, দাম্পত্যবৃত্তির মধ্যে কাম এবং ভালবাসা দুইই আছে। একটি অন্যটি ব্যতীত বাঁচে না, স্থায়ী বা পূর্ণ হয় না। একটি ছাড়িয়া অন্যটি হয় নিতান্ত পশুবৃত্তি, নয় রসহীন। শুধু কাম দেহসংযোগে মরিয়া যায়; শুধু ভালবাসা কাম ভিন্ন বিকশিত হয় না, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা এই যে, উক্ত প্রকার মনোভাব সাধারণের অতি প্রিয়; কারণ, ইহার মধ্যে শুধু ভোগের কথা আছে। আবার সর্ব্ববাধাশূন্য করিয়া দিবার জন্যই এই সব কথার সৃষ্টি, নচেৎ যদৃচ্ছ কামোপভোগ করা যায় না। ইহাতে যে-কোন প্রকারে পরের দাবীতে হস্তক্ষেপ করিতেই হয়, নচেৎ প্রত্যেকের খেয়ালমত কার্য্য হয় না। ইহাতে সমাজ, সভ্যতা, ভদ্রতা থাকে না; জুয়াচুরী, গুপ্ত বা প্রকাশ্য প্রণয় রাস্তা-ঘাটে ঘটিতে বাধ্য হয়। সুতরাং, সংসার একটি ইয়ার্কির স্থান বা 'pandemonium' হইয়া পড়ে। কিন্তু, এই প্রকারে অবাধ যৌন সম্ভোগবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া, বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরেই নেপথ্যে বলা হয় যে "পরের দাবীতে হস্তক্ষেপ করিও না।" অথচ, সকলেই জানে ও সকলেই মানে যে, পরের দাবীতে হস্তক্ষেপ ভিন্ন এরূপ তাণ্ডব নৃত্য চলে না। জুয়াচুরী, হাল ফ্যাসানে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। কিন্তু, যে-দেশ হইতে এই নীতির আমদানী, সেখানে অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থ-ঘরের আওতায় বিশ্বাসকে জবাই করিয়াই কি ঘরে ঘরে গুপ্ত প্রণয় ঘটে না? সত্য কথা এই যে, জুয়াচুরী ভিন্ন এসব ব্যাপার অচল। Freud প্রমুখ মনীষিগণের বচন উদ্ধার করিয়া মানুষ আজ ব্যভিচার করে; কারণ, তাঁহারা বারংবার দেখাইয়াছেন যে, যৌনবৃত্তি দমিত করিলে সাংঘাতিক স্নায়ুরোগ হয়; জগৎশুদ্ধ এই মত, কাজেই কে কাহাকে ঠেকাইবে! কিন্তু, Ellis, McDougall প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, উক্ত কথার সারবত্তা নাই; সংযমই মানুষকে "মানুষ" করিতে পারে, ইহা সর্ব্বত্র দেখা যায়। স্ব স্ব জীবনে ইহার সত্যতা পরীক্ষাও সকলেই করিতে পারেন।

এই সমস্ত শিক্ষা বা ব্যবস্থাই বিবাহ-ব্যবস্থার মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিষেধক কি?

মেঘ

—শেলী

আমি—সরস বারি আনি—কুসুমে ঢারি
ঐ—সিন্ধু-তটিনী হ'তে তৃষ্ণা ভরে;
করি—আধেক ছায়া ধরি—শতেক মায়া
ঐ—দুপুর-স্বপন-ঢলা পাতার পরে।

মম—পক্ষ হ'তে ঐ—শিশিরস্রোতে
যত—পুলকে কাঁপিয়া জাগে কুসুমকুঁড়ি,
বেগ—বাহুর ভরে জন্ম—দোলনে নড়ে
ঐ—পাগল পবনস্রোতে ঘুরিছে ঘুরি।

ছুঁড়ি—করকা মেতে ঐ—শাঙন ক্ষেতে
ধরি—শুভ্র শিবের ভূষা মরত ভূমি,
যত—শিলার রাশি যায়—গলিয়া ভাসি
আমি—উজলি চলিয়া যাই বিজলী চুমি'।

ছুঁড়ি—তুষার নীরে ঐ—শৈলশিরে
যত—পাইনতরুর পাতি গোঙিয়া মরে;
মোর—সারাটি রাত্তি থাকে—সিরিটি শাদা
আমি—স্বজনে শেজটি পাতি পবন-পরে।

উচ—সৌধচূড়ে মোর—গগনপুরে
থাকি—দেখায় আমার পথ সৌদামিনী,
মোর—নীচের তলে থাকে—বাঁধা শিকলে
দেখ—গর্জ্জে কুলিশ কত, তাহারে জিনি।
চলে—মন্দগতি মোর—বিজুরী-জ্যোতি
প্রেম—আবাহন পেয়ে ধরা-সাগর' পরে,
ঐ—গিরির বুকে ঐ—সরসীমুখে
ঐ—ঝোরাতে মিশিতে চায় পরাণ ভ'রে।
যবে—যেখানে থাকে তাকে—প্রেমিকে ডাকে
সেথা—মিলিতে ছুটিয়া যায় পরশ মাগি',
আমি—সোহাগে আসি দেখি—স্বরগ হাসি
সে যে—মিশে কোথা চ'লে যায় বৃষ্টি লাগি।

ঐ—রক্ত-রবি আঁকে—স্বর্ণছবি
যবে—শুক্র তারকা যায় অস্ত চলি',
রবি—কিরণমালা চারি—দিকেতে ঢালা
মম—অঙ্গ উপরে যায় চরণ দলি;
যেন—আর্দ্রশিরে ভূমি—কম্পে ধীরে
যাহা—দোদুল দোদুল দোলে কাঁপনে মাতে,
তাতে—গরুড় পাখী ক্ষণ—নিমেষ থাকি
নিজ—স্বর্ণপক্ষ ভরা আলোকপাতে।
যবে—অস্তে রবি করে—শান্ত কবি
বহি'—প্রেমের বার্ত্তা অল-জলধি হ'তে
দেয়—সন্ধ্যারাণী তার—আঁচল টানি
ঐ—স্বর্গ ভুবন ঢাকি স্বর্ণালোতে।
ঐ—সাঁঝের বেলা করি—নীরব খেলা
আমি—আপন বায়ুর নীড়ে আপন সাথে,
মম—পক্ষ দু'টি থাকে—গুচ্ছ লুটি'
যেন—অণ্ড উপরে ঘুঘু নীরবে রাতে।

ঐ—ইন্দুবালা ঢালি—রূপের আলা
ঘন—নৃত্য করিয়া মোরে ঝরোকা রচে,
তার—নেউর ধ্বনি বাজে—ঝনন্ ঝনি
যত—দেবশিশু শুনি কানে পড়ে ঝুরছে।

সব—তারকাবলী যেন—সোণার অলি
তারা—ঝাঁক বেঁধে উঁকি দেয় চাঁদের পাশে,
আমি—বিথারি মোরে ঐ—বায়ুর ঘোরে
দেখি—ঝোরা, ঝিলে কত শত মুকুর আসে।

আমি—সূর্য্যরথে বাঁধি—স্বর্ণলতে
আর—ইন্দুদেবীরে দিই মেখলা ঘিরি,
যবে—ঝঞ্ঝা উঠে মোর—ধ্বজাটি টুটে
কাঁপে—তারকানিকর, নিভে অগ্নিগিরি।
আমি—দেশ বিদেশ গাঁথি—সেতু বিশেষ
ঐ—ক্ষুব্ধ চপল গতি সাগর 'পরে
ঐ—সূর্য্য-জ্যোতি নাহি পশিতে গতি,
ঝুলি—উপর তলেতে নগে গাঁথনি ক'রে।
পশি—বিজয় তোরণ করি—সমাপ্ত রণ
রচা—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইন্দ্রধনু—
রবি—রশ্মিমালা সাত—রঙেতে জ্বালা
কত—সুন্দর করি রচে মোহন তনু।
বাঁধা—সিংহাসনে বায়ু—শক্তি রণে,
চলি—ঝঞ্ঝা, আলোকমালা, শিলার সাথে;
শেষে—শ্যামল ভূমি ভানু—কিরণে চুমি
নীচে—ঝলমল করি' সে যে হাস্তে মাতে।

মোর—জীবনধারা সদা—গগনে হারা
আমি—জনম লভেছি ঐ ধরা ও জলে
হ'য়ে—বাষ্প কণা তুলি আকাশে ফণা
পরি—বর্ত্তনি' নিজ রূপ মরণে দ'লে।
ঐ—বৃষ্টি পরে আমি—থাকি না ঘরে
ঐ—স্বর্গ চন্দ্রাতপ মুক্ত সেজে—
ঐ—সূর্য্যবাতি করি—অনিলে সাথী
রচে—সুনীল মরকতগৃহে বক্র তেজে।
আমি—মৃদুল হাসি মোর—শ্মশানে আসি
ঐ—বৃষ্টিধারা থেকে বাষ্পবেশে,
শিশু—গর্ভ হ'তে প্রেত—কবর হ'তে
আমি—ভেঙে দিয়ে যাই চ'লে আবার এসে॥

অনুবাদক—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়া কথাটা একটা ইটালিয়ান শব্দ। ভাষায় 'মেলা' শব্দের অর্থ 'খারাপ' এবং 'এরিয়া' অর্থ 'বাতাস, অর্থাৎ খারাপ বাতাস হইতে আনীত যে রোগ, তাহার নাম ম্যালেরিয়া। বর্ত্তমানে এই শব্দ পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই গৃহীত হইয়াছে (Encoyclopædia Médica—Voll., VIII., P. 564)।

ম্যালেরিয়ার সূক্ষ্ম জীবাণু এনোফিলিস জাতীয় কয়েক প্রকার মশকের দ্বারা মানুষের দেহ হইতে দেহান্তরে নীত হয়। ঐ জীবাণুগুলি দেহের রক্তকণিকাগুলিকেই আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে। এ-জন্য দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে মানুষ রক্ত-শূন্য হইয়া যায়।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহের ভিতর প্রবেশ করিলেই যে মানুষ অসুস্থ হয়, তাহা নয়। যাহাদের দেহ সবল ও দোষশূন্য, ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশকে দংশন করিলেও তাহাদের বিশেষ কিছু হয় না। অনেকে ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে থাকে, তথাপি তাহারা ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত। ম্যালেরিয়ার সত্যকার কারণ ম্যালেরিয়া শব্দের ভিতরেই নিহিত আছে। ক্রমাগত দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া যখন রক্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে দেহে যথেষ্ট পরিমাণ বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হয়, তখনই ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

ম্যালেরিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ। সাধারণতঃ বর্ষার পর নিম্নভূমির আশে পাশেই এই রোগের অধিক বিস্তার হয়। বর্ষার পর নিম্নভূমি হইতে গ্যাস বাহির হয়, তাহাই প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত দেহের ভিতর যাইয়া রক্তকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। দেহের ভিতর রোগবিস্তারের এই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইলেই, ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহের অনিষ্ট করিতে পারে।

ম্যালেরিয়া-রোগীদের সর্ব্বদাই জ্বর থাকে না। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনায়, অত্যধিক গরম অথবা ঠাণ্ডা হাওয়া গ্রহণে এবং অন্যান্য রোগের আক্রমণেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহের ভিতর প্রভাব বিস্তার করে এবং রোগী জ্বরগ্রস্ত হয়। ইহাই নিঃশেষে প্রমাণ করে যে, দেহ যখন দুর্ব্বল হয়, তখনই কেবল রোগ-জীবাণু আক্রমণ করিয়া সুবিধা করিতে পারে।

দূষিত গ্যাস হইতেই যে রক্ত কেবল খারাপ হয়, তাহা নয়; দেহে অত্যধিক পরিমাণ বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হইলে রক্ত-কণিকাগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখনও ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা তাহারা সহজে আক্রান্ত হয়।

এই জন্যই ম্যালেরিয়া-রোগীদের প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, লোমকূপ মুক্ত থাকে না এবং যথেষ্ট প্রস্রাব হয় না। যে-পথে প্রকৃতি দেহের পরিত্যাজ্য পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেই পথগুলি যখন যথেষ্টরূপে মুক্ত না থাকে, তখন ঐ দূষিত পদার্থগুলি দেহের ভিতর থাকিয়া রক্তকে দূষিত করে এবং রক্ত দূষিত হইলেই ম্যালেরিয়া-জীবাণু-বিস্তারের উর্ব্বর ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়।

[২]

বিভিন্ন দেহে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ বিভিন্নরূপ হয়। কাহারও জ্বর প্রত্যহ হয়, কাহারও একদিন অন্তর হয়, কাহারও দুই দিন অন্তর, কাহারও দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার জ্বর হয়। কোন কোন সময় আবার আক্রমণ এত ঘন ঘন হয় যে, নিজ্বর অবস্থা হইতে পারে না। কেবল মাত্র জ্বরের তাপ হ্রাস হইয়া থাকে। যখন সবিরাম জ্বর একজ্বরে পরিণত হয়, তখনই রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগীর প্রবল শীত ও কম্প অনুভব হয়। কখন কখন মাথার বেদনা ও কাসি থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় চোখ-মুখ লালবর্ণ হইয়া যায়, গাত্র-চর্ম্ম শুষ্ক হয়, মাথা ধরে, পিপাসা বৃদ্ধি পায় এবং বমন বা বমনেচ্ছা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দেয়। তখন উত্তাপ ১০১°—১০৭° পর্য্যন্ত হয়। ইহার পর গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। তখন শীত কমিয়া যায় এবং রোগী ঘামিতে থাকে। রোগী যথেষ্ট ঘামিলে জ্বর আপনি ছাড়িয়া যায়।

দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ার জ্বর থাকিলে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার অনেক সময় কুইনিনের অপব্যবহারের ফলেই প্লীহা-যকৃৎ বৃদ্ধি পায় এবং শোথ ও উদরী আক্রমণ করে।

[৩]

ম্যালেরিয়ার জীবাণু হত্যা করার জন্য বিভিন্ন বিষাক্ত ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যে-অবস্থা দেহের ভিতর ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বিস্তার সম্ভব করিয়াছে, যে-পর্যান্ত না দেহ হইতে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ দূর হয়, সেই পর্যান্ত কুইনিন প্রভৃতি কোন ঔষধেই রোগীর কিছুমাত্র উপকার হয় না, বরং যথেষ্ট ক্ষতিই করে। প্রকৃতি দেহের ভিতর অতিরিক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া যে-রোগবিষকে পোড়াইয়া ফেলিতে চায়, বিষাক্ত ঔষধ দেহকে ক্রমশঃ এরূপ অসাড় করিয়া আনে যে, প্রকৃতি আর প্রবল জ্বর সৃষ্টি করিয়া দেহকে নির্দ্দোষ করিতে সক্ষম হয় না। সাধারণ লোকে তাহাকে আরোগ্য বলিয়া ভুল করে। কিন্তু রোগের মূল কারণ নষ্ট না হওয়ায় রোগ তাহাতে আরোগ্য হয় না। রোগ কতক দিন চাপা অবস্থায় থাকে। তাহার পর, যাহা সহজ ছিল তাহাই অধিকতর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লইয়া অথবা অন্য রোগের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।* অথবা সে শক্তিও দৈহিক প্রকৃতির যদি না থাকে, তবে ম্যালেরিয়া পুরাতন রোগে পরিণত হয়। এই জন্যই দেশে এত কুইনিনের প্রচলন থাকিতেও প্রতি বৎসর ভারতে এগার লক্ষের উপর লোক এক ম্যালেরিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করে।

কুইনিন প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ ম্যালেরিয়ার জীবাণুকেই যে কেবল ধ্বংস করে, তাহা মনে করা ভুল। বিষাক্ত ঔষধ যে পরিমাণে রোগজীবাণু ধ্বংস করে, সে পরিমাণে রোগীর জীবনীশক্তিকেও ক্ষুন্ন করে।

কিন্তু জল, মাটি ও উত্তাপ প্রভৃতির দ্বারা দেহের কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া অনায়াসে আমরা দেহকে রোগমুক্ত করিতে পারি। ষ্টিম-বাথ, হিপ বাথ, তলপেটের ব্যাণ্ডেজ এবং জলপান প্রভৃতি দ্বারা অতি অল্প সময়ে রক্তকে বিশুদ্ধ এবং দেহকে আবর্জ্জনামুক্ত করা যাইতে পারে। দেহ যখন তাহার বিষের বোঝা হইতে মুক্ত হয়, তখন কোন রোগ-জীবাণুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার বিষাক্ত ঔষধ দেহের অপরিমেয় অনিষ্ট করিয়া যে রোগ-জীবাণু নষ্ট করে, দেহের কিছুমাত্র ক্ষতি না করিয়া ষ্টিমবাথ সবই জীবাণু নষ্ট করিতে পারে।

ম্যালেরিয়া রোগীর পক্ষে প্রথমেই আবশ্যক অন্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে (intestine and colon) দোষশূন্য করা। ঐ স্থানই দেহের প্রধান আস্তাকুঁড়। এই মলভাণ্ডের দূষিত রস অনুক্ষণ রক্তস্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের রক্তকে দোষযুক্ত করে। তলপেটের এই আবর্জ্জনা অব্যাহত রাখিয়া কোন চিকিৎসাই চলে না।

তলপেট দোষশূন্য করিতে হিপ-বাথ ও তলপেটের ব্যাণ্ডেজের মত আর কিছুই নাই। হিপ-বাথকে জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র বলা চলিতে পারে। একটি ভদ্রলোক বলিয়াছেন, যেমন কানে ধরিয়া এক জন লোককে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া চলে, তেমনি হিপবাথ দ্বারা কানে ধরিয়া জ্বরকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায়।

অনায়াসে বসা যায়, এরূপ বড় একটি গামলায় পা বাহিরে রাখিয়া নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া অনবরত তলপেট ঘর্ষণ করিলেই হিপ-বাথ নেওয়া হয়। জ্বরের প্রথম অবস্থায় এই বাথ দিনে তিন বার করিয়া দশ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত লইতে হয়। অনেক সময় এক দিন মাত্র হিপ-বাথ লইলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং জ্বর কমিয়া যায় (প্রবন্ধলেখক প্রণীত বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা, ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যাহাদের অত্যন্ত কোষ্ঠ-কাঠিন্য, তাহারা হিপ-বাথ নেওয়ার অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে তলপেটের ব্যাণ্ডেজ লইতে পারে। নাভির নীচ হইতে তলপেটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের উপর একটা ভিজা নেকড়া দুইবার ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার উপর একটা ফ্লানেল দিয়া এমন করিয়া বাঁধিতে হয়, যেন, ভিজা নেকড়ার সহিত বায়ুর সংস্পর্শ না হইতে পারে। অর্থাৎ ভিতরে একটা উত্তাপ সৃষ্টি করা চাই। এই প্যাক প্রতি দিন ভোরবেলা খালি পেটে দুই ঘণ্টার জন্য দিলে তলপেটের সমস্ত কঠিন বিজাতীয় পদার্থ গলিয়া বাহির হইয়া যায়।

দেহে যখন শীত ও কম্প থাকে, তখন তলপেটের ব্যাণ্ডেজ নেওয়া উচিত এবং দেহে যখন জ্বালাপোড়া হয়, তখন হিপ-বাথ লইতে হয়।

* Kuhne—Natural Ways of Cure, P. 15-23.

অনেক রোগী আছে, জ্বরের প্রথম আক্রমণেই তাহারা এত অস্থির হইয়া পড়ে যে, উঠিয়া বসিতে পারে না। হিপ-বাথের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের পেটে মাটির পুলটিস দেওয়া চলিতে পারে। রোগীর দেহের উত্তাপ অনুসারে অর্দ্ধঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নাভির নীচে তলপেটে মাটির পুলটিস দেওয়া যায়। ইহাতে অতি সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, মূত্র বর্দ্ধিত হয় এবং তলপেটের অনেকটা কুপিত তাপ মাটির সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

জ্বরের প্রথম দিনই, দেহের উত্তাপ যখন সর্ব্বনিম্নে থাকে, তখন রোগীকে একটা ষ্টিম-বাথ, হট-ফুট-বাথ বা ওয়েট-শিট-প্যাক দেওয়া আবশ্যক। ইহার যে-কোন একটি দ্বারাই দেহের দূর দূর অংশে সঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায় এবং ইহার প্রত্যেকটিই রোগজীবাণু নষ্ট করে।

একটা মোটা কাপড়ের মশারির ভিতর ষ্টিম ছাড়িয়া দিয়া মাথা ও মুখ বাহিরে রাখিয়া শরীর ঘামাইয়া লইলেই ষ্টিমবাথ হয়। একটা টিনের পাত্রে চুঙ্গি বসাইয়া লইয়া এবং পাত্রের ভিতর কতকটা জল দিয়া ষ্টোভে জ্বাল দিলেই অনায়াসে বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে।

হট-ফুট-বাথ গৃহস্থদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। একটা গামলায় গরম জল ঢালিয়া সমস্ত দেহ কম্বলঢাকা অবস্থায় পনের মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পা ডুবাইয়া রাখিলেই প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

অথবা ইহার পরিবর্ত্তে ওয়েট-শিট-প্যাক লওয়া চলিতে পারে। জ্বর আরোগ্যের পক্ষে ওয়েট-শিট-প্যাকের মত জল-চিকিৎসা জগতে আর কিছুই নাই।

পর পর তিনখানা লোমের কম্বল পাতিয়া, তাহার উপর একখানা ভিজা বিছানার চাদর মেলিয়া দিয়া, ঐ চাদরে রোগীর পা হইতে গলা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ভাল করিয়া আবৃত করিতে হয়। তাহার পর এক এক খানা করিয়া তিনখানা কম্বল দ্বারা রোগীর সমস্ত দেহ ঢাকিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। কম্বলের নীচে যে গুমট গরমের সঞ্চার হয়, তাহাতে রোগীর দেহ হইতে যথেষ্ট বিষাক্ত জিনিষ, ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া যায়।

সকল উক্ত স্নানের পরই হিপ-বাথ লইয়া এবং স্নান করিয়া তাহার পর পুনরায় কম্বল জড়াইয়া শরীরটাকে পুনরায় গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক।

এই সকল বাথ ও প্যাকের সঙ্গে রোগী প্রচুর শীতল জল পান করিবে। রোগীর যতক্ষণ শীত ও কম্প থাকে, কেবল ততক্ষণ রোগীকে গরম জল দিতে হয়, তাহা ব্যতীত আর সকল সময়েই রোগীকে নেবুর রস সহ প্রচুর শীতল জল দেওয়া আবশ্যক। জল দেহ হইতে সমস্ত বিষ ধোয়াইয়া লইয়া যায়। জলের মত ধুইয়া পরিষ্কার করিতে এমন আর কিছুই নাই। জ্বরের সময় এই পরিমাণ জল বার বার পান করা উচিত, যেন প্রস্রাবের রং সাদা হইয়া যায়।

সাধারণতঃ অধিকাংশ জ্বরে স্নানই জ্বরের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা। যেমন ঔষধের দ্বারা জ্বর বন্ধ করা যায়, তেমন স্নানের দ্বারাও জ্বর বন্ধ করা যায়। কিন্তু দেহের আবর্জ্জনা সম্পূর্ণ বিধৌত হইয়া না গেলে কখনও জ্বর জোর করিয়া বন্ধ করিতে নাই। কারণ, দেহের বিষ নষ্ট করিবার জন্যই প্রকৃতির কৌশল। যখন দেহের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হয়, তখনই রোগীর দেহে জল প্রয়োগ করিয়া তাহার উত্তাপ এরূপ আয়ত্তাধীনে আনিতে হয়, যেন রোগতাপ দেহের অনিষ্ট করিতে না পারে।

ম্যালেরিয়ারোগীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত স্নান করান আবশ্যক। অত্যধিক স্নান করাইলে ম্যালেরিয়ারোগীর জ্বর বৃদ্ধি হয়। কারণ, অত্যধিক শৈত্য রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু বিস্তারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। রোগীর দেহে যতক্ষণ শীত ও কম্প থাকে, ততক্ষণ কোন অবস্থাতেই তাহার দেহে শীতল জল প্রয়োগ করিতে নাই। কিন্তু শীত ও কম্পের অবস্থা কাটিয়া গেলে যখন দেহে জ্বালাপোড়া আসে, তখন শীতল জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা রোগীর সর্ব্বদেহ দিনে অন্ততঃ তিনবার খুব ঘর্ষণ করিয়া দ্রুত হস্তে মোছাইয়া দেওয়া উচিত। তলপেট ও উরুসন্ধি খুব ভাল করিয়া ঘর্ষণ করিয়া শীতল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রোগীর মাথাও দিনে অন্ততঃ চার বার শীতল জল দ্বারা ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। গা মোছাইয়া তখন তখনই তাহাকে কম্বলের ভিতর লইয়া পুনরায় তাহার শরীর গরম করিয়া দিতে কখনও অবহেলা করিতে নাই।

এই পদ্ধতিতে এক ফোঁটা ঔষধ ব্যবহার না করিয়া জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে। ষ্টিম-বাথ, হিপ-বাথ ও জলপান প্রভৃতি দেহের সমস্ত বিজাতীয় পদার্থ ও রোগ-বিষ দেহ হইতে ধোয়াইয়া লইয়া যায়। দেহ যখন আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হয়, তখন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং রক্তকণিকা গুলি সবল হয়। ম্যালেরিয়ার কি অন্য যে-কোন জীবাণু-আর দেহের তখন কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না। রোগ তখন আপনিই আরোগ্য হয়।

[৪]

জ্বরের প্রথম দিনে রোগীকে কিছুই খাইতে দিতে নাই। আয়ুর্ব্বেদে আছে, 'জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং'—জ্বরের প্রথমে না খাইয়া থাকিবে এবং জ্বরের শেষে খুব অল্লাহার করিবে। জ্বরের সময় দৈহিক প্রকৃতি দেহ হইতে রোগবিষ বাহির করিবার কাজেই ব্যাপৃত থাকে। তখন রোগীকে খাওয়াইলে দেহের যে-সকল যন্ত্র রোগ-বিষ দেহ হইতে বাহির করিবার কাজে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদিগকে হজম ও গ্রহণ করিবার কাজে জোর করিয়া টানিয়া আনা হয়। এই জন্য জ্বরের সময় বেশী খাইলে অথবা গুরুভোজন করিলে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং রোগের শেষে বেশী খাইলেও অনেক সময় রোগ ফিরিয়া আসে।

যতক্ষণ রোগীর প্রকৃত ক্ষুধা না হয়, ততক্ষণ রোগীকে কিছুই খাইতে দিতে নাই। জ্বরের সময় রোগীর প্রধান পথ্য লেবুর রস সহ জল। জলে এই পরিমাণ লেবুর রস দিতে হয়, যেন জল তিক্ত না হয়, আবার খুব কমও যেন লেবুর রস না পড়ে। যখন রোগীর প্রকৃত ক্ষুধা হয়, তখন সে কমলা লেবু, ডাবের জল ও ঘোল প্রভৃতি চিবাইয়া চিবাইয়া মুখের ভিতর অনেকক্ষণ রাখিয়া তাহার পর খাইতে পারে।

রোগী যাহাতে প্রচুর মুক্ত হাওয়া পাইতে পারে, সর্ব্বদা তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু সাবধান থাকিতে হয়, যেন রোগীর গায়ে কখনও দমকা হাওয়া না লাগে।

নূতন রোগ-জীবাণু যাহাতে দেহে প্রবেশ না করে এবং রোগ যাহাতে বিস্তার লাভ না করে, সে-জন্য রোগী রাত্রিতে সর্ব্বদা মশারি ব্যবহার করিবে। স্যাঁৎসেতে, রৌদ্র ও বাতাস-হীন স্থান সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার ভিতর থাকিয়া রোগ আরোগ্যের আশা করা বৃথা।

জ্বর আরোগ্য হইলে রোগী সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে তাহাকে কখনও দূষিত গ্যাস গ্রহণ করিতে না হয়, তাহার প্রতিদিন যথেষ্টরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, প্রচুর প্রস্রাব হয় এবং লোমকূপগুলি পরিষ্কার থাকে। যদি রোগী নিজেকে ভিতরে বাহিরে এরূপ পরিষ্কার রাখিতে পারে এবং নিজে সংযত জীবনযাপন করিতে পারে, তবে সহস্র ম্যালেরিয়ার ভিতর থাকিলেও, ম্যালেরিয়ার দ্বারা আর কখনও সে আক্রান্ত হইবে না।

উচ্চশিক্ষা

...অনেকে মনে করেন যে, আধুনিক জগতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের জীবিকার্জ্জন-বিদ্যা লাভ করিবার সহায়তা করিতেছে। একে ত' যে দেশে মানুষের জীবিকার্জ্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিবার প্রয়োজন হয়, সেই দেশে বাস করা প্রীতিপ্রদ অথবা সেই দেশকে উন্নত বলা চলে না, তাহার পর আবার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোথাও মানুষকে জীবিকার্জ্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সহায়তা করিতেছে, ইহা বলা চলে না।...



একতার পথে



বিজ্ঞান শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান!! আমি বৈজ্ঞানিক
বিহার ও নদী সংস্কার করিব!! আমি সংস্কারক
পতিত জমি চাষ করিতে হইবে! আমি ??
RANCHI EXPRESS

রাঁচী: বড়দিনের সফর

বদহজমের ইতিকথা



How The Baby Got Dyspepsia.

ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে]

দিনের পর দিন

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলা চোখ মেলিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সুখময়ী ঘরে যে রোদ আসিয়াছে, এর বেশী আর কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। পূবের একটিমাত্র জানালার উপরের অর্দ্ধাংশ দিয়া মেঝের মাঝখানে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে,— এলোমেলো নোংরা বিছানায়। চৌকীর বিছানাটিতে নিজে যে ভাবে কাত হইয়া শুইয়া ছিল, সেইভাবে শুইয়া থাকিয়াই সুখময়ী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মেঝের রৌদ্রালোকিত অংশটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল। মস্তিষ্ক এমন ভোঁতা হইয়া আছে, যেন এখনো ঘুম ভাঙ্গে নাই- সবগুলি ইন্দ্রিয় বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসিতে এখনো অপারগ।

ঘরে রোদ আসার মানেটা বুঝিতে পর্য্যন্ত সময় লাগিল সুখময়ীর। ঘরে রোদ আসার মানে আর কিছু নয়— বেলা হইয়া গিয়াছে। সাহাদের দোতলা বাড়ীটা না ডিঙ্গাইয়া সূর্য্যদেব তাদের একতলা বাড়ীর এই ঘরটিতে উঁকি দিতে পারেন না, আর সাহাদের বাড়ীটা ডিঙ্গানোর জন্য আকাশের অনেকখানি উচুতেই তাঁকে উঠিতে হয়।

সূর্য্য উঠিবার অনেক আগে, ধরিতে গেলে শেষ রাত্রেই, তাকে ডাকিয়া দেওয়ার কথা ছিল। সে গিয়া ভবানীর মাথায় আইস্-ব্যাগটা চাপিয়া ধরিলে, রাত একটা হইতে তার শিয়রে বসিয়া যে ও কাজটা করিয়াছে, সে একটু ঘুমানোর ছুটি পাইবে—এই ছিল বন্দোবস্ত। কিন্তু, তাকে সকলে ক্ষমা করিয়াছে, রেহাই দিয়াছে। তার শরীরটাও ভাল নাই জানিয়া সংসারে যারা তার আপনার এবং যাদের সে প্রাণ দিয়া সেবা করে, তার ঘুম ভাঙ্গাইতে তাদের হইয়াছে মায়া।

উঠিয়া বসিয়া সুখময়ী একটা হাই তুলিল। মুখের হাঁ বন্ধ করার আগেই ঠেলিয়া উঠিয়া আসিল একটা উদ্গার। পেঁয়াজের গন্ধ। কাল রাত্রে পেঁয়াজের তরকারীটা খাওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু, বড় চমৎকার স্বাদ হইয়াছিল তরকারীটায়। সমস্ত রাত্রে হজম হওয়ার পরিবর্ত্তে যা কিছু বদহজম হয়, তাই কি ভাল লাগে মানুষের মুখে?

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, সামনে দিয়া যাওয়ার সময় সুখময়ীর মেজমেয়ে আভারাণী দরজা একটু ফাঁক করিয়া ঘরে একটা উঁকি দিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি না ঘুমাইয়া চোখ দুটি আভারাণীর টকটকে লাল হইয়া গিয়াছে। প্রথম রাত্রে তার ঘুমাইয়া লওয়ার কথা ছিল, স্বামীর জন্য পারে নাই। তার স্বামী বিনয় দোকানে খাতাও লেখে, বাড়ীতে কবিতাও লেখে এবং পাছে সে মনে করে যে শ্বশুরবাড়ী পড়িয়া থাকার জন্য তাকে অবহেলা করা হইতেছে, এই ভয়ে আভা তাকে খাতির করিয়া চলে অতিরিক্ত। তা ছাড়া, রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত ঘুমও আভারাণীর আসে নাই—ঘুম আসিয়াছিল ভবানীর শিয়রে গিয়া বসিবার পর। কি সে অদ্ভুত ও অকথ্যরকমের অবাধ্য ঘুম! শব্দহীন স্তব্ধ রাত্রি, ভীতি ও দাস্থিভরা রোগীর ঘর, অর্দ্ধচেতন রোগীর মৃদু মৃদু এলোমেলো নিশ্বাস সব যেন তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া ম্যাজিক আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মস্তিষ্ক হইয়া আসিতেছিল অসাড়, চোখ আসিতেছিল বুজিয়া, আইস্-ব্যাগটি খসিয়া পড়ার উপক্রম হইতেছিল —কেবলি মনে হইতেছিল সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাক, সে একটু ঘুমাইয়া নিক। ঘুম ছাড়া আর কি আছে মানুষের জীবনে?

কিন্তু, তবু সে সমস্ত রাত ঘুমায় নাই। বোন নয় সে? দাদার তার এমন অসুখ, দাদা তার মরিতে বসিয়াছে, আর ঘুমটাই তার বেশী হইল!

তা ছাড়া, তাকে ডাকিয়া দিয়া অবনী বলিয়াছিল: 'আটটা থেকে ঘুমিয়েছিস, বাকী রাতটা জাগবি—তুই মাকে ডাকিস্ না।'

না ঘুমাক সে, সকলে তো জানে সন্ধ্যা আটটা হইতে

সে ঘুমাইয়াছে। কাল রাত্রে মরা সম্ভব ছিল, কিন্তু অন্য কাউকে ডাকিয়া দিয়া ঘুমানো সম্ভব ছিল না।

'তোমার জন্যে চা রেখেছি মা, মুখ হাত ধুয়ে গরম করে খেও।'

চা এ বাড়ীর সকাল বেলার জলখাবার। আর কিছু খাওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না।

সুখময়ী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভবু কেমন আছে, আভা ?'

'সেই রকমই। শেষ রাত্রে জ্বরটা একটু বেড়েছিল। সকালে একদাগ ওষুধ খাওয়ানো মাত্র বমি হয়ে গেছে। এ যে কোত্থেকে জ্বর এল, ছেড়েও ছাড়তে চায় না,— আজ নিয়ে বাইশ দিন হ'ল, না মা ?'

গায় দিয়া সুখময়ী আর একটা হাই তুলিল। না, আভারাণীর লাল চোখের দিকে, রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট মুখের দিকে তার দৃষ্টিও পড়িবে না, ও বিষয়ে প্রশ্ন করার মত কৌতূহলও জাগিবে না। আভা একটা নিশ্বাস চাপিয়া গেল। রাত জাগা কিছু নয়, ঘুমের সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়ী হওয়া কিছু নয়, ওজন্য আভা কোন দিন গৌরব বোধ করে নাই। কিন্তু, কাল রাত্রির ঘুমটাকে দমন করিতে পারিয়া তার যেন কি হইয়াছে, কেবলই মনে হইতেছে, নিজে সে উঁচুদরের শক্তিশালিনী মানবী, বিশেষরূপে প্রশংসনীয়া। কাল তার রাত জাগার কাহিনী শুনিয়া সকলের অবাক্ হইয়া তার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করা উচিত।

এবার হাইএর পরে যে উদ্গারটা উঠিয়া আসিল, সেটা এমন টক যে, সুখময়ীর গলাটা যেন জ্বলিয়া গেল। কে জানে চায়ে হয় তো পেটের এই অম্বলটা চাপা পড়িতে পারে। উঠিয়া মুখে চোখে একটু জল দিয়া চা'টা গিলিয়া ফেলাই ভাল। তারপর ভবুর কাছে গিয়া বসিতে হইবে। সকাল বেলা বিছানা ছাড়িবার আগে যে সব দেবতার পায়ে মনে মনে প্রণাম করিয়া করিয়া উঠিতে হয় তাদের সকলের কাছে সুখময়ীর নিবেদন, তার ভবু, তার প্রথম সন্তান, সারিয়া উঠুক। সুখময়ীকে নেওয়া হোক, ভবানী রেহাই পাক্।

ভবানীর বড় অসুখের হাঙ্গামায় বাড়ীর অন্যান্য সকলের ছোট অসুখগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষায় ফেল করায় অবনীর মন ভাল নয়, বেহিসাবী খাওয়ায় রমণীর পেট ভাল নয়, আভার ছোট বোন প্রভার নাক দিয়া দুদিন হয় ক্রমাগত জল ঝরিতেছে, প্রভার ছোট বোন নিভার ছোটখাট শরীরটিতে পাঁচড়ায় পাঁচড়ায় তিলধারণের স্থান নাই, ধরণীর শরীর এমন অসাধারণ দুর্ব্বল যে, রুগ্ন হওয়ার জন্য তার কোন রকম অসুখেরই প্রয়োজন হয় না; ভবানীর বৌ মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে চিৎপাত হইয়া হাত পা ছোঁড়ে আর চীৎকার করে, আভার স্বর্গীয়া দিদি শোভার পাঁচ বছরের মেয়ে খেঁদি কাণের ব্যথায় কাঁদে।

আজ সুখময়ীর পেটে গরম চা যাইতে না যাইতে সে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বড়মামার অসুখের ভয়ে কদিন সে চুপ করিয়াই ছিল,—কাণের ব্যথাও ছিল কম, কাঁদিবার দরকারও হইয়াছে আস্তে আস্তে। কিন্তু, গত চব্বিশ ঘণ্টায় তার কাণ দিয়া পূঁয বাহির হইয়াছে অন্ততঃ ছটাকখানেক, তার উপরে আবার কাঠি দিয়া কাণটা খোঁচাইতে গিয়া কাণে লাগিয়াছে খোঁচা।

গাছের ফলের পাকার মত ছোট ছেলেমেয়ের কাণ পাকা সংসারের সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা। এমনি যদি বা ওদিকে কারো নজর পড়ে, যে-বাড়ীর বড় ছেলে, একমাত্র রোজগেরে ছেলে মরিতে বসিয়াছে, সে বাড়ীতে ও সব তুচ্ছ বিষয় খেয়াল করার সময় কারও হয় না,—যতক্ষণ না চ্যাঁচাইয়া সে বাড়ী একেবারে মাথায় করিয়া তোলে। বাঁশীর মত সরু গলায় প্রাণপণ আর্ত্তনাদ—দাঁড়ানো রোগী এবং শয্যাশায়ী রোগী সকলেরই কাণের পর্দ্দায় গিয়া ঘা মারে।

'চুপ্ চুপ্। মামার অসুখ জানিস্ না, খেঁদি !'

জানিয়া খেঁদির লাভ ? মামার অসুখ এ কথা জানিয়া যদি কারও কাণের ব্যথা কমিত, অন্ততঃ পাঁচ বছরের মেয়ে যে রকম ব্যথা সহ্য করিতে পারে সেই স্তরে নামিয়া আসিত ব্যথাটা, তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু, তাতো হওয়ার নয়। খেঁদি হাত পা ছুঁড়িয়া চ্যাঁচাইতে লাগিল।

চড়চাপড় মারিয়াও লাভ নাই, তাতে চ্যাঁচামেচি কমিবে না। আভা ভাবিয়া চিন্তিয়া অবনীকে বলিল 'ওকে বরঞ্চ একবার হাসপাতালেই নিয়ে যাও, ছোড়দা !

সুখময়ী না ভাবিয়া বলিল, "হাড় জ্বালিয়ে গেল মেয়েটা। জন্মে মাকে গিলেছিল, ও কি সহজে সবাইকে রেহাই দেবে। বাপও হয়েছে তেমনি, খোঁজটুকু পর্য্যন্ত নেয় না।"

অবনী বলিল, "চল, তোকে হাসপাতালে রেখে দিয়ে আসব।"

প্রভার চোখ দিয়া এমনিতেই জল ঝরিতেছিল, বিনা চেষ্টায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া সে বলিল, "ছি ছোড়্দা, অমন কথা বলতে আছে! দিদি থাকলে দিদির কানে গেলে দিদির কি রকম লাগত বল ত'?"

অবনী রাগিয়া বলিল, "তাই বললাম না কি আমি? কি বললাম আমি উনি কি মানে বুঝলেন। ওকে ভয় দেখাবার জন্যে বলছি, হাসপাতালে ফেলে রেখে আসব, তার মানে এই নয়—"

প্রভা বলিল, "ভয় পেতে কি ওর বাকী আছে যে ওকে ভয় দেখাচ্ছ? তুমি বড় নিষ্ঠুর, ছোড়্দা!"

ভাবপ্রবণতার জন্য প্রভা এ বাড়ীতে বিখ্যাত, সুতরাং তার সঙ্গে আর তর্ক না করিয়া অবনী জ্ঞানবানের মত শুধু একটু হাসিল। কে না জানে যে, হাজার তর্ক করিলেও মানুষের হৃদয়-সমুদ্রের তরঙ্গ ওঠা-নামা করিবেই? এবং, যুক্তিতর্কের চেয়েও সেই ওঠানামারই দাম বেশী?

জামা গায়ে দিয়া খেঁদিকে সঙ্গে করিয়া অবনী হাসপাতালের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। সকলে চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলার ফলে বাড়ীর যে স্তব্ধতা জমজমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, খেঁদি সেটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গিয়াছে। বৌ রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল, তার বড়া ভাজিবার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ যেন কেমন খাপছাড়া শোনাইতে লাগিল। হঠাৎ শোনা গেল, কোণের ঘরে বিনয়ের শিস্ দেওয়া আওয়াজ। বারান্দায় দাঁড়াইয়া আভা আরক্ত চোখ মেলিয়া সাহাদের দোতলা বাড়ীর ছাদে দামী দামী শাড়ী মেলিয়া দেওয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, স্বামীর শিসের আওয়াজ কানে আসিবামাত্র তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গেল।

"শিস্ দিচ্ছ যে?"

চমকাইয়া উঠিলে বিনয়ের বুক ধড়্ফড়্ করে, ফর্সা মুখখানা একবার লাল হইয়া সাদাটে হয়ে যায়।

"এঁ্যা?" বলিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং মুখে সেই বর্ণবৈচিত্র্যের খেলা পুরামাত্রায় অভিনীত হইয়া গেল।

"শিস্ দিও না। দাদার অমন অসুখ, কি বলে তুমি শিস্ দিচ্ছ?"

বিনয় ঢোক গিলিয়া বলিল, "খেয়াল ছিল না। শিসের শব্দ কি অতদূরে যায়?"

"তা না যাক, অন্য লোকে শুনলে কি ভাববে? ওদিকে দাদার অসুখ আর এদিকে তুমি ফুর্ত্তি করে শিস্ দিচ্ছ।—রাগ করলে? লোকে তোমায় নিন্দে করবে বলে বললাম, —নয় তো—"

"না, রাগ করি নি। জান, শরীরটা আজ বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে, কদিন যেরকম মন বিচ্ছিরি মনে হচ্ছিল, আজ ঠিক তার উল্টো। সত্যি আজ ঘুম থেকে উঠে ভারি ফুর্ত্তি লাগছে মনে। খিদেও পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে পার?"

"চা খাও নি?"

"চায়ে মানুষের পেট ভরে? খাবার জিনিস কিছু দাও।"

এ এক বিপদ আভার। চা বরং আর এক কাপ সে যোগাড় করিয়া আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু খাদ্য? মুড়ি চিঁড়া দু'চার মুষ্টি সে আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু জামাইকে কি শুধু মুড়িচিঁড়া দেওয়া যায়? দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মোটে জামাই বাড়ীতে, সকাল বেলা ক্ষুধা মিটাইতে সে চিবাইবে শুকনা মুড়ি? অথচ, খানিক পরে স্নান করিয়া খাইয়া সে যাইবে দোকানে, এখন তার জন্য অন্য দামী খাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিতেও আভার লজ্জা করে।

প্রভা রোগীর ঘরে নাকে চোখে জল ফেলিতেছিল, জানালা দরজা প্রায় সমস্তই ভেজান থাকায় ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার এবং একটা ভাপসা বোট্কা গন্ধে ভরা। দরজা একটু ফাঁক করিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেই প্রভা উঠিয়া আসিল, বলিল, "চুপ, দাদা ঘুমোচ্ছে।"

"ঘুমোচ্ছে? বাঁচা গেল বাবাঃ, যা ছটফটটাই শেষ রাত্রে করেছে। ভোর বেলা ওষুধ খাওয়ানো মাত্র বমি

করে ফেললে। ওষুধ খাওয়ান হয় নি আর এক দাগ? ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে? ভালই হল, আর ডেকে তুলে ওষুধ খাওয়াতে হবে না, ডাক্তার বলেছে যত ঘুমোয় ততই ভাল। আর, শোন প্রভা, তোদের জামাইএর ত' খিদেয় পেট জ্বলছে ভাই, কি খেতে দিই বল তো?"

শুনিয়া ভাবপ্রবণা প্রভা ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল। জামাই বাবুর ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে? তাই তো কি খাইতে দেওয়া যায় তাঁকে? কিছু তৈরী করিতে গেলে তো সময় লাগিবে অনেক! প্রভার ব্যতিব্যস্তভাব দেখিয়া আভা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল: এর একটা উপযুক্ত ফল ফলিবেই। এ তো আর কেউ নয়, স্বয়ং প্রভা। অন্য সকলে বিনয়কে তেমন খাতির না করুক, অনায়াসে এক বাটি শুকনা মুড়ি খাইতে দিতে পারুক, জামাইএর মান প্রভা জামাইএর মতই মানিয়া চলে।

"মোড়ের দোকান থেকে কিছু আনিয়ে দেব, মেজদি! রমণীকে দিয়ে?"

আরক্ত চোখে কয়েকবার তাড়াতাড়ি পলক ফেলিয়া আভা বলিল, "যা খুসী কর বাপু, আমি কি জানি? তোদের জামাই, ওসব তোরা বুঝবি।"

"তোর বুঝি কেউ নয় মেজদি?"

এ আর এক বিপদ্ প্রভার। তার হাতে তো পয়সা নাই! জামাইকে দেওয়ার জন্য খাবার কিনিতে পাঠানর পয়সা এখন সে কোথায় পায়? ডাক্তার ও ওষুধের খরচ এ বাড়ীতে বারমাস লাগিয়াই আছে, তবু ভবানীর মত কঠিন রোগে কেহ এতদিন পড়িয়া না থাকিলে পয়সার এতটা টানাটানি পড়িয়া যায় না। চাকরী আরম্ভ করার পর ভবানীও হাত পাতিলে মাঝে মাঝে কিছু দেয়। এখন তো সে উপায়ও নাই। মার বিছানার তলটা প্রভা একবার হাতড়াইয়া আসিল, তারপর রান্নাঘরে গিয়া চুপি চুপি বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে দু'চার আনা পয়সা আছে বৌদি?"

বৌ বাক্স খুলিয়া তিন আনার পয়সা আনিয়া দিলে মোড়ের দোকান হইতে খাবার আসিল। বিনয় চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আঃ, এসব কি দরকার ছিল, মুড়িটুড়ি কিছু দিলেই হ'ত। একটু পরেই তো ভাত খাব।"

আভা বলিল, "তা হোক, ভাত কম করে খেও। খাবারটা খেয়ে নিয়ে বসবে যাও দিকি দাদার কাছে একটু।"

কাল রাত্রের প্রতিহত নিদ্রা এখনও যেন দুই কাণে ছিপির মত আটকাইয়া আছে: ঝমঝমানো শব্দটা যেন আজ আর বন্ধ হইবে না। মনে মনে স্বামীর উপর আভা বিরক্তি বোধ করে। শরীর হাল্কা লাগিতেছে, মনে ফূর্ত্তি বোধ হইতেছে, মুখ দিয়া শিস্ বাহির হইতেছে! এদিকে স্ত্রীর শরীর যে লাগিতেছে কেমন, স্ত্রীর মরণাপন্ন দাদার অবস্থা যে আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়, বলিয়া না দিলে এসব একবার খেয়ালও হয় না। এবাড়ীর গুরুতর আবহাওয়ায় তার স্বামীর হাবভাব যেন সত্যসত্যই একেবারে মানায় না। সব বিষয়ে সে শান্ত এবং সহজ, সব সময়েই যেন জীবনের ভারি দিক্‌টা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা, মৃদু একটু হাসি, আনন্দ উপভোগে যদি দিনগুলি তার ভরিয়া থাকে, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

স্বামীর চরিত্রের এই দিক্‌টা আভা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সংসারের গুরুতর ব্যাপারগুলিকে সে যেমন ভয় করে ও এড়াইয়া চলিতে চায়, জোরালো আনন্দের সঙ্গেও তার ঠিক সেই রকম বিরোধিতা। মনের যে স্ফূর্ত্তির কথা সে আজ বলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে বলে, আভা তার স্বরূপ জানে। অতি মোলায়েম, অতি জড়তাগ্রস্ত সে স্ফূর্ত্তি। শীতকালের রোদের মত নিস্তেজ আনন্দ ছাড়া আর কোন আনন্দকে সে আমল দেয় না।

কাল যে তার সঙ্গে খেলা করিয়া সে অত রাত অবধি জাগিয়াছিল, বিবাহের পর এই বোধ হয় ও রকম উচ্ছৃঙ্খলতা তার প্রথম। অন্ততঃ স্বামীর ও রকম চাঞ্চল্য, ও রকম খাপছাড়া চাপা হাসি, ও রকম উত্তেজনাপূর্ণ কথা ও কাজ আজ পর্য্যন্ত আভা কোনদিন দেখে নাই। ঘুমের কথা উচ্চারণ করা সেই জন্য হইয়াছিল আরও অসম্ভব, সমস্ত রাত এক মিনিটের জন্য সে চোখের পাতা এক করিতে পারে নাই। আজ সকালে তাই দু'চোখে ঘুমের বদলে আসিয়াছে জ্বালা, মাথায় ঝিম ঝিম করার বদলে আসিয়াছে টিপ টিপ করা, শরীরে শ্রান্তির বদলে আসিয়াছে একটা বিশ্রী অস্থিরতা।

দুটি রসগোল্লা মুখে দিয়া বিনয় বলিল, "এতগুলো খাব না, তুমি দুটো খাও, এ্যাঁ?"

স্বামীর খাতির ভুলিয়া গিয়া আভা বলিল, 'আহা, আবার ওসব আরম্ভ কোরো না। খেয়ে নিয়ে যাও দিকি দাদার ঘরে। একেবারে খোঁজখবর নাও না, সবাই ছি ছি করছে।'

বিনয়ের মুখখানা লাল হইয়া সাদা হইয়া গেল। সে বলিল, 'এ্যাঁ? ছি ছি করছে?'

আভা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'বললাম বলে আবার রাগ কোরো না। বাড়ীর লোকের অসুখবিসুখ হলে যদি খোঁজখবর না নাও, লোকে নিন্দে করবে না?'

বিনয় বলিল, 'না, রাগ করি নি। কিন্তু, আমারও যে অসুখ গো?'

'তোমার আবার কি অসুখ?'

'আছে। ভয়ানক অসুখ আছে। কোন রকম উত্তেজনা আমার পক্ষে ভাল নয়।'

'দাদার কাছে খানিকক্ষণ বসবে, তাতে উত্তেজনার কি আছে?'

বিনয় গোঁ ধরিয়া বলিল, 'আছে, তুমি বুঝবে না। সবাই তো সমান নয় জগতে? রোগীর সংস্পর্শে এলেই আমার শরীর কেমন করতে থাকে, পেটের মধ্যে পাক দেয়। কদিন ধরে বাড়ীতে যে ব্যাপার চলছে—'

বিমর্ষভাবে বিনয় থামিয়া গেল। আনমনে সিঙ্গাড়া ও গজাগুলি গিলিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা বসছি গিয়ে, সেজন্য কি! শরীরটা আজ ভাল নেই কি না, সেই জন্য বলছিলাম।'

আভা অবাক্ হইয়া বলিল, 'শরীর ভাল নেই? এই যে বললে শরীরটা আজ খুব ভাল বোধ করছ?'

বিনয় বিব্রতভাবে হাসিয়া বলিল, 'ও এমনি বলছিলাম —নিজের মনে জোর করার জন্য। কটমট করে তাকাচ্ছ যে?'

'কটমট করে তাকাব কেন? রাত জেগে চোখ লাল হয়েছে।'

বিনয় ভবানীর ঘরে গিয়া বসিলে আভা ঢক ঢক করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া ফেলিল। কিছু ভাল লাগে না। সমস্ত বাড়ীতে বিষাদ। রোগীর ঘর হইতে যে বিষাদ সমস্ত বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তারও যেন অতিরিক্ত কিছু। ভবানীর অবস্থা খুব খারাপ। আজকালের মধ্যে যদি জ্বর না ছাড়ে—কথাটা ভাবিতেও আভার বুকের মধ্যে হিম হইয়া আসে। এই ভয়টা মনে বাসা বাঁধিয়াছে বলিয়াই কি এত খারাপ লাগিতেছে?

বারান্দায় আসিয়া আভা দেখিল সুখময়ী বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে সুখময়ী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'আমার কি অদেষ্ট আভা।'

আভা সভয়ে বলিল, 'দাদা—?'

'ঘুম ভেঙ্গে প্রলাপ বকছে। যে দিকে দু'চোখ যায় আমি চলে যাই আভা, আমার আর সয় না।'

'বুকে জোর কর মা, বুকে জোর কর। এখন কি এমন করতে আছে? জ্বর কমে যাবে আজকালের মধ্যে।'

মাকে বুকে জোর করিতে বলিলেও নিজের বুকে আভা জোর পায় না।

এই জ্বরেই যে মাসখানেক আগে সাহাদের বাড়ীর একটা ছেলে মরিয়া গিয়াছে। ভিজা উঠানের রোদটুকু আভার আরক্ত চোখে হঠাৎ জ্বল জ্বল করিয়া ওঠে। বৌ এখনো রান্নাঘরে রাঁধিতেছে, ছেলেমেয়েরা পড়িতেছে বাহিরের ঘরে। আর সকলে রোগীর সেবায় ব্যস্ত। কিন্তু, ওষুধ, ডাক্তার আর সেবায় কি মানুষ বাঁচে? আর কি উপায় আছে মানুষের মানুষ বাঁচানোর?

গৌদিকে সঙ্গে করিয়া অবনী যখন বাড়ী ফিরিল, সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে এবং বিনয় স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছে। সাড়ে ন'টার স্থানে সাড়ে দশটা করার কৈফিয়ৎ অবশ্য আভা দাবী করিয়াছিল। বিনয় জবাবে বলিয়াছে 'তা হোক, একদিন তো।'

গৌদির কাণের ব্যথা কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। হাসপাতালে সে কি কি কীর্ত্তি করিয়াছিল অবনী সংক্ষেপে তার একটা বর্ণনা দিয়া জানাইল যে, কয়েকদিন গৌদিকে এখন যে নিয়ম মত হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইবে, সে কাজটা যার খুশী হয় করিতে পারে, সে পারিবে না।

সুখময়ী বলিল, 'বৌদির কথা রাখ অবু, ধরণীকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি, ও গুছিয়ে সব বলতে পারবে না, তুই একবার ছুটে যা। ভবু আবার প্রলাপ বক্‌ছে।'

'বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে আবার ছুটে যাব ?'

'যাবি না ?'

বিনয়ের পাতে ভাত দিতে দিতে বৌ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। রোগীর সেবা অবশ্য হয় যথেষ্টই, কিন্তু তাকে সে সুযোগ যথেষ্ট দেওয়া হয় না, তার স্বামী যখন ও দিকে তিলে তিলে মরণের দিকে আগাইয়া চলিতে থাকে, তখন তাকে দিয়া করানো হয় সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ। ঘোমটার ফাঁকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া হঠাৎ সে সজল ভর্ৎসনার সুরে ডাকিয়া বসিল, 'ঠাকুরপো !'

অবনী বলিল, 'যাচ্ছি, যাচ্ছি।'

ভাতের থালা নামাইয়া রাখিয়া বৌ কয়েক পা তফাতে সরিয়া গিয়াই ঢিপ্‌ করিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িল এবং শ্বাস টানিতে লাগিল জোরে জোরে। এক ঘটি জল লইয়া আভা ছুটিয়া কাছে গেল এবং মুখে জলের ঝাপটা দিয়া মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, 'এখন ফিট কোরো না বৌ, দোহাই তোমার। দাদার অমন অবস্থা আর তুমি ফিট করবে, তোমার একটু বিবেচনা নেই ? ফিট কোরো না, শুনছো বৌদি, ফিট কোরো না।'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বৌ ফিট না করার চেষ্টাই করিতেছিল, জবাবে কিছু সে বলিল না বটে, কিন্তু একটু পরেই তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, ননদের অনুরোধটা এবার সে রাখিয়াছে।

বিনয় এতক্ষণ খাওয়া বন্ধ করিয়া বিবর্ণ মুখে তাকাইয়া ছিল, সে আবার খাওয়া আরম্ভ করিল। অবনী জামার বোতাম খুলিয়াছিল, সেগুলি লাগাইতে লাগাইতে সে বাহির হইয়া গেল। আস্তে আস্তে উঠিয়া বৌ চলিয়া গেল রান্নাঘরের দিকে।

সুখময়ী বলিল, 'তুমি আজ দোকানে না গিয়ে পার না বিনু ? আজ না হয় তুমি বাবা না-ই গেলে !'

বিনয় বলিল, 'একবার না গেলে চলবে না মা। বলে কয়ে শীগ্‌গির বরং চলে আসব।'

সুখময়ী বলিল, 'তা-ই এস। আজ বড্ড ভয় করছে বাবা আমার। তুমি থাকলে তবু একটু ভরসা হয়।'

ভাবপ্রবণা প্রভার কাণে পর্য্যন্ত কথাটা একটু খাপছাড়া শোনায়। বিনয় বাড়ী থাকিলে ভরসা! সংসারের সমস্ত বিপদাপদকে যে দূর হইতে নমস্কার করে, রোগীর ঘরে একমিনিট বসিতে হইলে যার গায়ে জ্বর আসে! যাই হোক, অত হিসাব করিয়া তো মানুষ সংসারে কথা বলে না, অত ধরিলে চলিবে কেন ? প্রভা ধীরে ধীরে উঠিয়া রোগীর ঘরে চলিয়া যায়, সুখময়ী মেয়ের পিছনে যাইতে যাইতে সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে, আর বিনয় তাড়াতাড়ি গিলিতে থাকে ভাত।

আভা আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে সাহাদের বাড়ীর ছাদের দিকে। রঙ্‌বেরঙের শাড়ীগুলি ইতিমধ্যেই আধশুক্‌নো হইয়া আসিয়া বাতাসে দুলিতেছে। একমাস আগেও বাড়ীতে গভীর শোক আসিয়াছিল, এখনো মাঝে মাঝে তার সাড়া মেলে। যত রঙ্‌বেরঙের শাড়ীই ছাদে শুকাক, সকাল সন্ধ্যায় ছেলেটার মা আজও বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। তাদের ভাগ্যে আজিকার দিনটা কি কাটিবে না ?

অবনীর সঙ্গে আসিয়া ডাক্তার একবার রোগীকে দেখিয়া গেলেন। বিনয় তখন চলিয়া গিয়াছে। আজ কালের মধ্যে ভবানীর জ্বর কমিতেও পারে, ডাক্তার এই ভরসা দিয়া গেলেন বটে, মনে কিন্তু কারও ভরসা আসিল না। সুখময়ীকে কোনমতে ভাতের থালার সামনে বসানো গেল না, ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া সকলে কোন রকমে দুটি দুটি মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল।

তারপর আসিল আভার ঘুম।

কাল রাত্রে ভবানীর শিয়রে বসিয়া থাকিবার সময় যে ঘুম আসিয়াছিল, তার চেয়ে জোরালো, তার চেয়ে প্রভাবশালী। ভবানী কি রকম ছটফট করিতেছে দেখিয়াও সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল ; এবং শোয়া মাত্র ঘুমাইয়া পড়িল

সে ঘুম ভাঙ্গিল বেলা চারটার সময়, অনেক লোকের গণ্ডগোলে। দোকানের চার পাঁচজন লোক বিনয়কে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে—সঙ্গে একজন ডাক্তারও

আছেন। কি হইয়াছে বিনয়ের? দোকানে পৌঁছানোর খানিক পরেই হঠাৎ সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়, তারপর আর জ্ঞান হয় নাই।

বাড়ীতে দাঁড়ানো পুরুষদের মধ্যে অবনীই এখন সকলের চেয়ে বড়, তার কাছেই ডাক্তার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিলেন। বিনয়ের যেমন আছে, এ রকম হাই ব্লাড-প্রেসার যাদের থাকে তাদের না কি এরকম হয়। দু'চার বছর বিনয় যদি এখন বাঁচেও, এমন ভাবে বাঁচিবে যে—

ভাবপ্রবণা প্রভা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া ভবানীর কথা মনে পড়িয়া যাওয়ার মুখে আঁচল চাপা দিল।

আভার চোখ এখনো লাল টকটকে হইয়া ছিল, সুখময়ীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া সে বলিল, 'শীগ্‌গির বাড়ী আস্‌তে বলেছিলে না, মা! তাই এসেছে।'

মাটি

—শ্রীগিরীন্ চক্রবর্ত্তী

আমরা গাঁয়ের চাষী—
ভাবনা-বিহীন দিবস-রজনী বাজাই মাঠেলী বাঁশী!
প্রভাতে ও সাঁঝে আকাশে বাতাসে
আলো-হাসি খেলা করে,
আকাশের চাঁদ হেসে নেমে আসে
আমাদেরই ছোট-ঘরে।
নিত্য-মুখর পাখীর কণ্ঠ শোনায় মোদেরে নিতি—
চিত্ত-হরণ হাসি-খুসীভরা চির সে নবীন গীতি।
দীঘল-দীঘির নীল কালো জল মেটায় মোদের তৃষা,
ক্লান্তি যতেক—ঘুচায় নিত্য জ্যোছনা-উজল-নিশা॥

ক'র না মোদেরে ঘৃণা—
মোরাও মানুষ; মানুষের দিন চলে কি মানুষ বিনা?
একই আকাশ, একই সূর্য্য বিরাজে ভুবন ভরি'—
তবে কেন মিছে দূরে দূরে থাক স্বজনেরে পরিহরি'!
হ'তে পারি মোরা নেহাৎ গরীব,
তাই ব'লে কি গো ভাই,
গরীবের সাথে পথ সে চলিতে কথাও কহিতে নাই?
আমাদেরে ছেড়ে তোমাদের দিন চলিবে না ভাই, হায়,
তেমনি আবার তোমাদেরে ছেড়ে
মোদেরো জীবন যায়!!

জননী মোদের মাটি—
বর্ষা-শরৎ, শীত-হেমন্তে আমরা সমানে খাটি।
পল্লী-মায়ের আদরের ধন আমরা গাঁয়ের চাষী,
মায়ের আশিস্ সর্ব্ব-ঋতুতে জীবনে বাজায় বাঁশী।
চাষা-ভুষা-লোক, নাই কোন শোক,
খাই-দাই, মজা লুটি—
জগত-কাননে সুরভির সনে ফুল হ'য়ে ফুটে উঠি।
আমরা মায়ের, জননী মোদের, এম্‌নি প্রাণের টান,—
ছেলে-বুড়ো মিলে নাচি খালে-বিলে কণ্ঠে ধরিয়া গান

মোদেরে বাস গো ভাল—
পরাণে-পরাণে স্নেহের আলোতে প্রীতির প্রদীপ জ্বাল।
হাতে হাত ধরে তোমাদের ক'রে
আমাদেরে লহ কাছে,—
উছল-খুসীর অনুরাগে মেতে মোদের হৃদয় যাচে।
সদা কাছাকাছি রহিব আমরা জীবন-মরণ ধরি'—
মোদের বাঁধনে বাঁধিব এ-ধরা সু-চির সুরেতে ভরি'।
পাখী গা'বে গান, সাথে কল-তান তুলিবে তরলা-নদী;
শহরে-গেরামে হরষ-জোয়ার ব'য়ে যাবে নিরবধি॥

সাধু ও মৌখিক ভাষা

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

পরিবর্ত্তন যখন আসন্ন এবং অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তখন সেই অনিবার্য্য আসন্ন অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পরিবর্ত্তনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে যে, অনেক অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচা যাইতে পারে, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।* প্রয়োজনের চাপে পড়িয়া ভাষার যে অনেকখানি রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং জাতীয় জীবনের মুখ্য কর্ম্মক্ষেত্রসমূহে ব্যবহারের উপযোগী হইয়া উঠিবার জন্য যে, আরও অনেক বেশী পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, সে কথাও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু, আমাদের ভাষার বর্ত্তমান রূপ আরও অন্যান্য দিক হইতে আক্রান্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদের ভাষার ঐতিহাসিক আদিকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ভাষার গঠনে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, প্রয়োজনের চাপ তাহার প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে, ইহার ইতিহাসের মধ্যেও এই কারণ নানা আকারে বর্ত্তমান আছে। যদিও কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি শ্রেণীর পুস্তকই আমাদের সাহিত্যের প্রধান অংশ, যদিও গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই বুদ্ধির চর্চ্চা অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের বাহন রূপেই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং যদিও আমাদের ইংরাজীশিক্ষাপুষ্ট, সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত মনের রসচর্চ্চার পক্ষে বিদেশী ভাষার স্বাভাবিক বাধা ও কাঠিন্যই রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদিগকে গৃহাভিমুখী করিয়াছে, তবুও, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, গদ্যসাহিত্যসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা, কাব্য লিখিবার ইচ্ছা হইতে আসে নাই, ইহার প্রথম লেখক ও প্রবর্ত্তকেরা কবি বা ঔপন্যাসিক ছিলেন না ; দায়ে পড়িয়া, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই এদিকে দৃষ্টি দিতে হইয়াছিল এবং ইহার প্রথম লেখকেরা পণ্ডিত ও চিন্তাবীর ছিলেন।

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের মনে নিজেদের সম্বন্ধে হীন ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। পুরুষের পর পুরুষ আমরা দেখিতেছিলাম এবং শিখিতেছিলাম যে, আমরা ছোট, আমরা হীন, আমরা পরের নিকট হইতে সম্মান পাইবার উপযুক্ত নহি, আমরা কোন বড় কাজ করিতে পারি না, বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি না ; এই অভিজ্ঞতার ফলেই, আমাদের কোন জিনিষ যে বড় হইতে পারে, মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে ধারণাও আমাদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আমাদের পশ্চাতে গৌরবের ইতিহাস ছিল না, বর্ত্তমানের কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত ছিল না, ফলে ভবিষ্যৎও আমাদের সম্মুখে কোনদিন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। নিজেদের সব কিছুকে, নিজেদের পরিচ্ছদকে, ভাষাকে আমরা হেয় মনে করিয়াছি এবং যখনই নিজেদের বড় হইবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই পরের অনুকরণ করিয়াছি, পরের ভাষা গ্রহণ করিয়াছি। নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি এইজন্য আমাদের কখনও অনুরাগ জাগে নাই। আমাদের পণ্ডিত লোকেরা কেহ সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কেহ ফার্সী পড়িয়াছেন, কেহ উর্দ্দু বলিয়াছেন। দীর্ঘকাল-জাত মাতৃভাষার প্রতি এই অশ্রদ্ধার ভাব আমাদের মন হইতে আজও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই, এবং আমাদের শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশ আজও ইংরাজী লিখিতেছেন, পড়িতেছেন এবং শিক্ষা ও আভিজাত্যের নিদর্শন-স্বরূপ ইংরাজী বুলি আওড়াইতেছেন! কাজেই, জাতীয় সাহিত্য আমরা গড়িয়া তুলিব, এই প্রকার কোন সচেতন সঙ্কল্প হইতে প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় নাই।

মাতৃভাষা বিদ্যার বাহন না হইয়া অপাংক্তেয় হইয়া থাকায়, বিদ্যার দ্বার অবশ্য সাধারণের নিকট রুদ্ধ ছিল, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া বিদ্যা সাধারণের অধিগম্য হউক, আমাদের দেশে এরূপ আদর্শ ছিল না, বরং সাধারণের মধ্যে বিদ্যা প্রবেশলাভ না করিতে

* গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙ্গালা ভাষার রূপান্তর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পারিলেই তাহার মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে, এমন কথাই তখন হইতে মনে করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু, ইংরেজের সংস্পর্শ হইতে এ কথাটা ক্রমে আমরা বুঝিতে লাগিলাম যে, শিক্ষার প্রসারের এবং শিক্ষালাভের উপায় সহজ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষাকে সাধারণের গ্রহণ করিবার মত সহজ করিতে হইলে, তাহার প্রাথমিক আরম্ভ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তদ্ব্যতীত ইংরাজীর ন্যায় আমাদের সহিত সকল সম্পর্কশূন্য ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে কিছুদূর পর্য্যন্ত মাতৃভাষার মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ না করিয়া পারা গেল না; তাহার জন্যও মাতৃভাষার কিছু জ্ঞান আবশ্যক হইয়া পড়িল।

তাহা ছাড়া ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যশাসনের জন্য ইংরাজদেরও কিছু কিছু বাংলা শিখিবার প্রয়োজন হইতে লাগিল। বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে কিছু নিয়ম এবং প্রণালীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। নানাবিষয়ে, বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ লোককেও তাঁহাদের নিজেদের কথা বলিবার প্রয়োজন হইতে লাগিল। এইরূপে প্রধানতঃ পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং মিশনারিদের ধর্ম্মপ্রচারকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলা গদ্য প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব-বর্ণিত কারণের জন্য যদি মাতৃভাষার উপর আমাদের শ্রদ্ধার অভাব না থাকিত, তাহা হইলে এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যে আমাদের সাহিত্য, অন্ততঃ ইহার শিক্ষাপ্রদ তথ্যমূলক দিক্‌গুলি অনেক অধিক সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু, যতটুকু না শিখিয়া এবং যতটুকু শিখিবার ব্যবস্থা না রাখিয়া আমরা পারিয়া উঠিলাম না, বাংলা ভাষাকে ততটুকু মর্য্যাদা দিয়া এবং ইহার উন্নতির জন্য ততটুকু ব্যবস্থা করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট রহিলাম। কিন্তু, আমাদের ঔদাসীনতা সত্ত্বেও যে অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল।

একদিকে হইল, যে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন, শিক্ষার ফলে তাঁহাদের অনেকের মনে যে পরিমার্জনা আসিল, চিত্তের ও চিন্তার যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইল, আত্মপ্রকাশের জন্য তাহা পথ খুঁজিতে লাগিল। এখান হইতেই আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহিত্যের সৃষ্টি। ইহা ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে সকল নূতন কথা শিখিলাম, যে-সকল নূতন চিন্তা মনে স্থান পাইল, নিজেদের দেশের নানাবিধ সংস্কার ও উন্নতির জন্য যে প্রেরণা পাইলাম, দেশের লোককে সে সকল কথা শুনাইবার ইচ্ছাও একদল লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া সাহিত্যরচনার কাজে নিযুক্ত করিল।

আর একদিকে হইল, ইংরাজী শিখিবার জন্য যত লোকে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল, তত লোকের পক্ষে শিক্ষা সমাপ্ত করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। কিন্তু, কিছু শিক্ষার জন্য ইঁহাদের অল্পবিস্তর মানসিক ক্ষুধা জাগ্রত হইতে লাগিল এবং বাংলা সাহিত্যকেই তাহার অভাব পূরাইতে হইল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে, ইংরাজীশিক্ষিত সমাজে সাধারণভাবে বুদ্ধি ও মনের অনেকটা উন্নতি হইল, কিন্তু এই সমাজের সকলেই ইংরাজী জানিতেন না বা জানেন না, সুতরাং ইঁহাদিগের অনেককে সম্পূর্ণভাবে বাংলা সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইল। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে মেয়েরাই প্রধান এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টির ইতিহাসে ইঁহাদের পরোক্ষ দানের মূল্য খুব বেশী। বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারে যে সকল বাংলা পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করা হয়, তাহার বেশীর ভাগ মেয়েরাই পড়িয়া থাকেন এবং তাঁহাদের জন্যই এগুলি ক্রয় করা হইয়া থাকে। কারণ, ইংরাজীশিক্ষিতেরা বাংলাকে এখনও কৃপার চক্ষে দেখেন। আমাদের দাসমনোভাবই মাতৃভাষার প্রতি এই বিমুখতার জন্য দায়ী এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা কিছুদিন পূর্ব্বে এই মনোভাব আরও অনেক বেশী প্রবল ছিল।

শিক্ষার প্রথম সোপান আমাদিগকে বাংলা ভাষার সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইত বলিয়া, অসমাপ্ত-শিক্ষা অনেক লোকের যেমন ইংরাজী বিদ্যা অধিগত হইল না, অথচ কিছু বিদ্যাচর্চ্চার প্রয়োজন হইল, তেমনই ইংরাজজাতি ও ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে কার্য্যকরী জ্ঞান জন্মিল, যে নূতন জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইল, তাহার ফলে এবং সরকারী চেষ্টার ফলে জনসাধারণের মধ্যে কিছু কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার হইতে লাগিল। এই শিক্ষার

মধ্যে বাংলা ভাষারই স্থান ছিল এবং এই ভাবে শিক্ষা-প্রাপ্তদের অনেকে বাংলা চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজীশিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষ মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোকেরা, যেমন, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা সম্ভব নয় দেখিয়া বাংলা সাহিত্যরচনায় হাত দিলেন, তেমনই ইংরাজীশিক্ষিত সাধারণ লোকের পক্ষে ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চা সম্ভব হইয়া উঠিল না (এখনও উঠে না) এবং ইঁহারা বাংলায় লিখিত পুস্তকাদি অল্পস্বল্প পড়িতে লাগিলেন।

এইরূপে বাংলা সাহিত্য সৃষ্ট ও পুষ্ট হইতে লাগিল; আমাদের ক্রমবর্দ্ধিত জাতীয়তাবোধ ক্রমেই অধিকসংখ্যক লোকের দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের দিকে ফিরাইতে লাগিল এবং আমাদের ক্রমপ্রসারিত জাতীয় জীবন ও ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় সাধারণ কাজে অল্পশিক্ষিত লোকের যোগদান বাংলাসাহিত্যকে অধিকতর কার্য্যোপযোগী শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া তুলিল।

প্রয়োজনের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে এবং প্রয়োজনের চাপে পড়িয়াই প্রধানতঃ তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু, ইহাই তাহার রূপান্তর ঘটিবার একমাত্র কারণ নয়। লোকে বাধ্য হইয়াই বাংলা ব্যবহার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু যাঁহারা বাংলা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অনেকেই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন এবং মাতৃভাষাচর্চ্চার জন্য গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। ফলে, এই ভাষা যাহাতে অধিকতর স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে, আমাদের মৌখিক ভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য ইঁহাদের মধ্যে চেষ্টা দেখা দিল। ক্রমেই বর্দ্ধিত সংখ্যায় সাধারণ লোকের যোগদানও ভাষাকে এই দিকে লইয়া চলিল। বাংলাসাহিত্যস্রষ্টারা অধিকাংশ ইংরাজী-জানা লোক, ইংরাজী ভাষার গতি-প্রকৃতি তাঁহারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, এবং শুধু রচনার বিষয়বস্তু নহে, ভাষার গঠনভঙ্গীও ইঁহাদের ইংরাজীর দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। আমাদের ভাষার গঠনে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, ভাষার কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা হইতে। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন লোকের এই চেষ্টার ফলে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের রচনারীতি এবং বিশেষ করিয়া শব্দের রূপে, শব্দের ব্যবহার-নির্ব্বাচনে কতকটা বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে এবং সাবধান হইতে না পারিলে এই বিশৃঙ্খলা হইতে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহ মূলতঃ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বাংলাভাষায় প্রথম গদ্য লিখিতে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এ কথা ভাবা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় হয় নাই যে, রচনা যতটা সংস্কৃতের অনুগামী হইবে, যত অধিক পরিমাণ শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইবে, লেখক যতটা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন, রচনা ততই উৎকৃষ্ট হইবে।

আমরা আমাদের যে সকল আধুনিক জিনিসের জন্য গর্ব্ব বোধ করিতে পারি, তাহার প্রায় সবগুলির জন্যই যেমন ইংরাজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিকটে আমাদের ঋণ আছে, তেমনই বহু ইউরোপীয়ের ব্যক্তিগত চেষ্টা, উদ্যম ও স্বার্থত্যাগ তাহার মূলে রহিয়াছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসেও মিশনারীদের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কেরি সাহেবের চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যত্নের সহিত বাংলা-চর্চ্চা আরম্ভ হইল এবং এই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ পণ্ডিতগণকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পাঠ্যপুস্তক-রচনায় নিযুক্ত করিলেন। ইঁহাদের রচনাকে অনুস্বার-বিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত বলা যাইতে পারে। বাংলা কবিতার ভাষা অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পদ্যের এই সরলতা গদ্যে রক্ষিত হইল না।

ইহারও মূলে আমাদের দাসমনোভাব ছিল। প্রথম লিখিবার সময় সব চেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার হইত, আমাদের শিক্ষিত সাধারণ লোকেরা এই সময় মুখে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, সাহিত্যের ভাষায় তাহারই মার্জ্জিত রূপ গ্রহণ করা। কিন্তু, আমরা নিত্য যে ভাষা ব্যবহার করি, তাহাতে যে ভাল কোন জিনিস লিখিত হইতে পারে, এ কথা বাংলার প্রথম লেখকেরা মনে করিতে পারিলেন না। কাজেই, তাঁহারা ভাষাকে যথাসম্ভব সংস্কৃতঘেঁষা করিয়া তাহার মর্য্যাদারক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিশনারি সাহেবেরা যে বাংলা লিখিতেন, অস্বাভাবিকতার জন্য তাহা টিঁকিয়া থাকিতে

পারিল না, বা সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী হইয়া উঠিতে পারিল না। অন্যদিকে দলিলপত্র, সরকারি কাগজপত্র এবং জমিদারী খাতাপত্রে যে বাংলা ব্যবহৃত হইত, তাহা অত্যন্ত আরবী ও পারশী শব্দবহুল বলিয়া তাহাও সাধারণ বাঙ্গালীর গ্রাহ্য হইতে বা সাহিত্যে স্থান পাইতে পারিল না। কাজেই, প্রথমদিকে বাংলা গদ্যের ভাষায় দুর্বোধ্য পণ্ডিতি বাংলাই স্থান পাইল। রামমোহনের সময়ে ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হইলেও বাংলাভাষায় সংস্কৃতরীতি অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং অতি আধুনিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাভাষা এই প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

কিন্তু, যাঁহারাই বাংলাভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, এই ভাষার অস্বাভাবিকতা তাঁহাদের সকলের চোখেই ধরা পড়িয়াছিল। যে ভাষা আমরা অনুক্ষণ ব্যবহার করি, যে ভাষায় অতি সহজে আমাদের মনে ভাব যাতায়াত করিতে পারে, যে ভাষায় চিন্তা আমাদের মনে প্রথম উদিত হয়, সেই ভাষার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িল। এই জন্য বাংলাভাষার প্রত্যেক যুগের লেখকেরা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের এবং প্রত্যেক শক্তিশালী লেখক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের অপেক্ষা মৌখিক ভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে, একদিকে নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তায় যেমন ভাষাকে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করিতে হইতে লাগিল, তাহার প্রকাশভঙ্গী শাণিত হইয়া উঠিল, গতি লঘু হইল এবং এইরূপে তাহার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিল, অন্যদিকে, তেমনই এই ভাষার লেখক ও পাঠকদের, ইহাকে নিজের করিয়া লইবার চেষ্টাও ইহাকে এবং ইহার রচনাভঙ্গীকে নূতন আকার দান করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকেরাই প্রথমতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রধান পাঠক হইলেন (সম্ভবতঃ এই কথা এখনও একেবারে মিথ্যা হইয়া যায় নাই)। ইঁহারা সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন না, কাজেই সংস্কৃতবহুল জটিল ভাষাকে গ্রহণ করা ইঁহাদের পক্ষে সহজ হইল না। পাঠ্য পুস্তক লোককে জোর করিয়া পড়ান যাইতে পারে, কিন্তু লোকে ইচ্ছা করিয়া কি পড়িবে না পড়িবে, তাহার উপর জোর চলে না; এখানে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার ক্ষমতার উপরে সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্য বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা প্রধান পাঠক ও পৃষ্ঠ-পোষক হইলেন, তাঁহাদের মনের ঝোঁক ও ক্ষমতার দিকে লেখকেরা দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর দেশের মধ্যে যে নূতন চিন্তার ঢেউ আসিল, তাহার ফলে ইংরাজী ও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হইতে লাগিল এবং তাঁহারা যে বাংলা ব্যবহার করিতে লাগিলেন তাহা স্বাভাবিক বাংলাই হইতে লাগিল।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি, বাংলাভাষার রচনাপ্রণালী এমন দ্বন্দ্ব ও সমস্যা-সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এ বিষয়ে বাংলা-সাহিত্যানুরাগীদের আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার সময় নাই।

সংস্কৃতবহুল বাংলার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে আরম্ভ হয়, বাংলার আধুনিক লেখকদের প্রায় সকলের উপরই সেই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। বিদ্রোহের আকারেই প্রতিক্রিয়ার প্রথম আবির্ভাব নিতান্তই স্বাভাবিক। স্থিতিশীলতা মানুষের মনের একটি প্রধান অংশ; এই জন্য, নূতন প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনকেও অস্বীকার করিয়া দূরে রাখিবার ঝোঁক সকলেরই আছে। কিন্তু, পথ-পরিবর্ত্তন যখন অপরিহার্য্য হয়, এবং বিদ্রোহের আকারেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে স্বীকার করিতে পারা, সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারা স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির লক্ষণ।

বাংলা-লেখকেরা সকলেই নিজ নিজ উপায়ে ভাষাকে কৃত্রিম বেষ্টনী হইতে বাহির করিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই, এই চেষ্টায় কাহারও সহিত কাহারও মিল থাকা সম্ভব হয় নাই। কোন একটা বিশেষ জিনিষের যখন কোন বিশেষ দিকে গতি আরম্ভ হয়, তখন অনেক সময়েই এই গতি বাঞ্ছিত সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। বাংলার সাহিত্যের ভাষাকে কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী করিবার

চেষ্টাও সম্ভবতঃ এই বিপৎ-সীমায় গিয়া পড়িয়াছে বা পড়িতে চলিয়াছে।

সাহিত্যিক ও মৌখিক ভাষার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের সময় একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যে ভাষা আমরা মুখে ব্যবহার করি, একথা খুবই সত্য যে, তাহাই ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক রূপ; এই ভাষায় লোকের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া, অবিরত ব্যবহারের ফলে ইহা স্বভাবতই নমনীয় এবং লঘু হয়, ইহা সহজেই প্রাণবন্ত এবং গতিশীল হইয়া উঠিতে পারে। লিখিত ভাষার রূপ যদি এই ভাষা হইতে খুব দূরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সে ভাষা আড়ষ্ট ও বাধাগ্রস্ত, তাহার ছন্দগতিও প্রাণহীন, তাহার চিন্তার স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতা আচ্ছন্ন এবং আমাদের মনের সহিত তাহার আত্মীয়তা দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। আবার অন্যদিকে, আমরা সব সময় যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকি, সাহিত্যের ভাষা শুধুমাত্র তাহার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না; কারণ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, আমাদের ঘরকন্না সম্বন্ধে, বা বৃত্তিহিসাবে আমরা যে সকল কাজকর্ম্ম করিয়া থাকি, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে, বা এই প্রকারের ছোটখাটো সামান্য বিষয় সম্বন্ধেই আমরা কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি। দুরূহ জটিল চিন্তাকে ভাষায় রূপ দিবার, উচ্চ মহৎ ভাবে লোককে অনুপ্রাণিত করিবার, গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন আমাদের সাধারণ জীবনে অল্পই ঘটে। জ্ঞানচর্চ্চার মধ্য দিয়াই মনে এই প্রকার বিকাশ ঘটে এবং সাহিত্যের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ থাকে। শিক্ষিত লোকেরা মুখেও অনেক সময় গভীর বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা সাহিত্যের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাজেই, মৌখিক ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য কিছু থাকিবে, বা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিতে হইলে কিছু পার্থক্য রাখিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু, তাঁহা হইলেও, মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার কাঠামো হিসাবে ব্যবহার না করিলে, অথবা নিত্য-ব্যবহৃত শব্দগুলিকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিলে, ভাব ও দ্যোতনাপূর্ণ কথাগুলির পরিবর্ত্তে কষ্ট-কল্পিত সাধু ও গুরুগম্ভীর শব্দের ব্যবহার চালাইতে থাকিলে, ভাষাকে গাম্ভীর্য্য ও আভিজাত্য দান করিবার জন্য, বাংলা কথা ছাড়িয়া সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিলে, অক্ষম হস্তে ভাষার স্বাভাবিক নিজস্বরূপ নষ্ট হইতে পারে।

মৌখিক ভাষা হইতে সাহিত্যিক ভাষার দূরত্ব কতটা হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সূক্ষ্ম নির্দ্দিষ্ট মান থাকা সম্ভব নহে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি, শক্তি এবং ঝোঁক অনুসারে ও আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে রচনার ভিন্নতা হইবেই। লেখকদের এই স্বাধীনতা না থাকিলে, ভাষা বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে এবং শক্তিহীন ও কৃত্রিম হইয়া উঠিবে। কিন্তু, যাহা শুধু মাত্র লেখকের সম্পত্তি হইবে না, যাহা আরও বহু জনের অধিকারভুক্ত হইবে, বহু লোককে ব্যবহার করিতে ও কাজে লাগাইতে হইবে, তাহা যদি কোন বিশেষ সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইয়া, লেখকদের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন হইয়া উঠে, তবে সকলের পক্ষে তাহা পড়া এবং উপলব্ধি করা, অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য লেখকেরা রচনায় কতটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহার সূক্ষ্ম এবং সুনির্দ্দিষ্ট না হইলেও স্থূল এবং কতকটা অস্পষ্ট, একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন; তাঁহারা কোন্‌দিকে কতটা যাইতে পারিবেন, তাহার একটা মোটামুটি মান থাকা উচিত।

এইরূপ নির্দ্দিষ্ট মান না থাকিলে, বাংলাভাষার বর্ত্তমানে যে অবস্থা ঘটিয়াছে এবং আরও যে অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন প্রকারে রোধ করা সম্ভব নহে। আমাদের আধুনিক সাহিত্য অল্প দিনের এবং তাহার পরিসরও অধিক নহে। কিন্তু, ইহার এক প্রান্তে রহিয়াছে অতিশয় কৃত্রিম সংস্কৃতশব্দবহুল পণ্ডিতী বাংলা, আর অন্য প্রান্তে রহিয়াছে ভাষাকে কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী করিবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ লেখকদের অতি-আধুনিক রচনা। শেষোক্ত লেখকদের বিদ্রোহের ফলে, আধুনিক বাংলারচনায় নির্দ্দিষ্ট মানের যে কতটা অভাব হইয়াছে, এবং তাহাতে যে কতটা অসুবিধার কারণ হইয়াছে, তাহা, ইহার উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বৃদ্ধির প্রতিটি স্তরকে ধীরভাবে লক্ষ্য করিবার অবসর না পাওয়ায়, আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে

ারিব না। আমরা বাংলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির ্ল্যাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা পোষণ করিতেছি, াহার, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রিক ও সাধারণ ভাষা হইবার দাবী ঁপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা কেহ কেহ ক্ষোভ প্রকাশ রিতেছি, অথচ, ইহার আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্য যে এই পথে তটা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, সে কথা এখনও আমরা ুরুতর মনে করিয়া ভাবিয়া দেখি না।

অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, বাংলা-াহিত্যকে বিশ্ববরেণ্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও শক্তি-ালী আরও লেখকের আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছে। সত্যের হিত মনের গোপন আশা এবং আত্মপ্রসাদক গৌরববোধ িশাইয়া যে কথা ভাবিয়া আমরা বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া াকি, বিশ্বসাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে সেই স্থান অধিকার করা াংলা সাহিত্যের পক্ষে একদিন অসম্ভব না হইতে পারে। াহার ফলে ভারতের বাহিরে হয়ত কোনদিন অপেক্ষাকৃত াল ও ব্যাপকভাবে বাংলাভাষার আদর হইবে এবং ভার-তর রাষ্ট্রিক ভাষা না হইলেও ভারতের কৃষ্টির ভাষা হিসাবে বাঙ্গালী ভারতীয়দের মধ্যেও এই ভাষা শিখিবার চেষ্টা েখা যাইবে। কিন্তু, বর্ত্তমানে ভাষার নির্দিষ্ট কোন মান াবং রূপ না থাকায়, বিদেশীর পক্ষে ইহা শিক্ষা করা বিশেষ ষ্টকর ব্যাপার হইয়াছে।

সাহিত্যের ভাষাকে মৌখিক ভাষার নিকটবর্ত্তী করিবার -চেষ্টার ফলে এই অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই চেষ্টাকে রোক্ষে আক্রমণ করা বা এই চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে; বরং এই চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হইলে, ভাষার গঠনে কোন প্রকার বিকৃতি না ানিয়াও যে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে, এই বিশ্বাসেই কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কথিত ভাষাকে গ্রহণ করিতে যাইয়া ক্রিয়াপদের নানা প্রকার রূপ এবং তদপেক্ষা অধিক প্রকারের বানান, বাংলা-পাঠক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সমস্যার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ক্রিয়ার এই রূপগুলি অবশ্য কলিকাতা অঞ্চলের। কিন্তু, কোন কোন লেখক পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থানেরও উচ্চারণ-ভঙ্গীকে সাহিত্যে স্থান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, ইহাঁদের দৃষ্টান্তের ফলে, বাংলার অন্যান্য স্থানের লোকেরও একাংশের মনে নিজেদের অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে এবং মৈমনসিংহে এই ইচ্ছা জনসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন-চেষ্টার মধ্যে কতকটা আকার গ্রহণ করিয়াছে।

ক্রিয়াপদের ব্যবহার ব্যতীত প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিবার সময় অনেক সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক শব্দ নির্ব্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে। যে সকল শব্দের সহিত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় নাই, স্থানবিশেষে প্রচলিত এমন শব্দের বহুল ব্যবহারের ফলে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

ইহা ব্যতীত আরও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিতেছে। শিক্ষিত লোকেরা কথাবার্ত্তায় অনেক ইংরাজী শব্দ অনাবশ্যকভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রসারের ফলে শব্দের দৈন্যের জন্য আমাদিগকে যে সকল বৈদেশিক কথা ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাহা ব্যতীত শিক্ষিত সমাজের চিত্র আঁকিবার সময়, অথবা কোন বিশেষ লোকের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এবং অনেকটা অকারণেও প্রচুর ইংরাজী শব্দ আমা-দের লেখার মধ্যে চলিতেছে। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকদের পক্ষে এবং ভাষার শুদ্ধির পক্ষে ইহারও নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন।

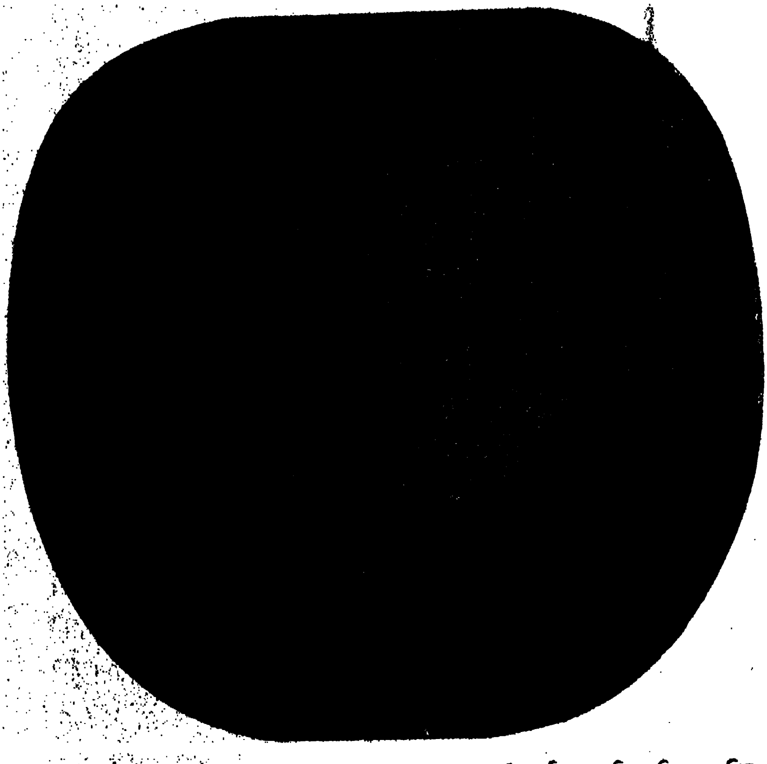
শব্দজ্ঞান ও ভাষাজ্ঞান

উচ্চারণতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব গভীরভাবে আলোচিত হইলে, ভাষার প্রত্যেক অর্থ বর্ণসংযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক বর্ণের অর্থানুসারে এবং বর্ণসংযোগের প্রকারভেদে শব্দের অর্থ হয়। এইরূপ হইলে প্রত্যেক শব্দ স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে।...শব্দগুলির পরিস্ফুট অর্থ শব্দের বর্ণসমষ্টির এবং বর্ণসংযোগের ভিতরই পাওয়া যায়।

চীনের চিত্রসম্পদ

—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

অতীত যুগের চৈনিক চিত্রকলা চীনের জাতীয় জীবনের অপূর্ব্ব সাধনার প্রতীক। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সৌন্দর্য্য অনুশীলনের জন্য দিগন্তবিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যে কখনও কোনও বিশিষ্ট স্থায়ী অঙ্কন-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাই। চিরকালই এই সৌন্দর্য্যানুশীলন মাত্র সম্ভ্রান্ত



গোধূলিকালে কবি ও কর্ণধার। [মা লিন-এর চিত্র বলিয়া অনুমিত

ব্যক্তি ও মহিলাগণের একান্ত নিজস্ব বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। সাধারণ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কোনও দিন আশানুরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই; অথচ প্রাচীন চীনের রম্যকলা আজও পর্য্যন্ত জগতের সৌন্দর্য্য-সাধনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বিরাট চীন সাম্রাজ্যের এই অতীত ঐশ্বর্য্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

তাঙ্ (T'ang) যুগ (৬৯৮-৯০৭ খৃষ্টাব্দ) যখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত, তখন সামরিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চীন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিমথিত করিয়া তুলিল। দেশের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বিভিন্ন সামরিক নেতার প্রভুত্বস্থাপনের চেষ্টায় ও আত্মকলহের ফলে সারা দেশময় অরাজকতার বন্যা প্রবাহিত হইল। প্রায় ষাট বৎসর ব্যাপিয়া চীন দেশে এই অরাজকতার প্রবাহ প্রবল ছিল। অবশেষে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া ৯৬০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সুঙ বংশ পিকিং ব্যতীত চীনের অবশিষ্ট খণ্ডে তাহাদের একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। তিন শত বৎসর কাল এই সুঙ বংশ তাহাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। পরে ১১২৫ খৃষ্টাব্দে এক তাতারজাতি (জুচেন) উত্তর-চীন অধিকার করিয়া লইল। ইহার ফলে চীন দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। দক্ষিণে জাতীয় সুঙ সাম্রাজ্য এবং উত্তরে তাতার জাতির জুচেন (পরবর্ত্তীকালে কিন্) সাম্রাজ্য; প্রথমটির রাজধানী হাংচাউ এবং দ্বিতীয়টির পিকিং। এই বিচ্ছিন্নতা জঙ্গীস খাঁ ও তাঁহার পরবর্ত্তী মোঙ্গলগণের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

সুঙ্ রাজত্বকালই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার জন্য চীনের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তথাপি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগগুলি সৌন্দর্য্যসাধনায় যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সুঙ-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগগুলির মধ্যে চাউ (Chou) যুগে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ১০৫০-২৫৬১) সৌন্দর্য্যকলা অনুশীলনের বিকাশ নিবিড়ভাবে প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

চাউ যুগের পরে চি'ন (Ch'in) যুগ আরম্ভ হয় ; ইহার স্থিতিকাল ২৫৬ (মতান্তরে ৩১০) হইতে ২০৭ খৃষ্টপূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই যুগেও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রম্যকলার আদর্শ নিতান্ত নিগূঢ় ও নিবিড় ভাবে অনুসৃত হইত। কিন্তু, পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ হান্ (Han—স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ২০২-২২০ খৃষ্টাব্দ) যুগে এই আদর্শের বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইল এবং চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিও একটি স্থায়ী এবং বিশিষ্ট আকার ধারণ করিল।

ইহার পরে ২৮০ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হান্-যুগের আদর্শ কিয়দংশ অনুসৃত হইল বটে, কিন্তু অঙ্কনপদ্ধতি সাবলীল না হইয়া ধীর, মন্থর ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। ইহার অব্যবহিত পরে তাঙ (T'ang) যুগের প্রারম্ভ ; ইহার স্থিতিকাল ৬১৮ হইতে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে চীনের চিত্রকলা সজীবতার গতিছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিল। এই সময়েই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের পরিকল্পনা অতীন্দ্রিয়তার সীমা অতিক্রম করিয়া সীমাবদ্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত মিউজিয়াম "ম্যুজে গিমে"র সহকারী অধ্যক্ষ, বিশেষজ্ঞ শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত রেনে গ্রুসে বলিয়াছেন—

> "The tumultuous ardor of the the Six Dynasties passed on into the realistic art of the T'ang period, which differed from the realistic art of the Han Dynasty in that it was no longer a linear art confined to one plane surface but a plastic art working in the round, no longer merely a means of rendering movement but an end in itself, the play of muscle being now admired for its own sake. At the same time movement as such gradually lost its impetus and even, its mobility; for it was now no longer movement that was aimed at but a parade of [illegible]. Having reached this point, the evolution of the Chinese esthetic ideal is complete on the material side."

'বঙ্গশ্রী'র পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা ইতিপূর্ব্বে* আধুনিক চৈনিক চিত্রকলার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। প্রধানতঃ তাহা সুঙ যুগের চিত্র-সম্পদেরই কথা। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অতীন্দ্রিয় ভাববহুল চিত্রাবলী এই যুগে বাস্তবজগতের সংস্পর্শে আসিয়া অভূতপূর্ব্ব ভাবের



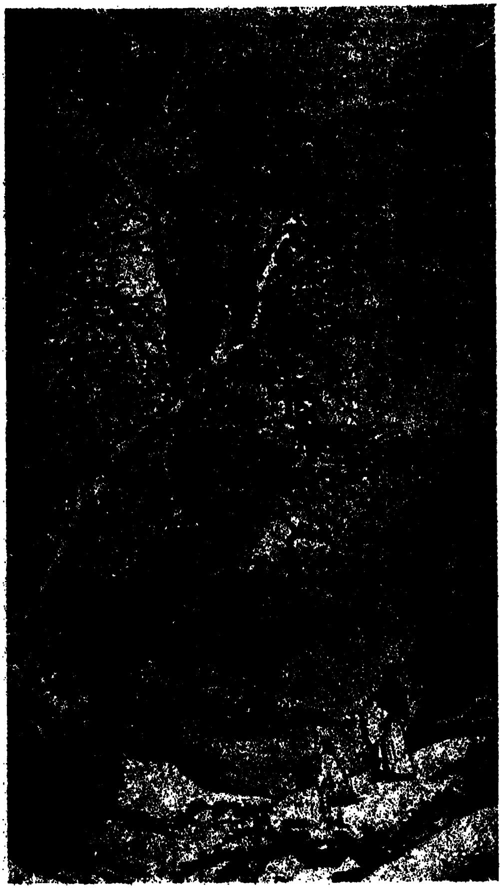
প্রাকৃতিক দৃশ্য। [শিল্পী—সান্ চুন্-যে

প্রবর্ত্তন করিল ; ইহার পূর্ব্বেও এই পদ্ধতির কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঙ যুগের কবিতাও এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিল। তাঙ যুগের দার্শনিক কবিবৃন্দ ও সুঙ যুগের চিত্র-শিল্পিগণ সম্মিলিতভাবে একই আদর্শের অখণ্ড অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সুঙ রাজত্বকালের চিত্র

* আধুনিক চীনের চিত্রকলা (আশ্বিন, ১৩৪২) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সম্পদ চৈনিক সৌন্দর্য্যানুভূতির এক অপূর্ব্ব প্রতীক। চাউ বংশের রাজত্বকালে এই সৌন্দর্য্যবোধ এক প্রকার অব্যক্ত, ভাবব্যঞ্জক মানসিক প্রেরণায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। কিন্তু, তৎপরবর্ত্তী চি'ন (Ch'in) শিল্পযুগের সাময়িক উৎকর্ষে এ-ভাব বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই; তাই আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাই, হান্ (Han)



শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ। [শিল্পী—মা উয়ান

বংশের রাজত্বকালে রেখাঙ্কনচিত্র বিশেষভাবে প্রসারতা লাভ করে। ইহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব গতিশীলতা ছিল, এই গতিশীলতাকে কেন্দ্র করিয়া রেখাঙ্কনচিত্রের রূপ, ভাব ও প্রাণসত্তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে চেষ্টা করিল।

ইহার পরে তাঙ যুগে এই প্রকারের ভাববহুল শিল্পকলা নবরূপে সঞ্জীবিত হইয়া এক বাস্তব প্রাণশক্তিসম্পন্ন কলাশিল্প বলিয়া পরিগণিত হইল। এই বংশের পতনের পরও আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ চিত্র দেখিতে পাই, সেগুলি সুঙ যুগের সৌন্দর্য্যানুশীলনবৃত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তখন চৈনিক চিত্র-বিশারদগণ চারুশিল্পে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রণোদিত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃতির বহিরাবরণের যাবতীয় দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইত। তাঙ অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহে যে ইহা একেবারে ছিল না, এমন নহে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রম্যকলা বাস্তবতা-প্রণোদিত ছিল। কিন্তু, এই যুগের প্রসিদ্ধ কবিগণ যেন ভবিষ্যৎ যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তব বিশ্বের বহিরাবরণ লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই, ইহার অননুভূত অদৃশ্য দিক্‌কে কল্পনার সাহায্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লি তাই পো, তু ফু, ওয়াং উই, তাও হান্ এবং পো চু-ই প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা নিগূঢ় বিশ্বের গোপনবার্ত্তা আদর্শবাদীর ন্যায় মানবমনের গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের রোমান্টিক কবিগণ যাহাকে "বস্তুর প্রাণসত্ত্বা" (soul of things) বলিয়াছেন, ইঁহারা যেন তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

এই প্রেরণার মূলে ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের অতীন্দ্রিয় চিন্তাধারা। এই সময়ে, খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতকে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া সুদূর পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল এবং যথেষ্ট সমাদৃতও হইয়াছিল। কিন্তু, তাহা স্থানীয় "তা-ও" ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ভিন্ন একটি বিশিষ্ট চৈনিক রূপ ধারণ করে। এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধকবি পোচু-ই অথবা লিউ ৎসুঙ্-য়ুয়ানের কাব্যের সহিত সমসাময়িক ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-সাহিত্য, 'ললিতবিস্তার' অথবা 'বোধিচর্য্যাবতারে'র সহিত তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ভারতের বৌদ্ধ-যুগের ন্যায় এই যুগের অধিকাংশ কবিতা এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় ভাবের অপরূপ ব্যঞ্জনা। সাহিত্যের এই ভাবধারা চিত্র-শিল্পে স্থানলাভ করিয়াছে; দৈনন্দিন জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়া অনাস্বাদিত অপরূপ জগতের উদ্দেশে চলিয়াছে। ইহা হইতে চৈনিক চিন্তাধারার গতি নির্দ্দেশিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ চাউ জোশিয়েনের নাম

করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই চীনের শিল্পকলার প্রতীক ড্রাগন ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। রেনে গ্রুসে এতাদৃশ চিত্র-কলার বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

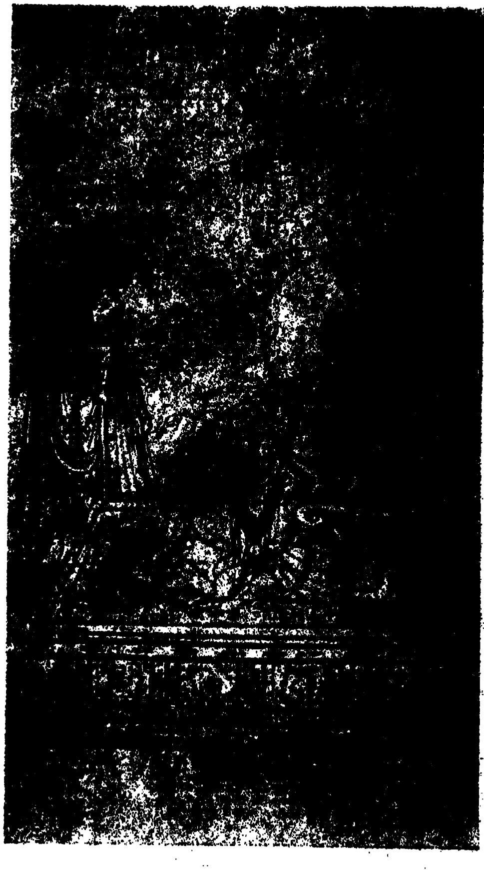
> "This ideal of art consisted in a sense of the mystery diffused through things and of latent cosmic forces.……The artist discerned the soul of the cosmos in the lines of a landscape bathed in mist and lost in infinite distances."

শিল্পী বহু দূরে বিলীয়মান কুহেলিকাচ্ছন্ন দৃশ্যাবলীর অন্তরালে বিশ্বের নিগূঢ় আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা ধীরে ধীরে সৃষ্টির আদিমতম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া এক স্বয়ম্ভু শক্তির বলে যে জীবন-প্রবাহ উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে, তাঁহারা অবশেষে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই অভিনব চিন্তাধারাকে সৌন্দর্য্যে রূপায়িত করিবার জন্য প্রথমে কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—চৈনিক চিত্রকরবৃন্দ তুলিকাবলে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন। তাঙ যুগের কবিগণ মানসচক্ষে যে মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত, কেন না পরবর্ত্তী সুঙ্ যুগের শিল্পীবৃন্দ সেই পরিকল্পনাকে চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

কবি লি তাই-পো বিশ্বের ক্ষণভঙ্গুরতা তাঁহার কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। নদীর সদা-চঞ্চল তরঙ্গের সহিত তিনি ইহার তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"গত দিবসকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই, তীব্র যন্ত্রণাপূর্ণ বর্ত্তমানকেও ভুলিতে পারিতেছি না—তাই নিজেকে ভুলিবার জন্য প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিদের গান করিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু হায়, তাঁহাদের ভাবকে উপলব্ধি করিবার মত শক্তি আমার কোথায়? যেন ঊর্দ্ধ আকাশের নক্ষত্রকে মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা। যখন মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বাহ্য বস্তুর সহিত একতালে চলিতে পারে না, তখন সে ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিয়া উত্তাল সাগরতরঙ্গে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলে।" এই ভাবসম্পদটি একাদশ শতাব্দীর একটি সুবিখ্যাত সামুদ্রিক চিত্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

কবি তু-ফু অনুরূপ চিন্তাধারার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন, "অদূরে শ্যামল পর্ব্বতমালা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সমস্ত অর্দ্ধ-আলোকিত হইয়াছে, নিম্নে নদীতীরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ



মহাসাধু ও ভিক্ষুণী বিমলকীর্ত্তি।   [শিল্পী—লি লুঙ-মেন

অস্পষ্টভাবে শোভা পাইতেছে—পর্ব্বতের সারা অঙ্গে অফুরন্ত পুষ্প-মালার বিপুল সমারোহ—" সুঙ্ যুগের একটি দৃশ্য-চিত্রে এই অপূর্ব্ব ভাবটিকে চিত্রিত করা হইয়াছে।

সুবিখ্যাত কবি ওয়াং-পো (মৃত্যু—৬১৮ খৃঃ অব্দে) এক জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সুঙ্ যুগের শিল্পীবৃন্দ প্রায় সকলেই এই করুণ

দৃশ্যটির চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বহু শিল্পী এই কবির অপরূপ সন্ধ্যার আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। সন্ধ্যার বর্ণনায় ইনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ :-



দায়তোকুজি মন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট ধ্যানশীল মূর্ত্তি। [শিল্পী- মু চি

"This is the hour when forest and pools grow dark, when from the midst of piled up rocks the mists of evening slowly rise."

চেন জুয়াং নামক আর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবির পরিকল্পনাও বহু চিত্রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি তা'ও হান লিখিয়াছেন—

"The sky clears, a peak shows itself and, as though born out of space, a convent rises up before my eyes. Night falls. I gaze upon the blue peaks and the moon.......My soul has soared beyond what is visible, at once wanderer and captive, in a wondrous ravishment..."

ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অতীন্দ্রিয় ভাববহুল অপূর্ব্ব আলেখ্য সুঙ্ যুগের কীর্ত্তি বিঘোষিত করিয়াছে। এই যুগের চারুশিল্পের যাবতীয় মনোরম ভাব ও দার্শনিক তত্ত্ব সুং পো-জেন নামক একজন দার্শনিকের গুটিকতক মনোজ্ঞ কথার ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে, "আমাদের চিত্র-শিল্পীদের তুলির আঁচড় মরুভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বৈকালের নির্ম্মল বায়ু সেবন করা ও বর্ষার ঘন পুঞ্জীভূত মেঘের বর্ষণের সময় চাতক পাখীর বাতাসের অঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখার তুল্য।"

"To build a terrace in a deserted land and enjoy from it the purity of the evenings; watch the rain veiling the heavy foot of the clouds while light

bodies of the swallows are borne away on the wind."

সুঙ্ যুগের বিখ্যাত কয়েকজন চিত্র-শিল্পীর নাম আমরা দেখিতে পাই। ফান্-কুয়ান, তুং য়ুয়ান, কুও সি, চাও তা-নিয়েন্, লি লং-মিয়েন্, মি ফেই, সম্রাট হুই ৎসুং (ইঁনি দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে কাই-ফেং-ফু যুগের রাজা ছিলেন), মা য়ুয়ান, মা লিন্, সিয়া কুয়েই, লিয়াং কাই, মু চি প্রভৃতি। ইঁহাদের অঙ্কিত চিত্রসম্ভারের বিশদ বর্ণনা এই অল্প স্থানের মধ্যে সম্ভবপর নয়, অধিকন্তু ইঁহাদের সমস্ত চিত্রগুলিও এখনও সংগ্রহ হয় নাই। সম্রাট হুই ৎসুং একজন চিত্র-সংগ্রাহক ছিলেন, তাঁহার রাজ-প্রাসাদে যে সমস্ত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সত্যই সুন্দর ও অপূর্ব্ব কল্পনাপ্রসূত। তবে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি মূল চিত্র নহে, প্রতিরূপ মাত্র। এই প্রাসাদটি কিন্ তাতারদের দ্বারা অধিকৃত হয় ও সম্রাট হুই ৎসুং বন্দী অবস্থায় মাঞ্চুরিয়ায় নীত হইলে এই মনোরম পদ্ধতির চিত্রকলার কেন্দ্র তৎকালীন সুঙ্ রাজধানী হান চাউ নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

মা য়ুয়ান (১১৯০-১২২৪) হান্ চাউ পদ্ধতির প্রাকৃতিক দৃশ্যের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর ছিলেন; সারা এশিয়ায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার চিত্রাবলী যে কেবল পরবর্ত্তী চীন চিত্রকলাকে প্রেরণা দিয়াছিল, এমন নয়, জাপানের কানো (kano) পদ্ধতির উপরও তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। এই চিত্রকরের অঙ্কিত প্রধান চিত্রাবলীর মধ্যে পাইন বৃক্ষের অন্তরালে শীতের অস্পষ্ট কুটিরগুলি, উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেবদারুপুঞ্জ, কুয়াসাচ্ছন্ন প্রান্তর, শীতের বায়ুভরে দোদুল্যমান দুই একটি গাছ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

ইঁহার অঙ্কিত বর্ষার একখানি চিত্র এখন ব্যারন ইওয়াসাকি কোয়াতার সংগ্রহের মধ্যে আছে। ইঁহার অঙ্কিত "পাইন বৃক্ষের তলদেশে উপবিষ্ট একটি মানুষ ও শিশু"র ভাবপূর্ণ চিত্র কাউণ্ট তানাকা মিংসুওকি সংগ্রহ করিয়াছেন। "এক কবি পর্ব্বতভেদী সু-উচ্চ পাইন বৃক্ষের ভিতর হইতে উদ্ভাসিত চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন", এই কল্পনাপ্রসূত একটি অতি মনোরম চিত্র মারকুইস্ কুরোদা নাগামারির সংগ্রহের অন্যতম চিত্র। উক্ত চিত্রকরের অঙ্কিত বলিয়া আখ্যাত বহু চিত্র আমেরিকার বস্টন্ মিউজিয়মে শোভা পাইতেছে। কিন্তু, জাপানী ও আমেরিকান সংগ্রহের মধ্যে যথেষ্ট ভাবগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

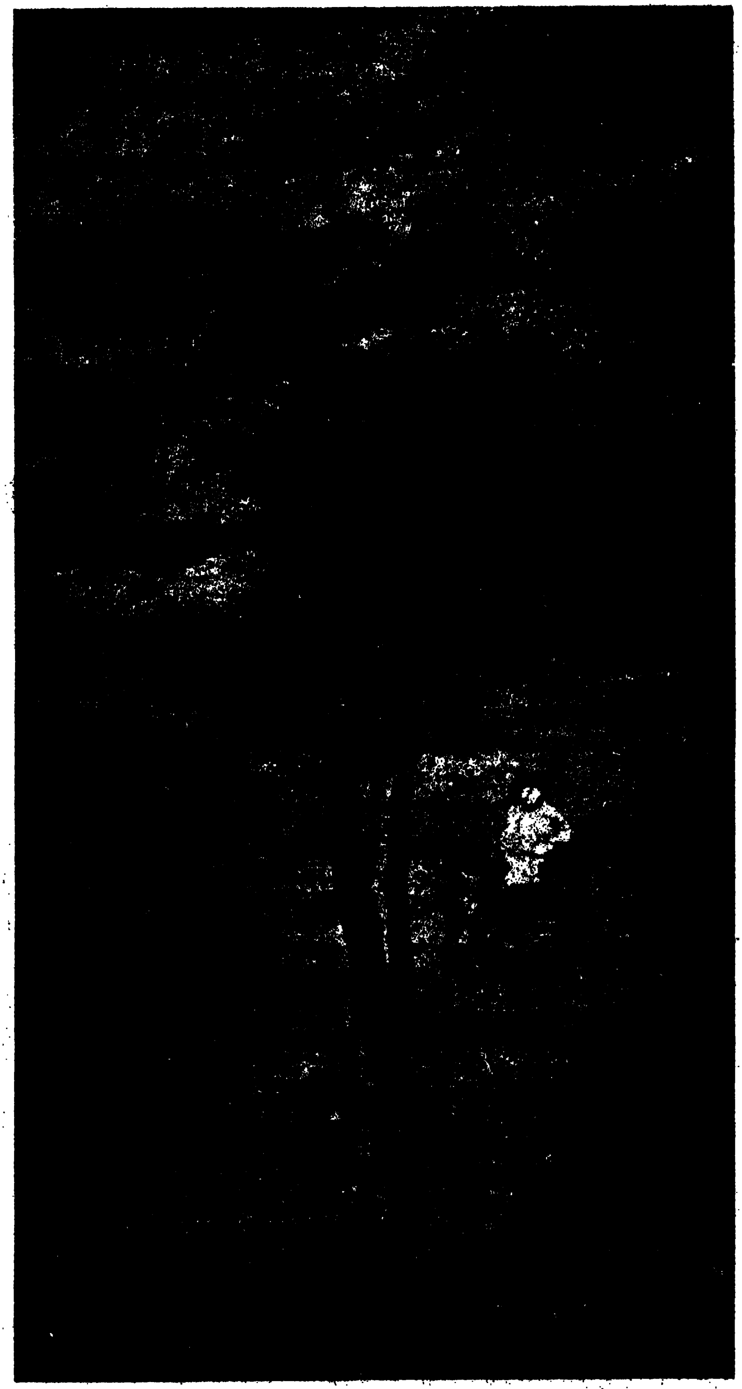
সুং যুগের শেষ শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন মু চি (আনুমানিক ১২৫০)। ইঁনি কল্পিত জানোয়ার ও দেবদেবীর অচিন্ত্যনীয় ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দাইতোকুজি (Daitokuji) কিয়োতোর মিউজিয়মে ইঁহার অঙ্কিত ড্রাগন



সন্ন্যাসী: হাসিতে ধূর্ত্তামীর আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে।

[শিল্পী—ইয়েন হুই

ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চীনের এক অপূর্ব্ব সম্পদ ও অতীত-কালের উপদেবতা-কল্পনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তা-ও-তিয়ের মুখমণ্ডলে রহস্য ও আতঙ্কের ছায়া এই চিত্রকরের শ্রেষ্ঠ মানস-রচনা। এই সুবিখ্যাত চিত্রটি বহু কাল হইতে চৈনিক শিল্পীদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রাচীনতম চাউ যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সুঙ্ যুগ পর্য্যন্ত যে একটি বিশিষ্ট ভাবধারার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাকে চৈনিক শিল্পের প্রাণসত্ত্বা বলা যায়, ইহা যেন তাহারই প্রতীক।



তাতার অশ্বারোহিগণ। [শিল্পী অজ্ঞাত (য়ুয়ান যুগের)

"...now we see it appearing in the mingled light and shadow of a storm cloud, with its terrifying face, its long tentacles, like those of a sea-beast, its demon's horns and its blazing eyes. In this physiognomy is suddenly concentrated the whole vague menace of the unknowable, at once bestial and divine..."

আমরা যে তাঁহার নিকট হইতে কেবল মাত্র কন্‌ফি-উসিয়াসের যুগের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত চীন জাতির সংস্কারবহুলতার মূর্ত্ত প্রকাশ পাই তাহা নহে, অধিকন্তু মোঙ্গল-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও সমাজের যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, তাহার পবিত্র ভাবপূর্ণ অনেকগুলি চিত্র দেখিতে পাই। ব্যারন্‌ কোয়াটা-র সংগৃহীত "অর্হৎ বনবাসী" চিত্রে ব্যাঘ্র ও ড্র্যাগন মূর্ত্তি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতার বাণী বহন করিয়া আনে। ইহাতে "কুণ্ডলিত সর্পের উপর উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন যোগীর ভাবময় মূর্ত্তির সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে—বহু দূরে কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী।" পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শান্তিময় বাণী যখন যু চির অন্তরে বদ্ধমূল হইল, তখন আমরা দেখিতে পাই, পর্ব্বতের শেষভাগে উপবিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি ভিক্ষুণী ভগবদ্‌চিন্তায় মগ্ন—তলদেশে স্রোতস্বিনী বহিয়া চলিয়াছে—উপরে মস্তকোপরি ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ সমস্ত জগৎকে এক গভীর রহস্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

সুঙ্ যুগের দার্শনিকগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও তাও ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া সমস্ত প্রকৃতিকে দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে মনসংযোগ করেন। মু চি সেই চিন্তা-ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক কয়েকটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যও অঙ্কিত করিয়াছেন। কাউন্ট মাৎসুদাইরা নাওসুকের নিকট মু চি-র অঙ্কিত একটি প্রাকৃতিক চিত্র আছে, সম্ভবতঃ ঐরূপ অলৌকিক ভাবপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্য সমগ্র সুঙ যুগে একটিও অঙ্কিত হয় নাই। চিত্রটির ভাবার্থ "কয়েকটি নৌকা (টুংটিং, tungting) হ্রদে মৎস্যসংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ডিঙিগুলি অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। চারিদিকে অনন্ত জলরাশি এবং ঘন কুহেলিকা সুদূর-প্রসারিত রহিয়াছে; অদূরের গ্রামখানি বৃক্ষের আচ্ছাদনের মাঝে সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে।" দর্শকের হৃদয়ে ইহা এক অপূর্ব্ব মোহময় আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে।

ত্রয়োদশ শতকে চীনদেশ মোঙ্গলদের করতলগত হয়। জঙ্গীস্ খাঁ ছিলেন এই আক্রমণের প্রধান নায়ক। ১২১১ খৃঃ অব্দে কীন্ রাজ্য এবং পরবর্ত্তী কালে ১২৭৯ খৃঃ অব্দে 'সুঙ' সাম্রাজ্য ইহাঁদের অধিকারভুক্ত হয়।

চীনসম্রাট কুবলাই (১২৫৯-১২৯৪ খৃঃ অঃ) মধ্য-এশিয়া, পারস্য এবং জঙ্গীস্ খাঁ অধিকৃত রুষসাম্রাজ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার নাম 'য়ুআন' বংশ। ঐ যুগে অঙ্কনশিল্প প্রধানতঃ সুঙ্ ধারানুযায়ী চলিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু চীনের এই রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের সময় মোঙ্গলদের সামরিক উন্মাদনা চীন চিত্র-শিল্পে গভীর ভাবে ছাপ রাখিয়া গেল। এই সময় পুরাতন তাঙ যুগের সামরিক কল্পনা ও বাস্তবতার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল। চাও মেং-ফু প্রতিষ্ঠিত 'চাও' পদ্ধতি এই ধারা অনুযায়ী গঠিত হইল (১২৫৪-১৩২২)।

এই পদ্ধতির শিল্পীরা যে কেবল জন্তু-জানোয়ারের অঙ্কনে বিশারদ হইল, এমন নহে; ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিল। সম্রাট কুবলাই ও তাইমুর খাঁয়ের সমসাময়িক চিত্রকরগণ তাতার বীরগণের বিজয়সংক্রান্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া ঐ যুগের যাবতীয় যুদ্ধব্যাপার আমাদের সম্মুখে বাস্তবাকারে সজ্জিত রাখিয়া গিয়াছেন—তাতারীয় টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া বা ট্রান্স-অক্সিয়ানার বিরাট অশ্বে আরূঢ় জাতীয় পোষাকে সুসজ্জিত মোঙ্গলগণ ও তাতারগণ আমাদের সম্মুখ দিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই ধরণের বহুচিত্রসংবলিত একটি 'রোল (roll)' ফরাসী চিত্রসংগ্রাহক আঁরি রিভিয়েরের (Henri Riviere) সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়।

মোঙ্গলেরা যে কেবল সামরিক জাতি ছিল তাহাই নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বৌদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তিও তাহাদের যথেষ্ট ছিল। সেই জন্য মোঙ্গলদের প্রভাবে তাৎকালীন চিত্রশিল্পে সামরিক চিত্র ব্যতীত পবিত্র ভাবপূর্ণ ধর্ম্মচিত্রসমূহও বহুলভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। য়ুআন রাজসভায় ইয়েন হুই (১৪ শতক) একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত অর্হৎ ও সন্ন্যাসীদের রহস্যময় মূর্ত্তি ভাবপ্রকাশে মুচির চিত্রাবলীর প্রায় সমকক্ষ; উপরন্তু সমস্ত ছবিটির মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৩৫১ খৃষ্টাব্দে চীনজাতি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া অবশেষে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জাতীয় মিং সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। মিং যুগে (১৩৬৮-১৬৪৪) চীনজাতি জগতের অন্যান্য জাতিগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া রাজনৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িল। চিত্রাঙ্কনেও তাহাদের সেই দশা; মৌলিক চিত্র এ যুগে এক প্রকার অঙ্কিত হয় নাই বলিলেই চলে। চীন দেশের সাধারণ শ্রেণীর অধিকাংশ চিত্র এই যুগেই চিত্রিত হয়।

নিশির ডাক

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

[১]

সমস্ত গ্রামটির ওপরেই যেন বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। ছেলেবুড়ো সকলেরই কেমন যেন মনমরা ভাব—বৃদ্ধেরা দাওয়ায় বসে ঘরবাড়ী, বাগানবাগিচার দিকে চেয়ে চেয়ে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন, বৃদ্ধারা ঘনঘন আঁচলে চোখ মুছছেন, সক্ষম মেয়ে-পুরুষেরা অত্যন্ত নিরুৎসাহভাবে দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছে; ছোট ছেলেমেয়েরাও যেন তেমন আনন্দে খেলা করছে না—খেলার মাঠটিতে খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে।

সকলের এই গভীর বিষাদের কারণ এই যে, আর কিছুদিন পরেই তাদের জন্মভূমি, পিতৃপিতামহের বাসস্থান, সাতপুরুষের ভিটে এই গ্রাম ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। রাণীগঞ্জের কাছে যে প্রকাণ্ড কোল-ফিল্ড আছে এই গ্রামটি সেই সুবিস্তীর্ণ ভূমির একাংশে অবস্থিত—এর আশেপাশে চারিদিকে ছোটবড় অনেক কয়লা-কুঠী। যে কয়লা-কুঠীর অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামটি অবস্থিত, তার অন্য অংশের সব কয়লাই কেটে নেওয়া হয়ে গেছে—বাকী আছে শুধু এই গ্রামটির নীচের কয়লা। কাজেই কয়লা-কুঠীর মালিকেরা গ্রামটির দখল নেবার জন্য নোটিস দিয়েছেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকলকে গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হবে। তাঁরা অবশ্য ঘর-বাড়ী, বাগান-বাগিচা, ক্ষেত-খামার সমস্তেরই ন্যায্য মূল্য ধরে দিচ্ছেন, কিন্তু তাতে মন কতটুকু সান্ত্বনা পায়? যাদের জীবনের আর কয়েকটি গোনা দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, যাঁরা আবাল্যপরিচিত জন্মভূমির মাটিতে সাতপুরুষের চিতাভস্মের সঙ্গে নিজেদের নশ্বর দেহাবশিষ্ট মিশিয়ে দেবার শেষ কামনাটুকু বুকে করে আছেন, যে-সব সন্তানহীনা জননী, পতিহীনা নারী প্রিয়-জনের শতস্মৃতিবিজড়িত ঘরে খানিকটা সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ কি দিয়ে হবে? তারপর কত সহায়হীন নাবালক, কত অনাথা বিধবা আছে, তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করবার ও অন্যত্র নতুন বাসস্থান নির্ম্মাণ করবার ব্যবস্থাই বা কে করে দেবে?

সত্য কথা বলতে কি, এই কোলিয়ারী থেকে গ্রামের অনেকে অনেক উপকার পেয়ে এসেছে। এখানে এতদিন কাজ করে গ্রামের অনেক লোক অর্থ উপার্জ্জন করেছে; কোলিয়ারীর ডাক্তারখানার সুবিধা গ্রামবাসীরা পেয়েছে; এর কাটা ইঁদারার জলে গ্রীষ্মের দিনের দারুণ জলকষ্টেরও খানিকটা লাঘব হয়েছে। কিন্তু, যে কোলিয়ারী এতদিন তাদের কাছে পরম সুহৃদের মত ছিল, আজ সেই কোলিয়ারীই যেন ভীষণ শত্রুর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে রয়েছে কত পুরুষের পুরাণো কালী-তলা, রথতলা, জোড়াশিবমন্দির, মসজিদ—কতদিন ধরে কত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সে সবের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—তাঁরা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে, দূর ভবিষ্যতে বিদেশী বণিক এসে তাঁদের এতদিনের আশ্রয়দাত্রী জননী ধরিত্রীর মৃত্তিকার অন্তরালে গভীর গহনে সম্পদের সন্ধান খুঁজে বার করবে, আর দেশের সেই সম্পদ লুণ্ঠন করবার জন্য তাঁদের বংশধরদের পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে?

কথায় বলে, সাতপুরুষের ভিটে! পিতৃপিতামহের পুণ্য-স্মৃতিমণ্ডিত, আবাল্যপরিচিত সেই জননী-জন্মভূমি চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যেতে কার অন্তর না ব্যথায় ও বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে? পলে পলে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বছরে বছরে, এর সঙ্গে কত স্মৃতি, কত কাহিনী, কত কিংবদন্তী, কত প্রবাদ জড়িয়ে উঠেছে—কে তার ইয়ত্তা করেছে? এতদিন কি এসব কথা কারও মনেও এসেছে? আজ ছেড়ে যাবার কথা উঠতেই যেন শত-সহস্র গ্রন্থির বাঁধনে নাড়া পড়েছে—ক্ষুব্ধ হৃদয় যেন বারেবারেই বলছে, কেন এতদিন আরও ভাল করে চেয়ে দেখি নি—

সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে কেন পরিপূর্ণভাবে অনুভব করে নিই নি—নয়ন-মনের আশ মিটিয়ে কেন উপভোগ করে নিই নি ?

[২]

গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট করে নোটিস দেওয়া হয়েছিল, তার মোটে আর দিনদশেক বাকী আছে। আর দশদিন পরেই এতদিনকার জন-কোলাহল-মুখরিত এই গ্রাম—কখনো উৎসব-আনন্দে মুখর, কখনো দুঃখবিষাদে মূক, প্রাণবন্ত গ্রামখানি শ্মশান-পুরীর মত শূন্য, নীরব ও হতশ্রী হয়ে যাবে।

এমন সময়ে একদিন এক ভীষণ ঘটনা ঘটল। সকালে কুঠীর আট নম্বর পিটে খুব হৈ-চৈ, গোলমাল শোনা গেল; সেদিন সোমবার—আগের দিন রবিবার বলে খাদ বন্ধ ছিল। সকালে খাদের ওভারম্যান, সর্দ্দার ও ঘণ্টা-ওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে সকলের আগে নীচে নেমেছিলেন। ওঠানামার ডুলীতে চড়ে প্রকাণ্ড ইঁদারার মত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ৫০০ ফিট নীচে, গভীর গহনে তাঁরা নামতে লাগলেন। তাদের হাতের গ্যাসের আলো পড়ে সুড়ঙ্গের নিবিড় অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছিল, আর দেখা যাচ্ছিল যে, সুড়ঙ্গ-প্রাচীরের গা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে। ডুলীটা থামতেই উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় দেখা গেল যে, পিটের নীচে পিণ্ডবৎ একটা কি জিনিষ পড়ে রয়েছে—ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে, সেটা একটা মানুষের শব। ওভারম্যান তৎক্ষণাৎ ম্যানেজারের কাছে খবর পাঠালেন। তারপর খাদের কর্ত্তারা সকলেই এসে উপস্থিত হলেন। তদন্ত আরম্ভ হল। প্রথমে কিছুতেই ধরা গেল না যে, মৃতদেহটি কার, কারণ ৫০০ ফিট উঁচু থেকে পড়ার দরুণ শব এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, দেখে সনাক্ত করা দূরে থাক, স্ত্রী কি পুরুষ নির্ণয় করাও কঠিন। যাই হোক, খোঁজ করতে করতে বহু তদন্তের পর জানা গেল যে, মৃতদেহটি গ্রামের একটি বধূর—এই কুঠীরই ভূতপূর্ব্ব পেট্-সরকার শ্যামলালের বিধবা স্ত্রীর। তার এভাবে আত্মহত্যা করার কারণ কেউ অনুমান করতে পারল না। তার আপনার কোন লোক গ্রামে কেউ নেই। সে একাই থাকত—কেবল একটি নীচ জাতীয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রাত্রে তার কাছে শুত—সেও কিছুই জানে না।

ম্যানেজার তারপর যথারীতি খনির পরিদর্শকের কাছে খবর দিলেন। তিনি এসে তদন্ত করে এটা যে সত্যসত্যই আত্মহত্যা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে রিপোর্টে সেই কথাই লিখে দিয়ে গেলেন। কয়লাকুঠীর কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হলেন।

তারপর সেই পিণ্ডাকার শবদেহ ডুলীতে করে উপরে তুলে আনা হল। গ্রামেরই কয়েকজন যুবক তার সৎকার করে এল। এমনি করে স্বজনহীনা, নিরাশ্রয়া এক বিধবার জীবন শেষ হয়ে গেল। কেউ কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করল, কেউ কেউ দুঃখ করে বলল, "আহা"! কেউ বা তার কাজের সমর্থন করল, কেউ বা করল না, কেউ বা কারণ খুঁজল, কেউ বা খুঁজল না—কিন্তু কিছুক্ষণ এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার পর সকলেই যে যার দৈনন্দিন কাজে চলে গেল। সহসা এমনভাবে আত্মহত্যা করবার কারণ যে কি থাকতে পারে, গভীরভাবে চিন্তা করে খুঁজে বার করবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন দরদী সে গ্রামে কেউ ছিল না, মৃতার আপনার জনও কেউ ছিল না, যে এ বিষয় বিশেষ ভেবে দেখবে। কাজেই তার আত্মহত্যার কারণ এই রকম একটা অস্পষ্ট রহস্যের আবরণেই ঢাকা রয়ে গেল।

গ্রামের নিন্দাপরায়ণা প্রবীণারা এতদিন এই নিরীহ, সুশীলা বধূটির কোন নিন্দা করবার অবকাশ পান নি, তাঁরা এতদিনে একটা সুযোগ পেয়ে নানারকম মন্তব্য প্রকাশ করে তাঁদের এতদিনকার ক্ষোভ মেটাতে লাগলেন। দু'একটি কোমলহৃদয়া, উদারমতি মহিলা তাঁদের এই বিরুদ্ধ মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মুখের কথায় না পেরে নিজেদের স্নেহ-ভরা অন্তরের মমতা দিয়ে সেই নির্ব্বান্ধবা মেয়েটির স্মৃতিকে ঘিরে রাখলেন; গ্রামের যে দু'একটি বধূ তার পরিচিতা ছিল, প্রবীণাদের লুকিয়ে আড়ালে তারা অশ্রুমোচন করল। . .

গ্রামবাসীরা একদিন সজল নয়নে গ্রামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র বাসস্থান নির্ম্মান করে বর্ত্তমানের মনভোলানো মোহে তাকেই আবার নূতন আগ্রহে নবীন আশায় আঁকড়ে ধরতে লাগল; পুরাতন গ্রামের কথায় তাদের মনে আর তেমন গভীর বিষাদ জাগে না। হয়ত তারা ক্রমে ক্রমে একদিন সে বিচ্ছেদব্যথা একেবারেই ভুলে যাবে। কোলিয়ারীর কাজও যথানিয়মে চলতে লাগল, বড় সাহেব থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র শ্রমিক পর্য্যন্ত সকলেই যে যার কাজ করে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে আত্মহত্যাকারিণী সেই গ্রাম্য বধূটির কথা সকলেই ভুলে গেল।

[৩]

কিন্তু কেউ যদি তলিয়ে ভেবে দেখত, মেয়েটির ঘটনাবিহীন নিরাড়ম্বর তুচ্ছ জীবন-কথা কেউ যদি ভাল করে আলোচনা করত—তা হলে কারণ খুঁজে পেতে বিশেষ দেরী হত না। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে এটি স্বাভাবিক সাধারণ ঘটনা। মেয়েটি ভদ্র কায়স্থ-কন্যা—অতি শৈশবেই বাপ-মাকে হারিয়ে কোন দূর-আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রতিপালিত হয়। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে উপেক্ষা, অনাদর ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সঙ্গেই তার পরিচয়, পাড়া-প্রতিবেশী দু'একজনের কাছ থেকে ছাড়া মিষ্টি কথা শোনবার সৌভাগ্য তার হয় নি কোনদিন—আদর তো তার কাছে ছিল দিবাস্বপ্ন। এমনি করেই সে বড় হয়ে উঠছিল। এমন সময় একদিন তাদের গ্রামের দু'তিনটি গ্রামের পরের এক গ্রাম থেকে কি এক কার্য্যোপলক্ষে শ্যামলাল এই গ্রামে তার এক দূর আত্মীয়ের বাড়ী এল। গ্রামের পথে ঘাটে কার্য্যনিরতা এই মেয়েটিকে দু'চারবার দেখে তার বিষণ্ণ, করুণ মুখখানি শ্যামলালের মনে একটা ছায়াপাত করল। আত্মীয়ের কাছে মেয়েটির খোঁজ নিয়ে তার নিঃসহায় অবস্থার কথা শুনে মেয়েটির প্রতি তার মন আরও আকৃষ্ট হল। শ্যামলালও অল্প বয়সে পিতৃহীন—দারিদ্র্য-দুঃখের সঙ্গেও তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। মেয়েটির নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনে সহানুভূতি ও করুণায় তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। খোঁজ নিয়ে যখন জানা গেল যে, কুলেশীলে সব মিলে যায় —সে দিক্ দিয়ে কোন বাধা নেই। তখন সে মেয়েটির সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করল। কেউ এতে কোন আপত্তি করল না—মেয়েটির অভিভাবক বিনা আয়াসে ও বিনা অর্থে এই ঘাড়ের বোঝার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে কোন দ্বিধা না করে, শ্যামলালের সম্বন্ধে কোন খোজ নেবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করেই সানন্দে সম্মতি দিলেন। এমনি করে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত এক শুক্লা বাসন্তী রজনীতে স্বজনবান্ধব-হীন সহায়শূন্য এই দু'জনের মিলন হল; তরঙ্গ-আবর্ত্তসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে তারা দুজনে মাত্র পরস্পরকে আশ্রয় করে জীবনতরী ভাসাল।

গ্রামের স্কুলটিতে খানিকটা লেখাপড়া শিখে কিছুদিন এটা ওটা করে ও কিছুদিন শিক্ষানবিশী করবার পর মাসছয়েক হল শ্যামলাল কোলিয়ারীর পিট-সরকারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। শ্যামলালের বাড়ীতে ছিল টিনের দুটি শোবার ঘর, খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি রান্নাঘর—তার পাশে একটি ঢেঁকি ঘর, আর বাড়ীর পিছনে গোটা দুই তিন আম-কাঁঠালের গাছ। শ্যামলালের মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বাড়ীঘর অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল হয়ে ছিল; শ্যামলালের বালিকা-বধূর অভ্যস্ত, নিপুণ হাতের স্পর্শে ক্রমে ক্রমে সে সবের শ্রী ফিরতে লাগল। বিয়ের আগে যে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী সে থাকত, সে বাড়ী অবশ্য এর চেয়ে অনেক বড় ও ভাল ছিল। সেখানে দালান ছিল, উঠানে ধানের মরাই ছিল, গোয়ালে গরু ছিল, আম কাঁঠাল ও অন্য ফলের মস্তবড় বাগান ছিল। কিন্তু সেখানে সে ছিল পরমুখাপেক্ষী, অনাদৃতা আশ্রিতা মাত্র, আর এখানে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও গৃহিণী। মাত্র বছর বার তার বয়স, কিন্তু অতি শিশু বয়স হতেই সংসারের কঠোর ও শ্রীহীন দিক্‌টার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দরুণ তার মন অতি দ্রুত বেড়ে উঠেছিল। লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে এমন সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সে শ্যামলালের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই শুভদৃষ্টির সময়েই তার বালিকা-হৃদয় যে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, শ্যামলালের

স্নেহ কোমল ব্যবহারে দিনে দিনে তা আরও পরিপূর্ণ য়ে উঠতে লাগল। শ্যামলালের বাড়ীটি তার কাছে ীর্থের মত পবিত্র ও প্রিয় হয়ে উঠল।

শ্যামলাল যখন খুব ছোট, সেই সময় থেকেই একটি গয়লার য়েয়ে তাদের বাড়ী কাজকর্ম্ম করে দিয়ে যেত—শ্যামলাল াকে গয়লামাসী বলে ডাকত। শ্যামলালের মায়ের ত্যুর পর সেই এসে অন্য কাজ সেরে শ্যামলালের রান্নার ব জোগাড় করে রেখে যেত। এখন সেই গয়লামাসীর হায়তায় শ্যামলালের বৌ টীনের ঘরদুটির মাটির দেওয়াল, েঝে ও সামনের দাওয়া, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর ও উঠান, ব গোবরমাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপে-মুছে শাভন, সুদৃশ্য ও মসৃণ করে তুলল; শ্যামলালকে বলে ান্নাঘরে নতুন খড়ের ছাউনি দেওয়াল। বাড়ীর পিছনের জায়গাটুকুতে আম-কাঁঠালের গোটা দুইতিন গাছ ছল, তার তলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে নিল, ারপর চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে লঙ্কা, বেগুন ও ানারকম শাকের গাছ পুঁতে দিল। ভবিষ্যতে আরও 'একটা আম গাছ লাগানর সংকল্পও তার মনে রইল। ান্নাঘরের চালে লাউ-কুমড়ার লতা তুলে দেওয়া হল, ার উঠানের একপাশে একটী মাচা বেঁধে তার চার াশে পুঁই, সীম, বরবটী, শশা, ঝিঙ্গে এই সব নানা রকম তা উঠিয়ে দিল। উঠানের এককোণে যে সযত্ন-ক্ষিত তুলসীমাচাটি ভেঙ্গে পড়ছিল, সেটাকে ঠিক রে নিল। তারপর শ্যামলালের বৌ ঘরে লক্ষ্মীর াসন পাতল ও শ্যামলালকে বলে একখানা জগদ্ধাত্রীর একখানা হরগৌরীর ছবি এনে শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে খল। শ্যামলালের বাড়ী-ঘর যেন লক্ষ্মীর হাতের স্পশ য়ে আনন্দে হেসে উঠল। শ্যামলাল আর তার বৌয়ের বনযাত্রার মাপকাঠির হিসাবে তাদের সংসারে আর অপূর্ণতা তাদের চোখে পড়ত না—খালি একটি াব তাদের মনে জাগত। অনেক খোঁজাখুজির শ্যামলাল যেদিন সস্তায় একটি গরু কিনে আনল, দিন সে ক্ষোভও তাদের মিটল। সেদিন তাদের দেখে কে!

এমনি করে একটানা মিষ্টি সুরের মত, ভোরের পাখীর আনন্দ-উচ্ছল গানের মত, লীলাচঞ্চল নদীপ্রবাহের মত, পুলকবিহ্বল, আবেশমণ্ডিত মধুর সুখশান্তির ভিতর দিয়ে সাতটা বছর কেটে গেল। শ্যামলালের বৌয়ের আজন্ম স্নেহ-বঞ্চিত, তৃষিত হৃদয় স্নেহ পাবার ও স্নেহ করবার সুযোগ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল; শ্যাম-লালও মা মারা যাবার পর থেকে স্বার্থপর কুটিল সংসারের নানা আঘাতে মুষড়ে পড়েছিল, সেও এতদিন পরে স্নেহপ্রেমভরা কোমল কৃতজ্ঞ একখানি হৃদয় একান্তই আপনার করে পেয়ে যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিল। এই সব নানা কারণে শ্যামলাল ও শ্যামলালের বৌ পরস্পরের খুব নিকটে এসে পড়েছিল ও পরস্পরকে অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে কোন অসঙ্গতি—কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে দুইটি হৃদয় মিলে একটি হওয়ার বেদোক্ত বিবাহমন্ত্র তাদের ক্ষেত্রে এমন সত্য হয়ে উঠেছিল, যা বাস্তবে হয়ত খুব অল্পই দেখা যায়।

কিন্তু, মানবজীবনে এত পরিপূর্ণ সুখ বুঝি অকরুণ বিধাতার অভিপ্রেত নয়, তাই একদিন সহসা নির্মেঘ, নীল আকাশের ভিতর থেকে বজ্র এসে নির্ম্মম আঘাতে এদের সব সুখ ছিন্নভিন্ন করে দুঃখের একেবারে শেষ সীমায় এনে দিয়ে গেল। মাত্র চার পাঁচ দিনের জ্বরে শ্যামলালের মৃত্যু হল। শ্যামলালের বৌ পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল—কি সর্ব্বনাশ যে তার হয়ে গেল, তা ধারণা করবার শক্তিও যেন তার লোপ পেয়ে গেছে। শ্যামলালের মৃতদেহ নিয়ে যাবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার পা' দুটি কোলে নিয়ে নিশ্চল প্রতিমার মত বসে ছিল, একবিন্দু চোখের জলও ফেলেনি। যখন সবাই মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য তাকে সরে বসতে বলল, সে তাই বসল, কিন্তু শ্যামলালকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। দুদিনের মধ্যে সে মূর্চ্ছা তার ভাঙ্গেনি; সবাই ভেবেছিল আর বুঝি ভাঙ্গবেও না। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার তার জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়েছিল শ্যামলালের শেষ সময়ের কথা;. শ্যামলাল তার হাত দুটি নিজের

বুকের ওপরে টেনে নিয়ে কোন রকমে বলেছিল যে, পরপারে আবার মিলন হবে। যে শ্যামলালকে সে দেবতার আসনে বসিয়েছিল, তার শেষ সময়ের এই কথার ভিতরে কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পেয়ে সে তখন উঠে বসতে পেরেছিল, আর সেই কথাই এতদিন তার আশ্রয় হয়ে আছে। তার নিজেরও অবশ্য আজন্মের সংস্কার এই যে বিবাহবন্ধন জন্ম-জন্মান্তরের এবং সতী স্ত্রী মৃত্যুর পরে স্বামীর সঙ্গে মিলবেই। —শ্যামলালের কথায় সেই সংস্কার আরও দৃঢ় হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। তবুও মাঝে মাঝে গভীর বিষাদ ও হতাশা তাকে মুহ্যমান করে দিত—কিন্তু তার শিশু-জীবনের অভ্যস্ত ধৈর্য্য ও সংস্কার তাকে বাঁচিয়ে রাখত। এমনি করে দশটি বছর কেটে গেল। শ্যামলালের ঘরটি সে আগেকার মতই পরিপাটী করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত —একটি জলচৌকীর উপরে তার পরিধেয় জামা জুতা ও নিত্য ব্যবহার্য্য অন্য নানা টুকিটাকি জিনিষ রেখে সে রোজ সকালে চন্দন ও ফুল দিয়ে পূজা করত, সন্ধ্যায় ধূপধুনো দিয়ে আরতি করত। অবসর সময়ে রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে পড়ত।

এমনি করে স্বামীর ধ্যানে সমস্ত চিত্ত নিয়োজিত করে, শত স্মৃতি-মণ্ডিত সেই নির্জ্জন ঘরে নিঃসহায়া, নির্ব্বান্ধবা, নিঃসন্তানা, একাকিনী বিধবা মৃত্যুর পরপারে স্বামীর সঙ্গে মিলনের আশা বুকে নিয়ে একাগ্র প্রতীক্ষায় তার জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। শোকের কঠোর তীব্রতা ও সকরুণ তিক্ততার ভাব তার মন থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছিল—সাধনার ভিতর তার মন শান্ত, সমাহিত হয়ে গিয়েছিল; তার সরল, পবিত্র হৃদয়ের একান্ত ধ্যানের ভিতর দিয়ে দিনে দিনে, পলে পলে ঈশ্বর ও শ্যামলাল মিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

এমনিভাবে দশ বছর কেটে গেছে, আরও দশ বছর হয়ত সে এমনি শান্ত ধৈর্য্যে এমনিই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু এমন সময় গ্রাম ত্যাগ করে যাবার নিদারুণ আদেশ এসে তাকে বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল করে তুলল। এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে!—শ্যামলালের বৌয়ের কাছে এই বাড়ী যে কি—তা সে আর তার অন্তর্য্যামী আর কে জানে? আবাল্য সে শুনে এসেছে, স্বামীর ভিটা পরম পবিত্র তীর্থ—বিয়ের পর সে কথা সে সমস্ত প্রাণ দিয়েই অনুভব করেছে, এখন তা দিনে দিনে আরও পবিত্র, আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে; জীবনের শেষ কয়েকটা দিন শ্যামলালের স্মৃতিঘেরা শ্যামলালের এই বাড়ীতে কাটিয়ে দিয়ে এইখান থেকেই শেষ নিশ্বাস ফেলে সে শ্যামলালের কাছে যাবে, এই যে এখন তার একমাত্র কামনা—শেষ সাধ! এর থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হবে?

পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ডাকে "শ্যামলালের বৌ"—তাদের এই ডাক যে অহোরহ তাকে আশ্বাস দেয়, শ্যামলালের সঙ্গে তার বন্ধন জীবনে মরণে অচ্ছেদ্য—এই সব সান্নিধ্য ছেড়ে আজ চলে যেতে হবে? কিন্তু যাবেই বা কোথায়? আর কোথায় তার আশ্রয় আছে? ছোটবেলার অভিভাবক সেই আত্মীয় বিয়ের পর থেকেই আর কোন খোঁজ নেন নি—এখন যে তিনি আশ্রয় দেবেন, সে ভরসা করা বাতুলতা মাত্র। কোম্পানী অবশ্য বাড়ীঘর, জমিজমার ন্যায্য দাম ধরে দেবে, যাতে অন্যত্র বাসস্থান নির্ম্মাণ করে থাকা চলে, কিন্তু সহায়হীনা অল্পবয়সী ভদ্রঘরের বিধবা সে—কার সাহায্য সে নেবে? কে তাকে সেই টাকা আদায় করে দেবার ব্যবস্থা করে দেবে? তেমন কে আছে? এখন সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত—তার দিকে তাকাবার অবসর কার আছে? আর যদিই বা কোন রকমে টাকা পাওয়া যায়—নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেই বা দেবে কে, আর তার চলবেই বা কিসে? একমনে সে প্রার্থনা করতে লাগল—সকাতরে শ্যামলালের কাছে পথের সন্ধান চাইতে লাগল। ক'দিন ধরে এই রকম নানা চিন্তায়, ক্রমাগত প্রার্থনা করে এবং অবিরত ক্রন্দনের ফলে তার সমস্ত শরীর কেমন যেন অবসন্ন বোধ হতে লাগল, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল—আস্তে আস্তে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রামপ্রান্তে তাদের বাড়ী; বাড়ীর পরে উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপারে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে কোলিয়ারীর বিজলী বাতির আলো জলজল করছে! নিষ্ঠুর, বিরাট দুই দানবের মত কয়লা-খাদের হেড্‌গিয়র দুটো দাঁড়িয়ে আছে; শ্যামলালের বৌ একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইল—

কতদিন সে একা একা এখানে দাঁড়িয়ে শ্যামলালের প্রতীক্ষা করেছে, আবার কতদিন এখানে দাঁড়িয়ে কোলিয়ারীর সম্পর্কে দুজনে তারা কত গল্প করেছে। এখন সেই আলোর দিকে ক্রমাগত চাইতে চাইতে তার মনে হল সেটা যেন ধীরে ধীরে শ্যামলালের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তার আকুল প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে সে বুঝি মুক্তির সন্ধান বলে দিতে এসেছে। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে আস্তে আস্তে সে বাড়ীর বাইরে এল—দাওয়ায় যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ঘুমোচ্ছিল, সে তেমনই ঘুমোতে লাগল—কিছু জানতে পারল না। যে কোন-দিন গ্রামের বাইরে পা দেয় নি, সে আজ মাঠ ঘাট, বন জঙ্গল ভেঙ্গে উন্মাদের মত সেই আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে সোজা চলতে লাগল—কোনদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই—বিন্দুমাত্র জ্ঞানও যেন তার নেই—এমনি ভাবে সে ছুটে চলল—একেই কি লোকে নিশির ডাক বলে? চলতে চলতে সেই আলোর কাছাকাছি আট নম্বর খাদের কাছে এসে খাদের মোহনার যে মুখটি খোলা ছিল, সেই অন্ধকার গর্ত্তের সামনে থমকে দাঁড়াল। তারপর কি ভেবে হঠাৎ তার ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ঝপ্ করে একটা শব্দ হল মাত্র, তারপর আবার সব আগে আগে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে রইল। গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক তেমনই পরিব্যাপ্ত হয়ে রইল, আকাশে নক্ষত্র-রাজি তেমনই উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তি বিকীর্ণ করতে লাগল, দূর সাঁওতাল-পল্লী থেকে তেমনই মাদলের সুর ভেসে আসতে লাগল।

লোক-লোচনের অন্তরালে, মানুষের জ্ঞানের বাইরে, অন্তরীক্ষের অপর পারে কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হল কি না, কে বলবে!

পরের জিনিষ

বসু

মা কহিলেন মেয়েকে তার,—'লক্ষ্মী আমার সোনার মেয়ে,
সন্ধ্যে হ'ল পিদীমখানা তুলসীতলায় আন ঘুরিয়ে।
শাঁখটায় দুটো ফুঁ দিয়ে দে, রাখ মা এখন বইখানা।'
—কাজলকালো সন্ধ্যা তখন দুয়ারধারে দিচ্ছে হানা।
মেয়ে বলে,—'কি বললে মা?—সন্ধ্যে দেব বই ফেলে,
কি ব্যাপারটা হবে যে মা এবারে 'ডেস্‌ডেমোনা' এলে,
ঃ! 'ওথেলো' কী অবিশ্বাসী! পরের কথায় কান দিয়ে…
এমন ওদের ভালবাসা……'—হাতে তখন প্রদীপ নিয়ে
মেক দিয়ে রাগেন মাতা,—
　　　　'কী যে বকিস্—যা-না-তা,
ক্লিওপেট্রা', 'এ্যান্টনিও', বায়স্কোপ আর থিয়েটার!
মন্দিরকোতে বন্যা এল, অস্তিত্ব নেই কোয়েটার—'
ঠোঁট ফুলিয়ে বললে মেয়ে,—'তুমি মা তার জানবে কি,
পড়তে যদি 'টুর্গেনিভ্', ভর হ্যাগার্ডের অমর 'শী'…
এ-সব কথা বলতে না ক'। হয় ত' তখন তুমিই মেতে
সিনেমাতে থাকতে শুধু,—এখন যেমন হেঁসেলেতে।
অমুকের ত' নাচ দেখ নি, এমন তা'লে চমৎকার!
বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙ্গাতে মেনকারে মানায় হার।
অপ্সরারা ছিল শুধু সত্য যুগে—শুনেই থাক,
মহাভারত পড়লে মাত্র, চোখে ত' তা' দেখলে না ক'!
দেখেছ কি 'উদয়শঙ্কর'? কোথায় লাগে 'প্যাভ্‌লোভা'?
জ্যোৎস্নারাতে লেকের জলে নীল আকাশের নিখুঁত শোভা!
থামিয়ে তারে বলেন মাতা,—'তাই ত' এমন দশম-দশা,
সন্ধ্যা-আলো জ্বললো না ক',—হাজির আছে 'গরম চা',
ঘর-সংসার চুলোয় দিয়ে,—এখন তোরা সাজলি মেম্,
মুখে শুধু নভেল-নাটক, নাচ-গান আর প্রণয়-প্রেম!
ছিঃ ছিঃ তোরা হলি কি-যে! সত্যি আমি বলছি 'মিলি',
পরের জিনিষ আনতে গিয়ে, নিজের তা' সব বিলিয়ে দিলি।'

স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সভ্যতার উত্থান পতনে ইংরাজ জাতির ইতিহাস একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং স্যর ওয়াল্টার র‍্যালের জীবনী (১৫৫২-১৬১৮) এই কাহিনীর একটি মনোজ্ঞ অধ্যায়।



স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে, পুত্র ওয়াল্টার সমভিব্যাহারে।

[১৬০২ সনে Marcus Gheeraert- অঙ্কিত চিত্র হইতে

অতীত যুগে ইউরোপীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ভূমধ্যসাগর উপকূলে। গ্রীস ও রোম বহু শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপে যে কৃষ্টির প্রদীপ উজ্জ্বল রাখিয়াছিল, প্রাচ্যে মুসলমানদের উত্থানে ক্রমে তাহা ম্লান হয় এবং পরবর্ত্তী কালে মুসলমান সভ্যতা ইউরোপেও তাহার আধিপত্য বিস্তার করে। গ্রীক ও রোমকদের আমলে ভারতের সহিত বাণিজ্য চলিত ভূমধ্যসাগর দিয়া। পরবর্ত্তী যুগে রোমক সভ্যতার পতনের পর ইহা মুসলমানদের হস্তগত হইলেও লিভাণ্ট প্রদেশ (বর্ত্তমান ব্ল্যাক সী অঞ্চল) হইতে পণ্যাদি আমদানী করিয়া ভিনিসীয় বণিকেরা প্রচুর লাভ করিত। কিন্তু, কালক্রমে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কী কর্ত্তৃক কন্সটান্টিনোপল দখলের পর হইতে এই বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের আর কোন অধিকার রহিল না। ফলে ইউরোপে ভারতীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময়েই ভূমধ্যসাগরের অপরাংশে স্পেনীয়েরা মূরদের বিতাড়িত করিয়া স্বদেশকে বহু শতাব্দী পরে মুসলমানদের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়। ফলে একদিকে মুসলমানরা যেমন ইউরোপের একাংশ গ্রাস করে, অন্যদিকে অপরাংশ হইতে তেমনি তাহারাও বিতাড়িত হয়। স্পেনের এই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ কেবল স্বদেশকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, ভারতীয় বাণিজ্যের উত্তরাধিকারী হইবার এবং বিধর্ম্মীদের খৃষ্টান করিবার বাসনা স্পেনীয়দের মধ্যে দেখা দিল। ইহার পর ক্রমান্বয়ে স্পেন ও পর্ত্তুগালের নৌবাহিনী অতলান্তিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অবধি বিচরণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্য স্থাপন করিল। এইরূপে অগণিত অর্থ এবং অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় স্পেন ইউরোপের ঈর্ষ্যার কারণ হইল।

স্যর ওয়ালটার র‍্যালের জন্মকালে এই ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ কূপমণ্ডুক ইংলণ্ডের জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল— এবং ইংলণ্ডবাসীর একমাত্র ধ্যান ছিল কিরূপে ঐ অর্থের অংশভাগী হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে এইরূপ গৌরাবান্বিত করা যায়।

র‍্যালের জীবনে এই দুই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে ডিভনসায়ারের সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক গ্রামে র‍্যালের জন্ম হয়। কিছুদিন তিনি অক্সফোর্ডের অরিয়

কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পরে পনের বৎসর বয়সে ফরাসী দেশে নৌসেনাধ্যক্ষ কলিনীর (Coligny) অধীনে হিউয়েনট (Huguenot) প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ফরাসী সেনাদলে যোগদান করিয়া ফ্রান্সের রাজার বিরুদ্ধে কিছুকাল যুদ্ধ করেন। বোধ হয় এই সময় কলিনীর (Coligny) নিকট হইতেই সমুদ্র-পরপারে নূতন ইংলণ্ড স্থাপনের কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয়। ফ্রান্স ও পরে নেদারল্যাণ্ডে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সুনাম অর্জ্জনের পর তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্যর হাম্‌ফ্রে গিলবার্টের (Sir Humphrey Gilbert) সহিত ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে অভিযান করেন। এই অভিযানের কোন ফল হয় নাই। ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আয়ার্লণ্ডে ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন। ইংলণ্ড তখনও আয়ার্লণ্ড দখল ও শাসন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। এখানে তাঁহার অর্থলাভ হয় ও তিনি কিছু জমিজমাও করেন এবং ক্রমে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সুনজরে পড়িবার পর হইতে রাজসভার একজন প্রধান সভাসদরূপে নানা প্রকার চক্রান্ত ও দলাদলির মধ্যে লিপ্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন। স্পেনের সহিত যুদ্ধে দেশে সেনা-সংগ্রহকার্য্যে কাডিজ [(Cadiz) ১৫৯৬] ও ফেয়াল-[(Fayal) ১৫৯৭]-এর অভিযানে তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পায়। ইহার পর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখান। রাজকর্ম্ম ব্যতীত তাঁহার মনীষার বিকাশ হয় সাহিত্য এবং ইতিহাস রচনায়। বেকনের কথা মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার সমসাময়িক কোন ব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় বহুবিধ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না এবং লেখকদের মধ্যে কাহারও এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে এমন সতেজ এবং অভিনব প্রকাশভঙ্গী ছিল না। র‍্যালে হকুলাইটকে (Hakluyt) তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীগুলি লিখিতে সাহায্য করেন। নৌ-যুদ্ধ সম্বন্ধে বোধহয় তিনিই সর্ব্বপ্রথম পুস্তক-রচয়িতা। তৎকালে বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। শুধু তাহা নয়, তিনি ছিলেন মার্লো এবং স্পেনসারের কবি-বন্ধু। এবং পৃথিবীর ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে তাঁহার আজও সুনাম আছে। সত্য সত্যই তিনি একজন বিরাট পুরুষ, অসমসাহসী কর্ম্মী এবং দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। একটি বিশেষ কারণে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ইংলণ্ড আজও তাঁহার কথা স্মরণ করে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আমেরিকায় তাঁহার স্থাপিত উপনিবেশ ভার্জ্জিনিয়া ইংলণ্ডের অংশরূপে সমৃদ্ধিলাভ করিবে। এবং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেন। তাঁহার সকল প্রকার চেষ্টা বিফল হইলেও তাঁহার আদর্শ বিলুপ্ত হয় নাই এবং তাঁহার জীবদ্দশায় অপরে এই উপনিবেশ স্থাপন করে। এই আদর্শবাদই তাঁহাকে এলিজাবেথের যুগের মনীষাদের মধ্যে উচ্চাসন দিয়াছে। সেই গৌরবান্বিত যুগের লোকদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভা ছিল না বলিলেও চলে—তৎকালীন জীবনে যাহা কিছু গৌরবজনক—রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ এবং সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল।



১৫৯৫ সনের মার্চ্চ মাসে র‍্যালে ট্রিনিডাডে পৌঁছান	ড্রেকের 'ভয়েজ' হইতে

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ র‍্যালের এই প্রচেষ্টার অনুকূলে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক জন ক্যাবট-(John Cabot)-এর বিরাট অভিযানের পর হইতেই ইংলণ্ডের দৃষ্টি সমুদ্রের পরপারের দেশসমূহের উপর পড়ে এবং ইংরাজরা পূর্ব্বে উত্তর-এশিয়া এবং পশ্চিমে আমেরিকার তটভূমির সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়। স্পেন ও পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া এবং পূর্ব্ব-দেশের সহিত বাণিজ্যের আশায় তাহারা কখনও মরু-প্রদেশে, কখনও স্থল পথে মধ্য-এশিয়া বা পারস্যে, কখনও বা দক্ষিণ-আমেরিকার হর্ণ অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া স্পেনের জাহাজগুলির সহিত যুদ্ধ করিত ও জোর করিয়া স্পেনের অধিকৃত বন্দরে বাণিজ্য করিত। বিদেশী জাহাজ এবং উপনিবেশ লুটতরাজ করিয়া অর্থ-উপার্জ্জনে তাহাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ যাযাবর বৃত্তির পর পৃথিবীর অনেক দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় হইয়াছিল। এ কথা তাহারা বুঝিয়াছিল, নৌবল বৃদ্ধি হইলে সকল আশাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব—বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষা, স্পেনের গর্ব্ব খর্ব্ব করা, প্রোটেস্ট্যান্টিজমের প্রচার, নূতন দেশ আবিষ্কার, বাণিজ্যের বিস্তার, সকলই নির্ভর করে এই নৌশক্তির উপর। অবশ্য, তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অর্থ এবং জাতীয় গৌরব লাভ। অর্থ লাভ করিতে হইলে বাণিজ্যের বিস্তার, স্বর্ণপ্রসূ নূতন দেশ আবিষ্কার করা, অপরের হস্তগত বাণিজ্যের অংশ ছিনাইয়া লওয়া এবং 'ক্যাথে' (চীন) ও ভারতবর্ষে যাইবার নূতন পথ বাহির করা—এই সব যে অপরিহার্য্য, অজস্র ঐশ্বর্য্যের মোহে ইহা তাহাদের মজ্জাগত হইল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য-দ্রব্যই যে স্থায়ী ঐশ্বর্য্য অর্জ্জনের পথ, এ কথা তাহারা এই সময় হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখে। এই ধারণা স্পষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত হইবার পর হইতেই সমুদ্রের পরপারে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-স্থাপনের সূত্রপাত।

স্পেনীয়দের মত সাম্রাজ্য-বিস্তারের মোহ তাহাদের পাইয়া বসিতেছিল। কিন্তু, কাহারও মনে স্পেন রাজ্য অধিকার করিবার কথা তখনও জাগে নাই। এমন কি স্বয়ং র‍্যালে, যিনি সকল সময় স্পেনের সহিত যুদ্ধ করিতে দেশবাসীকে প্ররোচিত করিতেন, তিনিও এ কথা চিন্তা করেন নাই। সকলের ইচ্ছা, নূতন দেশ আবিষ্কার করা—এমন দেশ, যাহা খৃষ্টান রাজার অধীন নয়। এলিজাবেথের সময়ের লোকেদের নিকট পৃথিবীর বিস্তার ছিল অনন্ত, তাই স্পেনের রাজত্বে হস্তক্ষেপ না করিয়াও স্পেনের মত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন তাহাদের কল্পনায় স্থান পাইয়াছিল।

এইরূপ নানা দিকে নানা চিন্তা এবং কর্ম্মপ্রেরণার মধ্য দিয়া ক্রমে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের বাসনা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের স্বাধীন নরনারীর সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক সুবিধা, তাহাদের আইন, ভাষা এবং ভাবগত ঐক্যে ইংলণ্ডের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমেরিকার উপনিবেশে এক নূতন ইংলণ্ড গড়িয়া উঠিবে, এ ধারণা দৃঢ়তর হইল। আমেরিকায় ইংলণ্ডের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে কাহারও মনে যেন আর কোন প্রশ্ন রহিল না, ছলে বলে কৌশলে ইংলণ্ড সেখানে খৃষ্টান উপনিবেশ স্থাপন করিবে, ইহা যেন বিধিলিপি। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে গিলবার্টকে এবং ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে র‍্যালেকে প্রদত্ত সনন্দে এই মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে তাঁহার বংশধরেরা সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, এ সমস্ত কল্পনা র‍্যালেকে চঞ্চল করিত। তাই সে যুগের কাম্য বস্তু স্পেনের ঐশ্বর্য্য-লুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশ স্থাপনে তিনি তাঁহার প্রতিভা এবং অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এই যুগের বহুমুখী কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া পরবর্ত্তীকালে আমেরিকায় উপনিবেশ-স্থাপনে নিয়োজিত হয়।

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাপটেন আমাডাস (Amadas) এবং বার্লোর (Barlow) অধীনে উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী দেশ দেখিয়া আসিবার জন্য এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সে দেশের গুণাবলী বর্ণনা করিলে রাজ্ঞী এলিজাবেথ অধিকৃত দেশের নামকরণ করেন ভার্জ্জিনিয়া। এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে স্যর রিচার্ড গ্রেনভিল্-(Sir Richard Grenville)-এর অধীনে প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু, তখনও ইংরাজরা উপনিবেশ স্থাপনের

কষ্ট সহ্য করিতে শিখে নাই। সে দেশে আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণ না পাওয়ায় তাহারা হতাশ হইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ সুরু করে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে শীঘ্রই সে উপনিবেশ র‍্যালের সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া যায়। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি অভিযানও এই-রূপে বিফল হয়। এ সময়ে স্পেনের নৌ-বাহিনীর আক্রমণ আশঙ্কায় ইংলণ্ড শঙ্কিত। সকল জাহাজ দেশ-রক্ষার জন্যই প্রয়োজন, অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া সেই দুর্দ্দিনে উপনিবেশবাসীগণকে সাহায্য প্রেরণ করা অসম্ভব ছিল। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইবার পর ইংলণ্ড যখন অতলান্তিক মহাসাগরে অবাধ বিচরণের অধিকার পাইল, তখন নব-প্রতিষ্ঠিত উপ-নিবেশের অবস্থা অতি শোচ-নীয়।

ইতিমধ্যে র‍্যালে ৪০ হাজার পাউণ্ড খরচ করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হই-য়াছে। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সনন্দ একটি কোম্পা-নীকে দিলেন, কিন্তু তাহারাও ঔপনিবেশিকদেশ সহিত যোগা-যোগের বিশেষ কোন সুবিধা না করিতে পারাতে র‍্যালে নিজব্যয়ে আরও পাঁচবার ঔপনিবেশিকদের সাহায্যার্থে অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, যাত্রা করিবার পর অভিযানকারীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, পরে জানা যায়, ইণ্ডিয়ানরা তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। পরে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে যখন এই ভার্জিনিয়ায় স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপিত হয়, র‍্যালে তখন কয়েক বৎসর ধরিয়া কারাগারে!

র‍্যালে নিজে ভার্জিনিয়ায় কখনও যান নাই বটে, কিন্তু তিনি ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকার গায়না প্রদেশে অভিযান করেন। গায়না অভিযানের বিশেষত্ব এই যে,



আর্মাডিলা।   [ড্রেকের 'ভয়েজ' হইতে

এই সময় হইতে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যপথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় রাজত্ব-বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই কার্য্যে র‍্যালেই ছিলেন অগ্রণী। ক্যাবট (Cabot) প্রভৃতির ন্যায় আবিষ্কারকদের বুদ্ধির অভাব ছিল না, কিন্তু কাহারও র‍্যালের মত রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টি বা রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। ইষ্ট-ইণ্ডিজের সন্ধানে ক্যাবট (Cabot পশ্চিমে, অন্য একজন পূর্ব্বে গমন করেন। কলম্বাস এবং অন্যান্য পর্ত্তুগীজ আবিষ্কারকদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের মনে সজীব ছিল র‍্যালেও ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ-এর ইতিহাস বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যায় অধিকৃত রাজত্বগুলি স্পেনকে যে অভূতপূর্ব্ব সম্পদ এবং ক্ষমতা দিয়াছিল, তাহার উপর। এই জন্যই তিনি উপনিবেশ স্থাপন এবং রাজত্ব-বিস্তারের প্রতি তাঁহার দেশবাসীর মন আকৃষ্ট করিতে এত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্পেনের রাজত্ব-বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কালে র‍্যালে স্পেনীয় লেখক বর্ণিত দক্ষিণ-আমেরিকার 'এলডোরেডো' (El dorado)—স্থানীয় লোকমুখে ম্যানোয়া (Manoa) নামে পরিচিত—নগরীর উল্লেখ দেখিতে পান গায়নার অভ্যন্তরে অবস্থিত ম্যানোয়ায় (Manoa) এ

গায়নায় ইংরাজ অধিকার বিস্তার করিবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করায়, পেরুর মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন গায়নাকে ইংলণ্ডের অধিকারে আনিবার ইচ্ছা র‍্যালের স্বপ্নই রহিয়া গেল। রাজকার্য্যে আটকাইয়া পড়িয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব হইল না। ক্যাপ্টেন কেমিসকে (Capt. Kemys) ১৫৯৬ সনে গায়নায় পাঠাইয়া জানিতে পারিলেন, ইতিমধ্যে স্পেনীয়েরা ক্যারনি (Caroni) নদীর মুখে ঘাঁটি করিয়া গায়না প্রবেশের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার পর দু'একবার অভিযান পাঠাইয়া বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই।



স্বর্ণের সন্ধানে র‍্যালে। প্রাচীন চিত্র

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথের মৃত্যুর পর হইতে র‍্যালের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল। তাঁহার প্রবল শত্রুরা রাজপ্রাসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে টাওয়ারে বন্দী করিল এবং ইহাদের চক্রান্তে রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হইল। মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেও পরবর্ত্তী একাদশ বর্ষকাল তিনি টাওয়ারে বন্দী অবস্থায় জীবন যাপন করেন। এই সময়েই তিনি সুপ্রসিদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন।

১৬১৬ সালে রাজা জেমস্-এর অর্থের অভাব হওয়ায় র‍্যালে আবার মুক্তি পাইলেন—গায়নায় স্বর্ণের সন্ধান করিতে। এই অভিযানের ভবিষ্যৎ কার্য্য-সূচী জেমস্ র‍্যালেকে পূর্ব্বাহ্নে দিতে বাধ্য করেন এবং এই কার্য্য-সূচী তিনি শত্রুপক্ষের স্পেনীয় রাজদূত গণ্ডোমারের (Gondomar) হস্তে অর্পণ করেন। কাজেই, যাত্রার পূর্ব্বেই র‍্যালের এই অভিযানের পরিণাম কি হইবে, তাহা স্থির ছিল বলা চলে। এবার তিনি সামর্থ্যহীন অবস্থায় অকর্ম্মণ্য একদল নাবিক লইয়া সপুত্র যাত্রা সুরু করিলেন। ট্রিনিডাড (Trinidad) এবং মার্গারিটা (Margarita) দখল করিয়া গায়নায় যাত্রার প্রাক্কালে তিনি রোগগ্রস্ত হন ও ফলে তাঁহার পুত্র এবং ক্যাপ্টেন কেমিস অভিযান সুরু করেন। ক্যারোনি নদীর মুখে স্যন টমাসে (San Tomas) স্পেনীয়রা বাধা দিতে কেমিস (Kemys) সে স্থানটি ধ্বংস করিলেন। এই যুদ্ধে র‍্যালের পুত্র নিহত হন। এত করিয়াও কিন্তু কোন ফল হইল না, কারণ স্পেনীয়রা নদী-তীরবর্ত্তী জঙ্গল দখল করিয়াছিল। অবশেষে এই দুঃসংবাদ লইয়া কেমিস্ ফিরিয়া আসিলেন। স্পেনের কোন ক্ষতি করিলে জেমস্ তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দিবেন, এ কথা স্মরণ করিয়া কেমিস্‌কে ভর্ৎসনা করিলে তিনি আত্মহত্যা করিয়া র‍্যালের বিপদ আরও ঘনীভূত করিয়া দিলেন। তখন হইতে তাঁহার দল তাঁহার শাসন মানিতে অস্বীকার করিল। তাহারা আর খনির সন্ধান করিতে চাহিল না। ফলে র‍্যালে রিক্ত হস্তে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপ অপদার্থ দলের সাহায্যে গায়নার মত বিপদসঙ্কুল পথে স্বর্ণ-খনির সন্ধান করা, বিশেষতঃ যখন বিফল হইলে মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত, সাধারণের নিকট পাগলামীর লক্ষণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু, র‍্যালের নিকট ইহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হইয়াছিল। বাস্তবিক, বৃহৎ কার্য্য কোন দিন সম্পন্ন হয় না, মন যদি এই পাগলামীর প্রশ্রয় না

দেয়—যদি কল্পনায় অসম্ভবকে সম্ভব না করা যায়। জেম্‌স্‌ এই অভিযানে অনুমতি দিয়া, স্পেনীয়দের কাছে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেন এবং পরে স্পেনের অনুরোধে পূর্ব্ব অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

এইরূপে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে র‍্যালের জীবন-নাট্যের যবনিকা পড়ে। এবং স্পেনের এক আজন্ম শত্রুর মৃত্যু হয়।

জীবনের দুইটি বৃহৎ প্রচেষ্টায় র‍্যালে বিফল হন। কিন্তু, তাঁহার প্রচেষ্টার সারবত্তা অচিরেই প্রমাণিত হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি ভার্জ্জিনিয়ায় স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপনা দেখিয়া যান। গায়না সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া ডাচ্‌রা গায়নায় উপনিবেশ স্থাপন করে এবং এখানে স্বর্ণখনি না পাইলেও বাণিজ্যে প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে। ক্রমে অবশ্য এই গায়নার এক খণ্ডাংশ ডাচদের নিকট হইতে ইংরাজদের অধিকারে আসে। র‍্যালের চিরদিনের সাধ স্পেনের ক্ষমতা খর্ব্ব করা হয়— স্পেনের সহিত যুদ্ধে নয়, রাজত্ব দখল করিয়াও নয়, নৌ-শক্তির বৃদ্ধি এবং উপনিবেশ-গুলির সমৃদ্ধিতে। এই দুইটি নীতিই ইংলণ্ডকে গ্রহণ করাইবার জন্য র‍্যালে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর।

র‍্যালের কীর্ত্তি-কথা এবং এলিজাবেথের যুগের গৌরব-বর্ণনায় ইতিহাস পঞ্চমুখ, কিন্তু এই উপনিবেশ স্থাপন হইতেই যে কলঙ্ক স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডের জীবনে প্রবেশ করে, তাহার আজও নিরপেক্ষ বিচার হয় নাই। ইতিহাস এলিজাবেথের যুগকে পরম গৌরবময় কাল বলিয়া বর্ণনা করিলেও "মানবধর্ম্মে"র দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ জাগে। আমেরিকার সমৃদ্ধি এবং আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর প্রতি অত্যাচারের বিচার নীতিগত তুলাদণ্ডে কোথায় দাঁড়াইবে? মনে হয়, উপনিবেশ স্থাপনের মূলে যে অর্থ ও জাতীয় গৌরবের উন্মাদনা দেখি, তাহা অভাবগ্রস্ত, অন্তর-ঐশ্বর্য্য-রিক্ত জাতির লক্ষণ। এলিজাবেথের ইংলণ্ড তাহার আপন ঐশ্বর্য্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। পরস্ব অপহরণের লোভ, প্রভুত্ব করিবার মাদকতা তাহার রক্ত মাংসে সঞ্চারিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই, এ কথা কিরূপে বলা যায়! জাতির প্রকৃত গৌরব বিচার করিবার মান-দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইলে ইংলণ্ডের এই যুগ সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বেলের মোরব্বা

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

মরি মরি কি সুন্দর রচিয়াছ তুমি কাঁচা বেলে
অপরূপ মোরব্বা মোহিনী—মনে প'ড়ে গেল মোর
প্রভাতে সন্ধ্যায় কত দরিদ্রের ছোট ছোট ছেলে
শালপাতে খায় বসি' মোরব্বার তরলিত ঝোল
দোকানের পাশে বসি'। প্রাণ ভরি' যে মোরব্বা খেলে
জীবন বাঁচিয়া যায়—সে মোরব্বা করিনু উজোড়
হেথা বসি'। ইচ্ছা হয়, যদি দিতে আরো কিছু পেলে
খাইতাম—অপরূপ, দূরে যায় নয়নের ঘোর।

অপূর্ব্ব স্বর্ণাভ কান্তি ছিদ্রে ছিদ্রে ঝরিতেছে রস
মনে হয় বাজিতেছে কোটি কল্প যুগান্তের বেণু,
শিল্পী তুমি ভগ্নী মোর—রচিয়াছে ও কর-পরশ
শ্যামস্নিগ্ধ বিল্ব হ'তে সুধা ক্ষরে মিষ্ট রেণু রেণু—
অমৃত আস্বাদ তা'র—তুমি যেন সুজাতার মত
'মার'-খিন্ন বুদ্ধ-আত্মা তৃপ্ত কর জীবনে সতত!

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের গল্পভাগ)

জোড়াদীঘির চৌধুরীরা প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ; নবাবী আমলে তাহাদের জমিদারির পত্তন। আমরা অষ্টাদশ শতকের শেষ-ভাগের কথা বলিতেছি। ইহা প্রধানতঃ পিতামহ উদয়নারায়ণ ও পৌত্র দর্পনারায়ণের কাহিনী। দর্পনারায়ণের বাল্যকালে গ্রামে একটি মূক-বধির বালকের আগমন হয়। গ্রামের লোকে তাহাকে পছন্দ করিত না, কিন্তু বিরক্ত করিতেও সাহস করিত না, সে ছিল দর্পনারায়ণের আশ্রিত। বালকটির নাম আব্বর, তাহার সঙ্গী ছিল একটি একপা-ওয়ালা দাঁড়কাক।

স্বরূপ সর্দ্দার ছিল চৌধুরী-বাড়ীর সর্দ্দার, তাহার বাহুবলে ও উদয়নারায়ণের বুদ্ধিবলে চৌধুরীদের জমিদারি অনেক বাড়িয়াছিল। স্বরূপ সর্দ্দার পলাশীতে মোহনলালের অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল, পলাশীর যুদ্ধের পরে মীরকাশিমের সৈন্যদলে কিছুদিন কাজ করিয়াছিল। তারপর হইতে সে চৌধুরী-বাড়ীর সর্দ্দার।

এই স্বরূপ সর্দ্দার দর্পনারায়ণ ও তাহার দুই জ্ঞাতিভ্রাতাকে লাঠি, তলোয়ার, শড়কি খেলা শিখাইত; পলাশীর যুদ্ধের গল্প বলিত। দর্পনারায়ণ পলাশী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বরূপ একদিন তাহাকে লইয়া যাইবে বলিয়া সান্ত্বনা দিত। তিন জমিদার-পুত্র শরৎ পণ্ডিতের নিকটে শুভঙ্করী ও বাণীবিজয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িত।

দর্পনারায়ণের বয়স আঠার-উনিশ হইলে উদয়নারায়ণ নিকটস্থ রক্তদহের জমিদার-কন্যা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। ইন্দ্রাণীর পিতা-মাতা নাই, সম্পত্তির মালিক সে নিজে। কাজেই, তাহাকে বিবাহ করিলে রক্তদহের জমিদারি জোড়াদীঘির সহিত যুক্ত হইবে—এই চিন্তা উদয়নারায়ণকে খুসী করিয়া তুলিল। ইন্দ্রাণী কুলীন-কন্যা—বয়স ষোল-সতের হইবে।

বিবাহ অগ্রহায়ণে স্থির, এমন সময়ে স্বরূপ সর্দ্দারের মৃত্যু হইল। দর্পনারায়ণ তাহার অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য নৌবাহিনী সাজাইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল। মুর্শিদাবাদে শাস্ত্রীয় কৃত্য শেষ করিয়া পলাশীর মাঠে বেড়াইতে গেল। সেখানে রাত্রি বেলায় এক জমিদার-পুত্রের তাঁবু হইতে বনমালা নামে একটি মেয়েকে রক্ষা করিল। মেয়েটির বাড়ী নিকটস্থ পলাশী গ্রামে। মেয়েটি সুন্দরী। দর্পনারায়ণ তাহাকে নৌকায় করিয়া ফিরিতেছিল। সকালের দিকে বনমালার নিদ্রা ভাঙ্গিলে দর্পনারায়ণ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। বনমালা হাসিয়া নাম বলিল।

পলাশী

[১৫]

বনমালা হাসিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল; একে একে গত রাত্রির সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। নিদারুণ দুঃখের অভিজ্ঞতার প্রকৃতিই এই যে, মানুষের মনকে তাহা এমন অসাড় করিয়া দেয় যে, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে কিছু সময় লাগে। দারুণতম দুঃখের ঠিক পর মুহূর্ত্তেই হয় ত হাসি পায়, কিন্তু যতই সময় যাইতে থাকে, হাসি ততই ম্লান হইয়া আসে। বনমালা সেই যে মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল, দর্পনারায়ণ তাহাকে দিয়া কিছুতেই কথা বলাইতে পারিল না। সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু এই মলিন মূর্ত্তি তাহার মন্দ লাগিতেছিল না। যে-হীরকখণ্ড রৌদ্রে ঝলমল করিতে থাকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি তাহাকে এমনই দেখায়—উজ্জ্বল নয়, ঈষৎ মলিন, তাই বলিয়া কম সুন্দর নয়। সুন্দর পদার্থ সর্ব্ব অবস্থাতেই মনোহর।

অনেকক্ষণ সাধাসাধির পর দর্পনারায়ণ জানিতে পারিল, বনমালার বাড়ী নিকটস্থ পলাশী গ্রামে—সেখানে গেলেই সকল বিষয় জানা যাইবে। দর্পনারায়ণ তিনখানা বজরা পলাশী গ্রামের ঘাটে লাগাইতে আলিবর্দ্দীকে হুকুম করিল। বজরা পলাশীর ঘাটে ভিড়িলে আলিবর্দ্দী ও বাণী-বিজয়কে সঙ্গে দিয়া দর্পনারায়ণ বনমালাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বনমালা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে তাহার বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল; সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধকে শান্ত করিয়া বসাইয়া তাহার মুখ হইতে সে সমস্ত কাহিনী অবগত হইল।

বৃদ্ধের নাম রামকান্ত রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, অবস্থা

দরিদ্র, নিবাস পলাশী গ্রামে। সংসারে তাহার একমাত্র সন্তান ঐ বনমালা; দরিদ্র বলিয়া এবং কুলীন বলিয়াও বটে, বয়স্থা হইলেও তাহাকে বিবাহ দিতে পারে নাই। গতকল্য বনমালা গঙ্গায় জল আনিতে গিয়াছিল, আর ফেরে নাই। ব্রাহ্মণ নানাস্থানে সন্ধান করিয়াছে, আজ দর্পনারায়ণের কৃপায় তাহাকে ফিরিয়া পাইল। তখন দর্পনারায়ণ যতটুকু জানিত ও যাহা দেখিয়াছে, সব খুলিয়া বলিল; ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিল, আপনার কন্যা নিষ্কলঙ্কা, যদি সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, বলিবেন, আমি সাক্ষ্য দিব। তারপরে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কন্যার বিবাহের কি করিতেছেন? ব্রাহ্মণ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না—দর্পনারায়ণ কি বলিবে বোধ হয় আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বলিল—আমি তাহাকে বিবাহ করিব। জোড়াদীঘির চৌধুরীদের নাম সে অঞ্চলে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, ব্রাহ্মণ তাহার প্রস্তাব শুনিয়া পুনর্ব্বার কাঁদিয়া উঠিল। দর্পনারায়ণ তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

দর্পনারায়ণের প্রস্তাব যখন অনুচরদের মার্ফৎ বজরায় রাষ্ট্র হইল, তখন শরৎ পণ্ডিত ও বাণীবিজয় দাবাখেলায় মগ্ন। আসন্ন কিস্তির আশঙ্কায় বাণীবিজয় চিন্তিত ও শরৎ পণ্ডিত উল্লসিত, এমন সময়ে বিবাহের কথা শুনিয়া দুই পক্ষই সমান চিন্তিত হইয়া উঠিল। শরৎ পণ্ডিত পিলচক্র ছাড়িয়া অদৃষ্টচক্রের কথা স্মরণ করিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—মসৃণ টাকের উপরে কি একটা জিনিষ যেন খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—ঠাকুর, বুড়ো বয়সে গঙ্গাস্নান করতে এসে কি ফেরেই না পড়লাম। বাণীবিজয়ও কম বিস্মিত হয় নাই, সে বলিল—আর একটা বছর টোলে থাকতে পারলেই আমার কাব্য শেষ হত, কিন্তু বুঝি আর তা হয় না। বাণীবিজয়ের স্বার্থপরতায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরৎ পণ্ডিত বলিল—তোমার কি ভায়া! গ্রাম ছাড়লেই তোমার মিটল, আমার যে না মলে নিস্তার নেই।

বাণীবিজয় মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল—দাদাবাবু যদি বিয়ে করে, আমাদের কি দোষ? "কি দোষ!" শরৎ পণ্ডিত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কর্ত্তা দাদাবাবুকে আর কি বাঁচবে! দু'দশ দিন না হয় দু'বছর পথ দেখাদেখি বন্ধ হবে! কিন্তু, তাকে যে শাস্তিটা দিতে পারল না, সেটা পড়বে আমাদের ঘাড়ে! এই পর্য্যন্ত বলিয়া গলার স্বর কিছু মৃদু করিয়া বলিল—আর তাও বলি, দাদাবাবুর কাজটা ভাল হচ্ছে না। অত বড় জমিদারের মেয়ে, সব ঠিকঠাক্, ফিরে গিয়েই অঘ্রাণে বিয়ে—এর মধ্যে এ কি কাণ্ড! আবার কিছুক্ষণ থামিয়া আরম্ভ করিল—এ কোথাকার কে? কুল নাই, শীল নাই, যাকে তাকে বিয়ে করলেই হ'ল! বাণীবিজয় বলিল—কিন্তু মেয়েটি সুন্দরী। এই কথাতে পণ্ডিত অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। পণ্ডিতের স্ত্রী অত্যন্ত বিসদৃশ কুৎসিত; কেহ কোন মেয়ের রূপের উল্লেখ করিলে পণ্ডিত ভাবে তাহার স্ত্রীকে বিদ্রূপ করা হইতেছে—কাজেই এ বার এই পত্নীব্রত স্বামীর মুখ খুলিয়া গেল—রং ফর্সা হলেই সুন্দর হয় না; নাক মুখ চোখের গড়ন দিয়ে কি মানুষ বোঝা যায়! মানুষ হয় মনে, মানুষ হয় ধনে! কি আছে ওই মেয়েটার? আর কিই বা শ্রী। মাথা গিয়ে ঠেকেছে সেই আকাশে। মেয়েমানুষ কি অত ঢ্যাঙ্গা হলে চলে—না বাপু, অকালে গঙ্গা স্নান করতে এসেই মারা গেলাম। বাণীবিজয় তাহাকে লইয়া কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে বলিল—বুড়ো বয়সে কতটা পুণ্য হ'ল, সে খোঁজ রাখ? পণ্ডিত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না যে, বাণীবিজয় অন্য গ্রামের লোক, ইচ্ছা করিলেই জোড়াদীঘি ত্যাগ করিতে পারে। তাই সে আপন মনে যেন বকিয়া যাইতে লাগিল—তোমার কি ভায়া, গ্রাম ছাড়লেই তুমি পর, তোমাকে আর কে কি বলবে। আমাকে যে চাল কেটে গাঁ থেকে তুলে দেবে। বাণীবিজয় বলিল—তা করলে নেহাৎ অনুচিত হবে না; দাদবাবুকে তুমি কি শিক্ষাই দিয়েছিলে! শরৎ পণ্ডিত দেখিল, যুক্তির বেড়াজাল চারিদিকে ঘিরিয়া আসিতেছে—কাজেই নিজেকে বাঁচাইবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিল—আরে আমি শিখিয়েছি ধারাপাত, শুভঙ্করী, নামতা, তাতে কি পীরিতের কথা আছে না কি? পড় নি তুমি? বাণী আগ্রহসরকারে বলিল—পড়েছি বুলেই তো শিখেছি!

"কি শিখেছ?"

"পীরিত করতে।"

পণ্ডিত দেখিল ক্রমে তাহার পরাজয় ঘটিতেছে—পাল্টা আক্রমণ না করিলে সুনিশ্চিত পরাজয়, কাজেই তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিল—"ও সব তোমার দোষ,—তোমার ওই সংস্কৃত কাব্যের। ছিঃ ছিঃ, ওই সব পড়ে, না পড়ায়? পড়েছিলাম বটে খানিক— (পণ্ডিতের সংস্কৃতপাঠ চাণক্য শ্লোক পর্য্যন্ত)—কিন্তু ওই সব কাণ্ড দেখেই আর এগোই নি।" (ইচ্ছায় নয়, শক্তির অভাবে) বাণীবিজয় বলিল—"দেখ পণ্ডিত, আমাদের কাব্যে ও সব কাণ্ড আছে বটে, কিন্তু ও সব করত কারা, বড় বড় রাজা মহারাজারা; যেমন বীর দুষ্যন্ত। তুমি কি বল দাদাবাবু দুষ্যন্তের আদর্শ গ্রহণ না করে' তোমার আমার করবেন! বড় লোক বড় লোকের মত হবে।" "আর ছোট লোক তোমরা গোল্লায় যাও, চাল কেটে গাঁ থেকে উঠিয়ে দিক্" —এই বলিয়া শরৎ পণ্ডিত লাফাইয়া আসন পরিত্যাগ করিল এবং বাহিরে যাইবার সময় বলিতে লাগিল—"তোমার কি দাদা—ভিন গায়ের লোক, গাঁ ছাড়লেই পর —আমার একেবারে সর্ব্বনাশ।"

এইরূপ আলোচনা ও বিতর্ক কেবল যে ইহাদের মাঝে হইতেছিল, তাহা নহে। দর্পনারায়ণের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; পাচক, ঠাকুর, পাইক-পেয়াদা সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; সমব্যথায় ব্যথিত বলিয়া সবাই একত্র হইয়া পরামর্শ করিল। অনেকক্ষণ আলোচনার পরে স্থির হইল—এই আসন্ন বিপদ হইতে কেহ যদি উদ্ধার করিতে পারে, তবে সে আলিবর্দ্দী সর্দ্দার। একবার সর্দ্দারকে গিয়া ধরিতে হইবে। সকলে সর্দ্দারের কাছে যাইবে, এমন সময়ে হাসিমুখে আলিবর্দ্দী নিজেই আসিল। বলিল—"যাক্ সব মিটে গেল।" সকলে ভাবিল, দর্পনারায়ণের সুবুদ্ধি হইয়াছে। এমন সময়ে সর্দ্দার বাণীবিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ঠাকুরমশাই—বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, বামুন হয়ে জন্মাইনি—নইলে এ বিয়েতে পুরুতগিরি নিশ্চয় পেতাম।" কথাটা এমন গুরুতর বিপদের আভাসে পূর্ণ যে, বাণীবিজয় প্রথমবার শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিতেই পারিল না; সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তখন সর্দ্দার কথাটা সকলের বোধগম্য ভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিল—"দাদাবাবুর সঙ্গে রামকান্ত রায়ের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে; এখানে আর পুরুত কই? সেই নিয়েই একটু মুস্কিল বেধেছিল; আমি বল্লুম, কেন—বাণীবিজয় ঠাকুর আছে, টোলে পড়া পণ্ডিত; দাদাবাবু শুনে বললেন—ঠিক হয়েছে, বাণীবিজয় বিয়ে দেবে। কেমন ঠাকুর, সংবাদটা শুভ কি না?" যে-সংবাদে লোকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়, চক্ষু উর্দ্ধে উঠে, নাসা বিস্ফারিত হইতে থাকে, তাহাকে কেমন করিয়া শুভসংবাদ বলা যায়! একমুহূর্ত্ত এই ভাবে থাকিয়া বাণীবিজয় গোঁ গোঁ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কেহ তাহার মাথায় জল দিতে, কেহ বাতাস দিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু বাণীবিজয়ের মূর্চ্ছা-ভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, কেবল শরৎ পণ্ডিতের মুখে একটা চাপা হাসির রেখা দেখা গেল। তাহার মনে হইল, ভগবান্ আছেন। নতুবা যে বাণীবিজয় এতক্ষণ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছে, তাহার উপরেই দণ্ডের খড়্গাঘাত এমন করিয়া আসিয়া পড়িবে কেন? সে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে বলিল—"কোন ভয় নেই, এখন এ মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে না, এ যে নারায়ণের কপট নিদ্রা!" তারপরে সে যেন নিজের মনেই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল—"এইবার বোঝ বাপধন! পুরুতগিরি না করলে মারবে নাতি, করলে মারবে কর্ত্তা! এখন কোন্ দিকে যাবে যাও! গ্রাম ছেড়ে গেলেও তেড়ে মারবে! এ বাবা ভীমরুলের রাগ, সাত তাল জলের মধ্যে গিয়ে কামড়াবে।"

[১৬]

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়া গেল, এমন কি বাণী-বিজয়ের মূর্চ্ছাও বাধা জন্মাইতে পারিল না। দর্পনারায়ণ মূর্চ্ছার কথা শুনিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জল দিতে বলিল, পৌষের গঙ্গার জল মাথায় পড়িতেই বাণীবিজয় লাফাইয়া উঠিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া দর্পনারায়ণের কাছে লইয়া গেল, দর্পনারায়ণ বলিল, বিবাহ দিতে হইবে। আপত্তির প্রথম কথা তাহার মুখে বাহির হইতেই দর্পনারায়ণ হুকুম দিল, পণ্ডিতকে নদীতে ফেলিয়া দাও। কাজেই তাহাকে রাজী হইতে হইল। সে বাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "পণ্ডিত তুমি আনন্দিত হও নাই?" বাণী

স্বীকার করিল হইয়াছে; সে আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে বিবাহের মন্ত্র পড়াইল।

এই বিবাহে দর্পনারায়ণের জীবনে কত বড় একটা গ্রন্থি পড়িয়া গেল, সে কি বুঝিতে পারিল? এই পলাশীর মাঠেই ইংরাজে বাঙ্গালীতে যেদিন পলাশীর যুদ্ধ নামে রাজনৈতিক হা-ডুডু খেলা হইয়াছিল, তাহার ফল যে কি হইবে, সে দিন কি কেহ বুঝিতে পারিয়াছিল? এমনই হয়। ছোট জিনিষ কাছে প্রকাণ্ড দেখায়, যতই দূরে যায় তাহার আকার ছোট হইয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়; বড় জিনিষের বৃহত্ত্ব নিকট হইতে উপলব্ধি হয় না, দূরে যাইতে যাইতে বড় হইয়া দেখা দেয়, ক্রমে তাহা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। নিকটে দাঁড়াইলে হিমালয় শিলা-স্তূপ মাত্র—দূর হইতে পৃথিবীর মানদণ্ড; পলাশীর যুদ্ধ সে-দিন ছিল সিরাজের দণ্ড—আজ ভারতবর্ষ সেই দণ্ডে দণ্ডিতা। দর্পনারায়ণের বিবাহকে যুবকের খেয়াল বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই ঘটনায় গল্পের মোড় ফিরিয়া গেল।

এই বিবাহের শানাইএর করুণ সুরে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের একটা পর্ব্বের সমাপ্তির আভাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কে শুনিয়াছিল! তখন কেহ শুনিতে পায় নাই—আজ আমরা শুনিতেছি! তখন শোনা যায় নাই বলিয়াই আজ শুনিতেছি, কারণ এ সঙ্গীত মহাসঙ্গীত!

রোরুদ্যমানা নববধূকে লইয়া দর্পনারায়ণের নৌ-বহর স্বদেশে যাত্রা করিল। প্রথমে গঙ্গা ধরিয়া উজানে, তারপরে পদ্মার স্রোতের টানে ভাটিতে। গঙ্গা অতিক্রম করিতে কিছু বিলম্ব হইল বটে, কিন্তু পদ্মায় পড়িতেই নৌ-বহর নক্ষত্রপুঞ্জের মত ছুটিয়া চলিল। চারঘাটের নিকটে বড়ল নদীর মুখে নৌকা বাঁধা হইল, রন্ধন হইল, আহারাদি সমাপ্ত হইল, নৌ-বহর পুনরায় যাত্রা করিল। সেদিনের বড়ল নদী পদ্মার যোগ্য সহচরী ছিল, পদ্মার উদ্দাম স্রোত তাহার নাড়ীতে প্রবাহিত হইত; বাংলার প্রান্তরে পদ্মার কালীমূর্ত্তি যে শতাধিক ডাকিনী নদী-সহচরী সহ নৃত্য করিত—বড়ল ছিল তাহাদের অন্যতম। আজিকার বড়ল সেদিনের নৌবাহ্য নদীর প্যারডি মাত্র; তাহার আজিকার কলধ্বনি সেদিনের রুদ্রসঙ্গীতের ব্যঙ্গধ্বনির মত শ্রুত হয়। আজিকার বড়ল দেখিয়া সেদিনের নদীকে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিও না, ভুল করিবে।

যতই জোড়াদীঘির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দর্পনারায়ণের মনে ততই কেমন যেন ভয় করিতে আরম্ভ করিল। উদয়নারায়ণের বিরাট মূর্ত্তি আকাশের প্রান্ত হইতে কালবৈশাখীর মুষ্টিমেয় মেঘের মত দেখা দিল, ক্রমেই সে মেঘ প্রলয়ের আকৃতি ধারণ করিতে থাকিল—ক্রমে সমগ্র আকাশ তাহার করাল ছায়ায় যেন অন্ধকার হইয়া গেল। প্রথমে দর্পনারায়ণের মুখের হাসি মিলাইল; তারপরে মুখ গম্ভীর হইল; অবশেষে মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হইল। শরৎ পণ্ডিত নৌকায় উঠিয়া পর্য্যন্ত হুঁকার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ করে নাই; বাণীবিজয় সমস্ত পথ আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়াছে।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা নৌবহর আসিয়া জোড়া-দীঘির ঘাটে পৌঁছিল। আগে সংবাদ পায় নাই বলিয়া অভ্যর্থনার জন্য কেহ আসে নাই। দর্পনারায়ণ একাকী হইলে সোজা চলিয়া যাইত, কিন্তু নববধূকে এমনই তো লওয়া যায় না। আগে সংবাদ দেওয়া দরকার। কিন্তু, কে এই দুঃসাহসিক কাজের ভার লইবে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাণীবিজয় যাচিয়া এই সংবাদ দিবার ভার লইল। দর্পনারায়ণের অনুমতি লইয়া সে আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে পোটলা-পুটলী লইয়া দ্রুত পদে নৌকা ত্যাগ করিল।

বাণীবিজয় অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল যে, যত শীঘ্র দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করা যায়, ততই ভাল। কাজেই সে এই উপলক্ষ্য করিয়া নৌকা হইতে বিদায় লইল, কিন্তু চৌধুরী-বাড়ীর দিকে না গিয়া সদর পথ ছাড়িয়া সোজা টোলের দিকে যাত্রা করিল। সকলে কিছুক্ষণ বাণী-বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করিল—না ফিরিল সে, না আসিল অন্য লোক।

দুঃসংবাদ কেহই দিল না—তবু যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিল। উদয়নারায়ণ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন। সংবাদ অনুমান করিয়া লইয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"এই কে আছিস, দেউড়ী বন্ধ করে দে।" কিন্তু দেউড়ী কে বন্ধ করিবে? সকলেই উদয়নারায়ণকে

ভয় করে, তবু দর্পনারায়ণের পথ রুদ্ধ করিয়া দেউড়ী বন্ধ করিবার সাহস কাহারও নাই। দেউড়ী বন্ধ হইল না দেখিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া পড়িলেন; দেউড়ীর কাছে গিয়া দেখিলেন, লোকজন কেহ নাই, তখন বৃদ্ধ স্বয়ং ভীমের বুকের পাটার মত সেই বিশাল ফটক ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিলেন—অর্গল রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধ হইলে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। পাশের কক্ষ হইতে বৃদ্ধের খাস-খানসামা লক্ষ্য করিল—বৃদ্ধ হাঁপাইতেছেন।

এই খবর দর্পনারায়ণের কাণে গেল। দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দীকে বজরা খুলিয়া দিতে বলিল। আলিবর্দ্দী বলিল,—"দাদাবাবু, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি দেউড়ী ভাঙব।" দর্পনারায়ণ বলিল—"তার দরকার নেই। বরঞ্চ আমার বজরা খুলে দে। আর তুই যদি চাস তো সঙ্গে আসতে পারিস, আর কারো যাবার প্রয়োজন নেই।" উপায়ও ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে অন্য নৌকায় সকলে যে যাহার মত সরিয়া পড়িয়াছে। আলিবর্দ্দী বৃথা ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বজরায় উঠিয়া মাঝিদের নৌকা খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দর্পনারায়ণের বজরা স্রোতের টানে আপন মনে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই যেন ভাসিয়া চলিল।

দর্পনারায়ণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া শুনিতে পাইল—প্রথম প্রহরের শিয়াল ডাকিয়া উঠিল; প্রথমে অতি নিকটে, নদীপারের ঝাউঝাড়ের মধ্যে, তার পরে আরও একটু দূরে আমবাগানের মধ্যে, তারপরে আরও দূরে, ক্রমে গ্রাম-গ্রামান্তরের সম্মিলিত শিবাধ্বনি দিগন্ত ব্যাপিয়া যেন শব্দের বেড়াজাল নিক্ষেপ করিল। শিবারব থামিয়া যাইতে নদীর কলধ্বনি শ্রুত হইল; দর্পনারায়ণ অনুভব করিল, স্রোতের বেগে নৌকার পাটাতন কাঁপিতেছে, দুলিতেছে, টলমল করিতেছে। দর্পনারায়ণ শুনিতে লাগিল, দূরে ঢেঁকিতে ধান কুটিবার শব্দ; বেনে-বৌর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ, হুতুমের ঘুৎকার, আর ক্বচিৎ বিলম্বিত নৌকার শঙ্কিত দাঁড় ফেলিবার ধ্বনি। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল; বিনা সম্ভাষণে, বিনা অভ্যর্থনায় মাতৃহীন দর্পনারায়ণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া নববধূ সহ গভীরতর রাত্রির দিকে ভাসিয়া চলিল।

[১]

সেদিন সকাল বেলা রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর একটি কক্ষে দুই জন ব্যক্তি কথা বলিতেছিল। একজন বৃদ্ধ; সে তক্তপোষের উপরে বসিয়া ছিল, আর একজন কিশোরী, সে বৃদ্ধের ঠিক পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল। বৃদ্ধ সম্মুখের দেয়ালের একটা বিশেষ ভগ্ন চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু দুলিতে দুলিতে বলিতেছিল—"ভালই হয়েছে মা! ভগবান রক্ষা করে দিয়েছেন। আমি বুড়োকে জানি কি না!"

কিশোরী এবার একটু আপত্তি করিল—"না, না, তাঁর দোষ কি?"

বৃদ্ধ তাহার কথা শেষ না হইতেই আরম্ভ করিল—"তাঁর দোষ কি! তা বটে, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি জানবে কি করে'! আমি ওর তিন পুরুষের ইতিহাস জানি! আমার অজানা কিছু নেই! আমাদের চিনিডাঙ্গার বিলটার জন্যে ওর কি আজ থেকে লোভ! কতবার কত রকম চেষ্টা করেছে। ওর পক্ষে ছিল সেই দুষমন, বেটা মরেছে, সেই স্বরূপ সর্দ্দার, যেটা কতবার লাঠিয়াল নিয়ে পড়ে জবর-দখলের চেষ্টা করেছে। নেহাৎ পড়েছিল আমার পাল্লায়, পেরে ওঠেনি।"—ডান পায়ের তলদেশে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ এই সব পুরাতন ইতিহাস বলিতেছিল; শরীর অগ্র-পশ্চাতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে—আর চক্ষু সেই ভগ্নচিহ্নটার প্রতি নিবদ্ধ!

—"আর আমাদের ধূলো উড়ির কুঠিটার কথা তো জান! জান না, আচ্ছা তবে শোন।"—কিশোরীর উত্তরটা নিজেই ভাবিয়া লইয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"তখন তোমার বাবা ছিলেন বেঁচে। বুড়ো প্রস্তাব পাঠালে কুঠিটা কিনতে চায়। আমরা রাজী হলাম না দেখে বুড়োর সে কি রাগ! সেবার পৌষমাসে লাট দাখিল করতে আমি গিয়েছি সদরে, এর মধ্যে বুড়ো করেছে কি (বৃদ্ধের দৃষ্টি যেন ওই ভগ্ন চিহ্নটা হইতে পরিবারের এই ভগ্ন ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিল) লোকজন নিয়ে গিয়ে পড়েছে কুঠির উপরে! বুঝলে মা, সেবার লাঠালাঠি করে আমাদের

পাঁচ হাজার টাকা বের হয়ে গেল!" এই বলিয়া বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—"এবারে বুড়ো ভেবে ভেবে আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছিল, এবার আর লাঠালাঠি নয়, মামলা মোকদ্দমা নয়, বিনা পরিশ্রমে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা! আর অর্দ্ধেক-ই বা কেন? পুরো রাজত্ব নেবার মতলব বের করেছিল। নাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জোড়াদীঘি আর রক্তদ' একাকার করে নেবে! বুড়োর আগ্রহ দেখে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ একটু থামিল, তারপরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কষ্ট পেয়েছ মা"!

কিশোরী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"কষ্ট পাব কেন?" বৃদ্ধ যেন এই উত্তরই আশা করিতেছিল, কাজেই বলিয়া উঠিল—"আমিও তাই বলি, কষ্ট পাবে কেন? নসরৎপুরের লাহিড়ীদের ছোট ছেলের জন্য কতদিন ধরে ওরা সাধাসাধি করছে, বুড়োর জন্যেই তাদের কথা দিতে পারিনি!"

কিশোরী ইহার কোন উত্তর দিল না। কিন্তু, হঠাৎ মুখ তুলিতেই তাহার দৃষ্টি সম্মুখের আরশিতে গিয়া পড়িল; কিশোরী নিজেকে যেন চিনিতে পারিয়া চমকিয়া উঠিল! এ কি! একরাত্রিতে মানুষের এমন পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হয়! কাল সন্ধ্যাবেলাতে সে দর্পনারায়ণের বিবাহ-সংবাদ পাইয়াছে; সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই সত্য; কিন্তু এমন যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ত' সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কাশ্মীরের উপত্যকায় বসন্তের প্রারম্ভে জাফরাণের ফুল ফুটিয়া ওঠে; রাত্রিবেলায় প্রকৃতির কি খেয়াল হয়, তুষার পড়ে; ভোরবেলা ক্ষেতের মালিকরা জাগিয়া দেখে শুভ্র তুষার-প্রলেপে পুষ্পিত ক্ষেত মুহ্যমান। কিশোরীর লাবণ্য-মুকুলিত মুখশ্রীতে এক রাত্রির মধ্যে সেইরূপ দুঃসংবাদের তুষার-পাত ঘটিয়াছে। কিশোরী চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কোনরূপ শব্দে বা ভাবে তাহা প্রকাশ করিল না।

বৃদ্ধ তখনও বলিয়া চলিয়াছে—"বুঝলে মা, এই যে বিয়েটা করলে নিশ্চয় খুব মোটা হাতে মেরেছে। নইলে বুড়ো অমনি একমাত্র নাতির বিয়ে দেয় নি!"

বিবাহের সংবাদ ইন্দ্রাণী ও তাহার দেওয়ান-জ্যেঠা শুনিয়াছে বটে, কিন্তু কোথাকার মেয়ে, কি নাম, কেমন দেখতে, কত টাকা পাইল, কিছুই শোনে নাই। তবে উভয়েই অনুমান করিয়া লইয়াছে, ভাল রকম না পাইলে বিবাহ অমনি হয় নাই।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"আমাদের চেয়ে জমিদারি অনেক বড় আছে, টাকা-ওয়ালা লোকও কম নেই, কিন্তু আমার মার মত সুন্দরী ত' চোখে পড়েনি। সে বিষয়ে বুড়ো জিততে পারে নি।"

দেওয়ান ইন্দ্রাণীর রূপের প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যদি তাহাকে দেখিত, তবে চমকিয়া উঠিত। ইন্দ্রাণীর মুখ এতই বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধ উঠিল, খড়মের শব্দ তুলিয়া দরজা পর্য্যন্ত গেল, আবার কি ভাবিয়া যেন ফিরিয়া আসিল, বলিল—"আচ্ছা মা, নসরৎপুরের লাহিড়ীদের কি একটা খবর দেব?"

ইন্দ্রাণী অতি সংক্ষিপ্ত এবং সেই জন্যই অতি অমোঘ একটা 'না' শব্দের দ্বারা বৃদ্ধকে অর্দ্ধপথে নিরস্ত করিল।

বৃদ্ধ বলিল—"কিন্তু মা, তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে।" ইন্দ্রাণী বলিল—"কুলীনের মেয়ের আবার বিয়ের বয়স আছে না কি, দেওয়ান-জ্যেঠা?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—"কিন্তু কুলীনের ছেলের ত' বয়স হয়। আমি যে এ ভার আর বইতে পারি না। এত বড় জমিদারি দেখা কি এই বুড়োর কর্ম্ম!"

ইন্দ্রাণী শান্তভাবে বলিল—"বেশ ত, এবার থেকে আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বৃদ্ধ বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু, এ ভার যে কত গুরুতর তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই যেন প্রকাণ্ড একটা চাবির তোড়া ইন্দ্রাণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তা' হলে তোমার জিনিষের ভার তুমিই নাও।" ইন্দ্রাণী নত হইয়া চাবির তোড়া তুলিয়া আঁচলে বাঁধিল। বৃদ্ধ এতটা আশা করে নাই। কোন কথা না বলিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিল—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, দেয়ালের সেই ভগ্ন চিহ্নটাকে, তাহার দৃষ্টি অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল,

সেইটার মধ্যেই যেন এই সমস্যার সমাধান লিখিত আছে। কিন্তু, সেটা খুঁজিয়া না পাইয়া বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী অন্য দ্বার দিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

যতক্ষণ ইহারা ঘরের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল পাশের ঘর হইতে একটি রমণী আড়ি পাতিয়া সব শুনিতেছিল। এখন সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে সে হাসিতেছিল; হাসিতে দম আকাইয়া যাইতেছিল, তবু হাসিবার উপায় ছিল না। এইবার হাসিতে হাসিতে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। বসন্তের অকারণ বাতাসে কম্পিত মাধবীলতা হইতে যেমন রাশি রাশি মাধবী-মঞ্জরী খসিয়া খসিয়া পড়ে, তেমনি তাহার সারা অঙ্গ হইতে যেন হাসি-রাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া ঘরময় বিকীর্ণ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিল—রমণী সোজা হইয়া দাঁড়াইল, রমণী যুবতী, নাম চাঁপা।

চাঁপার একটু ইতিহাস আছে। অল্প বয়সে চাঁপার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা গেল বরপক্ষ ইন্দ্রাণীর পিতার নিকট হইতে জানিতে পারে যে চাঁপা এক জমিদারের রক্ষিতার কন্যা। বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে চাঁপার মাতার মৃত্যু হয়; চাঁপা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িল। ইন্দ্রাণীর পিতা দয়া করিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন। সেই হইতে সে জমিদার-বাড়ীর পরিবার-ভুক্ত। বয়স হইলে সে জন্মের ও বিবাহ-বিভ্রাটের ইতিহাস অবগত হইল। তাহার নারী-মনের সমস্ত ক্রোধ ইন্দ্রাণীর পিতার উপরে পড়িল। তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার-সূত্রে ইন্দ্রাণী তাহার ক্রোধের পাত্র হইল। চাঁপার আর বিবাহ হইল না; জানিয়া শুনিয়া কে আর বিবাহ করিবে; তাহারও বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। জমিদার-পরিবারে সে এখন ইন্দ্রাণীর সঙ্গী, সহচরী ও খানিক পরিমাণে অভিভাবক। তাহার মনের কথা কেহ জানিত না, কাজেই কেহ চাঁপার আন্তরিকতায় সন্দেহ করিত না।

চাঁপা ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা বয়সে বড়—তবে তাহার বয়স ঠিক কত তাহা অনুমান করা সহজ নয়। সে চেষ্টাও কেহ করিত না। মুখ দেখিলে তাহার বয়স হইয়াছে মনে হয়, আচরণে তাহার বয়স ধরা পড়ে, কিন্তু তাহার শরীর বলিয়া দেয় মুখের সাক্ষ্য নিতান্তই মৌখিক। মুখে তাহার শারদীয় প্রৌঢ়তা, দেহে তাহার বাসন্তিক লাবণ্য। তাহার শরীরে যৌবনের জোয়ারের জলরেখা উচ্চতম সীমায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও কমিতে আরম্ভ করে নাই। তাহার সৌন্দর্য্যের পরম পরিণামের মধ্যে কান পাতিয়া শুনিলে বিদায়ের রাগিণীর ক্ষীণ পূর্ব্বাভাস শ্রুত হয়।

চাঁপাকে দেখিতে দীর্ঘ নয় বরঞ্চ একটু খর্ব্ব বলিয়াই মনে হয়; মুখখানি গোল, হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিটোল, মাংসল। একদল মেয়ে আছে যাহাদের সমস্ত শরীরের মধ্যে কায়িক ভাবটাই অশোভন রকম উগ্র, চাঁপা সেই দলের। তাহাকে দেখিলেই তাহার শরীরটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ ইহার কারণ নয়; এক শ্রেণীর রূপ আছে, যাহা দর্শককে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়, সে রূপ মুগ্ধকর; আর এক জাতীয় রূপ আছে, দর্শককে যাহা অকস্মাৎ সচেতন করিয়া তোলে, সে রূপ লুব্ধকর; চাঁপার রূপ সেই জাতীয়। প্রথম জাতীয় রূপ অমূল্য, তাহার দর করিবার কথা মনে হয় না; চাঁপার রূপ মূল্যবান্, স্বভাবতই দরের কথা মনে ওঠে; তাহার রূপ একাধারে অস্ত্র ও শস্ত্র; আত্মরক্ষা করা চলে, আবার আবশ্যক হইলে নিক্ষেপ করিয়া আততায়ীকে আঘাত করাও অসম্ভব নহে।

দর্পনারায়ণের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহের কথা শুনিয়া চাঁপা মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সে ভাবিল তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে; যাহার প্ররোচনায় তাহার বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার কন্যার যে এমন সহজে এমন বহু-বাঞ্ছিত ঘরে বিবাহ হইবে, ইহা তাহার পক্ষে কল্পনা করাও ক্লেশদায়ক; চোখের উপরে সহ্য করা ত' অসম্ভব। কিন্তু, এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। চাঁপা ভাবিল, ইন্দ্রাণীর বিবাহ যদি সত্যই হইয়া যায়; তবে সে অন্য কোথাও গিয়া সুবিধামত বিবাহ করিয়া জীবন-যাপন করিবে। কয়েক মাস তাহার বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটিল।

আজ সকাল বেলা সে পাশের ঘরে কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে শুনিতে পাইল দেওয়ানজী ও ইন্দ্রাণীতে

গোপনে কি আলাপ হইতেছে। চাঁপা আড়ি পাতিল—এবং যে-সংবাদ সর্ব্বাপেক্ষা তাহার কাম্য অথচ যাহা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সংবাদই শুনিতে পাইল। চাঁপা শুনিল, দর্পনারায়ণ অন্যত্র বিবাহ করিয়াছে। তাহার হাতের কাজ পড়িয়া রহিল—রুদ্ধ হাসির আবেগে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল ; দেওয়ানজী ও ইন্দ্রাণী পাশের ঘর হইতে চলিয়া যাইতেই সে সগর্ব্বে সানন্দে বিজয়ীর মত শক্রর পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে হাসির আবেগে লুটাইয়া পড়িল।

[২]

ইন্দ্রাণী ঘরে ফিরিয়া গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই, খাদ্য গ্রহণ করে নাই, লোকের সঙ্গে কথা বলে নাই, নীরবে একাকী পড়িয়া আছে। এক রাত্রে তাহার চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, কপোল পাণ্ডুরাভ হইয়াছে, অধরের লালিত্য শুকাইয়া গিয়াছে—দীর্ঘ কেশদাম আজ অবিন্যস্ত। তবু যে তাহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র ম্লান হইয়াছে এমন মনে হয় না ; সোনা যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে যতই ঘষ না কেন, আগুনে পোড়াও, অনাদরে ফেলিয়া রাখ, তাহা আরো সুন্দর হইয়া ওঠে। দুঃখ সুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

ইন্দ্রাণীর মত সুন্দরী ক্বচিৎ দেখা যায়—তার মানে ইহা নয় যে, বাঙ্গালা দেশে সুন্দরী মেয়ে নাই। বাঙ্গালী নারীর সৌন্দর্য্যে লালিত্যের ভাগ কিছু বেশি ; এই নদী-মাতৃক দেশের মেয়েরা নদীর মতই ললিত-তরল ; ইন্দ্রাণী পাষাণ-সুন্দরী। বিধাতা যে ছাঁচে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রাকে গড়িয়াছিলেন, তারই একখণ্ড পাথর যেন তাঁর শিল্পশালার এক কোণে অলক্ষ্যে পড়িয়াছিল ; সেই পৌরাণিক পাষাণ-খণ্ড দিয়া বিধাতা ইন্দ্রাণীকে গড়িয়াছেন ; সেদিক্ দিয়া বিচার করিলে ইন্দ্রাণী বাঙ্গালী নয়, পৌরাণিকী।

তাহার সুঠাম সমুন্নত সরল দেহ বাঙ্গালী মেয়ের তুলনায় কিছু দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় ; তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি অনুপাতের সামঞ্জস্য আছে যে তাহার দিকে তাকাইলেই একদৃষ্টিতে সমগ্র মূর্ত্তিটি চোখে পড়ে। সাধারণতঃ এমনটি হয় না ; অধিকাংশ মেয়ের মূর্ত্তি একসঙ্গে দেখা যায় না ; কাহারো চোখে পড়ে মুখ, কাহারো অধরোষ্ঠ, কাহারো চোখ দুটি, কাহারো গ্রীবাভঙ্গী, কাহারো বাহুলতা, কাহারো গতিচ্ছন্দ। ইন্দ্রাণীর চন্দ্রকান্ত ললাটের নিম্নে ভ্রূ-রেখা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে কোথায় যে শেষ হইয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা যায় না ; সেই ভ্রূর নীচে চোখ দুটি ভাসমান পদ্মের মত বিগলিত মাধুর্য্যপূর্ণ নয় ; স্থির মহিমায় অচঞ্চল ; গোলাপের দলের মত পাতলা অধরোষ্ঠ যেন অনায়াস-দৃঢ়তায় অন্তরের রহস্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে ; শুভ্রপাণ্ডু দুই কপোলে লাবণ্যের পুষ্পমঞ্জরী ; রজনীগন্ধার বৃন্তকে লাঞ্ছিত-করা সরল গ্রীবাতটে তিনটি মাত্র রেখা ; মর্ম্মর-ধবল নিটোল বাহু-যুগলের শেষপ্রান্তে তপ্ত রক্ত দুইখানি করপদ্ম, পাঁচটি করিয়া ক্রমসূক্ষ্মায়মাণ কোমল সুগোল অঙ্গুলিতে পর্য্যবসিত। যখন সে চুল খুলিয়া দেয়, সেই সুদীর্ঘ সরল সুপ্রচুর চিক্কণ কেশরাশিতে কশাহত আলো যেন চঞ্চল হইয়া ওঠে।

বাঙ্গালী মেয়েদের মুখ যেন স্বচ্ছ কাচে নির্ম্মিত। সে দিকে চাহিলেই এক মুহূর্ত্তে ভিতরের সব রহস্য চোখে পড়ে, এক মুহূর্ত্তে তাহা দেখা শেষ হইয়া যায়। ইন্দ্রাণীকে অত সহজে বুঝিবার উপায় নাই, তাহার মুখ যেন দর্পণের কাচে রচিত, তাহা স্বচ্ছ, নির্ম্মল, কিন্তু তাহাকে দেখা যায়, তাহার অন্তরের রহস্যকে নয়, দর্শক সেই দর্পণোপম মুখে নিজেকেই দেখিতে পায়, ইন্দ্রাণীকে নয় ; দর্পণের প্রতিফলিত আলোকে তাহাকে ভাল করিয়া চোখেই পড়িতে চায় না, ইন্দ্রাণী দূর-গগনের নক্ষত্রের মত নিজের আলোর আড়ালে নিজে অবগুণ্ঠিত। যে খুব বেশি তাহাকে দেখিতে পায়, সেও তাহাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না।

এই জাতীয় আত্মসমাহিত নারীরা দুঃখের টীকা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ; সীতাকে দেখ, দময়ন্তীকে দেখ, সাবিত্রীকে দেখ, দ্রৌপদীকে দেখ। ইহারা অসাধারণ বলিয়াই সাধারণের উপেক্ষার পাত্র। সংসারের হাটে বাজারে চাল, ডাল, নুন, তেল মাপিবার তুলাদণ্ড যথেষ্ট, কিন্তু এমন অলৌকিক সোণা মাপিবার নিক্তি কয়টি আছে ; তেমন জহুরীই বা কোথায়! ইহারা সুখী হইতে পারে না, বিধাতাও ইহা জানেন ; সেই জন্য সুখের পরিবর্ত্তে ইহা-

দিগকে দিয়াছেন মহাকাব্যের অমরতা। ইন্দ্রাণীর দুরদৃষ্ট যে সে ব্যাস বাল্মীকির হাতে পড়িল না।

ইন্দ্রাণী গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; মনের কথা কাহাকে বলা তাহার স্বভাব নয়, সেই জন্য চাপা দুঃখের আগুনে তাহার হৃদয়ে পুটপাক চলিতেছে। দর্পনারায়ণকে সে ভালবাসিয়াছিল, দর্পনারায়ণ অন্যত্র বিবাহ করিল। কিন্তু, শুধু কি ইহাই? আঘাত আরও গভীর মর্ম্মস্থলে! আঘাত লাগিয়াছে ইন্দ্রাণীর আত্মবিশ্বাসে, অহঙ্কারে। এই জাতীয় মেয়েরা সংসারের প্রাত্যহিক অবজ্ঞাকে, সাধারণের উপেক্ষাকে সহ্য করিয়া জীবনের পথে চলিতে পারে, অহঙ্কারই তার কারণ। এই অহঙ্কারই মেরুদণ্ডের মত তাহাদের অস্তিত্বকে ঋজু করিয়া রাখে। সেই মেরুদণ্ডে যখন আঘাত পড়ে, তখন তাহারা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল, তাহাতে রামায়ণ শেষ না হইয়া গিয়া আরও চারিটি কাণ্ডের সৃষ্টির কারণ হইয়াছিল; কিন্তু রাবণ যদি সীতাদেবীকে অসহায় দেখিয়াও হরণ না করিত, তবে রামায়ণ ঐখানেই শেষ হইয়া যাইত, সীতাদেবীর অহঙ্কারে যে আঘাত লাগিত, তাহাতে তিনি পম্পাসরোবরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। ছদ্ম নল-দের মধ্য হইতে দময়ন্তী প্রকৃত নলকে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দেবতাদের ছলনাতে তিনি মনে মনে খুসী হন নাই—এমন কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে?

ইন্দ্রাণী মনটাকে মানচিত্রের মত সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দেহের চলনশীল ব্যথার মত, ইহা যেন মনের মধ্যে চলিয়া বেড়াইতেছে, কখনো এখানে, কখনো সেখানে, কখনো প্রেমে, কখনো অহঙ্কারে। ইন্দ্রাণী দর্পনারায়ণকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তার মূলেও অহঙ্কার, ইন্দ্রাণী দর্পনারায়ণের মধ্যে নিজেকেই ভালবাসিয়াছিল, আমরা যাহাকে যতটা ভালবাসি তাহার মধ্যে তত পরিমাণে নিজেকে উপলব্ধি করি।

ইন্দ্রাণী স্থির করিল, বিবাহ আর করিবে না। কিন্তু, এই সঙ্কল্পে মনে শান্তি পাইল না, সে বিবাহ না করিয়া সারা জীবন শাস্তি পাইবে, আর যে প্রকৃত দোষী তাহার বেকসুর খালাস। না! তাহার মনের সমস্ত আক্রোশ পড়িল দর্পনারায়ণের উপর। দর্পনারায়ণকে দণ্ড দিতে হইবে; দণ্ড দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ইন্দ্রাণী তাহাকে ভালবাসে। ক্রোধ প্রেমের বিকার, লৌহনিগড় বাহুলতার রূপান্তর মাত্র। শত্রুও পর নয়, কারণ তাহার সঙ্গে সন্ধি হইতে পারে; যাহার প্রতি মানুষ অন্যমনস্ক সে-ই প্রকৃত পর।

কিন্তু, ইন্দ্রাণী একাকী, অসহায়, দুর্ব্বল, দর্পনারায়ণকে দণ্ড দিবে কি প্রকারে? তাহার কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এ আবার কি? ইন্দ্রাণী এত চিন্তা করিবে কি প্রকারে? এত মনোবিশ্লেষণ তাহার পক্ষে কি সম্ভব? কারণ যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ত' সাইকোলজিকাল নভেলের সৃষ্টি হয় নাই, যেন সাইকোলজিকাল নভেলের পর হইতেই মানুষ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে।

বিধাতা দিয়াছেন মন, আর মন বিশ্লেষণ করিবার অভ্যাস শয়তানের দান। মনোরথের সরল রাজপথ স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টি—সেই পথে গিয়া থামিয়াছে তাঁহার স্বর্ণসিংহাসনের সোপানের প্রান্তে, আর মনোবিশ্লেষণের সর্পিল বঙ্কিম অলিগলিতে আদিম সর্পের, শয়তানের পদচিহ্ন; সে পথের কোন লক্ষ্য নাই, তাহা সাপের মতই নিজেকে নিজে জড়াইয়া পুত্তলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। সে পথে পদার্পণ করিলে আর রক্ষা নাই; কেবলই ঘুরিতে হইবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া মরিতে হইবে; সে পথ সাইকোলজিকাল নভেলের নায়ক-নায়িকার কঙ্কালে চিহ্নিত। আদি-দম্পতী নন্দনের সরল রাজপথ ত্যাগ করিয়া শয়তানের প্ররোচনায় সর্পিল গলিপথে প্রথমে পদক্ষেপ করিয়াছিল, আর আজিও আমরা, তাহাদের অধস্তন পুরুষেরা সেই আদিম পাপের বোঝা মাথায় বহিয়া সেই বঙ্কিম পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে, তবে তাহা এই আত্মকেন্দ্র-শৃঙ্খলিত বিশৃঙ্খল অন্তহীন অলিগলির নাগপাশের মধ্যেই রহিয়াছে।

[ক্রমশঃ

বিচিত্র জগৎ

কলোরাডো

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলোরাডো প্রদেশ ধাতুর খনির জন্য বিখ্যাত, কিন্তু সকলের চেয়ে বিখ্যাত তার অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য। দেশদেশান্তর থেকে প্রতিবৎসর বহু লোকে কলোরাডো আসে তার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে। এখানে যেন সকল রকম মহিমময় দৃশ্যের সম্মেলন ঘটেছে। বিশাল তুষারাবৃত পর্ব্বতরাজি, গভীর নদীখাত, কুলুকুলুনাদী পার্ব্বত্য ঝরণা, বড় বড় হ্রদ, তুষার-নদী, বিবিধ বন-কুসুম, বন্য হরিণের দল।

রকি পর্ব্বতের বিভিন্ন শাখা এ দেশের সর্ব্বত্র ছড়ান। তুষার-নদীর সংঘর্ষে উৎপন্ন নদীখাতগুলির বয়স নিরূপণ করা কঠিন, হয় তো বা মানুষ-সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই ওদের অস্তিত্ব সুরু হয়েছিল। পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ অপরূপ মালভূমিগুলির উৎপত্তি যে কি ভাবে হয়, তা ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের বিচার্য্য বিষয়।

আজকাল এই সব অঞ্চলে বড় বড় মোটরের রাস্তা হয়েছে। মোটরযোগে কলোরাডো পার্ব্বত্য অঞ্চলের যে কোন জায়গায় যাওয়া যায়। এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র গ্রীষ্মের দিনে অবসর-যাপনের উপযুক্ত স্থান অনেক আছে। গ্রীষ্মের দিনে নানা বন্য ফুল ফোটে, রাত্রে শিশির পড়ে না, বাতাস শুষ্ক অথচ সব সময়েই শীতল।

বড় বড় পর্ব্বতের মধ্যস্থ উপত্যকায় গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের বিচরণ-ভূমির জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন। এই সব উপত্যকার চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বতমালা, শিকারী দল এখানকার বনে হরিণ ও বন্য পাখী শিকার করতে আসে, সহরের লোকে বেড়াতে বা পিক্‌নিক করতে আসে, কলেজের ছাত্রেরা স্তরসংস্থান ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে আসে, মৎস্য-শিকারীরা মাছ ধরতে আসে।



কলোরাডো: বিশিষ্ট বন্যপুষ্প—'কলাম্বাইন'।

খুব যখন গ্রীষ্ম, বড় বড় সহরের লোকজন রাত্রে গরমে ঘুমুতে না পেরে পার্কে শুয়ে কাটাচ্ছে, তখন সহর ছেড়ে বহু লোক কলোরাডো অঞ্চলে বেড়াতে আসে। রেল-যোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সহর থেকে কলোরাডোর পার্ব্বত্য অঞ্চলে পৌঁছানো আজকাল খুব সহজ। তুষারাবৃত শিখরদেশে উঠবার সোজা রাস্তা আছে, ঘোড়া বা মোটরও ভাড়া পাওয়া যায়। অথচ, কিছুকাল আগে দু'চার জন ভ্রমণকারী বা শিকারী ছাড়া এই অঞ্চলের অস্তিত্ব অনেকের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

কলোরাডোর বিভিন্ন শিখররাজির দুই-তৃতীয়াংশের

উচ্চতা ৬০০০ হাজার ফুট থেকে ১৪০০০ হাজার ফুট। এই অঞ্চলে ১০২৯টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ১০,০০০ ফুটের বেশী এবং ৫৯টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ১৪০০০ হাজার ফুটের বেশী।

কলোরাডোর পার্ব্বত্য অঞ্চলের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এর যে কোন দিকে, যে কোন শিখরে বা যে কোন মালভূমিতে অতি সহজে পৌছান যায় বা পৌছানর চমৎকার রাস্তা আছে।

দশ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমির উপরে দুটী পুরানো আমলের খনি ও খনি-সংক্রান্ত ছোট সহর এখনও বর্ত্তমান, যদিও এখন আর তাদের সে পূর্ব্ব গৌরব নেই। এই সহর দুটির নাম লেড্‌ভিল্ ও ক্রিপ্‌স্ ক্রিক্। গত শতাব্দীর শেষভাগে এখানে অনেক লোকের বাস ও দোকান-পসার ছিল। এখন যাত্রীদের জন্য কেবল কয়েকটি বড় হোটেল সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে।



কলোরাডো: ন্যাশন্যাল পার্ক ও ফরেষ্টে ভ্রমণকারীদের তাঁবু খাটাইয়া বাসের জন্য এইরূপ মনোহর স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

আল্পস্ পর্ব্বতমালার সঙ্গে কলোরাডো পার্ব্বত্য অঞ্চলের এইখানেই পার্থক্য। আল্পস্ পর্ব্বতে বেশী উঁচুতে আরোহণ করা বিপজ্জনক, এখানে উঁচুতে অতি সহজেই পৌছান যায়।

মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের অনেকগুলি বড় সহর থেকে ট্রেনে মাত্র একটা রাত্রি কাটালেই কলোরাডো অঞ্চলে আসা যায়। আজকাল প্রত্যেক ছুটীতে এত যাত্রীর ভিড় হয় যে, ইউনিয়ন প্যাসিফিক্ রেল কোম্পানী ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

কলোরাডোর আবহাওয়া দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্য বিখ্যাত। গ্রীষ্মের দিনে সারাদিনই রৌদ্র, অথচ সে রোদের তাপ এমন কিছু অসহ্য নয়। রাত্রিকাল খুব ঠাণ্ডা ও আরামপ্রদ। গ্রীষ্মকালে ৬০° ডিগ্রির বেশী উত্তাপ কখনও দেখা যায় না।

পর্ব্বতের উপর অনেক ক্রীড়াভূমি আছে। সেখানে গল্‌ফ, টেনিস্, স্কেটিং প্রভৃতি খেলা খেলতে প্রতিবার গ্রীষ্মকালে বহু লোক আসে। যারা খেলা করতে চায় না, শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পরিতৃপ্ত হতে চায়, তাদের মোটর-ভ্রমণের জন্য সুদীর্ঘ পথ আছে, মোটরের গদি-আঁটা আসনে বসে তারা জগতের একটি অতি বিশাল পার্ব্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখতে পারে।

রকি পর্ব্বতের ন্যাশন্যাল পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে 'ফল্ রিভার রোড' নির্ম্মাণের পর আজকাল মোটর-যাত্রীদের সুবিধা হয়েছে। এই পথ সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করেছেন,—Corley Scenic Highway এই পথটির নাম। নাম থেকেই বোঝা যাবে, শুধু সৌন্দর্য্যময় অঞ্চলগুলির সুসমতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পথ তৈরী হয়েছে। মাঝে মাঝে এই পথের ধারে হোটেল ও সরাই আছে।

পার্ব্বত্য নদীতে খুব বড় বড় 'ট্রাউট' মাছ পাওয়া যায়। বিশেষ করে হ্রদগুলিতে 'ট্রাউট' মাছের সংখ্যা খুব বেশী। প্রতি বৎসর অনেক 'ট্রাউট' ধরা পড়ে এবং বাক্সবন্দী হয়ে বিদেশে চালান যায়।

এই পার্ব্বত্য হ্রদগুলির সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। এদের চারিধারে বন, বনে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের বন্যপুষ্প বন আলো করে রাখে, একটি গম্ভীর প্রশান্তি ও চারিদিকের

সৌন্দর্য্যে দর্শকের মনঃপ্রাণ বিভোর হয়ে ওঠে। যারা খেলাধূলা ভালবাসে না, শুধু বসে বসে ভাবতে চায় বা কবিতা লিখতে চায়, তারা নৌকা ভাড়া করে আপনমনে আসন্ন সন্ধ্যায় হ্রদের নিস্তরঙ্গ নীল জলে ইচ্ছামত বেড়িয়ে বেড়াতে পারে।

তুষার-নদী অনেক শ্রেণীর আছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা আসেন এই সব তুষার-নদীর স্রোতের গতি, গঠন ও আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে। আমেরিকায় বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলি থেকে অনেক পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ আসেন এ অঞ্চলের বন্য পক্ষীদের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে।

কলোরাডোর পার্ব্বত্য অঞ্চলের বনানীর শোভা বাড়িয়েছে এখানকার বন্যপুষ্পের প্রাচুর্য্যে। সে যে কত ধরণের ফুল, আর কত রকম যে তাদের রং!

সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু পার্ব্বত্য বনানীতেও প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত ফুলের শোভা। এ দেশের এ একটি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। তুষার-নদীর সান্নিধ্যবশতঃ যে অঞ্চলগুলি খুব শীতল, সে সব জায়গা ছাড়া আর সমস্ত শিখর ও সমভূমিতে জল সুপ্রচুর।



কলোরাডো : উপত্যকায় মৎস্য-শিকারের নদী।

উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, শুধু কলোরাডো ষ্টেটেই ৩০০০ হাজার শ্রেণীর বন্যপুষ্প আছে, তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ছোট ছোট উপত্যকা ও মালভূমিতে ফোটে। বাকিগুলি পাঁচ হাজার ফুটের ওপরে ফোটে। অনেক ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য দুই ই আছে। ইউরোপে পরিচিত "লিলি-অফ-দি ভ্যালি", গোলাপ, ফ্লক্স, ভায়োলেট, ব্লুবেল, জিরেনিয়াম, অর্কিড, লার্কস্পার এগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে ফোটে। সুগন্ধ "ফর্গেট-মি-নট" ফুল পথের ধারে ও শৈলসানুর সর্ব্বত্র দেখা যায়।

পূর্ব্বে যখন এখানে অবাধ শিকারের স্বাধীনতা ছিল, তখন শিকারীরা অনেক বন্য জন্তু মেরেছে। এখানকার প্রাণীদের বধ করা হ'ত তাদের বহুমূল্য লোমের জন্য। সুদূর হডসন নদী-অঞ্চলে যেমন শিকারীরা ফাঁদ পেতে জন্তু শিকার করে, এখানেও গবর্ণমেণ্টের কাছে লাইসেন্স নিয়ে শিকারীরা বন্যজন্তু ধরত। কলোরাডো ষ্টেটের একটি প্রধান আয় ছিল শিকারীদের লাইসেন্সের ট্যাক্স।

কিন্তু আজকাল আইন দ্বারা বন্যজন্তু শিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদেশে এক প্রকার পার্ব্বত্য লোমশ মেষ আছে, তাদের শিং খুব বড় বড় বলে নাম দেওয়া হয়েছে 'বিগ্‌হর্ণ' মেষ। এরা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ ও দুরারোহ শৃঙ্গগুলিতে অবলীলাক্রমে লাফালাফি করে খেলে বেড়ায়। এরা দেখতে ভারি সুশ্রী। কিন্তু মূল্যবান্ লোম গায়ে থাকার অপরাধে এদের বংশ প্রায় নির্ব্বংশ হতে বসেছিল। সম্প্রতি সে বিপদ্ থেকে এরা মুক্তি পেয়েছে।

'বিগ্‌হর্ণ' ভেড়া ছাড়া নানা ধরণের হরিণ, বিবর, বনবিড়াল, পার্ব্বত্য সিংহও দেখা যায়। খরগোস ও মারমট্ নদীর উভয় তীরের মুক্ত প্রান্তরে বাস করে। এক জাতীয় কৃষ্ণসার হরিণ পার্ব্বত্য হ্রদের বনে পাওয়া যায়। কলোরাডো ষ্টেটে যত পাখী দেখা যায়, অন্য কোনও ষ্টেটে এত পাখী তো দূরের কথা, এর অর্দ্ধেকও আছে কি না সন্দেহ। ৪০৫ শ্রেণীর পাখী এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তবু এখনও উত্তর দিকের পার্ব্বত্য হ্রদগুলির তীরে যে বন আছে, সেগুলিতে ভাল রকম অনুসন্ধান হয় নি। ডেন্‌ভার

হ্রদে এমন তিনটি নতুন শ্রেণীর পাখী দেখা গিয়েছে, যুক্ত রাজ্যের কোনও স্থানে সে পাখী নেই।

এই সব পাখীর অধিকাংশ থাকে পাহাড়ের গায়ের ফাটলে, এবং উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে। অন্ততঃ দুই তিন শ্রেণীর পাখী সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের অনুর্ব্বর ও বায়ু-তাড়িত অঞ্চলে বাসা বাঁধে। অথচ, এরা ঈগল বা কন্ডর জাতীয় শিকারী পাখী নয়। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাখী থাকে পথের ধারের বনে ও ঝোপঝাড়ে, এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর পাখী চমৎকার শিস্ দেয়। বড় বড় লোমশ পালকযুক্ত এক রকমের কাঠঠোক্‌রা আছে, এরাও বেশী উঁচুতে থাকে না। কয়েক জাতের দুষ্প্রাপ্য পেঁচক্ দু'হাজার ফুটের উপরের বনে বা পাথরের ফাটলে দেখা যায়।

বড় বড় পর্ব্বতের যত উঁচুতে ওঠা যায়, গাছপালা তত কমে আসে। তারপর এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছানো যায়, যার উপরে গাছপালা আর তেমন জন্মায় না, অন্ততঃ যাদের গুঁড়িতে কাঠ হয় এমন ধরণের গাছপালা জন্মায় না। এই জায়গার উপরে যে গাছ হয়, সেগুলি শৈবাল ও অশ্বকর্ণ জাতীয় উদ্ভিদ্। সাধারণতঃ দশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত গাছপালা জন্মায়। এর উপরে এত ঝড় হয় এবং এত শীত পড়ে ও তুষারপাত হয় যে, গাছপালা বেঁকে দুমড়ে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে।

চার পাঁচ হাজার ফুট উপরে যেসব গাছ সোজা প্রায় দেড় শো ফুট লম্বা হয়, দশ হাজার ফুটের উপরে সেই সব গাছ লতার মত এঁকে বেঁকে চলে,—বড় বড় ওক্ পর্য্যন্ত অশীতিপর বৃদ্ধের মত বেঁকে কুঁজো হয়ে দুমড়ে যায়। কোন কোন গাছের পত্র-পুষ্প ও ডালপালা বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে বেঁকে থাকে, দেখে মনে হয় যেন ভীম প্রভঞ্জনের হাত এড়াবার জন্যে উর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত ছুটে পালাচ্ছে।

অধিকাংশ গাছ বেঁটে হয়ে যায়। এমন সব গাছ আছে, যা' নীচের পাহাড়ে ৬০।৭০ ফুট বাড়ে কিন্তু দশ হাজার ফুট ওপরে একশো বছরের গাছ কয়েক ইঞ্চি মাত্র উঁচু হয়।

কলোরাডোর প্রধান সহর ডেন্‌ভার এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। রকি পর্ব্বতের পাদমূল থেকে ডেন্‌ভার মাত্র ১৩।১৪ মাইল দূরে। ডেন্‌ভার থেকে রওনা হয়ে রকি পর্ব্বতের বিখ্যাত ন্যাশন্যাল পার্কগুলি ভ্রমণ করবার চমৎকার বন্দোবস্ত আছে।

ডেন্‌ভার খুব ছোট সহর নয়, ১৯২৮ সালে এর লোক-সংখ্যা ছিল, তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার, বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণের ষ্টেটগুলির মধ্যে কলোরাডো খুব উন্নতিশীল, আয়ও অনেক বেশী। এর প্রধান কারণ, নানা দেশ থেকে যাত্রী দল আসে রকি পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে, ডেন্‌ভার থেকে তাদের যাত্রা সুরু হয়। ফলে, এই সহরের হোটেল, দোকান, রেল, ট্রাম মোটরওয়ালাদের যথেষ্ট আয় হয়। এতে ষ্টেট্ গবর্ণমেণ্টের অংশ আছে, তা' ছাড়া ইন্‌কাম্ ট্যাক্স প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার আয়ের উপায় আছে। যাত্রীদের যাতায়াত সুগম করবার জন্য ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্টের ত্রুটী নেই। কারণ, তাদের আকৃষ্ট করে এখানে আনার উপরে ষ্টেটের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। এজন্য ডেন্‌ভার সহরে মোটরের ভাড়াও খুব সস্তা করে দেওয়া হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনেও খুব সস্তা ভাড়ায় পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

ডেন্‌ভার সহরে ৪২টী পার্ক আছে। এদের মধ্যে সিটি পার্ক সকলের চেয়ে বড়, এই পার্কের মধ্যে একটী পশুশালা ও একটী ইলেক্‌ট্রিক্ ফোয়ারা আছে। পরিষ্কার দিনে সিটিপার্ক থেকে রকি পর্ব্বতমালার সম্মুখভাগের সমস্ত অংশটা এক নজরে দেখা যায়।

ডেন্‌ভারে প্রায় ২৫০ হোটেল ও সস্তাদরের ১০০০ বোর্ডিং আছে। গবর্ণমেণ্ট থেকে এদের রেট্ বেঁধে দেওয়া আছে, যার যা' ইচ্ছা আদায় করার যো নেই। সহরের একটা বড় রেলষ্টেশনে (এখানে ৩।৪টা রেলষ্টেশন) গবর্ণমেণ্টের খরচে একটা Bureau of information রেখেছেন, ভ্রমণ-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ এখানে বিনামূল্যে যাত্রীদের সরবরাহ করা হয়।

ডেন্‌ভার সহরের ৭৫ মাইল দূরে বিখ্যাত পাইক্‌স পিক্।

এই পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ১৪১০৯ ফুট—রেলে

মোটরে এর উপরে উঠা যায়। পাইক্‌স্ পিকের উপরে ষ্টেট্ গবর্ণমেণ্টের তৈরী একটা বিশ্রামাগার আছে। কলোরাডো অঞ্চলে রকি পর্ব্বতের যতগুলি ছোট বড় শৃঙ্গ আছে, পাইক্‌স্ পিকের উপর উঠলে তার সবগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

যেখান থেকে পাইক্‌স্ পিকে উঠা আরম্ভ করতে হয়, সেটা একটা ছোট সহর। এর কাছেই একটা পার্ব্বত্য ঝরণা আছে, যার জল বাতরোগের পক্ষে মহোপকারী। জলে সোডা, ম্যাগনেসিয়া, গন্ধক, পটাস্ ও লিথিয়া মিশ্রিত আছে। টাউনটা এক রকম গড়ে উঠেছে বাতরোগীদের ভিড়ে।

ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান্ অধিবাসীরা এই ঝরণার জলের গুণ অবগত ছিল। ঝরণার নিকটেই উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা সুন্দর স্থান আছে, সেটা বর্ত্তমানে একটা ন্যাশন্যাল পার্ক। ইণ্ডিয়ান্‌রা তার নাম দিয়েছিল 'ভগবানের বাগান' —এখনও এই নামই প্রচলিত। অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল বেলে পাথরের নানা রকম শৃঙ্গ, স্তূপ ইত্যাদি এখানে দেখা যায়। কোথাও যেন অবিকল একটা পাথরের ষাঁড় কি কৃষ্ণসার হরিণ, কোথাও একটা গির্জ্জার চূড়া। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ও রৌদ্রের প্রভাবে নরম বেলেপাথর বহুকাল ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হয়ে ঐ রকম দাঁড়িয়েছে।



কলোরাডো : রকি পর্ব্বতের 'বিগহর্ণ' জাতীয় মেষ।

প্রাচীনকালে মানুষ এখানে পাহাড়ের গায়ে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করত। এখনও একদল পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান্ সেই সব গর্ত্তে বাস করে। কিন্তু, এরা সত্যিকার গুহাবাসী মানুষ নয়। ভ্রমণকারীদের নয়নের তৃপ্তিদান করবার উদ্দেশ্যেই ষ্টেট থেকে এদের এই গর্ত্তে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু, কলোরাডো ষ্টেটে সত্যই একটা প্রাচীন স্থান আছে, যেখানে গুহাবাসী মানুষদের আবাস ছিল। সেটাও এখন ন্যাশন্যাল পার্ক, পার্কটির নাম 'মেসা ভার্ড ন্যাশন্যাল পার্ক'।

'মেসা ভার্ড ন্যাশন্যাল পার্ক' প্রাগৈতিহাসিক মানবের অকৃত্রিম আবাসভূমি হিসাবে যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটা বিখ্যাত স্থান। অনেক ছাত্র, অধ্যাপক ও ভ্রমণকারীরা প্রতি বৎসর পার্কটি দেখতে আসে। প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি সংরক্ষণের জন্যই আইন দ্বারা স্থানটাকে ন্যাশন্যাল পার্ক করা হয়েছে।

'মেসা' (Mesa) কথাটার অর্থ পাহাড়ের মাথার উপরের সমতল ভূমি। প্রাচীনকালে মানুষ গর্ত্ত কেটে বাসস্থান তৈরী করেছিল এই মালভূমির নীচে পাহাড়ের সানুর গায়ে। এরা অনেক দিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এদের অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও বাসনপত্র কিছু কিছু মাটী খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এখানে একটা মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন।

ডেন্‌ভার থেকে এই স্থানের দূরত্ব ২৫ মাইল।

'মেসা ভার্ড পার্কে'র আট মাইল উত্তরে কলোরাডো ন্যাশন্যাল ফরেষ্ট।

যে সমস্ত স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে রমণীয়, দেশের আইনে সেগুলিকেই করে রাখে ন্যাশন্যাল পার্ক বা ন্যাশন্যাল ফরেষ্ট। এখানকার গাছপালা কেউ কাটতে পারে না, বন্যজন্তু কেউ শিকার করতে পারে না, যেখানে সেখানে হোটেল বা বৈদ্যুতিক শক্তিসংগ্রহের যন্ত্র বসিয়ে

স্থানের প্রাকৃতিক শোভাও নষ্ট করতে পারে না। কলোরাডো ন্যাশন্যাল ফরেষ্ট এই ধরণের একটি পার্ক।

এই অপূর্ব্বস্থানে বড় বড় পর্ব্বতশিখর, বিরাট ও গভীর নদীখাত, হ্রদ, বিশাল বনানী, ঝরণা ও তুষারনদীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে।

অথচ, ডেন্‌ভার থেকে এর দূরত্বও খুব বেশী নয়, তিন ঘণ্টায় মোটরে ন্যাশন্যাল ফরেষ্টের প্রান্তসীমায় পৌছানো যেতে পারে।

কলোরাডো ন্যাশন্যাল ফরেষ্টে আটটি বড় বড় গ্লেসিয়ার আছে, এদের প্রত্যেকটি প্রায় এক মাইল চওড়া ও কয়েক



কলোরাডো: গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, ন্যাশন্যাল পার্ক।

শো ফুট গভীর। এদের মধ্যে আরাপাহো, ইসাবেল, ও সেণ্ট ভেন গ্লেসিয়ার খুব বড়, এদের তুষার-স্রোতের গতি বৎসরে ১৮ থেকে ৩৫ ফুট। আল্পস্ পর্ব্বতের তুষারনদীগুলির তুলনায় এদের তুষার-স্রোতের গতি দ্রুততর। আরাপাহো গ্লেসিয়ারের উত্তরে উত্তর-আমেরিকায় আর কোন বড় জীবন্ত গ্লেসিয়ার নেই। জীবন্ত অর্থাৎ সচল।

কলোরাডো ষ্টেটের আর একটা দ্রষ্টব্য স্থান রকি মাউনটেন্ ন্যাশন্যাল পার্ক।

এই সুন্দর পার্ক ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে। একটা ছোট জায়গা আগে গভর্ণমেণ্ট থেকে ন্যাশন্যাল পার্ক করা হয়েছিল, একটা পাহাড়ের গায়ের খানিকটা সমতলভূমি, সেখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য বড় চমৎকার। উঠ্‌বার জন্য মোটরের অনেকগুলি রাস্তাও করে দেওয়া হয়েছিল। এর নাম ছিল এষ্টস্ পার্ক; এর চারিধারের সীমানা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বর্ত্তমানে এটা এই বিস্তৃত পার্কে পরিণত হয়েছে।

রকি মাউনটেন্ পার্ক ২০ মাইল লম্বা ও মাইল দুই চওড়া।

এর চারিধার ঘিরে বড় বড় পর্ব্বতশিখর, উত্তরে টন্‌সন্ নদী, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ ও পাইন ও ফারের নিবিড় বন। ১৮৬৫ সাল থেকে ভ্রমণকারীদের দল এখানে বেড়াতে আসে।

এই পার্কের একটা বিশেষত্ব, এখানে বনের ফুল খুব বেশী ফোটে। অনেক হ্রদ আছে, হ্রদের চারিধারেই প্রকৃতির হাতে তৈরী ফুলের বাগান, চার পাঁচটা বড় বড় জলপ্রপাত, মোট জলপ্রপাত অসংখ্য। আর একটা বিশেষত্ব, এর তুষার-নদী। দুটী বড় তুষার-স্রোত এর দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। গ্লেসিয়ারের ইতিহাস আলোচনা করার পক্ষে স্থানটী বিশেষ উপযোগী, কারণ কয়েকটি প্রাচীন ও লুপ্ত গ্লেসিয়ারের চিহ্ন শিলাতলে বিদ্যমান।

১৯১৬ সালে দেশের আইন দ্বারা এটা ন্যাশন্যাল পার্ক করা হয়। নিয়ম করা হয় যে, পার্কে ঢুক্‌তে হবে এষ্টস্ পার্কের দিক থেকে। এখানে এষ্টস্ পার্ক নামে একটা গ্রামও আছে। গ্রামে অনেকগুলি হোটেল ও সরাই, একটা এরোপ্লেন নামবার জমি, একটা সরকারী বেতার ষ্টেশন আছে। ডেনভার থেকে এষ্টস্ পার্কের দূরত্ব ৭০ মাইল এবং রকি মাউনটেন্ পার্কের পূর্ব্ব সীমানা থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৫ মাইল মাত্র।

কলোরাডো ষ্টেটে রকি পর্ব্বতের অংশ অবস্থিত তার মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দর অংশ এই রকি মাউনটেন্ পার্ক থেকে দেখা যায়। একটি বড় মালভূমির ন

ফ্ল্যাট টপ্ মাউনটেন্, এর উচ্চতা ১২০০০ ফুট, এষ্টস্ পার্ক গ্রাম থেকে ঘোড়ার পিঠে পূর্ব্বদিকে সাত মাইল গেলে এর পাদমূলে পৌঁছান যায়।

আর একটা উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের নাম লঙ্স্ পিক্। উপরে উঠবার রাস্তা আছে, একদিনেই লঙ্স্ পিকের উপরে বেড়িয়ে লোকে হোটেলে ফিরে আসতে পারে। লঙ্স্ পিক্ থেকে মনে হয় যেন সমগ্র কলোরাডো ষ্টেট দর্শকের পায়ের নীচে পড়ে আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে কন্‌টিনেণ্টাল্ ডিভাইড বলে রকি পর্ব্বতের একটা বড় শাখা, তার বড় বড় তুষারাবৃত শিখর ১৬০০০ হাজার ফুটের উপরে মাথা তুলে আছে। দক্ষিণে প্রকাণ্ড একটা হ্রদ, এর নাম Exquisite Fern Lake, রকি মাউনটেন্ পার্কের মধ্যে এটি একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। এর চারিধারে নিজ্জন ফারের অরণ্য, নিস্তরঙ্গ জলের নীচে ঝাঁকে ঝাঁকে ট্রাউট্ মাছ খেলে বেড়ায়। হ্রদে মৎস্য-শিকারীরা দলে দলে আসে ট্রাউট্ মাছ ধরতে।

এষ্টস্ পার্ক গ্রাম থেকে এই হ্রদে আসা সুবিধাজনক। মাছ ধরার সময়, অক্টোবর মাস থেকে জুন মাস পর্য্যন্ত। এই সময় এষ্টস্ পার্কের হোটেল ও সরাইগুলি লোকে পূর্ণ থাকে।

যুক্তরাজ্যের কতকগুলি বড় বড় কলেজ ও স্কুলের ছেলেরা গ্রীষ্মকালে এষ্টস্ পার্কে বেড়াতে আসে, খেলাধুলো করে, এখানেই তাদের দু'তিন মাস ক্লাস হয়। এদের জন্য অনেক খানি জায়গা পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাদের ব্যায়ামাগার, টেনিস্ কোর্ট, ক্লাসরুম, গল্‌ফ্ খেলার জায়গা সব এখানে।

কলেজের ছেলেরা অধ্যাপকের সঙ্গে আসে রকি পর্ব্বতের ভূতত্ত্ব আলোচনা করতে ও গ্লেসিয়ার পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে। গ্লেসিয়ার যেখানে শেষ হয়েছে সে জায়গাটাকে মোরেন বলে। প্রাচীনকালের দুটি বড় গ্লেসিয়ার রকি মাউনটেন্ পার্কের পূর্ব্ব-সীমানায় শেষ হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও আছে। একে বলে মোরেন পার্ক। এ গুলির অবস্থা ও প্রাচীন ইতিহাস ভূতত্ত্বের ছাত্রদের নিকট বিশেষ কৌতূহলের বিষয়।

আবির্ভাব ও তিরোধান

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

উষার তখন মিলিয়ে গেছে
　　গালের গোলাপ-রঙ্,
নিশার তখন কে-ই বা দেখে
　　শাড়ীর জরির ফুল ?
দিবার রূপের জৌলুসেতে
　　বন্‌লো তারা সঙ,
যেই এল সে ধরার পরে
　　পেলাম না তার তুল !

কর্ম্মে দৃঢ় অঙ্গুলিতে
　　কতই যে তার ধূলি,
শ্রমের মাঝে লীলায়িত
　　নিপুণ দু'টি হাত ;
মুখের 'পরে ঘর্ম্ম দেখে'
　　যেই নিয়ে গো তুলি
রেখা এঁকে রঙ্ দিতে যাই,—
　　মিলায় অকস্মাৎ !

অকালমৃত্যু

—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শীতের শেষ এবং রবিবার। প্রায় অপরাহ্ন বেলায় খাওয়া শেষ করিয়া সতীশ দিবা-বিশ্রাম-মানসে আরাম করিয়া দেহ মেলিয়া শুইয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে কয়েকটি ভয়চকিত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল। বিশ্রাম আর হইল না। দুয়ারের বাহিরে আসিয়া সতীশ দেখিল, তাহা-রই জন কয়েক বন্ধু শুষ্ক মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দুশ্চি-ন্তায় কপালে তাহাদের রেখা ফুটিয়াছে এবং অস্থির ভাবে এ-ধার ও-ধার পায়চারি করিতেছে। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকে কোনক্রমে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য এই পাদ-চারণা। সতীশকে দেখিয়া প্রণব এক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শীগ্‌গির চল সতীশ দা, অমলের অবস্থা বড় সুবিধা বুঝছি না।" সতীশ বলিল, "এই ত বেলা দশটায় দেখে এলাম ভাল। দিব্যি কথা কইলে—আফিসে এক-খানা দরখাস্ত দিতে হবে বললে—"

বিপিন বলিল, "সে তো দেওয়া হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা দুটোর সময় গিয়ে দেখি, জ্ঞান নেই, মাথা চালছে আর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।"

পরেশ বলিল, "তুমি চল—ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।"

জুতা পায়ে না দিয়াই সতীশ বাহির হইয়া গেল।

দুশ্চিন্তার ছায়া সকলের মুখেই পড়িয়াছে, কিন্তু ছায়াটা সতীশের মুখেই যেন গাঢ়তর। বিপদ যে এমন ভাবে মানুষের স্থৈর্য্যকে নিশ্চিহ্ন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সতীশের ছিল না। বিপ-দের অনেকগুলি শক্ত বাহু সতীশের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া যেন তাহাকে জোরে পেষণ করিতেছে;—মুখ শুষ্ক, বুকের স্পন্দন দ্রুত, ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা-শক্তি বিলুপ্ত। দ্রুত-পদে চলিতে চলিতে সতীশ ভাবিতে লাগিল, কতটুকুই বা সময়? কাল বিকালে ট্রেনে আসিবার সময় দেখা গেল, অমল জ্বর গায়ে বাড়ী ফিরিতেছে,—সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা। শীতাবসানে নয়ন-মনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে যে ঋতু ঐশ্বর্য্যে ও রূপে রাজার মতই স-সমারোহে আসিয়া থাকেন, পিছনে তাঁহার শাসনদণ্ডের বিভীষিকাও ফুটিয়া উঠে আলোর অনুবর্ত্তী ছায়ার মত। গায়ের ব্যথায় সকলেই মনে করিয়াছিল, জ্বরটা সেই রাজানুগ্রহেরই চিহ্ন। দেশী বসন্ত-চিকিৎসকও সেই কথাই বলিয়াছিলেন। ডাক্তার বলিয়াছিলেন অন্যরূপ। এবং পাঁচজনের নানারূপ অনু-মানের উপর রোগ অনির্ণীতই রহিয়া গিয়াছে। রোগ যে দুরন্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে মানুষ যে কত দুর্ব্বল, সে কথা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। জমিদারের জোর তলব, পাইক আসিয়া হুমকি দিতেছে—বাকী খাজনা মিটাও। টাকা চাই-ই। যেখানে বউয়ের গহনা বাঁধা দিলে উপস্থিত রক্ষা হয়, সেখানে হালের বলদ বেচিয়া সব দিক্ মাটি করাই বুঝি দুর্ব্বল মনের রীতি। কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ অন্ধকারে ফিরিতেছেন, এ্যালোপাথিষ্টও আসিয়াছেন দুজন। অথচ কাল সন্ধ্যা হইতে আজ বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এইটুকু ত' সময়! মনে হইতেছে, অনির্ণীত রোগের বৃদ্ধিতে প্রতিটি মুহূর্ত্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। নাম-করা ডাক্তারও সাধারণ মানুষের মতই অন্ধ; তাঁহাদের নিষ্প্রভ চোখের পানে চাহিয়া বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠে। এই সঙ্কটকালে চিকিৎসকের মাথা নাড়া দেখিয়া মন তীব্র হতাশায় ভরিয়া যায়। রোগ আছে এবং থাকিবে, কিন্তু ভগবান করুন, আশ্বাস দিবার কেহ যেন না থাকে। নিদারুণ নৈরাশ্যের মাঝেও একটা পরম প্রশান্তি আছে 'যাহা হইবার হউক,'—কিন্তু আশা যেখানে ক্ষীণ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত অনুজ্জ্বল, সেখানকার ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা নাই। এক ক্ষেত্রে যে ঔষধপ্রয়োগে মানুষ বাঁচিয়া উঠিল, অন্যক্ষেত্রে সেই ঔষধের নাম মাত্রও ডাক্তারের মাথায় আসিল না, ইহার চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কি আছে!

অবশেষে ঠিক হইল, রোগ মেনিনজাইটিস্। দুরন্ত এবং দুরারোগ্য। কিন্তু যখন রোগ ধরা পড়িল, চিকিৎসার কাল তখন অতীত। ডাক্তার রায় দিলেন, এই রোগে

আজ পর্য্যন্ত কেহ বাঁচে নাই—কলিকাতার মত সহরেও নহে। মস্ত একটা সান্ত্বনার কথা বটে। যে-রোগে মরাটাই ধ্রুব সত্য, সে রোগে রক্ষা পাওয়া অনিয়ম। মরিয়া রোগীকে প্রমাণ করিতেই হইবে, এতবড় মারাত্মক ব্যাধি ত্রিভুবনে আর নাই।

সে প্রমাণ অমল হাতে হাতেই দিল। তীব্র আক্ষেপ, কষ্টকর শ্বাস, মাথা চালা দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া আসিল। হিক্কার মত বার দুই উৎকট শব্দ তুলিয়া রোগী পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিল—অতি শ্রান্তিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িল

অমল ত' ঘুমাইল, সতীশের অন্তরে সে-ঘুমের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া কে যেন লেপিয়া দিল। এমন ভীষণ মৃত্যু, অথচ এত শান্ত ও এমন সহজ! বর্ষার আকাশে মেঘ-সঞ্চারের মত নিঃশব্দ ও নিবিড়। বৃষ্টি-ধারা নামিবার পূর্ব্বে মানুষকে যেমন মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিবার অবসর দেয় না, তেমনই দোদুল্যমান কালো যবনিকা মেলিয়া অলক্ষ্য-প্রসারিত করে জীবন-নাট্যমঞ্চের আলোক-অভিনয়কে অতি অকস্মাৎ মৃত্যু ঢাকিয়া দেয়। প্রভেদ এই, সংসার-মঞ্চে অভিনয়ের পট-ক্ষেপণের একটা রীতি আছে, পরবর্ত্তী দৃশ্য উদ্ঘাটনের জন্য কিছু উৎসুক অপেক্ষা আছে,—মৃত্যুর আছে অনিয়ম। সঙ্গতি তাহার কোথাও নাই। অতি উজ্জ্বল আলো, রসঘন আয়োজন, চিত্তের মধ্যে নিবিড় রসানুভূতি, সব কিছুর উপর নিদারুণ ভাবে পূর্ণচ্ছেদ টানিতে দক্ষতা তাহার অসাধারণ।

অমলের কথাই ধরা যাক। যে পরিণত বয়সে লোকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণিতে থাকে (অবশ্য এ কথাও সত্য যে, মৃত্যুর দিন গণিবার আগ্রহ মুখে যে যতই প্রচার করুন, আন্তরিক কামনার সবুজ রং কখনো ফিকা হইয়া যায় না), সে বয়সের সিংহদ্বার অমলের আয়ুর পথ হইতে ছিল বহুদূরে। পূর্ণ যৌবন; চাঁদের টুকরার মত এক দেবশিশু সবেমাত্র তরুণী মায়ের বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি টানিতেছে, বায়ু-আন্দোলিত বনস্পতির শাখাচ্যুত জ্যোৎস্না যেমন নিবিড় অরণ্যের মাঝখানে চাঞ্চল্যে ও দৌরাত্ম্যে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। বৃদ্ধ দাদা ও দিদিমা শিশুকে ঘিরিয়া শৈশব-স্বপ্নের পুনরাবৃত্তিতে মগ্ন-প্রায়; অমলের উপার্জ্জনের টাকা কয়টি সাংসারিক দুশ্চিন্তাকে ফুটিতে দেয় নাই। শীতের পরিচ্ছন্ন আকাশ নূতন-কেনা আয়নার মত ঝকঝকে; হাই তুলিয়া কোন্ নিষ্ঠুর সেই আয়না ঝাপসা করিয়া দিল! এত আকস্মিক মৃত্যু, যে, সহায়-সম্বলহীন বজ্রদগ্ধ এই পরিবারটির ভবিষ্যৎ চিন্তাকে পর্য্যন্ত পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। অনাহারে কেহ মরে না। (এ কথাও খুব সত্য নহে; একদিনের অনাহারে কেহ মরে না বটে—প্রত্যহের পুঞ্জীভূত অভাব ধীরে ধীরে দেহকে ক্ষয় করিয়া আনে, আনে দুরারোগ্য ব্যাধি এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসে মৃত্যু—এ-কথা যে-কোন দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের দিকে চাহিয়া অসঙ্কোচে উচ্চারণ করা চলে। অহরহ অস্বাস্থ্য ও রোগের মূলে আছে সর্ব্ব বিষয়ের অপ্রাচুর্য্য)। ইহাদেরও যাহা হউক উপায় হয় ত হইবে—কিন্তু অকালমৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার কোন পন্থাই কি মানুষ আজ অবধি খুঁজিয়া পায় নাই?

প্রকৃতি যেমন নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া চলে—প্রভাতের পর আসে মধ্যাহ্ন—তারপর অপরাহ্নের কোমল আলোয় আসন্ন রাত্রির আভাস পাওয়া যায়,—জীবন সম্বন্ধে তেমন কোন নিয়ম, কোন ইঙ্গিত বা সতর্কতা নাই। কিন্তু কেনই বা তাহা থাকিবে! চোর গৃহস্থকে সজাগ করিয়া আপন কার্য্য করে না; মৃত্যুও ত' চোর! কে বলে মৃত্যু মহান্? হয় সে জীবনকে ভালবাসে নাই, অথবা মৃত্যুকে কবি-কল্পনার মধ্যে আঁকিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অজুহাতে মহত্ত্বের মুকুট পরাইয়া জনারণ্যের মধ্যে প্রচার করিতে চাহে।

হয়ত অক্ষরের পর অক্ষর সাজাইয়া মৃত্যুকে শ্রুতি-সুখকর করা চলে, আত্ম-বিসর্জ্জনের বা ত্যাগের ছবি আঁকিয়া লোভনীয় করা চলে, স্বদেশপ্রেমের বর্ণপ্রলেপে অতি উজ্জ্বল করিয়া আঁকাও চলে; কিংবা অতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনকে প্রস্তুত করা যায়—কিন্তু অমল যেমন করিয়া মরিল, পরিপূর্ণ সুখের মাঝে—মধ্যাহ্ন-বেলায় চারিদিকের উত্তুঙ্গ কামনা ও অগণন আশা যেন কবির দুইটি লাইনের মত:

'অর্দ্ধ নিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিভে যাবে যবে
বুঝিব কি কেন এসেছিনু ভবে ?...'

প্রকাণ্ড একটা কেন-র চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া—এই মৃত্যুর সান্ত্বনা কোথায় ? সুগৌর তনু এতটুকু কালো হয় নাই, পরিপুষ্ট দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথাও ক্ষয়ের চিহ্ন নাই, ছয় ফুট লম্বা দেহ মেলিয়া অত্যন্ত আরাম করিয়া সে যেন চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইতেছে। শ্রবণ কেবল বধির হইয়া গিয়াছে; এত ডাক, এত কোলাহল ও কাকুতি সে সুগভীর প্রশান্তির মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না। মাটির জগৎ ছাড়িয়া ধ্যানলোকের মহিমায় আত্মা তাহার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া চারিপাশের বিলাপ ও আর্ত্তধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর-মন অবসন্নতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। রোগের সংক্রামতা বায়ুস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে—যে কোনও মুহূর্ত্তে যে-কোন সুস্থ সবল দেহকে সে আক্রমণ করিতে পারে! যতক্ষণ সামান্য মাত্রও জীবনের স্পন্দন থাকে, ততক্ষণ দূর এবং নিকটতম আত্মীয়েরা সহানুভূতি ভরে গায়ে হাত দিয়া রোগীকে সান্ত্বনা দান করেন, কিন্তু মৃত্যু শেষ চৈতন্যটুকু হরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তবিলাপে গগন বিদীর্ণ হইয়া যায়, সসঙ্কোচে পরমাত্মীয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতে থাকেন।

সতীশও বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াইল না। বন্ধু-বিয়োগ-বেদনা ও নিজ জীবনের মমতা দুই-ই পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে ও মাথা নাড়িতেছে। সতীশ বুঝিতে পারিল, তাহার অন্তরে যে ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে, অন্য সকলের শুষ্ক মুখেও সেই ছায়া পরিস্ফুট।

বাড়ী আসিয়া শুষ্ক মুখে সে মাকে জানাইল, "অমল এই মাত্র মারা গেল।"

মা দুঃখ-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

সতীশ বলিল, "বড় ভয়ানক রোগ, ওষুধ নেই, আশা নেই।"

মা শুধু বলিলেন, "আহা!"

সতীশ কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, "বড় বড় ডাক্তাররা কিছু ঠিক করতে পারে না, কত লোক যে কলকাতায় মরল!"

মা ব্যথিত দৃষ্টিতে সতীশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সতীশ বলিতে লাগিল, "আজকাল বড্ড হচ্ছে রোগটা, প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই—"

মা কোন কথা না কহিয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশে নতি জানাইলেন।

সতীশ ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "যা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়!" তাহার মনোগত ইচ্ছা, রোগের সংক্রামতা ও বিনাশ-পটুত্ব জানাইয়া মায়ের আশঙ্কা-নিবিড় স্নেহকে ভাল করিয়া উপভোগ করে। অমল যেমন আকস্মিক মারা গেল, সেও ত' তেমনি চক্ষু মুদিতে পারিত! অমলের মায়ের চক্ষে আজ শ্রাবণের ধারা, সেই আশঙ্কার ঘন ছায়া তাহার মায়ের চক্ষুপল্লবকেও মেঘাবৃত করুক, মায়ের সেই তীব্র উদ্বেগের মধুর আস্বাদ সতীশ এই মুহূর্ত্তে সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে চাহে। কিন্তু সতীশ বুঝিল না, স্নেহময়ীর অন্তরে কি ঝড় উঠিয়াছে। মূঢ় স্নেহ প্রকাশ করিয়া মা বলিলেন, "দিন কতক না হয় ছুটি নে।"

সতীশ নিরুপায়তার ভাণ করিয়া বলিল, "ছুটি! তবেই হয়েছে! যে আপিস, দেবে খতম করে।"

মা এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে কি! অসুখ হ'লেও ছুটি দেয় না?"

সতীশ বলিল, "সত্যিই ত' আর আমার অসুখ হয় নি। বল ত' চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে আসি।"

শঙ্কাতুরা জননীর মূঢ়তা যেন বাড়িয়া গেল, বলিলেন, "তাই আয়।"

মায়ের আশঙ্কাকে নিবিড় অনুভূতিতে পাইয়া পরিতৃপ্ত সতীশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, "তুমি পাগল! চাকরী গেলে খাব কি?"

মাও সে-কথা ভাল করিয়া জানেন। কিন্তু যেখানে দুরন্ত দস্যু উদ্যত প্রহরণ লইয়া প্রাণসংহারের অপেক্ষায় আছে, প্রাণরক্ষার আয়োজন সেখানে সর্ব্বাগ্রে, জীবন-ধারণের সমস্যা তাহার অনেক নীচে।

কণ্ঠে জোর দিয়া মা বলিলেন, "সে যা হয় হবে—তুই চলে আয়।"

এইবার মাকে সান্ত্বনা দিবার পালা সতীশের সে হাসিয়া বলিল, "ভয় পাচ্ছ কেন, জগৎ শুদ্ধ মায়ের ছেলে কলকাতায় চাকরী করছে—জগৎ শুদ্ধ মা যদি তোমার মত ভয়ে সারা হন, তা হলে একদিনে কলকাতা যে ফাঁকা হয়ে যাবে! কোম্পানী কাকে নিয়ে আপিস চালাবে?" হা হা করিয়া হাসিয়া সতীশ ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিল।

মাও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। একা তাঁহারই অন্তর প্রবাসী পুত্রের কল্যাণ-কামনায় প্রবাসিনী হইয়া নাই, বাংলার বহু জননীই দূষিত সহরের আবহাওয়ায় উদ্বেগ ও আশঙ্কা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, বহু কামনাই দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যহ উর্দ্ধগামী হইতেছে। সে সকলই কি অকিঞ্চিৎকর?

সতীশ ঘরে আসিতেই উর্ম্মিলা বলিল, "ছুটিই নাও না দিনকতক?"

উর্ম্মিলার আর মায়ের মনের তাঁতে একই সূতার টানা-পোড়েন, বিপদের মাকুতে যে বুনন চলিতেছে, তাহাতে তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে একই রকমের শাড়ী—এক পাড়, এক জমি!

সতীশ হাসিয়া বলিল, "তুমিও মার মত ক্ষেপলে দেখছি?"

উর্ম্মিলা ভ্রূকুটি করিল, "তার মানে? ঘরে আগুন লাগিয়ে চোখ বুজে ঘুমুতে উপদেশ দাও? এই ত' তোমার হুকুম?"

"কি কথার কি উপমা!"

"উপমা যাই হোক—ছুটি নেবে কি না?"

"আচ্ছা, আজ যেন ছুটি নিলাম—বারমাসে নানান রকমের রোগ ত সহরে—তখন কি হবে?"

উর্ম্মিলা সে কথার জবাব না দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। কথা কাটাকাটি সে হাজার ভালবাসিলেও মৃত্যুকে সামনে রাখিয়া তর্ক করা চলে না। বুকের ব্যাকুলতার সঙ্গে অশ্রুর নিকট সম্বন্ধ। মানুষের মন দুর্ব্বল, —বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির। মিছামিছি সতীশের সামনে খানিক কাঁদিয়া কি হইবে?

একটি ছোট কথা উর্ম্মিলার মনে পড়িল। বধূ না কি বাঙ্গালী ঘরের কল্যাণী লক্ষ্মী। যে বধূর আগমনে গৃহের শ্রী উথলিয়া উঠে—ধনে ও ধান্যে ঘর ও বাহির সমৃদ্ধ হয়, প্রকৃত লক্ষ্মীর অংশ তাহার মধ্যেই বর্ত্তমান। তাহাদের ঘরে সিন্দুক নাই যে ধনে ভরিবে, মাঠ নাই যে শস্যে শ্যামল হইবে—প্রবাসী প্রিয়ের চাকরীটুকুতেই অন্ন ও আশ্রয়ের সমস্যার সমাধান। সতীশের চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে বধূ কিরূপ পয়মন্ত, কত জনে কত ভাবেই না বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্ত্তন করিয়াছে।

সেই ছোট্ট কথাটি আজও মনে পড়ে। বরণের সময় বর-বধূ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে—চারিদিকে উৎসুক প্রতিবেশীর ভিড়। বধূ দুধে আলতায় পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে, কে একজন বলিয়া উঠিল, 'এখন সার্থক হয়—তবে ত' বুঝি!' দুধে আলতায় পা দেওয়া সার্থকই হইয়াছিল। সেই মাসেই চাকরী পাইয়া সতীশ কলিকাতায় যায়।

আর সার্থক না হইলে যে কি হইত, সে কথা তখনকার নববধূ না বলিতে পারিলেও আজিকার উর্ম্মিলা ভাল রূপেই জানে। তাহার কাছে সতীশের জীবনের মূল্য তাহার চাকরীর চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু চারিপাশের অপ্রীতিকর মন্তব্যের মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নহে। ঘরে লোহার সিন্দুক নাই, মাঠে নাই ধান, ভালবাসার বস্তু-তান্ত্রিকতা উর্ম্মিলার অতি কোমল মনেও সোনার কষের মত উজ্জ্বল দাগ টানিয়া দিয়াছে। এই বয়সে চাঁদ, আকাশ বা বহিপ্রর্কৃতি লইয়া মানব-দম্পতি স্বর্গ রচনা করে, কিন্তু উর্ম্মিলা অভাবের অন্তলীন ম্লান হাসিটি চিনিয়া কুণ্ঠাভরা রচনাকে পরিমার্জ্জনা করিতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য প্রচণ্ড আঘাত দিয়া বারবার তাহাকে বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করাইতেছে।

উর্ম্মিলা হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল।

যেন কিছুই হয় নাই এমন ভাবে বলিল, "পান খাবে?"

"দাও।"—বলিয়া সতীশ হাত পাতিল। প্রসঙ্গটা এড়াইতে পারিলে সেও যেন বর্ত্তাইয়া যায়।

পান চিবাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কিছু প্রফুল্ল হইল।

সতীশ বলিল, "ওদের অবস্থা বড় খারাপ, কি করে যে চলবে!"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "যেমন করে হোক ভগবান চালাবেনই।"

সতীশ হাসিল, "ভগবান যদি আমাদের ভার নিতেন, তা হলে কোন্ শর্ম্মা চাকরী করত!"

ঊর্ম্মিলা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তুমি ঠাট্টা করছ?"

এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া সতীশ বলিল, "মোটেই না।"

ঊর্ম্মিলা বলিল, "সে তুমি যাই কর—ভগবান আমাদের ভার কি নেন নি? আমি ত' জানি—তিনি আমার জন্য কতখানি করেছেন।" ভক্তিতে তাহার চোখ দুটি চক্ চকে হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া মিশিয়া গেল।

সতীশ পরিহাস করিবার জোর কণ্ঠে খুঁজিয়া পাইল না। কাহারও দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া কৌতুক করা বেশীক্ষণ চলে না।

বলিল, "মানলাম ভগবান দিয়েছেন, আবার অমলের মত নিতেও ত বেশীক্ষণ নয়।" বলিয়াই মনে হইল, কথাটায় ঊর্ম্মিলাকে কত গভীর ভাবেই না আঘাত দেওয়া হইল।

ঊর্ম্মিলা উত্তর না দিয়া পুনশ্চ বাহিরে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। ব্যস্ত হইয়া সতীশ তাহার হাত ধরিল।

"আহা, শোনই না!"

"শুনব কি?" মুখ ফিরাইয়া ভারি গলায় ঊর্ম্মিলা জবাব দিল।

"তোমার কেবল ওই কথা। যেন মরাটাই বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের দামী কথা!"

গলার স্বরে অভিমানের চেয়ে অসহায়তা অনেকখানি ফুটিল। সতীশ আহত হইয়া বলিল, "বাঁচা বেশী মূল্যবান বলেই ত' মরার কথা ভুলতে পারি না ঊর্ম্মিলা! এইমাত্র চোখে যা দেখে এলাম—না, না, এদিকে এস। আজকের হাওয়াটা গেছে বদলে! তবু তুমি কাছে থাকলে খানিকক্ষণ ভুলে থাকতে পারি।"

ঊর্ম্মিলা কাছে আসিয়া সতীশের হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইল, কোন কথা বলিল না। সতীশও কেমন যেন মুহ্যমান হইয়া গিয়াছে। এই মৃদু স্পর্শকে নিবিড় করিয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করা যেন স্বপ্নের বিষয়—বহু দিনের অতীত বাল্যকালকে যেমন ছোঁওয়া যায় না! মরণকে অনুভব করিয়া কেবলই মনে হইতেছে—পথ চলার কথা। যে-পথের ইসারা সামনে; যেখান দিয়া মানুষ চলিতেছে, সেইটুকুর মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন, ক্ষণকালের জন্য। অগ্রগতির মুখে সে বাঁধনের কতটুকুই বা মূল্য? পথের দুপাশে যে-সব দৃশ্য ফুটিয়া আছে—গতিশীল ট্রেণের গবাক্ষেও ত অমন কত সুন্দর দৃশ্য ফুটিয়া উঠে,—কেবল জানা নাই গন্তব্যের ঠিকানা। কোথায় যে পথের শেষ ও কোথায় যে চলার বিরাম, আজ পর্য্যন্ত সে-নির্দ্দেশ কেহ দিতে পারিল না। কে বলিতে পারে, আজ সন্ধ্যাকালের এই আলাপ কাল প্রভাতে বিলাপে পরিণত হইবে না?

মুহ্যমান সতীশ হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "যাই, একবার দেখে আসি—হয়ত এতক্ষণে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে।"

পথে লোকে ওই কথাই বলাবলি করিতেছে।

কিন্তু যে-হৃদয় হইতে অমলের পার্থিব অন্তর্দ্ধান ঘটিল—সেইখানটিতে 'আহা'র করুণ রাগিণী পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আর সে কথা কহিবে না, মাথা দোলাইয়া হাসিবে না, হাত নাড়িয়া তর্ক করিবে না, কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া কোলাহল জমাইবে না! নাটকের অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের মত তাহার ক্ষণকালীন বিকাশ। অথচ যে তাহাকে নিরন্তর দেখিয়াছে,—প্রতি মুহূর্ত্তে হাসি ও আলাপে নিবিড় করিয়া সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিয়াছে,—এই আকস্মিক রূঢ় বিয়োগ-ব্যথা তাহার বুকে কতখানি বাজিয়াছে, তাহা শুধু সেই জানে!

অমল গেল, কিন্তু সংসারের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া ত' বোধ হয় না। উনানে প্রকাণ্ড কড়াই চাপাইয়া ময়রা তাড়ু নাড়িয়া নাড়িয়া গুড় ঘন করিতেছে, দোকানে আলো জ্বালাইয়া মুদি কাঠের ক্যাশ-বাক্সটার উপরে মোটা খাতা পাতিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে হিসাব লিখিতেছে, খরিদ্দারকে ভাঙ্গানী খুচরা পয়সা গণিয়া দিতেছে, মোড়ের মাথায় ছোকরাদের খেলার গল্প তেমনই জমিয়াছে, ছুতার কাঠে হাতুড়ী-বাটালি দিয়া শব্দ

তুলিতেছে, গণেশ-মন্দিরে হরিসংকীর্ত্তনের রোল পূর্ব্ব দিনের মতই উত্তাল।

এই পাড়ার কয়েকটি লোক মাত্র এই ব্যথাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আর সব প্রাত্যহিক ঘটনার মত অতি সহজে এই সংবাদ শুনিয়াছে। মৃত্যু না মৃত্যু! যেমন গৃহপালিত পশু মরে, পাখী মরে, ঝড়ে গাছ ভাঙ্গে, নদীতে বন্যা দেখা দেয়, ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ী পড়িয়া যায়; এ-সব ক্ষতিতে 'হায়' 'হায়' করা মানুষের স্বভাব। ক্ষতি যার হৃদয়ে বিঁধে, সেই শুধু ধ্বনি দ্বারা তাহাকে প্রচার করে না, দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে।

"দেখেছ সতীশ দা, আকাশে মেঘ উঠল।" বসন্ত কালের আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখা দেয় না; শোক-বিমুখ মানুষগুলিকে শিক্ষা দান করিবার জন্য বুঝি প্রকৃতির এই সহানুভূতি। আজ এখানে যে ক্ষতি হইয়া গেল, তাহাতে দোকানের আলো, মন্দিরের সংকীর্ত্তন, ছেলেদের উচ্চালাপ সব কিছু বন্ধ হইলেই মানাইত ভাল। মূক প্রকৃতি যা পারে মুখর তা পারে না, অথচ শোকপ্রকাশ মানুষেরই অন্তর্নিহিত বৃত্তি!

পশ্চিমের মেঘ ঘন হইবার আগেই ইহাঁরা যাত্রা করিলেন। হয়ত পথে বৃষ্টি নামিবে, হয়ত চিতার কাঠ ভাল জ্বলিবে না, বন্ধুর পথে চলার অসুবিধা, শীতের প্রহারেও জর্জ্জরিত হইবেন অনেকে; তথাপি এই ধরণের যাত্রার পথে এই সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ কতই না মানানসই!

সতীশ ভাল করিয়া আহার করিল না। বিছানায় শুইতেই বাহিরে বৃষ্টি নামিল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অবিরাম ধারাবর্ষণ। পায়ের দিকের জানালা দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে বলিয়া উর্ম্মিলা জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

আর শ্মশানযাত্রীরা?

রুদ্ধদ্বার গৃহে কোমল উষ্ণ শয্যায় শুইয়া সতীশের অন্তর আরামে কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। অবিরাম বৃষ্টিপতনের রাগিণী, গাছের ডালে ঝড়ের দোলা —মন সেই রাগিণীতে যোগ দিয়া ছন্দ গাঁথিতে চাহিতেছে। সেই ছন্দে ব্যথার কবিতার বুনন ও সুখের বিচিত্র চিত্রণ দুইই চলে ভাল। দুয়েতেই তীব্রতা আছে,—আস্বাদ আছে,—বিভিন্ন দিক্ দিয়া জীবনকে উপভোগ করিবার সাধ আছে, প্রাণ দুয়েতেই জাগিয়া আছে। বেশ জীবন! আজ আছে কাল নাই, এই দণ্ডে আছে—পরমুহূর্ত্তে থাকিবে না, যেন খেয়ালীর খেলার লীলায় তাসের মত 'পরতা' ঘুরিতেছে। যে জগতের মানুষ গৌরব আয়ত্ত করিতে দুর্গম পাহাড়ে উঠে, বায়ুযানে আকাশের মেঘস্তর বিদীর্ণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, সমুদ্রকে রূঢ় ভাবে শাসন করে, বিজ্ঞানের কৌশলে বিশ্বামিত্রের মত নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে চাহে, নূতন মানুষ, নূতন যন্ত্র, এমন কি আয়ু শিখাকে উজ্জ্বল করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মানুষকে অমৃতত্বের মোহানায় উত্তীর্ণ করিয়া দিবে আশা করে—সেই জগতে আজ সামান্য জ্বর বা অতিসামান্য উপসর্গে দণ্ড কয়েক পূর্ব্বের সুস্থ সবল মানুষ একেবারে নিঃসাড় হইয়া পড়ে! কেন এমন হয়?

"কি ভাবছ?"

সতীশ চমকিত হইয়া কহিল, "অ্যাঁ!"

"কি ভাবছ?"

সতীশ মাটির জগতে ফিরিয়া আসিল। অদ্ভুত কণ্ঠে কহিল, "ভাববার কি কিছুই নেই, উর্ম্মিলা?"

উর্ম্মিলা সহজ ভাবেই বলিল, "যা হবে, তা নিয়ে মিছে ভেবে কি ফল? ভেবে যদি কিছু উপায় হত—"

সতীশ কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, "না, না, তুমি বুঝছ না। আমরা আছি দ্বীপের উপর—চারদিকে সমুদ্র—অকূল। উদ্বেল হয়ে যে-কোন মুহূর্ত্তে আমাদের ডুবিয়ে দিতে পারে। এ সময় না ভেবে হাসি আমোদ আসে কি করে?"

উর্ম্মিলা করুণ হাসি হাসিয়া বলিল, "অধীর হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ভাবনটা শেষ করতে চাও?"

অধীর ভাবে সতীশ বলিল, "সমুদ্রে ঝাঁপিয়েই পড়ি আর বন্যাতেই ডুবি, ফল একই।"

"একই নয়। মরণ নিশ্চিত এ কথা সবাই জানে, কিন্তু বাঁচবার চেষ্টাও ত' লোকে সেই সঙ্গে করে।"

"হাসালে উর্ম্মিলা, যেখানে মরণ নিশ্চয় সেখানে বাঁচার প্রসঙ্গ বাতুলতা মাত্র! কি করে বাঁচবে?"

"কেন, সমুদ্র যখন উত্তাল হবে, তখন তৈরী করব ভেলা।"

"তারপর ?"

"তারপর আবার কি—তখনকার মত ত' বাঁচব।"

"যখন ঢেউয়ের আঘাতে ভেলা ভাঙ্গবে ?"

"ভেলা যে ভাঙ্গবে তা জানি। যতক্ষণ না ভাঙ্গে ততক্ষণ ত' জীবন থাকে। ভেলা ভাঙ্গবার আগে নতুন উপায় বার করতে পারি—আরও কিছুদিন বাঁচতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, সমুদ্রে ডুবে যাবার ভয় যখন জেগেছিল, তারও কত পরে বেঁচে রইলাম!"

"তুমি যা বলছ বুঝেছি। কোন ক্রমে বেঁচে থাকাটাই উদ্দেশ্য। রোগ যেন সমুদ্র আর ডাক্তার ভেলা। যতক্ষণ ঢেউয়ের তালে তাল দিতে পারে, ততক্ষণই নিরাপদ।"

উর্ম্মিলা হাসিল, "আমরা যেখানে রয়েছি, সে কিন্তু উদ্বেল সমুদ্র নয়, কথাটাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য শক্ত উপমা দেওয়া গেল। কাজ বন্ধ করে ভাবনা-চিন্তা নিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে? এ ভাবনা কি তুমিই নতুন ভাবছ ?"

সতীশ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে উর্ম্মিলার পানে চাহিয়া
"তুমি ভাব ?"

পরম নিশ্চিন্তভাবে উর্ম্মিলা বলিল, "ভাবি বৈকি! যখন কেউ হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে মরে, বলি, আহা! এমন ভাগ্য কি আমার হবে!" কেউ বিধবা হ'লে বুকখানা ভয়ে শুকিয়ে যায়, বলি অতিবড় শত্রুও যেন এমন ব্যথা না পায়। কিন্তু, যাই বলি আর যাই ভাবি—এ ছাড়া পথ ত' নেই।" বলিয়া ললাটে তর্জ্জনী ঠেকাইল।

"তোমার নিজের মরণ ভেবে ভয় হয় না ?"

ঘাড় নাড়িয়া উর্ম্মিলা বলিল, "হয় না যে তা নয়, তবে খুব বেশীক্ষণ সে ভয় থাকে না। যেমন জলে ষ্টীমার গেলে খানিকক্ষণ ঢেউ ওঠে, তেমনি। যা ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তা নিয়ে খুব বেশীক্ষণ কি ভাবা যায়? তা হলে যে মানুষ পাগল হয়ে যাবে!"

সতীশ সহসা উর্ম্মিলার হাত দুখানি টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "সেই নির্ভাবনার খানিকটা আমায় দাও, উর্ম্মিলা। মরণের ষ্টীমার আজ আমার বুকের নদী দিয়ে চলে গেছে। যেমন ঢেউ—তেমনি দোলা। এত চেষ্টা করছি—অমলের মরণটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এ যেন আমারই যাত্রাপথের প্রথম পা বাড়ান।"

উর্ম্মিলা একখানি হাত ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি ঘুমোও—আমি বাতাস করছি।"

চক্ষু মুদিয়া সতীশ উর্ম্মিলার স্পর্শকে ও সেবাকে সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। সেই উত্তপ্ত স্পর্শে অনেক খানি আলো ও অনেক খানি আশা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। ঘন কুয়াসার তিমির অপসারিত করিয়া প্রভাতের সূর্য্য যেন সবে মাত্র উদয়াচলে দেখা দিলেন!

সতীশ পুনরায় উর্ম্মিলার হাতখানি নিঃশব্দে টানিয়া লইয়া আপনার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

জনসাধারণ

...এখনও যাঁহাদের চরিত্র এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা এবং কপটতার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে স্পৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা এখনও সভ্য মানুষগুলির উপহাসের পাত্র, তাঁহারাই আমাদের মতে "জনসাধারণ" পদবাচ্য। যাঁহারা "জনসাধারণ", তাঁহারা প্রায়শঃ অশিক্ষিত ও নির্ব্বোধ বলিয়া মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজে কৃষকরূপে সর্ব্বসাধারণের অন্ন; তাঁতী ও জোলা রূপে সর্ব্বসাধারণের বস্ত্র; রাজ, মজুর ও ঘরামী রূপে সর্ব্বসাধারণের গৃহ; ছুতার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও কাঁসারী রূপে সর্ব্বসাধারণের তৈজসপত্র সর্ব্বদা সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন।...

"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা

পূর্ব্বানুবৃত্তি

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

নিম্নলিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত কথা যে যুক্তিযুক্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে :—

(১) বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যে-কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপ-স্থ, বহ্নি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। এক কথায়, যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম "ধর্ম্ম" ;

(২) "ধর্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপ-স্থ, তেজঃ এবং স্পর্শশক্তিবশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। এক কথায়, মানুষ যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার "ধর্ম"। যথা—'চোরের ধর্ম', 'সাধুর ধর্ম' ইত্যাদি ;

(৩) শরীরের যাহা কিছু কাটিয়া ফেলিলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে দৃষ্টি-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ও চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, তাহার নাম উপ-স্থ এবং যাহা কাটিয়া ফেলিলে ঐ ছয়টি শক্তির কোন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম অপ-স্থ ;

(৪) জীবের উপ-স্থ বস্তুগুলির শক্তি অটুট রাখিবার উপযোগী কার্য্য করিলে জীব তাহার নীরোগতা ও কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে ;

(৫) জীব ও জগতের মূল কারণ ব্যোম। ব্যোমের দুইটি অবস্থা আছে। একটির নাম "অশরীরী" অবস্থা এবং অপরটির নাম "ভূত" অবস্থা ;

(৬) "অশরীরী-ব্যোম" হইতে "ভূত-ব্যোমের" উদ্ভব হয় এবং "ভূত-ব্যোম" হইতে ক্রমশঃ বায়ু, অম্বু, বহ্নি, পরমাণু, অণু, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ এবং রোমকূপের উদ্ভব হইয়া থাকে ;

(৭) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন শীতল স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে শীতলতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অম্বু" বলা হয়। "অম্বু"র শীতলতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "অপ্", "জল" ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে ;

(৮) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন উষ্ণ স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে উষ্ণতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বহ্নি" বলা হয়। "বহ্নি"র উষ্ণতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "অগ্নি", "তেজঃ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে ;

(৯) আমাদের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে প্রকৃত বিশুদ্ধ বায়ু, অথবা বিশুদ্ধ অম্বু, অথবা বিশুদ্ধ বহ্নি অবিমিশ্রভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নীলাকাশের নিকটে যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ অম্বু এবং বিশুদ্ধ বহ্নির বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে ;

(১০) জীব তাহার শরীরের মধ্যে যে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি সাধারণতঃ পোষণ করিয়া থাকে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। কি না, তাহার বিচার করিলে

প্রতিনিয়ত নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ঐ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির অবিশুদ্ধতার মাত্রানুসারে জীবের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মাত্রার তারতম্য হয় ;

(১১) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিতে পারিলে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় ;

(১২) বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির মূল কারণ—অশরীরী ব্যোমকে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ স্পর্শ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋগ্‌বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণসহকারে "উদান-বায়ু"র অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বায়ুর সমতাসাধন" ও "উদান-বায়ু" কাহাকে বলে, তাহার আলোচনাও গত বৈশাখ-সংখ্যায় করা হইয়াছে ;

(১৩) ভূত-অবস্থার ব্যোমকে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ স্পর্শ করিতে না পারিলে উদান-বায়ুর অনুধাবন করা যায় না এবং উদান-বায়ুর অনুধাবন করিতে না পারিলে ব্যোমের অশরীরী অবস্থা স্পর্শ করা, অর্থাৎ "ব্রহ্ম" সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না ;

(১৪) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ...ন্দ. উচ্চারণসহকারে "ব্যান-বায়ু"র অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "ভূত"-অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের "ভূত"-অবস্থা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করারা কার্য্য" বলা হইয়াছে। যে বিশুদ্ধ বহ্নিবশতঃ ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা হইতে "ভূত" অবস্থা পরিগৃহীত হয়, সেই বিশুদ্ধ "বহ্নি"কে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে ;

(১৫) উপরোক্ত একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ দফার সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যায়—বিশুদ্ধ বহ্নি কি বস্তু—এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ঈশ্বর প্রত্যক্ষ** করা যায়—এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ব্রহ্মের সাক্ষাৎ** লাভ করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করা সম্ভব হয়। শরীরাভ্যন্তরে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। কাযেই, এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ "বহ্নি" কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং শরীরাভ্যন্তরে তাহা অটুট রাখিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধি-যন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় ;

(১৬) মানুষ তাহার কতকগুলি কু-প্রকৃতিবশতঃ

তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে "বহ্নি" আছে, ঐ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তাহার জন্য মানুষের জীবন অবিমিশ্র সুখময় না হইয়া সুখ-দুঃখমিশ্রিত হইয়া থাকে। মানুষের কু-প্রকৃতির সংখ্যা সাধারণতঃ আটটি, যথাঃ—(১) অহঙ্কার, (২) কু-বুদ্ধি, (৩) বিক্ষিপ্ত মন, (৪) আকাশ, (৫) বায়ু, (৬) অনল, (৭) আপ ও (৮) ভূমি;

(১৭) শরীরাভ্যন্তরস্থ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে উপরোক্ত আটটি প্রকৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে;

(১৮) মানুষের কেন ঐ আটটি কু-প্রকৃতির উদ্ভব হয়, তাহার অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্যবশতঃ যথাক্রমে মানুষ অহঙ্কারী, কু-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিক্ষিপ্তমনাঃ এবং আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়;

(১৯) উপরোক্ত অষ্টাদশ দফা হইতে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে মানুষের মেদ, অস্থি, মজ্জা বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানুষ তাহার প্রধান আটটি কু-প্রকৃতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে;

(২০) স্পর্শ-শক্তি অটুট থাকিলে শরীরস্থ মেদাদি যাহাতে অত্যধিক উষ্ণ না হয়, তাহা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং শরীরস্থ মেদাদির উষ্ণতা যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায়, তাহা করিতে পারিলে মানুষ তাহার আটটি কুপ্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এবং তখন মানুষের অবিমিশ্র সুখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা হয়;

(২১) ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—নীরোগতা সাধন করিয়া কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করা এবং আটটি কুপ্রকৃতির হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া অবিমিশ্র সুখ ভোগ করা, অথবা এক কথায়, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করা;

(২২) ধর্ম্মের উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল করিবার উপায় —কি প্রকারে জীবের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তাহার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থা সংঘটিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া;

(২৩) উপরোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং তাহা সফল করিবার উপায় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, "ধর্ম্ম" শব্দের বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে—সেই কার্য্য অথবা চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে কি প্রকারে জীবের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তাহার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থা সংঘটিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে, জীবের উদ্ভব, বিকাশ, সাত্ত্বিক অবস্থা, রাজসিক অবস্থা এবং তামসিক অবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধিলাভ, অর্থাৎ কর্ম্মতঃ শিক্ষালাভ করিতে হয়, তাহার নাম "ধর্ম্ম";

(২৪) বৈশেষিক দর্শনে ভারতীয় ঋষি "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার সহিত উপরোক্ত সংজ্ঞা সাদৃশ্যযুক্ত কি না, তাহার বিচার করিলে

দেখা যাইবে যে, ঐ দুইটি সংজ্ঞাই অবিকল একরূপ ;

(২৫) কাযেই দেখা যাইতেছে যে, "ধর্ম্ম" শব্দটির বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতীয় ঋষি তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে ধর্ম্মের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন ;

(২৬) অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ঋষিগণের "ধর্ম্ম"-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা খুবই সুস্পষ্ট এবং তাহা যে বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, তাহার কারণ, তাঁহারা ভারতীয় ঋষির প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না ;

(২৭) জীবের দেহ প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—সত্ত্বা, আত্মা ও শরীর। জীবের দেহাভ্যন্তরে যে ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি বিদ্যমান আছে, তাহা লইয়া জীবের "সত্ত্বা"। আর, ঐ দেহাভ্যন্তরে যে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বক্ বিদ্যমান আছে, তাহা লইয়া জীবের "শরীর"। যাহার, অথবা যে কার্য্যের বিদ্যমানতাবশতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি, অর্থাৎ সত্ত্বা হইতে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বকের, অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং শরীর হইতে সত্ত্বার উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার নাম আত্মা ;

(২৮) মেদাদি অর্থাৎ শরীরের অস্তিত্ববশতঃ জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং শরীরেরই বা কেন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা সামবেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;

(২৯) ব্যোমাদি অর্থাৎ সত্ত্বার অস্তিত্ববশতঃ জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং সত্ত্বারই বা কেন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা যজুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;

(৩০) আত্মার অস্তিত্ববশতঃ জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তিরই বা কেন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;

(৩১) নিম্নলিখিত চৌদ্দটি বিষয় অথর্ব্ববেদে আলোচিত হইয়াছে :—

(ক) শরীর-গঠন-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের শরীর-গঠনের বর্ণনা ;

(খ) শরীর-বিধান-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এবং জীব-শরীর কিরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা ;

(গ) শব্দ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের শব্দক্ষমতা কিরূপভাবে উদ্ভূত এবং পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ঘ) স্পর্শ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের স্পর্শক্ষমতা কিরূপভাবে উদ্ভূত এবং পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ঙ) রূপবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে রূপ কিরূপভাবে উদ্ভূত হয় এবং তাহার রূপবোধক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা ;

(চ) রস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে রস কিরূপভাবে উদ্ভূত হয় এবং তাহার রসবোধক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ছ) গন্ধ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে গন্ধ কিরূপভাবে উদ্ভূত হয় এবং গন্ধবোধ-

ক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা ;

অখণ্ড বায়বীয় ও তরল বস্তুসমূহ কিরূপভাবে খণ্ডনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়া সংখ্যাযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে ;

(জ) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে কেন ব্যাধির উদ্ভব হয় এবং কি করিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ঝ) ধর্ম-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীব কেন বিভিন্ন-স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং কোন্ স্বভাবের কি পরিণতি, তাহার বর্ণনা ;

(ঞ) ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে চলাফেরা করিবার কি কি ব্যবস্থা হইলে মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু-সমূহ অর্জ্জন করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখিতে পারে, তাহার বর্ণনা ;

(ট) জীবের "সত্ত্বা" বলিতে কি বুঝায় এবং এই "সত্ত্বা"র সহিত বায়ুমণ্ডল ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কি সম্বন্ধ এবং ঐ সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কি কি ভাবে নিজকে গঠিত করিতে হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ঠ) জীবের "আত্মা" বলিতে কি বুঝিতে হয় এবং ঐ আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্যের কি সম্বন্ধ, তাহার, এবং ঐ সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপ ভাবের সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ড) জীবের "শরীর" বলিতে কি বুঝিতে হয় এবং শরীরের সহিত তাহার সত্ত্বার ও আত্মার কি সম্বন্ধ এবং ঐ সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপ ভাবের সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহার বর্ণনা ;

(ঢ) জীবের "জ্ঞান" বলিতে কি বুঝিতে হয় এবং যথাযথভাবে জ্ঞান লাভ করিবার কি উপায়, তাহার বর্ণনা ;

(৩২) উপরোক্ত ২৭শ দফা হইতে ৩১শ দফা পর্য্যন্ত যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহা পরিজ্ঞাত হইলে মানুষ অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তি ও সন্তুষ্টির সহিত স্বাবলম্বনে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা সমস্তই ভারতীয় ঋষিগণ চারিটি বেদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আরও দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক তথ্যটি কি করিয়া জ্ঞানতঃ (theoretically) অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা যেমন তাঁহারা অথর্ব্ববেদে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ আবার উহা কি করিয়া কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সাম, ঋক্ এবং যজুর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাযেই, ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কোন রকম ভাবেই অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক অথবা কাল্পনিক বলা যাইতে পারে না।

স্যর রাধাকৃষ্ণন্ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়া থাকেন, তাহা যে প্রায়শঃ ভারতীয় ঋষিগণের কথার বিরুদ্ধ তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জ্ঞানও যে বিশ্বাস-যোগ্য নহে, তাহা দেখান হইতেছে।

ডাঃ দাশগুপ্তের বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য কথা ২৫টি, যথা :—

(১) রিলিজিয়ান এবং উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ধর্ম্মের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন ;

(২) প্রকৃত ধর্ম্ম মানবীয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ;

(৩) ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ অনুভূতি থাকিতে পারে ;

(৪) ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিই সুকুমার কলার উদ্দেশ্য ;

(৫) কলাবিদ্ রসসৃষ্টিতে এবং কলারসিক সেই রস উপভোগে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যান ;

(৬) সুকুমার কলা সমগ্র মানবজাতিকে সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে ;

(৭) ধর্ম্ম কলার ঊর্দ্ধে, কারণ ধর্ম্মের সম্পর্ক শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিরই সহিত নহে, মানুষের সমগ্র সত্তার সহিতই ধর্ম্মের সম্পর্ক ;

(৮) যদি বিজ্ঞানের দিক্ হইতে নীতিবোধের বিচার করা যায়, তবে উহাতে বহু দুরতিক্রম্য অসামঞ্জস্য দেখা যায় ;

(৯) ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হইলে নীতিবোধ উহার একটি স্বাভাবিক উপফলস্বরূপ হইয়া পড়ে ;

(১০) সাধারণ নীতিশাস্ত্র অনুসারে সুনীতিসম্মত আচরণই যথেষ্ট ;

(১১) ধর্ম্মজগতের নীতিবোধ অনুসারে মননে এবং চিন্তনেও সুনীতি রক্ষা করিতে হইবে ;

(১২) ধর্ম্ম ও কলাজগতে আচার ও প্রথাগুলি অনুষ্ঠান-বিধি মাত্র ;

(১৩) মনকে সমগ্র মানবজাতির একাত্মবোধের উপ-যোগী করিয়া গঠন করাই ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত ;

(১৪) যদি মন আর্দ্র না হয়, যদি মনের কণ্টকসমূহ সমূলে উৎপাটিত না হয়, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন না ;

(১৫) মানুষের মধ্যে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের মধ্যে মানুষ— ইহাই ধর্ম্মের প্রথম ও শেষ কথা ;

(১৬) ইহুদীদের মতে ঈশ্বর একমাত্র তাঁহাদের রক্ষক। তাঁহারা শুধু একটি উপজাতির সমস্ত লোকের ভ্রাতৃসম্পর্কে বিশ্বাসী ;

(১৭) মুসলমানেরা সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারা একমাত্র মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ;

(১৮) খৃষ্টধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব প্রচার করেন। কিন্তু, আদিম যুগে খৃষ্টানদিগের উপর যে নির্য্যাতন হইত, তাহার ফলে তাঁহারা শুধু খৃষ্টানদের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়া থাকেন ;

(১৯) হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্ম কেবল সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নহে, সমগ্র জীবের মধ্যেই ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রচার করেন ;

(২০) বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার-শিক্ষা, আত্মসংযম এবং সর্ব্বভূতে সমাত্মবোধ ;

(২১) যৌগিক, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদেও আত্মসংযম, সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ্য এবং একাত্মবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ;

(২২) শিক্ষিত সমাজের এবং নেতৃবর্গের ঔদাসীন্যবশতঃ দেশে ক্রমেই সংস্কৃতচর্চ্চা উঠিয়া যাইতেছে ;

(২৩) সংস্কৃত ভাষার উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিতে হইলে বিশেষ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অত্যাবশ্যক। কিন্তু তেমন ছাত্রেরা সংস্কৃত শিক্ষা করে না। সুতরাং যাহারা সংস্কৃত শিক্ষা করে, তাহারা প্রায়ই গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না ;

(২৪) যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অযোগ্য হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিও মূল্যহীন, আমাদের কোন ইতিহাস নাই এবং আমরা একটি অপদার্থ জাতি ;

(২৫) যদি ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য কোনও ভাষা নির্ব্বাচন করিতে হয়, তবে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা আর নাই।

উপরোক্ত ২৫টি কথার মধ্যে তিনটি কথার আলোচনা আমরা করিয়াছি।

তাহাতে নিম্নলিখিত সত্যসমূহ প্রমাণিত হইয়াছে :—

(১) প্রকৃতিগত অর্থ ধরিলে "ধর্ম্ম"কে কোন ক্রমেই "রিলিজনে"র প্রতিশব্দ বলিয়া ধরা চলে না।

(২) ডাঃ দাশগুপ্তের মতে "প্রকৃত ধর্ম মানবীয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত"। কিন্তু ধর্ম ও অনুভূতি এই দুইটি কথার অর্থ কি, তাহা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু অনুভূতি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ;

(৩) ডাঃ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন বটে যে, ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ অনুভূতি থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের দর্শনের জ্ঞান বেদের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, যে সমস্ত অনুভূতি জীবের ধর্ম্মবশতঃ হইয়া থাকে, সেই সমস্ত অনুভূতি আর কোন ক্ষেত্রে হয় না।

মানুষ তাহার ধর্ম্মবশতঃ যে সমস্ত অনুভূতি পায়, তাহা ছাড়া তাহার অজ্ঞান ও উত্তেজনাবশতঃ কতকগুলি অনুভূতি সে পাইয়া থাকে।

ধর্ম্মবশতঃ অনুভূতিসমূহ মানুষকে যেরূপ উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে,অজ্ঞান ও উত্তেজনাবশতঃ অনুভূতি-সমূহ সেইরূপ তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়।

ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহার বক্তৃতার চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উক্তিতে "ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি", 'আধ্যাত্মিক বিষয়' এবং "কলা" সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, আমাদের মতে তাঁহার এই কথাগুলি অত্যন্ত আল্‌গা (loose)। আমাদিগের অভিমত যে বিবেচনাযোগ্য তাহা সুপ্রমাণিত করিবার জন্য আমরা এই সংখ্যায় "ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি," "আধ্যাত্মিক বিষয়" এবং "কলা" সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আধ্যাত্মিক বিষয়, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং সুকুমার কলা

"ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি", "আধ্যাত্মিক বিষয়" এবং "কলা" সম্বন্ধে ডাঃ দাশগুপ্ত যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দ্বারা এবং সুকুমার কলার দ্বারা আমাদিগের পক্ষে আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধি করা এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে।

আমরা ভারতীয় ঋষিগণের যে কয়খানি গ্রন্থ যে অর্থে পড়িয়াছি, তাহাতে ঐ কথা পাওয়া যায় না। পরন্তু ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শনে ঐ ঐ বিষয়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ও সুকুমার কলার দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধি করা, অথবা প্রকৃত আনন্দ লাভ করা ত' দূরের কথা, কোন মানুষ যখন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অথবা সুকুমার কলার সৌন্দর্য্য লইয়া মত্ত হয়, তখন সেই মানুষ মোহ-মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান বিকৃত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে যে মানুষ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অথবা সুকুমার কলার উপাসক হইয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে নিজের মনের সহিত প্রতারণা আরম্ভ করিতে হয় এবং সর্ব্বদা তাঁহার বুকের ভিতর বিবিধ রকমের কামাগ্নি ও হিংসাপ্রবৃত্তি বশতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষ্টীম ইঞ্জিন চলিতে থাকে এবং তিনি বর্ত্তমান জগতের কবিসম্রাট্, সাহিত্যসম্রাট্ ও ভাষা-সম্রাট্গুলির মত মানুষের চিত্তবিনোদন করিবার নামে তাঁহার বন্ধু ও ভক্তগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু বড় গলায় অথবা তথা-কথিত ভক্তিপ্রবণ কণ্ঠে "আধ্যাত্মিক" "আধ্যাত্মিক" বলিয়া চীৎকার করিলেই, অথবা তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই প্রকৃতভাবে আধ্যাত্মিক হওয়া, অথবা আধ্যাত্মিক বিষয় উপ-লব্ধি করা সম্ভব হয় না।

আমাদিগের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক বিষয় কি কি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্ব-প্রথমে আমাদিগের দৈহিক বিষয় কি কি, তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, তাহা পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে, কোন্‌টি তাহার আধ্যাত্মিক বিষয়, অথবা কোন্‌টি তাহার দৈহিক বিষয়, তাহা ঠিক করিয়া বুঝা সম্ভব হয় না। কাজেই কোন্‌টি মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে দৈহিক বিষয় উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহারও

আগে কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, তাহার সম্পূর্ণ সন্ধান রহিয়াছে, ভারতীয় ঋষির অথর্ব্ববেদে। মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষি তাঁহার অথর্ব্ববেদে যে যে সন্ধান দিয়াছেন, সেই সেই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, তাহা পরীক্ষা করিবার বিধি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সাম, ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদে। সকলের পক্ষে সকল রকমে সকল স্থানে সকল অবস্থায় ভারতীয় ঋষির বেদ অধ্যয়ন করা অথবা অভ্যাস করা সম্ভব হয় না। যাহা যাহা করিলে বেদ অধ্যয়ন করা, অথবা তাহার অভ্যাস করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে দর্শন, মীমাংসা এবং উপনিষদে।

কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অবয়বের মধ্যে তিন শ্রেণীর বিষয় আছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বিষয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আর এক শ্রেণীর বিষয় আছে, যাহা চক্ষু, কর্ণ অথবা নাসিকা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তাহা জিহ্বা এবং ত্বকের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সেইরূপ আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর বিষয় আছে, যাহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অথবা জিহ্বা দ্বারা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

মানুষের আভ্যন্তরীণ এই তৃতীয় শ্রেণীর বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, একমাত্র ত্বকের দ্বারা।

মানুষের আভ্যন্তরীণ যে যে বিষয় তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেই সেই বিষয়কে ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে "শারীরিক" অথবা "দৈহিক" বিষয় বলা হইয়া থাকে।

মানুষের আভ্যন্তরীণ যে যে বিষয় কেবলমাত্র তাহার জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না, সেই সেই বিষয়কে "আত্মিক" অথবা "আধ্যাত্মিক" বিষয় বলা হইয়া থাকে।

মানুষের আভ্যন্তরীণ যে যে বিষয় কেবলমাত্র তাহার ত্বকের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, সেই সেই বিষয়কে 'সাত্বিক' বিষয় বলা হইয়া থাকে।

"সত্ত্বা," "আত্মা" এবং "শরীর" লইয়া যে মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে আমাদিগের পাঠকবর্গকে অনেক বার শুনাইয়াছি।

যে যে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ লইয়া মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, সেই সেই অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটির কতিপয় অংশ "সাত্বিক" বিষয়, কতিপয় অংশ "আত্মিক" অথবা "আধ্যাত্মিক" বিষয় এবং কতিপয় অংশ "শারীরিক" বিষয়। মানুষের অবয়বের কোন অঙ্গ অথবা প্রত্যঙ্গ কেবলমাত্র সাত্বিক, অথবা আত্মিক, অথবা শারীরিক বিষয় সম্ভূত হইতে পারে না।

মানুষের অবয়বের কোন অঙ্গ অথবা প্রত্যঙ্গ যে কেবলমাত্র সাত্বিক অথবা আত্মিক অথবা শারীরিক বিষয়সম্ভূত হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার জন্য চক্ষুর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, চক্ষুটিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিম্নলিখিত তিনটি :—

(১) শরীরের কোন্ অঙ্গকে চক্ষু বলা হইয়া থাকে।

(২) কোন্ শক্তির বলে কর্ণের দৃষ্টিশক্তি না হইয়া চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হইয়া থাকে।

(৩) যে শক্তির বলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই শক্তি কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়।

শরীরের যে অঙ্গকে "চক্ষু" বলা হইয়া থাকে, সেই অঙ্গ চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিযোগ্য বটে, কিন্তু যে শক্তির বলে কর্ণের দৃষ্টিশক্তি না হইয়া চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হইয়া থাকে, সেই শক্তি চক্ষু অথবা কর্ণ অথবা নাসিকার উপলব্ধির যোগ্য নহে। সেই শক্তি কেবলমাত্র জিহ্বা এবং ত্বকের উপলব্ধিযোগ্য। সেইরূপ আবার যে শক্তির বলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই উভয়েরই দ্বারা সেই শক্তির উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যে "দ্রব্য" হইতে সেই শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই দ্রব্যকে উপলব্ধি করা চক্ষু, অথবা কর্ণ, অথবা নাসিকা, অথবা জিহ্বা দ্বারা পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না। সমস্ত শক্তির মূলাধার যে "দ্রব্য" তাহা একমাত্র ত্বকের উপলব্ধির যোগ্য।

এই হিসাবে শরীরের যে অঙ্গকে চক্ষু বলা হইয়া থাকে এবং তাহার যে অংশ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির যোগ্য, সেই অংশকে মানুষের চক্ষুর শারীরিক বিষয় বলিতে হইবে।

যে শক্তির বলে কর্ণের দৃষ্টিশক্তি না হইয়া চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি হইয়া থাকে এবং যাহা কেবলমাত্র জিহ্বা ও ত্বকের উপলব্ধিযোগ্য বটে, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিযোগ্য নহে, সেই শক্তিকে মানুষের চক্ষুর আত্মিক অথবা আধ্যাত্মিক বিষয় বলিতে হইবে।

যে শক্তির বলে চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি হইয়া থাকে এবং তাহা যে "দ্রব্য" হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহা কেবলমাত্র ত্বকের উপলব্ধিযোগ্য, সেই "দ্রব্য"কে মানুষের চক্ষুর সাত্ত্বিক বিষয় বলিতে হইবে।

আমাদের অবয়বের বিভিন্ন অ ও প্রত্যঙ্গের কোন্ অংশ শরীর, কোন্ অংশ আত্মা এবং কোন্ অংশ সত্ত্বা তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির দৌরাত্ম্যের জন্য আমাদের পক্ষে প্রায়শঃ কোন আভ্যন্তরীণ অঙ্গের উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কারণ, আমরা প্রায়শঃ বাহিরের কোন বস্তুকে সুদৃশ্য, কোন বস্তুকে কুদৃশ্য, কোনটিকে সুশ্রাব্য কোনটিকে অশ্রাব্য, কোনটিকে সুগন্ধি, কোনটিকে দুর্গন্ধি, কোনটিকে সুরসের, কোনটিকে কু-রসের, কোনটিকে কোমল স্পর্শের, কোনটিকে কঠিন স্পর্শের মনে করিয়া, যে বস্তুটি আমাদের প্রীতিপ্রদ, সেইটিকে পাইবার জন্য, আর যেটি আমাদের বিরক্তিকর সেইটিকে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রতি-নিয়ত ব্যস্ত হইয়া থাকি। বাহিরের জিনিষ হইতে নিজের মনকে সরাইয়া আনিয়া, একটি বস্তুবিশেষকে কেন সুন্দর অথবা কুৎসিত মনে করিতেছি, স্ব স্ব অভ্যন্তরে তাহার সন্ধান লইবার প্রবৃত্তি প্রায়শঃ আমাদের থাকে না। অথচ, কোন্‌টি শারীরিক বিষয়, কোন্‌টী আধ্যাত্মিক বিষয় এবং কোন্‌টি সাত্ত্বিক বিষয়, তাহা স্থির করিয়া আধ্যাত্মিক সুখ উপলব্ধি করিতে হইলে একটি বস্তুবিশেষকে কেন সুন্দর অথবা কুৎসিত মনে করিতেছি, স্ব স্ব অভ্যন্তরে তাহার সন্ধান লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

দার্শনিক ভাষায় বাহিরের কোন একটি বস্তুকে সুন্দর অথবা কুৎসিত, সুশ্রাব্য অথবা কুশ্রাব্য, সুগন্ধি অথবা দুর্গন্ধি, সুরসের, অথবা কুরসের, কোমল অথবা কঠিন মনে করার নাম **ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি**। আর কোন বস্তুবিশেষকে কেন আমাদের মন সুন্দর অথবা কুৎসিত বলিয়া ধরিয়া লইতেছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করার নাম **"আত্মোপলব্ধি"** অথবা **বুদ্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া**।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, **ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে** বাহিরের জিনিষ লইয়া মত্ত থাকিতে হয় এবং তাহাতে আভ্যন্তরীণ কোন উপলব্ধি পাওয়া কখনও সম্ভব হয় না। আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি পাইতে হইলে আত্মোপলব্ধি পাওয়ার অথবা স্বীয় বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহার বক্তৃতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফায় বলিয়াছেন :—

(৫) কলাবিদ্ রসসৃষ্টিতে এবং কলারসিক সেই রস উপভোগে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যান ;

(৬) সুকুমার কলা সমগ্র মানবজাতিকে সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে।

ডাঃ দাশগুপ্ত "কলা" শব্দে কি বুঝিয়া থাকেন তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় "কলা" এবং "চিৎ-কলা" নামক দুইটি শব্দ আছে। যে কার্য্যে শব্দ ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "কলা" এবং যে অব্যক্ত কার্য্যবশতঃ ব্যক্ত কার্য্যের ব্যক্তি কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে "চিৎ-কলা" বলা হইয়া থাকে। কলা চতুঃষষ্টি, কিন্তু চিৎ-কলা মাত্র একটি, কলাকে সুকুমার কলাও বলা যাইতে পারে। যাঁহারা চিৎকলা শব্দটি সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, চিৎকলার দ্বারা আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যাওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কলা অথবা সুকুমার কলার দ্বারা কখনও কোনও আধ্যাত্মিক বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

চিৎকলা কি বস্তু এবং তাহার সাহায্যে যে আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যাওয়া সম্ভব হয়, তাহা এই শ্লোকটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে অনুধাবন করা যাইবে।—

"অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যাদ্বিন্দুঃ সর্ব্ববস্তু।
চিৎকলামিং সমাশ্রিত্য জগদ্রূপ উদীশ্বরঃ।

"কলা" অথবা সুকুমার কলা হইতে রস অথবা আনন্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে বটে, এবং তাহা উপভোগ্যও বটে, কিন্তু

চিৎকলায় কখনও কোনও রস অথবা আনন্দের সৃষ্টি হয় না। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"—এই কথায় মানুষের যে ভাব হইয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হয়, তাহা "চিৎকলা" হইতে উদ্ভূত হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। মানুষের যে অবস্থায় আনন্দ এবং উপভোগ আছে, সেই অবস্থায় দুঃখ এবং সন্তাপও আছে। কলা অথবা সুকুমার কলায় যখন আনন্দ এবং উপভোগের বস্তু আছে, তখন উহাতে দুঃখ এবং সন্তাপের বস্তু আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যাহা হইতে দুঃখ এবং সন্তাপের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার সাহায্যে কখনও আধ্যাত্মিক বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কাযেই, সুকুমার কলায় কখনও আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে না। সুকুমার কলায় মানুষকে মোহের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে কাহাকেও ক্ষণিকের জন্যও সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে না, তাহা বাস্তব সংসারের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। [ক্রমশঃ

খেয়া-পার

—শ্রীবিবেকানন্দ পান

থর-থরি কাঁপে জল
সমীর-ভারে;
মাঝি গায়—"বেলা নাই,
কে যাবি পারে!"

হাট হতে ফিরে চাষা
গাঁয়ের ঘরে,
পাঁচ বছরের দাদু
বুকের পরে;

সহসা মাঝির গান
পশিল কানে,
চমকি উঠিল সে যে
ব্যাকুল প্রাণে;

"নাই নাই—বেলা নাই,
পারে সবে চ'লে যায়,
আমি যাই কোথা তবে
কিসের টানে;
ওরে মাঝি যাব আমি
ও-পার-পানে!"

দাদুরে নামায়ে তীরে
ছুটিয়া চলে,
"পারে যাব, ওরে মাঝি,"
ডাকিয়া বলে;

সহসা রোদন-সুরে
হৃদয় উঠিল পুরে,
দেখে ঘুরে—ভাসে দাদু
নয়ন-জলে!
"ফিরে যাই, যাই দাদু"
কাঁদিয়া বলে!

ফিরে যেতে শোনে গান—
"নাইরে বেলা,"
ভাবে মনে—"কোথা যাই
এ কি এ খেলা!"

ছুটে গিয়ে বসে নায়
বলে—"আরো হবে ঠাঁই?
কেঁদে চায় দাদু মোর
বড় একেলা!"
"ঠাঁই নাই", মাঝি বলে
"নাহি রে বেলা!"

তরী চলে, 'হরি' বলে
যাত্রী সবে,
"ফিরে এস" ডাকে দাদু
কাতর রবে;
"ওরে মাঝি যাব ফিরে
তরী খান বাঁধ তীরে"
ধীরে ধীরে মাঝি কয়—
"কেমনে হবে;"
"পারে চল" ডেকে বলে
যাত্রী সবে!

* *

তরী হ'তে তীরে চায়
নয়ন ঝুরে,
কতব্যথা বেজে ওঠে
হৃদয়-পুরে;
সন্ধ্যার আঁধিয়ার
ঢেকে দিল চারিধার,
হাহাকার মিশে গেল
নীরব-সুরে!
ভেসে গেল তরী খান
কোন্ সুদূরে!

চতুষ্পাঠী

পৃথিবীর কথা

—শ্রীগঙ্গেশ বিশ্বাস

এই পৃথিবীর এবং আমাদের জন্ম কি করে হ'ল ? শাস্ত্রে লেখা আছে, প্রথমে নিবিড় অন্ধকার ছাড়া কোথাও কিছু ছিল না। তারপর 'করুণাময়ে'র ইচ্ছায় আলো, জল, মাটী, গাছ-পালা ইত্যাদির সৃষ্টি হ'ল। যাঁরা একটু বেশী জানেন, বলেন, Sun is the source of all energy—সূর্য্য থেকেই জীব-জগতের সৃষ্টি হ'য়েছে। সত্যটা তাই বটে, তবে এর প্রকৃত রূপ কি ?

বোধ হয়, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে মহাশূন্য বিশাল বাষ্পসাগরে আবৃত ছিল। কালক্রমে এই বাষ্পরাশি বিভিন্ন জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং তা থেকেই প্রথম নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি।—এটা আমাদের ধারণা মাত্র, এ পর্য্যন্ত কেউ এ বিষয়ে সঠিক বলতে পারেন নি।

সত্য-মিথ্যা সব জিনিষেরই নির্দ্ধারণ করা কঠিন—সে চেষ্টা না করে এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবী সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন, তার খানিকটা এখানে উপস্থিত করছি।

আমাদের এই পৃথিবী তার 'parent nebula'(?)র কাছ থেকে জন্ম পেয়েছে এবং তখন থেকেই চিরন্তন গতিতে (perpetual motion) আবর্ত্তন করছে। তরল-প্রায় পৃথিবী ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'তে থাকে, ফলে তার তাপ বেড়ে যায় অসম্ভব রকম। এই সময় পৃথিবীর চারিদিক্ ছিল গভীর বাষ্পরাশিতে আবৃত। অম্লজান (oxygen) ও উদজান-(hydrogen)-এর ভাগই ছিল তার মধ্যে বেশী। অত্যধিক উত্তাপের জন্যে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া (reaction) হ'ত না। তখনকার পৃথিবী ছিল যেন অসূর্য্যম্পশ্যা নারীর মত। চারিদিক আবৃত থাকায়, উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে পরিমিত তাপ বিকিরণ (heat radiation) হ'ত না। কয়েক শতাব্দীর পর পৃথিবী কতকটা ঠাণ্ডা হ'লে, অম্লজান ও উদজান-এ প্রতিক্রিয়া হ'য়ে যে বাষ্প হয়, তাই থেকে বৃষ্টিপাত সুরু হ'ল। পৃথিবী তখনও এত গরম যে, বৃষ্টি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আবার বাষ্প হ'য়ে যেত।



প্রাগৈতিহাসিক নর কর্ত্তৃক গুহায় ক্ষোদিত মূর্ত্তি।

এই ভাবে আরও কয়েক শতাব্দী কেটে গেল। ক্রমে পৃথিবীতে রীতিমত বৃষ্টি হ'তে লাগল। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠে জল পড়ায় পৃথিবী গেল সঙ্কুচিত হ'য়ে—কোন জায়গা হ'য়ে গেল উঁচু, আর কোন জায়গা নীচু। নীচু জায়গাগুলি ভরে গেল বৃষ্টির জলে, আর তাই থেকে সৃষ্টি হ'ল প্রথম সাগরের। অবিরাম বৃষ্টির ফলে এই জল ছড়িয়ে পড়ল সব জায়গায়—পৃথিবী গেল

। মহাপ্রলয়ের সময় মহাদেব বটপাতায় ভেসে ছিলেন

বলে হিন্দুদের মধ্যে যে একটা কথা আছে, সেটা বোধ হয় এই সময়ের ইতিহাসের পুরাণকথা।

পৃথিবীর বাইরের দিক্‌টা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলেও, তার ভিতরে চলছিল আগুনের খেলা। পৃথিবীর ফাটল বেয়ে জল পড়তে লাগল এই সব অগ্নিগর্ভে, ফলে কোন জায়গা হ'য়ে গেল উঁচু পর্ব্বত, আর কোন জায়গা হ'য়ে গেল চিরকালের জলাভূমি। পৃথিবীর চারিদিকে যে মেঘ ছিল, বহু সহস্র বৎসর বৃষ্টির ফলে সেটাও গেল কমে, থাকল মেঘের একটা পাতলা আবরণ। এই আবরণের ভিতর দিয়ে পৃথিবী প্রথম ঊষার আলো দেখতে পেল। এই থেকে আরম্ভ হ'ল তার প্রথম জীবন (protozoic age)। এই সময় সমুদ্রে এবং পাহাড়ে একরকম শৈবাল জন্মাত, ছোট ছোট পোকা-মাকড়ও কর্দ্দমাক্ত পাহাড়ের উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াত। 'অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্রষ্টব্য' (microscopic) কঙ্কাল, ও তাদের চলে বেড়াবার চিহ্নও পাওয়া গেছে।

এরও কিছুকাল পরে পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। মেঘের পাতলা আবরণ সরে গিয়ে সূর্য্যের আলো পৃথিবীর উপর পড়ল এই প্রথম। ঋতুর সৃষ্টিও হ'ল এই সময়। এ'দিন পৃথিবীতে যা কিছু জন্মেছিল, তা শুধু নিজের উত্তাপ থেকেই। পৃথিবীর সব কিছু তার নিজেকেই করতে হ'ত; এবার সে নবজীবন লাভ করল, কর্ত্তব্যের ভার সূর্য্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে।

সূর্য্যের আলো পেয়ে সমুদ্রের আগাছাগুলি বুঝতে শিখল যে, বেঁচে থাকবার অধিকার তাদেরও আছে। এই অধিকারের দাবী নিয়ে তারা ভেসে উঠতে চাইলে উপরে, কিন্তু পারলে না। বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করবার ক্ষমতা তখনও তাদের হয় নি। জোয়ারের সময় আগাছাগুলি পারে গিয়ে ঠেকত, কতকগুলি সেইখানেই থেকে যেত।

এইবার আরম্ভ হল পৃথিবীর কৈশোর (mesozoic age), 'মিড্‌-লাইফ'। ক্রমশঃ আগাছাগুলি জলো বাষ্প সংগ্রহ করবার ক্ষমতা পেল; তারা নূতন আলোয় নূতন মাটীতে বেড়ে উঠতে লাগল ঠিক রূপকথার দৈত্যের মত। তাই থেকে সৃষ্টি হ'ল বনের। সমুদ্রে যে সব ছোট ছোট সরীসৃপ জন্মেছিল, তারাও সূর্য্যের আলোতে বেরিয়ে এল, আর নূতন রূপ ধারণ করে ঐ সব বনে গিয়ে লুকাল। পাখীরা এতদিন উড়তে পারত না, পরিপুষ্ট ডানা ছিল না বলে। তারা ভেসে বেড়াত সমুদ্রের উপর দিয়ে। সূর্য্যের আলোয় তাদের ডানা হ'ল পুষ্ট। এবার তারা ভেসে উঠল, জলের সমুদ্রে নয়, অনন্ত উন্মুক্ত বাতাসের সাগরে,—জগৎ দেখবে বলে। আমরা টিরানোসরাস (tyranosaurus), ব্রন্টোসরাস (brontosaurus), ষ্টেগোসরাস (stegasaurus), ট্রিসেরাটপস্‌ (triceratops), ড্রাগন ফ্লাইস (dragon flies) প্রভৃতি যে সব জন্তু-জানোয়ারের কথা আজকাল শুনি, অথবা যাদের পাথরে পর্য্যবসিত হাড় (fossilised bones) যাদুঘরে দেখি, তারা সবাই ছিল এই 'মিড্‌লাইফে'র জীব। এরা দেখতে ছিল যেমন ভীষণ আকৃতির, এদের প্রকৃতিও ছিল তেমনই হিংস্র।

এই সময় 'ম্যামালস্‌' (mamuals) নামক এক প্রকার স্তন্যপায়ী জীবের সন্ধানও পাথরের ইতিহাস থেকে পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে মানুষের অনেক গুণ লক্ষিত হ'ত বলে অনেকে এদের তখনকার মানব বলে মনে করেন। পাথরের পৃষ্ঠা থেকে এই আদিমানবের ইতিহাস আমরা অতি অল্পই জানতে পারি। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, তখনকার মানুষ ছিল অতি ভীরু স্বভাবের, কারণ তারা মুক্ত মাঠের মধ্যে, নয় ত' পর্ব্বতগুহায় লুকিয়ে থাকত। তখনকার বন্য পশু ও মানুষের অস্থিপঞ্জর এক সঙ্গে না পাওয়ার কারণই এই। মানুষের মত 'ম্যামাল্‌'দের সন্তানরা বড়দের কাছ থেকে শিক্ষা পেত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা সিদ্ধান্ত করেছেন, ওরাই ছিল বর্ত্তমান গণ্ডার, হস্তী, অশ্ব, হরিণ, বানর প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এই বিরাটকায় জন্তুগুলি পৃথিবী থেকে চিরতরে লোপ পেয়ে যায়। সম্ভবতঃ জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনই এই ধ্বংসের কারণ। তারপর এই পরিবর্ত্তন সঙ্গে করে নিয়ে এল নূতন অতিথি—কুমীর, কচ্ছপ, গিরগিটি প্রভৃতি।

'মিড্‌লাইফ'এর পর আরম্ভ হল পৃথিবীর নূতন ধরণের জীবনযাত্রা (cainozic age)। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে 'ম্যামাল্‌' জাতটা পরিবর্ত্তনের পরও বেঁচেছিল। এত ঝড়-ঝঞ্ঝা যাদের নত করতে পারে নি, তাদের বিশেষত্ব স্বীকার করতেই হবে। তাই তারা হল এখন পৃথিবীর প্রভু।

এরও পরবর্ত্তী-কালে আর একটি জাতির কথা জানা গিয়েছে। এরা বনের 'ম্যামথ' (mammoth), বাইসন (bison), 'স্যাবার-টুথ্ড্-টাইগার' (sabre-toothed-tiger), জলহস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে মিশে থাকত।

এর কয়েক শতাব্দী পরে পর্য্যায়ক্রমে চারবার বরফের যুগ (ice age) আসে বলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এখন থেকে পঞ্চাশ হাজার ও পাঁচলক্ষ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ই পরিবর্ত্তন এসেছিল। শেষ পরিবর্ত্তনের সময়, অর্থাৎ প্রায় প াশ হাজার বৎসর আগে থেকেই, আমরা আদিমানব সম্বন্ধে েশেষ ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি। এই সময়কার মানুষদের বলা হয়েছে 'নিয়ান্ডারথাল' মানব (neanderthal man)। এদের সর্ব্ব শরীর ছিল ঘনকৃষ্ণ লোমে আবৃত; নাক ও গলা বানরের মত, আর এদের কপাল ছিল খুব ছোট। এদের বাসস্থান ছিল পর্ব্বতগুহায়, নয় ত জলের উপর গড়ে তোলা একরকম স্তূপাকৃতি ঘরে। এরা পাথর দিয়ে তৈরী অস্ত্রে পশুপক্ষী শিকার করে, বনের ফল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত। আগুনের ব্যবহার এদের সময় থেকেই প্রচলিত হয়েছে। এরা আগুন জ্বালত চকমকি পাথর দিয়ে। কিন্তু এরা রান্না করতে জানত না, এদের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত হত ঝলসিয়ে। এরা থাকত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, আর দল ছিল এক একটি পরিবার নিয়ে। বেঁচে থাকবার জন্য এদের সর্ব্বদা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত। তার উপর ছিল আর এক বিপদ—একদলের উপর অধিকারবিস্তারের জন্য আর এক দলের অদম্য উৎসাহ। এই নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন দলের মধ্যে হত যুদ্ধ। একদল জয়লাভ করলে পরাজিত দলের ছেলেমেয়ে সব হয়ে যেত তাদের। অবশ্য তাতে কোন পরিবারই সুখী হত না।

তারপর আরম্ভ হ'ল পাথরের যুগ (palæolithic age)। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ও চল্লিশ হাজার বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আফ্রিকা অথবা এশিয়াতে (এখনও ঠিক হয় নি) আর একটি জাতির আবির্ভাব হ'য়েছিল। এরাই ছিল প্রকৃত মানব (homo sapiens)। 'নিয়ান্ডারথাল' মানবদের সঙ্গে এদের বহুকালব্যাপী যুদ্ধ হয়, ফলে 'নিয়ান্ডারথাল' জাতি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেল। এদের মস্তিষ্ক ছিল পূর্ব্বের সকল জীব অপেক্ষা প্রখর। যদিও এরা পর্ব্বত-গুহায় বাস করত, তাই বলে বন্য জীবজন্তুর ভয়ে লুকিয়ে বেড়াত না। আত্মরক্ষার জন্য ব্রঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র এরাই প্রথম তৈরী করল। শিকারের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, এরাই ছিল প্রকৃত শিকারী। এদের সময় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি, আর শিকারের এত সহজ প্রণালীও



ব্রণ্টোসরাস।

কেউ জানত না। কাজেই এদের করতে হ'ত শ্রমসাধ্য ও প্রকৃত বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এরা যে-সব গুহায় বস বাস করত, তার দেয়ালে নানা বর্ণের চিত্র এঁকে গুহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করত। আজকাল অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে পশুপক্ষীর ক্ষোদাই করা মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ভাস্কর্য্যশিল্পের উন্মেষ পাথরের যুগ থেকেই হ'য়েছে। পুতুল খেলা শিশুদের একটা চিরন্তন অভ্যাস, তা আজই হ'ক বা কালই হ'ক। শিশুর মনস্তত্ত্ব চিরকালই এক। তাই

পাথরের যুগের শিশুরাও পুতুল নিয়ে খেলা করত, যদিও সেলুলয়ড্ বা গাটাপার্চ্চার নয়—মাটীর। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে মানবসভ্যতার গোড়াপত্তন অনেক দিন পূর্ব্বেই হ'য়েছে।



ডিনোসার।

তারপর এসিয়া থেকে আবির্ভাব হয় একটি শ্বেতকায় জাতির। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মানবজাতি এদেরই বংশধর। এরা ছিল সব 'নিওলিথিক রেস'-(neolithic race)-এর লোক। প্যালিয়লীথিক জাতির সঙ্গে এদের অনেক দিন ধরে যুদ্ধ হয়, তারপর থেকে এরাই হ'ল পৃথিবীর স্থায়ী প্রভু।

এ পর্য্যন্ত কোন জাতি রান্না করে খেতে জানত না, রান্না করে খাবার এরাই প্রথম আস্বাদন করল। এদের সময় ছেলেমেয়ে সবাই গয়না পরতে ভালবাসত, আর সেই বাসনা মেটাবার জন্যে এদের নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হ'ত। শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, আজকাল যেমন অনেক ভদ্র পরিবারের মেয়েছেলেরাও (অবশ্য অবাঙ্গালীদের মধ্যেই বেশী) হাতে পায়ে নানা বর্ণের চিত্র এঁকে দেহের সৌন্দর্য্য বাড়াচ্ছেন মনে করে সুখী হন, সেকালেও ঠিক এই রকমটাই ছিল। সোণা-রূপোর ব্যবহার এদের সময় থেকেই চলে আসছে। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, খনি থেকে কি করে সোণা-রূপো নিষ্কাশন করতে হয়, তাও এরা জানত।

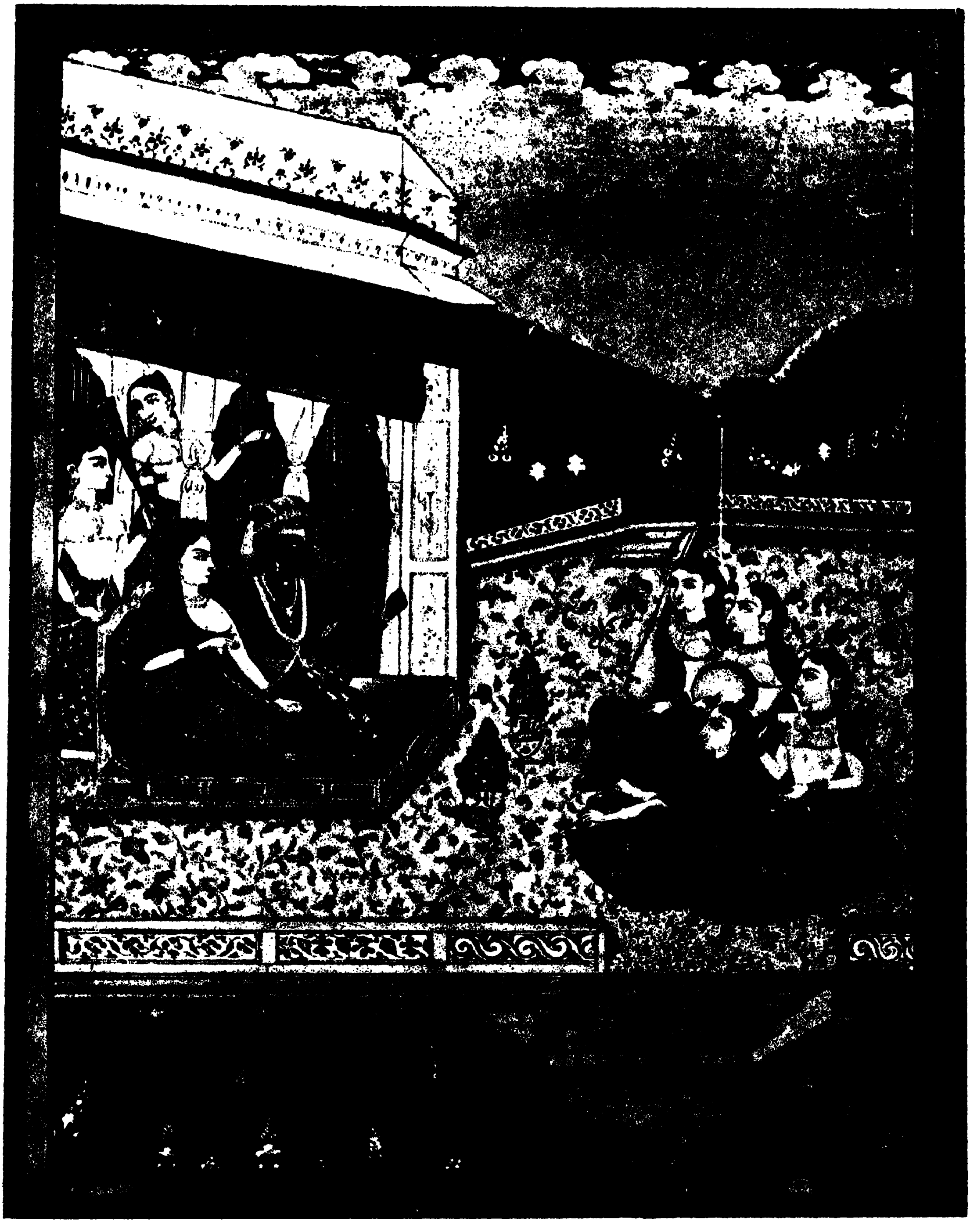
মানুষের একটা দুর্ব্বলতা আছে, সে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। কেবল মাত্র মানুষের সাহায্য নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকতে পারে; কিন্তু বাস করতে পারে না। এ সত্যটা নিওলীথিক জাতি উপলব্ধি করেছিল ভাল রকম। তাই তাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল পশুপক্ষীর। চাষ-আবাদ, উন্নত প্রণালীর অস্ত্রশস্ত্র-নির্ম্মাণ কেবল আজকালেরই একচেটে নয়, তা অনেক দিনের পুরাণ, ঠাকুরদাদার আমলের।

সেবা

—শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়

নগরের শত নাগরিক চলিয়াছে হাসি সিনেমায়
দিনশেষে মনের পুলকে
সিগারেট মুখে দিয়া—কেহ হাঁটি, কেহ বা মটরে।
তার মাঝে দেখা গেল সকরুণ দুটি কালোচোখ
ফিরিতেছে সব মুখ চাহি—
ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ, রুগ্ন দেহখানি
দীনতার পরিপূর্ণ রূপ।
কারও প্রাণ কাঁদিল না।

হে ঈশ্বর!
এই বুঝি মানবের নারায়ণ-সেবা !!



মাঘ মাস (প্রাচীন চিত্র

নয়ান্‌দীঘি

—শ্রীগোবিন্দপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদকালে বিলচরীর মাঠে, যেখানে রতনমুখীর জমিদারদের মস্ত তেমহলা কুঠী ছিল—এখন সেই কুঠীর শেষ ভগ্নাংশের পাশ দিয়ে কুলবধূর ভাঙ্গা-চোরা সিঁথির মত যে খালটা হঠাৎ দূরে—গাছ গোছালির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—তারই নাম নয়ান্‌দীঘি। এ অঞ্চলে এত বড় খাল আর কোথাও নেই।

ঝাউগাঁয়ের মৃণালকুমার নামকরা শিকারী। সে তাঁবু ফেলল এই নয়ান্‌দীঘিরই পাশে—একেবারে রতনমুখীর জমিদার-কুঠীর ভগ্ন-স্তূপের গা ঘেঁষে। এর আগে মৃণালকুমার বহু যায়গায় শিকার করেছে, কিন্তু এমন দীঘি সে আর কোনখানে দেখে নি। বেলেহাঁস, চকাচকী, সারস এবং আরও কত রকমের পাখী যে এই দীঘিতে সারা বছর মজুত থাকে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তা'ছাড়া রতনমুখীর সব গাছেই হরিয়াল, ঘুঘু, বুনো পায়রা যখন তখন পাওয়া যায়। মৃণালকুমার শুনেছে—এখানকার—এই রতনমুখীর পাখীগুলো নাকি ভারী 'ভাল-মানুষ'! গায়ের কাছে এসে পড়লেও উড়ে পালায় না—বন্দুক দেখলেও ক্ষেপে ওঠে না। শীতের সকালে—যখন প্রথম-জাগা পাংশু রোদ মাটীর ওপরে উঁকি মারে, তখন হরিয়ালগুলো না কি নয়ানদীঘির আশপাশের গাছে বসে আরামে সেই রোদ্দুর গায়ে লাগায়—কেউ তাড়া করলেও উড়ে পালায় না—গাছ ধরে নাড়' দিলে ঘাপটী মেরে বসে থাকে। বিস্ময়ের বিষয় বটে! মৃণালকুমার জানে, তার নিজের গাঁয়ের শালিকগুলো পর্য্যন্ত কি রকম চালাক! পটকার আওয়াজেই তারা ভোঁ দৌড় দেয়—হাততালি দিলে সে মুলুকে আর পা বাড়ায় না। তা' ছাড়া নদীর ধারে যদি কেউ কখনো এক টুক্‌রো কঞ্চি হাতে করে হেঁটেছে—তা হলেই সর্ব্বনাশ! হাঁসের মোড়ল গলা তুলে হাঁক্‌ছে—কঁক্! বাস্—, তারপরেই দেখা যাবে মাটীর পাখী এক লাফে আকাশে উঠে পড়েছে।

মৃণালকুমারের নিজের গাঁয়ের পাখীগুলো গুলি-খেকো হয়ে গিয়েছে। তাদের আর এখন নাগাল পাওয়া যায় না। তাইতেই সে অনেক ঘুরে ফিরে—সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে অবশেষে তাঁবু খাটাল এই নয়ান-দীঘির পাশে। গত বছরে তার বুড়ো বাপ গেছেন মারা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাঁচেক তালুক তার হাতে এসেছে। আরও তার হাতে এসেছে—একটা ভারী সিন্দুক এবং দুটো বন্দুক। মৃণালকুমারকে এখন পায় কে!

নয়ান্‌দীঘি ভারী সুন্দর খাল। এ রকম জলাশয় বড় একটা চোখে পড়ে না। কাঁচের মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে জল। মাঝে মাঝে কলমী আর দামের ঝোপ—তাদের কাছে কাছে সদ্য ফুটে থাকে লাল নীল ও অনেক রকমের রঙ-বেরঙের নাল ফুল। দেখলে মনে হয়—দীঘির জলের নীল বিছানায় রূপসী মেয়েরা নৌরোজার হাট বসিয়েছে। জলের কিনারায় বড় বড় ঘাস আর কাশ-বন। স্থানে স্থানে পাট পচাতে দেওয়া হয়েছে। দীঘির ভিতরে—যে সব যায়গায় গভীর জল—সে সব যায়গায় এক রকম জোলো লতার জটলা--তারা যেন জলের ওপরে গায়ে গায়ে ভিড়ে এক একখানা সবুজ মাঠ তৈরী করে রেখেছে। সেই সব মাঠে শুয়ে থেকে খেলা করে বড় বড় পদ্ম ফুল। এই সব ফুলের কাছে ঘাসের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী দিন-রাত্তির কলরব করে।

মৃণালকুমার বলল—এই, তোরা সব গিয়ে ডিঙ্গি ভেড়া ঐ দিকে ঐখেনে রে। এক গাদা বেলেহাঁস দেখ্‌ছিস্ নে। আরে, চকাচকীও রয়েছে যে!

ডিঙ্গি তার দুল দুল করতে করতে বাঁ ধারে এগিয়ে চলল। মৃণালকুমার কাঁধের বন্দুকটা নামিয়ে তার দু'ঘরে দুটো পাখী-মারা গুলি পুরে নিল। এর পরে হাঁটু গেড়ে বসে সে বন্দুকটা বগলে চেপে উঁচু করে তুলল—বাঁ চোখটা তার আস্তে আস্তে এল বুঁজে। একটা শব্দ হল—দুম্—বাস্!

জলের ওপরে, পদ্মবনের ধারে দুটো আহত পাখী ছটফট্ করতে লাগল। আর একটা পাখী—বোধ হয় একটা চকা—একেবারে উড়বার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। হাত দুয়েক উঠেই একটা লাল ফুলের পাশে সেটা ঝুপ করে পড়ে গেল। দামের ঝোপে পাখা আটকে যাওয়ায় সে গলা বার করে ভাসতে লাগ্‌ল।

মৃণালকুমার হাঁক্‌ল—চালাও জোরে। ডুব লাগালে ওদের আর ধরা যাবে না—ব্যাটারা বদমাইসের ধাড়ী।

লগীর ঠ্যালায় ডিঙ্গি পদ্মবনের এদিকে তর তর করে এগিয়ে এল। কয়েক জন চটপট্ করে জল থেকে পাখী-গুলো পাটাতনের ওপরে তুলে ফেল্‌ল। গুলি-খাওয়া চকাটা তখনও মরে নি। সেটা ডাকতে লাগ্‌ল—কঁক্-কঁক্—

মৃণালকুমার আবার বন্দুক তুল্‌ল। পূব দিকের কিনারায়—যেখানে পাড়ার মেয়েরা দীঘির জলে নাইতে আসে—তারই অনতিদূরে নলঝোপের পিছনে তার নিশানা।

আহা! পাখীটা যেন কাঁদছে—

পাখীটা কাঁদছে না কি? মৃণালকুমার বন্দুক নামিয়ে ঘাটের দিকে চোখ ফেল্‌ল। দেখল—একটী যুবতী মেয়ে জলের কলসী কাঁখে করে আর একটী মেয়েকে বলছে—আহা! পাখীটা যেন কাঁদছে। সঙ্গী মেয়েটি উত্তর দিল—সত্যি? ভাই পাখীটা যেন কাঁদ্‌ছে। নয়ান্‌দীঘিতে এই প্রথম শুন্‌লাম বন্দুকের আওয়াজ।

এ কথা ঠিক। নয়ান্‌দীঘিতে এর আগে এমনটা কখনও ঘটে নি। এর আগে এখানে কত জমিদার তাঁবু ফেলেছে, কত সিপাই সময়ে অসময়ে বন্দুক ঘাড়ে করে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ফিরে গিয়েছে, কিন্তু এমনতর আর কখনও ঘটে নি। রতনমুখীর লোকেরা নয়ান্‌দীঘিতে এর আগে কখনও বন্দুকের আওয়াজ শোনে নি। এখানে এ যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকে তাদের।

মৃণালকুমার হাঁক্‌ল—চালাও ডিঙ্গি—ঐ ঘাটের কাছে যেয়ে ভিড়াও। আজকের শিকার এই পর্য্যন্ত—হ্যাঁ রইল আমার শিকার বন্ধ। চালাও।

যুবতী মেয়েটি ততক্ষণে ঘাট থেকে ডাঙ্গায় উঠেছে। সে সঙ্গী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে—দেখছিস্ ভাই মিন্‌সেটা যে এই দিকেই আস্‌ছে। সে আঙুল তুলে মৃণালকুমারের দিকে ইসারা করল।

ইতিমধ্যে ডিঙ্গি এসে পড়ল ঘাটের কাছে। মৃণাল-কুমার একলাফে ডাঙ্গায় নেমে মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে রইল। কলসী-কাঁখে তারা দুজনে তারই পাশ দিয়ে হন্ হন্ কোরে এগিয়ে চলেছে—বাঃ। মৃণালকুমার অবাক্ হয়ে গেল—কি সুন্দর! যেমনি গড়ন তেমনি রঙ্। নাক-মুখেরই বা কী ঢং। হ্যাঁ—একেই বলে গেঁয়ো ফুল, গোবরে পদ্ম।

একটি মেয়ে একবার মৃণালকুমারের দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু, সে ত তাকানো নয়—মৃণালকুমারের মনে হল যেন একখানা ছুরির ফলা—চক্‌চকে আর ধারালো—

উল্লাসে শীস্ দিয়ে সে ডাকল—চিমনলাল!

চিমনলাল তার খোট্টা চাকর। সে জী হুজুর বলে তার সামনে হাজির হল।

মাঠের মধ্যে মোড়-ফেরতা যুবতীদের দিকে হাত বাড়িয়ে মৃণাল কুমার বল্‌ল—দেখছিস্?

—জী হুজুর।

সে কইলো—একঠো বড়া জবর আছেরে চিমনলাল বুঝলি? যা—পিছন পিছন যেয়ে ঘর দেখে আয়। আজ রাত্তিরে—এই ফাঁকা দীঘির ধারে যখন চাঁদ উঠ্‌বে তখন আমি তাকে চাই।

চিমনলাল—'যো হুকুম' বলে তাদের পিছু নিল।

রাত যখন অনেক, তখন দূরে—নয়ান্‌দীঘির সীমানা ঘেঁসে যে বন-বাদাড়ের কাল রেখা—তারই মাথায় সরু এক ফালি চাঁদ দেখা দিল। পশ্চিম দিকে- আকাশের বুকে এক টুকরো তরল শুভ্রতা ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে উঠছিল। ঘুমিয়ে থাকা নিঝুম নয়ান্‌দীঘির পরতে পরতে একটা অস্বাভাবিক ভয়ার্ত্ত সুর পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে নয়ান্‌দীঘির কূলে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আস্‌ছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়ে মন্থর

শীতল বায়ু একটানা এক বেসুরো গান গেয়ে চলেছে। ওদিকে, যেখানে মাঠের মাঝে শুকানো পাটগাছের পাঁজা পাশাপাশি জড় করা—বাতাসের সেই বেসুরো গান ক্রমাগত সেখানে হু-হু শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠছে—

মৃণালকুমার তাঁবুর বাইরে এসে একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখল—দেখল এক টুক্‌রো ভাঙ্গা চাঁদ। এক-বার সে দীঘির জলের দিকে চাইল—দেখল চাঁদের আলোয় একটা নাল ফুল দোল খাচ্ছে। সে ভাবল—তাইত! চিমনলালরা দেরী করছে কেন?

অকস্মাৎ দূরে অস্ফুট কাতরাণি শোনা গেল। মৃণাল-কুমার উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁবুর দরজার ওপরে ডান হাতের ভর দিয়ে দাঁড়াল। এমন সময় চিমনলাল এবং আরও কয়েক জনে একটি মেয়েকে কোল পাঁজা করে এনে সামনে বসাল। তার মুখ বাঁধা। হুড়োহুড়িতে মাথার একরাশ কালো চুল ঝড়ে ঢেউ-খেলা বনের মত অগোছালো হয়ে পড়েছে। চোখের কোণায় কয়েক ফোঁটা জলের দাগ—চাঁদের আলোয় তা চিক্‌মিক্‌ করছে।

মৃণালকুমার বল্‌লো—চিমনলাল! তোরা সব কড়া পাহারা লাগা—আর বন্দুক যেন 'রেডী' থাকে।

চিমনলাল উত্তর দিল—যো হুকুম।

মৃণালকুমার এগিয়ে এল। যুবতীর তখন ঘন ঘন শ্বাস বইছে। সে আস্তে আস্তে তার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে বল্‌লো চেঁচিও না। কেন মরবে? তারপর কণ্ঠকে একেবারে কোমল আদরের পর্দ্দায় নামিয়ে এনে কইল ছিঃ, এ কি ব্যবহার তোমার। লক্ষ্মি, যাবে আমার সঙ্গে? আমার কত টাকা কড়ি—সব তোমায় দেব—কত ভাল বাসব—

যুবতী গর্জ্জন করে উঠলো—ছোটলোক—নচ্ছার কোথাকার! ঘরে তোমার মা-বোন নেই!

একটা গল্প—

সে দিনও রাত্তিরে এমনি চাঁদের আলো। সারা নয়ান্‌দীঘি ছেয়ে একটা অসাড় নিস্পন্দতা। রতনমুখীর জমিদারদের ভাঙ্গা বাড়ীর পিছন দিয়ে যে রাস্তাটা বাব্‌লা বন পর্য্যন্ত সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে, তারই পাশে একখানা চালাবাড়ী—ঘুমে নিশুতি। ঐ চালাবাড়ীর খিড়কীর দরজায় একটি মূর্ত্তি পা টিপে টিপে এগিয়ে এল।

এ ধারে—বালির চড়ার বাঁ-হাতি ধানের ভুঁয়ে একটা শেয়াল অকারণে ডেকে উঠল—তার পিছনে সাড়া দিল আর একটা—। একটা নিশাচর পাখী সন্‌ সন্‌ করে উড়ে গেল।

মূর্ত্তিটা দরজার কড়ায় তিনটে টোকা মারল—টক্‌ টক্‌ টক্‌।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি আইবুড়ো মেয়ে। পনের কিংবা ষোল তার বয়েস হবে—দিব্যি দোহারা চেহারা। সে ফিস্‌ ফিস্‌ করে শুধালো—কেউ জেগে নেই ত?

মাণিকের বয়স বছর বাইশের কাছাকাছি। গোঁফটা সবে ঘন হয়ে উঠেছে। হাত-পাগুলো লোহার মত শক্ত রঙ্‌ও লোহার মতই। তার কণ্ঠে তখনও জড়তা ছিল। কইল—না, বেশ নিশুতি বলেই ত মনে হচ্ছে।

চারু জিজ্ঞেস্‌ করল—কোথায় যাবে?

কোথায় যাব? মাণিক উত্তর দিল—কেন ঐ দিকে—কেমন ফুর ফুর করে হাওয়া দিচ্ছে—কেমন চাঁদের আলো।

চারু হেঁসে বলল—'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল', না? কিন্তু ওদিকে ত যাবে, এদিকে যদি কারও ঘুম ভেঙ্গে যায়।

মাণিক অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো—যাঃ, জাগবে কেন? শেষ রাত্তিরেই ত ঘুম ভারী হয়—নইলে আমি এলাম কি করে?

চারু রহস্য করল—তুমি খুব বীর তা স্বীকার করছি, কিন্তু—

'আবার কিন্তু করে! চল্‌ শীগ্‌গির' বলে মাণিক চারুকে প্রায় জড়িয়ে ধরে টান্‌তে টান্‌তে নয়ান্‌দীঘির দিকে নিয়ে চল্‌ল।

তারপর?

তারপর মাস কয়েক যেতে না যেতেই আবার এমনি একটা রাত্তির ঘুরে এল। কিন্তু সেদিনের রাত্তিরে এমন চাঁদ ছিল না। দীঘির জল কৃষ্ণপক্ষের রাতের মত হল

কালো হয়ে। জমিদার হরিদাস রায় মহাল থেকে খাজনা আদায় করে বাড়ী ফিরছিলেন। বজরা তাঁর পদ্মা দিয়ে এসে নয়ানদীঘির জলে পড়েছে। মস্ত উঁচু সাদা পাল—বাতাস লেগে পায়রার পালকের মত ফুলে উঠেছে। হঠাৎ হরিদাস রায় শুনতে পেলেন—ডাঙ্গার ওপরে কে যেন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। সবাই বল্‌ল—বোধ হয় অপদেবতা উপদেবতা হবে। কিন্তু হরিদাস রায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। নৌকো থামিয়ে তিনি কেরোসিনের আলো জ্বেলে নীচে নামলেন। মাঝি-মাল্লাদের হাতে রইল এক একখানা লাঠি। চারিদিক্ খোঁজাখুঁজি সুরু হল। একজন একপাশ থেকে চেঁচিয়ে বল্‌ল—বাবু এই যে। এঃ, একটা কচি ছেলে যে!

হরিদাস রায় ছুটে গেলেন—তাই ত রে! একেবারে যে সবে মাত্র হয়েছে। কী নির্দ্দয় বাপ্ মা—বলে তিনি সেই নির্জ্জন প্রান্তর থেকে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। নৌকোয় উঠে সেই ছেলেকে কয়লার কাঠের আগুনে সেঁক দিতে দিতে তিনি কড়া হুকুম দিলেন—নৌকো জোরে চালা রে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী পৌছানো চাই।

দীঘির জলে আরও চারখানা লগি আর দু'খানা বৈঠে নেমে এল। তারপর দেখতে দেখতে নৌকা যতই দূরে যেতে লাগল নয়ানদীঘির কূলে সেই ক্ষুদ্র শিশুর কান্নার শব্দ ততই মন্থর হয়ে আসতে লাগল; মাঝিরা হাঁকল—হেঁইও—হেঁইও!

অনেকদিন কাটলে পর, রতনমুখীতে চারুর বয়স যখন আরও বেড়ে গেল, তখন তার নামে মাণিককে নিয়ে যে কলঙ্কটুকু রটনা হয়েছিল তা মুছে এল। চারুর বাপ সুবিধে বুঝে চারুর বিয়ে দিয়ে দিল এবং সে শ্বশুরবাড়ী গেল ঘর করতে। এর পরে চারুর এক মেয়ে হয়, আর সেই মেয়ে হবার সময়ই চারু যায় মারা। চারুর বাপ্-মা তার শেষ চিহ্ন-সেই মেয়েটিকে নিজেদের কাছে রেখে মানুষ করে। এখন চারু বেঁচে নেই, কিন্তু নয়ানদীঘির ঐ পাশে—চারুর বাপ-মায়ের চালাবাড়ীতে সেই মেয়ে প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে।

নয়ানদীঘির সমাধিস্থ নিস্তব্ধতা খাঁ-খাঁ করে উঠল, ভাঙ্গা চাঁদখানা ক্রমে আকাশের পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। গাছের মাথায় বাতাস যেন আর্ত্তনাদ করছে—

নালফুল শুধাল—তারপর?

তারপর? মাটি বল্‌ল—তারপর? গল্পটা তা হ'লে শুনেছিস্। তারপর আর কি! হরিদাস রায়ের সেই কুড়ানো ছেলেই হচ্ছে মৃণালকুমার—যে আজ শিকারে এসেছে। আর চিমনলাল যে মেয়েকে ধরে এনেছে, সে হচ্ছে ঐ চারুরই মেয়ে।

আধুনিক শিক্ষা

...আমাদের গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে হয়ত মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সন্তানগুলির পক্ষে উইভিং, ডাইং-ক্লিনিং কার্পেণ্ট্রি, স্মিথি, পটারি, ট্যানিং, এগ্রিকালচার প্রভৃতি শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে। এই সমস্ত বিভাগে কি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের তাঁতী, ধোবা, ছুতার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, চর্ম্মকার এবং কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণ একদিন যাহা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, এক্ষণে আমাদের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানগণ পিতামাতার বহু টাকা খরচ করিয়া Weaving-এর নামে তাঁতীগিরি, Dyeing-cleaning-এর নামে ধোবাগিরি, Carpentry-র নামে ছুতারগিরি, Smithy-র নামে কর্ম্মকারগিরি, pottery-র নামে কুম্ভকারগিরি, Tanning-এর নামে মুচিগিরি এবং Agriculture-এর নামে কৃষকগিরি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ, আমাদের তাঁতী প্রভৃতি একদিন বিনা ব্যয়ে যাহা যাহা শিক্ষা করিলে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, অধুনা মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানগণ পর্য্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে তাদৃশ বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়াও স্বাধীনভাবে ত' দূরের কথা, চাকুরী করিয়াও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করিতে সমর্থ হইতেছেন না।...

বিজ্ঞান-জগৎ

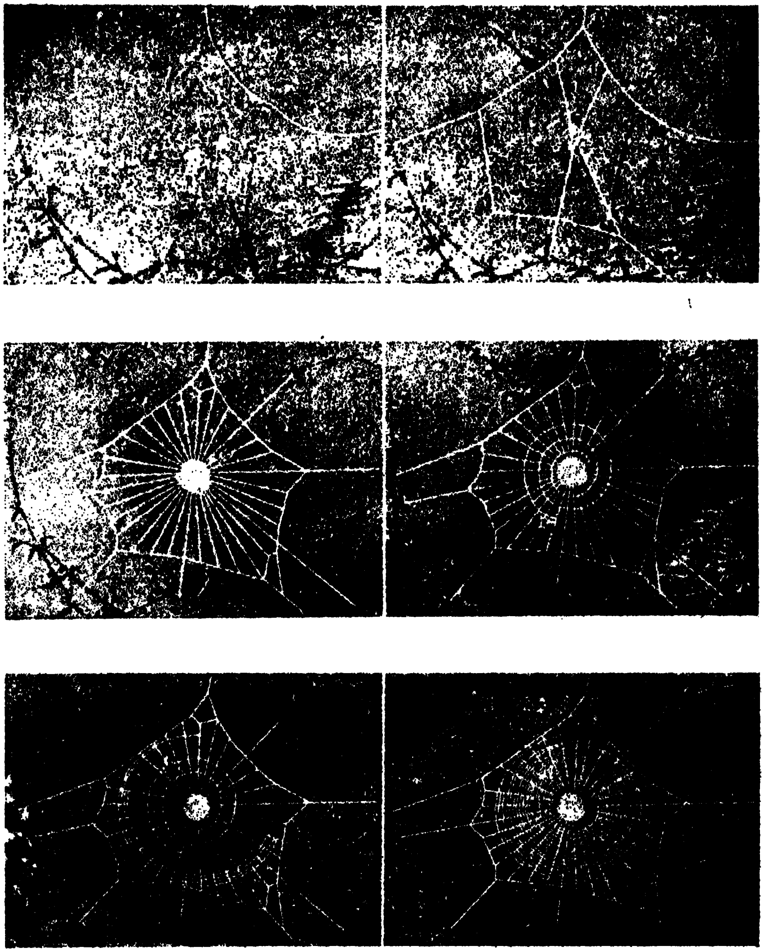
কীটপতঙ্গের শিল্পকৌশল

—শ্রী[illegible]প্রকাশ চৌধুরী

বুদ্ধিমান্ বলিয়া মানুষের যথেষ্ট অহঙ্কার রহিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, বহু তথাকথিত ইতর প্রাণী, সামান্য কীটপতঙ্গ, অনেক সময় মানুষ অপেক্ষা উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়। কীটপতঙ্গের শিল্পকৌশলের দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

মাকড়সা

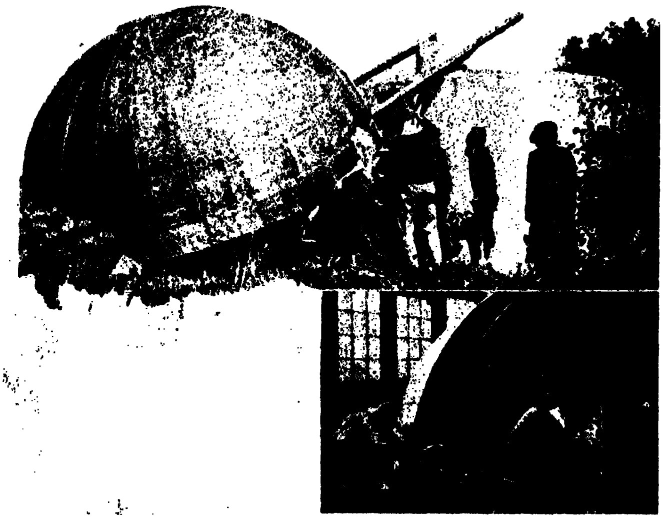
একটি সাধারণ মাকড়সা পা ছড়াইলে বড় জোর পৌনে এক ইঞ্চি স্থান লইতে পারে ; কিন্তু ইহা ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই জাল বুনিয়া প্রায় ২ ফুট লম্বা সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারে। একটি লোক হাত বাড়াইলে প্রায় সাড়ে সাত ফুট উঁচু হইতে পারে। তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই হিসাবে একজন লোকের ঐ সময়ের মধ্যে ২০০ হাতেরও অধিক দীর্ঘ একটি ইস্পাতের জাল বুনিতে পারা উচিত। অধিকন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, মাকড়সা কোনরূপ যন্ত্রপাতির সাহায্য ত' লয়ই না, এমন কি সেতু নির্ম্মাণের মালমশলাও তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয় না ; প্রয়োজনমত মালমশলা তাহারা নিজেদের দেহ হইতেই প্রস্তুত করিতে পারে। কোন লোককে যদি বিনা মালমশলায় ও বিনা সাহায্যে ২ ঘণ্টায় মধ্যে ২০০ হাত লম্বা একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে বলা হয় তাহা হইলে আদেশদাতার মস্তিষ্কবিকৃতি সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ থাকিবে না।



মাকড়সার জাল-বুননের কৌশল।

উপরে—বামে :—একটি সূতা লাগান হইয়াছে। দক্ষিণে :—জালের কাঠাম বোনা হইয়াছে এবং কেন্দ্র ঠিক করা হইয়াছে। মধ্যে—বামে :—কেন্দ্র হইতে প্রান্ত-পর্য্যন্ত যোগ করা হইয়াছে। দক্ষিণে :—জালটি সুদৃঢ় করা হইতেছে, কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে বোনা হইতেছে। নীচে—বামে :—বিপরীত দিক্ হইতে বোনা হইতেছে। দক্ষিণে :—সম্পূর্ণ জাল।

বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশস্পর্শী অট্টালিকা বা বড় বড় সেতু নির্ম্মাণ করিতে যে পরিমাণ শিল্পকৌশল প্রয়োজন মাকড়সার শিল্পজ্ঞান তাহা অপেক্ষা কোনক্রমেই অল্প নহে। বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, মাকড়সার জালনির্ম্মাণ-কৌশল এইরূপ: প্রথমে একটি সূতা বুনিয়া মাকড়সা সূতার অপর প্রান্তটি বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। প্রান্তে আঠা জাতীয় পদার্থ থাকায় কিছুতে স্পর্শ করিলে সূতাটি সেইখানে সংলগ্ন হইয়া যায়। আটকাইয়া যাইলেই মাকড়সা সূতাটি টানিয়া সমান করিয়া লয়। জাল বুনিবার ইহাই প্রথম পর্ব্ব। ইহার পর আরও কয়েকটি সূতার সাহায্যে একটি কাঠাম তৈয়ারী করা হয়। তৃতীয় পর্ব্ব, জালের যেখানে কেন্দ্র হইবে সেই স্থানটি স্থির করিয়া তাহার মধ্য দিয়া একটি মধ্যরেখা চালনা করা। এইরূপে কেন্দ্র নিরূপণ করা অল্প জ্যামিতিজ্ঞানের পরিচয় নহে। ইহার পরে কেন্দ্র হইতে কাঠাম পর্য্যন্ত একটি সূতা বিস্তৃত করা হয়। এই জন্য মাকড়সাটি অনেক সময় বহু আঁকা বাঁকা পথে ভ্রমণ করে কিন্তু কাঠামের প্রান্তভাগে পৌঁছাইলেই সূতাটি টানিয়া সমান করিয়া দেয়। কেন্দ্র হইতে প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত অথবা প্রান্তদেশ হইতে কেন্দ্র অভিমুখে দুই দিকেই সূতা বোনা চলিতে থাকে। এই কার্য্যের সময় মাকড়সা অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করে, যাহাতে যে সূতাটির উপর দিয়া সে চলিতেছে তাহা যেন কোনও ক্রমে জালের কোন সূতার সহিত আটকাইয়া না যায়। এইভাবে কেন্দ্র হইতে কয়েকটি সূতা জালের প্রান্ত পর্য্যন্ত জুড়িয়া জালের আকৃতি অনেকটা গাড়ীর চাকার মত হয়। ইহার পরবর্ত্তী কার্য্য জালটিকে দৃঢ়তর করা। ইহার জন্য পূর্ব্বের প্রত্যেক সূতাটির সহিত অন্য সূতাগুলি নূতন কতকগুলি সূতা বুনিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বের বোনা সূতাকে 'টানা' বলিলে এগুলিকে 'পোড়েন' বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এইরূপ বুনন শেষ করা হয়। অনেক সময় কেন্দ্র হইতে আরম্ভ না করিয়া বাহির হইতে ভিতর দিকে সূতা বুনিতেও দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে এইরূপ ভাবে জাল বুনিলে তাহা যতখানি দৃঢ় হয় অন্য কোনরূপে তাহা করা যায় না। সুতরাং মাকড়সার ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান কোন অংশেই মানুষের চেয়ে কম নয়। মানুষকে প্রতি ক্ষেত্রেই বরং বহু গণনা করিয়া কাজে হাত দিতে হয়, কিন্তু কোনরূপ গণনার ধার না ধারিয়াও মাকড়সা এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত সুদৃঢ় জাল নির্ম্মাণ করিতে পারে।



স্কুলের ছাত্রদের তৈয়ারী মান-মন্দির।
উপরে—ছাত্রেরা মান-মন্দিরের গম্বুজটি দেওয়ালের উপর তুলিতেছে, গম্বুজটির ওজন প্রায় ২৫ মন।
নীচে—গম্বুজের কাঠামর উপর তামার চাদর লাগান হইতেছে। [পর পৃ

জাল নির্ম্মিত হইয়া গেলে মাকড়সা জালের উপর আঠা জাতীয় এক প্রকার পদার্থ লাগাইয়া দেয় যাহাতে উহার উপর কোন কীট বা পতঙ্গ বসিলে তাহা ঐখানেই আটকাইয়া যায়, কারণ মনে রাখিতে হইবে যে, মাকড়সার জাল উহার খাদ্য সংগ্রহ করিবার যন্ত্র মাত্র।

জালের নির্ম্মাণ-কৌশলই কেবলমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার নহে, যে পদার্থে জাল নির্ম্মিত হয় তাহাও অতি অদ্ভুত পদার্থ। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাকড়সার জাল ইস্পাত অপেক্ষা প্রায় ছয় শত গুণ দৃঢ়তর! অর্থাৎ সমান আকারের ইস্পাত অপেক্ষা মাকড়সার জাল ছয় শত গুণ অধিক ভার সহিত পারে। আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক মাকড়সার জাল অপেক্ষা দৃঢ়তর পদার্থ তৈয়ারী করিতে পারেন নাই। মাকড়সার জালের আর একটি গুণ ইহার স্থিতিস্থাপকতা।

মাকড়সার দেহের পশ্চাৎ ভাগের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ হইতে এই সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ছয়টি অংশের প্রতিটিতে প্রায় ১০০ করিয়া মোট প্রায় ৬০০ ছিদ্র আছে; এই ছিদ্রগুলি হইতে এক প্রকার বস্তু নিঃসৃত হয়। বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে এই নিঃসরণ অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া সূতার আকার ধারণ করে। মাকড়সার জালের সূতাগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকদের পরিমাপ অনুসারে এইগুলি সময় সময় এক ইঞ্চির বিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হইতে দেখা গিয়াছে। অতিশয় সূক্ষ্ম রেশম (রেশমের পাকান সূতা নহে) ইহা অপেক্ষা অন্ততঃ দশ গুণ মোটা।

শিল্পজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয় মৌমাছি। মৌমাছিরা যে চাক তৈয়ারী করে তাহার নির্ম্মাণকৌশল সত্যই বিস্ময়জনক। একটি চাকে বহুসংখ্যক ছোট ছোট খোপ থাকে। ধারের খোপগুলি তিন কোণা এবং তাহার পরে ভিতরের দিকের সমস্ত খোপগুলিই ছয় কোণা হইয়া থাকে। ঘরগুলি

সমস্ত আকারে প্রায় সমান এবং প্রত্যেকটির দেওয়াল অন্যগুলির দেওয়ালের সহিত এক। সর্বাপেক্ষা কম মালমশলা ব্যবহার করিয়া যতদূর সম্ভব বড় ঘর তৈয়ার করিতে হইলে এইরূপ ছয়-কোণা ঘর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় কোন ইঞ্জিনিয়ার বা বৈজ্ঞানিক বাহির করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, যদি প্রত্যেকটি খোপ পৃথক্ ভাবে গোলাকার করিয়া নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে সবগুলিতে একসঙ্গে চাপ দিলে তাহা ছয়-কোণা হইয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, মৌমাছিরা খোপগুলি পৃথক্ ভাবে নির্ম্মাণ করে না, একেবারেই ছয়-কোণা খোপ জুড়িয়া জুড়িয়া সমস্ত চাকটি তৈয়ারী করে। মৌচাক নির্ম্মাণের উপাদান হইতেছে মোম। মৌমাছিরা বহু মধু খাইয়া অল্প মোম নিজেদের দেহ হইতে নিঃসৃত করিতে পারে বলিয়া মোম নষ্ট করিতে চায় না, যত অল্প মোম খরচ করিয়া যত বড় খোপ তৈয়ারী করিতে পারে তাহার চেষ্টা করে।

মৌমাছি সহজাত বুদ্ধি হইতে জ্যামিতিজ্ঞানের যে পরিচয় দেয়, মানুষ বহু অঙ্ক কষিয়াও তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জনৈক গণিতজ্ঞ পণ্ডিত মৌমাছির ছয়-কোণা ঘরগুলির প্রত্যেক কোণটি পরিমাপ করেন ; পরে সবচেয়ে কম মালমশলা লাগাইয়া ঐরূপ ঘর তৈয়ারী করিতে হইলে কোণগুলির পরিমাণ কত হওয়া উচিত অঙ্ক কষিয়া বাহির করেন। তিনি দেখিলেন যে, হিসাব মত কোণগুলির পরিমাণ যাহা হওয়া উচিত তাহার সহিত পরিমিত কোণের সামান্য তফাৎ হইতেছে। ইহাতে তিনি হয়ত এই ভাবিয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন যে, মৌমাছির শিল্পকৌশল মানুষের কাছাকাছি হইলেও এখনও ঠিক সমান হয় নাই। অপর একজন পণ্ডিত ইহাতে ঠিক সন্তুষ্ট হইলেন না ; ইনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, পরিমিত কোণের সহিত হিসাব সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইতেছে। পরে দেখা গেল যে, প্রথম পণ্ডিতের একটি সারণীতে (সারণী-Table) ভুল ছিল এবং সেইজন্য তাঁহার সামান্য ভুল হইয়া গিয়াছিল।

ছাত্রদের নির্ম্মিত মানমন্দির

আমেরিকার কনেক্টিকাট প্রদেশের গ্রানীচের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চেষ্টায় একটি ছোট মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারা নিজেদের হাতে একটি ৮ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত প্রতিফলক দূরবীক্ষণ এই মানমন্দিরের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। ১ ইঞ্চি মোটা জাহাজের জানালার কাঁচ ঘসিয়া দূরবীক্ষণের দর্পণটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দূরবীক্ষণটি নির্ম্মাণ করিবার জন্য যাহা কিছু হিসাবপত্র সমস্ত ছাত্রেরাই করিয়াছে ; দূরবীক্ষণের বিভিন্ন ধাতব অংশ তৈয়ারী করা বিদ্যালয়ের কারখানায় এবং মিস্ত্রীদের কোন সাহায্য না লইয়াই। মান-মন্দিরের দেওয়াল কংক্রিট-নির্ম্মিত। দেওয়ালের ভিত খোঁড়া, কংক্রিটের ছাঁচ তৈয়ারী করা, কংক্রিট ঢালাই সমস্তই ছাত্রেরা করিয়াছে। উপরের গম্বুজটি কাঠের ফ্রেমের উপর পাতলা তামার চাদর দিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। গম্বুজটি কারখানায় পৃথক্ ভাবে তৈয়ারী করিয়া দেওয়ালের উপর লাগাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রবণশক্তি পরীক্ষার বৈদ্যুতিক যন্ত্র

শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি শব্দরুদ্ধ ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে এই যন্ত্র স্থাপিত থাকে। যন্ত্রটির সহিত বাড়ীর যে কোন "প্লাগে" যোগ করিয়া দিলেই তাহা ব্যবহারযোগ্য হয়। পরীক্ষা করিবার সময়, পরীক্ষাধীন ব্যক্তির কাণে একটি টেলিফোন লাগাইয়া দেওয়া হয়। টেলিফোনের মধ্যে অতিশয় ক্ষীণ শব্দ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই শব্দ ধীরে ধীরে তীব্রতর হইতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে পরীক্ষাধীন ব্যক্তি শব্দ শুনিতে পায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি বৈদ্যুতিক চাবি টিপিতে বলা হয়। বিভিন্ন গ্রামের শব্দ লইয়া এই পরীক্ষা করা



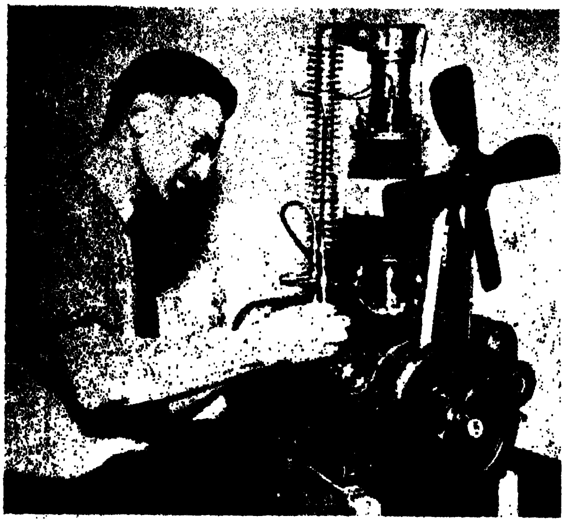
যন্ত্রসাহায্যে শ্রবণশক্তির প্রখরতার পরিমাপ করা হইতেছে।

হয়। ইহা হইতে পরীক্ষাধীন ব্যক্তির নিম্নতম শ্রবণসীমার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোক কত মৃদু শব্দ শুনিতে পায় বহু পরীক্ষার ফলে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার সহিত তুলনা করিলেই, পরীক্ষাধীন ব্যক্তির শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিক হইতে কম বা বেশী এবং স্বাভাবিক হইতে তারতম্য থাকিলে তাহার পরিমাণ কত, নির্ণয় করা যাইতে পারে। অপর পরীক্ষায় পরীক্ষাধীন ব্যক্তির কাণ বন্ধ করিয়া বৈদ্যুতিক উপায়ে স্পন্দমান একটি ধাতুখণ্ড কানের পিছনে হাড়ের উপর স্পর্শ করাইয়া রাখা হয়। এই পরীক্ষা হইতে কাণের বহিরংশ ও ভিতরের অংশের শব্দ-গ্রাহিতা পরিমাপ করা যাইতে পারে। একজন ব্যবহার করিতে পারে এরূপ ছাড়া একসঙ্গে বহুলোক ব্যবহার করিতে পারে এমন যন্ত্রও নির্ম্মিত হইয়াছে।

শেষোক্ত যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

নূতন ধরণের ডিজেল ইঞ্জিন

পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় ডিজেল ইঞ্জিন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ডিজেল ইঞ্জিনের প্রধান সুবিধা, ইহাতে খরচ কম পড়ে, কারণ ইহাতে ব্যবহৃত জ্বালানী তৈল পেট্রল অপেক্ষা বহুগুণ শস্তা। কিন্তু, ডিজেল ইঞ্জিন পেট্রল ইঞ্জিন অপেক্ষা বহুগুণ ভারী হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার ঠাণ্ডা করিবার জন্য জলের প্রবাহ প্রয়োজন। মোটর গাড়ীর পেট্রল-চালিত ইঞ্জিনেও অবশ্য এই ব্যবস্থা আছে কিন্তু এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন বাতাসের প্রবাহ দিয়াই শীতল করা হয়। সংপ্রতি



নূতন ধরণের ডিজেল ইঞ্জিনের উদ্ভাবক এবং নূতন ইঞ্জিনের আদর্শ। জলের পরিবর্ত্তে বাতাস দিয়া ইঞ্জিনটি ঠাণ্ডা করা হয়।

জনৈক উদ্ভাবক এক প্রকার হাল্কা ডিজেল ইঞ্জিন উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহাতে একটি পিস্টন ও সিলিণ্ডারে যাহা কাজ হয়, পুরাতন পদ্ধতিতে ৪টি সিলিণ্ডার এবং ৪টি পিসটনে তাহাই হইত। এই ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করিবার জন্য জলের প্রয়োজন নাই। ফাঁপা পিসটনের ভিতর দিয়া বেগে বাতাস চালিত করিয়া এই ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করা হয়। ইহার ক্রিয়া সন্তোষজনক হইলে, এরোপ্লেন ও উড়োজাহাজে ব্যবহৃত পেট্রল ইঞ্জিনের ব্যবহার বহুলভাবে কমিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে নূতন মতবাদ

আমাদের দেহের রক্ত অপরিস্কৃত হইয়া হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয়, হৃৎপিণ্ড হইতে ফুস্‌ফুসের ভিতর গিয়া বাতাসের অক্‌সিজেনের ক্রিয়ায় ঐ রক্ত পরিস্কৃত হইয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে আবার সমস্ত দেহে চালিত হয়—ইহাই প্রচলিত মত। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয় যে, হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পের ন্যায় যন্ত্র মাত্র। এই মতবাদ প্রায় ৩০০ বৎসর পুরাতন। কিছুদিন হইল জনৈক জাপানী চিকিৎসক ডাঃ কাটুৎজো নিশি এই মতবাদের বিপক্ষে একটি নূতন মতবাদ প্রচার করিতেছেন। তিনি বলেন যে, হৃৎপিণ্ড পাম্প করিয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালন করে, ইহা যথার্থ নহে। তাঁহার মতে পাম্পের ক্রিয়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সহিত কোন মিল নাই। অতিশয় সুক্ষ্ম বহু শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়, এবং ইহাদের কৈশিক আকর্ষণই রক্ত সঞ্চালনের কারণ। যে আকর্ষণের ফলে সলিতায় তৈল উঠে অথবা ব্লটিং কাগজে কালি শোষণ করে, শ্রীযুক্ত নিশির মতে রক্ত সঞ্চালনের কারণ তাহাই। হৃৎপিণ্ড রক্তের একটি আধার মাত্র এবং স্থিতিস্থাপক বলিয়া উহা রক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। এই মতবাদ অনুযায়ী শ্রীযুক্ত নিশি স্বাস্থ্যপালনের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছেন। জাপানে এই পদ্ধতিতে আস্থাবান লোকের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৪শ অধিবেশন নিজামরাজ্যে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যর আক্‌বর হায়দারী মহামান্য নিজাম বাহাদুরের নিকট হইতে প্রেরিত বাণী পাঠ করেন এবং কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন।

ইক্ষু-বিশেষজ্ঞ দেওয়ান বাহাদুর টি, এস, বেঙ্কটরামন্ এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করেন। বর্ত্তমান বৎসরের সভাপতির অভিভাষণে চিরাচরিত ধারা বর্জ্জিত হইয়া কিছু নূতনত্বের আভাস দেখা গিয়াছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিগণ সাধারণতঃ গম্ভীর গম্ভীর তত্ত্বের আলোচনাই করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দেওয়ান বাহাদুরের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"ভারতীয় গ্রামের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।" বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশের মতে বিজ্ঞান কংগ্রেসে গ্রামসম্পর্কীয় আলোচনা হয়ত অপাংক্তেয় হওয়াই উচিত ছিল।

সভাপতির অভিভাষণ

বর্ত্তমানে গ্রামসমূহে শহরের অধিকাংশ সুখ সুবিধাই পাওয়া যায় না। শহরে যে সকল সুখ ও সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশেরই হয়ত প্রয়োজন নাই, কিন্তু বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে এইগুলির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, আমাদের পছন্দ অপছন্দের উপর তাহা মোটেই নির্ভর করে না। লোকে যে গ্রামবাসী হইতে চায় না তাহার প্রধান কারণ যে, গ্রামে যানবাহনের সুবিধা, খবরের কাগজ, ডাকের সুবিধা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা প্রভৃতির অভাব। গ্রামে বিশুদ্ধ বাতাস ও উন্মুক্ত প্রান্তরের অভাব না

।কিলেও এই সকল পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা দূর না হইলে সহরমুখী লোক ামবাসী হইবে না।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা কেহই গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস রিতে চাহেন না, ইহা অতি পরিতাপের বিষয়। গ্রামে আকর্ষণের বস্তুর ।প্রাচুর্য্য এবং সম্ভবতঃ উপযুক্ত শিক্ষালয়ের অভাব গ্রামবিমুখতার জন্য ।নেকাংশে দায়ী। বাহির হইতে চেষ্টা না করিয়া গ্রামের মধ্যেই গ্রাম-ন্নয়নের চেষ্টা না করিলে সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না। অল্পকালের ন্য শহর হইতে কোন আকর্ষণের বস্তু গ্রামে লইয়া গেলে তাহার কোনও ায়ী ফল হইতে পারে না, একান্ত গ্রামের জিনিষ না হইলে তাহা গ্রামের াটীতে শিকড় গাড়িবে না।

পুরাকালে গ্রামসমূহ যে অধিকতর জনবহুল ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ।কিতে পারে না। পূর্ব্বের যে অবস্থায় তাহা সম্ভব হইয়াছিল আমাদের শত চষ্টায় বা ইচ্ছায় তাহা ফিরিয়া আসিবে না। বর্ত্তমান অগ্রগতির যুগে শহর-াস এবং তাহার আনুসঙ্গিক যাহা কিছু সমস্তই আমাদের গ্রহণ করিতে ইবে, ইহা ছাড়া অন্য পন্থা নাই। শহরের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও সুবিধাও হু কিছু আছে। এই সুবিধাগুলি যাহাতে গ্রামবাসীরাও পাইতে পারে াহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। অপরদিকে গ্রামের যে সমস্ত সুবিধা রহিয়াছে রে কোনক্রমেই তাহা পাওয়া সম্ভব নহে।

পূর্ব্বে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র ছিল গ্রাম, এখন তাহা ক্রমশঃ আসিয়া পৌঁছিয়াছে শহরে। সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রাম ও শহরের মধ্যে নিবিড়তর যোগ প্রয়োজন। শহরের শিক্ষা ও জ্ঞান গ্রামে প্রসারিত হওয়া বশ্যক। অপরদিকে গ্রাম না থাকিলে শহরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। চামালের জন্য এবং খাদ্যের জন্য শহরকে গ্রামের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। রে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব; গ্রাম হইতে এই সুবিধা দূর হইতে পারে। পরিশেষে প্রকৃতির নিকটবর্ত্তী থাকিয়া গ্রাম-াসীরা যে বৃহত্তর মনুষ্যত্ব ও গভীর বৈশিষ্ট্য পাইয়াছে তাহার কিছু অংশ হরবাসীরা গ্রামবাসীদের নিকট হইতে পাইতে পারে। কাজেই আমাদের ্তব্য গ্রামবাসীর শিক্ষার উন্নতি বিধান করিয়া গ্রামের তথা জাতীয় জীবনের কন্দ্রের পুনরুজ্জীবন করা।

কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

নয়া দিল্লীর ইম্পিরিয়াল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অস্থায়ী ডিরেক্টর, কৃষিরসায়নবিদ্ রাও বাহাদুর বি. বিশ্বনাথ কৃষি-বিজ্ঞান শাখার ভাপতিত্ব করেন।

তাঁহার অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য ছিল জমীগঠন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে স্যের জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে এদেশে কিরূপভাবে গবেষণা চলিতেছে তিনি তাহার আলোচনা করেন। তিনি লেন যে, সম্পূর্ণ নূতন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন না করিয়া ব্যবহৃত প্রণালীগুলি কিরূপে অপেক্ষাকৃত উন্নত করা যায় সে সম্বন্ধে গবেষণাগারে ও জমীর উপর নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির হয়ত কার্য্যকারিতা অনিশ্চিত এবং এদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, উন্নত প্রণালী যেন চাষীর উপযোগী হয়। তিনি বলেন যে জমী-সম্বন্ধীয় গবেষণা তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম—অধিকতর উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন জমীর গুণ অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয়—যে সকল জমীর উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া গিয়াছে তাহা পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এবং তৃতীয়—অনুর্ব্বর জমীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা।

ভারতীয় ও বৈদেশিক জমীর মূলগত পার্থক্যহেতু পাশ্চাত্ত্য দেশের উপযোগী ব্যবস্থা এদেশে চলে না। বহু ক্ষেত্রে ইহাতে লাভ না হইয়া যে ক্ষতিই হইয়া থাকে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টি লইয়া এদেশের কৃষি-গবেষণায় যে কোন সুবিধা হইবে না, তিনি এরূপ অভিমত দেন।

রাসায়নিক কৃত্রিম সারে যে জমীর ক্ষতি হয় এই দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জমীর পক্ষে স্বাভাবিক জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন।

পরিশেষে তিনি খাদ্যের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে জমীর প্রভাব কি তাহার আলোচনা করেন। জৈবসারের অভাব ঘটিলে যে খাদ্যের পরিপুষ্টি কমিয়া যায় তিনি তাহার উল্লেখ করেন। বর্ত্তমানে ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মায় তাহা ভারতের লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের মাত্র চলিতে পারে, কাজেই অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য যাহাতে উৎপাদন করা যায় তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা হইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন।

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান শাখা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি "অণু ও পরমাণু কর্ত্তৃক আলোক-শোষণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বোর ও বোলট্‌স্‌মানের মতবাদ অনুসারে কিরূপে স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা তাপ বা বিদ্যুৎ প্রভৃতির ক্রিয়ায় উত্তেজিত পরমাণুর আলোক-শোষণের অধিকাংশ ঘটনার মীমাংসা করা যায় তিনি তাহার আলোচনা করেন। বর্ণচ্ছত্রের রেখার বিস্তার, কয়েকটি বিশেষ ঘটনায় বর্ত্তমান মতানুযায়ী মীমাংসার অসাফল্য, আলোকশোষণে আলোকের পরিণতি ও অপচয়, বিভিন্ন প্রকারের অণু কর্ত্তৃক আলোকশোষণ প্রভৃতি বিষয় তাঁহার আলোচ্য ছিল।

রসায়ন শাখা

রসায়ন শাখার সভাপতি ডক্টর জে. এন্. রায় "ম্যালেরিয়ানিবারক ঔষধের রসায়নতত্ত্ব" সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায় ম্যালেরিয়া; ম্যালেরিয়া যে কেবলমাত্র বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে তাহা নহে, ম্যালেরিয়া লোকের কর্ম্মশক্তি অত্যন্ত কমাইয়া দেয়। ভারতবর্ষের শারীরিক, মানসিক

ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক ম্যালেরিয়া, সুতরাং ম্যালেরিয়া দূর করিবার রাসায়নিক প্রচেষ্টার অপেক্ষা অধিক আগ্রহের আর কিছুই বর্ত্তমানে থাকিতে পারে না।

কোনও ঔষধের গুণ নির্ণয় করিবার জন্য কি রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তিনি তাহার আলোচনা করেন এবং এই সকল পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কি প্রকারে নূতন নূতন ঔষধ প্রস্তুত করা যায় তিনি তাহা বর্ণনা করেন। কোনও ঔষধের ক্রিয়া উহার কোন অংশের রাসায়নিক বিন্যাসের উপর নির্ভর করে; এই বিন্যাসঘটিত কোনও ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিলে অনুরূপ গুণ পাওয়া যাইতে পারে। তিনি রাসায়নিকদের আবিষ্কৃত "প্লাস্‌মোকুইন", "প্লাস্‌মোসাইড' ও "আটেব্রিন"-এর ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝাইয়া দেন এবং দেখান যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে ব্যবহার করিলে এগুলির ফল আছে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কাজ হয় এইরূপ কোন ম্যালেরিয়ানিবারক ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার একটি বিবৃতি দিয়া এবং গবেষণার জন্য অর্থসাহায্যের আশু প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণের উপসংহার করেন।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মিঃ এচ. জি. চ্যাম্পিয়ন তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, কোন বৃক্ষবিশেষের দেহবিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই অজ্ঞাত এবং যে সকল ফসলাদি বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও অল্প। এ পর্য্যন্ত যে সামান্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষ সম্বন্ধে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃক্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কিছুই হয় নাই বলিলেও চলে।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের বনভূমি জমীর প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির উপর কি ভাবে নির্ভর করে এবং বনজ বৃক্ষসমূহের প্রকৃতি ও বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ অতি সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি ও কৌশল আবশ্যক এবং এই জাতীয় গবেষণার যে সুবিধা ভারতে রহিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে এ সম্বন্ধে পথ দেখাইতে পারে। বিজ্ঞান আলোচনার আনন্দ ব্যতীত ইহার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

জিয়লজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার মিঃ ডবলিউ. ডি. ওয়েস্ট্ এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষে ভূমিকম্পের উৎপত্তি এবং ভূমিকম্পজনিত ক্ষতি উপশমের উপায় আলোচিত হয়।

তিনি বলেন যে, মহাদেশের স্থলভাগের মন্থর প্রচলনের ফলে পর্ব্বতের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং প্রচলনের সময় চাঞ্চল্যের জন্য ভূমিকম্প হইয়া থাকে। যে সকল পর্ব্বত বহু প্রাচীন সেখানে ভূমিকম্পের বিশেষ ভয় নাই, কিন্তু হিমালয়ের মত অপেক্ষাকৃত নবীন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূমিকম্পের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। এই হিসাবে দাক্ষিণাত্যে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অল্প, এবং হইলেও তাহা অত্যন্ত মৃদু হইবে, কারণ আরাবল্লী, সাতপুরা, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত বহু প্রাচীন; উহাদের বৃদ্ধি শেষ হইয়া গিয়াছে। যদি বোম্বাই হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটি রেখা টানা যায় তাহা হইলে মোটামুটিভাবে ইহার দক্ষিণ অংশ নিরাপদ, ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা উত্তর দিকেই সম্ভব।

ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব সংপ্রতি এদেশে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; গত ছয় বৎসরের মধ্যে পাঁচটি বড় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যে আরও ভূমিকম্প ঘটিবে না তাহার কোন স্থিরতা নাই, যেহেতু ভূমিকম্পের কারণগুলি সমস্তই বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ, আসাম ও বেলুচিস্থান ভূমিকম্পের প্রধান কেন্দ্র।

ভূমিকম্প যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই হয় তাহা নহে,— জাপান, নিউ জিলাণ্ড, ক্যালিফর্নিয়া ও ইতালীতে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ঐ সকল দেশে ভূমিকম্পবিষয়ক গবেষণা চলিতেছে এবং ভূমিকম্পে ক্ষতি করিতে না পারে এই ভাবে গৃহ-নির্ম্মাণ করা হয়। এ দেশের গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতি এরূপ যে অধিকাংশ গৃহই ভূমিকম্প প্রতিরোধ করিতে পারে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাঙড়ায়, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরবিহারে এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কোয়েটায়, এই তিনটি প্রধান ভূমিকম্পে অন্ততঃ ষাট হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ভূমিকম্প প্রতিরোধের উপযুক্ত গৃহ থাকিলে মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চয়ই বহুগুণ কমিয়া যাইত। উপযুক্ত গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য যাহাতে একটি বিশেষ পদ্ধতি গড়িয়া উঠে সেদিকে সরকারের ও সাধারণের দৃষ্টি দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জোর দেন।

অন্যান্য শাখা

স্বাস্থ্য-শাখার সভাপতি ডক্টর জি. এস. থাপর "ভারতবর্ষে কৃমিতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থে কৃমিতত্ত্বের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে বিষয়ে কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কৃমিতত্ত্ব শিখাইবার বিশেষ সুযোগ নাই কিন্তু চিকিৎসা, সাধারণ স্বাস্থ্য, পশুচিকিৎসা এবং কৃষি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই কৃমিতত্ত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকায় ইহার অধিকতর আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত কে. সি. মুখার্জ্জি মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং দেখান যে যদিও ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি অপেক্ষা গণের বুদ্ধিতে লোকে সাধারণতঃ বেশী আস্থা স্থাপন করে, তথাপি তাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই।

নৃতত্ত্ব-শাখার সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর এল. কে. অনন্তকৃষ্ণ আয়ার গত ২৪ বৎসরে নৃতত্ত্বের উন্নতির আলোচনা করেন এবং বর্ত্তমানে নৃতত্ত্বের ক্ষেত্র যে কতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহার একটি পরিচয় দেন। ইহার পরে তাঁহার অভিভাষণ নৃতত্ত্বের দিক্ হইতে কুর্গদের একটি বিবৃত পরিচয় মাত্র।

অমৃতস্য পুত্রা:

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

জনপূর্ণ পৃথিবীতে জনতাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও অনেকগুলি মানুষ মিলিয়া একসঙ্গে জমাট বাঁধিবার আর নিশ্বাস, গায়ের গন্ধ, সংক্রামক রোগ, কড়া কথা, এই সব আদান প্রদান করিবার সাধ মানুষের কেন থাকিবে, সে কথাটা যারা ঘরের কোণায় বসিয়া ছাপান কাগজের পাতা হইতে দু'চোখ দিয়া জ্ঞান শুষিয়া শুষিয়া হয় মানবতত্ত্ববিদ্, তাদের বিবেচ্য। পিঁপড়াও ভিড় জমায়, কেবল গুড়ের চারিদিকে নয়, সকলে মিলিয়া সকলের চেষ্টায় যাতে সকলে বাঁচিতে পারে সেই জন্য। পাখা ওঠার পর একা একা পাখায় ভর দিয়া পিঁপড়া তাই স্বর্গে যায়।

যেখানে যত বেশী মানুষ যত বেশী জমাট বাঁধে আর প্রত্যেক দিন যত বেশী উপলক্ষে যত বেশী জনতা হইয়া আসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, সেখানটা তত বড় সহর। স্কুল কলেজে ক্লাস বসে রোজ, দশটায় খোলে আপিস, সভা-সমিতির অধিবেশন হয় হরদম, খেলার মাঠে দশ বিশ পঁচিশ রকমের খেলা বাদ যায় না একদিনও, প্রত্যেকটি সিনেমায় প্রত্যেক দিন একটি প্রবেশ-পত্র কিনিতে চায় দশজনে, রেস্তোরাঁয় চা-চপ খায় সকলে, বাকে-ডি-অমুকে দু'একটা ভঙ্গুর বোতলের ঠেলায় অনাবৃতার স্বর্গে উঠিয়া প্যাডোচ্চ-মধ্যা সমতল-বক্ষা রূপসীর সঙ্গে নাচে অনেকেই, বাজারে চলিতে থাকে আলু-পটল বিক্রী, দাওয়ায় বা বাহিরের ঘরে চলিতে থাকে আড্ডা, অন্তঃপুরে একটা মানুষের দশভাগের একভাগ থাকিতে পারে যে স্থানটুকুতে সেখানে বাস করে দশজন—

দশজনের একজনও পূরা মানুষ নয়, তাই রক্ষা।

হয়ত মানুষও নয়।

অনুপম আর জহরলাল দু'জনেই কলেজ যাইতেছিল। অনুপম যাইতেছিল বাসে আর জহরলাল যাইতেছিল মোটরে। একটা প্রকৃত ও প্রকাণ্ড চৌমাথায়, চারদিকের চারটি পথবাহী গাড়ী ঘোড়া মানুষের দ্রুতগতির মধ্যেই যেখানে প্রগতির লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আর যেখানে কাগজ ফিরিওয়ালাদের বগলে দু'চার পয়সা দামের সংবাদ-রূপী বিশ্বকে কিনিতে পাওয়া যায়, দু'চার পয়সা দাম দিয়া সেই চৌমাথায় লাল আলোর ইঙ্গিতে বাস আর মোটরটি পাশাপাশি থামিয়া গেল।

প্রকাণ্ড দোতলা বাস, বসিবার আসনগুলি বাদ দিলে একটি পরিবারের চমৎকার বাস-গৃহ হইতে পারে। অনুপম কোণে বসে নাই, তবু নীচের তলায় মাঝখানের একটি আসনে কোণঠাসা অবস্থায় জানালা দিয়া চাহিয়াছিল পথের দিকে। মোটরটির পিছনের সিটে ট্রাউজার ঢাকা দুই হাঁটুর উপর কনুই আর কামান গালে হাতের তালু রাখিয়া বসিয়া ছিল জহরলাল আর তার পাশে বসিয়া-ছিলেন তার সাড়ে তিয়াত্তর বছরের ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর।

কয়েক হাত তফাতে বাসের জানালায় অনুপমের মুখ-খানি দেখিয়া ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর চিনিতে পারিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, অনুপম না? ও অনুপম!

চোখোচোখি হইয়াছিল কয়েক সেকেণ্ড আগেই। বাসের জনতায় অজ্ঞাতবাসী অনুপম মানুষ চেনার ব্যাপারে একটু কাঁচা। এতগুলি মানুষের মধ্যে এতক্ষণ সে যে নিজেকে স্বতন্ত্র, একা, অসহায় আর ছেলেমানুষ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চেনা জগতের কাছে অজ্ঞাতবাসীর নিজেকে অচেনা করিয়া রাখার মত নিজের মনের সুপরিচিত অংশটুকুর কাছে নিজেকে অপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল, বছর তিনেক আগে দেখা একজন বুড়োকে এতকাল পরে চোখে দেখামাত্র মনে পড়ার মানসিক প্রক্রিয়াটিকে সে ভাবনা একটুও প্রশ্রয় দেয় না।

অনুপম বলিল, আপনি কে?

বীরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে নেমে আয়, তারপর বলছি আমি কে। নাম, নাম, শীগ্‌গির নাম।

জীবনে আর কখন তো এমন ঘটনা ঘটে নাই। এমন দামী মোটরের আরোহী, ধূসর রঙের দামী কাপড়ে তৈরী চাপকানের মত লম্বা এ রকম কোট গায়ে, সাদা গোঁফ-দাড়িতে এ রকম ঋষির মত মুখওয়ালা, এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ জীবনে আর কবে অনুপমকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাস হইতে নামিতে বলিয়াছে? যানবাহনের গতিনিয়ামক যন্ত্রের লাল আলো এতক্ষণে নীল রঙে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায় বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনুপম নামিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। মানুষ ঠেলিয়া বাস হইতে নামার অভ্যাস তার অনেক দিনের, তবু, মোড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছানোর আগে মাটিতে পা দেওয়া সেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিল না। হাতে বই, মুখে ব্রণ, কালো একটি মেয়ের কাছে মাথা তার কাটা গিয়াছে লজ্জায়, পা মাড়াইয়া দেওয়ায় একজন প্রৌঢ়বয়সী ভদ্রলোক ছোটলোকের মত কি যেন বলিয়াছেন অপমানকর, বাস হইতে নামার জন্য বীরেশ্বরের হুকুমের অজানা রহস্য মনের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে আরও গভীর, তবু বাসের টিকিটের পয়সাকটা নষ্ট হওয়ার কথাটাই যেন খচ খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল অনুপমের মনে। আবার টিকিট করিতে হইবে। আবার দিতে হইবে চার চারটা পয়সা।

মোটর গাড়ীটি বাসের পিছু পিছু আগাইয়া আসিয়াছিল, পাশে থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের কুড়ি বাইশটা গাড়ীর হর্ণে বাজিয়া উঠিল বিরক্তির আওয়াজ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আয় অনুপম, ভেতরে আয়।

অনুপম ভিতরে গিয়া বসিল। চেনা মানুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু চেনা যায় না কেন? এতক্ষণ এটা খেয়াল থাকে নাই, এবার পাশে বসিয়া বীরেশ্বরের গোঁফ দাড়িতে ঢাকা মুখখানায় অপরিচয়ের আরও একটা আবরণ সরাইতে না পারিয়া হঠাৎ লজ্জায় অনুপম একেবারে যেন কাবু হইয়া গেল।

চেনা মানুষকে না চিনিতে পারার লজ্জা। প্রণম্যকে প্রণাম করার বদলে মনের ভুলে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দেওয়ার মত এ যেন একটা সাংঘাতিক অপরাধ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আমি চিনলাম, তুই আমাকে চিনতে পারলি না অনু? আজকালকার ছেলে তোরা, তোদের কাণ্ডই আলাদা। মনের মধ্যে হাজার রকম চিন্তা আর স্মৃতির খিচুরি পাকাস, একটাও স্পষ্ট হতে পারে না। আমি হলাম তোর ঠাকুর্দ্দা।

একটু হাসিলেন বীরেশ্বর, অত দাড়ি গোঁফের জঙ্গলেও হাসিটা দেখা গেল। হঠাৎ খুসী হইয়া অনুপম বলিল, চিনেছি।

কে বলত আমি?

আপনি সীতা-পিসীমার বাবা।

তোর বাবার বাবা নই?

এটা পরিহাস। নিজের কথায় বীরেশ্বর নিজেই হাসিলেন, কিন্তু অনুপমের অত সহজে হাসি আসে না। মনের মধ্যে হাসির যে কারখানা আছে সেটার অনেকগুলি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, মনটাও কি হইয়া যায় নাই গোলকধাঁধাঁর মত এলোমেলো রকমের বাঁকা? সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, হঁ্যা।

হঁ্যা? শুধু হঁ্যা? আমি হলাম তোর ঠাকুর্দ্দা, শুধু হঁ্যা বলে আমার কথার জবাব দিলে পাপ হয়।—এ হল তোর রামলাল কাকার ছেলে জহরলাল। কাকার ছেলের সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়, তাতো জানিস্? কে জানে বাবা জানিস্ কিনা, তোরা হলি আজকার ছেলে, কি যে জানিস্ আর কি যে জানিস্ না ভগবান্‌ও তা জানেন না। বলেই দিই, —কাকার ছেলে হয় খুড়তুতো ভাই। দু'জনে যে হাঁ করে তাকিয়ে রইলি এ ওর মুখের দিকে?

জহরলাল বলিল, আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

অনুপম বলিল, আমারও মনে হচ্ছে আপনাকে দেখেছি।

জহরলাল বলিল, আপনার কোন ইয়ার?

অনুপম বলিল, ফোর্থ ইয়ার—সাইন্স। আপনার?

জহরলাল বলিল, আমারও ফোর্থ ইয়ার—আর্টস্।

বীরেশ্বর দুজনের আলাপ শুনিতেছিলেন। হঠাৎ ড্রাইভারকে গাড়ী ঘুরাইয়া বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিলেন।

জহরলাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, কলেজ যাব না?

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন, চুলোয় যাক তোর কলেজ। বাড়ী ফিরে তোদের দুজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেব। যতক্ষণ আপনি আপনি করে তোরা কথা বলবি, তালা খুলব না। আমার নাতি

তোরা, ভাইকে আপনি বলতে লজ্জা করে না তোদের? বয়সের কত তফাৎ জানিস্ তোদের? একুশ দিন।

তাদের মধ্যে কে একুশ দিনের বড় কে একুশ দিনের ছোট, বীরেশ্বরকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সাধ অনুপমেরও দেখা গেল না, জহরলালেরও দেখা গেল না। বাসের চারটা পয়সা নষ্ট হওয়ার শোক অনুপমের মনে মিলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কলেজ না গেলে যে পার্সেন্টেজগুলি আজ নষ্ট হইবে সে অপচয় তার কাছে আরও শোচনীয়। অসুখে ভুগিয়া তার অনেক পার্সেন্টেজ নষ্ট হইয়াছে, নন-কলেজিয়েট হইয়া পরীক্ষা দিতে হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না অনুপমের, দশটা টাকাও বেশী লাগিবে। তবু, প্রতিবাদ করার বদলে সে চুপ করিয়া রহিল, গাড়ী ফিরিয়া চলিল যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে। ক্ষতি? ক্ষতির ভাবনাকেই আজ অনুপমের উপভোগ্য মনে হইতেছে। জীবনে একদিন হিসাব মিলিল না, দেখা গেল লোকসান হইয়াছে,—জীবনটা তাই যেন একদিনের জন্য ধন্য হইয়া গেল। কলেজের পার্সেন্টেজের ক্ষতির চেয়ে বড় রকম একটা ক্ষতি আজ হইতে পারে না? পকেটে একটা দশটাকার নোটও নাই যে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পকেটে হাত ঢুকাইয়া নস্যের কৌটাটা বাহির করিয়া আনিতে গিয়া আবার খালি হাতটাই অনুপম বাহির করিয়া আনিল।

সে জানে, এ সাময়িক বৈরাগ্য নয়, অস্থায়ী পাগলামি, মন অস্থির হইলে এরকম হয়। নস্যির ডিবা ছুঁড়িয়া ফেলা নয়, মানসিক অস্থিরতা চরমে উঠিয়া কত মানুষের কাছে সন্ন্যাসী হওয়া সহজ করিয়া দিয়াছে।

বড় তিনতলা বাড়ী, সামনে ছোট একটি বাগান। সহরের এই অংশটা নির্জ্জন ও গম্ভীর, কারণ, একটা বাড়ী ও বাগান-বাড়ী না হোক, পথের দুদিকের প্রায় সবগুলিই সামনে বাগানওয়ালা বাড়ী। বাড়ীগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি যেন বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজান গোছান দোকান, অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়া হয়ত কারও চোখ জুড়ায়। জগতে অন্ধ যত আছে, চোখ থাকিতে অন্ধের সংখ্যা তো তার চেয়ে অনেক বেশী।

ইতিমধ্যেই অনুপম ও জহরলাল পরস্পরকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় দুজনকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখার সঙ্কল্প বীরেশ্বরের আর দেখা গেল না। দুজনকে তিনি লইয়া গেলেন দোতলার অন্দরে, যেটা আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড একটা ঘর এবং যেখানে দুপুরবেলা বাড়ীর মেয়েরা খেলে তাস এবং পাড়ার মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে বসে মজলিস।

মাতা-পিসীমাই আগে আসিলেন। মাঝবয়সী বিধবা মানুষ তিনি, পরণে তাই ধবধবে সাদা হাতাকাটা সেমিজ আর ধবধবে সাদা চুলপাড় ধুতি। কপালে চামড়ার ভাঁজে সৃষ্ট লম্বা রেখাটি অত্যন্ত স্পষ্ট। রেখাটি দুশ্চিন্তার নয়, চিন্তার। সাত বছর আগে সধবা অবস্থায় তিনি যখন পড়িতেনও কম, ভাবিতেনও কম, তখনও এই রেখাটি ছিল, তবে এত অস্পষ্ট যে, লোকে দেখিয়াও দেখিত না। তারপর বিধবা হইয়া তিনি পড়াশোনা আরম্ভ করেন—মনস্তত্ব আর দেহতত্ব ছাড়া মানুষের সম্বন্ধে যত কিছু পড়িবার ও শুনিবার আছে সব! এরকম পড়াশোনায় গভীর চিন্তাও বোধ হয় দরকার হয়। সাত বছরের চিন্তায় কপালের রেখাটি তাই স্পষ্ট আর গভীর হইয়া কপালটিকে তার দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের তর্জ্জনীর ডগা দিয়া রেখাটিকে তিনি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘষিয়া দেন। হয়ত তোয়াজ করেন, হয়ত মিলাইয়া দিতে চান।

পরিচয় পাওয়ার পরেই অনুপমকে তিনি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, ওমা! তুমি সেই অনুপম! জলপাইগুড়িতে তোমাকে যে আমি কদিন ধরে দেখেছি, তবু চিনতে পারলাম না দেখে? কি আশ্চর্য্য মন মানুষের! তবে অনেকদিন আগে তোমায় দেখেছিলাম, দশ এগার বছরের কম নয়, ছোট ছিলে তখন তুমি। কত বয়েস তোমার এখন? উনিশ? দশ এগার বছর আগে যদি তোমায় দেখে থাকি,—ধরা যাক এগার বছর, তাহলে তখন তোমার বয়েস ছিল—

কপালের রেখায় চামড়ার ভাঁজ পড়িয়া গেল, নিজে নিজেই অবাক্ হইয়া সীতা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য মন মানুষের! উনিশ থেকে এগার বাদ গেলে কত যেন থাকে? দশ বাদ গেলে থাকে নয়, তাহলে এগার বাদ গেলে থাকবে আট। হ্যাঁ আট। তোমার তখন আট বছর বয়েস ছিল, না?

অনুপম বলিল, আমার ঠিক মনে নেই

সীতা বলিলেন, আমার চেয়ে কত ছোট তুমি, আমার মনে নেই, তোমার মনে থাকবে? তোমরা এখন কলকাতাতেই থাক, না? কোথায় থাক? বড়দা এখানেই আছেন, না?

অনুপম বলিল, বাবা আর বছর মারা গেছেন।

বীরেশ্বর আরাম-কেদারায় কাত হইয়া পিসী-ভাইপোর আলাপ শুনিতেছিলেন, অনুপমের কথা শুনিয়া সোজা বসিলেন। তারপর তার স্তব্ধ নিশ্চল ভাব দেখিয়া মনে হইল, সোজা হইয়া বসিবার অতিরিক্ত আর সব ক্ষমতা তার শেষ হইয়া গিয়াছে।

বড়দা নেই! বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে একটু সময় লাগিল সীতার। জীবনে একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য যে ভাইকে তিনি চোখে দেখিয়াছিলেন, সেই কয়েক দিনের মধ্যে একবারও যার কাছে ছোট বোনের মত ব্যবহার পান নাই, যে ধরিতে গেলে এক রকম অজানা, অচেনা অপরিচিত মানুষ, আর বছর সে মরিয়া গিয়াছে এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কি কাঁদিতে পারে? চেয়ারে বসিয়া সীতা কাঁদিতে লাগিলেন, আর বীরেশ্বর চুপচাপ শুধু বসিয়াই রহিলেন।

একুশ বছর বয়সে যে ছেলে জন্ম লইয়াছিল, আর পঁচিশ বছর বয়সে যে ছেলের সঙ্গে তার হইয়াছিল বিচ্ছেদ, আজ তিয়াত্তর বছর বয়সে পাওয়া গেল তার মৃত্যুসংবাদ, সেই ছেলেরই ছেলের মুখে। পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা বীরেশ্বরের ছিল না। তিয়াত্তর বছরের জীবনে অনেক পিতাকেই তিনি পুত্রশোক পাইতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু পরের শোক দেখিয়া এমন ভয়ানক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা কি মানুষের হয়!

জহরলাল ঘরে ছিল না। পিতামহ ও পিসীমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অনুপম মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব দেখিয়া আর সীতার মৃদু কান্না শুনিয়া হঠাৎ তার মনে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। আপনজন এরা? এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এত দামী আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসিয়া তার বাবার মরণের খবরে এদের কাতর হইবার কি অধিকার আছে, কেবল ওই অর্গ্যানটা বেচিয়া সেই টাকায় চিকিৎসা হইলে তার বাবার যখন না মরিবার সম্ভাবনা ছিল?

একে একে বাড়ীর অন্য সকলে ঘরে আসিতে থাকে। জহরলাল, তার মা, জহরলালের তিনটি বোন ও ছোট একটি ভাই, জহরলালের এক মামা এবং এ বাড়ীতে আশ্রিত ও আশ্রিতা তিনটি দূরসম্পর্কের মানুষ। আর আসে সাত আট বছরের একটি ছেলে। জহরলালের বড় বোনটি যখন বছর খানেক আগে মারা গিয়াছিল, তার এই ছেলেটি তখন মানুষ হইতে আসিয়াছিল মামার বাড়ী।

দুম্ দাম্ শব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটি সকলের ভাবভঙ্গি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সীতার কান্না সকলকে যেন নির্ব্বোধ ও নিশ্চল পুতুলে পরিণত করিয়া দিয়াছে। কেউ জানে না ব্যাপারখানা কি, তবু সীতার মত মাঝবয়সী নারীর এ রকম মৃদু ও মার্জ্জিত কান্নারও যে বড়রকমের একটা কারণ থাকে এটুকুতো সকলে বোঝে। তা ছাড়া ঘরের আবহাওয়াটাও যেন কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটি অপরিচিত যুবকের উপস্থিতি, সীতার শোক আর বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব ছাড়া আরও কি যেন একটা শোচনীয় রকমের খাপছাড়া বিষাদ ঘরের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে সহজবোধ্য অস্বাভাবিকতা।

জহরলালের স্বর্গীয়া দিদির ছেলেটি একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এইরকম স্বভাব ছেলেটার, খাপছাড়া কিছু দেখলেই সে হাসে। ছোটবড় যত কিছু অসঙ্গতি আছে জগতে, সব যেন তাকে সুড়সুড়ি দেয়।

জহরলালের মা বলিলেন, ওকি সতু, ছি!

জহরলাল বলিল, ফের যদি হাসবি তো কাণ মলে লা[illegible] করে দেব।

ছমকিতে থামিবার মত হাসি সতু হাসে না। মামার বাড়ীতে মা-মরা ছেলেকে কে মারিবে? ছমকি যে শুধু

হুনকি সে তা জানে। তাই হাসি তার থামে না, কিন্তু তার হাসির চাপে সীতার কান্না বন্ধ হইয়া যায়।

সতু নাগালের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাত বাড়াইয়া তাকে কাছে টানিয়া অনুপম বীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ছেলেটি কে?—আর এক পা সামনে আগাইয়া জহরলালের মা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে ঠাকুরঝি?

অনুপমের কথার জবাবে বীরেশ্বর বলিলেন, ও জহরের দিদি মাধুরীর ছেলে। আর বছর মাধুরী মারা গেছে।

জহরলালের মার কথার জবাবে সীতা বলিলেন, বৌদি, বড়দা আর বছর মারা গেছে।

ঘরের এতগুলি লোকের সকলের মধ্যেই কমবেশী ফাঁক ছিল, অনুপম সতুকে কাছে টানিয়া লওয়ায় মনে হইল, তাদের একজনের মা ও অপরজনের বাবার মৃত্যুতে এতগুলি দুঃখিত মানুষের মধ্যে ওরা পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়: দুজনে একসঙ্গে। [ক্রমশঃ

পুস্তক ও পত্রিকা

দুর্গাপূজা চিত্রাবলী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা বাঁধাই সুন্দর।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি যে সকল পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ পাইয়া থাকি, এই পুস্তকখানি সে শ্রেণীর নহে। ইহা মূলতঃ চিত্রপুস্তক। কিন্তু চিত্রগুলিকে একটি কাহিনীর রূপ দেওয়া হইয়াছে, কিংবা একটি কাহিনীকে রূপ দিবার জন্যই চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা বলিলেই ভাল হয়। কাহিনীটি দুর্গাপূজার প্রচলিত ব্যাখ্যার রূপক। এই রূপক যে এত সুন্দর ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে কিংবা এই রূপকের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা এই বই পাইবার পূর্ব্বে কোনদিন ধারণা করিতে পারি নাই। সুতরাং শিল্পীযুগল প্রতিমা-পূজক বাঙ্গালীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

পুস্তকটি শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথের যে মূর্ত্তি চিত্র আছে, তাহার বিশিষ্টতা চিত্তাকর্ষক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশ করিয়া যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আশা করা যায়, সে সাহস এই একখানা বই প্রকাশের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ থাকিবে না। ভবিষ্যতে আমরা এই ধরণের আরও অনেক পুস্তক দেখিবার আশা রাখি। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

স্বস্তিকা—লেখক ও প্রকাশক শ্রীহীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১৩নং নিমতলা লেন, কলিকাতা। ছাপা বাঁধাই ভাল, মূল্য আট আনা।

কবিতার বই।

আকাশ-পাতাল—শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিলের শ্রমিকদের বস্তি-জীবন উপন্যাসের পটভূমি। গাঁয়ের ছেলে কানাইয়ের সহরের পঙ্কিলতার আবর্ত্তে অধঃপতন; বস্তি-জীবনেও গঙ্গাবতীর মত নারী; সাবপ্লট তরুণ সাহিত্যিক রজতের ব্যর্থ প্রেম সমস্ত মিলিয়া আধুনিক কথা-সাহিত্যের যদি কোন দোষ কিংবা গুণ থাকে, তবে সে সমস্তই এই পুস্তকখানিতে পাওয়া যাইবে। আধুনিক সাহিত্যকে আমরা নির্দ্দোষ এবং নির্গুণ এই দুই আখ্যা দিলাম বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা হেঁয়ালী করিতেছি! প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। দোষ কিংবা গুণ অবয়ব-বিশিষ্টতার সহিত জড়িত। বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যের কি সে অবয়ব আছে? আমাদের মনে হয়, নাই—কিন্তু ইহা কবন্ধও নহে। তবে ইহা কি, তাহা গবেষণাযোগ্য। এই নিরাবয়ব নিরাকার বস্তুর অস্তিত্ব কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি।

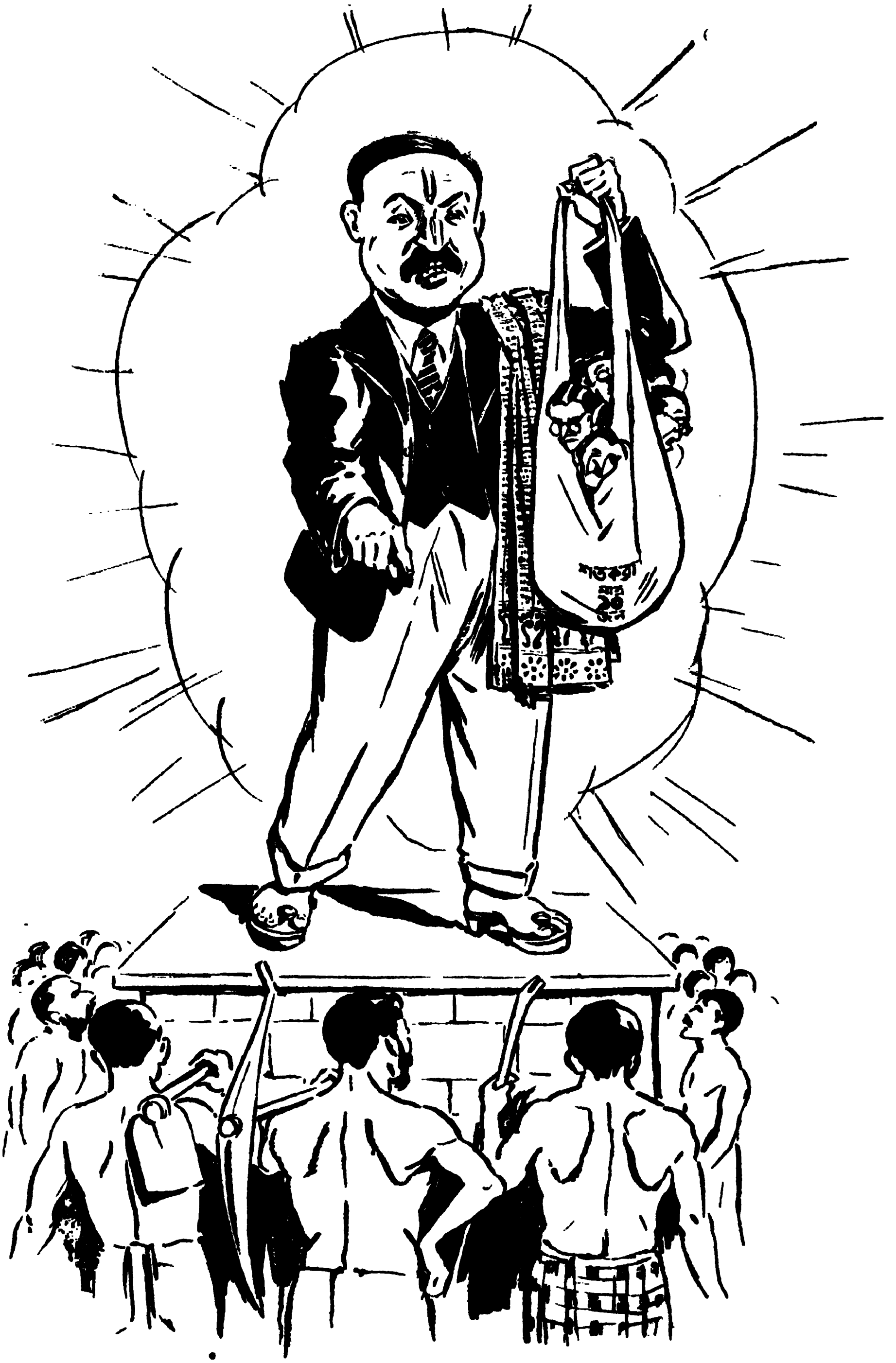
সেই অস্তিত্ব সময়ে সময়ে আমাদের কৌতূহল জাগায়, সময়ে সময়ে বিরক্তি আনে। "আকাশ পাতাল" সেই শ্রেণীর পুস্তক।

সরল হিন্দী শিক্ষা—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী। প্রকাশক হিন্দী প্রচার কার্য্যালয়। ২, মহামায়া লেন, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য ।১০ মাত্র।

হিন্দী-শিক্ষার্থী বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী পুস্তক।

সাহিত্য বার্ষিকী—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া। ছাপা, বাঁধাই ভাল।

শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের ২০শ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ ও পরিষদের উক্ত বর্ষের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও কবিতা সঙ্কলন।



শতকরা দশ জনের কোসুলি

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

জগতের আর্থিক অবস্থা ও তাহার পরিবর্ত্তনের উপায়

দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলে প্রায় প্রতি দেশেই দেখা যাইবে যে, গত কয়েক বৎসর জগদ্ব্যাপী যে আর্থিক অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল, সেই আর্থিক অভাব অদূর-ভবিষ্যতে বিদূরিত হইবে, এইরূপ আশা অনেকেই পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের মতে যাঁহারা এই আশা পোষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। বর্ত্তমানে যে জগদ্ব্যাপী আর্থিক অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সমস্ত উপায় আমূলভাবে পরিবর্ত্তিত না হইলে, তাহা অদূরভবিষ্যতে দূরীভূত হওয়া ত' দূরের কথা, উহা আরও ঘনীভূত হইবে এবং **জগতে মানবজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষা করা ক্লেশকর হইয়া পড়িবে।**

আমাদের উপরোক্ত মতবাদ যুক্তিপূর্ণ, অথবা যাঁহারা আশা করিতেছেন—অদূরভবিষ্যতে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে, তাঁহাদের মতবাদ যুক্তিপূর্ণ, তাহার বিচার করিতে হইলে, প্রকৃতভাবে জাতীয় অর্থ অথবা জাতীয় ধন (national wealth) কাহাকে বলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্থির করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমরা এখানে ব্যক্তিগত অর্থের (individual wealth) কথা না বলিয়া জাতীয় অর্থের (national wealth) কথা বলিতেছি। আধুনিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণের মতে, যাহা লইয়া জাতীয় ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাই ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যেরও পরিমাপ হইতে পারে। তাঁহাদের মতে কোন্ জাতি কত ঐশ্বর্য্যশালী, তাহা যেরূপ ঐ জাতির কত টাকা, আনা, পয়সা, অথবা কত পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স্ আছে, তাহার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন্ মানুষ কত ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাও ঐ মানুষের কত টাকা আনা, পয়সা আছে, তদ্দ্বারা স্থির করিতে হয়। আমাদের মতে, যতদিন পর্য্যন্ত জাতীয় ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার পদ্ধতি টাকা, আনা, পয়সার সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের পরিমাপও মানুষ টাকা, আনা, পয়সার সংখ্যার দ্বারা করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবে বটে এবং ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার পদ্ধতি কতকাংশে টাকা, আনা, পয়সার সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু, জাতীয় ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গতভাবে একদিনও টাকা, আনা, পয়সার সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আজকাল যেরূপভাবে বিভিন্ন ধাতুকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং বিভিন্ন রকমের কাগজকে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ছাপ প্রদান করিয়া টাকা, আনা, পয়সার অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের উৎপত্তি সাধন করা হইয়া থাকে, তাহাতে তদ্দ্বারা অর্থাৎ টাকা, আনা, পয়সা প্রভৃতির দ্বারা যদি কোন জাতির ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ যথাযথভাবে স্থির করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে কোন জাতিকে অল্প ঐশ্বর্য্যশালী অথবা কোন জাতিকে অধিক ঐশ্বর্য্যশালী বলা চলিত না। কারণ, ঐরূপ ভাবে বিভিন্ন ধাতুকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং বিভিন্ন রকমের কাগজকে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ছাপ প্রদান করিয়া,

অসংখ্য পরিমাণের টাকা, আনা, পয়সার উৎপত্তি করা, প্রত্যেক জাতির পক্ষেই অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, আধুনিক জগতের প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ দেশে যে নোট (currency notes) প্রচলিত করিয়া থাকেন, তাহার পরিমাণ একটা কোন ধাতুর নির্দ্দিষ্ট ওজনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং কোন জাতিই নিজ দেশে ঐ নির্দ্দিষ্ট ধাতুর পরিমাণের বৃদ্ধি সাধন না করিয়া নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাদের ঐ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা কারেন্‌সি ভ্যালুর এপ্রিসিয়েশন ও ডিপ্রিসিয়েশন (appreciation & depreciation of currency value) কেন হয়, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, টাকা, আনা, পয়সাকে যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে জাতীয় ধন অথবা অর্থ বলিয়া আখ্যাত না করা যায়, তাহা হইলে কোন্ বস্তুকে "জাতীয় ধন" অথবা "জাতীয় অর্থ" বলিতে হইবে ?

মানুষের কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধান পাইলে, কোন্ বস্তুকে মানুষের প্রকৃত অর্থ বলা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়। কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষ মুখ্যতঃ আহার, বিহার এবং শিক্ষা* লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ঐ আহার, বিহার এবং শিক্ষার জন্য যাহা কিছু দরকার হয়, তাহার প্রত্যেকটীকে সঞ্চয় করা অর্থসাপেক্ষ। কাযেই, মূলতঃ যে যে বস্তু অথবা কর্ম্মের দ্বারা মানুষের আহার, বিহার এবং শিক্ষার উপকরণসমূহ অর্জ্জিত হইতে পারে, সেই সেই বস্তুকেই মানুষের ধন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

কোন্ কোন্ বস্তু অথবা কর্ম্মের দ্বারা মানুষের আহার, বিহার এবং শিক্ষার উপকরণসমূহ অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার উপায় প্রধানতঃ চারিটী, যথা—

(১) কৃষি ;
(২) শিল্প ;
(৩) বাণিজ্য ;
(৪) চাকুরী।

মানুষের আহার, বিহার এবং শিক্ষার উপকরণসমূহ অর্জ্জন করিবার প্রধান উপায় চারিটী বটে, কিন্তু উহার মূল উপায় একমাত্র "কৃষি"। যাহা কিছু জমি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যাপক ভাবে কৃষিজাত বলিতে পারা যায়। এই হিসাবে খনিজ পদার্থসমূহকে কৃষিজাত বলিতে হইবে।

মানুষের আহার, বিহার এবং শিক্ষার উপকরণসমূহ অর্জ্জন করিবার প্রধান উপায় চারিটী হইলেও মূল উপায় যে একটী, তাহার বড় প্রমাণ এই যে, কোন না কোন কৃষিজাত দ্রব্য না হইলে কোন শিল্পকার্য্য সাধিত হইতে পারে না, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য হইলে কোনরূপ বাণিজ্য সাধিত হইতে পারে না এবং কৃষি, শিল্প অথবা বাণিজ্যের ব্যবস্থা না থাকিলে, কোন সরকারী অথবা বে-সরকারী চাকুরীক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় না।

অতএব মূলতঃ কৃষিজাত দ্রব্যকেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে মানুষের প্রকৃত ধন অথবা অর্থ (wealth) বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। টাকা, আনা, পয়সা অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্‌স্ না থাকিয়াও যদি মানুষের একমাত্র প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয় না। কিন্তু, মনুষ্যসমাজে কৃষিজাত দ্রব্য না থাকিয়া যদি কেবলমাত্র অসংখ্য পরিমাণের টাকা, আনা, পয়সা অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্‌স্ থাকিত, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে একদিনও জীবনধারণ করা সম্ভব হইত না।

গত তিন শত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মতে কৃষি শিল্পের অন্তর্গত এবং কৃষির যত উন্নতি হউক আর না-ই হউক, অন্যান্য শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই জাতির উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে। এই মতবাদও ভ্রমাত্মক। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু

* এই তিনটী শব্দ এইস্থানে কোন পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া শব্দগত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দগত অর্থ জানা না থাকিলে, ব্যাপকভাবে পারিভাষিক অর্থ চিন্তা করিতে পারিলে উহার সন্ধান অনুমান করা যায়।

একে ত' কোন না কোন কৃষিজাত দ্রব্য না হইলে কোন শ্রেণীর শিল্পের সংগঠন করা সম্ভব হয় না, তাহার পর আবার কৃষি ব্যতীত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদিত হইলে আংশিক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অভাব দূর করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সমগ্র শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

মূলতঃ কৃষিজাত দ্রব্যকেই যে মানুষের প্রকৃত ধন অথবা অর্থ (wealth) বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে, এই সত্যটী একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে, কি উপায়ে জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য হয়। যে যে উপায়ে কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলেই জাতির আর্থিক উন্নতির বিধি-ব্যবস্থা সুগম হইয়া থাকে। কাযেই, কি উপায়ে জাতির আর্থিক উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কি উপায়ে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়—

(১) প্রতি বিঘা জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি যাহাতে সংরক্ষিত ও বিবর্দ্ধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা;

(২) স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা;

(৩) যাহাতে মনুষ্যসমাজে স্বাস্থ্যসম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা।

সর্ব্বাগ্রে ঐ তিনটি ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন দেশের কৃষিকার্য্যের কোন প্রকৃত উন্নতি ব্যাপক ভাবে সম্পাদিত করা যে সম্ভব নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

অনেকে মনে করেন যে, কৃত্রিম উপায়েই হউক অথবা স্বাভাবিক উপায়েই হউক, যে কোন উপায়ে জমীর উর্ব্বরা-শক্তি বিবর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে যে চাষের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে যে কৃষিকার্য্যে লাভবান্ হওয়া সম্ভব হয় না, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে, কৃত্রিম উপায়ে জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থায় যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সেইরূপ আবার অনেকের মতে, যে-কোন রকমের হউক, কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হয়। যে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কম, সেই জমী চাষ করিলে যে কৃষকের শ্রমশক্তির অপব্যয় (wastage of labour) হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে, যে সমস্ত জমীতে যথেষ্ট স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি আছে, একমাত্র তাহাই কৃষিযোগ্য করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

কাহারও কাহারও মতে জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে দেশের দারিদ্র্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যাঁহারা অস্বাস্থ্য অথবা কুশিক্ষার ও অশিক্ষার জন্য উপার্জ্জনে অক্ষমতাবশতঃ পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যে মনুষ্যসমাজের অপকার আছে তাহা সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কার্য্যক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে যে, কৃষি, অথবা শিল্প, অথবা বাণিজ্যের প্রসার সাধন করা সম্ভব নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং তাহাতে যে, দেশের পক্ষে প্রকৃত ধনবান্ হওয়া সম্ভব হয়, তাহা যে-সমস্ত দেশের চারিধারে শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যপদেশে অন্যান্য দেশের লোক সকল মৌচাকের চারিধারে মৌমাছির মত ভ্যান-ভ্যান ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সমস্ত দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় একদিন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং এই দুইটি দেশে বহুদিন পর্য্যন্ত জমীর উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য কোনরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। এই দুইটি দেশে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-সাধন করিবার অপর দুইটি ব্যবস্থাও স্মরণাতীত কাল হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহারই জন্য এই দুইটি দেশেরই কৃষিকার্য্য

বহুদিন পর্য্যন্ত উন্নত ছিল এবং জগতের সমস্ত দেশের লোকই এই দুইটি দেশের সহিত শিল্প-বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আসিতেছেন।

কোন দেশের কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পরিমাণ, উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ, এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, এই সত্যটি বুঝিতে পারিলে জগতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কারণ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পরিমাণ, উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছে কি না এবং ঐ ব্যবস্থা সফল হইয়াছে কি না, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে দেশের গভর্ণমেণ্ট উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই দেশের লোকের অধিকাংশের পক্ষেই অর্থাভাবে অল্পাধিক ক্লেশ পাওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কোন দেশেই কৃষির উন্নতি সাধন করিবার জন্য উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কোনটিই অবলম্বিত হয় নাই এবং প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই অর্থাভাবে অল্পাধিক ক্লেশভোগ করিতেছেন।

ইহা সত্ত্বেও 'জগতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে' এতাদৃশ কোন উক্তি কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে কাহারও মুখে শোভা পায়?

যাঁহারা কার্য্য-কারণ-ভাবের দিকে তাকাইবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পাণ্ডিত্যের নামে কতকগুলি মূর্খতা মানুষকে ঘিরিয়া বসিয়াছে বলিয়া মানুষ তাহার প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে এবং তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়াছে।

যাঁহারা ক্ষমতার মদে মত্ত, যাঁহারা পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে গর্ব্বিত, তাঁহাদিগকে আমরা এখন গর্ব্ব ও মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা দেখুন, আমাদের নিরপরাধ শ্রমজীবিবৃন্দ ও শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী তাঁহাদিগের পাপের ফলে দুঃখসমুদ্রে কিরূপ হাবুডুবু খাইতেছে। আমরা সকরুণ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অনুকম্পার যোগ্য ঐ অগণিত মানুষগুলিকে কি তাঁহারা এখনও প্রতারণা করিতে থাকিবেন?

ভারতের মুক্তি কোন্ পথে?

"ভারতের মুক্তি কোন্ পথে?" তাহার আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মুক্তি কাহাকে বলে তাহার পরিষ্কার ধারণা অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়। "মুক্তি" কাহাকে বলে, "ভারতের মুক্তি কোন্ পথে"—এই দুইটী কথা লইয়া আমাদের দেশের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে, ভারতকে মুক্ত করিতে হইলে ইংরাজ জাতিকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর করায়ত্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কাহারও কাহারও মতে ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে যা'ক আর না-ই যা'ক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে হইলে ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর করায়ত্ত হয় এবং তাহা কেবলমাত্র ভারতবাসীর দ্বারাই পরিচালিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞগণের মতে ইংরাজ এই দেশে অন্য যে ভাবেই থাকুন না কেন, তাঁহারা যাহাতে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট না থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবেই।

রাজনীতিক্ষেত্রে আর একটী তৃতীয় সম্প্রদায় আছেন,

যাঁহাদের মতে ইংরাজকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া যাহাতে ইংরাজদিগের পরামর্শানুসারে ভারতবর্ষ ভারতবাসিগণের দ্বারা শাসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে ভারতবর্ষের মুক্তি সাধিত হইবে।

এই তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক ছাড়া আরও একটী চতুর্থ শ্রেণীর সম্প্রদায় আছেন। তাঁহাদের মতানুসারে ভারতবাসী ও ইংরাজ মিলিত হইয়া যাহাতে গভর্ণমেণ্ট সদ্‌ভাবে পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভারতবাসী তাহার কাম্য লাভ করিতে পারিবে।

এই চারি শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে কোন্ পথে স্ব স্ব ধারণানুযায়ী মুক্তি লাভ করা সম্ভব হইবে, তাহা লইয়াও নানারকমের বাদ-বিসংবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

যাঁহারা উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থাৎ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজ জাতির হস্তচ্যুত করিয়া একমাত্র ভারতবাসীর করায়ত্ত না করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মুক্তি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার উপায় প্রধানতঃ দুইটী, যথা :—

(১) দেশবাসীর বাহুবল যাহাতে বৃদ্ধি পায়, দেশবাসী যাহাতে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিতে অথবা সংগ্রহ করিতে পারে, যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই মতাবলম্বী লোকদিগের কার্য্যপন্থায় বাধা প্রদান করিবেন, তাঁহাদের হত্যা যাহাতে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। সন্ত্রাস-বাদিগণকে এই পন্থায় বিশ্বাসী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(২) কাহাকেও হত্যা না করিয়া যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন অথবা থাকিবেন, তাঁহারা যাহাতে প্রতিনিয়ত উত্যক্ত হইয়া পড়েন তাহার ব্যবস্থা করা। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল-পরিচালিত কংগ্রেসকে এই পন্থার সাধক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

যাঁহারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক, অর্থাৎ যাঁহারা ইংরাজের সাহায্যে ভারতবর্ষের মুক্তি হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক আবেদন ও নিবেদন ছাড়া আর কোন প্রয়োগযোগ্য পন্থা দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজ গঠনের কথা, কেহ কেহ ধর্ম্মসংস্কারের কথা, কেহ কেহ বা কৃষ্টিগত সাধনার কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কাহারও কথা সম্পূর্ণ ও চিন্তার যোগ্য বলিয়া ধরা যায় না।

আমাদের মতে এই চারি শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞগণই কি করিয়া গভর্ণমেণ্ট সৎ (good) হইবে, অথবা দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত (independent) হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের যে কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং কি হইলে যে গভর্ণমেণ্টকে সৎ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কেহই কোন চিন্তা করেন না। ইঁহারা সকলেই ভিত্তিহীন সৌধ নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়া দেশবাসী জনসাধারণকে গোলকধাঁধার মধ্যে নিপতিত করিয়াছেন, এবং দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা ক্রমশঃই অধিকতর শঙ্কাপ্রদ হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের মতে, ধর্ম্ম ও জাতিনির্ব্বিশেষে দেশের জনসাধারণের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থকৃচ্ছ্রতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার চেষ্টাই হওয়া উচিত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষকে মুক্ত বলা যাইবে তখন, যখন দেখা যাইবে যে, ভারতের অগণিত শ্রমজীবি-সম্প্রদায় ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকে অর্থকৃচ্ছ্রতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা, এক কথায়, যখন ভারতবাসী প্রায়শঃ দুঃখমুক্ত হইতে আরম্ভ করিবে, তখন ভারতবর্ষ মুক্ত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারিবে।

ইংরাজকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলে, কিংবা গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণকে হত্যা করিলে, কিংবা যে সমস্ত গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগকে অবাধ্যতা-মূলক কর্ম্মের (civil disobedience) দ্বারা, অথবা অসহযোগের (non-co-operation) দ্বারা, অথবা সমাজতন্ত্র-

বাদের দ্বারা উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, ভারতবর্ষের এতাদৃশ মুক্তিসাধন করা কখনও সম্ভব হইবে না।

দেশের মধ্যে কলহ হইতে থাকিলে কোন চিন্তাপূর্ণ কার্য্য হওয়া সম্ভব হয় না। যাহাতে অগণিত শ্রমজীবি-সম্প্রদায় ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকে অর্থকৃচ্ছ্রতাদির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা করিতে হইলে, যাহাতে দেশের প্রধান প্রধান বাদ-বিসংবাদের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইংরাজগণকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলে, কিংবা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে হত্যা করিলে, অথবা তাঁহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলে দেশের মধ্যে কলহ, বাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের মতে জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে হইলে, কি উপায়ে মানুষের অর্থকৃচ্ছ্রতাদি ছয়টি অভাবের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণভাবে একসঙ্গে তিরোহিত হইতে পারে, তাহার জ্ঞানানুসারী (theoretical) এবং কর্ম্মানুসারী (practical) বিদ্যা, যাঁহারা নেতৃত্বকামী, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব সাধনার দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আধুনিক জগতের তথাকথিত বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিদ্যা কি উপায়ে মানুষের অর্থাভাব দূর হয়, তাহার একটা উপায় দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু কি উপায়ে অর্থাভাব ও পরমুখাপেক্ষিতা একসঙ্গে দূর করা যায়, তাহার কোন উপায় দেখাইতে পারে নাই। সেইরূপ আবার কি উপায়ে অশান্তি দূর হইতে পারে, তাহার একটা উপায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় খুঁজিয়া পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কি উপায়ে একসঙ্গে অশান্তি ও অকালবার্দ্ধক্য দূর হইতে পারে, তাহার কোন সন্ধান আজকালকার প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য কোন বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় পাওয়া যাইবে না। কাযেই, ঐ বিদ্যা কোন নেতার পক্ষে স্বীয় সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব হইবে না।

ঐ বিদ্যা লাভ করিবার পর, দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ যাহাতে স্ব স্ব কার্য্যের ভ্রম বুঝিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে দেশবাসী জনসাধারণ যাহাতে ঐ বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া বাদ-বিসংবাদ হইতে বিরত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

আমাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় "স্বাধীনতা" চাহিলে স্বাধীনতা অথবা পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া যাইবে না; বরং তাহা পাইবার আশা সুদূরপরাহত হইবে। "স্বাধীনতা" অথবা পূর্ণ স্বরাজ পাইতে হইলে আমাদিগকে ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া যাহাতে ইংরাজের সহিত আন্তরিক সখ্য স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতবাসী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে যাদৃশ আর্থিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে আপাত-দৃষ্টিতে ইংরাজের প্রতি সখ্যভাব ঘোষণা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ভারত-শাসনের ইতিহাস যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, তাহার চেষ্টা তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি অনুসারে তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু, ২।৩ শত বৎসরের একটা জাতি তাহার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও যে-বিদ্যায় মানুষকে প্রকৃত ভাবে অর্থকৃচ্ছ্রতাদির হাত হইতে রক্ষা করা যায়, সেই বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে না। ফলে, তাঁহাদের ঐ বিদ্যায় যে সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেমন ভারতবাসীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতেছে, সেইরূপ আবার ইংরাজ জনসাধারণের নিজেদের অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাযেই, আপাতদৃষ্টিতে দুইটি জাতির মিলন অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও, যে বিপদে দুইটি জাতির জনসাধারণ সমান-ভাবে হাবুডুবু খাইতেছে সেই বিপদের সময় দুইটি জাতি কৃতবিদ্য নেতার নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হইলে, তাঁহাদের কার্য্যতঃ মিলন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

জনসাধারণ কি উপায়ে একসঙ্গে অর্থকৃচ্ছ্রতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার জ্ঞানানুসারী (theoretical) এবং কর্ম্মানুসারী (practical) বিদ্যা যে-মানুষ স্বীয় সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া ভারতবাসী ও ইলণ্ডবাসীকে ভ্রাতৃবোধে তদুদ্দেশ্যে গন্তব্য পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন, তিনি 'ভারতের মুক্তি কোন্ পথে' তাহা

বিশদভাবে আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ইহা আবিষ্কৃত হইলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তি হয়, তাহা করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, তাহার কোন শ্রেণীর মুক্তি হওয়াই সম্ভব নহে। অন্নাভাবে জনসাধারণ যখন এত ক্ষুধার্ত্ত, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন শ্রেণীর কথা তাহাদের মনোরম হইতে পারে না। যখন দেশের জনসাধারণ প্রায়শঃ অর্থাভাব, বস্ত্রাভাব, গৃহাভাবে জর্জ্জরিত, তখন কোন্ উপায়ে তাহাদের ঐ ঐ অভাবের পূরণ হওয়া সম্ভব, তাহার প্রয়োগযোগ্য চেষ্টা না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে যাওয়া কখনও সমীচীন হইতে পারে কি ?

ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তি কোন্ পথে ?

যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন্ বস্তুকে মানুষের প্রকৃত অর্থ বা ধন (wealth) বলিতে হইবে এবং কি উপায়ে তাহার পরিবর্দ্ধন (increase) ও বণ্টন (distribution) সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা জানা থাকিলে, কোন্ পথে ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান করিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য হয় না।

আমরা এই সংখ্যার প্রথম সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, যুক্তিসঙ্গতভাবে মূলতঃ কৃষিজাত দ্রব্যকে মানুষের প্রকৃত ধন বলিয়া অভিহিত করিতে হয় এবং দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত তিনটী ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় :

(১) প্রতিবিঘা জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে সংরক্ষিত ও বিবর্দ্ধিত হয় তাহার ব্যবস্থা ;

(২) স্বাভাবিক-উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) যাহাতে মনুষ্যসমাজে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা।

কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দেশের ধন যোগ্যতানুসারে মানুষের মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করাও খুব ক্লেশসাধ্য নহে। কোন্ কৃষিজাত দ্রব্যটী উৎপন্ন করিতে প্রতি মণে, অথবা প্রতি হন্দরে, কয়জন কৃষকের কয়দিনের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া, একজন মানুষের একদিনের পরিশ্রমের জিনিষের সমমূল্যে যাহাতে ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়, তদনুসারী দ্রব্যমূল্যের সমতা (parity) ব্যবস্থিত হইলে, দেশের ধন যোগ্যতানুসারে মানুষের মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের জমীর অবস্থার দিকে, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে অনুমান করা যাইবে যে, একদিন ভারতবর্ষের কৃষি-কার্য্যের উন্নতিবিধায়ক উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা এবং জিনিষপত্রের আদান-প্রদানেও দ্রব্য-মূল্যের সমতা বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধায়ক ঐ তিনটি ব্যবস্থা এবং জিনিষপত্রের আদান প্রদানে দ্রব্য-মূল্যের সমতা বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, ভারতবর্ষ একদিন জগতের মধ্যে সমস্ত দেশের তুলনায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিয়াছিল এবং মা আমাদের এত ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছিলেন বলিয়াই সকল দেশের সকল মানুষ স্ব স্ব আর্থিক দুর্গতির সময় স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ সন্দর্শনার্থ উদ্‌গ্রীব হইত।

এখনও ভারতবর্ষের জমী হইতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘায় যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, এখনও ভারতবর্ষের মোট জমীর তুলনায় যে পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমী বিদ্যমান আছে, এখনও ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় যে-সংখ্যক স্বাধীন কৃষিজীবী কৃষক বিদ্যমান আছে, তাহা জগতের আর কোন স্থানে পরিলক্ষিত হয় না।

কি উপায়ে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি-সাধন করিতে হয়, কি উপায়ে জমীকে কর্ষণযোগ্য করিতে হয়, কি উপায়ে কৃষকের দীর্ঘযৌবন বজায় রাখিতে হয়, তাহার যাদৃশ আলোচনা এতদ্দেশীয় গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে, তাহা আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না।

কাযেই, ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তি কোন্ পথে, ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যথাযথভাবে

ভারতীয় কৃষির উন্নতিতেই ভারতের আর্থিক মুক্তির বীজ রোপিত হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, যন্ত্রজাত শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তৃতিসাধন ব্যতীত ভারতবাসীর আর্থিক দুর্গতি দূর হওয়া সম্ভব নহে।

কাহারও কাহারও মতে, যন্ত্রশিল্প কোন দেশের পক্ষে সমীচীন নহে বটে, কিন্তু কুটীর-শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তৃতি ব্যতীত ভারতবাসীর ঐশ্বর্য্য (wealth) লাভ করা সম্ভব নহে।

আমাদের মতে, দেশ এখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এই মুহূর্ত্তেই আমাদের পক্ষে যন্ত্রশিল্প পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু যত শীঘ্র উহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, ততই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গল। যন্ত্রশিল্প সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইলে, যাহাতে বিস্তৃত ভাবে কুটীর-শিল্পের পুনরভ্যুদয় হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত কৃষকের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে লাভজনক কৃষির অভ্যুদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে কুটীর-শিল্পের পুনরভ্যুদয় হওয়া সম্ভব হইবে না। অতএব ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তি সাধিত করিতে হইলে যে সর্ব্বাগ্রে লাভজনক কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যন্ত্রশিল্প বর্জ্জন করিবার প্রয়োজনীয়তা যে আমরা স্বীকার করি, তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য, হয় অপেক্ষাকৃত কম টেকসহি হইয়া থাকে, নতুবা উহা মানুষের ব্যবহারে প্রায়শঃ অল্পাধিক অস্বাস্থ্যের উৎপত্তি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রশিল্পক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রমজীবী জীবিকার্জ্জনোদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়শঃ স্বাস্থ্য হারাইয়া অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হন।

বিস্তৃতভাবে কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত করিতে হইলে যে লাভজনক কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। যাহাতে কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যন্ত্র-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় বিস্তৃতভাবে কোন কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার হওয়া সম্ভব নহে। যাহাতে শ্রমিক অন্য কোন বৃত্তির দ্বারা তাহার পরিবারের খাদ্যাদি অর্জ্জন করিতে পারে এবং অবসর-সময়ে হস্তপরিচালিত শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য, এমন কি যন্ত্রশিল্পজাত শিল্পদ্রব্যের তুলনায়ও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। কৃষি লাভজনক হইলে শ্রমিকের পক্ষে তাহার দ্বারাই অনায়াসে স্বীয় পরিবারের খাদ্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে।

একদল লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, প্রত্যেক কৃষক যাহাতে নামমাত্র অথবা বিনা খাজানায় প্রচুর কর্ষণযোগ্য জমী পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কৃষিকার্য্য অনায়াসে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী এবারকার ফৈজপুরের কংগ্রেসে এই সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে তাঁহাকে ঐ মতের অনুবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

আমাদের মতে, এই মতবাদ ভ্রমাত্মক। জমীর প্রকৃতিগত সামর্থ্যানুসারে যাহাতে অত্যধিক খরচা ব্যতীত প্রতিবিঘা জমী হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, কৃষকের পক্ষে বিনা খাজানায় কোন জমী কর্ষণ করিবার সুযোগ হইলেও তাহাতে তাহার কোন লাভ হয় না। যথেষ্ট পরিমাণে শাহারা মরুভূমির জমীর মত অনুর্ব্বর জমী চাষ করিলে কোন কৃষকের পক্ষে লাভবান্ হওয়া সম্ভব হয় কি? প্রত্যেক শ্রমজীবী কৃষককে দশ বিঘার অধিক জমী প্রদান করিলেও তাহাতে তাহার কোন লাভ হইতে পারে না; কারণ, কোন শ্রমজীবী কৃষক, সে যে পরিমাণ জমী চাষ করিতে পারে তাহার অধিক জমী পাইলে, তাহা অপরের হাতে প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

কাযেই, দেখা যাইতেছে যে, মানুষের আর্থিক মুক্তিরূপ বৃক্ষের বীজ মাত্র একটী। তাহার নাম লাভজনক কৃষি। জমীর উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন জমী যাহাতে অধিক পরিমাণে কৃষিযোগ্য হয় এবং স্বাস্থ্যবান্ কৃষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহা করিবার ব্যবস্থা যখন কোন দেশে অবলম্বিত হয়, তখন বুঝিতে

হইবে যে, ঐ দেশে আর্থিক মুক্তিরূপ বৃক্ষের বীজ রোপিত হইয়াছে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, লাভজনক কৃষি আর্থিক মুক্তিরূপ বৃক্ষের বীজ বটে, কিন্তু ঐ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা আরও বহু।

ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তি যাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিতে হইলে যেমন একদিকে যাহাতে লাভজনক কৃষির ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, সেইরূপ আবার যাহাতে দেশের মধ্যে দলাদলি প্রভৃতি তিরোহিত হইয়া ঐক্য-বন্ধনের চেষ্টা জাগ্রত হয়, তাহার জন্যও প্রযত্নশীল হইতে হইবে। কারণ, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায়, ও ইংরাজের সহিত ঐক্যবন্ধন ব্যতীত এখানে লাভজনক কৃষির ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সম্ভব নহে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় কংগ্রেস

আমাদের দেশের ও দশের অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে করিবার জন্য যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার মধ্যে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় কংগ্রেসের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সমগ্র ভারতবাসী যখন শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাবে জর্জ্জরিত, যখন প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অপরের সহায়তা পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তখন স্বতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, এতাদৃশ অবস্থায় **জনসাধারণের দুঃখ মোচন করিবার জন্য কংগ্রেস বেশী পরিশ্রম করিতেছেন, অথবা আমাদের গভর্ণমেণ্টের উদ্‌যোগ বেশী দেখা যাইতেছে?**

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদের মতে প্রথমতঃ, জগতের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ভারতের মুক্তি কোন্ পথে, এবং তৃতীয়তঃ, ভারতের আর্থিক মুক্তি কোন্ পথে—এই তিনটি প্রশ্নের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই তিনটি প্রশ্নের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা যাহা যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

"জগতের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে?" এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় পাওয়া গিয়াছে :—

(১) আধুনিক অর্থ-নীতিজ্ঞগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা টাকা, আনা, পয়সা, অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্‌সকে অর্থ, অথবা ধন (wealth) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমূলভাবে চিন্তা করিলে মলতঃ কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে সমিচীনভাবে অর্থ অথবা ধন (wealth) বলা চলে না।

(২) জগতের সর্ব্বত্রই বাস্তব অর্থের অভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; তাহার কারণ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সর্ব্বত্রই হ্রাস পাইতেছে।

(৩) এখনও জগতের সর্ব্বত্রই বাস্তব অর্থের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা যাহাতে মানুষের যোগ্যতানুসারে মানুষের মধ্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, যাহাদিগকে প্রকৃতভাবে এখনও আংশিকভাবে মস্তিষ্কশালী (brainy) অথবা বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, তাঁহারা অজ্ঞাত-বাসে থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন; যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা এখনও মনুষ্য-সমাজের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য আংশিকভাবে উৎপন্ন করিতেছেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইতেছেন। যাঁহারা প্রকৃতভাবে মস্তিষ্কশালীও নহেন, শারীরিক পরিশ্রমে নিপুণও নহেন, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কশালী না হইয়া নিজদিগকে মস্তিষ্কশালী বলিয়া জাহির করিতে পারেন, যাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে পণ্ডিত (scholar) না হইয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজদিগকে পণ্ডিত বলিয়া

জাহির করিতে পারেন, যাঁহারা মনুষ্য-সমাজের কল্যাণপ্রদ বিজ্ঞানের এক ছত্রও অবগত না হইয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনের দ্বারা বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন, যাঁহারা কি পদ্ধতিতে কাব্য ও সাহিত্য লিখিলে মানুষ বিপথগামী না হইয়া সুপথগামী হইতে পারে, তাহার বিন্দু-বিসর্গও না জানিয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজ-দিগকে সাহিত্যিক ও কবি বলিয়া জাহির করিতে পারেন, যাঁহারা 'অক্ষরের ক্ষরণ' কি উপায়ে কোথা হইতে মানুষের জিহ্বায় আসিয়া পৌছিতেছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও উপলব্ধি না করিয়া, mutual admiration society-র সাহায্যে নিজদিগকে আক্ষরিক (literate), এমন কি ভাষাতত্ত্ববিদ্ (philologist) পর্য্যন্ত বলিয়া জাহির করিবার নিপুণতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সমাজের স্বাস্থ্য-বৃদ্ধিকর শিল্প ও বাণিজ্য কি পদ্ধতিতে গঠিত করিতে হয়, তাহার বিন্দু-বিসর্গও না জানিয়া শিল্পী ও বণিকের সম্মান লাভ করিতে পারেন, যে আইনের বলে মানুষকে নিরপরাধ করিয়া তুলিতে পারা যায়, সেই আইনের বিন্দুবিসর্গ জানা ত' দূরের কথা, যে-আইনের ফলে মানুষের অপরাধ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই আইনের আইনজ্ঞ হইয়া যাঁহারা নিজদিগকে কৃতীআইনজ্ঞ বলিয়া জাহির করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, অর্থাৎ এক কথায়, যাঁহারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার নিপুণতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এখন বর্ত্তমান মানব-সমাজের নেতা এবং তাঁহারাই এখন বাস্তব ধনের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশীদার।

"ভারতের মুক্তি কোন্ পথে ?" এই প্রশ্নের আলোচনায় যাহা যাহা দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি কথা উল্লেখযোগ্য :—

(১) যে অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতবাসী প্রায় প্রত্যেকে, এমন কি শ্রমজীবী ও কেরাণী জনসাধারণ পর্য্যন্ত শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শা[ন্তি] ও সন্তুষ্টি এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করি[তে] পারিবে, সেই অবস্থার নাম ভারতের মুক্তি[র] অবস্থা।

(২) যে অবস্থায় কেবলমাত্র কয়েকজন তথাকথি[ত] বুদ্ধিজীবী বড়লাট, ছোটলাট অথবা মন্ত্রী হইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন গভর্ণমেণ্টের বড় বড় চাকুরী পাইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের অনুগৃহীত জনমণ্ডলী পুলিশের কনষ্টেবল প্রভৃতি অন্যান্য চাকুরী পাইবেন, অথচ জনসাধারণ 'যে তিমিরে সে[ই] তিমিরে' থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ এক কথা[য়] যাহাকে আধুনিক স্বাধীনতা বলা হইয়া থাকে তাহাকে কোনক্রমেই ভারতের মুক্তির অব[স্থা] বলা যাইতে পারে না।

(৩) যাঁহারা দেশের প্রকৃত মুক্তিকামী না হই[য়া] তথাকথিত মুক্তির নামে নিজেদের নাম জা[হির] করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশদ্রোহী বলি[য়া] আখ্যাত করিতে হইবে। এই হিসাবে, এক[ণে] যাঁহারা তথাকথিত স্বাধীনতাকামী, তাঁহা[রা] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেশদ্রোহী।

(৪) ভারত যাহাতে মুক্ত হয়, তাহা করিতে হই[লে] সর্ব্বাগ্রে মুখে স্বাধীনতার কথা সম্পূর্ণভাবে ব[ন্ধ] করিতে হইবে। তাহার পর যাঁহারা আজক[াল] সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ যাঁহ[ারা] প্রকৃতভাবে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন না করিয়া প[ণ্ডিত] বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, যাঁহারা প্রকৃত[ভাবে] রাজনীতি ও অর্থনীতির জ্ঞান লাভ না ক[রিয়া] রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিশারদ বলিয়া চ[লিয়া] যাইতেছেন, তাঁহারা যে বুদ্ধি-প্রবণ নহেন, [তাহা] তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। তাঁহারা, যাহাই হউন না কেন, তাঁহাদিগকে বু[ঝিতে] হইবে যে, তাঁহারা যদি প্রকৃত বুদ্ধিপ্রবণ [হইতে] পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পু[ত্রগণের] জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য চাকুরীর অথবা দা[...]

সন্ধান করিতে হইত না। এবং যে জনসাধারণ সং পরামর্শের জন্য তাঁহাদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, সেই জনসাধারণকে আজ প্রায়শঃ দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইত না।

(৫) তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণ যখন কায়মনোবাক্যে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান্ না হইয়াও নিজদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রচার করার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রতারকপদ-বাচ্য হইতেছেন এবং তাহার জন্য মনে মনে অনুতাপ ভোগ করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে যে বিদ্যায় ও সংগঠনে জনসাধারণ একসঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারে, অথবা যাহাতে মানুষের অর্থকৃচ্ছ্রতা পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু তিরোহিত হইতে পারে, সেই বিদ্যা ও সংগঠন—সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণকে জনসাধারণের দুঃখমোচনের জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পক্ষে জনসাধারণের সহায়তার প্রত্যাশী হওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাঁহারা যদি জনসাধারণকে কোনক্রমে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরিশেষে সাপ লইয়া খেলা করিবার মত অনুতপ্ত হইতে হইবে।

(৭) এইরূপে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণের মধ্য হইতে প্রকৃত বুদ্ধি-প্রধান মানুষের উদ্ভব হইলে, তখন ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত মুক্তি-পথের পথিক হওয়া সম্ভব হইবে এবং তখন যে যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসীর, এমন কি শ্রমজীবী ও কেরাণীগণের পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাব দূরীভূত হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিবার কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) এইরূপভাবে মনে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, মুখে তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিলে, যে উপায়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, আর্থিক অভাব দূরীভূত হইতে পারে, সাধনার দ্বারা সেই উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলে, যাহাতে জনসাধারণের আর্থিক অভাব দূর হয়, সেই কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিলে, অগণিত যুদ্ধোপকরণ (munitions), অসংখ্য যোদ্ধা এবং অনির্ব্বচনীয় কৌটিল্য পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না।

"ভারতের আর্থিক মুক্তি কোন্ পথে?"—এই প্রশ্নের আলোচনায় যাহা যাহা দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি কথা উল্লেখযোগ্য:—

(১) ভারতের আর্থিক মুক্তি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় তাহার ব্যবস্থা যাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

(২) কৃত্রিম সারের প্রচলন অথবা নাতিগভীর খালের (modern irrigation) বিস্তৃতি-সাধনের দ্বারা কৃষিকার্য্যকে কৃষকের পক্ষে লাভজনক করিয়া তোলা কখনও সম্ভব হইবে না। পরন্তু তাহাতে কৃষিকার্য্যের অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইবে। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষকের যাহাতে এক কপর্দ্দকও খাজানা না দিতে হয়, অথবা যাহাতে প্রত্যেক কৃষক অতীব বিস্তৃত ভূমিখণ্ড লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলেও, অথবা অসংখ্য হৃষ্টপুষ্ট বলদের আমদানী করিলেও কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য লাভবান্ করা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না।

(৩) কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে পর, দেশের মধ্যে কৃষি-যোগ্য জমীর পরিমাণ এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ কৃষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৫) কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলে, শিল্প ও বাণিজ্য দেশবাসীর পক্ষে কোনক্রমেই ব্যাপক ভাবে লাভজনক হইতে পারে না। যাঁহারা কৃষি-কার্য্য যাহাতে লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থায় সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করিবার পরামর্শ প্রদান না করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবার কল্পনা করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম-নির্দ্দেশ শূন্য-গর্ভে সৌধ নির্ম্মাণ করিবার কল্পনার মত প্রয়োগের অযোগ্য। যাঁহারা মনে করেন যে, কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলেও কেবলমাত্র বহুল চরকার প্রচলনের দ্বারা, অথবা বিস্তৃত ভাবে কুটীরশিল্পের সংগঠনের দ্বারা শ্রমজীবীর অর্থাভাব দূরীকৃত, অথবা দেশের রাজনৈতিক পর-মুখাপেক্ষিতা দূরীভূত হইতে পারে, তাঁহাদিগকে অর্থনীতি ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাতুল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলে যে, কোন কুটীর-শিল্পের ব্যাপক ভাবে বিস্তৃতি সাধন করা সম্ভব নহে, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

(৬) ভারতবর্ষ এখন যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে যে যে ব্যবস্থা সাধিত হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থা—যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসী পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক ভ্রাতৃভাব আনয়ন করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে।

(৭) এতাদৃশ অবস্থায় ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসীর পরস্পরের আন্তরিক ভ্রাতৃভাবকেই ভারতের সাধারণ আর্থিক মুক্তির সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(৮) ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসীর পরস্পরের আন্তরিক ভ্রাতৃভাব যে কেবল মাত্র ভারতের মুক্তির প্রথম সোপান, তাহা নহে, উহা জগতের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি দূর করিবারও প্রথম সোপান।

ভারতের মুক্তি কোন্ পথে, তাহা উপরোক্ত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, কাহার কর্ম্মাবলী আমাদের মুক্তিপথের সহায়ক, তাহার বিচার করিলেই, কে আমাদের অধিকতর মিত্র, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

এইরূপ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যদিও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বকালে কার্য্যতঃ ভারত-বাসীর শারীরিক স্বাস্থ্য ক্রমশঃই হীনতা-প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, যদিও তাহাদের মানসিক অশান্তি ও আর্থিক অভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে, তথাপি ইংরাজ জাতি যে ভারতবাসীর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, তাহাদের মানসিক অশান্তি ও আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য, তাঁহাদের, অর্থাৎ ইংরাজ জাতির বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা সত্যের অপলাপ না করিলে স্বীকার করিতেই হইবে।

অন্যদিকে, ভারতীয় কংগ্রেসের পাণ্ডাগণ যদিও নিজ-দিগকে ভারতের মুক্তির সাধক বলিয়া জাহির করিতেছেন, তথাপি যে সমস্ত কার্য্যের দ্বারা ভারতের মুক্তি হওয়া সম্ভব, তাহার একটিও তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন না। পরন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সমস্ত কার্য্য করিলে তাহার মুক্তি হওয়া অসম্ভব হয়, তাঁহারা সেই সকল কার্য্যই সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে ভারতের মুক্তি হওয়া

তো দূরের কথা, উহার সম্ভাবনা ক্রমশঃই গান্ধীজী-চালিত কংগ্রেসের কার্য্যের ফলে পিছাইয়া যাইতেছে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় কংগ্রেস-সম্বন্ধীয় আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে, ভারতের মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চারিটি সত্য আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে :—

প্রথমতঃ, কোন্ উপায়ে একসঙ্গে জনসাধারণের শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাব দূরীভূত হইবে, তাহা নেতৃবর্গকে স্ব স্ব সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে যে উপায়ে একসঙ্গে জনসাধারণের শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাব দূরীভূত হইতে পারে, সেই সেই উপায় দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, যাহাতে অনতিবিলম্বে কৃষি কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, যে যে ব্যবস্থায় কৃষি অনতিবিলম্বে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যাহাতে আন্তরিক ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

উপরোক্ত চারিটি সত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের মুক্তির উদ্দেশ্যে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যাহাতে আন্তরিক ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয় এবং যাহাতে ইংরাজ ও ভারতবাসী একযোগে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের আর্থিক অভাব দূর করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রযত্নশীল হইতে হয়।

আমাদের এই কথা যদিও গান্ধীজীর অনুচরবর্গের কর্ণে পাগলের কথার মত শোনা যাইবে বটে, কিন্তু ইহা যে সত্য, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

একতায় যে মানুষের উন্নতি হইয়া থাকে এবং কলহে যে মানুষের পতন হয়, তাহা গান্ধীজীর অনুচরবর্গ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের কোন উন্নতি যে হইতেছে না, তাহার বড় কারণ যে হিন্দু-মুসলমানের কলহ, তাহাও ঐ অনুচরবর্গ প্রায়শঃ অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার মূলে রহিয়াছে ইংরাজের প্ররোচনা। আমরাও বলি, ইংরাজের প্ররোচনার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া এবং নানা রকমের দলাদলির উদ্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ইংরাজকে দায়ী করা যায় না।

মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে, তোমরা ইংরাজকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে এবং ইংরাজের শক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিবে, আর ইংরাজ সুবোধ ও সুশীল বালকের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা প্রকৃতির বিধির বিরুদ্ধ। কাযেই, হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের সঙ্গে যাহাতে ঝগড়া না হয়, তাহা করিতে হইবে।

যতদিন ... স্থ ভারতবর্ষে স্বরাজ অথবা স্বাধীনতার কথা দেখা দেয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজ যে কোনরূপে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কায়েমীভাবে ঝগড়া বাঁধাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। এখনও কোন ইংরাজ যে কোথায়ও প্রকাশ্যভাবে ভারতবাসীকে পরস্পরের মধ্যে দলাদলি করিবার উপদেশ দিতেছেন, ইহার কোন সাক্ষ্য নাই।

অথচ, গান্ধীজী-চালিত কংগ্রেস বরাবর প্রকাশ্যভাবে, হয় মুসলমানের সঙ্গে, নতুবা ইংরাজের সঙ্গে ঝগড়া চালাইয়া আসিতেছে। যে সংস্কৃত আইন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মুসলমানগণের অধিকাংশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই সংস্কৃত আইন ও বাঁটোয়ারাকে নাকচ করিবার চেষ্টা করা কি মুসলমানগণের সহিত ঝগড়া করিবার সমতুল্য নহে ?

গান্ধীজী মুখে অহিংসা, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতির কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাতে অপর কেহ উত্যক্ত হইতে পারে, কার্য্যতঃ তাহা করিলে কি কার্য্যতঃ হিংসা ও শত্রুতার পরিচয় দেওয়া হয় না ?

যে আইনের বলে ইংরাজ দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই আইন যাহাতে কেহ না মানে (civil disobedience), যে শিল্প ও বাণিজ্যের বলে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয়

জনসাধারণের অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা করিতেছেন, সেই বাণিজ্য ও শিল্প যাহাতে সকলে বর্জ্জন (boycott) করে, তাহার জন্য প্রযত্নশীল হইলে কি ইংরাজের প্রতি হিংসার ও শত্রুতার পরিচয় দেওয়া হয় না?

এইরূপে, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় কৃষি কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, অথবা কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় একসঙ্গে জনসাধারণের শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়া দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ-ভাবুকগণ যে কিছু কিছু চেষ্টা বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের কোন পাণ্ডার মস্তিষ্কে যে ঐ জাতীয় কোন চিন্তা কোন দিন স্থান পাইয়াছে, তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না।

বর্ত্তমান বড়লাট কৃষি সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তথাপি দেশের উন্নতি করিতে হইলে যে, সর্ব্বাগ্রে যাহাতে কৃষি কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় তাহার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন আছে, ইহা যে আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট সাহেব বুঝিতে পারেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও বাণীতে উপলব্ধি করা যাইবে।

অন্যদিকে কৃষির এই প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক্ বোধ পর্য্যন্ত যে ভারতীয় কংগ্রেসের পরিচালকগণের নাই, তাহা গত ফৈজপুর কংগ্রেসের ও তৎসংশ্লিষ্ট অধিবেশনে গান্ধীজী ও জওহরলালজী যে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, ঐ সকল বক্তৃতা অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে। কৃষি কৃষকের পক্ষে লাভজনক না হইলে যে ব্যাপকভাবে কুটীর-শিল্পের প্রসার-সাধন সম্ভব নহে এবং কোন কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে যে, সর্ব্বাগ্রে কৃষি যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় তাহার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন আছে, এতৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও যদি গান্ধীজীর থাকিত, তাহা হইলে তিনি অত আস্ফালনের সহিত তাঁহার বক্তৃতায় চরকার মহিমা প্রচার করিতে পারিতেন না।

উপসংহারে, আমরা দেশের যুবকবৃন্দ ও কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকদিগকে বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান কংগ্রেস আমাদের জনসাধারণের উপকার করিতেছে, অথবা অপকার করিতেছে, তাহা তাঁহাদিগকে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে। নতুবা কোন উত্তেজনার বশে কার্য্য করিতে থাকিলে, তাঁহাদের কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

ভারত-শাসনে ইংরাজের ভুল কোথায়?

"ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় কংগ্রেস" নামক সন্দর্ভে আমরা দেখাইয়াছি যে, একে তো আমাদের ভারতীয় জনসাধারণের হিতার্থে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট যাহা যাহা করিতেছেন, তাহার তুলনায় ভারতীয় কংগ্রেস কিছুই করিতেছেন না, পরন্তু ভারতীয় কংগ্রেস যাহা যাহা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের কোনরূপ হিত হওয়া তো দূরের কথা, আমাদের যথেষ্ট অহিত সাধিত হইতেছে। ভারতীয়-গভর্ণমেণ্ট যাহা যাহা করিতেছেন, তাহা ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যের তুলনায় প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজের ভারত-শাসনকে ভ্রম-প্রমাদ-বিহীন বলা চলে না। পরন্তু, রাজার নিকট হইতে প্রজার, শাসকের নিকট হইতে শাসিতের, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অধিবাসিবৃন্দের (citizens) কি কি প্রাপ্য, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে, ইংরাজের ভারত-শাসন ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

কোন দেশ সুশাসিত হইতেছে বলিয়া প্রচার করিতে হইলে, ঐ দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার বিদ্যমানতা যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ সমগ্র প্রজামণ্ডলীর সন্তুষ্টিও একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ, দেশের যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অধিকাংশ প্রজার সন্তুষ্টি বিধান করিতে অক্ষম, সেই শান্তি ও শৃঙ্খলাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিয়া অভিহিত করিলে ঐ দুইটি শব্দের অপমান করা হয়। দেশে প্রায়শঃ শান্তি

ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে, অথচ ঐ দেশের মানুষের মনে প্রায়শঃ সন্তুষ্টি নাই, এতাদৃশ বাক্য সোণার পাথরের বাটীর অনুরূপ। শৃঙ্খলা, শান্তি ও সন্তুষ্টি তিনটি যমজ ভগ্নী। একটি থাকিলে অপর দুইটিও থাকিবেই। একটি না থাকিলে অপর দুইটিও নাই, ইহা বুঝিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রজাগণের মধ্যে যে, গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্টি দেখা দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কাযেই, ভারতের শাসনকার্য্যে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন না কোন ভুল হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, ভারত-শাসনে ইংরাজের কোথায় সেই ভুল, যে ভুলবশতঃ ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়াছে ?

কোন দেশের শাসনকার্য্যে কোথায় ভুল হইতেছে, যে ভুলের জন্য প্রজার মধ্যে অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শাসন-কার্য্যে কি কি ব্যবস্থা থাকিলে প্রজার মধ্যে অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইতে পারে না, তাহা আগে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

শাসক (ruler) এবং শাসিত (ruled) লইয়া শাসন (rule)। শাসিতের (ruled) মধ্যে দুষ্ট ও নিরীহ উভয় প্রকৃতির লোকই থাকে। দুষ্ট প্রকৃতির লোক যাহা পাইলে সন্তুষ্ট হয়, নিরীহ প্রকৃতির লোককে তদ্দ্বারা প্রায়শঃ সন্তুষ্ট করা যায় না। সেইরূপ আবার নিরীহ প্রকৃতির লোককে যদ্দ্বারা সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়, দুষ্ট প্রকৃতির লোককে তদ্দ্বারা সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাতাল ও সংযমশীল (temperate) মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। কোন বস্তুবিশেষ প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকিলেই যে শাসকগণের পক্ষে শাসিতদিগকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়, তাহা বলা চলে না বটে, কিন্তু শাসকগণ যদি সুবিচারক হন এবং তাঁহারা যে সুবিচারক, তাহা যদি শাসিতগণ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে শাসিতগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির কোন কারণ উদ্ভূত হইতে পারে না। কাযেই, যখনই দেখা যায় যে শাসিতগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, হয় শাসকগণের মধ্যে সুবিচারশীলতার অভাব হইয়াছে, নতুবা শাসকগণ যে সুবিচার করিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে যে বিচারশক্তির প্রয়োজন, শাসিতগণের মধ্যে সেই বিচারশক্তির অভাব হইয়াছে। শাসক ও শাসিত উভয়ে কর্ত্তব্য ও শক্তিভ্রষ্ট হইলেও শাসিতের মধ্যে অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শাসনকার্য্যে যদি এমন ব্যবস্থা থাকে, যাহার ফলে শাসকের সুবিচারশীলতার এবং শাসিতের বুদ্ধিশক্তির, অর্থাৎ শাসক সম্প্রদায় অবস্থানুসারে সুবিচার করিতেছেন কি না, তাহা বুঝিবার ক্ষমতার উদ্ভব হয়, তাহা হইলে প্রজাগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন, কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা শাসকের সুবিচারশীলতার এবং শাসিতের বুদ্ধিশক্তির উদ্ভব হইতে পারে ?

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে মানুষের সুবিচারশীলতার ও বুদ্ধিশক্তির উদ্ভব হইতে পারে এবং একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার অভাববশতঃ মানুষের মধ্যে অসন্তুষ্টি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় সমগ্র প্রজামণ্ডলীর মধ্যে অসন্তুষ্টি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন ভারতের শাসনকার্য্যে যে কোন না কোন স্থানে ভ্রম রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং ঐ ভ্রম যে প্রধানতঃ তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থায়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

শুধু ভারতবর্ষে কেন, বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশেই প্রকৃত শিক্ষার অভাব হইয়াছে এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাব বশতঃ মানুষ এখন আর কি করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্যের উৎপত্তি এবং স্বাস্থ্যপ্রদ বিহারের প্রবর্ত্তন করিতে হয় তাহাও বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারই ফলে, সর্ব্বত্রই অসন্তুষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সর্ব্বত্রই সোস্তালিজম্, বোলশেভিজম্, ফ্যাসিজম্ নাৎসিজম্ নামক নিত্য নূতন নূতন দলের আবির্ভাব হইতেছে।

ভারতবাসীর অন্নাভাব ও অসন্তুষ্টি দূর করিবার জন্য ইংরাজ অধিকতর সংখ্যায় নোটের প্রচলন, চাকুরী-স্থলের সৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ পন্থার পরীক্ষা করিতেছেন বটে

কিন্তু, আমাদের মতে **যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া যথাযথ শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত কি করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা ভারতবাসী শিখিতে না পারে,** ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, অথবা জগতের কোথায়ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত সন্তুষ্টি পুনরায় দেখা যাইবে না।

কাযেই, "ভারত-শাসনে ইংরাজের ভুল কোথায়"—এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলিতে হইবে যে, ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থাতেই ইংরাজের সর্ব্বপ্রধান ভুল রহিয়াছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজের প্রধান ভুল রহিয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষে যাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় যত অধিক শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বেশীর ভাগ মানুষ ইংরাজের সহিত অধিক কলহে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং ভারতীয় সমাজকে ওলট-পালট করিয়া ভারতবাসী জনসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিবার পথ কণ্টকিত করিতেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যে যে কুব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকেই ভারত-শাসনে ইংরাজের সর্ব্বপ্রধান ভুল বলিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহাদের একমাত্র ভুল নহে।

ভেদনীতি তাঁহাদিগের অন্যতম ভুল। রাজ্যশাসনে সাফল্যলাভ করিতে হইলে সমগ্র প্রজামণ্ডলী যাহাতে সন্তুষ্টি লাভ করে, তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে এই কথা স্বীকার করিলে, কোন ক্রমেই কোন রাজ্যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ভেদনীতি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, প্রজাগণের মধ্যে দলাদলি থাকিলে, যে ব্যবস্থায় একদলের সন্তুষ্টি বিধান করা যাইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থায় প্রায়শঃ অপর দলের অসন্তুষ্টি পরিহার্য্য।

যখন দুষ্ট-প্রজা পাশবিক বল অর্জ্জন করিয়া রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে, তখন শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করিবার জন্য সময় সময় তাহাদিগের মধ্যে যাহাতে সাময়িক ভেদ হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু সৎ ও অসৎ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজার মধ্যে যাহাতে সর্ব্বদা দলাদলি বিদ্যমান থাকে, এমন কোন ব্যবস্থা নীতি হিসাবে প্রবর্ত্তিত করা কখনও রাজ্যশাসনে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। যে কোন দেশের শাসনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে এবং তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অসন্তুষ্টি প্রায়শঃ কেন বিদ্যমান ছিল না, আর এখন উহা কেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা আমাদিগের রাজ-প্রতিনিধিগণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

ইহা ছাড়া ভারত-শাসনে ইংরাজের আরও কিছু কিছু ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট প্রভৃতি যে নানাবিধ উপায়ে রাজপুরুষগণ যাহাতে জনপ্রিয় (popular) হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের আধুনিক কার্য্যাবলী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে যে বিধি-ব্যবস্থায় রাজপুরুষগণ জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মধ্যে লাটগণের উদ্যান-সম্মিলনী (garden party) ও আনন্দ-সম্মিলনী (State balls) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড উইলিংডন এই বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁহার পদানুসরণ করিতেছেন।

জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই যখন আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত, তখন রাজ-প্রতিনিধিগণের পক্ষে এতাদৃশ ভাবে যাত্রার দলের জুড়িগণের মত তাঁহাদের বাহনগণকে লইয়া প্রকাশ্যে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হওয়া যুক্তি-সঙ্গত কি না, তাহা আমরা তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

আমরা এখনও রাজ-প্রতিনিধিগণকে ভারতবাসিগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। নতুবা, আমাদের মতে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের অভূতপূর্ব্ব রকমে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তার কথা

শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইলে তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার নিম্নলিখিত তিনটি দিক্ আছে—

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাহার প্রণালী ;

(২) শিক্ষক ;

(৩) শিক্ষার গ্রন্থ।

শিক্ষার এই তিনটি দিকের মধ্যে প্রথমোক্তটি, অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাহার প্রণালী কি হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারিত না হইলে শেষোক্ত দুইটি, অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার গ্রন্থ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করা চলে না।

ইয়োরোপে এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে যে-সমস্ত ভাবুক গত ১৫০ বৎসর ধরিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে অনেক প্রকৃত সাধক দেখা দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে নানা রকমের পরীক্ষা (experiment) করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন পরীক্ষাই যে কৃতকার্য্য হয় নাই, ইহা আধুনিক জগতের মানুষের অবস্থা দেখিলে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

আমাদের মতে, আধুনিক জগতে শিক্ষার যে যে ব্যবস্থা পরীক্ষিত হইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহার উপরোক্ত তিনটি দিক্‌ই দুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে প্রথম দিক্‌টি, অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার প্রণালী কি হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর শিক্ষক ও শিক্ষার গ্রন্থ কিরূপ হওয়া উচিৎ, সৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। শিক্ষার এই তিনটি দিক্ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিশিষ্টভাবে গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়া না লইয়া কোন পরিবর্ত্তন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কোন ফলোদয় হইবে না।

বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যবিধি অথবা যে অভিমত সংখ্যাধিক্যের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই মতবাদ গ্রহণের বিধি (majority rule) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইলে শিক্ষা-কার্য্যের দোষ কখনও তিরোহিত হইবে না।

যাঁহারা কর্ম্মজীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ম্মক্ষমতা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই, অথবা তৎসম্বন্ধে সুদক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যতই সংখ্যাধিক্যের নেতৃত্ব করুন না কেন, তাঁহাদের দ্বারা কখনও মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা, অথবা শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে না।

এই হিসাবে যাঁহারা পঞ্চাশ বৎসরের অনুর্দ্ধবয়স্ক এবং কোনরূপ পুরাতন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত, তাঁহাদিগকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনিয়ন্তা করিলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে কর্ম্মজীবনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

যাঁহারা কর্ম্মজীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ম্মক্ষমতার অধিকাংশ দিক্ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা অধ্যাপনায়, অথবা বিচারকার্য্যে, অথবা আইনের ব্যবহারে যতই সুচতুর হউন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইতে পারে না।

যাঁহারা নিজের দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, অথবা অন্ততঃ যাঁহারা শাসন-ব্যপদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ চরিত্রের মানুষের সংস্রবে আসিতে এবং তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছেন, অথবা অন্ততঃ যাঁহারা শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত ধন কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়, তদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া বিবিধ চরিত্রের সঙ্গিগণের কর্ম্মবিধি ও কর্ম্মক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যালোচনা করিতে পারিয়াছেন, আমাদের মতে একমাত্র তাঁহারাই যদি উদ্যোগী হন, তাহা হইলে দেশের শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থা যথাযথভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রজামণ্ডলীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সংগঠনের সহায়তা সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রকৃত অভিজ্ঞ লোকের হাতে শিক্ষাসংস্কারের কার্য্য অর্পণ না করিয়া, যাহাতে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা একেবারে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিলে সুফল ফলিবে না।

গভর্ণমেণ্টকে মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা মানুষের শরীরবিধানের একটি স্বাভাবিক কার্য্য (natural physiological function), মানুষ যেমন স্বভাববশতঃ মলমূত্র ত্যাগ করে, অথবা খাদ্যাদি পরিপাক করে, সেইরূপ স্বভাববশতঃই তাহার শিক্ষার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং সে শিক্ষিত হয়।

গভর্ণমেণ্ট যদি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কোন বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে শাসক ও সমগ্র শাসিতের মধ্যে বিবাদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

জগৎ যে দিকে চলিয়াছে, তাহাতে একদিন যে আমাদের কথা ভাবুকের মনে স্থান পাইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এখন তাহা কাহারও মনে স্থান পাইবে কি না, তাহা বলা যায় না।

অত্যধিক বিলম্ব হইবার আগে (before it is too late), আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

ভারতীয় কংগ্রেসের আধুনিক স্বরূপ

আমাদিগের এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে পথ দেখাইবার জন্য, অথবা আমরা যাহাতে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন পাই, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কে অধিকতর প্রযত্নশীল হইয়াছেন, তাহার আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, যদিও আমাদের দুর্দ্দিনের দুর্দ্দশা ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে এবং কেহ যে আমাদের জন্য কিছুই করিতেছেন, তাহার ঘনিষ্ঠ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের যে একটা চেষ্টা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও যে, আমরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিয়া গিয়াছি, তাহার কারণ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য অথবা দুর্নীতি নহে। উহার কারণ, প্রধানতঃ তাঁহাদের অজ্ঞতা। এইরূপ ভাবে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে বলিবার অনেক কথা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের স্বপক্ষে বলিবার কোন কথাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে ঘিরিয়া বসিয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আসল কোন কার্য্য পাওয়া তো দূরের কথা, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন না করিতে পারিলে, তাঁহাদের কার্য্যের ফলে আমাদের ঘনীভূত বিপদ্ অধিকতর ভাবে ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা আছে।

আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা কংগ্রেসের কার্য্যোদ্দেশ্য (creed) এবং কর্ম্মতালিকা (programme) যে কি এবং উহাতে দেশ কোন্ দিকে অগ্রগতি-প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

কংগ্রেসের আধুনিক কার্য্যোদ্দেশ্য (creed) ও কর্ম্মতালিকা (programme) যে কি, তাহা গত ফৈজপুর কংগ্রেসে এবং তাহার সংশ্লিষ্ট অধিবেশনে জওহরলালজী ও গান্ধীজী যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই সব বক্তৃতা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন-কাল হইতে ফৈজপুর কংগ্রেসের অধিবেশন-কাল পর্য্যন্ত দেশ কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিলে কংগ্রেস বর্ত্তমানে যে কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কার্য্যতালিকায় তাহার কার্য্যোদ্দেশ্য অগ্রগতি প্রাপ্ত হইতেছে কি না, তাহা বুঝা যাইবে।

কোন্ কোন্‌টি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য (object) এবং তাহা লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন **সুস্পষ্ট** কথা জওহরলালজীর সমগ্র বক্তৃতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অস্পষ্ট ভাবে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা তিনটি, যথা :—

(১) রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ ;

(২) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্থাপন ;

(৩) সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষকের আর্থিক সমস্যার সমাধান।

কি উপায়ে কংগ্রেস যে তাহার উপরোক্ত উদ্দেশ্যে উপনীত

হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন অস্পষ্ট কথা পর্য্যন্ত আমরা জওহরলালজীর বক্তৃতায় খুঁজিয়া পাই নাই।

তাঁহার বক্তৃতার একাংশে দেখা যায় বটে যে, তিনি "চরম ও বৈপ্লবিক প্রতিষেধক সমাজতান্ত্রিক গঠনের" কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সমাজকে কিরূপ ভাবে গঠিত করিলে যে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন বুঝিবার উপযুক্ত কথা তাঁহার সমগ্র বক্তৃতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, তিনিই আবার তাঁহার বক্তৃতার অপর স্থানে বলিতেছেন যে, "সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী কাজ করিতে হইলে আমাদের আরও বহুদূর অগ্রসর হইতে হইবে।" অথচ, কোন্ পথে অগ্রসর হইলে আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হইবে, তৎসম্বন্ধে জওহরলালজী সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্।

গান্ধীজী যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, স্বরাজ চরকার সূতায় ঝুলিতেছে। অথচ, চরকার সূতার দ্বারা যে কিরূপ ভাবে স্বরাজ লাভ হইতে পারে, তাহার কোন বিশদ ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে শুনান নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, চরকার সূতায় যদি স্বরাজ ঝুলান থাকে, তাহা হইলে যখন দেখা যাইতেছে যে, দেশে চরকাও আছে এবং তাহার সূতাও আছে, তখন "স্বরাজ" দেখা যায় না কেন?

ইহার উত্তরে গান্ধীজী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, ভারতবাসী খুব ব্যাপকভাবে চরকা গ্রহণ করে নাই বলিয়া চরকা থাকা সত্ত্বেও দেশে স্বরাজ উপস্থিত হয় নাই।

আমাদের মতে চরকার যে ব্যাপকতা গান্ধীজীর নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে সাধিত হইতে পারে নাই, চরকার সেই ব্যাপকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, ভারতের স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হইবে—ইহা মনে করা, আর ভারতবাসীর প্রত্যেকে এক একটি চাঁদ অর্জ্জন করিলে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবেন, ইহা মনে করা একই কথা।

গান্ধীজী ও জওহরলালজীর বক্তৃতা পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, তাঁহাদের মতে পূর্ণস্বরাজ লাভ করিতে হইলে, অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইলে, অথবা আর্থিক সমস্যা দুরীভূত করিতে হইলে আমাদিগের বিশেষ কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। খুব বড় গলায় আমরা যদি বলিতে পারি যে, "আমাদিগকে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে," তাহা হইলে এখনই স্বরাজ আসিয়া উপস্থিত হইবে। চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিয়া যদি বলিতে পারি যে, "আমাদিগকে দারিদ্র্য-সমস্যা ও কৃষক-সমস্যা দুরীভূত করিতে হইবে", তাহা হইলে তখনই আমাদিগের দারিদ্র্য-সমস্যা চম্পট প্রদান করিবে।

আমাদের এই "পি-পু, ফি-শু"র দেশে গান্ধীজী ও জওহরলালজীর প্রতিষেধক যে খুব মুখরোচক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রতিষেধক খুব মুখরোচক বলিয়াই উহার মধ্যে নিরাময়কারী কিছু থাক্ আর নাই থাক্, যাঁহারা বিচারে অক্ষম, তাঁহারা এই সমস্ত বক্তৃতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব বিচারহীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। গান্ধীজী ও জওহরলালজীর ঔষধ খুব মুখরোচক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে কোন অগ্রগতি কোন দিন হয় নাই এবং কখনও যে হইবে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, আ-পামর জনসাধারণের দারিদ্র্য যেরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, প্রায় প্রত্যেক পরিবারের যেরূপ চাকুরীর উপার্জ্জন-প্রার্থী হইতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে আমাদের কথায় কোন সন্দেহ করিবার অবসর থাকে কি?

আমরা এখনও কংগ্রেসের অনুচরদিগকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

নির্ব্বাচনকালে কংগ্রেস সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য

ভারতীয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যোদ্দেশ্য ও কার্য্যপন্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উহাতে আমাদের কোন সুফল ফলিতেছে না এবং উহাতে কেবলমাত্র অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে বটে এবং সেই

হিসাবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কংগ্রেস আমাদিগের বর্জ্জনীয়ও বটে, কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের মুক্তির পন্থার প্রথম সোপান, ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া। এবং, কোন সমষ্টিগত সংগঠনে সংগঠিত না হইতে পারিলে, আমাদিগের ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেস আমাদিগের বর্জ্জনীয় বটে, কিন্তু একটি কংগ্রেস না হইলেও আমাদিগের মুক্তির পন্থার প্রথম সোপানে আরোহণ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান কংগ্রেসকে বর্জ্জন করিয়া নূতন করিয়া আর একটি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিবার কথা উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ নূতন কংগ্রেসকে বর্ত্তমান কংগ্রেসের সহিত বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে দেশবাসীর ঐক্যসাধন, সেই প্রতিষ্ঠান তাহার সূচনাতেই যদি কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। এই যুক্তি অনুসারে দেশের মধ্যে কোন নূতন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনাও পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে না। কাযেই, যাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসের সংস্কার সাধিত হইয়া উহা প্রকৃতপক্ষে জাতির হিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, আমাদের মতে, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক দেশবাসীর করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান কংগ্রেসের কোন সংস্কার সাধন করিতে হইলে উহার পরিচালকবৃন্দ যে তাঁহাদের কার্য্যের ফলে দেশীয় জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে। ঐ পরিচালকবৃন্দের কার্য্যাবলী যে আমাদিগের অপ্রীতিকর, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিলে, বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সংস্কার সাধন করা যত সহজ হইবে, তত সহজে কংগ্রেসের সংস্কার আর কোন উপায়ে হইবে না। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ অধিকাংশ স্থলে অসাফল্য লাভ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি যে দেশীয় জনসাধারণের প্রীতিকর নহে, তাহা কংগ্রেস-পরিচালকবর্গকে বুঝান সহজ সাধ্য হইবে।

ভোটারগণের পক্ষে আমাদিগের এই কথা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে কি?

আমাদিগের মতানুসারে, বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যতালিকা হইতে বিরত হন, তাহা না করিতে পারিলে নূতন কোন কার্য্য-তালিকা কংগ্রেসের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হইবে না।

নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইবার জন্য কংগ্রেস যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, উহা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, তাহা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে মাসিক বঙ্গশ্রীর গত আশ্বিন সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখাইয়াছি।

এই অযৌক্তিক এবং অদূরদর্শী কার্য্য-তালিকা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এখনও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই এবং ভারতবাসীকে এখনও কিছুদিন আত্ম-প্রতারণায় মুগ্ধ থাকিয়া দুঃখ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

যদি এখনও কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বের জন্যই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা যে আরও কি ভীষণ হইবে তাহা আমরা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠি। দেশের ভোটারগণ কাহারও কথায় প্রতারিত না হইয়া স্ব স্ব প্রকৃত অবস্থা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

সংবাদ ও মন্তব্য

নববর্ষের সম্ভাষণ

মাদ্রিদের ১লা জানুয়ারীর এক সংবাদ: ঘড়ীতে বারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীগণ বারটি গোলা মাদ্রিদ সহরের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করে।

নববর্ষের এমন সম্ভাষণ ইতিহাসে বহুদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা বর্ত্তমানে যে-যুগে বাস করিতেছি, সে যুগ অনেক কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। বাঁচিবার উদ্দেশ্যে এমন মরিবার চেষ্টা আর কোন যুগ করে নাই। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সামাজিক সংগঠনে—সর্ব্বত্র, এ যুগে

মানুষের প্রাণ রাখিবার প্রাণঘাতকারী প্রয়াস পরিস্ফুট। এমন শূন্য গর্ভে আকাশচুম্বী সৌধনির্ম্মাণের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে আর কোন্ যুগে হইয়াছে ? এক মুহূর্ত্তের ভূকম্পনে যখন সেই সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বসিয়া পড়ে, তখন কোন্ যুগ সেই ভূকম্পনের হেতু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া প্রতিষেধক আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত হয় ? কোন্ যুগে মানুষ অসুস্থ হইলে অসুস্থতা নিবারণ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত অস্বাস্থ্যের হেতু পুঞ্জীভূত করিয়া চলে ?

ট্রেডমার্ক

কংগ্রেসের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল সকল কংগ্রেস সদস্যকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা একটি বিশেষ নীতি সমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান। ভারতীয় স্বাধীনতার ও কংগ্রেসের সৈনিকরূপে তাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। যাঁহারা কংগ্রেসের নীতির বিরোধী, তাঁহারা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কংগ্রেসের সুনামের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করিতেছেন। ভোটারগণ স্মরণ রাখিবেন, এই সকল লোক কংগ্রেসের সভ্য নহেন।

কংগ্রেস এক কাজ করিতে পারেন, তাঁহাদের 'ট্রেডমার্ক' পেটেণ্ট করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে জাল হইবার সম্ভাবনা কমিবে। নচেৎ যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'কংগ্রেসের লোক' ঠিক করা দায়। এ বৎসর যে কংগ্রেসের লোক, পর বৎসর সে কংগ্রেসের নহে—এইরূপ ঘটনা তো অহরহ ঘটিতেছে। সুতরাং 'পেটেণ্টে'র কথা বলিতেছিলাম।

কৃষির উন্নতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভারতের কৃষির উন্নতি করিতে হইবে। এই জন্য লোককে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। অন্যদেশে কি ভাবে কৃষির উন্নতি বিধান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে আমাদিগকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃষির উন্নতি-অভিলাষী অধ্যাপক মহাশয়ের কৃষি বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। সংপ্রতি হায়দ্রাবাদে যে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার কৃষি-শাখার সভাপতি, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের অস্থায়ী ডিরেক্টর ও উচ্চ-পরিষদের এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট রাও বাহাদুর বি. বিশ্বনাথ তাঁহার অভিভাষণে কি বলিয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁহার মতে, "ভারতবর্ষের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতির এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন, যাহা জমির অবস্থা ও কৃষকের অবস্থার উপযোগী। ভারতবর্ষের নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং সে পদ্ধতির পিছনে বহু শতাব্দীর চেষ্টা রহিয়াছে। নূতন কোন পদ্ধতির ফল অনিশ্চিত। ভারতের মাটি ও ইউরোপের মাটি বিভিন্ন। ইউরোপায় পদ্ধতি ভারতে প্রয়োগ করিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় নাই।"

কিন্তু প্রফুল্ল বাবু কি পশ্চাদ্পদ হইবেন ?

নিকৃষ্ট শিক্ষা

গত ২রা জানুয়ারী বোম্বাই প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন: সমস্ত শিক্ষা-প্রণালী নিকৃষ্ট-- জাতীয়তা-বিরোধী, স্বাধীনতা-বিরোধী এবং শিক্ষা-বিজ্ঞান বিরোধী।

বুঝিলাম, কিন্তু কোন্ শিক্ষাপ্রণালী উৎকৃষ্ট, তাহা ঠাকুর মহাশয় জানাইবেন কি ? 'শিক্ষাবিজ্ঞান'-বিরোধী বলিয়া তিনি তো এক নিশ্বাসে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু 'শিক্ষা-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে তাঁহার কোন্ ভাষা পাঠ করিয়া জ্ঞান হইয়াছে ? ইংরাজী ? জার্ম্মান ? রুশিয়ান ? ইহাদের কাহারও কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাবিজ্ঞান নাই।

ঋণের পরিমাণ

গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের নিউ দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের প্রথম রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে যানা যায় যে, ভারতে গ্রাম্য ঋণের মোট পরিমাণ ১ নিখর্ব ৮ খর্ব্ব অর্থাৎ মাত্র ১৮০০ কোটী টাকা।

বৃটিশ ভারতের লোকসংখ্যার হিসাব করিলে মাথাপিছু এই ঋণ কত দাঁড়াইবে ?

স্বাস্থ্যের অবস্থা

করাচীর অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্সে ডাঃ বি. এন. ব্যা যে বক্তৃতা দান করেন, তাহার সমালোচনা করিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" গত ১৮ই পৌষ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে জানাইয়াছেন: "পরাধীনতার জন্যই দেশবাসী স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে নাই এব পারিবে না।"

ইহা কি সত্য ? যে-সকল-দেশ স্বাধীন, সে সকল দেশের অধিবাসীরা কি প্রচুর মাত্রায় স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে ?

হিসাবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কংগ্রেস আমাদিগের বর্জ্জনীয়ও বটে, কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের মুক্তির পন্থার প্রথম সোপান, ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া। এবং, কোন সমষ্টিগত সংগঠনে সংগঠিত না হইতে পারিলে, আমাদিগের ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেস আমাদিগের বর্জ্জনীয় বটে, কিন্তু একটি কংগ্রেস না হইলেও আমাদিগের মুক্তির পন্থার প্রথম সোপানে আরোহণ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান কংগ্রেসকে বর্জ্জন করিয়া নূতন করিয়া আর একটি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিবার কথা উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ নূতন কংগ্রেসকে বর্ত্তমান কংগ্রেসের সহিত বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে দেশবাসীর ঐক্যসাধন, সেই প্রতিষ্ঠান তাহার সূচনাতেই যদি কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। এই যুক্তি অনুসারে দেশের মধ্যে কোন নূতন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনাও পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে না। কাযেই, যাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসের সংস্কার সাধিত হইয়া উহা প্রকৃতপক্ষে জাতির হিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, আমাদের মতে, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক দেশবাসীর করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান কংগ্রেসের কোন সংস্কার সাধন করিতে হইলে উহার পরিচালকবৃন্দ যে তাঁহাদের কার্য্যের ফলে দেশীয় জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে। ঐ পরিচালকবৃন্দের কার্য্যাবলী যে আমাদিগের অপ্রীতিকর, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিলে, বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সংস্কার সাধন করা যত সহজ হইবে, তত সহজে কংগ্রেসের সংস্কার আর কোন উপায়ে হইবে না। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ অধিকাংশ স্থলে অসাফল্য লাভ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি যে দেশীয় জনসাধারণের প্রীতিকর নহে, তাহা কংগ্রেস-পরিচালকবর্গকে বুঝান সহজ সাধ্য হইবে।

ভোটারগণের পক্ষে আমাদিগের এই কথা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে কি ?

আমাদিগের মতানুসারে, বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যতালিকা হইতে বিরত হন, তাহা না করিতে পারিলে নূতন কোন কার্য্য-তালিকা কংগ্রেসের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হইবে না।

নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইবার জন্য কংগ্রেস যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, উহা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অদুরদর্শিতার পরিচায়ক, তাহা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে মাসিক বঙ্গশ্রীর গত আশ্বিন সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখাইয়াছি।

এই অযৌক্তিক এবং অদূরদর্শী কার্য্য-তালিকা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এখনও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই এবং ভারতবাসীকে এখনও কিছুদিন আত্ম-প্রতারণায় মুগ্ধ থাকিয়া দুঃখ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

যদি এখনও কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বের জন্যই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা যে আরও কি ভীষণ হইবে, তাহা আমরা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠি। দেশের ভোটারগণ কাহারও কথায় প্রতারিত না হইয়া স্ব স্ব প্রকৃত অবস্থা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

সংবাদ ও মন্তব্য

নববর্ষের সম্ভাষণ

মাদ্রিদের ১লা জানুয়ারীর এক সংবাদ : ঘড়ীতে বারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীগণ বারটি গোলা মাদ্রিদ সহরের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করে।

নববর্ষের এমন সম্ভাষণ ইতিহাসে বহুদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা বর্ত্তমানে যে-যুগে বাস করিতেছি, সে যুগ অনেক কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। বাঁচিবার উদ্দেশ্যে এমন মরিবার চেষ্টা আর কোন যুগ করে নাই। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সামাজিক সংগঠনে—সর্ব্বত্র, এ যুগের

মানুষের প্রাণ রাখিবার প্রাণঘাতকারী প্রয়াস পরিস্ফুট। এমন শূন্য গর্ভে আকাশচুম্বী সৌধনির্ম্মাণের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে আর কোন্ যুগে হইয়াছে? এক মুহূর্ত্তের ভূকম্পনে যখন সেই সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বসিয়া পড়ে, তখন কোন্ যুগ সেই ভূকম্পনের হেতু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া প্রতিষেধক আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত হয়? কোন্ যুগে মানুষ অসুস্থ হইলে অসুস্থতা নিবারণ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত অস্বাস্থ্যের হেতু পুঞ্জীভূত করিয়া চলে?

ট্রেডমার্ক

কংগ্রেসের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল সকল কংগ্রেস সদস্যকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা একটি বিশেষ নীতি সমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান। ভারতীয় স্বাধীনতার ও কংগ্রেসের সৈনিকরূপে তাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। যাঁহারা কংগ্রেসের নীতির বিরোধী, তাঁহারা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কংগ্রেসের সুনামের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করিতেছেন। ভোটারগণ স্মরণ রাখিবেন, এই সকল লোক কংগ্রেসের সভ্য নহেন।

কংগ্রেস এক কাজ করিতে পারেন, তাঁহাদের 'ট্রেডমার্ক' পেটেণ্ট করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে জাল হইবার সম্ভাবনা কমিবে। নচেৎ যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'কংগ্রেসের লোক' ঠিক করা দায়। এ বৎসর যে কংগ্রেসের লোক, পর বৎসর সে কংগ্রেসের নহে—এইরূপ ঘটনা তো অহরহ ঘটিতেছে। সুতরাং 'পেটেণ্টে'র কথা বলিতেছিলাম।

কৃষির উন্নতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভারতের কৃষির উন্নতি করিতে হইবে। এই জন্য লোককে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। অন্যদেশে কি ভাবে কৃষির উন্নতি বিধান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে আমাদিগকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃষির উন্নতি-অভিলাষী অধ্যাপক মহাশয়ের কৃষি বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। সংপ্রতি হায়দ্রাবাদে যে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার কৃষি-শাখার সভাপতি, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের অস্থায়ী ডিরেক্টর ও উচ্চ-পরিষদের এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট রাও বাহাদুর বি. বিশ্বনাথ তাঁহার অভিভাষণে কি বলিয়াছেন, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁহার মতে, "ভারতবর্ষের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতির এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন, যাহা জমির অবস্থা ও কৃষকের অবস্থার উপযোগী। ভারতবর্ষের নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং সে পদ্ধতির পিছনে বহু শতাব্দীর চেষ্টা রহিয়াছে। নূতন কোন পদ্ধতির ফল অনিশ্চিত। ভারতের মাটি ও ইউরোপের মাটি বিভিন্ন। ইউরোপীয় পদ্ধতি ভারতে প্রয়োগ করিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় নাই।"

কিন্তু প্রফুল্ল বাবু কি পশ্চাদ্পদ হইবেন?

নিকৃষ্ট শিক্ষা

গত ২রা জানুয়ারী বোম্বাই প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন: সমস্ত শিক্ষা-প্রণালী নিকৃষ্ট জাতীয়তা-বিরোধী, স্বাধীনতা-বিরোধী এবং শিক্ষা-বিজ্ঞান বিরোধী।

বুঝিলাম, কিন্তু কোন্ শিক্ষাপ্রণালী উৎকৃষ্ট, তাহা ঠাকুর মহাশয় জানাইবেন কি? 'শিক্ষাবিজ্ঞান'-বিরোধী বলিয়া তিনি তো এক নিশ্বাসে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু 'শিক্ষা-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে তাঁহার কোন্ ভাষা পাঠ করিয়া জ্ঞান হইয়াছে? ইংরাজী? জার্ম্মান? রুশিয়ান? ইহাদের কাহারও কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাবিজ্ঞান নাই।

ঋণের পরিমাণ

গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের নিউ দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের প্রথম রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে যানা যায় যে, ভারতে গ্রাম্য ঋণের মোট পরিমাণ ১ নিখর্ব্ব ৮ খর্ব্ব অর্থাৎ মাত্র ১৮০০ কোটী টাকা।

বৃটিশ ভারতের লোকসংখ্যার হিসাব করিলে মাথাপিছু এই ঋণ কত দাঁড়াইবে?

স্বাস্থ্যের অবস্থা

করাচীর অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে ডাঃ বি. এন. ব্যাস যে বক্তৃতা দান করেন, তাহার সমালোচনা করিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" গত ১৮ই পৌষ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে জানাইয়াছেন:- "পরাধীনতার জন্যই দেশবাসী স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে নাই এবং পারিবে না।"

ইহা কি সত্য? যে-সকল দেশ স্বাধীন, সে সকল দেশের অধিবাসীরা কি প্রচুর মাত্রায় স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে?

যক্ষ্মা-রোগীর স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের বিষয়ে সুখবর নহে? হিসাব করিলে, অমৃতবাজার পত্রিকা দেখিবেন, যে-সকল দেশ স্বাধীন, তাহারা কেবল হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারি এবং যাবতীয় ব্যাধি-উপশমের অস্ত্র বৃদ্ধি করিতেই ব্যস্ত; রোগ যাহাতে না হইতে পারে, সে-ব্যবস্থা কাহারও নাই। ইহার কারণ কি—অমৃতবাজার পত্রিকা কি তাহা ভাবিয়া দেখিবেন?

পদার্থ বিজ্ঞান

> হায়দ্রাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মেলনে পদার্থবিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনের সভাপতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেনঃ—পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে জগতের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞানের জন্য আমরা তো এক ডক্টর সাহা এবং তাঁহার সগোত্র কয়েকজন ব্যতীত আর কাহারও এবং আর কিছুর উন্নতি দেখি না। তাঁহাদের অবশ্য পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যেই 'পদ' এবং 'অর্থ' দুইই লাভ হইয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণ

> রাষ্ট্রীয় মহাসভার পঞ্চাশৎ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আনন্দবাজার পত্রিকা জানাইয়াছেনঃ- "পণ্ডিত জওহরলালের প্রকৃতিগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার অভিভাষণে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাই আমরা ঐ অভিভাষণের কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন আশ্বস্ত হইলাম।

মিলন-প্রস্তাব

> ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলার সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য একটি প্রস্তাবে বহুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। প্রস্তাবটি এই সমান সংখ্যক চাকুরী এখন হইতে দুই সম্প্রদায়ের লোকই পাইবে।

পাড়ার দুইটা ছেলে মারামারি করিতেছিল। মোহন দাদা ভাল লোক, তিনি তাহাদের ডাকিয়া লজেঞ্চুস্ খাইতে দিলেন। সেই হইতে মোহন দাদাকে দেখিলেই তাহারা কলহ করে। এই প্রস্তাবের ফলও তাহাই দাঁড়াইতে পারে।

চিত্র পরিচয়

মাঘমাস

'মাঘ মাস' চিত্রখানি অতি দুর্লভ। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এই ছবিখানি নেপালের রীতির সহিত পশ্চিম-ভারতের সম্পর্ক প্রস্ফুট করিতেছে। মোগল চিত্রকলার সংস্পর্শে এই চিত্রের জন্ম হয় নাই, তাই এই হিসাবে এ ছবিখানি অমূল্য। হিন্দু চিত্রকলার ইতিহাস এখনও সম্যক্‌রূপে অধীত হয় নাই। পার্সি ব্রাউনের মতে অজান্তার চিত্রসম্পদের পর বহুকাল, প্রায় হাজার বৎসর, হিন্দু চিত্রকলার নিদর্শন দেখা যায় না। শুধু মোগলযুগেই এই কলার পুনরুত্থান হয়। স্যর যদুনাথ সরকার রাজপুত চিত্রকলাকে মুসলমান প্রভাবযুক্ত মনে করেন। এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অঙ্কিত হিন্দু শিল্পের নমুনা পাওয়া বিশেষ ঘটনা, সন্দেহ নাই। চিত্রখানি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা মনে হয়। অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে এ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও নেপালের চিত্রকলার নমুনা পাওয়া যায়। এ শ্রেণীর চিত্রকলা নেপাল হইতে এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ærial viewএর, আকাশ দৃশ্যের একটি প্রাচীন নমুনা—সে হিসাবে চিত্রখানির মূল্য আরও বেশী। চিত্রের বিষয় মাঘমাস। রাধাকৃষ্ণ উপবিষ্ট—দূর-দিগন্তে মেঘমালা মাল্যের ন্যায় চক্রবালে দীপ্ত হইতেছে। সখীরা সম্মুখে উপবিষ্ট—রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতিতে তাহারা পুলকিত। শীতের প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে—নানা বৃক্ষের পুষ্পপত্রের প্রাচুর্য্য আবার দেখা দিতেছে, চারিদিকে যেন একটা জাগরণ ও উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণবাঞ্জনায়, রেখাকৌলীন্যে এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রকলার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই চিত্রে সোনালী রঙ ছাড়া বহু রঙের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য, গৃহকোণ, কুঞ্জবন, মেঘালিঙ্গিত আকাশ, সবই যেন রাধাকৃষ্ণকে অপূর্ব্ব আবেষ্টনে সংবর্দ্ধনা করিতেছে। বস্তুতঃ ভগবানের প্রসাদেই ঋতুবিপর্য্যয় ও নূতন জীবন লাভ হয়। এই চিত্রখানিতে মনে হয়, রাধাকৃষ্ণের আশিসে প্রকৃতি, মানব, জলস্থল, আকাশ সব কিছুই দীর্ঘ শৈত্যের কঠিন আলিঙ্গন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিজেদের শোভা ও সৌন্দর্য্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। শিল্পী ভগবানের এই সার্থক কৃপাকে বর্ণের ঐশ্বর্য্য ও রেখার ললিত ছন্দে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন।



"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

ফাল্গুন—১৩৪৩

৫ম বর্ষ, ১ম খ[illegible]য় সংখ্যা

"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা

পূর্ব্বাবৃত্তি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

স্যর রাধাকৃষ্ণন্ এবং ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দুইজন দার্শনিকের দুইটি বক্তৃতা সমালোচনাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি আরম্ভ করা হইয়াছিল।

ইহাতে প্রথমতঃ ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত কয়েকটি মুখ্য কথা আলোচিত হইয়াছে। তারপর আজকাল বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত ভারতীয় ঋষিগণের কথা সম্বন্ধে কত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখান হইতেছে।

ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যে-কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপ-স্থ, বহ্নি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। এক কথায়, যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম "ধর্ম্ম" ;

(২) "ধর্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপ-স্থ, তেজঃ এবং স্পর্শশক্তিবশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। এক কথায়, মানুষ যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার "ধর্ম"। যথা—'চোরের ধর্ম', 'সাধুর ধর্ম' ইত্যাদি ;

(৩) শরীরের যাহা কিছু কাটিয়া ফেলিলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে দৃষ্টি-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ও চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, তাহার নাম উপ-স্থ এবং যাহা কাটিয়া ফেলিলে ঐ ছয়টি শক্তির কোন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম অপ-স্থ ;

(৪) জীবের উপ-স্থ বস্তুগুলির শক্তি অটুট রাখিবার উপযোগী কার্য্য করিলে জীব তাহার নীরোগতা ও কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে ;

(৫) জীব ও জগতের মূল কারণ ব্যোম। ব্যোমের দুইটি অবস্থা আছে। একটির নাম "অশরীরী" অবস্থা এবং অপরটির নাম "ভূত" অবস্থা ;

(৬) "অশরীরী-ব্যোম" হইতে "ভূত-ব্যোমের" উদ্ভব হয় এবং "ভূত-ব্যোম" হইতে ক্রমশঃ বায়ু, অম্বু, বহ্নি, পরমাণু, অণু, মেদ্, অস্থি, মজ্জা,

বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ এবং রোমকূপের উদ্ভব হইয়া থাকে ;

(৭) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন শীতল স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে শীতলতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অম্বু" বলা হয়। "অম্বু"র শীতলতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "অপ্", "জল" ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে ;

(৮) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন উষ্ণ স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে উষ্ণতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বহ্নি" বলা হয়। "বহ্নি"র উষ্ণতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "অগ্নি", "তেজঃ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে ;

(৯) আমাদের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে প্রকৃত বিশুদ্ধ বায়ু, অথবা বিশুদ্ধ অম্বু, অথবা বিশুদ্ধ বহ্নি অবিমিশ্রভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নীলাকাশের নিকটে যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ অম্বু এবং বিশুদ্ধ বহ্নির বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে ;

(১০) জীব তাহার শরীরের মধ্যে যে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি সাধারণতঃ পোষণ করিয়া থাকে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাহা বিশুদ্ধ নহে বলিয়াই জীব প্রতিনিয়ত নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ঐ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির অবিশুদ্ধতার মাত্রানুসারে জীবের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মাত্রার তারতম্য হয় ;

(১১) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিতে পারিলে শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় ;

(১২) বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির মূল কারণ—অশরীরী ব্যোমকে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ স্পর্শ করিতে পারিলে, শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋগ্‌বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণসহকারে "উদান-বায়ু"র অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বায়ুর সমতাসাধন" ও "উদান-বায়ু" কাহাকে বলে, তাহার আলোচনাও গত বৈশাখ-সংখ্যায় করা হইয়াছে ;

(১৩) ভূত-অবস্থার ব্যোমকে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ স্পর্শ করিতে না পারিলে উদান-বায়ুর অনুধাবন করা যায় না এবং উদান-বায়ুর অনুধাবন করিতে না পারিলে ব্যোমের অশরীরী অবস্থা স্পর্শ করা, অর্থাৎ "ব্রহ্ম" সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না ;

(১৪) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋগ্‌বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণসহকারে "ব্যান-বায়ু"র অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "ভূত"-অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের "ভূত"-অবস্থা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করার কার্য্য" বলা হইয়াছে। যে বিশুদ্ধ বহ্নিবশতঃ ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা হইতে "ভূত" অবস্থা পরিগৃহীত হয়, সেই

বিশুদ্ধ "বহ্নি"কে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে ;

(১৫) উপরোক্ত একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ দফার সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যায়—বিশুদ্ধ বহ্নি কি বস্তু—এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ঈশ্বর প্রত্যক্ষ** করা যায়—এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ব্রহ্মের সাক্ষাৎ** লাভ করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করা সম্ভব হয়। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। কাযেই, এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ "বহ্নি" কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং শরীরাভ্যন্তরে তাহা অটুট রাখিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধি-যন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় ;

(১৬) মানুষ তাহার কতকগুলি কু-প্রকৃতিবশতঃ তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে "বহ্নি" আছে, ঐ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তাহার জন্য মানুষের জীবন অবিমিশ্র সুখময় না হইয়া সুখ-দুঃখমিশ্রিত হইয়া থাকে। মানুষের কু-প্রকৃতির সংখ্যা সাধারণতঃ আটটি, যথা :—(১) অহঙ্কার, (২) কু-বুদ্ধি, (৩) বিক্ষিপ্ত মন, (৪) আকাশ, (৫) বায়ু, (৬) অনল, (৭) আপ ও (৮) ভূমি ;

(১৭) শরীরাভ্যন্তরস্থ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে উপরোক্ত আটটি প্রকৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে ;

(১৮) মানুষের কেন ঐ আটটি কু-প্রকৃতির উদ্ভব হয়, তাহার অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোম-কূপে উষ্ণতার আধিক্যবশতঃ যথাক্রমে মানুষ অহঙ্কারী, কু-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিক্ষিপ্তমনাঃ এবং আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতি-সম্পন্ন হয় ;

(১৯) উপরোক্ত অষ্টাদশ দফা হইতে বলা যাইতে পারে, যাহাতে মানুষের মেদ, অস্থি, মজ্জা বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, তাহার প্রধান আটটি কু-প্রকৃতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে ;

(২০) স্পর্শ-শক্তি অটুট থাকিলে শরীরস্থ মেদাদি যাহাতে অত্যধিক উষ্ণ না হয়, তাহা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং শরীরস্থ মেদাদির উষ্ণতা যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায়, তাহা করিতে পারিলে মানুষ তাহার আটটি কু-প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং তখন মানুষের অবিমিশ্র সুখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা হয় ;

(২১) ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—নীরোগতা সাধন করিয়া কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করা এবং আটটি কু-প্রকৃতির হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া অবিমিশ্র সুখ ভোগ করা, অথবা এক কথায়, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করা ;

(২২) ধর্ম্মের উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল করিবার উপায় —কি প্রকারে জীবের উদ্ভব ও বিকাশ এবং

তাহার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থা সংঘটিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া ;

(২৩) উপরোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং তাহা সফল করিবার উপায় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, "ধর্ম্ম" শব্দের বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে—সেই কার্য্য অথবা চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে কি প্রকারে জীবের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তাহার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থা সংঘটিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে, জীবের উদ্ভব, বিকাশ, সাত্ত্বিক অবস্থা, রাজসিক অবস্থা এবং তামসিক অবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধিলাভ, অর্থাৎ কর্ম্মতঃ শিক্ষালাভ করিতে হয়, তাহার নাম "ধর্ম্ম" ;

(২৪) বৈশেষিক দর্শনে ভারতীয় ঋষি "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার সহিত উপরোক্ত সংজ্ঞা সাদৃশ্যযুক্ত কি না, তাহার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দুইটি সংজ্ঞাই অবিকল একরূপ :

(২৫) কাযেই দেখা যাইতেছে যে, "ধর্ম্ম" শব্দটির বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতীয় ঋষি তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে ধর্ম্মের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন ;

(২৬) অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ঋষিগণের "ধর্ম্ম"-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা খুবই সুস্পষ্ট এবং তাহা যে বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, তাহার কারণ, তাঁহারা ভারতীয় ঋষির প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না ;

(২৭) জীবের দেহ প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—সত্ত্বা, আত্মা ও শরীর। জীবের দেহাভ্যন্তরে যে ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি বিদ্যমান আছে, তাহা লইয়া জীবের "সত্ত্বা"। আর, ঐ দেহাভ্যন্তরে যে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বক্ বিদ্যমান আছে, তাহা লইয়া জীবের "শরীর"। যাহার, অথবা যে কার্য্যের বিদ্যমানতাবশতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি, অর্থাৎ সত্ত্বা হইতে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বকের, অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং শরীর হইতে সত্ত্বার উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার নাম আত্মা ;

(২৮) মেদাদি অর্থাৎ শরীরের অস্তিত্ববশতঃ জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং শরীরেরই বা কেন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা সামবেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;

(২৯) ব্যোমাদি অর্থাৎ সত্ত্বার অস্তিত্ববশতঃ জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং সত্ত্বারই বা কেন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা যজুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;

(৩০) আত্মার অস্তিত্ববশতঃ জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তিরই বা কেন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;

(৩১) নিম্নলিখিত চৌদ্দটি বিষয় অথর্ব্ববেদে আলোচিত হইয়াছে :—

(ক) শরীর-গঠন-বিস্তার প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের শরীর-গঠনের বর্ণনা ;

(খ) শরীর-বিধান-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এবং জীব-শরীর কিরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা;

(গ) শব্দ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের শব্দক্ষমতা কিরূপভাবে উদ্ভূত এবং পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা;

(ঘ) স্পর্শ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের স্পর্শক্ষমতা কিরূপভাবে উদ্ভূত এবং পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা;

(ঙ) রূপবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে রূপ কিরূপভাবে উদ্ভূত হয় এবং তাহার রূপবোধক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা;

(চ) রস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে রস কিরূপভাবে উদ্ভূত হয় এবং তাহার রসবোধক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা;

(ছ) গন্ধ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে গন্ধ কিরূপভাবে উদ্ভূত হয় এবং গন্ধবোধ-ক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহার বর্ণনা;

অখণ্ড বায়বীয় ও তরল বস্তুসমূহ কিরূপভাবে খণ্ডনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়া সংখ্যাযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে;

(জ) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবের দেহে কেন ব্যাধির উদ্ভব হয় এবং কি করিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, তাহার বর্ণনা;

(ঝ) ধর্ম-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং জীব কেন বিভিন্ন-স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং কোন্ স্বভাবের কি পরিণতি, তাহার বর্ণনা;

(ঞ) ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে চলাফেরা করিবার কি কি ব্যবস্থা হইলে মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু-সমূহ অর্জ্জন করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখিতে পারে, তাহার বর্ণনা;

(ট) জীবের "সত্ত্বা" বলিতে কি বুঝায় এবং এই "সত্ত্বা"র সহিত বায়ুমণ্ডল ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কি সম্বন্ধ এবং ঐ সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কি কি ভাবে নিজকে গঠিত করিতে হয়, তাহার বর্ণনা;

(ঠ) জীবের "আত্মা" বলিতে কি বুঝিতে হয় এবং ঐ আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্যের কি সম্বন্ধ, তাহার, এবং ঐ সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপভাবের সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহার বর্ণনা;

(ড) জীবের "শরীর" বলিতে কি বুঝিতে হয় এবং শরীরের সহিত তাহার সত্ত্বার ও আত্মার কি সম্বন্ধ এবং ঐ সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপ ভাবের সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহার বর্ণনা;

(ঢ) জীবের "জ্ঞান" বলিতে কি বুঝিতে হয় এবং যথাযথভাবে জ্ঞান লাভ করিবার কি উপায়, তাহার বর্ণনা;

(৩১) উপরোক্ত ২৭শ দফা হইতে ৩১শ দফা পর্য্যন্ত যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহা পরিজ্ঞাত হইলে মানুষ অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তি ও সন্তুষ্টির সহিত স্বাবলম্বনে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা সমস্তই ভারতীয় ঋষিগণ চারিটি বেদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আরও দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক তথ্যটি কি করিয়া জ্ঞানতঃ (theoretically)

অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা যেমন তাঁহারা অথর্ব্ববেদে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ আবার উহা কি করিয়া কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সাম, ঋক্ এবং যজুর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাযেই, ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কোন রকম ভাবেই অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক অথবা কাল্পনিক বলা যাইতে পারে না।

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বক্তৃতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটি আলোচিত হইয়াছে :—

(১) ধর্ম্ম ও রিলিজন;
(২) ধর্ম্ম ও অনুভূতি;
(৩) আধ্যাত্মিক বিষয়, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং সুকুমার কলা।

ডক্টর দাশগুপ্তের বক্তৃতার শেষাংশ

ডক্টর দাশগুপ্তের বক্তৃতার শেষাংশে আমরা যাহা যাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া ধরিয়াছি, তাহাতে তিনি মুখ্যতঃ ছয়টি বিষয় আংশিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, যথা :—

(১) বিজ্ঞান ও নীতি,
(২) সাধন ও চিন্তা,
(৩) আচার ও প্রথা,
(৪) ঈশ্বর,
(৫) মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব,
(৬) সংস্কৃতচর্চ্চা।

বিজ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি বিজ্ঞানের দিক্ হইতে নীতিবোধের বিচার করা যায়, তবে উহাতে বহু দুরতিক্রম্য অসামঞ্জস্য দেখা যায়"।

আমাদের মতে ডক্টর দাশগুপ্তের ঐ উক্তিটিও যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভারতীয় ঋষিগণ 'জ্ঞান', 'বিজ্ঞান' এবং 'নীতি' এই তিনটি পদ বেদ ও তন্ত্রের মন্ত্রে অথবা দর্শনের সূত্রে অথবা সংহিতা প্রভৃতির শ্লোকে যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে জানা থাকিলে বলিতে হয় যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং নীতি সর্ব্বদাই সামঞ্জস্য-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যখন উহার কোনটির মধ্যে কোন সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হয় যে, "জ্ঞানে"র স্থলে অজ্ঞানের, "বিজ্ঞানে"র স্থলে কুজ্ঞানের এবং "সুনীতি"র স্থলে কু-নীতির খেলা চলিতেছে।

বিদ্বৎ-সমাজের নাইট-উপাধিধারী আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতবর্ষে "বিজ্ঞান" প্রচলিত ছিল না এবং তাঁহাদের ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় ভারতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের ঐ ধারণা সত্য কি না তাহা সংস্কৃত ভাষায় 'বিজ্ঞান' শব্দটির ব্যবহার আছে কি না, তাহার সন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে তাহা হইলে যাঁহারা বস্তুতঃ বালকবৎ চপল, তাঁহাদের পক্ষে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ছিল কি না তাহা বুঝা সম্ভব হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় ঋষি-প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থ প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে মহাভারতান্তর্গত গীতা অন্যতম। ঐ গীতার সপ্তম অধ্যায়ের নাম "জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ।" যদি জ্ঞান এবং বিজ্ঞান নামক দুইটি বিষয় ভারতীয়গণের না জানা থাকিত, তাহা হইলে ভারতীয় ঋষির পুস্তকে জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ নামক অধ্যায়ের স্থান হইত না। ভারতবর্ষে যে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান নামক দুইটি বিষয়ের চর্চ্চা অতি প্রাচীন কালে পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইতে পারে। ভারতীয় ঋষিগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনাকে যে কত শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, তাহা গীতার সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের* দিকে নজর করিলে বুঝা যাইবে। তাঁহাদের মতে যিনি বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের আলোচনা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, সমস্ত বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামক দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলিতে ভারতীয় ঋষিগণ কি বুঝিতেন, তাহা সম্যক ভাবে জানিতে হইলে তাঁহাদের গ্রন্থাদি লইয়া

---

* জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

অধ্যয়ন ও সাধনা করিতে হয়। মোটামুটিভাবে তৎসম্বন্ধে জানিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণের মতে পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক বস্তুটির তিনটি অবস্থা আছে। একটি তাহার "ব্যক্ত"-অবস্থা, দ্বিতীয়টি "অব্যক্ত"-অবস্থা এবং তৃতীয়টি 'জ্ঞ'-অবস্থা। এই তিনটি অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য 'জল'কে উদাহরণ স্বরূপ লইলে দেখা যাইবে যে, যে-বস্তুটির 'ব্যক্ত'-অবস্থা জল, তাহার 'অব্যক্ত'-অবস্থা জলীয় বাষ্প এবং তাহার 'জ্ঞ'-অবস্থা জলীয় পরমাণু। জলীয় পরমাণু যে জলের 'জ্ঞ'-অবস্থা, তাহা সম্যক্ ভাবে ধারণা করিতে হইলে যেরূপ 'জ্ঞ'-অবস্থা কাহাকে বলে, তাহার ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ 'পরমাণু' কাহাকে বলে, তাহারও ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়। আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে কোন বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে পরমাণু স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিতে হয়।

ভারতীয় ঋষিগণের মতে বস্তুর যে অবস্থা সূক্ষ্মতম যন্ত্রের দ্বারা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বস্তুর "ব্যক্ত"-অবস্থা বলিতে হয়। তাঁহাদের মতে কোন বস্তুর "জ্ঞ"-অবস্থা অথবা পরমাণু-অবস্থা চক্ষু, অথবা কর্ণ, অথবা নাসিকা অথবা জিহ্বার দ্বারা গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবলমাত্র ত্বক্-গ্রাহ্য। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, কোন বস্তুর পরমাণুর এমন রূপ নাই যে, তাহা চক্ষুর দ্বারা দেখা যাইতে পারে। অথবা তাহাতে এমন শব্দ হয় না যে, তাহা কর্ণের দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অথবা তাহাতে এমন গন্ধ হয় না যে, তাহা নাসিকার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। অথবা তাহার এমন রস হয় না যে, তাহা জিহ্বা দ্বারা অনুভব করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বস্তুর পরমাণুর অবস্থা যে কি, তাহা মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা অথবা জিহ্বার শক্তিকে আজকালকার ধরণে যন্ত্র দ্বারা তথাকথিত ভাবে বৃদ্ধি করিয়া লইলেও বুঝা যায় না বটে, কিন্তু তাহা শরীরাভ্যন্তরীণ ত্বকের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ভারতীয় ঋষিগণের মতে প্রত্যেক মানুষের শরীরাভ্যন্তরে দেহের সর্ব্বত্র 'বটুকায়' নামক একটি ত্বক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ 'বটুকায়' নামক ত্বক্ কি করিয়া স্ব স্ব শরীরাভ্যন্তরে দেহের প্রত্যেক স্থানে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ বুঝাইয়াছেন তাঁহাদের তন্ত্র নামক গ্রন্থসমূহে, আর ঐ 'বটুকায়' নামক ত্বকের সাহায্যে পরমাণুরাশিকে কি করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন ঋক্, সাম, যজুঃ নামক তিনটি বেদে।

ভারতীয় ঋষিগণের মতে যেমন জলের তিনটি অবস্থা আছে, সেইরূপ পরিদৃশ্যমান বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুরই তিনটি অবস্থা আছে। পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক বস্তুটির যে তিনটি অবস্থা আছে,তাহা যেমন ভারতীয় ঋষিগণ প্রমাণিত করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা ইহাও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বস্তুর 'জ্ঞ'-অবস্থা অথবা পরমাণু-অবস্থা হইতে তাহার অব্যক্ত-অবস্থা অথবা বাষ্পীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তাহার অব্যক্ত অথবা বাষ্পীয় অবস্থা হইতে ব্যক্ত-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, যেরূপ প্রত্যেক বস্তুর 'জ্ঞ'-অবস্থা হইতে তাহার অব্যক্ত-অবস্থার এবং অব্যক্ত-অবস্থা হইতে তাহার ব্যক্ত-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক বস্তুর ব্যক্ত-অবস্থা হইতে তাহার অব্যক্ত-অবস্থার এবং অব্যক্ত-অবস্থা হইতে তাহার 'জ্ঞ'-অবস্থার পরিণতি হইয়া থাকে।

এইরূপে 'জ্ঞ'-অবস্থা হইতে অব্যক্ত-অবস্থার উদ্ভব, অব্যক্ত-অবস্থা হইতে ব্যক্ত-অবস্থার উদ্ভব এবং আবার ব্যক্ত-অবস্থা হইতে অব্যক্ত-অবস্থার পরিণতি ও অব্যক্ত-অবস্থা হইতে 'জ্ঞ'-অবস্থার পরিণতি প্রত্যেক বস্তুর স্বভাব অথবা প্রকৃতি। বস্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'জ্ঞ'-অবস্থায় থাকে এবং 'জ্ঞ'-অবস্থা হইতে তাহার অব্যক্ত-অবস্থার উদ্ভব হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে কেবলমাত্র স্বভাবের অথবা প্রকৃতির কার্য্য হইতে থাকে। কিন্তু, উহার পর যখন অব্যক্ত-অবস্থা হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত-অবস্থার উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করে, তখন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অহরহঃ যেরূপ প্রকৃতির কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার বিকৃতির কার্য্যও আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় প্রত্যেক বস্তু যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের আয়ত্তাধীন থাকে, সেইরূপ আবার তাহার নিজের নিয়মেরও আয়ত্তাধীন হয়। একটি যন্ত্র

যেরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে এবং সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ ভাবে কেবলমাত্র যন্ত্রনির্ম্মাতার নির্দ্দেশে চালিত থাকে, কিন্তু যখন উহার অংশগুলি সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হইয়া পূর্ণ যন্ত্ররূপে বিরাজিত হয়, তখন একদিকে যেরূপ যন্ত্রনির্ম্মাতার কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার যন্ত্রের আপনার কার্য্যেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। বস্তু যখন তাহার 'জ্ঞ'-অবস্থা হইতে অব্যক্ত-অবস্থায় উপনীত হয়, তখনও ঠিক ঠিক সেইরূপ তাহার মধ্যে তাহার নির্ম্মাতার এবং তাহার স্বকীয় কার্য্য চলিতে থাকে। নির্ম্মাতার কার্য্যের সহিত প্রকৃতির কার্য্যের এবং স্বকীয় কার্য্যের সহিত বিকৃতির কার্য্যের তুলনা করা যাইতে পারে।

যে ক্রিয়া দ্বারা বস্তুর "জ্ঞ"-অবস্থা অথবা পরমাণু-অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার নাম "কর্ম্ম" (দুইটি 'ম'-য়ে রেফ্), আর যে ক্রিয়ার দ্বারা বস্তুর "জ্ঞ"-অবস্থা অথবা পরমাণু-অবস্থা হইতে তাহার অব্যক্ত-অবস্থার উৎপত্তি কিরূপ ভাবে হইতেছে এবং ঐ অব্যক্ত-অবস্থাই বা কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং ঐ অব্যক্ত-অবস্থা হইতে আবার কিরূপে "জ্ঞ"-অবস্থার পরিণতি হইতেছে, তাহা জানা যায়, তাহার নাম ঋষিদিগের ভাষায় "জ্ঞান"। যে ক্রিয়া দ্বারা বস্তুর অব্যক্ত-অবস্থা হইতে তাহার ব্যক্ত-অবস্থা কিরূপে উৎপত্তি হইতেছে এবং ব্যক্ত-অবস্থা হইতেই বা অব্যক্ত-অবস্থায় তাহার পরিণতি কিরূপে ঘটিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং বস্তুর ব্যক্ত-অবস্থার প্রকৃতি ও বিকৃতি কি, তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহার নাম "বিজ্ঞান"।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যতটুকু প্রকৃতির কার্য্য থাকে, তাহাকে ঋষিদিগের ভাষায় নীতি অথবা 'সুনীতি' বলা যাইতে পারে এবং যেটুকু বিকৃতির কার্য্য থাকে, তাহাকে 'কুনীতি' বলা যাইতে পারে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সুনীতি যেরূপ তাহার উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম, সেইরূপ কুনীতিও তাহার উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম। দুইটির তফাৎ এই যে, সুনীতি জটিলতাবিহীন, আর কুনীতি জটিলতায় পরিপূর্ণ। বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির নিয়ম অথবা সুনীতি জানিতে হইলে, কেবল মাত্র অঙ্কশাস্ত্রের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ জানা থাকিলেই তাহা জানা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিকৃতির নিয়ম অথবা কুনীতি জানিতে হইলে অঙ্ক শাস্ত্রের ঐ চারিটি প্রাথমিক পদ্ধতি ছাড়া binomial theorem এবং exponential theorem প্রভৃতি নামক উচ্চগণিতের অপরাপর অংশও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। এইরূপে ভারতীয় ঋষিদিগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গ্রন্থে সর্ব্ববিধ গণিতের এমন বহুবিধ কথা পাওয়া যায়, যাহা আধুনিক গণিতশাস্ত্রে দেখা যায় না।

উপরোক্ত ভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং নীতির সংজ্ঞা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

আজকালকার পণ্ডিতসমাজ যেরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আপোষে (by convention) যে-কোন বস্তুকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়াই অভিহিত করা যাইতে পারে, ভারতীয় ঋষিগণ তাহা মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে জীবের শব্দোৎপত্তির, অথবা ভাষার উৎপত্তির প্রাকৃতিক নিয়ম আছে এবং ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম জানা থাকিলে প্রত্যেক জীবের এবং প্রত্যেক বর্ণের মানুষের (অবশ্য, মনুষ্যাকার দাম্ভিক জীবের নহে) ভাষা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জীবের ভাষার উৎপত্তির যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে এবং নিয়ম জানা থাকিলে যে সর্ব্ববিধ জীবের প্রাকৃতিক অবস্থার ভাষা বুঝিতে পারা যায়, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের বেদে অতি বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। জীবের ভাষার উৎপত্তি প্রথমতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়া থাকে বলিয়াই শিশুগণ আপনা হইতেই বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন দেশের শিশুগণ বিভিন্ন বস্তুকে যে যে নামে অভিহিত করিয়া থাকে, তন্মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে।

ভাষার অথবা শব্দের এই প্রাকৃতিক নিয়ম জানা থাকিলে, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং নীতি প্রভৃতির সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানা মোটেই ক্লেশকর হয় না এবং তখন কোন্ বিষয় কতখানি আলোচ্য এবং তৎসম্বন্ধে কি বক্তব্য, তাহা লইয়া মতভেদের উদ্ভব হইতে পারে না।

ভারতীয় ঋষিগণ প্রত্যেক বস্তুর সর্ব্ববিধ অবস্থার কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং নীতি সম্বন্ধে সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যসমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি সম্পাদিত করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কাহারও নিকট সম্মানের প্রার্থী না হইলেও জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষ তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিত। এই শ্রদ্ধাই ক্রমে ক্রমে সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় ঋষির ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া সত্বেও বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের মানুষ এই দেশ হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা আহরণ করিবার জন্যই এই খানে গমনাগমন করিত। Niebuhr, Wolf, Bocke, Müller, Eichhorn, Savigny, Jacob, Grimm, Ranke প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ও তাঁহাদের শিষ্যগণ কার্য্যকারণের সঙ্গত ভাব বুঝিতে না পারিয়া পরবর্ত্তী কালে এতাদৃশ বিদ্যা আহরণের অভিযানকে দিগ্বিজয়ের যাত্রা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ডক্টর দাশগুপ্তের বিজ্ঞান ও নীতিসম্বন্ধীয় কথাতে যেরূপ ভ্রমাত্মকতা প্রমাণিত হইল, সেইরূপ তাঁহার অপর পঁচটি কথাতেও অল্লাধিক অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইতে পারে। ডক্টর দাশগুপ্তের এই সমস্ত কথায় অল্লাধিক অযৌক্তিকতা থাকিলেও তাহাতে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে এবং তিনি যে তাঁহার অপর বন্ধুর তুলনায় অধীতশাস্ত্র, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বর্ত্তমান কালের দুইটি প্রসিদ্ধ দার্শনিকের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কথার সমালোচনায় আমরা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া আপাততঃ ঐ প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে অনেক কথা বলিয়াছেন।

আমাদের মতে, ভারতীয় ঋষির ভাষা প্রকৃত ভাবে জানিতে পারিলে সমগ্র মানবজাতির যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ডক্টর দাশগুপ্ত ও তাঁহার সমশ্রেণী-গণ যে-ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বলিয়া মনে করেন, এবং যাহা শিখিয়া তাঁহারা নিজদিগকে সংস্কৃতজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন, সেই ভাষার অভ্যুদয় হইলে মনুষ্যসমাজের কোন উপকার হওয়া ত' দূরের কথা, তাহাতে যথেষ্ট অপকার সাধিত হইবে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় ঋষির ভাষা প্রকৃত ভাবে জানিতে হইলে যাঁহারা সংস্কারকে ধূলার মুঠার মত দূরে নিক্ষেপ ক[illegible]ত পারেন, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষুর অন্তরালে [illegible]জন্য [illegible]নায় নিমগ্ন হইতে হইবে আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, [illegible] মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি আধুনিক ব্যাকরণগুলি [illegible] বেদাঙ্গান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির [illegible] তাহা [illegible] পণ্ডিতগণ যাহাতে বুঝিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেবতা

…কি করিয়া ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অবসাদ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা মস্তিষ্কের পরিশ্রমে নিবিষ্ট থাকিতে পারা যায়, তাহার গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কেন মানুষের শরীরে ব্যাধি ও অবসাদের উদ্ভব হয়, তাহা না জানিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অবসাদ হইতে মুক্ত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। এই সঙ্গে মানুষ আরও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব কোন্ কোন্ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের মিলনে গঠিত (Anatomy) এবং মানুষের শরীর-বিধানের কার্য্যগুলিই (Physiological operations) বা কি, তাহা স্ব স্ব অবয়বের মধ্যে অনুভব করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলে, মানুষের শরীরে ব্যাধি ও অবসাদের উদ্ভব হয় কেন, তাহা নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। এই বিষয় লইয়া আরও অগ্রসর হইয়া মানুষ বুঝিতে পারিল যে, মানুষের অবয়বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসংখ্য এবং তাহার শরীর-বিধানের কার্য্যও অসংখ্য। ক্রমে ক্রমে তাহার আরও প্রতীতি হইল যে, ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (Anatomical parts) ও শরীর-বিধানের কার্য্য (Physiological operations) আপাতদৃষ্টিতে অসংখ্য বটে, কিন্তু মূলতঃ তাহা কতকগুলি প্রধান প্রধান শরীর-বিধানের কার্য্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং এই শরীর-বিধানের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি (Physiological operations) স্বীয় অবয়বের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিলে, সমগ্র শরীর-বিধানের কার্য্য (Physiolgical operation) ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ Anatomical parts) উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

যে যে প্রধান প্রধান শরীর-বিধানের কার্য্য হইতে সমগ্র শরীর-বিধানের কার্য্য ও সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইতেছে, সেই সেই প্রধান প্রধান শরীর-বিধানের কার্য্য মোট চব্বিশটি এবং তাহাই মানুষের প্রধান প্রধান "দেবতা"।…

ইউরোপে গ্রীষ্মের ছুটি

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ইউরোপে চারটা গ্রীষ্ম কাটিল। এখানে লোকে সারা বৎসর জুলাই-আগষ্ট এই দুই মাস গ্রীষ্মের প্রতীক্ষায় থাকে। ছুটির আনন্দ, বেড়াইবার আমোদ, সব এই সময়ে। প্রথম গ্রীষ্ম আমার কাটিয়াছিল ইতালিতে ঘুরিয়া। দ্বিতীয় গ্রীষ্মে বাতের চিকিৎসার হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলাম লণ্ডনে; তৃতীয় গ্রীষ্মে সাম্‌নে ছিল থিসিস্ লেখা ও পরীক্ষা, তা সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটির দলে যোগ দিয়া একবার জাহাজে করিয়া হামবুর্গ হইতে হেলিগোলাণ্ড দ্বীপে বেড়াইতে যাই, বন্ধুদের মোটরবাইকের পিছনে চড়িয়া বাল্‌টিক সমুদ্রে স্নান করিতে যাই, মোটরবাসে করিয়া সদলে মেঠো জার্ম্মানীর শোভা দেখিতে বাহির হই। তা ছাড়া নৌকা ও বনবিহারও বারকয়েক করিয়াছি। প্রোফেসার মায়ার-বেনফাইরা তাঁহাদের একটি বান্ধবীর মৃত্যুতে হামবুর্গের মাইল কুড়িক দূরে বুকস্‌টেহুডে নামক গ্রামে একটি নূতন ভিলা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন, সেখানেও মধ্যে মধ্যে গিয়া গ্রামের মাঠ ও জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, চাষাদের বাড়ীঘর, জীবনযাত্রা দেখিয়াছি। একদিন ফ্রাউ প্রোফেসারকে বলিলাম, আমি রাত্রে বাহিরে বাগানের কাঠের ঘরটিতে ঘুমাইব। প্রোফেসার আপত্তি করিলেন—ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ করিবে। আমার ইচ্ছাধিক্য দেখিয়া ফ্রাউ প্রোফেসার বাগানের কাঠের ঘরের বেতের চেয়ার-খাটিয়াটিতে খান পাঁচেক কম্বল ও অনেকগুলা বালিশ বিছাইয়া বিছানা করিয়া দিলেন। দিনে গরম হইলেও রাত্রে বাস্তবিক ঠাণ্ডা লাগিল। কিন্তু ভোরে আস-পাশের চাষাদের বাড়ীর হাঁস-মুর্গির ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বড়ই আনন্দ পাইলাম, দেশের কথা মনে পড়িল। অনেক সময় রাত চারটার সময় এলবে নদীর ধারে বন্দরের প্রভাতিক দৃশ্য দেখিতে গিয়াছি। নিস্তব্ধ প্রভাতে নির্জ্জন বৃহৎ বন্দরে নিশ্চল নদীবক্ষে বৃহদাকার বহুসংখ্যক জাহাজগুলি দেখিয়া মনে হইত—নিদ্রামগ্ন দানবদের দেশে আসিয়াছি। নদীর ধারে ঘুরিয়া পাশের একটা জায়গায় রবিবার প্রভাতের হাট দেখিতে যাইতাম। পথে দোকানে কফি খাইয়া হাটে ঘুরিতাম, ছ'টার পর ট্রাম চলিতে আরম্ভ করিলে বাড়ী ফিরিতাম। একদিন রাত দু'টায় বাহির হইয়া তিন বন্ধুতে আল্‌ষ্টার হ্রদের ধারে রাত তিনটায় উপস্থিত হইয়া সূর্য্যোদয় দেখিলাম। কি সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী এখানে গ্রীষ্ম-প্রভাত! রাত আড়াইটা হইতে আকাশ ফর্সা হইয়া পূর্ব্বাকাশে উষার রক্তিমাভা প্রকাশিত হইতে থাকে, ক্ষীণ জ্যোতিঃ পূর্ণ সূর্য্যোদয়ে পরিণত হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। গরমও পড়ে দুই একদিন খুব। একদিন সন্ধ্যা দশটার সময় বেড়াইয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া বাড়ী পৌঁছিলাম, বাথরুমে ঠাণ্ডাজলে গা মুছিয়া মাত্র একখানা পাতলা হাফ্‌প্যাণ্ট পরিয়া খালিগায়ে বাড়ীর ছাতে ইজিচেয়ার পাতিয়া ঘণ্টাখানেক দেশের মত বসিয়া থাকিলাম। বাল্‌টিক সমুদ্রতীরে একবার এক বন্ধুর সঙ্গে ঘোড়ার আস্তাবলে বিচালির বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়া একরাত্রি কাটাইয়াছিলাম।

হাম্বুর্গের কেমিষ্ট ডক্টর দাশগুপ্ত আজকাল ভয়ানক জ্যোতিষচর্চ্চায় লাগিয়া গিয়াছেন, জ্যোতিষের নূতন নূতন গণিতঘটিত গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিতেছেন। ইঁহার সহকর্ম্মী হইয়াছেন একজন জার্ম্মান অ্যামেচার জ্যোতিষী। এ ভদ্রলোক হাম্বুর্গ ছাড়ার আগে আমার কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন, সামনে 'viele kline reise, ফীলে ক্লাইনে রাইজে' অর্থাৎ ছোট ছোট বহু ভ্রমণ! ফলিলও তাই। হাম্বুর্গ হইতে বার্লিন, বার্লিন হইতে প্রাহা, প্রাহা হইতে মোটরে ভিয়েনা হইয়া গেল। তারপর জুলাই হইতে ছুটি আরম্ভ হওয়া মাত্র ও সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি পর্য্যন্ত খালি ঘুরিয়াছি।

পয়লা জুলাই আবার রওনা হইলাম ভিয়েনায়। এবার আর মোটরে নয়, রেলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার রেলভাড়া জার্ম্মানীর চেয়ে সস্তা এবং টুরিষ্ট টিকিট কিনিলে আরও সস্তা পড়ে। তাই এবার বরাবরই সেকেণ্ড ক্লাস।

পারিয়াছি। মধ্যের এক ষ্টেশনে এক সুবেশী দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার কামরায় ঢুকিয়াই কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে অন্য ষ্টেশনে লোকজন কমিয়া গেলে জায়গা বদল করিয়া আমার বেঞ্চে আসিয়া বসিলেন, কিন্তু কথা আরম্ভ করিলেন না। একখানা ইংরেজি বই পড়িতেছিলাম, প্রোফেসার ভিণ্টারনিট্‌স্ দিয়াছিলেন তাঁর লেখা বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধের প্রতিলিপি। খানিক পরে বুড়ো ভদ্রলোকের কথা ভুলিয়া গেলাম, পরে বইখানি বেঞ্চিতে রাখিয়া একটু উঠিয়া গাড়ীর করিডারে ঘুরিয়া আসিলাম। এদেশে প্রায় সব গাড়ীতেই করিডারে ট্রেনের এমুড়া ওমুড়া ঘুরিয়া আসা যায়, বিশেষতঃ দূরগামী এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনে। কামরায় ফিরিয়া সীটে বসিতেই বুড়া ভদ্রলোক ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইংরেজি বলেন?" বুঝিলাম আমার অনুপস্থিতিতে আমার হাতের বইখানি দেখিয়া লইয়াছেন। পরে আলাপ জমিল। বেলা বারটা বাজে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে রেস্তরাঁ কারে একটু আহারে আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি?" আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, পাতিয়ালার মহারাজার সঙ্গে তাঁহার একবার কার্ল্‌সবাডে আলাপ হইয়াছিল। আমাকে বলিলেন, ভিয়েনা হইতে ফিরিয়া যেন অবশ্য অবশ্য একবার তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করি। আমার পকেট-বইএ নাম-ঠিকানা লিখিয়া দিলেন ও কোন্ পথে কি করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া দিলেন। নাম দেখিলাম Count Sternberg, তখন বুঝিতে পারি নাই তাঁর পরিচয়, পরে প্রাহায় ফিরিয়া বন্ধুসমাজে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ভদ্রলোক খুব ধনী ও বনেদি অষ্ট্রিয়ান অভিজাতবংশের লোক। খাইতে খাইতে যোগদর্শন সম্বন্ধে কথা হইল। তাঁহার ছেলেপুলের কথা বলিলেন, একটি ছেলে ভিয়েনায় অ্যাড্‌ভোকেট ও আর একটি হংকংএ থাকে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলে হংকংএ কি করে।

"কিছুই না, এমনি সেখানে সপরিবারে থাকে।"

"বেড়াইতে গিয়াছেন শুধু, না থাকেনই সেখানে?"

"আজ পাঁচ বৎসর আছে সেখানে।"

"কিছু করেন না, তা তাঁর খরচ চলে কি করিয়া?"

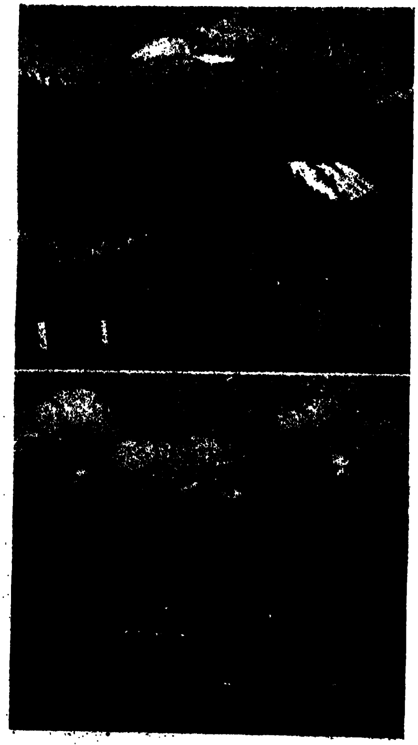
"আমিই মাসে মাসে খরচ পাঠাই।"

পরে জানিয়াছিলাম কাউণ্ট অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক, বাড়ীঘরও ভিয়েনা প্রভৃতি সহরে একাধিক আছে। অনেক দিন লণ্ডনে বাস করিয়াছেন, আমেরিকায়ও ভ্রমণ করিয়াছেন। চেহারা দেখিয়া কাউণ্টকে সংসারের ভোগসুখী বলিয়া যে কেহ বুঝিবে, কিন্তু তিনি চেকদের নিন্দা করিয়া বলিলেন, "ওদের সবাই ক্যাথলিক ধর্ম্ম মানে না, ওরা ধার্ম্মিক নয়, আমরা অষ্ট্রিয়ানরা ধার্ম্মিক, আমরা ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করি।" আরও বলিলেন, "এরা আগে অষ্ট্রিয়ার অধীনে বেশ সুখে ছিল, এদের ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল সব ছিল, এখন এরা স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটেই সুখে নাই।" আমি ভাবিলাম, হ্যাঁ ঠিকই হইয়াছে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ইংরেজ সওদাগরও ভারতীয়দের স্বাধীনতার আন্দোলনকে মহা একটা দুর্ব্বুদ্ধি বলিয়া মনে করে, নতুবা আমরা তো বেশ সুখেই ছিলাম, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ব্যবসাও বেশ সুন্দর চলিতেছিল! কাউণ্টের আর একটা অভ্যাস খাওয়ার সময় দেখিলাম, প্রত্যেক কোর্সের পরে একটা করিয়া সিগারেট-পান। একটা জংসন ষ্টেশনে আমাকে



চেকোশ্লোভাকিয়া: গ্রাম্য নৃত্য।

গাড়ী বদল করিতে হইল, কাউন্ট বার বার বলিয়া দিলেন, যেন তাঁর অতিথি হই। ব্রাটিশ্লাভা Bratislava সহরে আবার গাড়ী বদল করিতে হইল, হাতে এক ঘণ্টা সময় ছিল, সহরটি একটু ট্রাম ও ট্যাক্সি করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম। ইহা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধান তিনটি সহরের একটি। বেশ সুন্দর ছোট সহর, দানিয়ুব নদীর ধারে। ব্রাটিশ্লাভা হইতে সন্ধ্যার সময় ভিয়েনা পৌঁছিয়া ডাঃ সন্তোষ সেন মহাশয়ের বাসায় অতিথি হইলাম। এই বাসায় আরও



চেকোশ্লোভাকিয়া : পার্ব্বত্য দৃশ্য।

একটি উত্তর-ভারতীয় ছাত্র ডাঃ সেনের সঙ্গে একত্র থাকিয়া মেডিকেল পড়েন, নাম গাইড়োলা। ডাঃ সেন ও গাইড়োলা এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের অ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডা। ডাঃ সেনের ছুটি বান্ধবী লণ্ডন হইতে ভিয়েনায় ছুটিতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, পাঞ্জাবের ডাঃ ধরমবীরের দুই মেয়ে। দুই বোনই পঞ্জাবে ডাক্তারি পাশ করিয়া এখন লণ্ডনে পড়িতেছেন। ইঁহাদের মা ইংরেজ।

একখানা জাঁকাল সহর বটে এই ভিয়েনা (স্থানীয় নাম ভীন্ Vien)। দুঃখের বিষয় বাদশাহী আমলের গরিমা ও ঔজ্জ্বল্য এখন আর নাই, তবু এ প্রাচীন কঙ্কালে এখনও অতীতের গৌরব বর্ত্তমান। সে যুগে ইহাই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা, কালচার ও ফ্যাশানের কেন্দ্র। বহু বিস্তীর্ণ এম্পায়ারে আহৃত অর্থ খরচ হইত এখানে এবং কি ছিল তার জাঁক! রাজবাড়ী, পার্লামেণ্ট, রাট্‌ হাউস, অপেরা, থিয়েটার, মিউজিয়াম, বাগান প্রভৃতি কি বৃহতের কল্পনায় কল্পিত হইয়াছিল, কালিদাসের কথা মনে পড়ে—"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন—।" সেকালে গুণীরা এখানে জীবনে একবার অন্তত আসিয়া থাকিতেন, এখানে 'ইন্‌স্‌পিরেশন' সংগ্রহ করিতেন, নাম প্রচার করিতেন; অনেক গির্জ্জার সাম্‌নে ফলক আঁটা—"এখানে অমুক গুণী অর্গ্যান বাজাইতেন," অনেক বাড়ীর গায়ে লেখা—"এখানে অমুক কবি বা লেখক বা চিত্রকর বা বাদ্যকর বাস করিতেন।" আমোদ-প্রমোদের জায়গাও বহু, আর কাফেতে কাফেতে সহর সমাচ্ছন্ন। কাফেগুলির সৌষ্ঠব এখানে যেন রাজবাড়ীর মত। প্রাটের Prater নামে একটা বড় পার্কে সর্ব্বদাই নানারূপ আমোদ-প্রমোদ, নাচ ও মেলার বন্দোবস্ত আছে। অনেক কাফে বাগানের মধ্যে, গরমের দিনে সেখানে বাহিরে বাগানে নাচ হয় বা অর্কেষ্ট্রা বাজে, লোকে বাহিরেই বসিয়া সময় কাটায়। একটা অতি বৃহৎ ও স্তরে স্তরে বহু সীট ঝুলান ইলেকট্রিক নাগরদোলার মত আছে, সেটা বন্ বন্ করিয়া না ঘুরিয়া অতি ধীরে এক ঘণ্টায় একটা চক্রাবর্ত্তন করে, সেটাতে বসিলে নীচু হইতে ক্রমে সু-উচ্চে উঠিয়া সারা সহরের দৃশ্য দেখা যায়। সহরের মধ্যে দিয়া দানিয়ুব নদী, উপরে অনেক ব্রীজ। দানিয়ুব বেশ বড় নদী, উত্তর ইউরোপের নদীর মত সংকীর্ণ নয়। সহরের বাহিরে নদী ও পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই মনোরম, তাহার গায়ে গায়ে পুরাণ প্রাসাদ ও বাগানগুলি "পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ, মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থং" শোভা ধারণ করিয়া আছে। সুবিস্তীর্ণ গম্ভীরদর্শন রাজবাড়ী ও তৎসংলগ্ন সুপ্রশস্ত বাগান ঘিরিয়া সেকালে নগর-প্রাচীর ছিল, তাহার বাহিরে ছিল রাস্তা।

হইয়াছে, বেড়াইবার ও বসিবার সুন্দর জায়গা হইয়াছে। একদিন এখানে বেড়াইতে দেখিলাম একটি মহিলাকে। মনে হইল কোথায় দেখিয়াছি, তারপর মনে পড়িল, ইনি প্রাহা হইতে রেলে আমার কামরায় ঠিক সামনের আসনে বসিয়া আসিতেছিলেন, কাউন্টের সঙ্গে আলাপ যখন হইতেছিল, তাহা শুনিতেছিলেন। দেখিলাম মহিলাও পূর্ব্বদর্শন ভোলেন নাই, চোখে অর্দ্ধ-পরিচয়ের আভাস। ট্রেনে বাক্যবিনিময় হয় নাই, কাজেই পথের মাঝখানে একটু মাথা-নোয়ান অভিবাদন ছাড়া আর কিছু দু'পক্ষেই হইল না। আবার দুদিন পরে আবার দেখি তিনি। এবারে অগ্রসর হইয়া করমর্দ্দন করিলাম, পরিচয়ে জানিলাম, তিনি প্রাহাবাসিনী ও জার্ম্মান থিয়েটারের অভিনেত্রী। বলিলেন, কাউন্টের সঙ্গে আমার আলাপ শুনিতেছিলেন। প্রাহার জার্ম্মান থিয়েটারের অভিনয়-পরিচালকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তাঁর নাম হের মার্লে। মার্লের স্ত্রী মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়ডের ভাইঝি, নাম লেখেন ফ্রয়েড্ মার্লে; ইনি প্রোফেসার মায়ার-বেন্‌ফাইদের বন্ধু ও রবীন্দ্রনাথ যখন জার্ম্মানিতে আসেন, তখন ডক্টর দাশগুপ্তের কাছে "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে" কবিতাটি শিখিয়া সভাসমিতিতে আবৃত্তি করিয়া বাহবা পাইতেন। ইনি খুব খ্যাতিলোভী ও pushing প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের একটি সভায় বন্দোবস্ত না থাকিলেও কাহাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া ইনি মাঝখানে হঠাৎ প্লাটফর্মে অবতীর্ণ হইয়া আবৃত্তি করিয়া ব্যবস্থাপকদের অবাক্ করিয়া দিয়াছিলেন। খুব আত্মীয়তার ঢং করিয়া নিজের স্বার্থোদ্ধারের পথ করায়ও ইঁহার যশ আছে। এঁদের বাড়ীতে প্রথম যেদিন নিমন্ত্রণে যাই, সেদিনই আমার কাছে এখানে ওরিয়েন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হইবে শুনিয়া প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, তিনি "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে" আবৃত্তি করিবেন। আমি বলিলাম ব্যবস্থার ভার তো আমার হাতে নয়, ওরিয়েন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট সরকারী প্রতিষ্ঠান, হয়তো লেস্‌নী ব্যবস্থা করিতে পারেন। বলিলেন, আপনি লেস্‌নীকে বলুন। বলিলাম বলিব, কিন্তু আপনিও বলিলে ভাল হয়, আমি নূতন এখানে আসিয়াছি।" লেস্‌নীর সঙ্গে ইঁহার আলাপ নাই, লেস্‌নী-পত্নীর সঙ্গেও না, কিন্তু চট্ করিয়া প্ল্যান করিয়া' ফেলিলেন যে, লেস্‌নীর শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ তাঁর আছে, শ্বশুরকে দিয়া মেয়েকে, মেয়েকে দিয়া লেস্‌নীকে ধরাইয়া আবৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। ইঁহার রকম-সকম আমার শুনা ছিল বলিয়া লেস্‌নীকে এই প্ল্যানের কথা জানান আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। লেস্‌নী শুনিয়া চটিয়া গেলেন, "আপনি বাঙ্গালী এখানে আছেন, আবৃত্তি করিতে হয় আমরা আপনাকে অনুরোধ



চেকোস্লোভাকিয়া: জল-প্রপাত। সেতু ব্রইগা।

করিব, অন্য লোককে আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই"। পরে আর কিছু শুনি নাই, কিন্তু হাম্বুর্গে গিয়া মায়ার-বেনফাইদের কাছে শুনিলাম ফ্রাউ ফ্রয়েড-মার্লে জানাইয়াছিলেন যে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় তিনি নিজ বন্ধু-মহলে সভা করিয়া উৎসব করিয়াছেন (ময়ূরের নাচটাও অবশ্য বাদ যায় নাই)। যা হোক, ভিয়েনার এই মহিলা

বলিলেন মার্লেদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে। এই মহিলার স্বামিবিচ্ছেদ অর্থাৎ divorce হইয়াছে, তাহাও বলিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় লেস্‌নী একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভিন্টারনিট্‌সেরও প্রবন্ধ পড়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন।* এই উপলক্ষ্যে লেস্‌নী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কাগজে লিখিয়াছিলেন ও রেডিওতেও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ভিয়েনার দ্রষ্টব্য যা কিছু সবই দেখা গেল। এখানকার সংস্কৃতের প্রোফেসার গাইগারের নামে ভিন্টারনিট্‌স্ চিঠি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রোফেসার ছুটিতে বাহিরে গিয়াছেন, দেখা হইল না। অন্য প্রোফেসাররাও কেহই সহরে নাই। মাত্র একজন, অ্যান্‌থ্রপলজির প্রোফেসার হাইনে-গেল্‌ডার্ণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনি ভারতীয় আর্কিয়লজি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ফ্রাউ ডক্টর আনা-জেলিগও একদিন চা খাওয়াইলেন ও অপেরা দেখাইলেন। ইনি শান্তি-নিকেতন ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ১৯৩০ সালে জার্ম্মাণ তরুণ-সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সোশাল ডেমক্রাট পার্টির প্রাধান্যের সময় জার্ম্মানিতে ইহাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল, এখন দেশত্যাগী প্রবাসী। আমেরিকা প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়াছেন ও এখন ভারত সম্বন্ধে একখানি বই লিখিতে-ছেন। একদিন দানিয়ুব নদীতে নৌকাবিহার করিলাম ও সাঁতার কাটিলাম। চন্‌চনে রৌদ্র ও হাওয়া গরম, কিন্তু জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। একটা পাহাড়ের সমান উঁচু বাড়ীর উপর তলায় একটি কাফে আছে, সেখানে রাত্রে বসিয়া নগরীর দীপশোভা চমৎকার উপভোগ করা যায়। থিয়েটারও দেখিলাম, গোয়েটের "ফাউষ্ট" হইল। অপেরা-থিয়েটারে ভিয়েনারই জগৎজোড়া খ্যাতি; অন্যত্রও দেখিয়াছি অনেক, কিন্তু এইবার মনে হইল, আর কোথায়ও অপেরা-থিয়েটার না দেখিলে আপশোষ করার কিছু থাকিবে না, যে ভিয়েনার শ্রেষ্ঠতা সবাই অনুকরণ করে, সেটাই দেখা হইয়া গেল। আর একটা সুন্দর জিনিষ দেখিলাম, রাজবাড়ীর ক্ষুদ্র চ্যাপেলে রবিবার সকালের উপাসনা। রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার উপাসনার সৌষ্ঠব ও গাম্ভীর্য্য ইতালিতে রোমের সেণ্ট পিটার হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীগ্রামের ছোট গির্জ্জাতে খুব দেখিয়াছি। কিন্তু ভিয়েনা রাজচ্যাপেলের বিশেষত্ব এই যে, এখানকার গীত-বালকগুলি সারা অষ্ট্রিয়ার সুকণ্ঠ বালকদের মধ্যে বাছাই করাও শ্রেষ্ঠ। মিউজিয়মগুলিতে আর্টের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অনেক দেখা যায়, কিন্তু রাজবাড়ীর মিউজিয়মে অষ্ট্রিয়ার এম্পারারদের ব্যবহৃত জিনিষপত্র পোষাক-পরিচ্ছদও দেখা গেল।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনায় বাস করিয়া এখানে একটি ছোটখাট ভারতহিতৈষী দলের সৃষ্টি করিয়া গিয়া-ছেন। 'হের বোজে'কে (Bose) অনেকেই জানে। একটি ফটোর দোকানে দেখিলাম তাঁহার বড় একখানা ছবি, নীচে লেখা indischer gelehrte ইণ্ডিশের গেলেহের্‌ট, অর্থাৎ ভারতীয় পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় প্রাহাতে আসিলে আমরা কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলাম; নূতন রিফর্মে বাংলাদেশে তাঁহার ফিনান্স-মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া লেস্‌নী তাঁহাকে মিনিষ্টার বলিয়া পরিচয় দিতেন, কিন্তু সরকার মহাশয় যখন এখানকার Export Institute-এ দেখা করিতে আসিলেন, তখন লোকে বলিল, ভারতীয় পণ্ডিত আসিয়াছেন! ভারত সম্পর্কে মেয়র-মিনিষ্টারের চেয়ে পণ্ডিতেই এদের বেশী রুচি। অষ্ট্রিয়ায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মুরুব্বিয়ানাটা ইদানীং খুব বেশী হইয়াছে, তাই অফিশিয়াল সমাজে সুভাষ বাবু তেমন কিছু কাজ বেশী করিতে পারিয়াছেন মনে হইল না। বিদুষী বুড়ীদের অনেকে তাঁর খুব গুণগ্রাহী দেখিলাম; সুভাষ বাবুর মত যোগ্য ও চরিত্রবান লোক এদেশে বাস করিলে ভারতীয় অ্যাম্ব্যাসাডরের কাজ করিতে পারেন। তাঁহার নামের পিছনে যদি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বের সরকারি ছাপ থাকিত, তাহা হইলে আরও বেশী সুফল হইত। সুভাষ বাবুর সংস্পর্শে যেই আসিয়াছে, সেই তাঁহার মেধা ও চরিত্রে মোহিত হইয়াছে। বিখ্যাত লোকদের সঙ্গেও তিনি মেলামেশা করিয়াছেন অনেক, কিন্তু আরও স্থায়ী ফল হইত, আমার মনে হয়, যদি তাঁহার মত লোক কংগ্রেসের তকমা আঁটিয়া কংগ্রেসের ফার্মান হাতে লইয়া এদেশে

* গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে ভিন্টারনিট্‌সের মৃত্যু হইয়াছে।—বঃ সঃ।

কাজ করিতে পারিতেন। ব্যক্তিবিশেষের হিতেচ্ছালাভ খুব ভাল কাজ, তাহার চেয়েও বেশী ফল হিতৈষী দল সৃষ্টিতে এবং এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের কাজ প্রচার করায়। এটি কংগ্রেসের নাম ও বল পিছনে না থাকিলে হয় না। চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্ত্তা প্রোফেসার মাসারিক বিদেশে প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা দেশের স্বাধীনতার পথ বার আনা উন্মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের কংগ্রেস কেন এখনও একথা বুঝিলেন না, জানি না।

প্রোফেসার হাইনে-গেলডার্ণ বলিলেন, একটি ভারত-হিতৈষী মহিলা আমার ভিয়েনা আসার সংবাদ পাইয়াছেন ও আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান। টেলিফোনে মহিলার সঙ্গে আলাপ হইলে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন। ইনি "গান্ধী ও লেনিন" প্রভৃতি বইএর লেখক ফ্যুলপ্-মিলারের স্ত্রী। সম্প্রতি লণ্ডন হইতে ঘুরিয়া আসিতেছেন, সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে ঝাল দিয়া ভারতীয় রান্না শিখিয়াছেন। ভাত, খুব ঝাল ডাল ও ভারতীয় ভাবে রাঁধা মাংস প্রভৃতি খাওয়াইলেন। ইনি জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান, সে দেশেও ঝালের খুব প্রচলন। ইঁহার বসিবার ঘরে সুভাষ বাবু ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের ছবি। দিলীপ বাবুর সঙ্গে ইঁহার খুব সৌহার্দ্দ্য ও তাঁহাকে ইনি উচ্চাঙ্গের কবি মনে করেন। ইনি শীঘ্রই ভারতে যাইবেন,* ইচ্ছা, পণ্ডিচেরি বা ঐ রকম কোন একটা আশ্রমে জীবন কাটাইবেন। ড্রয়িংরুমে বসিয়া তীক্ষ্ণ হাঙ্গেরিয়ান লিকার আস্বাদ করিতে করিতে গ্রামোফোনে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটি শুনাইলেন। ইঁহার ঘরের দিলীপ বাবুর ফটোটি সাধুবেশী। ইনি সুভাষ বাবুর গুণগ্রাহী। আরও কয়েকটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। ইঁহাদের একজন মহিলা এখানকার থিয়েটার ডিরেক্টারের স্ত্রী, অতি সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতবুদ্ধি মহিলা। রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে কথা উঠিল; এ বিষয়ে পড়াশুনা বেশ করিয়াছেন, বলিলেন, ও শিক্ষা খুব উচ্চ হইতে পারে, কিন্তু সংসারকে অস্বীকার করিয়া ভাবসমাধিতে জীবন কাটাইয়া দিতে আমরা পারিব না। ইনি সুইট্জারল্যাণ্ডের ভারত-হিতৈষিণী শ্রীমতী হোরুপের কাগজে সুভাষবাবুর ভ্রাতৃগৃহে অবরোধ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, সেই অবরোধের স্বরূপটি ঠিক কি, সে সম্বন্ধে খবরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিয়েনার একটি ধনী ব্যবসায়ী সুভাষবাবুর খুব পক্ষপাতী হইয়া এখানে ভারতীয় সমিতি একটা স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতে তাহার বিজ্ঞাপনও প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শনের উপরও তাঁর ঝোঁক আছে শুনিয়াছিলাম। প্রথম



চেকোশ্লোভাকিয়া : গ্রাম্য রমণী।

বার ভিয়েনা আসিয়াই তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। যে কয়দিন ছিলাম তার মধ্যে উত্তর পাই নাই। প্রাহা ফিরিলে এক চিঠি পাইলাম। খুব সবিনয়ে ("হের্ প্রোফেসোর" ইত্যাদি সম্বোধনযুক্ত) যে, ডাকের গোলমালে আমার চিঠি দেরীতে পাইয়াছেন, বড়ই দুঃখিত আমার সঙ্গে দেখা হইল না, ডাকের নামে অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে করিয়াছেন, পরের বার ভিয়েনা আসিবার

* সম্প্রতি ইনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন।—বং সঃ।

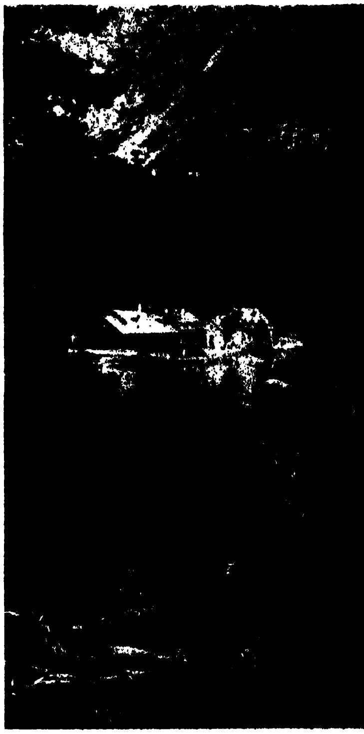
আগে নিশ্চয় যেন জানাই, ইত্যাদি, আর তার সঙ্গে তাঁর স্থাপিত ভারতীয় সমিতির একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র। এবার আসিবার বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে বার-তারিখাদি জানাইয়া চিঠি লিখিলাম। কোনও জবাব নাই। ভিয়েনায় আসিয়া ভারতীয় ছেলেদের কাছে খবর শুনিলাম, ভদ্রলোক দর্শন ও সুভাষবাবু প্রভৃতির সাহায্যে ভারতে ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে মনে করিয়াছিলেন, তাহা ততদূর না হওয়ায় তাঁহার ভারতপ্রীতি কমিয়া গিয়াছে, উপরন্তু ইদানীং একটা ব্যবসা ফেল হওয়ায় অর্থনাশও হইয়াছে, এবং সুভাষবাবুর ভিয়েনা ত্যাগের পর ইনি ভারতের জন্য আর দুর্ভাবনা করেন না। ভারতের ছাত্রদের সমিতিতে শুনিলাম, ইনি মোড়লী করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহারা পাত্তা দেয় নাই বলিয়া চটিয়া গিয়াছেন। ব্যাপার শুনিয়া আমার আলাপ করিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠিল, কারণ, সর্ব্বত্রই ভারতসম্পর্কীয় সাধু-পাজী দুইয়েরই খাঁটি স্বরূপটি আমি জানিয়া রাখিবার প্রয়াস করি। ভিয়েনার একটি নামজাদা ভারতীয় জুয়াচোরকেও প্রথমবারেই চিঠি লিখিয়া আমার হোটেলে আনাইয়াছিলাম, অনেক মিথ্যা কথা শুনিলাম, ধাপ্পাবাজির টেক্‌নিকটা বুঝিয়া লইলাম, লোকটিকেও দেখিয়া রাখা হইল, আমারও কাজ ফুরাইল, কিন্তু সে সব কথা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—"স্মারং স্মারং স্বগৃহ-চরিতং" বিরক্তি ধরে। যা হ'ক, অষ্ট্রিয়ান ব্যবসায়ীকে ধরিবই ঠিক করিয়া তাঁর আপিসে ফোন করিলাম, উত্তর পাইলাম, দিন কতক একটা কাঁধের ব্যথায় তিনি আপিসে আসেন নাই, হয় ত কাল আসিতে পারেন, আমি আর একবার যেন ফোন করি। আমার চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপিস বলিল, তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আমি ভিয়েনার ঠিকানা দিয়া সেখানে উত্তর দিতে চিঠিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, চিঠি প্রাহাতে পাঠান হইয়াছে। উত্তরে ভদ্রলোক কি লিখিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, সে খবর ঠিক বলিতে পারে না। দিন তিন-চার চুপ করিয়া থাকিলাম, ইতিমধ্যে এক চিঠি প্রাহা হইতে ঘুরিয়া আসিল, ভদ্রলোক সংক্ষেপে লিখিতে-ছেন, শারীরিক অসুস্থতায় তিনি ঠিক ঐ সময়টিতে ভিয়েনার বাহিরে যাইতেছেন। হঠাৎ একদিন বিনা ফোনে তাঁর আপিসে চড়াও হইলাম, কেরাণী বলিল, তিনি নাই। আমি আমার কাজ জানাইলে কেরাণী তাঁর সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, দেরি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সেক্রেটারি বড়ই ব্যস্ত আছেন, তিনিই আমার কাজের শর্টহ্যাণ্ড নোট লইবেন ও কর্ত্তাকে জানাইবেন। নোট দিয়া কর্ত্তার ভারতহিত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সুস্থচিত্তে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মায়ার-বেনফাইদের আর একটি বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাইলাম, নাম লিসাওয়ার, কবি ও লেখক, ভারত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না।

ভিয়েনার লোকগুলি বড় ভাল, বড়ই খোসমেজাজী, আমোদ-প্রিয় ও কথায় ব্যবহারে বড়ই ভদ্র। নিতান্তই 'কন্টিনেণ্টাল', বড়ই অবৃটিশ, তাই অল্পই নির্ভরযোগ্য।

ভিয়েনার পালা এবারকার মত সাঙ্গ করিয়া প্রাহার উপর দিয়া আসিলাম উত্তর-বোহেমিয়ার (চেকোশ্লো-ভাকিয়া চারটি প্রদেশে বিভক্ত, পশ্চিমে বোহেমিয়া, মধ্যে মোরাভিয়া, তার পূর্ব্বে শ্লোভাকিয়া, একেবারে পূর্ব্বে কার্পাথীয়ান রাশিয়া।) একটি ছোট জায়গায়, জার্ম্মান সীমান্তের কাছে একটি হ্রদ-সমন্বিত গ্রীষ্ম-বিলাসের জায়গা। জায়গাটির জার্ম্মান নাম ভার্টেনবের্গ Wartenberg, চেক নাম ষ্ট্রাজ পোদ রাল্‌স্কেম্‌ Staz pod Ralskem। চেকোশ্লোভাকিয়ার সব জায়গারই দুটি করিয়া নাম, একটি স্থানীয় ও একটা জার্ম্মান। অনেক সময়ে নাম দুটি একই, ভাষাভেদে উচ্চারণ ও বানানটি একটু বিভিন্ন, যেমন জার্ম্মান Pilsen চেক Plzen, জার্ম্মান Prag চেক Praha, কিন্তু অনেক নাম আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভার্টেনবের্গের পাশেই একটা বড় ফ্যাশানেবল গ্রীষ্মাবাস, নাহ বাড হামার Bad Hammer। ভার্টেন-বার্গ একটি হ্রদের ধারে ছোট জায়গা, লোক অধিকাংশই জার্ম্মান। প্রেফেসার লেস্‌নী এবার এখানে গ্রীষ্মযাপন করিলেন ও তাঁহার অতিথি হইয়া কিছু দিন এখানে থাকার জন্য মাস দুয়েক আগে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। লেস্‌নীর ছেলে ইভান ডাক্তারি পড়ে, একটা ডেনিশ জাহাজে সহকারী ডাক্তারের কাজ পাইয়া ছুটিতে বাহির হইয়া পড়িল সিঙাপুর ব্যাংকক্‌ পর্য্যন্ত পাড়ি দিতে। তাহাকে বিদায় করিয়াই লেস্‌নী-দম্পতি ভার্টেন-

বার্গে গিয়াছিলেন, আমি ভিয়েনা হইতে গিয়া যোগ দিলাম। প্রাহা ষ্টেশনে পৌছিয়াই ভার্টেনবার্গের গাড়ীর খবর লইয়া সেখানে পৌছার সময় জানাইয়া লেস্‌নীকে টেলিগ্রাম করিলাম। টেলিগ্রাম পৌছিতে দুঘণ্টা লাগিবে, ট্রেন পৌছিতে চার ঘণ্টা, মাঝে দু' জায়গায় বদল করিতে হইল।

উত্তর বোহেমিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সুন্দর। খানিকটা পথ যাইতে হইল মোটর-রেলে, বাঁ পাশে পাহাড়, ডান পাশে বরাবর নদী, কি চমৎকার! জানিতাম ষ্টেশন হইতে ভার্টেনবার্গ প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ, বাস্ চলে। ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিলাম বাস নাই, একখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। সেদিকে যাইতেই ড্রাইভার আসিয়া আমার ব্যাগ হাতে লইল, ভাবিয়াছিলাম ট্যাক্সি, লেস্‌নীর হোটেলের নাম বলিলাম, ড্রাইভার বলিল "হাঁ, প্রোফেসর আমাকে সবই বলিয়া দিয়াছেন।" রংএর জোরে অতিথি চিনিতে ড্রাইভারকে একটুও ভাবিতে হয় নাই। হোটেলটি একটি পুরাতন ব্যারণের ক্যাস্‌ল্, পাহাড়ের মাথায় চকমিলান দু'তলা বাড়ী। ঠিক লাঞ্চের সময়ে উপস্থিত হওয়া গেল। ঘরে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া পোষাক বদলাইয়া ডাইনিং-হলএ গিয়া দেখিলাম অনেক অতিথি, লেস্‌নীরা একটা লম্বা টেবিল অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদের দলে এই এই লোক ছিলেন—লেস্‌নী-দম্পতী, লেস্‌নীর বুড়া শ্বশুর-শাশুড়ী (শ্বশুর মহাশয় প্রাহা চেক ইউনিভার্সিটির জার্ম্মান-সাহিত্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক), লাম্পার-দম্পতি (ডক্টর লাম্পার প্রাহার একজন প্রথম শ্রেণীর অ্যাডভোকেট, বাড়ীতে যে সব তৈলচিত্র আছে, তার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা), ক্লাপ-দম্পতি (পান্ ক্লাপ —"পান্" মানে চেক ভাষায় মিষ্টার—একটি ডেন্টিষ্টদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম নির্ম্মাণের কারখানার মালিক), ইঁহাদের ছেলে ভিক্টর (ল' পড়ে, লেস্‌নীর ছেলে ইভানের বন্ধু), লাম্পার দম্পতির দুটি মেয়ে, ডোডিয়া (২০, ভিক্টরের বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী) ও মেলানি ১৮, স্কুলে পড়ে, ইভানের প্রণয়িনী, এখনও বাগ্দান হয় নাই), এবং আর একটি মেয়ে লিবা (১৬, মেলানির সহপাঠী, ব্যাঙ্ক-ডিরেক্টারের কন্যা, প্রোষিতভর্তৃকা, মেলানি সঙ্গিনীরূপে ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, আগে ডোডিয়া-মেলানি দুই বোনে খুব মাখামাখি ছিল, কিন্তু প্রণয়ী পাওয়ার পর এখন ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া চলাফেরা করে, উপরন্তু ডোডিয়ার ভিক্টর সঙ্গে আছে, মেলানি বেচারার ইভান জাহাজে)। ভারতীয় জার্ণালিষ্ট মিঃ নাম্বিয়ারও যোগ দিয়াছিলেন এখানে দিনকয়েকের জন্য। তিনি গত বৎসর গ্রীষ্মে আর একটা জায়গায় লেস্‌নী-দের সঙ্গে কিছুদিন কাটাইয়াছিলেন, অনেক রঙ্গরসের



চেকোশ্লোভাকিয়া: হ্রদ, পর্ব্বত, উপবন (তুষারাচ্ছন্ন)

সঙ্গে ইভান-ভিক্টরের প্রণয়-ইতিহাস বর্ণনা করিলেন— "সেবার লেস্‌নী ও ক্লাপ পরিবার সেখানে গিয়াছিলেন, লাম্পার পরিবার ইঁহাদের অপরিচিত ছিলেন, দৈবাৎ সেখানে আসেন। দিনকতক একত্র বসবাসের পরই ইভান-ভিক্টর দুই বন্ধুর ভাবান্তর দেখা দিল, ডোডিয়া-মেলানি ভগ্নীদ্বয় নির্ব্বিকার থাকিলেন না। প্রবীণরা বুঝিলেন ব্যাপারটা ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু সকলেই

নিপয়েক্ষ অজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকিতেন, একা অনেষ্ট প্রোফেসারই তরুণ-তরুণীদের mutual and all-round devastationএর ভাব দেখিয়া গোপন হাস্ত সংবরণ করিতে পারিতেন না।" মিঃ নাম্বিয়ার সুরসিক লোক, wit anecdote এর অফুরন্ত ভাণ্ডার, তাঁহার গল্প শুনিয়া আমি মধ্যে মধ্যে মন্তব্য করি, "গল্পটা সত্যই, না বানাইয়াছেন ?" ফলে গল্পের আরম্ভে আমার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখিলেই সোৎসাহে সাবধান করিয়া দেন "No, I am not joking !"

দিন কতক এখানে বেশ কাটিল। ছোট সহরের বাহিরেই খোলামেলা জায়গা, অল্পদুরেই বন ও পাহাড়। আমাদের পাহাড়ের পাশের পাহাড়ের মাথায় একটা পার্ক, এই পাহাড়ের নীচেই মস্ত বড় লেক। লেকের ধারে বাগান, স্নানের পর কাপড় ছাড়িবার ঘর। একপাশে বন, আর এক পাশে পিচবাঁধান রাস্তা মাঠের মধ্য দিয়া বাড্ হামারের দিকে গিয়াছে। লেকের সামনেই একটা কাফে, পাহাড়ে বেড়াইতে এখানে দার্জ্জিলিংএর মত লাগে, আর পাহাড়ের উপর হোটেলের ঘরের জানালা দিয়া নীচের উপত্যকা ও সমতলভূমির হরিৎ শস্যক্ষেত্র ও শেষ-প্রান্তে পাহাড় দেখিয়া রাঁচীর কথা মনে হয়। কাজ এখানে পুরুষদের খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ সাঁতার ভ্রমণ প্রভৃতির দ্বারা 'মোটা কমান' ও রৌদ্রে রংটা পুড়াইয়া একটু ময়লা করা। মেয়েরা প্রথমটার সাধনা সম্বৎসর ধরিয়াই করিয়া থাকেন বলিয়া যত ঝোঁক পড়িয়াছে শেষটার উপর। সকালে যথাসম্ভব দেরি করিয়া উঠিয়া ব্রেকফাষ্ট ও ডাকের প্রতীক্ষা। ডাকের একটু দেরি হইলেই বুড়া প্রোফেসর ক্রাইজ (লেসনীর শ্বশুর) ছুটিতেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া ডাকঘরের দিকে। ডাক আসিলে খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র লইয়া কিছুক্ষণ কাটিত। ইভানের চিঠি লইয়া লেসনী-পত্নী একখানা ম্যাপ লইয়া বসিয়া যাইতেন ছেলে জাহাজ হইতে যে ল্যাটিচুড্ লঙ্গিচুড্ দিয়া চিঠি লিখিয়াছে, সেটা ঠিক কোন জায়গায়। মেলানি তার মোটা খামখানি লইয়া কোনে যাইয়া ইভানের চিঠি দ্রুত পড়িয়া ফেলিত, পরে "প্রিয়তমে" প্রভৃতি পাঠ যে জায়গাটায় থাকে, চিঠির ঠিক সে জায়গাটা সকলে দেখিতে পায় এমন ভাবে চিঠিটি মুড়িয়া, ফিরিয়া দলে আসিয়া যোগ দিত। ব্রেকফাষ্ট সাঙ্গ হইলে কেহ পাহাড়ে যাইতেন, পুরুষরা খালি গায়ে হাফপ্যাণ্ট পরিয়া টেনিসে লাগিয়া যাইতেন, রৌদ্র থাকিলে লেকে স্নানে চলিতেন। মেয়েরা একটু ডুব দিয়াই রোদে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, পুরুষরা খানিকটা ভুঁড়ি কমিয়াছে মনে না হওয়া পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিতেন। একটার সময় লাঞ্চ। মেয়েরা স্বতঃই কম খায়, পুরুষদেরও চর্ব্বি কমাইবার দিকে যেরূপ দৃষ্টি, এসব দেখিয়া হিতেচ্ছু ও সুব্যবসায়ী হোটেলের মালিক আহার্য্যের বাহুল্য সাবধানে বর্জ্জন করিত। গৃহিণীরা নিজেদের খরচে ঘরে স্যালাড বানাইয়া টেবিলে আনিতেন, তাঁদের এটাই প্রধান খাদ্য, কারণ চর্ব্বি জমায় না।

টেবিলে অন্য সকলকেও তাঁহারা ইহা বিলাইতেন। তা ছাড়া ডেসার্টের মিষ্ট কোর্সটা অনেকেই চর্ব্বি জমিবার ভয়ে বর্জ্জন করিত, ইহাতে যারা চর্ব্বিভীতু নয়, তাদের ভাগ বাড়িত। খাওয়ার পর সকলে ছোট ছোট দলে ঘণ্টা দেড়েক তাস খেলিয়া আবার পূর্ব্বাহ্নের মত চর্ব্বি কমান ও রং পুড়াইতে ছুটিতেন। যেদিন রোদ থাকিত, সেদিন তাস খেলাটাও রোদে চেয়ার-টেবিল টানিয়া হইত। বৈকালে পাঁচটার সময় লেকের কাফেতে চা-কফি পান হইত ও সেখানে সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া পরে একটু সহরে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় সাতটার সময় ডিনার। ডিনারের পর আবার তাস-গল্প রাত এগার-বার পর্য্যন্ত চলিত। টেবিলে কথাবার্ত্তার নেত্রী ছিলেন লেস্‌নী-পত্নী, অতি বুদ্ধিমতী, সহৃদয়া ভদ্রমহিলা, অবিশ্রাম হাস্য পরিহাস করিতেছেন, কিন্তু সদা দৃষ্টি আছে, কার কি প্রয়োজন। লাম্পার-পত্নী অতি মৃদুস্বভাব ও মুখে কথা প্রায় নাই-ই, যেন বাঙ্গালী গৃহ-লক্ষ্মী। ক্লাপ-পত্নীও অতি সহৃদয়া, সবাইকে সেবা করিবার দিকে আগ্রহ, সবার আরামে যত্নবতী। প্রোফেসার ক্রাউজ ও তাঁহার পত্নী বুড়াবুড়ী সর্ব্বদা মেয়ের সঙ্গে নানা তর্ক হাসিঠাট্টা করিতেন। পুরুষদের মধ্যে ক্লাপ খুব রসিক ও স্বল্পভাষী লোক, লেস্‌নী বাড়ীতে ও পত্নীর সামনে খুব নরম হইয়া থাকেন, নতুবা ইনি মহা আমুদে ও বাচাল লোক। ডক্টর লাম্পারের চেহারাটা অনেকটা দেশবন্ধু মহাশয়ের মত, ব্যবসায়ে যশস্বী বলিয়া ভারি আমুদে ও তার্কিক, কাহাকেও মানেন না। মধ্যে মধ্যে লেস্‌নীর সঙ্গে তর্কে লাগিয়া যাইতেন, প্রোফেসার যত ধীর যুক্তি প্রয়োগ করিতেন, অ্যাডভোকেট তত বেশী তেজের সঙ্গে প্রতিবাদ করিতেন, অবশেষে লেস্‌নী চুপ করিয়া যাইতেন। খেলাধূলা, সাঁতার প্রভৃতি চর্ব্বি কমাইবার আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লেস্‌নী। [ক্রমশঃ

চতুষ্পাঠী

মাটির বাসনের ইতিহাস

ঃ 'পোর্সেলেন'-এর বিচিত্র কাহিনী

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

গ্রামে কুমোরকে চাকী ঘুরিয়ে অপরূপ কৌশলে মাটির নানারকম বাসন তৈরী করতে বোধ হয় সকলেই দেখেছে। মাটির তালকে কুমোরের আঙুলের টিপে, হাতের চাপে দেখতে দেখতে সুন্দর বাসন হয়ে উঠতে দেখলে সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে। ছেলেবেলায় কুমোরকে কার না যাদুকর বলে মনে হয়েছে!

কুমোরের এ যাদু-বিদ্যা কিন্তু অনেক দিনের। কুমোরের চাকী লিখিত ইতিহাসের বহু আগে থেকেই সমানে ঘুরে আসছে। লোহা দূরের কথা, মানুষ যখন কোন ধাতুরই ব্যবহার জানত না, পাথর থেকে যখন সে অস্ত্র তৈরী করত, তখনও মাটির বাসন গড়বার বিদ্যা তার আয়ত্ত ছিল। সভ্যতার অলিখিত প্রাচীন ইতিহাস বৈজ্ঞানিকেরা পুরাকালের এই সব মাটির বাসন থেকেই অনেকখানি উদ্ধার করেছেন। সেই আদিম যুগে মানুষ যেখানে যেখানে বাসা বেঁধেছিল, সেখানে সেখানে তারা যেসব ভাঙা মাটির বাসন ফেলে গিয়েছে, সেই গুলিই তাদের জীবনের সাক্ষী হয়ে আছে।

কেমন করে মাটি থেকে বাসন করবার কল্পনা মানুষের মনে প্রথম উদয় হয়েছিল কে জানে! হয়ত নরম ভিজে কাদায় হাঁটবার সময় তার ওপর পায়ের দাগ পড়তে দেখে মানুষ প্রথম এ সম্ভাবনার কথা জানতে পারে।

এ বিষয়ে অবশ্য নানা দেশে নানা রকম গল্প আছে। চীনাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুমোর বলা যায়। সব চেয়ে সুন্দর মাটির বাসন পৃথিবীতে সবার আগে তারাই তৈরী করেছে। তাদের পুরাণে বলে, খৃষ্ট জন্মাবার প্রায় তিন হাজার বছর আগে হোয়াংসি নামে তাদের এক সম্রাট এই কুম্ভকারের বিদ্যা আরম্ভ করে দেশের লোকেদের শেখান। দেশের লোক কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে মৃত্তিকার যাদুকর বলে পূজা করে। দেবতারাও না কি সম্রাটের কাজে এত খুসী হয়েছিলেন যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিয়ে হোয়াংসিকে তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সিংহাসন থেকে স্বর্গে তুলে নিয়ে যান।



প্রাচীন চীনের বাসনের কারুকার্য্য।

প্রাচীন মিশরের পুরাণে আবার বলে যে, মিশরের দেবাধিদেব 'প্তা' নীল নদের মাটি থেকে প্রথম মানুষ তৈরী করে কুম্ভকারের বিদ্যায় তাঁর কেরামতি দেখান। গ্রীসের পুরাণে আছে যে, দেবতা জিউসের ছেলে ডাইওনিসস্ ক্রীটের রাজা মাইনসের মেয়ে আরিয়াদ্নিকে বিয়ে করেন। তাঁদের প্রথম ছেলে কেরামনই পৃথিবীর প্রধান কুম্ভকার।

মাটি থেকে বাসন গড়তে মানুষ যে বহু প্রাচীন যুগেই শিখেছিল, এই পুরাণ-কাহিনীগুলি তার প্রমাণ। বিভিন্ন দেশে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই এ বিদ্যার নানাদিকে উন্নতি

হয়ে আসছে। তার মধ্যে আবার চীন সকলকে ছাড়িয়ে গেছে সবার আগে।

সাধারণ মাটির বাসন আর চীনেমাটির বাসনের তফাৎ আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। 'চীনেমাটির বাসন' নামটিতেই চীনাদের এ বিদ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চীনেমাটির বাসনের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, সেই 'পোর্সেলেন' তৈরী করার পদ্ধতি চীন দেশেই আবিষ্কৃত হয়। সাধারণ মাটির বাসন মোটা হয়, তার ভিতর দিয়ে আলো যায় না, জল



প্রাচীন ক্রীটের সৌখীন বাসন-কোসন : উপরেরটি মাইসিনীয়। নীচের তিনটি ক্রীটের ; 'ধূপাধার' হিসাবে পূজার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত। কারুকার্য্য দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি তরল জিনিষ তা শুষে নেয়। মাটির বাসনের উপর কাঁচের মত চকচকে পালিশ লাগিয়ে অনেক দেশে তার এই শোষণ করবার ক্ষমতা নষ্ট করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এ দেশের চুণারের বাসন এই দিক্ দিয়ে চমৎকার ও সুদৃশ্য। কিন্তু 'পোর্সেলেনের' সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মাটির মধ্যে কি কোমল সৌন্দর্য্য যে লুকিয়ে থাকতে পারে, ভাল 'পোর্সে-লেন' না দেখলে তা ধারণাই করা যায় না।

চীন দেশে 'পোর্সেলেন' তৈরী করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় প্রায় দু' হাজার বছর আগে। ১০০০ খৃষ্টাব্দে চীনা বণিকদের এশিয়ার নানা যায়গায় পোর্সেলেন বিক্রী করে বেড়াতে দেখা যায়। ইউরোপে প্রথম 'পোর্সেলেন' পৌছায় ১১০০ খৃষ্টাব্দে। ক্রুজেডে যে সমস্ত ইউরোপীয় সৈনিক গিয়েছিল, তারা তুর্কী, আরবীয়, পারসীক প্রভৃতি জাতির লোকের কাছ থেকে কিছু কিছু 'পোর্সেলেনের' জিনিষ কিনে দেশে নিয়ে যায়। 'পোর্সেলেন' তখন অসভ্য ইউরোপের কাছে এমন আশ্চর্য্য জিনিষ ছিল যে সোণায় ওজন করেও তার দাম দিতে তারা প্রস্তুত ছিল।

ইউরোপের কুমোরেরা 'পোর্সেলেন' দেখে একেবারে অবাক্। মাটির বাসন যে এমন পাৎলা আর এমন সুন্দর হতে পারে, এ ধারণাই তাদের ছিল না। সাধারণ মাটির জিনিষের মধ্য দিয়ে আলো দেখা যায় না। 'পোর্সেলেন'-এর মসৃণতাই তাই তাদের সব চেয়ে বিস্মিত করে।

১১০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ 'পোর্সেলেন'-এর প্রথম পরিচয় পেলেও ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ বাসন প্রস্তুতের রহস্য তাদের অজ্ঞাত ছিল।

১২৮০ খৃষ্টাব্দে এক ইতালীয়ান পর্য্যটক কিংটেচীন সহরে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত 'পোর্সেলেনের কারখানা দেখেন। তারও সাত শ' বছর আগে সে কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মার্কো পোলো 'পোর্সেলেন' কি করে তৈরী হয় জানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চীনারা এ গোপন বিদ্যা অত সহজে কাউকে শেখাতে রাজী হবে কেন? তারা নানা জনে তাঁকে নানা রকম ভুল খবর দিয়ে এক রকম পরিহাসই করেছিল। একটি খবর তার মধ্যে ভারী মজার—মার্কো পোলো এক-জনের কাছে শোনেন যে, এক শ' বছর মাটির ভিতর ডিম পুঁতে রেখে তাই দিয়ে পোর্সেলেন তৈরী করা হয়।

মার্কো পোলো সকল রকম খবরই টুকে রেখে দিয়ে-ছিলেন তাঁর খাতায়। ইউরোপের কুমোরেরা তখন 'পোর্সে-লেন' তৈরী করবার জন্যে সব কিছুই করতে প্রস্তুত। চীন থেকে যত আজগুবি খবর আসুক না কেন, তারা তখন সব কিছুই সরল মনে বিশ্বাস করে তাই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু সফল তারা কিছুতেই যে হয় নি, তা বোধ হয় বলার দরকার নেই।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে জোহান ফ্রেডরিক বুটগের নামে একজন জার্মানই প্রথম 'পোর্সেলেনের রহস্য উদ্ধার করে আনেন।

সেই বৎসরই ইউরোপে প্রথম সত্যিকার 'পোর্সেলেন' তৈরী হয়।

তার কয়েক বৎসর আগে পেয়ার দন্ত্রেকল নামে একজন ফরাসী মিশনারী চীন থেকে 'পোর্সেলেন' তৈরীর জন্ত ব্যবহৃত দু'রকম মাটির নমুনা দেশে পাঠান। কিন্তু এই মাটি যে কি জাতের, দু'রকম মাটিই বা কেন লাগে, কোথায়ই বা সে মাটি পাওয়া যায়, সে সব কিছুই তিনি জানান নি। তাঁর পাঠান এক রকম মাটির তিনি নাম দেন 'কেয়োলিন'। কেয়োলিন মানে হল উঁচু পাহাড়। উঁচু পাহাড় থেকে পাওয়া যায় বলেই তার নাম এ রকম দেওয়া হয়। আর একটি মাটি কিংটেচীনের কুম্ভকারদের সরবরাহ করার একচেটিয়া অধিকার পাঁচটি পরিবারের মধ্যে ভাগ করা ছিল। সে মাটির নাম দেওয়া হয় 'পিতুন্‌ত্‌সি'। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা কোয়েলিন ও 'পিতুন্‌তসি'র আসল পরিচয় জেনেছেন। এ দু'টি মাটি খুব বেশী উত্তাপে পরস্পরের সঙ্গে মিশে নির্ম্মল স্বচ্ছ পোর্সেলেনে পরিণত হয়।

পোর্সেলেনের রহস্য চীন থেকে আরম্ভ করে যে-রকম ভাবে সমস্ত দেশ গোপন রাখবার চেষ্টা করেছে, তাতে এর মোটামুটি খবর সমস্ত পৃথিবীতে আজ ছড়িয়ে পড়া সত্যি আশ্চর্য্য ব্যাপার।



উপবিষ্ট চীনা কুম্ভকার, পোর্সেলেনের বাসন তৈরী করিতেছে। সম্মুখে বিরাট চুল্লী। ইহারই গহ্বরে ঐ বাসন নিক্ষিপ্ত হইবে।

সমস্ত চীনে কিংটেচীন সহর পোর্সেলেন তৈরী করবার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১০০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চিনসুঙ সকল জায়গার কুম্ভকারদের ডেকে এই সহরে জড় করেন। অন্ত কোথাও পোর্সেলেন তৈরী তাঁর আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। 'পোর্সেলেনে'র কারখানাটি সম্রাটের নিজস্ব ছিল। কিংটেচীনে সমস্ত লোক, ছেলেবুড়ো মায় অন্ধ আতুর পর্য্যন্ত এই কারখানায় কোন না কোন কাজ করত। সহরটি আসলে শুধু 'পোর্সেলেন' তৈরীর কাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। কারখানার প্রধান পরিচালকই সহর শাসন করতেন এবং সেখানে পাছে কোন রকমে বাইরের কোন লোক এ বিস্তার সন্ধান পান, সে জন্তে অত্যন্ত সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা ছিল। বিদেশী লোককে রাত্রে নগরের ভিতর শুতেই দেওয়া হ'ত না। কাছের একটি নদীতে নৌকোয় তাদের রাত কাটাবার বিধান ছিল।

জার্ম্মানীতে জোহান ফ্রেডরিক বুটগের 'পোর্সেলেনে'র রহস্য আবিষ্কারের পর স্যাক্সনির শাসক প্রথম ফ্রেডরিক আগষ্টস চোদ্দ বছর ধরে বুটগের ও তাঁর সহকর্ম্মীদের একটি প্রাসাদে বন্দী করে রেখে দেন। বুটগের ও তাঁর সঙ্গীদের তৈরী পোর্সেলেন যখন ইউরোপের লোকদের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে, তখন বন্দী অবস্থায় তাঁরা নিজেরা নিত্য চোখের জল ফেলছেন। তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতাই হয়েছিল তাঁদের কাল। আগষ্টস তাঁদের শাসিয়ে রেখেছিলেন যে, পোর্সেলেনের সামান্ত একটু রহস্য যে ফাঁস করবে, তার শাস্তি হবে মৃত্যু।

চোদ্দ বছর বাদে দু'জন কারিকর কোন রকমে সে কারাগার থেকে পলাবার সুযোগ পায়। পালিয়ে তারা ভিয়েনায় গিয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে। ভিয়েনায় রাজকীয় 'পোর্সেলেনে'র কারখানার সূত্রপাত এই ভাবেই হয়।

সামান্ত মাটির বাসন হ'লে কি হয়, পোর্সেলেনের

সৌন্দর্য্যের নাগাল হীরা-জহরৎও কোন দিন পাবে না। দুঃখ শুধু এই যে, এ সৌন্দর্য্যও মানুষের চোখের জলে দাগী হয়ে আছে। সব সৌন্দর্য্যের নিয়তি বোধ হয় এই।

সাগর-পারের সব্জি

§ আলুর ইতিকথা

সেকালের রাজা-বাদশাদের সকল বিষয়েই জাঁক-জমকের অন্ত ছিল না। অন্য ব্যাপারের মত খাওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা নিশ্চয় আয়োজনের ত্রুটি করতেন না, কিন্তু এখনকার সাধারণ কোন লোকও তখনকার সে ভোজে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হত কি না সন্দেহ। কারণ যে সব জিনিষ নিত্য-ব্যবহারের দরুণ আমাদের কাছে সাধারণ হয়ে গেছে এখন, তা তখন শুধু দুর্লভ নয়, তার মধ্যে অনেকগুলির নাম পর্য্যন্ত অজানা ছিল।

কোন রকমে মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের কোন ভোজ-সভায় যদি আমরা কেউ উপস্থিত হতে পারতাম, তা হলে চর্ব্ব্যচুষ্য-লেহ্যপেয়ের প্রচুর বন্দোবস্ত সত্ত্বেও আমাদের নিশ্চয় মনে হত, অনেক কিছুরই সেখানে অভাব। আইসক্রীম বা রসো-মালাই-এর মত জিনিষের কথা বলা হচ্ছে না, এখনকার অনেক সাধারণ তরি-তরকারিও সে ভোজে দেখা পাওয়া যেত না, এইটেই আশ্চর্য্যের কথা। এযুগের নেহাৎ গরীব লোকও ত' আলুভাতে-ভাত খেতে পায়, কিন্তু তখন রাজা-মহারাজার পক্ষেও আলুভাতে-ভাত স্বপ্নের অগোচর ছিল।



এই বহুবন্দী আলুর একটিও দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার কিংবা উইলিয়ম শেক্স্পীয়ার—কেহই দেখেন নাই। কেন না, আলু মাত্র দুই শত বৎসর আগে দেখা দিয়াছে।

তার কারণ আর কিছুই নয়, আলু বলে কোন তরকারীই তখন এদেশে ছিল না। রোজ রোজ আলু খেয়ে অরুচি হতে পারে একদিন, কিন্তু আলু না খেয়ে দিন কাটাবার কথা এখন ভাবা যায় কি! সাধারণ প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে দু'বেলা আলু এখন প্রধান তরকারী, যে কোন একটা তরকারীতে আলু না থাকলে খাওয়ায় আমাদের তৃপ্তিই হয় না। এই আলু কিন্তু বড় জোর আড়াই শ' বছরের বেশী আগে আমাদের দেশে আসে নি। ইউরোপকে নিয়ে সমস্ত সভ্য জগৎই আলুর প্রথম স্বাদ পেয়েছে মাত্র চার শ' বছর আগে। আজ সমস্ত পৃথিবীতে বছরে প্রায় ২০ কোটি টন আলু উৎপন্ন হয়। পাঁচ শ' বছর আগে সমস্ত সভ্য জগতে একটি আলুর গাছও দেখা যেত না।

তামাক, রাঙা-আলু প্রভৃতি জিনিষের মত আলুও এসেছে আমেরিকা থেকে। সেখানে কলম্বাসের আমেরিকা আবি-ষ্কারের সময় বন্য অবস্থায় যে আলু জন্মাত, মানুষের চেষ্টায় ও যত্নে তা একটি মূল্যবান্ খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

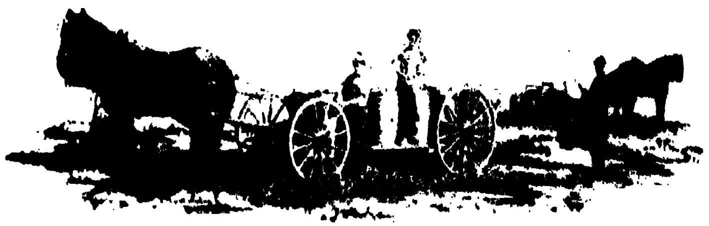
ভারতবর্ষ আলুর চাষ ইউরোপের কাছেই শিখেছে। ইউরোপে কবে কি ভাবে আলু প্রথম আতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে শিকড় গাড়ে, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। আলুর সঙ্গে রাঙা-আলুর প্রথম আবির্ভাবের ইতিহাস এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, এখন এ দুটিকে আলাদা করা শক্ত। রাঙা-আলুরও প্রথম জন্ম আমেরিকায়। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের দিকের উপকূলে আলুর জন্ম। সেখান থেকে যতদূর জানা যায়, আলুর চাষ স্পেনে প্রচলিত হয় ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পর। অনেকের ধারণা তার আগেই ১৫৬৩ সালে ক্যাপ্টেন জন হকিন্স্ ইংলণ্ডের সঙ্গে আলুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তবে বিরুদ্ধমতের লোকেরা বলেন, সে রাঙা-আলু, আসল আলু নয়। স্যার ওয়ালটার র‍্যালে ইংলণ্ডে ধূমপান প্রবর্ত্তন করেছিলেন বলে শোনা যায়, আয়র্ল্যাণ্ডে তিনিই না কি প্রথম আলুর চাষও করেছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর-আমেরিকায় আলুর চাষ যেতে অনেক দিন লেগেছিল। সেখানে ভার্জিনিয়া ও নর্থ ক্যারোলিনা অঞ্চলে এ চাষ যখন সুরু হয়েছে, তখনও নিউ ইংলণ্ডের লোক আলুর কথা জানে না। আমেরিকার নিজস্ব জিনিষ হলে কি হবে, আলুর চাষ নিউ ইংলণ্ডে, ইউরোপ থেকে ঘুরে এসে প্রথম প্রচলিত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকেই আলুর চাষ আবার নিউ ইংলণ্ডে ফিরে আসে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে সেখান থেকে আলু ফরাসী দেশ জয় করে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই তার প্রচলন দেখা যায়।

সামান্য এই উদ্ভিদের ইতিহাসে সত্যকার গৌরবময় অধ্যায়ও আছে। একদিন ইউরোপের কোটি কোটি লোকের প্রাণ শুধু এই আলুর জন্যেই রক্ষা পেয়েছে। বিখ্যাত থার্টি ইয়ার্স ওয়ার-এর ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে তখন ইউরোপের কৃষকদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। তারা তখন সর্ব্বস্বান্ত, তাদের গরু-বাছুর, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু যুদ্ধের লুটপাটে খোয়া গিয়েছে, অনেকে চাষ করার সুযোগ পায় নি, যারা কোন রকমে মাঠে কিছু ফসল ফলিয়েছে, ঘরে তোলবার সুযোগ তারা পায়নি। সেই সময় আলুই অসংখ্য দরিদ্র অসহায় চাষীর ত্রাণকর্ত্তারূপে দেখা দেয়। আলু সামান্য ছোটখাট জমিতে চাষ করা যায়, তার জন্যে প্রচুর সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না, একটা কোদালি হলেই যথেষ্ট। অন্য ফসল চাষ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই তারা আলুর চাষ করেই সে যাত্রা বেঁচে যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডে কিছুদিন বাদে আলুই প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে। আমাদের যেমন চাল, আয়ার্ল্যাণ্ডে এখনও আলু তেমনি দুবেলার প্রধান আহার।

আলুর সুবিধে অনেক, বিঘেপিছু ফসল আলুর খুব বেশী হয়, নানা রকম জমিতে তার চাষ চলে, খুব ভাল জমি না হলেও ক্ষতি নেই। সেই জন্যেই এবং পুষ্টিকর বলে তার চাষ পৃথিবীতে এত বেড়ে গিয়েছে।

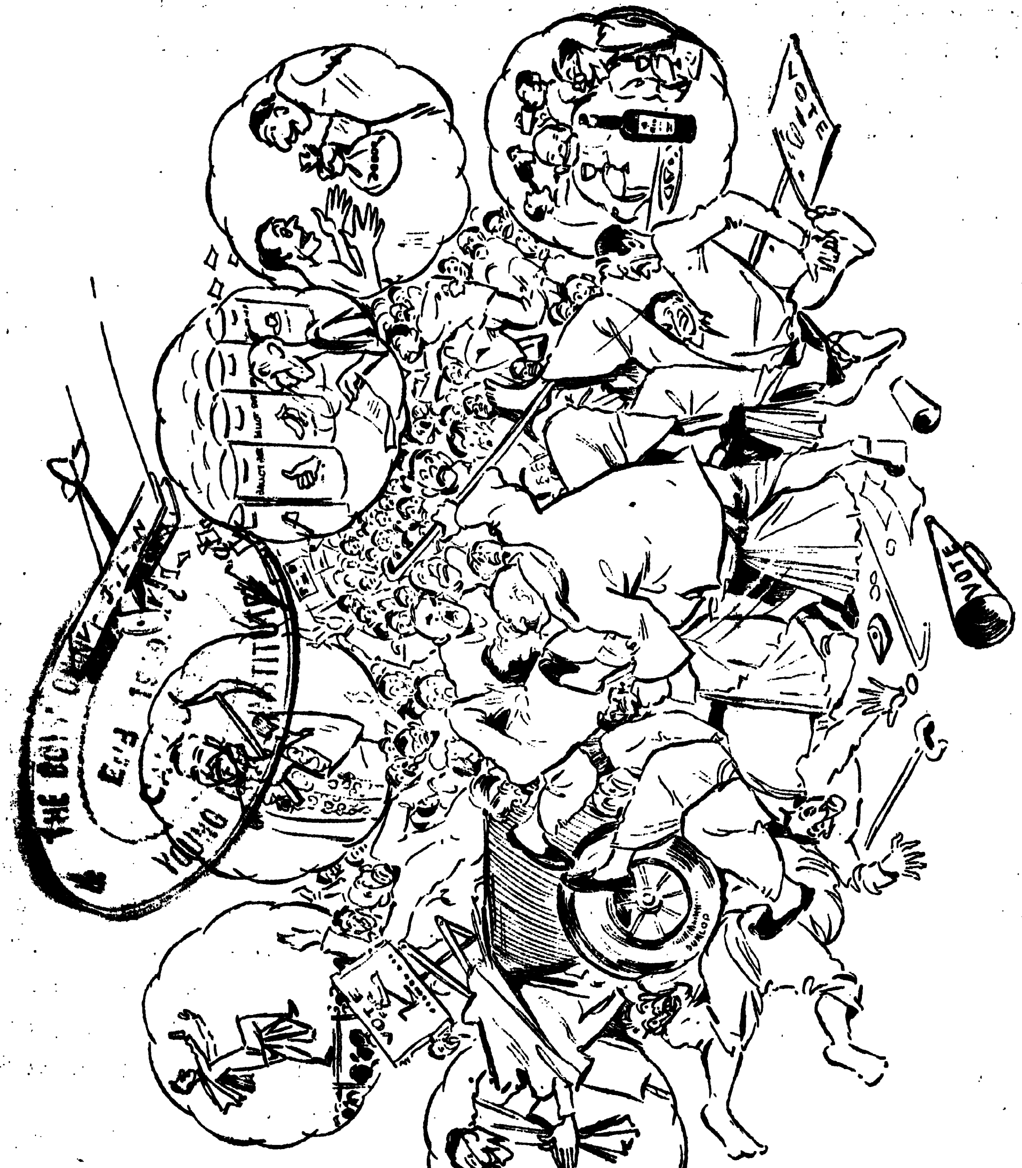
আলু একেবারে বিদেশী হলেও তার জাতগুষ্টি আমাদের খুব পরিচিত। লঙ্কা, তামাক, বিলিতি বেগুণ প্রভৃতি তার আত্মীয়। তার অত্যন্ত বদ আত্মীয় হল, বেলেডোনা—যা থেকে তৈরী হয় সেই বিষাক্ত গাছ। আলুও বিষাক্ত হতে পারে। আলুর ফুলের এক রকম সবুজ নরম বিচি হয়, সেগুলি অনিষ্টকর। আলু অনেকদিন মাটির উপরে থাকলে সবুজ হয়ে ওঠে, সবুজ আলু বিষাক্ত। যে সব অলুর খুব বড় কোঁড় বেরিয়েছে, সেগুলিও খাওয়া উচিত নয়।



কানাডার মাঠে আলুর চাষ।

আলু থেকে কাঁচকড়ার মত জিনিষ তৈরীর কথা অনেকেই জানে। জার্ম্মানীতে আলু থেকে পেট্রোলের বদলে ব্যবহার করবার উপযুক্ত এক রকম আলকহল তৈরী হয়।

ধান গম যব প্রভৃতি শস্য থেকে ফল মূল প্রভৃতি যা কিছু আজকাল আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য, সে সবই একদিন বন্য অবস্থায় আপনা থেকে জন্মাত। গরুঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারকে মানুষ যেমন পোষ মানিয়েছে, কাজে লাগিয়েছে, এ সমস্ত উদ্ভিদকেই তেমনি মানুষ বশ করে তাদের বন্যতা ঘুচিয়েছে। আর সব ফসলের তুলনায় আলু মানুষের হাতে ধরা দিয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু এরই মধ্যে সেপ্রমাণ করেছে যে সে কারুর চেয়ে কম নয়।



নির্ব্বাচনের প্রলয়-নাচন

বাঙ্গালা ভাষার সমস্যা

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র কথিত ভাষার রূপ এক নহে। পাঁচ কোটির উপর লোক যে ভাষা ব্যবহার করে, এমন অনেক ভাষারই কথিত রূপে বিভিন্নতা আছে। সম্ভবতঃ সব ভাষা সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। বাঙ্গালার সাহিত্যের ভাষায় প্রথম যে রূপ গৃহীত হইয়াছিল, বাঙ্গালার কোন বিশেষ অঞ্চলের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। দেশের সকল অংশের লোকেই, এই ভাষাকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং কালে এমন হইতে পারিত যে, এই ভাষাই বাঙ্গালার মৌখিক ভাষা হইয়া উঠিতে পারিত। কারণ, শিক্ষিত লোকেরা যে ভাষা লিখিতেন এবং পড়িতেন, তাঁহাদের মৌখিক ভাষায়, অন্ততঃ পোষাকী ভাষায় তাহাই অনেকটা ব্যবহার করিতেন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিত এবং বিদ্যাবিস্তারের সহিত এই ভাষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিত।

'কোন দেশেরই সর্ব্বত্র কথিত ভাষার রূপ এক থাকে না', এ কথা সত্য হইলেও, কোন সমৃদ্ধ ভাষার কথিত ভদ্র-রূপটি এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নইলে দেশের এক প্রান্তের লোক অন্য প্রান্তে গেলে অসুবিধায় পতিত হন, এক প্রান্তের বক্তার ভাষা অন্য প্রান্তের শ্রোতাদের হাস্যোদ্রেক করে, কোন বৈদেশিক কথা বলিবার জন্য কোন্ রূপটি আয়ত্ত করিবেন, সে সম্বন্ধে সমস্যায় পতিত হন এবং সকলের দ্বারা গৃহীত ও সকলের দ্বারা স্বীকৃত কোন সাধারণ রূপের অভাবে, এক ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন শিথিলতর হয়। কোন বিশেষ স্থানের ভাষাকে যদি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে দেশের অন্যান্য স্থানের লোকদের অপেক্ষা সেই বিশেষ স্থানের লোকেরা কতকগুলি বেশী সুবিধা পাইবেনই; ফলে অন্যান্য স্থানের লোকদের আপেক্ষিক অসুবিধা হওয়া, অভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং নিজ অঞ্চলের ভাষা যাহাতে প্রাধান্য পায়, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

সাহিত্যের কথা বাদ দিয়াও বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশের মধ্যে কথিত ভাষার পার্থক্য যে এতটা বেশী রহিয়াছে—একটা সাধারণ পোষাকী ভাষা গড়িয়া উঠে নাই, তাহার প্রধান কারণ, পূর্ব্বে ভিন্নদেশের সহিত যেমন আমাদের তেমন যোগাযোগ ছিল না, আমাদের নিজেদের দেশের বিভিন্ন অংশের সহিতও পরিচয় তেমনই শিথিল ছিল। প্রথমতঃ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার পথ সুগম ছিল না, অধিকন্তু, বিপদসঙ্কুল ছিল। জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়া লোকের স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা বা প্রয়োজনও হইত না। বাণিজ্যাদির জন্য যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরের লোক ছিলেন না, কারণ, শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ ভাবে ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে নিন্দনীয় ছিল। কোন বৃহৎ কাযের জন্য দেশের সকল স্থানের, অথবা অনেক স্থানের লোকের সমবায় দরকার হয় এবং তাহাতে স্থানের দূরত্ব কতকটা প্রতিহত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের এমন প্রয়োজনও কদাচিৎ হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়াও, ভাষার মিলন ঘটিতে পারে। কোন স্থানেই দেশের সব দিকের লোক একত্র সমবেত হইতেন না বলিয়া এবং দূরে যাতায়াত অনেকটা অসম্ভব ছিল বলিয়া তাহাও ঘটে নাই।

সাধারণ সাহিত্য ভাষার ঐক্য বিধান করিতে বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু দেশে গদ্য-সাহিত্য বিশেষ কিছু ছিল না এবং পদ্যের ভাষা লোকের মৌখিক ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সর্ব্বোপরি, আমরা সাধারণ ভাবেও সেদিন ঐক্যের কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করি নাই, ভাষার ঐক্যের বিষয় ত' অনেক দূরের কথা।

তাহা হইলেও, সাহিত্য-সৃষ্টি এবং ঘটনার অগ্রগতির সহিত এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝিতে লাগিলাম। এই ঐক্যোপলব্ধি ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রারম্ভে যে বিশেষ কোন অঞ্চলের কথিত ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহা আমাদের বহু ভাগ্যের কথা। কারণ,

প্রথম হইতেই এরূপ কোন প্রকার ঐক্যের পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্নতা আরম্ভ হইত এবং বর্ত্তমানে সকল বাঙ্গালীই বাঙ্গালা ভাষাকে যতটা আপনার মনে করেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য যতটা গৌরব অনুভব করেন এবং যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় বাঙ্গালীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাহার কৃষ্টির ও সভ্যতার একটা বিশেষ রূপ আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে চিন্তায়, ভাবে, আদর্শবাদে ঘনিষ্ঠতর একত্বের পথে লইয়া চলিয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। আমাদের ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে বলিয়াই, আজ হয় ত বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে গ্রহণ করা সহজ হইয়াছে, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সাহিত্যের মঙ্গল ও পুষ্টির জন্য হয় ত আজ ছোট-খাটো সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া আমাদিগকে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মত গঠনের মত উদার করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু গোড়ার দিকে ইহা কখনই সম্ভব হইত না।

বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য-রচনার রীতি যে একেবারে ছিল না তাহা নয়; গ্রাম্য ছড়া, গান, এমন কি, ছোট ছোট কাব্যও স্থানীয় ভাষায় লিখিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকাগুলি ত আজ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উৎকর্ষে ইহার সমকক্ষ না হউক, বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলেও এইরূপ সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। ছন্দের মাধুর্য্যে এবং ভাষার মিষ্টতায় এগুলি সকল বাঙ্গালীরই চিত্তাকর্ষণ করে; স্থানীয় লোকের কাছে যে ইহা বিশেষ আদর পাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

কিন্তু, এইরূপ খণ্ডত্বের মধ্য দিয়া কখনও কোন বৃহৎ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। একথা সত্য যে, আমরা মুখে সব সময় যে ভাষা ব্যবহার করি, সেই ভাষাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সুবোধ্য, সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য আমাদের মনের বিশেষ নিকটবর্ত্তী এবং আদরের বস্তু। ইহার লিখন-পঠনও নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া যদি আমরা দেশকে ভাষা হিসাবে বহু খণ্ডে ভাগ করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের সাহিত্যকে পৃথক্ করিয়া গড়িয়া তুলিতাম, তাহা হইলে তাহার ফল-বিশেষ সুবিধাজনক হইত না। যদিও কয়েক মাইল অন্তর অন্তর উচ্চারণ-রীতি ও শব্দ-প্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায় এবং এক জেলারও উভয় প্রান্তের পার্থক্য এত বেশী থাকে যে, এক দিকের লোক অন্য দিকের লোকের কথা শুনিয়া বিদ্রূপ করে, তবুও যদি তিন চারিটি করিয়া জেলাকে একক ধরিয়া, বাঙ্গালাদেশকে ভাগ করিয়া ফেলা হইত, তাহা হইলেও এখানে আট নয়টি সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন হইত; কম পক্ষেও, পাঁচটি বিভাগের জন্য যে পৃথক্ পাঁচটি সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইত, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাতে সাহিত্য ও জাতির দিক্ দিয়া যে ক্ষতি হইতে পারিত, তাহা এত সুস্পষ্ট যে, বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য যদি এইরূপে খণ্ডিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে এ আশঙ্কা করা অন্যায় হইবে না যে, প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষায় লিখিত পুস্তক মাত্র সেই অঞ্চলের লোকেরাই পাঠ করিতেন। ইহাতে পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকিত। বর্ত্তমানে যে সকল শক্তিশালী লেখকের দানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে, ইঁহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতেন, ফলে প্রত্যেক অংশেই ভাল লেখকের অভাব ঘটিত। বর্ত্তমানে যত লেখক বাঙ্গালায় সাহিত্য-রচনায় শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, পাঠকসংখ্যা, ভাষার শক্তি, এবং সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ক্ষীণ দেখিয়া তাঁহারা অনেকেই বিদেশী ভাষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন। ভাষা শক্তিহীন ও সাহিত্য দরিদ্র হইলে, বাহিরের লোকে ইহা চাহিত না, বা ইহার আদর করিত না। কোন অঞ্চলের সাহিত্যেই শিক্ষা পূর্ণ করিবার বা জ্ঞান যথোচিত পুষ্ট করিবার মত পুস্তকাদি থাকিত না এবং অপরের কথা বাদ দিয়া কোন অঞ্চলের লোকেই, শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার উপর নির্ভর করিতে পারিত না; ভারতীয় বা অ-ভারতীয় কোন বিদেশী ভাষার উপরই এ জন্য আমাদের নির্ভর করিতে হইত। ইহার ফলে মাতৃভাষা বিশেষভাবে অবহেলিত হইত। সাহিত্য যদি এই ভাবে খণ্ডিত হইত, তাহা হইলে, মাতৃভাষাকে অবহেলা করিবার, শিক্ষার জন্য তাহার উপর নির্ভর করিতে না পারিবার, এই সাহিত্যের প্রসারিত হইতে না পারিবার, আদর না পাইবার যে সকল সম্ভাবনার কথা বলা হইল, ইহার সবগুলিই ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল এবং সেজন্য আমাদের সাহিত্যের

বর্ত্তমান উন্নতি কল্পনাতীতই থাকিয়া যাইত। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য-সাধনায় যত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহার যত পাঠক সৃষ্টি হইয়াছে, যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদির প্রকাশ হইয়াছে এবং হইতেছে, বাঙ্গালা ও ভারতের বাহিরেও ইহার যে খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বকল্পিত অবস্থায় তাহা কখনও ঘটিয়া উঠিত না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যিক ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই সাহিত্যানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও, বাঙ্গালায় একখানি বা দুইখানি মাত্র দৈনিক সংবাদপত্র চলিতেছে ; এগুলির মোট গ্রাহক-সংখ্যা ৫০ হাজারের উপর হইবে না, কোন একখানা ভাল সাপ্তাহিক স্থায়ী হইতে পারিতেছে না ; তিন চারি খানার অধিক ভাল মাসিক নাই ; তাহার মোট গ্রাহকসংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র—ইহাদেরও অনেকের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা দায়। বাঙ্গালা সাহিত্যকে আমরা কৃতিত্ব ও গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ইহাতে প্রকাশিত এক শত ভাল বইএর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। খুব নামকরা ভাল বইগুলিরই তিন চারি বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় না।

বাঙ্গালা বর্ত্তমানে পাঁচ কোটির উপর লোকের ভাষা থাকিয়াও, ইহার সাহিত্যের অবস্থা এই, ভাগ হইলে যে অবস্থা কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। সাহিত্যকে অবহেলা করিবার পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ যদি নাও ঘটিত, (যদিও তাহা না ঘটিয়া উপায় ছিল না) তবুও ইহার সম্প্রসারণ বা উন্নতির কোন আশাই আমরা করিতে পারিতাম না।

আমাদের সাহিত্য খণ্ডিত হইলে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অসুবিধা এবং জাতীয় জীবনের ক্ষতিও কম হইত না। ইহাতে এক জেলার লোক অন্য জেলায় যাইয়া অসুবিধায় পড়িতেন, এক জেলার লোকের পক্ষে অন্য জেলার লোকের নিকট পত্রাদি লেখা কষ্টকর হইত। পাঁচ অঞ্চলের পাঁচ জন বাঙ্গালী বিদেশে যাইয়া এক হইতে পারিতেন না। রাজধানী বা অন্য কোন বন্দরে, যেখানে বাঙ্গালার সব অঞ্চলের লোকের সমবেত হইতে হয়, একত্র কাষ করিতে হয়, মিশিতে হয়, বন্ধুত্ব করিতে হয়, সেখানে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষেও অসুবিধার সৃষ্টি হইত।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইত আমাদের জাতীয় জীবনের। জাতিকে সূত্রে এক করে তাহার ভাষা ও সাহিত্য। আজ সহস্র বিচ্ছিন্নতা ও বিভাগের মধ্যে আমাদের মধ্যে যে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে একই সাহিত্য, অর্থাৎ একই চিন্তা ও বিদ্যা আমাদের মনকে পুষ্ট ও গঠিত করিতেছে। একই বই পড়িয়া, একই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে বাঙ্গালার সকল প্রান্তের ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিতেছে। পাঁচ কোটি লোকের গৃহের দ্বারে কোন একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নূতন কথার পৌঁছিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক স্কুলে, এক কলেজে, এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময় কাহার কোন্ জেলায় বাড়ী, এ কথা ভুলিয়া বাঙ্গালীর ছেলেরা সর্ব্ব বিষয়ে এক হইয়া উঠিতেছে, একই স্কুলে পাঁচ প্রকার ভাষায় দক্ষ শিক্ষক রাখিতে হয় না।

এই সকল কারণে, বাঙ্গালার সব অঞ্চলের পক্ষেই উপযোগী ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করা বিশেষ সুফলদায়ক হইয়াছে। বাঙ্গালার সব অঞ্চলের মৌখিক ভাষা পরস্পরের অধিক নিকটবর্ত্তী হইলে, ইহার মৌখিক ভদ্র রূপটি এক হইলে একই সাহিত্যের সুফল আমরা পূর্ণ মাত্রায় পাইতে পারিব

কিন্তু আমাদের ভাষার যে রূপটি সাহিত্যে গৃহীত হইল, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধার দিক হইল এই যে, বাঙ্গালার সকল অঞ্চলের লোকেরই প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে এই ভাষা হইতে সযত্নে দূরে রাখা হইল এবং ক্রিয়াপদগুলির উচ্চারণ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। আমাদের মনের সহিত একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের ইহার ভিতরের একটা সহজ সাবলীল গতির অভাব হইয়া, ইহা কতকটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। ইহার আড়ষ্টতা ও অস্বাভাবিকতা, ইহার প্রাণশক্তির দৈন্য, লেখকদিগকে কথ্য ভাষার দিকে ক্রমেই আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

যাঁহারা কথ্য-ভাষা ক্রমে ক্রমে গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন অথবা এখনও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালার সব অংশের লোকই আছেন; ইঁহারা সকলেই কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া, সকল দিকের সকল কথা ভাল ভাবে ওজন করিয়া যে, এই ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চিত ভাবে এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই।

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত। একই স্থানের সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কথাও ঠিক এক প্রকারের নহে, এ অবস্থায়ও বাঙ্গালার নানা স্থানের এবং নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভাষাকে আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সকল দিক দিয়াই খুব স্বাভাবিক হইয়াছে বলিতে হইবে। কোন স্থানের সকল সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষার মধ্যে সামান্য মাত্র পার্থক্য-হীন ঐক্য নাই, ইহা থাকা স্বাভাবিকও নহে। কিন্তু কাহাদের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ করা যাইবে, সে কথা বিবেচনা করিবার সময় আমা-দিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, যদিও অধিকসংখ্যক লোকের সুবিধাই সব ব্যাপারে আমাদের দেখা উচিত, যদিও সমাজের নিম্নস্তরে মাত্র প্রচলিত বহু-সংখ্যক শব্দ গ্রহণ না করিলে, ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিবে না, তবুও শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষাকেই সাহিত্যে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে যতটুকু কথাবার্ত্তা মুখে বলিয়া থাকি, তাহা-কেই মাত্র লিপিবদ্ধ করা সাহিত্যের কায নহে। সাধারণ ভাবে যে-সকল ভাব বা চিন্তার কথা আমাদের মনে আসে না, অথচ বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও গভীর মনোযোগ দিয়া আমরা যে সকল কথা ভাবিতে পারি, আমাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে লব্ধ মানসিক উৎকর্ষকে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর প্রয়োগ করিয়া আমরা যে ফল লাভ করিতে পারি, আমাদের মধ্যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে চিন্তা ও ভাবের অধিকারী হইতে পারেন, কোন বিশেষ অসাধারণ মুহূর্ত্তে আমাদের মনে যে প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, সাহিত্যকে তাহাই বহন করিতে হয়। বহু জটিল ব্যাপার লইয়া সাহিত্যকে কারবার করিতে হয়, বহু বৃহৎ ঘটনাকে, সূক্ষ্ম চিন্তাকে, সকল মানুষের জ্ঞানের সমগ্রতাকে সাহিত্যের ধারণ করিতে হয়। শিক্ষাই মানুষকে এই সকল গুণের সান্নিধ্যে লইয়া আসে এবং তাহার মুখের ভাষাও এই কারণে অনেকটা মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া উঠে। যাঁহারা বর্ত্তমানে শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও যত শিক্ষার প্রসার ঘটিবে, ততই তাঁহারা কতকটা শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে ও অনুকরণে এবং কতকটা প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হইয়া বর্ত্তমানের শিক্ষিত লোকদের কথার অনুকরণ করিবেন। শিক্ষিত লোকদের কথাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার আর একটা যুক্তি এই যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌখিক ভাষার মধ্যে যতটা মিল আছে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভাষার মধ্যে ততটা নাই। তাহার প্রধান কারণ, একই সাধারণ সাহিত্যের পুস্তকাদি ইঁহারা সকলেই পড়িয়া থাকেন, এই সাহিত্যের ভাষা ইঁহাদের সকলের মুখের ভাষাকেই কতকটা প্রভাবিত করে; উচ্চারণ-ভঙ্গী ও ক্রিয়ার রূপের কথা বাদ দিলে, একই প্রকার শব্দ এবং বাক্‌পদ্ধতির সহিত সকলেই পরিচিত এবং সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাজেই যে অঞ্চলের ভাষাকেই গ্রহণ করা সুযুক্তির হউক, শিক্ষিত লোকের ভাষাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু শিক্ষিত লোকের কথার রূপকে গ্রহণ করিলেও শুধু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অনেক কথাকে গ্রহণ না করিয়া আমাদের উপায় নাই। কৃষি, সর্ব্বপ্রকার শ্রম-শিল্প, নানাবিধ ব্যবসায় প্রভৃতিতে দেশের শিক্ষিত লোক-দের সাধারণতঃ কোন অংশ নাই। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রকাশ করিবার ও পড়িবার প্রয়োজন আমাদের হইবে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দের জন্য আমাদিগকে সমাজের নিম্নস্তরে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভাবপ্রকাশক হাস্যরসাত্মক নানা বাক্যসমষ্টিও ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সকল শব্দ আমাদের লেখকেরা সুবিধা ও ইচ্ছামত চালাইতেছেন। এ সম্বন্ধেও বিস্তৃত অনুসন্ধান, কি কি অর্থে কোন্ কোন্ শব্দ গ্রহণ করা যাইবে তাহা নির্দ্ধারণ, তাহার প্রয়োগ ও বানান-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত।

তাহার পর, কোথাকার ভাষা গ্রহণ করা যাইবে, সে সম্বন্ধে স্থান নির্ব্বাচন। নানাস্থানের ভাষার মধ্যে যখন বিভিন্নতা থাকে, তখন কোন একটি ভৌগোলিক সীমা ধরিলে তাহার দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যেই পার্থক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রকৃত বাঙ্গালাদেশের জনবহুল অংশের কথা ধরিলে, উত্তর-দক্ষিণের কথা বাদ দিয়া, এই দেশকে অনেকটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ধরা যায়। দেশকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ভাগ করিলে, কলিকাতাকে প্রায় মধ্যস্থানবর্ত্তী বলা যায়। কাজেই, এই অঞ্চলের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের নিকটবর্ত্তী মৌখিক ভাষা। কোন প্রান্তের অথবা প্রান্তের কাছাকাছি কোন স্থানের ভাষা অন্য প্রান্তের ভাষা হইতে যতটা পৃথক্ হইবে, কলিকাতার ভাষা কোনও স্থানের ভাষা হইতে ততটা পৃথক্ হইবে না। এই দিক্ দিয়া কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করা স্বাভাবিক ও যুক্তি এবং ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। অবশ্য এই কারণের জন্য মাপিয়া জুঁকিয়া সচেতন ভাবে যে সাহিত্যিকেরা কলিকাতার ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন নাও হইতে পারে।

কথিত ভাষায় সাহিত্য-রচনা আধুনিক সাহিত্যের ও আধুনিক কালের কথা। ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম ভাগে কলিকাতা ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, আবার ইহা ভারতের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ও বাণিজ্যেরও কেন্দ্র বটে। কাজেই, ভারতের সকল অংশের লোককেই এখানে আসিতে এবং বাস করিতে হইয়াছে। কলিকাতা বাঙ্গালা-দেশে বলিয়া অনুপাতে অবশ্য বাঙ্গালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অর্থে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যাঁহারা বড় বড় চাকুরি করিতেন, বড় বড় কারবারের মালিক ছিলেন, চিকিৎসা, আইন-ব্যবসায় প্রভৃতিতে যাঁহাদের বিশেষ পারদর্শিতা ও খ্যাতি ছিল, বাঙ্গালার সকল জেলার এমন সকল লোকই কলিকাতায় থাকিতেন এবং অনেক দিন থাকার ফলে কলিকাতার কথ্য ভাষা সকলেই আয়ত্ত এবং অনেকেই ব্যবহার করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান কলেজগুলি, আইন ও ডাক্তারি স্কুল-কলেজগুলি এখানে অবস্থিত হওয়ায় উচ্চশিক্ষা-প্রাথী ছাত্রদিগকেও কলিকাতায় থাকিতে ও পড়িতে হইত।

বর্ত্তমানে কলিকাতা ভারতের রাজধানী না থাকিলেও, বাঙ্গালার রাজধানী, ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র আছে এবং পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থাসমূহ এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বরং, জীবন-সংগ্রাম পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর হওয়ায়, যাতায়াতের সুবিধা বাড়িয়া যাওয়ায় এবং সাধারণভাবে বাঙ্গালীদের মধ্যে কাযকর্ম্ম করিবার সাড়া জাগায়, চাকরী ও নানা স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং কর্ম্মের অনুসন্ধানে নিরত বহুসংখ্যক বেকার—বাঙ্গালার সর্ব্ব অঞ্চলের লোক কলিকাতায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আবার, কলিকাতায় যাঁহারা স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করেন এবং কথার দিক্ দিয়া কলিকাতার লোক হইয়া যান, তাঁহাদেরও অনেকেই সুবিধা ও অবসর মত নিজ নিজ পল্লীতে যাইতেন এবং এখনও যাইয়া থাকেন। মাত্র ইহাতেই শুধু যে কলিকাতার ভাষার সহিত বাঙ্গালার সকল জেলার লোকের পরিচয় ঘটিয়া এবং কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালার সকল জেলায় এবং অনেক পল্লীতে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালার সকল স্থানের সহিত কলিকাতার যোগ ঘনিষ্ঠ করিয়াছে, তাহা নহে; দেশের সকল স্থানের শিক্ষিত, ধনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী লোকেরা যখন এই ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন, দেশের সকল স্থানেই এই ভাষা অভিজাত ভদ্র-লোকের ভাষা বলিয়া চলিতে লাগিল এবং চলিতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং ভদ্র হইতেছেন, তাঁহারাই এই ভাষা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শুধু আধুনিক কালের ইতিহাসে নহে, পশ্চিম-বঙ্গ চিরদিনই বাঙ্গালার সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা; বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তারের সহিত নদীয়ার ভাষার প্রভাবও সারা বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালার রাজ-নৈতিক ইতিহাসের সহিত নদীয়ার নাম ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এবং বাঙ্গালার কৃষ্টির ইতিহাসে নবদ্বীপের নাম চির-দিন স্মরণযোগ্য হইয়া থাকিবে।

এইরূপে পশ্চিম-বঙ্গের ভাষা ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে স্বাভাবিক নানা কারণে কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা সমগ্র বঙ্গের শিক্ষিত ও

ভদ্র-সাধারণের ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহা যাহাতে আরও ভাল ভাবে বাঙ্গালার সকল স্থানে কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকামী এবং বাঙ্গালী জাতির ঐক্যকামী সকলেরই এ জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণ স্থানীয় প্রীতি দেশ ও সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী হইতে পারে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে বৃহত্তের কাছে আত্মসমর্পণ, আত্ম-বিসর্জ্জনে পরিণত হইতে পারে এবং যেখানে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার দ্বারাই একমাত্র আত্মরক্ষা হইতে পারে; কিন্তু এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমেই একক ধরিবার সময় যদি আমরা এত ছোট করিয়া ধরিয়া ফেলি, যাহার আভ্যন্তরীণ সমবায়ে টিকিয়া থাকিবার শক্তি লাভ না হয়, তাহা হইলে, তাহাতে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। একক ধরিবার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমবায়ের ঝোঁকে ক্ষেত্র এত বড় হইয়া যাইতে পারে, যেখানে শৃঙ্খলারক্ষা এবং কাহারও স্বার্থরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ঝোঁকে মিলন-ক্ষেত্রকে আত্ম-কলহের ক্ষেত্রেও আমরা পরিণত করিতে পারি এবং স্বাতন্ত্র্যকে শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আনিয়া শেষ করিতে পারি, উভয় প্রান্তই বিপজ্জনক। সমগ্র ভারতের লোককে যখন জোর করিয়া হিন্দী শিখাইয়া আমরা এক করিতে চাই, তখন আমাদের প্রথমোক্ত বিপদের সম্ভাবনা থাকে, আর যখন আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে খণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভাগ ও সংকীর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চাই, তখন আমরা শেষোক্ত বিপদের অভিমুখে যাত্রা করি।

সাহিত্যে কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারের প্রতি-ক্রিয়ারূপে বাঙ্গালার কোন কোন জেলার লোকেরা যে নিজ নিজ জেলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থানদানের জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহা কোন শুভ-ফলপ্রসূ হইবে না। তাঁহারাও দেখিবেন, তাঁহাদের নিজ নিজ জেলার সর্ব্বত্র ভাষার রূপ এক নহে এবং তাঁহারাও জেলা-সহর এবং তাহার নিকট-বর্ত্তী ভাষাকে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছেন। ঠিক এই যুক্তি অনুসারেই কলিকাতার ভাষারই সমগ্র বাঙ্গালার ভাষার আদর্শ হইবার দাবী আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমগ্র বাঙ্গালাকে ভাষা হিসাবে সাহিত্যে (এবং ক্রমে মৌখিক ভাষায়ও) এক বলিয়া না ধরিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং ফলে, সকল বাঙ্গালীরই বিশেষ বিপদের কারণ আছে।

কিন্তু কলিকাতার ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করা ঠিক হইয়া থাকিলেও, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া-প্রসূত অন্য চেষ্টায় ইতিমধ্যেই অনেকটা বিপদ এবং অসুবিধা ঘটিয়াছে। এখনও যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিশৃঙ্খলা ও আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টার ফলে, কয়েকটি কারণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম কথা, কলিকাতায় বাঙ্গালার সকল স্থানের লোকের সমাবেশ হয়, ইহার মধ্যে কোন্‌টি খাঁটি কলিকাতার ভাষা, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোক কলিকাতায় অস্থায়ীভাবে বাস করিয়া কলিকাতার ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই উচ্চারণে কিছু বিকৃতি এবং ভাষায়ও কিছু মিশ্রণ আছে। ইঁহারা নিজেরা এ সম্বন্ধে সচেতন নহেন বলিয়া, ইঁহাদের লিখিত কথ্য ভাষার মধ্যে এই ত্রুটী থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ইঁহাদের ভাষার এই ত্রুটী, কলিকাতা হইতে দূরে যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা সহসা ধরিতে পারেন না এবং ইঁহাদের ভাষাকেই কলিকাতার ভাষা বলিয়া গ্রহণ করেন। আবার পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা নিজ নিজ কথ্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন, এবং নিজেদের ভাষা হইতে যাঁহাদের ভাষা যতটা পৃথক্, তাঁহাদিগকে ততটা 'বাঙ্গাল', অর্থাৎ ভাষার দিক্ দিয়া নিকৃষ্ট মনে করেন। পশ্চিম-বঙ্গের দূর প্রান্তে যাঁহাদের বাস, তাঁহাদের পক্ষে এই সব কথা অল্লাধিক পরিমাণে সত্য। এই জন্য পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন-স্থানের লেখকেরা নিজ নিজ কথ্য ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া, সাহিত্যে নিজেদের উচ্চারণ-ভঙ্গী চালাইতেছেন।

কথ্য ভাষা গ্রহণের চেষ্টা শুধু ক্রিয়াপদের কথ্যরূপের ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সর্ব্বপ্রকারে শব্দ ও বাক্‌পদ্ধতি সাহিত্যে গৃহীত

হইতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যাতায়াতের উপায় সহজ হইয়া সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের মধ্যে ছুটাছুটি ও চাঞ্চল্য যত বাড়িয়া যাইবে এবং এই সকলের সমষ্টিগত ফলে বাঙ্গালার সকল স্থানের ভাষা যত মিশ্রিত হইবে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক যত সাহিত্যচর্চ্চায় যোগদান করিবে এবং বিভিন্ন স্থানের লেখকেরা যত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ জন্মস্থানের ভাষা চালাইতে থাকিবেন, বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলা ও লেখকদের শব্দের বানান ও প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ততই বাড়িয়া যাইবে। এই সকল এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য কারণের কথা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, কথ্য ভাষা গ্রহণের দিকে ভাষার আরও কতকটা অগ্রসর হওয়া এবং ফলে রূপান্তর গ্রহণ করা অনেকটা আসন্ন এবং অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কতটা পর্য্যন্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে ও তাহাকে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করিতে পারিলে, লেখকদের মধ্যে আমরা কতকটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আশা করিতে পারি। পশ্চিম-বঙ্গের (কলিকাতা অঞ্চলের) কথ্য ভাষার কোন্ রূপটি সাহিত্যে স্বীকৃত ও গৃহীত হইবে, কথ্য ভাষার কোন্ কোন্ শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইবে, কোন্ কোন্ শব্দ গ্রহণ করা যাইবে, অত্যন্ত সংকীর্ণ ভাবে প্রাদেশিক বলিয়া বর্ত্তমানে চালান হইতেছে—এমন কোন্ কোন্ শব্দ বর্জ্জিত হইবে, বঙ্গের সকল অংশের সাহিত্যিকদের মতামত লইয়া বিশেষ বিবেচনা এবং নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এই অনুসন্ধান, নির্ব্বাচন ও গ্রহণের সময় শুধু মাত্র কোন বিশেষ স্থানের কথ্য ভাষার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বাক্যের রূপ ও গঠন-প্রণালী কি হইবে, কোন্ স্থানের উচ্চারণ-রীতি ও ক্রিয়ার রূপ অনুসৃত হইবে, তাহার জন্য যদিও প্রধানতঃ কলিকাতার ভাষার উপরই সমধিক নির্ভর করিতে হইবে, তবুও বাঙ্গালার কোন প্রান্তকেই অবহেলা করা যাইবে না। কারণ, বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে, বহু বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত ভাবপ্রকাশক অনেক শব্দ, প্রবচন ও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত বাক্য রহিয়াছে—যাহা উপেক্ষা করিলে, ভাষার অনেক সম্পদ নষ্ট হইবে। যে সকল শব্দের সাহিত্যে প্রবেশ-লাভের প্রকৃত শক্তি ও দাবী আছে, তাহাদিগকে বাঙ্গালার সকল স্থান হইতে যদি গ্রহণ করা না হয়, তবে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ অনেকটা স্বাভাবিক হইবে এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে-সকল শব্দের প্রকৃত দাবী নাই, এমন অনেক কথা সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা হইবে।

কথ্যভাষা চালাইতে যাইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদিগকে একটি বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিনা প্রয়োজনে অনেক ইংরেজী শব্দকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে, ইহার দ্বারা সাহিত্যের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি না হইয়া ইহার শক্তি ও ঠাসবুনানি অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অবশ্য, আমাদের ভাষার অনেক দৈন্য আছে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী হইয়া উঠিবার জন্য ইহাকে অনেক বিদেশী শব্দ নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। এই প্রয়োজনের উপযোগী হইয়া উঠিবার জন্য যে কিয়ৎসংখ্যক বিদেশী শব্দ গ্রহণ ও তজ্জনিত ভাষার কিছু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এখানে, যে সকল ইংরেজী কথা শুধু আমাদের শিক্ষা ও অন্যবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য, অনেকটা অকারণে, আমাদের কথ্যভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যে সে সকল শব্দের ব্যবহারকেই লক্ষ্য করা হইতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার প্রধান, এবং বলিতে গেলে একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে ইংরেজী শিক্ষা করা। এই শিক্ষা সকল দিক দিয়া এ পর্য্যন্ত আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে; ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আমাদের মনের অতিমাত্র মমত্ববোধ পরিত্যাগ করিবার সময় যদিও না বর্ত্তমানে আসিয়া থাকে, কিন্তু এক দিন যে এই শিক্ষার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রচুর উদ্যম, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিয়া যাহা শিক্ষা করিতে হইতেছে, ছাত্রাবস্থায় যাহা প্রত্যেকের তপস্যা ও সাধনার জিনিষ, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও যে, তাহা আদরের বস্তু হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে!

তদ্ব্যতীত দেশের রাজভাষা ইংরেজী, পণ্ডিতদের ভাষা ইংরেজী, দেশে কোন দিক্ দিয়া গণ্যমান্য হইতে হইলে কথা-বার্ত্তায় ও লেখাপড়ায় ইংরেজী চালাইতেই হইবে। রাজপুরুষদের সহিত বন্ধুত্ব এবং তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করিয়া আমাদের ন্যায় পরাধীন জাতির পক্ষে—একমাত্র ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। সর্ব্বোপরি ইংরেজীশিক্ষা বিত্তালাভের সর্ব্বপ্রধান উপায় ও ইংরেজী জ্ঞান বিত্তাবত্তার সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া, নিজেকে অপরের নিকট বিদ্বান্ প্রতিপন্ন করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় সাধারণ লোকেও কথাবার্ত্তায় যথাসম্ভব বেশী ইংরেজী শব্দ চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অবিরত অভ্যাসের ফলে, ইহা যে কতটা খেলো এবং কতটা হাস্যকর তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নিজেদের বড় প্রমাণিত করিবার জন্য, মাতৃভাষায় উপযুক্ত শব্দ থাকিতেও যখন আমরা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করি, তখন তাহার মধ্য দিয়া আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে যে হীন ধারণা পোষণ করি, তাহা প্রকাশ পায় এবং সেটা বিশেষভাবে লজ্জার কারণ হইয়া পড়ে। আমাদের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা সকল সময়ে যে বাঙ্গালা কথা বলি, তাহাতে অর্দ্ধেকের উপর ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি। নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং নিত্যব্যবহার্য্য ছোট ছোট বাঙ্গালা শব্দ ত্যাগ করিয়া ইংরেজীর আশ্রয় লইতেছি। দেশের সাধারণ লোকের সহিত এবং মেয়েদের সহিত (ইঁহারা সাধারণতঃ ইংরেজী অনভিজ্ঞ) যদি কারবার করিতে না হইত, তাহা হইলে দেশের শিক্ষিত লোকেরা সম্ভবতঃ নিত্যব্যবহার্য্য বাঙ্গালা শব্দগুলি এতদিনে ভুলিয়া যাইতেন।

আমাদের লেখকদের অনেকে কথ্যভাষায় লিখিতে যাইয়া, আমরা সব সময় যে সকল ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি, তাহার অনেকগুলি বাঙ্গালায় চালাইতেছেন। ইঁহাদিগকে মোটামুটি দুই দলে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম দল, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, বা কোন কিছুর বর্ণনা প্রভৃতিতে ভাষাকে স্বাভাবিক করিবার ইচ্ছায় অথবা আধুনিকতা অনেক স্থলে প্রাচীন সংস্কার-রীতি এবং বাঁধন না মানিয়া অগ্রসর হইতেছে বলিয়া, নিজেদের অতি-আধুনিক প্রমাণিত করিবার লোভে, পূর্ব্বোক্তশ্রেণীর ইংরেজী শব্দকে সাহিত্যে চালাইতেছেন। সম্ভবতঃ এই আধুনিকতা ও ধনী এবং অভিজাত সমাজসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রমাণ দিবার জন্য, বিদেশী গৃহসজ্জা, খাদ্য প্রভৃতির বর্ণনায় অনেক লেখক সীমা অতিক্রম করিয়া ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আর দ্বিতীয় দল, গল্প বা উপন্যাসে শিক্ষিতশ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টির সময়, সঠিক চিত্র আঁকিবার জন্য বোধ হয়, ইঁহারা যেমন ইংরেজী কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ ইংরেজীমিশ্রিত কথা ইঁহাদের মুখ দিয়া বলাইয়া থাকেন।

সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যে সকল কাযের ফল দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করে, এমন কায সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করিবার দায়িত্ব সকলেরই আছে। কোন কিছু লেখা সম্পূর্ণভাবে লেখকদের নিজস্ব জিনিষ হইলেও, দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উপর সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া এবং দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাহিত্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বলিয়া লেখকের স্বাধীনতা থাকিলেও অনেকটা দায়িত্ব রহিয়া গিয়াছে।

আমরা কথ্যভাষার সহিত যে প্রচুর ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তাহা স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক নহে। বর্ত্তমানে আমাদের নানাদিকে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে —কোনও পরিবর্ত্তনের সময় যাহা বোধ হয় স্বাভাবিক, ইহা তাহারই একটা অংশ মাত্র। ইংরেজীমিশ্রিত বাঙ্গালা যে কোন সম্প্রদায়েরই কথ্য ভাষায় পরিণত হয় নাই, তাহাও একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে। আমরা বন্ধু-বান্ধব মিশিয়া যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলি, আমাদের পুত্র-কন্যা ও পরিজনদের সহিত সে ভাষায় কায চালাইতে পারি না। দেশের সাধারণ লোকের সংস্পর্শে যখন আসিতে হয়, তখনই এই ভাষা পরিত্যাগ করিতে হয়। শুধু তাহাই নয়, যাঁহারা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহারা সকলে এক প্রকারের কথা ব্যবহার করেন না। শিক্ষা-দীক্ষার পার্থক্য

অনুসারে ইংরেজী শব্দের সংখ্যা ও শ্রেণীর বিশেষ পার্থক্য আছে।

যাহা ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ সকল বাঙ্গালীরই অবোধ্য, যাহার সমার্থক শব্দের আমাদের ভাষায় অভাব নাই, যে সকল শব্দের উচ্চারণের সহিত আমাদের ভাষার ধাতু-প্রকৃতির মিল নাই, অথচ যাহার ব্যবহার অপরিহার্য্য নয়, এমন সকল কথাকে সাহিত্যে স্থান দিবার ফলে, সেই সাহিত্য অধিকাংশ বাঙ্গালীর অপাঠ্য হইয়া উঠে। ইংরেজী শিক্ষা যেদিন অনেকটা অপ্রচলিত হইয়া যাইবে এবং আমাদের দাস-মনোবৃত্তি কমিবার সহিত ইংরেজী শিক্ষিতেরাও যখন সকল সময় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা গৌরব মনে করিবেন না, সেদিন এই সাহিত্যকে লোকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, আমাদের বর্ত্তমান বিকৃত অবস্থার ইহা পাকা দলিল হইয়া রহিবে এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গালা কথার মধ্যে ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে যে ইতরতা আছে ও সাহিত্যে এই সকল কথা বর্জ্জিত হইবার ফলে, যে ইতরতা ক্রমে দূর হইবার সম্ভাবনাও ছিল, তাহা সাহিত্যে গৃহীত হইবার জন্য কতকটা গৌরব ও স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

ইহা ব্যতীত, ইংরেজী-শিক্ষিতেরা যদি যথেষ্ট ভাবে তাঁহাদের লেখায় ইংরেজী শব্দ চালাইবার স্বাধীনতা গ্রহণ করেন, তবে যাঁহারা ফরাসী জানেন, তাঁহাদের ফরাসী শব্দ, সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃত শব্দ, হিন্দী অভিজ্ঞদের (বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে হিন্দীর চর্চ্চা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে) হিন্দী শব্দ, উর্দ্দুপন্থী মুসলমানদের উর্দ্দু শব্দ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ইহার ফলে সাহিত্য বহু ভাগে বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক ভাগেরই প্রচার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইবে। ইহাতে শৃঙ্খলাহীনতা ত' ঘটিবেই, পরন্তু সাহিত্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হইলে, পূর্ব্বে যে সকল অপকারের সম্ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহা ঘটিবে। তদ্ব্যতীত লেখকদের মনে রাখিতে হইবে যে, কথাবার্ত্তায় আমরা যে পরিমাণ ইংরেজীশব্দ চালাইয়া থাকি, সে পরিমাণ শব্দ লেখায় চালাইতে দুঃসাহসী লেখকেরাও সাহসী হইবেন কি না সন্দেহ। যে সকল লেখক লঘুচিত্ততার সহিত ইংরেজী চালাইতেছেন, তাঁহাদের প্রথমোক্ত দলকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইবে।

আর, যাঁহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের চরিত্রসৃষ্টির সময়ে সঠিক চিত্র আঁকিবার জন্য পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া ইংরেজী কথা বাহির করেন, তাঁহাদের অবশ্য অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা আছে। যদিও তাঁহাদের পক্ষেও এ সব কথা প্রযোজ্য—সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক—এবং এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিবার। আমাদের সকল শিক্ষিত লোকই বহু ইংরেজী শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। ইঁহাদের চরিত্র সঠিকভাবে আঁকিবার জন্য যদি ইঁহাদের যথাযথ কথাবার্ত্তা দিতে হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিনে তিন-চতুর্থাংশ ইংরেজী হইয়া যাইত। কিন্তু সাধারণ-ক্ষেত্রে ইংরেজীর ব্যবহার ব্যতীতও যখন চরিত্রসৃষ্টির পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে না, তখন দুই চারিটি বিশেষ ক্ষেত্রেও বা হইবে কেন? সাধারণ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর মুখে ইংরেজী শব্দ পুরিয়া না দিয়াও যেমন নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে, ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষ অগ্রসর ইংরেজী আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত ধনী ও অভিজাত বংশের লোকদের চরিত্রসৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনই ইংরেজী শব্দ বাদ দিয়া চরিত্রসৃষ্টি অসম্ভব না হইতে পারে। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা এ সম্বন্ধে অবহিত হইলেও কতকটা সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

আর্থিক অভাব

……বর্ত্তমানে যে জগদ্ব্যাপী আর্থিক অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সমস্ত উপায় আমূলভাবে পরিবর্ত্তিত না হইলে, তাহা অদূরভবিষ্যতে দূরীভূত হওয়া ত' দূরের কথা, উহা আরও ঘনীভূত হইবে এবং জগতে মানবজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষা করা ক্লেশকর হইয়া পড়িবে।……

যোগিনীর মাঠ

—শ্রীতারাপদ রাহা

গ্রামের শেষ প্রান্তে বুড়ো-বটতলায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়,—সমুদ্র বীচিবিক্ষোভিত লবণাম্বু-রাশির নয়, কখনও কমল-কুমুদ-পরিশোভিত কাক-চক্ষু স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের, কখনও সোনার বরণ ধানের, কখনও মটর-মসুর যব-গমের স্নিগ্ধ-শ্যামল সমারোহের। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে মাঠ দূরে, আরও দূরে গিয়া আকাশের সঙ্গে মিতালি করিয়াছে। চক্ষুকে বিশেষ ভাবে নির্য্যাতন করিলে শুধু একটা অতি-নিম্ন কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীরের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়, সমুদ্র পার হইয়া উহার নিকটে পৌঁছিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রাচীর নয়, আম-জাম-তাল-খর্জ্জুর-বংশ-পরিবেষ্টিত গ্রামের সূচনা।

দূর হইতে এই সমুদ্রের মাঝে ছোট বড় দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা চাষী নমঃশূদ্র পল্লী। বর্ষার জলে বিলের জল বাড়িয়া যখন মাঠ সত্যই সমুদ্র হইয়া উঠে, তখন এই উচ্চ ভূভাগগুলি ঠিক দ্বীপের মত দেখায়। দুই তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এই দ্বীপের মত গ্রামগুলির একটি হইতে আর একটিতে যাইতে হইলে, তখন নৌকা ও 'ডোঙ্গা' ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু নৌকা-চালনায় ইহারা সিদ্ধহস্ত। তীরের মত লম্বা নৌকায় যখন পাঁচ ছয়জন আরোহী মালকোঁচা মারিয়া, বৈঠা ফেলিয়া শব্দ করিয়া চলে, তখন দূর হইতেও লোকের সন্ত্রস্ত হইতে হয়। মাঝে মাঝে পনের বিশখানা নৌকা একসঙ্গে বাহিয়া চলে—হয় ত সে কিছুই নয়, শ্রীকোলের বা আবাইপুরের হাট করিয়া ফিরিতেছে, তথাপি কাহারও নৌকা বিলের মাঝে থাকিলে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে। এই দুই মাস আগে ভীম মণ্ডলের দল ছাড়া পাইয়া আসিয়াছে।

বর্ষার অন্তে ইহারা এই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে সোনার ফসল ফলায়। লাঙ্গলের ফলার আঘাতে তাহারা নিজেদের শৌর্য্যের পরিচয় দেয়, ক্ষেত 'নিড়াইতে নিড়াইতে' তাহারা এক সঙ্গে গান ধরে

চাঁদের নাহান মুখ রে কন্যার, পায়ে পড়ে কেশ...

বন্ধু, আমায় নিয়ে চলো, সেই চন্দ্রাবতীর দেশ।

মাঠের বিস্তৃত ভাগাড়ের পথে যাইতে যাইতে ইহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের প্রেমগীতি আপনার দাঁড়াইয়া শুনিতে হইবে। বাড়ী যদি আপনার কাছের কোন গ্রামে হয়—তবে আপনার ভয় নাই, ইহাদের কাছে আগাইয়া যাইবেন। গান শেষ হইলে ইহারা আপনাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইবে। দেবদাসপুরের জমীদারীর এলাকায় বসতি করে, এমন কোন লোকের ইহাদের কাছে কিছু ভয় করিবার নাই। কেন নাই, তাহা লইয়াই আমার এ কাহিনী।

প্রায় একশত বৎসর আগেকার কথা। কুমারের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া নব-গঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। নব-গঙ্গার অপর পারেও তখন ভাল করিয়া চাষ আবাদ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু সে কথা আমরা ভাল করিয়া জানি না। গ্রামের বুড়োবুড়ীদের কাছে শুনিয়াছি 'যোগিনীর মাঠে'র কথা,—যে মাঠ কুমার হইতে আরম্ভ করিয়া নব-গঙ্গার তীরে গিয়া মিশিয়াছে।

যোগিনীর-মাঠের পূর্ব্ব নাম ছিল 'গড়ের মাঠ'। এখনও ইহার এক অংশের নাম গড়ের মাঠ। গড় আর এখন নাই, কিন্তু মাঠে চাষ করিতে চাষীদের লাঙ্গলের ফলা এখনও মাঝে মাঝে কিসে লাগিয়া ঠং করিয়া বাজিয়া ওঠে! বিশ বছর আগেও নাকি এই মাঠে চাষ করিতে করিতে কুড়ান মণ্ডল দু'ঘড়া মোহর পাইয়াছিল। তাহার সন্তানেরা পাকা বাড়ী করিয়া দুধে ভাতে আছে।

গড়ের মাঠ এখন সবুজে, হলুদে, নীলে—চাষীর মনে স্বপ্ন জাগায়। কিন্তু তখন ছিল ঘন বন, নল-খাগড়া, হিজল গাছের ঘন জটলা। পাশের গাঁয়ের কেহ ভয়ে কাছে ঘেঁষিত না। কবে কোন্ হীরুদাস—গরুর জন্য ঘাস কাটিতে গিয়া 'বোনোলা' মহিষের কবলে পড়িয়াছিল এবং কেমন করিয়া সেই বীর হীরুদাস সেই ভয়ঙ্কর মহিষাসুরের

শিং ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, মহিষ দৌড়াইতে থাকিলে সে কি করিয়া এক হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আর এক হাতে কাস্তে দিয়া তার গলা কাটিয়াছিল, গ্রামের ঠাকু'মাদের কাছে সবিস্তারে তাহা এখনও শুনিতে পাইবেন। মহিষটা না কি বুড়ো বটতলা আসিয়াই হুমড়ি দিয়া পড়িয়াছিল।

মাণিক মিস্ত্রী এখন থুর্‌থুরে বুড়া হইয়াছে। তাহার কাছে গেলে শুনিবেন তাহার এক কাকা জোয়ান্ বয়সে গড়ের মাঠে কাঠ কাটিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। ভাঙ্গা কুঠীর ধারে সর্দ্দারপল্লীতে গেলে শুনিতে পাইবেন, বাদল সর্দ্দারের ঠাকুরদাদার ছোট ভাই না কি বরাহ-শিকারে গিয়া গড়ের মাঠ হইতে আর ফেরে নাই। বুনো মহিষ ও শূকরের সাথে বাঘেরও অভাব ছিল না বটে এ বনে : নলডাঙ্গার রাজা হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে আসিতেন, কিন্তু বুড়ো মাণিক ও বাদলের কাছে শুনিবেন, তাহাদের খুড়ো-ঠাকুরদাদাকে খাইয়াছে জঙ্গলের বাঘে নয়—কথাটা উচ্চারণ করিতে গিয়া তাহারা রাম নাম একশো আট বার উচ্চারণ করিয়া লয়, তারপর চোখ বুঁজিয়া বিড়বিড় করিয়া ইঙ্গিতে বলে, নেছে—ওই তো বাবু, তোমরা বিশ্বাস করো না! নেকাপড়া করে তোমরা লায়েক হোইছো, কিছুই বিশ্বেস করতি চাও না। কত রং বেরঙের ছিল জান? আমাগোরে মুনিব বিষ্টু ঠাকুরের ঠাক্‌'মা ঐ বুড়ো-বটতলা একবার পুজো দিতি গিছ্‌লো, তেনার সাথে দেখা হইছিল এট্টির—রাম রাম,—তার মাথা নাই, বুকের উপর আছে চোখ-মুখ আর দাড়ি—পা আর হাত পিছনের দিক ফিরানো।

তাহাদের কথা শুনিয়া আপনি যদি না হাসেন, তাহা হইলে শুনিবেন, এই সব বিদেহীদের সকলের আকার এমন কিম্ভূত-কিমাকার নয়, কেহ কেহ আবার পরম রূপসী নারী,—নাম তাদের পরী। ইহারা কাহারও প্রতি সুনজর দিলে তার পরম মঙ্গল হয়; ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য, সুন্দরী স্ত্রী সকলই লাভ হয়। উহাদের মুখেই শুনিবেন, মাণিক মিস্ত্রীর খুড়া আর বাদল সর্দ্দারের ঠাকুরদাদাকে লইয়াছে এই পরীতেই। কোন্ দেশে উড়াইয়া লইয়াছে তার ঠিক কি? কথা-প্রসঙ্গে শুনিবেন এই যোগিনীর মাঠের ইতিহাস :

ক্যান্ বাবু,—এই যুগ্নির মাঠ্‌টা ক্যামন্ ক'রে হলো, এ গ্রামটা ক্যামন্ ক'রে হলো, এহানে দেবদাস-পুরের জমিদারী ক্যামন্ ক'রে হলো? যশোর জেলার কোন জমিদার, এমন কি নলডাঙ্গার রাজা পর্য্যন্ত যে বন কিন্‌তি সাহস করলো না, নদে জেলার থে' জমিদার আ'সে হ্যাহানে তাজ্জব ব্যাপার বানায়ে দিলো বাবু!

এই তাজ্জব ব্যাপারের অনেক আশ্চর্য্য কথা আপনার কানে আসিবে, বুড়াদের কেহই তাহাতে পরীর অনুগ্রহের কথা আরোপ করিতে ছাড়িবে না, কিন্তু সে সব ভৌতিক ব্যাপার একেবারে উড়াইয়া দিলেও, যে কাহিনীটা আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়ায়, সেটিও কম রোমাঞ্চকর নয়।

জমিদার দেবদাস রায় লেখাপড়া কতদূর জানিতেন, সে খবর কেহ জানে না, কিন্তু অত বড় লাঠিয়াল, অত বড় জোয়ান না কি আজকাল আর দেখা যায় না। রূপও ছিল তাঁহার দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের মত, একবার যে দেখিয়াছে সে আর ভোলে নাই। পরিণত বয়সেও জন্মাষ্টমীর লাঠিখেলার প্রদর্শনীতে ভিন্ গ্রামের এক শত লাঠিয়ালের আক্রমণ হইতে লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তিনি লাঠি ঘুরাইতে থাকিলে তাঁহার গায়ে নিক্ষিপ্ত বর্শা বা লাঠি একটিও তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই, বরং তাঁহার লাঠির কৌশলে নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। তাঁহার সময়ে এ তল্লাটের বড় বড় সর্দ্দার লাঠিয়াল তাঁহার পায়ে লাঠি রাখিয়া গুরুজী বলিয়া প্রণাম করিয়াছে।

গড়ের মাঠে তাঁহার জমিদারীর প্রথম পত্তনের কথা লোকে এখনও গল্প করে। কাজলীর হাট করিতে যাইতে 'হাটুরে' নৌকা একদিন দেখিতে পাইল, কুমারের দক্ষিণ তীরে গড়ের মাঠের এক অংশ পরিষ্কার করা হইতেছে।

কি, কি, কি হচ্ছে ওহানে!—বৈঠা মারিতে মারিতে কেহ জিজ্ঞাসা করিল।

—যাবেন বাঘের প্যাটে, বোনালা মোষির শিংইর গুঁতোয় অক্কা পাবেন—কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল।

রাত্রে ব[illegible]খা গেল, কুমারের সেই নির্জ্জন অরণ্যময় তীরে আলো জ্বলিতেছে। এই ভয়ঙ্কর স্থানের পাশ দিয়া নৌকা চালাইতে সেদিন তাহাদের গা ছমছম্ একটু কম করিল! বাড়ী গিয়া তাহারা গ্রামের লোকের কাছে গল্প করিল, এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা। গ্রামের লোক হাসিয়া উঠিল: তোরা পাগল হইছিস্! ভূতি আলো জ্বালিছে ওহানে, ও 'আলো-ভুলো'র কাণ্ড!

—কিন্তু জায়গা সাফ কর্‌তিছে যে!

—ও তোমারে চোখির ভুল, ওরা অমনি করেই ত ধাঁধা লাগায় চোখি।

তারপর একটু থামিয়া বলিল, নইলি কুমোরের ধারে গড়ের মাঠে জা'গা সাফ হয়? বোলে নলডাঙ্গার রাজা মহারাজ হার মানে গেল, তা, এ ত কন্‌কার কেডা!··· ক্ষেপলি না কি তোরা?

কিন্তু পরের হাটে নৌকা বাহিয়া যাইবার সময় দেখা যায়, তাহারা ক্ষেপে নাই। কুমারের ধারে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের জঙ্গল আরও পরিষ্কার করা হইয়াছে। কুলিদের থাকিবার জন্য একটা চালা বাঁধা হইয়াছে, ভদ্রবেশী একজন লোক, বোধ হয় গোমস্তা হইবে, একটা জল-চৌকীতে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর তদারক করিতেছিল।

নৌকার বৈঠা ফেলিতে ফেলিতেই কৌতূহলী হাটুরে নৌকার লোক জিজ্ঞাসা করিল, এ্যহানে কি হবে গো?

—কাচারী।

—কাচারী!

—হাঁ।

—কন্‌কের কাচারী?

হুঁকার ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে গোমস্তাবাবু উত্তর দিলেন—নদে জেলার ইস্‌লামপুরির গো, জমিদার দেবদাস রায়ের কাচারী।

চঞ্চল বৈঠাগুলির আলোড়ন মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া যায়, কন্‌কের জমিদার বললেন?

—ইস্‌লাম পুরির। গোমস্তা হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের হাট করতে আর অতদূর যেতে হবে না।

হাটুরে নৌকার লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ওঠে। অত সুখ আর খাবেন না মশায়, আগে প্রাণডা নিয়া ফির্‌্যা যান!

গোমস্তা আর একবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলে, আচ্ছা দেখা যাক।

তিন চারটা হাটবারের পর যাহা দেখা গেল, তাহাতে হাটুরে নৌকার আরোহীদের মনে হইল, গোমস্তার কথা সত্য হইতেও পারে বা। কুমারের তীরে এই নির্লক্ষ্যের চরে পাকা বাড়ী করিবার সকল সরঞ্জামই আনা হইয়াছে, নৌকাভর্ত্তি চুণ-সুরকী রহিয়াছে, নদীর তীরে পরিষ্কৃত জায়গায় ইটের গাদা করা হইয়াছে। ভদ্রবেশী আরও দু'চারজন লোক ঘোরাফিরা করিতেছে, কুলির সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ঘাটে একখানা সুদৃশ্য বজরা বাঁধা রহিয়াছে।

হাট করিয়া রাত্রে ফিরিবার পথে হাটুরে নৌকার লোকেরা সেখানে তামাক খাইতে নামে।

—তা'লি পাকা বাড়ী হল বাবু?

—হুঁ, বলিয়া গোমস্তা রাখালবাবু কলিকা বাড়াইয়া দেন, এখানে হাটও বসবে, তোমরা সব এখেনে হাট করতে আসবে।

সেদিন আর হাটুরে লোকে সে কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল না, বলিল, হাট ত করবেন, কাচারীও বসালেন, কিন্তু প্রজা পাবেন ক'নে?

—প্রজা বসান হবে এই জঙ্গল কেটে।

হাটুরিয়াদের দুই চোখ কপালে উঠিয়া যায়, কি কলেন?

গোমস্তা হাসিয়া বলেন, এ জঙ্গল সাফ করা হবে।

—ঐ কাজডা করতি যাবেন না বাবু, বাপের দেওয়া প্রাণডা হারাবেন, নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর নিতি সাহস পান নি। এ জঙ্গলে—বলিতে বলিতে তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠে।

গড়ের মাঠের রহস্যময় ভীষণতাকে তাহারা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে, ইহার অপরাজেয়তা লইয়া তাহারা গর্ব্ব করে। কোন দুর্দ্ধর্ষ সুন্দরী কন্যাকে যেন তাহারা পরম স্নেহে পালন করিয়া আসিতেছে, বাহু বলে কোন বীর তাহার কৌমার্য্য-

ব্রত ভঙ্গ করিয়া ঘরণী করিয়া লইবে, এ তাহারা সহ্য করিতে চাহে না। কলিকায় টান দিতে দিতে তাহারা বলে, আপনাগারে বাবু আসবেন কবে?

—কোন্ বাবু?

—জমিদার বাবু গো, যিনি এই তালুক কিনিছেন?

—আসবেন শীগগিরই, দেখ না বজরা পাঠিয়েছেন!

—ঐ নৌকোয় থাকবেন বুঝি তিনি?

—হাঁ, যতদিন কাচারী বাড়ী তৈরী না হয়।

—বজরা ত আ'সে গেল, তিনি আ'লেন না যে! কিসি আসবেন তিনি?

—তিনি ঘোড়ায় আসবেন। ঘোড়ায়ই তিনি সব জায়গায় যান; যেখানেই যান আগে বজরা যায়, তারপর ঘোড়ায় চড়ে তিনি আসেন।

লোকগুলির কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল, তা'লিই হইছে!

—কেন?

—ঘোড়ায় চড়ে তিনি আসবেন কোন পথে শুনি? দেখতি পাচ্ছেন না, নদীর ধারে মানুষ যাবার পথ নেই। এহানকার লোকজন নৌকায় যাতায়াত করে। ডাঙ্গার পথ থাকলি কি আমরা এমনি দাঁড় ঠেলে' গা ব্যথা করি?

কথাটা অতিরঞ্জিত নয়, কুমারের ধারে নলখাগড়ার বনের ভিতর দিয়া কেহ পথ রচনা করিতে সাহস পায় নাই। বন্য শূকর, মহিষ, অজগরের উপদ্রব আর ভূতের ভয়ে গড়ের মাঠের কিনারা কেহ মাড়াইতে সাহস পাইত না। ভাঙ্গা কুঠীর ধারে কাঠ কাটিতে মাঝে মাঝে লোক আসিত, তাহাদের পায়ে পায়ে মাঝে মাঝে ছোট সঙ্কীর্ণ পথ দেখা যাইত, বর্ষার জলে সে পথ মিলাইয়া যাইত। যাহারা কাঠ কাটিতে গভীর জঙ্গলে যাইত, তাহাদের কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত, জঙ্গলে বসতি আছে, লোকের পায়ের চিহ্ন নাকি পাওয়া যায়। ভয়ে কিছুদিন আর কেহ জঙ্গলে ঢুকিত না। রাজা বাহাদুর যখন শিকারে আসিতেন, তাঁহার দলবলের সহিত অনেকে জঙ্গলে ঢুকিয়া এই ভৈরবীর হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করিয়া আসিত, সেখানে পশুর আস্ফালন অত্যধিক, কিন্তু মানুষের গতি-বিধির কথা একেবারেই মিথ্যা।

লোকে বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও দেবদাস বাবু একদিন সত্যই ঘোড়ায় চড়িয়া এই জঙ্গলের পথে আসিলেন, সঙ্গে চারজন মাত্র অশ্বারোহী লাঠিয়াল। ঘোড়া হইতে নামিয়াই দেবদাস বাবু বলিলেন, ভাল শিকারের জায়গা পাওয়া গেছে, কি বলিস রে শিবু?

শিবু তার বাবরী চুল দোলাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, হেঁ বাবু, একদিন যাব আমরা শিকারে।

শিবু ও তার বাবু তখনও ঘামে স্নান করিয়া উঠিতেছেন। গোমস্তা বাবুর হাতে পাখা দিয়া বলিলেন, আগে বিশ্রাম করুন, তারপর শুনবেন এখানকার বনের কথা, এখানে শিকারে যাওয়া হবে না আপনার।

ভ্রূ কোঁচকাইয়া দেবদাস বলিলেন, কেন?

—এখন নয়, আগে আহারাদি করে বিশ্রাম করুন, তার পর শুনবেন সে সব কথা।

স্নানাহার ও বিশ্রামের পর গোমস্তা যখন লোকমুখে শোনা বনের গল্প দেবদাস বাবুর কাছে সবিস্তারে বলিলেন, দেবদাস ত হাসিয়াই অস্থির!—শুনেছিস্ রে, শুনেছিস্ শিবু? তোদের রাখাল বাবুর কথা শুনেছিস্! কালই তোমার ভয় ভেঙ্গে দিচ্ছি…কালই শিকারে যাচ্ছি। কি বলিস্ রে শিবু!

দীর্ঘপথ অশ্বচালনা করিয়া শিবুর গায়ে ব্যথা হইয়াছিল, সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, তবু বাবুর উৎসাহ-দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে না বলিতে পারিল না। সে একবার বাবুর দিকে, একবার রাখালের দিকে চাহিতে লাগিল: বনের অবস্থা যে দেখিয়া আসিয়াছে, চার জন মাত্র লাঠিয়াল সঙ্গে করিয়া এই বনে শিকার করিতে যাওয়া যে নিতান্তই দুঃসাহস,এ কথা সেও বোঝে। অথচ বাবুর একটি প্রস্তাবের যে কি মূল্য, তাহাও তার অজানা নাই।

সকলের চেয়ে বেশী মুস্কিল গোমস্তা রাখালের। দেবদাস বাবুর মায়ের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বাবুর আপদে বিপদে দেখাশুনা করিবেন। রাখালবাবু অনেক দিনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, মা ঠাকুরাণীর তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস। তাই এই জমিদারী পত্তনের কাজে নায়েবকে রাখিয়া রাখালকে পাঠানো হইয়াছে। রাখাল বাবু সে

বিশ্বাসের উপযুক্ত মর্য্যাদা রাখিতে চান। এতদিন ধরিয়া দিনের পর দিন তিনি বনের রহস্যের কথা শুনিয়া আসিতেছেন, নিজে হয় ত তাহার অধিকাংশ কথাই বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল বনে বাবুকে তিনি কিছুতেই পাঠাইতে পারেন না,—বিশেষতঃ বাবু খেয়ালী। ছেলে বেলায় লেখাপড়ার চেয়ে লাঠিখেলা, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়াতেই ছিল তাঁহার আসক্তি; তাহার পর বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চার বৎসর কাটাইয়া সবে এক বৎসর হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনও যোগাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কি সব করেন। মা বিবাহের কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাবু কিছুতেই রাজী নন। তবু মন্দের ভাল, জমিদারীতে মন দিয়াছেন। ছেলেবেলার লাঠিখেলার সাথীদের ধরিয়া আনিয়া কাছারীতে পেয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ইস্‌লামপুর কাছারীতে সকল পেয়াদাই লাঠিয়াল। দেবদাস অনেকবার তাঁহার মাকে বলিয়াছেন, কি হবে মা বিয়ে করে, এত সন্তান আমার এদের পালন করতে হবে না!

মা সুন্দরী পুত্রবধূর স্বপ্ন ভুলিতে না পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন, ছেলে ত তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে!

রাখাল বাবু এ সব নিজের চোখে দেখিয়াছেন, চার বৎসর ধরিয়া মা ঠাকুরাণীর চোখের জলও দেখিয়াছেন, সুতরাং তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন, এখানে শিকারে যাওয়া আপনার হবে না, বাবু।

—কেন?

—এখানকার জঙ্গলটা বড় ভাল নয়, তা ছাড়া এ ত' আর বাদা নয় যে হরিণ মেরে খাবেন? এখানে যা পাওয়া যায় তার কিছুই আমাদের খাদ্য নয়।

—যথা?

—যথা, মোষ, বুনো শুয়োর, বাঘ, সাপ—

—তারপর?

—তা' ছাড়া আরও অনেক ভয়ের কিছু না কি আছে, লোকে বলে।

দেবদাস হাসিয়া উঠিলেন,—তোমার ভয় এখানেই বেশী, তা বুঝতে পেরেছি! তুমিও বোধ হয় প্রজাদের মত মনে কর পরীতে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

রাখাল বাবু অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, নাই বা গেলেন এত তাড়াতাড়ি, জানোয়ারের ভয় ত' আছে, আর বেশী লোকজনও এখন সঙ্গে নেই।

—তা হয় না রাখাল, একবার যা আমি মনে করি, তা' আমি করি, আর যে কাজে যত বিপদ বেশী, দেবদাস রায়ের সেই কাজ করতে আগ্রহ আর আনন্দ তত বেশী।

রাখাল বাবু সে কথা জানিতেন, আর জানিতেন বলিয়া তিনি ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, মা ঠাকুরুণের কাছে আজই লোক পাঠাচ্ছি আমি!

দেবদাস রাখাল বাবুকে ডাকিলেন, 'এদিকে এস।'

রাখাল বাবু আগাইয়া গেলেন।

দেবদাস তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমার কাছে তোমার কোন শাস্তি পেতে অপমান আছে?

রাখাল বাবু বলিলেন, না।

দেবদাস তাঁহার হাতে একটু চাপ দিতেই, উঃ উঃ লাগে!—বলিয়া রাখাল বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

দেবদাস হাসিয়া উঠিলেন, এমনি করে হাড় গুঁড়ো করে দেব, যদি মায়ের কাছে লোক পাঠাও। আমাকে কি তুমি আটাশে পেয়েছ না কি, যে বোন্‌লা শুয়োর আর মোষের ভয়ে মূর্চ্ছা যাব?

মা ঠাকুরাণীর কাছ হইতে এতদূরে তাহার পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিরুপায় রাখাল বাবুর চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। বাবুর যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে মা ঠাকুরাণীর কাছে তিনি কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন!

পরদিন অতি ভোরেই শিকারের আয়োজন চলিতে লাগিল। চার জন ছাড়া লাঠিয়াল সঙ্গে ছিল না, রাখাল বাবু বলিলেন, যদি বলেন ত' ওপার থেকে দু'চারজন সর্দ্দার এনে দি—ওরা ঐ বনে মাঝে মাঝে শূয়োর মারতে যায়।

দেবদাস হাসিয়া বলিলেন, তার আর দরকার নেই, যদি দু'একটা শূয়োর মারতে পারি, তাহলে বরং ওদের খেতে দেওয়া যাবে।

শিবু ও পঞ্চু সে কথায় সায় দিল। মহিষ শিকারেই তাহাদের বিশেষ ঝোঁক, বাবুর সঙ্গে থাকিয়া দু'চারটা বাঘ মারিয়াও তাহারা হাত পাকাইয়াছে, শুধু শিকারের আনন্দ ছাড়া শূকর মারিয়া তাহাদের কিছুমাত্র লাভ নাই, শূকর পাইলে তাহারা সর্দ্দারদেরই দিয়া দিবে।

কাঠের উপর বালি ঘষিয়া বর্শাগুলি ধারাল করিয়া তোলা হইল, বাবুর বন্দুকটা তেল দিয়া পরিষ্কার করা হইল।

নদীর ধার হইতেই ঘন জঙ্গলের যে ক্রম দেখা যায়, তাহাতে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যাওয়া অসম্ভব। সকালে কিছু জলযোগ করিয়া সকলে পায়ে হাঁটিয়া শিকারে রওনা হইল। রাখাল বাবু তাঁহার চাদরের ভিতর হাত রাখিয়া ঘন ঘন দুর্গানাম জপ করিলেন।

বনে ঢুকিয়া আধ মাইলের ভিতর বিশেষ কিছু মিলিল না। গাছে গাছে দু'চারিটা পাখী, কাঠবিড়ালী, বেজী, সজারু এই কেবল জানোয়ারের নমুনা। শিবু হতাশ হইয়া বলিল, বাবু মিছেই হয়রান্ হচ্ছি আমরা, ফিরে চলুন।—কিন্তু বাবু নিরুৎসাহ হইলেন না, একটু আগে কচু বনে তিনি শূকরের পায়ের চিহ্ন দেখিয়াছেন। বাঙ্কা চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবু ঐ যে নদী দেখা যায়!

দেবদাস তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন। শিকারে বাহির হইয়া এমন করিয়া দিক্ ভুল তাঁহার এই প্রথম। বুঝিলেন, এই জন্যই জানোয়ারের দেখা পাওয়া যাইতেছে না; ওপারের সর্দ্দারদের ভয়ে দিনের বেলা তাহারা নদীর গা ঘেঁষে না। দেবদাস এইবার দিক্ ঠিক করিয়া দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেন। বাবলা, 'পিঠেপোড়া', খেজুর গাছ অগ্রসর হইতে পথ দেয় না।—একটা সজারু ঝন্ঝন্ করিয়া পালাইতেছিল, বংশীর বর্শা গিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। নিধিরাম বলিল, মাছি মেরে হাত কালো করলি, বংশী!

কিন্তু আর মাছি মারিতে হইবে না, তাহাদের সম্মুখ দিয়া তিন চারিটা বড় শূকর পাশ কাটাইতেছিল, দেবদাসের বন্দুক হইতে গুড়ুম্ করিয়া শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটি শূকর আর্ত্তনাদ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। বংশী চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবু সাবধান!

দেবদাস দেখিলেন, সকলের চেয়ে বড় শূকরটি তীর বেগে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। দেবদাস গুলি করিতে যাইতেছেন, এমন সময় শিবু এক লাফে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া বর্শাটা একেবারে সোজা করিয়া ধরিল, চোখ দুটা যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়। শূকরটা ছুটিয়া একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলে শিবু তাহার বর্শার অগ্রভাগ শূকরের গ্রীবার নিম্নে বক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে ন্যস্ত করিল, একটু বলও সে প্রয়োগ করিল না। কি আশ্চর্য্য! জানোয়ারটা একটু সরিল না, এই সুতীক্ষ্ণ বাধার পথেই শিবুকে আক্রমণ করিতে ছুটিল! দেখিতে না দেখিতে শিবুর বর্শাটা তাহার বক্ষদেশ ভেদ করিতে চলিল, তখন দুই দিক হইতে পঞ্চু ও বংশীর আরও দুইটা বর্শা আসিয়া শূকরটার সকল যন্ত্রণা শেষ করিয়া দিল।

গ্রামের কোন জঙ্গলে এ শিকার হইলে রক্ষার জন্য একটি লোক রাখিলেই চলিত, কিন্তু এ ভীষণ অরণ্যে, যেখানে প্রতি পদেই মানুষের জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেখানে একটি লোককে প্রহরী রাখিয়া যাওয়া চলে না; আর শূকর যদি রাখিয়াই যাইতে হয়, তবে শিকার করিয়া লাভ কি? সুতরাং ঠিক হইল বংশী ও নিধি দুইটি মৃত শূকর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে, দেবদাস বাবু শিবু ও পঞ্চুকে লইয়া বড় শিকারের সন্ধানে আগাইয়া যাইবেন। বাঘ বা মহিষ না পাইলে আর শিকার করা হইবে না। বাঘ পাইলে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইবে, মহিষ পাইলে বাসায় গিয়া আরও লোক পাঠাইতে হইবে।

পায়ের চিহ্ন দেখিয়া দেবদাস বাবু বুঝিয়াছেন, এ বনে বাঘ ও মহিষ আছে। বাঘ-শিকার জীবনে তিনি করিয়াছেন নিতান্ত কম নয়, কিন্তু মহিষ-শিকারের সুযোগ জীবনে তাঁহার আর আসে নাই। মহিষের পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটা জায়গায় কয়েকটি মহিষ হয় ত ঘাস খাইতে উঠিয়া আসিয়াছিল, সেখান হইতে তাহারা যে দিকে চলিয়া গিয়াছে সে দিক ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। নল খাগড়ার বন ঘন হইতে ক্রমে ঘনতর হইয়া অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। জলাটার ধারে ধারে হিজলের বন সেগুলিও এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, মানুষের কথা দূরে থাকুক,

পশুদেরও সে পথে যাওয়া দুঃসাধ্য। দূর হইতে মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট কর্কশ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, দেবদাসের মনে আশা হইল, কিছু আগাইয়া গেলে হয়ত ভাল শিকার মিলিবে। পঞ্চু ও শিবুকে সঙ্গে লইয়া জলার ধারে ধারে হিজল-বনের পাশ দিয়া তিনি ক্রমে দক্ষিণ দিকে আগাইয়া চলিলেন। দূরে অস্পষ্ট গর্জ্জন বা কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছু নাই। জলাটা যেন ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে, আর একটু আগাইয়া গেলেও যদি মহিষ দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে আশা ত্যাগ করিতে হইবে, —আবার কতটা পথ অতিক্রম করিলে অন্য জলার সন্ধান মিলিবে, তাহাও বলা যায় না। দেবদাস আকাশে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইতে চলিল, আর একটু পরেই হয় ত ফিরিয়া যাইতে হইবে, দেবদাস আরও কত কি ভাবিতে যাইতেছিলেন, সহসা শিবু বলিয়া উঠিল, বাবু দেখুন—মানুষের পায়ের দাগ্।

দেবদাস দেখিলেন, সত্যই তাই। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত, একটা হিজল-গাছের নীচে কে যেন তামাক খাইয়া ছাই ফেলিয়া গিয়াছে, দাগ খুঁজিতে গিয়া শিবুই তাহা আবিষ্কার করিল। দেবদাস দেখিয়া বলিলেন, অন্য কোনও দল হয়ত শিকার করতে এসে থাকবে।

শিবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, অন্য লোকেও এখানে শিকার করতে আসে ?

—আসে বই কি ?

—আর তাদের আসতে দেব না।

—কেন রে ?

—এ ত এখন আমাদের এলেকা, আসতে দেব কেন তাদের ?

দেবদাস হাসিলেন;—বাঁয়ে নলখাগড়ার বন প্রায় শেষ হইয়া আসিল বটে, কিন্তু ডাইনে হিজল বন শিমুল ও রয়না গাছের সংমিশ্রণে দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার পর আবার কি এক লতায় ডাইনের বনটাকে একেবারে ছাইয়া দিয়াছে, দশহাত দূরে বনের মধ্যে কি আছে জানিবার কোনই উপায় নাই।

জলাটার ধারে ধারে দুই একখানা ভাঙ্গা ইঁটের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে, এই বিজন অরণ্যে ইহা কোথা হইতে আসিল, সেও এক সমস্যার কথা। এমন সময় বাঙ্গা চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবু বন্দুক ধরুন, শিবু, বল্লম ঠিক করে ধর, ঐ যে এল!

দেবদাস একটা হিজল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বন্দুকটা শক্ত করিয়া ধরিয়া জলার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুদীর্ঘ হোগলাবনের ভিতর হইতে একটা মহিষ-শিশু বাহির হইয়া আসিতেছে, পিছনে আর একটি, বোধ হয় তাহার মা। মানুষ দেখিবামাত্র ধাড়ী মহিষটা কেমন করিয়া তাকাইল, মুহূর্ত্তে তাহার চোখ দুটি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তারপর ক্রোধে সে এক ভীষণ গর্জ্জন করিল, সঙ্গে সঙ্গে জলার বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ভৈরব কণ্ঠ তাহার আহ্বানে সাড়া দিল।

শিবু বলিল, বাবু শীগগির গাছে উঠুন, নইলে নিস্তার নেই।

দেবদাস তাহা বুঝিলেন, তিনি ডান হাতে একটা ডাল ধরিয়া এক লাফে হিজল গাছে উঠিয়া বসিলেন, শিবু ও পঞ্চু বিদ্যুদ্গতিতে আর একটা গাছে উঠিল। মহিষটা তখন হিজল-গাছের নীচে আসিয়া গিয়াছে। দেবদাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, হোগলা বন ভেদ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে আরও অনেক মহিষ। শিকার করিতে আসিয়া এমন অবিবেচনার কাজ তিনি আর একটিবারও করেন নাই।

প্রথম মহিষটা রাগে উন্মত্ত হইয়া শিং দিয়া হিজল-গাছের গোড়ার মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। শিবু পাশের গাছ হইতে ডাকিয়া বলিল, বাবু, গুলি করুন, আমাদের বল্লম একবারের বেশী দু'বার কাজে লাগাতে পারবো না।

শিবুর বুদ্ধি আছে। সমস্ত বন কাঁপাইয়া দেবদাসের বন্দুক হুঙ্কার দিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিষ আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু হোগলার বন কাঁপাইয়া চোখ লাল করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে আরও অনেক মহিষ, প্রায় পনের বিশটি। দেবদাসের বন্দুক গাদিয়া লইতে যে সময় লাগিল, তাহাতে হিজলগাছের গোড়ার অর্দ্ধেক মাটী শিঙের গুঁতায় প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। দেবদাসের বন্দুক আবার বন কাঁপাইয়া তুলিল, তাহাতে মহিষ মরিল একটি

কিন্তু বাকিগুলি ক্রোধে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, তাহারা ভীম বিক্রমে হিজলগাছ ভূমিসাৎ করিতে লাগিয়া গেল। শিকার করিতে আসিয়া দেবদাসের এমন বিপত্তি আর কোন দিন হয় নাই। তিনি বুঝিলেন, বন্দুক আর একবার গাদিয়া লইবার আগেই হিজলগাছ মাটীতে পড়িয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ মহিষগুলির সুতীক্ষ্ণ শিংগুলি তিনি যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন

ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহিষগুলি শিবু ও বাঙ্গাকে তখনও দেখিতে পায় নাই। মুনিবের প্রাণ রক্ষা করিতে শেষ মুহূর্ত্তে কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়াই হউক, অথবা কাহারও জন্যই আত্মরক্ষার শেষ সম্বল ত্যাগ করিতে নাই, এই সুবিবেচনার জন্যই হউক, শিবু ও পঞ্চু তাহাদের বর্শা দুইটি তখনও নিক্ষেপ করে নাই।

সহসা পিছনের লতামণ্ডপ ভেদ করিয়া দু'খানি শক্ত গাছের ডাল আসিয়া বাঙ্গা ও শিবুর ডান হাতের কব্জীতে সজোরে আঘাত করিল। এই আঘাতের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না, বর্শা দুইটি মাটীতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই লতার দেওয়াল ভেদ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন জোয়ান, মালকোচা দিয়া কাপড় পরা, হাতে ঢাল ও শড়কি—মুখে পাবা দিয়া এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে তীরের মত বাহির হইয়া আসিল।

মহিষগুলি মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হইল, তারপর ভীম বিক্রমে এই নবাগত শত্রুদের আক্রমণ করিল। কিন্তু সে আক্রমণ একেবারেই নিষ্ফল, শিংএর সম্মুখে ঢাল রাখিয়া এক সঙ্গে পঞ্চাশটা শড়কি চলিল। মহিষাসুর ও মানুষের যুদ্ধে বনের মাটী কাঁপিয়া উঠিল।

সহসা লতামণ্ডপের ভিতর হইতে শিঙ্গাধ্বনি হইতে, কয়েকটি লোক গিয়া বাঙ্গা ও শিবুকে বাঁধিয়া ফেলিল, চোখে তাহাদের গামছা বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে পাঁচ ছয়টা মহিষ শড়কির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইলে বাকীগুলি বিকট শব্দ করিতে করিতে পলাইয়া গেল।

দেবদাসের চোখের উপর যেন ভোজবাজী হইতেছিল, এতক্ষণে তিনি নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। বন্দুক গাদা মারা হয় নাই, হইলেও এত বড় দলের মাঝে, বিশেষতঃ যাহারা তাহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের উপর বন্দুক ব্যবহার করা চলে না।

একজন বেঁটে জোয়ান দেবদাসের নিকট আগাইয়া গিয়া বলিল, এইবার ওডা ফ্যালাও।

দেবদাস বন্দুকটা ছাড়িয়া দিলেন। বেঁটে লোকটা বন্দুকটা কুড়াইয়া লইয়া একবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, এইডে নিয়ে এই বনে এতদূর আসতি সাহস করিছ তুমি?

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক একটা লোকের হাতে বন্দুকটা দিয়া সে বলিল, যা দৌড়য়ে যা, 'বড় সর্দ্দারের হাতে দিয়ে আয়।

লোকটা দৌড়াইয়া কোন দিকে যায় দেখিবার জন্য দেবদাস চোখ ফিরাইতেছিলেন, বেঁটে লোকটা ঢাল দিয়া আড়াল করিল। দেবদাস একটা লাফ দিয়া ঢাল ছাড়াইয়া দেখিয়া লইলেন, বন্দুক লইয়া লোকটা লতা-আস্তরণের ভিতরে ঢুকিতেছে।

দেবদাসের চারিদিকে তখন ঢাল-শড়কিওয়ালা লোকগুলি ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বলিষ্ঠ লোক হুকুম দিল, বাঁধ ওরে, হাত-পা বাঁধে চোখ ঢা'কে দাও।

বেঁটে লোকটা বলিল, তুমি আস ছোট সর্দ্দার, আমি পারব না।

—মরদ না তুমি?

ছোট সর্দ্দার একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, এই সব, ওরে বাঁধ ত। বেঁটে লোকটার না পারার কারণ তাহার কাপুরুষতা নয়, দেবদাসকে দেখিয়া কেন যেন তার মনে একটা দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। ছোট সর্দ্দারের শ্লেষে উত্তেজিত হইয়া বেঁটে লোকটা তাহার কোমরের গামছা খুলিয়া দেবদাসের চোখ বাঁধিতে যাইতেছিল, ছোট সর্দ্দারের ইঙ্গিতে আরও আট দশজন লোক ছুটিয়া আসিতেছিল, এমন সময় এক অসম্ভাবিত কাণ্ড ঘটিয়া গেল, দেবদাসের লাথি খাইয়া বেঁটে লোকটা গড়াইয়া পড়িল, চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে দেবদাস তার ঢাল ও বল্লম কুড়াইয়া লইয়া বন্দী পঞ্চু ও শিবুর প্রায় গায়ের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য এতগুলি জোয়ান লোক সব থ হইয়া গেল। এখনই কি কাণ্ড

আরম্ভ হইবে দেবদাসের তাহা অজানা ছিল না, বল্লমের সুদৃঢ় বংশদণ্ডের মধ্যভাগ ধরিয়া লাঠি বানাইয়া বাঁ হাতে শিবু ও বাঙ্গার বাঁধন খুলিতে লাগিলেন। প্রলয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের গভীর নীরবতার মত এই ভীষণ লোকগুলি কিসের প্রতীক্ষায় যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। সহসা ছোট সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চালা' লাঠি, চালা' শড়কি, ওডারে গাঁথে' নিয়ে চল বড় সর্দ্দারের কাছে।

বাঙ্গা ও শিবু তখন বন্ধনমুক্ত হইয়া বল্লম লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছোট সর্দ্দার দেবদাসকে শড়কিতে গাঁথিবার হুকুম দিল বটে, কিন্তু কার্য্যত: তাহাকে বিদ্ধ করা অত সহজ হইল না। দেবদাসের অঙ্গের চারিদিকে কঠিন বংশদণ্ড তখন বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতেছে। বিপক্ষ পক্ষ হইতে যতগুলি বর্শা নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার প্রত্যেকটি ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরই আঘাত করিতে লাগিল, যে ঢালে রুখিতে পারিল, সে বাঁচিল, যে না পারিল, তাহার অঙ্গ বিদ্ধ হইল। বাঙ্গা এবং শিবুও আত্মরক্ষা করিতে প্রাণপণ লড়িল।

এতগুলি শক্তিশালী শত্রুর হাতে তাহাদের নিস্তার নাই, তাহা তাহারা জানিত। তবু লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহারা ক্রমে পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

এই বিজন বনের ভিতর ইহাকে মারিয়া ফেলিলে ইহার গলার হার, হাতের অঙ্গুরী ও তাগা ছাড়া আর কিছু লাভ হইবে না, কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে কৌশলে বেশী কিছু লাভ হইতেও পারে—এই ভাবিয়াই ছোট সর্দ্দার দেবদাসকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দেয় নাই।

দেবদাস একা এতগুলি লোকের সঙ্গে লড়িয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, বাঙ্গা ও শিবু আগেই আহত হইয়া পড়িয়াছিল। আর নিস্তার নাই জানিয়াও লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দেবদাস ক্রমে পিছাইয়া যাইতেছিলেন,' তাহা ছাড়া আর কি করিবারই বা ছিল?

পিছাইতে পিছাইতে দেবদাস যখন আর একটা হিজল-গাছের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, ছোট সর্দ্দার ও বেঁটে লোকটা একটা মোটা দড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া দেবদাসকে গাছের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল। দেবদাস এতক্ষণ লাঠি-চালনায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইবার পনের বিশজন লোক তাহার উপর পড়িয়া তাহার হাতের লাঠি কাড়িয়া লইল। দেবদাস বন্দী হইলেন। বেঁটে লোকটা আসিয়া গামছা দিয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া দিল। ডাকাতের দল হাতের থাবা মুখে দিয়া একটা ভয়ঙ্কর শব্দের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিল।

সারাদিনের পরিশ্রম, যুদ্ধের উত্তেজনার পর একটা দারুণ অবসাদ, ভাগ্যের ক্রূর পরিহাস—সকলে মিলিয়া দেবদাসকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার উপর তাঁহার চোখ বাঁধা, কোন্ পথে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে পঞ্চু ও শিবুরই বা কি হইল - কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ যাইবার পর দেবদাস অর্দ্ধচেতনার ভিতরেই বুঝিলেন, বাহকেরা ক্রমে যেন একটু উচুতে উঠিতেছে, মাটী যেন ক্রমে শক্ত, এমন কি স্থানে স্থানে কঠিন প্রস্তরময় বোধ হইতে লাগিল।

উচুতে একটা অপেক্ষাকৃত সমান জায়গায় নিয়া লোকগুলি এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, জয় কালী মাইকি জয়, জয় বড় সর্দ্দার কি জয়, জয় যোগিনী মাইকি জয়!

হুঙ্কার শুনিবামাত্র কে যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিল, বল জয় কালী মাইকি জয়! বামা কণ্ঠ!—সুরটা নিখাদে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ রেখাবে নামিয়া গেল। দেবদাস বিপন্ন অবস্থাতেও ভাবিলেন, ভৈরবীর কণ্ঠে মাধুর্য্য আছে,—কিন্তু উৎসাহটা থামিয়া গেল কেন?

একটা গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠে কে যেন বলিল, মা তুই ঘরে যা, আজ তুই থাকতি পাবি নে এ্যাহানে।

মেয়েটি বোধ হয় এরূপ আজ্ঞা শুনিতে অভ্যস্ত নয়, প্রত্যুত্তরে বলিল, ক্যান্, আগে ত কোনও দিন বারণ করো নি!

—আমি বুলতিছি, তুই ঘরে যা।

মেয়েটি দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষীণ পদশব্দে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। দেবদাস এমন বিপন্ন অবস্থায়ও কান পাতিয়া তাহা অনুভব করিল। মেয়েটি নিশ্চয় বুড়ের কন্যা!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিচিত্র জগৎ

পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পা'রী সহরে ছ'জন আমেরিকান ভ্রমণকারী এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা আমাজন নদীর উপত্যকার সমগ্র অংশ ভ্রমণ করে ঐ দেশ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন। এঁদের অধিনায়ক ডাঃ স্বর্জ্জ।

এই ভ্রমণ নিছক সখের জন্যে নয়। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট অবিশুদ্ধ রবার উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে নিজের খরচে ডাঃ স্বর্জ্জের অধীনে পাঁচজন রবার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আমাজনের উপত্যকায় পাঠিয়েছিলেন। দশমাসে তাঁরা বিশ হাজার মাইলের উপর ভ্রমণ করেন এবং আমাজন নদীর শাখা-প্রশাখা নিয়ে সাঁইত্রিশটি নদী বেড়িয়েছেন। ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট একখানি ভাল ষ্টীমার পাঠিয়ে এঁদের সাহায্য করেছিলেন। বলিভিয়া ও পেরুর গবর্ণমেণ্টও তাঁদের দেশে অবস্থানকালে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই সব সাহায্য না পেলে হয়ত ডাঃ স্বর্জ্জ ও তাঁর দলের কাজ সহজ হয়ে উঠত না—কারণ আমাজন নদীর উপত্যকা অতি বিষম অরণ্যসঙ্কুল স্থান। দুর্দ্দান্ত অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচারে ইতিপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে অনেক ভ্রমণকারী বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন।

ব্রেজিল রাজ্যে ভ্রমণকালীন ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের চার জন প্রতিনিধি সব সময় এদের সঙ্গে বেড়াত। এই চার জন লোকের প্রত্যেকেই আমাজন নদীর ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। যেখানে ষ্টীমারে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে এঁরা ষ্টীমলঞ্চে ভ্রমণ করেছিলেন। ষ্টীমলঞ্চও যেখানে অচল, সেখানে ডোঙায় বা ভেলায়। ৪০০ মাইল যেতে হয়েছিল অশ্ব ও অশ্বতরপৃষ্ঠে। চার পাঁচ শত মাইল হাঁটতে হয়েছিল।

আমাজন নদীর নামের উৎপত্তি একটা আষাঢ়ে গল্প থেকে।

এই গল্পের বক্তা ফ্রান্সিস্কো ওর্লেনা বলে একজন পর্য্যটক, রিওমার নদীর ঘোলাজলে ডোঙা বেয়ে গিয়ে



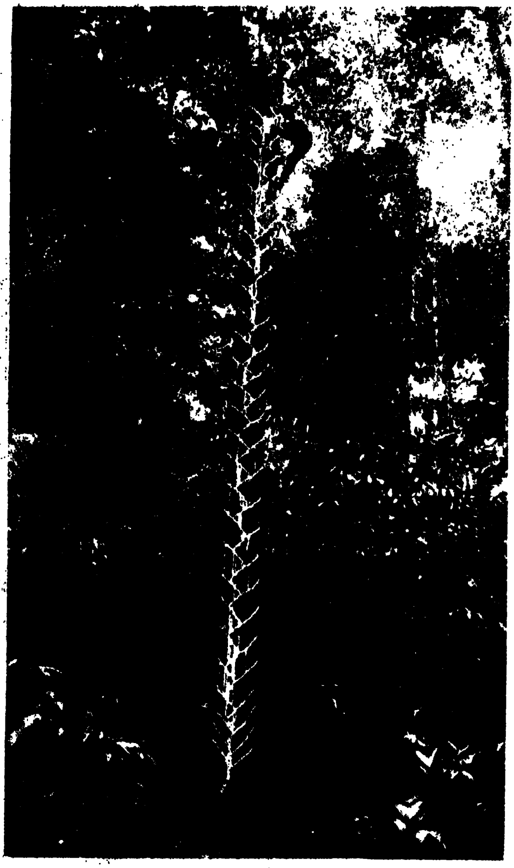
হুইটোটো ইণ্ডিয়ান : আমাজন নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলের বহু উপজাতির অন্যতম। ইহাদের বিচিত্র অলঙ্কার দ্রষ্টব্য।

শ্বেতকায় ব্যক্তিদের মতে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ব্রেজিলের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে রবারের গাছ আবিষ্কার করেন।

১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের বিখ্যাত রৌপ্যখনি আবিষ্কারের আশায় ঘোর অরণ্যমধ্যে ভ্রাম্যমাণ বিপদগ্রস্ত

স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক গন্‌জালো সিজারো এঁকে প্রেরণ করেন সৈন্যদলের জন্য খাদ্য খুঁজে বার করতে।

ফ্রান্সিস্‌কো ওর্লেনা একটি মাত্র নদী বেয়েই ভাঁটার দিকে চললেন। নদীটি রিওনার। কয়েক মাস ধরে অনবরত চলতে চলতে তিনি পৌছলেন আটলান্টিকে। স্পেনে পৌছে ইনি গল্প করেছিলেন যে, এই ভ্রমণের সময়



পাটাপার্চা বৃক্ষ: রসের জন্য গা কাটা হইয়াছে।

তিনি একদল বীরনারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে অতি কষ্টে উদ্ধার পেয়ে এসেছেন।

এই নারীসৈন্য মাথায় খুব লম্বা চুল রাখে। এরা ধনুর্ব্বাণ চালনায় সুনিপুণ। এদের দেহ সুগঠিত, যদিও দেখতে খুব সুশ্রী নয়। ট্রম্বেটা নদীর ধারে এই নারীদলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

খুব সম্ভব ওর্লেনার এ গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা। হয় ত দীর্ঘকেশ ইণ্ডিয়ানদের দেখে ওর্লেনা এ কথা বলে থাকবেন। কিংবা হয় তো কথাটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মুগ্ধ স্বদেশবাসীর চোখে আরও বড় হবার আশায় ওর্লেনা এই গল্প করে থাকবেন। মোটের উপর, সত্য হ'ক, মিথ্যে হ'ক, সেই গল্প থেকেই নদীর নাম হয়ে গেল এই বীরনারীদের নামে। সে বহুকালের কথা হ'ল। ওর্লেনার নদীভ্রমণের পরে বহু পর্য্যটক আমাজন নদীর আরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু সেই নারীদলের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কারও সাক্ষাৎ হয় নি।

পেরুর ভীষণ গৃহযুদ্ধে কিছুদিন পরে সিজারো ভ্রাতাদ্বয় হত হন এবং লোপ ডি এগুইর আমাজন নদীর আরণ্য ভূমিতে একদল সৈন্যসহ প্রবেশ করেন। এই লোপ ডি এগুইর যে কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিলেন, যাঁরা প্রেস্‌কটের পেরুর ইতিহাস পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন। লোপ ডি এগুইর পর পর দুজন সেনাপতিকে হত্যা করে ঐ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাজনের গভীর জঙ্গলে কোথায় না কি ধনরত্নপূর্ণ নগরী লতাপাতার আড়ালে লুকানো আছে, সেই স্থান খুঁজে বার করা। বলা বাহুল্য, এমন কোন প্রাচীন নগরীর সন্ধান তিনি পান নি। অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য পথকষ্টে মারা যাওয়ায় পরে বাকী অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় নিজে ফিরে এসেছিলেন।

জনৈক পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক পেড্রো ডি ট্যাক্সিরা পূর্বদিক থেকে নদী বেয়ে সাও পাওলো পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হন এবং অনেক জায়গায় পর্ত্তুগালের পতাকা উত্তোলিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে দুইজন মার্কিণ নৌবিভাগের কর্ম্মচারী আমাজন নদী ও অরণ্যপ্রদেশের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন। তখন স্পেনীয় অভিযান ও বিজয়ের দিনগুলি প্রাচীন অতীতে পর্য্যবসিত হয়েছে, পিজারোর দলের কাজকর্ম্ম উপকথায় দাঁড়িয়েছে, অরণ্যের মধ্যে লুকান ধনরত্নপূর্ণ প্রাচীন নগরীর কথা আর কেউ চিন্তা করে না, তখন লোকে আমাজনের অরণ্যে উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্বে অধিক উৎসাহী।

এই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হুমবোল্ট ও ফরাসী উদ্ভিদতত্ত্ববিদ কাসলনো; ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বেট্স্ ও ওয়ালেস। উপরোক্ত নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারীদ্বয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আন্ডিজ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অতিক্রম করে আমাজন নদীতে নৌকা ভাসান এবং বেনি ও লা পাজের পথে বহু দূর পর্য্যটন করেন। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্টের কাছে এঁরা আমাজন নদীর ভৌগোলিক তথ্য বিষয়ক যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, জগতের মধ্যে তা অতি উচ্চদরের ভৌগোলিক বিবরণের মানদণ্ড বলে আজও গণ্য হয়।

অন্যান্য পর্য্যটকের মধ্যে দুজন মহিলা পর্য্যটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

একজন হচ্চেন মাদাম কুদ্রু। পা'রা ষ্টেটের নদীগুলি ভ্রমণ করে দেখা ছিল এঁর প্রধান কাজ। এঁর স্বামী এই কাজ করতে গিয়ে মারা পড়েন। স্বামীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। আর একজন মহিলা পর্য্যটক হচ্ছেন ডাঃ এমিলিয়া স্নেথলেজ; ইনি সুইস বৈজ্ঞানিক, জিঙ্গু ও টাপাজো নদীপথে ইনি যে ভীষণ দুর্গম আরণ্য অঞ্চলে যাত্রা করেছিলেন, স্থানীয় রবার-চাষীরাও সে অঞ্চলের সন্ধান রাখত না।

এ সব বিখ্যাত পর্য্যটকদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেল্টের নাম ভুলে গেলে চলবে না। ১৯১৩-১৪ সালে অনেকখানি আরণ্যভূভাগে,—প্রকৃতপক্ষে বিচার করে দেখলে মাতো গ্রাসো থেকে আরাওয়া নদী পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে ইনি পর্য্যটন করেন এবং অনেক পূর্ব্বপ্রচলিত ভুল ধারণার খণ্ডন করেন।

রবার বৃক্ষের সন্ধানে যারা আমাজনের অরণ্যে ঢুকেছিল এবং জীবন তুচ্ছ করে বহুদূর অঞ্চল ভ্রমণ করে অনেক নতুন ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিল—এদের দ্বারা আমাজন ভূভাগের অনেক অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। রবারের সন্ধানে বেরিয়ে সুয়ারেজ বলিভিয়াতে প্রায় একটা সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই দলের মধ্যে এক দল নিরক্ষর পেরুভিয়ান্ রবার-সংগ্রাহক আমাজন জঙ্গলের অত্যন্ত ক্ষতি করেছে। এরা জংলী রবার গাছ অনুসন্ধান করে বেড়াত এবং যেখানেই এর জঙ্গল দেখত, রবার সংগ্রহের জন্যে নিষ্ঠুরভাবে নির্ম্মূল করে আবার নতুন অঞ্চলে নতুন গাছের সন্ধানে রওনা হত। এদের নির্ম্মম হস্তচিহ্ন দেখা যাবে জিঙ্গু নদীর দূরে ব্রেজিল ও বলিভিয়ায় তাবৎ আরণ্য অঞ্চলে।

দৈর্ঘ্যে আমাজন খুব বড় নদী না হলেও এর শাখানদী সংখ্যায় এত বেশী এবং আমাজন নদীর অববাহিকা এত বিস্তৃত যে, আমেরিকার মধ্যে ত বটেই, পৃথিবীর মধ্যে এ যে অন্যতম বৃহৎ নদী, এ বিষয়ে ভৌগোলিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই।



আমাজন-বক্ষে ভাসমান কুমীরের দল।

পেরুভিয়ান্ আণ্ডিজের এক উচ্চ মালভূমির উপরকার পার্ব্বত্যহ্রদ থেকে বার হয়ে আমাজন নদী এক বিরাট খাতের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর সোজা উত্তরে চলে গিয়েছে। তারপর হঠাৎ পূর্ব্বদিকে গতি ফিরিয়ে আণ্ডিজ পর্ব্বতের শেষ হ্রদের মধ্যে দিয়ে কেটে বেরিয়ে আমাজন নদী সমতল উপত্যকাভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই জায়গাটার নাম পঙ্গো। পঙ্গোতে আমাজন নদী প্রায় ৫০ ফুট চওড়া, এর স্রোতও অত্যন্ত খরতর। কিন্তু দু'হাজার মাইল নীচের দিকে আমাজন নদী এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপার প্রায় দেখা যায় না।

ব্রেজিলের মধ্যে যখন আমাজন প্রবাহিত, তখন এর

খাত একটা নয়, সাধারণতঃ তিন চারটি। মাঝে মাঝে আড়াআড়ি অবস্থায় অন্য নদীও একে কেটে গিয়েছে। কেবল ওবিডোস্ নামক স্থানে আমাজন নদীর খাত একটি মাত্র। এখানে নদী হাজার ফুটেরও কম চওড়া, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় দু'মাইলের বেশী নয়। গভীরতা ৩৫০ ফুট।

আমাজন নদীর শাখানদীগুলিও অত্যন্ত বৃহৎ। নামেই তারা শাখা, অনেক সময় আয়তনে ও জলরাশির বিপুলতায় প্রধান নদীখাতের অপেক্ষাও বড়। কোন কোন শাখানদীর আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে, যেমন ম্যাডিরা ও নিগ্রো নদী। শেষোক্ত নদী দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলম্বিয়ার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ও গভীর অরণ্যাহত ভূ-ভাগের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসছে এবং এই বনের মধ্যে কোথাও



নিগ্রো ব্রঙ্কোর বুকে কচ্ছপকুল।

ব্রেজিলের অন্যতম বৃহৎ নদী ওরিনাকোর সঙ্গে এর সংযোগ হয়েছে। নিগ্রো নদী অত্যন্ত চওড়া। বয়েম্ নামক স্থানে এর এক দিকের পার থেকে অপর পারের ব্যবধান আট মাইল। শাখানদীগুলির গতিও বিচিত্র ধরণের।

এর কোনটা সমস্ত পথই এঁকে বেঁকে গিয়েছে। কোনটা সোজা চলেছে সারাপথ, যেমন ব্রঙ্কো ও টাপাজোস্ নদী। কোন নদীর জল কালো, যেমন নিগ্রো নদী। জল কালো বলেই নদীর নাম ওই। ব্রঙ্কো নদীর জল আবার কাচের মত নির্ম্মল। দুধের মত সাদা রংয়ের জল, এমন নদীও আছে—গুয়াসোর। কথাটার মানেই 'দুধ'।

কিন্তু অধিকাংশ নদীর জলই গৈরিক, যেমন আমাজন নদীর। এর প্রধান খাতের জল অত্যন্ত ঘোলা।

আমাজনের শাখানদী সমূহের নামগুলি প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের প্রদত্ত। কতকগুলি তাদের দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত, যেমন জিঙ্গু, পারো ও জুরুয়া নদী। বৈদেশিক পর্য্যটক ও আবিষ্কারকদের নামেও অনেক নদীর নামকরণ করা হয়েছে, যেমন স্মিথ্, ওর্টন, রুজভেল্ট নদী।

ম্যাডিরা নদীর ধার দিয়ে রেলপথ প্রস্তুত করা হয়েছে বহুব্যয়ে। পূর্ব্বে বলিভিয়া রাজ্যের রবার নদী ও জঙ্গলের পথে আসতে অনেক দেরী হত। ম্যালেরিয়া ও অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের হাতে অনেক লোক পথে মারা পড়ত। নদীর খরস্রোতে অনেক রবার-বোঝাই ডোঙ্গা ডুবে যেত।

১৮৭০ সালে কর্ণেল চার্চ্চ নামে জনৈক মার্কিন এঞ্জিনিয়ার রেলপথের কল্পনা করে বলিভিয়ান্ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নি, কারণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি। ১৮৭৮ সালে ফিলাডেলফিয়া সহরের একটি কোম্পানী রেলপথ প্রস্তুতের ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়ে কাজ আরম্ভ করে দেয়।

কিন্তু আমাজন নদীর আরণ্য অঞ্চল শ্বেতকায় লোকের পক্ষে যমালয় স্বরূপ। যে বৎসর রেলপথের কাজ সুরু করা হ'ল, বছর শেষ হবার পূর্ব্বেই রেলপথ তৈরীর কল্পনা ত্যাগ করে কোম্পানীর লোকজন যারা তখনও বেঁচে ছিল, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল।

১৯০৩ সালে ব্রেজিলের সঙ্গে বলিভিয়ার যুদ্ধ হয় এবং ঐ বৎসরেই উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট ম্যাডিরা নদীর তীরে রেলপথ বসাতে বাধ্য থাকেন। কারণ বলিভিয়া নিজের রাজ্যের খানিকটা অংশ ব্রেজিলকে ছেড়ে দিয়েছিল সন্ধি অনুসারে। রেলপথ তৈরীর কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় বিখ্যাত মার্কিন এঞ্জিনিয়ার মিঃ পার্সিভালকে।

রেলপথের কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমস্যা আবার দেখা দিলে। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর ও বেরিবেরিতে লোকে হাজারে হাজারে মরতে লাগল। ছ'শো আর্শাণ মজুরের মধ্যে চারশো কয়েক মাসের মধ্যে মারা পড়ল।

গ্রীক ও স্পেনীয় মজুরেরা অপেক্ষাকৃত কম ভুগল বটে, কিন্তু তাদের কাজ করবার শক্তি অনেক কমে গেল।

রেলপথ যখন জাসি-পারানা পর্য্যন্ত পৌঁছেছে, তখন অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে, কাজ প্রায় অচল, একটা



আমাজনের বুকে।

মজুরও সুস্থ নেই, যারা একটু ভাল আছে, তারা আমাশয়ে ভুগছে। ১৮৭৮ সালের মত এবারও রেল-তৈরীর কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে এমনই দাঁড়াল ব্যাপারটা।

এই বিপুল চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্যে কোম্পানী উঠে পড়ে লাগল। প্রতি বৎসর দু টন কুইনিন্ আমদানী করার ব্যবস্থা হল এবং প্রত্যেক লোককে দৈনিক আহার্য্যের সঙ্গে কুইনিন্ খেতে দেওয়ার নিয়ম প্রচারিত হল।

মশার উপদ্রব নিবারণের জন্যে সমস্ত তাঁবুর দরজা জানালায় সরু তারের জালির পর্দ্দা টাঙানো হ'ল। বড় হাঁসপাতাল তো ছিলই, তা ছাড়া অনেক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে ছোট হাঁসপাতাল ও সমগ্র লাইনে হাঁসপাতাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হ'ল।

মার্কিন যুক্তরাজ্য থেকে ভাল ভাল ডাক্তার আনা হ'ল, তাঁরা মোটর-ট্রলিতে লাইনের সর্ব্বত্র সারাদিন ঘুরে কুলি-মজুরদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসা কাজে ব্যস্ত রইলেন।

ক্যাণ্ডেলেরিয়া নামক স্থানে বড় হাঁসপাতাল বসা'ন হ'ল। লাইনের বিভিন্ন তাঁবুতে যারা সাংঘাতিক অসুস্থ, তাদের এই কেন্দ্রীয় হাঁসপাতালে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ল। ১৯০৮-১১ সালে ক্যাণ্ডেলেরিয়া হাঁসপাতালে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০,৪৩০ রোগী আনীত হয়েছিল।

মানুষের অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির এত বড় জয় আর হয় নি। লোকালয় থেকে বহু দূরে দক্ষিণ-আমেরিকার এই ঘোর জঙ্গলাবৃত স্থানে প্রকৃতির সঙ্গে, রোগের সঙ্গে, পূর্ত্তবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই যে মহাযুদ্ধ, কোন ইতিহাসে এ যুদ্ধের কথা লেখা নেই, এ সব কথা ইতিহাসে লেখা থাকেও না—এই বিরাট যুদ্ধে শেষকালে জয়ী হয়েছিল মানুষ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রেলপথ তৈরীতে এত বিলম্ব হয়ে গেল যে, ও থেকে আর আর্থিক সুবিধা হ'ল না। রবার রপ্তানীর সুবিধার জন্যই রেলপথ করা। কিন্তু ১৯১১ সালের পরে বাজারে রবারের দাম অত্যন্ত নেমে গেল, বলিভিয়া থেকে আনীত রবারের চাহিদা কমে গেল বাজারে; তার উপর এদিকে রেলরাস্তা প্রস্তুত করবার ব্যয়ের অঙ্ক দেখে ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের চক্ষু স্থির হ'ল। রেল তৈরীর মোট ব্যয় পড়েছিল ত্রিশ কোটী ডলার।

রেলপথে ট্রেন চালানোর কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে একটি বিটিশ কোম্পানী।



আমাজন নদীর একপ্রকার মাছ: মানাটি।

এ জন্যে ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট খরচ বাদে কিছু কমিশন ঐ কোম্পানীকে দেন।

সপ্তাহে একখানি ট্রেন পোর্টোভেলো ও গুয়াজারা মিরিমের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলের পথে যাত্রা করে। রাত্রে

সেখানা আহুনা গ্রামে থাকে। পথিকদের জন্যে এখানে থাবার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে।

গুয়াজারিম একটা ছোট সহর, এখান থেকে আমাজনের বিখ্যাত জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। এ স্থান থেকে ছোট একটা খাল বেয়ে গেলে গুয়াসোর বা 'দুগ্ধ' নদীতে যাওয়া যায়। ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সহর থেকে যাত্রা সুরু করেছিলেন।

ক্যাণ্ডেলেরিয়া হাসপাতাল এখনও আছে। অনেক দূর থেকে রোগী এখানে আসে চিকিৎসার জন্যে। ম্যাডিরা নদীর তীরে সবুজ তৃণাবৃত ক্ষেত্রের মধ্যে হাসপাতালের সুদৃশ্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা অনেক দূর থেকে দর্শকের



গাধার পিঠে রবার পাঠা হইয়াছে।

চক্ষুকে আকৃষ্ট করে। এর দরজা জানালা সরু ইস্পাতের জালের পর্দা দিয়ে ঘেরা। হাসপাতালের চারিপাশে মনোরম পুষ্পোদ্যান ও কৃত্রিম ফোয়ারা।

ম্যাডিরা নদীর বিশাল আরণ্য ভূ-ভাগে ডাঃ উইলিয়ম এম্‌রিককে চেনে না বা শ্রদ্ধা করে না, এমন কোন শ্বেতকায় লোক বা অসভ্য ইণ্ডিয়ান নেই। রেলপথ তৈরীর সেই ভীষণ দুর্দ্দিনের সময় থেকে ডাঃ এম্‌রিক এই হাসপাতালের অধ্যক্ষ। তাঁর সুচিকিৎসায় ও সুব্যবস্থায় যে কত রোগীর প্রাণ রক্ষা হ'য়েছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। এত বড় নিঃস্বার্থ, উদারচেতা, সেবাব্রতী বীর কদাচ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাইরে ক'জন লোকে এঁকে চেনে?

জগতে এমনি হয়, কাঞ্চনকে কেউ চেনে না, কাচ নিয়ে লাফালাফি করে।

আমাজন নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ কর্দ্দমময় জলাভূমি নয়। ২,৭০০,০০০ বর্গ মাইল আমাজন নদীর অববাহিকার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ মাত্র ভূমি বন্যা বিনা ডুবে যায়। বাকী যায়গাটা একটা উঁচু ডাঙ্গা। কোথাও কোথাও দীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড় আছে, কোথাও বড় বড় পাহাড় আছে। সারা বন্দর থেকে নদীর উজানপথে একদিন গেলেই দীর্ঘ পর্ব্বতমালা দেখা যাবে। পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত সেটা চলে গিয়েছে।

দক্ষিণে বড় বড় তৃণাবৃত প্রান্তর, এখানে পশুপাল সারাদিন চরে বেড়ায়, এদিকে নদীর খালসমূহ খুব বেশী, পাহাড় ও উচ্চভূমির সংখ্যা কম। উত্তরে বড় বড় ঘাসে ভরা সমতল ক্ষেত্র, অনেকটা পাম্পাস্ জাতীয় ঘাস।

আমাজন নদীর বিখ্যাত জঙ্গলপ্রধান নদী খাতের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে।

উত্তর-পশ্চিম দিকে রিও ব্রঙ্কোর তীরবর্ত্তী মুক্ত তৃণাবৃত প্রান্তর। তার চারিদিকেই বড় বড় পর্ব্বতমালা ব্রিটিশ গায়েনার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দুধারে ঘন জঙ্গল, মধ্যে সুঁড়ি নদী—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বনের পথে চলবার পরে মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন রিও ব্রঙ্কোর মুক্ত তীরভূমি পথিকের প্রাণে নতুন আনন্দের সঞ্চার করে। নিবিড় অরণ্যের পরপার থেকে মুক্তিলাভ করে দেহ ও মন দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী থেকে প্রবহমান শীতল বায়ুর স্পর্শে নবজীবন পায়।

আমাজন নদীর জঙ্গলে গাছপালায়, লতাপাতায় খুব জড়াজড়ি ও নিবিড়তা নেই। সে আছে কেবল নদীর ও খালগুলির তীরের জঙ্গলে। প্রথম ষ্টীমার বা ডোঙ্গা থেকে দেখলে মনে হবে যে, জঙ্গল বুঝি সর্ব্বত্রই এমনি নিবিড়, আসলে নদী থেকে তীরে নেমে কিছুদূর গেলেই পথিকের সে ভুল ভেঙে যাবে। খুব খোলা জঙ্গল, স্থানে স্থানে এত খোলা যে, গাছপালা কেটে পথ তৈরী করার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু নিম্নভূমিতে বাঁশের জঙ্গল বেশী বলে যাতায়াতের কিছু কষ্ট হয়। যেখানে তালজাতীয় গাছের প্রাচুর্য্য, সেখানে টুবাক্ল বলে একজাতীয় কাঁটাগাছের বন খুব ঘন।

কিন্তু আমাজন জঙ্গলের যে অংশ বন্যার জলে বার মাস ডুবে থাকে, সে অংশ দিয়ে যাতায়াত করা সব সময়ই বিপজ্জনক। উঁচু ডাঙার জঙ্গলে কোন বিপদ নেই, এক পথ হারিয়ে যাওয়ার বিপদ ছাড়া। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ভুল পথে ঘোরার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এ অবস্থায় পথ-শ্রান্ত পথিক ভয়ে ও দুর্ভাবনায় তারও বিবেচনা-বুদ্ধি হারিয়ে ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। আমাজন জঙ্গলে মানুষের খাদ্যের উপযোগী ফলমূলের নিতান্ত অভাব, তবে শিকার করে খেতে পারলে জীবজন্তুর প্রাচুর্য্য যথেষ্ট।

জল পাওয়া কষ্টকর। মাঝে মাঝে সিপো জাতীয় মোটা মোটা বোড়া সাপের মত লতা আছে, তা কাটলে সুপেয় জল পাওয়া যায়। কিন্তু সিপো লতা কাটা যায় না হঠাৎ। তীক্ষ্ণধার দা বা কুঠার সঙ্গে রাখা এজন্য অত্যন্ত আবশ্যক। অনেক পথভ্রান্ত পথিকের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, যারা খাদ্য ও জলাভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ইণ্ডিয়ান বা বর্ণশঙ্কর রবার-সংগ্রাহকদের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে।

এই জঙ্গলের প্রধান গাছ ব্রেজিল বাদাম। জঙ্গলের অন্যান্য গাছপালা থেকে ব্রেজিল বাদামের গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে থাকে। বড় বড় গাছের গুঁড়ির পরিধি অনেক সময় ৪০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। খুব হাল্কা জাতীয় কাঠ থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত শক্ত কাঠের জঙ্গল আছে এখানে। আমাজন জঙ্গলের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিবিধ বিষতরু আছে। ইণ্ডিয়ানরা সে সব গাছ চেনে বা তীরের ফলায় তাদের বিষ মাখিয়ে জীবজন্তু শিকার করে। দরকার হলে মানুষও মারে। এই সব বিষাক্ত রসের মধ্যে একটি সুতীব্র বিষের স্পেনীয় নাম 'মাটা কালাডো'—এর গন্ধ কিছুক্ষণ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে মানুষ মারা যায়। অথচ শব ব্যবচ্ছেদ করলে বিষের প্রক্রিয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ঐ স্পেনীয় কথাটির অর্থ 'নিঃশব্দ মৃত্যু'। অপরপক্ষে এই জঙ্গলে একটি অদ্ভুত লতাজাতীয় উদ্ভিদ আছে, অরণ্যবাসী ইণ্ডিয়ানরা একে বলে 'চুচুয়াসকো'। এই লতার রস নিয়মিত পান করলে মানুষের যৌবন বহুদিন পর্য্যন্ত অটুট থাকে। এই জাতীয় লতা অতীব দুষ্প্রাপ্য, কেবল মাত্র ইণ্ডিয়ানরা এর সন্ধান রাখে।

চাই আলো, চাই অন্ন

—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

রোগ-জীর্ণ শীর্ণ তনু পাতি' দিয়া শবের মতন,
যুগে যুগে যারা শুধু সহিয়াছে নির্ম্মম পীড়ন,
কহে নাই কোন কথা, দাঁড়ায় নি উচ্চ করি মাথা,
দোহাই দিয়েছে শুধু আছে এক ন্যায়ের বিধাতা!
যারা যত্নে আনিয়াছে জগতের সভ্যতার দান,
গড়িয়াছে স্তূপ-সৌধ, বিলাসীর প্রমোদ-উদ্যান
কাটিয়াছে পাথরের উচ্চ-স্তূপ, খুঁড়িয়াছে খনি,
মরুভূমে বসায়েছে সহরের সৌন্দর্য্যবিপণি,
আশ্রয় পায় নি যারা নিঃস্ব হ'য়ে ফিরিয়াছে পথে,
নিষ্পেষিত হ'য়ে গেছে দীর্ণ বক্ষ অন্যায়ের রথে;
যাহারা পায় নি অন্ন, পায় নাই পরিধেয় বাস,
বুকের ক্রন্দনে শুধু ভ'রে দেছে বিশ্বের আকাশ;
যারা শুধু ঘুমায়েছে দীর্ঘ রাত্রি স্বপ্নের কুহকে,
ভাবিয়াছে দূরে যাবে একদিন চক্ষের পলকে—
সর্ব্বতোপ্রসারী অই আঁধারের ঘন-আবরণ,
আজ তারা জাগিয়াছে, লভিয়াছে নূতন জীবন!
আজ তারা অকারণ রহিবে না দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,
অনাগত আলো-দীপ্ত কল্পনার দিনের আশায়!

আজ তারা চিনিয়াছে সসাগর বিশাল জগৎ,
দেখিয়াছে মানুষের শক্তিময় জীবন বৃহৎ;
এর মাঝে পাবে তারা নিজ নিজ দাঁড়াবার ঠাঁই,
চাবে না কো কারো দয়া, দেবে না কো
কাহারো দোহাই!
ক্ষুধা-শীর্ণ ম্লান-মুখে মুষ্টি-অন্ন তুলি' তৃপ্তিভরে,
ভাগ্যের এ অসম্মান করিবে না বাঁচিবার তরে!
বাঁধা রহি' পীড়নের সুকঠিন নিগড়ের পাশে,
চাবে না সান্ত্বনা তারা অর্থ-হীন সুমধুর ভাষে!
আজ তারা চলিয়াছে দলে দলে অন্ধকার-রাতে,
মৃত্যুরে করে না ডর, যুদ্ধ করে বিপদের সাথে!
সভ্যতার দৃঢ়-ভিত্তি কাঁপে আজ তাদের হুঙ্কারে,
বঞ্চিত রবে না তারা মানুষের চির-অধিকারে!
দারিদ্র্যের সাজ খুলি' চাহে তারা বিকশিতে প্রাণ,
চাহে তারা মাথা তুলি' মিটাইতে আকাঙ্ক্ষা মহান্!
জগৎ ভরিয়া উঠে তাহাদের জয়-যাত্রা-গান,
"চাই আলো, চাই অন্ন, চাই মোরা
দাঁড়াবার স্থান!"

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ইন্দ্রাণী

[৫]

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে রক্তদহের নদীর ঘাটে স্নানের ভিড় জমিয়াছে। গরমের দিনে অতি প্রত্যুষ হইতে স্নান আরম্ভ হয়, ছেলে বুড়ো সবাই সাঁতার কাটে, তীরে বড় ভিড় জমিতে পারে না। শীতের দিনে অনেকটা বেলা হইলে তবে লোক আসিতে আরম্ভ করে, সবাই জলে নামিতে ইতস্ততঃ করে, ফলে তীরে ভিড় জমিয়া উঠে। স্নানের ঘাটই বাংলাদেশের সামাজিক পার্লামেণ্ট।

দুই একজন দুঃসাহসিক স্নান-রসিক ব্যক্তি এই পৌষের শীতেও সাঁতার কাটিতেছিল—অন্য সকলে তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময়ে নদীর বাঁকের আড়াল হইতে একখানা বৃহৎ বাঁশের ভেলা আসিয়া পড়িল। ভেলাওয়ালা সাঁতারুকে লক্ষ্য করে নাই; এক্ষণে লক্ষ্য করিয়া ভেলা সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু স্রোতের প্রবল টানে ভেলা লোকটার দিকেই যেন ছুটিয়া যাইতে লাগিল। তীরের জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; বিপন্ন সাঁতারু আসন্নপ্রায় ভেলা লক্ষ্য করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিল; দীর্ঘ এক ডুব-সাঁতারে পাশ কাটাইয়া আত্মরক্ষা করিল। সে যাত্রা লোকটা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু ভেলা-ওয়ালা বাঁচিল না। লোকটা যদি মরিত, তবে ভেলাওয়ালা বাঁচিত। কিন্তু লোকটার কিছু না হওয়ায় সকলের নিষ্ফল ব্যস্ততা নিরীহ ভেলাওয়ালার উপরে গিয়া পড়িল।

একজন বলিল, বেটার আক্কেল দেখেছ! আক্কেলের মধ্যে দ্রষ্টব্য কি ছিল তাহা জানি না—কিন্তু তখন যেন সকলেই তাহা হঠাৎ দেখিতে পাইল। তখন জলে-স্থলে এক বাক্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভেলাওয়ালা একা হইলেও কলহে কম নয়—সে একাই একশ'-জনের মোহাড়া লইতে লাগিল। এমন সময়ে তীরের একজন লোক ভেলা-ওয়ালাকে চিনিয়া ফেলিল—সে বলিল, লোকটার জোড়া-দীঘিতে বাড়ী। লোকটা জোড়াদীঘির শুনিয়া জনতা সত্য সত্যই ক্ষেপিয়া উঠিল। সকলে বুঝিল, জোড়াদীঘির পক্ষে কোন দুষ্কর্মই অসম্ভব নহে। তাহাকে ভেলা থামাইতে আদেশ করিল। কিন্তু স্রোতের টানেই হোক, আর ইচ্ছা হোক, ভেলা দ্রুততর চলিতে লাগিল। তখন কয়েক জন উদ্যোগী যুবক নৌকা লইয়া ভেলার উদ্দেশ্যে চলিল; কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকায় ও ভেলায় হাতাহাতি বাধিয়া গেল। অবশেষে ক্লান্ত ভেলাওয়ালাকে সকলে টানিয়া নৌকায় তুলিল—নৌকা তীরের দিকে আসিতে লাগিল—শূন্য ভেলা স্রোতের টানে অপর এক বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নৌকা ভিড়িবামাত্র সবাই ভেলার মালিককে টানিয়া মাটিতে নামাইল এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার উপর পড়িয়া যে যাহা দিয়া পারিল, থানা-পুলিশ-দারোগার কাজ করিল। মৃতপ্রায় লোকটা অসাড় হইয়া পড়িলে বিচারকের কাজ আরম্ভ হইল। পাঠক বিস্মিত হইও না; এমনই হয়; বিচার মানেই প্রবলের আত্মপক্ষ সমর্থন; অধিকাংশ সময়েই তাহা দুষ্কর্ম্মের সাফাই।

লোকটা বলিল—বাপু আমার দোষটা কি?

এ পক্ষের একজন জিজ্ঞাসা করিল—বেটা তোর বাড়ী জোড়াদীঘি বটে কি না?

লোকটা বলিল—তাতে দোষটা কিসের?

বাস্তবিক তাহাতে দোষের যে কি আছে, তাহা না জানায় অনেকেই চুপ করিয়া থাকিল।

একটা মহৎ কার্য্যে আকস্মিক বাধা আসিয়া পড়ে দেখিয়া একজন বৃদ্ধ বলিল, দোষটা কি? আচ্ছা আমি বলছি। তোদের জমিদার-পুত্তুর আমাদের দিদিমণিকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন কি না?

লোকটা ঘটনা জানিত, বলিল, হাঁ।

—আচ্ছা, এখন সে বিয়ে করেছে আর একজনকে! সত্যি কি না?

লোকটা ইহাও জানিত, অতএব বলিল, হাঁ। কিন্তু সে দোষে আমি কেমন করে দোষী? আমি কি ঘটকালি করেছিলাম? এই রসিকতার চেষ্টার ফলে একটা প্রবল গুঁতা আসিয়া তাহার পাঁজরে পড়িল। তখন সেই পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধটি বলিল, বেটা তুই জমিদারের জমি খাস্ নে? তার বাড়ীতে দরকার হলে খাটিস নে? তাকে খাজনা দিস্ নে? তবে আবার তোর দোষ নয় কিসের?

লোকটা চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় সত্য সত্যই নিজেকে দোষী ভাবিতে আরম্ভ করিল। আবার প্রশ্ন-বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। বল বেটা, বিয়ে হলে তুই খুসী হ'তিস কি না? লুচি সন্দেশ খেতিস কি না? তা যদি হয়, তবে বিয়ে না হওয়ার জন্য তুই দায়ী কি না? গুঁতো খাবি না কেন?

বিবাহ না হইবার জন্য সেই যে দায়ী, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। বৃদ্ধ সগর্ব্বে বলিয়া দিল—আমাদের জমিদারের যে-অপমান তাহাদের জমিদার করিয়াছে, এই অপমান রক্তদহের লোক কখনও ভুলিবে না। তাহাদের বিচারে জোড়াদীঘির জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের কুকুরটা পর্য্যন্ত এই জন্য দায়ী। রক্তদহের লোক দিন গুণিতেছে, সুবিধা পাইলেই ইহার শোধ দিবে।

কিন্তু তাহার যখন বিলম্ব আছে, এই লোকটাকে লইয়া কি করা যায়! একজন বলিল—একেবারে নিকেশ করে দেওয়া যাক। এই প্রস্তাবে অপর একজন বাধা দিয়া বলিল—না, না, ওটাকে মেরে ফেল্‌লে জোড়াদীঘিতে গিয়ে খবর দেবে কে? সকলেই এই উক্তির যথার্থতা বুঝিল। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—লোকটাকে জলে ভাসাইয়া দাও। লোকটা বিচারের ফল শুনিয়া মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। মানুষের স্পর্শের অপেক্ষা শীতের শীতল নদীর কোলকে সে অনেক গুণে বরণীয় মনে করিল। সকলে বিকট আনন্দধ্বনি করিয়া লোকটাকে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

যেখানে এই ঘটনা ঘটিতেছিল, তাহার নিকটে একখানি প্রকাণ্ড বজরা বাঁধা ছিল। মাঝি-মাল্লা কেহ নাই, বোধ হয় কার্য্যান্তরে অন্যত্র গিয়াছে, কেবল ছাদের উপরে একটি অদ্ভুত লোক গুটি মারিয়া বসিয়া রোদ পোহাইতেছিল। লোকটিকে দূর হইতে দেখিলে মানুষরূপী একটি পুঁটুলি বলিয়া মনে হয়।

জনতার গোলমাল শুনিয়া বজরার কামরা হইতে এক যুবক বাহির হইয়া আসিল। যুবকের দেহ দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, মাংস-পেশল, মাথার চুল ঘন এবং কুঞ্চিত, পোষাকপরিচ্ছদ দেখিয়া ধনবান্ বলিয়া মনে হয়। যুবক ছাদের উপরে আসিতেই নররূপী পুঁটুলি-টি একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া সম্ভ্রম জানাইল। যুবক বলিল—বেঙা এক কাজ করতে হবে। পাঠকের বোধ হয় এই নাম মনে থাকিতে পারে। ইহারা আর কেহ নহে, পলাশীর মাঠের বেঙা চৌকিদার এবং এই যুবক তাঁবুতে দৃষ্ট তাহার মনিব পরন্তপ রায়।

বেঙা বলিল—আমাদের মোতির মা বল্‌ত—পরন্তপ হাসিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—আচ্ছা তোর মোতির মা'র কথা পরে শুনব; এখন এক কাজ কর। ওই যে বুড়ো লোকটা দেখ্‌ছিস—এই বলিয়া সে জনতার মধ্যস্থিত সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখাইয়া দিল—ওকে একবার চট করে গিয়ে ডেকে আন্।

বেঙা উঠিয়া দাঁড়াইল—কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতেই পরন্তপ ব্যস্ত ভাবে বলিল—এখন নয় পরে শুনব। তোর মোতির মার কথা তো?

বেঙা রুষ্ট ভাবে বলিল—না তোমাকে আর বল্‌তে হবে না; দেখা হলে আমি বেটাকে একবার আচ্ছা করে শাসিয়ে দি! সব তাতেই তার এত কথা বল্‌বার দরকার কি?

পরন্তপ বলিল—আচ্ছা তা দিস্। যা চট্ করে কাজটা কর। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। বেঙা বজরা হইতে নামিল।

বৃদ্ধ লোকটি আসিলে পরন্তপ তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইল, পরিচয় লইল, কুশল জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধের নাম মাধব কর্ম্মকার; রক্তদহে তাহার বহু পুরুষ হইতে বাস। মাধবের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় পরন্তপ

স্পষ্ট ভাবে দিল না, কথাটা কোন রকমে এড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাধব বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

পরন্তপ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া অনেক কৌশলে যাহা জানিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ। জোড়াদীঘির জমিদার দর্পনারায়ণের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ প্রায় এক রকম স্থির, এমন সময়ে দর্পনারায়ণ অন্যত্র বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার অপমান রক্তদহের অধিবাসীরা ভাগ করিয়া লইয়াছে। মাধব কর্ম্মকার সগর্ব্বে বলিয়াছিল—"বুঝ্‌লেন বাবু, আমরা সহজে ছাড়ব না। জোড়াদীঘির ঠাকুর থেকে কুকুর পর্য্যন্ত সবাই আমাদের শত্রু। আজ যদি আমাদের কর্ত্তা বেঁচে থাকতেন, তবে দেখতেন মজা। এরই মধ্যে লড়াই বেধে যেত।" মাধবের মুখে সে জোড়াদীঘি ও রক্তদহের বহু পুরুষের শত্রুতা ও বাদ-বিসংবাদের কাহিনী অবগত হইল। মাধব বলিয়াছিল—"আজ আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, কিন্তু আবার যদি লড়াই বাধে, আমিই রওনা হ'ব সবার আগে। আমার যখন বয়স অল্প ছিল, দু'বার জোড়াদীঘির জমিদারি লুঠ করতে গিয়েছি। হায় কর্ত্তাও নাই, সে দিনও নাই।"

মাধবের কথা হইতে পরন্তপ বুঝিল যে, ইন্দ্রাণী বিবাহ করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে, আর স্থির করিয়াছে—যেমন করিয়াই হউক জোড়াদীঘির জমিদারকে জব্দ করিতে হইবে। অবশ্য ইন্দ্রাণীর এই পণের টীকা স্বরূপ মাধব নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—"ইন্দ্রাণী মা আমার ভারি একরোখা, তার কথার নড় নড়চড় হয় না। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি, তেমন বীর-পুরুষ যদি জোটে, তবে সে নিশ্চয় বিয়ে করবে—যাকে দিয়ে সে জোড়াদীঘির জমিদারদের জব্দ করা চলবে। মার আমার যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি, তবু তো মেয়ে মানুষ বই নয়। আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এও জানি জোড়াদীঘিকে জব্দ হ'তে না দেখে মরব না, মরে' শান্তি পাব না। আছি আশায়, মার আমার বিয়ে হবে বীর-পুরুষের সঙ্গে, তারপরে দেখে নেব কত আস্পর্দ্ধা চৌধুরীদের।"

পরন্তপ মাধবের নিকট হইতে জানিল যে, এ সমস্ত কথা সে জমিদার-বাড়ীর চাঁপা ঠাকুরাণীর মুখ হইতে শুনিয়াছে, কাজেই ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সে অনেক কথাই জানিতে পারিল বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিল না যে, দর্পনারায়ণের বধূ বনমালা। না জানিবার কারণ এ কথা তখন কেহই জানিত না; দ্বিতীয়তঃ শুনিলেও তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হইত; তৃতীয়তঃ বনমালা নামটি তাহার কাছে নিরর্থক। পলাশীর তাঁবুর সেই মেয়েটির নাম কি তাহা সে জানিত না। সেই মেয়েটিকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল—যেমন গিয়াছে ওইরূপ আরও অসংখ্য মেয়েকে। কিন্তু দর্পনারায়ণকে ভোলে নাই। পরন্তপ স্থির করিল, একবার চাঁপা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বেঙাকে ডাকিয়া হুকুম করিল—যেমন করিয়াই হউক, সেই দিন সন্ধ্যায় একবার চাঁপা ঠাকুরাণীকে তাহার বজরায় আনিয়া হাজির করিতে হইবে।

[৪]

মুখের গ্রাস ছুটিয়া গেলে হিংস্র সাপ যেমন হিংসাকে পোষণ করিয়া দেশে দেশে শত্রুকে খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনই করিয়া সেই দিনের পর হইতে পরন্তপ শত্রুকে জব্দ করিবার উপায় অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। দর্পনারায়ণ যখন বনমালাকে তাঁবু হইতে লইয়া গেল, পরন্তপ তখন সুরাতে অজ্ঞান, নতুবা সেই খানেই একটা রক্তারক্তি হইত। বহুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইলে, মেয়েটি কোথায় জিজ্ঞাসা করিল; শুনিল, একজন লোক আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া তখনই চাবুক বাহির করিয়া একধার হইতে মোসাহেব ও চাকর-বাকর-দের পিটিয়া গেল; তাহারা এ-রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল, ক্ষতনাশক একটা মলম সর্ব্বদা তাহারা সঙ্গে রাখিত। ক্ষতস্থানে মলম লাগাইয়া তাহারা যথারীতি শুইতে গেল। কেবল আহত সিংহের ন্যায় পরন্তপ সারারাত্রি তাঁবুর মধ্যে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। শেষ রাত্রে স্বর্গারোহণ পাল' শেষ করিয়া বেঙা আসিয়া তাঁবুর মধ্যে উঁকি মারিয়া প্রভুকে তদবস্থায় দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে সব ব্যাপার বুঝিয়া লইল। বাহিরে গিয়া সে নিজের কাপড় ছিঁড়িল, চুল এলোমেলো করিয়া দিল, গায়ে ধুলা বালি লাগাইল, এমন কি নিজের বাহুতে

কামড়াইয়া কয়েকটা দাগ করিয়া লইল, তারপরে হাতে একখানা বাঁশের লাঠি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁবুর মধ্যে প্রভুর সম্মুখে গিয়া সটান পড়িয়া গেল, যেন পা' আর চলে না। পরন্তপ তাহাকে তুলিয়া ধরিল, সুস্থ করিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি ? বেড়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কখনও ক্রোধে, কখনও লজ্জায়, কখনও চোখের জলে সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা ব্যাপার বর্ণনা করিয়া গেল। সে বলিল,—যখন সেই দুষমণ দু'টা মেয়েটাকে লইয়া যাইতে ছিল, সে গিয়া পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা দুইজন, সে একা; তব সে ছাড়ে নাই, একজনের মাথা ফাটাইয়াছে, অপর জন পলাতক; কাজেই কিছু করিতে পারে নাই; আর একজন তাহার সঙ্গে থাকিলেই সে লড়াই ফতে করিয়া দিত। তারপরে সে বলিল, যদিও সেই লোক দুটাকে আনিতে পারে নাই, তবু তাহাদের পরিচয় আনিয়াছে, একজন জোড়াদীঘির জমিদার, অন্য জন তাহার সর্দ্দার। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, ইহা বাণীবিজয়ের মুখ হইতে সংগৃহীত।

পরন্তপ তাহার সাহসে, বিশেষ পরিচয় সংগ্রহে এত খুসী হইল যে, তখনই তাহাকে এক আশরফি বকশিস করিল এবং তখনই তাঁবু গুটাইয়া বজরা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল। তারপর হইতে সে ক্রমাগত নদীপথে ভ্রমণ করিয়াছে, আর ভাবিয়াছে—কি উপায়ে দর্পনারায়ণকে দণ্ড দেওয়া সম্ভব! সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—দর্পনারায়ণকে দণ্ড না দিয়া সে সুরা ও নারী স্পর্শ করিবে না। দেবতার পণ অপেক্ষা দৈত্যের পণ অনেক ভীষণ! মিথ্যাবাদী যখন সত্য কথা বলে, সে সত্যের এক চুল এদিক ওদিক হইবার উপায় থাকে না।

নদীপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আজ সকাল বেলা সে রক্তদহের ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে। সকাল বেলাতে সে একাকী বসিয়া প্রতিজ্ঞায় শান দিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে ওই লোকটাকে লইয়া গোলমাল বাধিয়া উঠিল। তখনই তাহার মনে একটা আশার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তারপরে মাধবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ক্রমে সেই চল-বিদ্যুৎ স্থির-বিদ্যুতে পরিণত হইল। সে স্থির করিল, এই ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিতে হইবে। উভয়েরই ক্রোধের লক্ষ্য দর্পনারায়ণ। বিবাহে সামাজিক বাধাও নাই—কাজেই বাহিরের দিক্ হইতে এ বিবাহে আপত্তি হইবে না। কিন্তু মাধবের কথায় বুঝিয়াছিল, ইন্দ্রাণীর মধ্যে অসামান্যত্ব আছে, অতএব তাহার সঙ্গে বুঝিয়া শুনিয়া ব্যবহার না করিলে সব ব্যর্থ হইবে। মাধবের নিকট শুনিয়াছিল যে, চাঁপা ঠাকরাণীর প্রবল প্রতিপত্তি, ইন্দ্রাণী না কি তাহার কথা মানিয়া চলে; কাজেই এই চাঁপা ঠাকরাণীকেই তাহার একমাত্র সহায় বলিয়া মনে হইল, এবং সেইজন্যই বেড়াকে হুকুম করিল, যেমন করিয়া হউক চাঁপা ঠাকরাণীকে সন্ধ্যাবেলায় বজরায় হাজির করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, বেড়ার পক্ষে তাহা যে শুধু সম্ভব তা-ই নহে, সেই সব কাজ করিতেই বেড়ার বুদ্ধি যেন খোলে! পরন্তপ সঙ্কল্প করিল, এই বিবাহ করিতেই হইবে; ইন্দ্রাণীকে সে চেনে না, প্রয়োজনও নাই, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে নহিলে দর্পনারায়ণকে প্রতিশোধ দেওয়া চলিবে না।

[৫]

সন্ধ্যাবেলায় চাঁপা ঠাকরাণী বজরায় আসিল। পরন্তপ তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। চাঁপা ঠাকরাণী কি প্রকৃতির লোক, মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা যায় কি না,জানিবার জন্য মেজের মোমবাতিটি এমন ভাবে রাখা ছিল, যাহাতে আলোটা নিজের মুখে না পড়িয়া চাঁপার মুখে পড়ে। পরন্তপ নিজে ধরা না দিয়া চাঁপাকে বুঝিয়া লইবে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু চাঁপা আসিয়াই চোখে আলো সহ্য করিতে পারে না ওজুহাতে মোমবাতিটি এমন ভাবে স্থাপন করিল, যাহাতে সবটা আলো পরন্তপের মুখে পড়ে। ঠাকুরাণী পরন্তপকে দেখিল; পরন্তপ তাহাকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল না বটে, তবে বুঝিল, চাঁপা সামান্য মেয়ে নয়, অতিশয় বুদ্ধিমতী; তাহার সঙ্গে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে।

পরন্তপ নিজের পরিচয় দিল—কিছু বাড়াইয়াই দিল এবং অবশেষে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার বিবাহ ঘটাইয়া দিবার জন্য চাঁপার সাহায্য প্রার্থনা করিল। পরন্তপ বলিল—ইন্দ্রাণী দেবীর শত্রু দর্পনারায়ণ; দর্পনারায়ণ আমারও

শত্রু। ইন্দ্রাণীও তাহাকে জব্দ করিবার উপায় খুঁজিতেছেন, আমিও তাহাই চাই। ইন্দ্রাণী বুদ্ধিমতী হইলেও নারী, আমার সাহায্য পাইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইবে না। পরন্তপ চাঁপাকে নিজের সহিত দর্পনারায়ণের শত্রুতার প্রকৃত কারণ বলিল না, বানাইয়া বলিল।

চাঁপা ঠাকুরাণী বলিল—ইন্দ্রাণী আর বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহাকে সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করা কাহারও সাধ্য নয়। তবে দর্পনারায়ণকে জব্দ করা সম্ভব জানিলে, বিবাহ করিতেও পারে। কিন্তু সে কথা এমন সোজাসুজি বলিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে; কাজেই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

যে-চাঁপা ইন্দ্রাণীর সৌভাগ্য খর্ব্ব করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিবাহভঙ্গে যে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সে কেন যে পরন্তপকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিল, তাহা জানি না। তবে চাঁপা ইন্দ্রাণীকে জানে। তাহাকে সে শত্রু মনে করে বলিয়া জানে। শত্রুকে আমরা মিত্রের চেয়ে বেশী করিয়া জানি, আর মিত্রকে যদি শত্রুর মত অত্যন্ত অধিক জানিতাম, তবে তাহাকেও শত্রু বলিয়াই মনে হইত। বিধাতা পুরুষ দয়াময়, অজ্ঞতার সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারা প্রেমকে তিনি রক্ষা করেন।

চাঁপা ঠাকুরাণী বলিল, আগামী কল্য বিকাল বেলায় জমিদারবাড়ীর সম্মুখের মাঠে অশ্বপরীক্ষা হইবে; ইন্দ্রাণী ছাদের উপর হইতে তাহা দেখিবে, সেই সময়ে পরন্তপ যদি সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে চাঁপা স্বয়ং ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং পরে কৌশলে তাহার মনের ভাব জানিয়া পরন্তপকে জানাইবে। পরন্তপ চাঁপাকে এই সাহায্যের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইল। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া চাঁপা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। পরন্তপ অভাবনীয় সাহায্যে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, চাঁপাকে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ধীর সতর্ক চাঁপা পরন্তপের মর্ম্ম পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। হয় তো সে বুঝিল যে, পরন্তপকে দিয়াই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে—ইন্দ্রাণীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবার সাহায্য হইবে। [ক্রমশঃ]

আলোচনা

চণ্ডীদাসের কথা

বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের অরুণোদয়ে চণ্ডীদাস আদি কবি। সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার হইতে আজিও সেই মরমী কবির লোকোত্তর প্রণয়-সঙ্গীত-মুখর-কণ্ঠ বাঙ্গালার রসগ্রাহীচিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সাড়া জাগাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রসিকজন সমাজে যাহা এতকাল এতখানি উন্মাদনা আনিয়াছে, সাহিত্যিক পুরাবৃত্তকারগণের নিকটে তাহাই আজ হইয়া উঠিয়াছে গুরুতর সমস্যার বস্তু। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস শুধু বড় কবিই নহেন; বিরাট সমস্যাও বটেন।

চণ্ডীদাসের নামে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০।৯০০ পদ প্রচলিত আছে। ইহাদের ভণিতায় দীন, বড়ু, দ্বিজ প্রভৃতি বিবিধ বিশেষণে ভূষিত চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়, এবং বিশেষণ-বিরহিত শুধু চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদেরও অন্ত নাই। সুতরাং এই সকল বিভিন্ন ভণিতাসম্বলিত পদাবলী একই কবির রচিত কি না, এতকাল পরে সে সম্বন্ধে কিছু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলেও এই গুলিকেই অনেক কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি। স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮৩০টি পদ-সম্বলিত একখানি সুবৃহৎ চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অষ্ট শতাধিক পদাবলীর মধ্যে সমগ্র না হইলেও অধিকাংশ পদই যে উক্ত প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের রচিত, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের বিশেষ মতভেদ ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় একখানি আদ্যন্তহীন খণ্ডিত প্রাচীন গীতি-কবিতার পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। উক্ত পুঁথির কবি ও পদাবলীকার একই ব্যক্তি কি না?

নবাবিষ্কৃত পুঁথিখানির নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। পুস্তকখানির মুখবন্ধে ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস,

বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী-রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিক বার উল্লেখ আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু দিবারাত্রি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন।* সুতরাং ইহা হইতে এইটুকু মাত্র অনুমান করা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃঃ পূর্ব্বে চণ্ডীদাস বলিয়া কোন কবির শ্রীকৃষ্ণলীলা পদাবলী তৎকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

যে চণ্ডীদাসের সহজ সরল ও অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় সঙ্গীতাবলী এতকাল ধরিয়া আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল, সেই চণ্ডীদাসকেই আমরা শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী, প্রাচীন ও বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ আদি কবি বলিয়া আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতেই নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতেছে। দুই চণ্ডীদাসই বাসলীসেবক, বড়ু ও কৃষ্ণলীলার কবি; সুতরাং ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি হইলে নিশ্চয়ই একজন আসল ও অপর জন নকল। তাহা হইলে কে আসল? কোন্ চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীমহাপ্রভু আস্বাদ করিয়া অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন…ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন উঠিয়া সাহিত্য-তত্ত্ববিদ্‌গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আবিষ্কারক ও সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় —"পুঁথিখানি কবির প্রথম বয়সের লেখা এবং পদাবলী পরিণত বয়সের লেখা" বলিয়া সমস্যাটিকে এক কথায় উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্য-তত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত মতের পোষকতা করিয়া বলিতেছেন—"সৌভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের লেখা একখানি কাব্য (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) পাওয়া গিয়াছে,…প্রচলিত পদাবলীতে যাহা মিলিতেছে তাহা বিকৃত, পরের যুগের ও বহুস্থলেই সন্দিগ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত ৮০০ পদের মধ্যে ৬০।৭০ টির বেশী বড়ু চণ্ডীদাসের নহে"।

(বাঙ্গালা-সাহিত্যের কথা)

* ১। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি　রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে　মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
(চৈ, চ, ম ২ প)

২। সন্তোষ, গোবিন্দ, গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা হরে সবার চিত॥
(প্রেমবিলাস)

৩। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥
(চৈ, চ, ম ১০ প)

বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলী বলিয়া সাহিত্য-পরিষদ সম্প্রতি যে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রচলিত পদাবলী, এই উভয় গ্রন্থ হইতেই বাছিয়া বাছিয়া পদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্টই বাধা আছে।

পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন উভয় গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক প্রেমকাব্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিন্তা করিয়া দেখিলে এই গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে ভাষাগত, ভাবগত, এমন কি আখ্যানভাগগত পার্থক্যও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

পদাবলীর ভাষা যেমন অতি সহজ, সরল ও অনবদ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা তেমনই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। অবশ্য ইহা আমি কোন প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিতেছি না। যাঁহারা পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একই কবির রচনা বলেন, তাঁহাদের মতে পদাবলীর ভাষা লোকপ্রসিদ্ধি অর্জ্জন হেতু কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে মুখে ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিয়াছে মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বহু দিন অনাবিষ্কৃত ও অপ্রচলিত থাকায় তাহাতে তৎকালিক ভাষার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে নাই। সুতরাং ভাষাগত বৈষম্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে অন্য একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে—যে-কবির কতকগুলি গাথা দেশে দেশে কানে কানে সুপ্রচলিত হইয়া এতখানি লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাঁহারই অন্য কতকগুলি পদাবলী একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গেল কেমন করিয়া?

যাহা হউক, অতঃপর ভাবগত বৈষম্যের দিক্ দিয়াও গ্রন্থ দুইখানি এক জনের রচনা বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীরাধা ছলনা-চাতুর্য্যময়ী, বিলাস কলাকুশলা ও উদ্ধতা; এই হিসাবে বিদ্যাপতির সহিত ইঁহার কথঞ্চিৎ ভাবগত সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পদাবলীর রাধাচিত্র ইহা হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন। পদাবলীর শ্রীরাধা একেবারেই কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলা, তদ্গতপ্রাণা, মুগ্ধা—শ্যামসুন্দরের নাম শুনিয়াই তিনি আকুল, যোগিনীর মত অহরহ তাঁহাকে সেই নিখিল রসামৃতসিন্ধুর রূপমাধুরী ধ্যান করিতে দেখি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রথমেই নায়কের পূর্ব্বরাগ। শ্রীরাধা তখন আদৌ মিলনোন্মুখ নহেন, বরং মিলনবিমুখ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীরাধা মাতুলানী ও শ্রীকৃষ্ণ ভাগিনেয়—এই সম্বন্ধের কথা তুলিয়া মামী-ভাগ্নের বাদানুবাদ ছলে কবি যে ইন্দ্রিয়োপভোগের নির্লজ্জ অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কুৎসিতরুচির পরিচায়ক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ছন্দ, অলঙ্কারের সমাবেশ যথেষ্ট, কিন্তু কাব্যের নায়কনায়িকা ঐশ্বর্য্যভাবমণ্ডিত গোলোকবিহারী রাধাকৃষ্ণ বলিয়া কোন স্থানেই মাধুর্য্যরস ভাল জমিতে পারে নাই। পদাবলীতে অলঙ্কারবাহুল্য বা ছন্দঃপারিপাট্য মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে, তৎসত্ত্বেও ইহা আদ্যোপান্ত অনুপম মাধুর্য্যমণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয় ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ।

এই পার্থক্য সামান্য বর্ণনাগত নহে, ইহা একেবারে কাব্যের মূলসূত্রের এবং বিভিন্ন কবির বিভিন্ন রসানুভূতিসম্ভূত রুচির পার্থক্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একজন জগন্ধ ইন্দ্রিয়োপভোগ-ব্যঞ্জক ও গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট দানী-ভাগের পেঁউড়ের কবি, অপর জন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যসাধনার কবি, ভাবোচ্ছ্বাসভরা দুঃখের কবি ও স্বর্গীয় প্রেমসাধনার কবি। শুধু ভণিতায় এক নাম পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই এই দুই বিভিন্ন জাতীয় গ্রন্থকে একই কবির লেখনীনিঃসৃত বলা কতখানি সমীচীন, তাহা অবশ্যই সুধীবর্গের বিবেচনাসাপেক্ষ।

ইহা ছাড়া উভয় গ্রন্থের আখ্যানভাগগত পার্থক্যও রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম, কিন্তু পদাবলীতে ইঁহারা স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার পিতার নাম সাগর গোয়াল ও মাতার নাম পদুমা বা পদ্মা—কিন্তু পদাবলীর শ্রীরাধা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী।

সুতরাং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে ভাষা ভাব বা উপাখ্যান কোন দিক দিয়াই মিল নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উপর জয়দেবের যথেষ্টই প্রভাব। এমন কি ইহার পাঁচটি পদ জয়দেবের হুবহু অনুবাদ বলিলেও চলে, কিন্তু পদাবলীর উপরে জয়দেবের কোনই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে কবির অপরিণত বয়সের লেখা বলিয়াছেন, কিন্তু পদাবলী হইতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আলঙ্কারিকতা বেশী এবং কাব্যমধ্যে প্রচুর স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়া কবি তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, আর সকল বৈষম্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একই কবি কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় শ্রীরাধাকে একবার বৃষভানুরাজ-নন্দিনী, আবার সাগর গোয়ালার মেয়ে বলিতে পারিতেন কি? সুতরাং বসন্ত বাবুর উক্ত একীকরণের প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রচলিত পদাবলী একই কবির লেখনীনিঃসৃত বলিয়া আর মনে করা চলে না। এবং ইঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলে উভয়েই শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদিত, বাসলীসেবক চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই হইতে পারেন না। তাহা হইলে বর্ত্তমান সমস্যা দাঁড়ায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই মহাপ্রভুর পূর্ব্বেকার প্রচলিত আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাসের কাব্য, না প্রচলিত পদাবলী?

আলোচ্য বস্তু অন্ততঃ ৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকার। প্রকৃত তথ্য একেবারেই অতীতের ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত—কেবলমাত্র দুইচারিটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক নামোল্লেখ, দুইএকটি অকিঞ্চিৎকর সূত্র ছাড়া আর কোন তথ্য প্রমাণরূপে পাওয়া যায় না। ইহাদেরই কয়েকটি বর্ত্তিকালোকে যেটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই সাহায্যে অতি সন্তর্পণে ইতিহাসের এই দুরধিগম্য পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে যেমন অন্ধবিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়া ভ্রান্ত পথে ঘুরিয়া মরিবার আশঙ্কা আছে, তেমনি নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠার মোহে কল্পনাবিলাসী হইয়া মিথ্যাকে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইবার আশঙ্কাও কম নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অতি প্রাচীন। পুঁথিখানির ভাষা, এমন কি হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর ভাষা একেবারেই আধুনিক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমান রায় চৌধুরী মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে উদয়ন পত্রিকায় (বৈশাখ আষাঢ় ১৩৪১) এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতাই প্রকৃত চণ্ডীদাস এবং ইঁহার পদই মহাপ্রভু আস্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই একটা সহজ প্রশ্ন মনে আসে—চণ্ডীদাসের নামে এই যে বহু শত অমৃতোপম পদলহরী প্রচলিত আছে, এগুলি তবে কোথা হইতে আসিল? কবে, কে বা কাহারা ইহা রচনা করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে, পদাবলী আজ যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে সেখানে সংস্থাপিত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং বিমান বাবুকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইয়াছে যে, পদাবলীরচয়িতা চণ্ডীদাস বলিয়া কোন কালেই কেহ ছিলেন না। "আদিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী শ্রীমহা-প্রভুর বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণব মতাবলম্বী বঙ্গসমাজে ভাষা ও ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িলে, যখন কীর্ত্তনীয়াগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য নিরুপায় হইয়াই তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের (গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি) কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিয়া চণ্ডীদাস নাম দিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন—তখন হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব হইয়া থাকে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী বিভিন্ন কবির রচনা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই প্রকৃত চণ্ডীদাসের কাব্য বলিয়া মানিলে পদাবলীকে অবশ্যই নকল বলিতে হয়। সুতরাং এই হিসাবে প্রচলিত পদাবলীর ইহা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও আর সম্ভব হয় না।

কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই এই যুক্তি কষ্টকল্পিত ও অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অজ্ঞাত নাই যে, দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন ভাষাই পরবর্ত্তীকালের লিপিকর, পাঠক ও গায়কগণের হস্তে পড়িয়া পুরুষানুক্রমে ধীরে ধীরে আধুনিকত্বে সংস্কৃতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান কালোপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। গোপীচাঁদের গান, কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতির যে রূপ আমরা আজ পাইতেছি, তাহাই তাঁহাদের আদিরূপ নিশ্চয়ই নহে। ভাষার দুরূহত্ব তাহাদের লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া কাব্যের ভাষা অপেক্ষা সঙ্গীতের ভাষা আরও দ্রুতগতি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক হইয়া পড়ে। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যদি শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদিত হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজের তাহা নিশ্চয়ই খুব আদরের সামগ্রী হইত, কেবল ভাষার দুরূহত্বের অপরাধে এমন করিয়া নিশ্চিহ্নরূপে লোপ পাইয়া যাইতে পারিত না। কোন পদসংগ্রহে, কোন পুঁথিতে, কোন কীর্ত্তনীয়ার মুখে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ২।৪ টা পদও অন্ততঃ পাইতে পারিতাম—কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই একখানি মাত্র খণ্ডিত পুঁথিরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, দ্বিতীয় পুঁথিও আজ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। ভাষার দুরূহত্বের স্কন্ধে এত দোষ চাপাইলে চলে কি?

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের ভাষাও সাধারণের পক্ষে কম দুরূহ নহে, কিন্তু তাহা তাহাদের প্রচারের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অশ্লীল ও অবিশুদ্ধ ভাব পরবর্ত্তী শুদ্ধমতি বৈষ্ণবগণের রুচিপীড়া উৎপন্ন করিয়াছিল—ইহা বালকোচিত সিদ্ধান্ত। স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু যে পদগানে দিবারাত্রি বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাহাই পরে তাঁহার শিষ্য-বর্গের রুচিপীড়ার কারণ ঘটাইবে—একথা বিশ্বাস করা সহজ নহে। গীত-গোবিন্দ বা বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ প্রাকৃত দৃষ্টিতে কম অশ্লীল নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি মোটেই লোপ পায় নাই। শ্রীমহাপ্রভু যাহা আস্বাদ করিয়া মহামহিমমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, ভাব ও ভাষার নগণ্য পরিবর্ত্তনের অজুহাতে পরবর্ত্তী সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ তাহাকে এমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া যাইবেন, ইহা অনুমান করা অবশ্যই কঠিন। শুধু বিস্মৃতি বলিলেও সমস্যা কাটে না—চণ্ডীদাসের পদগুলিই তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন, অথচ চণ্ডীদাসের নামটিকে ভুলিতে পারিলেন না। অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের অবস্থাটা এমন কল্পনা করিতে হয়, যখন শুধু চণ্ডীদাসের নামটাই সকলের মুখে মুখে ফিরিতেছে, তাঁহার পদগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। বৈষ্ণব কবিরা চণ্ডীদাসের স্তুতিগান রচনা করেন, জনসাধারণ চণ্ডীদাসের পদ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হয় অথচ শুনিলে রুচিপীড়ায় কাতর হইয়া উঠিয়া যায়—নহিলে চণ্ডীদাসের প্রকৃত পদ বাদ দিয়া, তাঁহারই নামে অপরের উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিবার কুপ্রবৃত্তি কীর্ত্তনীয়াগণের কেন হইবে বুঝা যায় না। এই জুয়াচোর কীর্ত্তনীয়াদের নাম ধাম জানিবার উপায় নাই—তাহারা এক সময়েরও লোক নহে, এক স্থানেরও লোক নহে, কিন্তু সকলেই এমন সুন্দর ভাবে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাসের ভণিতায় চালাইতে আরম্ভ করিল এবং পাছে সেগুলি চৈতন্যোত্তর কালের বলিয়া মনে সন্দেহ হয়, তাই অতি সাবধানে গৌরচন্দ্রিকার পদ এড়াইয়া গেল যে, তাহাদের বাহাদুরীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

তারপর গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের গীত ভক্তসমাজে খুবই সমাদরে গাওয়া হইত এবং অত্যন্ত লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাওয়া যায়। অথচ কিছুকাল পরেই জানিয়াও কীর্ত্তনীয়াগণ পেশার খাতিরে তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদরত্নগুলি চণ্ডীদাসের নামে চালাইতে লাগিল, আর তাৎকালিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্মৃতিভ্রংশবশতঃ তাহাকেই শ্রীমহা-প্রভুর আস্বাদিত আসল পদ বলিয়া নির্ব্বিচারে মানিয়া লইলেন, এই বা মানিব কেমন করিয়া? সুবিখ্যাত পদকর্ত্তাগণের সুপ্রসিদ্ধ পদবলী কেবলমাত্র অর্দ্ধশিক্ষিত কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে শুনিয়াই রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আপন আপন সংগ্রহ-পুস্তিকায় চণ্ডীদাসের ভূমিকায় বসাইতেন না। সুতরাং নবাবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে প্রতিষ্ঠা করিবার মোহে এতকালকার পদাবলীকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া মোটেই সহজসাধ্য নহে।

মোটামুটি ভাবে এই ত গেল পদাবলীর কথা—এইবার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কথাও একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে

বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানি বসন্তরঞ্জন বাবু একরাশ পুঁথির সহিত বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দৌহিত্র-বংশোদ্ভব দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছেন এবং প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পুঁথিখানি বিষ্ণুপুর রাজবাটীর পুঁথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশ বিষ্ণুপুর রাজবাটীর গুরুবংশ এবং বংশপরম্পরা ইঁহাদের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। বিষ্ণুপুর রাজবাটীতে আচার্য্যের প্রতিপত্তির কথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরও তাৎকালিক বিষ্ণুপুর-রাজের গুরু। সুতরাং সর্ব্ব দিক্ দিয়াই রাজবাটীর পুঁথিশালার খবর (বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভু আস্বাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী) রাধামোহন ঠাকুরের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ যে সময়ে পুথিখানি রাজবাটীর গ্রন্থালয়ে ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়) রাধামোহন যখন পদামৃত-সমুদ্র সঙ্কলন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটি পদও তাঁহার সঙ্কলনে স্থান দেন নাই—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথিখানির হস্তলিপি দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা সম্ভবতঃ ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল, অথচ তিনিই বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তিন রকম হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীন, প্রাচীনের অনুলিপি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। রাখাল বাবু অনুলিপি ও আধুনিক ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন লিপি দেখিয়াই পুঁথিখানির বয়স স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুলিপি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক লিপি কেমন করিয়া কবে আসিল, তাহার উত্তর তিনি দেন নাই। অক্ষরের আকৃতিগত পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই ২।১ বছর অন্তরই হয় না—অনেক কাল লাগে। কিন্তু একই পুঁথিতে প্রাচীন ও আধুনিক দুই রকম লেখার সমন্বয় সম্ভব হইল কেমন করিয়া ও কতদিন ধরিয়া, তাহা ভাবিবার কথা নয় কি? প্রাচীন লিপির বয়স যদি ১৪শ শতক হয়, আধুনিকের কাল নিশ্চয়ই তাহা হইলে অনেক পরে—তবে পুঁথিখানি কি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া লেখা হইয়াছিল; অথচ কাগজ, কালি ও ভাষার পার্থক্যও বিশেষ কিছু নাই।

রাখাল বাবুর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ট, প, হ, দ প্রভৃতি বহু অক্ষরের তিন প্রকার আকৃতিই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আকৃতি দেখিয়া গ্রন্থের বয়স নিরূপণ করিলে পরবর্ত্তী যুগের আকৃতি তাহাতে মোটেই মিলিবার কথা নহে, বরং পরবর্ত্তী যুগে গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলে, আধুনিক লিপিভঙ্গির সাথে পূর্ব্ববর্ত্তী ছাঁদেরও ২।৪টা অক্ষর আসিয়া পড়া অসম্ভব নহে। রাখাল বাবুও বলেন—"যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক"। গ্রন্থের বয়স-নিরূপণ এই আধুনিক আকারের বর্ণ ধরিয়া হওয়াই উচিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই ত গেল লিপিকালের কথা—এইবার ভাব ও ভাষার কথা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে জয়দেবের প্রভাব যথেষ্ট আছে, এমন কি অনেকগুলি

পদের হুবহু অনুবাদও আছে বলিয়া সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির প্রভাবও ইহাতে কম নাই। যথা—

১। এ ধন যৌবন বড়াই সবাই আসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ-মুকুতার হার
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর

(শ্রীকৃঃ কীঃ)

২। গিম্র গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ-কুচ-যুগল উপরে—
হুআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু-শিখরে

(শ্রীকৃঃ কীঃ)

১। শঙ্খ কর চুর বসন কর দুর
তোড়হ গজমতি হার রে
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ভার রে
সীথার সিন্দুর পোছি কর দুর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাশ রে।

(বিদ্যাপতি)

২। পীন পয়োধর অপরূপ সুন্দর
উপর মোতিম হার
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার

(বিদ্যাপতি)

ইত্যাদি —

ইহা শুধু প্রভাব নহে, হুবহু নকল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলে, বিদ্যাপতিকেই চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। কিন্তু মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতির পক্ষে বঙ্গের এই অজ্ঞাত অখ্যাত মন্দ কবির ২।৪টা লাইন চুরি করা মোটেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারই বোধ হয় বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কবিকে তাহা হইলে বিদ্যাপতিরও পরে ধরিতে হয়, অর্থাৎ এই পদরচনার কাল পঞ্চদশ শতকের প্রথমে গিয়া পড়ে। কিন্তু লিপিতত্ত্ব-গবেষণায় পুঁথিখানির লিপিকালই ১৬শ শতকের প্রথমে গিয়া পড়িয়াছে।

পদাবলীর শ্রীরাধা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদবর্গ ইহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাই পরবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব কবির রাধাই বৃষভানু-কুমারী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার হঠাৎ সাগর গোয়ালা কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন কে জানে? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন, কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও পরবর্ত্তী সকল পদকর্ত্তাগণের নিকটেই ইঁহারা স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দশ অবতারের তালিকা বড়ই অদ্ভুত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে—প্রথমে শ্রীরাম, তারপর বুদ্ধ, কল্কী ও সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ। পুঁথির অধ্যায়-বিভাগেও ভাগবতের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই, বরং বিপরীত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানি যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের কোন নাম ছিল না, বর্ত্তমানে অনুমান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থমধ্যে মাঝে মাঝে বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও ভণিতায় 'অনন্ত' নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে অনন্তনামা কোনও সংস্কৃতজ্ঞ গ্রাম্যকবি তাৎকালিক প্রচলিত জয়দেব বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির পদাবলী শুনিয়া ও তৎকর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পালা রচনা করিয়াছিল। সেইজন্য পালাটির ভিতর গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট ভাষাও যেমন দেখা যায়, জয়দেবাদি পদকারগণের প্রভাবযুক্ত কয়েকটি ভাল পদও পাওয়া যায়।

পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করিব। চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে একটি বিষয় জানিতে পারা যায় যে, কবি রামীনাম্নী কোনও নীচজাতীয়া রমণীর নিষ্কলুষ প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং অনেক পদে চণ্ডীদাসের নামের সহিত রামীর নাম যুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও রামীর নামোল্লেখ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে 'চণ্ডীদাস চরিত' বলিয়া যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে [বঙ্গ প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে] তাহাতে চণ্ডীদাসের ও রামীর সম্বন্ধীয় ঘটনার বিশেষ উল্লেখ আছে।

সুতরাং সর্ব্বদিক্ দিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীমহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের গীতি-রস আস্বাদন করিয়া অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরপরিচিত পদাবলীর চণ্ডীদাস। আধুনাবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানি অনন্তনামা কোন অজ্ঞাত অখ্যাত কবি পরবর্ত্তী কালে রচনা করিয়া বাসলীসেবক চণ্ডীদাসের ভণিতায় চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পালাটি ইতর, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, ও অজ্ঞতাপরিপূর্ণ হওয়ায় একেবারেই লোকপ্রীতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই এবং সেই জন্যই ইহা এতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিয়াছে।

—শ্রীবীরেন্দ্র মোহন আচার্য্য

তাম্রকূটসেবী চণ্ডীদাস

বাঙ্গালীর প্রিয় কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ অনেকেরই আছে। চণ্ডীদাস কে, কবে কোথায় জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার কবিত্বের উৎস কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠিয়াছে, এবং সকলে যথাসাধ্য উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দিক্ হইতে চিন্তার ফলে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বহু মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহারও মতে বড়ু, দীন, দ্বিজ সবই এক, একই ব্যক্তি বিভিন্নরূপ ভণিতা দিয়াছেন, তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চণ্ডীদাসের বাল্যের রচনা, আমাদের সুপরিচিত পদাবলী

পরিণত বয়সের দান। অপর দিকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার ও পদাবলী-রচয়িতাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। একজন চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, অপর জন পরবর্ত্তী। কাহারও মতে চণ্ডীদাস্ রামী রজকিনীর বন্ধু, আবার অনেকে রামী রজকিনীর কাহিনীটিকে নিছক গল্প বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। কাহারও মতে চণ্ডীদাস বীরভূম নান্নুরের, আবার অপর এক সম্প্রদায়ের মতে বাকুড়ার ছাতনার অধিবাসী। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রচারিত বিভিন্ন মতবাদ হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুরূহ। আশার কথা এই যে, প্রায় একই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় চণ্ডীদাস-সমস্যা সমাধানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই দুই প্রতিষ্ঠান হইতেই সুসম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকা-ভাগ অচিরেই প্রকাশিত হইবে। তাহা পাঠ করিবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত, সন্দেহ নাই।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যে সব ধারণা ছিল, তাহার একটির পরিচয় পাওয়া যাইবে। কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যাধ্যাপক স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,—"বাঙ্গালা সাহিত্য-সংগ্রহ ১ম ভাগ" নামক এক গ্রন্থ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। তাহাতে চণ্ডীদাসের বহু পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, ভূমিকাস্বরূপ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাই যথাযথ উদ্ধৃত হইল। চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানকারীদের নিকট ইহা কোন প্রয়োজনে আসিবে কি না জানিনা, তবে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে, তাহার সংবাদ তাঁহাদের জানা থাকিলে সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত হইল। উদ্ধৃত অংশে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, তাম্রকূটসেবী চণ্ডীদাসের কাহিনী, এই কাহিনীর সঙ্গে কালিদাস সম্বন্ধে প্রচারিত এক জন-শ্রুতির বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে রামীর নাম-গন্ধও নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে রামী-রজকিনীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের সম্পর্কের কথা অন্ততঃ এক সম্প্রদায় জানিতেন না বলিয়া মনে হয় না কি?

আলোচ্য গ্রন্থখানি কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরীতে আছে। গত বড়দিনের বন্ধে উত্তর-বঙ্গের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীগুলি দেখিবার জন্য রাজসাহী, রংপুর, কাকিনা ও কোচবিহার গিয়াছিলাম। সেই সময় এই পুস্তকখানি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। ষ্টেট লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি দেখিবার সকল প্রকার সুযোগ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয়ের অভিমত নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—

"বিদ্যাপতির সমকালেই চণ্ডীদাস-নামক আর একজন কবি শ্রীরাধা-গোবিন্দ-কেলি-বিলাস-বিষয়ক বহুতর পদাবলী রচনা করেন। তিনি বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি নান্নুর গ্রামনিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রথমে অতিশয় মূর্খ ছিলেন এবং দিবানিশি কেবল তামাক সেবন করিতেন। এক দিবস রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া তামাক খাবেন মনে করিলেন, কিন্তু কোথাও অগ্নি না পাইয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্নির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন মাঠের মধ্যে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী "বাশুলী" বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন তিনি অগ্নি লাভের প্রত্যাশায় দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি যাহা অগ্নি মনে করিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহা অগ্নি নহে। দেবীর অঙ্গজ্যোতি অগ্নিরূপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। তখন তিনি ভীতিসমন্বিত ভক্তিরসাভিষিক্ত হৃদয়ে দেবীরে প্রণাম করিলেন। দেবীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়া বলিলেন—তোমারে আমি দুর্লভ কবিত্বশক্তি প্রদান করিলাম, তুমি আমার প্রভুর ব্রজলীলা বর্ণন কর। চণ্ডীদাস এইরূপে কবিশক্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস মানবলীলা সংবরণ করেন। অনুক্ত বচনপাঠে প্রতীত হইবে চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই কৃত পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

দেবতার

...বিভিন্ন দেবতার মূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষের শরীর-বিধানের বিভিন্ন কার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি অথবা ফটো। এক এক দেবতার মূর্ত্তিতে, শরীর-বিধানের এক এক কার্য্য প্রধানতঃ যে যে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ লইয়া যে যে ভাবে গঠিত হইয়া থাকে, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত থাকে। এক এক দেবতার মন্ত্রে শরীর-বিধানের ঐ ঐ কার্য্য নিজ নিজ অবয়বের মধ্যে কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।...

নবান্ন

—শ্রীসরোজ কুমার রায় চৌধুরী

শীত এখনও পড়ে নাই। কেবল মৃদুমন্দ শীতের আমেজ দেখা দিয়াছে। সকালের দিকে একখানা পুরু চাদর গায়ে থাকিলেই ভাল হয়, না থাকিলেও খুব কষ্ট হয় না। মাঠে ধানের গাছগুলি শস্যের ভারে শুইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, কে যেন মাঠের উপর কাঁচা সোনা ঢালিয়া দিয়াছে। সময়টা কার্ত্তিকের শেষের দিক্। সকাল বেলা।

ইহারই মধ্যে কৃত্তিবাসের সঙ্গে তাহার স্ত্রীর একচোট কলহ হইয়া গেল। দোষ কাহারও নয়। অভাবগ্রস্ত সংসারে এমন নিত্যই হয়। কৃত্তিবাসের সংসার বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নয়। সম্বলের মধ্যে পৈতৃক বিঘা পাঁচ ছয় জমি। পাড়ার আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের কিছু জমি ভাগে চাষ করে বলিয়াই একখানা হালের চাষ করিয়াছে। অন্যান্য বৎসর ইহাতেই তাহার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের খরচটা চলিয়া যায়। তবে এবারে অজন্মার সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে এখনও টিঁকিয়া আছে বটে, কিন্তু আর বুঝি টেঁকে না। তীরের কাছে আসিয়া তরী বুঝি ডোবে।

আর এই কয়টা দিন গেলেই অগ্রহায়ণ পড়িবে। তাহারই প্রথম সপ্তাহে নবান্নটা হইয়া গেলে শুধু সে নয়, গ্রামের পনের আনা লোক বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু সেই প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্তই যে কি করিয়া সংসার চালাইবে, তাহাই একটা মস্ত বড় সমস্যা।

আউশ যাহা হইয়াছিল, শেষ হইয়া গিয়াছে। ধান এবং খড় দুইই। যে কয়টি বলদ এবং গাই-গরু আছে, এইমাত্র শূন্য-পাত্রের সামনে সেগুলিকে বাঁধিয়া দিয়া আসিল। কয়দিন চালের খড় কাড়িয়াই দিয়াছিল। এমনি টানাটানিতে চালের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আর তাহাতে হস্তক্ষেপের উপায় নাই। ক্ষুধার্ত্ত জন্তুগুলির

কৃত্তিবাস ওদিকে যাওয়াই বন্ধ করিয়াছে। কাহারও কাছ হইতে যে আঁটি কয়েক খড় চাহিয়া আনিবে সে সুযোগও নাই। সকলেরই প্রায় তাহারই মত অবস্থা। সে কথা গ্রামের পথে অস্থি-চর্ম্মসার গরুগুলিকে দেখিলেই বোঝা যায়। কোনোটাই সোজা হইয়া চলিতে পারে না। হাঁটিতে গেলে পায়ে পায়ে ঠেকে। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে গরুগুলিকে মাঠ হইতে চরাইয়া আনিয়াছে, আবার আজ একটু বেলা হইলে চরাইতে বাহির হইবে। মাঝের এই সময়টা অসহায় ক্ষুধাতুর প্রাণী কয়টির কি করিয়া কাটিতেছে, তাহা ভাবিয়া কৃত্তিবাসের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তাহার মন এবং মাথা ভাল নাই।

ওদিকে তাহার স্ত্রীও এমন কিছু সুখে নাই। বড় ছেলের মাথার গয়না বাঁধা দিয়া দুইটা টাকা আনিয়া এই কয়টা দিন সে চালাইয়াছে। চালাইয়াছে মানে, স্বামী ও পুত্র-কন্যাদের জন্য আউশ চালের ভাত রাঁধিয়া নিজে অপরাহ্ণ বেলায় দু'টি রেঙ্গুনী চালের ক্ষুদের জাউ লবণ সহযোগে পান করিয়াছে। এবার রেঙ্গুনী ক্ষুদ যে কত গৃহস্থকে রক্ষা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তা সে যা-ই হোক, এবেলা চাল দূরে থাক, রেঙ্গুনী ক্ষুদেরও যোগাড় নাই। কি করিয়া যে ছেলেপেলেগুলির মুখে দুটি অন্ন দিবে তাহাই ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

কয়দিন হইতেই তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। কৃত্তিবাসকে নিশ্চিন্ত ভাবে বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। দু'জনে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। যাহার মনে যত গ্লানি জমিয়াছিল এই উপলক্ষে একে অপরের উপর ঝাড়িয়া দিয়া অবশেষে শান্ত হইল। ততক্ষণে তাহাদের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশী পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ছুটিয়া গিয়াছে অনেক।

করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। আর কৃত্তিবাস পুনরায় দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া সরোষে হুঁকা টানিতে লাগিল।

প্রতিবেশিনীরা কৃত্তিবাসের গৃহিণীকে বোঝাইতে লাগিল, কাহার ঘরে টানাটানি নাই! ভগবানের মার দুনিয়ার বার। সকলেরই তো এইভাবে দিন চলিতেছে। এ-বেলা জোটে তো ও-বেলার ভাবনা, ও-বেলা জোটে তো পরের দিনের ভাবনা। এর জন্য কলহ করিয়া লাভ কি?

প্রতিবেশীরা কৃত্তিবাসকে বোঝাইতে লাগিল, দুঃখে দুশ্চিন্তায় সকলেরই পরিবার বারুদ হইয়া আছে। উহা-দেরই বা দোষ কি! এই সেদিন গণেশের পরিবার গণেশকে কি গালাগালিই না দিল! সে তো কৃত্তিবাস স্বকর্ণেই শুনিয়াছে! তা কি করা যায়! পেটের ছেলে সামান্য দুটি ভাত-মুড়ির জন্য কাঁদিলে মায়ের বুকে কেমন বাজে সেই কথা মনে বুঝিয়া দেখিলেই সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ভিতরে প্রতিবেশিনীদের কথায় কৃত্তিবাস-গৃহিণীর এবং বাহিরে প্রতিবেশীদের কথায় কৃত্তিবাসের ক্রোধোপশম হইল বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা গেল না। এ বেলার শাকান্নের ব্যবস্থা কি করিয়া হয় সেই চিন্তায় বিরস মলিন বদনে উভয়েই নিজের নিজের জায়গায় গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। দুশ্চিন্তা কাহারও কম নয়। কৃত্তিবাসের চিন্তার ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহারাও নতমুখে বসিয়া আপন আপন দগ্ধোদরের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল

হঠাৎ দামোদর বলিল, এই নবান্নটা একবার হয়ে গেলে হয়!

—যা বলেছ! ধানের দর কি রকম চ'ড়ে গেল দেখছ?

দামোদর হাসিয়া বলিল, আর ক'টা দিন? নবান্ন হ'তে দেরী, ধানের দর হু হু ক'রে নেমে যাবে।

মাথা তুলিয়া কৃত্তিবাস বলিল, নবান্নর দিন স্থির হ'ল?

—ঠাকুর মশাই বলছিলেন···

দামোদর কথাটা গুছাইয়া বলিবার জন্য একটু থামিল।

—আর ঠাকুর মশাই!

কৃত্তিবাস বিরক্তভাবে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তম ফোঁস করিয়া বলিল, হ্যাঃ! ঘরে নেই ভাত, বাতাসে হাঁড়ি নড়ছে, আর তোমার ঠাকুর মশাই বলছিলেন! ঠাকুর মশাই আমার মাথা বলছিলেন।

নরোত্তম এমনিতেই একটু ঢেঁকি। তাহার উপর নিজের পেটের জ্বালায়ও বটে, গরুটার পেটের জন্যও বটে, তাহার একমাত্র দুগ্ধবতী গাভীটিকে অতি অল্প মূল্যে বন্ধক দিতে হইয়াছে। সম্প্রতি নানা অহেতুক উপলক্ষে নবান্নর দিন লইয়া যে প্রকার গোলযোগ বাধিয়াছে, তাহাতে বুঝি বা সেটিকে নকড়া-ছকড়ায় বিক্রয়ই করিতে হয়।

দামোদর তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কিন্তু পাঁচুই শনিবার পড়ছে যে!

নরোত্তম ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল, পড়লই বা!

তাহার ছেলেমানুষীতে হো হো করিয়া হাসিয়া দামোদর বলিল, তাই কি হয় রে পাগল! নবান্ন ব'লে কথা!

—নাঃ! হয় না!—নরোত্তম রাগে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কৃত্তিবাস বলিল, কে যেন বলছিল চৌঠা দিন আছে। তা সেই দিনই হোক না কেন?

ঈষৎ বিরক্তভাবে দামোদর বলিল, দিন থাকলেই হ'ল? ঠাকুর মশাই নিজে বলছিলেন···

নরোত্তম আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত ছিটকাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দুত্তোর ঠাকুর মশাই! শনিবারে হ'তে নেই, রবিবারে হ'তে নেই, সোমবারে···আরে বাবা, ঠাকুর মশাই এ ক'দিন আমাদের খেতে দেবে? তা হ'লে যেদিন খুশী হোক না। না হয় মাঘ মাসেই হবে। কি বল হে কৃত্তিবাস?

দামোদর হাত নাড়িয়া বলিল, ওহে বাপু, দিন না থাকলে তো আর কামার বাড়ী থেকে গড়িয়ে আনতে পারা যায় না। নবান্ন একটা যে-সে দিনে ক'রলেই হ'ল? তার দিন-ক্ষণ বাছাবাছি নেই? বাপ-পিতেমো'র আমলে যা হয় নি তা-ই হবে আজ? হাত্তোর পেটের কিছু

ব'লেছে! অমন পেটে ছুরি মারলেই হয়! এই যে চট্টরাজ মশাই! প্রাতঃ প্রণাম!

চট্টরাজ মহাশয়কে দেখিয়া শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর মোলায়েম হইয়া আসিল। চট্টরাজ মহাশয় এই দিকে কিছু একটা কাজে যাইতেছিলেন, সকলে দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধুলা লইল এবং পরম সমাদরে একখানা চাটাই পাতিয়া বসাইল।

চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝগড়া কিসের?

দামোদর বলিল, আজ্ঞে এই নবান্নর কথা হচ্ছিল।

—বিশের আগে বাপু নবান্নর দিন নাই।

অন্যদের তো কথাই নাই। স্বয়ং দামোদরও বিব্রত ভাবে বলিল, বিশে!

—কি ক'রে থাকবে বুঝিয়ে দাও। সতেরই পর্য্যন্ত হরি শয়নে থাকবেন। তার আগে তো হ'তেই পারে না। শাস্ত্রে ব'লেছেন:

ভেবুগ্রাহিশিবেষু বিষ্ণুশয়নে কৃষ্ণে শশিন্যষ্টমে।
শ্রাদ্ধং ভোজনকং নবান্নবিহিতং পুত্রার্থনাশপ্রদম্॥

বুঝলে না?

চট্টরাজ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দও কিছুই না বুঝিয়া তাঁহার হাসির তালে তালে শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিল।

তেমনি হাসিতে হাসিতে চট্টরাজ বলিলেন, মূল কথা হরিশয়নে নবান্ন হলে পুত্র আর অর্থনাশ হয়। এর পরে যদি তোমাদের মন চায়, কর।

সকলে শিহরিয়া বলিল, ওরে বাবা!

কৃত্তিবাসের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাড়ীর ভিতরে সমানে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছিল। এখন আর তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসের গৃহিণীরও সাড়া নাই। হয় তো পাশের বাড়ীতে কিছু চাল, কিংবা দুটি মুড়ি, কিংবা যা হোক কিছু ধারের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। হয়তো একখানা কাঁসার থালা, কিংবা পিতলের ঘড়া বন্ধক দিবার চেষ্টাতেও বাহির হইতে পারে। কৃত্তিবাস অন্যমনস্কভাবে হাত কচলাইতে লাগিল।

দামোদর ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে যে ঠাকুর মশাই বলছিলেন সাতুই নাকি একটা ভাঙ্গ দিন আছে।

—তবে সেই দিনেই কোরো।—চট্টরাজ রাগিয়া বলিলেন,—ওরে ঠাকুর মশাই তো দিন ক'রে দিলেন; হরিশয়নের কথাটাও না হয় ছেড়েই দিলাম। পুত্রার্থনাশ না হয় হ'লই। কিন্তু সেদিন তিথিটা কি খেয়াল আছে?

—তিথিটা…

—তবে? ঠাকুর মশাই দিন তো ক'রে দিলেন। কিন্তু অষ্টমীর দিন যে নারকেল, আদা খাওয়া নিষেধ ঠাকুর মশাই তার কি বল্লেন? আদা, নারকেল ছাড়া নবান্ন হয়?

চট্টরাজ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, বাপুহে, বড় পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রামের সব গেছে। পাজি দেখতে জানে কে? 'নন্দামন্দমহীজ-কাব্যদিবসে পৌষে মধৌ কার্ত্তিকে' এই কথাটার মানেই কেউ বলুক তো দেখি। পাঁজি অমনি দেখলেই হ'ল? তার বিচার নেই?

—ঠিক।

—বড় পণ্ডিত মশাই যাবার সময় ব'লে গেলেন, বাবা, তুমি রইলে। গ্রামের যা অবস্থা দেখো যেন পাঁজি দেখাবার জন্যে এখানকার কাউকে আর নালতেডাঙ্গা যেতে না হয়। ঠিক! মহাপুরুষের বাক্য কি না! নইলে ঠাকুর মশাই নবান্নর দিন করলেন কি না সাতুই!

চট্টরাজ হয় তো তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বড় পণ্ডিত মহাশয়ের আরও কিছু অভিমত বিবৃত করিতেন। কিন্তু দামোদরের কন্যা একটি শূন্য বাটি হাতে করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দামোদর বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে?

নতমুখে মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিলে না। দোকানী বললে, চার আনা বাকি হয়েছে আর দেবে না।

—শুনছ?—দামোদর রোষরক্তনয়নে সকলের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া বলিল,—এই চার আনা পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? ছোটলোক কোথাকার!

মেয়েকে বলিল, যা যাঃ। আর তেল কিনতে হবে

না। আজকের দিনটা বিনা তেলেই চালিয়ে নিতে বলগে। কাল কলু এলে তার কাছ থেকে ভাল তেল নেওয়া যাবে এখন। ওঃ! গন্ধের চোটে তেল তো খাবার উপায় নেই, তাতেই এত গুমর! দাঁড়া বাবা, নবান্নটা হ'তে যে দেরী। তারপরে···

মেয়েটি একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে বিনা তেলে কি ভাবে রান্না হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

নরোত্তম এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার বলিল, আমি বলছিলাম চৌঠা হ'লে কি হয়?

বেচারা সাদাসিধা মানুষ। কথা গুছাইয়া বলিতে পারে না। তাহার উপর কণ্ঠস্বরটা অত্যন্ত কর্কশ এবং রূঢ়। চট্টরাজ তাহাকে একেবারে দেখিতে পারেন না। ভদ্রলোক একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন

কৃত্তিবাস আস্তে আস্তে বলিল, নালতেডাঙ্গার নবান্ন কিন্তু চৌঠাই হবে।

চট্টরাজ এবারে কথা কহিলেন। বলিলেন, রবিবারে?

—তাইতো হবে।

—হবে না হয় বুঝলাম। কিন্তু বাপু, পঞ্জিকা তো মানতে হবে। রবিবারে যে পিতাপুত্রে পায়েস খেতে নেই, তার কি?

নরোত্তম চট করিয়া জবাব দিল, এক সঙ্গে খাবে না। বাপ এক ঘরে খাবে, ছেলে এক ঘরে খাবে। ব্যস্।

চট্টরাজ শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিনের নক্ষত্রটা কি জান?

—নক্ষত্র আবার কি?

-পূর্ব্বদিনের রাশির চন্দ্রশুদ্ধি আছে কি না দেখেছ?

—তা, চন্দ্র···

—মৃগনেত্রা কাকে বলে জান?

—ও সব···

—হুঁ। কিছুই তো জাননা বাপু। এদিকে তর্কে তো বৃহস্পতি হয়ে উঠেছ। আমাদের তুড়ি দিয়েই উড়িয়ে দিচ্ছ।

নরোত্তমও চটিয়া গেল। হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, আপনার ঘরে তো ধান আছে চট্টরাজ মশাই, বিশ ছুই ধান আমাদের ধার দিতে পারেন? তারপরে সতেরই কেন সাতাশে নবান্ন করুন না, কেউ একটা কথা বলবে না। পারবেন?

—নবান্ন করাবার জন্যে তোমাকে ধান ধার দিতে হবে?

দামোদর ব্যাপারটাকে লঘু করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তা, না খেয়ে ম'রে গেলে নবান্ন ক'রবে কে চট্টরাজ মশাই? হা হা হা!

—আর ধান ধার না দিলে তোমরা যেদিন খুশী নবান্ন করবে? পঞ্জিকা মানতে হবে না? ওটা কিছুই নয়?

চট্টরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল নিরক্ষর লোকের কথায় রাগ করা বৃথা ভাবিয়া আবার বসিলেন। বলিলেন, তবে বলি শোন; সূর্য্য বিশাখানক্ষত্র-গত হ'লে, ত্রয়োদশী, রিক্তা, নন্দা তিথিতে, ত্রিজন্ম আর পাপতারাতে, শনি মঙ্গল শুক্রবারে, চোৎ পোষ কার্ত্তিক মাসে, তারপরে তোমার গিয়ে হরিশয়নে, কৃষ্ণপক্ষে, মৃগনেত্রাতে, অষ্টম চন্দ্রে, জন্মচন্দ্রে, জন্মতিথিতে, পূর্ব্ব-ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদে, মঘা ভরণী অশ্লেষা আর আর্দ্রা নক্ষত্রে নবান্ন করতে নেই। করলে পুত্রনাশ, অর্থনাশ হয়। আমার যা বলবার ব'লে দিলাম। এখন তোমরা যা খুশী করতে পার।

নরোত্তম চেঁচাইয়া বলিল, আরে রাখুন মশাই, পুত্রনাশ, অর্থনাশ। এদিকে যে সর্ব্বনাশের আর বাকি নেই। এখন প্রাণে বাঁচলে হয়।

চট্টরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ইহাদের কাহারো ঘরে ধান নাই, হাতে পয়সা নাই, চালের খড় পর্য্যন্ত এমন করিয়া কাড়িয়া গরুকে খাওয়াইয়াছে যে, পতিত বাড়ীর মত অবস্থা হইয়াছে। সেদিকে আর চাওয়া যায় না। ইহারা বিশাখানক্ষত্রগত সূর্য্যও বুঝিবে না, মৃগনেত্রাও বুঝিবে না, হরিশয়নেরও খাতির রাখিবে না। পুত্রনাশের ভয় পর্য্যন্ত যাহাদের লোপ পাইয়াছে, তাহাদের আর নূতন কি কথা বলা যায়।

তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সবই বুঝি হে! তবু নিতান্ত হরিশয়নের মধ্যে···

কৃত্তিবাস দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, হরি মাথায় থাকুন, আপাততঃ আপনারা আমাদের বাঁচান। নিজেরা তো দু'একটা উপোস দিতে ভয় পাই না, কিন্তু ছেলে ক'টা আর এই অবলা গরুগুলো, এদের দুঃখ চোখ মেলে দেখতে পারছি না।

কৃত্তিবাসের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। মলিন বস্ত্রপ্রান্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

কিন্তু এ-দিকে চট্টরাজেরও বিপদ কম নয়। ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ অনেককালের। সম্প্রতি নবান্নর ব্যাপারে আরও পাকাপাকি হইয়াছে। চট্টরাজ সতেরই দিন করিয়াছেন, আর ঠাকুর মহাশয় সাতুই। এ কয়দিন গ্রামের লোকের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, প্রতিপত্তি তাঁহার যতই থাক, সতেরই পর্য্যন্ত কেহই অপেক্ষা করিবে না। হরিশয়নের জন্য না, নারিকেল এবং আর্দ্রকের জন্য না, এমন কি পুত্রনাশের ভয়েও না। সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের দিকে ঢলিয়া পড়িবে। সকল কথা ইহারা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার কুলদেবতা, যিনি এই গ্রামেরও গ্রাম-দেবতা,—ক্ষেতের ফসলটি, বাড়ীর নূতন ফলটি পর্য্যন্ত যাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিবেদন না করিয়া কেহ মুখে তুলে না,—তাঁহারও মর্য্যাদা কেহ রাখিবে বলিয়া ভরসা হইতেছে না। ভিতরে ভিতরে ইহারা যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার শ্রীরাধামাধবের নবান্ন না হইলেও ইহারা নবান্ন করিতে দ্বিধা করিবে না।

সেই কথা ভাবিয়া এবং ঠাকুর মহাশয়ের বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হাসি কল্পনা করিয়া চট্টরাজ ফাঁপরে পড়িলেন। হরিশয়নের মধ্যে নবান্ন করিতে সত্যসত্যই তাঁহার মন সরিতেছিল না। ইতিপূর্ব্বে এমন আর কখনও তাঁহার জ্ঞাতকালের মধ্যে হয় নাই। ওদিকে ঠাকুর মহাশয় যে তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া যাইবেন তাহাও অসহ্য।

বলিলেন, কিন্তু সাতুই কোন প্রকারেই হয় না। ওটা একটা দিনই নয়। বিশেষ নারিকেল এবং আর্দ্রক মানে আদা…

নরোত্তম বাধা দিয়া বলিল, বেশ তো। আপনি একটা ভালো দিন করুন না। কিন্তু সাতুই-এর পরে হলে…

—তবে চৌঠাই হোক।

কৃত্তিবাস এবং নরোত্তম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কেবল দামোদর বলিল, কিন্তু ওই যে বললেন পিতা-পুত্রে…

চট্টরাজকে কষ্ট করিয়া উত্তর দিতে হইল না। নরোত্তম তাহাকে একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, আরে রাখ রাখ। আলাদা আলাদা খেলেই হবে এখন। পিতাপুত্রে! বলে ভাত জোটে না, পায়েস! তা হ'লে এই কথাই রইল তো চট্টরাজ মশাই?

মাথা চুলকাইয়া চট্টরাজ বলিলেন, তা-ই হবে। তোমরা সবাই যখন বলছ কি আর করা যাবে!

—দেখুন। এর আর নড়চড় হবে না তো?

—উঁহু।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ঠাকুর মহাশয় সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও কাহাকেও আর সাত তারিখে নবান্ন করিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না,—এমন কি পৈতা ছিঁড়িবার ভয় পর্য্যন্ত দেখাইয়াও না। তাঁহার কথা আর কেহ কানেই তুলিতে চাহিল না। এমন কি, নিতান্ত অনুগত যাহারা তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ-ভাবে তিনি শপথ করিলেন, যে যেদিন খুসী নবান্ন করুক তিনি সতরই তারিখে নবান্ন করিবেন, অর্থাৎ হরিশয়নের পরে। ঘরে তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান আছে, কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না।



নদীতীর (নোয়াখালী)

চিত্র-চরিত্র

ব্যারিষ্টার ও হাকিম

শ্রীঅমিত রায়

বারুইপুরের হাকিমের এজলাশে আজ বড় ভিড়। হাকিম ছোট, মামলা ছোট; বাদী বিবাদী ধনী, তাই কৌশুলি আসিয়াছে বড়—বিলাত হইতে সদ্য পাশ-করা ব্যারিষ্টার। বারুইপুর কলিকাতার নিকটে হইলেও সে-আমলে ব্যারিষ্টার, উকীলের মত,পথে ঘাটে দেখা যাইত না, অর্থাৎ দর্শনীয় ছিল। বিশেষ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ছিল না বলিলেই হয়; তখনও বিলাতী-বেকারের দল জন্ম গ্রহণ করে নাই। কিন্তু সকলেই যে ব্যারিষ্টার দেখিবার লোভে আসিয়াছে, এমন বলা যায় না;—ব্যারিষ্টারের নাম তাঁহার বিলাত যাইবার আগে হইতেই অনেকে জানিত, অনেকে ছাত্রবৃত্তিতে ইহাঁর রচিত কাব্য পাঠ করিয়াছে—রঙ্গমঞ্চে ইহাঁর নাটক অভিনীত হইয়াছে; কোন কোন সংবাদপত্র ইহাঁকে মহাকবি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে;—ভদ্রলোক কবি ও ব্যারিষ্টার! এই আপাত-বিরোধের সন্নিবেশের জন্যই লোকে তাঁহাকে অদ্ভুত মনে করিত। তাই আজ ভিড় কিছু বেশি।

যথাসময়ে হাকিম এজলাশে আসিয়া বসিলেন। হাকিমের বয়স বেশি নয়—ত্রিশ বছরের এ দিকে; গায়ে কোট-প্যাণ্টলুন নয়, চোগা চাপকান। একহারা চেহারা, ক্ষীণকায় বলিয়া যতটা দীর্ঘ তাহার চেয়ে বেশি মনে হয়; মাঝখান দিয়া চেরা-সীঁথির দুই পাশে কুঞ্চিত সজ্জিত কেশদাম; প্রশস্ত ললাট, খড়্গের মত নাকটা চাপা অধরোষ্ঠের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উপরের ওষ্ঠ কিছু বড়, তাহার তলে অধর প্রায় অদৃশ্য, তবু মনে হয় সর্ব্বদাই একটা শুভ্র হাসির বিদ্যুৎ চারিপাশে খেলিতেছে। চোখ দুইটি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল এবং অনায়ত।

হাকিমকে দেখিয়া অনেকের মনে পড়িল হাকিমও বড় কম ন'ন; তিনিও থান দুই উপন্যাস লিখিয়াছেন, একখানা উপন্যাস তো এই বারুইপুরে থাকিবার সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এত খবর রাখিত, তাহারা কবি ও ঔপন্যাসিকের মিলন দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এজলাশে ব্যারিষ্টার প্রবেশ করিলেন। আত্মপ্রত্যয়বান্ বিখ্যাত অভিনেতা যে-ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেই ভাবে; ব্যারিষ্টার প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন আজিকার রঙ্গ-মঞ্চের তিনিই প্রধান অভিনেতা; হাকিম জবরদস্ত হইলেও তাঁহার প্রভায় কিঞ্চিৎ ম্লানায়মান; তাঁহার মনে হইল, হাকিম, এজলাশ, মামলা সবই উপলক্ষ্য, তিনিই একমাত্র লক্ষ্য। তিনি যেন হাজার হাজার হাত হইতে অশ্রুত করতালির শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

দর্শকেরা দেখিল ব্যারিষ্টার যে বিলাতী-পাশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নেকটাই হইতে বুট পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলাতের ছাপ-মারা; কেবল বর্ণটিতে বাঙ্গালীয়ানা বজায় রহিয়াছে। তবে যে শোনা যায়, বিলাতে বাস করিলেই রংটা ফর্সা হয়! ব্যারিষ্টার স্থূলকায়। প্রৌঢ়ত্বের স্থূলতা দেহে দেখা দিয়াছে; মাথায় চেরাসীঁথি, চুল অনেকটা বিরল হইয়া পড়িয়াছে; গড়ানে ললাট, কোন সংকল্পই যেন দীর্ঘকাল সেখানে থাকিতে পারে না; দুইচার মুহূর্ত্ত টলমল করিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়; নাকটা মোটা; অধরোষ্ঠ স্থূল ও ফাঁক, মনের কথা কিছুতেই যেন তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারে না; চোখ উদার এবং উজ্জ্বল-কবির সংসার-জীবনের চঞ্চল সমুদ্রের ঊর্দ্ধে ধ্রুব-তারকার জ্যোতি বিকীরণ করিয়া অন্তরের কাব্য সপ্তডিঙাকে যেন কমলে-কামিনীর পরপারবর্ত্তী সুদূর সিংহলের দিকে সতত ইঙ্গিত করিতেছে।

হাকিমও বুঝিতে পারিলেন, হাকিম হইলেও আজ তিনি উপলক্ষ্য; লক্ষ্য ওই কৌশুলী। জনতার মনোযোগ ও ঔৎসুক্য ওই কৌশুলিতে কেন্দ্রীভূত। তিনি স্থির করিলেন, কিছুতেই তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবেন না, নেহাৎ দু'একটি ছাড়া কথাই বলিবেন না, কবি ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে কে বড় সে বিষয়ে বিতর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু এজলাশে

কৌশুলীর চেয়ে যে হাকিম বড়, তাহা প্রমাণ করিয়া দিবেন। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চোখ কাগজে নিবদ্ধ করিয়া অনুকম্পামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি যেন কৌশুলীর তর্ক শুনিতে লাগিলেন।

অন্যপক্ষে ব্যারিষ্টার যেন দর্শক সম্মুখে রাখিয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। সহস্র দর্শকের মধ্যে হাকিমও একজন। কখনও তিনি জনতার দিকে তাকাইতেছেন, কখনও হাকিমের দিকে, কখনও নিজের অত্যুগ্র বিলাতী পোষাকের দিকে। দুইজনের মধ্যে একজন স্বগত-অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন, অপরজনের প্রাণপণ চেষ্টা দর্শকের মনোরঞ্জন। কৌশুলীর গলার স্বর মোটা, ভাঙা-ভাঙা; বক্তৃতার মধ্যে আছে ইংরাজী কোটেশন, আছে ভারতচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। হাকিম মৃদুভাষী, স্বল্পভাষী, স্বর পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ, ছিটেগুলির মত। কৌশুলী তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই ভাবিয়াই যেন হাকিমের অধরের পাশে একটা কৌতুকের হাসির আভাস।

হঠাৎ কাগজ হইতে একবার চোখ উঠাইতেই দুইজনে চোখাচোখি হইয়া গেল। এতক্ষণের সংকল্প ভুলিয়া, জনতা, স্থানকালপাত্র ভুলিয়া, বিচার-বিতর্ক ভুলিয়া দুইজনে দুইজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উজ্জ্বল চোখের সঙ্গে উদার চোখের সম্মেলন; তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে স্নিগ্ধ দৃষ্টির, গদ্যের সঙ্গে পদ্যের, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন। একজন বিচারক, একজন ব্যারিষ্টার। একজন কৃতী বিচারক, একজন ব্যর্থ ব্যারিষ্টার। ইহা কি দৈবমাত্র, না তাহার অধিক কিছু ইহাতে আছে? বিচারকের ব্যক্তিত্ব লইয়াই যেন বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক, স্বল্পভাষী, স্বতন্ত্র; স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভেদী তাঁহার দৃষ্টি; উভয় পক্ষের তিনি ঊর্দ্ধে। মধুসূদন কৌশুলীর কৌশল অবগত ছিলেন না; সুকৌশুলি নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়া মক্কেলকে লক্ষ্য করিয়া তুলিবেন; তিনি হইবেন পরতন্ত্র। মধুসূদন দু'চার কথার পরে মক্কেলকে পটভূমিতে ঠেলিয়া দিয়া রঙ্গমঞ্চ নিজে অধিকার করিয়া দাঁড়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে মক্কেলের কথা ভুলিয়া যায়, সবাই দেখিতে থাকে বিস্ময়ের সঙ্গে, মাইকেল এম. এস. ডাট্ বার-এ্যাট-ল-কে। অবশেষে অভিনয় অতি-অভিনয়ে দাঁড়ায়; লোকে ভুলিয়া যায় যে, ইনি মেঘনাদ বধ নামে একখানা কাব্যের কবি; ভুলিয়া যায় যে ইনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, কেবল মনে রাখে ইনি কৌশুলি। কিন্তু যে-কৌশুলি লোকের চক্ষে কৌশুলি ছাড়া আর কিছু নয়, বাগ্‌জালের দ্বারা যে ওই অতি-প্রত্যক্ষ সত্যটাকে ঢাকিয়া দিতে না পারে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যে-অভিনেতা দর্শককে ভুলিতেই দিল না যে, সে অভিনয় করিতেছে, তাহার প্রয়াস নিরর্থক।

মাইকেলের বৈশিষ্ট্য তাঁহার ঈষদুন্মুক্ত অধরোষ্ঠে, সে যেন সর্ব্বদাই নীরব ভাষায় নিজের মনের কথা বলিয়া চলিয়াছে। সে ভাষণ চিঠিপত্রে, সনেটসমূহে, আত্মবিলাপে; সে বিলাপ রাবণের খেদোক্তিতে, নবকুমারের মত্ততায়, ভীমসিংহের সর্ব্বনাশী বিপদে; সে হাহাকার সুন্দ-উপসুন্দের তিলোত্তমা-লাভের মত্ত বাসনায়; তিলোত্তমা নবসঞ্জাতা কাব্যলক্ষ্মী, যাঁহার অন্য নাম তিনি দিয়াছিলেন মধুচক্র, এই কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিতে গিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ; তিনিই দ্বিধাবিভক্ত সুন্দ ও উপসুন্দ। মাইকেলের চোখের অচঞ্চল উদারতায় ও ওষ্ঠের ব্যগ্র বাচালতায় কত প্রভেদ। চোখে তাঁহার প্রতিভা, ওষ্ঠে চরিত্র, অর্থাৎ চরিত্রের অভাব। চরিত্র ও প্রতিভার দুই পায়ের স্বাভাবিক গতি তিনি লাভ করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার চাপা অধরোষ্ঠে, যে অধরোষ্ঠের উপরে ডিমোক্লিসের খড়্গের মত নাকটা ঝুলিতেছে। ওই চাপা ওষ্ঠ ভেদ করিয়া নিজের একটি কথাও তিনি বলেন নাই—বহু লোকের কথা বলিয়াছেন, কেবল নিজের ছাড়া, বঙ্কিমের ওষ্ঠে নেতৃত্বশক্তির পরিচয়; কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে কোথায় সে বাহিনী? তিনি নিজেই এক অদৃশ্য বাহিনী রচনা করিয়া লইয়াছেন—মহেন্দ্র সিংহ এবং সন্তানের দল; রঙ্গরাজ এবং ডাকাতের দল; সীতারাম এবং সৈন্যের দল; প্রতাপ এবং লাঠিয়ালের দল; রাজসিংহ এবং রাজপুতের দল।

আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি—ওই চাপা অধরোষ্ঠ ও উজ্জ্বল চক্ষু এই অদৃশ্য মানসবাহিনীকে স্বল্প-সঙ্কেতে তর্জ্জনীর ইঙ্গিত করিতেছে। বঙ্কিমের ওষ্ঠে চরিত্রবল, নেত্রে প্রতিভা। বঙ্কিম ছিলেন নেতা, মাইকেল ছিলেন বক্তা; বঙ্কিম ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক, মাইকেল ছিলেন অতি-ব্যক্তিক; বঙ্কিম ছিলেন যুধিষ্ঠিরের রথ, শূন্য দিয়া চলিত, চিহ্নটি মাত্র রাখে নাই,; মাইকেল ছিলেন কর্ণের রথ, ধরিত্রী ভেদ করিয়া তাহার যাত্রাপথের চিহ্ন। বঙ্কিম নিজের কথা কিছুই বলেন নাই, মাইকেল বেশি বলিয়াছেন; বঙ্কিম-মাইকেল কাহারও জীবনী লিখিত হইবে না, একজনের বিষয়ে কিছুই জানি না, অপর জনের বিষয়ে অত্যন্ত বেশি জানি।

মাছি

—লুইগি পিরাণ্ডেলো

গ্রামের নীচে খাড়া পাহাড়টির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিল দু'টি যুবক। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাদের ছোট মাথা-মোটা জুতোজোড়া পিছলিয়ে যাচ্ছিল আর তারা খুব হাঁপিয়ে পড়ে' পেছনের পিছল পথটিকে লক্ষ্য করে গাল দিচ্ছিল। শেষে সাদা বাঁধটির ওপর তারা দুজনেই যখন এসে দাঁড়াল—তখন গ্রামটির মুখে ছোট কুয়োটির পার থেকে অনেকগুলো মেয়ে তাদের কথাবার্ত্তা থামিয়ে, তাদের দিকে তাকাল।

—টরটুরিসিদের ছেলেরা না? তাই তো, নেলি আর তার ভাই স্যারো টরটরিসি যে! হতভাগারা এত ছুটছে কেন?

ছোট ভাইটির নাম নেলি। সে এত হাঁপিয়ে পড়েছিল যে, একটা হাঁপ না নিয়ে আর এক পাও এগাতে পারছিল না। দাঁড়িয়ে বললে: গুইরল্যো জারুর জন্যেই তো···

মেয়েগুলো ভয়ে ও বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। সমবেদনা জানিয়ে একটি জিজ্ঞেস করলে:—তার আবার কি হল?

নেলির দেরী হচ্ছে দেখে স্যারো তার একখানা হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। সে দারুণ অসহায় হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল:—হবে আবার কী! কপাল সব···যেতে যেতে দূর থেকে সে উত্তর দিলে।

যুবক দুটি গ্রামের গরীবদের ডাক্তারবাড়ীর দিকে আবার ছুটে চলল।

ডাক্তার সিডোরো লপিকোলো নয়-দশ মাসের রোগ-পাণ্ডুর ও অস্থিচর্ম্মসার একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে তাঁর বসবার ঘরে পায়চারী করছিলেন। তাঁর শার্টের বোতাম গুলো ছিঁড়ে গিয়েছে; পায়ে পুরাণো একজোড়া স্লীপার। অনিদ্রায় তাঁর চোখ দুটি ক্ষীণ-ফুলে উঠেছে। আজ প্রায় দশ দিন হতে চলল—তিনি ক্ষৌরি করার এক মুহূর্ত্তও সময় পান নি।

এগারটি মাস তাঁর স্ত্রী শয্যা নিয়েছেন। সাতটি ছেলে মেয়ে; কোলের এটিই হ'ল সব চেয়ে ছোট। দেখা-শুনা করে কে? নোংরা দুরন্ত ছেলেগুলো—গায়ের ছেঁড়া জামা-কাপড় থেকে বিশ্রী ময়লা গন্ধ বেরোয়, বাড়ীখানাকে যেন তোলপাড় করে তোলে। চারদিকেই বিশৃঙ্খলা—এখানে ভাঙ্গা বাসন, ওখানে ফলের খোসা ছড়ানো; কোন ঘরের মেঝেতে ময়লা জমে জমাট বেঁধে আছে। চেয়ারের পায়াগুলো সব ভাঙ্গা, আরাম-কেদারাটার মাঝখানটা ছেঁড়া। অনেক দিন ধোপার বাড়ী পাঠানো হয়নি বিছানার চাদরটা—ছেলেমেয়েগুলো তার ওপর বালিস নিয়ে খেলতে গিয়ে একদম জঘন্য করে রেখেছে।

বসবার ঘরে দেয়ালে টাঙ্গানো এনলার্জ-করা ছবিখানাই হয়তো একমাত্র জিনিষ, যা ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সিডোরো লপিকোলো ডাক্তারী পাশ করেই এই ফটোখানা তুলেছিলেন। বয়স তাঁর তখন অল্প; খুব ফিটফাট বাবু হয়ে তিনি হাসিমুখে এই ফটোখানা তুলেছিলেন।

আলগা স্লীপার-পরা পায়ে তিনি ছবিটির দিকে এগিয়ে গেলেন, দাঁত বার করে স্মিত একটুখানি হেসে রোগা মেয়েটিকে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

—তুমি বেশ আছ, সিসিনী!

ছোটবেলায় তাঁর মা তাঁকে আদর করে 'সিসিনী' বলে ডাকতেন, কেন না তিনিই তখন পরিবারের একমাত্র আশা—ভবিষ্যতের একমাত্র গৌরব।

আর এখন···

চাষী যুবক দুটিকে দেখে তিনি পাগলা কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠলেন।

—কি চাও তোমরা?

টুপিটা হাতে নিয়ে স্যারো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: সিনর ডাক্তর···আমার খুড়তুত ভাই—একটি গরীব লোক···

—মরছে? মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক; ভাগ্যবান্!···
ডাক্তার অস্বাভাবিক রকম চীৎকার করে উঠলেন।

—না না, ডাক্তার বাবু—আসুন একবার, হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা বুঝতে পারছি না—কি যে হ'ল। মন্তেলুসার খামারে সে এখন পড়ে আছে।

ডাক্তার চমকে উঠে পিছনে এক পা হেঁটে গিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন :

—অ্যাঁ, মন্তেলুসায় !

তিনি জানতেন—গ্রাম হ'তে মন্তেলুসা ঠিক সাত মাইল নীচে ; আর কি বিশ্রীই না রাস্তা !

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিনর ডাক্তার। আসুন—দয়া করে শীগগির একবার আসুন···

জারো আবার অনুনয় করল,···সে ফুলে এত কালো হয়ে গেছে যে, তার পানে তাকাতেও ভয় করছে। আসুন একবার দয়া করে !

—হেঁটে না কি ?···ডাক্তার রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।···দশ দশটি মাইল ! তুমি কি পাগল হলে ? ঘোড়া—আমি ঘোড়া চাই একটি, বুঝলে ? নইলে যাব না বলে রাখছি।

—আমি ছুটে গিয়ে এক্ষুনি একটা নিয়ে আসছি, সিনর ডাক্তার ··জারো অসহায় হয়ে বলল।

নেলি তার দাদার দিকে তাকিয়ে বলল : আমি তা হলে দাড়িটা কামিয়ে আসি—কি বল ?

ডাক্তার তার দিকে তাকালেন—যেন চোখদুটি দিয়ে তাকে গিলে ফেলবেন।

নেলি ঘাবড়ে গিয়ে কৈফিয়তের সুরে বললে : আজকে র'ববার কি না···আর শীগগির আমাদের বিয়ে হচ্ছে···

– বিয়ে ! ওঃ, তা হলে তোমাদের বিয়ে হবে শীগগির ! ডাক্তার রাগে নাক সিটকালেন ; মুখে বিশ্রী ভঙ্গি করলেন।···হ্যাঁ, তারপর বছর বছর এর মত ছেলে হবে ! তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে তার কোলের রোগা মেয়েটিকে নেলির কোলে একরকম ছুঁড়েই দিলেন। তারপর একজন একজন করে সবাইকে তার দিকে ঠেলে দিলেন জোরে।

—বোকা তুমি—একদম বোকা !—তিনি থামলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে পিছনে কয়েক পা হেঁটে গেলেন ; যেন চলে যাবেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এসে রোগা মেয়েটিকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন ! জ'ভারের দিকে চেঁচিয়ে বললেন : যাও গিয়ে ঘোড়া নিয়ে এস একটি —আমি এখুনি আসছি।

দাদার পিছু-পিছু সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে নেলির মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। তার বয়স কুড়ি ; আর ম্যালুজার ষোল—খুব সুন্দরী সে—তার বাগ্‌দত্তা। হেঃ, সাতটি ছেলে ! বেশী আবার কি ? তাদের চাই অন্তত বারটি ! নাই বা থাকল তার টাকা ; তাই বলে ছেলেমেয়েরা উপোস থাকবে না কি ? ভগবান কি দেন নি তাকে সবল দুটি বাহু ! ভয় কি ? হাতে থাকবে কাস্তে ; আর সবাই তো তাকে কবি বলেই ডাকে—নিজের গান গেয়েও কাটাতে পারবে দিনগুলি। আর মেয়েরা তো তার উজ্জ্বল নীল চক্ষু দুটির পানে তাকিয়েই লজ্জায় লাল হয়ে উঠে—তার কোঁকড়ানো সোনালী চুলের পানে তাকিয়ে !

কিন্তু জারুই সব মাটি করে দিলে ! লুজা হয়তো তার উপর খুব রাগ করবে ; ছয়-ছ'টি দিন সে বসে আছে এই রবিবারটির জন্যে—তার সাথে ক'ঘণ্টা আলাপ করবার জন্যে ; আর সে এখন কি করেই বা যায়—লোকেই বা কি ভাববে। হতভাগা জারু ! তারও যে এক সঙ্গে বিয়ে হবার কথা—সব ঠিকঠাক ! কিন্তু সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। মন্তেলুসার লপেসের খামারেই সে কাজ করছিল—গাছ থেকে বাদাম পাড়ছিল। শনিবার সকাল বেলায় আকাশটা হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে ফেলল, যেন এখুনি আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি আসবে। যা'হোক, দুপুরের দিকে লপেস হুকুম দিল : বৃষ্টি হয়ত ঘণ্টাখানেকের ভিতর সুরু হবে ; আমি চাই না যে, নীচে ছড়ান বাদামগুলি জল-কাদায় একেবারে নষ্ট হয়ে যাক। তোমরা আর পেড় না···

মেয়েরা অতক্ষণ নীচ থেকে বাদাম কুড়াচ্ছিল। সে তাদের বলে দিলে : পাহাড়ের পাশের শেডে গিয়ে তোমরা খোসা ছাড়াও গে।

তারপর নেলিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : তোমরাও যদি চাও, মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে খোসা ছাড়াতে পার।

জারু বলল : আমাদের মজুরী কিন্তু পাঁচিশ 'সোলডি' করেই দিতে হবে।

—না, শুধু আধা দিনের মাইনে পাবে পঁচিশ সোল্‌ডির হিসেবে। তারপর মেয়েদের মত আধ লীরা করে।··· লপেস উত্তর দিল।

সত্যি, তাদের ওপর, গরীব মজুরদের উপর—এটা ভারী অন্যায়! চুক্তিবদ্ধ একটা কাজ আরম্ভ করে, কেনই বা পাবে না তারা একদিনের পুরো মাইনে! সেদিন বৃষ্টিও হ'লো না—রাত্রেও না।

—আধ-লীরা করে কাজ করতে বলছেন আপনি!—জাক্ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।—বেশ, কিন্তু আমি ও-কাজ করতে চাই না। কাছা দিয়েই আমি কাপড় পরে থাকি—জানবেন। পঁচিশ সোলডি করে আমার আধা-দিনের মাইনে চুকিয়ে দিন—আমি বাড়ী চলে যাই।

সে কিন্তু গ্রামে ফিরে গেল না; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে রইল নেলি ও স্যারোর জন্যে—তারা ওদিকে রাজী হয়ে ওই বেতনেই মেয়েদের সঙ্গে কাজ করছে। খুব ক্লান্ত হয়ে সে একটি আস্তাবলে গিয়ে শুয়ে পড়ল; আর লোকদের বলে দিল, যেন নেলি ও স্যারো এসে তাকে জাগিয়ে দেয়।

ফসল খুব সামান্যই সংগ্রহ করা হয়েছিল, মেয়েরা তাই বলল: একটু রাত জেগে সবাই মিলে কাজটা শেষ করে, বাকি রাতটা তারা এখানেই কাটিয়ে দেবে—তারপর কাল খুব সকাল সকাল গ্রামের দিকে রওনা হবে

লপেস খুব খুসী হ'লো; তাদের জন্যে পাঠিয়ে দিলে—এক ডিশ ডিম আর দু'বোতল মদ। রাতদুপুরে কাজ শেষ করে তারা সবাই শিশিরে ভেজানো খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়ল খোলা মেঝেয়—জ্যোৎস্না-ভরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

—কবি একটি গান করো না!—মেয়েরা বায়না ধরল।

নেলিকে শেষে গান গাইতে হ'ল। একরাশ সাদা-কালো মেঘের ফাঁকে চাঁদ ডুবে যেতে লাগল তার দিকে একটুখানি হেসে লুজা যেন মুখ লুকাল!

জাক্ কিন্তু সেই আস্তাবলেই রয়ে গেল। খুব সকালে স্যারো তাকে জাগাতে গিয়েছিল; সে তখন ভীষণ জ্বরে বেঁহুস, বিবর্ণ—চোখ-মুখ ফুলে গেছে।

নাপিতের দোকানে বসে নেলি আগাগোড়া ঘটনাটি বুঝিয়ে সবাইকে বলল। নাপিতটা তার কথায় এত মজে গিয়েছিল যে, তার থুতনীতে ক্ষুরের একটা পোঁচই দিয়ে বসল। ক্ষতটি খুব সামান্য হলেও নেলি নাপিতটাকে তার আনাড়িপানার জন্যে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই লুজা তার মার সঙ্গে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। মিতা লুমিয়াও কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এল—কেন না জাকের সাথে দুদিন পরে তার যে বিয়ের সব ঠিকঠাক।

মস্তেলুসায় গিয়ে জাককে দেখবার জন্যে মিতা জিদ ধরল; নেলি তাকে বুঝিয়ে বহু কষ্টে শান্ত করল। বলল যে, তারা গিয়ে জাককে এখুনি নিয়ে আসছে গ্রামে, সন্ধ্যের আগেই সে তাকে দেখতে পাবে।

এই সময় স্যারো ছুটে এসে চেঁচিয়ে জানাল—ডাক্তার ঘোড়ায় উঠে বসে আছেন, এক মুহূর্ত্তও তিনি তার দেরী করবেন না।

নেলি লুজাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তার একখানি হাত ধরে বলল: তুমি একটুখানি অপেক্ষা ক'রো—বুঝলে? সন্ধ্যের আগেই আমি ফিরে আসছি অনেক কথাই বলবার আছে···

রাস্তাটা বিশ্রী। নেলি ও স্যারো দুপাশ থেকে ঘোড়ার লাগামটি ধরে ধরেই যাচ্ছিল; তবু ডাক্তার লপিকলো পাশে গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয়ে কেঁপে উঠছিলেন। নীচে কম্প্যানার বিরাট মালভূমি—জলপাই ও বাদামের সারি সারি বাগান। মাঠে থেকে শস্য কাটা হয়েছে—তাদের সাদা নাড়াগুলো এখানে ওখানে কুড়িয়ে জড় করা হয়েছে স্তূপাকার; সারের জন্যে তাতে আগুন দেওয়া হবে। দূরে—বহুদূরে দেখা যায় সমুদ্র—কালো, গাঢ় নীল সমুদ্র। চারদিকে অনেকগুলো গাছ আকাশে মাথা তুলে ঢেকে রেখেছে—নিবিড় সবুজ শোভা। কিন্তু বাদাম গাছের আগা পাতলা হতে সুরু করেছে।

দূর-দিগন্তের রেখা ছুঁয়ে যে পর্ব্বতগুলি দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলিকে দেখাচ্ছে কাল মেঘের মত। আর কাঁকড়-ছড়ানো রাস্তাটির উপর সূর্য্যের প্রখর কিরণ পড়ে কাঁকরগুলো চিকচিক করছে। মাঝে মাঝে পাশের কাঁটা-ঝোপ থেকে চাতক ও কাক উচ্চৈস্বরে ডেকে উঠছে। হঠাৎ কর্কশ একটা ডাক শুনে ঘোড়াটির কান দুটো ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল।

—বাজে—একদম বাজে ঘোড়া! ডাক্তার অসহায় ভাবে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন।

ঘোড়াটির মাথার দিকে স্থির ভাবে চেয়ে থেকে তিনি তার পিঠের উপর বসেছিলেন। তাঁর খেয়ালও ছিল না মাথার উপর থেকে ছাতাটি কখন সরে গিয়ে সূর্য্যের প্রখর তেজ তাঁর গায়ে এসে পড়ছে।

—ভয় কি ডাক্তারবাবু, আমরা যখন রয়েছি· চাষা দুজন তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলল। বাস্তবিক ডাক্তার নিজের জন্যে একটুও ভয় করছিলেন না; কিন্তু ঘরে যে তাঁর সাতটি অসহায় দুরন্ত শিশু রয়েছে! তাদের কথাও তো তাঁকে ভাবতে হবে।

ডাক্তারের পথ-কষ্ট লাঘব করবার জন্যে চাষা দুজন বলতে সুরু করল:

—ফসল এবার মোটেই হয়নি, ডাক্তারবাবু—গম, শিম, খুব কমই পাওয়া গেছে। বাদাম আর আর বছর কতই না পাওয়া যেত; কিন্তু এবার! এবার একেবারেই পাওয়া যায় নি। জলপাইয়ের কথা বলবেন না—সবে মাত্র ফুল ধরল; অকালে তুষারপাত হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল। আর আঙুরের কথাই বা কে বলতে পারে বলুন,—চারদিকে যে ভাবে রোগ দেখা দিচ্ছে···

মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে ডাক্তার তাদের কথায় সায় দিতে লাগলেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে তারা এসে পড়ল সোজা, লম্বা একটি রাস্তায়; পুরু ধুলোর সাদা একটা প্রলেপ তার উপর কে যেন আলগাভাবে বুলিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে ঘোড়াটি জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগল। স্যারো গুণ গুণ করে গান করতে লাগল আপন মনে; কিন্তু সে থেমে গেল—পথে একটিও লোক নেই। আজকে রবিবার; সব চাষাই রয়েছে গ্রামে। অনেকেই গেছে চার্চ্চে; আর অনেকেই হয়ত আমোদ-আহ্লাদ করছে। কিন্তু এত নীচে—মন্তেলুসায় আস্তাবলে জারুর কাছে কেউ কি বসে আছে? নির্জ্জনে একলাই হয়ত সে মরছে!

তারা গিয়ে দেখল নোংরা সেই আস্তাবলে জারু একলা দেওয়ালের পাশে—স্যারো ও জেলি সকালে যেমন দেখে গিয়েছিল—তেমনি শুয়ে আছে। তার মুখ এত ফুলে উঠেছে যে, তাকে আর চেনা যায় না। খড়ের গাদার ফাঁক দিয়ে একটুখানি রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। নাক তার চলে পড়েছে; ঠোঁট দুটো কালো—ফোলা। তার রুক্ষ কোঁকড়ানো চুলের ভিতর এক টুকরো খড় চিকচিক করছে রোদে।

ভয়ার্ত্ত চোখে তিনজনেই তারদিকে তাকিয়ে রইল, দরজায় দাঁড়িয়ে। ঘোড়াটি ডেকে উঠল; আস্তাবলের অসমান মেঝেতে ক্ষুর দিয়ে আঘাত করল। স্যারো চমকে উঠে মুমূর্ষু লোকটির কাছে এগিয়ে গেল। ডাকল:

—গুইরল্যো! গুইরল্যো! দেখ—চোখ মেলে দেখ—ডাক্তার এসেছে।···স্যারো জারুকে জাগাবার জন্যে আবার চেষ্টা করল। সে হঠাৎ ভীরু চোখদুটি একবার মেলল—রক্তের মত লাল চোখদুটি; চারিদিকে তার কালো দাগ পড়েছে। বীভৎস একটা হাঁ করে সে ক্ষীণ গলায় বলল: আমি···মরে ···যাব!—

—না-না, তুমি শীগগির সেরে উঠবে···আহত হয়ে স্যারো উত্তর দিল।—ডাক্তার বাবুকে নিয়ে এলুম তোমার জন্যে—তুমি দেখতে পাচ্ছ না তাঁকে?

—আমাকে···নিয়ে যাও···গ্রামে।···জারু আবার অনুনয় করল।

—ও-মাগো!···কষ্ট করে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সে হয়ত আর কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু ফোলা ঠোঁটদুটো সে আর নাড়তে পারল না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিয়ে যাব, না? ঘোড়া রয়েছে···

স্যারো মাথা নেড়ে বলল।

—কেন, আমিই ত' তোমায় কোলে করে নিয়ে যেতে পারি, গুইরল্যো···

নেলি ঘোড়াটিকে আস্তাবলে বেঁধে রাখতে গিয়েছিল। এখন ফিরে এসে তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল,—ভয় পেও না, তুমি সেরে উঠবে।

জেলির গলা শুনে তার দিকে জারু চোখ ফেরাল—রক্তবর্ণ দুটি চোখ। পরে চিনতে পেরে উঠে হাত বাড়িয়ে সে নেলির কোমরের সিল্কের লালকাপড়টি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

—আরে···তুই!

—হ্যাঁ, আমি। অত চেঁচিও না, গুইরল্যো! তোমার অসুখ সেরে যাবে।

সে তার রুগ্ন ভাই-এর বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বুক তার অবিরত ধুকধুক করছে। এক সময় জারু হঠাৎ রাগে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠল। তারপর দু'হাতে নেলির ঘাড়টা জোর করে চেপে ধরল।

—এক সঙ্গে আমাদের দু'জনের বিয়ের কথা ছিল, না?— সে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল।

—হাঁা, এক সঙ্গেই তো বিয়ে হবে; অত ভাবছ কেন তুমি?···ঘাড় থেকে তার হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নিতে নিতে নেলি উত্তর দিল।

ডাক্তার রোগটি ধরতে পারছিলেন না। এখন বুঝতে পারলেন—'গ্ল্যান্‌ডারস্‌'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কোন পোকায় কামড়িয়েছিল? মনে পড়ছে?

জারু শুধু মাথা নাড়ল; কোন উত্তর দিল না।

—পোকা? স্যারো বোকার মত জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার এই বোকা চাষা দুটিকে যতদূর পারলেন— বুঝিয়ে দিলেন: কাছেই হয়তো কোন জন্তু মরেছে 'গ্ল্যান্‌ডারস' হয়ে; আর তার পচা মড়ার উপর অনেকগুলো মাছি গিয়ে বসেছে—তার একটি হয় তো ওখান থেকে উড়ে এসে জারুকে দূষিত করেছে!

জারু দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। কেউ হয়ত লক্ষ্য করে নি, এখানেই যে তার মৃত্যুর দূত—খুব সামান্য একটি প্রাণী নীরবে প্রতীক্ষা করছে! কাছে—দেওয়ালেই একটি মাছি স্থির হয়ে বসে ছিল। কিন্তু একটুখানি ভাল করে দেখলেই দেখা যাবে—সে তার ছোট শুঁড় ফুটিয়ে দিয়ে যেন কিছু পান করছে; আর মাঝে মাঝে তার সরু সামনের পা দু'খানা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে দুটো এক সঙ্গে রগড়াচ্ছে আস্তে আস্তে—পরম তৃপ্তি ভরে।

ডাক্তার তখনও বলছিলেন। কিন্তু জারু মাছিটির দিকে চেয়ে রইল—অপলক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। একটি মাছি! কে বলতে পারে—হয় তো এইটিই! ও, তার মনে পড়ল—আগের দিন সে যখন স্যারোদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এখানে শুয়ে শুয়ে, একটি মাছি তাকে তখন খুব বিরক্ত করছিল। হয়তো এইটিই···এক সময় মাছিটি উড়ে গেল। সে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল—মাছিটি গিয়ে নেলির গালে বসেছে। তার গালের উপর সামনের সরু পা'দুখানা বারকয়েক রগড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সে আবার গিয়ে বসল, থুতনীর যে জায়গায় নাপিত ক্ষুর দিয়ে কেটে ফেলেছে, তার উপর।

জারু ইচ্ছে করেই তার দিকে তাকিয়ে রইল; ডুবে রইল একরাশ চিন্তায়। তারপর খুব কষ্ট করে হঠাৎ বলে ফেলল —মাছি থেকে!···একটি মাছি—

—হাঁা, একটি মাছি থেকেই!—ডাক্তার উত্তর দিলেন।

জারু আর কিছু বলল না; শুধু মাছিটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। ডাক্তারের কথাগুলি নেলি হাঁ করে শুনছিল; একবার চেষ্টাও করল না—হাত দিয়ে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিতে। জারু আর ডাক্তারের কথা শুনছিল না। তার খুব আনন্দ হ'ল—মুখের উপর থেকে নেলি মাছিটিকে তাড়াচ্ছে না দেখে। আঃ, তবে একসঙ্গেই তো তারা দু'জনে এখন চলল বিয়ে করতে—

সুস্থ ছোট ভাইটির উপর তার কেমন একটা প্রবল, উৎকট ঈর্ষা হচ্ছিল—জীবনের বহু মধুর আশা থেকে নিজে সে কেন আজকে বাদ পড়ে গেল ভেবে।

এমন সময় নেলি টের পেল—তাকে কিছু একটা যেন কামড়াচ্ছে। হাত তুলে সে থুতনীর উপর থেকে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিল; তারপর দু'টো আঙুল দিয়ে সেই জায়গার ঘাটার উপর চুলকাতে লাগল। জারুর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল—সে তার দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে। রুগ্ন এই লোকটির বিবর্ণ ঠোঁট দুটি পৈশাচিক হাসিতে ভরে গেছে। তারা দু'জনেই চেয়ে রইল দু'জনের দিকে। তারপর জারু এক সময় বলে উঠল:

—সেই মাছিটি···

নেলি কিছু বুঝতে পারলে না, সে তার দাদার উপর ঝুঁকে পড়ল।

—কি বলছ?

—সেই মাছিটি· জারু আবার বলল।

—কোথায়? কোথায় সেই মাছিটি···ভয় পেয়ে নেলি ডাক্তারের দিকে তাকাল।

—ওখানে, যেখানে তুই চুলকাচ্ছিস্‌। আমি বলছি· ঠিক সেই মাছিটি···বিকট হেসে জারু বলল।

নেলি ডাক্তারকে তার থুতনীর ঘা'টা দেখালে, বলল : —কি হ'লো দেখুন তো ডাক্তার বাবু ; খুব জ্বালা করছে—

ডাক্তার ঘা'টা দেখলেন ; কি ভাবলেন। তারপর তাকে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে এলেন ; স্যারোও পিছু পিছু এল তাদের সঙ্গে।

তারপর কি যে হল তার কিছুই বুঝতে পারল না। সে অপেক্ষা করে রইল অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করে রইল, নিদারুণ উদ্বেগে। বাইরে তাদের কথাবার্তা সে অস্পষ্ট শুনতে পেল, হঠাৎ এক সময় স্যারো ভিতরে ছুটে এল ; তার দিকে একবার তাকালও না ; ঘোড়াটিকে খুলে টেনে নিয়ে গেল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল কাতর একটা আর্ত্তনাদ : হে ভগবান ! আমার নেলিকে…

তারা আর ফিরে এল না। অসহায় হয়ে মরবার জন্যে—একটি কুকুরের মত মরবার জন্যে—তাকে ফেলে তারা চলে গেল, কনুই দুটির উপর ভার রেখে সে মাথা তুলল ; বার দুয়েক ক্ষীণ করুণ স্বরে ডাকল : —স্যারো…স্যারো…

শুধু নিবিড় নীরবতা। কেউ সাড়া দিল না।

কনুই-এর উপর ভার রেখে সে আর থাকতে পারছিল না ; মেঝের উপর চিৎ হয়ে সহসা পড়ে গেল, তারপর এক সময় বিছানো খড়ের ভিতর মুখ ঢাকল—আস্তাবলের এই দুর্ব্বিষহ নীরবতা যেন তার বুকে অহর্নিশ ছুরি হানছে ! এক সময় তার মনে হ'লো—হয়ত আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটি তার প্রবল জ্বরের একটি প্রলাপ—একটি দুঃস্বপ্ন ! কিন্তু যখন আবার সে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল, দেখল যে সেই মাছিটি আবার এসে দেওয়ালের সেই জাগাতে বসেছে !

কিন্তু এই তো যথেষ্ট……

মাঝে মাঝে আবার মাছিটি তার ছোট শুঁড়টি ফুটিয়ে দিয়ে কিছু একটা যেন পান করছে ; তারপর সামনের সরু পাদুখানা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে এক সঙ্গে সে দুটো রগড়াচ্ছে আস্তে আস্তে—পরম তৃপ্তি ভরে !

[অনুবাদক—শ্রীনিখিল সেন

দুঃখ ও সুখ

—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

দুঃখ-সুখে অপরূপ এই তো জীবন !
চাহি না কেবল শুধু মধু-রজনীর
উতরোল নর্ম্মলীলা—মদির স্বপন।
আসে যদি অমারাতি লইয়া গভীর—
তমসার হাহাকার—বরি' লব তায়।
না মাগি কেবল শুধু পুষ্পিত প্রলাপ
মদ-দৃপ্ত ফাল্গুনের ; নিকুঞ্জ-সভায়
কোকিলের কলোচ্ছ্বাস—বকুল-কলাপ
সৌরভ-আকুল ! যদি শিশির শীতল
আসে নিয়ে কম্প্রকরে তুহিন-সম্ভার,—
রিক্ততার ব্যথা বহি'—উপবনতল
নিথর নৈঃশব্দ্যে ভরি',—না করিব আর
বৃথা ডর ! বেদনার গাঢ় অন্ধকারে—
উদ্ভাসি' উঠুক মোর আত্মা বারে বারে !

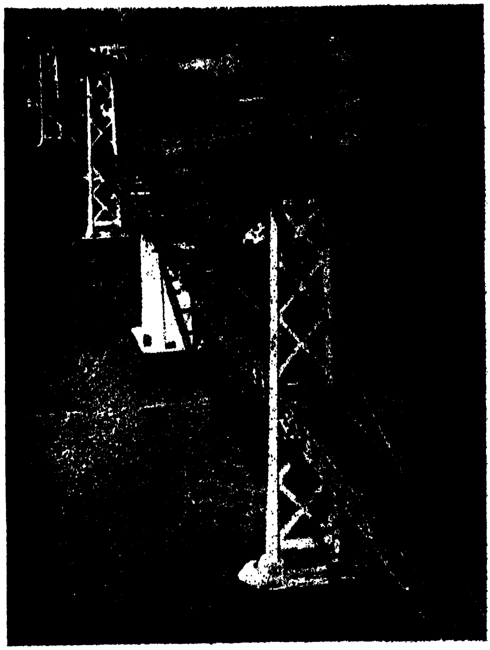
বিজ্ঞানের নিষ্ফলতা

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

"সায়েন্টিফিক আমেরিকান" একটি উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। প্রায় শতাব্দীকাল প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা নিতান্ত অল্প নহে। বর্ত্তমানে বহুলোক আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান 'বৈজ্ঞানিক' যুগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে আস্থাবান। কিন্তু যাঁহারা একটু চিন্তা করিয়াছেন, যদিও বর্ত্তমান দ্রুতগতিতে জীবনযাত্রা প্রণালী এবং মাত্র সংবাদপত্র পাঠে জ্ঞান (?) অর্জ্জনের স্পৃহার নিবৃত্তি চিন্তার সহায়ক নহে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানুষের হিত অপেক্ষা অহিত বেশী করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের এই বিকৃত ও ভ্রান্ত গতির মোড় ফিরাইবার কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। বিজ্ঞানের এই নিষ্ফলতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উক্ত পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় "হোয়াট ক্যান্ সায়েন্স ডু?" বিজ্ঞান কি করিতে পারে?—শীর্ষক একটি হতাশাব্যঞ্জক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। "বঙ্গশ্রী"র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট প্রবন্ধটির মর্ম্মানুবাদ উপস্থাপিত করা হইল :—

বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে, আলোচনা-সভায় অথবা কেবলমাত্র দুই একজনের মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপের সময়, বৈজ্ঞানিকেরা যখনই নিজেদের মধ্যে আলোচনার কোন অবসর পান তখন তাঁহাদের আলোচনায় একটি বিষয় অধিকাংশ সময় অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়ে। বিষয়টি এই—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে তাহা মানুষের কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া এই সকল আবিষ্কার বিকৃত করিয়া বিজ্ঞানের অপব্যবহার করা হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা নিরীহ ও নির্ব্বিরোধী আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ, অথচ বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ বিজ্ঞানেরই সাক্ষাৎ প্রয়োগ, যদিও সাক্ষাৎ অপব্যবহার বলাই অধিকতর সঙ্গত। যে জ্ঞান হইতে মানুষের জীবন অধিকতর নিরাপদ ও সুখী করা যাইত সেই জ্ঞান বিকৃত করিয়া মারণাস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন নিয়োজিত হইতেছে নূতন নূতন ভয়াবহ কামান, গোলা, বারুদ ও বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত করিবার জন্য। আকাশযান উদ্ভাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দ্রুতগতি ও অবাধ বিচরণের ক্ষমতা যুদ্ধকার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে বোধহয় একটি লোকও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারে না, রাত্রের মধ্যে আকাশযান হইতে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত গ্যাস্ যে সেই নিদ্রাকে মহানিদ্রায় পরিণত করিবে না কে তাহা বলিতে পারে? বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান ও যুদ্ধের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কোন যু তাহা হয় নাই।

অনেকে মনে করেন যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বিকৃতির ফলেই বর্ত্তমা আত্মসর্ব্বস্ব রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানকে ইহার সাক্ষাৎ কা



পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু : সানফ্রান্সিসকো ও ওক্ল্যাণ্ডের সংযোজক এই সেতুটি দৈর্ঘ্যে ৯ মাইলেরও অধিক। [২০৮ পৃঃ

বলা হয়ত সঙ্গত হইবে না, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে ইহার সহায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলের সাহায্য লইয়া একদল শক্তিশালী লোক বহুসংখ্যক লোক বা বহু জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেছে। ইতিহাসের পাতায় যে সকল সাম্রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের লোকসংখ্যা বর্ত্তমান একটি জাতির লোকসংখ্যার অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল, কাজেই, বর্ত্তমান রাষ্ট্রসমূহের

অনিবার্য্যতা সহজেই অনুমেয়। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভুত্ব জাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক মাত্র, সমগ্র জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রভুত্ববিস্তার সম্ভব নহে ; বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই দলের দম্ভকে সহায়তা করিয়েছে।

মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞান যুদ্ধের কারণ নহে ; যুদ্ধপ্রবৃত্তি মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা আদিম প্রবৃত্তি। অল্পকাল পূর্ব্বে একটি রাসায়নিকদের সম্মেলনে ডক্টর জিলবার্ট জে. ফাউলার যুদ্ধের তিনটি কারণ প্রদর্শন করেন। ডক্টর ফাউলারের মতে এই কারণ তিনটি লালসা—শক্তির লালসা, তথাকথিত আত্মপ্রতিষ্ঠা 'প্রেস্‌টিজে'র লালসা



পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী : অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত এই 'মাইক্রো-জামিয়া' গাছটির বয়স ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ বৎসরের মধ্যে।
[২০৯ পৃঃ

এবং রাজ্যবিস্তারের লালসা। ইহাদের মধ্যে শেষেরটি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উগ্র। মানুষের অস্তিত্ব যতকাল থাকিবে এই তিনটি লালসাও সম্ভবতঃ ততদিনই থাকিবে। এই আলোচনা হইতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। সম্ভবতঃ অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ, বিকৃত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক নিয়োগে বিশেষ পারদর্শী কয়েকটি বলদৃপ্ত রাষ্ট্রের পারস্পরিক অভিযানই ভবিষ্যৎ জগতের ইতিহাস। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তা পাইলে সেকেন্দর শাহ, জুলিয়স সিজার ও নাপলিয়ন কি "কীর্ত্তি"ই না স্থাপন করিতে পারিতেন ?

মানুষের মূলগত প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই যুদ্ধের যে কারণের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে সেগুলির বিলোপ সম্ভব নহে ; পুনশ্চ বৈজ্ঞানিকদের যে সকল আবিষ্কার বা উদ্ভাবনার অপব্যবহার হইতেছে সেগুলির প্রত্যাহারও কোনরূপে সম্ভব নয় ; কাজেই এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে এরূপ অবস্থায় উপায় কি ? এ সম্বন্ধে একটা কিছু যে করা প্রয়োজন সে বিষয়ে এখন অনেকেই সচেতন হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, কোন আবিষ্কার সম্পূর্ণরূপে সাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত নহে ; উহার ব্যবহার যাহাতে নিয়ন্ত্রিত করা চলে এইরূপ ভাবে উহা প্রকাশ করা উচিত। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের যুক্তি কতদূর কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব, কারণ কোন আবিষ্কারই এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা চলে না যে, তাহার কোনরূপ অপব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ মনে করেন, প্রত্যেক আবিষ্কারক বা উদ্ভাবকের নিজের আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কোন কিছু আবিষ্কার করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিবার পরে উহার নিয়োগ কোন দিকে হইল সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ না রাখিয়া অপর কোন নূতন কার্য্যে মাতিয়া উঠা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে অনুচিত, ইহাই তাঁহাদের মত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সাধারণ মানুষ হইতে কিছু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভবও নহে এবং স্বাভাবিকও নহে।

সুতরাং প্রশ্ন উঠিতেছে—এই সমস্যার সমাধান কি ? নৈরাশ্যজনক উত্তর হইলেও বলিতে হয় যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার কোন সমাধান নাই। সকল সমস্যার সমাধান থাকে না এবং এই সমস্যা সেই জাতীয় ; নৈরাশ্যজনক ও অপ্রিয় হইলেও ইহাই সত্য কথা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমরা যে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার মধ্যে জীবন কাটাইয়া যাইলাম, আমাদের উত্তরপুরুষগণের পক্ষেও কি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন পন্থা নাই ? ভবিষ্যতের অন্ধকারে কি নিহিত আছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, কিন্তু বোধ হয় ইহা ছাড়া কোন গতি নাই। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাহারা যুদ্ধের অবসান দেখিতে ইচ্ছা করে, অপর সকল প্রাণী নিরন্তর যুদ্ধ করিতেছে। মানুষের ধারণা মানুষ অন্য প্রাণী অপেক্ষা "উচ্চতর" জীব ; এক হিসাবে ইহা হয়ত সত্য, অপর হিসাবে ইহা তেমনিই মিথ্যা।

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির কোন পরিবর্ত্তন না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সকল দান নিষ্ফলই থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমান জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতিবিধান কল্পে বিজ্ঞান কিছুই করিতে পারে না।

পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু

সংপ্রতি আমেরিকায় পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু "সান ফ্রানসিসকো ওকল্যাণ্ড বে" সেতুর দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়া গিয়াছে। সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য ৯·১ মাইল। সান ফ্রান্‌সিস্‌কো আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর এবং যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নগর। এই সেতু নির্ম্মিত হওয়াতে সান্ ফ্রান্‌সিস্‌কো কাউণ্টি ও আলামেডা কাউণ্টি যুক্ত হইল।

গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের যে মাসে সেতুর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং গত ১২ই নভেম্বর সেতুটির দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। এত অল্প সময়ে এত



আথেন্সে খননকালে একটি হস্তিদন্তনির্ম্মিত মূর্ত্তির এই খণ্ডগুলি পাওয়া গিয়াছিল।

বড় সেতু নির্ম্মাণ করা কতখানি কঠিন কাজ, তাহা পাঠকগণ 'বালী ব্রীজ' নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে সময় লাগিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন। মার্কিন সরকারের 'পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট' সেতুটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহাতে খরচ পড়িয়াছে প্রায় ২৩ কোটী টাকা। মোটর গাড়ী, ভারবাহী লরী, শহরতলীর বৈদ্যুতিক ট্রেন এবং যাত্রীদের উপর শুল্ক বসাইয়া এই টাকা উশুল করা হইবে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র মোটর যান সেতুর উপর দিয়া চলিতে দেওয়া হইতেছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলিবে। সেতুটি দুই তলা, উপর তলা দ্রুতগতি মোটর যানের জন্য এবং নীচের তলা ভারবাহী লরী এবং বৈদ্যুতিক ট্রেনের জন্য।

সেতুটি তিনটি অংশে নির্ম্মিত। সান্ ফ্রান্সিস্কো ও ওকল্যাণ্ডের মধ্যে সমুদ্রের উপর য়েরবা বুয়েনা নামে একটি ছোট প্রস্তরময় দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটি একদিকে সান্ ফ্রান্সিস্কো ও অপরদিকে ওকল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম অংশ সান্ ফ্রান্সিস্কো হইতে য়েরবা বুয়েনা পর্য্যন্ত ১০,৪৫০ ফুট দীর্ঘ। মধ্যের অংশ, দ্বীপটিতে একটি ৫৭০ ফুট লম্বা 'টানেল' নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। সেতুর পূর্ব্ব অংশ ওকল্যাণ্ডের সহিত য়েরবা বুয়েনার যোগ সম্পাদন করিয়াছে। সম্পূর্ণ সেতুটি সমসূত্রে অবস্থিত নহে; পশ্চিম ও পূর্ব্ব অংশ তির্য্যকভাবে স্থাপিত।

পৃথিবীর প্রচীনতম প্রাণী

সংপ্রতি অষ্ট্রেলিয়ার কুইনল্যাণ্ড প্রদেশে পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেখানে ট্যাম্বোরিন পর্ব্বতে বহু প্রাচীন 'ম্যাক্রোজামিয়া' গাছ আছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক সেগুলি উচ্চে প্রায় তিন ফুট এবং বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় ৩,০০০ বৎসরের প্রাচীন। ইহাদের মধ্যে যে গাছটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ফুট লম্বা। বৈজ্ঞানিকদের হিসাব মতে এই গাছটির বয়স অন্ততঃ ১২,০০০ বৎসর। জনৈক আমেরিকান অধ্যাপক ম্যাক্রোজামিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পৃথিবী পর্য্যটনের সময় এই গাছটির সন্ধান পান।

আপোলোর নূতন মূর্ত্তি আবিষ্কার

প্রাচীন লেখকের লেখায় যে সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকে আজকাল অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। সংপ্রতি কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে দেখা যায় যে, তাঁহারা যে সকল জিনিসের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বাস্তবিকই সে সবের অস্তিত্ব ছিল। সংপ্রতি এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। দুই হাজার বৎসরেরও পুরাতন গ্রীক লেখক লুসিয়ান তাঁহার পুস্তকে আথেন্স নগরে অবস্থিত আপোলোদেবের একটি মূর্ত্তির বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। লুসিয়ানের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বাম হস্তে একটি ধনু এবং দক্ষিণ হস্ত মাথার উপরে রাখা অবস্থায় মূর্ত্তিটি একটি স্তম্ভের পাশে হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।



আপোলোর নূতন মূর্ত্তি: আপোলোর পুনর্গঠিত মূর্ত্তি।

জনৈক আমেরিকান অধ্যাপক সংপ্র ' আথেন্সে খননকার্য্যের সময় অনেকগুলি কূপ দেখিতে পান। একটি খুঁড়িবার সময় তলীর উপর হইতে

প্রায় ৫০ ফুট নীচে হাতীর দাঁতে তৈয়ারী ছোট একটি মূর্ত্তির কয়েকটি খণ্ড পাওয়া যায়। ইহার পরে কূপটি সম্পূর্ণ খুঁড়িয়া মাটির মধ্য হইতে দুই শতাধিক টুকরা পাওয়া গেল। ইহার পর সমস্যা হইল, এই টুকরাগুলিকে এক সঙ্গে জুড়িয়া সম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তিটির পুনর্গঠন করা। ইহা যে কিরূপ কঠিন কাজ ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে। বহু পরিশ্রমের পরে এবং কয়েকটি অংশ পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটির উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। মূর্ত্তিটি প্রায় ১ ফুট লম্বা। বিশেষজ্ঞদের মতে লুসিয়ান-বর্ণিত এই মূর্ত্তিটি সুবিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর প্রাখিটেলেসের গঠিত।



এরোপ্লেনের নূতন রেকর্ডের স্থাপয়িতা, বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত পোষাক-পরিহিত স্কোয়াড্রন-লীডার সোয়েন।

এরোপ্লেনের নূতন রেকর্ড

পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী"র পাঠকপাঠিকাগণকে জানান হইয়াছে যে, ইংরাজ বিমান-বাহিনীর জনৈক অফিসার এরোপ্লেনে উঁচুতে উঠিবার নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। স্কোয়াড্রন-লীডার এফ. আর. ডি. সোয়েন এরোপ্লেনে ৪৯,৯৬৭ ফুট উঁচুতে উঠিয়া এই রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

তিনি যে এরোপ্লেন ব্যবহার করেন তাহা উঁচুতে উঠিবার জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত একটি মনোপ্লেন। ডানার মোট দৈর্ঘ্য ৬৬ ফুট এবং এরোপ্লেনটির প্রোপেলার সাধারণতঃ যেরূপ দুই বা তিন-ব্লেডযুক্ত হয় সেরূপ না হইয়া চার-ব্লেডযুক্ত ছিল। ঐ আকারের এরোপ্লেনের পক্ষে সাধারণ প্রোপেলার যত বড় হয় ইহার প্রোপেলার তাহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। হাল্কা অথচ শক্তিশালী করিবার জন্য যত উপায় সম্ভব সমস্তই ইহাতে অবলম্বিত হইয়াছিল। এরোপ্লেনে চালক ছাড়া অন্য কাহারও বসিবার আসন ছিল না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে যত উপরে উঠা যায় শৈত্যও তত বৃদ্ধি পায় এই জন্য চালন-প্রকোষ্ঠটি সম্পূর্ণরূপে তাপরুদ্ধ করা হয়।

উপরে উঠিলে বাতাসের চাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়, সেরূপ অল্প চাপে প্রাণধারণ সম্ভব নহে। এই কারণে স্কোয়াড্রন-লীডার সোয়েনের এই অভিযানের জন্য বিশেষ পোষাক নির্ম্মিত হয়। পোষাকটির রবার-আবৃত এবং সমস্ত দেহ সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে। পোষাকটি সহিত একটি শিরস্ত্রাণ আছে। দেখিবার সুবিধার জন্য শিরস্ত্রাণে স্বচ্ছ 'প্ল্যাস্টিক' দ্বারা নির্ম্মিত দুইটি জানালা আছে। পোষাকের মধ্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য অক্‌সিজেন গ্যাস দিবার ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রশ্বাসের সহিত অক্‌সিজেন গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাসের সহিত কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড ত্যাগ করি। এই কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড শোষণ করিবার ব্যবস্থাও করা হয়। শীত নিবারণের জন্য পোষাকটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ সাহায্যে গরম করা হয়।

এত প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্কোয়াড্রন-লীডার সোয়েনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। এই প্রকার কৃত্রিম অবস্থায় থাকিয়া তিনি অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা বোধ করেন। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ৫০,০০০ ফুটের নিকটবর্ত্তী স্তরে ভ্রমণ করেন। তাঁহার শিরস্ত্রাণের জানালায় আলো পড়িয়া তাহা এরূপ চক্‌চক্ করিতে থাকে যে তিনি একেবারে কিছুই দেখিতে পান নাই। কম্পাস, উচ্চতানিরূপণ-যন্ত্র প্রভৃতি কোন যন্ত্রের কাঁটা তিনি দেখিতে পান নাই। এরূপ অবস্থায় এবং হিমালয়ের দুই গুণ উঁচুতে এরোপ্লেন চালান যে কিরূপ কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি এই সকল কারণে ঠিক একদিকে না যাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। নামিবার সময় তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার মত হয় এবং তিনি মনে করেন যে তাঁহার অক্‌সিজেন ফুরাইয়া আসিতেছে। তখন তিনি চালনকক্ষের ঢাকা খুলিবার চেষ্টা করেন কিন্তু ঢাকা খুলিবার কলটি খারাপ হওয়ায় খুলিতে পারেন নাই। শেষে একটি ছুরি পাইয়া তিনি শিরস্ত্রাণের স্বচ্ছ আবরণ কাটিয়া ফেলেন এবং বাতাস পাইয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করেন। এই ঘটনাটি ঘটে জমি হইতে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে।

আইনষ্টাইন্-উদ্ভাবিত ক্যামেরা

অধ্যাপক আলবার্ট আইনষ্টাইন বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত। তিনি জার্ম্মানী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমেরিকায় বাস করিতেছেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন একজন বড় গণিতবিদ্ কিন্তু তিনি যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহা জানা ছিল না। সংপ্রতি আমেরিকা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে অধ্যাপক আইনষ্টাইন নিউ ইয়র্কের তাঁহার জনৈক বন্ধুর সহযোগিতায় এক প্রকার নূতন ধরণের ক্যামেরা

উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ ক্যামেরার আলোকের তারতম্য হিসাবে 'ষ্টপ' ও 'এক্স্‌পোজার' অর্থাৎ প্লেটে আলোক দিবার সময় পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়। এই ক্যামেরাটিতে কিছুই করিতে হইবে না,—আলোকের



অধ্যাপক আইনষ্টাইন-উদ্ভাবিত ক্যামেরা : (ক) অতিরিক্ত লেন্স, এই লেন্সের ভিতর দিয়া যাইয়া ফটো-ইলেকট্রিক সেলের উপর আলোক পড়ে। (খ) 'ষ্টপ'। (গ) প্রধান লেন্স। (ঘ) ফটো-ইলেকট্রিক সেল। (ঙ) আলোকনিয়ন্ত্রক পর্দ্দা।

তারতম্য হিসাবে ক্যামেরা আপনা হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইবে। এই জন্য ইহাতে একটি 'ফটো-ইলেকট্রিক সেল' আছে, এই সেলের উপরে আলোক পড়িলেই আলোকের তারতম্য হিসাবে একটি পর্দ্দা লেন্সের উপর আসিয়া পড়িবে। পর্দ্দাটির স্বচ্ছতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন এবং ইহার এমন অংশ লেন্সের উপর পড়ে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক্যামেরার মধ্যে সমান পরিমাণ আলোক আসে। এই প্রকার ক্যামেরার বহুল প্রচলন হইলে ফটো তোলার মধ্যে নূতনত্ব কিছু থাকিবে না, ব্যাপারটি অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িবে বলিয়া বোধ হয়।

নূতন ধরণের টেলিফোন যন্ত্র

সাধারণতঃ যে টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহার জন্য বিশেষ করিয়া তার খাটান প্রয়োজন। সংপ্রতি এক প্রকার নূতন টেলিফোন যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাতে বিজলীবাতীর প্লাগের সহিত যোগ করিলেই কথোপকথন করা চলিতে পারে। ইহাকে বলা হয় 'ক্যারিয়ার কল' (Carrier Call)। যদিও তার সাহায্যে ইহাতে কথাবার্ত্তা শোনা যায় তবুও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার ব্যবহার বেতারের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করে, সেইজন্য ইংরাজিতে ইহাকে 'wired wireless' বলা হয়। অবশ্য ইহাতে বহুদূর পর্য্যন্ত কথোপকথনের কোন সুবিধা হয় নাই, একই বিজলীবাতীর তারের সহিত সংযোগ আবশ্যক অর্থাৎ একটি বাড়ী বা কারখানার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। একই যন্ত্রে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়, সাধারণ টেলিফোনের মত কানে লাগাইয়া শুনিবার কোন প্রয়োজন নাই, বেতারের 'লাউড-স্পীকারে' যেরূপ শব্দ পাওয়া যায় ইহাতেও তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত দুইটি যন্ত্রের সুর এক না হইলে ইহা ব্যবহার করা যায় না।

মোটর গাড়ী চালাইবার নূতন ইন্ধন

ইতালীতে পেট্রল পাওয়া যায় না, ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। সেইজন্য ইতালীতে কয়লা হইতে রাসায়নিক উপায়ে পেট্রল তৈয়ারী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সংপ্রতি পেট্রলের অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিটাইবার জন্য মোটর গাড়ীতে গ্যাস জ্বালান হইতেছে। মিথেন গ্যাসকে সাধারণ বায়ুচাপ অপেক্ষা ২০০ গুণ চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করিয়া সিলিণ্ডারে ভরিয়া ইতালীতে মোটর চালাইবার জন্য বিক্রয় করা হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গ্যাস ব্যবহার করিয়া দৈনিক প্রায় ৭০০ গ্যালন



“ক্যারিয়ার কল” টেলিফোন যন্ত্র।

করিয়া পেট্রল ইতালীতে বাঁচান যাইতেছে। যদিও ইতালীর মোট পেট্রলের চাহিদার পক্ষে দৈনিক ৭০০ গ্যালন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তবুও পেট্রলের আমদানী যতটুকু কমে ইতালী তাহাই লাভ মনে করিতেছে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

...যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া যথাযথ শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত কি করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা ভারতবাসী শিখিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, অথবা জগতের কোথায়ও প্রজাগণের মধ্যে প্রকৃত সন্তুষ্টি পুনরায় দেখা যাইবে না।

সুদূরের স্বপ্ন

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

লম্বা ছুটীটা যখন বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া একান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় একদিন বন্ধু অমল আসিয়া জানাইল, চলুন, একটু অনুসন্ধিৎসু অভিযানে ঘুরে আসা যাক্।

অমল একজন সাহিত্যিক। যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে। ঐতিহাসিক গবেষণা করা তাহার একটা নেশার মত। এবার কোথায় সে যাইতে চায়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। যেখানে হয় বাহিরে একটু ঘুরিয়া আসিতে পারাটাই তখন আমার কাছে একটা চরম লোভের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চারজন বন্ধুতে বাহির হইয়াছিলাম। বরাবর অমলের নিজের মোটরেই যাওয়া হইতেছিল। মনে কোন চিন্তা বা উদ্বেগ নাই। বরং একটা রীতিমত সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে চলিয়াছিলাম। অমল প্রত্নতাত্ত্বিক, মণীশ ও বিপিন যথাক্রমে কবিতা ও গল্প লেখে। আমার কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং এই রকম সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে পড়িলে আমাকে সমালোচক সাজিতে হয়। ক্ষতি তাহাতে কিছু দেখি না। কত হাতুড়ে ডাক্তার অপরের দেহের উপর বে-পরোয়া ছুরি চালাইতেছে, আমি না হয় পরের লেখার উপরই একটু চালাইলাম।

বিপিন চুপচাপ থাকিবার মানুষ নয়। এক সময় চট করিয়া আমাকে খোঁচা মারিয়া বলিল, অদ্ভুত এই খেয়াল তোমাদের—মানে প্রত্নতাত্ত্বিকদের! কবে কোথায় কি ছিল না ছিল, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সারা অতীতের অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সারা জীবনটা ম'লে!

অমল বলিল, সেই অন্ধকারের ভেতর থেকেই কত যে আলোর খনি আমরা টেনে বা'র করছি, সেটা তোমরা হয় বুঝবে না, নয় তো বুঝলেও ন্যাকা সেজে থাকবে।

বিপিন বলিল, আমি বলব, তোমরা যেটাকে আলো ব'লে বাহাদুরী করছ, আসলে সেটা আলোই নয়, অন্ধকারেরই একটা মরীচিকারূপ। অতীতের যে বিরাট গহ্বরে যুগ যুগের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, সেখানে তোমরা ছোট একটা বাতির আলো নিয়ে তার অন্তরের সত্যগুলোকে দেখবার চেষ্টা করছ। আমি তো বলি, তাতে সত্যিকার আলো হওয়া দূরে থাক, অন্ধকারটাই আরো ভয়ঙ্কর হয়ে আমাদের গলা চেপে ধরে।

অমল বলিল, আমরা—এদেশের লোকেরা আজও অতীতকে চিন্‌তে শিখলুম না। তাইতো এত অধঃপতন।

বিপিন বলিল, অধঃপতন যে অতীতকে না চেনার জন্যে, তা হয় ত হাও হতে পারে। অতীতকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে নিষ্প্রাণ হ'য়ে পড়ে থাকার মত বোকামী আমি তো এ সংসারে আর কিছুই দেখতে পাই নে।

অমল শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, তা হবে। সব চেয়ে খেদের বিষয় এই যে, বোকা জগৎটা তোমার মত বুদ্ধিমানের তারিফ করতে শিখলে না।

অমল চটিতেছে দেখিয়া বিপিন বেশ খুসী হইয়া একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল, দেখো হে, সামনে মস্ত বড় উৎরাই। রাগের সব ঝোঁকটা যেন ষ্টিয়াংরি হুইলের উপর দিও না। তা হলে হয় ত' এক মিনিটের মধ্যেই সকলকে অন্ধকার অতীতের খাতায় নাম লেখাতে হবে।

অমল হাসিয়া বলিল, তা মন্দ কি!

সরু একটি বালুকাময় পাহাড়ে নদীর ধারে ছোট ডাকবাংলো। সেখানে যখন পৌছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইতে অল্প একটু বিলম্ব আছে। দূরের একটা ঘন শালবনের মাথার উপর দিয়া যেন সূর্য্যাস্তের সোণালী কিরণের বন্যা নামিয়াছে। কাছে কোথা হইতে মাদলের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অবোধ্য সাঁওতালী সুরের গান কাণে আসিতেছে। মনীশ বলিল, চমৎকার!

বিমল বলিল, কাছেই কোথাও সাঁওতাল পল্লী আছে।

এই ডাকবাংলোতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া এখান হইতেই আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালাইব, এইরূপ স্থির হইয়াছিল, সুতরাং রাত্রিটা এইখানেই বিশ্রাম। আমাদের গন্তব্য এবং দ্রষ্টব্য স্থানটি এখান হইতে আন্দাজ নয় মাইল দূরে। কাল ভোরের সময় বাহির হইলেই চলিবে।

সেরগড় পরগণায় বিস্তীর্ণ উষর ক্ষেত্রের উপর চমৎকার এই বাংলোখানি। সামনে একটা বকুল এবং একটা পলাশ গাছ। এক পাশে কি একটা বনলতা টালির ছাউনির উপর উঠিয়াছে। অনেকটা দূরে একটা কয়লার খনির আগুন দেখা যাইতেছে।

একখানা ক্যাম্পখাটকে টানিয়া বাহির করিয়া আমরা বারান্দার উপর বসিলাম। ডাকবাংলোর চাকর নাথু নিকটের গ্রাম হইতে আমাদের রসদের ব্যবস্থায় গিয়াছিল।

দূরে কোথায় একটা বাঁশী বাজিতেছে। সাঁওতালী বাঁশী। মণীশ তো একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। আমরা যদি একটু হাই তোলার শব্দ করি তো সে একেবারে আঁৎকাইয়া উঠে। বলে, হায় রে হায়! 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্'—

সুতরাং আমরাও বসিয়া থাকি এক রকম রুদ্ধনিশ্বাসেই, তা' ছাড়া, সন্ধ্যার এই নির্জ্জনতার মাঝখানে বাঁশীটি আমাদিগকেও কম মুগ্ধ করে নাই।

বাঁশীর সুর হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এবং একটু পরেই একটা উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে আমরা এদিক-ওদিক তাকাইতেই নদীর ওপারে দুইটি মানুষের কাল ছায়া চোখে পড়িল। দুজনে যেন বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই হাসির উচ্ছ্বাস। মনে হইল কাল ছায়া দুটি হাসিতে হাসিতে ছুটাছুটি সুরু করিয়াছে। পশ্চিমের আকাশ হইতে তখন আলোর শেষ দীপ্তিটুকু মুছিয়া যায় নাই। ঘোলাটে আকাশের জমীর উপর সেই কাল ছবি-দুটি ভারী চমৎকার লাগিতেছিল।

বিপিন বলিল,—নিশ্চয় একটি পুরুষ আর একটি মেয়ে।

অমল বলিল,—আসলে সেটা সত্যি না হলেও তোমার কল্পনাতে তাই মনে হচ্ছে। গল্পের খোরাক জোটাবে বুঝি?

বিপিন বলিল,—তা' সে যাই করি, জোর করে বল্‌তে পারি যে, ওরা পুরুষ আর মেয়ে।

অমল বলিল,—বাজী?

বাজী অবশ্য রাখা হইল না, কেন না, সকলেই আমরা সেই মূর্ত্তিদু'টির হাসি ও খেলা দেখিতে দেখিতেই বুঝি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম।

তাহারা দু'জনে এবার নদীর গর্ভে নামিয়াছে। বালির উপর হেঁট হইয়া এ-ওর গায়ে কি যেন ছিটাইতেছে। হয়ত জল, হয়ত বা বালিই।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে দু'চারিটা দুর্ব্বোধ্য কথার টুক্‌রা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—নিশ্চয় সাঁওতাল। সাঁওতালী ভাষায় কথা বল্‌ছে, শুন্‌তে পাচ্ছো?

মণীশ বলিল—ঠিক সাঁওতাল বলেও মনে হচ্ছে না। বোধ হয় ভাঙ্গা বাংলা—

অমল বলিল,—আশ্চর্য্য কি! এখন তো আমরা বাংলার গণ্ডী পার হইনি।

সেই বালুকাময় নদীর গর্ভে খানিকটা ঠেলাঠেলি আর হাসাহাসি করিবার পর দু'জনেই তাহারা ছুটিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল, সন্ধ্যার সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটি পথহারা পাখী এতক্ষণে তীরবেগে কুলায়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। খানিকটা উচ্চভূমির আড়ালে পড়িতেই আর তাহাদের দেখা গেল না। শুধু তাহাদের মিলিত হাসির চাপা শব্দটি তখনো কানে আসিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নাথু ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সঙ্গে আসিল একটী ছেলে। বয়স তার সতের আঠারর বেশী হইবে না। গায়ের রঙ রোদে পুড়িয়া পুড়িয়া তামাটে হইয়া গেলেও বুঝিতে বাকী থাকে না যে, একদিন এই ছেলেটিকে নিঃসঙ্কোচে সুশ্রী বলা চলিত। পরিষ্কার দোহারা গড়ন, মাথায় সাঁওতালী ধাঁজে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, তাহার উপর দিয়া একখানা ডোরা গামছা বাঁধা। ভাসা ভাসা চোখ দুটিতে একটা যেন স্বপ্নাচ্ছন্নতা—কতকটা উদাস—কতকটা বোকাটে চাহনি।

নাথুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটী কে নাথু? তোমার ছেলে না কি?

নাথু জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে, ও যে আমাদের রাজপুত্তুর!

'রাজপুত্তুর'? আমরা সকলেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম। ছেলেটি আমাদের সকলের মুখের পানে চাহিয়া অর্থহীন বোকাটে হাসি হাসিতে লাগিল

নাথু বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যিই এ-তল্লাটের লোকেরা ওকে 'রাজপুত্তুর' বলেই ডাকে।

ভোরে বাঁশীর সুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, তখন বেশ অন্ধকার।

ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই 'রাজপুত্তুর'টি এক-পাশে একটি লোহার পোষ্টে ঠেস্ দিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। আমাকে দেখিয়াও তার বাঁশী থামিল না। গভীর ভৈরবী সুরে বাঁশী তার বাজিয়াই চলিল।

কাল রাতেই এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিবার প্রবল ইচ্ছা হইলেও তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বাঁশী থামিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি?

—নাম? আমার নাম হচ্ছে গণেশ।

গণেশ? জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি বাঙ্গালী?

সে একটু মেয়েলি ধরণের সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল,—বাঙ্গালী বৈকি! আমার বাবার নাম হচ্ছে 'রামচরণ'।

কোথায় থাকো তোমরা?

আঙুল দিয়া দূরে দেখাইয়া দিয়া গণেশ জানাইল, সে নিজে অবশ্য ওই গ্রামেই থাকে, কিন্তু তার বাপ যে কোথায় থাকে, তা সে নিজেও জানে না।

একটু পরেই মণীশ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিয়া গণেশকে দেখিয়া বলিল, আরে, সকালে উঠেই 'রাজপুত্তুরের' দর্শন যে! দিনটা আজ ভালো যাবে বোঝা যাচ্ছে।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। অমল বলিল, ওহে, ঐ ছোঁড়াটাকেও সঙ্গে নিলে তো মন্দ হয় না। সঙ্গে একটা বাড়্‌তি লোক থাক্‌লে অনেক কাজ হবে।

আমি বলিলাম,—খুব ভালো ত হয়ই। তবে রাজী হবে কি?

অমল বলিল,—রাজী হবে না মানে? দিব্যি মোটরে চেপে যাবে; মোটরে বোধ হয় ওর চৌদ্দপুরুষে কখনো চাপেনি। তারপর যে-রকম ছিনে-জোঁকের মত এসে বসেছে, যাবার সময় কিছু বখ্‌সিস না দিয়ে তো নিস্তারই থাক্‌বে না। চল, ওকে নেওয়া যাক্।

আমি গণেশকে বলিলাম। সে কোন জবাব দিল না। তবু খানিকটা অর্থহীন হাসি হাসিয়া এমনভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে, বিশেষ কোন আপত্তি আছে বলিয়াও মনে হইল না। কেন জানি না, মনটা ভারী খুসী হইয়া উঠিল। আমাদের এই যাত্রাকে সার্থক করিবার জন্য আমরা এই চারজন সঙ্গী ছাড়া এই ছেলেটিরও যেন কেমন একটা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রাইভারের পাশে গণেশকে বসিতে বলিলাম। মণীশ বলিল—হ্যাঁ রে, বাঁশীটা সঙ্গে নিয়েছিস্ তো?

গণেশ তার কোমরের কাপড় হইতে বাঁশীটা বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া আবার তাহা কোমরে গুঁজিয়া রাখিল।

সাঁওতাল পল্লীটাকে বাঁ দিকে রাখিয়া আমাদের মোটর ছুটিয়াছিল। রাস্তাটা স্থানে স্থানে খুব উঁচু-নীচু। এক জায়গায় একটা চড়াই হইতে নামিতে গিয়াই দেখা গেল, সামনে হাত কয়েক দূরে একটা সাঁওতালী মেয়ে মাথায় একটা ঝুড়ি লইয়া রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিয়াছে। ড্রাইভার তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য জোরে কয়েকবার হর্ণ্ দিতেই সে একবার পিছন ফিরিয়াই তাড়াতাড়ি রাস্তার এক পাশে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মোটর তাহাকে পিছনে ফেলিয়া তীরবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া চলিল। লক্ষ্য করিলাম, গণেশ হঠাৎ অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, পথের মাঝে কি যেন তার পড়িয়া গিয়াছে, তাই এত ছট্‌ফটানি। আমি কাহাকেও কিছু বলিবার আগেই সে এমন একটা অদ্ভুত চীৎকার করিয়া উঠিল যে, ড্রাইভার তাড়াতাড়ি ব্রেক্ কষিয়া গাড়ী থামাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—ক্যা হুয়া রে?

গণেশ কোন জবাব দিল না। তাহার পরিবর্ত্তে সে

এক লাফে গাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া বলিল,—বাবু! আমার যাওয়া হবে নি।

সকলেই রীতিমত অবাক্। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, যে-পথ দিয়া আসিয়াছি, গণেশ সেইদিকেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া যাইতেছে।

মণীশ বলিল, এর মূলে হ'লো সেই ঝুড়ি-মাথায় মেয়েটা। তাকে দেখেই হতভাগা আর বসে থাকতে পারলে না।

দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গেল। সত্যই অনেক কিছু দেখিবার ও জানিবার আছে এই স্থানটাতে। একদিন যে হিন্দু রাজাদের এখানে বাস ছিল, তাঁহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গেল যথেষ্ট। ঐ প্রকাণ্ড স্তূপের খানিকটা অংশ ইতিপূর্ব্বে আর কোন অনুসন্ধিৎসু দল আসিয়া খনন করিয়া গিয়াছে। মনে হয়, খনন করিয়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই, শুধু একটা খিলানের খানিকটা অংশ যেন বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অমল বলিল, এই খিলানের ইঁট বহুকালের পুরাতন।

অমল ঠিক করিল, কয়েকজন কুলী সংগ্রহ করিয়া জায়গাটা আরও খানিকটা খনন করাইবে। নিশ্চয় ইহার ভিতর হইতে অতীতের বহু গৌরবময় রহস্যের উদ্ধার সাধন করা যাইবে। কিন্তু সেদিন অনেক চেষ্টা করিয়াও লোক পাওয়া গেল না। একজন যদি বা মিলিল, সে দু'চার জনকে ডাকিতে গিয়া সেই যে নিরুদ্দেশ হইল, আর তার দেখা মিলিল না।

অগত্যা সেদিন আমরা হতাশ হইয়া ফিরিলাম। মোটরে উঠিতে গিয়া দেখি, ড্রাইভার কোথায় গিয়াছে, মোটরের ভিতর পিছনকার গদীতে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে হেলান্ দিয়া বসিয়া আছে একটি অপরিচিত লোক। বয়স তার ঠিক আন্দাজ করা শক্ত, চল্লিশ হইতে ষাট—যে কোন বয়স হইতে পারে। শীর্ণ চেহারা, ঘোর তামাটে রঙ, চোখ দুইটা কোটরের ভিতর বসিয়া গিয়াছে। চোয়ালের হাড়গুলি চোখের নীচে অতি বিশ্রীভাবে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ দাড়ি, চুলগুলি এলোমেলো এবং রুক্ষ। লম্বা সরু নাকটার উপর বহুদিন স্নান না করার ফলে রীতিমত ময়লা জমিয়াছে।

বিপিন বলিল,—ইনি আবার কে?

লোকটা একটুও নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। শুধু একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল,—আসুন। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

অমল বলিল,—পরিচয়টা তো আপনারই আগে দিতে হয়। কেন না, আমরা যে কি করতে এসেছি তা বোঝবার বিশেষ কষ্ট নেই ত।

লোকটি এবার একটু উঠিয়া বসিয়া বলিল, তা কি আর আমি বুঝিনি মনে [illegible] এই রাজবাড়ী দেখতে এসেছে [illegible] সব? রাজবাড়ী, গড়, তোষাখানা, সব দেখলেন?

এ সব কথার জবাব না দিয়া অমল বলিল, আপনি কে সার, সেটা জানতে পারি কি?

লোকটা বলিল, ও! আপনারা গাড়ীতে উঠবেন না বুঝি? তা বলতে হয়। এই আমিও নামলুম তবে··· হ্যাঁ, কি বলছেন? পরিচয়? আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছেন। হুঁঃ! আমার আবার পরিচয়! সেটা এমনই কি একবারে মহাভারত ব্যাপার যে,—

লোকটার কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী বেশ মজার মনে হইতেছিল। তাহার ও-কথার পর কি যে বলিব, হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না।

লোকটি একবার কপালে হাত দিয়া সূর্য্যের পানে তাকাইয়া লইয়া বলিল, বেলা ত দুপুর হলো! খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত? অভুক্ত অবস্থায় চলে যাবেন তাও ত ঠিক হয় না! কি করবো বলুন সার, আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

আমি বলিলাম, কেন?

লোকটি বলিল, 'কেন' কি বলছেন! একদিন তো সত্যি করেই ছিল, যেদিন এখানে লক্ষ লক্ষ অতিথি অভ্যাগত কেউ বিফল হয়ে ফিরে যেতো না···হ্যাঁ ভাল কথা, আপনারা ঐ স্তূপের ওখানে উঁকি ঝুঁকি মারতে যান কেন বলুন ত? এখানকার প্রত্যেকটি কাহিনী—প্রত্যেকটি

বিবরণ আমার যে ঠোঁটস্থ হয়ে আছে। এখানকার কোন্ জায়গায় কি ছিল, তার প্রকাণ্ড একখানা ম্যাপ আমার কাছে রয়েছে যে! আপনারা দেখতে চান অক্লেশে দেখাতে পারি। কিন্তু সার, দিতে পারবো না, তা বলে রাখছি, মরে গেলেও দিতে পারবো না। সেবার একটা সায়েব এসে আমাকে ১০০০৲ টাকা ঘুষ দিয়ে ওটা নিতে চেয়েছিল, তাও আমি দিই নি।

আমি বলিলাম, দেন নি কেন?

লোকটা একটা হতাশার ভঙ্গী করিয়া বলিল, কেন দিই নি! হায় রে হায়! কি যে মেহনৎ হয়েছে, তার খবর রাখেন কিছু? যাকে বলে পুরো দুটি বছর আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পরিশ্রম, বুঝলেন?

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল, চল হে চল ফেরা যাক। ড্রাইভার এসে গেছে।

অমল কিন্তু ভারী জমিয়া গিয়াছিল। অপরিচিত লোকটিকে বলিল, তা, আপনি সেটা বাড়ী থেকে নিয়ে আসেন নি তো! নইলে—

লোকটা হাসিয়া বলিল, আপনি বুঝি আমাকে এতবড় নিরেট ভাবেন যে, ঐ অমূল্য জিনিষটিকে আমি বাড়ীতে ফেলে রাখবো? আমার সব এইখানে, বুঝলেন? বলিয়া আমার বুকপকেটের উপর কয়েকবার চাপড়াইয়া বুঝাইয়া দিল যে, অমূল্য পদার্থটি তাহার বুকপকেটেই থাকে এবং এখনও সেখানেই আছে।

অমল উৎসাহিত হইয়া বলিল, তা হলে ত'…আচ্ছা, আপনি আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না? বাড়ীতে না হয় একটা খবর দিন না।

লোকটি হাসিয়া বলিল, আমার বাড়ীর জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। চলুন, যাই।

বাংলোয় ফিরিয়া দেখিলাম,নাথু পর্য্যাপ্ত আহার্য্য প্রস্তত করিয়াছে। আমাদের অতিথিটিকে বলিলাম, আপনারও তো খাওয়া হয়নি, স্নান করে কিছু খেয়ে নিন।

লোকটি হাসিয়া বলিল, স্নান করবার দরকার নেই কিছু। আমার মশাই ভয়ঙ্কর কফের ধাত। স্নান করেছি তো প্লুরিসির ব্যথাটা বাধা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে খাওয়ার কথা যখন বলছেন, তা আপনাদের কথা ত ঠেলতে পারিনে!

অমল বলিল, তবে আর আপনি দেরী করবেন কেন? আমরা চান্ করে আসি, আপনি ততক্ষণ খেয়ে নিন।

লোকটি মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, এঁ্যা, সেকি! আমি আগেই খেয়ে নেব! সেটা কি ভাল দেখাবে? তবে, যখন বলছেন ,এত করে—

সে খাইতে বসিল, আমরা স্নান করিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিলে নাথু চুপি চুপি জানাইল, ভাত আর মোটে দু'জনের আছে।

বিপিন ত' রাগিয়া আগুন! সে অমলকে গালি দিতে লাগিল, কোথাকার একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনোয়ারকে ধরিয়া আনিয়া বাড়া ভাতে ছাই দিয়া বসিয়াছে। অমল হাসিয়া বলিল, আরে নাও, নাও, বাঁদরামি করো না, একদিন আধপেটা খেলে কেউ মরে যাবে না।

আহারাদির পর বিপিন ও মণীশ বলিল, ওহে তোমরা থাক ঐ ভূতটাকে নিয়ে। আমরা মোটর নিয়ে চললুম একবার ঐ কলিয়ারীর দিকে।

অমল এবং সেই লোকটিকে ঘরের ভিতর রাখিয়া আমি বাহিরে একখানি ইজি চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া খুব খানিকটা নিদ্রা দিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া নদীর ধারে অগ্রসর হইলাম।

মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যার সময় সেই বাঁশীর সুরটি, সে যেন সত্যই এই বেলা-শেষের বিদায়-বাঁশী। সে বাঁশীও যে গণেশ বাজাইতেছিল, তাহা বুঝিতে আর বাকী ছিল না।…আচ্ছা, সারা দিনের ভিতর গণেশের আর দেখা নাই কেন? সেই যে মোটর হইতে নামিয়া পলাইয়া আসিল, তার পর কোথায় সে গেল। হয় ত লজ্জায় সে আমাদের কাছে আসিতে পারিতেছে না। মণীশ বলে, সে সেই সাঁওতালী মেয়েটার সন্ধানে ছুটিয়াছিল। কে জানে! কাল সন্ধ্যার নদীর বালির উপর যে দুটি প্রাণীর হাস্য-লীলা দেখিয়াছিলাম, সেও কি ঐ গণেশ আর সেই সাঁওতালী মেয়েটা?…

চুপ করিয়া একটা পাথরের উপর বসিলাম। পাথরের নীচ দিয়া ঝির ঝির করিয়া একটি শীর্ণ জলস্রোত বহিতেছিল। চমৎকার লাগিল সেই শীর্ণ জলধারার মৃদু সঙ্গীত! মনে হইল আমার নিজেরই অন্তরের অপরিস্ফুট ভাবরাশির ফল্গুপ্রবাহের গোপন কলধ্বনি যেন আজ এখানে বসিয়া সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। এখানে এই আসন্ন সন্ধ্যার মৌন সৌন্দর্য্যের মাঝখানে—সেই কিশোর-কিশোরীর উদ্দাম নর্ম্মলীলার স্মৃতিটুকু বুকের মাঝে লইয়া আমারও মনে যে সঙ্গীতের শিহরণ জাগিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কোথায়?

দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া মুখ তুলিলাম। দেখিলাম, নদীর ওপারে গণেশ আর সেই মেয়েটা। দুজনের মাথাতেই একরাশ লাল ফুল গোঁজা। দুজনেই ছুটিতেছে, যেন একজন অপরকে ধরিতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না।

মনে হইল, চুপি চুপি সরিয়া পড়ি এখান হইতে—ইহাদের খেলার বাধা দিব না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমাকে দেখিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম, কিরে গণেশ যে! সমস্তদিন আর দেখিনি যে বড়?

গণেশ কোন জবাব দিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটিও তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটি কে?

গণেশ বলিল, আজ্ঞে ও সুন্দরী।

আরও কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পিছন হইতে শোনা গেল, কার সঙ্গে কথা কইছেন সার? আমাদের গণ্‌শা নয়?

ফিরিয়া দেখি, সেই লোকটা আমার খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখে তাহার একটা হিংস্র দৃষ্টি, সে দৃষ্টি দিয়া সে যেন গণেশ আর সেই মেয়েটিকে দগ্ধ করিতে চায়।

বজ্রস্বরে সে বলিল, ও কে রে গণ্‌শা?

গণেশ বলিল, ওই গাঁয়ের মেয়ে।

সাঁওতালদের মেয়ে? শোন হতভাগা, কাছে আয় বলছি!

তাহার বজ্রগর্জ্জনে আমারই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, গণেশ এবং তাহার সঙ্গিনীর তো কথাই নাই। গণেশ একবার করুণভাবে মেয়েটার পানে তাকাইয়া লোকটার দিকে পা বাড়াইতেছিল, মেয়েটা হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় বলিল, চলে আয়—

তার ব্যাকুল কণ্ঠের ঐ কথা দুটি স্পষ্ট আমার কানে আসিয়া বাজিল। লোকটাও বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল, সে ক্রুদ্ধ আস্ফালনে গণেশের দিকে যেমন আগাইতে যাইবে অমনি গণেশ আর সুন্দরী উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ঘনায়মান অন্ধকারের বুকে মিলাইয়া গেল।

অমলও ততক্ষণে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, ওদের ধরতে পারা কি সোজা কথা! কালও ওদের দেখেছি এই রকম সময়ে—ছেলেটা চমৎকার বাঁশী বাজায়। এতক্ষণ বোধ হয় ওরা কোন্ গাছতলাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বাঁশী বাজাতে সুরু করেছে।

লোকটা এতক্ষণ গুম্ হইয়া ছিল। হঠাৎ ফোঁস্ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু, কে জানেন ও? আমার ছেলে। ভাবুন তো, কতখানি জাহান্নমে গেছে হতভাগা? রাজবংশের ছেলে হয়ে কি না একটা ছোটলোকের মেয়েকে নিয়ে—

আমরা অবাক্ হইয়া তার মুখের পানে চাহিলাম। সে বলিল, আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, না? কিন্তু যা' বললুম, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। ছা-ঘরের একটা মেয়েকে ঘরে এনেছিলুম, তারই ফল হাতে-হাতে ফলল আর কি!

বিপিন, মণীশ এবং তাহাদের সঙ্গে অপর একটি ভদ্রলোক আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নূতন ভদ্রলোকটির সহিত বিপিন আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি তাহার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু সুধীন বসু, কলিয়ারীতে মোটা-মাহিনার কর্ম্মচারী। হঠাৎ আজ এখানে দেখা হইয়া গেল, সুতরাং ধরিয়া আনিয়াছে।

সুধীন বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ ওদিকে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন,—আরে, রাজা রামচরণ যে এখানে! কি সংবাদ?

গণেশের বাবা আমার মুখের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, শুনছেন তো? পরিহাস হচ্ছে আর কি! সুবাদ কি? না, একদিন ওঁদের কলিয়ারীতে কাজ করতুম।

তারপর মুখখানাকে গুম্ করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে বলিতে বাংলোর দিকে আগাইয়া চলিল।

অমল বলিল, আপনি চললেন যে?

সে বলিল, ঠাট্টা-মস্করা নিয়ে নষ্ট করবার মত সময় আমার একদম নেই।

বিপিন অমলকে বলিল, ভাবনা নেই হে, ভাবনা নেই। উনি ততক্ষণ বাংলোয় নাথুর কাছে বসে' আহারের নমুনা নেবেন। ও-বেলা তবু আধপেটা জুটেছিল, এ-বেলা হয় তো—

অমল বলিল, তুমিও কিছু কম পেটুক নও। এখন একটু থাম। রাজা রামচরণের ইতিহাসটা একটু শোনা যাক্ সুধীন বাবুর কাছে।

সুধীন বাবু বলিলেন, ও এখানে জুটল কি ক'রে?

বিপিন সংক্ষেপে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাতের বিবরণ দিয়া বলিল, চোর-টোর নয় তো?

সুধীন বাবু বলিলেন, না। তা ও একেবারেই নয়। তবে হয় ত' খুনে ওকে বলতে পার। লোকে বলে, ওর স্ত্রীকে ও খুন করেছিল।

—কি রকম?

—ওর নাম হচ্ছে রামচরণ। ঐ যেখানে রাজার গড় রয়েছে না, তারই উত্তর দিকের ঐ গ্রামখানাতে ছিল ওর বাস। অত্যন্ত গরীব। ওর স্ত্রী বেচারা কায়ক্লেশে সংসার চালাত। ও করত ঐ কলিয়ারীতে খুব কম মাইনের একটা কাজ—যাকে বলে, কুলির সর্দ্দার আর কি! ও-সব কাজের যা' দস্তুর—মদও ধরেছিল একটু-আধটু। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হতো তাই নিয়ে। তবু তাতে সংসার একরকম চলে যাচ্ছিল দুঃখে-সুখে। হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপারে ওর মাথাটা গেল বিগ্‌ড়ে। এই অঞ্চলেরই একজন পণ্ডিত ঐ রাজার গড় সম্বন্ধে ইতিহাস তৈরী করছিলেন। সে ইতিহাস অবিশ্যি তাঁর শেষ হয় নি। কিন্তু তাঁর গবেষণার ফলে আমাদের বেচারা রামচরণের হ'ল মাথা খারাপ, তার স্ত্রীর হ'ল অকাল-মৃত্যু, আর তার ছেলেটি শুনেছি—

বিপিন বলিল, সে তো দিব্যি আছে একটা সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে—

সুধীন বাবু বলিলেন,—তাই নাকি! তা, তা' ছাড়া আর হবে কি?…হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। কেমন করে জানি না, সেই ইতিহাসের পণ্ডিতটি আবিষ্কার করলেন যে, রাজার গড়ে যে রাজবংশ বাস করতেন, বর্ত্তমানে তাঁদের একমাত্র বংশধর হচ্ছে আমাদের ঐ কুলির সর্দ্দার রামচরণ।…তার ফল কি দাঁড়াল জানো? আভিজাত্য-গৌরবে রামচরণ কুলির সর্দ্দারী ছেড়ে দিয়ে গ্যাঁট্ হ'য়ে বাড়ীতে বসে রইল। স্ত্রী তার অনেক কেঁদে-কেটে কিছুতেই তাকে কাজে পাঠাতে পারলে না। রামচরণের এক কথা, এত বড় বংশের নামটাকে সে ছোট হতে দেবে না, মরে গেলেও না। অগত্যা তার স্ত্রী ঘরের জিনিষ পত্র বেচে—বন্ধক দিয়ে সংসারের চাহিদা মেটাতে লাগ্‌ল। শেষে এমন একদিন এসে পড়ল—যে দিন বেচ্‌বার মত আর একটা কিছুও সে খুঁজে পেলে না—শুধু একটী জিনিষ ছাড়া। ঘরে ছিল বহুদিনের পুরোণ একখানা রূপোর পদক, তাতে নাকি পার্শীতে কি-সব লেখা ছিল। রামচরণের মতে সেই পদকখানাই ছিল তাদের বংশপরিচয়ের সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ। পেটের দায়ে তার স্ত্রী চুপি-চুপি সেই পদকখানা দিলে বেচে। কিন্তু ব্যাপারটা রামচরণের কাছে লুকোন রইল না। জান্‌তে পেরে সে একবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌ল, এবং স্ত্রীকে এমন ভাবে প্রহার সুরু করল যে, তার ফলেই সে বেচারা বিছানা নিলে এবং ক'দিন পরে তাতেই হ'লো তার মৃত্যু।…তারপর? তার পরের রামচরণকে তো তোমরা নিজের চোখেই দেখ্‌ছো।

বাংলো হইতে নাথুর ডাক শোনা গেল।

আমরা সকলে বাংলোতে আসিয়া প্রথমেই রামচরণের সন্ধান করিলাম। কিন্তু, তাহাকে আর কোথাও দেখা গেল না।

বিহারে একদিন

যখন রেল, ষ্টীমার ছিল না, তখন বিহারভ্রমণ নামক কোন ভ্রমণকাহিনী কেহ লিখিলে তাহা চমকপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে পারিত। এখন ইউরোপভ্রমণ বা আমেরিকাভ্রমণও পাঠকের নিকট পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ যুগে বিহার-ভ্রমণ আর কালীঘাটভ্রমণ প্রায় সমপর্য্যায়ের। তবু কেন যে বিহার-ভ্রমণ লিখিতে উৎসাহী হইলাম, তাহার কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বিহারে কোন হোটেলে থাই নাই, বিহারের নৈশ-জীবন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্যও সেখানে যাই নাই—যেমন অনেক ইউরোপ-ভ্রমণকারী করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ আমার এ কাহিনী দুই তিনশত পৃষ্ঠাপূর্ণ গ্রন্থ নহে, দুই তিন পৃষ্ঠাতেই শেষ হইবে। তৃতীয়তঃ ইহাতে এমন কিছুই থাকিবে না, যাহার সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা খুলিতে হইবে। যাহা বলিব, তাহা শুনিবামাত্র সকলেই বিশ্বাস করিবেন যে, তাহা সত্য—শুধু যাঁহাদের নিকট বিহার পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কাছে পুরাতন সত্য এবং যাঁহারা বিহার দেখেন নাই, তাঁহাদের কাছে বিস্ময়কর সত্য।

আমি বিহারের পল্লীরূপ ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই, সেই জন্য আমার এই প্রথম-দর্শনজনিত বিস্ময় পাঠকদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি।

বাংলাদেশ হইতে প্রথম বিহারে আসিলে প্রথমেই যে জিনিসটি স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়ে, তাহা তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য। জমি সর্ব্বত্রই প্রায় উঁচু-নীচু। অর্থাৎ, সর্ব্বত্রই পাহাড়ের আভাস। আমি অবশ্য গঙ্গার দক্ষিণ দিকের কথাই বলিতেছি। বাংলার সমতল ভূমি হইতে ইহা এতই স্বতন্ত্র এবং মনোহর যে, ইহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া দুঃসাধ্য। এই উঁচুনীচু জমিতে দ্বিতীয় আকর্ষণ তালবন। তালগাছের



বিহারে পল্লী-বধূগণ শহরবাসী লোক দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়। শহরের লোক ইহাদের নিকট দেবতাবিশেষ। শহর হইতে পল্লীর অবস্থা দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া ইহারা অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

শোভা ইতিপূর্ব্বে এরূপ আর কোথায়ও দেখি নাই। বীরভূম জেলার মাঠে অনেকটা এই ধরণের তালগাছ আছে এবং বীরভূম যাহাদের নিকট অতি-পরিচিত, তাঁহাদের কাছে হয় তো বিহারের এই নৈসর্গিক শোভায় কোন নূতনত্ব অনুভূত হইবে না।

আমি প্রথমতঃ একটি শহরেই উঠিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সেই শহর বা অন্য কোন স্থানের নাম করিলাম না, করিলে হয় ত বক্তব্যে কোন রহস্য থাকিবে না। শহর অতিশয় নোংরা, সর্ব্বদা ধূলা উড়িয়া সর্ব্বত্র আশ্রয় লইতেছে, বাজারে যে খাবার বিক্রয় হইতেছে, তাহাতেও ধূলার আবরণ জমিতেছে, কিন্তু কেহ তাহা বিশেষ গ্রাহ্য করিতেছে না, আর করিবার উপায়ও নাই। শহর হইতে পল্লীজীবন দেখিবার জন্য একখানি একাগাড়ী বা টম্‌টম ভাড়া করিলাম। ভাড়া সব চেয়ে সস্তা বলিয়া একাগাড়ীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হইল। সঙ্গে বিহার-প্রবাসী একজন বাঙালী বন্ধু ছিলেন। বিহারের বর্ত্তমান বাঙালীকে ঠিক প্রবাসী বলা যায় না, কেন না, এখন দেশ-দেশান্তরে দ্রুত গমনের সুবিধার জন্য বাঙালী বিহারে বসিয়া কখনও ভাবে না যে, সে বিদেশে বাস করিতেছে। চাকরি জুটাইবার সময় হয় ত একবার তাহাকে স্মরণ করিতে হয় যে, সে বাঙালী, অন্য সময় ইহা মনে থাকে না। বাঙালীর সংখ্যাও অনেক বেশী। কিন্তু আমি যে বাঙালীর সঙ্গে একায় চড়িলাম, তিনি প্রকৃতই প্রবাসী বাঙালী, তাঁহাদের পাঁচ পুরুষ বিহারে কাটাইয়াছেন এবং পূর্ব্বকালে তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় বা চাটুজ্যে হইলেও বর্ত্তমানে তাঁহারা চাটুরজিয়া। বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা কেহই বাংলা জানেন না, এবং সকলেই তামাক খান। আমার সঙ্গী বন্ধু এতাবৎ বিশুদ্ধ হিন্দী বলিতেন, হালে বাঙালীত্ব-বোধ জাগ্রত হওয়ায় কিছু কিছু বাংলা শিখিয়াছেন এবং বাঙালীপাড়ায় প্রত্যহ তাস খেলিয়া বাঙালীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।



বিহারের পল্লীর অবস্থা। খোলা জায়গায় ঘর থাকা সত্ত্বেও ঘরের ভিতরে আলো-হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না। বাড়ীর ছেলেরাও স্বাস্থ্যবান্ নহে, অত্যন্ত শীর্ণ ও নিরানন্দ।

একা শহরের সীমা ছাড়াইয়া ক্রমশঃ পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং রাস্তাও ক্রমশঃ খারাপ হওয়ায় গাড়ী প্রায় লাফাইতে লাগিল। আমি



বিহার পল্লীর আর এক অংশ। বাড়ীতে কেহ নাই—সকলেই বাহিরে কাজে গিয়াছে।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাস্তায় গাড়ীর অ্যাক্সিডেণ্ট হয় না? বন্ধু নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন, হয় বৈ কি, পরশুও একখানা পাল্কীগাড়ী উল্টে তিনজন লোক জখম হয়েছেন। আমি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিলাম—গাড়োয়ানকে ব'লে দিন, যাতে আস্তে চালায়। বন্ধু গাড়োয়ানকে বলিলেন, গাড়ী এত জোর চালাও কেন? গাড়োয়ান এ কথা শুনিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া সম্মুখের পা-দানির উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিমুখে বলিল, "আরি থোড়া"—বলিয়াই গাড়ী ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটাইয়া দিল। এক্কার উপর দুইজনের অবস্থা কি হইল, তাহা বুঝাইবার নহে। বন্ধু চীৎকার করিয়া গালাগালি দিতে সে গাড়ী হঠাৎ থামাইয়া দিল, কিন্তু ঘোড়াও তৎক্ষণাৎ উল্টাদিকে ঘুরিয়া ছুটিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট ছুটিবার পর থামান গেল। তখন বুঝা গেল—গাড়োয়ান তাড়ি খাইয়াছে এবং এতক্ষণ নেশার ঝোঁকে কি করিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। গাড়ী জোরে চালান সম্বন্ধে কথা উঠিতেই সে মনে করিয়াছিল, আমরা বুঝি বলিতেছি, গাড়ী আরও জোরে চলিতেছে না কেন?

বুঝিলাম এই মাতালের হাতে পড়িয়া ঘোড়ার চরম দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং তাহারই প্রতিবাদকল্পে সেও নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ব্যবহার করিতেছে। অতঃপর গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া দিয়া হাঁটিয়া চলাই ঠিক করিলাম।

নিকটেই একটি গ্রাম। গ্রাম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা তাহা নহে। এ গ্রামে বহু দূরে দূরে চার পাঁচখানি বাড়ী। তবে একসঙ্গে মাত্র একটি জায়গায় তিনখানি বাড়ীর অতি ঘন-সন্নিবেশ দেখা গেল। কোন বাড়ীতে একটি ও তাহার ছবি তুলিতে আসিয়াছি; বলিবার সময় দেখিলাম, একটি কুকুর তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া। ভয় হইল, যদি কামড়ায়। কিন্তু আমাদের কথা স্ত্রীলোকদের নিকট এতই



বিহারের কর্ষিত জমি। গঙ্গার পাড় বাংলাদেশের নদীর পাড়ের মত ভাঙ্গে না বলিয়া পাড়ের জমিতে নিশ্চিন্তমনে চাষ করা চলে। অনেক বাড়ীও নদীর পাড়ে বহুদিন ধরিয়া আছে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী নদীর ধারে কুড়ে বাঁধিয়া বাস করে দেখা গেল।

অসম্ভব এবং হাস্যকর বোধ হইল যে, তাহারা সত্যই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া কুকুরটি একটু দূরে গিয়া শুইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকেরাও ভিতরে চলিয়া গেল।

বাড়ীখানি সবই জীর্ণ। শহরের লোক এই সব জীর্ণ বাড়ীর বাসিন্দার কাছে প্রায় দেবতা-তুল্য। শহরের মায়াজাল প্রত্যেক গ্রামে বিস্তৃত হইতেছে, বিহারও বাদ নাই। তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা আমরা সকলেই জানি।

বাংলা দেশের মত বিহারের অবস্থাও খুব সুবিধাজনক নহে। পল্লীজীবন এবং নাগরিক জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশে চলিতেছে, এবং যে দ্বন্দ্বে বাংলার পল্লী শ্মশানে পরিণত হইতেছে, বিহারেও দেখিলাম সেই দ্বন্দ্ব। শহরে নানারূপ আমোদ-প্রমোদ, বিশেষ করিয়া প্রত্যেক শহরে তা ছোট হউক, বা বড় হউক. অন্ততঃ একটি করিয়া সিনেমা-ঘর হইয়াছে। এই সিনেমা যে হতভাগ্যেরা দেখিতে পারিল না, তাহারা নরাধম এবং আপন সমাজে তাহাদের কোনই প্রতিষ্ঠা নাই। শহর হইতে কিছু জাপানী খেলনা এবং সস্তা স্নো, ক্রীম কিনিয়া এবং সন্ধ্যাবেলা সিনেমা দেখিয়া তাহারা পল্লীতে গিয়া সগর্ব্বে অন্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে থাকে।



ক্যাকটাস্ বা ফণীমনসা ; বিহারের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা দৃষ্ট হয়। রাস্তার দুই ধারে অথবা যেখানেই আগাছা জন্মাইবার সুযোগ পায়, সেখানেই ইহা প্রচুর জন্মে।

যাহাদের অবস্থা শহরের এই সুবিধাভোগের অনুকূল নহে, তাহারা হয় ত নিজেদের অভিশপ্ত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

শহরের লোক ইহাদের সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ। তাই এখন কৃষক চাষে মনোযোগ দিতে পারিতেছে না, তাই তাহার উপার্জ্জনের অধিকাংশ বর্ত্তমান সভ্যতার অন্ধকারময় গ্রাসে পতিত হইয়া তাহার গৃহকে শ্রীহীন করিয়া তুলিতেছে, তাই তাহার ভাঙাঘরের সঙ্গে তাহার নগরমুখী মনের কোন সামঞ্জস্য হইতেছে না। এবং যতই হইতেছে না, ততই তাহার ঘর জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া পড়িতেছে।

ধনীর গৃহে বহুপ্রকার আসবাবপত্র সাজসরঞ্জাম থাকে, দরিদ্রের গৃহে সে সব থাকে না। কিন্তু দরিদ্রগৃহের এই বিরলতা, তাহার দীনতাকে পূর্ব্বে কখনও এমন কুৎসিত ভাবে ফুটাইয়া তোলে নাই। কারণ, বিরলতার জন্য তাহার কোন লজ্জা পূর্ব্বে ছিল না। এখন লজ্জা আসিয়া তাহার মনকে কলুষিত করিয়াছে। তাই যেখানে ছিল তৃপ্তিজনিত পরিপূর্ণতা, এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে অভাবজনিত কদর্য্য লালসা।

বিহারের পল্লীবাসীকে দেখিলে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িবে যে, ইহারা ত' ধ্বংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মদ্যপান ইহাদের মধ্যে এমন ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া ইহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। পাহাড়ী সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা প্রতি সপ্তাহে যাহা কিছু বিক্রয় করিবার মত উৎপন্ন করে, সপ্তাহান্তে ছোট বা বড় শহরের হাটে আসিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থের সবটাই নেশায় উড়াইয়া দিয়া শূন্য হাতে ফিরিয়া যায়।

বিহারের গরুর স্বাস্থ্যবতী বলিয়া যে সুনাম ছিল, তাহা এখন অতীতের স্মৃতিমাত্র। ভাগলপুরের গরুর মূর্ত্তি আর বাংলাদেশের গরুর মূর্ত্তিতে কোন তফাৎ নাই—দুইই কঙ্কালসার।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখন ঘি-দুধে ভেজাল দেওয়ার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং যে সমস্ত জায়গায় পূর্ব্বে বিশুদ্ধ দুধ-ঘি সস্তায় মিলিত, সে সব জায়গায় ইহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের প্রায় সর্ব্বত্রই কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব। দাতব্য চিকিৎসালয় অনেক আছে বটে, কিন্তু রোগের সাময়িক চিকিৎসা ব্যতীত রোগের মূলোৎপাটন-বিধান এখনও অনায়ত্ত।

বিহারে আর একটি ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর মনে হইল। যক্ষ্মারোগের বিস্তার এখানে খুব দ্রুত হইতেছে। কয়েকটা হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, যক্ষ্মারোগ ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে।

উপযুক্ত খাদ্যাভাব বাংলা দেশের স্বাস্থ্যহীনতা ঘটাইয়াছে, কিন্তু বিহারেও যে বাংলাদেশের মত খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, ইহা না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। গো-পালনে যাহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে আর কি হইবে? সত্যই গরুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল।

বিহারের ভূমির অ-সমতলতা এবং বহু তালগাছ মিলিয়া যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, যে সৌন্দর্য্য বাংলাদেশে প্রায় বিরল, সেই সৌন্দর্য্য এখানে উপভোগ করিতে বাধা আছে। উদ্ভিদ-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণিপ্রকৃতি যেখানে এক হইয়া মিলিয়া যায়, সেইখানেই সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ বেশী, কিন্তু বিহারের জড়প্রকৃতির সুর এক হইয়া মিলিতে পারে নাই—অন্ততঃ বর্ত্তমানে শেষোক্তটি বড়ই বেসুরা হইয়া পড়িয়াছে। পরিপুষ্ট বৃক্ষ-লতার পাশে কঙ্কালসার গরু এবং আনন্দ-লেশহীন মানুষকে একসঙ্গে মিলাইয়া দেখা যায় না।

ক্রমশঃ……



অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ

ভারতীয় শর্করা-শিল্প

—শ্রীললিতমোহন হাজরা

ভারতীয় শর্করা-শিল্প দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট শর্করা সংরক্ষণ আইন [Sugar Industry (protection) Act 1932] করায় জাভার শর্করা ভারতে বেশ সুবিধা করিতে পারিতেছে না এবং ভারতীয় শর্করা-শিল্প সংরক্ষণ আইনের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ফলে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ইক্ষুর আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অনেকগুলি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৯৩২-৩৬ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টে নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে :—

বৎসর	কার্য্যরত কলের সংখ্যা	কত টন ইক্ষু পিষ্ট হইয়াছে	সরাসরি ইক্ষু হইতে কত টন শর্করা প্রস্তুত হইয়াছে
১৯৩১-৩২	৩২	১৭৮৩০০	১৫৮৫৮১
১৯৩২-৩৩	৫৭	৩৩৫০২৩১	২৯০১৭৭
১৯৩৩-৩৪	১১২	৫১৫৭৩৭৩	৪৫৩৯৬৫
১৯৩৪-৩৫	১৩০	৬৬৭২০৩০	৫৭৮১১৫
১৯৩৫-৩৬	১৩৯	৭৭১০০০০	৬৮৪০০০

এই তালিকা হইতে বেশ বুঝা যায়, ভারতীয় শর্করা শিল্পের কিরূপ বিস্তার হইতেছে। ভারতীয় শর্করা তিন প্রকারে প্রস্তুত হয় :—(১) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সরাসরি ইক্ষুরস হইতে ; (২) দেশীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইক্ষুরস কুটাইয়া (এই প্রণালীতে প্রস্তুত শর্করা খাণ্ডসারি নামে অভিহিত হয়) ; (৩) গুড় হইতে।

এইবার দেখা যাউক আমরা বৎসরে কি পরিমাণ শর্করা ব্যবহার করি। আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ শিল্প তুলা এবং তাহার পরেই শর্করা। এই শিল্প বর্ত্তমান বৎসরে কুড়ি লক্ষাধিক লোকের অন্ন সংস্থান করিতেছে এবং প্রতি বৎসরে এই দরিদ্র দেশের প্রায় ১৫ কোটী টাকা বিদেশে চালান যাওয়া হইতে রক্ষা করিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতীয়গণ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কি পরিমাণ শর্করা ব্যবহার করিয়াছে।

বৎসর	কত টন শর্করা ব্যবহার করিয়াছে
১৯৩১-৩২	৯৮২০০০
১৯৩২-৩৩	৯০০০০০
১৯৩৩-৩৪	৯০০০০০
১৯৩৪-৩৫	৯০০০০০
১৯৩৫-৩৬	৯০০০০০

ব্যবহৃত শর্করার পরিমাণ নির্ভর করে মূল্যের তারতম্যের এবং দেশের আর্থিক উন্নতির উপর। এখন দেখিতে হইবে, ভারতীয় মিলগুলি বাৎসরিক কি পরিমাণ শর্করা উৎপাদন করে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বৎসর	আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সরাসরি ইক্ষুরস হইতে কত টন	কত টন খাণ্ডসারি	গুড় হইতে কত টন	মোট কত টন
১৯৩১-৩২	১৫৮৫৮১	২৫০০০০	৬৯৫৩৯	৪৭৮১১৯
১৯৩২-৩৩	২৯০১৭৭	২৭৫০০০	৮০১০৬	৬৪৫২৮৩
১৯৩৩-৩৪	৪৫৩৯৬৫	২০০০০০	৬১০৯৪	৭১৫০৫৯
১৯৩৪-৩৫	৫৭৮১১৫	১৫০০০০	৪০০০০	৭৬৮১১৫
১৯৩৫-৩৬	৬৮৪০০০	১২৫০০০	৪০০০০	৮৪৯০০০

এই দুই তালিকা হইতে ভারতীয়গণ বাৎসরিক কত টন শর্করা প্রস্তুত করে এবং কত টন ব্যবহার করে বুঝা যাইতেছে। ভারতীয় মিলগুলি দেশের প্রয়োজনীয় শর্করা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আগামী দুই তিন বৎসরেই ভারতীয় মিলে প্রস্তুত শর্করা পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানী করা হইবে। বর্ত্তমানে ভারতে যতগুলি মিল আছে সেগুলি যদি সারা বৎসর ধরিয়া কার্য্য চালাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে ১১০০০০০ টন শর্করা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা একেবারেই সম্ভবপর নহে, কারণ ইক্ষু আবাদের উন্নতি নাই।

ইক্ষু আবাদের ভূমির পরিমাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী রিপোর্টে কেবলমাত্র কত একর ক্ষেত্রে ইক্ষু আবাদ হইয়াছে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কত টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ভারতের প্রদেশগুলিতে গত দুই বৎসরে কত একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়াছে এবং কত টন গুড় প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রদেশ	জমির পরিমাণ (১০০০ একর)		কত টন গুড় প্রস্তুত (১০০০ টন)	
	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫ ৩৬
যুক্তপ্রদেশ	১৮৪৯	২২৪৯	২৭৫৮	৩৩৩৬
পাঞ্জাব	৪৬২	৪৭৩	৩২৬	৩৫৮
বিহার-উড়িষ্যা	৪৪৫	৪৬৫	৩৭৩	৩৬৮
বাঙ্গালা	২৭৬	৩২৫	৪৯২	৫৬০
মাদ্রাজ	১১২	১৩১	৩২১	৩৬০
বোম্বাই	১১৪	১২১	২৬৬	৩১৩
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪২	৪৮	৫১	৬৩

আসাম	৩৫	৩৫	৩৪	৩৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৯	৩০	৪৭	৪৯

অল ইণ্ডিয়া সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে আনুমানিক ৪১৪১০০০ একর ক্ষেত্রে ইক্ষু আবাদ হইবে এবং ৩১০০০০০০ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। গত বৎসরে যে পরিমাণ ক্ষেত্রে আবাদ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১৫% ভাগ অধিক ক্ষেত্রে আবাদ হইবে এবং ১৬% ভাগ অধিক টন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। এই ত' গেল সাধারণ ইক্ষু আবাদের কথা। উন্নত ধরণের ইক্ষুর আবাদ সম্প্রতি হইতেছে। উন্নত ধরণের ইক্ষুর অভাব আমাদের দেশে যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অভাব পূরণের জন্য বর্ত্তমানে জাভা হইতে বৎসরে কয়েক হাজার টন শর্করা ভারতে আমদানী করা হইতেছে। আশা করিতে পারা যায় দুই এক বৎসরের মধ্যে আমাদের এই অভাব পূরণ হইয়া যাইতে পারে।

শিল্প প্রভূত পরিমাণে বিস্তার লাভ করিতেছে কিন্তু এই বিস্তারের পথে অনেকগুলি সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। সেই সমস্যাগুলির যথাসম্ভব সত্বর সমাধান না হইলে এই ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পের অবনতির আশঙ্কা আছে। কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেই সমস্যাগুলি যথাক্রমে :— (১) ঝোলাগুড় এবং ইক্ষু 'খোয়া'র (bagasse) ব্যবহার (২) ইক্ষু উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচ (৩) উন্নত ধরণের ইক্ষুর আবাদ (৪) ইক্ষুর ক্ষতিকর কারণসমূহের প্রতিকার (৫) নানা প্রদেশে ইক্ষু ক্রয় কালীন যে অবৈধ প্রতিযোগিতা হয় তাহা প্রত্যাহার (৬) মিলের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের ইক্ষুর আবাদ (৭) ক্ষেত্রে জল সেচন ও নিঃসরণের সুব্যবস্থা (৮) কৃষকগণ যাহাতে উন্নত ধরণের সার ব্যবহার করে এবং কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে তাহার ব্যবস্থা (৯) ইক্ষু পেষণের সময় ৪ হইতে ৮ মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা (১০) শর্করা বিক্রয়ের সুব্যবস্থা অবলম্বন করা (১১) উন্নত ধরণের শর্করা প্রস্তুত করা। এই সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধান হইলে আশা করা যায়, দুই এক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় শর্করা জাভার শর্করার সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা চালাইতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমানে ভারতে ইক্ষু আবাদের উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় মিলগুলির মালিকগণ ইক্ষু আবাদ করেন না। জাভায় দেখিতে পাওয়া যায়, মিলের মালিকগণ নিজেদের অধীনে এবং কারখানার নিকটবর্ত্তী অনেক একর জমিতে ইক্ষুর আবাদ করেন। তাঁহাদের আবাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং উন্নত ধরণে সম্পাদিত হওয়ায় দেশের নিরক্ষর কৃষকদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে জাভায় অতি উৎকৃষ্ট ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা নাই। আমাদের দেশের মিলের মালিকগণ ইক্ষুর জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন দেশীয় কৃষকদিগের উপর। এই কৃষকগণ একেবারে নিঃস্ব। তাহারা অর্থের অভাবে জমিতে উত্তমরূপে সার প্রদান করিতে এবং উৎকৃষ্ট উপায়ে আবাদ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কৃষকদিগের আবাদী ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে বিভক্ত হওয়ায় এবং একস্থানে অবস্থিত না হওয়ায় আবাদের জন্য অনেক ব্যয় বহন করিতে হয়। কিন্তু দরিদ্র কৃষকেরা এত ব্যয় বহন করিতে কেমন করিয়া পারিবে? সেই জন্য তাহারা যেন তেন প্রকারে আবাদ করে। ফলে ইক্ষুর কোন উন্নতি হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে ইক্ষুচারায় নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাহার ফলে কৃষকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত সাংঘাতিক রোগ যাহাতে ফসলকে আক্রমণ না করিতে পারে, তাহার জন্য সরকারী মহল এবং ভারতীয় মিলগুলির মালিকদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশে জল সেচনের অব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট উপায়ে আবাদের অভাবে, উত্তম সারের অভাবে কৃষকেরা নিকৃষ্ট প্রথায় আবাদী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। তাহার ফলে আমাদের দেশের আবাদী-ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শর্করার মূল্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতে যাহাতে জাভার ন্যায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ইক্ষুর আবাদ হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইলে উৎকৃষ্টতর উপায়ে আবাদের প্রথা প্রচলন, জল সেচন ও জল নিঃসরণের সুব্যবস্থা অবলম্বন, জমিতে উত্তম সার প্রদানের সুব্যবস্থা এবং কৃষকদিগকে আবাদ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

ইক্ষু যে বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান ফসল রূপে স্থান পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাৎসরিক ৬০ কোটি টাকা মূল্যেরও অধিক ইক্ষু ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারত সরকারের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আর্থিক দুর্গতির দিনেও এই ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষকগণ তাহাদের দেয় খাজনা স্বচ্ছন্দতার সহিত মিটাইয়া [illegible]। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হইবে যে [illegible] ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষকদিগের আবাদের উন্নতির জন্য যা[illegible] ভারত সরকারের অবলম্বন করা উচিত। সুখের বিষয় ভারত সরকারের পল্লীসংস্কার ফণ্ড হইতে কৃষির উন্নতির জন্য [illegible] টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। [illegible]ার মিলস্ সেক্রেটারী লিখিয়াছেন —

"For this purpose it is essential to establish a series of demonstration farms and nurseries in all cane-growing Provinces, so that they may devote their energies to the propagation of canes of higher sucrose content, of higher tonnage and of early and late ripening varieties which will be very helpful to the industry in extending the cane-crushing and thus reducing cost of production of sugar. These demonstration farms and nurseries should also serve as centres from where trained agriculturists would tour round the surrounding districts where the best methods of cultivation and manuring suitable to Indian condition would be demonstrated and accessible to small holders and whence the distribution of disease-free seed could be undertaken. One important function of these farms would be to carry on researches as to the methods of combating cane-disease and pests. In addition to the establishment of such farms it is also necessary for the

Government, to undertake such allied work of all round improvement as provision of better facilities of irrigation by extension of canal system and assistance in tapping the subterranean sources of water-supply" *
তিনি আরও লিখিয়াছেন—

"It is the bounden duty of the Government to undertake all measures calculated to improve the condition of the cultivators and to help the stabilization of the sugar industry within a short period. It is equally the duty of the mill-owners to take active part in the programme of improvement of cultivation of cane and to render all possible assistance and help to the Government. Such an enormous scheme of development could only be got through with the co-operation of all concerned viz, the Government, the Manufacturer, the Zaminder and the cultivator." †

ইক্ষু সরবরাহের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিলের মালিকগণ ইক্ষু সরবরাহের জন্য এমন অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন, যাহার ফলে শর্করার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অবৈধ প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করিতে হইলে প্রত্যেক মিলের মালিকগণকে স্থির করিতে হইবে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র। কথাটি আরও বিশদ ভাবে বলা যাউক। মনে করুন একটি থানার অধীনে দুইটি শর্করা প্রস্তুতের মিল আছে। কিন্তু এই থানায় যে পরিমাণ ক্ষেত্রে ইক্ষুর আবাদ হয় তাহা দুইটি মিলের পক্ষে একেবারে স্বল্প। তখন সাধারণতঃ একটি মিলের মালিক সমস্ত ইক্ষু ক্রয় করিয়া লইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে যে মিলের মালিকের মূলধন অতি অল্প তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই সেই মিলটি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে এরূপ করা উচিত যে, দুইটি মিলের মালিকগণের সমস্ত ইক্ষু-ক্ষেত্র দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া। তাহা হইলে উভয় মিলই কার্য্য চালাইতে পারিবে এবং অবৈধ প্রতিযোগিতা প্রত্যাহৃত হইবে। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সহরে অল ইণ্ডিয়া সুগার মিলস্ এসোসিয়েশনের যে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক মিলের মালিকগণের একটি হোম ষ্টেশন থাকিবে। এই ষ্টেশন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ইক্ষু সরবরাহ করিবে। যুক্ত-প্রদেশের কয়েকটি মিলের মালিক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিমাংশে এই নিয়ম খাটিতে পারে না, কারণ তথায় মিলগুলি এত নিকটবর্ত্তী যে সর্ব্বদা এই নিয়ম ভঙ্গের আশঙ্কা রহিয়াছে।

মিলে কত শত টন মাত গুড় নষ্ট হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মাত গুড় হইতে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহাতে আছে পটাশ, ফসফরিক এসিড ও নাইট্রোজেন। ইহা হইতে পেট্রোল এবং উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার নীলরতন ধর মহাশয় মাতগুড় সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সামান্য দ্রব্য হইতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মাতগুড় হইতে যে পেট্রোল প্রস্তুত হয় তাহা "পাওয়ার এলকোহল" (power alchohol) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পেট্রল প্রস্তুত করিতে খরচ অতি অল্পই পড়ে। নিম্নে ইহার ব্যয়তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রতি গ্যালন "পাওয়ার এলকোহল" প্রস্তুত করিতে লাগে— ৵
প্রতি গ্যালনের গভর্ণমেণ্ট ডিউটি — ।৵
প্রতি গ্যালন পাওয়ার এলকোহল প্রস্তুতের মোট ব্যয় — ১৶

মাত্র এক টাকা তিন আনায় এক গ্যালন পেট্রল পাওয়া গেল। এখন কলিকাতায় এক গ্যালন পেট্রলের মূল্য ১।৵৹ এবং কানপুর, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরের প্রতি গ্যালন পিছু পড়ে ১।৶৹, ১।৶১৹ এবং আরও অধিক পড়ে। মাতগুড় হইতে পেট্রল প্রস্তুত হইলে দেশের বহু অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং একটি নূতন শিল্পের ব্যবস্থা হয়।

মাতগুড় জমির উত্তম সার। ইহাকে কেমন করিয়া সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায় তাহার কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন।

১। প্রথমতঃ এক একর জমিতে ব্যবহার করিবার মত ৯০ হইতে ২১০ মণ মাতগুড় একত্র করিতে হইবে এবং তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছিটাইয়া দিতে হইবে।

২। জমিতে ছিটাইয়া দিবার এক সপ্তাহ পরে জমি উপযুক্তরূপে কর্ষণ করিতে হইবে। সপ্তাহে দুইবার করিয়া জমি কর্ষণ করিতে হইবে। কর্ষণ-কার্য্য অন্ততঃ পক্ষে দুই মাস ধরিয়া চালাইতে হইবে।

৩। মধ্যে মধ্যে জমিতে জল দিতে হইবে।

ইক্ষুর খোয়া (Bagasse) আমরা সাধারণতঃ জ্বালানী করি। কিন্তু ইহাতে আমাদের যথেষ্ট লোকসান হয়। ইহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে আমাদের শর্করার মূল্য কিছু পরিমাণে কমিতে পারে। ইহা হইতে নানা প্রকার মোড়ক (Packing paper) করিবার কাগজ এবং বোর্ড প্রস্তুত হয়। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ কোন গবেষণা হয় নাই। গবেষণা চলিলে আরও অনেক কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এই শিল্পের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—মার্কেটিং সমস্যা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় মিলগুলি দুই এক বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রয়োজনীয় শর্করা প্রস্তুত করিয়াও কিছু টন 'বাড়তি' হইবে। তখন তাহার জন্য মিলের মালিকগণ অস্থির হইয়া উঠিবেন। পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য একটি "Central Marketing Board" গঠন করিতে হইবে। এই বোর্ডের কাজ হইবে দেশীয় মালিকগণের অবৈধ প্রতিযোগিতা নিবারণ করা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে শর্করা রপ্তানী করা। বিদেশ হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে শর্করা দেশে আসিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। যাহাতে শর্করার মূল্য গুড়ের মূল্যের দ্বিগুণ না হইতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকারের যত্ন লইতে হইবে। এই বোর্ডকে ভারতীয় শর্করার ৩০% ভাগ শর্করা ক্রয় করিতে হইবে এবং দেশের বাহিরে বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ ভার লইতে হইবে। শর্করার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় ভারতীয় মিলগুলির প্রায় ৭৫% ভাগ বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। ইহার উন্নতিতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। চাই ভারতীয়দিগের উন্নতি। ভারতীয় মূলধন, ভারতীয় পরিশ্রম, ভারতীয় কর্তৃত্ব সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতীয়গণ কি এই ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? বঙ্গদেশে মাত্র ১২টা মিল আছে। তাহার মধ্যে ৮টি কার্য্য করিতেছে। এই আটটির মধ্যে ২টা মিলও বাঙ্গালীর মূলধনে ও কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কিনা সন্দেহ।

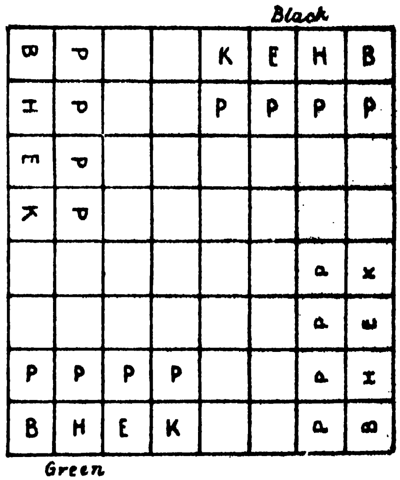
* The Indian Sugar Industry (1936-Annual) pp. 53
† The Indian Sugar Industry (1936 Annual) pp. 54

দাবাখেলার ইতিহাস

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ

দাবাখেলার মত সর্ব্বজনপ্রিয় গৃহাশ্রয়ী (indoor) খেলা বোধ হয় আর কিছুই নাই। সময়সংহার ব্যাপারে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। প্রবাদ আছে যে, দাবাখেলায় নিবিষ্ট-চিত্ত কোন খেলোয়াড় তাহার পুত্রের সর্পদংশন-বার্ত্তা শুনিয়া সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সর্পটির মালিক—কোন্ ব্যক্তি। এই কাহিনী সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত কি না জানা যায় না, তবে দাবার আশ্চর্য্য মাদকতার সহিত যাঁহারা বিন্দুমাত্রও পরিচিত আছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, সত্যই এরূপ ঘটা একেবারেই অসম্ভব নয়। দাবার আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে সমগ্র সভ্য জগৎ মুগ্ধ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু দাবা-ক্রীড়াসমিতি আছে এবং দাবাখেলাকে অবলম্বন করিয়া এ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক পুস্তক, পুস্তিকা ও মাসিক পত্রাদি রচিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত প্রত্যেক দেশের সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে দাবার সমস্যা পূরণের জন্য পুরস্কার সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া প্রকাশিত হয় এবং বহু যোগ্য ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে নিবিষ্ট রাখে। দাবাখেলোয়াড়দের মধ্যে যোগ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রতিবর্ষে হইতেছে। সেই সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে ক্রীড়া হয়, তাহার ফলাফল তড়িৎ-যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তবাসীদের নিকট যুগপৎ প্রেরিত হয় এবং বহুলোকের সোৎকণ্ঠ কৌতূহল নিবৃত্ত করে। এইরূপ যে সর্ব্বজন-মনোগ্রাহিণী ক্রীড়া, তাহার ইতিহাস অবগত হইবার আগ্রহ সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু, এই ইতিহাস এক অপূর্ব্ব অস্পষ্টতার আবরণে আবৃত।

দাবাখেলার আবিষ্কার গ্রীক, রোমক, পারসীক, চৈনিক, ব্যাবিলনীয়, সীথীয়, মিশরীয়, হিন্দু, আরব, আইরিশ ইত্যাদি বহু বিভিন্ন জাতির উপর আরোপিত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার ব্যক্তিবিশেষের উপরও এই আবিষ্কার আরোপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, বাইবেল-বর্ণিত রাজা সলোমন, গ্রীক-বীর পালামেদেস, আরিষ্টোটেল, চৈনিক মাণ্ডারিন হান্‌সিঙ ইত্যাদি বহু ব্যক্তিকে দাবা উদ্ভাবনের সম্মান দান করা হইয়াছে। আর, আমাদের দেশেও দাবাপ্রসঙ্গে মন্দোদরীর নাম সুবিদিত। প্রবাদ আছে যে, তিনি স্বীয় যুদ্ধপ্রিয় স্বামীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিবার জন্য এই কৃত্রিম যুদ্ধক্রীড়ার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। স্বামীকে মানাইয়া রাখিবার ব্যাপারে মেয়েদের যে স্বাভাবিক দক্ষতা আছে বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে, তাহা মনে করিলে এই ব্যাপার অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে আধুনিক যুগে আমরা যখন দশমুণ্ড রাক্ষসরাজ



১ম চিত্র। *

রাবণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করি না, তখন তাহার পত্নীর অস্তিত্ব অথবা উদ্ভাবনী প্রতিভা স্বীকারের কোন অবকাশ নাই। অতএব দাবাখেলার ইতিবৃত্তের জন্য আমাদিগকে সাবধানে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

দাবাখেলার উৎপত্তিস্থান এবং উদ্ভাবক সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ (১৮৫০) পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহলে এই বিশ্বাসই বলবৎ ছিল যে, প্রাচীন পারস্তবাসীরাই এই ক্রীড়ার উদ্ভাবন করিয়া-

* উদ্ধৃত চিত্রে নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে :—K=রাজা, E=গজ, H=অশ্ব, B=নৌকা বা রথ, P=বড়ে, M=মন্ত্রী।

ছেন। কিন্তু, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন পণ্ডিত এই মত পোষণ করিতেছিলেন যে, দাবাখেলা আবিষ্কারের কৃতিত্ব হিন্দুদের। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে টমাস হাইড্ (Dr. Thomas Hyde) নামক জনৈক বিদ্বান্ ইংরাজ তাঁহার লাতিন ভাষায় লিখিত *De Lundio Orientalibus* নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তিনি হয় ত' নিজে ঐ খেলা জানিতেন না এবং এই মতের পোষক কোন সংস্কৃত রচনা তাঁহার হস্তগত হয় নাই। কিন্তু, এ সব সত্ত্বেও তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা করিতে হইবে। তাঁহার প্রায় একশত

Black

B	H	E	K	M	E	H	B
P	P	P	P	P	P	P	P
P	P	P	P	P	P	P	P
B	H	E	M	K	E	H	B

Red

২য় চিত্র।

বৎসর পরে তাঁহারই স্বদেশীয় স্যর উইলিয়ম জোন্স্ দাবার ভারতীয়ত্ব প্রমাণের নিদর্শন (সংস্কৃত বচনাবলী) সর্ব্বপ্রথমে আধুনিক পণ্ডিতসমাজে প্রচারিত করিলেন। প্রাচ্য বিদ্যা অধ্যয়ন ও প্রচারের অগ্রদূত হিসাবে জোন্সের নাম সর্ব্বজনবিদিত। তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের 'Asiatic Researches' (প্রাচ্য-গবেষণা) নামক পত্রিকায় 'ভারতীয় দাবাখেলা' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ঐ প্রবন্ধেই দাবার ভারতীয়ত্বের প্রমাণস্বরূপ কিছু সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জোন্স্ ঐ প্রমাণকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে, ভারতে এই খেলার উদ্ভব হইতে পারে।

জোন্সের প্রকাশিত প্রমাণকে সর্ব্বপ্রথম কাজে লাগাইলেন ক্যাপ্টেইন কক্স (Capt. Cox)। তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এক প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশীয় দাবাখেলার সহিত ভারতীয়, চৈনিক এবং পারস্যদেশীয় দাবাখেলার এক তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারতবর্ষই দাবার জন্মভূমি, এবং তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে ডন্কান্ ফরবেস্ (Duncan Forbes) নামক পণ্ডিত কক্সের এই সিদ্ধান্তকে তাঁহার স্বরচিত 'দাবাখেলার ইতিহাস' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিলেন।

কিন্তু কক্স্ ও ফর্বেস্-প্রচারিত মতবাদ দাবার ঐতিহাসিকগণ সকলে স্বীকার করিলেন না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দাবার ইতিহাস' গ্রন্থে মিঃ মারে (H. J. R. Murray) ইহার বিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এ জন্য তাঁহাকে বা তাঁহার মতানুবর্ত্তীদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, দাবা যে ভারতে উদ্ভাবিত ইহার অকাট্য প্রমাণ তাঁহারা পান নাই, তবে প্রাপ্ত প্রমাণাবলী এই সিদ্ধান্তের বিশেষ অনুকূলে ছিল। সে যাহাই হোক, বঙ্গদেশীয় বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত শূলপাণির সঙ্কলিত 'চতুরঙ্গদীপিকা' * নামক সংস্কৃত গ্রন্থের আবিষ্কারের পর দাবার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বহুল ভাবে নিরস্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

দাবার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান ইঙ্গিত দেয় ভাষাতত্ত্ব। পারস্যদেশীয় দাবার আধুনিক নাম হইতেছে 'শতরঞ্জ'। এই শব্দ পহ্লবী 'চত্রঙ্গ্' হইতে উদ্ভূত। পহ্লবী 'চত্রঙ্গ্' শব্দটীর মূল সংস্কৃত 'চতুরঙ্গ'। এই চতুরঙ্গ কি, তাহার সম্বন্ধে স্যর উইলিয়ম জোন্সের আগে কেহ আলোচনা করেন নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দেখাইলেন যে, চতুরঙ্গনামক ক্রীড়ার কথা রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্বে' উল্লিখিত আছে এবং কোজাগর-রাত্রিতে ঐ ক্রীড়া করিয়া জাগরণের বিধি রহিয়াছে। এই খেলা চারিজনে মিলিয়া

* এই গ্রন্থ প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ' নামক পুস্তকাবলীর [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

খেলিতে হয় এবং দাবাখেলার সহিত তাহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার সম্যক্ বর্ণনা তিনি করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহাকে চতুরঙ্গদীপিকা গ্রন্থের এক অতি খণ্ডিতাংশের উপর নির্ভর করিয়াই প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ অবলম্বনে আমরা নিম্নে চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার বিশেষ লক্ষণগুলি বিবৃত করিতেছি :—

(১) চতুরঙ্গ দাবার ছকের মত ছকের উপর চারিজনে মিলিয়া খেলিতে হয় (১ম ও ২য় চিত্র দ্রষ্টব্য) ;

(২) প্রত্যেক খেলোয়াড়ের অধীনে একটি করিয়া রাজা, গজ, অশ্ব ও নৌকা (বা রথ) এবং চারিটী বড়ে থাকে * ; চারিজন খেলোয়াড়ের বল লাল, সবুজ এবং কালো রঙের (১ম চিত্র) ;

(৩) প্রত্যেক বার বল চালনার আগে খেলোয়াড়-গণকে ক্রমান্বয়ে দুইটি চৌকো পাশার দান ফেলিতে হয় এবং ঐ দানের অনুসারে বল চালিত হয় ;

(৪) পাশাগুলির গায়ে ১ হইতে ৬ পর্য্যন্ত সূচক চিহ্ন থাকে এবং পাঁচ দান পড়িলে রাজা ও বড়ে, চারে গজ, তিনে অশ্ব এবং দুইয়ে নৌকা বা রথ চালিত হয় ;

(৫) বলসমূহের গতি নিম্নবর্ণিত প্রকার :—

(ক) গজ চারিদিকে পার্শ্ববর্ত্তী কোঠায় যাইতে পারে (৩য় চিত্র) ;

(খ) অশ্বের গতি দাবার অশ্বের ন্যায় (৪র্থ চিত্র) ;

(গ) নৌকা কোণাকুণি ভাবে পরবর্ত্তী কোঠায় যাইতে পারে (৫ম চিত্র) ;

(ঘ) ব'ড়ের গতি দাবার ব'ড়ের ন্যায় (৬ষ্ঠ চিত্র) ;

(ঙ) রাজার গতি দাবার রাজার ন্যায় (৭ম চিত্র) ;

(৬) দুই পাশার দানের উপর বল চালনা হয় বলিয়া প্রত্যেক ক্রীড়ক উপযুক্ত দান পড়িলে দুটি বলও চালাইতে পারেন ;

* হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিযুক্ত সেনাবাহিনীর নাম 'চতুরঙ্গ'। অতএব এই খেলার নাম অর্থযুক্ত।

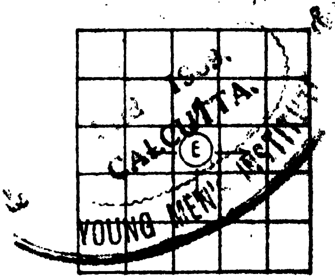
(৭) বিপক্ষ বলের সহিত যুদ্ধ দুই প্রকারের :—এক, পরের বলকে বিনাশ বা বন্দী করা ; অপর, সেই বলকে গতিবিহীন করা ;

(৮) চতুরঙ্গে জয় পরাজয় নিম্নোক্ত প্রকারের :—

(ক) সিংহাসন—যখন এক রাজা অপর রাজার (শত্রু, মিত্র বা শত্রুর মিত্রের) স্থানে উপবেশন করিতে পারে, তখন সেই জয়-লাভকে 'সিংহাসন' বলে।

(খ) চতুরাজী - যখন কোন রাজা অপর তিন রাজাকে বন্দী করিতে পারে, তখন সেই জয়লাভকে 'চতুরাজী' বলে।

(গ) এই সকল ব্যতীত 'নৃপাকৃষ্ট' 'বৃহন্নৌকা', 'নৌকাকৃষ্ট' এবং 'ষট্পদ' নামক জয়ও



৩য় চিত্র।

রহিয়াছে। (এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা মৎসম্পাদিত চতুরঙ্গদীপিকার ভূমিকা পাঠ করিতে পারেন) ;

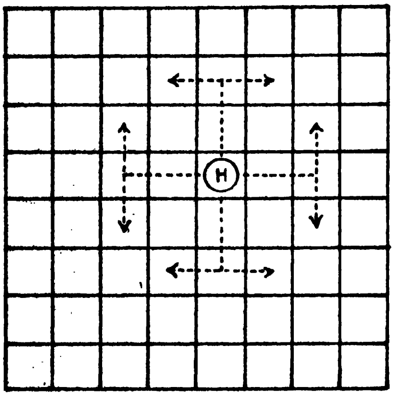
(ঘ) যদি কোন খেলোয়াড়ের সকল বল নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার সেই পরাজয়কে 'কাক-কাষ্ঠ' বলে ;

(৯) প্রতিপক্ষের কোন বল বন্দী করিতে পারিলে, তাহার জন্য পণ পাওয়ার বিধি রহিয়াছে। এই পণের পরিমাণ স্থানীয় এবং সাময়িক প্রথা অনুসারে নির্ণীত হয়।

উপরে চতুরঙ্গের যে মোটামুটি লক্ষণ দেওয়া হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহা কেবল যুদ্ধক্রীড়া মাত্র নহে, ইহা রাজনীতিরও ক্রীড়া। যে চারিজন রাজার যুদ্ধ এই

ক্রীড়ার উপজীব্য, তাহাদের এক জোড়া অন্য জোড়ার শত্রু এবং প্রত্যেক জোড়ার একজন অপরের মিত্র। কিন্তু রাজাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব কখনই স্থায়ী হয় না; বন্ধুর দুর্ব্বলতার সুযোগে বন্ধুর রাজত্ব অধিকার রাজাদের পক্ষে স্বাভাবিক; তাই 'সিংহাসন' ও 'চতুরাজী' নামক জয় সম্ভবপর হয়

চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার যে মোটামুটি বর্ণনা উপরে দেওয়া হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই ক্রীড়া দাবা অপেক্ষা জটিল। এই চতুরঙ্গের জটিলতার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংস্রব বিবেচনা করিয়াই ক্যাপ্টেইন কক্স্ এই ক্রীড়াকে দাবার জননী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে ডনকান্ ফরবেসের সমর্থন লাভ



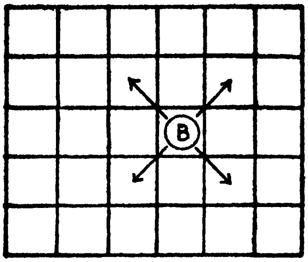
৮ম চিত্র।

করিয়াছেন। এই পণ্ডিতদ্বয় মনে করেন যে, চতুরঙ্গের জটিল নিয়মাবলীর চাপে, অথবা সর্ব্বদা চারিজন খেলোয়াড় পাওয়ার সুবিধা না থাকায়, খেলাটি ক্রমে দুই জনের খেলায় পরিণত হইয়াছে (৮ম চিত্র)। এবং পরে পাশা ব্যবহারের সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় এবং শাস্ত্রীয় নিষেধ বশতঃ চতুরঙ্গ হইতে পাশা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং কালক্রমে বলসমূহ নূতন ক্রমে সজ্জিত হইয়া খেলাটি দাবাখেলায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের এই মতবাদ ও যুক্তি দাবার ঐতিহাসিক মিঃ মারের মনঃপূত না হইলেও খুবই সমীচীন মনে হয়। তাঁহারা যে রাষ্ট্রীয় এবং শাস্ত্রীয় নিষেধের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থ মনুসংহিতায় তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। মনু দ্যূতকে অত্যন্ত নিন্দা করেন (২, ১৭৯), তাঁহার মতে অক্ষ (পাশা) ক্রীড়া নিষিদ্ধ (৪, ৭৪ ; ৮, ১৫৯) এবং দ্যূতাদি রাষ্ট্র হইতে নিবারণ করা পর্য্যন্ত তিনি রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (৯, ২২০-২২৪)। অতএব, চতুরঙ্গ হইতে দাবার উৎপত্তি বা ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় করিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

দাবা চতুরঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইলেও কবে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লিখিত পারস্যদেশীয় কোন পহ্লবী উপাখ্যান গ্রন্থে দাবার উল্লেখ দেখিয়া জানা যায় যে, খেলাটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং অন্যূন ৫৫০ খৃষ্টাব্দে পারস্যে উহার প্রচলন ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে, দাবা (শতরঞ্জ) চতুরঙ্গ ক্রীড়া হইতে উদ্ভূত ; অতএব তাহা ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে গিয়াছে নিশ্চয়। 'চতুরঙ্গনামক' আখ্যার যে পহ্লবী গ্রন্থ ৭ম ও ৯ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও দাবার ভারতীয়ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব অন্যূন ৫০০ খৃষ্টাব্দে যে দাবা ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত কোন গ্রন্থে দাবা খেলার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সকল স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা দাবার প্রসঙ্গ আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, সে সকলই চতুরঙ্গ সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত ভাবে 'চতুরঙ্গ-দীপিকা'র ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় সাহিত্যে দাবার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ বোধ হয় পদ্য 'বিক্রমার্কচরিতে' (আনুমানিক ১৪০০ খৃঃ)। কাহ্নপাদের 'চর্য্যাপদে' দাবার উল্লেখ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহা ভ্রমজনিত কল্পনা।

সে যাহাই হোক, দাবাখেলার জন্ম যে খৃষ্টীয় ৫০০ শতাব্দীর পরে নহে, ইহা অনায়াসে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইহা কত প্রাচীন বলা তত সহজ নয়। মনুসংহিতায় পাশা (অক্ষ) সম্বন্ধে যে নিষেধোক্তি আছে, তাহাই যদি চতুরঙ্গের দাবারূপে পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশক হয়, তবে দাবার ইতিহাসকে অন্যূন আরও চারিশত বর্ষ পিছাইয়া দেওয়া যায়, যেহেতু বর্ত্তমান মনুসংহিতা ১০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। তাহা হইলেই

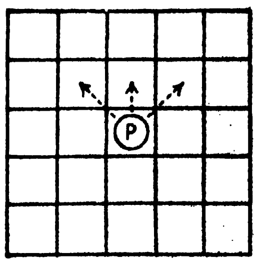
দেখা যায় যে, দাবাখেলা অন্ততঃ পৌনে দুই হাজার বছরের মত প্রাচীন।



৯ম চিত্র।

এই ত গেল দাবার কথা। দাবার পূর্ব্বপুরুষ চতুরঙ্গ ক্রীড়া যে কত প্রাচীন তাহা কে বলিবে? চতুরঙ্গের প্রাচীনতম সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কাব্যে (৭০০ খৃঃ); অথচ পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চতুরঙ্গ অন্ততঃ ১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। তখনকার ভারতীয় সাহিত্যে উহার কোন উল্লেখ না থাকার কারণ কি? এই উল্লেখ না থাকার কারণ সম্ভবতঃ উহার নামান্তরের প্রচলন। যে ছকের উপর চতুরঙ্গ খেলা হইত তাহার নাম ছিল 'অষ্টাপদ'। অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী (১১০০ খৃষ্টাব্দে) অষ্টাপদকে চতুরঙ্গ-ফলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনে হয়, চতুরঙ্গের আর এক নাম ছিল 'অষ্টাপদ'। কাশ্মীরদেশীয় কবি রত্নাকরের 'হরবিজয়' কাব্য (৯০০ খৃঃ) হইতে আমরা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। এই অষ্টাপদ ক্রীড়া খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যেহেতু পালি 'বিনয়পিটক' এবং 'ব্রহ্মজালসুত্তে' (৬০০ খৃঃ পূঃ) উহার উল্লেখ রহিয়াছে। সিংহলী টীকাকারের মত গ্রহণ করিলে উল্লিখিত অষ্টাপদকে চতুরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অতএব দেখা যায়, দাবার পূর্ব্বপুরুষ চতুরঙ্গ অন্ততঃ ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। এই পর্য্যন্ত দাবার প্রাচীন ইতিহাস। অন্যূন ৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে 'চতুরঙ্গ' নামক খেলা বর্ত্তমান ছিল। উহার ক্রমবিকশিত রূপ দাবা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে যে ভারতবর্ষে জনগণের অবসরযাপনের সহায়তা করিত, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু এই অসাধারণ লোকচিত্তাকর্ষিণী ক্রীড়া অচিরকাল মধ্যে ভারতের প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহে এবং দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল এবং কালক্রমে জগৎসভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানরূপে গণ্য হইল।

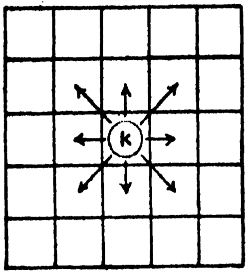
পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দাবা ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু হয় ত' তাহার আগেই ব্রহ্মদেশে দাবার প্রচলন হইয়াছিল। ব্রহ্মভাষায় দাবার নাম 'সিতুয়িন' হয় ত 'চতুরঙ্গ' শব্দের সহিত কোন প্রকারে সম্পর্কযুক্ত। ব্রহ্মদেশীয় দাবায় 'নৌকা'র স্থানে রহিয়াছে 'রথ', অতএব মনে হয়; ঐ দাবা উত্তর-ভারত হইতে ব্রহ্মে গিয়াছে। কারণ, বঙ্গ-মগধের দাবায় রথের স্থানে আছে নৌকা। শ্যামদেশীয় দাবায় কিন্তু নৌকা রহিয়াছে। অতএব উহা যে বঙ্গ-মগধ অঞ্চল হইতে গিয়াছে, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। শ্যামদেশে দাবা কবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ইন্দোচীনের অন্তর্গত আনাম প্রদেশে দাবাকে বলে 'ছোএন্ ত্রাঙ্গ'; ইহা হয় ত চতুরঙ্গ শব্দের সহিত সম্পর্কিত। মালয়দ্বীপের লোকদের মধ্যেও বিশেষভাবে দাবার প্রচলন। সুমাত্রা, জাবা এবং বোর্ণিও দ্বীপের নিজস্ব দাবাখেলা আছে। সুমাত্রার লোকেরা দাবা যে কখন সুমাত্রায় প্রবেশ করিয়াছিল ইহা জানা যায় না; তবে খুব সম্ভব ৭০০ খৃষ্টাব্দের পরে নহে। মালয় অঞ্চলে ব্যবহৃত দাবার সাধারণ নাম 'চাতের'; ইহাও 'চতুরঙ্গ' শব্দের সহিত সম্পর্কিত। মালয়-ভাষায় নৌকার নাম 'তের'; ইহা হয় ত' 'তরী' শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'তরী'



১১শ চিত্র।

শব্দ হইতে ইহার বঙ্গ-মগধের দাবার সহিত জ্ঞাতিত্ব কল্পনা করা যায়। চীনদেশীয় দাবা ভারতীয় দাবা হইতে কিছু

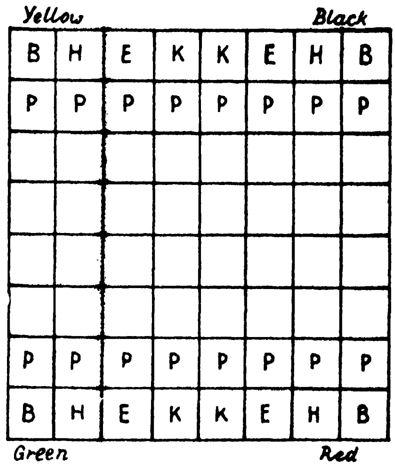
ভিন্ন ধরণের হইলেও উহার ভারতীয়ত্ব সুনিশ্চিত বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। রথ, অশ্ব, গজ, মন্ত্রী আদি বল



১২শ চিত্র।

তাহার প্রমাণ। 'রথ' দেখিয়া মনে হয়, চীনের দাবা উত্তর-ভারত হইতে উত্তর-পশ্চিমের পথ দিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মও ঐ রাস্তায় চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। দাবা কবে চীনে গিয়াছিল তাহা জানা যায় না, তবে খুব সম্ভব ৭ম শতাব্দীর পরে নহে। কোরিয়াতে যে দাবা খেলা হয়, তাহা চীন হইতে গিয়াছে। জাপানের দাবা কোরিয়ার দাবা হইতে প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রাপ্ত। জাপান ছাড়া তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া, তুর্কিস্থান এবং ট্র্যান্স্‌ককেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও দাবা খেলা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত। পারস্যদেশে দাবা যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই খেলা তথা হইতে এক দিকে আরবে, অপর দিকে প্রাচ্য রোম-সাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। আরব দেশ হইতে দাবা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে; এবং সেই খেলাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দাবার পূর্ব্ব পুরুষ।

দাবার এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা চিন্তা করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীর মনেই গর্ব্বের সঞ্চার হয়। আধুনিক য়ুরোপীয়েরা যুদ্ধকে প্রায় মারাত্মক দৈনন্দিন ব্যবসায়ে



১৩শ চিত্র।

পরিণত করিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী তাহাকে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ দৈনন্দিন ক্রীড়া করিয়া তুলিয়াছিল।

ধন

…মানুষের কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধান পাইলে, কোন্ বস্তুকে মানুষের প্রকৃত অর্থ বলা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়। কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষ মুখ্যতঃ আহার, বিহার এবং শিক্ষা (শব্দগত ব্যাপক অর্থে) লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ঐ আহার, বিহার এবং শিক্ষার জন্য যাহা কিছু দরকার হয়, তাহার প্রত্যেকটিকে সফল করা অর্থসাপেক্ষ। কাযেই, মূলতঃ যে যে বস্তু অথবা কর্ম্মের দ্বারা মানুষের আহার, বিহার এবং শিক্ষার উপকরণসমূহ অর্জ্জিত হইতে পারে, সেই সেই বস্তুকেই মানুষের ধন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।…

র‍্যাণ্টগেন্

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

ভিল্‌হেল্‌ম্ কনরাড র‍্যাণ্টগেন্, জার্ম্মানীর লেনেপ (Lennep) শহরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। র‍্যাণ্টগেন্‌ও ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন ইহাই এক প্রকার স্থির ছিল। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয় হল্যাণ্ডে, আপেলডোর্ণ (Apeldoorn) শহরের মার্টিন্স্ হারমান ফান ডোর্ণের (Martins Herman Van Doorn) বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়টি অনেকটা বোর্ডিং স্কুলের মত ছিল। র‍্যাণ্টগেন্ অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন না কিন্তু প্রকৃতিপ্রিয় ছিলেন। নানারূপ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের শক্তি তাঁহার অল্প বয়সেই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যের কোন লক্ষণই, তখন দেখা যায় নাই।

ইহার পর তিনি উট্‌রেখ্‌টে (Utrecht) ষ্টেডেলিইক (Stedelijk) উচ্চ বিজ্ঞান-শিক্ষালয়ে (Gymnasium) ভর্ত্তি হন, কিন্তু বালকসুলভ দুষ্টামির অপরাধে অল্পকাল পরেই তিনি এই বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত করে, কারণ ইহা তাঁহার উট্‌রেখ্‌ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া রহিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, তিনি উচ্চ শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য উট্‌রেখ্‌ট শিল্প-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন বটে, কিন্তু তথায় সাধারণ ছাত্রের সকল অধিকার পাইলেন না। পরে তিনি জানিতে পারেন যে, সুইট্‌সারল্যাণ্ডের ৎসুরিশ (Zurich) শহরে যে Polytechnical School বা শিল্প-বিদ্যালয় আছে, তথায় সাধারণ ছাত্রের সমস্ত অধিকার পাইয়া তিনি রীতিমত পড়িতে পারিবেন এবং সেখানে প্রবেশ করিতে তাঁহার পূর্ব্বতন শিক্ষালয় ষ্টেডেলিইক গিম্‌নাজিউমের কোনরূপ পরিচয়পত্র আবশ্যক হইবে না। ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি তথায় মেক্যানিকাল ইনজিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে যান। এখানে অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে পড়িয়া তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরেও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানেই অধ্যয়ন করেন এবং গ্যাস সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পি, এচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি জার্ম্মানীতে যান ও তথায় ভ্যুর্ৎসবুর্গে (Würzburg) অধ্যাপক কুনটের সহকারীপদে নিযুক্ত হন। এখানে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি ষ্ট্রাস্‌বুর্গে যান এবং তথায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে privatdozent (সনন্দপ্রাপ্ত 'প্রাইভেট টিউটর') হন।



ভিল্‌হেল্‌ম্ কনরাড র‍্যাণ্টগেন্ [১৮৪৫-১৯২৩]

উপরের ঘটনাবলী হইতে দেখা যাইতেছে যে, র‍্যাণ্ট্‌গেনের বিদ্যাশিক্ষা সাধারণভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে হয় নাই। তিনি নিজের অভিরুচি অনুসারে বিদ্যাশিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিলেন। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি জার্ম্মানীতে হোহেনহাইমের (Hohenheim) কৃষি-বিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইহার দুই বৎসর পরে তিনি ষ্ট্রাস্‌বুর্গে অতিরিক্ত অধ্যাপকের (extraordinary professor) পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি গীসেন্ (Giessen) পদার্থবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভ্যুৎর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পদেই নিযুক্ত হইয়া যান।

ইহার ১০ বৎসর পরে র‍্যাণ্ট্‌গেন্ রশ্মি আবিষ্কার করিয়া তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। গ্যাসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিচালন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য, পুরু কাল কাগজের বাক্সের ভিতরে একটি কাচের নল রাখিয়া বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের সাহায্যে নলের ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিয়া ফেলেন। পরে নলটির মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিবার সময়ে তিনি দেখিলেন যে, নিকটে স্থিত বেরিয়ম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড্ (barium platinocyanide) মণ্ডিত একটি কাগজের পর্দ্দার উপর সন্দীপ্তি দেখা যাইতেছে। কোন অদৃশ্য ও নূতন রশ্মির ক্রিয়ায় এইরূপ হইতেছে বলিয়া তিনি অনুমান করেন। এই রশ্মির প্রকৃতি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তিনি ইহার নাম দেন এক্স্‌-রশ্মি বা x rays।

পরে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, এই রশ্মি এমন বহু পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে যাহার মধ্য দিয়া সাধারণ আলোক যাইতে পারে না। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, এই রশ্মি ফটো তুলিবার প্লেটের উপরেও ক্রিয়া করিতে পারে। আরও দেখা গেল যে, প্রতিফলন (reflection) ও প্রতিসরণ (refraction) বিষয়ে নূতন রশ্মি সাধারণ আলোক-রশ্মির নিয়ম মানিয়া চলে না। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি রয়্যাল সোসাইটী হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ্ লেনার্ডের (Philip Lenard) সহিত একত্রে 'রামফোর্ড' পদক প্রাপ্ত হন। লেনার্ড পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলন যে, 'ক্যাথোড' রশ্মির কতক অংশ এ্যালুমিনিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুর পাত্‌লা পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

এই আবিষ্কারের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া র‍্যাণ্ট্‌গেন প্রথমেই ভ্যুৎর্সবুর্গের ফিজিক্যাল মেডিক্যাল সোসাইটির (Physical Medical Society) সভাপতির নিকট প্রেরণ করেন এবং সভায় পঠিত হইবার পূর্ব্বেই প্রবন্ধটি Annals পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এই নূতন রশ্মি সম্বন্ধে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফিজিক্যাল মেডিক্যাল সোসাইটি'তে, র‍্যাণ্টগেন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতার শেষে শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ফন্ কলিকার (Von Kolliker) এই রশ্মিকে আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে র‍্যাণ্ট্‌গেন্ রশ্মি নামে অভিহিত করেন। এখন পর্য্যন্ত 'এক্স্‌-রে' ও 'র‍্যাণ্টগেন রে' উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। এই র‍্যাণ্টগেন্ শব্দ হইতেই বাঙলা 'রঞ্জন-রশ্মি' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

এই রশ্মি এখন মনুষ্য-শরীরের আভ্যন্তরিক গঠন দেখিবার ও কোন কোন রোগ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। কান্‌সার প্রভৃতি কতকগুলি রোগের চিকিৎসাতেও ইহা প্রয়োগ করা হইতেছে। রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও বর্ত্তমানে রঞ্জন-রশ্মির বহুল ব্যবহার হইতেছে।

র‍্যাণ্ট্‌গেন্ যে কেবল মাত্র এই রশ্মিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে। স্থিতিস্থাপকত্ব (elasticity), কৈশিকত্ব (capillarity), স্ফটিকের উত্তাপ-পরিচালন-ক্ষমতা, বিভিন্ন গ্যাসের উত্তাপ-শোষণ-ক্ষমতা, 'পিজো ইলেক্‌ট্রিসিটি' (piezo-electricity), তড়িৎ-চুম্বক দ্বারা ধ্রুবিত আলোকের (rotation of polarised light) ঘূর্ণন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি মৌলিক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন।

র‍্যাণ্ট্‌গেন্ প্রতিষ্ঠাকামী লোক ছিলেন না। তাঁহার আলোক-চিত্র গ্রহণ করা বা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কোন প্রকার প্রকাশ্য সভা করা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার জীবৎকালে নিজের জীবনী সম্বন্ধে সকল তথ্যই তিনি অতি সাবধানে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাবলী, তাঁহার মৃত্যুর পর জানা যায়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার ছবি

—শ্রীবিনয় ঘোষ

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের কবিতার মধ্যে তাঁহাদের কতকগুলি প্রিয়বস্তুর নিখুঁত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে "বারমাসী"। কবিকঙ্কণ মাধবাচার্য্য, দ্বিজ বংশীবদন, শ্যামদাস, গোবিন্দদাস গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম দাস, লোচন দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তারা নানাভাবে নানাভঙ্গীতে এই 'বারমাসী'র বর্ণন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য চণ্ডীকাব্যে ফুল্লরার 'বারমাসী বর্ণনা করিয়াছেন :

বৈশাখ বসন্ত ঋতু খরতর খরা।
তরুতলে নাহি মোর করিতে পসরা॥
পাও পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন॥
... ...
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকরে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি১॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
... ...
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
... ...
ভাদ্র মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিকে জল॥
... ...
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে জগজনে।
ছাগল, মহিষ, মেষ দিয়া বলি দানে॥
... ...
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥ ইত্যাদি।

শ্রীমন্ত স্বদেশে যাইতে চাহিলে তাঁহার স্ত্রী সিংহল-রাজকন্যা সুশীলা তাঁহাকে আর একটি বৎসর সিংহলে থাকিতে অনুরোধ করিতেছে। ফাল্গুন মাসে ঘরে ঘরে যখন হোলিখেলা চলিবে মহানন্দে, সুশীলা তখন তাহার স্বামীর সহিত আবির খেলিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় সে তাহার প্রাণকান্তের অঙ্গে শীতল গন্ধ লেপন করিয়া দিবে। শ্রাবণের ঝড়-বৃষ্টির রাতে শ্রীমন্ত-বিনা চাতকিনী সুশীলার বুক ফাটিয়া যাইবে, সে কিছুতেই তাহার স্বামীকে ঘরছাড়া হইতে দিবে না। সুশীলা বলিতেছে :—

২ ফাল্গুনেতে হরির উৎসব সবে করে।
নানা রঙ্গ করে লোক প্রতি ঘরে ঘরে॥
আবির খেলাও প্রভু আমার সঙ্গতি।
কি কারণে যাইবারে চাহ প্রাণপতি॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে লোক-চক্ষুর আতপ অত্যন্ত।
গন্ধ লেপি দিব অঙ্গে শুন প্রাণকান্ত॥
শ্রাবণেতে নিত্য নিত্য মেঘে করে ঝড়।
দেশে যাইতে উচিত না হয় প্রাণেশ্বর॥
আমি চাতকিনী নারীর জন্মিছে পিপাসা।
কাদম্বিনী রূপে মোর পূর্ণ কর আশা॥
ভাদ্র মাসে হেথা থাকি কর নানা রঙ্গ।
সুখের সময় সুখ কেন কর ভঙ্গ॥

দুঃখী শ্যামদাস বাঙ্গালার এক জন প্রাচীন কবি। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কেদারখণ্ড পরগণার হরিহরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার অনূদিত সমগ্র ভাগবতের পুঁথি এখনও দেবতারূপে পূজা পাইয়া থাকে। শ্যামদাসের "রাধিকার বারমাস্যা" হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

৩ কার্ত্তিকেতে কল্পতরু-মূলে চিন্তামণি।
কুঞ্জক্রীড়া-কৌতুক কহিতে নাহি জানি॥
কত রঙ্গ জানে কৃষ্ণ কিশোর শরীর।
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির॥

পৌষে প্রবল শীতে পবন প্রবলে।
পাতিয়া পঙ্কজ পত্র শুতি মহীতলে॥

১। অর্দ্ধেক খেয়ে ফেলে। ২। কবিকঙ্কণ "চণ্ডী"। ৩। "গোবিন্দ মঙ্গল"।

প্রভুর পীরিতি প্রেম মনে মনে গণি।
প্রতি বোলে পুড়ে মোর পাপ ননদিনী॥

ফাগুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥

ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু ঘোরে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায়॥

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা-জলে যাদব-সংহতি।
জল-কেলি[৪] করে রঙ্গে যতেক যুবতী॥

জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়।
যৌবন-চুম্বন-ধন যাচে যদুরায়॥

গোবিন্দদাস, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের বর্ষার বিবরণ অতুলনীয়। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, বৃষ্টির ঝরঝরানি গান, ঝিঁঝিঁ পোকা ও দাদুরীর ডাক এক সঙ্গে যে ঐক্যতানের সৃষ্টি করে, তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই কবিতার ছন্দ-ঝঙ্কারে, শব্দ-তরঙ্গে। অত্যাধুনিকের দল বাঙ্গালা দেশকে ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলেও চলে। সুরের ভিতর এখন সেই মধুর মূর্চ্ছনা আর নাই, আছে waltz-এর উন্মত্ততা, উচ্ছৃঙ্খলতা। গোবিন্দদাসের মুখে শুনি :

মাস আষাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদ-পাঁতি।
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগএ নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাঙনে সঘনে ঘন গরজন উনমতি দাদুরী-বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন-কণ্ঠ-বিলোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ॥

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মুখে শুনি পাপিয়ার গান, কিন্তু পাপিয়াকে দেখিতে পাই না চোখে। অন্তরের বেদনা শুধু বাড়িয়া যায়।

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী-বেদন বাঢ়॥
পাপীয়া পাখায় পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া॥

আবার আর একজনের মুখে শুনিতে পাই বর্ষার ছন্দ

৫ রজনী শাঙন[৬] ঘন ঘন, দেয়া-গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত-দাদুরী-বোল কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে, স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

ইহার পাশে বর্ষা-কবি রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সঙ্গীত তুলনা করিবার জন্য উদ্ধৃত হইল :

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার যাদুস্পর্শে বর্ষার মেঘ-মন্দির ছন্দ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে সচরাচর তেমনটি দেখা যায় না। তাঁহার ছন্দের ঘুমপাড়ানি গানে আমরা ঘুমাইয়া পড়ি, স্বপ্ন দেখি। বহুদূর হইতে ভাসিয়া-আসা সেই ম্লান মধুর রাগিণী আমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ব্যথিত করিয়া তুলে। আমরা স্তম্ভিত হইয়া শুনি—ঋতু-রাণী বর্ষার বন্দনা গান :

বম্ ববম্ বম্ শব্দ গম্ভীর,
বৃন্তে ছম্ ছম্ শুব্ধ জম্বীর—
মেঘ মৃদঙ্গে প্রাণ সারঙ্গে,
স্বপ্ন মল্লার স্বপ্ন হাম্বীর।

বাঙ্গালার বর্ষা, বাঙ্গালার হেমন্ত, বাঙ্গালার শরৎ, বাঙ্গালার বসন্ত, বাঙ্গালার কাল-বৈশাখী, বাঙ্গালার কবিকে যুগ-যুগান্তর হইতে অনুভূতির খোরাক জোগাইয়া আসিতেছে এবং আসিবে। ঋতুর গান গাহিয়া যুগে যুগে বাঙ্গালার কবিরা নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন এবং আজও আমরা সেই রসামৃত পান করিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

বাঙ্গালার কবির লেখনী-অগ্রে একদিন বাঙ্গালার ছবি বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একদিন কবির অন্তর-গর্ভে কল্পনার কল্লোল-সঙ্গীতে কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি 'অনন্ত-যৌবনা' উর্ব্বশীর মত বাঙ্গালার রূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার কবির মুখে শুনিয়াছি বাঙ্গালার কাল-বৈশাখীর উদ্দাম নৃত্য-গীত, বাঙ্গালার বর্ষার সান্দ্র বর্ষণ, শরতের শস্য-

৪। জলক্রীড়া। ৫। জ্ঞানদাস। ৬। শ্রাবণ।

ধ্বনি, বসন্তের মধুর কাকলী। তখন বাঙ্গালার 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র বনে উপবনে শুনিয়াছি বুলবুলির গান, পাপিয়ার বিলাপ, কোকিলের কুহুরব, তরু-শাখায় দেখিয়াছি ফিঙের নৃত্য। তখন দেখিয়াছি :

৭ বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ-ধূ
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
কোকিল ডাকে তীরে অমিয়-মাখা।
আসিতে পথে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

কিন্তু আজ ?

এইবার আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের আরও কয়টি প্রিয় বস্তুর আলোচনা করিব। রন্ধন-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। রান্নাঘরের আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী অনেক কবির অন্তরে অনুভূতির জন্ম দিয়াছে। অনেকে হয় ত বলিবেন—রান্নাঘর লইয়া আবার কবিতা কি ? রন্ধন নারীর রূপের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হিসাবে চিরদিনই বাঙ্গালা দেশে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা রন্ধন করিতে এবং পুরুষদের যত্ন করিয়া খাওয়াইতে যেমন পটু, তেমন আর কোনও দেশের মেয়েরা নয়। সেবা ও শুশ্রূষার প্রতিমূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশের নারী। এই দিক্ বাদ দিয়া বিচার করিলে, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়। আজকাল উড়িয়া ব্রাহ্মণেরর হাতে অখাদ্য ব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করিয়া আমাদের পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, আমাদের মেয়েরা চপ্-কাট্‌লেট্ ভাজিয়া সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের সনাতন আহার ও রন্ধনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি। কবিতার ছন্দে রন্ধনের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সুর করিয়া একদিন বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা আবৃত্তি করিত। উচ্চবংশীয়া মেয়েরা রন্ধনের পূর্ব্বে ঘি এবং সুগন্ধি মশলার অর্ঘ্য দিয়া অগ্নি-দেবতার পূজা করিত। কবি বিজয় গুপ্ত 'মনসা-মঙ্গলে' সোণকার রন্ধন সম্বন্ধে অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন :—

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান।
মুক্তি যেন রন্ধন করি অমৃত সমান॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন।
ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন॥
অনেক দিন পরে রান্ধে মনের হরিষ।
ষোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ॥
প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুশুরীর সুপ৮॥
পাটায় ছেঁচিয়া লয় পোলতার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোলতা॥
জ্বর পিত্ত আদিনাশ করার কারণ।
কাঁচাকলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাচন॥
যমানী পূরিয়া ঘৃতে করিল ঘনপাক।
সাজা ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতাশাক॥
শুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাল।
পাকা কলা লেবু রসে রান্ধিল অম্বল॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাচ গাচ।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥

খাবার সাজাইয়া দিবার জন্য অনেক প্রকার থাল, প্লেট ও গেলাস ব্যবহার করা হইত। সেকালের লোকের খুব প্রিয় খাদ্য ছিল কচ্ছপের মাংস।

কাউটার৯ রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাকিয়া॥

রন্ধনের পর সোণকার পরিবেশনের বর্ণনা আরও সুন্দর। সোণার থালায় ও বাটিতে খাবার সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সোণকা হাওয়া করিতেছে এবং রন্ধনের কোন ত্রুটি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছে।

সম্মুখে সুবর্ণ থাল বসিলা দিব্য পাটে।
সোণকা বসিল গিয়া চাঁদের নিকটে॥

আর কিছু হোক্ না হোক্, এগুলি হইতে নানারকম মাছ, মাংস, শাক-সব্‌জি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাক করিবার প্রণালী শিক্ষা করা যায়। ডাকের বচনে পাওয়া যায় :

নিমপাতা কাসন্দির ঝোল।
তেলের ওপর দিয়া তোল॥

৭। 'বধূ'।

৮। ইংরাজীতে 'soup' বলে, ঝোল বা রান্না ডাল। ৯। কচ্ছপ।

পলতা শাক রুহি মাছ।
বলে ডাক বেগুন মাছ ॥
মগুর মৎস্য দাএ কুটিয়া।
হিঙ্গ, আদা, লবণ দিয়া ॥
তেল, হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক বেগুন খাব ॥
পোনা মাছ জামিরের রসে।
কাসন্দি দিয়া যে জন পরশে ॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ।
ইচিল১০ মাছ তৈলে ভাজিয়া।
পাতি লেবু তাতে দিয়া ॥
বাহাতে দেই তাতে মেলে।
হিঙ্গ, মরিচ দিহ ঝোলে ॥
চালু দিহ যত তত।
পানী দিহ তিন যত।

এইবার মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে কিছু বলিব। আধুনিক শিক্ষিতা নারীর পোষাক দেখিলে শুধু এই মনে হয় যে, রুচির কি কদর্য্য ও ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পোষাকের সে সৌন্দর্য্য নাই, যে সৌন্দর্য্য আমাদের দেশের মেয়েদের শারীরিক শোভা চিরকাল বর্দ্ধিত করিয়াছে। বিনাইয়া বিনাইয়া সে খোঁপা বাঁধাও নাই, সে মণিময় কর্ণফুলীও নাই, সে মেঘাম্বর শাড়ীও নাই। তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায়, আকণ্ঠলম্বিত কেশগুচ্ছ, প্রায় আধফুট ডায়ামিটারের রূপোর ঝুমকো, 'ইপক্‌মেকিং পিকক্‌' শাড়ী ইত্যাদি। প্রাচীন কবিরা এই সকল পোষাকের সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজ বংশীবদন পদ্মার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

মণিময় কর্ণ-ফুলী তদুপরে চক্রাবলী
গণ্ড-যুগে ঝলকে বিজলী।
গলে গজমুক্তা হার তাতে গ্রীবাপত্র আর
নাসা-অগ্রে মুকুতা-আবলী।

যদুনন্দন দাস শ্রীমতী রাধিকার বেশ-বিন্যাস বর্ণনা করিয়াছেন :

সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র ধনী ভিতরে পরিল।
তাহার উপরে নীল বসন ধরিল ॥
ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর।
মেঘাম্বর নাম তার অতি মনোহর।

১০। চিংড়ী।

... ...
নিতম্ব দেশেতে হার করিল যোজনা।
যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা ॥
চন্দন কর্পূর আর অগুরু কাশ্মীর।
পঙ্ক করি লঞা আইল বিশাখা সুধীর ॥
পৃষ্ঠে, বক্ষে, বাহু আর কুচযুগ দেশে।
লেপন করিল সেই পরম হরিষে ॥
রক্তবস্ত্র মুক্ত-রচিত অনেক রতন।
দিব্য চুণী দিল কুচে করিয়া যতন ॥
ইন্দ্র-ধনু প্রায় সেই সুবর্ণ-পর্ব্বতে।
রক্তসন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে ॥
সুবর্ণের তালপত্র বলয় করিঞা।
কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিঞা ॥

এরূপ বেশ-বিন্যাস আধুনিক মেয়েরা ভুলিয়া গিয়াছে। সে বেশ-বিন্যাসও নাই, কেশ-বিন্যাসও নাই। এখনকার মেয়েদের (এবং পুরুষদেরও) ষ্টাইল হইয়াছে সযত্ন অবহেলা (careful carelssness)। পূর্ণবস্ত্র পরিধান করিলেও অর্দ্ধনগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। জানি না, সভ্যতার ক্রম-বিবর্ত্তনে পূর্ণ নগ্নতাই ষ্টাইল হইবে কি না।

নরহরি দাস "ভাগবতে" রুক্মিণীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

কম্বুকণ্ঠে শোভে কত মণি-আভরণ।
তাহার শোভায় যেন উদয় কিরণ ॥
পঙ্কজ মৃণাল জিনি বাহু সুগঠন।
বাজুবন্দ, তাড়, চুড়ি, কঙ্কণ শোভন ॥
অঙ্গুলি চম্পক-কলি অঙ্গুরী জড়িত।
করি-কুম্ভ জিনি উরু বক্ষোজ শোভিত।
নিবিড় নিতম্বে পট্টাম্বর নীলমণি।
তথি ক্ষুদ্রঘণ্ট আদি সহিত ত্রিবলি।

নৃত্য সম্বন্ধেও অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। এযুগে প্রাচ্যকলার ভিতর শ্রেষ্ঠ ছিল নৃত্য এবং সঙ্গীত। বৈষ্ণব কবিগণ নৃত্যের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর উদ্দেশ্য হইতেছে দ্রুত শরীর-সঞ্চারণে সাম্যাবস্থার একটি 'অধ্যাস' সৃষ্টি করা। প্রসিদ্ধ "চণ্ডীকাব্য"-প্রণেতা দ্বিজ মাধবের রাধাকৃষ্ণের নৃত্যবর্ণনা অতীব সুন্দর। শ্রীরাধা নৃত্য করিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি সর্ত্ত আছে। শ্রীরাধার

পরাজয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 'বেশর কাঁচলি' খুলিয়া লইবেন, জয় হইলে নিজের 'মোহন মুরলী' পুরস্কার দিবেন।

চাঁদ-বদনী নাচ ত' দেখি তাক্ তাক্ থোই
তিনিকিটি তিনিকিটি ধাঁ।
... ...
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥
বিষম-সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলী।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥
যেমন বলেন শ্যাম-নাগর তেমনি নাচে রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই॥
সবাই বলেন রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
... ...

এইবার শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিবেন।

শ্যাম তোমারে নাচতে হবে দিগেদা ধেনা কাটা
থোর লাগজিগ ধাঁ।
উড় তাড়া থোই ঝুমুর ঝুমুর ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু...

এ-যেন নটরাজের নৃত্য। চরণাবর্ত্তে এক নূতন মধুময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু রাধিকার তরফ হইতে সখীদেরও কতকগুলি সর্ত্ত আছে।

না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্রঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥
উদ্ভট তালে যদি হার বনমালা।
চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালী॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে রাখিব দুখিনী শুনে হাসি॥

শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া শ্রীরাধা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছেন। নৃত্যের সঙ্গে বাজনার প্রয়োজন। ললিতা, বিশাখা, ইন্দুলেখা, তুঙ্গদেবী, রঙ্গদেবী প্রভৃতি সখীগণ বীণা, মৃদঙ্গ, সপ্তস্বরা, কপিদাস, তুম্বুরা, পিণাক বাজাইয়া এক অপূর্ব্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি করিল। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য সুরু করিলেন, রাই চুপ করিয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন।

[১১]"শ্রীকৃষ্ণের "রাসলীলা" বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। রাস মুখ্যতঃ হল্লীশ—নায়ককে কেন্দ্র করিয়া নর্ত্তকীদের বৃত্তাকারে নৃত্য। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আমরা 'Divine Dance about Him'-এর কথা শুনিতে পাই। সে-নৃত্য হইতেছে আমাদের 'হল্লীশ' নৃত্য। 'Hymn of Jesus' নামক গ্রন্থে যশুখৃষ্ট ভক্তমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থ হইয়া বলিতেছেন :

"Who danceth not knoweth not what is being done." "I would pipe, dance ye all!"

মহাকবি দান্তে (Dante) প্রেমসিক্ত দিব্যদৃষ্টিতে গোলকে যে নিত্য নৃত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তার বর্ণনা অতি চমৎকার এবং আমাদের সাহিত্যের সহিত তুলনীয়।

"Thus the souls of the great theologians dance to music and laughter in the Heaven of the Son; the loving seraphs, in their ecstatic joy, whirl about the Being of God."

আমাদের কবি দেখিয়াছেন সেই একই দিব্যদৃষ্টিতে—

মণ্ডলী বন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।[১২]

শ্রীকৃষ্ণের এই নৃত্যের কথা কে না শুনিয়াছে! কখন উদ্দণ্ড নৃত্য, কখন সেই ভাবময়, মধুময় নৃত্য, যাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়। আধুনিক রঙ্গমঞ্চে শিবের নৃত্যাভিনয়ে ভৈঁরো রাগ সকলের ভাল লাগে না, কিন্তু মনশ্চক্ষু দিয়া এই নৃত্য দেখিয়া কে না আরও আনন্দ পাইবেন!

প্রাচীন কবিগণের আরও কয়েকটি প্রিয় বস্তু ছিল। কৃষি ও পল্লীজীবনের যে ছবি তাঁহারা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। ডাক ও খনার বচন পড়িলে মনে হয়, সত্যই যেন মাঠের বুকে দাঁড়াইয়া এ-যেন কাহার বহুদিনের সযত্ন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উক্তি। বাঙ্গালার কৃষকেরা মনের সুখে একদিন জীবনযাপন করিত, তাহাদের ভাঙা কুঁড়ের ভিতর একদিন শান্তির আধিপত্য ছিল অক্ষুণ্ণ। তাহারা ছিল কর্ম্মপটু, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। রাজার উপর তাহাদের অটল বিশ্বাস ছিল, রাজাকে তাহারা ভক্তি করিত, রাজার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিত। যে-সব জমি তাহারা চাষ করিত, তাহা তাহাদের ঘরের নিকট অবস্থিত। গরু রাখিবার গোয়ালঘরও তাহারা কাছে নির্ম্মাণ করিত।

১১। মাসিক 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'রাসলীলা'র এই সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন।

১২। চরিতামৃত।

আনহি বসন্ত আনহি চাষ।
বলে ডাক তাহার বিনাশ॥

এক স্থানে বাড়ী, অপর স্থানে কৃষিক্ষেত্র হইলে, কৃষক নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল "agricultural drawbacks"-এর "fragmentation of holdings"-এর মত ইহাও একটি প্রধান কারণ।

আনহি বসতি আনহি গোয়ালি।
হেন বসতের কি বাউলি॥

এক জায়গায় বাসা, অপর জায়গায় গোয়ালঘর, ইহা পাগলের বাস করিবার উপযুক্ত। নিজের ঘরের কাছে, গৃহস্থের গোয়াল থাকা উচিত। বহুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলার এক বুদ্ধিমান্ কৃষক এই গান গাহিয়া গিয়াছে। আজ তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে।

দশম শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে জ্যোতির্বিদ্যারও পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যে দেখা যায়, ধনপতি জ্যোতিষীকে অপমান করিতেছে। ধনপতির বাণিজ্যগমনের যে দিন স্থির হইয়াছে, তাহা জ্যোতিষীর মতে অশুভ দিন। সেদিন যাত্রা করিলে ধনপতির অমঙ্গল হইবে। শ্যামদাস গোকুলের অশুভ লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন :

উল্কাপাত দিবসে উদয় ধূম্রচয়।
সঘনে অঙ্গারবৃষ্টি চতুর্দ্দিকে হয়॥
নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ।
প্রাচীরে উলূক বৈসে দেখে সর্ব্বজন॥
যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক।
নগরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক॥
কুক্কুর ক্রন্দন-গীত গায় সেই কালে।
দিনে খসি পড়ে তারা অবনীমণ্ডলে॥
হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতী।
গোপগণে ডাকি নন্দ করেন যুকতি।

দশম শতাব্দীতেও গ্রামের সাধারণ চাষারা চন্দ্রগ্রহণ গণনা করিতে পারিত।

যে যে মাসের যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী॥
সে দিন যদি হয় পৌর্ণ-মাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'শিবায়নে' কৃষি-কার্য্যের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কি উপায়ে নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ ও রোগ হইতে ফসল বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহারও অনেক উপদেশ আছে।

যুক্তি করি জল কাটে জল বয়ে যান।
অর্দ্ধ ভাদ্রপদ মাসে রৌদ্র পাইল ধান॥
পিছু পরিপূর্ণ করি বান্ধিলেন জল।
ডুবে রয় খাড় যেন দেখা যায় জল॥
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নাহি করে হেলা।
পদাঘাতে ঘোগ মারে ঘারে দেই চেলা॥
ডাক সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কতদিনে কেটে দিলে জল॥

শিবঠাকুরের কৃষি-কার্য্যের মধ্যে যতরকম ঘাসের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের অ-জানা। যে-দেশে কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-দেশের গ্রাম্য লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত তাহার কিছু কিছু সন্ধান মিলিতে পারে।

রামাই পণ্ডিতের 'শিবের গানে'র মধ্যে নানাবিধ শস্যের বীজবপনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বিবিধ ধান্যের নাম যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি বেশীর ভাগ কাব্যিক হইলেও, নামের ভিতর দিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়।

কালিন্দী, কটকী, কুসুমশালি, কনকচূড়।
দুধরাজ, দুর্গাভোগ, পর্দ্দেশী, ধুস্তুর॥
কৃষ্ণশালি, কোঙরভোগ, কোঙরপূর্ণিমা।
কল্মীলতা, কনকলতা, কামোদগরিমা॥
খেজুরথুপী, খয়েরশালি, ক্ষেমগঙ্গাজল॥
ছত্রশালি, জটাশালি, জগন্নাথভোগ।
জামাইলাড়ু, জলারাঙ্গী, জীবনসংযোগ॥

বঙ্গালাদেশের বনে জঙ্গলে যে-সব গাছপালা আছে, বাঙ্গালার আকাশে যে-সব পাখী উড়িয়া বেড়ায়, বাঙ্গালার বৃক্ষশাখায় যে-সব পাখী গলা ছাড়িয়া মিষ্টিসুরে গান গায়, বাঙ্গালার বনে যে-সব সুগন্ধি সুরম্য ফুল ফোটে, সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন কবিতার ভিতর। দ্বিজ বংশীবদনের "মনসা-মঙ্গলে" চাঁদসদাগরের গুয়াবাড়ী নির্ম্মাণের মধ্যে যে-সব বৃক্ষসমূহের নাম পাইয়াছি, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

চারিদিগে গড় করি সিজে মান্দারে।
দুর্গম করিল কেহ লঙ্ঘিতে না পারে॥

তার মধ্যে লাগাইল নানা মিষ্ট ফল।
রোপিল তমাল, তাল, শাল, সরল॥
নারাঙ্গ, কমলা রোয়ে সোলঙ্গ, শাকর।
মিঠা জাজী নানা কলা লাগায় বিস্তর॥

এইবার যূথী, মালতী, রক্তমল্লিকা প্রভৃতি নানারকম ফুলের কথা বলিব :

তাঁহার অন্তরে চাঁপা নাগেশ্বর।
রোপিল জবা, ধুতুরা পুজিতে শঙ্কর॥
সারি সারি রোপিল বকুল, শেফালিকা।
রোপিল বিবিধ শ্বেত রক্তমল্লিকা॥
জাতী, যূথী, মালতী লাগায় সারি সারি।
লাগাইল নানাবিধ লবঙ্গ, কস্তুরী॥
শ্বেত কৃষ্ণ করবী সে দেখিতে সুন্দর।
আর যত গন্ধ ফুল লাগায় বিস্তর॥

আর্টের দিক্ দিয়া এ-সমস্ত জিনিষের আলোচনা আমি করি নাই। তাই বলিয়া যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কবিদের একমাত্র এইগুলিই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, তবে তিনি ভীষণ ভুল করিবেন। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ জিনিষগুলি লইয়া কাব্যে এত সুন্দর মধুর বর্ণনা আর কোথাও দেখি নাই। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্'-এর দোহাই দিয়া যে-সব কবি আজকাল বাঙ্গালার বিকৃত প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেন, তাঁহারা একবার শত শত বৎসরের অন্ধকারের অতল-গহ্বরে যে-সব মণিমুক্তা লুকানো আছে, সেগুলির দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবেন, সুন্দরের খাতিরে সুন্দর-সৃষ্টি অপেক্ষা আরও একটি মহত্তর উপায়ে সুন্দরের সৃষ্টি করা যায়, যে সুন্দরের উদ্দেশ্য হইতেছে মঙ্গল-সাধন, অর্থাৎ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' জিনিষ কি, তাহা উপলব্ধি করা। সংস্কার লইয়া, সমাজ লইয়া, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লইয়া আমরা জীবনে আলোকাস্বাদ পাইয়া আসিয়াছি, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের চিত্তমোহন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সমস্ত বিরোধের মাঝখানে আমাদের অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলনের বেদগান উৎসারিত হইয়াছে প্রাচীন কবিকণ্ঠ হইতে। তাই আমরা শুনিতে পাই বিচিত্র ঋতু-বর্ণনার ভিতর, ফল, ফুল, লতাপাতার ভিতর, রন্ধন, বেশ-বিন্যাস, নৃত্যের ভিতর, সবগুলির মিশ্রণের একটি অনবদ্য ঐকতান—Unity in Diversity এবং ইহাই সমস্ত আর্টের শ্রেষ্ঠ আর্ট। শুধু রিপুর উন্মত্ততাকে কেন্দ্র করিয়া যে আর্ট সৃষ্টি করা হয়, সে আর্টের কোন সার্থকতা নাই। আর্টের উদ্দেশ্য সুন্দরের সৃষ্টি করা এবং শিব ও সুন্দর এক জিনিষ—এককে বর্জ্জন করিয়া অপরটি কোনমতেই সম্ভব নয়।

ইয়োরোপের ইতিহাস

...প্রায় এক হাজার বৎসর আগে সর্ব্বপ্রথমে ইয়োরোপের স্থানে স্থানে, মানুষের প্রয়োজনে যাহা যাহা লাগে, তাহার অনেক বস্তুর অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছিল এবং ঐ ঐ স্থানের মানুষ স্ব স্ব অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বিপৎসঙ্কুল রাস্তায় ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইতেছিলেন, কারণ ভারতবর্ষে যে জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য অত্যধিক, তাহা তখনও ইঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন।...

আধুনিক রাজনীতির প্রকৃতি

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গত এক মাসের মধ্যে ইউরোপে রাজনীতিক্ষেত্রে দুইজন বিশ্ব-বিখ্যাত রাজনৈতিক ধুরন্ধর (statesman) দুইটি বিরুদ্ধ মতবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন যে, কলেক্‌টিভিজমের দিন আর নাই, এক্ষণে ডিক্টেটরশিপের দ্বারা রাজ্য পরিচালিত করিতে হইবে। যাঁহার ঠোঁট হইতে এই মতবাদটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাঁহার নাম সিনর মুসোলিনী। তিনি এক্ষণে ইটালীর ডিক্টেটর।

অপর মতবাদটি স্যার এন্থনি ইডেনের ঠোঁটপ্রসূত। তাঁহার মতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার অমোঘ উপায় ডিমোক্রেসির সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠা। ইনি ইংলণ্ডের ফরেন সেক্রেটারী।

মতবাদের এই ঘাত-প্রতিঘাতে আধুনিক রাজনীতির প্রকৃতি কি, তদ্বিষয়ে আমাদিগের আলোচনা করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে।

অধুনা জগতের কোন্ রাজ্য কোন্ নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহার সংবাদ যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সোস্যালিজম্, বলশেভিজম্, কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্, এবং নাৎসিজম্ নামক পঞ্চবিধ রাষ্ট্রনীতির আলোচনা লইয়া মানুষের যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহারা আরও অবগত আছেন যে, জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে উপরোক্ত পঞ্চবিধ নীতি স্থান পাইবার আগে মনার্কিকাল গভর্ণমেণ্ট ও রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট নামক দ্বিবিধ নীতি মানুষের চালচলন দখল করিয়া বসিয়াছিল। এই সময় হইতে ডিমোক্রেসি নামক একটি শব্দও ভাল রকমে মানুষকে অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা আধুনিক রাজ্য-সংগঠনের ইতিহাসের (History of Constitution) সহিত সম্যক্ ভাবে পরিচিত আছেন, তাঁহারা ঐ সম্বন্ধীয় কেতাবগুলির কথা মনে মনে আওড়াইয়া লইলে স্মরণ করিতে পারিবেন যে, যখন মানুষের জিহ্বা এবং ঠোঁট মনার্কিকাল গভর্ণমেণ্ট, রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট ডিমোক্রেসির কথায় ব্যস্ত হইয়াছিল, তখন সোস্যালিজম্, বলশেভিজম্, কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্ এবং নাৎসিজম্ নামক শব্দগুলি মানুষের কথোপকথনে এতাদৃশ স্থান লাভ করিতে পারে নাই। রাজ্যসংগঠনসম্বন্ধীয় ইতিহাসের কেতাবগুলি আওড়াইয়া লইলে আরও দেখা যাইবে যে, যেদিন হইতে সোস্যালিজম্ প্রভৃতি মতবাদগুলি রাজনৈতিক ধুরন্ধর (statesman)দিগের জিহ্বার সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মনার্কিকাল এবং রিপাব্লিকান মতবাদ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। মুসোলিনী ও এন্থনি ইডেনের কথা হইতে আমাদের মনে হইতেছে যে, অতি শীঘ্রই আবার সোস্যালিজম্ প্রভৃতি পাঁচটি শব্দও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া তৎস্থলে "ডিক্টেটরশিপ" এবং "কলেক্‌টিভিজম্" নামক দুইটি শব্দ রাজনৈতিকগণের সুন্দর সুন্দর ঠোঁটগুলি পরিশোভিত করিবে।

রাজনৈতিকগণের ঠোঁটের কথা বারংবার বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদের মতে আধুনিক পলিটিসিয়ান্‌দিগের ঠোঁটই সর্ব্বাপেক্ষা পরিদ্রষ্টব্য, অর্থাৎ তাঁহারা পক্ষিবিশেষ। যাঁহারা আমাদিগের পার্থিব জীবন-যাত্রার সর্ব্ববৃহৎ নিয়ন্তা, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐজাতীয় কোন কথা আমাদের মনে মনে স্থান পাইলেও, তাহা পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করা কাহারও পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় নিরাপদ্ হইতে পারে কি? যদি পাঠকদিগের নিকট হইতে অভয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের ঠোঁট ও জিহ্বা যেরূপ কার্য্যক্ষম, মস্তিষ্ক তাহার শতাংশের একাংশও কার্য্যক্ষম নহে।

মনার্কি, রিপাব্লিক, ডিমোক্রেসি, সোস্যালিজম্, বলশেভিজম্, কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্, নাৎসিজম্, ডিক্টেটরশিপ, কলেক্‌টিভিজম্ প্রভৃতি নূতন নূতন শব্দের দ্বারা রাজনৈতিকগণের সাহিত্য কিছু দিন হইতে পরিশোভিত হইয়া আসিতেছে বটে এবং রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ (statesman) যখন ঐ সমস্ত বুলি আওড়াইয়া থাকেন,

তখন তাঁহারা নিজদিগকে যে এক একটি অসামান্য 'কেষ্ট-বিষ্টু' মনে করিয়া থাকেন, তাহারও সাক্ষ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যাহার জন্য মানুষের রাজনীতির প্রয়োজন, তাহার বিপর্য্যস্ততা ছাড়া উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই যে রাজনীতি এবং ঐ ত্রিবিধ অবস্থা যে ক্রমশঃই শঙ্কাজনক হইতে অধিকতর শঙ্কাজনক হইয়া পড়িতেছে, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না। যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, মানুষের যে অবস্থার উন্নতির জন্যই রাজনীতি, সেই অবস্থার উন্নতি হওয়া ত' দূরের কথা, তাহা ক্রমশঃই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন আমাদের রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ (statesman) তাঁহাদিগের চালচলনে যতই সুচতুর (smart) হউন না কেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক যে খুব কার্য্যক্ষম নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমাদের মতে, আধুনিক রাজনৈতিকগণের মস্তিষ্ক ক্রমশঃই অপটু হইতে অপটুতর হইয়া পড়িতেছে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা রাজনৈতিক সাহিত্যের মনার্কি প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলেও বুঝা যাইবে।

যাঁহারা শব্দবিজ্ঞান পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, ঐ শব্দসমূহের মধ্যে কোনটিরই বিজ্ঞান-সম্মত কোন পরিষ্কার অর্থ হয় না এবং রাজনীতিক্ষেত্রে বরং মনার্কি (রাজতন্ত্র) ও রিপাব্লিক (প্রজাতন্ত্র), এই দুইটি শব্দের একটা অস্পষ্ট অর্থ হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ডিমোক্রেসি, সোস্যালিজম, বলশেভিজম, কমিউনিজম ফ্যাসিজম, নাৎসিজম প্রভৃতি শব্দগুলির বিজ্ঞানসম্মত কোন রূপ অর্থ হওয়া সম্ভব নহে। ঐ শব্দগুলির বিজ্ঞান-সম্মত কোন অর্থ হউক আর নাই হউক, সুচতুর (smart) ষ্টেটস্-ম্যানদিগের কার্য্যতৎপরতার(activity) কোন বিরাম নাই এবং তাঁহারা এক এক জন উহার এক একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং প্রায়শঃ দুইটি ব্যাখ্যা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। এইরূপ ঠোঁট নাড়া-চাড়ার ফলে সোস্যালিজম, বলশেভিজম, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম এবং নাৎসিজম নামক শব্দগুলির অনেক ব্যাখ্যা গজাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাখ্যার কেবল মাত্র ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়া-চাড়া করা সম্ভব হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে মস্তিষ্কের বিশেষ কোন খাদ্য পাওয়া যায় না।

ঐ ঠোঁটের নাড়া-চাড়া হইতে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, মানুষ আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না এবং কোন একটি অলক্ষিত শক্তির প্ররোচনায় একটি নূতন রাষ্ট্রবিধির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অথচ মানুষ জানে না যে, সে কি চাহিতেছে এবং কীদৃশ রাষ্ট্রবিধিতে সে সন্তুষ্ট হইতে পারে।

মানুষ যে একটি নূতন রাষ্ট্রবিধির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা রাজ্যসংগঠনের ইতিহাস (History of Constitution) পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি নূতন রাষ্ট্রবিধির সন্ধানে মানুষ প্রবৃত্ত না হইত, তাহা হইলে অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক সাহিত্যে সোস্যালিজম, বলশেভিজম প্রভৃতি রাষ্ট্রীয়বাদের উদ্ভব হইত না।

কোন্ রাষ্ট্রবিধি যে সর্ব্বতোভাবে মানুষের সন্তোষজনক তাহা যদি মানুষের জানা থাকিত, তাহা হইলে মানুষ তাহার প্রবর্ত্তন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত এবং একে ত' তাহাকে নিত্য নূতন নূতন বিধির কথা কহিতে হইত না, তাহার উপর ঐ বিধিতে অধিকাংশ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার উন্নতি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইত। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এতগুলি ঠোঁটের এত অধিক নাড়া-চাড়া এত অহরহঃ হইয়া থাকে, অথচ যাহাতে মানুষের অবস্থা ক্রমশঃ শঙ্কাযোগ্য হইতে অধিকতর শঙ্কাযোগ্য হইতে থাকে, সেই রাজনীতির প্রকৃতি কি, তৎসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে পাঠকগণকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রকৃতির নিয়ম

রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া আধুনিক জগতের ভাবুকগণের মধ্যে যে অনেক মত-বিরোধ রহিয়াছে, তাহা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদিগের কথা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের কেহ বা সোস্যালিজমের কেহ বা বলশেভিজমের, কেহ বা কমিউনিজমের, কেহ বা ফ্যাসি-

জমের, কেহ বা নাৎসিজমের উপাসক। কেহ বলেন, কলেক্‌টিভিজম এবং ডিমোক্রেসী না হইলে বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে মনুষ্যসমাজের উদ্ধার পাইবার উপায় নাই, আর কেহ বলেন, জবরদস্ত ডিক্টেটর না হইলে দেশের অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্কটাপন্ন হইতে থাকিবে।

ডিমোক্রেসি-পন্থীদিগের কথাই ধরা যাউক, আর ডিক্টেটরী-পন্থীদিগের কথাই ধরা যাউক, কাহারও কথা যে সর্ব্বতোভাবে ঠিক নহে, তাহা 'ফলেন পরিচীয়তে'।

রাষ্ট্রনীতি ধরা যাউক, অথবা সমাজনীতি ধরা যাউক, অথবা যে কোন নীতিই ধরা যাউক না কেন, স্ব স্ব আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রভৃতি বিভিন্নবিষয়ক নীতির প্রয়াসী হইয়া থাকে। যখন ঐ বিভিন্নবিষয়ক নীতি যথাযথ হয়, তখন মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর যখন উহা ভ্রমাত্মক হয়, তখন মানুষের অবস্থাও উত্তরোত্তর পতিত হইতে আরম্ভ করে। কোন দেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতাদি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখা গেলে, সেই দেশের রাষ্ট্রপরিচালনা প্রভৃতির নীতি যে যুক্তি-যুক্ত, আর যে দেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতাদি হ্রাস পাইতে থাকে, সেই দেশের বিভিন্ন নীতি যে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে জগতে প্রত্যেক দেশেই যখন দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অভাব, পরমুখা-পেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন কোন দেশের রাষ্ট্রপরি-চালনার নীতিই যে সমীচীন নহে, তাহা মানিয়া লইতে হইবে।

কাজেই বলিতে হইবে যে, সোস্তালিজম প্রভৃতি রাষ্ট্র-পরিচালনা-বিষয়ক আধুনিক কোন মতবাদই ধোবে টেকে না এবং কোন্ ব্যবস্থায় মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা, অথবা মানসিক শান্তি, অথবা শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান আধুনিক ধুরন্ধরদিগের নিকট পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধি কিরূপ হইলে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে সঙ্কটজনক না হইয়া প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, তাহার কোন সম্পূর্ণ ভ্রমহীন বিজ্ঞান আধুনিক রাজনৈতিক ধুরন্ধরদিগের (statesman) দ্বারা লিখিত কোন গ্রন্থে অথবা জীবিত ধুরন্ধরদিগের ঠোঁট হইতে যে সমস্ত বাণী নিঃসৃত হয়, তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু চিরদিন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থা এতাদৃশ ছিল না।

রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধি কিরূপ হইলে জগতের প্রত্যেক মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ ভারতীয় ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর আগে তাঁহাদের বিবিধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থসমূহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে এখনও তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও ভ্রমহীন জ্ঞান পাওয়া যায়। ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এখন আর কেহ সর্ব্বতো-ভাবে বুঝিতে পারেন না বলিয়া, ঋষিদিগের প্রদর্শিত ঐ রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

"রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধি"র মূল মন্ত্র রহিয়াছে প্রধানতঃ অথর্ব্ববেদের তিনটি অধ্যায়ে, তাহার মূল সূত্র রহিয়াছে "গৌতমসূত্রে" এবং তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে মন্বাদি বিংশ সংহিতায়।

ভারতীয় ঋষিপ্রণীত রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধির মূল মন্ত্র, সূত্র এবং কারিকাসম্বন্ধীয় কথাগুলি অতীব বিস্তৃত এবং তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিপ্রসূত। তাহার মূল ভাগ চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যে সামর্থ্য হইলে সংস্কারাবদ্ধ বিক্ষিপ্তমনাঃ মানুষগুলিকে পর্য্যন্ত তাহা বুঝান সম্ভব হইতে পারে, সেই সামর্থ্য এই সন্দর্ভের লেখক উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। লেখকের এই অসামর্থ্যবশতঃ তাহার পক্ষে ভারতীয় ঋষির সমস্ত কথা সম্পূর্ণভাবে এই সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। অত্যধিক বিস্তৃতিবশতঃ উহার সম্পূর্ণ বর্ণনা কোন মাসিক পত্রে করা সম্ভব হইতে পারে না।

রাষ্ট্রপরিচালনা-বিধি কিরূপ হইলে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রযত্নে উদ্যত হইয়া পরমারাধ্য ঋষিগণ প্রথমেই রাষ্ট্র-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতির রূপ কি এবং রাষ্ট্রের অবস্থা ও জীবের অবস্থা কত রকমের

হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাটি মুখ্যতঃ মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋষিদিগের ভাষা যথাযথভাবে জানা থাকিলেও কেবলমাত্র মনুসংহিতা অধ্যয়ন করিলেই ঋষিদিগের উপরোক্ত আলোচনাটি সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। উহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে অন্ততপক্ষে অথর্ববেদের কিয়দংশ এবং গৌতমসূত্রের সম্পূর্ণাংশের সহিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের সাদৃশ্য কোথায় কোথায় রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়।

রাষ্ট্রের অবস্থা কত রকমের হয়, তাহা দেখাইতে বসিয়া ভারতীয় ঋষিগণ বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের জীবন যেরূপ প্রধানতঃ বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু এই চারিটি অবস্থায় বিভক্ত, সেইরূপ রাষ্ট্রীয় জীবনও প্রধানতঃ চারিটি অবস্থায় বিভক্ত।

বাল্যে মানুষের বিকাশ, যৌবনে তাহার বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যে তাহার ক্ষয় এবং মৃত্যুতে তাহার অস্ত এবং পুনরায় বিকাশ-প্রাপ্তির প্রযত্নের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মানুষের শরীর ও মন সর্ব্বোচ্চ পটুতা লাভ করে যৌবনে। যৌবনে সর্ব্বোচ্চ পটুতা লাভ করা সম্ভব হয় বলিয়া, আপাত-দৃষ্টিতে যৌবনই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যৌবনের অব্যবহিত পরে বার্দ্ধক্য অবধারিত হওয়ায় এবং বার্দ্ধক্যের অব্যবহিত পরে মৃত্যু অবধারিত হওয়ায়, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের পরিণতি যেরূপ অবনতিতে, বাল্যের পরিণতি সেরূপ তাহার বিপরীত দিকে হইয়া থাকে। বাল্যের অব্যবহিত পরে যৌবন অবধারিত হওয়ায়, বাল্যের পরিণতি উন্নতিতে। এই হিসাবে বাল্যকে মানুষের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় বলিতে হয়।

বাল্যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্ব স্ব শক্তি-বিষয়ে উন্নতিমুখী হইতে থাকে; কিন্তু যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাহা অবনতি প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুতে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আপাতদৃষ্টিতে বাল্যজীবন জ্ঞানহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু মানুষ বাল্যকালে ভাষা ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার যত অধিক পরিমাণে নির্ভুলভাবে শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহার পরবর্ত্তী জীবনে তাহা সম্ভব হয় না। বরং যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাহা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হইতে আরম্ভ করে।

যতগুলি দ্রব্যের নির্ভুল সংজ্ঞা অথবা ইন্দ্রিয়াদির যতগুলি নির্ভুল ব্যবহার বালক শিক্ষা করিতে পারে, যুবক ও বৃদ্ধ তাহা পারে না।

বালকের শিক্ষায় প্রায়শঃ ভ্রান্তির উন্মেষ হয় না; কিন্তু যুবক ও বৃদ্ধের শিক্ষা প্রায়শঃ ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

বালক যেরূপ নির্ভুলভাবে চাউলকে চাউল, আটাকে আটা, পুস্তককে পুস্তক বলিতে শিক্ষা করিয়া থাকে, যুবক ও বৃদ্ধের শিক্ষা তদ্রূপ হয় না। যুবক ও বৃদ্ধ প্রায়ই কাণাছেলেকে পদ্মলোচন বলিতে আরম্ভ করেন।

বালক পরমুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে চাহে এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়া থাকে

যুবক স্বভাবতঃ স্বাবলম্বী

বিভোর হইয়া নিজ কর্ম্মফলে প্রায়শঃ পরমুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হয়।

বৃদ্ধের পরমুখাপেক্ষিতার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

আপাতদৃষ্টিতে মৃতের সর্ব্ববিধ শক্তি অস্তমিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু যাঁহারা সত্ত্বা, আত্মা এবং শরীরের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের চোখে মৃতাবস্থায় আত্মা এবং শরীরের বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তখনও সত্ত্বার কার্য্যের অবসান হয় না। মৃতের সত্ত্বা অব্যক্ত। ঐ অব্যক্ত সত্ত্বা প্রতিনিয়ত আত্মা ও শরীরের প্রয়াসী হইয়া স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্ব পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ভ্রূণে পরিণতি লাভ করিয়া বালকরূপে ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার ইতস্ততঃ ঘুরাফিরা করাই সার হইয়া থাকে।

বালকের কোন অভাব থাকে না। তাহার প্রয়োজন অল্প এবং অল্পতেই সে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতিদেবী তাহাকে তাহার প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্য তাহার অভ্যন্তরে অনেক রকমের সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকেন; নতুবা, বালকের পক্ষে কেবলমাত্র মাতৃস্তন্যের দ্বারা দিনাতিপাত করা সম্ভব হইত না।

যুবকের অভাব যদিও অতি সামান্য, তথাপি সে নিজ কর্ম্মফলে সর্ব্বদা অভাব অনুভব করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই সে ক্ষুধার কাতরতা অনুভব করে।

বৃদ্ধের অভাব যুবকের অভাব হইতেও অধিক ; কারণ, এই বুঝি তাহার সমস্ত ভোগের অবসান হইয়া যায়, এতাদৃশ দুশ্চিন্তায় সে সর্ব্বদা আকুল হইয়া থাকে।

মৃতের সত্ত্বার যদিও মানুষের প্রধান জিনিষ যে আত্মা ও শরীর তাহারই অভাব উপস্থিত হয়, তথাপি তাহার কোন অভাববোধ থাকে না ; কারণ সে জড়পদার্থের মত।

বালকের প্রায়শঃ কোন অশান্তি অথবা অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু যুবক ও বৃদ্ধ প্রতিনিয়ত কোন না কোন অশান্তি ও অসন্তুষ্টির কারণে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। আর মৃতের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির সর্ব্ববিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও সে তাহা অনুভব করিতে পারে না, কারণ সে জড়।

যুবক ও বৃদ্ধের যত অধিক হারে অকালবার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু হইয়া থাকে, বালকের যতদিন পর্য্যন্ত বালকত্ব থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত অকালবার্দ্ধক্যের কোন কথাই আসিতে পারে না ; এমন কি, অকালমৃত্যুর হারও তত অধিক হইতে পারে না।

মৃতের সত্ত্বা, জড়পদার্থের ন্যায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকে বলিয়া অনবরত চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত হয়, কিন্তু তাহা সে অনুভব করিতে পারে না, কারণ সে জড়।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের জীবনে যেরূপ বিকাশ, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রগতভাবে মনুষ্যসমাজের অবস্থায়ও ঐরূপ বিকাশ, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

গত বার হাজার বৎসরের ইতিহাস কার্য্যকারণের শৃঙ্খলার সহিত যোগ্য ও সঙ্গতভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতে এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ কেন কি করিতেছে, তাহার প্রত্যেকটির কারণ অধিকাংশ মানুষই নির্দ্দেশ করিতে পারিত এবং প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের কোন আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি বিদ্যমান ছিল না।

এই সময়ে মানুষ অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইত, মানুষ ক্রমোন্নতিশীল ছিল এবং প্রায়শঃ মানুষের কোন রূপ অপরাধের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত না। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অপরাধের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত না বলিয়া, এই সময়ে কোন রাজ্যশাসনের প্রয়োজন হইত না। এই সময়ে শিক্ষা, শৃঙ্খলা-রক্ষা, অর্থোন্নতি এবং পরিচর্য্যা-বিষয়ক কেবলমাত্র একটা সমাজবন্ধনের দ্বারা মনুষ্যসমাজের পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছিল এবং তাহাতেই প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি তিরোহিত হইয়াছিল।

এই প্রাথমিক অবস্থার পরে জগতের ইতিহাসে একটি সময় পাওয়া যাইবে, যখন অধিকাশ মানুষের মধ্যে আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি সামান্য সামান্য মাত্রায় দেখা দিয়াছিল।

এই সময়েও মানুষ কেন কি করিতেছে, তাহার প্রত্যেক-টির কারণ অধিকাংশ মানুষই নির্দ্দেশ করিতে পারিত বটে এবং মানুষের কার্য্যশক্তিও প্রায়শঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু মানুষের লালসাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং প্রায়শঃ কেহ অল্পেতে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। এই সময়ে মানুষ প্রায়শঃ অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে অপরাধের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং মানুষের মধ্যে অপরাধের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া, কেবলমাত্র সমাজ-বন্ধনের দ্বারা কোন দেশের মনুষ্যসমাজকে পরিচালিত করা সম্ভব হয় নাই। প্রত্যেক দেশেই অপরাধীকে দণ্ড দিবার জন্য রাজশাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

মানুষ কেন কি করিয়া থাকে, তাহার কারণ অধিকাংশ মানুষই এই সময়ও নির্দ্দেশ করিতে পারিত বলিয়া, তখন যে-সমস্ত গুণ থাকিলে মানুষের উপর রাজত্ব করিবার সামর্থ্য হয়, সেই সমস্ত গুণ মানুষের পক্ষে উপার্জ্জন করা সম্ভব হইত এবং প্রত্যেক দেশেই রাজ্যশাসন করিবার উপযুক্ত রাজা পাওয়া যাইত।

উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা অতিবাহিত হইবার পর জগতের ইতিহাসে আর একটি তৃতীয় অবস্থা পাওয়া যাইবে, যে অবস্থায় মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি অপেক্ষাকৃত অধিকতর মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। এই তৃতীয় অবস্থায় মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু তখনও কোনও দেশে ব্যাপকভাবে অর্দ্ধাশন অথবা অনশন, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু দেখা দেয় নাই।

এই সময়ে কালের পরিবর্ত্তনবশতঃ জমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মানুষেরও কার্য্যতৎপরতার

হ্রস্বতা দেখা দিয়াছিল। মানুষের কার্য্যতৎপরতার হ্রস্বতা আসিয়াছিল বলিয়া, মানুষ অপেক্ষাকৃত অলস হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের কেন বিভিন্ন অবস্থার উদ্ভব হয়, প্রকৃতিতে কেন বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায় ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তখনও কোন কোন মানুষ পরিজ্ঞাত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার মত অধিকাংশ মানুষই আর ঐ তথ্য পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। এইরূপভাবে মানুষের জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই লালসা দ্বিতীয় অবস্থার তুলনায় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। লালসা এতাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার ফলে, মানুষের অপরাধ করিবার প্রবৃত্তিও অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জগতের ইতিহাসের তৃতীয় অবস্থায় উহার দ্বিতীয় অবস্থার তুলনায় মানুষের অজ্ঞান, অকর্ম্মণ্যতা, অলসতা এবং অপরাধপ্রবণতা এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তখন কেবলমাত্র সমাজবন্ধন দ্বারা মনুষ্যসমাজকে পরিচালিত করিতে পারা ত' দূরের কথা, ইতিহাসের দ্বিতীয় অবস্থায় যে রাজশাসন মনুষ্যসমাজকে শৃঙ্খলিত করিতে পারিয়াছিল, তৃতীয় অবস্থায় তদপেক্ষাও কঠোরতর রাজশাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই তৃতীয় অবস্থায় একদিকে যেরূপ কঠোরতর রাজশাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল, অন্যদিকে মানুষের অজ্ঞান, অকর্ম্মণ্যতা, আলস্য এবং অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাদিগের মধ্যে লোভহীন পরার্থপর উপযুক্ত রাজা পাওয়া দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, মনুষ্যসমাজের বিশৃঙ্খলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অধিকাংশ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে জগতের ইতিহাস তাহার তৃতীয়াবস্থা হইতে চতুর্থাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই সময়ে মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক এবং মানসিক অশান্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছে; জগতের সর্ব্বত্রই অধিকাংশ মানুষ অর্দ্ধাশন, অনশন, দাসত্ব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষের অজ্ঞান, অকর্ম্মণ্যতা, আলস্য এবং অপরাধপ্রবণতা চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। রাজশাসন স্বার্থপরতা এবং অর্থলোলুপতায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে ক্রমে রাজতান্ত্রিক শাসনের উপর মানুষের বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র প্রজার স্বার্থান্বেষী নির্লোভ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিপুণতা-সম্পন্ন রাজশাসন এই চতুর্থ অবস্থায় পাওয়া যায় না বলিয়া মানুষ প্রজাতান্ত্রিক শাসনের প্রার্থী হইয়াছে। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক শাসনে মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি কখনও দূরীভূত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, জগতের সর্ব্বত্রই মানুষ ঐ ত্রিবিধ অভাবে হাবুডুবু খাইতেছে। কাজেই, এই অবস্থায় মানুষ দিশাহারা হইয়া কোন্ রাষ্ট্রপরিচালনাবিধি যে তাহার মঙ্গলপ্রদ, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

জগতের ইতিহাসের এই চারিটি অবস্থাকে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় অবস্থার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং মৃতাবস্থা বলা যাইতে পারে।

এই চারিটি অবস্থা বিস্তৃতভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বাল্যাবস্থায় রাষ্ট্র একমাত্র সমাজবন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের যৌবনাবস্থায় রাজশাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং তখন প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মপরায়ণ ও কার্য্যক্ষম রাজা বিদ্যমান থাকেন। রাষ্ট্রের বার্দ্ধক্যাবস্থায় কঠোরতর রাজশাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং তখন প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মপরায়ণ ও কার্য্যক্ষম রাজার স্থলে লোভী ও অকর্ম্মণ্য রাজার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের মৃতাবস্থায় জগতের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তখন প্রজাতান্ত্রিকতার অন্বেষণ প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিকতায় কখনও মানুষের অভীষ্ট পূরণ সম্ভব হইতে পারে না।

মনুষ্যসমাজ যে রাষ্ট্রবিষয়ে মৃতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। অচিরে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। যে পরিবর্ত্তনে আবার মনুষ্যসমাজের সুপ্রভাতের অথবা রাষ্ট্রের বাল্যাবস্থার উদয় হইতে পারে, সেই পরিবর্ত্তন কখনও পাশ্চাত্ত্য সোস্তালিজম ও বলশেভিজমরূপী অখড্ডিম্বের দ্বারা যে হইতে পারে না, তাহা মানুষ অদূরভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে। উহার জন্য যাহা চাই, তাহা পাইতে হইলে, মানুষকে তাহার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে মিলিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে সাধনায় প্রবৃত্ত

ত হইবে। যে শক্তি মানুষকে আবার আলোকিত রিতে পারিবে, সেই শক্তি একক বটে, কিন্তু তাহা হিটলার বা মুসোলিনীর মত আত্ম-প্রতারক দাম্ভিক মানুষের মধ্যে থাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মানুষ যেরূপ অহঙ্কারে হইয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনে রত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে মুখ হইয়া সাধনারত হইলেই ঐ শক্তি আপনা হইতে স্ব-প্রকাশ করিবে।

এই অবস্থায় চাই কেবল অহঙ্কারী ও আত্মবিজ্ঞাপক-কে শাস্তি দিবার প্রবৃত্তি। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সমাজের মধ্যে ঐ প্রবৃত্তির উদ্ভব কবে দেখা যাইবে?

ষ্ট্রের বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের ভিন্ন কর্ত্তব্য

রাজনৈতিক অথবা রাষ্ট্রীয় সংগঠন কিরূপ হওয়া উচিত, হা লইয়া জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে আজকাল বিভিন্ন মতবাদ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা মরা আগে দেখাইয়াছি। এইসম্বন্ধীয় মতবাদ লইয়া জকাল যেরূপ মারামারি, কাটাকাটি ক্রমশঃই বৃদ্ধি ইতেছে, জগতের ইতিহাসে চিরদিন এতাদৃশ অবস্থা দেখা বে না। জগতে একদিন যে কেবলমাত্র মনার্কিক্যাল র্ণমেণ্টই বিদ্যমান ছিল, তাহার সাক্ষ্য আধুনিক ঐতি-সিকগণের ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে। মনার্কিক্যাল র্ণমেণ্টের পর রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে (political literature) পাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের নাম স্থান পাইয়াছিল। রি-ব্লিকান গভর্ণমেণ্ট দ্বিবিধ। এক শ্রেণীর রিপাব্লিকান র্ণমেণ্টের নাম অলিগারকিক (Oligarchic) এবং অপর টীর নাম ডিমোক্র্যাটিক (Democratic)। অলি-রকিক রিপাবলিক কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে যাঁহারা পরি-ত আছেন, তাঁহারা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, রাষ্ট্রপরিচালনাক্ষেত্রে মনার্কিক্যাল গভর্ণমেণ্ট ও অলিগারকিক পাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। মোক্র্যাটিক রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট যেরূপ সাধারণের নির্ব্বাচনের দ্বারা যে কেহ হইতে পারেন, অলি-রকিক রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট সেইরূপ যে হ হইতে পারিতেন না। মনার্কিক্যাল গভর্ণমেণ্টে যেরূপ রাজবংশসম্ভূত না হইলে কাহারও রাজা হওয়া সম্ভব নহে, সেইরূপ অলিগারকিক রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টে অভিজাত বংশসম্ভূত না হইলে কাহারও প্রেসিডেণ্ট হওয়া সম্ভব হইত না।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের আগে জগতের কোন কোন দেশে অলি-গারকিক রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু কুত্রাপি ডিমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে রাষ্ট্রীয় সংগঠনবিধি লইয়া মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীর মারামারি উত্থিত হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে সেই শ্রেণীর মারামারি তাহার আগে আর কখনও দেখা যায় নাই। পরন্তু ঐ মারামারি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মানুষ একটির পর একটি করিয়া একে একে সোস্যালিজম, বলশেভিজম, কমিউনিজম, ফ্যাসি-জম, এবং নাৎসিজম প্রভৃতি বাদের উত্থাপন করিয়াছে। আবার ডিমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের স্থলে ডিক্টেটরশিপের কথা জগতে দেখা দিয়াছে। এইরূপে মানুষ রাষ্ট্রীয় সংগঠন লইয়া নানা রকমের নূতন নূতন বাদানুবাদ উত্থাপিত করিতেছে বটে, কিন্তু মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক অবস্থার কোনই উন্নতি হইতেছে না। পরন্তু তাহা উত্তরোত্তর অবনত হইতেছে।

এতাদৃশ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় চালচলন কিরূপ হইলে মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা আশানুরূপ সন্তোষজনক থাকিতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়।

কোন বিষয়ে তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে না চলিয়া তৎসম্মতভাবে চলিলে অনায়াসেই মানুষের অবস্থা উন্নতিমুখী হইতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই, এতাদৃশ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় চালচলন কিরূপ হইলে আবার সর্ব্বত্র মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মে রাষ্ট্রের অবস্থা কত রকমের হইয়া থাকে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে রাষ্ট্রের অবস্থা কত রকমের হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি।

ঐ আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু আছে, সেই-রূপ রাষ্ট্রগত জীবনেও ঐ চারিটি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনের বাল্যে যেরূপ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ রাষ্ট্রগত জীবনের বাল্যেও মনুষ্যজাতির শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতে আরম্ভ করে এবং জগতের সর্ব্বত্রই অধিকাংশ মানুষ শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা উপভোগ করিতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনের যৌবনে যেরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, রাষ্ট্রীয় জীবনের যৌবনেও সেইরূপ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি ও আর্থিক প্রাচুর্য্য ক্রমশঃ উন্নতি পাইতে পাইতে পুনরায় অবনত হইতে আরম্ভ করে।

ব্যক্তিগত জীবনের বার্দ্ধক্যে যেরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, রাষ্ট্রীয় জীবনের বার্দ্ধক্যেও সেইরূপ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি ও আর্থিক প্রাচুর্য্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অর্থাভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনের মৃত্যুতে যেরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, রাষ্ট্রীয় জীবনের মৃত্যুতেও সেইরূপ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা যে কখন কিরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তৎসম্বন্ধে কাহারও সম্যক্ ভ্রমহীন ধারণা বিদ্যমান থাকে না। স্বাস্থ্য, শান্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা যে কাহাকে বলে, তাহার নির্ভুল ধারণা পর্য্যন্ত মানুষের বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মানুষ গরলকে অমৃত ও অমৃতকে গরল মনে করিতে আরম্ভ করে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেরূপ সত্ত্বা, আত্মা এবং শরীর লইয়া, সেইরূপ তাহার রাষ্ট্রগত জীবন জমি, জল-হাওয়া ও জীব লইয়া।

ব্যক্তিগত জীবনের সত্ত্বাকে রাষ্ট্রগত জীবনের জমির সহিত, আত্মাকে জল-হাওয়ার সহিত এবং শরীরকে জীবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত তাহার রাষ্ট্রীয় জীবনের সাদৃশ্য যখন এত অধিক, তখন ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের বিভিন্ন কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির করিতে পারিলেই যে তাহার রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্ত্তব্যও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রথমতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যাহাতে সুস্থ ও সবল হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ যাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, বালক অনায়াসেই সুস্থ ও সবল যুবক রূপে পরিণত হইয়া তাহার দীর্ঘ যৌবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কি ব্যবস্থা হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সবলতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা সম্পাদিত হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে একমাত্র সুশিক্ষার দ্বারাই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা সম্পাদিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যতই সুশিক্ষার ব্যবস্থা হউক না কেন, প্রাকৃতিক কারণে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপভোগের ইচ্ছা উদ্ভূত হয় এবং তাহার ফলে অল্পাধিক অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তিও দেখা দেয়। ঐ অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইলে, তাহা যে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা যাহাতে বালক ও যুবক জানিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে অল্পাধিক শাস্তির বিধান না করিতে পারিলে, কেবলমাত্র সুশিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা বালক ও যুবকের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বালকের সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতার আদর ও ভৎর্সনা এবং যুবকের সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রাণা পত্নীর সতৃষ্ণ চাহনি ও ছল-ছল চক্ষু, ব্যক্তিগত জীবনে বালক ও যুবকের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত করিতে ও বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সুশিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা বালকের ও যুবকের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা বৃদ্ধি করা এবং রক্ষা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু একবার বৃদ্ধ হইলে ঐ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রকৃতিবশতঃ ক্রমশঃই এত দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করে যে, যে ব্যবস্থায় ও শিক্ষায় বালকের ও যুবকের স্বাস্থ্য ও সবলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়, সেই ব্যবস্থায় ও শিক্ষায় বৃদ্ধের স্বাস্থ্য ও সবলতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পর যাহাতে অকালমৃত্যু-মুখে পতিত না হইয়া দীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পটুতা রক্ষা করা যায়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ সংসারের জটিলতায় যাহাতে বিব্রত না হইতে হয়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার অন্যদিকে মানুষের মৃত্যু কেন হয়, অর্থাৎ সত্ত্বা, আত্মা এবং শরীরের পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা কেন ঘটে, কি উপায়ে এই বিচ্ছিন্নতার কাল দূরে অপসারিত করা যাইতে পারে, তাহা যিনি শিখাইতে পারেন, এমন গুরুর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ঐশ্রেণীর গুরু পাওয়া সাধারণতঃ সহজসাধ্য নহে বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই বৃদ্ধগণ নানা রকমে বিব্রত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন।

মৃতের সত্ত্বা যাহাতে ক্লেশভোগ না করিয়া পুনরায় আত্মার সাহায্যে জড়তা হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তাহার জন্য যে কি ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা আজকাল প্রায়শঃ মানুষের পরিজ্ঞাত। এমন কি, অনেকেই মনে করেন যে, মৃত সম্বন্ধে কিছু করা মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু গবেষণা করিলে জানা যাইবে যে, সত্ত্বা, আত্মা এবং শরীর সম্বন্ধে যাঁহারা কর্ম্মতঃ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মৃতের সত্ত্বার জড়তা ঘুচাইয়া তাহাদের ব্যক্তিত্ব পাইবার সহায়তা করিতে পারেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সতেজ রাখিতে হইলে, সর্ব্বাবস্থাতেই সুশিক্ষা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুইটি ব্যবস্থার দ্বারা বাল্য ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের আকাঙ্ক্ষা এবং মৃতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করিবার আয়োজন করিতে হইলে, সত্ত্বা, আত্মা এবং শরীরসম্বন্ধীয় শিক্ষাগুরু ও শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইখানে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বাল্যাবস্থায় রক্ষিত হয় মাতা ও পিতার দ্বারা, যৌবনে পত্নীর দ্বারা, বার্দ্ধক্যে পুত্র ও কন্যার দ্বারা এবং মৃত্যুতে পৌত্র ও দৌহিত্র ইত্যাদি দ্বারা। ইঁহারা সকলেই জন্মাধিকারবশতঃ স্নেহ ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া থাকেন। সুশিক্ষিত মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্রের দ্বারা সংসারে যে শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, যাঁহারা জন্মাধিকারবশতঃ স্নেহ ও ভক্তিপরায়ণ নহেন, তাঁহাদের দ্বারা সেই শান্তি ও শৃঙ্খলা কিছুতেই ব্যবস্থিত হইতে পারে না।

ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ সুশিক্ষা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার প্রয়োজন সর্ব্বাবস্থাতেই হইয়া থাকে, অথচ বার্দ্ধক্যের আকাঙ্ক্ষা ও মৃতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র ঐ দুইটি বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বাবস্থাতেও সুশিক্ষা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু একমাত্র ঐ দুইটি ব্যবস্থার দ্বারাই বার্দ্ধক্যের ও মৃতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে।

মনুষ্যজাতির রাষ্ট্রীয় জীবন যখন বার্দ্ধক্য অথবা মৃতাবস্থায় উপনীত হয়, তখন সুশিক্ষা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনের বার্দ্ধক্যে ও মৃতাবস্থায় যেরূপ সত্ত্বা, আত্মা এবং শরীর-সম্বন্ধীয় শিক্ষাগুরু এবং শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে, রাষ্ট্রীয় জীবনের বার্দ্ধক্যে ও মৃতাবস্থাতেও সেইরূপ জমি, জলহাওয়া এবং জীব-সম্বন্ধীয় শিক্ষাগুরু এবং শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে যেরূপ জন্মগত প্রকৃতিসম্ভূত স্নেহ ও ভক্তিপরায়ণ সুশিক্ষিত পিতা, পত্নী ও পুত্র প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে, রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলেও সেইরূপ স্বভাবতঃ পরার্থান্বেষী সুশিক্ষিত রাজা অথবা অন্ততঃ পক্ষে তৎসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

জন্মগত প্রকৃতিসম্ভূত স্নেহ ও ভক্তিপরায়ণ সুশিক্ষিত পিতা, পত্নী ও পুত্র প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থিত হইতে পারে, সেই শান্তি ও শৃঙ্খলা যেরূপ কোন ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে, সেইরূপ রাজা অথবা প্রকৃত সাধকের দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনে যে শান্তি ও শৃঙ্খলার আয়োজন হইতে পারে, তাহা কেবলমাত্র নির্ব্বাচনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন প্রেসিডেণ্ট অথবা ডিক্টেটরের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হয় না।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন যখন মৃতাবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহার প্রয়োজন সম্পাদিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হয় :—

(১) ব্যক্তিগত জীবনের সুশিক্ষা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও সবলতা সম্পাদন করিবার শিক্ষা ;

(২) শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার ব্যবস্থা যাহাতে নির্লোভ, পরার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় রাজা অথবা সাধকের হস্তে নিপতিত হয় তাহার চেষ্টা।

(৩) দেশের মধ্যে যাহাতে জমি, জল-হাওয়া ও জীব-সম্বন্ধীয় নির্ভুল গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ঐ গবেষণা যাহাতে কার্য্যকরী হয় তাহার চেষ্টা।

মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন যে মৃতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

এই অবস্থায় যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ বর্ত্তমানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করুন।

মহা-সরস্বতী

শ্রী[illegible]শীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্ময়ী রূপে আছ সকলের মুখে মুখে মা গো।
জীবনের সুখে দুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগ তুমি জাগ ॥
হাসি হয়ে তুমি হাস কাঁদ তুমি নয়নের জলে।
দেখা দিয়ে দিয়ে যাও জীবনের প্রতি পলে পলে ॥
মানুষে মানুষ করি করিয়াছ তুমি মহীয়ান্।
বুকে বুকে আশা দিয়া মুখে মুখে ভাষা করি দান ॥
তোমারি আলোকে মা গো জানিয়াছি নিজেরে এবার।
আপনারে না জানার শাপ হতে করেছ উদ্ধার ॥
নিজেরে জেনেছি বলে নিজেরে জানাতে পারি তাই।
তোমারি ভিতর দিয়া মিলিয়াছি মোরা ভাই ভাই ॥
জানার যে মণি-দীপ জ্বেলে তুমি দিয়াছ মা বুকে।
সকলের পরিচয় তাই না পেয়েছি সুখে দুখে ॥
মানুষের ইতিহাস —সাম্রাজ্যের উত্থান পতন।
যুগে যুগে সভ্যতার নব নব কত সংস্করণ ॥
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আপনারে করি আবিষ্কার।
মানুষ আগায়ে যায় খুলে খুলে তব সিংহদ্বার ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বাজে তব মহিমার ভেরী।
যেদিকে ফিরাই আঁখি তোমারে মা সেই দিকে হেরি ॥
মানুষের মুখ দিয়া বেদ হয়ে যেই বীজ ঝরে।
মরে না মারে না কভু—অমর মা ওরা তোর বরে ॥
[illegible] হংসরূপে তোমারি বাহন।
বিশ্ব-চেতনার মাঝে নিশিদিন করে সঞ্চরণ ॥
থাকে না মানুষ তবু তার বাণী থাকে বিশ্বময়।
অনন্তের কানে কানে শত কণ্ঠে গায় তব জয় ॥
মতে মতে যে সংগ্রাম চলিতেছে থাহে নিরন্তর।
নিমিষে মা ধ্বংস হয়ে যেত এই বিশ্ব-চরাচর ॥
তুমি আছ তাই মা গো ভাল-মন্দে আছে সমন্বয়।
মতে মতে আছে লয় আছে মিল আছে পরিচয় ॥
জগতের নর-নারী মিলিয়াছে এক মধুচাকে।
সবারে পেয়েছে আজ সাধনায় পেয়ে এক মাকে ॥
অনুভব করিতেছে বুকে বুকে ভাষার সৌরভ।
বেদীপীঠে সবে পূজা করে মায়ের গৌরব ॥
বিশ্ব-চেতনার শতদল 'পরে লয়ে বীণাখানি।
যেমনি বাজাও সুর অমনি মা নব নব বাণী ॥
ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠে মুখে মুখে ফোটে যেন ফুল।
বর্ণে গন্ধে শব্দে রূপে এ জগৎ হয় মশগুল।
বিদ্যুতের মত মা গো চমকিছে তোমার চরণ।
চেতনার সূত্রে সূত্রে মনোবনে কর বিচরণ ॥
সবিতা-মণ্ডলস্থিতা বেদমাতা তুমি মা ভারতী।
বাক্যরূপে বিরাজিতা কণ্ঠে কণ্ঠে মহা-সরস্বতী।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

— শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণের জন্য তাই তারা গেল। হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অনুপমকে লইয়া সতু হইয়া গেল উধাও। বেশী দূরে কোথাও নয়, পাশের ঘরে,—যে ঘরে সতুকে বুকে করিয়া সীতা ঘুমান। বুকে অবশ্য সতুকে তিনি করেন সে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন, জাগিয়া থাকিলে ওসব সতু ভালবাসে না, শীতের রাত্রেও নয়। মানুষের বুক? যার মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য যন্ত্র টিপ্‌ টিপ্‌ করে আর ছোটছেলেকে নাগালের মধ্যে পাইলেই মানুষ যেখানে চাপিয়া ধরে প্রাণপণে, সেই মানুষের বুক? সতু কখনও ওসব বুককে প্রশ্রয় দেয় না। তবে অনুপমের কথা ভিন্ন। আর কোনদিন তো অনুপম তাকে বুকে পিষিবার জন্য ব্যাকুল হয় নাই।

বুকে পিষিয়া চুমা খাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিবার পর অনুপম বুঝিতে পারে, সতু এক অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক ছেলে, নূতন টাইপের পাগলা।

নাম জিজ্ঞাসা করার জবাবে সতু বলে, নাম? জানো, সীতাও আমার সঙ্গে এমনি করে।

তা বলি নি। তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি।

বলছি। সীতা রোজ এমনি করে। আটটা করে চুমু খেতে দেবে বলেছি, দিনে সব শোধ করে নেয়। রাত্তিরে চুপি চুপি ডাকে, সতু, ও সতু, ঘুমুলি? আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি, জবাব দিই না। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে খালি চুমু খায়। কি বলে জান? বলে, আরো ছেলেবেলা তোকে যদি পেতাম সতু! তোর মা যদি আরও ক'বছর আগে মরত সতু!

সোজা স্পষ্ট অনর্গল কথা! বয়স্ক মানুষের পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষা, এতটুকু ছেলেমানুষীর ছাপ নাই, কি যেন বুঝাইতে চায় সতু তাহাকে তার সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত, আজ বায়স্কোপ না গেলে জীবনটা মাটি হওয়ার মত অসঙ্গতিপূর্ণ দুর্ব্বোধ্য একটা ব্যাপার।

অনুপম কথা বলিতে পারে না, বলার সুযোগও ঠিক মত পায় না। সতু পাল্টা প্রশ্ন করিয়া তার নাম জানিতে চায়।

অনুপম বলে, তোমার নাম আগে বল, তবে বলব।

বললাম যে নাম?

কখন বললে?

ওই যে বললাম, রাত্তিরে সীতা চুপি চুপি ডাকে, সতু, ও সতু ঘুমুলি? নাম বলব বলেই তো ওকথা বললাম। তোমার একদম বুদ্ধি নেই।

তাই মনে হয় অনুপমের। মনে হয়, এই বয়সেই মনোবিকারের ফলে বুদ্ধির এমন বিকাশ ঘটিয়াছে ছেলেটার যে, তুলনায় তার নিজের বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, যা আছে সেটা শুধু বোকামি গোপন করার কায়দা।

সীতা আসিলেন। বলিলেন, তোমরা এ ঘরে চুপি চুপি গল্প করছ! কি আশ্চর্য্য মন মানুষের! আমি ভাবলাম, দুজনে গেল কোথায়? এটা আমার শোবার ঘর, আমি আর সতু ওই খাটে শুই। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও শুতে পারে না। একবার আমার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার কাছে শুতে বারণ করলে, ও শুলো গিয়ে তোমার বৌদির কাছে। রাত দুপুরে চুপি চুপি উঠে এসে—

সতু দু'হাতে শক্ত করিয়া অনুপমের একটা হাত ধরিয়া ছিল, হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, জানো, সীতা খালি মিথ্যা কথা বলে।

সীতা তীব্র ভৎ'সনার সুরে বলিলেন, মিথ্যা কথা বলি! তুই কিরে সতু, এঁ্যা, যা তা বলছিস আমার নামে? রাত দুপুরে উঠে আসিসনি সেদিন তুই?

সতু অনুপমকে চোখের ইসারা করিয়া বলিল, এসেছিলাম তো।

তবে?

সতু নির্ব্বিকারভাবে বলিল, কি হয় এলে?

সীতা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, একমুহূর্ত্তে নরম হইয়া গিয়া নিজের মৃদু ও মার্জ্জিত গলায় বলিলেন, তাই বল! এক এক সময় তোর কথা শুনে গায়ে যেন জ্বর আসে।

হঠাৎ অনুপমের একটা আশ্চর্য্য কথা মনে হয়। মনে হয়, তার সীতা পিসীমা তার পরিচিতা কোন একটি মহিলাকে

যেন নকল করিতেছেন। কিন্তু কে যে সেই পরিচিতা মহিলা, অনুপম কোনমতেই তাহা স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না।

ঘণ্টা তিনেক কোন রকমে কাটান গেল, তারপর অনুপমের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। এ বাড়ীতে অকারণে মানুষের মনে বড় কষ্ট। কোন অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব গিয়াছে বিগড়াইয়া, জীবনে রস কষ যা আছে সব শক্ত, জমজমাট, যেমন-তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসাল করিতে চায় না। কোন্ দৃষ্টিতে ইহাদের দেখিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনুপম শেষ পর্য্যন্ত অপরিচয়ের সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। জহরলালের মাকে কারও মা মনে করিতে তার রীতিমত কষ্ট হয়। মুখে তিনি এখনও ক্রীম পাউডার মাখেন বলিয়া নয়, সাজগোজে এখনও তিনি নিজের অপূর্ব্ব রূপশ্রী নষ্ট করেন বলিয়া নয়, নিজের চারিদিকে একটা গভীর বিষাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নিজের চরম স্বার্থপরতাকে তিনি পরিস্ফুট করিয়া রাখেন বলিয়া। তার দৃষ্টি বিষণ্ণ, কথা বিষণ্ণ, মুখের ভাব বিষণ্ণ, বিষণ্ণতার ভাবের মন্থর ও ভারাক্রান্ত তাহার চালচলন, ভাবভঙ্গি।

প্রথমে শোকের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি যখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একমাত্র তাকেই অনুপমের মনে হইয়াছিল প্রকৃত শোকাতুরা, কিন্তু জিনিষটা খাঁটি মনে হইলেও বিষাদের বাড়াবাড়িতে সে একটু ক্ষুণ্ণ ও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তারপর ধীরে ধীরে সকলের ব্যথিতভাব কাটিয়া যাইতে লাগিল, এ-কথা সে-কথায় চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল অনুপমের পিতার মৃত্যুর কথা, এই সংসারের যে নিজস্ব গতিটি আছে সেই গতি কম বা বেশী সময়ের জন্য দাবী করিতে লাগিল এ-কে আর ও-কে, আকাশ-পাতাল যাতায়াত করিতে লাগিল যারা অনুপমের আশে-পাশে রহিল তাদের মুখের আলোচনা, কিন্তু জহরলালের মার কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বীরেশ্বরের কথায় কয়েকবার সকলে যখন হাসিয়া পর্য্যন্ত উঠিল, তখনও তিনি হইয়া রহিলেন নিরবিচ্ছিন্ন বিষাদের প্রতিমা। রাত্রির অন্ধকারে ঘরের যে অন্ধকার কোণ মিশ খাইয়া গিয়াছিল; দিনের আলোতেও সে কোণ হইয়া রহিল অন্ধকার: বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট।

এ সব অনুপমের কেন চাপিয়াছিল বলা যায় না, একবার সে বলিয়াছিল, আপনাকে প্রণাম করা হয় নি।

বলিয়া জহরলালের মাকে করিয়াছিল প্রণাম।

জহরলালের মা বলিয়াছিলেন, আমাকে আবার প্রণাম!

আর কেউ নন তিনি, কাকীমা। সে হিসাবে অনুপমের প্রণাম শুধু তার প্রাপ্য নয়, গ্রহণীয়। কিন্তু তার মধ্যে অনুপমের প্রণামের প্রতিক্রিয়া আর তার মুখের কথা শুনিয়া কে বলিবে পথের ভিখারিণী তিনি নন, পয়সার বদলে প্রণাম পাইয়া তিনি মরিয়া যান নাই মরমে!

অনুপমের মনে হইতে লাগিল, প্রণাম সে করে নাই জহরলালের প্রণম্য মাকে, মরা একটা মানুষকে খাঁড়ার ঘা দিয়াছে।

জহরলালের মার এই খাপছাড়া চিরস্থায়ী বিষাদ অনুপমের মন-কেমন করাকে আরও বেশী বাড়াইয়া দিয়াছে। তিন ঘণ্টায় তিন শ বার তার মনে হইয়াছে পলাইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু যাওয়ার কথা বীরেশ্বর কাণে তুলিতে চান না, হাসিয়া উড়াইয়া দেন। আর দেন খোঁচা। এ কি পরের বাড়ী যে যাওয়ার জন্য অনুপম ব্যাকুল?

তা নয়, কাজ আছে।

কি কাজ? কলেজ আজ তোমার যাওয়া হবে না।

কলেজ নয়, বাড়ী যাব।

সে তো আমিও যাব। বেলা পড়ুক, দুজনে মিলে যাওয়া যাবে এক সঙ্গে।

আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন?

হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়াই অনুপম লজ্জা বোধ করে। তার প্রশ্নের মধ্যে বীরেশ্বরের এতকাল তাদের বাড়ী না যাওয়ার ইঙ্গিতটা এমন কদর্য্য শোনায় বলিবার নয়।

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলেন, তোর বাবা আমাকে তোদের বাড়ী যেতে দিত না অনু।

এটা ঠিক কি ধরণের কৈফিয়ৎ ঠাহর করিতে না পারিয়া অনুপম চুপ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বীরেশ্বর, জহরলাল, অনুপম আর সতু চারজনে যখন অনুপমের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, রোদ পড়িয়া আসিয়াছে।

জহরলালের আসিবার ইচ্ছা ছিল না, বীরেশ্বর তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছেন। সতুকে কারও সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা ছিল না, সে জোর করিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

রঙ-চটা সদর দরজা, খড়ি দিয়া নম্বর লেখা, তাও কাঁচা হাতের। বাড়ীর বাহির হওয়ার সময় হইতে জহরলাল অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বড় রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া গলিতে প্রবেশ করার পর সে অস্বস্তি হু হু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নোংরা গলি বলিয়া নয়, গরীব আত্মীয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া। একটি গরীব বন্ধু ছিল জহরলালের, একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই গরীব বন্ধুটি। সে অভিজ্ঞতা জহরলাল জীবনে ভুলিবে না। গরীব বন্ধুটি কিন্তু তার বাড়ীতে আসিয়া চমৎকার মিশ্‌ খাইয়া যাইত সকলের সঙ্গে, যেটুকু মিশ্‌ খাইত না সেটুকুও আপশোষ করার মত কিছু নয়। কিন্তু গরীবের অন্তঃপুরে জহরলাল বিদেশী, বেমানান। কথা ও ভদ্রতার আদান-প্রদানে সেখানে নিজেও সে হোঁচট খায় বারবার, অন্যান্য সকলকেও হোঁচট খাওয়ায়। গরীব মানুষকে বড় ভয় করে জহরলাল, গরীব মানুষের অন্দরমহলে সে জেলখানার কয়েদী, আধ ঘণ্টা সেখানে থাকিলে তার নিজেকে বাড়ীর ছেলেবুড়ো সকলের ঘৃণা মেশানো কৃপার পাত্র বলিয়া মনে হইতে থাকে।

কড়া নাড়িতে অনুপমের মা সাধনা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিবামাত্র বীরেশ্বরকে তিনি যে চিনিতে পারিয়াছেন সেটা এমন স্পষ্ট বোঝা গেল যে অনুপম কথা বলা দরকার মনে করিল না। সাধনা মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন, সকলের প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন, তারপর একপাশে সরিয়া বলিলেন, আসুন।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া জহরলাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মনে মনে সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল নোংরা সেঁতসেঁতে একটা বাড়ীর, যেখানে বাতাসে মেশানো থাকে ভোঁতা দুর্গন্ধ, মানুষের মুখে থাকে ব্যর্থ লোভের ছাপ, চারিদিকে ছড়ানো থাকে ভাঙ্গা জীবনকে জোড়াতালি দিয়া দিন কাটানোর আয়োজন। এবাড়ীর উঠান ভিজা কিন্তু সেঁতসেঁতে নয়, এবাড়ীর বাতাসে গন্ধ শুধু রান্নার, এবাড়ীর মানুষের মুখে ছাপ শুধু অভাবের, এবাড়ীতে দিন কাটানোর আয়োজন শুধু কম দামী।

তাছাড়া এত ছোট একটা বাড়ীতে এত তুচ্ছ সব আসবাব ও জিনিষপত্রগুলিকে কেহ যে এত যত্নে গুছাইয়া রাখিতে পারে জহরলালের সে ধারণা ছিল না। মেঝের যেখানে যে জিনিষটি থাকার কথা সেইখানে সেই জিনিষটি রাখা হইয়াছে, এক চুল এদিক ওদিক নয়। জানালার জিনিষ আছে জানালায়, তাকের জিনিষ আছে তাকে, দেয়ালের জিনিষ আছে দেয়ালে,—দেখিলেই বুঝা যায় সর্ব্বদা একটি সতর্ক দৃষ্টি এই ছোটবড় স্থাবর পদার্থগুলিকে পাহাড়া দেয়, জানালায় পাণের ডাবরের ডানদিকে রাখা কুচানো সুপারির ছোট পিতলের বাটিটি যেন বাঁ দিকে কখনো না আসে তাই দেখিবার জন্য।

বসিতে দেওয়ার জন্য মাদুর বিছানোর সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, এ সতর্ক দৃষ্টি কার।

রোগা লম্বা একটি মেয়ে মাদুরটা বিছাইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানো মাত্র সাধনা বলিলেন, অদ্ধেক মাদুর যে ভাঁজ হয়ে রইল নিমি ?

ভাঁজ খুলিয়া মাদুরটা টান করিয়া পাতিয়া দিয়া নিমি সোজা হইয়া দাঁড়ানো মাত্র সাধনা আবার বলিলেন, অতগুলি দেশলায়ের কাঠি আবার ঘরে এল কোত্থেকে ? কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে আয় বাইরে।

তিনটি পোড়া দেশলায়ের কাঠি কুড়াইয়া নিমি আবার যেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সাধনা আবার বলিলেন, ইনি তোর ঠাকুর্দ্দা নিমি, প্রণাম করে যা।

বলিয়া এতক্ষণ পরে নিজেও বীরেশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

এত যত্নে মাদুর পাতা হইল, কিন্তু বীরেশ্বর ছাড়া মাদুরে কেহ বসিল না। ঘরে ছোট একটি টুল ছিল, সেটাতে বসিয়া জহরলাল উসখুস করিতে লাগিল আর সতু বেড়াইতে লাগিল ঘরের সর্ব্বত্র। বসানর চেষ্টা করিয়াও তাকে বসাইতে পারা গেল না। সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, বড় অবাধ্য ছেলে তো।

হঠাৎ রাগে জহরলালের গা যেন জ্বলিয়া গেল। জোরে ধমক দিয়া সে বলিল, বসলি সতু ? কাণ মলে ছিঁড়ে ফেলব তোর।

সাধনা বলিলেন, আহা, অমন করে ধমকাতে আছে ওইটুকু ছেলেকে ? হঠাৎ একবার ধমক দিয়ে মায়ের কমলেই

কি ছেলেপিলে বাধ্য হয় বাবা? বাধ্যতা শেখাতে হয়। স্বভাব নিয়ে তো জন্মায় না ছেলেমেয়ে, চারদিকে যারা থাকে তারা তার স্বভাব গড়ে তোলে।—ওমা, ধমক খেয়ে ও যে হাসছে!

বীরেশ্বর বলিলেন, হাসি ওর একটা ব্যারাম, ধমকালেও হাসে, না ধমকালেও হাসে।

এমন ছেলে তো দেখিনি কখনো!

বলিয়া সাধনা বোধ হয় ভাল করিয়া দেখিবার জন্যই সতুকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একবার তার মুখখানার দিকে চাহিয়া সতু ছিটকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, খুব দুরন্ত, নয়?

বীরেশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ

বীরেশ্বরের এই জবাবে ঘরের মানুষগুলির কথা বলার সব প্রয়োজন যেন ফুরাইয়া গেল, কারও কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, কারও কিছু জবাব দিবার নাই। এরকম অব

আরও সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছে, তার বন্ধু-পরিবারের গৃহে। কিন্তু সে সব পরিবারে তাল সামলানোর মানুষ থাকে। হয় বাড়ীর গৃহিণী, নয় তার পাকা-পোক্ত মেয়ে মৃদু একটু হাসে, খাপছাড়া একটা কথাকে যেখান হইতে পারে টানিয়া আনিয়া আলাপে জুড়িয়া দেয়, স্বাভাবিক স্তব্ধতার বাধাকে ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকে সকলের কথোপকথন।

? আজ কে এই আত্মীয়-আত্মীয়ার বৈঠকে আলাপের ভূমিকা রচনা করিবে? আজ যখন প্রথম সংবাদ পাইয়াছেন, ধরিতে গেলে আজই বীরেশ্বরের ছেলে মরিয়া গিয়াছে,—কয়েক ঘণ্টা আগে। সেই ছেলের বিধবাবেশ-ধারিণী বধূর সামনে বসিয়া তার পক্ষে আজ কি বলা সম্ভব? বলার কথা অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সে সব কথা মানুষকে রাখিতে হয় নেপথ্যে, কারণ, হৃদয় চিরদিন নেপথ্যবাসী, হৃদয়ের কথা বাহিরে আনা ছেলেমানুষী কাজ।

সাধনা বলিলেন, আপনার শরীর ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, বাবা।

বীরেশ্বর বলিলেন, শরীর দুর্ব্বল হবার বয়সে এসে পৌঁছেছি, মা। তবু যা সবল আছি তাতেই ভাবনা ধরেছে, আরও কতকাল এ পারে আটকে থাকব।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি তো আমার ঠিকানা জানতে বৌমা, আমাকে একটা খবরও দিলে না?

সাধনা নতমুখে বলিলেন, বারণ করে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলিলেন, তুমি তো গোড়া থেকে সব জান বৌমা, তোমার স্বামীর কাছে আমি কোন অপরাধ করিনি। অপরাধ যদি করে থাকি, তার মার কাছে করে-ছিলাম। তবু শেষ সময়েও আমায় সে ক্ষমা করে যেতে পারল না?

সাধনা বলিলেন, তা নয় বাবা। তিনি বলে গিয়েছিলেন, সারাজীবন আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, এ খবরটা গোপন রাখাই ভাল।

অকারণে! বীরেশ্বর সোজা হইয়া বসিলেন।

তাই ন। আমিও ভেবে দেখলাম, এই বয়সে আ

খবরটা পাবার আগেই হয় তো আমি চোখ বুজতে

ভেবে তুমিও চুপ করে ছিলে, না বৌমা?

মনে হয় বীরেশ্বর রাগ করিয়াছেন। এক বছর তাঁহাকে পুত্রশোকের স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। সাধনা কথা বলিলেন না। জহরলাল শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার বীরেশ্বরের দিকে একবার সাধনার দিকে চাহিতে লাগিল। অতীতের গহ্বর হইতে কিসের যেন আবির্ভাব ঘটিয়াছে এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে, এতকাল মানুষের হৃদয়কে যা পেষণ করিয়াছে, কয়েকটি সম্পর্কিত মানুষের হৃদয়। অনুপম ও নিমি ঘরে ছিল, তাদের জহরলাল দেখিতে পাইল না, ওরা অশরীরী অতীতের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বীরেশ্বরের রাগ যদি হইয়া থাকে, অনুপম যখন তাদের বাড়ীতে খবরটা দিয়াছিল তখন রাগ হয় নাই কেন? অনুপমের মার উপর রাগ করিবার কি কারণ আছে বীরেশ্বরের?

বীরেশ্বর দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি কলেজে পড়েছিলে, না বৌমা?

হ্যাঁ।

এতদিন সংসারে বাস করছ, একা এতকাল সংসার চালিয়ে এলে, সাংসারিক জ্ঞানও তো তোমার আছে? তুমি তো বুদ্ধিমতী?

একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

করব না ? নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে তুমি কতগুলি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছ, ভাবতে পার ? একটা খবর পেয়ে শেষ সময়ে আমি যদি আসতে পারতাম, একদিনে পঁচিশ বছরের গণ্ডগোল মিটে যেত। ছেলের শোক ? কিসের শোক আমার ? ছেলে আমার যেখানে গেছে আজ বাদে কাল আমি সেখানে চলে যাব। তার চেয়ে আমার ভুলটা সংশোধন করার সুযোগ দিলে কি তুমি আমাকে বেশী দয়া দেখাতে না বৌমা ?

সাধনা তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন, তা হ'ত না বাবা।

হ'ত না ? কেন হ'ত না ?

সাধনা চুপ করিয়া থাকেন, জহরলাল অসহায়ের মত বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এবার কি করিবেন বীরেশ্বর ? তিয়াত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া আজ কি বীরেশ্বর ধমক দিবেন পঁচিশ বছর যে ছেলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না সেই ছেলের মাঝবয়সী স্ত্রীকে ? একি কলহ আজ বাধিয়া গেল এদের !

বীরেশ্বর আবার বলিলেন, ছেলেমানুষী কোরো না বৌমা। কেন হ'ত না স্পষ্ট করে বল।

বলে কি হবে বাবা ? অনর্থক মনে কষ্ট পাবেন।

তুমি বুঝি ভেবেছ, মনে আমি কোনদিন কষ্ট পাইনি, তুমি যে কষ্ট দেবে সইতে পারব না ? আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও, তোমার যা বলবার আছে তাই বল সোজা ভাষায়, আমি হাত জোড় করছি তোমার কাছে।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি হতে দিতাম না বাবা।

তুমি হতে দিতে না ?

না। হতে দিতামও না, কোন দিন দেবও না।

বীরেশ্বর ঝিমাইয়া পড়িলেন। জহরলাল জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিতে পাইল, কাদের দোতালা বাড়ীর উপরের ঘরের একটি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া শেষ-বেলার রোদ এ বাড়ীর ভিজা উঠানের সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে এইমাত্র নিমির সমবয়সী একটি বিধবা মেয়ে এঁটো বাসন মাজিতে বসিল।

জাতীয় কবি

শ্রীকানাইলাল দেবশর্ম্মা

গৃহস্থের মাটির প্রদীপে
ভরে নাই নয়ন তোমার।—
নক্ষত্রের আলোকেতে তুমি
দু'চোখ ভরিয়া কবি
অরূপের প্রেমিক-পিয়াসী।
ধূসরিত ধরণীর ক্লান্ত পথ ত্যাগি'
—পিছে ফেলি' শোক-দুঃখ-তাপ, হে বিরাগি !
কোথা' তব স্বপ্ন-অভিসার ?
দীনহীন এই পলায়ন ?
বেদনার উৎস-মুখ হ'তে—
কোথা তুমি, কোন্ অন্ধকারে
লিখিতেছ নব-রামায়ণ ?

এত দুঃখ, এত ব্যথা, এত অভিযোগ—
নাহি যেন কোন প্রতিকার ;
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার ক্ষুব্ধ হাহাকার।
এক কণা খাদ্যশস্য তরে,
এক ফোটা আলোকের লাগি,
হেথাকার মানব-মানবী—
ভুলিয়াছে আত্মা, ভগবান্ !
হেথা হ'তে আজি বহুদূর,
কোথা' কোন্ কল্পস্বর্গপুরে,
গাহিতেছে মধুচ্ছন্দ-গীতি
পুলকিত হরষিত লয়ে
মৃত্যুহীনা রূপসীরা
তব লাগি স্তুতি সপ্তসুরা ?

রহিয়াছে কনক-মালিকা
কোন্ লক্ষ্মী, কোন্ মন্দালিকা ?

বিত্তহীন হেথাকার লোক
শুধু আছে মর্ম্মভরা অন্তহীন শোক।
প্রতিদানে দিতে পারে
অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞ অঞ্জলি ;
ভগ্নকণ্ঠে, রুদ্ধ ভাবাবেগে
গাহিবারে পারে কবি,
তোমার জয়ের গান, ব্যথার পূরবী।
ধরার ধূলার 'পরে
আসিলে নামিয়া
এই মাত্র তব পুরস্কার।
নহে অর্থ, নহে বিশ্বযশঃ—
গরীবের অ-মূল্য সম্পদ্
অশ্রু আছে শুধু।

তা'ই কর কবি,
আপনারে লয়ে বুঝি
কল্পনা-সম্ভোগ, রূপ-কণ্ডূয়ন !
অরূপের স্তবে মুগ্ধ কবি,
আঁকিতে পার নি কভু
হৃদয়ের আরক্ত রেখায়
কদাকার কুরূপের ছবি ?
আকাশের ছায়াপথে, সীমান্তের পানে
সঁপি দিলে সব কাব্য-গানে ?
তোমার ধরণী শুধু করিছে ক্রন্দন—
তুমি যবে খুঁজিতেছ দেবের নন্দন।
হে কবি, হে মাটির কবি !

অমৃতের লভেছ সন্ধান ?
মিটাইতে ধরণীর ক্ষুধা
জিনিবারে চলিয়াছে—পরিপূর্ণ জীবনের সুধা ?
সহিবারে পার নাই বুঝি :

বিধবার অগ্নিকল্পদাহ,
অনাথার বুকভাঙ্গা করুণ ক্রন্দন,
ক্ষুধাক্ষিপ্ত পশ্বাধম নর,
সমাজের এত ব্যভিচার !
দর্পিতের অত্যাচার !
মুমুক্ষুর অসহ্য বন্ধন !

দুর্গন্ধ, দুর্বহ এই
ক্লান্তক্লিন্ন অন্ধকার ভেদি'
ওঠে না তো কোন বজ্রস্বর ?
কোথা' তুমি নীলকণ্ঠ কবি—
কোথা' শক্তিধর ?
কবিকুল কেন মৌন আজি ?
কোথা' তব আবির্ভাব ? অন্ধকার উদয়ের তীর
মোদের ব্যথার গান বাজিল না মন্ত্রে মন্ত্রে
দেশের পরাণ-মাঝে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
হলো না তো ধ্বনিত-স্পন্দিত।
এ কী অমঙ্গল !

আশা নাই শক্তি নাই,
নাহি কোথা' পুণ্যের আলোক।
সব চেয়ে বিষম বিপদ্—
তুমি নাই।
নাই তব বরাভয় বাণী
জানাতে দেশের জনে ;
নাই তব কবিতা-কুসুম
পূজিবারে গরীবের ক্ষুদ্র দেশবাণী।
সুচিরকালের তুমি অমর ঋত্বিক্,
নবীনের জন্মদাতা পিতা !
তুমি গেলে শূন্যে হারাইয়া
হেথা' শূন্য পুণ্য যজ্ঞপীঠ
কে রচিবে মৃত্যুমুখী মানবের গীতা ?

পুস্তক ও পত্রিকা

ঘরে বাইরে—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। ভারতী ভবন। ২৪।৫এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲ টাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৮ ফর্ম্মা। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বই পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। পরিচয় দিতে হইলে তাহা বর্জ্জাইস্ অক্ষরে পুস্তক-পত্রিকা বিভাগের ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া চলে না, তাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিতে হয়। তিনি এ পর্য্যন্ত অনেক বই লিখিয়াছেন—অধিকাংশ প্রবন্ধ, কিন্তু গল্পও অনেক আছে। "চারইয়ারী কথা"র কথা কোন্ বাঙ্গালী সাহিত্যিক ভুলিতে পারে? তাঁহার লেখা শাণিত ইস্পাতের তৈয়ারী তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত, রৌদ্রে ঝলসিয়া উঠে, মনে হয় বিজলী খেলিয়া গেল। এক সঙ্গে বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার এমন সমাবেশ বাঙ্গালীর বেশী দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের জরীপ যখন করা হইবে, তখন এ ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয়ের দখল জমি কতখানি তাহার বিচার হইবে।

এই পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—পৃথিবীতে নানা রকম ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিত্য ঘটে। তার মধ্যে কতকগুলো বিশেষ ক'রে লোকের চোখে পড়ে, আর সেই সঙ্গে আমাদের নানারূপ ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক করে। ...১৩৪০ বঙ্গাব্দে চোখে পড়বার মত নানারূপ ঘটনার বিষয় আমি 'উদয়ন' পত্রিকায় আমার মোৎ-ফরক্কা মতামত প্রকাশ করি। সেই পূর্ব্ব লেখাগুলি একত্র করে আমি পুস্তিকা-আকারে প্রকাশ করছি।

মুক্তাডুবুরী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। বাগচী এণ্ড কোং, ৭২ হ্যারিসন রোড (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা। দাম দশ আনা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০৪ পৃষ্ঠা। শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র সম্বলিত। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ।

সুন্দর ঝরঝরে মুক্তার মত ভাষাতে মুক্তাডুবুরীদের জীবনী গল্পের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ছবি দেখিতেছি। বইখানি পড়িতে পড়িতে ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে, বইয়ের কাহিনীকে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছি। শিশুসাহিত্যে লেখকের লেখনী ধরা সার্থক হইয়াছে। কচিৎ বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের লেখক সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইবে।

ঝিকিমিকি—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। ডি, এম্ লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী ১৩২ পৃষ্ঠা। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা। ছাপা-বাঁধাই মনোরম। আধুনিক প্রচ্ছদ।

কৃতী ব্যবসায়ী সহদেব সরকারের প্রৌঢ় বয়সে জীবনের উপর বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। মন তাঁর পঁচিশ বৎসর পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, সেখানে একুশ বৎসর বয়সে একটি হতাশ প্রেমের কাহিনী—তাহার মধ্যে সে 'গুবরে পোকা'র মত ডুব দিল এবং ভাসিয়া উঠিল পশ্চিমের এক সহরে চুরুটমুখে। সেখানে একটি 'ডিপার্টমেণ্টাল দোকান' (তৎসহ একটি লাইব্রেরি) কিনিয়া জীবনে সে তৃষ্ণা ফিরাইতে চাহিল। বিশেষ দেরী হইল না, তৃষ্ণার্ত্ত সহদেবের সম্মুখে আসিয়া জুটিল বি-এ-পাশ তরুণী ললিতা। সে একা এই পশ্চিমের সহরে ছুটি কাটাইতে আসিয়াছে। দুই জনে যখন প্রায় এক হইয়া যান— এমন সময়ে উদয় হইল নীতিশের। সদরে সে ললিতার বন্ধু অন্দরে প্রেমিক। কিন্তু নীতিশ দরিদ্র; তাই ললিতার সহিত তাহার বিবাহ হয় না। সহদেব মোটা টাকা খরচ করিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইল এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতার ন্যায় একটি চিঠি রাখিয়া ইহাদের জীবন হইতে বিদায় লইয়া গেল। অস্বাভাবিক চরিত্র, প্লট এবং আইডিয়া। সমস্তই অস্বাভাবিক, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে বাংলা সাহিত্যে ইহার আবির্ভাব এবং আশা করা যায়, স্বাভাবিক ভাবেই ইহার মৃত্যু হইবে। লেখক এই নিয়া আটখানি উপন্যাস লিখিলেন। আরও কতখানি লিখিবেন, আমরা জানি না। কিন্তু এত বই না লিখিয়া একখানি লিখিবার জন্য যদি সাধনা করিতেন, তাহা হইলে সমালোচকেরা বাঁচিত।

সব মেয়েই সমান—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। ডি, এম্ লাইব্রেরী। ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। ডবলক্রাউন ষোল পেজী ১২৪ পৃষ্ঠা। সুন্দর ছাপা-বাঁধাই; উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদ।

শোভা, কমলা, মীরা, বিজলী, নীরদা, প্রভা এবং নলিনী—সাতটি গল্প। গল্পের সাতটি নায়িকাই অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। পুস্তকের নামের মধ্যেই তাহার 'থিসিসে'র যোগফল দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়াছি, জনৈক জার্ম্মান মনস্তত্ত্ববিদ্ যৌন-গবেষণায় স্ত্রী-চরিত্রের অলিগলির এইরূপ পরিচয় পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অবিনাশ বাবুর স্নায়ু সবল—তিনি তাহা করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কেদার-বদরীপথে—শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী,

প্রকাশক—ডাঃ কে, পি, রায় এম-বি। ১২৫নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

চিত্র-সম্বলিত ভ্রমণ-কাহিনী। আলোচ্য গ্রন্থে কেদার-বদরীর পথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ বিবৃতি দিয়াছেন এবং তৎসহ বহু চিত্র দ্বারা স্থানগুলিকে পাঠক পাঠিকার দৃষ্টিপথে উপস্থিত করিয়াছেন, উপরন্তু পথে যে সব চটি পড়িয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও বিশেষ পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই। হিমালয়ের দুর্গমতীর্থ বলিয়াই এ পর্য্যন্ত কেদার-বদরী সাধারণের নিকট পরিচিত এবং ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে সব ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকখানিতে বহু ভ্রমাত্মক বিভীষিকাপূর্ণ বিবৃতি আছে। সে সব গ্রন্থ পড়িলে কেদার-বদরী যাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী যেরূপভাবে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা পাঠে কেদার-বদরী যাত্রা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়।

পথে কোন্ কোন্ দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দ্রব্যের অত্যন্ত অভাব এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে তাহারও একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। ইহাতে ভ্রমণকারিগণ যে উপকৃত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখিকার ভাষা স্বচ্ছ ও সরল, বর্ণনাকৌশলটি সুন্দর এবং লিখন-শৈলী চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়াছি এবং পাঠক-পাঠিকাগণ যে উহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—অ

বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডবলক্রাউন, ষোলপেজী ১৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷০ আনা। প্রকাশক শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ, প্রেসিডেন্ট হিন্দু-মিশন, ৩২-বি হরিশ চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি য়ুরোপ ও আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক লুইকুনে, জুষ্ট, কেলগ, উইলসন্ ও লিণ্ডলেয়ার প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার অন্ধভাবে ইহাদের অনুসরণ করেন নাই। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে যে সমস্ত প্রণালী তিনি নিঃসন্দেহরূপে ফলদায়ক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু, সূর্য্যকর ও পথ্য প্রভৃতির সাহায্যে বিনা ঔষধে ও বিনা অস্ত্রে কেমন করিয়া সব রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহাই এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার এরূপ সরল ভাষায় সকল কথা গুছাইয়া লিখিয়াছেন যে, অতি-সাধারণ লোকের পক্ষেও এই পুস্তকের সাহায্যে নিজেদের চিকিৎসা নিজেদের করা সম্ভব হইতে পারে। এই পুস্তকে জল-চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির কতকগুলি ছবি রহিয়াছে, তাহাতে প্রক্রিয়াগুলি বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। এই চিকিৎসাবিধি এই জন্যই অত্যন্ত প্রশংসাহঁ যে ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই চিকিৎসায় একটি পয়সাও অর্থব্যয় নাই। আমরা আশা করি, এই পুস্তকের দ্বারা দেশের লোক যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

—ব

প্রেমের বন্ধন

—শ্রীকরুণাময় বসু

যে প্রেম বন্ধন করে, তার আমি পক্ষপাতী নহি,
সে শুধু ব্যাপ্তির মাঝে অতি ক্ষুদ্র আয়ুর সীমানা;
তাহার আকাশে কাঁদে দীপ্তিশূন্য তারা রহি' রহি'
শতাব্দীর অন্ধকারে প্রকাশের আলো পায় মানা।
বাঁচিবার গূঢ় ধর্ম্ম চলিবার প্রাণবন্ত বেগ,
পদে পদে বাধা দেয় পৃথিবীর মায়ামুগ্ধ নীড়;
তবুও চলিতে হবে, অবরুদ্ধ অনন্ত আবেগ
কেন্দ্রচ্যুত গ্রহ সম হইয়াছে অধৈর্য্য অস্থির।
পৃথিবীর এই পথে মানুষ আসিছে বারংবার,
ছন্নছাড়া জীবনের গতি, এই ঘাটে বোঝা লয়,
জীবনের অন্ত ঘাটে ফেলে দেয় সঞ্চয়ের ভার,
যাত্রা তার বহু দূরে, মানুষের এই পরিচয়।
সুদূর অমৃত-তীর্থে মানবের ধ্রুব লক্ষ্য জানি,
ভঙ্গুর জীবন এই এক মুষ্টি পথের পাথেয়;
ক্ষণস্থায়ী পান্থাবাসে প্রেম লয়ে কেন টানাটানি,
প্রাণ লয়ে কাড়াকাড়ি, জীবনের ধ্রুবতম গেহ
নয় নয় হেথা নয়; কারে ছেড়ে কারে ভালবাসি?
এ জগতে নাহি বুঝি আমি কেবা মোর আপনার?
অনিবার্য্য স্ফীত প্রেম প্রাণতটে উঠেছে উচ্ছ্বাসি',
নব আত্ম-চেতনায় সমাহিত আবিষ্ট অন্তর।
পৃথক পৃথিবীখানি রচিয়াছে মানুষের প্রাণ
তার সাথে মুখোমুখী আত্মপরিচয়; ক্ষুদ্রতম
ক্ষুব্ধ গ্লানি, প্রাত্যহিক জীবনের খ্যাতি অসম্মান
সেথায় নিস্তব্ধ রহে, জেগে ওঠে পিপাসা পরম।
অভ্রভেদী আত্ম-প্রশ্ন জগতের ওঠে ঊর্দ্ধলোকে
চেতনা সংহত করি অবিচল তপস্যার মত;
অনন্ত মুহূর্ত্তগুলি বয়ে যায় চোখের পলকে,
আমার 'আমি'রে সেথা চক্ষু ভরি দেখিব নিয়ত।
তাই তো আমার প্রেম ব্যাপ্ত করি প্রিয় পরিজন
নিখিল-বিশ্বের পথে জন্ম জন্ম খুঁজিছে কাহারে;
কবে যে মিটিবে তৃষ্ণা? শেষ হ'বে এই অন্বেষণ;
কে আসি আঘাত দিবে জীবনের অবরুদ্ধ দ্বারে?

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

যুবক ও যুবতীদিগের কল্যাণের পন্থা

গত সেণ্ট এণ্ড্রুজ দিবসের ভোজসভায় বাঙ্গালার গভর্ণর যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পরোক্ষ ভাবে যুবক ও যুবতীদিগের প্রকৃত কল্যাণের পন্থা কি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। স্যর জনের প্রস্তাবিত যুব-কল্যাণ আন্দোলনের (Youth welfare movement) উদ্দেশ্য দুইটি :—

(১) কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিলে যুবক ও যুবতীদিগের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

(২) কি কি পন্থায় অগ্রসর হইলে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

বাঙ্গালার গভর্ণরের উপরোক্ত নির্দ্দেশানুসারে যুব-কল্যাণ সম্মেলনের জন্য সম্প্রতি একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঐ কমিটির চেয়ারম্যান হইয়াছেন স্যর মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় এবং উহার সভ্যতালিকায় বিচারক আমির আলি, মেজর জেনারেল লিণ্ডসে প্রভৃতি গণ্য-মান্য ব্যক্তিদিগের নাম রহিয়াছে।

স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের প্রস্তাব এবং এই কমিটির গঠনের প্রতি পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিলে, তিনি যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জন্য স্থায়ী ভাবে কিছু করিতে উৎসুক, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এই হিসাবে বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণর বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে ইংরাজজাতির যে শাসনকাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শুধু স্যর জন অ্যাণ্ডারসন্ কেন, ইংরাজ লাট ও বড়লাটদিগের মধ্যে অনেকেই সমগ্র ভারতবর্ষ ও উহার প্রদেশসমূহের স্থায়ী ভাবে কিছু না কিছু করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অথচ, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদিগের বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক পরিবারের শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই অবস্থায় স্বতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, ভারতবর্ষে এতদিন ধরিয়া ইংরাজের এত রকমের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবাসীর আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্গতি এত অধিক পরিমাণে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে কেন এবং ইংরাজ-শাসনের প্রতি জনসাধারণের অসন্তুষ্টিই বা এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে কেন ?

গত দেড় শত বৎসরের ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে যেমন ভারতবাসীর আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্গতি বৃদ্ধি পাইবার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে, সেইরূপ গত দেড় শত বৎসরের জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, এই সময়ে জগতের প্রত্যেক দেশেই অধিকাংশ মানুষেরই আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা শিক্ষার্থী অথবা পরিব্রাজক রূপে জগতের বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্রই যে অধিকাংশ মানুষের সর্ব্ব রকমের অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটিতেছে, তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের অনেকেরই মতে ইংলণ্ড, ইউনাইটেড ষ্টেট্স প্রভৃতি স্বাধীন দেশগুলি ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠায় প্রভাবান্বিত এবং একমাত্র পরাধীন ভারতবর্ষই অভাবগ্রস্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা শিক্ষার্থী অথবা

পরিব্রাজক রূপে জগতের বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া আর সকল দেশই ঐশ্বর্য্যশালী বটে, কিন্তু টলষ্টয়, হেনরি জর্জ্জ এবং জগতের বিখ্যাত সোস্যালিষ্ট, বল্‌শেভিক এবং কমিউনিষ্ট-দিগের লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে, জগতের অন্যান্য দেশেও দারিদ্র্য, অশান্তি এবং অস্বাস্থ্য যে ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নিজ জন্মভূমি ও আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায়ও দীর্ঘকাল বসবাস করিতে হইলে মানুষ স্বভাবতঃই তীব্র মানসিক জ্বালা অনুভব করে। একমাত্র পেটের দায় উপস্থিত না হইলে মানুষ নিজ জন্মভূমি অথবা আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া অন্য দেশবাসী অথবা প্রবাসী হইতে চাহে না, ইহা স্বভাবের নিয়ম।

এই হিসাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের যে সমস্ত মানুষ স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া জগতের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা যে পেটের দায়ে ঐরূপ করিতেছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার উপর যখন দেখা যায় যে, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের যত মানুষ জগতের বিভিন্ন দেশে যতদিন ধরিয়া প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন, ভারতবর্ষের তত মানুষের এখনও ততদিন ধরিয়া প্রবাসী হইতে হয় না, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, থিয়েটার-বায়স্কোপ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, যান-বাহন প্রভৃতি মনোহারী বস্তুগুলি যতই অধিকতর চমকপ্রদ হউক না কেন, ভারতবর্ষ যে এখনও ঐ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় প্রকৃতপক্ষে অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

সাধারণতঃ ধনিক গরীবের দ্বারে উপস্থিত হয়, অথবা গরীব ধনিকের দ্বারে উপস্থিত হয়, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

ভারতবর্ষের অবস্থার দিকে তাকাইলে যেমন স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ইংলণ্ডের বিভিন্ন চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবাসীর আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্গতি ক্রমশঃই এত বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, সেইরূপ জগতের বিভিন্ন সুসভ্য (?) দেশগুলির অবস্থার দিকে তাকাইলেও এই প্রশ্নই জাগ্রত হইবে যে, আধুনিক বিজ্ঞান হইতে এত চমকপ্রদ মনোহারী (amenities) বস্তুসমূহের আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশেই অধিকাংশ মানুষগুলির আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে কেন?

আমাদের মতে এই দুইটি প্রশ্নেরই জবাব একটি।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষগুলি যদিও মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া কি উপায়ে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাহা তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

যে মানুষগুলি নিজদিগকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক প্রভৃতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই মানুষগুলি মানুষ হিসাবে যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ, তাহা সুনিশ্চিত বটে এবং তাঁহারা যে জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য তাঁহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা যে-জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণ সাধন করিবার জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান নহে, উহা বিকৃত। তাঁহাদের ঐ বিকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানই জগতের সর্ব্বত্র মানুষের আর্থিক অভাব, মানসিক অশান্তি এবং শারীরিক অস্বাস্থ্য ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ যে তেজ (heat, electricity, transmission of sound waves and light waves ইত্যাদি) তিন শত বৎসর আগে যেরূপ ভাবে পাওয়া অসম্ভব ছিল, বর্ত্তমানে পৃথিবী সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহা পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। অধুনা পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে বলিয়া পৃথিবীস্থিত বিভিন্ন দ্রব্য হইতে উত্তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আলোক ও শব্দের ঢেউ খেলান ক্রমশঃই সহজসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে আলো ও বিদ্যুৎ-চালিত যানবাহন এবং আলোক ও শব্দের ঢেউ-চালিত বেতারবার্ত্তা, টকি প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। প্রাকৃতিক অবস্থার

পরিবর্ত্তন বশতঃ উপরোক্ত এক একটি জিনিষ সহজসাধ্য হইতেছে, আর মানুষ মনে করিতেছে, তাহারা সাধনা দ্বারা প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, অথচ যে মানুষগুলি এবংবিধ ভাবে প্রকৃতিকে করায়ত্ত করা হইতেছে মনে করিয়া দল বাঁধিয়া নিজদিগকে বৈজ্ঞানিক আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকেন, সেই মানুষগুলি কেন যে ঐরূপ ভাবে উত্তাপ ও তেজের উদ্ভব করা এবং আলোক ও শব্দের ঢেউ-খেলান সম্ভব হইতেছে, তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। কেন যে ঐরূপ ভাবে উত্তাপ ও তেজের উদ্ভব করা এবং আলোক ও শব্দের ঢেউ-খেলান সম্ভব হয়—এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব যখন মানুষ জানিতে পারিবে, তখন দেখা যাইবে যে, ঐরূপ ভাবে উত্তাপ ও তেজের উদ্ভব করা এবং আলোক ও শব্দের ঢেউ-খেলান মানুষের পক্ষে বাল্যকালে কৃত্রিমভাবে শুক্র নষ্ট করিবার মতই অনিষ্টজনক।

মানুষের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি যে জগতের সর্ব্বত্রই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্টতা, ইহা যুবক-যুবতীগণের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য অধুনা যে যে পন্থা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। যুবক-যুবতীগণের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজে প্রায়শঃ যে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটির উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগিতা থাকা ত' দূরের কথা, উহার প্রত্যেকটি প্রায়শঃ যুবক ও যুবতীগণের অপকারক।

যুবক ও যুবতীগণের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য মনুষ্য-সমাজে অধুনা যে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পনেরটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) শিক্ষা-বিস্তার;
(২) খেলা-ধূলার বিস্তার;
(৩) নৈতিক চরিত্রের উন্নতি;
 (ক) সংযম-শিক্ষা;
 (খ) ধর্ম্ম-শিক্ষা;
(৪) দেশপ্রেমিকতার উদ্বোধ;
(৫) শিক্ষকতা-শিক্ষা;
(৬) সরকারী চাকুরী-শিক্ষা;
(৭) শিল্প-শিক্ষা;
(৮) বাণিজ্য-শিক্ষা;
(৯) ডাক্তারী, আইন-ব্যবসায়, এঞ্জিনিয়ারী, কলিয়ারী, ম্যানেজারী, বিভিন্ন টেক্নোলজি এবং ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ব্যবসায়-শিক্ষা;
(১০) শিক্ষাক্ষেত্রের বিস্তার;
(১১) চিকিৎসালয়ের বিস্তার;
(১২) খেলা-ধূলাক্ষেত্রের বিস্তার;
(১৩) শিল্প-বিস্তার;
(১৪) বাণিজ্য-বিস্তার;
(১৫) কৃষি-বিস্তার।

এই পনেরটি ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম চারিটি যুবক ও যুবতীগণের গঠনের জন্য; পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ব্যবস্থাসমূহ তাহাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার জন্য এবং বাকী ছয়টি ব্যবস্থা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধনের জন্য।

প্রথম চারিটি ব্যবস্থায় যুবক ও যুবতীগণের গঠনকার্য্য সাধিত হইতেছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, যুবক ও যুবতীগণের গঠন বলিতে কি বুঝিতে হইবে।

যুবকের যুবকত্ব যে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের ও মস্তিষ্কের কার্য্যশক্তিতে, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না। যে-যুবক সামান্য মাত্র হাত-পা নাড়িয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সে বয়সে যুবক হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাকে যুবক বলা চলে না।

কাযেই, যে-শিক্ষার ব্যবস্থায় যুবক ও যুবতীগণের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, মন ও বুদ্ধির কার্য্যশক্তি সর্ব্বোচ্চ রকমের হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পটুতা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ বয়স পর্য্যন্ত পরিরক্ষিত হইতে পারে, তাহাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে যুবক ও যুবতীগণের গঠনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিতে হইবে। অন্যদিকে, শিক্ষার যে ব্যবস্থায় যুবক-যুবতীগণের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সর্ব্বোচ্চ সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে

না এবং যাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়াদি অল্প বয়সেই রুগ্ন অথবা অপটু হইয়া যায়, তাহা নামতঃ গঠনের ব্যবস্থা হইলেও কার্য্যতঃ উহাকে গঠনের ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না।

বর্ত্তমানে জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত যুবক ও যুবতী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অবস্থা ও কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিলে, একে ত' তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি যে খুব উচ্চস্তরের সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহার পর আবার যখন দেখা যায়, তাঁহারা জীবনের প্রারম্ভেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অসুস্থতা, মনের চাঞ্চল্য এবং মস্তিষ্কের বিবিধ ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তখন আধুনিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাতে যে যুবক ও যুবতীগণের গঠনকার্য্য যথাযথভাবে সাধিত হইতেছে না, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

ইহার পর আবার যখন দেখা যায়, যে যুবক ও যুবতীগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের যেরূপ অল্প বয়সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং বুদ্ধির রুগ্নতা উপস্থিত হয়, তাহার তুলনায় তথাকথিত অশিক্ষিত যুবক ও অশিক্ষিতা যুবতীগণ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া থাকেন, তখন যুবক ও যুবতীগণের গঠনের আধুনিক ব্যবস্থাগুলি যে তাহাদের উপকার সাধন না করিয়া অপকার সাধন করিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে যুবক ও যুবতীগণকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত যে সমস্ত বিষয় ও গ্রন্থ পড়ান হইয়া থাকে, তাহার কোন খানিতেই যে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কোনরূপ সামর্থ্য লাভ করিবার উপযোগী কোন নির্দ্দেশ নাই, তাহা ঐ গ্রন্থসমূহ পরীক্ষা করিলেও বুঝা যাইবে।

যুবক ও যুবতীগণের যুবকত্ব ও যুবতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে যে, শারীরিক স্বাস্থ্য একান্ত প্রয়োজনীয়,তাহা মানুষ অধুনা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে এবং বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই খেলাধূলার বিস্তার সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একে ত' ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাতে যুবক ও যুবতীগণের ব্যায়াম এত অতিরিক্ত পরিমাণে হইয়া থাকে যে, তাহাতে অবশেষে শারীরিক উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহার উপর ঐ শ্রেণীর খেলাধূলায় ইন্দ্রিয়াদির অসংযততা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে ও তাহার ফলে যুবক ও যুবতীগণের মানসিক অবনতিও ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যুবক-যুবতীগণের নৈতিক চরিত্রের গঠনের জন্য স্থানে স্থানে প্রায়শঃ যে শ্রেণীর সংযম-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রচলন রহিয়াছে, তাহাতেও তাহাদিগের প্রকৃত কোন সংযম ও ধর্ম্ম-শিক্ষা সাধিত হয় না। পরন্তু, তাহারা গোঁড়া, একদেশদর্শী এবং কথায় ও কার্য্যে অসমঞ্জস (insincere) হইয়া পড়ে। দেশপ্রেমিকতা-শিক্ষার নামে যে সমস্ত কথা তাহারা শিখিয়া থাকে, তাহার ফলে কলহপ্রিয়তা ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

যুবক ও যুবতীগণকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার জন্য যে সমস্ত শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে স্বাধীনভাবে কিরূপে উপার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা শিক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর শিক্ষায় যাহা যাহা শেখান হয়, তাহাতে অবশ্য স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার উপযোগী কোন শিক্ষাই থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু, কেবলমাত্র এই দুইটি শিক্ষাতেই যে গোলামগিরি শেখান হয়, তাহা নহে, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষাতেও যাহা যাহা শেখান হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া যুবক ও যুবতীগণের চাকুরীর উমেদারী করা ছাড়া স্বাধীনভাবে শিল্প ও বাণিজ্য করা সম্ভব হয় না। আধুনিক বিধিসম্মত ভাবে যাঁহারা শিল্প ও বাণিজ্যের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের শতকরা কয়জন সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা বুঝা যাইবে।

ডাক্তারী শিক্ষা করিতে পারিলে আপাত-দৃষ্টিতে স্বাধীনজীবী হওয়া যায় বটে, কিন্তু একে ত' জগতের

বিভিন্ন স্থানের ডাক্তারদিগের আর্থিক অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা প্রায়শঃ আর্থিক অভাবে জর্জ্জরিত বলিয়া অসততার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাহার পর আবার আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যায় মানুষের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।

আইন-ব্যবসায়ে আপাত-দৃষ্টিতে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু উকিল, ব্যারিষ্টার এবং এটর্ণি প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণের আর্থিক অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ব্যবসাতেও ব্যাপক ভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উহাতে একে ত' মক্কেলগণের মন-যোগান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তাহার পর আবার তাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রায়শঃ উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে, যাঁহারা আইন-শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারও অনেকেই পরিবার-প্রতিপালনের উপযোগী প্রচুর উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া চাকুরীপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন। অধিকন্তু মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে যে সত্যপ্রিয়তা মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়, নরঘাতক ও প্রবঞ্চকদিগের পক্ষসমর্থন-বশতঃ আইন-ব্যবসায়িগণের পক্ষে সেই সত্যপ্রিয়তা রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না এবং তাহার ফলে আধুনিক অনেক ব্যবহারজীবীকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে খাঁটী মনুষ্য নামে আখ্যাত করা যায় না।

বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ যে কতদূর পতিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের সামাজিক প্রাধান্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যদি অ-মানুষ না হইত, তাহা হইলে, যাহারা প্রকৃত খাঁটী মনুষ্য নামের অযোগ্য, তাহারা কি তাহাদের নেতৃত্ব পাইতে পারিত ?*

* এই স্থানে আমরা আমাদিগের ব্যবহারজীবী বন্ধুদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে দুষ্ট, তাহা প্রমাণিত করিতে বসিয়া আমরা এই সত্য কথাগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম, ইহা তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। লেখকের নিজের পশুত্বের কারণ কি কি, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা যাহা তাহার মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহাই সে সামাজিক কল্যাণের আশায় লিপিবদ্ধ করিতেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তাহার বিদ্বেষ নাই।...

যুবক ও যুবতীগণের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য শিক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি যে ছয়টি বিষয়ের বিস্তার সম্পাদিত করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহাও সমীচীন ভাবে হয় না। একে ত' এক কথাতেই বলা যাইতে পারে যে, যে যে ব্যবস্থায় আধুনিক মনুষ্যসমাজে যুবক ও যুবতীদিগের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার সাধন করিবার চেষ্টা হয়, তাহা যদি সমীচীন হইত, তাহা হইলে শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে জগতের সর্ব্বত্র এত বেকারের উদ্ভব হইত না, তাহার উপর একে একে ঐ ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি দুষ্ট।

উপরে যাহা যাহা বলা হইল, তাহাতে যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক মনুষ্যসমাজ যুবক ও যুবতী-গণের গঠনের, উপার্জ্জন-ক্ষমতা শিক্ষা করিবার এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিবার যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি দুষ্ট এবং তাহার কোনটিতে উদ্দেশ্য সাধিত ত' হওয়া দূরের কথা, তদ্দ্বারা মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকারই সাধিত হইয়া থাকে, তখন মানুষের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে বিকৃত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কাযেই আমাদিগের যুবক ও যুবতীগণের যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে, তাহাদের গঠনের, তাহাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার এবং তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন করিবার আধুনিক যে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে কি শিক্ষায় যুবক ও যুবতীগণ প্রকৃত ভাবে গঠিত ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোন্ ব্যবস্থায় তাহাদের স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা গবেষণার দ্বারা আবিষ্কার করিতে হইবে। তাহা না করিয়া, অন্য যাহাই করা যাউক না কেন, তাহাতে কোন প্রকৃত ফলোদয় হইবে না; পরন্তু উহা ভিতরে ক্ষত রক্ষা করিয়া উপরে তাহার আরোগ্য সাধন করিবার চেষ্টার অনুরূপ হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন এবং কংগ্রেস

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এই সংবাদ পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছেন। কলিকাতার প্রায় সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রই, মায় ষ্টেটস্‌ম্যান পর্য্যন্ত, পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের জয়জয়কার ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ কোন্ হিসাবে যে কংগ্রেসের জয়জয়কার হইল, তাহা কাহারও মন্তব্য হইতে ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না।

আমাদের মতে, যে আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি বাঙ্গালার যুবক, বাঙ্গালার যুবতী, বাঙ্গালার হিন্দু, বাঙ্গালার মুসলমান, বাঙ্গালার খৃষ্টান, বাঙ্গালার অনুন্নত সম্প্রদায়কে, অথবা এক কথায় বাঙ্গালার জমি, বাঙ্গালার জীব এবং বাঙ্গালার জল-হাওয়াকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছে, সেই আর্থিক অভাব, সেই শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং সেই মানসিক অশান্তি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইতে পারে একমাত্র প্রকৃত ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যের দ্বারা। অনেকে মনে করেন যে, গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলেও, একমাত্র গভর্ণমেণ্টের চেষ্টার ফলেই ঐ আর্থিক অভাব, ঐ শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং ঐ মানসিক অশান্তি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু আমরা ঐ মতাবলম্বী নহি। আমাদের মতে শুধু গভর্ণমেণ্ট কেন, যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোন ব্যক্তি ঐ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করুন না কেন, তাহাতেই অল্পাধিক সমাধান হওয়া সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় কংগ্রেসের চেষ্টায় যে শ্রেণীর পূর্ণ সমাধান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেই শ্রেণীর সমাধান গভর্ণমেণ্ট অথবা আর কাহারও চেষ্টায় সম্ভব হইতে পারে না। আমরা এতাদৃশ কথা কেন বলিতেছি, তাহা বহুবার বহু প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান সন্দর্ভে ঐ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত করিব।

একমাত্র প্রকৃত কংগ্রেসের দ্বারাই ভারত ও প্রত্যেক প্রদেশের সর্ব্ববিধ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের মতে অদ্যাবধি ঐ প্রকৃত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কংগ্রেসের প্রথম যুগে উহা যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে উহা হইতে প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ প্রকৃত কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের আশা করা যাইত বটে, কিন্তু বর্ত্তমান নেতৃবর্গের দ্বারা উহা যে পথে পরিচালিত হইতেছে, তাহার অনেকখানি পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, এই কংগ্রেস হইতে প্রকৃত কংগ্রেসের অভ্যুদয় হওয়া সম্ভব হইবে না। পরন্ত, গান্ধীজীপ্রমুখ বর্ত্তমান নেতৃবর্গের কার্য্যের ফলে বর্ত্তমান কংগ্রেস যে রাস্তায় চলিয়াছে, তাহ উহা হইতে প্রকৃত কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের এবং তদ্দ্বারা দেশের কোন প্রকৃত সমস্যা সমাধান হওয়ার আশা ক্রমশঃই সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছে।

প্রকৃত কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের আশা যে ক্রমশঃই সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ফলাফল তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

এক কথায়, দৈনিক-সংবাদপত্রসমূহ কংগ্রেসের যে জয়জয়কার দেখিয়াছেন, আমাদের চক্ষে সেই জয়জয়কারের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হওয়া ত' দূরের কথা, কংগ্রেস যে ক্রমেই পতিত হইতেছে, তাহার সাক্ষ্যই কেবল ভাসিতেছে

মনে রাখিতে হইবে, ভারতের প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেস বলিতে বুঝিতে হইবে সেই কংগ্রেসকে, যাহাকে একক হিন্দুর, অথবা একক মুসলমানের, অথবা একক খৃষ্টানের বলিয়া অভিহিত করা যায় না। যে কংগ্রেসে যোগদান করিতে অথবা যাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হিন্দুগণ যেরূপ উল্লসিত হইবেন, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি অপরাপর জাতিগণেরও ঠিক সেইরূপ উল্লাস দেখা যাইবে, সেই কংগ্রেসকে ভারতের প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেস বলিয়া অভিহিত করা যাইবে। ভারতের প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেসের উপরোক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কংগ্রেসে যত অধিকসংখ্যক সর্ব্বজাতির সম্মেলনের পরিচয় পাওয়া যাইবে, ততই তাহার জয়জয়কার ঘটিতেছে

বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর সর্ব্বজাতির সম্মেলনের যতই হ্রাস দেখা যাইবে, ততই তাহার অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও বুঝিতে হইবে, যে-নেতৃবর্গ কংগ্রেসের অবনতির সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও উহার জয়জয়কার ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহারা স্ব স্ব দাম্ভিকতাবশতঃ নিজেরা যে কতখানি মোটা বুদ্ধির মানুষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের জনসাধারণের কতখানি সর্ব্বনাশ সাধনে রত, তাহা বুঝিতে পারেন না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের উন্নতির পরিচায়ক অথবা অবনতির পরিচায়ক, তাহা যথাযথ ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে, কোন্ সম্প্রদায় হইতে মোট কতজন নির্ব্বাচিত হইবার কথা এবং তাহার মধ্যে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তাঁহাদের কয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য দণ্ডায়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মোট যে কয়জন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়জন জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন।

১৯৩৫ সালের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের ২৪৫ পৃষ্ঠার ৫নং তপশীলান্তর্গত প্রতিনিধিসংখ্যার যে সারণী (table of seats) লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পড়িয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বঙ্গীয় নূতন ব্যবস্থা-পরিষদে মোট ২৫০ জন প্রতিনিধির নির্ব্বাচিত হইবার কথা। তন্মধ্যে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতি ছাড়া থাকিবেন—

হিন্দু প্রভৃতি সাধারণ প্রতিনিধি		৪৮ জন
তপশীলভুক্ত	...	৩০ জন
মুসলমান	...	১১৭ "
ইয়োরোপীয়ান	...	১১ "
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	...	৩ "
ভারতীয় খৃষ্টান	...	২ "
জমিদার	...	৫ "
বিশ্ববিদ্যালয়	...	২ "
ব্যবসা-বাণিজ্য	...	১৯ "
শ্রমিক	...	৮ "
সাধারণ নারী	...	২ "
মুসলমান নারী	...	২ "
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নারী		১ "

উপরোক্ত মোট ২৫০ জন প্রতিনিধিকে হিন্দ মুসলমান ও খৃষ্টান ভেদে ভাগ করিয়া লইলে দেখা যাই যে, নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মোট—

৮০ জন	হিন্দু নর-নারী
১১৯ "	মুসলমান নর-নারী
১৭ "	খৃষ্টান নর-নারী
এবং	
৫ "	জমিদার
২ "	শিক্ষা-বিশারদ
১৯ "	ব্যবসা-বাণিজ্য-বিশারদ
৮ "	শ্রমিক প্রতিনিধির

স্থান রহিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, মোট প্রতিনিধিগণের মধে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কয়জনকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন-সমরে দণ্ডায়মান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, বাঙ্গালা কংগ্রেসের আত্মতৃপ্ত নূতন নেতৃবর্গ একটি মুসলমানকে অথবা একটি খৃষ্টানকে, অথবা একটি জমিদারকে, অথব একটি শিক্ষা-বিশারদকে, অথবা একটি ব্যবসা-বাণিজ্য বিশারদকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান করিতে সক্ষম হন নাই। অথচ কোন দিন বাঙ্গালার এই অবস্থ ছিল না। কংগ্রেস যখনই ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখনই হিন্দু হউক মুসলমান হউক, অথবা খৃষ্টান হউক, প্রায় প্রত্যেক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রেই স্বীয় প্রতিনিধি উপস্থাপিত করিতে সম হইয়াছেন।

ইহা দেখিলে কি যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে, বর্ত্তমা নির্ব্বাচন-সমরে(?) কংগ্রেস ওয়াটারলুর যুদ্ধের মত একট যুদ্ধ জয় করিয়াছেন? এই দৃশ্যের পর যখন কংগ্রেসে জয়জয়কারের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, আমাদের দেশমাতা এবং তাঁহার প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠান কতকগুলি নির্লজ্জ ষড়্যন্ত্রকারী মানুষের হাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন এবং জনসাধারণের প্রকৃতপক্ষে

যখন চিন্তাশীল হইবার কথা, তখন তাহারা বৃথা আনন্দে হৈ চৈ করিতেছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে যাঁহারা চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা উহাকে যে "হিন্দুর কংগ্রেস" বলিয়া আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কি এক্ষণে সত্য হইয়া উঠে নাই? বাঙ্গালায় কংগ্রেসের যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে উহাকে কি আর জাতীয় কংগ্রেস বলা চলে? শ্রীযুক্ত শরৎ সি, বসু এবং আনন্দবাজারীদলের হাতে পড়িয়া আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কি সত্যসত্যই অঙ্গহীন "হিন্দুর কংগ্রেস" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়া পড়ে নাই?

তাহার পর আরও চাহিয়া দেখুন যে, বাঙ্গালায় ভারতীয় কংগ্রেসকে সমগ্র হিন্দুর প্রতিষ্ঠানও বলা চলে না। আমরা তপশীলভুক্ত জাতিকে হিন্দু ছাড়া আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারি না। তাঁহাদিগকে ধরিলে এখনও বাঙ্গালায় মোট ১০৫ জন হিন্দু-প্রতিনিধির স্থান রহিয়াছে। সাধারণের জন্য যে ৭৮টি স্থান রহিয়াছে, তাহা সমগ্রই হিন্দুর জন্য। জমিদারদিগের ৫ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন এবং শ্রমিকের ৮ জনের জন্য যে যে স্থান রহিয়াছে, তাহাতেও সম্পূর্ণভাবে হিন্দুগণের দণ্ডায়মান হওয়া অনায়াসেই সম্ভব হইত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে ১৯টি স্থান রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৯টি স্থানে হিন্দু-প্রতিনিধিগণের অনায়াসেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হইতে পারিত।

শ্রীযুক্ত শরৎ সি, বসু এবং তাঁহার নূতন সখা-সম্প্রদায় যদি এই ১০৫টি স্থানে কংগ্রেসের ১০৫টি প্রতিনিধি দণ্ডায়মান করিয়া প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান না বলিতে পারিলেও সমগ্র হিন্দুর প্রতিষ্ঠান বলিয়া আখ্যাত করা যাইত। কিন্তু তাঁহারা তাহাও পারেন নাই। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ঐ ১০৫টি স্থানে তাঁহারা বাঙ্গালায় সর্ব্বসমেত, ৬০টি হিন্দু পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। এই দৃশ্য দেখিলে কি নূতন নেতা শরৎ সি, বসু এবং তাঁহার নূতন সখা-সম্প্রদায়কে ধিক্কার প্রদান করিতে হয় না? ইহার পর আবার যখন শোনা যায় যে, শ্রীযুক্ত শরৎ সি, বসু এবং তাঁহার নূতন সখা-সম্প্রদায় লজ্জানুভব না করিয়া অবলীলাক্রমে দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের বাণী প্রচার করিতেছেন, তখন কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কি হতাশ হইতে হয় না?

উপরোক্ত ভাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের দিকে তাকাইয়া দেখিলে আংশিকভাবেও কংগ্রেসের জয়জয়কার ঘোষণা করিবার উপযুক্ত কিছুই পাওয়া যায় না, তাহা বালকগণের স্বীকারযোগ্য না হইলেও যাঁহাদের মস্তিষ্কে যুক্তি-প্রবণতার লেশমাত্রও আছে, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। বালকগণকে শুধু আমরা বলিয়া রাখিতে চাই যে, আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের বহু অভিযোগের কারণ আছে বটে এবং আমাদের মতে তাঁহারা আমাদের বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্যের এবং বালকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন বটে—কিন্তু শ্রীযুক্ত শরৎ সি, বসুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন অভিযোগের কোন কারণ এতাবৎ ঘটে নাই। তথাপি কেন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে হইতেছে, তাহা আমাদের যুবকগণ ভাবিয়া দেখিবেন কি? ভবিষ্যৎ দেখাইবে যে, যুবকগণের ও বাঙ্গালী জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থোদ্ধার করিবার চেষ্টাবশতঃই তথাকথিত হোমরা-চোমরাগণের বিবেচনাশক্তির স্বরূপ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।

কংগ্রেসের সর্ব্বসমেত কয়জন প্রতিনিধি বাঙ্গালার কোন্ সম্প্রদায়ের কোন্ স্থানে প্রতিযোগিতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহার দিকে নজর করিলে যুক্তিসঙ্গতভাবে বর্ত্তমান নেতৃবর্গের ও বর্ত্তমান কংগ্রেসের জয়জয়কার ঘোষণা করা চলে না বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় যে, যে যে স্থানে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহার অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইতে পারিয়াছেন এবং কোন কোন কেন্দ্রে, এমন কি বালকসুলভ চপলতাবিশিষ্ট যুবকগণ অথবা সাধারণের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রৌঢ়গণ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া জয় লাভ করিতে পারিয়াছেন, তখন কংগ্রেসের নামের যে

একটা মহিমা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই কংগ্রেসের বিজয়ের কারণ বলিয়া মনে হয়।

কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের উপরোক্ত বিজয়াধিক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আপাতভাবে কংগ্রেসের নামের একটা মহিমার সাক্ষ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে তাহার ফলেই কংগ্রেস জয়ী হইতে পারিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। কংগ্রেসের নামের মহিমার ফলেই যদি তাহার প্রতিনিধিগণের বিজয় লাভ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে কুত্রাপি বিজিত হওয়ার দুর্ভাগ্য লাভ করিতে হইত না এবং সমস্ত কেন্দ্রেই কংগ্রেস-প্রতিনিধি পাওয়া সম্ভব হইত। কোন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি যখন যথোপযুক্ত গবেষণা অথবা সাধনা সমাপন করিয়া অকৃত্রিমভাবে কায়মনোবাক্যে কেবলমাত্র অসহায় গণসাধারণের অথবা অপরিণতমস্তিষ্ক যুবকগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকে, তখন ঐ প্রতিষ্ঠান এবং ঐ ব্যক্তির নাম মানুষের মনে ইন্দ্রজালের মত কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যখন কোন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি অকৃত্রিম ভাবে কায়মনোবাক্যে অসহায় গণ-সাধারণের অথবা অপরিণতমস্তিষ্ক যুবকগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকে, তখন ঐ প্রতিষ্ঠান অথবা ঐ ব্যক্তির কোন কার্য্যে কাহারও প্রতি কোন অন্ধ অনুরাগ অথবা অন্ধ বিদ্বেষের কোন সাক্ষ্য থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান কংগ্রেসের অথবা তাহার নেতৃবর্গের কাহারও কোন কার্য্যে এতাদৃশ অন্ধ অনুরাগের অথবা অন্ধ বিদ্বেষের বিলুপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। পরন্তু, কংগ্রেসের আধুনিক নেতৃবর্গের প্রায় প্রত্যেকেরই কার্য্যে ইংরাজের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষের, জনসাধারণের প্রতি অমনোযোগিতার এবং কেবলমাত্র স্বীয় স্তাবকদিগের প্রতি অন্ধ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উপরোক্ত যুক্তির অনুসরণ করিলেও কংগ্রেসের নামের মহিমা যে দেশের কাহারও মনে ইন্দ্রজালের মত কার্য্য করিয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।

তথাপি কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যে অধিকাংশ স্থলে হিন্দু নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে বিজয়ী হইতে পারিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের মতে, বাঙ্গালার হিন্দুগণ অধিকাংশ স্থানেই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ, গভর্ণমেণ্টের আধুনিক চণ্ডনীতি (Criminal Amendment Act) এবং দেশব্যাপী আর্থিক অভাব। গভর্ণমেণ্টের আধুনিক চণ্ডনীতির ফলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুগণকেই অধিকতর পরিমাণে ব্যথিত হইতে হইয়াছে। এই বিরক্তির ফলে অধিকাংশ স্থলেই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করা, হয় প্রত্যক্ষভাবে, নতুবা অপ্রত্যক্ষভাবে হিন্দুগণের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দলবদ্ধ হইতে না পারিলে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সম্ভব হইবে না এবং এক কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছাড়া তাঁহারা অন্য কাহাকেও কোন দলবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতে পারেন না। ইহারই জন্য হিন্দু-জনসাধারণের নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের অধিকাংশ স্থলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ উল্লেখযোগ্য ভোটাধিক্যে বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের চণ্ডনীতির পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের লোকহিতকর কার্য্যগুলি যদি জনসাধারণের অর্থাভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় এবং অপর কোন বিশিষ্ট হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া যদি কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস যদি তাহার কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন না করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের পক্ষে বিজয়াধিক্য লাভ করা সম্ভব হইবে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের যোগ্য।

প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহের প্রয়োজনীয়তা

কংগ্রেস-পন্থীদিগের কাহারও কাহারও মতে প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহ যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে দেশীয় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা পরিচালিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উহা দেশীয় লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা

এই মতাবলম্বী, তাঁহারাই এখন আমাদের কংগ্রেসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

তাঁহাদেরই প্রভাবে কংগ্রেস হইতে স্থির হইয়াছে যে, যাহাতে এতাদৃশ গভর্ণমেণ্টের শাসনযন্ত্র অচল হয়, তাহা দেশবাসীর করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং তদুদ্দেশ্যেই কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ অ্যাসেম্ব্লিসমূহে প্রবল হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

কংগ্রেসের উপরোক্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ অ্যাসেম্ব্লি-সমূহের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পাদিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন পরিষ্কার নির্দ্দেশ দেশবাসীকে অদ্যাবধি তাঁহারা প্রদান করেন নাই। তাঁহাদিগকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা প্রায়শঃ বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারা পর্য্যন্ত বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের দ্বারা দেশের কোন সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা এই মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর উত্তর পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন যে, গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেশদ্রোহী দেশীয় রাজপুরুষগণকে এবং প্রধান প্রধান বিদেশীয় রাজপুরুষগণকে গোপনে হত্যা করিতে পারিলে ও গরিল্লাযুদ্ধ (guerilla warfare) চালাইতে পারিলে স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে।

আর এক শ্রেণীর লোকের মতে স্বাধীনতা লাভ করিবার উপায়,—ব্যাপকভাবে অসহযোগ এবং আইন-অমান্য নীতি পরিগ্রহ করা। কংগ্রেসের এই দুই শ্রেণীর লোকই ভারতের স্বাধীনতা বলিতে বুঝিয়া থাকেন, ভারতবাসীকে ইংরাজ-শাসন হইতে মুক্ত করা।

আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত কোন দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে চাকুরী না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কোন দেশকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বাধীন বলা চলে না এবং দেশ হইতে ইংরাজ বিতাড়িত হইলেই যে উপরোক্ত অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহাও আশা করা যায় না। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ বিতাড়িত হইলে, ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব হইবে, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, যে দুইটি উপায়ে বর্ত্তমান কংগ্রেসপন্থিগণ ইংরাজকে তাড়ান সম্ভব বলিয়া মনে করেন, সেই দুইটি উপায়ের কোনটিতে উহা হওয়া সম্ভব নহে। খুব ব্যাপকভাবে গোপনে গরিল্লা যুদ্ধের আয়োজন হওয়া সম্ভব নহে, কারণ, যাঁহারা ঐ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের কার্য্য খুব বেশী দিন গোপন রাখা সম্ভব নহে এবং প্রায় প্রত্যেকেরই রাজদ্বারে অভিযুক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অসহযোগ এবং আইন-অমান্য নীতির দ্বারাও যে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করা সম্ভব নহে, তাহা যাঁহারা অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। আইন-অমান্য অথবা অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা উহা সম্ভব নহে বলিয়াই গান্ধীজী স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও অসাফল্য লাভ করিয়াছেন।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসপন্থিগণ প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহের অপ্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইতে পারে, অথবা কি উপায়ে যে সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পাদিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। কোন্ রাস্তায় দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করা অথবা সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা স্থির না করিয়া, ইহা প্রয়োজনীয় অথবা উহা অপ্রয়োজনীয়, এতাদৃশ মতবাদ পোষণ করা যুক্তিসঙ্গতভাবে বুদ্ধিমান্-জনোচিত হইতে পারে না।

প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বিচার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা কি কি এবং ঐ সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার উপায়ই বা কি কি?

বর্ত্তমানে অন্নসমস্যা ও বেকার-সমস্যাই যে ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা, তাহা কংগ্রেসপন্থীরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের মতে অন্নসমস্যা ও বেকার-সমস্যা ছাড়া

আরও কয়েকটি সমস্যা আছে, যাহা কোন ক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। তন্মধ্যে শারীরিক স্বাস্থ্য-সমস্যা ও মানসিক শান্তির সমস্যা উল্লেখযোগ্য।

অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, দেশে যাহাতে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তাহা করা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার দেশের ধন যাহাতে সর্ব্বস্তরের মানুষের মধ্যে উপযোগিতা অনুসারে বণ্টিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

চাকুরী না করিয়া দেশের সর্ব্বস্তরের মানুষ যাহাতে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে এবং সকলেই যাহাতে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, এতাদৃশভাবে বেকারসমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশের স্বাধীন ব্যবসাগুলি যাহাতে প্রত্যেকের পক্ষে লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিমূলক সমস্যা-সমূহের সমাধান করিবার উপায় ভারতীয় ঋষিগণের ভাষায় পাঁচটি, যথা :

(১) দ্রব্য-বিষয়ক বিজ্ঞানের আলোচনা ;

(২) তপোবিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ;

(৩) যোগ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ;

(৪) স্বাধ্যায়-বিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভ্যাস ;

(৫) জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ধারার উপলব্ধি।

শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিমূলক সমস্যা-সমূহের সমাধান করিবার জন্য উপরে যে পাঁচটি উপায়ের কথা বলা হইল, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের নিজস্ব। তন্মধ্যে শেষোক্ত চারিটি উপায় বর্ত্তমান জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমোক্ত উপায়টি, অর্থাৎ দ্রব্যবিষয়ক বিজ্ঞানের আলোচনাও এক সময় প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু গত তিন শত বৎসর হইতে মনুষ্যজাতি আবার উহার পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে।

অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় :—

(১) কোনরূপ সার অথবা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিয়া যাহাতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(২) বিভিন্ন দ্রব্যের ও পারিশ্রমিকের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য যাহাতে কাহারও পক্ষে কোনক্রমে লোকসানজনক না হইতে পারে এবং তাহা যাহাতে প্রত্যেকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

কি করিলে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, অথবা কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের ও পারিশ্রমিকের মূল্যের মধ্যে সমতা রক্ষিত হইতে পারে, অথবা কি উপায়ে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য যাহাতে কাহারও পক্ষে কোনক্রমে লোকসানজনক না হইয়া প্রত্যেকের পক্ষে লাভজনক হয়, তাহা করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞান বর্ত্তমান জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইবে না।

উপরোক্তভাবে সমস্যাসমূহের কথা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অন্ন-সমস্যা, অথবা বেকার-সমস্যা, অথবা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিমূলক সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে, সেইরূপ আবার কতকগুলি ব্যবস্থা যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত চেষ্টায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা আবিষ্কার করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করিলে কোন ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা কখনও সম্ভবপর হয় না। কোন ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে একদিকে যেরূপ দেশের সকলে যাহাতে ভয়েই হউক, অথবা ভক্তিতেই হউক, ঐ ব্যবস্থা সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে মানিয়া লয়, তাদৃশ আয়োজনের প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার যাঁহারা ঐ ব্যবস্থা অমান্য করেন, তাঁহাদের যাহাতে শাস্তি হয়, তাহার আয়োজনেরও প্রয়োজন আছে।

এই হিসাবে দেখা যাইবে যে, অন্ন-সমস্যা, অথবা বেকার-সমস্যা, অথবা অন্য কোন সমস্যার সমাধানকল্পে দেশের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার প্রত্যেকটি প্রাদে-

শিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহের সাহায্যে পরিগৃহীত হইলে, উহা যেমন দেশবাসীর প্রত্যেকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন, সেইরূপ আবার যাঁহারা উহা অমান্য করিবেন, তাঁহাদিগের দণ্ডেরও ব্যবস্থা হইতে পারিবে। কংগ্রেস প্রভৃতি দেশীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উহা সম্পাদিত হইতে পারে না।

কাযেই বলিতে হইবে যে, দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই সঙ্গে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লির সাহায্যে কার্য্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করা দেশের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় (under the present Constitution of the country) কোন ক্রমেই সম্ভব নহে বটে এবং তজ্জন্য প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহে প্রবেশ করাও একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু কেবল মাত্র প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহে প্রবেশ করিতে পারিলেই যে দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব হইবে, তাহা নহে।

উহার জন্য আরও যাহা যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য,—প্রথমতঃ কতকগুলি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গবেষণা, অথবা সাধনা; দ্বিতীয়তঃ ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষহীনতা এবং তৃতীয়তঃ কর্ম্মপ্রার্থী অসহায় যুবক ও শ্রমজীবিবৃন্দের প্রতি অকৃত্রিম (sincere, not academic or outward) সম-প্রাণতা।

দেশবাসিগণ উত্তেজনামত্ত হইয়া যে সমস্ত ধুরন্ধরদিগকে প্রতিনিধিরূপে অ্যাসেম্ব্লিতে প্রেরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন উপরোক্ত প্রয়োজন বুঝিতে ও সম্পাদিত করিতে সমর্থ, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি?

যদি দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া কেহ মনে করেন, তাহা হইলে এখনও সাবধান হইতে হইবে।

নির্ব্বাচনের ফলাফল

বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাব নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশের নির্ব্বাচন চলিতেছে।

যে পাঁচটী প্রদেশের নির্ব্বাচন-সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বিহার এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যা মোট প্রতিনিধিসংখ্যার অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। অন্যান্য কয়টী প্রদেশে তাহা হয় নাই। কাযেই আপাতদৃষ্টিতে বিহার এবং উড়িষ্যার অ্যাসেম্ব্লিতে কংগ্রেসপন্থীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহারা তাঁহাদের অভিলাষানুযায়ী প্রস্তাবসমূহ মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু বাঙ্গালা এবং আসামে তাহা পারিবেন না।

যে যে প্রদেশের নির্ব্বাচন-সংগ্রাম এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাদের নাম—মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং সিন্ধু। এই ছয়টী প্রদেশের মধ্যে উড়িষ্যা এবং বিহারের মত মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশেও কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য হইবার সম্ভাবনা আছে, আর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং সিন্ধুতে ঐ সম্ভাবনা নাই। পরন্তু এই দুইটী প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

যে যে প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে, সেই সেই প্রদেশে তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের মতে কংগ্রেস নির্ব্বাচন-সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং চেষ্টা করিলে তাঁহারা ঐ ঐ প্রদেশে ইংরাজদিগকে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিতে পারিবেন। তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের এই জয়োল্লাসে আমাদের দেশের তথাকথিত জাতীয়মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষগুলির প্রাণও আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে।

আমরা কিন্তু উপরোক্ত জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের অথবা জাতীয়মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষগুলির উল্লসিত হইবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-সংগ্রামের ফলে দেশের কাহারও উল্লসিত হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সংগ্রামে দেশবাসী দেশের কোন শত্রুকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না, এবং দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, যেরূপভাবে প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহ গঠিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে তদ্দ্বারা কোন প্রদেশের প্রকৃত সমস্যাসমূহের কোনটীর কোন সমাধান হওয়া সম্ভব কি না।

তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের মতে যে যে স্থানে কংগ্রেস-পন্থীরা বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই সেই স্থানে দেশের শত্রুসমূহ পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিমত যুক্তিসহ বলিয়া মানিয়া লইলে বলিতে হয় যে, দেশে যাঁহারা বর্ত্তমান কংগ্রেস-মনোবৃত্তির বিরোধী, তাঁহারা প্রত্যেকে দেশদ্রোহী, আর যাঁহারা সদসৎ কোনরূপ চিন্তা আমূলভাবে না করিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেসের গোলামী করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যেকে দেশপ্রেমিক। আমাদের মতে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের উপরোক্ত অভিমত সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। যদি দেখা যাইত যে, যে যে প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য লাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল না, সেই সেই প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, অথবা যদি দেখা যাইত যে, কংগ্রেস-পন্থীরা দেশীয় জনসাধারণের সহায়তা পাইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে দেশের সমস্যাসমূহের পূরণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশ্য যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে দেশদ্রোহী এবং কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য ঘটিলেই দেশের জয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, এতাবৎ বয়কট, অসহযোগ এবং আইন-অমান্য প্রভৃতি যে সমস্ত আন্দোলন কংগ্রেসের দ্বারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস জনসাধারণের সহায়তা পাইয়াছে, অথচ দেশের প্রায় প্রত্যেক সংসারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া ত' দূরের কথা, উহা প্রায়শঃই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তখন কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য ঘটিলেই যে দেশের জয় হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা চলে না।

এইরূপ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একে ত' বর্ত্তমান কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য ঘটিলেই যে দেশের জনসাধারণের বিজয়-লাভ ঘটিল, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করা চলে না, তাহার পর আবার এমন কোন একটি প্রদেশ দেখা যাইবে না, যে প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীরা ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের পূর্ব্বসঙ্কল্পিত অভিপ্রায়-বিরুদ্ধে সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিয়াছেন।

উপরোক্ত গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট চিন্তাসহকারে অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে দেশবাসীদিগের পক্ষে মিলিত হওয়া সম্ভব হইলে ঐ অ্যাক্টের সহায়তায় ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ঐ অ্যাক্ট এমনভাবে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, উহার পরিচালনাধীনে ভারতবাসীর পক্ষে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ ভাবে অসম্ভব না হইলেও সহজসাধ্য নহে। আরও দেখা যাইবে যে, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু-প্রতিনিধিগণের সংখ্যাধিক্য ও কোন কোন প্রদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কোন কোন প্রদেশে হিন্দু অথবা মুসলমান এই দু'য়ের কাহারও সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান নাই। অ্যাক্টের এই রচনাপ্রণালীর সহিত গভর্ণমেণ্টের গত কয়েক বৎসরের কার্য্য-প্রণালী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, যে যে প্রদেশে হিন্দু-প্রতিনিধিগণের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে, সেই সেই প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য লাভ করিবার সম্ভাবনা ঐ অ্যাক্ট-প্রণেতৃবৃন্দের পূর্ব্বসঙ্কল্পিত।

বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে যে প্রদেশে হিন্দু-প্রতিনিধিগণের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান

রহিয়াছে, প্রায়শঃ সেই সেই প্রদেশেই কংগ্রেস-পন্থীরা সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিয়াছেন।

কাযেই, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের অ্যাসেম্ব্লিতে কংগ্রেস-পন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারায় কংগ্রেস-নেতৃবর্গের যে কোন চতুরতার পরিচয় আছে, ইহা মনে করা যায় না এবং তাহাতে কাহারও পক্ষে কোন উল্লাসেরও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

ঐ অ্যাক্ট অধ্যয়ন করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, কয়েকটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশে যাহাতে কংগ্রেস-পন্থীরা সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হ'ন, অ্যাক্ট-প্রণয়নে তাহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমাদের মতে যে প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীরা সংখ্যাধিক্যের প্রলোভনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন, সেই প্রদেশেই তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকতর দলাদলি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। যে যে গুণ থাকিলে দেশের প্রকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে, সেই সেই গুণ না থাকিলে কাহাকেও কংগ্রেসপক্ষ হইতে মন্ত্রিত্বের জন্য নির্ব্বাচিত করা হইবে না, কংগ্রেসের মধ্যে এবংবিধ কোন বিধি প্রবর্ত্তিত থাকিলে এবং তদনুসারে কংগ্রেসপক্ষের মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলে, কাহারও পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাঁহার বিরোধিতা করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেসে উপরোক্ত কোন বিধি প্রবর্ত্তিত থাকা ত' দূরের কথা, দেশের প্রকৃত সমস্যা যে কি এবং সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে যে মন্ত্রিগণের কোন্ কোন্ গুণ থাকা দরকার, তৎসম্বন্ধে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কংগ্রেস-নেতৃবর্গের যে কোন পরিষ্কার ধারণা আছে, তাঁহাদিগের কার্য্য হইতে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এতাদৃশ অবস্থায় কংগ্রেসের দ্বারা কোন কর্ত্তৃত্ব গৃহীত হইলে যে দলাদলি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনের গত কয়েক বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝা যাইবে।

কাযেই বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-সংগ্রামে কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস-পন্থীরা জয়ী হইতে পারিয়াছেন বলিয়া দেশের কাহারও পক্ষে অযথা উল্লসিত হইবার কোন কারণ থাকা ত' দূরের কথা, দেশবাসীর পক্ষে শঙ্কিত হইবার কারণ আছে।

আমাদের মনে হয়, প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ গত ৬০।৭০ বৎসর আগে দেশে এমন একটি অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহার ফলে ভারতের প্রকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। ঐ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল বলিয়াই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতবাসী ও ইংরাজ মিলিত হইয়া ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে পারিয়াছিল এবং ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত ঐ কংগ্রেসের কার্য্যের ফলে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর ঐক্যবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কু-শিক্ষার কু-ফলে ভারতবাসী ভগবানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই এবং ইংরাজ-কর্তৃপক্ষও ভুলের উপরে ভুল করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে ভারতবাসীর স্বরাজ লাভ করিবার প্রস্তাবগ্রহণের ফলে তদবধি হিন্দু ও মুসলমানের মিলন-সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া অমিলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তদবধি কংগ্রেসের সুচতুর নেতৃবর্গ প্রায়শঃ ঐ অমিলনের কার্য্যে পরোক্ষভাবে ইন্ধন সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ যদি এখনও তাঁহাদের কু-শিক্ষার কু-প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সম্মুখে অ্যাসেম্ব্লির ক্যাবিনেটরূপী যে চাতুরীজাল বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার ফলে যেমন হিন্দুর মধ্যে দলাদলির সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সেইরূপ আবার মুসলমানের মধ্যেও দলাদলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এক কথায় ভারতবাসী বর্ত্তমানে যেরূপ হিন্দু ও মুসলমান নামক দুইটী প্রবল দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে সাবধান হইতে না পারিলে হিন্দুর মধ্যে যেমন অসংখ্য দলের বৃদ্ধি পাইবে, সেইরূপ মুসলমানগণের মধ্যেও অসংখ্য দল দেখা দিবে এবং ভারতবাসীর জাতীয়তা-গঠনের আশা উত্তরোত্তর সুদূরপরাহত হইবে।

আমাদের মতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে চতুরতার সহিত চেষ্টা আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষকে এখনও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করা যায়।

কিন্তু সেই চতুরতা অথবা তাহার গবেষণার কোন চেষ্টার নিদর্শন কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস এবং হিন্দুর দেবমূর্ত্তি

এবারকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসবের উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুইটি, যথা :—

(১) ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণের অনুপস্থিতি ;

(২) বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের অনুপস্থিতি।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি ব্যাপার সর্ব্বসাধারণের প্রণিধানযোগ্য। যথা :—

(১) প্রকাশ্য রাস্তায় রণ-রঙ্গিণীবেশে বাঙ্গালী যুবতী ছাত্রীগণের সঙ্গীত ;

(২) ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতা।

পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে, প্রথমোক্ত দুইটি ঘটনা এবারকার বৈশিষ্ট্য আর শেষোক্ত ব্যাপার দুইটি প্রতি বৎসরের বৈশিষ্ট্য। যাঁহারা বৈশেষিক দর্শনের "সামান্য" ও "বিশেষ" সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এবারকার বৈশিষ্ট্য এবং প্রতি বৎসরের বৈশিষ্ট্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে উপভোগ করিতে পারিবেন।

এই উৎসবে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণের না আসিবার যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাগে হিন্দু দেবতার প্রতিমূর্ত্তির বিদ্যমানতা অন্যতম।

মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে অবশ্যপালনীয় বলিয়া যে সমস্ত বিষয় মুসলমান ছাত্রদিগকে আজকাল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তন্মধ্যে "হিন্দুর দেব-দেবীকে অবজ্ঞা করা" অন্যতম।

হিন্দুর দেব-দেবীকে অবজ্ঞা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিলে মুসলমান ধর্ম্মে পাতিত্য উপস্থিত হয়, ইহা গত কয়েক শত বৎসর হইতে অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম্ম-যাজকগণ প্রচার করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু স্বয়ং নবী মহম্মদ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মুসলমান ধর্ম্ম-যাজকগণ এতাদৃশ কোন উপদেশ দিয়াছেন কি না, তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কোন জিনিষকে অথবা কোন ব্যবহারকে অবজ্ঞা করিবার উপদেশ "কোরাণে"র কোন্ স্থানে আছে, তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম-যাজকগণের নিকট অনুসন্ধান করিবার জন্য মুসলমান ছাত্রদিগকে আমরা অনুরোধ করিতে চাই।

আমাদের মতে ঐজাতীয় কোন কথা বিশ্বত্রাতা নবী মহম্মদের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় থাকিতে পারে না এবং নাই।

হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্ত্তি কি বস্তু, তাহা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে উহা কাহারও অবজ্ঞেয় হইতে পারে না। হিন্দুর দেব-দেবী কি বস্তু, তাহা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, জগতে একদিন মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র অধিকাংশ মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে পারিত। জগৎ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতাদৃশ উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তখন জগতের সমগ্র মানুষের মধ্যে একমাত্র "মানব-ধর্ম্ম" বিদ্যমান ছিল। তখন মানুষের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই। ঐ উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান ভাষায় উহার একটিকে ব্যাবহারিক অংশ এবং অপরটিকে বীজাংশ বলা যাইতে পারে। মানুষের উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক অংশ যাহাতে জগতের সর্ব্বত্র বুঝিবার উপযোগী হয়, তজ্জন্য উহা প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আর উহার বীজাংশ কেবল একটি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভাষায় ঐ ভাষাকে বীজভাষা বলা যাইতে পারে, কারণ, ঐ বীজভাষা হইতেই প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষার অভ্যুদয় হইয়াছে এবং ঐ বীজভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে সমস্ত ভাষাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। উপরোক্ত প্রাচীন বীজভাষায়, সংস্কৃত ভাষায়, হিব্রু ভাষায় এবং আরবী ভাষায় উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত গ্রন্থকে যেরূপ হিন্দুর গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, সেইরূপ বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমানের গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কারণ, যখন ঐ গ্রন্থগুলি লেখা

হইয়াছিল, তখন সমস্ত মানুষই "মানবজাতি" নামক একটি জাতির অন্তর্গত ছিল এবং মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ছিল না।

ঐ গ্রন্থগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং মানুষ তাহা এখনও পড়ে, কিন্তু কেহই তাহার তাৎপর্য্য যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারে না; কারণ, বহু সহস্র বৎসর হইতে ঐ চারিটি ভাষাই মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছে। ঐ চারিটি ভাষা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে বলিয়াই মানুষের উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানও বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়াছে এবং যেদিন হইতে মানুষের উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি অল্পাধিক আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্মৃতির মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তিও ততই বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে জগৎ এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, যখন মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছিল। যখন মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছিল, তখন প্রাকৃতিক কারণে জগতের তিনটি বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমশঃ ভগবৎসদৃশ তিনটি মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। একজনের নাম ভগবান্ বুদ্ধ, দ্বিতীয় জনের নাম ভগবান্ খৃষ্ট এবং তৃতীয়জনের নাম নবী মহম্মদ। ঐ তিন মহাত্মার আবির্ভাব না হইলে, তখনই জগতে মানবজাতির ইতিহাস বিভিন্ন রূপ ধারণ করিত। ভগবান্ বুদ্ধের নিকট পুনরায় সংস্কৃত ভাষা, ভগবান্ খৃষ্টের নিকট হিব্রুভাষা, নবী মহম্মদের নিকট আরবী ভাষা প্রস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। তাঁহারা আবার মানবজাতির উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক অংশ জগৎকে যথাযথ শুনাইয়া দিয়াছিলেন এবং মানবজাতি তখনকার মত রক্ষা পাইয়াছিল। তাৎকালিক মানবজাতিকে উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক অংশ তাঁহারা যথাযথভাবে শুনাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনজনের কেহই প্রাচীন সংস্কৃতভাষা, অথবা প্রাচীন হিব্রুভাষা, অথবা প্রাচীন আরবীভাষা কাহাকেও যথাযথভাবে শিখাইয়া যাইবার অবসর পান নাই।

ফলে, তিনজনেরই মৃত্যুর পর, তাঁহাদের তিনজনেরই শিষ্যগণ তিনজনেরই উপদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে আবার জগৎ হইতে মানুষের উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নবী মহম্মদের মৃত্যুর পর তিন চার শত বৎসরের মধ্যেই আবার জগতের সর্বত্র মানুষের মধ্যে আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি দেখা দিয়াছে এবং উহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গত ত্রিশ বৎসর হইতে মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমরা সকল ধর্ম্মের ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিতে চাই যে, এখন আর কোন ধর্ম্মের ধর্ম্মযাজকগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম কি, তাহা যথাযথভাবে বুঝাইতে পারেন না এবং ইহারই জন্য মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

যাঁহারা নবী মহম্মদের কথিত কোরাণের উপদেশ যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং মানুষ নবী মহম্মদের কথায় দুঃখকষ্ট হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া সম্মান করিত। কিন্তু এখন আর কেহ তাঁহার উপদেশ যথাযথ ভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না এবং তাহা পারেন না বলিয়াই অত বড় সুমহান্ ধর্ম্মের উপাসক হইলেও মানুষ দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে প্রায়শঃ অব্যাহতি পায় না।

যাঁহাদের উপদেশে এত শান্তি থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাঁহাদের কথা বিনা বিচারে সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লওয়া কোন মুসলমান ছাত্রের পক্ষে পরামর্শযোগ্য কি না, তাহা আমরা তাঁহাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যে হিন্দু-দেবতার মূর্ত্তি আমাদের মুসলমান ছাত্রদিগের এত অধিক অবজ্ঞার যোগ্য হইয়াছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাগে ঐ মূর্ত্তির বিদ্যমানতা বশতঃ তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তির কল্পনা কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষের প্রাণে উদ্ভূত হইয়াছিল,

তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, ঐ মূর্ত্তির প্রতি যুক্তিসঙ্গত-ভাবে এত অবজ্ঞাশীল হওয়া চলে না। হিন্দু-দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া যে সমস্ত মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তি কাহার মূর্ত্তি এবং কোন্ উদ্দেশ্যে তাহার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, তাহা যখন মানুষ আবার যথাযথ ভাবে জানিতে পারিবে, তখন ঐ সকল মূর্ত্তির প্রতি অবজ্ঞাশীল হওয়া ত' দূরের কথা, উহার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক মানুষ উপলব্ধি করিবে।

এখনও যাঁহারা অর্থের স্বচ্ছলতা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, সেইরূপ স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। অর্থের অভাব যেরূপ [illegible] ক্লেশদায়ক, ব্যাধি-যন্ত্রণার ক্লেশ তাহার তুলনায় হিসাবে কম নহে, পরন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক। তাই মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ ক[illegible] পারিয়াছিল, তখন একদিকে যে রকম অর্থাভাব হইতে কি করিয়া মুক্ত হইতে পারা যায়, তাহার চিন্তা মানুষের হৃদয়কে দখল করিয়া বসিয়াছিল, সেইরূপ আবার ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অবসাদ হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপভাবে সর্ব্বদা মস্তিষ্কের পরিশ্রমে নিবিষ্ট থাকিতে পারা যায়, তাহার গবেষণা মানুষের অন্যতম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কি করিয়া ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অবসাদ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা মস্তিষ্কের পরিশ্রমে নিবিষ্ট থাকিতে পারা যায়, তাহার গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিল যে, কেন মানুষের শরীরে ব্যাধি ও অবসাদের উদ্ভব হয়, তাহা না জানিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অবসাদ হইতে মুক্ত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। এই সঙ্গে মানুষ আরও বুঝিতে পারিল যে, মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব কোন্ কোন্ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের মিলনে গঠিত (Anatomy) এবং মানুষের শরীর-বিধানের কার্য্যগুলিই (Physiological operations) বা কি, তাহা স্ব স্ব অবয়বের মধ্যে অনুভব করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলে, মানুষের শরীরে ব্যাধি ও অবসাদের উদ্ভব হয় কেন, তাহা নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। এই বিষয় লইয়া আরও অগ্রসর হইয়া মানুষ বুঝিতে পারিল যে, মানুষের অবয়বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসংখ্য এবং তাহার শরীর-বিধানের কার্য্যও অসংখ্য। ক্রমে ক্রমে তাহার আরও প্রতীতি হইল যে, ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (Anatomical parts) ও শরীর-বিধানের কার্য্য (Physiological operations) আপাতদৃষ্টিতে অসংখ্য বটে, কিন্তু মূলতঃ তাহা কতকগুলি প্রধান প্রধান শরীর-বিধানের কার্য্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং শরীর-বিধানের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি (Physiological operations) স্বীয় অবয়বের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিলে, সমগ্র শরীর-বিধানের কার্য্য (Physiological operations) ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (Anatomical parts) উপলব্ধি করিতে পারা [illegible]

যে যে [illegible] প্রধান শরীর-বিধানের কার্য্য হইতে সমগ্র শরীর-বিধানের [illegible] ও সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব [illegible] সেই প্রধান প্রধান শরীর-বিধানের কার্য্য মোট চব্বিশটি এবং তাহাই মানুষের প্রধান প্রধান দেবতা। দে[illegible] বস্তু, তাহা যেমন সংস্কৃত ভাষায় অথর্ব্ব-বেদে লি[illegible]ছে, সেইরূপ উহা যে প্রাচীন হিব্রু-ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় কোরাণে লিখিত রহিয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এখন আর মানুষ তিনটি প্রাচীনতম ভাষার কোনটিই যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারে না বলিয়া কেহই আর দেবতা যে কি বস্তু, তাহা মানুষকে যথাযথ ভাবে বুঝাইতে পারেন না।

উপরোক্ত ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন দেবতার মূর্ত্তি প্রকৃত পক্ষে মানুষের শরীর-বিধানের বিভিন্ন কার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি অথবা ফটো। এক এক দেবতার মূর্ত্তিতে, শরীর-বিধানের এক এক কার্য্য প্রধানতঃ যে যে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ লইয়া যে যে ভাবে গঠিত হইয়া থাকে, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত থাকে। এক এক দেবতার মন্ত্রে শরীর-বিধানের ঐ ঐ কার্য্য নিজ নিজ অবয়বের মধ্যে কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইতে পারিয়াছিল, তখন এইরূপ ভাবে সমগ্র শরীর

বিধানের কার্য্য (Physiological operations) ও সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (Anatomical parts) পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই ঘরে ঘরে প্রতিদিন একটি একটি দেবতার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে তাহার মন্ত্রের সাহায্যে শরীর-বিধানের এক একটি কার্য্য নিজ নিজ দেহাভ্যন্তরে অনুভব করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত করিয়াছিল।

আমাদের এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি কোন দেবতার মূর্ত্তিকে অথবা কোন দেবতার আসল পূজাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা চলে ?

আমাদের আশা আছে যে, আমাদের এই কথার সত্যতা সমগ্র মনুষ্যসমাজ অদূরভবিষ্যতে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এইখানে উপসংহারে ছাত্রসমাজকে তাহাদের আর একজন অর্দ্ধশিক্ষিত প্রৌঢ় ছাত্র বলিতে চায় যে, প্রাণাধিক দুলালগণ, মনুষ্যসমাজ বড় দুঃসময়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

ঐ দুঃসময়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা যাঁহাদিগের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছি—তাঁহারা কেহ যে ঐ দুঃসময়ের মাত্রা সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কোন সাম্প্রদায়িক ঝগড়ায় মত্ত হইলে চলিবে না। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা মুসলমান হই, অথবা হিন্দু হই, অথবা বৌদ্ধ হই, অথবা খৃষ্টান হই—আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। আমরা মানুষ বলিয়াই আমরা ধর্ম্মের কথা বলিতে পারি। মানুষ না হইলে কোন ধর্ম্মের কথা আমাদের মুখ হইতে নির্গত হইত না। কাযেই আমরা প্রত্যেকে যে মানুষ, তাহাই আমাদিগকে আগে বুঝিতে হইবে এবং তাহা বুঝিতে পারিলে তখন কি আর সাম্প্রদায়িকতার এত তীব্রতা বিদ্যমান থাকিতে পারে? সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সেই শিক্ষা যাচ্ঞা কর, যে শিক্ষায় নিজ নিজ 'মনুষ্যত্ব' উপলব্ধি করা যায়, আর চাও সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রের মনুষ্যত্বব্যঞ্জক ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী সবলতা অর্জ্জিত হইতে পারে।

মুসলমান ছাত্রগণের নিকট আমাদিগের নিবেদন, "ভাই, তোমরা হিন্দুদিগের জাতিভেদকে যখন এত ঘৃণা কর, তখন তোমাদিগের পক্ষে মানুষের মধ্যের জাতিভেদকে এত মানিয়া লওয়া শোভনীয় কি? মানুষের মধ্যের জাতিভেদ না মানিয়া লইলে হিন্দু, খৃষ্টান এবং মুসলমান প্রভৃতি কথা থাকিতে পারে কি ?"

শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বলিতে চাই যে, তাঁহার এবারকার বক্তৃতাটিও কতকগুলি পরস্পরবিরোধী ভাব-ব্যঞ্জক কথায় পরিপূর্ণ। যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, তিনি পর্য্যন্ত ছাত্রগণের সম্মুখে যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে কার্য্য-কারণের সঙ্গত শৃঙ্খলাযুক্ত সুসমঞ্জসভাবে পরিপূর্ণ নহে, ইহা প্রমাণিত হইলে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চার বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ হইতেছে, ইহা বুঝিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও বুঝিতে হয় যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর শিক্ষা লইয়া একটা ছেলেখেলা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কাযেই, শ্যামাপ্রসাদবাবু যতদিন পর্য্যন্ত ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার দায়িত্ব যে অত্যন্ত অধিক, তাহা তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার এবারকার বক্তৃতাটি যে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের (self-contradictory) কথায় পরিপূর্ণ এবং তাহাতে যে কেবলমাত্র আত্মবিজ্ঞাপনের চেষ্টা আছে, কিন্তু কোন চিন্তাশীলতার পরিচয় নাই, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা প্রমাণিত করিব।

আমরা এখনও তাঁহাকে এতাদৃশ হাস্যোদ্দীপক বক্তৃতা হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করি।

বাঙ্গালার যুবতীবৃন্দকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রহসন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী না করিয়া, যুক্তিসঙ্গতভাবে সময়ের স্রোতকেই হয় ত' অধিকতর দায়ী করিতে হয়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদবাবু যদি ভাল নাবিক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাহা হইলে কি উপায়ে স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকার অগ্রগতি সম্পাদিত করিতে হয়, তাহা সাধনার দ্বারা তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে। উহা কি এতই অসম্ভব!

ছাত্রদিগের ব্যবসা-শিক্ষা ও বেকার-সমস্যার সমাধান

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে ব্যবসা ও বাণিজ্য শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্যর এডওয়ার্ড বেন্থল মিলিত হইয়া করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালীর বেকারসমস্যা-সমাধানের সহায়তা হইবে। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে যে সমস্ত মন্তব্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, যে ব্যবস্থাসমূহ সাধিত হইলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, সেই ব্যবস্থাসমূহ সম্পাদিত করিবার বন্দোবস্ত শ্যামাপ্রসাদ বাবু করিতে পারিয়াছেন এবং শীঘ্রই ছাত্রগণ উহা শিক্ষা করিয়া এক একজন দিগ্বিজয়ী ব্যবসাদার হইতে পারিবেন। দৈনিক সংবাদপত্রের কোন কোন সম্পাদক যে সমস্ত মন্তব্য দ্বারা শ্যামাপ্রসাদ বাবুর জয়ঢাক বাজাইয়া তাঁহার স্বীয় ক্রটীতে অন্ধ হইবার সহায়তা করিয়া থাকেন এবং পরোক্ষভাবে বাঙ্গালার ছাত্রগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কোন কার্য্য বস্তুতঃ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশংসার যোগ্য হইলে, আমরাও প্রাণ খুলিয়া তাহা কীর্ত্তন করিতে পারিতাম।

আমাদের মতে, যাঁহার হস্তে বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার ভার ন্যস্ত, তিনিই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বার-আনী নিয়ন্তা। যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার ভার কয়েক বৎসর হইতে ন্যস্ত হইয়া আসিতেছে, তাঁহারা কার্য্যকুশল ও কার্য্যক্ষম নহেন। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকুশল ও কার্য্যক্ষম হইলে আজ বাঙ্গালার যুবকবৃন্দকে আর্থিক অভাবে, মানসিক অশান্তিতে এবং শারীরিক অস্বাস্থ্যে জর্জ্জরিত হইতে হইত না এবং যে বাঙ্গালার জমী এখনও জগতের যে কোন দেশের, অথবা ভারতের যে কোন প্রদেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন, সেই বাঙ্গালার প্রায় ঘরে ঘরে আজ গৃহস্থগণের অন্ন-সমস্যায় ও স্বাস্থ্য-সমস্যায় আন্দোলিত হইতে হইত না। যাহাতে ছাত্রগণ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে কোন্ উপায়ে অর্থসমস্যা অথবা শারীরিক স্বাস্থ্যসমস্যা অথবা মানসিক অশান্তির সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে, তাহা মানুষের পক্ষে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। যে শিক্ষায় মানুষের যে কোন অবস্থায় তাহার অর্থ-সমস্যা, শারীরিক স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং মানসিক অশান্তির সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে, সেই শিক্ষাকে মানুষ আবহমান কাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া আখ্যাত করিয়া আসিতেছে এবং যে শিক্ষায় ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হইয়া, ঐ সমস্যাসমূহের জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাকে মানুষের ভাষায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে কু-শিক্ষা বলিতে হয়। যাঁহারা "কু-শিক্ষা"কে কু-শিক্ষা না বলিয়া "আসল শিক্ষা" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা সন্দেহ-জনক।

উপরোক্ত হিসাবে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থার দিকে নিরীক্ষণ করিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে যে কতখানি যোগ্যতা আছে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে।

গত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ভাষাবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞানের নামে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা লিখিয়া লেখকগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে পি, এইচ, ডি প্রভৃতি উচ্চ উপাধিসমূহ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সমস্ত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের অন্যতম সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যদি কোন প্রবন্ধের বক্তব্য পরিস্ফুট না হওয়া সত্ত্বেও, অথবা তাহার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) উক্তি থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রবন্ধকে লেখকের প্রতিভা-মূলক উপাধির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রবন্ধের পরীক্ষকগণ পর্য্যন্ত যে অযোগ্য, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতে হয়। গত পঁচিশ বৎসরের ভিতর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান এবং অর্থ-

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা লিখিয়া তাহার লেখকগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে উচ্চ উপাধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন একখানি গ্রন্থও পাওয়া যাইবে না, যে গ্রন্থখানি উপরোক্ত দুইটি দোষ, অর্থাৎ বক্তব্যের অপরিচ্ছন্নতা এবং পরস্পর-বিরোধী উক্তির বিদ্যমানতা হইতে মুক্ত।

এইরূপ ভাবে দেখিলে, একদিকে যেরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক কর্ত্তৃপক্ষগণের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে অযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেইরূপ আবার বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে ক্রমশঃই কিরূপ অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বাঙ্গালার শিক্ষাক্ষেত্রে যে কিরূপ 'ব্যাঘ্রোচিত' হৃদয়হীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

অধিকাংশ বাঙ্গালীরই আর্থিক অবস্থা যে ক্রমশঃ শঙ্কার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; অথচ ৩০।৩৫ বৎসর আগে স্কুলের বেতন, পুস্তকক্রয় ও পরীক্ষার ফি বাবদ যে খরচ গড়ে মাসিক দুই টাকায় নির্ব্বাহিত হইতে পারিত, সেই খরচ নির্ব্বাহ করিতে হইলে এখন গড়ে মাসিক প্রায় সাত টাকার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে শ্রেণীর বেতন ৩০।৩৫ বৎসর আগে ছিল দুই টাকা,সেই শ্রেণীর বেতন এখন প্রায়শঃ ৩৲ এবং স্থানে স্থানে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। যে পরীক্ষার ফি, একদিন ১০৲ দশ টাকা ছিল, এখন তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৫৲ টাকা। যে পুস্তক বাবদ একদিন গরীব ছাত্রদিগের কার্য্যতঃ প্রায়শঃ কোন খরচের প্রয়োজন হইত না, সেই পুস্তক বাবদ এক্ষণে বাৎসরিক ৩০৲।৪০৲ টাকা খরচের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ৩০।৩৫ বৎসর আগে দরিদ্র ছাত্রগণ প্রায়শঃ পুরাতন পুস্তক অপরের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লইয়া পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে আর প্রায়শঃ পুরাতন পুস্তকের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কারণ প্রতি বৎসরেই প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতে নূতন নূতন পুস্তক প্রায়শঃ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসরের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হয়, যেন কয়েকজন গ্রন্থকারের পকেট পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই দরিদ্র ছাত্রদিগের পিতামাতার উপার্জ্জন লুণ্ঠন করিবার জন্যই ঐ গ্রন্থকারগণকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছেন।

শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য সমস্ত কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অযোগ্যতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় থাকা সত্বেও তাঁহারা যেরূপ আত্মমহিমা প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না এবং তাঁহাদের ঐরূপ প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সংবাদপত্রেরও যেরূপ অভাব হয় না, সেইরূপ, শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপরোক্ত "ব্যবসাশিক্ষা ও বেকার-সমস্যা"র পরিকল্পনা সর্ব্বৈব অসার হইলেও, তাহা লোক-সমক্ষে বাহির করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিবার সংবাদপত্রেরও অভাব হয় নাই।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ব্যবসা-শিক্ষার নূতন পরিকল্পনানুসারে বুঝিতে হয় যে, তাঁহার মতানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ যদি কোন শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশী করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই তাহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর উপরোক্ত অভিমত যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত ছাত্র শিল্প ও বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য সমুদ্রপারের বিভিন্ন দেশে যাত্রা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ ঐ ঐ দেশের বিভিন্ন বাণিজ্য-ও শিল্পের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। অথচ বিদেশপ্রত্যাগত ঐ ছাত্রগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারা ত' দূরের কথা, গভর্ণমেণ্টের চাকুরী না পাইলে দেশীয় কোন বাণিজ্য অথবা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া তাঁহারা যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন না—এই সত্য একটু অভিজ্ঞতার সহিত পর্য্যালোচনা করিলেই অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশী করিলেই যদি শিল্প ও বাণিজ্য যথাযথভাবে শিক্ষা করা সম্ভব হইত,

তাহা হইলে বিদেশ-প্রত্যাগত অধিকাংশ যুবকগণেরই উপরোক্তভাবে বিফল হইতে হইত কি ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপরোক্তভাবে ছাত্রদিগের শিল্প ও বাণিজ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বেকারসমস্যার সমাধানের সহায়তা করিতে পারিবেন বলিয়া যে প্রচার করিতেছেন, তাহার মূলেও কোন সত্য নাই।

একে ত' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পিত শিক্ষানবিশীতে স্বাধীনভাবে শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিদ্যা শিক্ষা করা সম্ভব হইবে না, তাহার পর আবার জগতের শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত বেশী লোকের চাকুরী সংস্থান করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট চাকুরীর সংখ্যা এক্ষণে যাহা রহিয়াছে, অদূরভবিষ্যতে তাহা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ত' দূরের কথা, বরং উহা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এতদবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করিবার জন্য উহার কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোনীত কাহাকেও চাকুরী দিতে হইলে ভাগ্যবান্ লোকের কতকগুলি অনুপযুক্ত সন্তানের সহায়তা করা হইবে বটে এবং তাহাতে ভাইস্-চ্যান্সেলারের বয়স্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কোন উপকার সাধিত হইবে না।

কাযেই, আমাদের মতে, শ্যামাপ্রসাদবাবু ও এডওয়ার্ড বেন্থলের বেকারসমস্যা-সমাধান-সম্পর্কীয় এই নূতন পরিকল্পনা একটি প্রকাণ্ড চাতুরীর পরিচয়। আমরা ছাত্রদিগকে ও জনসাধারণকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে বলিতে চাই যে, এতাদৃশ চাতুরীজালে যাহাতে নিরীহ জনসাধারণ বিধ্বস্ত না হয়, তাহা করা কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে ?

ছাত্রগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে শিল্প ও বাণিজ্য করিবার উপযোগী হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, ছাত্রগণ যাহাতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, কি হইলে মানুষ বুদ্ধিমান্ হয়, তাহা যাহাতে তাহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তৃতীয়তঃ, ছাত্রগণ যাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা যাহাতে হয়, চতুর্থতঃ, প্রকৃত বুদ্ধিমান্ না হইয়া কেবলমাত্র টীয়াপাখীর মত কতকগুলি বুলি উচ্চারণ করিতে শিখিয়া যাহাতে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি লাভ করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে।

এইরূপভাবে ছাত্রগণের প্রকৃত বুদ্ধি প্রকৃতভাবে গঠিত করিবার ব্যবস্থা হইলে, তাহাদিগকে যে-কোন কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হইবে এবং তখন তাহাদিগের স্বাধীনভাবে শিল্প ও বাণিজ্য করা অনায়াসসাধ্য হইবে। ছাত্রগণের যাহাতে প্রকৃত বুদ্ধির গঠন প্রকৃতভাবে সাধিত হয়, তাহা না করিয়া কতকগুলি টীয়াপাখীর মত উদ্গারিত বুলি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে বিভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত করিবার বাহার যতদিন থাকিবে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরিকল্পনাই উপরোক্তভাবে ছাত্রগণের অসাফল্যের সহায়তা করিতে থাকিবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

শিক্ষার বিস্তার ও মিথ্যার বিস্তার

ওসাকার আশাহী পাব্লিশিং কোম্পানী 'বর্ত্তমান জাপান' নামে একখানি ২০০ শত পৃষ্ঠার ইংরাজী বই প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে বহুবর্ণে রঞ্জিত চিত্রাদির সহায়তায় বর্ত্তমান জাপানের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য হিসাব, সংখ্যাহীন কাজের কথায় বইখানি ভরপুর। ইহার উপর লেখা হইয়াছে, "জাপান সর্ব্বতোভাবে শান্তির প্রার্থী। অন্য জাতির উপর অত্যাচার করিয়া, তাহাদের ভূমিজাত দ্রব্যের সহায়তায় জাপানী বাঁচিতে চাহে না, নিজেদের জাতিকেই এমনভাবে গঠিত করিতে চাহে। যাহাতে জাপানীরা জাপানেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইতে পারে।"

জার্ম্মানী বলিতেছে, জার্ম্মানরা শান্তিকামী, ইটালী বলিতেছে, ইটালীয়েরা শান্তিকামী, ইংলণ্ড বলিতেছে, ইংরাজেরা

শান্তিকামী, রুশিয়া বলিতেছে রুশীয়েরা শান্তিকামী, জাপানও বলিতেছে, জাপানীরা শান্তিকামী। অথচ পৃথিবীময় যুদ্ধের সম্ভার বাড়িয়া চলিতেছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটি জাতি যুদ্ধের উপকরণ বাড়াইতেছে। মানুষের মুখের কথা ও মনের কথার এমন পার্থক্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দিন দেখা যায় নাই। ব্যষ্টির হিসাবে যাহা মিথ্যা, সমষ্টির হিসাবেও তাহা মিথ্যা। এই দিক্ হইতে দেখিলে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিকেই 'মিথ্যাবাদী' বলিতে হয়। আশাহী পাব্লিশিং হাউস বলিতেছেন, তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মোট বিক্রয়সংখ্যা এখন ৩০ লক্ষেরও উপর। আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের সহিত কি মিথ্যার কোন সম্পর্ক আছে?

দাড়ীর কল্যাণে

বেলারির নাপিতেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে—কারণ, মিউনিসিপ্যালিটি হইতে 'দাড়ী কামাইবার জন্য সেলুন' পিছু দুই টাকা লাইসেন্স ফি দাবী করা হইয়াছিল। নাপিতেরা ইহার জন্য কলেক্টর সাহেবের নিকট ডেপুটেশন পাঠায়। শেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কি কুক্ষণেই মানুষ দাড়ী কামাইতে শিখিয়াছিল! বেলারী মিউনিসিপ্যালিটির যখন অর্থাভাব ঘটিয়াছে, তখন তাঁহারা আর একটি ব্যাপার করিতে পারেন। একদিকে তাঁহারা নাপিতদের উপর যেমন ট্যাক্স ধার্য্য করিবেন, তেমনই দাড়ীওয়ালা লোকের উপর আর একটি ট্যাক্স বসাইতে পারেন। ইহাতে 'সেলুন' গুলি ভাল চলিবে এবং স্বায়ত্ত-শাসনের পথে বেলারীবাসী আরও অগ্রসর হইবে।

কোটি কোটি

লর্ড ন্যুফিল্ড চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য অক্সফোর্ডকে ২০ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়া বিপদে ফেলিয়াছেন। তাঁহারা এখন জিও-লজী, ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রী, বোটানি ইত্যাদি সমস্ত বিভাগের জন্যই চাঁদার আবেদন করিয়া কাগজে এক বিবৃতি ছাপিয়াছেন। এমন কি, বড্‌লিয়েন লাইব্রেরীর জন্যও তাঁহারা চাঁদা চাহিয়াছেন।

এক দিকে কোটি কোটি টাকার যুদ্ধোপকরণ, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, মাঝখানে কোটি কোটি নিরন্ন ব্যক্তি—বর্ত্তমান যুগের নরনারীর কি বিচিত্র অভিযান! যদি কোন সিনেমা-কোম্পানী, এই 'আইডিয়া'কে ভিত্তি করিয়া একটি ফিল্ম প্রস্তুত করেন, তবে তাঁহারাও কোটি কোটি ডলার উপার্জ্জন করিবেন—কোটি কোটি বেকার ও কোটি কোটি মোটরকার-ওয়ালারা তাহা দেখিবেন!

মাঘমেলা

প্রয়াগের গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে কিছুদিন আগে যে মাঘমেলা হইয়া গিয়াছে, সেখানে সরকারী হিসাব মত ১২ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভীড়ের জন্য রেলওয়ে কোম্পানীকে প্রয়াগ-ঘাট এবং দারাগঞ্জ নামক স্থানে ষ্টেশন খুলিতে হইয়াছিল। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীর মেলাতেও ৪ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন।

এই যে পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীদের জনতা ভারতবর্ষের মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র দেখা যায়, (কত কাল হইতে যে, তাহার ইতিহাস কে জানে?) ইহার ভিতরকার রহস্যটা কি খুঁজিয়া বাহির করিতে কাহারও ইচ্ছা যায় না? নিতান্ত অর্থহীন ভাবে দুইটা ডুব দিবার জন্যই এই জনতা, না আরও কোন অর্থ ইহার পশ্চাতে কোনদিন ছিল?

রাংতার সাজ

করাচী মিউনিসিপ্যালিটি সহরের ফুটপাথসমূহ আর সাদামাঠা ভাবে সিমেণ্ট করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক নহে। তাহারা এখন ফুটপাথকে বহু বর্ণের সিমেণ্টে রঞ্জিত করিতে চাহে। এ পর্য্যন্ত করাচী মিউনিসি-প্যালিটি ফুটপাথ তৈয়ারি করিতে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিত, এখন এই রঞ্জনকল্পে শতকরা আরও দুই টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

একদিকে না খাইতে পাইয়া লোক মরিতেছে, অন্যদিকে দেশের মাটিকে রাংতা দিয়া মোড়া হইতেছে! মা-টিকে এমন রাংতা দিয়া মোড়াইবার সাধ না জাগিলে আর এত দুর্দ্দশা!

ব্যাকগ্রাউণ্ড

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষিত বেকার এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সভার এক মিটিং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এলাহাবাদের যুক্তপ্রাদেশিক মোটরকার-সমিতির গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

এই মিটিং-এ কি হয়, তাহা আমরা না জানিয়াও বলিতে পারি। সে কথা নহে, জিজ্ঞাস্য এই যে, মোটরকার-সমিতির গৃহে বেকারদের জন্য অশ্রুপাত অভিনব বটে! এ যেন নন্দন-কাননের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে চিতাশয্যা। আমরা 'এমেচার থিয়েটারে'র সিন-টাঙ্গানোর কারিগরি ব্যতীত এমত দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই।

নেপথ্যে

আসামের নাপুক নামক চা-বাগানে বিধবা সুপনা, বাগুনা মুণ্ডার স্ত্রী সুকুমারোর নিকট হইতে একটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বাগুনা মুণ্ডা টাকা চাহিতে গেলে সুপনার পক্ষ হইয়া রত্না মুণ্ডা বাগুনাকে দু'কথা শুনাইয়া দেয় এবং তাহাতেও খুশী না হইয়া রত্না বাগুনাকে অবশেষে দা ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহাকে মারাত্মকভাবে জখম করে। বিচারে রত্নার ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শহরের সোফা-কাচশোভিত ড্রইংরুমে বসিয়া এই শ্রেণীর সংবাদ পাঠ করিবার সময় এক চুমুক চা খাইতে খাইতে যাঁহারা 'মাই লর্ড!' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহারা কি জানেন, হয়তো হাতের কাপে যে-চা তৈয়ারী হইয়াছে, সেই চা-ই রত্না কি সুপনা, কি সুকুমারো, কি বাগুনা বাগানে তৈয়ারী করিয়াছে? রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কি হয়, তাহা মনে পড়িলে সভ্যতার এই সহস্র সজ্জা মুহূর্ত্তমধ্যে চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় না? মাত্র একটি টাকার জন্য যখন নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়া যায়, তখনও মানুষ সভ্যতার গর্ব্ব করে? আশ্চর্য্য!



'लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी'

ধান্যশ্রী

চৈত্র—১৩৪৩

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

ধর্ম্মসম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কলিকাতার বিশ্ব-ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

সূচনা

গত ১লা মার্চ্চ হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন হলে বিশ্ব-ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মসম্মেলনের এই অধিবেশনে যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাপার কয়টি উল্লেখযোগ্য :—

(১) বিবিধ সভাপতির বিবিধ বক্তৃতা।

(২) স্ত্রীলোকের সভাপতিত্ব।

(৩) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রতচারী নৃত্য।

(৪) জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট হইতে মানবজাতির পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত্রের কামনাজ্ঞাপনেচ্ছা।

যাঁহারা এতাবৎ সম্মেলনের এই অধিবেশনের বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল।

(২) স্বামী অভেদানন্দ জী।

(৩) ডাঃ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

(৪) শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু।

(৫) স্বামী পরমানন্দ।

(৬) স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড্।

(৭) মহম্মদ আলা সিরাজী।

(৮) ডাঃ ভাণ্ডারকার।

(৯) কাকা কালেলকার।

(১০) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ।

কলিকাতার বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যথাযথ হইয়াছে কি না, যে সমস্ত ব্যক্তিকে সভাপতিত্বের দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা এই দায়িত্বের উপযুক্ত কি না, বিভিন্ন সভাপতিগণ যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয়, এতৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে সন্ধান করিতে হইবে যে, ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা কি এবং এই প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হইলে কোন্ কোন্ ব্যবস্থার দিকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা কি কি এবং ঐ ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা বিষয়ে সতর্কতার আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাহা স্থির করিতে হইলে যে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

কি এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানলাভের উপায় কি, এবংবিধবিষয়ক অভিজ্ঞতা নিতান্ত আবশ্যকীয়—ইহা বলাই বাহুল্য।

শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার উপায়

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় কোন্ শব্দের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ কোন্‌টি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া।

কোন্ শব্দের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ যে কোন্‌টি, তাহা সঠিকভাবে স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ মানুষের শব্দ কেন উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ চুপ করিয়া না থাকিয়া স্বভাবতঃ মানুষ কথা কহে কেন; দ্বিতীয়তঃ, মানুষের শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা উৎপন্ন হয় কেন; অর্থাৎ, বিভিন্ন রকমের শব্দোচ্চারণে এবং শ্রবণে বিভিন্ন রকমের প্রয়াস পাইতে হয় কেন; তৃতীয়তঃ, শব্দোচ্চারণে মানুষ যে রকম বিভিন্ন রকমের পদের সৃষ্টি করিয়া থাকে, অন্য কোন জীব তাহা পারে না কেন; চতুর্থতঃ, শব্দোচ্চারণে মানুষের কথায় বিভিন্ন রকমের পদ গঠিত হয় কেন এবং এই বিভিন্নতার মূল উৎস কোথায়; পঞ্চমতঃ, মানুষের কথাবার্ত্তায় কেবলমাত্র অসংলগ্ন পদ না থাকিয়া বাক্যের (sentence) উদ্ভব হয় কেন; ষষ্ঠতঃ, মানুষের কথায় যে যে বিভিন্ন পদের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহার সমতা কোথায় এবং বিভিন্নতার মূল উৎসই বা কোথায়—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। শব্দ-বিজ্ঞানের উপরোক্ত প্রথম দুইটি তথ্যের নাম বর্ণস্ফোট, তৎপরবর্ত্তী দুইটি তথ্য অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ তথ্য দুইটির নাম পদ-স্ফোট এবং শেষ দুইটি তথ্য, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ তথ্য দুইটির নাম বাক্য-স্ফোট। বর্ণ-স্ফোট, পদস্ফোট এবং বাক্য-স্ফোট সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, মানুষের মুখ হইতে অ-কারাদি ও ক-কারাদি-চৌষট্টিটি বর্ণ কেন নিঃসৃত হইয়া থাকে, অ-কারকে ক-কার না বলিয়া অ-কার কেন বলা হয়, এবংবিধ রহস্যপূর্ণ তথ্যগুলি অতি সুন্দর ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং তখন বুঝিতে পারা যায় যে, শরীর-বিধানের বিভিন্ন কার্য্যবশতঃ (due to various physiological operations) প্রত্যেক শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিহার্য্য (অর্থাৎ নিত্য) সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই কোন শব্দের যথেচ্ছ অর্থ স্থির করা—শব্দ-বিজ্ঞানসম্মত নহে এবং কোন যথেচ্ছ অর্থ নির্ভরযোগ্যও নহে। এইরূপ ভাবে শব্দ-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আরও জানা যাইবে যে, কোন্ শব্দের স্বভাবসম্মত অর্থ কি, তাহা সঠিক ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার একমাত্র উপায় স্ফোট-বিদ্যা অর্জ্জন করা।

কি উপায়ে উপরোক্ত স্ফোট-বিদ্যা অর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যাইবে যে, সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দ-স্ফোট সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত রহিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উহার কতকগুলি ভারতীয় ঋষিগণের দ্বারা এবং তাঁহাদের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের দ্বারা লিখিত, আর কতকগুলি তৎপরবর্ত্তী ভট্ট, আচার্য্য মিশ্র এবং স্বামী পদবীধারী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রণীত। ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র এবং স্বামী পদবীধারী পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা স্ফোটবাদের বিশ্লেষণ করিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নাগেশভট্ট, কৌণ্ডভট্ট এবং কুমারিল ভট্টের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা স্ফোট-বাদ বিশ্লেষণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই পাণ্ডিত্যের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রাধ্যয়নের বহর বিস্ময়-উৎপাদক বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কেহই ঐ স্ফোটবাদকে পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের এইবিষয়ক কথাগুলি প্রায়শঃ প্রয়োগের অযোগ্য। স্ফোটবাদ সম্বন্ধে ঋষিদিগের অথবা উহাঁদের সমসাময়িক পণ্ডিতদিগের প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার যে কোন খানিতে হস্তক্ষেপ করা যা'ক না কেন, তাহার সাহায্যেই স্ফোটবাদের কোন না কোন তথ্য নির্ভুলভাবে অল্পাধিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ঋষিগণের ও তাঁহাদের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের প্রণীত যে কোন গ্রন্থই অধ্যয়ন করা যা'ক না কেন, তাহা হইতে স্ফোটবাদের কোন না কোন তথ্য অল্পাধিক পরিমাণে নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু একমাত্র অথর্ব্ববেদ ছাড়া ঐ সমস্ত গ্রন্থের আর

কোন খানি হইতে উহার সমস্ত তথ্য (theoretical portions) সম্পূর্ণ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। স্ফোটবাদের সমস্ত তথ্য (theoretical portion) অথর্ব্ব-বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু কি করিয়া উহার অভ্যাস করিতে হয়, তাহার বিধি (practices) অথবা বিবিধ স্থানে উহার প্রয়োগ করিবার নিয়ম (applications) কি কি, তাহা অথর্ব্ববেদ হইতে অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু সম্যক্ ভাবে তাহা আয়ত্ত করা যায় না। অভ্যাস করিবার বিবিধ প্রণালী (practices) লিপিবদ্ধ আছে ঋক্, সাম এবং যজুঃ নামক তিনটি বেদে এবং উহার প্রয়োগ করিবার নিয়ম (applications) সম্পূর্ণভাবে দেখান হইয়াছে পাণিনি-সূত্রপাঠ নামক বেদাঙ্গে।

কাযেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে শব্দ-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পরিমাণে সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যেমন অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিনটি বেদের ও পাণিনি-সূত্রপাঠের জ্ঞান লাভ করিবারও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবে বেদাঙ্গ ও বেদের সাহায্যে শব্দ-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্যক্ ভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, স্ফোট-বাদের সম্পূর্ণ তথ্য (theoretical portion) যেমন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অথর্ব্ব-বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ আবার উহা প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলে এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণেও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শব্দ-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্যক্ ভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে আরও দেখা যাইবে যে, স্ফোট-বাদের সম্পূর্ণ তথ্য প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়, অথবা প্রাচীন হিব্রু ভাষায়, অথবা প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিয়া উঠা সম্ভব-যোগ্য বটে, কিন্তু উহা ঐ তিনটি ভাষা ছাড়া ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, বাঙ্গালা, জার্ম্মানী, আধুনিক সংস্কৃত, আধুনিক হিব্রু, আধুনিক আরবী প্রভৃতি আর কোন লৌকিক অথবা প্রাদেশিক ভাষায় সম্পূর্ণ পরিমাণে লিখিত হওয়া সম্ভব নহে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, একমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী ছাড়া আর কোন ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে স্ফোট সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য কথা পাওয়া যায় না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যেরূপ "ধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার "ধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝায়, তাহা সম্যক্ পরিমাণে নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, হয় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, নতুবা প্রাচীন হিব্রু ভাষা, নতুবা প্রাচীন আরবী ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনে মানুষের প্রয়োজনীয় কোন কথা **নির্ভুলভাবে** বলিতে হইলে ঐ তিনটি ভাষার অন্ততঃ পক্ষে একটি ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা না করিয়া যদি কেহ কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনে বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য কোথায়

প্রত্যেক "শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার উপায় কি," তৎসম্পর্কে আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে কি উপায়ে এবং কেন মানুষের মুখ হইতে বর্ণ উচ্চারিত হইতেছে, কি উপায়ে এবং কেনই বা বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন পদের উদ্ভব হইতেছে এবং কি উপায়ে ও কেনই বা বিভিন্ন পদ মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন বাক্যের (sentence) উদ্ভব হইতেছে, এই তিনটি তথ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে এবং ঐ তিনটি তথ্য শরীর-বিধানের কার্য্যের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। ঐ তিনটি তথ্যকে এতদ্দেশীয় লৌকিক ভাষায় যথাক্রমে বর্ণ-স্ফোট, পদ-স্ফোট এবং বাক্য-স্ফোট বলা হইয়া থাকে। এই তিনটি স্ফোট-

বিদ্যার উপর যে ভাষা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা।

আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, মানুষ যে-কোন লৌকিক ভাষায় সাধারণতঃ পরস্পরের মধ্যে মনোভাব আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর সমস্ত অবস্থা কোন লৌকিক ভাষায় সম্যক্ ভাবে ব্যক্ত করা, অথবা উহা লৌকিক ভাষার জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

প্রসঙ্গান্তরে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তুর তিনটি অবস্থা আছে। একটির নাম "ব্যক্ত", অপরটির নাম "অব্যক্ত" এবং তৃতীয়টির নাম "জ্ঞ"। যে কোন বস্তুই উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যা'ক্ না কেন, প্রত্যেক বস্তুর যে তিনটি অবস্থা আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি যে কলমটির দ্বারা লিখিতেছি, সেই কলমটি আমি ধরিয়াছি আমার অঙ্গুলির দ্বারা। অঙ্গুলির কিয়দংশ আমার চক্ষুর নিকট "ব্যক্ত", কিন্তু শরীর-বিধানের কোন্ কার্য্যবশতঃ কোন্ শক্তি যে আমার অঙ্গুলিগুলি কলমটিকে ধরিতে সক্ষম করিয়াছে, তাহা আমার নিকট "অব্যক্ত"। শরীর-বিধানের কোন্ কার্য্য এবং কোন্ শক্তিবশতঃ যে আমার অঙ্গুলিগুলি কলমটিকে ধরিতে পারিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যাইবে যে, অঙ্গুলির যে শরীর-বিধানের কার্য্য এবং শক্তিবশতঃ আমার পক্ষে কলমটিকে ধরা সম্ভব হইয়াছে, শরীর-বিধানের সেই কার্য্য এবং শক্তি, এই উভয়ই আমার চর্ম্মচক্ষুর নিকট অব্যক্ত বটে, কিন্তু অঙ্গুলিটির ঐ শরীর-বিধানের কার্য্য ত্বকের স্পর্শের দ্বারা ও অঙ্গুলির ঐ শক্তি বুদ্ধির স্পর্শের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ ভাবে বস্তুর যে অংশ চর্ম্মচক্ষু অথবা কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহার নাম "ব্যক্ত"-ভাব, যে-অংশ চর্ম্ম-চক্ষু বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করা যায়, সেই অংশের নাম "অব্যক্ত", আর যে অংশ ত্বকের দ্বারাও স্পর্শ করা যায় না বটে, কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়, সেই অংশের নাম "জ্ঞ" ভাগ।

প্রত্যেক বস্তুর ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ-নামক তিনটি অংশ আছে এবং কোন লৌকিক ভাষার দ্বারা ঐ তিনটি ব্যবস্থা প্রকাশ করা অথবা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না—এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে যে, লৌকিক ভাষার দ্বারা কোন বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান অথবা ঐ বস্তু-বিষয়ক সম্যক্ বিজ্ঞান বর্ণনা করা অথবা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। পরন্তু কোন বস্তুর নির্ভুল জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, অথবা তাহা বুঝিতে হইলে, স্ফোট-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। সংস্কৃতভাষার এতখানি সম্পূর্ণতা এবং লৌকিক ভাষার এতখানি অসম্পূর্ণতা যে কেন হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে সংস্কৃতভাষায় এবং লৌকিক ভাষায় পার্থক্য কোথায়, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। এই পার্থক্য সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে এক দিকে যে রকম কেবলমাত্র প্রকৃতির সাহায্যে ভাষা কতখানি স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তাহা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার সাধনার দ্বারা প্রাকৃতিক ভাষার উন্নতি সাধন করিবার উপায় কি, তাহা, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন হয়।

প্রাকৃতিক ভাষার এবং সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ জ্ঞান অতি বৃহৎ ব্যাপার। তাহা এই প্রবন্ধে সম্যক্ বর্ণনা করা সম্ভবযোগ্য নহে।

লৌকিক ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার মোটামুটি পার্থক্য কোথায়, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার কোন বাক্যের অর্থ তন্নিহিত পদের অর্থ এবং ঐ পদ-লিখিত বর্ণের অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষার কোন পদের অর্থ তন্নিহিত বর্ণের অর্থের সমন্বয় ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না এবং কোন বাক্যের অর্থে তদন্তর্গত পদের অর্থের অন্যথা কোন প্রকারে হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১২০৪ এই সংখ্যাটিকে ধরিয়া, ঐ সংখ্যাটি যে "এক হাজার, দুই শত, এবং চারি", তাহা স্থির করিতে হইলে যেরূপ উল্লিখিত ১, ২, ০, ৪, এই চারিটি সংখ্যার প্রত্যেকটির দিকে এবং একটি যে চতুর্থ স্থানে, দুইটি যে তৃতীয় স্থানে, শূন্যটি যে দ্বিতীয় স্থানে এবং চারিটি যে প্রথম স্থানে আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার কোন পদের

অর্থ যথাযথভাবে স্থির করিতে হইলে তন্নিহিত প্রত্যেক বর্ণের এবং কোন্ বর্ণটি কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হয়। লৌকিক ভাষার কোন পদের অর্থ স্থির করিতে হইলে ঐরূপ ভাবে তন্নিহিত বর্ণের অর্থের দিকে অথবা বর্ণ-সমন্বয়ের দিকে দৃকপাত করিবার প্রয়োজন হয় না। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, জার্ম্মান, জাপানী, চীনা, তিব্বতী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার প্রত্যেকটি লৌকিক ভাষা। আধুনিক সংস্কৃত ভাষাকে অনেকে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু উহাও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নহে। উহাও বস্তুতঃ পক্ষে একটি লৌকিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান এক্ষণে বিলুপ্ত। ঋষিপ্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থখানি প্রকৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। যে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান থাকিলে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থগুলি কোন ভাষ্যের (অর্থাৎ অর্থ-পুস্তকের) বিনা সাহায্যে বুঝিতে পারা সম্ভব-যোগ্য হয়, সেই সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া এখন আর কেহ কোন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ কোন ভাষ্যের বিনা সাহায্যে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হন না এবং আধুনিক সংস্কৃত ভাষার লৌকিক-স্বভাব বশতঃ উহার জ্ঞানের দ্বারা ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতে বসিয়া মানুষের মস্তিষ্ক হইতে কিম্ভুত-কিমাকার মতবাদগুলির উদ্ভব হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলির ভাষার জ্ঞান যেরূপ মনুষ্যসমাজ হইতে বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ, যে-হিব্রু ভাষায় বাইবেল রচিত হইয়াছিল এবং যে-আরবী ভাষায় কোরাণ রচিত হইয়াছিল, সেই প্রাচীন হিব্রু ও আরবী ভাষার জ্ঞানও বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ হইতে অন্তর্দ্ধান পাইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষার কোন পদের অর্থও তন্নিহিত বর্ণের অর্থ এবং তাহার সমন্বয় ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষা একই সূত্রের (principles) উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে যেরূপ প্রত্যেক বস্তুকে সম্যক্ ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়—সেইরূপ প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষাতেও উহা সম্ভব-যোগ্য। এই তিনটি প্রাচীন ভাষার সূত্র (principles) অর্থাৎ স্ফোট-বিদ্যা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া তৎস্থানে আধুনিক সংস্কৃত, আধুনিক আরবী ও আধুনিক হিব্রুর এবং তদনুকরণে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই পাঁচটি ভাষা বস্তুতঃ পক্ষে লৌকিক।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা

বর্ণস্ফোট ও পদস্ফোটের বিধি অনুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা আমরা "ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি।

ঐ প্রবন্ধে "ধর্ম্মে"র সংজ্ঞা আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সত্যতা বাস্তব জগতের সহিত তুলনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব জীবনে যত কিছু কার্য্য করে, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মানুষ যত কিছু কার্য্য করে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে এক শ্রেণীর কার্য্যে কোনরূপ বিচার অথবা বিশ্লেষণের কিঞ্চিন্মাত্রও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, আর অপর শ্রেণীর কার্য্যে নানা রকমের বিচার ও বিশ্লেষণের চিহ্ন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া মানুষ যে-শ্রেণীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, সেই শ্রেণীর কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রাকৃতিক বিধানবশতঃ সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং উহা পরিশেষে মানুষের পক্ষে যেমন শুভপ্রদ হইতে পারে, সেইরূপ আবার অশুভপ্রদও হইতে পারে।

বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের ঐ সমস্ত কার্য্যও প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের কতকগুলি কার্য্য তাহার সংস্কারগত পাপ ও পুণ্যের ধারণানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত কার্য্য মানুষের ধারণানুসারে পুণ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহার ফলে মানুষের পক্ষে শুভ এবং অশুভ দুই-ই ঘটিয়া থাকে। বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া

মানুষ অপর আর এক শ্রেণীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, যাহার পরিচালনায় কোন সংস্কারগত পাপ-পুণ্যের ধারণার বিদ্যমানতা কিছুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু মানুষের এই শ্রেণীর কার্য্যে, সংস্কারগত পাপপুণ্যের ধারণার বিদ্যমানতা ত' দূরের কথা, কোন্‌টি পাপ, কোন্‌টি পুণ্য, কোন্ কার্য্যটি শুভপ্রদ, কোন্ কার্য্যটি অশুভপ্রদ, তাহার আমূল বিচারের নানা রকমের সাক্ষ্য পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভাবে বিচারবুদ্ধির দ্বারা মানুষ যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতে আমূলভাবে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ সম্পাদিত হইলে,উহা প্রায়শঃ মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও অশুভ হয় না।

এইরূপভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আপাত-দৃষ্টিতে যদিও মানুষের কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ ইন্দ্রিয় ও মনের বিবিধ এবং বুদ্ধির বিবিধ প্রভেদানুসারে সম্পাদিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সমস্ত কার্য্য সংস্কার-গত পাপপুণ্যের বুদ্ধি অনুসারে সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত কার্য্যে ইন্দ্রিয় ও মনের বিধানানুসারে সম্পাদিত কার্য্যের ন্যায় শুভ এবং অশুভ এই দুই-ই ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত কার্য্যে সংস্কারগত পাপ-পুণ্যের বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র খাঁটী বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ সাধিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যে অশুভময় ফল হইতে সম্পূর্ণভাবে রেহাই পাইয়া কেবলমাত্র শুভময় ফল মানুষ লাভ করিয়া থাকে।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষানুসারে উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর কার্য্যকে মানুষের "ধরম্" বলা হইয়া থাকে। ধরম্-প্রবৃত্তি সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও সংস্কারগত বুদ্ধির বিধানানুসারে, অথবা এক কথায়, মানুষের শরীরবিধানের (physiological operations) বিধি অনুসারে উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং ইহারই জন্য একই মানুষ তাহার জীবনে কখনও চোরের ধরম্, কখনও সাধুর ধরম্, কখনও প্রকৃত মানুষের ধরম্, আবার কখনও পশুর ধরম্ পালন করিয়া কখনও শুভ-ফলভাগী আবার কখনও অশুভ ফলভাগী হইয়া থাকে।

কোন ইন্দ্রিয়বিধান অথবা মনোবিধান অথবা সংস্কার-প্রধানপ্রবৃত্তি বশতঃ বিন্দুমাত্রও প্রভাবান্বিত না হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিচার-বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া অবিমিশ্র শুভোদ্দেশে মানুষ যে-সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, সেই সমস্ত কার্য্যকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষানুসারে "ধর্ম্ম" বলা হইয়া থাকে।

'ধরম্' ও 'ধর্ম্ম' এই দুইটি শব্দের অর্থে প্রভেদ কোথায়, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যে সমস্ত কার্য্য কেবলমাত্র তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে করিয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যের নাম তাহার 'ধরম্'। আর যে সমস্ত কার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি পরিমার্জ্জিত হইয়া খাঁটি সাধনার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যকে মানুষের ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

'ধরম্'-কার্য্যে মানুষের শুভ এবং অশুভ দুইই ঘটিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে মানুষের কখনও কোন অশুভ ঘটিতে পারে না।

'ধরম্' ও 'ধর্ম্মে'র উপরোক্ত সংজ্ঞা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান জগতে 'ধর্ম্মে'র কথা অনেকেরই মুখে শুনা যায় বটে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত 'ধর্ম্ম' কি, তাহা এখন আর কেহ বুঝিতে পারেন না। "স্বামী" উপাধিধারী তথাকথিত সন্ন্যাসিগণ "ধর্ম্ম" কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু 'ধর্ম্ম' কি তাহা যদি তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে ঐ স্বামীজীর অথবা তাঁহার শিষ্যগণের অকাল-মৃত্যু অথবা অকালবার্দ্ধক্য, অথবা কোনরূপ শারীরিক অস্বাস্থ্য, অথবা মানসিক অশান্তি ঘটিতে পারিত না। অকাল-মৃত্যু, অকাল-বার্দ্ধক্য, অশান্তি এবং অসন্তুষ্টির হাত হইতে নিজে এবং যাঁহার অনুচরগণ রক্ষা পাইতে পারিয়াছেন, এমন কোন স্বামীজীর পরিচয় যখন লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তখন "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান-যুক্ত কোন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ যে কয়েক সহস্র বৎসর হইতে মনুষ্যসমাজ পায় নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

স্ফোটবিদ্যাসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ তথ্য যেরূপ অথর্ব্ববেদে, কোরাণ এবং বাইবেলে পাওয়া যায়, সেইরূপ মানুষের 'ধরম্' এবং 'ধর্ম্ম'-সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ তথ্যও ঐ তিনখানি পুস্তকেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

স্ফোট-বিদ্যা যেরূপ প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ছাড়া অন্য কোন প্রাদেশিক অথবা লৌকিক ভাষায় লিখিত হওয়া সম্ভব নহে, সেইরূপ স্ফোট-বিদ্যা অবগত হইতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষের'ধরম্'এবং 'ধর্ম্ম'তথ্যও ঐ তিনটি প্রাচীন ভাষা ছাড়া আর কোন প্রাদেশিক অথবা লৌকিক ভাষার সাহায্যে সম্যক্ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

মানুষের 'ধরম্' এবং 'ধর্ম্ম'তথ্য অথর্ব্ববেদে সম্যক্ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের সাধনায় উল্লেখ-যোগ্য ভাবে অগ্রসর হইতে না পারিলে, অথর্ব্ববেদের ঐ অংশ সম্পূর্ণ পরিমাণে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। প্রাথমিক সাধকদিগের জন্য সংস্কৃত ভাষায়'ধরম্'তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে "জৈমিনিসূত্রে" নামক পূর্ব্ব-মীমাংসায় এবং 'ধর্ম্ম'-তথ্য আলোচিত হইয়াছে "কণাদসূত্রে" নামক বৈশেষিক দর্শনে।

আমার মনে হয়, সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অথর্ব্ববেদ ছাড়া, জৈমিনিসূত্রে এবং কণাদসূত্রে 'ধরম্' এবং 'ধর্ম্ম'তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন আরবী ভাষা এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষাতে কোরাণ ও বাইবেল ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেও ঐ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন আরবী ভাষায় ও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় কি কি গ্রন্থ আছে এবং কোন্ গ্রন্থের কি কি আলোচ্য, তাহার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে ঐ দুইটি ভাষাতে লিখিত এইবিষয়ক আরও অনেক গ্রন্থের সন্ধান মিলিবে।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায়

"ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি"। তাহা স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ "ধর্ম্ম-জ্ঞান" কাহাকে বলে এবং দ্বিতীয়তঃ "ধর্ম্ম কাহাকে বলে", তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। যথাযথ ভাবে "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে", তাহা না জানিতে পারিলে "ধর্ম্ম-জ্ঞান" কাহাকে বলে, তাহা যেরূপ বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না, সেইরূপ "ধর্ম্মজ্ঞান কাহাকে বলে", তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলে "ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি" তাহাও সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

কাযেই ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ "ধর্ম্মজ্ঞান" কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য যে যে অভ্যাস ও গ্রন্থের অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়, সেই অভ্যাস ও গ্রন্থগুলির নামের প্রয়োজন, সেইরূপ আবার "ধর্ম্ম কাহাকে বলে", তাহা আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে যে অভ্যাসের ও গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেই সেই অভ্যাস ও গ্রন্থগুলির নামেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

"শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার উপায় কি", "সংস্কৃত ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য কোথায়"এবং"ধর্ম্মের সংজ্ঞা", এই তিনটি প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা অনুসরণ করিলে বুঝা যাইবে যে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ অথর্ব্ববেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণের সাহায্যে স্ফোট-বিদ্যা কাহাকে বলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া উহা অভ্যাস করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ বেদাঙ্গের সাহায্যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা অথবা আরবী ভাষা অথবা হিব্রু ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে হয় এবং তৃতীয়তঃ জৈমিনি-সূত্র ও কণাদ-সূত্রের সাহায্যে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হয়। এই তিন শ্রেণীর অভ্যাস ও অধ্যয়নকে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে।

আপাত-দৃষ্টিতে এই তিন শ্রেণীর অধ্যয়ন ও অভ্যাস দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষকের সহায়তা পাইলে এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ অধ্যয়ন ও অভ্যাসে প্রযত্নের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঐ প্রযত্নের কোন অবস্থাতেই পরিশ্রান্ত হইতে হয় না। পরন্তু যথাযথ ভাবে অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেক অবস্থাতেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার দ্বিতীয় সোপান কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, ধর্ম্মজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা প্রথমতঃ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

"ধর্ম্ম" কাহাকে বলে তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়, মন ও সংস্কারগত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কতকগুলি

কার্য্য করিয়া থাকে, আর কতকগুলি কার্য্যে অনেক বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া মানুষ হস্তক্ষেপ করে।

সম্পূর্ণভাবে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়, মন ও সংস্কারগত বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ যে কার্য্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করে, সেই কার্য্যগুলির নাম মানুষের "ধরম্"-কার্য্য। আর স্ব স্ব ইন্দ্রিয়, মন ও সংস্কারগত বুদ্ধির প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবে সংযত হইয়া কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধির পরিমার্জ্জনাবশতঃ যে কার্য্যগুলি সাধিত হইয়া থাকে সেই কার্য্যগুলির নাম মানুষের "ধর্ম্ম"-কার্য্য।

'ধরম্' ও 'ধর্ম্ম'কার্য্যের পার্থক্য কোথায়, তাহা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের 'ধরম্'-কার্য্যে তাহার প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয়েরই খেলা থাকে, আর তাহার 'ধর্ম্ম'-কার্য্যে কেবলমাত্র প্রকৃতির খেলাই বিদ্যমান থাকে।

মানুষের 'ধরম্'-কার্য্যে প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয়েরই খেলা বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঐ 'ধরম্'-কার্য্যের ফলে মানুষ সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভোগ করিয়া থাকে; আর প্রকৃত 'ধর্ম্ম'-কার্য্যে কেবলমাত্র প্রকৃতির খেলা বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঐ 'ধর্ম্ম'-কার্য্যের ফলে মানুষের কখনও বিন্দুমাত্রও দুঃখানুভব করিতে হয় না। যাঁহারা মনে করেন যে, ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র সুখ লাভ না করিয়া সময় সময় দুঃখের ভাগী হওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাঁহারা ভ্রান্ত। যে-কার্য্যের ফলে মানুষের কোনরূপ দুঃখানুভব করিতে হয়, অথবা অর্থকৃচ্ছ্রতা, দাসত্ব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেই কার্য্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষের চোখে 'ধর্ম্মে'র কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা যে কোন ক্রমে ধর্ম্মের কার্য্য নহে, পরন্তু উহা যে 'ধরম্'এর কার্য্য, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

'ধর্ম্ম'-এ কেবলমাত্র অবিমিশ্র সুখ, আর 'ধরম্'-এ সুখ ও দুঃখ দুইটি আছে বলিয়া 'ধর্ম্ম'-কার্য্য কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া মানুষের একান্ত কাম্য হইয়া পড়ে।

স্ফোট-বিদ্যানুসারে মানুষের "ধর্ম্ম-জ্ঞান" বলিতে সেই জ্ঞান অথবা অনুভূতিকে বুঝিতে হয়, যে জ্ঞান অথবা অনুভূতির ফলে, "ধর্ম্ম"-কার্য্য কি তাহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায়। অথবা, যে জ্ঞান অথবা অনুভূতির দ্বারা মানুষ তাহার দেহাভ্যন্তরে কোন্‌টি প্রকৃতির কার্য্য ও কোন্‌টি কোন্‌টি বিকৃতির কার্য্য, তাহা সঠিকভাবে অনুভব করিতে পারে, সেই জ্ঞান অথবা অনুভূতিকে ধর্ম্ম-জ্ঞান বলিতে হইবে। নিজ দেহাভ্যন্তরে কতখানি প্রকৃতির কার্য্য ও কতখানি বিকৃতির কার্য্য চলিতেছে, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, অসংখ্য অনুভূতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই সন্দর্ভে তাহা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। মানুষের ধর্ম্ম-কার্য্য যে কি, তাহা কোন্ কোন্ অনুভূতির বলে সঠিকভাবে নির্ণীত হইতে পারে, সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, মানুষকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রত্যেক অবয়বটি অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের প্রত্যেক অবয়ব যে অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত, তাহা অনুভব করিতে পারিলে, অর্থাৎ শরীরস্থ অসংখ্য অণু ও পরমাণুর যে-স্পর্শবশতঃ মানবশরীরের গঠন সম্পাদিত হইতেছে, **সেই স্পর্শ কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলে,** মানুষের ধর্ম্ম-কার্য্য যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া অতীব সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

ভারতীয় ঋষির এই কথাটি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে:—

(১) মানুষ যত কিছু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার প্রত্যেকটি তাহার কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(২) মানুষের কার্য্য দ্বিবিধ, যথা ধরম্-কার্য্য এবং ধর্ম্ম-কার্য্য।

ঐ দুইটি কথা হইতে ইহা বুঝিতে হয় যে, মানুষ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরম্-কার্য্য করিয়া থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহার "ধর্ম্ম"-কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয় তাহার প্রকৃতির খেলা খেলিবার যন্ত্র, সেই ইন্দ্রিয়ই তাহার বিকৃতির খেলা খেলিবারও যন্ত্র।

সুতরাং মানুষ যদি একবার অনুভব করিতে পারে যে, কতখানি তাহার প্রকৃতির খেলা এবং কতখানি তাহার বিকৃতির খেলা, তাহা হইলে কোন্‌টি তাহার 'ধর্ম্মকার্য্য" এবং কোন্‌টি তাহার "ধরম্"-কার্য্য, তাহাও বাছিয়া বাহির করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

এইখানে পাঠকদিগকে প্রকৃতি ও বিকৃতির সংজ্ঞা কি, অর্থাৎ মানুষের কোন্ কার্য্যকে প্রকৃতির কার্য্য এবং কোন্ কার্য্যকে বিকৃতির কার্য্য বলিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। প্রকৃতি, বিকৃতি প্রভৃতি শব্দের সংজ্ঞা যাহাতে সাধারণ পাঠকদিগের পর্য্যন্ত বুঝা সহজ-সাধ্য হয়, তাহার সম্যক্ আলোচনা সাংখ্যদর্শনের অন্যতম বিষয়। ঐ দর্শনের বিস্তৃতি কতখানি তাহা যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃতি ও বিকৃতি-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

স্ফোট-বিধানানুসারে মানুষের প্রকৃতির কার্য্য বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য, যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের অংশমাত্রের দ্বারা সম্পাদিত না হইয়া, ঐ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অবয়বের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে কার্য্য কোন ইন্দ্রিয়ের অংশ-মাত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বিকৃতির কার্য্য।

প্রকৃতি ও বিকৃতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা কোন একটি নদী অথবা সমুদ্রের দিকে তাকাইলে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায়। নদীর নদীত্ব এবং সমুদ্রের সমুদ্রত্ব যে তাহার জলের গভীরতা এবং স্রোতের বেগ লইয়া, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই কোন আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না। নদীর নদীত্ব এবং সমুদ্রের সমুদ্রত্ব যেরূপ তাহার মধ্যভাগে ফুটিয়া উঠে, তাহার তীরের দিকে সেইরূপ ফুটিয়া উঠে না; কারণ, মধ্যভাগে নদী ও সমুদ্রের গভীরতা এবং স্রোতের বেগ যত অধিক হইয়া থাকে, তীরের দিকে তাহা হয় না। তীরের দিকে ঘূর্ণায়মান স্রোত হয় ত অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে এবং তাহার বিপজ্জনকতাও প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত বেশী হয় বটে, কিন্তু নদীর মধ্যভাগে পাল তুলিয়া নৌকা ছুটাইতে পারিলে তাহা যে বেগে চলিতে থাকে, সেই বেগ কোন নদীর তীরে লাভ করা কখনও সম্ভব হয় না। কেন এইরূপ হয়, তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, নদীর মধ্যভাগে প্রায়শঃ কেবলমাত্র প্রকৃতির খেলা বিদ্যমান, আর তীরের কাছে প্রকৃতি ও বিকৃতি, এই উভয়েরই খেলার উদ্ভব হইয়া থাকে।

নদীর মাঝখানে তাহার সম্পূর্ণ অবয়বটির (অর্থাৎ পূর্ণ প্রশস্ততা, পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং পূর্ণ গভীরত্বের) কার্য্য হইয়া থাকে, আর তাহা যতই তীরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ঐ অবয়ব আংশিক ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; কারণ, তীরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যেমন গভীরত্ব কমিয়া যায়, সেইরূপ নদীর বক্রগতির জন্য দৈর্ঘ্য এবং প্রশস্ততার কার্য্যও কমিতে থাকে।

মানুষের ধর্ম্ম-কার্য্য বলিতে বিকৃতির কার্য্য সম্পূর্ণ-ভাবে বাদ দিয়া কেবলমাত্র নিছক প্রকৃতির কার্য্য ধরিয়া লইতে হয় এবং যে-কার্য্য কোন ইন্দ্রিয়ের অংশমাত্রের দ্বারা সম্পাদিত না হইয়া, ঐ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অবয়বের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেই কার্য্যের নাম প্রকৃতির কার্য্য, এই দুইটি সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, ধর্ম্মকার্য্য কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে যে, প্রত্যেক অবয়বের অন্তর্নিহিত অসংখ্য অণু ও পরমাণুর পরস্পরের স্পর্শ সম্যক্ ভাবে কার্য্যতঃ অনুভব করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, কোন ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণতা কোথায় তাহা ঐ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্নিহিত প্রত্যেক অণু ও পরমাণু অনুভব করিতে না পারিলে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না এবং ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণতা কোথায়, তাহা বুঝিতে না পারিলে, কোন কার্য্য ইন্দ্রিয়ের অংশমাত্রের দ্বারা সাধিত না হইয়া সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে কি না, তাহাও বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতে পারিলে মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র সুখ ভোগ করা সম্ভব হয় না, পরন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয় এবং কোন অবয়বের অন্তর্নিহিত পরমাণু ও অণুর স্পর্শ সম্পূর্ণ ভাবে স্পর্শ করিতে না পারিয়া অংশ-মাত্র স্পর্শ করিতে পারিলে ধর্ম্মকার্য্য কি, তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না বলিয়াই "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ" এবংবিধ ঋষিবাক্যের উদ্ভব হইয়াছে।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার দ্বিতীয় সোপান সম্বন্ধে এতাবৎ যাহা যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথম সোপানের বিবিধ অধ্যয়ন ও অভ্যাসের পরিসমাপ্তি করিয়া প্রথমতঃ "ধর্ম্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে", তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, তৃতীয়তঃ নিজ অবয়বের প্রত্যেক অংশের অন্তর্নিহিত অণু ও পরমাণুর পরস্পরের মধ্যে যে-স্পর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্পর্শ সম্যক্ ভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, ঐ স্পর্শ সম্যক্ ভাবে অনুভব করিবার উপায় কি?

যাঁহারা শব্দ-বিজ্ঞানের প্রথমাংশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, জীব-শরীরের অবয়বের অন্তর্নিহিত অণু ও পরমাণুর পরস্পরের মধ্যে যে স্পর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে,সেই স্পর্শ অনুভব করিবার একমাত্র উপায় জিহ্বানিঃসৃত শব্দের স্পর্শ এবং ঐ স্পর্শের ব্যাপ্তি অনুভব করা। একমাত্র জিহ্বানিঃসৃত শব্দের স্পর্শ অনুভব করার নাম—মন্ত্রাভ্যাস করা এবং ঐ স্পর্শের ব্যাপ্তি অনুভব করার নাম ধ্যানাভ্যাস করা।

জীব-শরীরের অবয়বের অন্তর্নিহিত অণু ও পরমাণুর পরস্পরের মধ্যে যে-স্পর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্পর্শ সম্বন্ধে কি কি জ্ঞাতব্য, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে অথর্ব্ব-বেদে। ইহা ছাড়া, উহা যে একই রকমে বাইবেলে এবং কোরাণেও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

ঐ স্পর্শ কি করিয়া সম্যক্ ভাবে অনুভব করিতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে ঋক্, সাম এবং যজুঃ নামক বেদে।

ঐ স্পর্শের ব্যাপ্তি কি করিয়া সম্যক্ ভাবে অনুভব করিতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে ঋষি-প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থে।

মানুষের শরীরের প্রধান প্রধান অবয়বের অন্তর্নিহিত অণু ও পরমাণুর পরস্পরের মধ্যে যে স্পর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্পর্শ সম্যক্ ভাবে অনুভব করিবার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে—বেদ, বাইবেল এবং কোরাণানুমোদিত দৈনন্দিন উপাসনা অথবা সন্ধ্যাপদ্ধতিতে।

স্ফোট-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক হিন্দু, অথবা আধুনিক মুসলমান, অথবা আধুনিক খৃষ্টান যে দৈনন্দিন উপাসনা-পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে বেদ, অথবা কোরাণ, অথবা বাইবেল-অনুমোদিত নহে। অনুসন্ধান করিলে ইহা জানা যাইবে যে, হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, আর খৃষ্টানই হউন, কেহই নিজ নিজ দৈনন্দিন উপাসনা-পদ্ধতির প্রত্যেক অংশের যে কি অর্থ, অথবা কোন্ অংশের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা সম্যক্ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। উপাসনা-পদ্ধতির অর্থ সম্যক্ ভাবে অপরিজ্ঞাত হইলেও হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতি অধিকাংশ পরিমাণে বজায় রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু খৃষ্টানগণ বাইবেলানুমোদিত প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতির রহস্য বুঝিতে পারেন না বলিয়া ঐ উপাসনা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সাধন করিয়াছেন।

স্ফোট-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি প্রাচীন ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আরও জানা যাইবে যে,আধুনিক হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টানগণ পরস্পরের মধ্যে তথাকথিত পৃথক্ ধর্ম্ম লইয়া নানা রকমের কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদ, বাইবেল এবং কোরাণানুমোদিত দৈনন্দিন উপাসনা-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে একই উদ্দেশ্যে এবং একই প্রকারের কার্য্যক্রমে রচিত।

সাময়িক উচ্ছ্বাস

পাঠকগণ, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণের উপাসনা-পদ্ধতিতে পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য আছে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন? ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ভেজাল ভারতবাসিগণ অর্থাৎ যাঁহারা জন্মতঃ ভারতবাসী, কিন্তু ভাবতঃ পাশ্চাত্ত্য এবং ভেজাল ইংরেজগণ অর্থাৎ যাঁহারা জন্মতঃ ইংরাজ, কিন্তু কার্য্যতঃ বৈদেশিকের মত মিথ্যাবাদী ও দুর্নীতিপরায়ণ,

তাঁহারা কখনও ভারতবাসী ও ইংরেজের আন্তরিক মিলন সংঘটিত করিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু খাঁটি ভারতবাসী ও খাঁটি ইংরেজ শীঘ্রই যে মিলিত হইবেন এবং মিলিত হইয়া বর্ত্তমান তথাকথিত ভারতবাসী ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের যাহা কল্পনা-বিরুদ্ধ, তাহা বাস্তব করিয়া তুলিবেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

যদি কাহারও নিজের প্রতি, অথবা নিজ সন্তানের প্রতি, অথবা নিজ ভ্রাতাভগ্নীর প্রতি প্রকৃত মমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মানবসমাজের কতকগুলি দুষ্কৃতীর দুষ্কৃত যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। এই দুষ্কৃতিগণ কখনও বা ভাবরাজ্যে সম্পূর্ণভাবে পরের দাসত্ব করিয়া এবং আত্মভাব উদ্ধার করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া নিজদিগকে অমুক স্বামী (অর্থাৎ প্রভু), কখন বা সম্পূর্ণ ভাবে খলতা, বিদ্বেষ ও মিথ্যাভাষণের কার্য্য করিয়া নিজদিগকে "মহাত্মা" কখন বা সম্পূর্ণভাবে পরদেশীয় ভাব ও চালচলন গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে দেশপ্রেমিক, কখনও বা দেশীয় ভাষায় সঙ্করতা উৎপাদন করিয়া নিজদিগকে কবি-সম্রাট্, কখনও বা যে সমস্ত সন্দর্ভে প্রাকৃতিক বিধির সহিত কোন সান্নিধ্য অথবা সাহিত্য নাই, সেই সমস্ত সন্দর্ভের রচনা করিয়া নিজদিগকে সাহিত্য-সম্রাট্, কখনও বা জ্ঞান ও বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত না হইয়া নিজদিগকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং তাঁহাদের স্ব স্ব দুষ্কৃতের দ্বারা একদিকে যেরূপ নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, সেইরূপ আবার সমাজের নিরীহ জনসাধারণের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া সমগ্র মানবসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছেন।

পাঠক, যখন ভারতীয় ঋষির অভ্যুদয় হইয়াছিল, তখন জগতে মনুষ্যসমাজে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার নাম ছিল "মানব-ধর্ম্ম"। তখন মনুষ্যসমাজে হিন্দু, খৃষ্টান, অথবা মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় ঋষি কাহারও নিজস্ব নহেন। তাঁহারা যেমন হিন্দুর, তেমনই খৃষ্টানের এবং তেমনই মুসলমানের। কত মহাপ্রাণ হইলে সমগ্র মানবসমাজের একতা-বন্ধন সাধিত করিয়া সমগ্র মানবসমাজে একমাত্র মানব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি? এতাদৃশ মহাপ্রাণ ভারতীয় ঋষির বাণী কখনও মিথ্যা হইবার নহে।

আপনাদের যদি কান থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের বাতাসের দিকে কর্ণপাত করিয়া, আপনাদের যদি চক্ষু থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনুভব করুন, দেখিতে পাইবেন—কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। তথাকথিত মধ্যবিত্ত দাম্ভিক মানুষগুলি যখন অন্নাভাবে জর্জ্জরিত হয়, তখন কালের কোন সাড়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যখন নিরীহ-জনমণ্ডলী পর্য্যন্ত জ্ঞানরাজ্যের দাম্ভিক-মানুষগুলির প্রতারণার ফলে অন্নাভাবগ্রস্ত হয়, তখন কাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, এইরূপ ভাবে বাজিয়া উঠে।

এই সময়ে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও কালকে অথবা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা যদি মিলিত হইয়া ঐ তথাকথিত স্বামী, মহাত্মা, দেশ-প্রেমিক, কবি-সম্রাট্ এবং সাহিত্য-সম্রাট্ প্রভৃতি আত্মপ্রতারক মানুষগুলি যাহাতে তাঁহাদের দুষ্কৃত হইতে নিরস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে বিনা রক্তপাতে হাসিতে হাসিতে আবার মনুষ্য-সমাজ সুদিনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে। নতুবা মনুষ্য-সমাজে সুদিনের সাক্ষাৎ লাভ করিবার আগে আরও রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত হইবার আশঙ্কা আছে।

মনুষ্যসমাজে যাহাতে আর রক্তগঙ্গা প্রবাহিত না হয়, তাহার চেষ্টা করা কি মানুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে? মনে রাখিতে হইবে, দুষ্কৃতীর দুষ্কৃত যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বরকমের উত্তেজনা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জনপ্রাপ্ত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। যে সত্য কথাগুলি আপাতভাবে কর্কশ, সেই কথাগুলি প্রকৃত পক্ষে উত্তেজনা-বিবর্জ্জিত হইলেও হইতে পারে এবং এতাদৃশ সত্য কথা জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হইলে তাহাই যে দুষ্কৃতীর দুষ্কৃত বিনাশের সহায়তা করিতে পারে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি? আমাদের প্রবন্ধের অপরাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। এই অংশে খুব সম্ভব, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে বাকী কথা, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভের লৌকিক প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম্ম-সম্মেলনসমূহের অবশ্যকর্ত্তব্য, বর্ত্তমান বিশ্ব-ধর্ম্মসম্মেলনের অনাচার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচিত হইবে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়নায় প্রতিফলিত রোদ আসিয়া পড়িবার কোন দরকার ছিল না, মেয়েটির এঁটো বাসন মাজিতে বসিবার ভঙ্গীতেই যেন চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল জহরলালের। ঘরে তার ঠাকুরদাদা আর জেঠাইমার মধ্যে যে সবাক নাটকের অভিনয় চলিয়াছে, সে নাটক গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছে এক শতাব্দীর চার ভাগের এক ভাগ, চৌবাচ্চা হইতে এক বালতি জল তুলিয়া এঁটো বাসন মাজিতে বসিয়া উঠানে মেয়েটি তার চেয়েও জমকালো নাটকের সূচনা করিয়া দিল এক মিনিটে। লম্বা চওড়া অ-বাঙ্গালী মেয়ের মত শরীর, স্বাভাবিক রঙীন রঙ, পরনে অতিরিক্ত সাদা থান, এ সবের জন্ত নয়, এ সব মিলিয়া জমকালো হইয়াছে শুধু মানুষটা,—নাটকীয় তার অকথ্য অবর্ণনীয় রাজরাণীর ভঙ্গীতে বাসন মাজিতে বসা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া আর যেন সে কাজ খুঁজিয়া পায় নাই, তাই রাগের মাথায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে। রাগ কমিলেই সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

বাসন মাজা শেষ করিয়া সে কিন্তু আসিয়া বসিল জহরলালের কাছেই, চারিটি পায়া লাগানো এক টুকরা কাঠের তক্তায়। বসিবার জন্ত অবশ্য সে আসে নাই, আসিয়াছিল ভাঁড়ার-ঘরের চাবি চাহিতে। শুধু সাধনার কাছে চাবি চাহিতে, আর কিছু নয়। ঘরে অন্য মানুষ কেউ আছে কি না কে তা জানে! কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন বীরেশ্বর। বোধ হয় মৃত পুত্রকে লইয়া পুত্রবধূর সঙ্গে উচ্ছ্বাসের আদান-প্রদানটা বন্ধ করিবার জন্ত।

মেয়েটি কে বৌমা ?

ও ? ও তরঙ্গ।

তরঙ্গিনী ?

জবাব দিয়াছিল মেয়েটি নিজেই, না, শুধু তরঙ্গ।

রসিকতা জমে না, কিছুক্ষণ জমিবেও না। তবু বীরেশ্বর [illegible] ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন, তরঙ্গ আমাদের কে ?

সম্পর্কের কথা বলেছেন ? সম্পর্ক কিছু নেই, আমি এখানে থাকি।

স্পষ্ট বলে দিলে দিদি সম্পর্ক নেই! আমি যে তোমার দাদু ?

তরঙ্গ বলিয়াছিল, ঠাকুরদা না দাদামশায় ?

তখন সাধনা করিয়া দিয়াছিলেন পরিচয়। তরঙ্গকে বলিয়াছিলেন, ইনি আমার শ্বশুর তরঙ্গ, আর এ অনুপমের ভাই জহরলাল। আর বীরেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, রজনী-ঠাকুরপোকে আপনার বোধ হয় মনে নেই বাবা, তরঙ্গ তার সেজ মেয়ে।

অতি খাপছাড়া ভাবে তরঙ্গ তখন নমস্কার করিয়াছিল দুজনকে, হাততালি দেওয়ার মত জোরে দু'হাতের তালু সে একত্র করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় হাত দুটি তার কোমল বলিয়া আওয়াজটা জোরালো হয় নাই। তারপর সাধনার হুকুম হইয়াছিল বসিবার। সহজ, স্বাভাবিক, সুশ্রাব্য হুকুম, মিনতি করার মত।

বসছি। সব কাজ কিন্তু পড়ে রইল জেঠিমা।

ছি, তরু। কতবার তোমায় বলেছি, বাড়ীতে বাইরের লোক এলে মেয়েদের কোন কাজ থাকে না, যাঁরা এলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা, তাঁদের সুখসুবিধা দেখা, এই শুধু তখন মেয়েদের কাজ। এঁরা না হয় আত্মীয়, অন্য কেউ হলে কি রকম অস্বস্তি বোধ করতেন বল তো ? ভাবতেন যে এসে সংসারের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, বেশীক্ষণ বসা চলবে না। যে বাড়ীতে এসে মানুষ স্বস্তি পায় না, সেটা কি বাড়ী, না, সে বাড়ীতে কাজ বলে কোন কিছু আছে! দরকার হলে সারাদিন অন্য কর্ত্তব্য করে যে মেয়ে সংসারের সব কাজ করতে পারে, সেই তো কাজের মেয়ে। জানলা দিয়ে দেখলাম, তুমি বাসন মাজতে বসলে, তখন কিছু বলি নি। কিন্তু আর কোনদিন এ রকম ক'রো না তরু, এত করে যা শেখাই, তা যদি ভুলে

যাও, বড্ড কষ্ট হয় আমার।—কটা বাজল রে নিমি? সাড়ে পাঁচ। ও মা, এখুনি যে কলের জল চলে যাবে!

খাবার জলটা তুলে রেখে আসব জেঠিমা?

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, না, তুমি ব'সো। নিমি জল তুলতে যাক। বড় পিতলের কলসীটা কলতলায় নিয়ে যাস না নিমি, আনতে পারবি না। ছোট কলসীতে করে জল ভরে নিয়ে গিয়ে ও কলসীটা ভরিস্। ঢাকনিগুলো তিনদিন ধোয়া হয় নি, একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে দিস্। গায়ে মাখা সাবান নয় কিন্তু, কাপড়কাচা সাবান। বাথরুমের খোপে দেখবি দু'টুকরো সাবান আছে কাপড়কাচা, ছোট টুকরোটা নিস্। আর শোন্—সব কথা না শুনেই চলে যাস কেন বল্ তো? তোদের শিখিয়ে শিখিয়ে আর পারলাম না নিমি—একটা কথা কতবার করে শেখাব? কি বলছিলাম যেন? যা, সব গোল পাকিয়ে গেল!

মৃদু একটু হাসিলেন সাধনা, হাসির সঙ্গে সখেদে বলিলেন, কি যেন হয়েছে আমার মাথাটার, চারদিকে আর নজর রাখতে পারি না, সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে ওঠে।—হ্যাঁ, খাবার জল তুলে ষ্টোভটা ধরিয়ে আমায় ডাকিস নিমি। আবার সব কথা না শুনে চলে যায়! তোর আজ কি হয়েছে বল তো নিমি? ষ্টোভ ধরাবার সময় স্পিরিট জলবার আগে দুধের কড়াইটা বসিয়ে দিস্ ষ্টোভে। কড়ায়ের ঢাকা নামিয়ে রেখে যেন আমায় ডাকতে আসিস্ না, বেড়ালে মুখ দেবে।

দুধ যদি ফুটে ওঠে মা?

ফুটে উঠবে! স্পিরিটটুকু জলবে আর পাম্প করে আমায় ডাকবি, তার মধ্যে দেড় সের দুধ ফুটে উঠবে? আজ তোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না নিমি, তোর মাথার ঠিক নেই। তুই বোস, আমি যাচ্ছি।

নিমি ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, না, তোমার যেতে হবে না, আমি পারব।

সাধনা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ছি, নিমি। আমি যা বলছি, তা' কি না ভেবে না হিসেব করে বলছি? কথা শোনো, এইখানে বোস। এঁদের দু'খানা গান শুনিয়ে দাও তোমরা দুজনে ততক্ষণ, আমি চোখের পলকে কাজ ক'টা সেরে আসছি, ও আর কতক্ষণের কাজ? নিমি আগে গেও, বাইরে উঠেছে ঝাঁঝাঁলো রোদ। তরু, তুমি কি গাইবে? আকাশের সীমা বাতাসের নীল, আলো দূরে, বহুদূরে?

তরঙ্গ বলিল, আচ্ছা।

সাধনা বীরেশ্বরকে বলিলেন, আমি যাই বাবা? ওদের গান শেষ হতে না হতে আসব।

সাধনা চাহিলেন অনুমতি, অনুমতি দেওয়ার বদলে বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওদের গান শিখিয়েছ, না বৌমা?

হ্যাঁ। নিমিকে ছেলেবেলা থেকে শিখিয়েছি, ও ভাল গাইতে পারে, কিন্তু ওর গলাটা তেমন মিষ্টি নয়। তরু অল্প দিন শিখছে, গানের কায়দা এখনও নিখুঁত হয় নি, তবে গলা ভারি মিষ্টি। নিমির চেয়ে ওর গান আপনাদের ভাল লাগবে, —তাইতো আগে নিমিকে তারপর তরুকে গাইতে বললাম। কলের জল চলে যাবে বাবা, আমি আসছি।

কলের জল যায় এবং আসে, সময় যায় এবং থাকে। সত্যই থাকে,—সব সময়। মানুষের জীবনকাহিনী সাময়িক, কিন্তু বোকামি যাদের ব্যাধি, আবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা-বাহিকতাকে পূর্বানুবৃত্তি আর ক্রমশঃ ছাড়া বুঝিতে পারা তাদের পক্ষে অপরাধ। অন্ততঃ বুদ্ধিমানেরা তাই স্থির করিয়া দিয়াছে বোকাদের জন্য। তরঙ্গ কাছে আসিয়া বসা মাত্র জহরলালের মনে যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তার মধ্যে মিশিয়া ছিল অনেকখানি অস্বাভাবিকতা। কিন্তু সেটুকু বুঝিবার মত মন তো জহরলালের নয়, দশদিন তরঙ্গের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার পর এটা ঘটিলে তবু সে বুঝিতে পারিত ভাবাবেগের এতখানি অস্বাভাবিকতার ইতিহাস আছে এবং সেইজন্য এই অস্বাভাবিকতার খানিকটা স্বাভাবিক, কিন্তু তরঙ্গকে দেখিয়াই বিচলিত হওয়ার জন্য নিজেকে নির্লজ্জ মনে করিয়া সে বড় কষ্ট পাইতেছিল। একবার সতুকে কাছে পাওয়া গেল। নিমি বাহিরে ঝাঁঝাঁলো রোদ উঠিবার গান গাহিল, তরঙ্গের গানে নীল আকাশের সীমানা পাওয়া গেল বাতাসে। তবু অপরাধের ভারে জহরলালের মনে শান্তি রহিল না।

বীরেশ্বরের মনেও শান্তি ছিল না, প্রায় একই কারণের

নারী-সংক্রান্ত অপরাধের অনুভূতিতে। অথচ কতদূর স্বাভাবিক ও সামাজিক ছিল তার অপরাধ!—দু'বার বেশী বিবাহ করা। অভিজ্ঞতার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী অসংযম বীরেশ্বরের জীবনে কোনদিন আসিতে পারে নাই। পুরুষ মানুষের পক্ষে তিনবার বিবাহ করায় কি অন্যায় থাকিতে পারে এখনও তিনি তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তবু এ বাড়ীতে বহুদিন ধরিয়া সঞ্চিত অব্যক্ত ধিক্কার অনুভব করিয়া তিনি আজ কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। এমনিভাবে একদিন তিনি তাঁর বংশের প্রায় অজানা শাখাটির সঙ্গে পরিচিত হইতে আসিবেন, এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মৃদু অজানা সুবাস-মেশানো বাতাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ বাঁচিতে বাধ্য হইবেন, একথা জানিয়াই যেন তাঁকে শাস্তি দিবার জন্য অনুপমের বাবা আর ঠাকুরমা তাঁর মনের স্থায়ী অশান্তির সঙ্গে পাপের উপলব্ধি মিশিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ক্ষোভে বীরেশ্বরের চোখে জল আসিতে চায়। এ কি বিপরীত অস্বাভাবিক শাসন-পীড়ন মানুষের জীবনে? স্বামী-ত্যাগের অপরাধ করিল অনুপমের ঠাকুরমা, আর সমস্ত জীবন মনোকষ্ট সহ্য করিয়াও তার নিস্তার হইল না, আত্ম-মর্য্যাদাটুকু পর্য্যন্ত আজ হারাইতে হইবে!

সাধনার সঙ্গে চা জল-খাবার আসিল। জলখাবার বিশেষ কিছু নয়, ঘিয়ে ভাজা, দুধে সিদ্ধ, চিনি-মেশান সুজি আর কয়েকখানা বিস্কুট। বীরেশ্বর এ সব কিছু খানও না, সন্ধ্যা না করিয়া কিছু খাইবেনও না। এখানে সন্ধ্যা করিয়া কিছু খাওয়া? না, সন্ধ্যার সময় তিনি বাড়ী যাইবেন, আহ্নিক করিবেন অনেকক্ষণ, তারপর কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িবেন।

সন্ধ্যা আসিতে আসিতে গভীর ক্লান্তি আসিল। বীরেশ্বর উঠিলেন। সকলে একসঙ্গে নামিয়া গেল নীচের উঠানে। সেখানে বীরেশ্বর শ্রান্ত সুরে সাধনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ও বাড়ীতে যাবে না বৌমা?

কেন যাব না বাবা?

একদিন গিয়ে সংসারটা দেখে আর মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় করে এসো। তারপর তোমাকে একটা অনুরোধ জানাব।

কি অনুরোধ করবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব হবে। আমার পক্ষে আপনার ওখানে গিয়ে থাকা—

বছরখানেক আগে যে মরিয়া গিয়াছে তাকে লইয়া আজ দু'জনের মধ্যে একবার কলহ বাধিয়াছিল, জহরলালের একবার ভয় হইয়াছিল বীরেশ্বর বুঝি ধমক দিয়া বসেন সাধনাকে। তখন বীরেশ্বর আত্মসম্বরণ করিয়াছিলেন, এখন বিদায় নেওয়ার সময় সাধনার কথা শুনিবামাত্র রাগে আগুন হইয়া এত জোরে তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল সাধনার তখনকার প্রাপ্য ধমকটাই সুদে আসলে তিনি দান করিয়া যাইতেছেন।

তোমার বুদ্ধি খুব টনটনে, সব তুমি বুঝতে পার, তা জানি বৌমা। কিন্তু আমি কি বলব শুনে তারপর পাকামি ক'রো, এখন থাম। তোমাদের পাকামির চোটে সংসারে মানুষের টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছে।

হন্ হন্ করিয়া তিনি চলিয়া যান, সাধনা ডাকিয়া বলিলেন, একটু দাঁড়ান বাবা, প্রণাম করব।

আমার বাড়ীতে গিয়ে ক'রো।

দড়াম্ করিয়া সদরের খিল খুলিয়া বীরেশ্বর বাহির হইয়া গেলেন, পিছনে গেল জহরলাল। গলির মোড়ে মোটরে উঠিবার সময় সে-ই খেয়াল করিল যে, সতুকে ফেলিয়া আসা হইয়াছে।

সতু রয়ে গেছে দাদা।

বীরেশ্বর গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বলিলেন, নিয়ে আয়। শীগগির আসিস্।

সদর দরজা বন্ধ হয় নাই। ভিতরে ঢুকিয়া জহরলাল দেখিতে পাইল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই উনানে আঁচ পড়িয়াছে, সাধনা তরকারী কুটিতে বসিয়াছেন, নিমি আটা মাখিতেছে আর তরঙ্গ বসিয়াছে মসলা বাটিতে। তরঙ্গের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সতু যেন তাকে কি বলিতেছিল, জহরলালকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

জহরলাল বলিল, সতু আয়।

সতু বলিল, না।

এতটুকু সময়ের মধ্যে কি করিয়া যে তরঙ্গের সঙ্গে এত

ভাব জমিয়া গেল সতুর! জহরলাল আরও দু'পা আগাইয়া আসা মাত্র সে দুহাতে প্রাণপণে গলা জড়াইয়া ধরিল তরঙ্গের।

তরঙ্গ বলিল, আপনারা যখন ওপরে বসে ছিলেন, চিলে-কুঠিতে গিয়ে খোকা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে আপনাদের সঙ্গে যাবে না, এখানে থাকবে।

সাধনা বলিলেন, যেতে যখন চাইছে না, আজ থাক। কাল আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।

কাল আপনারা যাবেন?

বাবা যেরকম রাগ করে গেলেন, কাল যাওয়াই ভাল। উনি বলে গিয়েছেন, বাবার মনে যেন কষ্ট না দিই। জান জহর, আমার হয়েছে বিপদ। এমন কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন উনি, যার একটা রাখতে গেলে আর একটা রাখা যায় না। দোটানায় দোটানায় প্রাণ আমার বেরিয়ে গেল বাবা।

সাধনার আপশোষে নীরবতার সায় দিয়া জহরলাল জিজ্ঞাসা করিল, কাল কখন গাড়ী পাঠিয়ে দেব?

সাধনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, গাড়ী কি হবে? বিষুদ্‌বার তো কাল? অনুপম কাল দেরীতে কলেজে যাবে, ওর সঙ্গেই আমরা যেতে পারব।

তরঙ্গ বলিল, সতু আমাকে যেতে বারণ করছে জেঠিমা, বলছে নিজেও যাবে না, আমাকেও যেতে দেবে না।

হাসিমুখে সাধনাকে এ কথা বলিয়া জহরলালের দিকে চাহিয়াই তরঙ্গ গম্ভীর হইয়া গেল।

এমনিভাবে একই বংশের দু'টি শাখা কাছাকাছি আসিল, কিন্তু মিলিত হইল না। বীরেশ্বরের একটি পুত্রবধূ ষ্টোভ ধরাইতে হিসাব করিয়া স্পিরিট ঢালিয়া স্পিরিটের উত্তাপটুকুর অপচয় পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন এবং একটি পুত্রবধূ বিষাদের বেহিসাবী প্ররোচনায় মুখে থাবলা থাবলা মাখিতে লাগিলেন দশ বোতল স্পিরিটের দামের এক কৌটা ক্রীম। বীরেশ্বরের একটি নাতির বাজেটে এক পয়সার পান খাওয়া হইয়া রহিল বিলাসিতার খরচ এবং একটি নাতি একটার পর একটা পুড়াইয়া চলিল দশটা পানের দামের সিগারেট।

যদি বীরেশ্বরের মনে কষ্ট না দিবার আদেশটা শুধু অনুপমের বাবা দিয়া যাইতেন, যদি বলিয়া না যাইতেন যে, বীরেশ্বরের একটি পয়সা যেন তাঁর বংশের কেউ গ্রহণ না করে, তবে হয় তো সাধনা বীরেশ্বরের তর্ক-বিতর্ক, আদেশ, অনুরোধ ও মিনতির মধ্যে অন্ততঃ শেষেরটাকে মানিয়া লইয়া উঠিয়া যাইতেন বীরেশ্বরের বাড়ীতে, আর হাঁফ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে এলাইয়া পড়িতেন ফ্যানের তলার নরম সোফায়। কিন্তু এই স্বতন্ত্র পরিবারটি গড়িয়া উঠিয়াছে বীরেশ্বরকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জনীয় করিয়া রাখিবার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে, এই পরিবারের মানুষগুলির মেরুদণ্ড সোজা হইয়া আছে চাওয়ামাত্র বীরেশ্বরের টাকার যে ভাগ পাওয়া যায় সেই টাকার লোভ জয় করিবার সাধনায়, আজ কি সে-সব বাতিল করিয়া দেওয়া চলে? শুধু মৃত স্বামীর হুকুম অমান্য করা নয়, সাধনার পক্ষে ভোলা কঠিন যে বিবাহের পর হইতে মন্ত্র জপের মত স্বামী তাকে শোনাইতেন, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই সাধনা, আর তোমার টাকার দরকার হয়, বাবার কাছে হাত-পাতার বদলে তুমি অসতী হয়ে যেও, তোমার রূপ আছে, কলকাতা সহরে বড়লোকও আছে অনেক। কি কুৎসিত কথা! কিন্তু কি আবেগের সঙ্গে কথাগুলি তিনি বলিতেন! স্বামী যে পাগলাটে ছিলেন, সাধনা তা জানে। যে উন্মাদিনী জননীর হাতে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাতে পাগলাটে হওয়ার বদলে একেবারে যে পাগল হইয়া যান নাই তিনি, তাই আশ্চর্য্য!

তা ছাড়া, কি হইবে বেশী টাকা দিয়া? এ তাদের নিজের বাড়ী, সুতরাং আশ্রয়ের ভাবনা নাই। যে টাকা হাতে আছে, সে টাকা শেষ হওয়ার আগেই অনুপম টাকা আনিতে আরম্ভ করিবে।

প্রথমে আসা-যাওয়া একটু বেশী ছিল, তারপর গেল কমিয়া। বীরেশ্বর দু'চার দিন পরে পরেই গাড়ী লইয়া আসিতেন, খানিকক্ষণ এ-বাড়ীতে থাকিয়া সকলকে লইয়া যাইতেন নিজের বাড়ী। সেখানে রান্নাবান্নার আয়োজন সেদিন হইত খানিকটা উৎসবের মত, বীরেশ্বরের সভাপতিত্বে সকলে একসঙ্গে বসাইত কথা গল্প হাসি আনন্দের সভা, মনে হইত সত্যই যেন মিলনোৎসব। কিন্তু এক তরফা যাওয়া আর আসা সাধনা কতদিন চালাইবেন? অথচ বীরেশ্বরের বাড়ীর সকলে আসিলে যে রকম খরচ করিতে

হয়, ঘন ঘন সে রকম খরচ করিবার ক্ষমতাও সাধনার নাই। তা ছাড়া, বীরেশ্বরের বাড়ীতে দুটি পরিবারের মিলনে যত হাসি আনন্দই সৃষ্টি হোক, বার বার এ কথা কার না মনে পড়িতে থাকে যে, এ বাড়ীতে যাদের চিরদিন এ-বাড়ীরই লোক হইয়া বাস করিবার কথা তাহারা বেড়াইতে আসিয়াছে সাময়িক অতিথির মত এবং তাহারা আসিয়াছে বলিয়াই এ বাড়ীতে আজ এই অতিরিক্ত হাসি-আনন্দের সৃষ্টি? এদিকে সাধনার বাড়ীতে আসিয়া বীরেশ্বরের বাড়ীর সকলে নড়াচড়া করিবার স্থান পায় না, বাড়ীতে যেন জনতার সৃষ্টি হইয়াছে। সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয় জহরলালের মার। সাতাশ টাকার চেয়ে কম দামী সাড়ী পরিয়া বাড়ীর বাহির হইলে তার বিষাদের সঙ্গে মিশিয়া যায় মাথা-কাটা-যাওয়া লজ্জা, অথচ সাতাশ টাকার সাড়ী যে তাকে ভেংচায় এ অনুভূতিটা অন্য সব যায়গায় অস্পষ্ট হইয়া থাকিলেও সাধনার বাড়ীতে ঢোকা মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরেই আর যেন সহ্য হইতে চায় না সাতাশ টাকার সাড়ী দিয়া নিজেকে নিজের ভেংচানো।

বড় মাথা ধরেছে দিদি। কাপড়টা ছেড়ে ফেলি, কেমন?

মাথা ধরার সঙ্গে কাপড় ছাড়ার সম্পর্কটা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া সাধনা তাকে নিমির একখানা সাড়ী দেন। নিমির সাড়ী পরিয়া আরও বিপদ হয় জহরলালের মার, নিজেকে ভিখারিণী মনে করিবার যে অনুভূতিটা প্রায় সব সময়েই স্পষ্ট হইয়া থাকে তার মনে সেটা হইয়া উঠে উগ্র এবং নিজেকে নিজের ভেংচি কাটার চেয়েও অসহ্য।

আমার শরীর কেমন করছে দিদি। আমি বরং বাড়ী চলে যাই। যাব?

একটু শোবে? শুয়েই থাক একটু।

কিন্তু শোয়ার সঙ্গে মনের বিকারের সম্পর্ক নাই। অবস্থা বিশেষে বরং কষ্ট তাতে আরও বাড়ে। শরীর ভাল নয় বলিয়া জহরলালের মা শুইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া সকলে কমবেশী ব্যস্ত হয়, কি হইয়াছে, কেন হইয়াছে, এখন কেমন লাগিতেছে শরীর, এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সাধনার বিছানায় শুইয়া জহরলালের মার যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। ছি! সকলকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন তিনি! এর চেয়ে মরাও যে তার ভাল?

জহরলাল এ বাড়ীতে আসে একটা অদ্ভুত নিয়মে। আসে সে একা এবং পরপর তিন চার দিন আসিয়া আট দশ দিন একেবারে আসে না। মনে হয়, পর পর তিন চার দিন আসিলেই এ বাড়ীতে আসিবার সখ তার মিটিয়া যায় এবং আট দশ দিন না আসিলে এ বাড়ীতে আসিবার এমন একটা সখ তার জাগে যে, পরপর তিন চার দিন আসিয়া সে সখটা তাকে মিটাইতে হয়। প্রথম দিন জহরলালের মুখ দেখিয়া হাসিভরা মুখখানা তরঙ্গ গম্ভীর করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন মমতাময়ী রাজরাণীর মত জহরলালের ছেলেমানুষী দৃষ্টিপাতকে ক্ষমা করিয়া হাসিমুখেই সে কথা বলে।

দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

পরীক্ষা আসছে যে।

পড়ে পড়ে রোগা হচ্ছেন? বেশ! এ রকম রেটে রোগা হয়ে চললে পরীক্ষা পর্য্যন্ত টি'কবেন তো?

শ্লেষ নয়, শ্লেষ তরঙ্গ জানেও না, শ্লেষ তার মুখে মানায়ও না। স্নেহ করিয়াই সে কথাগুলি বলে। কিন্তু সেবার জহরলালের এ বাড়ীতে না আসিবার আট দশ দিনের মেয়াদটা বাড়িয়া পনের দিনে গিয়া দাঁড়ায়। পনের দিন পরে আবার যখন সে আসে, দেখা যায় সে আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তরঙ্গ আর তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলে না। জহরলালও এ বাড়ীতে আসিবার মেয়াদটা সেবার বাড়াইয়া করে চারদিন।

সতু মাঝে মাঝে মাঝে আসে আর দু'একদিন এ-বাড়ীতে থাকিয়া যায়। আসিতে সে চায় প্রত্যেক দিন এবং আসিয়া থাকিয়া যাইতে চায় চিরদিনের জন্য, কিন্তু রোজ তাকে কেউ আনেও না, দু'একদিনের বেশী এ বাড়ীতে থাকিতেও দেয় না।

আসেন না শুধু জহরলালের বাবা রামলাল। তিনি আদালতে ওকালতী করেন আর এখানে ওখানে মদ খান। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন, নিজের ঘরে থাকেন একা। বাড়ীর লোককে তিনি বিরক্ত করেন না, বাড়ীর লোকেও তাকে বিরক্ত করে না। বীরেশ্বরের সঙ্গে মাসে তার যে কটি কথার আদান প্রদান হয়, তা বোধ হয় আঙ্গুলে গুনিয়া ফেলা যায়।

রাত দুটোর সময় বাড়ী ফিরিয়া রামলাল যদি দেখিতে পান যে জহরলাল পড়িতেছে, স্থির পদে হোক, টলিতে টলিতে হোক, রামলাল তখন একবার ছেলের ঘরে যান।

বলেন, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড় জহর।

জহরলাল বিনা বাক্যব্যয়ে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়ে।

[ক্রমশঃ

বিচিত্র জগৎ

ভূমধ্যসাগর হইতে পিকি

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেনার্ড উইলিয়াম্‌সের বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। মধ্য-এসিয়ার আদব-কায়দা অনুযায়ী সকলেই আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে। কাশগর সহরে আমরা বিদায়কালীন চা পান করছিলাম। আমাদের মোটর তৈরী। কাশগর থেকে আক্‌সু যাবার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে বসে আছি।

বর্ত্তমান চীনা শাসনকর্ত্তা আমাদের পছন্দ করেন না। একমাস আগে গেলে তিনি আমাদের পথ রোধ করতেন, কিন্তু এখন তাঁর সঙ্গে পান-ভোজন করে বন্ধুত্ব স্থাপিত করবার খানিকটা চেষ্টা আমাদের দিক্ থেকে আমরা করেছি। তার ফলে তিনি আমাদের যাওয়ায় বাধা দেবেন না, এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি।

আমরা সাতখানি মোটরগাড়ী নিয়ে বেরিয়েছি বৈরুথ থেকে পিকিং যাব বলে। আমাদের দলের অধ্যক্ষ মঁসিয়ে জর্জেস্-মেরি হার্ড। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর দিয়ে রুশীয় তুর্কিস্তানের পূর্ব্বে মরুপথে মোটর চালনা করে সোজা পিকিং যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে পদে পদে আমাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, চীন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনেক কষ্টে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু আমরা যখন হিন্দুকুশ পর্ব্বতের কাছে, তখন তাঁরা সে অনুমতি প্রত্যাহার করেন। বহুকষ্টে আবার তা আনা হয়েছে।

এদেশে চীনা রাজপ্রতিনিধি সিংকিয়াং-এ থাকেন। তিনি নানা প্রকার সন্দেহ করেছিলেন আমাদের সম্বন্ধে। আমরা হয় ত কোথায়ও মূল্যবান্ খনির সন্ধান পেয়েছি, কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছি, কিংবা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর হিসেবে পিকিংয়ে বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করতে যাচ্ছি, ইত্যাদি নানারূপ সন্দেহের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা।

শেষে অবিশ্যি সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যেখানে যেখানে আমরা গিয়েছি, স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করেছে। একটা ছবি আমাদের মনে আসছে,



লিয়াংচাউ সহরে পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি পুস্তকের দোকান : ছাপার দুরূহতা সত্ত্বেও চীনদেশে পাঠক ও পুস্তকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়েছে।

কাশগরের পূর্ব্বে ভয়জাবাদ সহরে একটা ডালিম-বেদানার বাগানে আমরা বসে আছি, ঝোপের আড়াল থেকে উদ্যান-স্বামীর পোষা কৃষ্ণসার হরিণ আমাদের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে আছে, আর একটি সুন্দরী তুর্কী মেয়ে এক চুবড়ী ফল নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। মিশর দেশের প্রাচীর-চিত্রের একটি নারীমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছে তাকে।

বড় বড় মরুভূমির প্রান্তে প্রাচীরবেষ্টিত নগরী।

আমরা দু' একদিন মাত্র অপেক্ষা করতাম এই সব সহরে। আমাদের লোভ ছিল খরমুজা খাবার। পৃথিবীর মধ্যে এমন সুমিষ্ট খরমুজা আর কোথায়ও নেই।

হাটের দিনে রঙীন পোষাক পরা নরনারীর ভিড়ে সহরের

রাস্তা ভর্ত্তি হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ভাত ও রুটীর দোকান, লোকে রাঁধা ভাত-তরকারী কিনে সেখানে বসেই তৃপ্তির সঙ্গে ভোজনে ব্যাপৃত। মাঝে মাঝে সরাইখানা। ধানের বোঝা পিঠে নিয়ে গাধার দল সার বেঁধে পথে চলেছে।

শরৎকালে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, নীল শূন্যে একটা বাজপাখী উড়ছে, কি বালুকারাশির মধ্যে কোন মরু-উদ্ভিদের সোনালী ফুল ফুটে আছে, যেন এক একটি জীবন্ত কবিতার মত মনে হয়।

একটি ছোট সহরে একজন তুর্কী মা তার পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে এল আমাদের কাছে। ডাক্তার জর্ডান দেখে বললেন, খুব শক্ত একটা অস্ত্রোপচার আবশ্যক। করাও



মুসটক জননী ও তার সন্তান : এই দোলাতে সন্তানকে বয়ে নিয়ে গিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে মা তার দৈনন্দিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

হল; বোধ হয় মেয়েটি এ যাত্রা বেঁচে যাবে, কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার পূর্ব্বেই আমাদের স্থান পরিত্যাগ করে অগ্রসর হতে হল।

যখন আমরা রওনা হই, মায়ের চোখে সে কি কৃতজ্ঞতা-

পথে অনেক গুহা পড়ে। তার অনেকগুলিতেই কিজিল শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ অনেক প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র আছে। এগুলির ফটোগ্রাফ নেওয়ার অনুমতি আমরা পাই নি। ফটো নেওয়া তো দূরের কথা, কোন প্রকার প্রতিলিপি গ্রহণ করা বা নোট্‌ বইয়ে কিছু লিখে নেওয়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

শরৎকালের শেষে আমরা কুচা সহরে পৌছুলাম। কুচা অতি প্রাচীন সহর, হিউয়েনশাং-এর বিবরণে এই সহরের উল্লেখ আছে। এখানকার শাসনকর্ত্তা তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। চমৎকার বাগান, ফুলের গাছই বেশী। রেশমী সামিয়ানা ও চীনা-লণ্ঠনের তলায় বসে আমরা সবুজ চা ও মেওয়া ফল খেলাম। চীনা বাদ্যকর দল বাজনা বাজাল।

চা পান শেষ হবার পরে সেই টেবিলেই মাখনে ভাজা আস্ত ভেড়া আনা হল। যথেষ্ট পানভোজন ও আলাপ-আলোচনার পর আমাদের অধ্যক্ষ মঁসিয়ে হার্ড শাসনকর্ত্তাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন।

কারা সহর চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে আমরা মাসখানেকের মধ্যে উপস্থিত হই। ফিরিওয়ালার দল বাঁশের বাঁকে জিনিষপত্র ঝুলিয়ে বিক্রি করছে। মোঙ্গল মেয়েরা জরির কাজ করা পোষাক পরে পথে বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, আমাদের মোটর দেখে তারা আনন্দের সঙ্গে ছুটে এল।

কারা সহরে আমরা চীনা শাসনকর্ত্তার গৃহে অতিথি হই। তিনি অতি ভদ্রলোক, আমাদের আরও কয়েক দিন থাকতে বার বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সময় অত্যন্ত কম থাকায় আমরা সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না।

কিছুদূরে তকুসান 'গর্জ্জ'। এই বিশাল গর্জ্জের মধ্য দিয়ে মোটর নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এখানে আমরা আর একদল ভ্রমণকারী ও তাঁদের অধ্যক্ষ লেফটেনাণ্ট পয়েণ্টের সাক্ষাৎ পেলাম। এঁরা পিকিং থেকে ফিরে পামীরের পথে বৈরুথ যাচ্ছেন। এদের মুখে গোবি মরুভূমিতে এঁদের ভ্রমণের কথা শুনলাম—

"২৪শে মে গোবি মরুভূমির বালিরাশির মধ্যে আমরা গিয়ে পড়ি। প্রথমে আমাদের মনে আশঙ্কা হল। সঙ্গের মোটরগুলি অত্যন্ত বোঝাই ছিল। মরুভূমি অতিক্রম করতে গেলে ১২৫০ মাইল চলবার উপযুক্ত তেল সঙ্গে থাকা দরকার তো?

বিপদের ওপর বিপদ। সবে মরুভূমির প্রান্তে পা দিয়েছি, এমন সময়ে পিকিং থেকে রেডিওতে সংবাদ পাওয়া গেল সিংকিয়াং সীমান্তে আমাদের একটা মোটর লুঠ করেছে মোঙ্গল দস্যুরা। সংবাদ পাঠাচ্ছে ফরাসী দূতাবাস।

তারপর উনিশ দিন কেটে গেল মরুভূমির মধ্যে। দু'বার ভীষণ বালির ঝড় বয়ে গেল। দুবার আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। অবশেষে নিরাপদে সুচৌ পৌঁছে গেলাম তেল ফুরিয়ে যাবার সামান্য কিছু আগে।

ফরাসী দূতাবাস থেকে পুনরায় রেডিও পাওয়া গেল এই মর্ম্মে যে, সিংকিয়াং-এর শাসনকর্ত্তা আমাদের যেতে অনুমতি দেবেন এই সর্ত্তে যে সঙ্গে আমরা কোন চীনা রাখতে পারব না। নান্‌কিং থেকে কয়েকজন চীনা রাজকর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে আসছিলেন, তাঁদের আমরা বিদায় দিতে বাধ্য হই।

কিন্তু বিপদ তাতেও কাট্‌ল না।

১২ই মে তারিখে শাসনকর্ত্তা আমাদের দুর্গ ত্যাগ করতে নিষেধ করে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেডিও বা গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ব্যবহার করা বন্ধ করে দেওয়া হল। শেষোক্ত আদেশের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, এবার আমরা যে প্রদেশের মধ্যে দিয়ে যাব, সেখানে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে, বৈদেশিকগণের ধনপ্রাণ সে পথে নিরাপদ নয়। আমরা বললাম, আমাদের যেতে দেওয়া হোক, মরুভূমির পথে আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। সেই সর্ত্তে আমাদের যেতে দেওয়া হল। সিংকিয়াং সহর থেকে কিছু দূরে একটা কূপের নিকট একটা নোটিশ মারা আছে, তাতে লেখা আছে, "যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও, সহরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে পর্ব্বতের দিকে পালিয়ে যাও।"

আমরা এ নোটিশে কর্ণপাত না করে অগ্রসর হলাম।

পরদিন সকালে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখতে পেলাম। গাড়ী উল্টে পড়ে আছে, ঘোড়া ও মানুষের মৃতদেহ খানায় পড়ে পচতে সুরু করেছে, অগ্নিদগ্ধ গৃহ-প্রাচীরে গোলাগুলির দাগ! চীনা সেনাপতি মা চুং ইং পূর্ব্বদিন সিংকিয়াং-এ প্রবেশ করার উদ্যোগে এখানে বাধা-প্রাপ্ত হয়েছেন শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে বহু আহত লোকের আর্ত্তনাদ আমাদের কানে আসছিল। ডাক্তার ডিলেয়ার গাড়ী থেকে নেমে এই সব হতভাগ্যদের চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সে গ্রামে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, দিনের আলো থাকতে থাকতে ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী হামি সহরে আমাদের পৌঁছতে হবেই, অন্যথায় পথে লুঠতরাজ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

পথের ধারে গ্রামগুলির কি শোচনীয় অবস্থা! বিদ্রোহীরা গ্রাম প্রায়ই পুড়িয়ে দিয়েছে, লোকজন গাছতলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কূপগুলির জল অব্যবহার্য্য,



পেইলিংমিয়াও-এর বৌদ্ধ মঠ: দেয়ালে যে দেবতার ছবি দেখা যায়, ইনি পৃথিবীর চারি দিক্ হইতে মানুষের জীবনে যে-সব অশুভ আসিতে পারে, তাহার হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করেন।

অনেক কূপে মৃতদেহ ফেলে জল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হামি সহরে না গিয়ে আমরা ২৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী তুর্ফান সহরে যাওয়া মনস্থ করলাম।

মরুভূমির পথে তুর্ফান সহরে পৌঁছুতে আমাদের কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নি। তুর্ফান পৌঁছে সিংকিয়াং-এর শাসনকর্ত্তার নিকট থেকে বেতারে সংবাদ পেলাম যে, কাশগরে যাবার পূর্ব্বে আমরা যেন একবার তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করি।

সঙ্গীদের নিয়ে সেই ঘোর বিপদসঙ্কুল পথে পুনর্ব্বার যেতে আমার মন চাইল না। ওদের কাশগরে যাবার আদেশ দিয়ে কয়েকজন চীনা অনুচরের সঙ্গে ছোট একখানা মোটরে সিংকিয়াং গিয়ে পৌছুলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোপ দাগা হল। বৃহৎ সামিয়ানার নীচে শাসনকর্ত্তার সঙ্গে চা পান করলাম।



মঙ্গোল রাজকুমারী পান্টা: ইনি পাশ্চাত্য জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিতা ও অনেকগুলি দেশী ও বিদেশী ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম।

বিদায় নেবার সময় শাসনকর্ত্তা আমার করমর্দ্দন করলেন। আমি আমার মোটরে উঠতে যাব, এমন সময় দু'জন রাইফেল-ধারী সৈনিক এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি বন্দী?

—আমরা কোন কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা করি না।

—আমি গভর্ণরের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—না, তাও পারেন না।

—গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ব্যবহার করতে পারি?

—না, তাও না।

তিনদিন নজরবন্দী অবস্থায় থাকবার পরে সিংকিয়াং-এর বৈদেশিক মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আপনার সঙ্গীদের এখানে আসতে আদেশ দিন।

আমি রাজী হলাম না।

—বেশ করে ভেবে দেখুন।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমাকে কড়া নজর-বন্দী অবস্থায় থাকতে হল আবার এক সপ্তাহ। অবশেষে আমি সম্মতি দিলাম।

বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ চেন তখন আমায় প্রাদেশিক গভর্ণ-মেণ্টের আদেশপত্র দেখালেন। তাতে লেখা আছে, আমাদের অভিযানকে যে কোন প্রকারে ব্যর্থ করতেই হবে, এই তাঁদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ।

আমাদের দল এসে পৌছে গেল।

গভর্ণরের ইচ্ছা ছিল আমাদের ন'খানা মোটর গাড়ী তাঁদের কাজে লাগান। এতে আমরা বাধা দিলাম। আমাদের বেতারযন্ত্র ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ হ'ল। কিন্তু কয়েকজন অস্ত্রধারী প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও একদিন গভীর রাত্রে পিকিংএর ফরাসী দূতাবাসে আমরা আমাদের দুরবস্থার কথা বেতারে জানিয়ে দিলাম।

তার পর পাঁচ সপ্তাহ বন্দী অবস্থায় কেটে গেল। কোন দিক থেকে কোন খবর নেই।

পাঁচ সপ্তাহ পরে গভর্ণরের আদেশে আমরা মুক্তি পেলাম। চারখানা মোটর গাড়ী ও আমাদের বেতার-যন্ত্রটি তাঁদের দিয়ে যেতে হবে, মুক্তির এ একটা সর্ত্ত।

তারপরে তকুসান গর্জ্জের মধ্যে যখন আমরা এসে পড়েছি, সংবাদ পেলাম যে আপনারা আসছেন। তাই এখানে আপ-নাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

লেফ্‌টেনাণ্ট পয়েণ্টের বিবরণ শুনে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের উপর আমার বিশ্বাস কমে গেল। এই সব অঞ্চলের ঘনীভূত রাজনৈতিক জটিলতার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই, এখানে দেখলাম যে, পিকিং নামেই চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী, কার্য্যতঃ এই সব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যা ইচ্ছা তাই করেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে চান না, অনেক বিষয় তাঁদের কর্ণগোচরই হয় না।

এর পরে দুই দল এক হয়ে আমরা উরুমচি পৌছুলাম।

উরুমচি সহরে অনেক গণ্যমান্য চীনা রাজকর্ম্মচারী ও পাণ্ডিত বাস করেন। এখানে একজন মোঙ্গল রাজবংশীয়া শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। তিনি চমৎকার ঘোড়ায় চড়তে পারেন, গান গাইতে পারেন, ফরাসী ভাষা অনর্গল বলে যেতে পারেন; ভাঙা ভাঙা ইংরাজিও বলতে পারেন, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের ইংরাজি নয়, মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইংরাজি।

আমরা প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা রাজকুমারী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সদ্ভাবের এত অভাব কেন? আপনারা আমাদের ভাল চোখেই বা দেখেন না কেন?

রাজকুমারী বললেন—আমি প্যারিসে গিয়েছি, ইংলণ্ডে গিয়েছি। সেখানেও দেখেছি আপনাদের বড় বড় ক্লাবে বা হোটেলে আমাদের প্রবেশের পথে বহু বাধা। সুতরাং বুঝতে পারছেন এটা শুধু আমাদের দোষ নয়। আসল কথা কি জানেন? চীনের বৃহৎ প্রাচীর যেমন, আমাদের মনেও আপনাদের সম্বন্ধে একটা মানসিক বৃহৎ প্রাচীর ঘেরা আছে। আমরা সেই প্রাচীরের আড়ালে নিরাপদে থাকতে চাই। আমরা চাই না আপনারা আমাদের দেশে এসে আমাদের কাজের নিন্দা বা প্রশংসা করেন। আমরা আপনাদের নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই চাই না। আমরা চাই আমাদের বৃহৎ প্রাচীরের আড়ালে শান্তিতে থাকতে। বোধহয় তাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনাদের জীবনযাত্রার ধারা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

১৫ই নভেম্বর তারিখে ক্রল, জোর্ডান এবং কার্ল সাইবিরিয়ার পথে প্যারিস যাত্রা করল। যাবার সময় তারা ফরাসী দূতাবাসের জন্য কিছু দরকারী কাগজপত্র ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ নিয়ে গেল।

উরুমচি থেকে পিকিং ২৩০০ মাইল। এই পথে আমাদের পূর্ব্ব অভিযানের মোটর লুঠ হয়েছিল। বালিয়াড়ি, মরুভূমি, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা পথও অতীব দুর্গম। মঙ্গোলীয় মালভূমির শীত অত্যন্ত প্রচণ্ড। যাওয়ার জন্যে পশমের ওভারকোট ও লোমশ চামড়ার জুতা তৈরী করা হয়েছিল। আমাদের পরিচ্ছদের ভিতরের দিকে পশুলোমের আস্তর বসান ছিল।

উরুমচিতে শীতকালে মেরুপ্রদেশের মত শীত। যথেষ্ট শীতবস্ত্র এখানে পাওয়া যায় এবং বেশ সস্তা। পথে অনেকগুলি পর্ব্বতগুহায় প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ চিত্র অঙ্কিত আছে, আমাদের সঙ্গী চিত্রকর জ্যাকভলেফ্ সেগুলি নকল করবার জন্যে রং, তুলি এবং চিত্রাঙ্কনের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কিনে নিল।

প্রথম গুহায় যখন পৌঁছেছি, তখন এত শীত পড়েছে যে, রংয়ের পাত্রে পাছে রং জমে যায়, সে জন্যে গ্যাসোলিনের



তুচো-এর মন্দিরে নরকে পাপীদের শাস্তির দৃশ্য।

ষ্টোভের উপর রংয়ের পাত্র বসিয়ে রাখা হল। ছবির পর ছবি নকল করে যাচ্ছে, আমরা [illegible] মধ্যে আগুন জ্বেলে বসে বসে দেখছি তার ছবি আঁকা।

ছবির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, লেখাগুলিও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করা গেল। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, বৃষবাহনে শিব, হুন দস্যু, মোঙ্গল পশুপক্ষী, মোনালিসার মত হাস্যমুখী তরুণী প্রভৃতি ছবির বিষয়বস্তু।

মুরটকের শাসনকর্ত্তা অনুগ্রহ করে আমাদের ফটোগ্রাফ তুলতে অনুমতি দিলেন। আমরা কয়েকটি পশুচর্ম্মের তাঁবু ও রাজপথের শোভাযাত্রার ফটো নিলাম।

যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাণিজ্যপথ, টলেমির গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। মধ্যযুগেও ইউরোপের সঙ্গে এসিয়ার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এই পথ দিয়েই। ফ্লোরেন্সের একজন কেরাণী মধ্যযুগে এই পথের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গিয়েছে তার পুস্তকে। লোকটি যদিও মধ্যযুগের, কিন্তু তার মন সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের ছিল। এই পথের কোথায় কোন নগর বা গ্রাম, তার ম্যাপ ও নক্সা, পণ্যদ্রব্যের দর, খাদ্যবস্তুর তালিকা ইত্যাদি সব উল্লেখ করে লোকটি তার বইখানাকে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে একটি আবশ্যকীয় বস্তু করতে চেয়েছিল এবং অনেক পরিমাণ কৃতকার্য্যও হয়েছিল।



চাংউইয়ের দক্ষিণে পীত নদী: ফেরি বোটে উঠিবার সময় বরফে গাড়ীর চাকা যাতে পিছ্‌লাইয়া না যায়, সে জন্য বরফে বালি বিছানো হইতেছে।

ভলগা নদী পার হয়ে আস্ত্রাকান, সেখান থেকে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ দিয়ে খিবা ও বোখারা, তারপরে ইলি নদীর উপত্যকা দিয়ে কারা-খোজা—এই ছিল প্রাচীন যুগের বাণিজ্য পথ। এখান থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলে গিয়েছে তিয়েনশিন্।

শুধু পণ্যদ্রব্য নয়, শিল্প, ধর্ম্ম, রাজনীতি, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতিও এই পথে চলাচল করেছে।

কারা-খোজা থেকে পথ অতীব দুর্গম হয়ে উঠল। মোটরের ড্রাইভার ও মিস্ত্রীদের আমরা কতবার প্রশংসা করেছি যে, সেই ভয়ানক শীতের রাত্রে তারা কি অমানুষিক ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তি প্রদর্শন করেছিল। এক আধ দিন নয়, প্রায় তিন সপ্তাহ।

আমরা তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করে সময় নষ্ট করিনি। আমাদের সঙ্গের একখানা মোটরে রান্না হ'ত, আমরা পথে একবার মাত্র মোটর থামিয়ে রান্নার গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের পাত্রে গরম ঝোল বা রাঁধা মাংস নিয়ে আসতাম। কুমুল সহরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই যুদ্ধের চিহ্ন চোখে পড়ল।

পথে ঘাটে সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর ধ্বংসের চিহ্ন। পোড়া দেওয়াল, গরু-ঘোড়ার মৃতদেহ, জনশূন্য গৃহ। তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা এখানে আসবার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে। এ ধরণের খণ্ড-যুদ্ধ চীনে লেগেই আছে। অধিবাসীদের মধ্যে যারা ছিল, তারা বললে, আমরা যদি সেখানে দু' চার দিন অপেক্ষা করি, তবে খুব সম্ভব এমন ধারা একটা যুদ্ধের ফিল্ম তুলে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু এ অনুরোধ আমরা রাখতে সক্ষম হলাম না।

এত শীতে লেখা পর্য্যন্ত অসম্ভব।

প্রতিবার কলমের কালি জমে যাচ্ছিল, কলমটা মুখের মধ্যে পুরে গরম করে নিচ্ছি।

মুক্ত প্রান্তরে মোটরগাড়ী থামিয়ে আমরা সবাই গাড়ীগুলিকে ঘিরে সামান্য দু'একঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতাম। গ্রামে ঢুকতে আমাদের সাহস হত না।

একদিন একজন চীনা ভৃত্য আমাকে জাগিয়ে বললে—হুজুর, নিকটেই গ্রাম, তাতে একটা বাড়ীতে দু'তিনটি ঘর আছে।

ভৃত্যকে আমিই ঘরের সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম। কারণ

এ শীতে উন্মুক্ত প্রান্তরে শুয়ে থাকার মত কষ্ট আর কতদিন মানুষ সহ্য করতে পারে ?

—ঘরগুল ভাল ? তাতে আর কেউ আছে ?

—একটা ঘরে বার তেরটা মড়া আছে, আর একটা ঘর খালি।

—আচ্ছা, খালি ঘরটাতে বিছানা পেতে দে।

মড়ার সঙ্গে একঘরে শুতেও আমার আপত্তি ছিল না, মনে ভাবলাম কাল সকালে চৌদ্দজনের একজন হওয়ার চেয়ে তেরটা মড়ার মধ্যে একজন জীবন্ত লোক হয়ে থাকাও ভাল। ক'দিন ধরে আমার নিশ্বাস জমে যাচ্ছে শীতে। নিমোনিয়ায় মরে যাওয়ার চেয়ে না হয় মড়ার সঙ্গেই শোব।

সারা গ্রামে একখানা বাড়ীতেও মানুষ নেই। কটা মড়া কোন্ ঘরে আছে, তা আমরা রাত্রির অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলাম না।

সেনাপতি মা-চুং ইংয়ের হাতে এই গ্রাম পড়েছিল। তাঁর সৈন্যেরা গ্রামের এই অবস্থার জন্য দায়ী। গৃহ-যুদ্ধে চীনের যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, চোখে না দেখলে তার গুরুত্ব বোঝান যাবে না। আর এ সব আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে চীনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

পথে আমরা একদল পলায়মান গ্রামবাসী দেখে মোটর থামিয়ে তাদের কফি ও খাবার দিলাম। এরা মা-চুং ইংয়ের সৈন্যদলের হাতে পড়বার ভয়ে সুচৌ সহরের দিকে পালাচ্ছে। দলে বৃদ্ধ আছে, স্ত্রীলোক আছে, শিশু ও বালকবালিকা আছে। এই তুষার-শীতল নৈশ বাতাসে মুক্ত প্রান্তরে ছিন্ন-বস্ত্রে রাত্রি যাপন করার ফলে প্রতিদিন দলের কত বৃদ্ধ, শিশু, বালকবালিকা মারা পড়ছে—কিন্তু তবু এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকবার সময় তাদের নেই। তা হলে শত্রুর হাতে পড়তে হবে

সুচৌ সহরে পৌছে আমরা একটা বাড়ীতে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করলাম। স্থানীয় চীনা সেনাপতি জানালেন, আমরা যদি তাঁকে পেট্রোল দিই, তার বদলে তিনি আমাদের নিরাপদে পিংকিং পৌছবার ব্যবস্থা করবেন। আমরা তাতে রাজী না হয়ে পারলাম না, পথঘাট অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল, এ সময়ে সামরিক কর্ম্মচারীর সুনজরে থাকা ভাল।



পথের শেষ : দশ মাস কষ্ট করিবার পর এই পিপিং সহরে পৌছাইয়া অভিযানকারীদের যাত্রা সমাপ্ত হয়।

এ-দিকে মা-চুং ইং-এর সৈন্যদল ক্রমশঃ নিকটে এসে পড়ছে।

রাত্রে আমরা রেডিও ব্যবহার করবার চেষ্টা করতেই জনৈক চীনা কর্ণেল আমাদের বাধা দিলেন। যুদ্ধের সময় বেতারে কোথাও সংবাদ পাঠান নিষেধ। অবশেষে মা জং খেলায় তাঁর কাছে ত্রিশ ডলার হেরে যাওয়ার প্রস্তাব করে রেডিও ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেল। পরদিন সকালে সুচৌ সহর পরিত্যাগ করে আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সহর ত্যাগের চব্বিশ ঘণ্টা পরে মা-চুং ইং-এর বাহিনী সুচৌ সহরে প্রবেশ করে ও লুটপাট, খুন জখম সুরু করে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা তখন বহুদূরে।

পথে একটা বিনষ্ট মন্দিরের ফটো নিলাম। সৈন্যদল ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে, মন্দিরগাত্রের প্রাচীর-চিত্রগুলি সঙীনের আঁচড় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। দস্যুদল মন্দিরের ধনরত্ন অপহরণ করে নিয়ে পালিয়েছে।

এবার পথে বালিয়াড়ির জন্য মোটর চালান কষ্টকর হয়ে উঠছে। কিছুদূরে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে হোয়াং হো বা পীত-নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর ধারে পীত-নদীর খেয়া পার হয়ে আমরা অতিকষ্টে সন্ধ্যার সময় অপর পারে উত্তীর্ণ হলাম।

ভাগবৎ

—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শেষ দৃশ্য নয়ন সম্মুখে ;
বিজয়ীর জয়োল্লাসে কাঁপে না কো গগন পবন,
নিবিড় বিষাদ-তমঃ ঘনায়েছে সকলের বুকে,
শূন্যতার মাঝে জাগে অসহায় প্রাণের ক্রন্দন !

পত্নী হারায়েছে পতি, বৃদ্ধ পিতা কাঁদে পুত্র তরে,
জননীর আর্ত্তনাদ জেগে উঠে বেদনার গানে,
রাজ্যমাঝে রাজা নাই, রাজ-দণ্ড লুটে ধূলা 'পরে,
প্রাণহীন দেহ যত প'ড়ে আছে বিরাট শ্মশানে !

শ্রীকৃষ্ণের মহাচক্র চিহ্নে চিহ্নে আঁকে কত পথ,
মুছে যায় কত চিহ্ন, দূরে যায় অনিত্যের ছায়া ;
বুকভরা কোথা শান্তি ? কোথা সত্য জীবন-শাশ্বত ?
সকল-ই কি মিথ্যা ভবে, সকল-ই কি স্বপ্ন আর মায়া ?

নৈমিষের তপোবনে ধ্যান-স্তব্ধ বৃক্ষছায়া-তলে,
ব'সে আছে ঋষিকুল, নিমীলিত বাহির নয়ন,
অন্তরে শাশ্বত-শান্তি—আনন্দের শুভ্র-শতদলে
ফুটে আছে নিশিদিন—চিরস্থির—নাহি কো স্পন্দন !

উদাত্ত-ঋষির কণ্ঠে ধীরে ধীরে জেগে উঠে গান,—
সেই মৌন স্তব্ধতার সুপ্তিভরা গভীরতা হতে,—
আছে সত্য, আছে শান্তি, বুকে বুকে আছে ভগবান,
ভালবেসে আপনারে দাও তাঁরে সমর্পণ ব্রতে !

সেই সুধা-সঙ্গীতের মধুচ্ছন্দ বাজে দিগন্তরে,
সেই সুর শান্তিভরা ভ'রে উঠে নিখিল জগৎ,
সেই বাণী তুলে ধ্বনি ব্যথাক্ষুব্ধ তাপিত অন্তরে,
পান করে সর্ব্বলোক তৃপ্ত হ'য়ে সুধা ভাগবৎ !

ইউরোপে গ্রীষ্মের ছুটি

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

এক দিন ঠাণ্ডা পড়িয়া গেল, আগের রাত্রে বৃষ্টি হইয়া টেনিস কোর্ট ভিজিয়া রহিয়াছে, খেলা চলিবে না। রোদ নাই, হাওয়াও দিতেছে, সাঁতার বা রোদ পোহাইবার উপায় নাই। লেস্‌নী, নাম্বিয়ার ও আমি বাড-হামারে বেড়াইতে গেলাম। খানিকটা খোলা মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তা, তারপর লেকের ধারে ধারে স্বচ্ছার পথ। হামার লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম তীরের একটি নির্জ্জন কাফের বারান্দায় ক্লাপ-দম্পতি বসিয়া, সামনে টেবিলে কফি, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি। লেস্‌নীকে বলিলাম 'দেখিতেছেন প্রফেসার, আজ বাদ্‌লার ওজুহাতে আপনার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকে একটু খাইয়া জিরাইয়া বসিয়া বাঁচিতেছে।" বয়স ৫৪ পার হইলেও যুবকোচিত কাজে সকলের উপর দলপতিত্ব করায় লেস্‌নী গর্ব্বই বোধ করেন। এখানে আসিয়া অবধি তিনি বিয়ার ছাড়িয়া দিয়াছেন, কারণ বিয়ারের পুষ্টিগুণ প্রসিদ্ধ, খালি সোডা বা মিনারেল ওয়াটার বা সাদা ওয়াইনে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন। অষ্ট্রিয়ান কাউণ্টের সঙ্গে ট্রেনে আলাপের কথাটা এখানে সকলকে বলিলাম, সাবেকি আমলের অষ্ট্রিয়ান অভিজাত চেক্‌দের ধর্ম্মজ্ঞান ও সুখে থাকার ধারণা শুনিয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিলেন। তবে কাউণ্টের একটা জিনিষ লেস্‌নীর খুব ভাল লাগিয়াছে। আহারের শেষ কোর্স কফির, তার আগে ডেসার্ট; সাধারণতঃ কফির পর সিগারেট ধরাইবার প্রথা, অনেকে কফির সঙ্গেও চালায়, কিন্তু লেস্‌নী মাংসের কোর্স শেষ হইয়া ডেসার্ট আসিতে দেরি হইলেই সিগারেট ধরাইয়া বলিতেন, "আসুন অষ্ট্রীয়ান কাউণ্ট হওয়া যাক।" রাত্রে আহারের পর অন্যেরা যখন তাসে বসিতেন, আমি তখন ভিক্টরের সঙ্গে দাবা খেলিতাম। তাস খেলার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেই ভাল লাগে না। আমরা দুজনে দাবা খেলিতাম, ডোডিয়া ভিক্টরের গা ঘেঁসিয়া বসিত, 'হস্তা-হস্তি প্রসঙ্গাদি" দ্বারা "প্রিয়সম্ভাষিয়া" প্রকাশ করিত, মেলানি ও লিবা পাশে বসিয়া খেলা দেখিত, অন্য টেবিল বা দলের লোকও মধ্যে মধ্যে আসিয়া যোগ দিতেন। গৃহিণীরা মধ্যে মধ্যে আমাদের কেক, বিস্কুট, ফল, কফি, ওয়াইন প্রভৃতি দিয়া যাইতেন। ডোডিয়া-মেলানি-লিবার ঘরে বসিয়া থাকিলে একটা প্রধান কার্য্য ছিল আধ ঘণ্টা অন্তর পাউডার ও লিপষ্টিক্ প্রয়োগ। এখনও নাবালিকা বলিয়া মেলানির দিন চারটা সিগারেটের বেশী খাওয়ায় মায়ের অনুমতি ছিল না, কিন্তু আসলে পার করিত বারটা, মা সামনে না থাকিলে সকলেই তাহাকে সাহায্য করিত, বাপ ও ভাবী শ্বশুরও বাদ যাইতেন না। একদিন হাত দেখার পালা উঠিল, সবাই জোর গলায় বলিলেন, মোটেই বিশ্বাস করেন না কিন্তু দেখাইতে ও নানাবিধ প্রশ্ন করিতে কেহই ছাড়িলেন না। মেলানির হাত দেখিয়া বলিলাম, এ বড় শক্ত মেয়ে, খুব বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় রাখে, নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনাতেই এ চলিবে, কেহ ইহাকে নিজের মত ছাড়িয়া অন্য মতে লওয়াইতে পারিবে না। শুনিয়া লেস্‌নী পড়িলেন মহা ভাবনায় (ইনি সকলের চেয়ে বেশী জোরে বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন হাত দেখা একেবারে বাজে জিনিষ;), জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "ও যদি বিবাহ করে তবে নিজের মতে চলিবে, না স্বামীর মতে চলিবে? স্বামীই ওকে চালাইবে, না ওই স্বামীকে চালাইবে?" ছেলের বৈবাহিক জীবনের কথা এ দেশের বাপেও ভাবে; তরুণীদের মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে লইয়া যাইতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বল তো তোমাদের প্রেমটা কি করিয়া হইল!"

"কেন? যেমন করিয়া হয়, আস্তে আস্তে হইল।"

"তোমাদেরই আগে হইল। না ওদেরই আগে হইল?"

"একই সঙ্গে হইল।"

"কিন্তু প্রকাশটা প্রথমে করিল কারা?"

মেলানী বলিল "ইভানই প্রথম বলিল।" ডোডিয়া

বলিল, "আমিই প্রথমে বলিলাম!" একদিন মেলানির নামে একটা বৃহৎ পার্শেল আসিল, খুলিয়া দেখা গেল বড় একটা ফুলের তোড়া, "ক্ষুদ্র প্রেমোপহার" লেখা কার্ড ঝুলাইয়া ইভান একটা বন্দর হইতে পাঠাইয়াছে। লেসনী শুনিয়া আড়ালে বলিলেন, "ছোকরা পয়সা খরচ করিতেছে তো খুব!" পরে একটু ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "যা হো'ক, ছোকরার মনটা ভাল বলিতে হইবে!"

ভিকটর দাবা খেলে মন্দ না, কিন্তু জিতটা বেশীর ভাগই হইল এ পক্ষে। একটি ভদ্রলোক, ডক্টর নেহুমা, মিনিষ্ট্রি অফ হেল্‌থের বড় চাকুরে, বলিয়াছিলেন প্রাহা ফিরিয়া আমার কাছে ইংরেজির চর্চ্চা করিবেন। ইনি কয়েক দিন বসিয়া আমাদের খেলা দেখিলেন ও শেষে এক দিন বলিলেন, "অনেক দিন খেলি নাই, কিন্তু তবু দেখা যাক একবার।" বার কয়েক রাম-হারা হারিয়া গেলেন। ইংরেজি শিক্ষার অভিলাষ একেবারে কমিয়া গেল। বলিলেন, "অভ্যাস একেবারেই নাই, কিন্তু কে ভাল খেলে বলিয়া আপনার মনে হয়, ভিকটর না আমি?" তিনিই ভাল খেলেন বলা সত্ত্বেও ইংরেজির জন্য পয়সা খরচে তাঁহার আর আগ্রহ দেখা গেল না। নিরীহ প্রেমমগ্ন ভিকটর বেচারার উপর কি কারণে ইঁহার ঈর্ষ্যা হইয়াছিল বুঝিতে পারিলাম না। ইঁহার টেবিলে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ ছিলেন, তা সত্ত্বেও ইনি মধ্যে মধ্যে আমাদের টেবিলের তরুণীদের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্যের চেষ্টা করিতেন, আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিতেন। ডোড়িয়ারা এঁকে পাত্তা দিত না, উপেক্ষা করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত, তাই বোধ হয় ভিক্টরকে জিতিয়া ইঁহাদের জব্দ করিবার মতলব করিয়াছিলেন। ভিণ্টারনিট্‌স ভিয়েনা যাইবার আগে বলিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রবধূ ও ছোট প্রপৌত্রটিও ভার্টেনবার্গে যাইবে। একদিন লেকের ধারে রোদ পোহাইতেছি, ছেলেটি আসিয়া উপস্থিত। পরে উহাঁদের হোটেলে দেখা করিয়া মাতাপুত্রের সঙ্গে একদিন বনে বেড়াইলাম।

ভারতীয় ছাত্রদের সম্মেলনের জন্য ভার্টেনবার্গ হইতে লেসনীর সঙ্গে প্রাহায় ফিরিলাম। লেস্‌নী তাঁহার গাড়ী কিছুদিন আগে বেচিয়া দিয়াছেন, নূতন গাড়ী এখনও কেনা হয় নাই। ক্লাপ ও লাম্পারদের গাড়ী প্রায়ই প্রাহা হইতে যাতায়াত করিত, ক্লাপদের মোটরে আমরা প্রাহা আসিলাম। পথে পাহাড়ের মাথায় মাথায় অনেক পুরাতন ক্যাসল্ দেখা গেল। সম্মেলন শেষ হইলে জার্ম্মানী রওনা হইলাম। বাহির হইতে টিকিট কিনিয়া অন্ততঃ সাত দিন জার্ম্মানিতে থাকিলে জার্ম্মান মেলে ৬০% কম ভাড়ায় টিকিট পাওয়া যায়।

বার্লিনে আসিয়া দেখিলাম অলিম্পিক খেলার মহা হৈ চৈ। সব বাড়ীতে গবর্ণমেণ্টের হুকুমে নূতন রং দেওয়া হইয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় ধ্বজাপতাকা উড়িতেছে। অলিম্পিকের বন্দোবস্ত সব দেখিলাম। কিন্তু বাড়ীভাড়া অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, দৈনিক ছয় মার্কের কম ঘর পাওয়া যায় না। অবিশ্রাম চতুর্দ্দিকে খেলা-ধূলার কথা, সেই আলোচনা, সেই চর্চ্চা, অতিষ্ঠ হইয়া হামবুর্গ পালাইলাম। হামবুর্গে গিয়া দেখিলাম সেখানেও শান্তি নাই, "বিশ্রাম ও অবকাশ" সম্বন্ধে একটা বিশ্ব-সম্মেলন চলিতেছে। জার্ম্মানরা প্রোপাগাণ্ডা করিতে সিদ্ধহস্ত, বার্লিনের অলিম্পিয়াডের আগে হাম্বুর্গেও বিশ্বের লোক জড় করিবার মতলব। নানারূপ খেলা-ধূলা, ফোক্ ডান্স, গীতবাদ্যের দৈনিক প্রোগ্রাম। নানা দেশের সেকেলে জাতীয় পরিচ্ছদসমন্বিত একটা প্রোসেশন দেখিলাম, প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী।

এখানেও এই খেলা-ধূলার ভীড়ে অস্বস্তি বোধ হইল, হামবুর্গ ছাড়িয়া জার্ম্মানীর একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণে নর্থ সী'র ধারে "সেন্ট-পিটার" নামক ছোট একটি জায়গায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সুন্দর স্থানটি। সাগরতীরে হোটেল, বোর্ডিং-হাউস প্রভৃতি আছে, কিন্তু জায়গাটি ফ্যাশানেবল নয়, খুব "কোয়ায়েট্"। নর্থ সী'র হাওয়াতে ওজোনের ভাগ খুব বেশী বলিয়া স্বাস্থ্যান্বেষীরাই এখানে খুব বেশী আসে, কয়েকটা স্যানিটেরিয়ামও আছে। বাস্তবিকই হাওয়ার এমন গুণ কোন পাহাড়ে বা সাগরতীরে দেখি নাই। সারা সকাল বৈকাল ঘুরিয়া বেড়াইতাম, একটুও ক্লান্তি বোধ হইত না, শরীর এমন চাঙ্গা বোধ কোথাও করি নাই। প্রশস্ত সাগরতীরে ঝাউজাতীয় ছোট ছোট গাছের বনে সমাচ্ছন্ন, একটু দূরে

বড় গাছের বনও আছে। ছোট সহরটির মধ্যে না থাকিয়া একটু বাহিরে ছিলাম। সাগরতীর প্রভৃতি চেঞ্জের জায়গায় সাধারণ অবস্থার লোকে বাড়ীতে দুই একটা ঘর বাড়াইয়া একটু সাজাইয়া গুছাইয়া গ্রীষ্মের ছুটীতে চেঞ্জারদের ভাড়া দেয়। সাধারণ অবস্থার অনেক গৃহিণী দুপুরে রাত্রে বাহিরের লোকের আহারেরও ব্যবস্থা করে। প্রথমে একটি সৈনিকের বিধবার বাড়ীতে, পরে একটি রাজমিস্ত্রীর বাড়ীতে ঘর লইয়াছিলাম। বলা আবশ্যক যে, এরূপ লোকেরও বাড়ীর আসবাব-পত্র এদেশে আমাদের দেশের বড়লোকের বাংলোর চেয়ে ভাল হয়। এক চাষার বাড়ীতেও মধ্যে মধ্যে খাইতাম। গ্রামের লোকের জীবন বেশ দেখা গেল। চাষারা এদেশে বেশ সম্পন্ন অবস্থার লোক। বাড়ীগুলিতে খড়ের ছাত ও ইট-কাঠের দেওয়াল। একটা বড় ঘরে চাষার ক্ষেতের গাড়ী ও ঘোড়া থাকে। অন্য ঘরে রাজ-হাঁস ও মুর্গী থাকে। বাহিরের একটা ঘরে শূয়র থাকে। কোন বাড়ীতে অতিথি হইলে বা নিমন্ত্রিত হইলে বাড়ীর সব জায়গা আগন্তুককে দেখান এদেশের ভদ্রতার রীতি। গৃহস্থের বড় আদরের জিনিষ এদেশে শূয়র, দুর্গন্ধ ও অপরিচ্ছন্ন ঘরে ঘোঁৎ-ঘোঁতায়মান এক পাল ছোট বড় শূয়র অতিথিকে দেখাইতে ইহাদের বড় আনন্দ হয়। ছোট গ্রামে গ্যাস নাই, কিন্তু কাছের সহর হইতে ইলেকট্রিক আসে, রেডিও-ও প্রায় প্রত্যেক চাষার বাড়ীতে আছে। ক্ষেতের কাজের জন্য মোটরের যন্ত্রপাতি বা চড়িবার জন্য মোটর সাইকেলও অনেকের আছে। জনাকীর্ণ সহরের গোলমালের মধ্যে রেডিও, বিশেষতঃ লাউড-স্পীকারের আর্ত্তনাদ শুনিলে আমার ঢিল ছুঁড়িয়া যন্ত্রটাকে ভূমিসাৎ করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু দূর জায়গায় ছোট গ্রামে নির্জ্জনে আরামে ঘরে বসিয়া রেডিও শোনার ভারি একটা মজা আছে। জগৎকে দূরে রাখিয়াও তার সব খবর রাখা চলে, সংসারের নির্ব্বোধদের কোলাহল না শুনিয়াও লোকযাত্রার সঙ্গে সংস্পর্শ রাখা যায়, মানবজগতের মূর্ত্তিতে চক্ষুকে ক্লিষ্ট না করিয়াও কর্ণেন্দ্রিয়ে তার প্রাণস্পন্দন শোনা যায়; তাহাও যাহা আমার ভাল লাগে তাহা শুনিব, যাহা ভাল না লাগে তাহা একটি অঙ্গুলীসঞ্চালনে দূর করিয়া দিব। যন্ত্রের হাতলটা ঘুরাইয়া প্রায় সারা পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসা যায়, কোথাও খবর বিতরণ হইতেছে, কোথাও বক্তৃতা, কোথাও নাচ-গান-বাজনা, কোথাও একটা বিশেষ সমারোহ ব্যাপারের বর্ণনা, কোথাও বা অন্য কিছু—পূরা পৃথিবীটার সঙ্গে ছোট ঘরটিতে বসিয়া যোগস্থাপন হইয়া যায়, জড়-দেহের যোগের চেয়ে বাস্তব ও কল্পনামিশ্রিত এই মনের যোগের আনন্দ বেশী; আমি সবই দেখিলাম, সবই শুনিলাম কিন্তু আমাকে কেহই বিরক্ত করিতে পারিল না, আমি বিশ্বে থাকিলেও বিশ্ব আমাকে অভিভব করিতে পারে না, সংসারে থাকিলেও আমি সংসারের বাহিরে ও উপরে, সংসারে আমার কর(অঙ্গুলি)তলে—এইরূপ একটা "অহং ব্রহ্মাস্মি" রকমের ভাব বোধ করা যায়। আরও একটু তুরীয় অবস্থায় উঠিবার বাসনা হইলে অ্যাট্-মস্ফেরিক্স এর গোলমালে বা যন্ত্রের বিরামের সময় যন্ত্রে যে এসরাজের তারের কাঁপনের মত আওয়াজটা শোনা যায় সমাধিস্থ শ্রোতা music of the spheres-এর ওঙ্কার-নাদ বলিয়া তাহাকে কল্পনা করিতে পারেন!

বার্লিনের অলিম্পিয়াডের ভীড় ছাড়িয়া আসিয়া এখানে নিরিবিলিতে বসিয়া রেডিওতে প্রথম দিনকার আরম্ভ—অনুষ্ঠানের মার্চ্চের বর্ণনা শুনিতে বেশ লাগিল। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় দল মার্চ্চ করিয়া যাইতেছে—"এই বার ঐ দেখ, ইহার পিছনে ভারতীয় দল! মাথায় পাগড়ী, ঋজু দেহ, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে জনতার তুমুল আনন্দোল্লাসের মধ্যে ইহারা অগ্রসর হইতেছে—" বাড়ীর অন্যান্য শ্রোতারাও আমার দিকে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন জানাইয়া হর্ষ-ধ্বনিতে যোগ দিলেন। মায়ার বেনফাইদের গ্রামের ভিলাতেও যখনই যাইতাম, প্রতি সন্ধ্যায় আমরা তিনজন নিস্তব্ধে স্তিমিত-প্রদীপে অনেকক্ষণ বসিয়া রেডিওতে গান-বাজনা শুনিতাম। রাজমিস্ত্রীর বাড়ীতে গৃহিণী রান্না করিত ছেলেমেয়েগুলি ঘরদোর বিছানা ঠিক করিত, আর মিস্ত্রী আহার পরিবেষণ করিত ও আহারের সময় ও পরে কথাবার্ত্তা রঙ্গ-তামাসা করিয়া অতিথিদের চিত্ত বিনোদন করিত। লোকটি পূর্ব্বে কমিউনিষ্ট ছিল, এখনও আছে, তবে কালধর্ম্মে প্রচ্ছন্নভাবে। বাড়ীর অতিথিদের মধ্যে দুই একজন ন্যাশনাল সোসালিষ্ট ছিল ও একটি পাদরি সপরি-

রাত্রে বাহির হইতে খাইতে আসিতেন। এঁদের এ ছচক্ষে দেখিতে পারিত না, আমার কাছে গোপনে একলা আসিয়া এঁদের নিন্দা করিত। ন্যাশনাল সোসালিষ্টরা অবশ্য কোটের উপর পার্টির ব্যাজ পরিতেন, কিন্তু পাদরি সাদা পোষাকে তাও গরমের দিনের অর্দ্ধ-পোষাকে আসিতেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পেশার পরিচয় ঠিক করিতে পারি নাই। রাজমিস্ত্রী বলিল "আস্তে আস্তে মাপিয়া মাপিয়া সার্মনের মত কথা বলার ঢং দেখিয়া প্রথম দিনেই আমি বুঝিয়াছি বেটা পাদরি না হইয়া যায় না।" রাজমিস্ত্রী আগে নর্থসী'র কূলে ও ডেনমার্ক-সীমান্তে স্মাগ্‌লিং-এর ব্যবসাও করিত, সে গল্পও অনেক রং-চং দিয়া করিল। লোকটি বাহিরে আমোদ-প্রমোদী হইলেও ভিতর হইতে একটা ক্রুদ্ধ পশুভাব যেন সর্ব্বদা উঁকি দিত। ইহারা স্বামী স্ত্রীতে আমাদের সামনে খুব সৌহার্দ্দ্য দেখাইত, এক দিন দেখা গেল গৃহিণীই পরিবেষণ করিতেছে, শোনা গেল মিস্ত্রী বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে কবে ফিরিবে কেহ জানে না। গৃহিণীর নির্লিপ্ততা হইতে বুঝা গেল এ ব্যাপার নূতন নয়, রোগের আদি অন্ত দুই তার জানা আছে এবং নিশ্চয়ই মারাত্মক নয়। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল মিস্ত্রী আবার হাসিমুখে পরিবেষণ করিতেছে, দুপুরে অনুপস্থিতির কোন লক্ষণ নাই। একদিন রাত্রে বড় বাদলা হইল, বাহির হইবার উপায় নাই, খাওয়ার পরে সে ঘরে বসিয়াই সকলে জটলা করা গেল। গৃহিণী রান্নাঘরে গিয়া ডিম ফোটাইয়া তাহার সঙ্গে রাম্ ও চিনি মিশাইয়া আমাদের বিনা পয়সায় পরিবেষণ করিল, ইহার নাম গ্রগ্। মিস্ত্রী নানারূপ গান করিয়া মুখ-হার্ম্মনিকা বাজাইয়া আমাদের চিত্ত বিনোদন করিল। এ ছোট সহরে ও বাড়ীতে কেহ কখনও ভারতীয় দেখে নাই, সদাই বহুবিধ প্রশ্ন করিত।

সেণ্ট পিটার হইতে আবার হামবুর্গ ফিরিয়া কিছু দিন থাকিলাম। সেণ্ট পিটার যাইবার পথে হামবুর্গে পরিচিত বাড়ীগুলিতে কোথাও ঘর খালি পাই নাই, অবশেষে একটি দরিদ্র পল্লীতে এক দর্জ্জির বাসায় ঘর পাইলাম। আমার একটি ইউনিভার্সিটীর বুলগেরিয়ান বন্ধু এ বাসায় থাকিতেন। ইউনিভার্সিটির অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী এ পাড়ায় থাকে, মাসিক ১৬ টাকায় সস্তায় ঘর পাওয়া যায়, তবে স্নানের ব্যবস্থা সেণ্ট্রাল হিটিং প্রভৃতি নাই, আসবাবপত্রও সামান্য। এই বুলগেরিয়ানটি স্কিপ্ ও প্রাইভেট টিউশনির দ্বারা পড়া-শুনা করিয়া ডক্টর হইয়াছেন, একখানি সাইকেল আছে, তাহাতে প্রতি ছুটিতে সারা ইউরোপ ঘুরিয়াছেন ও সমস্ত ইউরোপীয় ভাষা জানেন, এস্‌পারাণ্টোও। আর একটি গ্রীক আমাদের বন্ধু ছিলেন, ইনিও ডক্টর, ইউনিভার্সিটিতে কুকুরের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেন। আমাদের তিনজনেরই এক সালে জন্ম ও প্রায়ই আমরা একত্র ঘোরা-ফেরা করিতাম ও পর্য্যায়ক্রমে এক এক সপ্তাহে একদিন পরস্পরের ঘরে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দেশীয় রান্না করিয়া খাইতাম। এই সূত্রে বুলগেরিয়ান বন্ধুর দর্জ্জি-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ছিল। বন্ধুটি ছুটিতে বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আবার সেই ঘরই লইবেন, কাজেই ঘরটা খালি থাকিতে পারে ভাবিয়া সেখানে গেলাম। ঘর মিলিল, কিন্তু বুড়া দর্জ্জি জানাইল তাহার স্ত্রী এখানে নাই, সে একলা। স্ত্রী কবে ফিরিবে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া স্ত্রী তার ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে, দর্জ্জি বাঁচিয়াছে, আজীবন কলহ আর ভাল লাগে না। এতদিনে একলা হইয়া দর্জ্জি আমিরের মত সুখে আছে, ইত্যাদি। "সেকেলে পরিচ্ছদে" প্রোসেশনের জন্য রাস্তার ভীড়ে দর্জ্জির স্ত্রীকে টুল লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। উপদ্রপ বাড়াইবার ইচ্ছা না থাকায় কথা না বলিয়া 'নড' করিয়াই সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলাম। এবার আসিয়া বুলগেরিয়ান বন্ধু ফিরিয়াছে কি না খোঁজ করিবার জন্য তাহার বাসায় গেলাম। বাড়ী বন্ধ, কোন লোক নাই। প্রতিবেশীরা জানাইল দর্জ্জি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, স্ত্রী গলির ওমোড়ে অত নম্বরে তার ভায়ের বাড়ীতে! সেখানে স্ত্রীর দেখা মিলিল ও তাহার 'ভার্শান' শুনিতে হইল "যা দু' পয়সা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা, তাও মদ খাইয়া উড়াইয়া দিবে, আমাকে সব খরচা চালাইতে হইবে, চিরজীবন মাতালের সঙ্গে সংসার করা আমার কাজ নয়, এখন বেশ আছি।"

এবার একটি বাড়ীতে ঘর মিলাল, তিন তলার ফ্ল্যাটে,

আগে কিছু দিন এই বাড়ীরই পাঁচ তলার ফ্ল্যাটে ছিলাম। গৃহস্বামী পূর্ব্বে আফ্রিকায় জার্ম্মান কনস্যাল ছিলেন, পরিচয় শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আপনিই হের ডক্‌টর! আপনি উপরের ফ্ল্যাটে যখন ছিলেন তখন একদিন আপনাকে রাস্তায় দেখিয়াছি!" আমি বলিলাম "হাঁ, পাড়ায় অনেকেই দেখিয়াছে।"

"না, শুধু তাই না, একদিন আপনার একটি বন্ধু রাস্তায় আপনার দেশী কাপড়ে ফটো তুলিতেছিলেন, আমি জানালা হইতে দেখিয়া আমার স্বামীকে ডাকিয়া আপনার দেশী পরিচ্ছদ দেখাইলাম, কিন্তু আমার মনে হইল ঐরূপ পাতলা কাপড় পরিয়া বাহির হইলে আপনার ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইতে পারে। বিশেষতঃ সে দিন বেজায় ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। আপনার নামের চিঠিও মধ্যে মধ্যে পিয়ন ভুল করিয়া আমার ফ্ল্যাটে দিয়া যাইত, আমি পরে উপরে পাঠাইয়া দিতাম। ইঁহাদের বাড়ীতে ঝি ছিল না। সকাল বেলা প্রথম প্রথম কন্‌সালই প্রাতরাশের ট্রে ঘরে দিয়া যাইতেন, পরে গৃহিণীও আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের বসিবার ঘরের রেডিওটা অহোরাত্র শব্দায়মান থাকিত, ভাগ্যে আমার ঘরটা ফ্ল্যাটের অপর প্রান্তে ছিল। একদিন বৈকালে ঘরে বসিয়া আছি, ফ্রাউ কনসাল হাপাইতে হাপাইতে ছুটিয়া আসিয়া নক্ না করিয়াই দরজা খুলিয়া চীৎকার করিয়া গেলেন "অলিম্পিয়াডে ভারতীয়েরা হকিতে জিতিয়াছে। এই মাত্র রেডিওতে শুনিলাম।"

হামবুর্গে পরিচিত মহলের সঙ্গে দেখা হইল। আবার হামবুর্গে আসায় সকলেই সুখী হইলেন। লেস্‌নী কিন্তু মহা ব্যস্ত হইয়া এক চিঠি লিখিলেন "অনেক দিন পর আপনার খবর পাইয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম, এতদিন খবর না পাইয়া আমরা ভাবিতেছিলাম আপনি কোথায় গেলেন। শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসুন!" জার্ম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া বা হাঙ্গেরি যাওয়া চেকরা পছন্দ করে না, কারণ উহারা এদের প্রাচীন শত্রু ও বর্ত্তমানেও বিরোধী তা ছাড়া লেস্‌নী শুনিয়াছিলেন যে, প্রোফেসর শূব্রিং আমাকে হামবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে লেক্‌চারার নিয়োগ করায় বরাবরই ইচ্ছুক ছিলেন, ইউনিভার্সিটির অর্থাভাবে সেটা ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁর ভয় হইয়াছিল বুঝি বা এইবার শূব্রিং অর্থের জোগাড় করিয়া আমাকে হামবুর্গেই রাখিয়া দেন।

হামবুর্গ হইতে বার্লিনের উপর দিয়া প্রাহা ফিরিলাম। বার্লিনে অলিম্পিয়াডের বাজার ভাঙ্গিতেছে, এখনও খুব সরগরম। হামবুর্গ ও বার্লিনে অনেক সময় আমাকে দেখিয়া লোকে মনে করিত, অলিম্পিয়াডের দর্শক, তারপর ভাবিত খেলোয়াড়, আরও কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঠিক করিত নিশ্চয় পকেটে অলিম্পিয়াডের সোনার মেডেল আছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিত, কি খেলি। কেহ মনে করিত, আমি দক্ষিণ আমেরিকান, কেহ বা ভাবিত ইংরেজ। ভারতীয় শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিত, হকি টিমের কোন্ প্লেসে খেলি। ছোকরারা নাম জিজ্ঞাসা করিত ও অটোগ্রাফ চাহিত। এক ছোকরার দলকে বলিয়াছিলাম, কাল সকালের কাগজে আমার ছবি বাহির হইবে ও তাহার নীচে আমার নাম থাকিবে এবং বৈকালে ঠিক এই জায়গাটায় আসিলে আবার দেখা মিলিবে ও অটো-গ্রাফও দিব।

হামবুর্গ ও বার্লিনে শুনিলাম, শ্রীমতী মেনকার নাচের সুখ্যাতি হইয়াছে। উদয়শঙ্করের খ্যাতি ভিয়েনা, প্যারিস, বুদাপেস্তেও হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি বড় আর্টিষ্ট। শিশির ভাদুড়ী মহাশয়কে রঙ্গমঞ্চে পাঁচ মিনিট দেখিয়াই যেমন মনে হয় born actor, উদয়শঙ্করেরও দেহের প্রত্যেক রেখায় তেমন বর্ণ্‌ ডান্সারের ভাব। আর্ট-রসিকরা এখানে খুব প্রশংসা করিলেন, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম সমালোচকও যাঁরা, তাঁরা বলিলেন, একটু পাশ্চাত্ত্যের ছায়া পড়িয়াছে, ওটুকু বাদ দিয়া খাঁটি ভারতীয় ভাবটি রাখিলেই কলা হিসাবে উচ্চদরের হইত। উদয়শঙ্কর বহুদিন ইউরোপে আছেন, তবু তাঁর দলে একটা অভাব লক্ষ্য করিলাম। দলের স্ত্রীপুরুষ সবাই ফর্সা রং-এর, অথচ এ দেশে শ্যাম-বর্ণেরই appeal বেশী, কারণ ওটা অসাধারণ ও exotic, ঠিক আমাদের দেশে লোক যেমন ফর্সা রং দেখিতে ও পাইতে চায়। শ্রীমতী মেনকা অজস্র রং মাখিয়া মঞ্চে নামেন দেখিলাম, অপেরা গ্লাসে দেখিতে বড়ই বিসদৃশ লাগে, তার চেয়ে তাঁর খাঁটি শ্যামবর্ণে লোকে বেশী

প্রীত হইত। মেনকা প্রাহাতে অপেক্ষাকৃত নীচুদরের জায়গায় তাঁহার নাচের বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন।

বার্লিন হইতে প্রাহা পর্য্যন্ত গাড়ীতে সব সীট ভর্ত্তি। একটি সহযাত্রী ভিয়েনায় কাবারেতে অভিনেতা, রাত ১১॥টা হইতে ৩॥টা পর্য্যন্ত আমাকে ইংলিশম্যান মনে করিয়াছিলেন, পরে সীমান্তে আসিয়া কাষ্টম্‌স্ পরীক্ষার গোলমালের মধ্যে আলাপ হইল। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খবরাদি রাখেন দেখিলাম। খুব সপ্রতিভ লোক, কথার কার্পণ্য মোটেই নাই, নটরা যেমন হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্, কিন্তু ইন্‌টেলেক-চুয়াল নন, প্রসার আছে, কিন্তু গাঢ়ত্ব নাই। খানিকক্ষণ গল্প শুনিয়া ঘুমাইবার ভান করিয়া থাকিলাম, পরে উঠিয়া করিডারে একটু ঘুরিয়া আসিলাম। বাহিরে প্রভাত হইতেছিল, গাড়ী তখন এল্‌বের জল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এ দৃশ্য প্রথমবারে সন্ধ্যায় দেখিয়াছিলাম, এবার উষালোকে দেখিতে আরও ভাল লাগিল। প্রাহায় আসিলে আমি জার্ম্মানীর কোন কথা না বলা সত্ত্বেও লেস্‌নী বোধ হয় মনে করিলেন, ছুটির পর জার্ম্মানী যাওয়াই ঠিক করিয়াছি। বলিতে লাগিলেন, ছুটির পরও এখানে আমাকে বাংলা পড়াইতে নিশ্চয় ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট আবার নিয়োগ করিবেন ও অন্যান্য উপার্জ্জনের পথও অনেক ঠিক করিয়া দিবেন। অনেক চিঠিপত্র লেস্‌নীর কেয়ারে আমার আসিত, জার্ম্মানীর ঠিকানায় আমাকে পাঠাইতে লেখা সত্ত্বেও উনি সেগুলি জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে কোনও উপায়ে প্রাহায় ফিরাইয়া আনার মতলবে। যা'ক্, এতদিনে হিতৈষী প্রোফেসার নিঃশঙ্ক হইয়াছেন দেখিয়া আমোদ অনুভব করিলাম। চিঠির মধ্যে দেখিলাম সেই অষ্ট্রিয়ান কাউণ্ট তাঁহার প্রাসাদের ছবি পাঠাইয়াছেন ও লিখিতেছেন যে, ডাক্তারের আদেশে তাঁহার ভিয়েনায় যাইতে হইবে, তার আগেই যেন ওঁর ওখানে যাই। তখন আমি অন্যান্য বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আগেই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি, কাজেই কাউণ্টের ওখানে যাওয়া সম্ভব হইল না। পরে আরও পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, কিন্তু আমার যখন অবশেষে সময় হইল কাউণ্ট তখন ভিয়েনার ডাক্তারের হুকুমে স্যানিটেরিয়মে। যাওয়া আর হয় নাই।

প্রাহা হইতে একটি ছাত্রবন্ধুর বাড়ীতে গেলাম, দক্ষিণ-পশ্চিম বোহেমিয়ার সীমান্তের কাছে একটি ছোট গ্রাম পিল্‌জেনের উপর দিয়া যাইতে হইল। এখানে আগে একটি খুব বড় কাঁচের কারখানা ছিল, গ্রামের ও বাহিরের ঢের লোক সেখানে চাকরি করিত, ছাত্রটির বাপও সেখানে সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। এখন কারবারটি একটি বেল্‌জিয়ান ট্রাষ্টের কবলসাৎ হইয়া কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বাড়ীঘর অধিকাংশই এই কারখানার কর্ম্মচারিদের জন্য কারখানার নির্ম্মিত। এখানকার ৭০% লোক জার্ম্মান। ছাত্রটির পরিবার একটা তেতলা-বাড়ীর দোতলার ফ্ল্যাটে থাকিতেন, তেতলায় একটা ফ্ল্যাট খালি পড়িয়া ছিল, কোম্পানীকে বলিয়া সেই ফ্ল্যাটের একটি ঘরে খাট-টেবিল ফেলিয়া আমার থাকার বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। ছাত্রটি বড় ধীরপ্রকৃতির, ল পড়ে। তার মা বাবাও বড়ই ভাল মানুষ। সাত দিন সেখানে ছিলাম, সারাক্ষণ মা'এর একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল আমার কি খাইতে ভাল লাগিবে তাহার ব্যবস্থা ও রান্নাবাড়া করা। চেক আহার্য্য যত রকমের হয় সব খাওয়াইলেন। আমাদের দেশের সিমভাজা ও পালংশাক (এ দেশের spinat) ভাজার প্রক্রিয়া শুনিয়া লইয়া তাহাও খাওয়াইয়াছিলেন। একদিন মোহনভোগ বানাইয়া ইঁহাদের খাওয়াইলাম। জার্ম্মানরাও ইহা খাইয়া বলিত বেশ লাগে। বুল্‌গেরিয়ান বন্ধুটির ইহা এত ভাল লাগিত যে, আমার বাসায় খাইবার সময় ইহা একবার বাদ পড়িলে পরের বার ফর্ম্মাস করিতেন। ইনি বলিলেন, ঐ জাতীয় একটা জিনিষের তুরস্কেও চল আছে দেখিয়াছেন। জিনিষটি বোধ হয় পারস্য হইতে পূর্ব্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মা রোজ প্রশ্ন করিতেন, কি খাইবে, কি খাইবে। মাংসাহারে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, নিরামিষ এদেশে রাঁধিতেই জানে না। খরগোসের মাংস সে পর্য্যন্ত খাই নাই, ঐটি খাইতে চাহিলাম, দুঃখের বিষয় ঐ সময়ে খরগোসের closed season, তবুও বাপ এ গ্রামে ও আশে-পাশের গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন তাঁর খরগোসের প্রয়োজন। আমি বন্ধুটির সঙ্গে সারাদিন পাহাড়ে বনে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। গ্রামে অনেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিত ও পরে

বন্ধু বলিতেন যে খরগোসের খবর বলিতেছিল, সবাই জানাইতেছে চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু পাওয়া দুষ্কর। একদিন সন্ধ্যার আহারের পর পরিবারের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে, দরজায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, প্রথমে কর্ত্তা, পরে গৃহিণী ও পরে ছেলে উঠিয়া গেলেন। শুনিলাম একটা লোকের সঙ্গে কি কথা হইতেছে। অনেক পরে সকলে ফিরিয়া জানাইলেন, লোকটি একটা খরগোস লইয়া আসিতেছিল কিন্তু একেবারে বাচ্চা, খাইবার অযোগ্য। একদিন স্যালাডের শশাটা তিত লাগিল, আমি বলিলাম, কাল শশা কাটিবার আগে আমাকে ডাকিবেন, আমি দেখাইয়া দিব তিত নিবারণের উপায়। পরদিন মহা উত্তেজনায় সকলে একত্র হইলেন, না জানি কি ভারতীয় যাদু হইবে! শুধু বোঁটার আঠা ঘষিয়া বাহির করিয়া তিত নিবারণের উপায় দেখিয়া তাঁহারা একটু দুঃখিত হইলেন। ইঁহাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ী একদিন রাত্রে আহারের পর কফি খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। এই পরিবারের ছেলেটি প্রাহায় পড়ে, আমার বন্ধুর বন্ধু। এর একটি ছোট বোন আছে, পিল্‌জেনে স্কুলে পড়ে আমার বন্ধুটি বলিলেন আগে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল, কিন্তু এখন তিনি আর আগ্রহ দেখান না, কারণ মেয়েটি মাত্র ষোড়শী হইলেও বড় দুষ্ট, খালি ঘোরাল ঘোরাল নভেল পড়ে, কাহারও প্রতি মমতা নাই, শুধু বহু লোককে পিছনে ঘুরাইবার চেষ্টা করে। মেয়ের মার পূর্ব্বজীবনের সম্বন্ধেও বন্ধুর মা কিছু মন্তব্য করিলেন। এসব ছোট জায়গায় দেখিলাম সবাই সবাইয়ের নাড়ী-নক্ষত্রের খোঁজ রাখে এবং সে সম্বন্ধে চর্চ্চাও বেশ করে।

সন্ধ্যার পর আমরা বসিয়া গল্প করিতাম বা বন্ধুটির কাছে ফ্রেঞ্চ পড়িতাম। একদিন রবিবারে বৈকালে এখানকার কাফেতে গেলাম। একটি মাত্র কাফে, বাহিরে বনের প্রান্তে। চারিপাশের গ্রাম হইতে রবিবার বৈকালে লোক এখানে একত্র হয়, নাচের ব্যবস্থাও আছে। এই সাপ্তাহিক মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল বিয়ার-পান। আমরা কটি যুবকদের টেবিলে বসিলাম। সবাই বড় বড় বিয়ারের মগ সামনে লইয়া বসিয়াছে, যুবক-দের মা-বাপরাও অন্যান্য টেবিলে আছেন,—বাপরা মধ্যে মধ্যে এ টেবিলে আসিয়া ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছিলেন, ছেলের বন্ধুরাও বাপের সঙ্গে ছোকরা বন্ধুর মত রঙ্গ-ঠাট্টা করিতেছে। দলে আরও আছেন—দুইটি ভাই, দূরের এক সহরের একজন কাউন্টের ছেলে। ইঁহারা একটা দুই-সীটার রেসিং-কারে আসিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে গাড়ী লইয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া আসিতেছেন, একবার গিয়া দূরের একটা গ্রাম হইতে দুটি বান্ধবীকে লইয়া আসিলেন। এখান হইতে পিল্‌জেন, মুক্ত পিচঢালা পথে মোটর ছুটাইয়া গেলে যাইতেই আধঘণ্টা লাগে, কাউন্টের ছেলে দুটি একবার রেসিংকার ছুটাইয়া তের তের ছাব্বিশ মিনিটের মধ্যে পিল্‌জেন হইতে কি একটা জিনিষ কিনিয়া লইয়া আসিলেন। সাধারণ বিয়ারের মগ ছাড়া এক একজন বড় মগের হুকুম করিতেছেন, প্রায় তিনফুট উঁচু একটা মগ, সেই মগ টেবিল ঘুরিয়া আসিতেছে, সবাই একমগ হইতে পান করিতেছে। একজন যখন পান করিতেছে তখন পাঁচ জনে চীৎকার করিতেছে, "আরও, আরও।" প্রায় ঢোক দশেক না গিলিয়া নিস্তার নাই। আমাকে সকলে ছাঁকিয়া ধরিল, বল ভারতে এটা কি রকম, ওটা কি রকম, বিয়ার খায় কি না ইত্যাদি। আমি বলিলাম, না আমার দেশে বিনা বিয়ারেই আনন্দ করা চলে, সবেতেই অ্যাল্‌কহলের দরকার হয় না। একটি মেয়ে বিয়ারের বদলে লেমনেড খাইতেছিলেন, তিনি এ কথায় ভারি খুসী হইলেন, "হাঁ, সেই তো ঠিক, আনন্দ করিতে অ্যাল্‌কহলের দরকার কি?" একটি ছোকরা আমাকে দেখিয়া দেখিয়া শেষটা মুগ্ধের মত নানা কথা বলিতে লাগিল "আপনি সবেতেই যোগ দিতেছেন, সবই মনে মনে লক্ষ্য ও সমালোচনা করিতেছেন, নিজেকে কিন্তু হাতছাড়া করিতেছেন না; আর আমরা বড়ই অধম, কি বা আমাদের সমাজ বা ধর্ম্ম, কি বা আমাদের সভ্যতা, কি বা আমাদের স্ত্রীলোকদের চরিত্র—" ইত্যাদি। ক্রমে সকলেরই চোখ ঘোলা হইয়া আসিল, একজন হেঁচ্‌কি টানিতে লাগিল, বমির ওয়াক আসিতেই টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। ইহাই এদের রবিবার পালন। এক একজন দশ বার মগ পর্য্যন্তও খায়। ইহাই যুবকদের এ দেশে, অর্থাৎ সারা ইউরোপে আমোদ।

একটি যুবক, এখানকার এক জমিদারের ছেলে ও প্রাহায় ডাক্তারি পড়ে, আমার বন্ধুটির সঙ্গে একদিন দেখা করিতে আসিল ও আমাদের তাহাদের বাড়ীতে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিল। একটা পাহাড়ের তলায় নদীর ধারে বাড়ী। বাপটি war profiteer, এখন মস্ত ব্যবসা ফাঁদিয়াছেন। বনভাড়া লইয়া তক্তা চেরাই ও রেলের স্লিপার সরবরাহ করেন, সে জন্য দুইটা ইলেকট্রিক কল আছে। একটা গম পিষিবার ইলেকট্রিক কল আছে। নিজের ডায়নামো। ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য ছয়টা ঘোড়া। রাজহাঁস, মুর্গী অজস্র। গোয়ালে ছাবিবশটা গরু, জমিদারের মেয়েটি গরু-দোয়ানর তদারক করিতেছেন দেখিলাম। জমিদারকে দেখিলাম, একটা শূয়র ও বুলডগের cross বলিয়া মনে হয়, মুখে লালা ঝরিতেছে, হৃদ্রোগ আছে শুনিলাম। লোকটি কাহারও সঙ্গে কথা বেশী বলেন না। বাড়ী হইতে কাঠের কলে যাইবার জন্য নদীর উপর এঁর প্রাইভেট সাঁকো আছে, তার উপরে দেখা হইল, শেকহাণ্ডও করিলেন। আমার বন্ধু বলিলেন, তিনি প্রায় কোন লোকের সঙ্গে শেকহাণ্ড করেন না। এত ধনসম্পত্তি, দুখানা মোটর (ইঁহাদের এক মোটরে একদিন পিলজেন সহর ঘুরিয়া আসিলাম), ইলেকট্রিক রেডিও, কিন্তু বাড়ীঘরের শোভা ও সাজসজ্জা জার্ম্মানির তুলনায় অনেক হীন। চাষাদের বাড়ীও এখানে কয়েকটি দেখিয়াছি, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও শ্রীহীন। পিল্‌জেন সহরটি বেশ বড়। বিখ্যাত লোহা ও যন্ত্রপাতি, মোটর, এরোপ্লেন, এঞ্জিন প্রভৃতি নির্ম্মাতা স্কোডা Skoda কোম্পানীর কারখানা এখানে। টাটানগর দেখা ছিল বলিয়া লোহালক্কড়ের মধ্যে আর গেলাম না। এঁরা চেকোস্লোভাক গবর্ণমেণ্টের মিউনিশনও প্রস্তুত করেন। একদিন বন্ধুটির বাপের সঙ্গে মাইল চারেক দূরের একটা বিয়ারের কারখানা দেখিতে গেলাম। ম্যানেজার সব প্রক্রিয়া দেখাইলেন। বন্ধুর বাপ বলিলেন, "অতিথিকে একটু বিয়ার খাওয়াইয়া দাও" (আমাদের দেশের নিমন্ত্রণের "ও পাতে লুচি নেই"!)। এ কারখানার মালিকের নাম কাউণ্ট Schwartzenberg। ইঁহার ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এখানে মধ্যে মধ্যে শিকারে আসিতেন।

[ক্রমশঃ

প্রতিদিন

— শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিচিত্র মুহূর্ত্তপুঞ্জ সীমাসংখ্যাহীন
বুদ্ধিতে প্রোজ্জ্বল আর মূঢ়তা মলিন।
স্পর্দ্ধায় উদ্ধত কভু, বিনম্র বিনয়ে,
দুর্জ্জয় সাহসে কভু সঙ্কুচিত ভয়ে
করুণায় দ্রবীভূত, নির্ম্মম কঠিন
অসংখ্য মুহূর্ত্তময় মোর প্রতিদিন।

প্রেমের অমিয় স্পর্শ—মধু শিহরণ
বিদ্বেষ ঈর্ষ্যার বিষে ক্লিষ্ট তনুমন
সরল বিশ্বাস আর সন্দেহ সংশয়
অন্তরের প্রীতি বাণী—ক্রূর অভিনয়
তৃপ্তিহীন বাসনার দুঃসহ জ্বালা
রচিত কণ্টকপুষ্পে মুহূর্ত্তের মালা।

সীমাহীন রিক্তভার বিপুল বেদনা
আশার আশ্বাস কভু কল্পনায় বোনা
উন্মত্ত রক্তের নৃত্য কভু বক্ষমাঝে
প্রশান্ত সুষুপ্তি চোখে কভু বা বিরাজে
অসির ঝঞ্ঝনা আর ভীরু পলায়নে
কী বিচিত্র পরিচয় জীবনের সনে।

শক্তির ঐশ্বর্য্য মোরে কভু ঘিরে থাকে
দুর্ব্বল দীনতা কভু পঙ্গু ক'রে রাখে
কখনো ছুটিয়া চলি কখনো বা থামি
দুর্গম বন্ধুর পথ উঠি আর নামি।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোর কী বিচিত্র রূপ
বুঝিতে পারি না আমি নিজের স্বরূপ।

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মেঘনাদবধ-কাব্যরচনা

লোয়ার চিৎপুর রোডের ছয় নম্বর বাড়ী ; বাড়ীটি দোতালা ; দোতালার একটি কক্ষ ; কক্ষটি প্রশস্ত এবং সুসজ্জিত ; মেঝেতে কার্পেট পাতা ; চারি দিকে দেয়ালের গায়ে রাশি রাশি পুস্তক ; কতক আলমারিতে সাজানো ; কতক স্তূপাকারে টেবিলের উপরে, কতক অবিন্যস্ত ভাবে কার্পেটের উপরে পড়িয়া ; কয়েকখানা আধখোলা ; কয়েকখানা এমন ভাবে রহিয়াছে, দেখিলেই মনে হয়—এখনই পঠিত হইতেছিল ; দেয়ালে খানকয় চিত্র, দেবতার নয়, প্রাকৃতিক নয় ; মানুষের নয়, কয়েকজন বিখ্যাত কবির ; মাঝখানে টেবিলে বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরি, মোমবাতিতে আলো ও বোতলে সুরা ; দেয়ালে একটা গোলাকার ঘড়ি, তার কাঁটা দুইটিতে মহাকালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি। রাত্রি এগারোটা। পথে শব্দ নাই, পথিক বিরল, এক আধখানা ভাড়াটে গাড়ির চাকার ধ্বনি।

একব্যক্তি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছেন, বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, দোহারা চেহারা ; মাথার চেরা-সিঁথি অঙ্গুলি সঞ্চালনে এলোমেলো ; পায়ে একজোড়া দামী চটি ; পরণে ঢিলা পায়জামা ; গায়ে রেশমের হাতকাটা ফতুয়ার মত, বুকের বোতাম খোলা ; ফাঁক দিয়া সুগঠিত রোমশ বক্ষঃস্থলের খানিকটা দৃষ্ট হয় ; পরিপুষ্ট দুইটি হাতও রোমশ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পায়চারি করিতে করিতে কাব্য রচনা করিতেছেন ; মেঘনাদবধ কাব্য। ঘরের তিন কোণে তিন ব্যক্তি, পরিচ্ছদে ও চেহারায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, কাগজ-কলম লইয়া উপবিষ্ট ; এক জনের কাছে বেশীর মধ্যে কয়েকখানা অভিধান, অধিকাংশই সংস্কৃত ; তিনি শব্দ সঙ্কলন করিয়া শোনান ; আর দুইজন আবৃত্তি শুনিয়া লিখিয়া যান। ঘরের চতুর্থ কোণে আর এক ব্যক্তি—পাষাণ-কঠিন, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিশ্চল, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়ে না ; আশ্চর্য্য লোকটির ধৈর্য্য ; মনে হয় এমনি ভাবেই তিন শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া আছে। আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি মিল্টনের।

মাইকেল পায়চারি করেন, বাহু পৃষ্ঠে বদ্ধ ; মাঝে মাঝে দুই হাত সম্মুখে সজোরে ছুঁড়িয়া দিবার অভ্যাস আছে ; মস্তিষ্ক যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন ঘন ঘন চুলের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে দ্রুত পায়চারি করিতে



মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

থাকেন ; আবার কখনো বা মিল্টনের মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া অপলক ভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকেন ; পণ্ডিতেরা লেখা শেষ হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন ; ঘুম পায়, হাই তোলেন ; চোখ রগড়াইতে থাকেন ; গোপনে এক টিপ নস্য গ্রহণ করেন ; হঠাৎ মাইকেলের দৃষ্টি মোমবাতির দিকে পড়ে ; মোম-টা ক্ষইয়া গিয়াছে, তাই তো, রাত্রি গভীর ; ঘড়ি থাকিতেও সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই ; মহাকালকে যিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না, মহাকালের আমিনের দিকে তিনি কেন তাকাইবেন ? মাইকেল চমকিয়া উঠিয়া হাসেন ; স্থূল ওষ্ঠাধরের অবকাশে শুভ্র, উজ্জ্বল, সুগঠিত দন্তপঙ্ক্তি বিকশিত হয় ; স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন, "কি পণ্ডিত, ঘুম

পাইয়াছে, নাও একপাত্র টেনে নাও।" পণ্ডিত অপ্রস্তুত ভাবে অন্য দুইজনের দিকে তাকান; মাইকেল তিনজনকে তিন পাত্র দেন; তাঁহারা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া এক নিঃশ্বাসে পাত্র উজাড় করিয়া একটা অর্দ্ধোক্ত শব্দ করেন, তাহাতে অনুরোধ রক্ষার অপেক্ষা তৃপ্তির ভাবটাই অধিক ফুটিয়া ওঠে। পণ্ডিতদের উঠিবার সময়ে মাইকেল জিজ্ঞাসা করেন, "আজ কতদূর হইল?" একজন উত্তর দেন—

"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে"

পণ্ডিতরা চলিয়া যান; মোমবাতি আরও হ্রস্ব হইয়া আসে; মাইকেল উদ্‌ভ্রান্তের মত শব্দের ঝঙ্কারে মাতিয়া পায়চারি করিতে করিতে আবৃত্তি করিতে থাকেন; "লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।" ঘরের মধ্যে একজন মাত্র শ্রোতা থাকে—মিণ্টন; দুইজনে কি সংলাপ হয়, কেহ জানে না।

[২]

মেঘনাদবধ-কাব্য রচনা চলিতেছে; আগের মতই সব, কেবল কবির অনুপ্রেরণা আজ উদ্দীপ্ততর; দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন, পণ্ডিতেরা লিখিয়া লইতেছেন, আজ পণ্ডিতদের অবসর নাই। যেদিন কল্পনা এমন করিয়া কবির কাছে ধরা দেয় না, সেদিন পণ্ডিতেরা বসিয়াই থাকেন, কবি বৃথা পায়চারি করিয়া মরেন। কবি বলিয়া যাইতেছেন:—

"কুসুম শয়নে যথা সুবর্ণমন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।"

এই পর্য্যন্ত প্রায় এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া কবি থামিলেন; তারপরে কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ; পণ্ডিতেরা হাত গুটাইয়া উপবিষ্ট। একজন সাহসে ভর করিয়া একটু কাসিলেন; মাইকেলের খেয়াল হইল; স্বপ্ন ভাঙ্গিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদূর হইয়াছে?" পণ্ডিত বলিলেন— "জাগিল বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।" অনুপ্রাসে মাতিয়া কবি ছত্রটি দুই তিন বার আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু নূতন কিছুই বলিলেন না। পণ্ডিতেরা সাহস পাইয়া আবার কাসিলেন, মাইকেল কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মিণ্টনের মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; মিণ্টনের দৃষ্টিহীন দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—

"Then with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,
Her hand oft touching, whispered thus;—Awake,
My fairest, my espoused, my latest found,
Heaven's last best gift, my ever new delight;
Awake, the morning shines."

তার পরে মিণ্টনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পণ্ডিতদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটা চেয়ারের পিঠদানি ধরিয়া সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে বলিয়া গেলেন—

"প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায় রে যেমতি
নলিনীর কাণে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য-কথা; কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)—"ডাকিছে তোমারে
পাখীকুল, মিল প্রিয়ে কমললোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে! তুমি রবিচ্ছবি:—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি, হে, জগতে
আমার! নয়ন তারা! মহার্ঘ রতন!
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম।"

এতখানি বলিয়া পরিশ্রান্ত কবি চেয়ারটার উপরে বসিয়া পড়িলেন; পণ্ডিতেরাও ঝুঁকিয়া গিয়াছিলেন, একসঙ্গে দুইজন লিখিতে থাকেন, পরে দুইজনের কপি মিলাইয়া পাঠ প্রস্তুত করা হয়; দ্রুত লিখিতে গিয়া অনেক সময় এক আধটি ছত্র বাদ পড়িয়া যায়।

[৩]

রাত্রি অধিক হইলে পণ্ডিতেরা সেদিনের মত চলিয়া গেলেন; মাইকেল একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; সে ভাবনা আমরা কেমন করিয়া জানিব, বোধ করি, তাঁহার অন্তর্যামী মিণ্টনও জানে না।

ইতিমধ্যে মেঘনাদ বধের কতক প্রকাশিত হইয়াছে; দেশময় তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। অনুরক্তরা

বলিতেছে, কবি হিসাবে তিনি কালিদাস, ভার্জ্জিল, টাসো, মিল্টনের মত! সেই কথাই কি ভাবিতেছেন? কালিদাস, ভার্জ্জিল, টাসো বড় বটে, কিন্তু মিল্টন দেবতুল্য! মিল্টনের মত হওয়া অসম্ভব। তাঁহার মনে পড়িল জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘনাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন! দেবেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত, রসিক, পণ্ডিত, সমাজের অগ্রণী এবং ধনী; তাঁহার এক পুত্র, যিনি মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছেন, তিনিও না কি অমিত্রচ্ছন্দের পরম ভক্ত! লোকটা কবি এবং ধনী; অনুবাদক আবার কবি! ধনীর ছেলে এই যা; কাজেই কবি; আঃ আমার যদি—! ভবিতব্যতার কণ্ঠ হইতে অশ্রুত স্বরে ধ্বনিত হইল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পুত্র কবি হইবে বটে, কিন্তু এখনো সে অজাত, এখনো সে আসন্ন ভবিষ্যতের গর্ভে!

তাঁহার মনে পড়িল বিদ্যাসাগরের কথা! বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন—"তুমি খুব করিয়াছ, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইতে পারিয়াছ মনে হয় না।" কিছুতেই কৃষ্ণনগরের সেই লোকটার সঙ্গে আঁটিয়া ওঠা যায় না! এখনো সকলে তাহাকে মাইকেলের চেয়ে বড় মনে করে। লোকটা বাংলা সাহিত্যের কি ক্ষতিই না করিয়াছে! মেঘনাদকে তিনি বিলাসের শয্যা হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে জাগ্রত করিয়াছেন; কিন্তু তার চেয়ে অনেক কঠিন সেই লোকটার বিলাসের ললিত ছন্দ হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা কাব্যকে জাগাইয়া তোলা! বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ওই লোকটা!

কিন্তু তখনি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল চীনা বাজারের সেই সমালোচকের কথা। একটু হাসিও পাইল, আবার সান্ত্বনাও পাইলেন! লোকটা দোকানদার, নবপ্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিতেছিল; মাইকেল ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন; জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকটা, সেই চীনাবাজারের দোকানদার বলিল, বাংলাদেশে এই ছন্দই সব চেয়ে বেশী চলিবে। বাংলা সাহিত্যের অদৃষ্টে কি শেষে দোকানদারের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে! মনে পড়িল, কিছুদিন আগে রাজনারায়ণ বসুর প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমি পণ্ডিতদের জন্য কাব্য রচনা করিতেছি না; যারা ইউরোপীয় সাহিত্য ও আদর্শের সহিত কতক পরিচিত, তাদেরই জন্য আমার কাব্য-সৃষ্টি।"

পুলিশ কোর্টের দ্বিভাষী সাহিত্যেরও দ্বিভাষী; যারা দুই ভাষা না জানে, তারা ইহার রস পাইবে না। এই দ্বিভাষিত্ব তাঁহার কবিপ্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে; ইংরাজী ভাষায় তিনি দেশীয় কাহিনী লিখিয়াছেন; বাংলা ভাষার কাব্যের উপাদান প্রায় সমস্তই বিদেশী! মাইকেল সরস্বতীর দরবারের স্বভাবসিদ্ধ দ্বিভাষী।

কে বলিবে এইরূপ কত কথা তাঁহার মনে হইতেছিল? হয় তো ভাবিতেছিলেন—কাব্য, নাটক, রোমান্স, সমালোচনা সব দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যকে নাড়া দিতে হইবে, যশ তাঁহার চাই—সর্বতোমুখী যশ; গ্রীক কবিদের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের ধমনীতে চালাইয়া দিতে হইবে। রাজনারায়ণ বসুকে মেঘনাদবধের প্রুফ দেখাইবার পরে যে বলিয়াছিলেন—ইহাতে কি অমরত্ব লাভ করিব না? সেই কথা মনে পড়িল!

কিংবা কে বলিবে মাইকেল কবি-খ্যাতিকে সত্যই অমূল্য মনে করিতেন কি না? বিলাত-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত; আশৈশবের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল, তবু কত প্রভেদ! বিলাতে যাইবেন মহাকবি হইতে নয়, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য; সরস্বতীর মন্দির হইতে কখন অলক্ষিতে তাঁহার আসন লক্ষ্মীর মন্দিরে অপহৃত হইয়াছে! ব্যারিষ্টার না হইয়া আসিলে আর মান থাকে না! কবিকে লোকে ভালবাসে, কিন্তু ধনী না হইলে, পদস্থ না হইলে সম্মান পাওয়া যায় না! আজ যাহারা কবি হিসাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, অদূরভবিষ্যতে তাহারা বিস্মিত ভাবে সম্ভ্রমের সহিত সম্মান করিবে কবি মধুসূদনকে নয়, মাইকেল এম, এস, ডাট্, এস্কোয়ার অব দি ইনার টেম্প্‌ল, ব্যারিষ্টার এট্, ল-কে।

লোকবৃদ্ধি ও জন্ম-শাসন

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

লোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনায় আজ আমাদের নজর পড়েছে। ১৯৩১ সনে যে সেন্সাস্ নেওয়া হয় তাতে দেখা যায় যে, বিগত দশ বৎসরে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে; এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কয়েকজন মনীষী বলেছেন যে, অপ্রতিহত ভাবে লোকসংখ্যা যদি এই ভাবে বেড়ে যেতে দেওয়া হয়, তা হ'লে খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য দুঃখ দেবে; সুতরাং ব্যাপক ভাবে বার্থকন্ট্রোল বা জন্ম-শাসন আন্দোলন চালিয়ে জন্ম-হার রোধ করা আবশ্যক।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্ যে, লোকবৃদ্ধির যে আতঙ্ক এঁরা দেখিয়েছেন, তা সত্য। কিন্তু তা হ'লেও কি জন্ম-শাসনই তার ঔষধ? জন্ম-শাসন বল্‌তে কি বোঝায়? নর-নারীর যৌন-সম্পর্কের ফলে, অনেক সময়েই পিতা-মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তান জন্মে; জন্ম-শাসন প্রক্রিয়া অবলম্বনের ফলে নারী নিজের দেহের উপর সেই অধিকার লাভ করে, যার ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর তাকে জননী হ'তে হয় না। অতএব জন্ম-শাসনের মূল কথা হচ্ছে, ইচ্ছানুযায়ী সন্তান-সন্ততি প্রজনন; প্রজনন রোধ বা 'বার্থষ্ট্রাইক্' নয়। লোকবৃদ্ধির প্রতিকাররূপে জন্ম-শাসন প্রবর্ত্তন কর্‌তে চাইলে বুঝ্‌তে হবে, জন্ম-শাসন বল্‌তে আমরা জন্মরোধই বুঝ্‌ছি, ইচ্ছানুযায়ী প্রজনন বুঝ্‌ছি না। জন্ম-শাসনের এটা হ'ল বিকৃত অর্থ।

এই বিকৃত অর্থে জন্মশাসন ব্যবহার কর্‌লেও যে তার ফলে লোকবৃদ্ধি কম্‌বে, তা বলা যায় না। জন্মের চেয়ে মৃত্যুর পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবেই লোকসংখ্যা কম্‌তে পারে। ধরা গেল ব্যাপক ভাবে জন্মশাসন গ্রহণের ফলে জন্মহার কমেছে; কিন্তু তা বলে যে লোকবৃদ্ধির হারও কম্‌বে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না; কেন না, সেই সময়ের মধ্যে যদি মৃত্যুহারও কমে এবং জন্মহারের তুলনায় বেশী কমে, তা হ'লে জন্মহার কম হওয়া সত্ত্বেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সেন্সাসে বলে, ১৯০১-১০ দশকে ভারতে মৃত্যুহার ছিল হাজার করা ৪৩; আর ১৯২১-৩০দশকে দাঁড়ায় ২৫। সুতরাং সেন্সাস অনুযায়ী মৃত্যু-হার আমাদের দেশে কমে আস্‌ছে। সেন্সাস অনুযায়ী ১৯০১-১০ দশকে ভারতে জন্মহার ছিল ৩৮; ১৯২১-৩০ দশকে দাঁড়ায় ৩৫। সুতরাং এই হিসাবে দেখ্‌ছি যে ১৯০১ থেকে ১৯৩০এর মধ্যে জন্মহার কম্‌লেও ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে; কারণ, মৃত্যুহার তুলনায় অনেক বেশী কমেছে। অতএব শুধু জন্মশাসন দ্বারাই লোকবৃদ্ধি কম্‌বে না।

নারীর ডিম্বের (ওভাম্) সঙ্গে পুরুষের শুক্র-কীট (স্পার্ম্) মিলিত হ'লে তবেই সন্তান জন্মে; সুতরাং ডিম্বের সঙ্গে শুক্রকীটের মিলনে বাধা সাধন কর্‌তে পার্‌লে জন্ম-রোধ করা যায়। এই বাধা সৃষ্টির তিনটি উপায় আছে:—(১) পুরুষ-নারীর যৌন সম্পর্ক পরিহার (অ্যাবৃষ্টিনেন্‌স্) (২) বন্ধ্যাকরণ (ষ্টেরিলাইজেশন) (৩) কৃত্রিম উপায়ে বাধা সৃষ্টি—রাসায়নিক দ্রব্য, রবার-যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার। জন্মশাসন বল্‌তে এই তৃতীয় প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত যে-সকল জন্মশাসনের উপকরণ পাওয়া যায়, তা' যে-দামে বিক্রী হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে তা' কিনে ব্যবহার করা সাধ্যাতীত। বিলাতের কথা বল্‌তে গিয়ে জর্জ্জ রিলি স্কট্ বলেছেন যে, সেখানকার মজুরশ্রেণীর নারীরা বার্থকন্ট্রোল মেথড্ অবলম্বন কর্‌তে পারে না; কারণ, প্রথমেই হয় ত ১০ শিলিং (প্রায় ৭৲) খরচ করতে হয়, আর নয় ত সপ্তাহে ১ শিলিং থেকে ৩ শিলিং (৸০ হ'তে ২।০) পর্য্যন্ত খরচ করতে হয়। আমাদের দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে সেটা আরও কত দুঃসাধ্য! তা ছাড়া এদেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী, তাই বই পড়ে যে কিছু জ্ঞান লাভ করবে তার উপায় নেই। ডাক্তাররাই

এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং লোকে উপদেশই বা নেবে কার কাছ থেকে ?

অবশ্য এর প্রতিকারকল্পে বার্থকণ্ট্রোল আন্দোলনকারীরা বল্‌ছেন যে, স্থানে স্থানে ক্লিনিক্ (হাসপাতাল) খোলা হোক, তাহ'লেই জন্মশাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞের কাছে শিক্ষা পাবে। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে, তা মনে হয় না। বিলাতের সোসাইটী ফর্ দি প্রভিসান্ অফ্ বার্থকণ্ট্রোল ক্লিনিক্‌স্ ১৯৩১ সনের এক হিসাব দাখিল করেছেন ; তাতে দেখিয়েছেন কোন্ সহরের ক্লিনিকে ১ বৎসরে কত মেয়ে জন্ম-শাসন সংক্রান্ত উপদেশ নিতে এসেছিল—

ওয়াল্‌ওয়ার্থ—	১৪৭৭
গ্লাস্‌গো—	২৯৭
ম্যান্‌চেষ্টার—	৩৯৯
অক্সফোর্ড—	৩১
কেম্‌ব্রিজ—	১২২
নর্থ কেনসিংটন্	৬৫৩
উল্‌ভার হ্যাম্‌পটন—	১৭৬
ইষ্ট লণ্ডন—	৭১৭
অ্যাবার্ডিন	৯৩
বার্মিংহাম্	৬২৪
ব্রিষ্টল—	১০৬

কয়েক বৎসর ধরে আন্দোলন চলার পরেও বিলাতের মত প্রগতি-প্রবণ দেশেই মেয়েরা গাদায় গাদায় এসে জন্মশাসনের পুঁথি পড়ে যায় নি। সেরূপ ক্ষেত্রে এদেশে যে, সবাই জন্মশাসনকে বরণ করে নিয়ে জন্মরোধ করে বস্‌বে, তা বলা যায় কি ? অধিকন্তু বন্ধ্যাত্বকে আমরা এতই ঘৃণার চোখে দেখি যে, মেয়েরা যে অস্থায়ী বন্ধ্যাত্বও স্বেচ্ছায় বরণ করে নেবে তাও মনে হয় না। প্রসিদ্ধ যৌনতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ম্যাগ্‌নাস হার্শফিল্ড ভারতভ্রমণে এসে দেখেছিলেন যে মেয়েরা তাঁর কাছে বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার উপায় জান্‌তে চায়, জন্মশাসন কি ক'রে করা যায়, তা জান্‌তে চায় না। এ থেকেও বোঝা যায়, জন্মশাসনকে এ দেশের মেয়েরা কি চোখে দেখেন।

ডাঃ নর্ম্যান হেয়ার "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ্ সেক্সুয়াল সায়েন্স" গ্রন্থে বলেছেন যে, বাজারে প্রায় শতাধিক জন্মশাসনের উপায় প্রচলিত আছে ; এর মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ হানিকর, মাত্র কয়েকটা দোষদুষ্ট নয়। অধিকন্তু সকলের পক্ষে একই উপায় কার্য্যকরী হয় না ; তাই জন্মশাসন যদি কর্‌তেই হয়, জন্মশাসনের উপায় অবলম্বনের পূর্ব্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণের মনে যৌনসংক্রান্ত বিষয়ে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে ব'লে সাধারণে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়ার পরিবর্ত্তে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। তার ফলে বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতারিত হয়। রাস্তার মাঝে মাঝে জন্মশাসনের পেটেণ্ট মেডিসিনের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি যে রকম নির্লজ্জ ভাবে আমাদের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে, তাতে বুঝা যায় যে, জন্মশাসন কর্‌তে এ দেশের কেউ কেউ এখন ভয় কিংবা সঙ্কোচ বোধ করছেন না। কিন্তু কোন্‌টা নিরাপদ, দোষদুষ্ট নয়, তা জান্‌বার উপায় নেই, ক্লিনিক্ হয় ত' এ বিষয়ে কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে। কিন্তু ভাব্‌বার কথা এই যে—এই "নিরক্ষর" "অর্দ্ধশিক্ষিত" দেশে জন্মশাসন আন্দোলন চালালে বিজ্ঞাপনের জোরে সত্যিকারের নির্দ্দোষ (হার্ম্‌লেস্ কন্‌ট্রাসেপ্‌টীভ্‌স্) দ্রব্যের বদলে দোষাষ্ট (হার্ম্‌ফুল) পণ্য সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবারই সম্ভাবনা, কেন না এ বিষয়ে গোপন ভাব অবলম্বনই স্বাভাবিক, অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে কেউ যাবে না।

জন্মশাসনের আন্দোলনকারীদের একটা যুক্তি এই যে, আমাদের মধ্যে মৃত্যুহার অধিক বলে জন্মহারও অধিক ; কেন না তা না হ'লে সৃষ্টি থাকে না ; এবং মৃত্যুহার অধিক হবার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বাল্য-বিবাহ এবং তার ফলে মেয়েদের অল্প বয়সে মাতৃত্বলাভ।

১৯২১-৩০ সনের বাঙ্গালা দেশের সেন্সাসে যে হিসাব [illegible] খ্যার মধ্যে

বসন্ত রোগে	১৫·৭ পুরুষ	১৫·৪ নারী
আমাশয় ও পেটের পীড়ায়—	২৪·০ "	২৩·২ "
ফুসফুসের পীড়ায়—	৩৫·৫ "	২৪·০ "
ওলাওঠায়—	৫৯·৯ "	৫৯·৯ "
জ্বরে—	৭১২·৫ "	৭১৮·৫ "

মারা যায়। আর গ্রামের প্রতিসহস্র লোকের মধ্যে ১৫·৯ জন মরে জ্বরে। আবার জ্বর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

ম্যালেরিয়া—	৭·৬৮
এন্‌টেরিক্ ফিভার—	০·২৩
হাম—	০·০৬
রিল্যাপসিং ফিভার—	০·১১
কালাজ্বর—	০·২৩
অন্যান্য জ্বর—	৭·৫৯
মোট	১৫·৯

কোন্ রোগে কত লোক ভোগে তার কোন হিসাব পাইনি, তবু মৃত্যু-তালিকা দেখে এটুকু অনুমান করা যায় যে, জ্বরব্যাধি বাঙ্গালীর মধ্যে খুব বেশী প্রবল এবং তার মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান। ম্যালেরিয়ায় ভোগার ফলে শরীর যে কতখানি নিস্তেজ হয়ে যায়, তা' যাঁরা ভুগেছেন তাঁরা জানেন। জ্বরভোগের উপর যদি জননীত্ব চেপে বসে, তা হ'লে যমের সঙ্গে লড়াই বাধা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ কোন্‌টা—মাতৃত্ব না জ্বরের অত্যাচার? যদি ওষুধের বিধান দিতে হয় তা হ'লে জ্বরের প্রতিষেধক নির্দ্দেশ করাই কি বেশী যুক্তি-সঙ্গত নয়? তা না হলে গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া হয় না কি?

বাল-মাতৃত্ব যে কতটা ব্যাপক তাও ভেবে দেখা দরকার। মিষ্টার ব্যাল্‌ফুর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরের একটা হিসাব দেন; সেটা এই (টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া, ১লা অক্টো' ২৭। হার্শফিল্ডের 'উওম্যান্ ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' গ্রন্থে উদ্ধৃত)—

"প্রথম প্রসবের জন্য বোম্বাই হাঁসপাতালে ৩০৪টি হিন্দুনারী আসেন। তাঁদের বয়স ছিল গড়ে ১৮·৭ বৎসর; ৮৫·৬%এর বয়স ১৭ বা অধিক; ১৪·৪%এর বয়স ১৭র কম। সব চেয়ে যার বয়স কম ছিল তার বয়স ১৪; এরূপ মেয়ে ছিল মাত্র তিনটি। এই হিসাবের সঙ্গে আমি মাদ্রাজের মেটার্নিটি হস্পিট্যালের ১৯২২-২৪ খৃঃ-এর হিসাব মিলিয়ে দেখেছি। সেখানে এই সময়ের মধ্যে ২১৩২টি নারীর প্রথম সন্তান জন্মে; গড় বয়স ছিল ১৯·৪ বৎসর; ৮৬·২%এর বয়স ১৭ বা ততোধিক ছিল, আর ১৩·৮%এর বয়স ১৭র কম। সব চেয়ে কম যার বয়স তার বয়স ১৩ আর ১৪ বৎসরের মেয়ের সংখ্যা ছিল ২২টি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (উত্তরাঞ্চল শুদ্ধ) ২৯৬৪ জন প্রসূতির হিসাব নিয়ে দেখছি, এই হিসাবে মাত্র ১০ জন প্রসূতির বয়স ১৫র কম ছিল।" সুতরাং ব্যালফুরের এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত বলে যে বাল-মাতৃত্ব ব্যাপক, একথা সত্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাল-মাতৃত্ব হয় বটে, তা বলে সেটা সার্ব্বজনীন নয়।

এবার লোকবৃদ্ধির কথা আলোচনা করে দেখা যাক্। এই লোকবৃদ্ধি কতটা ভয়ের কারণ এবং তার জন্য জন্মরোধের আন্দোলন চালান প্রয়োজন কি না, তা বিচার করা যাক্। সেন্সাসের হিসাব অনুসারে ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ এই পঞ্চাশ বৎসরে লোকসংখ্যা বেড়েছে ৯৮,৯৪১, ৪৪৮।

১৮৮১ খৃঃ	২৫৩,৮৯৬,৩৩০
১৮৯১ "	২৮৭,৩১৪,৬৭১
১৯০১ "	২৯৪,৩৬১,০৫৬
১৯১১ "	৩১৫,১৫৬,৩৯৬
১৯২১ "	৩১৮,৯৪২,৪৮০
১৯৩১ "	৩৫২,৮৩৭,৭৭৮

কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, যে-ক্ষেত্রের লোকসংখ্যা গণনা করা হয়ে ছিল, ১৯৩১ খৃঃ-এ তার চেয়ে ৪২৬,০৫৫ বর্গমাইল বেশী স্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয়; সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরে প্রকৃত জনবল বৃদ্ধি ৯৮,৯৪১, ৪৪৮ নয়, তার চেয়ে কম (৯৮,৯৪১, ৪৪৮—১০,৩০১,০৩৫)। এই বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বা ভয়ঙ্কর কোন রকমেই বলা চলে না, ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় তা মোটেই বেশী নয়।—

(১৮৮০-১৯৩০) পঞ্চাশ	বছরে	যুক্তরাষ্ট্রে	লোক	বেড়েছে	১৮৩%
"	"	জাপানে	"	৭৪·১	"
"	"	গ্রেট-বৃটেনে	"	৫৪·১	"
"	"	ইটালীতে	"	৪৬·৮	"
"	"	সুইজারল্যাণ্ডে	"	৪৩·৫	"
"	"	জার্ম্মানীতে	"	৪২·২	"
"	"	ভারতবর্ষে	"	৩৯·০	"
"	"	বাংলায়	"	৩৭·৬	"

স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্স ছাড়া আর সব দেশেই পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী।

যে কয় বৎসরের সেন্সাস রিপোর্ট পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, প্রতি দশকে লোক-বৃদ্ধির হার সমান নয়।

১৮৮১ – ১৮৯১	বৃদ্ধিহার শতকরা	১১·২
১৮৯১—১৯০১		১·৮
১৯০১—১৯১১		
১৯১১—১৯২১		
১৯২১—১৯৩১		১০·৯

সুতরাং এই দশকে (১৯২১-৩১) ১০·৯% লোক বাড়তে দেখে মনে করা উচিত নয় যে, আগামী দশকে কি তার পরও ঐ ভাবে বাড়বে। প্রথম দশকে (১৮৮১-৯১) যে হারে লোক বেড়েছিল, সেই ভাবে যদি প্রতি দশকেই বেড়ে চল্‌ত, তা হলে আজ ৩৯·০% লোক না বেড়ে ৬৬% লোক বেড়েছে দেখতুম। অতএব আপাত-বৃদ্ধিতে ভয় পাবার কিছু নেই।

দুই দশকের লোকবৃদ্ধি বা হ্রাস লক্ষ্য করে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় বিপদ আছে, কেন না, দিন দিন সেন্সাস-গ্রহণের উপায়ের উন্নতি হচ্ছে; তার ফলে এই দশকে যেটা হ্রাস বা বৃদ্ধির উন্নতি বলে মনে হচ্ছে, তা হয় ত প্রকৃত পক্ষে ঠিক তার উল্টো। সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ও হায়দ্রাবাদের লোকের বাঁচার সম্ভাবনা বা এক্‌স্‌পেক্‌টেশন অফ লাইফ লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৩১-এর তুলনায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেই বেশী দিন বাঁচার সম্ভাবনা আশা করা যেত। অথচ ১৯৩১এ যে সেন্সাস নেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, ১৯২১এর তুলনায় মোট লোকসংখ্যা ১৫$\frac{১}{২}$% বেড়েছে; আর সমগ্র ভারতের বৃদ্ধির হার মাত্র ১০$\frac{১}{২}$%। সেন্সাস কমিশনারের মতে এরূপ হবার কারণ এই যে ১৯৩১এ সেন্সাস-গ্রহণের প্রণালী অনেক উন্নত হয়েছে। অতএব লোকবৃদ্ধির আতঙ্ক দেখানর পূর্ব্বে এ কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে।

মেয়েদের ১৫ হ'তে ৪৫ বৎসরই সন্তানপ্রসবের বয়স সাধারণতঃ ধরা হয়। ১৯৩১এর সেন্সাস হিসাবে ভারতের লোকসংখ্যা এই বয়সেই সমধিক।

শতকরা লোকসংখ্যা

	০– ১৫ বৎসর	১৫—৫০ বৎসর	৫০ এর বেশী
ভারতবর্ষ—	৩৯·৯	৫০·৫	৯·৬
বাঙ্গলা—	৪০·৮	৫১·১	৮·১
মুসলমান –	৪২·২	৪৯·৩	৮·৫
ক্রিষ্টান—	৪১·৭	৪৯·২	৯·১
ইহুদী—	৩৭·৭	৫৩·৬	৮·৭
হিন্দু—	৩৯·২	৫০·৯	৯·৯
শিখ—	৩৯·৫	৪৮·২	১২·৩
জৈন—	৩৬·৭	৫১·৭	১১·৬
পার্শি—	২৭·২	৫৬·৭	১৬·১

ত্রিশ বছর পরে লোকসংখ্যা কি দাঁড়াবে মনে হয়? ১৫-৫০ বৎসর বয়সের যাঁরা, তাঁরা পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে গিয়ে পড়বেন; অর্থাৎ এ যুগের অর্দ্ধেক লোক বুড়ো বলে আখ্যাত হবেন। লাইফ-টেবলে দেখা যায়, পঞ্চাশোর্দ্ধে মৃত্যুর হার হচ্ছে শতকরা ৪·২০ থেকে ৭০·৯৯ পর্য্যন্ত, বা গড়ে শতকরা ২০। এর ফলে সমগ্র জাতেরই মৃত্যুহার এখনকার তুলনায় বেড়ে যাবে। ১৯৩১এর সেন্সাসে জন্মহার হ'ল হাজারকরা ৩৫ ও মৃত্যুর হার হাজারকরা ২৪; কিন্তু ২৪ বেড়ে যদি ৪০ হয়, তা হলে এখনকার জন্মহারে লোকবৃদ্ধি না হয়ে বরং কমেই যাবে। ১৫-৫০ বয়সের লোকসংখ্যা ৫০·৫%; এই ৫০%ই বুড়ো কোঠায় উঠে মৃত্যুহার হবে ২০%। অতএব সাধারণ ভাবে (i. e. for the whole population) মৃত্যুহার হাজার করা ৪০ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। অন্য দিকে আবার জন্মহারটাকে মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে হিসাব না করে সন্তান উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন লোকের অনুপাতেই যদি দেখি, (অর্থাৎ ১৫-৪৫ বয়সের লোকের অনুপাতেই ধরি) তা হলে দেখব যে, ত্রিশ বছরে যে সংখ্যক মেয়ে জন্মেছে (মেয়ে বলছি এই জন্য যে সন্তানসংখ্যা তথা লোকসংখ্যা তাদেরই পরিমাণের উপর নির্ভর করবে) তা লোকসংখ্যাকে অব্যাহত রাখতেই হয় ত' সমর্থ নয়। অধিকন্তু বিবাহিত নারীর ৬% প্রায় বন্ধ্যা থেকে যায়। সুতরাং এই রকম নানাদিক থেকে আলোচনা করে না দেখার পূর্ব্বে লোকবৃদ্ধির ভয় দেখান যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। উপরে যে হিসাব দিয়েছি তাতে বোঝা যাচ্ছে, পার্শিদেরই

বেশী ভাববার কথা ; কি করে লোক বাড়ে, তার চিন্তাই বেশী করা দরকার।

আর এক ভাবেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রতি বিবাহিত নারীর গড়ে ৪টি করে জীবিত সন্তান জন্মে ; কিন্তু তার মধ্যে ৭০% বেঁচে থাকে। ব্রিটিশভারতে মোট নারীর সংখ্যা ১৯৩১এর হিসাবে ১৬৯,৫৫৪,০০০ ; আর প্রতি হাজার নারীর মধ্যে ৪৯৩ জন বিবাহিত, অতএব মোট বিবাহিত নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩৫, ৮৯১,২২। এখন প্রত্যেকের গড়ে ৪টি করে সন্তান হবে ধরলে, সন্তানসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৪,৩৫৬,৪৮৮এর মধ্যে আবার ৭০% সেন্সাস অনুসারে বেঁচে থাক্‌ছে। নারীর প্রজনন শক্তি ৩০ বৎসর ধরলে, এই হিসাব থেকে বোঝা যায়, ত্রিশ বৎসর পরে লোকসংখ্যা না বেড়ে বরং কমাই সম্ভব।

দেশের পুরুষ ও নারীর অনুপাতের উপরও লোকবৃদ্ধি নির্ভর করে। পুরুষের তুলনায় যদি নারীর সংখ্যা বেশী থাকে, তা হ'লে লোক বাড়ারই সম্ভাবনা, আর কম হ'লে সন্তান-জন্মের সংখ্যাও কমে যায়। দেখা যায় যে, আদিম বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় সমান ; কিন্তু হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা কম ; তার মধ্যে আবার শিখদের সব চেয়ে কম—

শিখ—	প্রতি হাজার পুরুষে	৭৮২	নারী
মুসলমান—	"	৯০৪	"
হিন্দু—	"	৯৫৩	"
জৈন—	"	৯৪১	"
(ট্রাইব্যাল) আদিম—	"	১০০৯	"
ভারতবর্ষ—	"	৯৪১	"

কিন্তু শুধু নারীর সংখ্যা দেখ্‌লেও ঠিক্ ধারণা হবে না। "রিপ্রোডাক্‌টিভ পিরিয়াড" বা সন্তান উৎপাদনশীল বয়সের অনুপাত দেখ্‌লে অনুমানটা আরও ঠিক হবে। ২০ থেকে ৫০ বয়সের পুরুষের তুলনায় ১৫ থেকে ৪৫ বৎসের নারীর সংখ্যা দেখলে দেখা যায় যে, উপরে নারীর যে অনুপাত পেয়েছি, তার চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী।

প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা

বয়স	১৫—২০	২০—২৫	২৫—৩০	৩০—৪০	৪০—৮০
ভারতবর্ষ—	৯৯১	১০২৩	৯৫২	৮৮৯	৮৬৬
হিন্দু—	৯৮৩	১০২৬	৯৭৩	৯১২	৮৮৬
মুসলমান—	১০১২	১০২৪	৯০৬	৮২৪	৭৯৮
ক্রিষ্টান—	১,০০৩	১০০১	৯৪৫	৯০৩	৮৭১
আদিম জাতি	১.১৩৯	১১৪৫	১০২৬	৯৫৭	৮৯১

দেখা যাচ্ছে যে, আদিমজাতি ছাড়া সব জাতের মধ্যেই মেয়ের সংখ্যা রিপ্রোডাক্‌টিভ পিরিয়াডে কম ; তবু লোকসংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু কেন তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। ২৫ বৎসর বয়সের পরও মেয়েদের সংখ্যা কমে যাওয়া দেখে মনে হয় যে, শুধু প্রথম সন্তান জন্মের সময়ই এদেশের মেয়েদের পক্ষে কালস্বরূপ নয় ; ২।৩ সন্তানের জননীও বহু পরিমাণে সন্তানপ্রসবের ধাক্কা সামলাতে পারেন না। প্রজননশক্তিসম্পন্ন নারীর সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে ৫৪, ৪৭৩, ৪৪৮ আর পুরুষের সংখ্যা ৫১, ৪৫০, ২৬৬ ; অর্থাৎ ১০০০ পুরুষের তুলনায় ১০৫৯ নারী আছে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নেই বলে যদি বিধবাদের বাদ দেওয়া যায় (৮,৩১৩,৭৭৩) তা হলে অনুপাতটা দাঁড়ায় ৮৯৭ নারী : ১০০০ পুরুষ। জৈনদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নেই বলে নারীর সংখ্যা তুলনায় কম। শিখদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কম হ'লেও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। মুসলমানদের মধ্যে ও ক্রিষ্টানদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। দেখা যায় যে, যে-জাতের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা যত বেশী, তার বৃদ্ধির হারও তত বেশী ; তাই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা বেশী বেড়েছে। এবারকার সেন্সাসে ক্রিষ্টান ও শিখরা খুব বেড়েছে দেখা যায় ; এই দুই জাতির মেয়েদের অনুপাত পুরুষের তুলনায় গত দুই দশকে খুব উচ্চে ছিল (rising female ratio) ; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ১৯১১-১৯২১ নারীর অনুপাত বেড়েছিল, তাই এবারকার সেন্সাসে তাদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে লক্ষ্য করা যায়। ১৯১১-র পর আর কোন জাতের মধ্যে নারীর অনুপাত বাড়তে তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে নারীর অনুপাতটা দিন দিন বেশ কমে যাচ্ছে ; সুতরাং অদূরভবিষ্যতে তাদের অতি-বৃদ্ধি কমবে না কে বলতে পারে ?

জাতি	শতকরা বৃদ্ধি ১৯২১—১৯৩১	প্রতি ২০—২৫ বৎসর বয়সের ১০০০ পুরুষে ১৫—৪৫ বৎসর বয়সের নারী
ক্রিশ্চান—	৩২	১০৮০
মুসলমান—	১৩	১০২৬
হিন্দু—	১০	৮৯৭ (বিধবা বাদ)
জৈন—	৬	৮১০ "

মেয়েদের বিয়ের বয়স যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে সন্তান-জন্মের সংখ্যাও কমে আস্‌বে, এই হ'ল সাধারণ বিশ্বাস। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় এ-কথার উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু ৫৬৮, ৬২৮ পরিবারের ইতিহাস নিয়ে যা দেখা গেছে, তাতে ঠিক এর উল্টোই ধারণা হয়। কম বয়সে ছেলে হ'লে সে ছেলের বাঁচার সম্ভাবনা কমে যায়; পক্ষান্তরে একটু বয়সে বিয়ে হ'লে যে-কটা ছেলে-মেয়ে জন্মায় তাদের অধিকাংশই বাঁচে। ত্রিশের বেশী বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে, তাদের পাঁচটা সন্তান গড়ে জন্মেছে।

বিবাহের সময় পত্নীর বয়স	গড়ে কয়টি জীবিত সন্তান জন্মেছে	গড়ে কয়টি সন্তান জীবিত আছে
০—১২	৩·৮	২·৮
১৩—১৪	৪·২	২·৯
১৫—১৯	৪·১	২·৯
২০—২৯	৪·৩	৩·১
৩০ ও বেশী	৫·১	৩·৬

সুতরাং এই হিসাব থেকে এই মনে হয় যে, মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ালে সন্তানসংখ্যা কম্‌বে না, পক্ষান্তরে জীবিত সন্তানের সংখ্যাই (those that survive) বেড়ে যাবে।

ভারতবর্ষ থেকে কত লোক বিদেশে গেছে তার একটা হিসাব নীচে দিলুম—

কোথায় গেছে	সংখ্যা
মালয়—	৫১০,০০০
সিংহল—	৩৮৫,০০০
ফিজি—	১৫,০০০
পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা—	৪,০০০
যুক্তরাজ্য—	৪,০০০
অন্যান্য দেশ—	১২,০০০
মোট	১,০০০,০০০

ভারত থেকে যারা বিদেশে গেছে, তাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী—

১৯২১ সনের ভারতীয়ের সংখ্যা

ধর্ম্ম	ব্রিটীশ মালয়	সিংহল
হিন্দু	৫০৯,২০২	৭৪৩,৩২৬
শিখ	১৮,১০০	×
মুসলমান	৫৬,৫০১	২০,৭৭৮
ক্রিশ্চান	৩৬,৬১৪	১১,৪২৮
বৌদ্ধ	×	২,২৬০
অন্যান্য	৩,৫০৭	৩৭৮

আমাদের দেশের মধ্যেও এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে লোকে অন্নের চেষ্টায় যায়। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশ থেকে—আসাম অঞ্চলে যথেষ্ট কুলী আমদানী হত। এখন সেটা কিছু কমেছে; কিন্তু তার স্থান নিয়েছে ময়মনসিং জেলা। গোয়ালপাড়া ও নওগাঁর অনেকেই এই বাংলার মুসলমান। তা ছাড়া, এদেশের লোকের মধ্যে সহরমুখো হবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। মোট ৬,৫১০,১৫১ বা লোকবৃদ্ধি যা হয়েছে তার ১৯·২% গত দশ বৎসরে সহরেই বেড়েছে। বাংলা প্রদেশে লোক বেড়েছে ৭·৩%, কিন্তু তার মধ্যে সহরে (urban) বেড়েছে ১৫·৮% ও গ্রামে ৬·৭%, পাঞ্জাবে লোক বেড়েছে ১৪·০% আর তার মধ্যে সহরে ৩৮·৭% ও গ্রামে ১১·০%। সব প্রদেশ সম্বন্ধেই এ ধরণের হিসাব দেওয়া যায়। আবার সহরগুলোয় দেখা যায়, বিবাহিত নারীর সংখ্যার চেয়ে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যাই বেশী; তাতে বোঝা যায়, সহরে অনেক বিবাহিত পুরুষ পত্নীর কাছ থেকে দূরে থাকেন। লোকবৃদ্ধির হিসাব করবার সময় আমাদের এসব কথাও খেয়াল রাখতে হবে। যে সব লোক কর্ম্মের সন্ধানে দেশান্তরে গমন করেন, কি সহরে যান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ৫০ এর ভেতর হয়ে থাকে; কেন না, যতদিন শরীরে শক্তি থাকে ততদিনই কর্ম্মের সন্ধানে অজানা দেশে পাড়ি দেওয়া যায়, অথচ এই বয়সটাই সন্তান-প্রজননের উৎকৃষ্ট বয়স। সুতরাং যে দেশ বা জাতি বাহির পানে বেশী ছোটে, তাদের মধ্যে সন্তান-জন্মের সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক। এই হিসাবে হিন্দুর লোকসমস্যা মুসলমানের লোকসমস্যার সঙ্গে এক নয়, বা পাঞ্জাবীর লোকসমস্যা ও বাঙ্গালীর লোকসমস্যা

এক নয়। সুতরাং সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা বাড়ছে দেখলেও ব্যাপক ভাবে জন্মশাসনের ব্যবস্থা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

যাঁরা লোক-বিজ্ঞানচর্চ্চায় যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কুচিন্স্কি অন্যতম। তিনি যে সূচি বা ইন্‌ডেক্‌স্ বার করেছেন, তা লোকবৃদ্ধির আলোচনায় নতুন আলোকপাত করেছে। লোকবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার জন্য কুচিন্স্কি দুটি প্রণালী বা মেথড্ ব্যবহার করেন। প্রথম প্রণালীতে তিনি শুধু প্রজনন-শক্তি বা ফার্টিলিটী পরিমাপ করেন; একে "গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্" বলে। কোন নির্দ্দিষ্ট-সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট-স্থানে সন্তান-জন্মের যে হার, সেই হার হিসাবে কোন নারীর সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতার বয়সের মধ্যে যে কয়েকটি মেয়ে সন্তান জন্মান সম্ভব, তাই হ'ল "গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্" (the number of girl children likely to be born to a woman passing through the whole child-bearing period on the basis of the fertility rates prevailing in a given place in a given time)। যে কয় বৎসর সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা থাকে—সেই কয় বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক নারীর গড়ে যে কয়জন সন্তান জন্মে, তা যোগ করলে এটা পাওয়া যায়। গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্ যদি একের (unity) কম হয়, তা হ'লে লোকসংখ্যা কম্‌বেই। কুচিন্স্কি হিসাব করে দেখেছেন যে ১৯২৭ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্ দাঁড়িয়েছে ০.৯৮। এখন যদি কোন নারীই ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মারা না যান, তা হ'লেও ইংল্যাণ্ড-ওয়েলেসের লোকসংখ্যা ক্ষয় পাবে, যদি-না ইতিমধ্যে 'গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্' এক বা তার বেশী না হয়। 'গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেটে একজন নারীর গড়ে কত সন্তান জন্মাবে তার হিসাব পাই। এইসব সন্তানদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে জননী হবে তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাই না। কোন নির্দ্দিষ্ট-সময়ে সন্তান-জন্মহার ও মৃত্যুহার যা থাকে, তার উপর ভিত্তি করে, প্রত্যেক সদ্যঃপ্রসূত মেয়ের ভবিষ্যতে গড়ে যে-কয়জন মেয়ে সন্তান জন্মাবে তা লক্ষ্য করে—লোকবৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই যে গড় হিসাব, একে বলে নেট্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্। এও অতি সহজ উপায়ে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। শুধু তার জন্য প্রয়োজন—বাৎসরিক সন্তান-জন্মহারের সঙ্গে লাইফ টেব্‌লে নারী জীবিত থাকার যে হিসাব থাকে, তার সমন্বয় স্থাপন (We have to weigh the annual fertility rates by the proportion of female survivors in the life table)। নেট্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্ "এক" (unity) হওয়ার অর্থ এই যে, একজন জননীর বদলে অপর একজন জননী জন্মাবে—এর বেশীও নয়, কমও নয়। যে দেশ বা জাতির 'নেট্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্' এক, সে দেশ বা জাতি বাড়বেও না বা কমবেও না, অবশ্য যদি সন্তানজন্ম হার ও মৃত্যুহার নড়-চড় না হয়। একের বেশী যদি নেট রিপ্রোডাক্‌শন রেট হয়, তবেই বুঝতে হবে যে, লোকবৃদ্ধি হবে। এইভাবে ভারতবর্ষেরও নেট রিপ্রোডাকশন রেট নির্দ্ধারণ করে না দেখে লোকবৃদ্ধির আতঙ্ক সৃষ্টি করা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কাজ।

এবার দেখা যাক "অপটিমাম্ পপুলেশনে"র মাত্রা (বাংলা পরিভাষার অভাবে ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করছি) ছাড়িয়ে গেছে কি না। অর্থাৎ লোকের চাপ এত বেশী হয়েছে কি না—যার বেশী আর ভারতবর্ষ বহন করতে পারে না। "অপটিমাম"-এর কথা আলোচনা করতে হলে "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং" বা জীবনযাত্রার ধারার কথা ভাবতে হয়। প্রত্যেক বর্গমাইলে কত নরনারী বাস করে দেখলে "অপটিমাম" পাওয়া যায়। শুধু প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা বাড়ছে কি কমছে দেখে বলা যায় না যে, অতিবৃদ্ধি বা অতিক্ষয় হচ্ছে, তার সঙ্গে দেখতে হবে মাথাপিছু আয় কমছে, না বাড়ছে, তথা জীবনযাত্রার ধারা নিকৃষ্টতর হচ্ছে, না উৎকৃষ্টতর হচ্ছে। নীচে যে হিসাব দিলুম, তাতে বোঝা যাবে যে, ইউরোপের অনেক দেশের তুলনাতেই ভারতের লোকের বসতি ঘন (ডেন্‌সিটি) নয়—

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত লোক বাস করে (১ কিলোঃ ৫/৮ মাইল,

বেলজিয়াম	২৬৬
হল্যাণ্ড	২৩২

গ্রেটবৃটেন	১৯৭
জাপান	১৬৯
জার্ম্মানী	১৩৪
ইটালী	১৩৩
চেকোস্লোভাকিয়া	১০০
অষ্ট্রিয়া	৮০
ভারতবর্ষ	৭৬
ফ্রান্স	৭৬
রুমানিয়া	৬১
বুলগেরিয়া	৫৯

প্রতি বর্গমাইলে লোকের বাস বাড়লেই যে দেশের মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দেবে এবং লোকের আয় কমে গিয়ে জীবনযাত্রার ধারা নিকৃষ্টতর হবে, এ রকম কোন কথাই নেই; কেন না ভারতবর্ষের তুলনায় ইউরোপের প্রায় সব দেশেই বসতি ঘন, তা বলে তাদের মাথাপিছু আয় কম নয়। ১৯২২এর মার্কিণি জরিপে পাওয়া যায়—

দেশ	মাথা-পিছু আয় (ডলারে
যুক্তরাষ্ট্র	২৮২
গ্রেটবৃটেন	২১৩
ফ্রান্স	১৭৯
জার্ম্মানী	১১৪
ইটালী	৮৫
রাশিয়া	৪২
জাপান	৩৫
ভারতবর্ষ	১৪

সেন্সাসে বলে ভারতে লোকের চাপ নীচের হিসাব অনুযায়ী বেড়েছে—

	সন		
	১৯৩১	১৯২১	১৯১১
ভারতবর্ষ	১৯৫	১৭৬	১৭৪
আসাম	১৫৭	১৩৬	১২০
বাংলা	৬৪৬	৬০২	৫৮৭
বিহার-উড়িষ্যা	৪৫৪	৪০৯	৪১৫
বোম্বে প্রেসিঃ	১৭৭	১৫৬	১৫৯
মধ্য প্রদেশ	১৫৫	১৩৯	১৩৯
দিল্লী	১১১০	৮৫২	৭২২
মাদ্রাজ	৩২৮	২৯৭	২৯১
পাঞ্জাব	২৩৮	২০৯	১৯৭
যুক্ত-প্রদেশ	৪৫৬	৪২৭	৪৪০

দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক দশকেই লোক বেড়েছে, কিন্তু বিদেশের দিকে চাইলে বোঝা যায়, এখনও তা ভয়াবহ রূপ ধরে নি।

ইউরোপে হিসাব করে স্থির করা হয়েছে যে, প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ পর্য্যন্ত লোক চাষের উপর নির্ভর করতে পারে; আমেরিকার সিদ্ধান্তও অনুরূপ; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পোর্ট-রিকো দ্বীপে প্রতি বর্গমাইলে ৪০০ লোক চাষের উপর নির্ভর করে থাকে। আমরা দেখেছি যে, ভারতে প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ১৯৫, অতএব ভাবনার কারণ এখনও উপস্থিত হয় নি। অধিকন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জমির চেয়ে ভারতের জমি উর্ব্বর; আর লোকের অভাবও কম। ভারতের লোকসংখ্যা নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয়, তা হলে কৃষিজীবীর সংখ্যার উপরই নজর দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রদেশে লোকসংখ্যা তথা কৃষিজীবীর সংখ্যা বিভিন্ন বলে, বিভিন্ন প্রদেশের লোকসমস্যাও বিভিন্ন। দিল্লী, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশেই লোকের চাপ বেশী। দিল্লী প্রদেশে ৫০ বৎসরে (১৮৮১-১৯৩১) ৮১% লোক বেড়েছে; দিল্লী সহরে প্রতি বর্গমাইলে ৫৮২৭৩ লোকের বাস ও গ্রাম অঞ্চলে ৩৭২। অতএব সহর বাদ দিলে দিল্লী প্রদেশে লোক খুব বেড়েছে বলা যায় না। আর দিল্লী সহর ভারতের রাজধানী নতুন করে হওয়ায় বাইরের থেকে বহুলোক সেখানে এসে বাস করছে; তার জন্য আপাততঃ বাড়ীর অভাব কিছু অনুভূত হলেও মোগল বাদশাদের আমলে যে পরিমাণ লোক দিল্লী সহরে বাস করত তার চেয়ে বেশী নয় বোধ হয়। তারপরই হল বাংলা দেশ—বাংলা দেশেই সবচেয়ে ঘন বসতি। নীচে একটা হিসাব দিচ্ছি—

দেশ'	বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	শতকরা বাড়তি ১৯২১—৩১
বাংলা	৬৪৬	+৭৩
কুচবিহার	৪৪৮	—০.৩
ত্রিপুরা	৯৩	—২৫.৬
হাওড়া জেলা	২১০৫	
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	৪৩	+২২.৯
ঢাকা বিভাগ	৯৩৫	
মুন্সিগঞ্জ সাবডিভিসন	২৪১৩	
লোহাগঞ্জ থানা	৩,২২৮	

ভারতের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বাংলায় লোকের চাপ বেশী হলেও, সমগ্র বাংলা দেশে তা এক নয়, বা সব অঞ্চলেই সমান হারে লোক বাড়ে নি। বরং দেখছি কুচবিহার রাজ্যে লোক কমেইছে। কুচবিহারে যা লোক কমেছে, তার ষোল আনাই হিন্দু; হিন্দু কমেছে ৪·৭৬%; তার স্থান অধিকার করেছে মুসলমান চাষী। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫·৬% লোক বেড়েছে। চট্টগ্রাম পাহাড়ের দিকে ২২·৯% লোক বাড়লেও ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে খুব কম লোকের বাস। আবার হাওড়া জেলা ও মুন্সী-গঞ্জ সাবডিভিসনে লোকের চাপ খুব বেশী। বাংলার কয়েকটা জেলায় লোক কি রকম বেড়েছে-কমেছে দেখুন—

জেলা	(density) চাপ শতকরা ১৮৯১-২১	 ১৯২১-৩১
বর্দ্ধমান	+ ২·৯	+ ৯·৫
হুগলী	+ ৪·৪	+ ৩·১
মুর্শিদাবাদ	+ ১·৮	+১০·২
নদীয়া	— ৮·৯	— ·৮
যশোহর	— ৮·৩	— ২·৯
বাখরগঞ্জ	+২০·৬	+১২·৯
ফরিদপুর	+ ১৯·৬	+ ৬·৪
ঢাকা	+৩০·৮	+ ৮·৭
মৈমনসিং	+৩৫·১	+ ৬·১
নোয়াখালি	+৪০·১	+১৫·৯
ত্রিপুরা	+৪৩·২	+১৩·৩

দেখা যাচ্ছে যে, সব জেলায়ও লোক বাড়েনি; নদীয়া ও যশোহরে বরং বেশ কমেছে। সুতরাং জেলা হিসাবেও বাংলা দেশের সমস্যা বিভিন্ন। আবার চাষের জমির দিকে তাকালেও এমনি বিভিন্নতা পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় চাষের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে; তাই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার কোন্ অঞ্চলে কত —মি চাষ হয়, তার একটা হিসাব—

	চাষযোগ্য জমির শতকরা কত ভাগ চাষ হয়	চাষযোগ্য জমি পতিত %	চলতি পতিত %
পূর্ব্ববঙ্গ	৯০	৭	৩
উত্তরবঙ্গ	৭১	১৪	৫
পশ্চিমবঙ্গ	৬১	২৬	১২
মধ্যবঙ্গ	৫৮	১৮	২৪

বাড়ান যায়। আরও বোঝা গেছে যে, খাদ্যশস্যে টান ধরার সমস্যার চেয়ে বাহুল্য হবার ভয়টাই বেশী। সুতরাং লোকবৃদ্ধির ফলে খাদ্যে টান ধরবে মনে করার কারণ দেখা যাচ্ছে না।

একটা দেশের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং' বা জীবন-যাত্রার ধারা ক্রমশঃ যদি নিকৃষ্টতর হতে থাকে, তা হলেও বুঝতে হবে লোক বাড়া অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠছে। দেখা যাক ভারতের জীবনধারা নিকৃষ্টতর হচ্ছে কি না। ভারত-বর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং বললে কি বোঝায় বলা শক্ত, কেন না, এখানে প্রদেশভেদে জীবনযাত্রার ধারা এতই বিভিন্ন যে, একটা সাধারণ মান স্থির করাই শক্ত। শোনা যায়, বাংলাদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং-ই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। সুতরাং বাংলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ই দেখা যাক। এ পর্য্যন্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড নির্দ্ধারণের কোন বৈজ্ঞানিক চেষ্টা হয়েছে বলে জানি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার আর্থিক জরীপ করার জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কতকগুলো প্রশ্নের খসড়া করেছিলেন, কিন্তু সেও এ পর্য্যন্ত খসড়াই রয়ে গেছে। তার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার পারিবারিক ব্যয়-তালিকা দেখে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড খাড়া করা হয়েছিল ; সেটা এই—

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
খাদ্য	৯৫·৪	৯৪·৫	৮৪·৫	৭৯·০	৭৭·৭	৭৪·০
বসন	৪·০	৩·০	১২·০	৯·০	৯·০	৪·৭
চিকিৎসা	×	১·০	১·০	৫·০	৫·৯	৮·০
শিক্ষা	×	×	×	×	১·০	৩·৩
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	·৬	২·০	২·৫	৪·০	৫·০	৮·০
বিলাস সামগ্রী	×	×	১·০	১·০	১·৪	২·০
মোট—	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

দেখা যাচ্ছে সবশ্রেণীর মধ্যেই খাওয়া-পরার খরচটাই বেশী ; বিলাসিতার ব্যয় নেই বললেই হয় ; মধ্যবিত্তের মধ্যেই বিলাস-ব্যয় সব চেয়ে বেশী। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই পূর্ব্বেই দেখেছি। ভারত দিন দিন বস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। তার ফলে বস্ত্রের দরুণ যে মোটা টাকাটা বিদেশে চলে যাচ্ছিল, তার বেশীর ভাগ দেশের লোকেরই হাতে থাকছে এবং প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণে কাপড়ের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে, তাতে বোঝা যায় যে, এ বিষয়েও কোন দুর্লক্ষণ আপাততঃ নাই।—

১৯২৫—২৯=১০০

ভারতীয় কলে

	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সূতাকাটা	৯১	১০৭	১০৭	৮৬	১১০	১১৫	১২৮	১৩৪	১২২
বয়নশিল্প	৯০	১০৪	১১০	৮৬	১০৯	১১৪	১৩০	১৩৫	১২৫

ভারত কৃষি-প্রধান দেশ, তাই কৃষিজ পণ্যের দর পড়লে সবাইকেই ভুগতে হয়। ১৯২৫-২৬এর পর যে দুর্যোগ দেখা দেয়, তাতে ভারতকেও কাবু করে ; কিন্তু সে দুর্যোগ কেটে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, অন্ততঃ তার তীব্রতা নেই। এই দুর্য্যোগের সময়টাকে সাধারণ অবস্থা বলে ধরে নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে, আর্থিক বিবর্ত্তনের এ একটা ক্ষণস্থায়ী রূপ। কিন্তু এই দুর্যোগ সত্বেও বাংলার লোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং খাটো হয় নি, এই মতই বাংলার সেন্সাস্ কমিশনার জোরসে দিয়েছেন। ভারতের (বিশেষতঃ বিলাস-দ্রব্যের) তালিকা দেখ্‌লে ও অঙ্গরাগ-শিল্পের উন্নতি দেখ্‌লে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দূরতম পাড়াগাঁয়েও লোককে টর্চ হাতে, ছাতা মাথায়, জুতা পরে, কামিজ গায়ে বায়স্কোপে যেতে দেখা যায়। রেডিও, বাস, বৈদ্যুতিক আলো, পাকা-বাড়ী আমাদের প্রাচীন গ্রাম্যজীবনকে বদলে দিতে চলেছে। এই সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতার নামান্তর কি না এবং তাতে গ্রামের সরলতার বদলে কুটিলতা দেখা দেবে কি না, সুতরাং তা' কাম্য কি না, এ প্রশ্ন আমার নয়, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বল্‌তে যা বোঝায় তারই একটা আভাস দিচ্ছি। গ্রাম-সংগঠনের সরকারের যে প্রোগাম, তাও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং উন্নত করবার জন্য। সকল লোকের দারিদ্র্য একবারে ঘুচে যাবে, এ কখনও হয় না, অন্ততঃ বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে তা অসম্ভব। পূর্ব্বে যে, লোকে এর চেয়ে স্বচ্ছন্দে থাকত, এমন কথা তোলা এখানে অবান্তর ; আমার বলার কথা এই যে, এখনকার জীবনধারা যতই খারাপ হোক্, তা পূর্ব্বের চেয়ে কিছু বিভিন্ন এবং লোক বেড়েছে বলেই যে দারিদ্র্য বেড়েছে তাও নয়।

দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং শুধু জন্মহার কমিয়ে

বাড়ান যায় না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বাড়াতে হলে চাই মাথাপিছু আয় বাড়ান। দেশ যত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, মাথাপিছু আয়ও তত বাড়বে। আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগে ভারতীয়ের মাথাপিছু আয় তথা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বাড়ছে কি না বা বাড়বার সম্ভাবনা আছে কি না জানতে হলে দেখতে হবে, ভারত যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করছে কি না। ১৯১৩-১৪ সালে ভারতীয় কলে ১,১৬৪,৩০০,০০০ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়েছিল; ১৯৩৩-৩৪এ সেটা দাঁড়ায় ২,৯৪৫,০০০,০০০ গজ; অর্থাৎ বিশ বৎসরে কাপড়ের কলের উৎপাদন ১৫৩% বেড়ে গেছে। ১৯২৮ এর তুলনায় ১৯৩৩এ ষ্টিলের উৎপাদন ৭৫% বেড়ে গেছে। আজ ভারতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি, বৈদ্যুতিক নানাবিধ যন্ত্র, রবার টায়ার, ষ্টোভ, অ্যাস্‌বেস্‌টাস্, সিমেণ্ট, রং প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। ভারত এত দিন শুধু কাঁচা মালই রপ্তানী করে এসেছে; এ যুগে কারখানাজাত পণ্যও প্রতিযোগিতায় বিদেশে বেচতে সক্ষম হয়েছে। ১৯১৩-১৪ সালে মোট রপ্তানীর ২৩% ছিল কারখানাজাত মাল; ১৯২৮-২৯এ তা দাঁড়ায় ২৭%। সুতরাং ভারত যে ক্রমশঃ যন্ত্র-নিষ্ঠ হয়ে উঠছে তাতে ভুল নেই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত গড়ে ৫৬,১১৪,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বিদেশ থেকে আমদানী করেছে; ১৯২৮-২৯এ তা দাঁড়ায় ১৮৩,৬০৪,০০০ টাকার। এ থেকে বোঝা যায়, ভারতে নতুন নতুন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯২৬-২৭এ ভারতের কোন্ অঞ্চলে কত কোম্পানী ছিল তার হিসাব—

বোম্বে	৮১২টি	কোম্পানী
বার্ম্মা	২৮৩	"
যুক্তপ্রদেশ	২১৫	"
বাংলা	২৬৫২	"
মধ্যপ্রদেশ	৬৯	"
মাদ্রাজ	৬৬২	"
পাঞ্জাব	১৭৩	"
বিহার উড়িষ্যা	৮২	"
আসাম	১১৬	"

ভারতের এই যন্ত্রনিষ্ঠা দেখে মনে হয়, লোকবৃদ্ধির ভয় করবার এখনো কোন সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নি; কেন না, উৎপাদিকা শক্তি বাড়লেই অভাব পূরণের উপায়ও বাড়ে। সার্ ডিও চিওজা মানি বলেছেন—"Whatever increases productivity increases the means of life and provides for a larger population."

এই আলোচনা থেকে আমরা এই বুঝতে পারছি যে—

(১) বার্থকণ্ট্রোল লোকবৃদ্ধি রোধ করবার সম্যক্ উপায় নয়। ধনীই হোক্ আর নির্ধনই হোক্, কুকুরের ছানার মত যে মানুষের গাদা খানেক সন্তান হবে, এ বাঞ্ছনীয় নয়; তেম্‌নি আবার সন্তানের জনক-জননী আদৌ না হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। এই হিসাবে জন্ম-সংযমের কিছু মূল্য আছে, কিন্তু মাত্রা ছাড়ালেই জাতির ধ্বংস। "Birth control is extraordinarily good up to a point but beyond that point it means racial death." ভারতের মত নিরক্ষর জনসমাজে ব্যাপক ভাবে বার্থ-কণ্ট্রোলের আন্দোলন চালালে সুফলের চেয়ে কুফল ফলাই বেশী সম্ভব।

(২) ভারতে অত্যধিক লোক বাড়ছে এমন কথা মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই; এ ভয় অমূলক।

(৩) খাদ্যাভাব হবার যে আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, চেষ্টা করে খাদ্য-উৎপাদন দ্বারা সে আশঙ্কা দূর করা চলে।

(৪) ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ লাইফ নিকৃষ্টতর হবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে আধুনিক ধনোৎপাদনের উপায়গুলি যেরূপ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে, তাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড উৎকৃষ্টতর হবারই কথা। আধুনিক অর্থনীতিকের মতে ষ্টাণ্ডার্ড অফ লাইফ উঁচু হলে সন্তানের সংখ্যা আপনি কমে আসবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষা ও অর্থের জোরে সমাজে উচ্চ আসন দখল করে আছেন, তাঁদের মধ্যে নিরক্ষর অনুন্নত জাতির তুলনায় সন্তানসংখ্যা কম। সুতরাং যদি জন্ম সংহত করতে হয়, তা হ'লে ষ্টাণ্ডার্ড অফ্ লাইফ্ বাড়ান প্রয়োজন।

(৫) সমাজের যে-অংশের সন্তান হওয়া একান্ত অবাঞ্ছনীয়, যেমন উন্মাদের, তাদের মধ্যে জন্ম-সংযম করতে হলে বার্থ কণ্ট্রোল আন্দোলন চালিয়ে হবে না, তাদের জন্য চাই 'ষ্টেরিলাইজেশন', তা স্বেচ্ছামূলক হোক্ আর বাধ্যতামূলকই হোক্।

আশা করি সুধীবর্গ এই আলোচনার আলোকে এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবেন।

বিহারে একদিন

—শ্রীবাঙালী

আমার প্রবন্ধের নাম বিহারে একদিন এবং গত সংখ্যায় ভূমিকাতে উল্লেখ করিয়াছি, আমার ভ্রমণকাহিনী দুই তিন পৃষ্ঠাতেই শেষ হইবে। সুতরাং সুদীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া আমার একদিনের কাহিনী বিবৃত করায় পাঠক-পাঠিকা অধীর হইয়া উঠিতে পারেন। মনে করিতে পারেন এ কাহিনী পরবর্ত্তী সংখ্যাতেও শেষ হইবে না; কিন্তু আমি অভয় দিতেছি, এই সংখ্যাতেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে।

দুই তিনটি পল্লী এবং পথ-ঘাট দেখিয়া যখন ফিরিলাম, তখন বেলা একটা হইবে। স্নান শেষ করিয়া খাইতে বসিয়া বিহার সম্বন্ধে আমার বিস্ময় একেবারেই কাটিয়া গেল। প্রচুর ক্ষুধার মুখে সুস্থ শরীরে জ্ঞানতঃ কখনও রুটি খাই নাই, অথচ রুটিই খাইতে হইল। কালাজ্বর এবং যক্ষ্মা সম্বন্ধে যখন হাসপাতালের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলাম, তখন ডাক্তার আসল রোগটির কথাই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।



বিহারের কর্ষিত ভূমির উপর ঘাসের আশায় এক পাল গরু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উল্টান মাটির নীচে হইতে দুই-একটা ঘাস টানিয়া টানিয়া খাইতেছে। যতগুলি গো-চারণভূমি মুদ্রিত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে, হিন্দুর 'গো-মাতা' কি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

শহরের এবং শহরের বাহিরের এই দুইটি হাসপাতালের কোন-টিতেই জানিতে পারি নাই, সেস্থানের তৎকালীন মারাত্মক ব্যাধি বেরিবেরি। মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—বেরিবেরির প্রকোপ অত্যন্ত বেশী, সুতরাং কেহ যেন ভাত কিংবা সরিষার তৈল না খায়। ইহাতে বিহারবাসীর কোন অসুবিধা না হইলেও বিহারপ্রবাসী বাঙালীর বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। ঘির দাম চড়িয়া গিয়াছে এবং যথারীতি ঘি খাইয়াও বেরিবেরি হইতেছে। এই রোগের কারণ কি তাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার চিকিৎসা কি তাহাও অজ্ঞাত। বেরিবেরি লইয়া রীতিমত গবেষণা হইয়াছে কি, না জানি না, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের ভগবান ইউরোপ এখন মানুষের প্রাণরক্ষা অপেক্ষা কিসে মানুষ মারা সহজসাধ্য হয়, সেই গবেষণাই করিতেছে। জার্ম্মানী এবং রুষিয়ার মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সুমধুর বাক্য-বিনিময় চলিতেছিল, তাহাতে প্রকাশ ছিল যে, উভয়েই মানুষের প্রাণহরণ ব্যাপারে অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী হইয়াছে—অতএব সাবধান।

হয় ত' ইহারই গৌণ ফলে আমাকে রুটি খাইতে হইল—হয় ত' ইউরোপ যদি যুদ্ধের জন্য উন্মাদ না হইয়া উঠিত, তাহা হইলে বেরিবেরির প্রতিকার আবিষ্কার করিবার সময়



ঘাস-বিরল মাঠে এক পাল গরু চরিতেছে। পাঁচ-সাত-হাত অন্তর দুই-একটি শুষ্ক ঘাস মিলিতেছে, ইহারা তাহাতেই তৃপ্ত হইতেছে।

একদল বলেন, তেলে। এইরূপ নানা অনির্দ্দিষ্ট মতের মধ্যে পড়িয়া লোকে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

শোনা গেল, একটা গ্রামের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, পুরুষ গত এক মাস ধরিয়া দিবারাত্র তাড়ি খাইতেছে। এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ অন্ধের দেশের গল্প লিখিয়াছিলেন, এই গ্রামটি ঠিক সেই রকম একটি মাতালের দেশে পরিণত হইয়াছে। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গেল, ডাক্তারি মতে তাড়ি ভাইটামিনে পূর্ণ, সুতরাং তাড়ি বেরিবেরির প্রতিষেধক। উক্ত গ্রামে দুই এক-

তাহার মিলিত। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে ভাত খাইতে পারিতাম। কিন্তু এ কি বিসদৃশ ব্যাপার! রুটিও খাইতেছি বেরিবেরিও হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট কারণ অজ্ঞাত থাকায়, এই ব্যাধি সম্বন্ধে সংখ্যাতীত গুজব শোনা গেল। একদলের মতে বেরিবেরি ছোঁয়াচে রোগ। একদল বলেন, বেরিবেরি সংক্রামক, কিন্তু ছোঁয়াচে নহে। একদল বলেন, ভাইটামিনের অভাবে বেরিবেরি হয়—একদল বলেন, কোনকিছুর অভাবে নহে, কোন কিছুর অস্তিত্বে বেরিবেরি হয়। একদল বলেন, তাতে সেই কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিবার সম্ভাবনা,



পথের কিনারে কিছু ঘাস মিলিয়াছে, গরুগুলি তাহাই অতি তৃপ্তিসহকারে খাইতেছে



শুষ্ক ঘাস এখানে অপেক্ষাকৃত বেশী মিলিয়াছে। পিছনের বাছুরটি কিরূপ ভয়ঙ্কর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখের এই গরুটি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবতী।

এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত নহে বলিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান খুব বেশী নাই। যে কাজের জন্য যে টুকু নৈপুণ্য প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে ফাঁকি দিয়া কিছুই করা যায় না। বিহারের উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। বিহারে বহু গণ্যমান্ত বাঙালী রহিয়াছেন। তাঁহাদের স্থান শীর্ষপ্রদেশে। বাঙালী উকিল, বাঙালী ডাক্তার, বাঙালী এঞ্জিনীয়ার, বাঙালী অধ্যাপক, ইঁহারা আপন আপন কাজের উপযুক্ত বিদ্যা এবং নৈপুণ্যে অন্য সকলের উপরে বলিয়াই বিহারবাসী ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। জটিল মোকদ্দমায় তাহারা

জন লোকের বেরিবেরি হওয়ায় গ্রামশুদ্ধ লোক তাড়ি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

চাকরির দিক্ দিয়া বাঙালী এখানে বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছে। বিহারীদিগের বা ঙা লী বি দ্বে ষ সুস্পষ্ট। আমরাও কিন্তু বাংলাদেশে বসিয়া অন্য প্রদেশবাসীকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখি না। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসীর হাতে যাওয়াতে আমাদের ধারণা, এ জন্য দোষী তাহারাই। দোষ যে আমাদের নিজের মধ্যেই সে কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখি না। অধিকাংশ বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়ের পক্ষে যে শ্রম



বিহার পল্লীর একটি জীর্ণতম বাড়ী: এই একখানি ঘরেই একটি পরিবার বাস করে।

প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দোহাই দিয়া কখনও পসারহীন স্বজাতী উকিল ডাকে না; কঠিন ব্যাধির চিকিৎসাতেও তাহার বাঙালী ডাক্তারকে না ডাকিয়া পারে না। ইহাতে প্রমা হয় এই যে কৃতিত্বই সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। কৃতি যেখানে নাই, কোন সুবিধাও সেখানে নাই। কাজেই বাঙালী মধ্যে যে-শ্রেণী বিহারে চাকরি না পাইয়া বিহারীকে নিন্দ করিতেছে, তাহাদের নিন্দার খুব বেশী মূল্য নাই.

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙালীও নহে,



বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ী। এই বাড়ীতে তিনখানি ঘর আছে।

বিহারীও নহে বা অন্ত কোন নামীয়ও নহে। বর্ত্তমান শিক্ষা-রীতিতে তাহারা ক্রমশই দেশের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। দেশের সাধারণ লোক এবং শিক্ষিত লোক এই দুই লোকের মধ্যে দ্যুলোক এবং ভূলোকের পার্থক্য। শহরে যে সব শিক্ষিত বাঙালী বা বিহারী আছে, তাহারা কেহই সেই দেশের লোক নহে। সাধারণ লোকের আত্মীয় তাহারা নহে। কি করিয়া সাধারণ লোকের নিকট হইতে কিছু উপার্জ্জন করা যায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাই লক্ষ্য। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা শহরে কতকগুলি পরিচয়হীন বাঙালী এবং পরিচয়হীন বিহারীতে নিবদ্ধ। সাধারণ লোকের কাছে এই উভয় সম্প্রদায়ের মূল্যই এক। সাধারণ লোক ইহাদের যে ভাবেই ডাকুক, বা যে ভাবেই ইহাদের সম্পর্কে আসুক, তাহারা ইহা নিশ্চয় জানে যে, শহরবাসী উত্তমর্ণ এবং তাহারা অধমর্ণ।

শহরবাসীর সঙ্গে পল্লীবাসীর এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধ যদি কখনও ঘোচে, তবে সেই দিন বিহারে বাঙালী-বিদ্বেষ বা বাংলায় বিহারী-বিদ্বেষও ঘুচিয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বে ঘুচিবার কোন আশা নাই।

গ্রামের জীর্ণতার কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু উল্লেখ করিয়াছি, এ প্রবন্ধের সঙ্গেও কিছু উল্লেখ করিতে হইল। বিহারের গরুর কি মূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত ছবিতে দেখা যাইবে। দেখা যাইবে—বাংলাদেশ ও বিহারে এ বিষয়ে লেশমাত্র পার্থক্য নাই। তবে বাংলাভ্রমণ লিখিলে তাহা নেহাত হাস্যকর হইবার আশঙ্কা ছিল; কারণ, এদেশে এসব অতি-পরিচয়ের পর্য্যায়ে পড়ে, এবং সেই জন্যই ইহা দেখিবার বা জানিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই। আসলে বিহারের নাম করিয়া আমি বাংলাদেশের কথাই লিখিতেছি—কারণ, দুইই এক। বিহারভ্রমণ পড়িলে বাংলাদেশের কথাই মনে পড়িবে। এইরূপ বাংলাপল্লীর কথা বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পারিলে বিহারবাসীর নিকট হয় ত' তাহার কিছু মূল্য হইবে।

হাঁড়ির ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা জানিতে হইলে যেমন একটি ভাত টিপিয়া দেখিলেই যথেষ্ট, তেমনি একটা জাতির অবস্থা কিরূপ জানিতে হইলে, তাহার গৃহপালিত পশুর দিকে চাহিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। লক্ষ্মী-শ্রী যতদিন থাকে ততদিন গৃহস্থের প্রধান লক্ষ্য থাকে গৃহপালিত পশুর

প্রতি। বিহারে কঙ্কালসার গরুর দিকে চাহিবামাত্র বুঝিতে পারা গেল, এদেশে অলক্ষ্মীর রাজত্ব চলিতেছে। যতগুলি মাঠে যতগুলি গরু দেখিলাম, তাহার সবই খাদ্যের অভাবে ঘাস-বিরল মাঠ শুঁকিয়া বেড়াইতেছে। এই অনাহারক্লিষ্ট গরুর দুধ খাইয়া দেশের স্বাস্থ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাও আবার পল্লীর ভাগ্যে জোটে না। শহরের মিষ্টান্নের বিলাসিতা মিটাইয়া বাকী অংশ জলমিশ্রিত হইয়া কিংবা জীর্ণ মহিষের দুধমিশ্রিত হইয়া শহরেই বিক্রীত হয়। যতগুলি গো-চারণ-ভূমির ছবি এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, গরু কি খাইতেছে। চাষকরা মাঠের মধ্যে দুই এক টুকরা শুকনা ঘাস যদি কোথাও মেলে, তাহারই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশী ঘাস মিলিয়াছে, তাহাও শুষ্ক।

ইহা বিহারচিত্র—এবং বাংলাদেশের চিত্রও যে ইহা অপেক্ষা উন্নত নহে, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি।



নির্ব্বাচনান্তে

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ইন্দ্রাণী

[৬]

ইন্দ্রাণীর পিতার ঘোড়ার সখ ছিল। নূতন ঘোড়া পাইলেই তিনি কিনিতেন। নিজে তিনি ওস্তাদ সোয়ার ছিলেন, কিন্তু সে জন্যও নয়, ঘোড়া প্রাণীটাই যেন তাঁর প্রিয় ছিল। প্রত্যেকবার শীতকালে পশ্চিম হইতে ব্যবসায়ীরা নূতন ঘোড়া লইয়া রক্তদহে উপস্থিত হইত, কেহই প্রায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। প্রতি-বৎসর তাঁহাকে আস্তাবল একটু করিয়া বৃহত্তর করিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইন্দ্রাণী ঘোড়াগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে সম্মত হইল না। একবার হঠাৎ কিছু বেশী পরিমাণে নগদ টাকার প্রয়োজন হইল—দেওয়ানজী বলিলেন, ঘোড়াগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাক্, গ্রাহক উপস্থিত; ইন্দ্রাণী কোন উত্তর না দিয়া সিন্দুক হইতে নিজের কতকগুলি অলঙ্কার বাহির করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ঘোড়া ও অলঙ্কার সে যাত্রা উভয়ই বাঁচিয়া গেল। শুধু তা-ই নয়, ঘোড়া বিক্রয় করিতে যে সে রাজি হইল না, তাহা নয়, নূতন ঘোড়া পাইলেই কিনিত। কাজেই শীতকালে ব্যবসায়ীরা নূতন নূতন ঘোড়া আনিয়া হাজির করিত, ইন্দ্রাণী ক্রয় করিত।

ইন্দ্রাণী ঘোড়ায় চাপিত না, চাপিতে জানিত না, চাপিবার কথা বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিত না। তবে তাহার এ অকারণ সখ কেন! হয় তো পিতার আদরের প্রাণীগুলির প্রতি মমত্ববোধে; কিংবা, এই তেজস্বী প্রাণীদের অবাধ বিহারের মধ্যে সে নিজের ব্যাহত তেজস্বিতার চরিতার্থতা দেখিতে পাইত।

প্রতিবারের মত এবারেও কয়েকজন ব্যবসায়ী নূতন ঘোড়া লইয়া আসিয়াছিল, দর-দস্তুর মিটিতেছে, পাঁচ-সাতটি ঘোড়া লওয়া হইবে। মধু গায়েন নামে একটা লোক ইন্দ্রাণীর আস্তাবলের সহিসদের সর্দার; লোকটা ভাল সওয়ার. সে রকমটি না কি সে দেশে আর নাই। নূতন ঘোড়া কিনিবার পূর্ব্বে সে একবার ঘোড়া যাচাই করিয়া লইত। যে ঘোড়ায় সে চাপিতে পারিত না, তাহা কেনা হইত না; কারণ, আর কেহ তাহাতে চাপিতে পারিবে না। আজ বিকালে জমীদারবাড়ীর পশ্চিমের মাঠে ঘোড়া-যাত্রা করিয়া লওয়া হইবে; ইন্দ্রাণী ছাদের উপরে উঠিয়া দেখিবে, সঙ্গে চাঁপাও থাকিবে। এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য পরন্তপকে চাঁপা বলিয়াছিল।

দুপুর হইতে পশ্চিমের মাঠে লোক জমিতে আরম্ভ করিল; ছেলে, বুড়ো, যুবক; যুবকের ভাগই বেশী। ঘোড়া-চড়ায় যাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিত, ইন্দ্রাণী তাহাদের বকশিস দিত; কাজেই যুবকদের ভিড়ই কিছু বেশী। তিনটা বাজিবার আগেই মাঠের অর্দ্ধেক জনতায় ভরিয়া গেল। পাগড়ি-বাঁধা পশ্চিমা ব্যবসায়ীর দল তেজস্বী ঘোড়ার দল লইয়া উপস্থিত হইল; দেওয়ানজীকে পুরোভাগে করিয়া কর্ম্মচারীর দল আসিল; লাঠিধারী বরকন্দাজের দল জনতাকে শান্ত করিতে লাগিল; হঠাৎ জনতা একজনবৎ মাথা তুলিয়া দেখিল, ছাদের উপর ইন্দ্রাণী ও চাঁপা ঠাকুরাণী আবির্ভূত হইয়াছেন।

জনতার একান্তে পরন্তপ ও বেঙা-চৌকিদার আসিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ানজীর ইঙ্গিতে এক একটি করিয়া ঘোড়া আনীত হইতে লাগিল এবং মধু গায়েন অতি অনায়াসে তাহাতে চাপিয়া খানিকটা করিয়া পাক খাইয়া আসিল। এই ভাবে চারিটি ঘোড়া রক্ষিত হইল; কিন্তু পঞ্চম ঘোড়াটিকে লইয়া বিপদ বাধিল। ঘোড়াটির রং কালো, সতেজ, পেশল, গা দিয়া যেন তেল গড়াইতেছে, কপালের উপর নাতিদীর্ঘ একটা শ্বেতচিহ্ন। মধু গায়েন চাপিতে গিয়া আছাড় খাইল; তাহার জেদ চড়িয়া উঠিল, ঘোড়ারও যেন জেদ চাপিল; ঘোড়াও উঠিতে দিবে না, মধুও ছাড়িবে না। জনতা যদি মধুকে না জানিত, তবে হয় তো তাহার এই দুর্দশায় হাসি-তামাশা করিত, কিন্তু জনতার

কাছে মধু সুপরিচিত, বহুবার তাহারা মধুর অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়াছে, অনেক দুর্দ্দম ঘোড়াকে বশ করিতে দেখিয়াছে, কাজেই মধুর অসামর্থ্য দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া গেল, কেহই একটু শব্দ পর্য্যন্ত করিল না।

ইতিমধ্যে তিন চার বার আছাড় খাইয়া আবার যেমন চাপিতে যাইবে, ঘোড়াটা এমন ভাবে লাফাইয়া উঠিল, মধু সটান মাটিতে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল। তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। দেওয়ানজী ঘোড়ার মালিককে বলিয়া দিলেন, এ ঘোড়া লওয়া হইবে না। এমন সময়ে ইন্দ্রাণীর খাস দাসী আসিয়া দেওয়ানজীকে জানাইল, দিদিমণির একান্ত আগ্রহ এ ঘোড়া রাখিতেই হইবে। ইন্দ্রাণী ছাদের উপর হইতে সমস্তই দেখিয়াছে। মধুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারও জেদ বাড়িয়া উঠিয়াছে; মধু অজ্ঞান হইলেও তাহার জ্ঞান হয় নাই। দাসী ইন্দ্রাণীর নাম করিয়া বলিল, এ ঘোড়া লইতেই হইবে; মধু চাপিতে পারিল না বটে, জনতার মধ্যে যদি কেহ চাপিতে পারে, তবে ইন্দ্রাণী তাহাকে পুরস্কৃত কবিবেন। দেখিতে দেখিতে কথাটা জনতার মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, কিন্তু মধু গায়েনের মত ওস্তাদের দুর্দ্দশা চোখের উপরে দেখিয়া পুরস্কারের লোভেও কেহ অগ্রসর হইল না। কিছুক্ষণ সবই নিস্তব্ধ নিশ্চল। এমন সময় জনতার একধারে চঞ্চলতা দেখা গেল; একজন লোক যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে এতই লম্বা যে, জনতার মস্তক-সমুদ্রের উর্দ্ধে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে। লোকটা দেওয়ানজীর কাছে আসিয়া ঘোড়ায় চাপিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ বীরবপু দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইল, এই অসম্ভব কাজ ইহার দ্বারা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। দেওয়ানজী অনুমতি দিলেন।

তখন পরন্তপ ঘোড়াটির কাছে গেল। সে অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিল, ঘোড়াটিকে পূবমুখ করিয়া দাঁড় করানোতে নিজের ছায়া দেখিয়া বারংবার ভয় পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিতেছিল। পরন্তপ তাহাকে পশ্চিম মুখ করিয়া দাঁড় করাইল, ঘোড়া অনেকটা শান্ত হইল। জনতা নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল। পরন্তপ তাহার গ্রীবাতে কয়েকটা চাপড় মারিয়া একলাফে পিঠে উঠিয়া বসিল। ঘোড়াটা চমকিয়া উঠিয়া একবার পিছনের পায়ের উপর খাড়া হইয়া উঠিল; পরন্তপ টলিল না; ঘোড়াটা তারপরে সম্মুখের পায়ের উপর ভর দিয়া পিঠের সোয়ারকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল; পরন্তপ টলিল না। সে স্থির হইতেই এবার পরন্তপ তাহার পেটে পা দিয়া বিষম আঘাত করিল; আহত ঘোড়া একবার গগন-ভেদী হ্রেষা-ধ্বনি করিয়া, কাণ দুটি খাড়া করিয়া তুলিয়া চক্ষুর তারকা আবর্ত্তিত করিয়া, নাসিকা স্ফীত করিয়া, আগা-গোড়া কাঁপিয়া উঠিল; তার পরেই মসৃণকৃষ্ণ বর্ণের উপর রৌদ্রকে চমকিত করিয়া ঝড়ের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভীত জনতা তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ তাহারা নীরবে ছিল, কিন্তু এতক্ষণে এই অপরিচিত যুবকের কৃতিত্বে আনন্দিত হইয়া উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ঘোড়া ও সোয়ার ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে হইতে মাঠের অপর প্রান্তে বিন্দুমাত্রসার হইয়া গেল। ইন্দ্রাণীর খাস দাসী দেওয়ানজীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে এবং সে কি পুরস্কার প্রার্থনা করে! জনতা দেখিল—দূরস্থ সেই কৃষ্ণবিন্দু ক্রমে বৃহত্তর, স্পষ্টতর হইতেছে, ঘোড়া ও সোয়ার ফিরিতেছে। জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ঘোড়াটা হাঁপাইতেছে, মুখ দিয়া তাহার ফেনা ঝরিতেছে, সোয়ার সম্মুখের দিকে ঈষৎ একটু ঝুকিয়া স্থির ভাবে উপবিষ্ট। এমন সময়ে হঠাৎ এক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। একটা কর্ত্তিত গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খাইয়া প্রবল বেগের উপরে এক-দিকে ঘোড়া অপরদিকে সোয়ার ছিটকাইয়া পড়িল। জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দেওয়ানজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যখন যুবকের কাছে গেল, তখন সে অজ্ঞান হইয়া নিস্পন্দ ভাবে শায়িত। তাহাকে ধরাধরি করিয়া জমীদার-বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল; সঙ্গে তাহার ভৃত্যটিও চলিল।

[৭]

এই দুর্ঘটনার জন্য ইন্দ্রাণী নিজেকেই দায়ী করিল। সে এইভাবে পুরস্কার ঘোষণা না করিলে, ভদ্রলোকের এই বিপদ ঘটিত না। কাজেই তাহাকে যে শুধু বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া যতদূর সাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল, তাহা

নয়, দিনরাত্রি সে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া কাটাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দয়ার পরিবর্ত্তে সমবেদনার ভাব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল; কিন্তু এখানেই শেষ নয়; ধীরে ধীরে তাহার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অজ্ঞাতসারে হইতেছিল বলিয়াই রক্ষা, নতুবা ইন্দ্রাণী লজ্জায় মরিয়া যাইত।

চাঁপা পরন্তপের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হইল; তাহার প্রতি আদেশ ছিল, দিনের মধ্যে তিন চার বার আসিয়া তাহাকে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইবে। চাঁপা নিয়মিত ভাবে রোগীর অবস্থা শুনিয়া যাইত; এ বিষয়ে মোটেই তাহার ঔদাসীন্য ছিল না।

পরন্তপ আজ তিন দিন ধরিয়া অচৈতন্য; কোনরূপ জ্ঞান নাই, নড়া-চড়া নাই, কথা-বার্ত্তা নাই। তবে বৈদ্য নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে, রোগী জীবিত আছে। কক্ষটি নিস্তব্ধ অন্ধকার, লোক বিরল; মাঝে মাঝে চাঁপা আসিয়া সংবাদ লইয়া যায়, আর বেঙা সর্ব্বদা তাহার হত-জ্ঞান প্রভুর পার্শ্বে উপবিষ্ট; সে আজ তিন দিনের মধ্যে একবারও মতির মার নাম উল্লেখ করে নাই।

ইন্দ্রাণী নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল। সে অতীত জীবনের মানচিত্রখানা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; চেষ্টা মাত্র, তেমন সফল হইতে পারিতেছিল না; কারণ, মানচিত্রের রেখাগুলি স্পষ্ট নহে, তার উপরে সেগুলি আবার নিয়ত চঞ্চল; মানচিত্রের অপেক্ষা সমুদ্রের লীলার সঙ্গেই তাহার মিল বেশী। মানুষের মন নিয়ত চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল এবং বোধ হয় তলহীন বলিয়াই তাহাকে সরোবর বলা হয়, মানস-সরোবর, কিন্তু সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় মানস-সমুদ্র।

কিন্তু ইহারা বোধ হয় অভিন্ন, অন্ততঃ সগোত্র যে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানস-সরোবরও তলহীন, সমুদ্রও অতল; মানস আপাত-অপার, সমুদ্রেরও পার নাই; সমুদ্র নীল, মানস নীলাভ; সমুদ্র মানস উভয়েই নিয়ত চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল। আমার মনে হয়, মানস-সরসী সমুদ্রের কন্যা; নগাধিরাজ তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়া শৈল-দুর্গের অন্তরালে বিশাল সব গিরি-প্রহরীর জিম্মায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র দুর্দ্দম আগ্রহে পর্ব্বতের পাদপীঠে তরঙ্গ-বাহিনী লইয়া আক্রমণ করিতেছে, আর মানসের তীরে কাণ পাতিয়া শুনিলে, তাহার করুণ কল্লোলে সুদূর সমুদ্রের ভাষার প্রতিধ্বনি-ই যেন শ্রুত হয়।

ইন্দ্রাণীর কাণে আজ সেই করুণ কলধ্বনি আসিতেছিল, মানস যে সমুদ্রের সগোত্র, সেই কথা আজ তাহার কাছে যেন ধরা পড়িয়াছে।

সে দেখিল—একটি বীরমূর্ত্তি পদ্ম-বিকশিত বিলের ধারে শিকার করিয়া বেড়াইতেছে; সে মুখ বহুদিনের ধ্যানের। আবার চোখে পড়ে আর এক বীরমূর্ত্তি, অপরিজ্ঞাত, দিগন্তের অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। সে মুখ অনুধ্যানের। তাহার ঘোড়ার ক্ষুরের ধূলায় আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; সূর্য্যাস্তের মেঘে আকাশ যেমন আচ্ছন্ন হইয়া যায়; সূর্য্যাস্তের না সূর্য্যোদয়ের! শয়নকক্ষে জানালার ধারে বসিয়া পশ্চিমের প্রান্তরের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রাণী এই স্বপ্ন বুনিতেছে, যুগল বীরের কাহিনীর টানা-পোড়েনে সে স্বপ্নের কিঙ্খাব রচনা করিয়া চলিয়াছে; কে বলিল; মানুষ বস্তুবাদী, আমি বলিতেছি—মানুষ স্বপ্ন-শিল্পী।

রূপকথায়-শোনা সেই রাজার মত মানুষের দুই রাণী; একজন বস্তু, একজন স্বপ্ন; বস্তুতে তার ঐশ্বর্য্য, স্বপ্নে তার আনন্দ; বস্তুতে তার সুখ, স্বপ্নে তার স্বস্তি; বস্তুতে তার শক্তি, স্বপ্নে তার শান্তি; বস্তু প্রথমে স্বপ্নকে আক্রমণ করে, তারপরে করে স্বয়ং রাজাকে। তারপরে একদিন কোথায় কি ঘটে, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বস্তু রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধরিয়া রাজপুরী চাপিয়া পড়ে; বস্তুমুগ্ধ রাজা আবার স্বপ্নের কোলে ফিরিয়া আসিয়া আত্মস্থ হয়। মানুষ বস্তুমুগ্ধ, কিন্তু স্বপ্নপ্রাণ।

[৮]

এমন সময়ে চাঁপা আসিয়া খবর দিল, রোগীর জ্ঞান হইয়াছে; সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রাণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; অতর্কিত এই পুলক ঢাকিবার জন্য যতই সে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই সেই উজ্জ্বলতার ভিতর দিয়া একটা রক্তিমাভা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল; শেষে এই বর্ণের বাক্যহীন বাচালতার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সে কথা বলিল; আজ সব দিকেই তার বিপদ; কথা বলিতে

গিয়া এ কি বেফাস কথা সে বলিয়া ফেলিল।—সে বলিল —"একবার তাঁকে গিয়ে দেখে এলে হয় না!" নিজের অদ্ভুত প্রস্তাবে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল, কিন্তু চাঁপা চমকিত হইল না; সে স্বাভাবিক ভাবে বলিল—আমার তো মনে হয় তোমার একবার যাওয়াই ভাল; জমিদারের ছেলে তোমার বাড়ীতে এসে তিন দিন অচৈতন্য; একবার না দেখলে দেশে ফিরে গিয়ে বল্‌বে কি? রক্তদহের দুর্নাম।" কিন্তু এত যুক্তি সত্ত্বেও ইন্দ্রাণী টলিল না; সে যাইবার প্রস্তাব না করিলে হয় তো যাইত; কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে ঢাকিবার জন্য সে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিল।

চাঁপা ঠাকুরাণী পাকা মাঝি; বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিতে তাহার সমকক্ষ নাই; সে ইন্দ্রাণীর মনের ভাব বুঝিয়া অনুরোধ করা বন্ধ করিল; বরঞ্চ বলিল—"সে তো ভালই; বিশেষ অসুখের মধ্যে যে-সব কথাবার্ত্তা সে বলত, তা শুনলে তোমার কষ্ট হ'তে পারে!

উৎসুক ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা চাঁপা?

চাঁপা বলিল—ওসব কথা কানে তুল্‌তে নেই, বিশেষ বিকারের ঘোরে মানুষ কত কথাই বলে; তাই বলে কি সব সত্যি মনে করতে হবে।

ইন্দ্রাণীর ঔৎসুক্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—সে বলিল —কিন্তু কথাটা কি?

চাঁপা বলিল—কিছু না, কিছু না, নাও এখন স্নান করবে তো ওঠ, তেল মাখিয়ে দি!

ইন্দ্রাণী কথাটা আদায় করিবার জন্য তেল মাখিতে রাজি হইল। চাঁপা তেল মাখাইয়া দিতেছে; ইন্দ্রাণী অন্যদিন তেল মাখিতে আপত্তি করে, বেশী মাখিতে চায় না, বেশীক্ষণ ধরিয়া মাখিতে চায় না; আজ ইন্দ্রাণী বড় নরম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি এত নরম হইবার আবশ্যক ছিল না; চাঁপাও কথা বলিতে চায়, কিছু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিতে চায়। ইন্দ্রাণী কথাটা পুনরায় শুনিতে চাহিলে চাঁপা বলিল—রায় মশায় (সেকালে নাম ধরিয়া বাবু বলিবার অপেক্ষা এইরূপ ভাবে উল্লেখ করিবার রীতিই বেশী ছিল; ইহাই ছিল সেকালের আদব-কায়দা) অসুখের মধ্যে জোড়াদীঘির খোকাবাবুর নাম করতেন। (তিন পুরুষের একসঙ্গে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে, কর্ত্তাবাবু ও খোকাবাবু এইরূপ ভাবে বলা হইত)।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—রায় মশায় বুঝি তাঁর বন্ধু!

চাঁপা কোন উত্তর দিল না।

ইন্দ্রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিল—বন্ধু না কি?

চাঁপা নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলিল—কি জানি বাপু? তোমার সঙ্গে পারি না। ওই জন্যেই তো বল্‌তে চাইনি! বন্ধু কি কুটুম তা কি আমি বলেছি, না তিনিই আমাকে শুনিয়েছেন।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—তবে বল্‌তেন কি?

চাঁপা—নানারকম গালাগালি দিতেন; শুনলে মনে হয় দু'জনের মধ্যে খুব রেষারেষি আছে!

ইন্দ্রাণী প্রসঙ্গটাকে থামিতে না দিয়া বলিল—ব্যাপারটা কি ভাল করে জান্‌লে হ'ত।

তাহার দীর্ঘ চুলের জট ছাড়াইবার জন্য অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে চাঁপা বলিল—জান্‌ব কি করে? আর আমার অত জানবার দরকারই বা কি? যা শুন্‌লাম, বললাম; তুমিও শুন্‌লে, চুপ করে থাক।

ইন্দ্রাণী বলিল—রোগীকে না হয় জিজ্ঞাসা করা যায় না, কিন্তু তার চাকরকে জিজ্ঞাসা করতে ক্ষতি কি? সে নিশ্চয় জানে!

চাঁপা একটু নরম হইয়া বলিল—তা হয় তো জানে! হয় তো কেন নিশ্চয়ই জানে; ওই যে বেঙা, রায় মশায়ের চাকরের নাম বেঙা, সর্ব্বদাই রায় মশায়ের সঙ্গে থাকে।

ইন্দ্রাণী বলিল—ওকে ডেকে শুন্‌লে হয় না?

চাঁপা—বেশ তো শোন না; যদি দরকার থাকে।

—দরকার আবার কি? একটু গল্প করা বই তো নয়! দুপুর বেলা খাওয়ার পরে একবার ডেকে এন না।

স্থির হইল—দুপুর বেলা বেঙাকে লইয়া চাঁপা ইন্দ্রাণীর কাছে আসিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বেঙা ও তাহার মধ্যে স্থির হইয়াছিল, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হইলে বেঙা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা কাহিনী বলিবে; কি ভাবে দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ রায়ের মধ্যে বিবাদ বাধিল। দুইজনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, গল্পটা এমন ভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে ইন্দ্রাণীর মন পরন্তপকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে

পারে ; তাহাকে অস্ত্ররূপে গণ্য করিতে পারে ; যে অস্ত্র তাহার নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অসহায় বলিয়া শক্তি নাই। ইন্দ্রাণী যদি বুঝিতে পারে, দর্পনারায়ণ পরন্তপের শত্রু ; তবে খুব সম্ভব সে আর অধিক বিবেচনা না করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিবে। বেঙাকে প্রস্তুত হইতে বলিবার জন্য চাঁপা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গেল।

[ক্রমশঃ

স্বরগের চেয়ে বড়

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দুই ধারে মাঠ, মাঝখানে সরু পথ,
এদিকে ওদিকে সুন্দর বেণুবন,
তারি মাঝে আমি তোমারে বেসেছি ভালো
তারি মাঝে মোর হরে' নিলে তনু-মন।
আম-কাঁঠালের চারিদিকে পাতা ঝরে,
শাখায় শাখায় দুলিতেছে পাখীগুলো
মন্দ-মধুর বাতাসের ছোঁয়া লেগে
শিমুল গাছের ফেটে ফেটে পড়ে তুলো।

জলভরা বিল বায়সের আঁখিসম
তারি বুকে কাঁপে আকাশের সাদা মেঘ।
কৃষাণের দল সে সলিলে বারোমাস
শস্য-দেবীরে করিতেছে অভিষেক।
ধানের শিশুরা হাতছানি দিয়ে ডাকে,
বন-উপবনে রাখালের বাঁশী বাজে।
তারি মাঝে মা গো রহিয়াছ আলো করে
ছয় ঋতু সদা তোমারে ঘিরিয়া নাচে।

আঁকা-বাঁকা পথ আশেপাশে ঝাউগাছ
মাঝে মাঝে ধূ ধূ করিছে পথের প্রাণ,
ধুলায় ধূসর সারা দেহখানি তার
রৌদ্র-জ্বালায় পুড়ে যায় বুকখান।
কত জীবনের চলার ছন্দগুলি
কাব্য-গাথায় মিলিয়াছে নিজেরাই,
পল্লী-বীণার ছিঁড়ে-যাওয়া কত তার
তোমার কাছে মা কেবলি কুড়ায়ে পাই।

লতাপত্রা-ঘেরা কৃষাণের কুঁড়ে ঘর
ধানের গোলাও ছোট বড় দেখা যায়।
তারি কোল ঘেঁসে চলিয়াছে ছোট নদী
আধ কালি চাঁদ ফিরে ফিরে যেন চায়।
জলের দুলাল করতালি দিয়া নাচে
মায়ার যাদুতে হরেছে হৃদয় শুধু
কাশবন হাসে তার পানে চেয়ে চেয়ে
তারি সাথে খেলা করে কল্লোল-বধূ।

ধ্যানের প্রদীপ জালিয়াছে বুড়ো-বট
পূজা-উপচার সেথা বহে ফুলরাণী।
গাঁয়ের বাউল একতারা নিয়ে গায়,
মাটির বুকেতে সুন্দর বেদীখানি।
গ্রামের দেবতা সেথায় বিরাজ করে
পালপার্ব্বণে অঞ্জলি দেয় সবে।
পল্লব-ঘন-কুঞ্জ-কানন মাঝে
মহাধুমধাম জাগে নানা উৎসবে।

নগরী-নটীর নিঃশ্বাসে প্রতিদিন
শুকায়ে যায় মা শোণিতের কণাগুলি।
তোমার পরশে তাহাদের ফিরে পাই
তব চুম্বনে সব ব্যথা যাই ভুলি।
যদিও জননী হইয়াছ অনাথিনী,
ছেঁড়া-কাঁথা পরি রহিয়াছ অনশনে
তবুও তুমি যে স্বরগের চেয়ে বড়
শিয়াকুল আর বৈঁচির কাঁটাবনে।

দাক্ষিণাত্যের প্রেমধর্ম্ম

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া শুধু অন্তরের গভীর প্রেমের ভিতর দিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ ভারতবর্ষের ধর্ম্মমতের ভিতরে খুব নূতন জিনিষ নহে। শুধু ভারতবর্ষে কেন, ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু প্রাচীন যুগ হইতেই মানবাত্মার শুদ্ধ প্রেমোন্মাদনার ভিতরেই অনন্ত-রসস্বরূপকে আস্বাদনের ধর্ম্মমত প্রচলিত দেখিতে পাই; পারস্যের সুফী ধর্ম্ম ইহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে এই প্রেমধর্ম্মের প্রকাশ দেখিতে পাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-প্রেমের ভিতরে; কিন্তু এই ভাগবতের পূর্ব্বেও আমরা প্রেমধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিতে পাই দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-চূড়ামণি আলওয়ারগণের প্রেম-সঙ্গীতগুলির ভিতরে। আজ সেই প্রেম-সঙ্গীতগুলির সম্বন্ধেই কিছু কিছু আলোচনা করিব।

এই আলওয়ারগণ কখন যে দ্রাবিড়দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ভিতরে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে,—এখানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; তবে সকল প্রমাণ-প্রয়োগ বিবেচনা করিয়া মনে হয়, এই প্রেমিক বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর ভিতরে দ্রাবিড়দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দ্রাবিড়দেশই যে ভক্তির জন্মভূমি, এ প্রবাদ বহু পুরাণাদিতে পাওয়া যাইতেছে,—ভাগবতেও সেকথা অনেকস্থলে স্বীকার করা হইয়াছে। এই বৈষ্ণবগণের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাঁহারা অনেকেই জ্ঞান-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া শুধু প্রেমের ভিতর দিয়াই ভগবানের আরাধনা করিতেন। নিজেকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রেমিকা বলিয়া ভাবিত করিতেন এবং এই নায়িকা-ভাবে তাঁহারা যে প্রেম-কবিতাগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিতার সহিত একই সুরে, একই ভাবে গ্রথিত। আজ আমরা নাম্ আলওয়ারের 'তিরুবিরুত্তম্'এর (ভগবানের নিকট আলওয়ারের পবিত্র বাণী) কবিতাগুলির ভিতর দিয়া, আলওয়ারগণের মধুর রসের ভিতর দিয়া বিষ্ণুর সাধনার একটু পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। এখানে সাধারণতঃ আলওয়ারকে ধরা হইয়াছে নায়িকা, আলওয়ারের শিষ্যগণ তাঁহার সখী,—স্বয়ং বিষ্ণু বা কৃষ্ণ রসিক-শেখর নায়ক। কোথাও আবার শিষ্য আলওয়ারের মা হইয়া বিরহিণী কন্যার দুঃখে তাহার প্রেমাস্পদকে তিরস্কার করিতেছে। আলওয়ারগণের ভিতরে আচার্য্য-প্রপত্তিকেও ভগবৎ-প্রপত্তির সমান করিয়াই দেখা হইত,—অর্থাৎ আলওয়ার বিষ্ণুর ভক্ত না হইয়া শুধু গুরুভক্ত হইলেও তাহার একই ফল লাভ হইত; তাই অনেক সময় শিষ্য আচার্য্যকে প্রেমিক নায়ক কল্পনা করিয়া নিজেকে তাঁহার নায়িকারূপে ভাবিত করিয়া প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতেন।

আলওয়ারদের এই সঙ্গীতগুলি সকলই মধুর-রসাশ্রিত নহে, ইহার ভিতরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই সকল রসের কবিতাই পাওয়া যায়। পেরিয়ালওয়ারের 'তিরুমোড়ি'তে একটি কবিতার ভিতরে বাৎসল্য-রসটি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার গগনে ষোলকলা-পূর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে যশোদারূপী আলওয়ার তাঁহার আদরের নীলমণি বাল গোপালকে কোলে করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

গোবিন্দ মোর বাছনি আজ।
সঘনে লুটিত ধরণী মাঝ॥
ভ্রূ-যুগলে মণি-রতন দোলে।
কটি-কিঙ্কিণী মধুর বোলে॥
বিরাট চাঁদিমা আনন মাহ।
নয়ন রহিলে নিরখি চাহ॥
নেহারি' আমার বাছনি রঙ্গ।
চন্দ্র আজিকে দেহত ভঙ্গ॥

অমিয়া সমান দুলহ স্নেহ।
মূর্ত্ত আশিস্ ক্ষুদ্র দেহ॥
ছোট বাহু মেলি তোমার পানে।
দেখায়ে দেখায়ে ডাকিছে সানে॥
বিরাট চাঁদিমা কানুর সঙ্গে।
সাধ যদি থাকে খেলিতে রঙ্গে॥
ঢাকিও না মুখ জলদ-পুঞ্জে।
হাসি নেমে এস মরত-কুঞ্জে॥

... ...

শিশুবোলে তার তোমারে ডাকা।
অস্ফুট ভাষ অমিয়ামাখা॥
আধবোলে তার ডাকে সে যবে।
শ্রীধরের মোর আপন সবে॥
সুধামাখা তার মধুর বোলে।
উপেখিয়া যদি যাবে গো চলে॥
তাহা হতে ওগো চাঁদিমা বালা।
ভাল ছিল তব রহিলে কালা॥ ১ (পৃ— ৩৭)

আলওয়ারগণ বলিয়াছেন,—যত ঋষি-মুনিগণ যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন,—তাঁহারাও বিষ্ণুর স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই, শুধু 'যেন এইরূপ' বলিয়াই নীরব হইয়াছেন; কিন্তু,—

তাহাদের যত জ্ঞানের আলোক
শুধু মনে হয় মম,
তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য
মাটির প্রদীপ সম। (পৃ—৭৩)

তাই আলওয়ার জ্ঞানের মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক প্রেম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আলওয়ারগণ বলেন,—ভগবান্‌কে লাভ করিবার অনেক পথ রহিয়াছে।

অনেক ভজন পূজন বিধান
রয়েছে তাহার তরে,
ভিন্ন হৃদয়ে আন বিশ্বাস
বিরোধী পরস্পরে। (পৃ—৮৭)

কিন্তু এই সকল বিরোধ ভুলিয়া গিয়া আলওয়ার শুধু প্রেমিকা নায়িকার ন্যায় চিরদিন তাঁহার প্রিয়ের প্রেমের বার্ত্তাই ঘোষণা করিবেন।

অপরূপ-রূপ হে প্রভু আমার,
অনুধন শুধু আমি,
ঘুষিব আমার প্রেমের বারতা
তোমা লাগি—মোর স্বামি! (পৃ—৮৭)

আলওয়ার বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের অবতার শুধু গোপীগণের প্রেমাস্বাদেরই জন্য। তাই,—

যদিও স্বরগে দেবতাবৃন্দ
সাজাইতে তব পদারবিন্দ
করেতে পুষ্প, পূত অনিন্দ্য
যতনে রহিল ধরিয়া।
পূত যে করিল সলিল অমল
ধৌত করিতে চরণ-যুগল
অগুরু গন্ধ ধূপ যে জ্বালিল
কত না ভকতি করিয়া॥ (পৃ—৬৬)

কিন্তু তথাপি হে লীলাময়,—তুমি তোমার অন্তর্গূঢ় মায়াতে ব্রজগোপীদের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়া খাইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ—এবং

আপনি বিহরি কত না ভঙ্গে
কত না শৃঙ্গী ধেনুক সঙ্গে
নাচিল ধরায় কত না রঙ্গে
চারু গোপবালা লাগিয়া॥ (পৃ—৬৭)

গোপী আলওয়ার অন্যত্রও বলিতেছেন,—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব?—তিনি সিদ্ধগণের প্রাণনাথ, স্বর্গের সুরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত তাঁহার রাতুল পদযুগল,—দুই পদবিক্ষেপে তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার—

গোকুলের গোপমাঝে,
নামিয়া এসেছে জনম লইয়া
গোপ-গোয়ালার সাজে॥ (পৃ—৭৮)

এই আলওয়ারদের প্রেম-সঙ্গীতগুলির বাঙ্গালা বৈষ্ণব-কবিতা হইতে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। বাঙ্গালা বৈষ্ণব-কবিতায় দেখিতে পাই,—অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্য লীলা করিতেছেন,—ভক্ত কবি তাহার এক পাশে দাঁড়াইয়া শুধু সেই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার রসাস্বাদন করিতেছেন। কিন্তু আলওয়ারদের কবিতার ভিতরে আলওয়ারগণ নিজেরাই রাধা,—নিজেদের জীবন-যৌবন, জাতি-কুল-মান সকল তাঁহার পায়ে সমর্পণ করিয়া সেই জীবন-যৌবনকে সফল করিয়া মানিবার জন্যই তাঁহারা ব্যাকুল,—তাই এখানে আধ্যাত্মিক সুরটি অতি স্পষ্ট এবং মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলিতে কবি-কল্পনায় এবং রূপকের লৌকিকতায় কোথাও অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক দীপ্তিটুকু ম্লান হইয়া যায় নাই; ইহার সকল গভীরতা, প্রেমের তীব্রতা, বিরহের অসহনীয়তা আমাদিগকে সকল সময়েই স্মরণ করাইয়া

১। উদ্ধৃত সকল কবিতাই J. S. M. Hooper-এর Hymns of the Alvars পুস্তকখানি হইতে গৃহীত। অনুবাদগুলি আমার। (লেখক)

দেয়—ইহা শুধুই কবিত্ব নহে, শুধুই রূপক নহে, ইহা অনন্ত রস-স্বরূপের জন্য মানবাত্মার চিরন্তন ক্রন্দন। কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যরসের দিক্ দিয়াও যে ইহা কোথাও হীন হইয়াছে, একথা বলা যায় না। নায়িকা আলওয়ারকে দেখিয়া সখীগণ বলিতেছে,—

পীরিতি কণ্টক চিরকাল।
মাথে অলকাবলী চিত্তবিমোহন,
এ বর-নায়রী রসাল॥
বাদল মেঘসম কামুক পদযুগ
সুরগণবন্দিত সেহ।
সোই চরণযুগে সো বর নায়রীর
উপজল বহুত লেহ॥
অনুরাগ-রক্তিম নয়নযুগল তাক
বেদন-অশ্রু-পূরিত।
গভীর সরমাহ কয়াল মীন জনু
নয়ানক চাহনি চকিত॥ (পৃ—৬১)

এ যেন একেবারে পূর্ব্বরাগের রাধা!—ভরা যৌবনের অর্ঘ্য সাজাইয়া কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুখ। প্রেম-বৈচিত্র্যে নবীনা নাগরী রসবতী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের প্রথম প্রেমের স্পন্দন যেন বুকের আঁচলে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছে। তাই একদিন একটি কালো ফল দেখিয়া কালোবরণ প্রিয়ের কথাই মনে পড়িয়া গিয়াছিল,—মা তাহা জানিতে পারিয়া কলঙ্কিনী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছে। সখীগণের নিকটে বালিকা বলিতেছে,—সখি, মা মিছামিছি আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি ত' তাহার নাম বলি নাই; শুধু একদিন—

'কালো ফল হেরি কহিনু হায়,—
বরণ ইহার সাগর-প্রায়।'
কিন্তু—রুষিয়া জননী বলিল মোরে,—
'ছি ছি, লাজ নাই বদনে ওরে?' (পৃ ৮১)

সখি, এখন তোরা সকলে মিলিয়া মাকে বুঝাইয়া না বলিলে আমার আর কলঙ্ক ঘুচিবে না।

এই ভরা-যৌবনী বালিকার অন্তরে যে গোপন বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়াই সখীগণ বলিতেছে,—

বাহুতে বলয় লাবণীময়
অশ্রু-সজল আঁখি,
কাল-উজল, কি হবে তাহার
[illegible] (পৃ—৬৩)

এ নায়িকা যে এখনও একেবারেই বালিকা,—কুসুম-কোমল তাহার হৃদয় যে এখন পর্য্যন্তও প্রেমের গভীর বেদনা সহ্য করিবার উপযুক্ত হয় নাই,—

অব হি ন পয়োধর তেল অতি সুগঠিত
কোমল চিকুর লহু মাথ।
বসনক অঞ্চল ক্ষীণ কটি দেশহি
স্খলিত রহত তছু সাথ॥
চঞ্চল-রসনা সো নির্ম্মল-নয়না—
যোই নেহারত সোই ধনী।
সোই কহত বালা অপরূপ-লাবণী
জগমূলে বিকায়ব জনি॥ (পৃ—৭৭)

কিন্তু এখন কি ইহা কোনও রূপে সঙ্গত হয় যে, এইটুকু বালিকা নিশিদিন তাহার প্রিয়তমের জন্য কাঁদিয়া কাটাইবে?

দাক্ষিণাত্যে অনেক বিষ্ণুমন্দির রহিয়াছে। বেঙ্কট-গিরির বিষ্ণুমন্দির সকল বৈষ্ণবগণেরই অতিপবিত্র তীর্থস্থান। আলওয়ার সেই বেঙ্কটপর্ব্বতের জন্য রওনা হইয়াছেন,—সঙ্গের সখীগণ সারথিকে বলিতেছে,—

চলহে সারথি, ম্লানিমা-পরশ
যেন না লাগিতে পারে,
উজ্জ্বল-ভুরু বালিকার দেহ
দীপ্তির জ্যোতি-ধারে।
অতি দ্রুতগতি পৌঁছে যেন গো
আমাদের এই রথ—
সেই পূত পর্ব্বত,
জাগিছে যেথায় অলিগুঞ্জন,—
যেথায় তটিনী ঢালা,
গোলোক-পতির মুকুট-শিখরে
শুভ্র মুকুতা-মালা। (পৃ—৭৪-৭৫)

এই নবীন বালিকার বিরহিণী মূর্ত্তিটি বড়ই করুণ, যেন বাণ-বিদ্ধা সরলা হরিণী! সখীগণের নিকটে বালিকা নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

সখি, সে হিয়া আমার ফিরে কি আসিবে হেথা?
অথবা রহিবে একাকী সে হিয়া
চলি গেল পিয়া যেথা! (পৃ—৬২)

তুলসীর গন্ধ বহন করিয়া মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, সে সমীরণ এ বালিকার নিকট তুলসীমালা-শোভী তাহার প্রিয়তমের স্মৃতিটিই বহিয়া আনিতেছে।

বালিকা এ মলয়-সমীরণকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাই সমীরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—

লাজ নাহি হায় তোরে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, সঘনে বহিয়া
কম্পনে ভর মোরে॥
একটি যে মোর হৃদয় আছিল
নিয়ে গেছে তার পাখী,
তুলসীর লাগি একটিও হিয়া
রহিল না আর বাকি! (পৃ—৬২)

সখীগণও বলিতেছে,—

প্রকৃতি-শীতল মলয়-পবন
এ দেশে আগুন ভেল।
একটি বারও কি কালিয়া তাহার
দণ্ড ফিরায়ে লেল॥
বরিষার মেঘ- বরণ কালিয়া
আসি কি একটি বার।
চুরি করে নিল প্রেম-রক্তিমা
বদন হইতে তার।
তুলসী-বিরহি-নারী,—
অবিরল ঝরে অশ্রু-বাদল
বিশাল নয়নে তারই॥ (পৃ—৬৩)

ক্রমে ক্রমে অনুরাগে রাঙা বালিকার জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণাভ এবং হরিদ্রাভ ছায়া পড়িয়া গেল,—

মলিন ভৈ গেল অনুরাগ-রাঙা জ্যোতিঃ।
ব্যাধিত কৃষ্ণ-হলুদ-বরণ তথি॥ (পৃ—৬৪)

বিরহের অগ্নিতে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতে হইতে বালিকার কোমলতনু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে,—ক্ষীণ বাহু হইতে বলয় দু'খানি খসিয়া পড়িতেছে,—অসহায়া বালিকা বলিতেছে,—

তুলসী হয়েছে বলয় আমার,
চলে যেতে দাও তারে,—
মলয় আবার রুখিয়া এসেছে
এ লাবণী হরিবারে। (পৃ—৬৮)

তাহার সেই 'বরবঞ্চক শঠ-নাগর শত ঘরিয়া'র তুলনায় সে এত ক্ষুদ্র, এত নগণ্য যে, তাহার প্রিয়তম যে বঞ্চনা করিতেছে, তাহা সে মুখে প্রকাশ করিতে পারে না,—তাই সখীগণকে ডাকিয়া বলিতেছে,—

ক্ষীণ পতঙ্গ জানায়ে গভীর ব্যথা
আপনার পথে উড়ে গেল দেখ ঐ,
জগতের কথা কেমন করিয়া আর
জানিতে পারে বা এতটুকু সে যে সই। (পৃ—৭২)

সেই ক্ষীণ পতঙ্গের ন্যায় এ বালিকাও শুধু তাহার অন্তরের গভীর বেদনারই একটু আভাস দিতে পারে, নির্লজ্জের চতুরালীর কথা সে কেমন করিয়া জগতের কাছে প্রকাশ করিবে?

বিরহের ভিতরে নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতিই যেন প্রিয়তমের নিষ্ঠুর মূর্ত্তিখানি পরিগ্রহ করে,—এখন যে—

'ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।'

তাই আজ মন্দ মলয়, সাগরের গর্জ্জন, সন্ধ্যার অন্ধকার, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সকলেই যেন একযোগে এই বালিকার দেহ-মন-প্রাণ ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। তাই সখীগণ বলিতেছে,—

দুখ দিল তারে বিরহি-বিহগ-
কাতর-করুণ-তান,—
পুষ্পিত তট-প্লাবক সফেন
সায়রের গুরু গান।
এথায় হেথায় সকল মিলিয়া
কাঁদায় এ সুরবালা,
অনুখন গাহে সে তব বাহন
পক্ষীর গুণ-মালা।
এই কি তোমার কাজ,—
নিন্দা যে জগ-মাঝ! (পৃ—৮৫)

প্রিয়তম এতটুকু দয়াও করিল না,—তাহাতে আবার বাতাস আসিয়া দেশে দেশে কলঙ্ক ছড়াইয়া দিতেছে,—

জানিতাম আমি পবন নিদয় অতি
কিন্তু সজনি, কখনও নাহি জানি,
নিষ্ঠুরতায় এমন মুরতি আছে
পাই নি আভাস নির্দ্দয় এতখানি।
গরুড়-বাহন অসুরবিনাশকারী
করিল না যবে এতটুকু দয়া হায়,
কলঙ্ক মোর ছড়াইছে দেশে দেশে
ঘুরিয়া মোরে নিঠুর এই বায়। (পৃ—৭৯)

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার রথের চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে, এ বালিকা দিবানিশিই সেই রথের চিহ্নের দিকে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু উদ্বেল সমুদ্র তাহার তরঙ্গমালা দিয়া সেই রথের চিহ্নকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছে, তাই কাতর প্রাণে বালিকা সাগরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে,—

গোধূলি লগন ক'র না তোমার
তরঙ্গ-মালা দিয়া,
মুছিও না তার রথের চিহ্ন
যে গেল আন্ধারিয়া। (পৃ—৬৫)

দরদী সখীগণও বিষ্ণুকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে,—

যত বলা যায় এ যে অতি হায়
অল্পবয়সী বালা,—
কালো এ সাগর গর্জ্জে যে শুধু
যেন দয়াহীন কালা!
জলদবরণ—সর্প-শায়িত
হে দেবতা, ওগো হায়,—
সাজে কি ইহারে ফেলে রাখা হেথা
নিঠুর উপেখায়!
শুধু তব কৃপাকণা
রাখিতে পারে গো এবে এ বালার
পূত সতীত্বপনা। (পৃ—৭৮-৭৯)

সখীগণ ভর্ৎসনাচ্ছলে আরও বলিতেছে,—হে নিঠুর, তুমি ত জগতেরই প্রিয়তম,—তবু যে কেন এই নবীন নাগরীকে এই ভাবে উপেক্ষা করিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারি না,— শুধু এই বালিকাটিই তোমার জগতের বাহিরে না কি জানি না। তবে,—

এইটুকু শুধু জানি,
তুমিই নাশিছ নবীন বালার
অরূপ লাবণীখানি। (পৃঃ ৭০)

সন্ধ্যা আসিলেই এ বালিকা আর স্থির থাকিতে পারে না; তাই সন্ধ্যাসমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকা বলিতেছে,—

পশ্চিম আকাশের প্রিয়তমা সন্ধ্যা,
সূর্য্যবিরহে অতি ম্লান,—
ক্ষুদ্র-আনন ছোট শিশুসম কক্ষে
চন্দ্র রয়েছে আধখান;

এই সাঁঝ হরে নিতে পারে সব শান্তি
সেই সব জন হতে হায়,
যারা ভাল বাসিয়াছে বিষ্ণুর তুলসীরে,
ভুবন ঢাকিল যেই পায়।
আবার আসিল ফিরে ঐ,—
শীতল মলয় বায় অতিশয় নিঠুর
আমারে খুঁজিতে ভলো সই। (পৃঃ ৭১)

অন্যত্রও দেখিতে পাই,—

চন্দ্র-শিশুটি কোলে ক্রন্দন নিরত
সন্ধ্যা বিষাদময়ী দাঁড়ায়ে,
রক্তিম রণভূমে রক্ত দণ্ডধারী
আপনার প্রাণনাথে হারায়ে।
লঙ্কার রণবীর স্বর্গের কাণ্ডার
তুলসী করিয়া তার সঙ্গে,—
যন্ত্রণা দেয় শুধু কাড়ি নিতে ক্ষণেকেই
যে লাবণ্য মাখা মোর অঙ্গে। (পৃঃ ৮২)

কিন্তু এই সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সখীগণ আবার সান্ত্বনাও দিতেছে,—

পীন-পয়োধরি,—বাহুর বলয়
খসি পড়ে যদি তুমি,
দুঃখ ক'র না তুমি,
পদবিক্ষেপে ভুবন ঢাকিল
আমাদের যেই প্রভু,
এমন সাঁঝে কি নির্ম্মম হেন
ত্যজিবে তোমারে কভু? (পৃঃ ৮০)

দিবসের স্পষ্ট আলোকে আমাদের যে মনটি বহির্জগতের বৈচিত্র্যের ভিতরে ছড়াইয়া থাকে, রজনীর সমাগমের সহিত সেই বহু-বিক্ষিপ্ত মনটি আমরা আবার আমাদের ভিতরে গভীর ভাবে ফিরিয়া পাই। তখন সেই কেন্দ্রীভূত মনের ভিতরে শুধু জাগিয়া ওঠে তাহারই মূর্ত্তি, যাহাকে মন পাইয়াছে সকলের চেয়ে বেশী আপনার করিয়া। রাত্রি তাই বিরহী জনের পক্ষে একটি মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা; প্রিয়হীন বিরহীর মনে তখন শুধু জাগিয়া থাকে একটি কথা,—এই রজনীতে আমি আছি,— আমার প্রিয়তম কাছে নাই। শুধু এই একটি বেদনার তীব্রতার ভিতরে পল পল করিয়া সমগ্র-রজনী কাটিয়া যায়, সে যেন এক-একটি বিশেষ যুগ। তাই বিরহিণী বালিকার সখীগণ বলিতেছে,—

এই যুগসম দীর্ঘ যে কাল
রাত্রি কহয়ে যারে,
খুঁজে মরে শুধু মানুষের প্রাণ
যখন অন্ধকারে ;—
এমন সময়ও করুণা হ'ল না
নিঠুর বঁধুর প্রাণে,
ভাবিল না সে ত, সান্ত্বনাহীন
গভীর বিষাদ-প্রাণে,
জাগিয়া রয়েছে এ বর-নাগরী
তুলসীর নামগানে। (পৃঃ ৭১)

অন্যত্রও দেখিতে পাই,—

দিবস দিবস কত মাস মাস সম—
কত না বরষ যুগসম,—
তুলসী লাগিয়া মোরে মলিন করিতে এল
কত না রজনী নির্মম।
... ...
আবার আসিল হের একটি রজনী গো
সহস্র যুগ যুগ সম—
ঘিরিয়া আসিল ওই—আর কি কহিব সই—
ভাঙ্গিতে পরাণখানি মম॥ (পৃঃ ৮০)

যে চন্দ্র প্রিয়ের মিলনে শুধু মঙ্গলদীপ ছিল, যে শুধু প্রেমের বাসরে সুধাই বর্ষণ করিত, সে আজ গরলবর্ষী। তাই ত,—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনু বিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥
(শ্রীগীতগোবিন্দম্, ৪।১,২)

এ বালিকাও বলিতেছে,—

রজনীর ঘন ঘোর তমসার আবরণ
করে যেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন,
আজিকার আকাশের আধ সেই চন্দ্রমা
করুক আমারে দ্বিধা ভিন্ন।
উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদিল এবার না কি
হাসিমাখা আলো তার দীপ্ত,
বিরহে ব্যথিতে আসে, তনু-মন-প্রাণ যার
তুলসীকুহুন, লাগি ক্ষিপ্ত। (পৃঃ ৮১)

অন্যত্রও দেখিতে পাই,—

কমল-বোজান কুমুদ-ফোটান
শুভ্র উজ্জ্বল চাঁদ,
গরল ছড়ায়ে আমারি বলয়
লাগিয়া পেতেছে ফাঁদ! (পৃঃ ৮২)

ধনী শুধু বিলাপ করিতেছে,—এ মধু-যামিনী কেমন করিয়া সে প্রিয় বিনে কাটাইবে!

বিলাপে সো ধনী রজনী-দিনে,—
"এ মধু-যামিনী বঁধুয়া বিনে
অন্ত-বিহীন লাগিছে যেন
তুলসীর লাগি বাসনা হেন।" (পৃঃ ৭৭)

তাই শুধু নিঃসহায়া অবলা কাতরকণ্ঠে মিনতি করিতেছে,—

ওগো গোলোকাধিপতি, হে রাজন অনুপম,—
যদিও ছেড়েছ মোরে শঠ,
জ্বালাময়ী রাতি এল, দয়া কর দয়াময়,
হে নিঠুর হ'য়ো না কপট। (পৃঃ ৮৩)

কালিদাস বলিয়াছেন,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥
(মেঘদূতম্, পূর্ব্বমেঘঃ, ৩ শ্লোক

বিদ্যাপতিও গাহিয়াছেন,—

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরী পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

তাই বর্ষার সমাগমে অম্বর যখন আবার মেঘে মেদুর হইয়া উঠিল, তাহার সহিতই এ বালিকার হৃদয়-গগন বিরহ-বেদনায় ছাইয়া আসিল,—বারিধারের সহিত অশ্রুধার মিশিয়া গেল।

আওল কিবা বাদর কাল,—
নাগরী আঁখি-বাণ,
বহত আজি অবিরল ধারে
সায়র-পরমাণ॥ (পৃঃ ৭৪)

বিরহিণী বলিতেছে,—

এই নাকি এল ঋতুবর;
শীতলিয়া অতি সুন্দর;—
রূপ যার ঠিক যেন হায়
জিজ্ঞাসা রকের প্রায়।

গর্জ্জনে ঘোষে কি বারতা
প্রবাসী প্রিয়ের নিঠুরতা।
পাপমতি নাহি বুঝি হায়,
আঁখিতে কি হেরি মূঢ় প্রায়! (পৃঃ ৬৩)

তাই বর্ষাগমে বালিকার মাও বলিতেছে,—

কাল জলদপর   কাল জলদ ঘব
জাগই গগন-বিথার।
বজ্রে ফুকারই,   আজু কোন নায়রী
সতী বারহবি ঘরে আর॥
ঐছন কালহি   গরুড়-বাহন পহু
সো ধনী নায়র বর,
পাণ ন ডাকল   এ বর-নায়রী
তুলসী ন দেওল কর॥
অল্প-বচনী ধনী,—   দেশক পরিবাদ
বিদরই তাক পরাণ
অব মঝু বালাক   সান্ত্বনা দেহত
হে নাগর নিঠুর কান॥ (পৃঃ ৬৬)

বিরহে মেঘ, পবন, হংস প্রভৃতিকে প্রেমাস্পদের নিকটে দূত প্রেরণ করা ভারতীয় সাহিত্যের একটি বহুপ্রাচীন রীতি। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা 'মেঘদূত', 'হংসদূত', 'পবনদূত' প্রভৃতি অনেক দূত পাইতেছি। এই কবিতাগুলির ভিতরেও দেখিতেছি, বিরহিণী বালিকা মরাল, মেঘ, তাম্বুল প্রভৃতির নিকটে অনুনয়-বিনয় করিতেছে, যাহাতে তাহারা তাহার বিরহী হিয়ার এককণা বেদনার বারতা তাহার প্রেমাস্পদের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার নিকট হইতে কিছু প্রেমের বারতা বহন করিয়া আনে। কিন্তু সকলেই তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ক্ষুব্ধ বালিকা সখীদিগকে বলিতেছে,—

'দূত নাহি যার মোদেরে সে নারী
দূত পাঠাইতে চায়!
যত পাবণ্ড মরালশ্রেণী যে
এই কথা বলি হায়,
কিছু না প্রিয়ের বারতা আনিল,
চলে স্বামী সাথে ক'রে!
বিজুরী-উজর শ্যামল বিষ্ণু
তাহার জগৎ পরে,
নাহি বুঝি অধিকার
কোন পথ দিয়া বহিয়া যাইতে
রমণীর বারতার! (পৃঃ ৬৯)

আকাশপথে উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণীর নিকটে রমণী কতবার অনুনয় করিয়াছে,—

উড়ে যায় যত মরাল বলাকা
সকলের পায়ে ধরি'
বলিয়াছি কত সকলের কাছে
শত অনুনয় করি,—
'তোমাদের মাঝে যে আগে যাইবে,—
দেখ যদি সেথা গিয়া
কৃষ্ণের পাশে রহিয়াছে মোর
বিরহিণী এই হিয়া,
ভুলো না ভুলো না, শুধু একবার
বলিও আমার কথা,—
শুধা'য়ো কেবল,—এখনো ফিরিয়া
যাও নি সে বালা যথা?' (পৃঃ ৬৯)

আবার আকাশপথে মেঘের মালা আপন মনে ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে,—বেঙ্কটগিরির চূড়ায় তাহারা ঘন ঘন বিদ্যুতের হাসি হাসিতেছে,—কিন্তু,—

'আমারি হৃদয়-বারতা বহিতে
করি যবে আহ্বান,
করে প্রত্যাখ্যান
বহুমূল্যের প্রস্তর সম
স্বর্ণ-বিজুলী থান।
বারতা আমার বহিবে কি তারা সাথে
আরবার যদি করি অনুনয়
চরণ ধরিয়া মাথে? (পৃঃ ৬৯)

এইরূপে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই নায়িকার ভিতরে আমরা বিরহের দশ দশা চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি প্রভৃতি প্রায় সকলই দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালা-বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেখিতে পাইতেছি,—বিরহিণী রাধার অবস্থা দেখিয়া সকলেই সন্দেহ করিতেছে,—রাধাকে ভূতে পাইয়াছে,—এবং এই জন্য ওঝার ব্যবস্থাও হইয়াছিল,—

'কেহ বলে মাই   ওঝা দে ঝারাই
রাইএরে পেয়েছে ভূতা।'

এখানেও দেখিতে পাই, এ বালিকার অবস্থা দেখিয়া সকলের সন্দেহ হইয়াছে,—ইহাকে হয় ত কোনও অপদেবতায়

পাইয়া বসিয়াছে,—এবং এজন্য ত্রিশূলধারী এক যোগীকেও ওঝাস্বরূপ ডাকা হইয়াছে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলিতেছে, যে দেবতা এই বালিকাকে ভর করিয়াছে, তাহাকে তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা বশীভূত করা যাইবে না; তবে,—

এ যোগী তিরশূলধারী,—
শুন শুন এ মাত এক বচন ইত,
এ বচন রাখবি হামারি॥
সপ্ত ভুবন-গ্রাসী বিষুক নাম কহি
সবাই মিলি এক সাথ।
অপরূপ সুন্দর শীতল তুলসী মাল
দেহ বেঢ়ি তাহাক মাথ॥ (পৃঃ ৬৬)

অন্যত্রও এ ব্যাধির ঔষধ দেখিতেছি,—

স্বরগ-শীতল অতি মনোহর
তুলসী-মালা তায়,
অথবা তুলসীপাতে, অঙ্কুরে
কর কর তারে বায়,

অথবা তুলসী মূলের শিকড়ে
অথবা হস্তে তুলি
যেথায় জনমে তুলসী-বৃক্ষ
সেথাকার কিছু ধূলি। (পৃঃ ৭৬)

এমনই করিয়া সে বিরহিণী বালিকা বিরহের দশম দশায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—

নয়ানক আগাই অঙ্গন-তরুমাহ
কণ্টকিত নীড় মাহি॥
প্রতিদিন বিহগ বিহগী সম্ভাষত
হেরত হি সম্মুখ চাহি॥
না জানি কি হব পরিণাম।
সঘন নিশাসই খোড়ি তাহে জন্মই
জলদ-বরণ পিয়নাম॥
কিয়ে জীয়ব বালা কিয়ে নাহি জীয়ব
কিয়ে নমুয়া তাক দেহ।
অমিয় পরাণ আর নিচয় কি তেজব
কিছু নাহি জানলুঁ সেহ॥ (পৃঃ ৮৪)

বিরহিণী হৃদয়ের বেদনা আর চাপিতে না পারিয়া প্রিয়তমকে ক্ষণে ক্ষণে কত অনুনয় করিতেছে, আবার ভর্ৎসনা করিতেছে। সে ভর্ৎসনার বাণী শুনিয়া সকলে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল,—কোথায় সে বিশ্বেশ্বর বিরাট্ দেবতা,—আর কোথায় এ তুচ্ছ বালিকা,—

দেব-অজ্ঞাত বিরাট সে দেব
তারে হেন কথা তোর! (পৃঃ ৮৭)

প্রত্যুত্তরে বালিকা বলিতেছে,—

উপেখার বাণী বলিয়াছি যদি
তাতে কি বা আসে যায়?
তাহা বিনে কোন মঙ্গল লাগি
মন নাহি মোর ধায়। (পৃঃ ৮৭)

এই সকল পদের সহিত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির বৈষ্ণব-পদাবলী তুলনা করিলে মনে হয়, ইহাদের ভিতরে কোন বিজাতীয়—এমন কি—সজাতীয় ভেদও নাই। সকলই যেন একই সুরে বাঁধা। এই জন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণপ্রেমে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামানন্দ রায়ের মুখে গোদাবরীর তীরে বসিয়া মহাপ্রভু যে রাধা-প্রেমের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় ইহাই।

প্রকৃত সন্তুষ্টি

ভারতবাসীর অন্নাভাব ও অসন্তুষ্টি দূর করিবার জন্য ইংরাজ অধিকতর সংখ্যায় নোটের প্রচলন, চাকুরী-স্থলের সৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ পন্থার পরীক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু, আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া যথাযথ শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত কি করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা ভারতবাসী শিখিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, অথবা জগতের কোথায়ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত সন্তুষ্টি পুনরায় দেখা যাইবে না।



যোগিনীর মাঠ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাপদ রাহা

দেবদাসের চোখের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি চারিদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলেন। তাঁহাকে যেখানে আনা হইয়াছে, তাহা একটি প্রকাণ্ড পাকাবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। এই বিজন অরণ্যের ভিতর পাকাবাড়ী কি করিয়া আসিল ভাবিতে গিয়াই মনে হইল, হয় ত' ইহা কোন নীলকর সাহেবের কুঠী,—বা রাজা সীতারামের কোন কীর্ত্তি। পঞ্চু এবং শিবুর চোখের বাঁধনও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা মিট্ মিট্ করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া বেঁটে লোকটা তাহাদের চোখের উপর শড়কি লইয়া বলিল,—চোখ গা'লে দেব যদি অমন করে চা'বি। শিকার করতি আইছেন!

যে বৃদ্ধ লোকটি সকলের উঁচুতে একটা পাকা বাঁধানো জায়গায় বসিয়া ছিল, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝা গেল, সে-ই মেয়েটিকে হুকুম করিতেছিল। এইবার লোকটি দেবদাসের দিকে চাহিয়া আদেশ করিল,—তারপর নিয়ে আসো দেহি রাজপুত্তুরির এই দিক্, ও দু'ডোরেও নিয়ে আসো।

দেবদাস, পঞ্চু ও শিবুকে বড় সর্দ্দারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। বড় সর্দ্দার দেবদাসের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—তারপর রাজপুত্তুর, রাজপুত্তুরের এ্যাহানে আসা হইছে ক্যান্?

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বড় সর্দ্দারের মুখ ভয়ঙ্কর—বীভৎস হইয়া উঠিল। একদিন লোকটা যে কত মানুষের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে, এক নিমেষে তাহার মুখের রেখাগুলি যেন স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিয়া গেল। বৃদ্ধের ব্যঙ্গোক্তিতে দেবদাস কোন উত্তর করিল না।

—কি, কথা কও না যে নবাব-পুত্তুর,—ঐ শড়কি দেখতিছ না—চোখ দুডো ঘা'ল করে দেব, সাড়াশী দিয়ে জিভে টানে ছেঁড়ব। এই, তোরা ওর গলার আর হাতের ওগুলো এহোনও রাহিছিস্ যে!

তিন চারিজন লোক আসিয়া দেবদাসের গলার হার, হাতের তাগা ও অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ আবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—এ বনে ক্যান্ আইছো কও।

দেবদাস বৃদ্ধের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—শিকার করতে।

—শিকার কোরতে!—শিকার করতি আর জাওগা পাও নি,—জান না—কালু সর্দ্দারের বন থে কেউ জ্যান্ত ফিরে যাতি পারে না!

ছোট সর্দ্দার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বড় সর্দ্দারের দিকে চাহিল। বৃদ্ধ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল,—তুই থাম হীরু আমাগারে নাম জানলো ত ভয় কি?—ওডারে এ বনেথে আস্ত ফিরে যাতি দেব না কি আমি—কালু সর্দ্দারের চেনেন না,—ঘুঘু—ধান খাতি আইছেন!

ক্রোধে বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল:—এ বনে ক্যান আইছো—কও।

—এ বন আমার, এ বন কিনেছি আমি।

চারিদিক হইতে ডাকাতের দল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল,—এ বন ক্যান্ কিনিছো, কন্‌কের জমিদার তুমি?

—ইস্‌লামপুরের।

—তা' হ'ক—এ বন ক্যান্ কিনিছো?

—প্রজা বসাব, চাষ করাব।

চারিদিক হইতে আবার অট্টহাস্য উঠিল। বৃদ্ধ ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল,—পেরজা বসাব,—আহ্লাদ! রাজা বাহাদুর সাহস করলো না,—উনি পেরজা বসাবেন। পেরজা বসালি আমরা যাবো ক'হানে শুনি! পেরজা বসাচ্ছি আমি—দ্যাহো না।…এই হীরু, এডারে,—না আগে ও'দু'ডোরে আঁধার কুঠরীতি নিয়ে যা,—আর এডারে মা কালীর ঘরে নিয়ে যা।

নিকটস্থ একটি কুঠরী হইতে শান্ত কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল,—বাবা!

—ক্যান্ মা!

—আজ না।

—ক্যান্ মা ?

—আজ যে আমার জন্মদিন, ফাল্গুনী পূর্ণিমা আজ।

কথাটা শুনিয়া বৃদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল, কিন্তু যদি প'লায়ে যায় তার জিম্মি দায়ী তুমি।

হাসির সঙ্গে জবাব আসিল, আচ্ছা।

অদৃশ্য নারীকণ্ঠের এই কথা ও হাসি দেবদাসকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করিয়া রাখিল। মনে হইতে লাগিল, চারিদিকের রূঢ় বাস্তবতার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে একটা স্বপ্নময় কল্পনাজগতের রহস্যময় সুর যেন তাহার কাণে ভাসিয়া আসিয়াছে।

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শিবু ও পঞ্চুকে আঁধার-কুঠরীতে লইয়া যাওয়া হইল, দেবদাসকে মা কালীর ঘরের পাশের ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হইল। ঘরে কুলুপ পড়িল।

*

সন্ধ্যাকালে মায়ের প্রসাদ বলিয়া যে দুধ ও ফল দেবদাসের কাছে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, মরণ শিয়রে করিয়া তাহা খাইবার মত ইচ্ছা দেবদাসের ছিল না। কিন্তু যে লোকটা প্রসাদ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানা গেল যে, মায়ের পূজার পুরোহিত স্বয়ং যোগিনী মা এবং প্রসাদও তিনিই পাঠাইয়াছেন, তখন সেই শব্দময়ী নারীর কথা স্মরণ করিয়া দেবদাস তাহা গ্রহণ করিলেন।

উপরের দুইটি গবাক্ষ দিয়া পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার দিকে চোখ পড়িতে দেবদাসের মন মুক্তির জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল, কিন্তু সে আশা বৃথা ; ঐ সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে কেহ বাহিরে যাইতে পারে না, তাহা ছাড়া হস্ত-পদ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেবদাস কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তিনি ভোলেন নাই : আজিকার ঘুমই তাঁহার এ জীবনের শেষ ঘুম।

*

ঘুমের মাঝে দেবদাসের একবার মনে হইল, তাঁর হাত-পায়ের লোহার শিকল ক্রমে খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। এমন দুর্ভাগ্যের জীবনে—ইহা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, দেবদাস আধো-ঘুমের মাঝেই একবার হাসিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন—হাতের শিকল খুলিতে খুলিতে কাহার অঙ্গুলির স্পর্শ যেন তাঁহার হাতে লাগিয়া গেল। কা'ল যখন তাঁহার জীবন শেষ হইতে চলিয়াছে, এমন করিয়া ঘুম-ঘোরে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার অর্থ কি! ঘুমের জড়তা ভাল করিয়া কাটে নাই, দেবদাস সদ্যোমুক্ত দক্ষিণ হস্তে শত্রুর হাত চাপিয়া ধরিলেন।

—উঃ লাগে, ছাড়েন।

এক মুহূর্ত্তে দেবদাসের ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার দৃঢ়-মুষ্টির মধ্যে যাহার হাত আবদ্ধ, সে কোন কঠিন-কায় যুদ্ধ-যোগ্য পুরুষ নয়, অতি কোমল স্বাস্থ্যবতী শক্তিশালিনী নারী। মেয়েটির হাত দেবদাসের হাতের ভিতর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, দেবদাসের জীবনেও এই প্রথম নারীর স্পর্শ, সুতরাং তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেবদাস নিজের জাগ্রত অবস্থাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। উপরের গবাক্ষ-পথে ঘরে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আলোতে দেখিলেন—মেয়েটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যে, বর্ণে, গড়নে, রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। দেবদাস নারীকে চিরকাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চ-বিংশতি বর্ষ বয়সে বিবাহের সম্বন্ধ অনেক আসিয়াছে, মায়ের শত অনুনয় তিনি অবহেলা করিয়াছেন, কিন্তু আজ এই বিজন অরণ্যে মরণ শিয়রে করিয়া তাঁহার মনে হইল—এমন কন্যা তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী হইলে তিনি বিবাহ করিতে রাজী ছিলেন।

মেয়েটি ধরা পড়িয়া গিয়া লজ্জায় মুখ নত করিয়াছিল। সে হয় ত' মনে করিয়াছিল, বন্দীকে বন্ধন-মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারিলে প্রথম সুযোগেই সে পলাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু তাহা আর হইল না। দেবদাস অভিভূত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ?

মেয়েটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপে চুপে বলিল, আর এটুটুও দেরী করবেন না, আপনি প'লান।

—তুমি কে তা' না বল্‌লে আমি কিছুতেই পালাব না, আর আমি বাঁচলে তোমার স্বার্থ কি ?

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়া দেবদাসের মুষ্টিবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দেবদাস বুঝিলেন, নারী হইলেও ইহার গায়ে শক্তি অসাধারণ। দেবদাস

বলিলেন, ছেড়ে দিতে পারি যদি নিজের পরিচয় দাও, নইলে সারারাত এমনি করে ধরে রাখব। আমি ত' মরতেই চলেছি, তুমিও মারা পড়বে।

মেয়েটি হাসিয়া উঠিল, আমার গায়ে এ্যাহানে কেউ হাত দিতি পারবে না, এট্টা খড়্‌কের আঁচড়ও না।

—কেন?

—আমি কালু সর্দ্দারের মেয়ে!

কালু সর্দ্দারের মেয়ে!—দেবদাসের মুষ্টি অকস্মাৎ শিথিল হইয়া গেল।

—কি, ভয় পা'লেন না কি?

—না ভয় না,—তুমিই কি সর্দ্দারের কাছ থেকে আজকার মত আমার জীবন ভিক্ষা করে নিয়েছিলে?

কথাটা শুনিয়া মেয়েটি একটু লজ্জা পাইল, মুখ নীচু করিয়া সে বলিল, আমার জন্মদিনডা সকলেই এ্যাহানে মানে,—আমি শুধু সেডা মনে করায়ে দিছি।

দেবদাস বুঝিলেন, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, কথা বলিতে জানে। তাহাকে দেখিবামাত্র মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, এখন কথা বলিয়া বলিয়া তাহাকে মঞ্জরিত করিয়া তোলা চলিত, কিন্তু তাহা না করিয়া দেবদাসের নিজের মনকে শাসন করিতে হইতেছে: সে যে কালু সর্দ্দারের মেয়ে!

দেবদাসের বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তুমি সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, আর এই গভীর রাত্রে গোপনে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার বন্ধন মোচন করতে এসেছ—এ কথার অর্থ আমি বুঝি,—কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিল, কত রকমে তুমি আমায় ঋণী করে রাখলে, এ জীবনে তা' শোধ দিবার সুযোগ হয় ত' আমি পাব না।

মেয়েটি দেবদাসের দিক্ হইতে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া কি যেন চাপিল, তারপর বলিল, শোধ দিয়ে আর কাজ নেই, আপনি এখনই পলান দেখি, দেরী করলি দুই জনেরই বিপদ হ'বে'নে।

দূরে খট্ করিয়া কিসের যেন একটা শব্দ হইল, মেয়েটি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল: যা'ন হন,—আর একটুও দেরী করবেন না। মেয়েটির দৃষ্টি ভয়-চকিত হইয়া উঠিল।

দেবদাস দাঁড়াইয়া দরজার সম্মুখে মেয়েটির পথরোধ করিয়া বলিল,—তোমার নামটা—তোমার নামটি বলে যাও আমায়।

মেয়েটি উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছিল, চোখে সেই ভয়-চকিত দৃষ্টি,—বলিল,—নাম?—আমার নাম কাঞ্চন। কিন্তু আপনি এ্যাহনই দৌড়ায়ে পলান, আমারে যাতি দিন, ওদিকে শব্দ হইছে।

দেবদাস দু'হাত বাড়াইয়া পথরোধ করিয়া বলিল, একটু দাঁড়াও তুমি,—আমার ত' যাওয়া হয় না কাঞ্চন, শিবু ও পঞ্চু আমার লোকদু'টি বাঁধা পড়ে রয়েছে,—তাদের আমিই সঙ্গে করে এনেছি। তাদের না নিয়ে আমি কি করে যাই! আর আমায় ছেড়ে দিলে ওরা যখন বুঝতে পারবে, তখন কি ওরা তোমায় ক্ষমা করবে?

কাঞ্চনের বুক ঠেলিয়া কি যেন উঠিতে চায়: হয় ত' সে ভাবিল—মানুষের মন এত বড় হয়!—হয় ত' বা তার মনে হইল—এ সে কি করিতেছে—একজন অপরিচিতকে বাঁচাইতে গিয়া সে কতজনের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে,—এ তাহার কি হইল!

আবার শব্দ হইল। শুনিয়া কাঞ্চনের সংজ্ঞা ফিরিল, সে তাড়াতাড়ি দেবদাসের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, শীগগির সরেন,—পথ ছাড়েন—

কিন্তু পথ আর তাহাকে ছাড়িতে হইল না,—মা-কালীর ঘরসংলগ্ন এই ঘরের সম্মুখে—'পিটেপোড়া'-গাছতলায় চার-পাঁচজন লোক শড়কি হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকাইয়া তাহারা হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—কেডা ও,—ঘরে দাঁড়ায়ে কেডা?

দেবদাস কোন উত্তর দিলেন না, জ্যোৎস্নালোকে কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার মুখের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত একটি হাসির রেখা খেলিয়া গেল। বিনা বাধায় তিনি পুনরায় বন্দী হইলেন। কাঞ্চন ধীরে ধীরে একপাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল, লোকগুলি তাহাকে দেখিয়া মাথা নীচু করিল। শুধু একজনের মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইয়া গেল—যোগিনী মা!

*

রাত্রি প্রভাত হইলেই দেবদাস ভয়ঙ্কর একটা কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর আবদ্ধ থাকিয়াই তিনি বুঝিতে-

ছিলেন—বাহিরে এবার পাহারা নিযুক্ত হইয়াছে। নিজের জন্য মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন শাস্তি কল্পনা করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু এই সুন্দরী অপরিচিতা মেয়েটি তাঁহার জন্য কি কলঙ্ক বরণ করিয়া লইল! দেবদাস নিজের জন্য এবার মায়া বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঁচিবার কোন উপায়ই আর রহিল না।

সারাদিন লোকের গতিবিধির শব্দ শুনিয়া তিনি বুঝিতে লাগিলেন, বাহিরে কিসের একটা আয়োজন চলিতেছে, এখনই হয় ত' তাঁহাকে পুনর্বিচারের জন্য কালু সর্দ্দারের সম্মুখে অথবা বলি দিবার জন্য মায়ের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইবে। দেবদাস বুঝিতে পারিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার একবার কাঞ্চনকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, অথচ তাঁহাকে কেহ লইতে আসিল না,—দেবদাসের কেমন আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় ঘর খুলিবার শব্দ শোনা গেল। একটা লোক আসিয়া একবাটী দুধ-কলা ও আকের গুড় রাখিয়া গেল। ঘরে আবার কুলুপ পড়িল। আবার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তের ধ্যানে কাল কাটিতে লাগিল।

*

নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেবদাস কেমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ 'জয় কালীমাইকী জয়, জয় যোগিনীমাইকী জয়'—শব্দে তাঁহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আর দেরী নাই বুঝিয়া দেবদাসের বীর-হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। দেবদাস একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন: সারাদিন ধরিয়া কালু সর্দ্দার যে মতলব আঁটিয়াছে, তাহাতে নিতান্ত সহজ-মৃত্যু তাঁহার হইবে না,—কিন্তু কাঞ্চনকেও ত' ইহারা শাস্তি দিতে পারে—ভাবিতেই এই করুণাময়ী—সুন্দরী কন্যার উপর সহানুভূতিতে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল।

এমন করিয়া বাঁচিবার সাধ দেবদাসের আর কোন দিন হয় নাই।

কিছুক্ষণ পর কয়েকটি লোক আসিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবদাসকে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে।

মা-কালীর ঘরের সমুখে যখন তাঁহাকে নামান হইল, তখন সেখানে লোকে ভরিয়া গিয়াছে, সকলের হাতে লাঠি ও ঢাল, মুখে উৎসবের উল্লাস। মানুষের প্রাণ লইতে যাহাদের এত আনন্দ তাহারা কোন্ স্তরের জীব!—দেবদাসের অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া গেল।

মায়ের ঘরের সিঁড়ীতে বসিয়া বুড়ো সর্দ্দার কালু ও তাহার বামে কাঞ্চন। দেবদাসকে সেখানে আনা হইলেই লোকগুলি আর একবার জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। দেবদাস দেখিলেন, কাঞ্চন একখানা পাটকেলী রংয়ের বেনারসী পরিয়াছে। ডাকাতের মেয়ের বেনারসী পরিতে অভাব হয় না সে কথা তিনি জানেন, কিন্তু কাল রাত্রে যে মেয়ে গেরুয়া পরিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিল, আজ তাঁহারই মৃত্যু উপলক্ষে সেই মেয়ে উৎসব-বেশে সাজিয়া আসিয়াছে দেখিয়া দেবদাসের সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল: এ জগতে বাঁচিয়া থাকিবার মত কোন আকর্ষণ তাহা হইলে থাকিতে পারে না। জগতের প্রতি বিতৃষ্ণায় জীবন ভরিয়া মৃত্যুকে সহজ করিয়া লইবো বলিয়া দেবদাস আর একবার কাঞ্চনের দিকে তাকাইলেন: সুন্দর দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও কা'ল রাত্রের মত ঔজ্জ্বল্য যেন মুখে নাই, কি একটা নিদারুণ দুঃখ যেন সে অতি কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছে, কালু সর্দ্দারের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

তৎক্ষণাৎ ঢোল ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল, দেবদাস দেখিলেন, শিবু ও পঞ্চুকেও এক পাশে আনিয়া নামান হইয়াছে।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দশজন বাছাই-করা জোয়ান্ লাঠি লইয়া পাঁয়তাড়া করিতে করিতে মা-কালীর ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল: জয় কালীমাইকী জয়, জয় যোগিনীমাইকী জয়।

তারপর বাদ্যের তালে তালে তাহারা নানারূপ খেলা-কসরৎ দেখাইতে লাগিল। প্রথমে শুধু লাঠির খেলা, তারপর লাঠি ও শড়কি লইয়া খেলা, পরে অনেক লোকে আক্রমণ করিলে লাঠি ঘুরাইয়া কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহার প্রদর্শনী। লোকগুলি খেলার নেশায় যেন মাতিয়া উঠিল: একটা লোককে হত্যা করার মত ভয়ঙ্কর কাজও যেন তাহাদের কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

ইহার পর আরম্ভ হইল লাঠির শক্তিপরীক্ষা। দুই দুই জন করিয়া জোড় মিলাইয়া শক্তিপরীক্ষা হইল। বিজয়ীদের ভিতর আবার জোড় মিলাইয়া শক্তি-পরীক্ষা হইল। দশ-জনের ভিতর যে সকলকে পরাস্ত করিল, সে গিয়া কাঞ্চনকে প্রণাম করিল। চারিদিক হইতে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, জয় যোগিনীমায়ের জয়।

কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর মা-কালীর উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম জানাইয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কালু-সর্দ্দারের পায়ের নিকট হইতে একটা তেলে পাকানো লাঠি তুলিয়া লইল। মুখে তাহার একটুও উত্তেজনা নাই।

দেবদাস ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন: একটা মানুষ মারিতে তাহাদের এত আয়োজন করিতে হয় কেন—অথবা ইহা কি উহাদের অন্য কোন উৎসব ?

আবার মহা-উদ্যমে ঢোল ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল, আর সেই বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া কাঞ্চন সেই বিজয়ী-খেলোয়াড়ের সঙ্গে লাঠি খেলিতে লাগিল। দেবদাস দেখিলেন, পা ফেলার ভঙ্গীতে, আঘাতের কৌশলে এবং দৃষ্টির প্রখরতায় কাঞ্চন লাঠিয়ালের মাথার মণি: জীবন সহজ হইলে, জাতি অভিন্ন হইলে, এ মণি দেবদাস গলায় পরিতেন।

ইহার পর শক্তি-পরীক্ষার খেলা! এ খেলা আর বেশীক্ষণ খেলিতে হইল না, দুই একটা প্যাঁচ খেলিবার পরই কাঞ্চনের লাঠির আঘাতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর লাঠি হাত হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। কালু-সর্দ্দারের মুখ হইতে বাহির হইল, —সাবাস্ বেটী!

চারিদিক হইতে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, জয় যোগিনী-মায়ের জয়, জয় যোগিনীমায়ের জয়, জয় যোগিনীমায়ের জয়!

পরাজিত বীর কাঞ্চনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

তারপর আরম্ভ হইল প্রণামের পালা। কালু সর্দ্দার ব্যতীত আর সকলেই একে একে আসিয়া কাঞ্চনকে প্রণাম করিয়া গেল, কাঞ্চন সকলের মাথায় হাত দিয়া প্রশান্তমুখে আশীর্ব্বাদ করিল।

*

সেদিন সন্ধ্যারতি শেষ হইলে মায়ের ঘরে দেবদাসকে লইয়া যাওয়া হইল। ঘরে তখন কালু সর্দ্দার ও কাঞ্চন ছাড়া আর কেহই ছিল না। দেওয়ালে একখান খড়্গধার খড়্গা ঝুলিতেছিল। কাঞ্চন পূজা সারিয়া সর্দ্দারের এক পাশে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া ছিল। দেবদাস তাকাইয়া দেখিলেন, কাঞ্চনের চোখমুখ ফুলিয়া গিয়াছে: হয় ত' একটু আগে সে কাঁদিয়াছে, দেবদাসের মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া হয় ত' সে বেদনা পাইয়াছে। যতই তাহাকে দেখিতেছেন ততই তাহাকে রহস্যময়ী বলিয়া মনে হইতেছে।

দেবদাসকে ঘরে আনা হইলেই কালু সর্দ্দার কাঞ্চনকে বলিলেন, মা তুমি এহোন এহান্‌তে' যাও, আমাগারে কথা আছে।

দেবদাসের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—বলির সঙ্গে কথা থাকা—আশার কথা।

কাঞ্চন চলিয়া গেলে কালু দেবদাসের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, তোমাগারে কার কি শাস্তি পাতি হবি—সে বিচার আমাগারে হয়ে গেছে—তা বোধ হয় জান ?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ।

—জান—তবু আর একবার ভাল করে জা'নে নাও তোমার ও দু'ডো লোকেরে আমরা দলে মিশায়ে নেব,—কেমন করে' তা নিতি হয়, তা আমরা জানি। আর তোমার ?—তোমার মায়ের এ্যাহানে বলি যা'তি হবি।

কথাটা শুনিয়া বীর দেবদাসেরও মুখখানা আবার নূতন করিয়া শুকাইয়া উঠিল, কালু সর্দ্দার তাহার ভয়াবহ মুখখানা হাসিয়া বিকট করিয়া বলিল—কিন্তু আমি তোমায় বাঁচায়ে দিতি পারি। দেবদাস জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

কালু সর্দ্দার বলিল, কি বাঁচতি চাও তুমি ?

– বাঁচতে আর কে না চায় ?

কালু সর্দ্দার সুদীর্ঘ পাকা গোঁফটা একটু নাড়িয়া বলিল, —হুঁ, কিন্তু তোমার বাঁচার দুডো পেস্তাব আছে,—তার এট্টা হচ্ছে—তুমি কাঞ্চনেরে বিয়ে করবা—

দেবদাসের মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল,—কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ!

বুড়ো কালুসর্দ্দার হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল; সে হাসি যেমন উৎকট, তেমনই ভয়ঙ্কর। হাসির শব্দে ঘরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। হাসি একটু থামিলে কালুসর্দ্দার বলিল, তুমি আমারে এমনি বোকা পাইছ, ঠাকুর, এ্যাঁ!

গলায় তোমার পইতে রইছে—সে কি আমি দেখি নি, অত বোকা হলি কি আর ডাকাতি করে মাথার চুল পাকাতি পারতাম ? তুমি বামুন—আমি নমঃশূদ্দুর, আমার মেয়েরে কি তোমার বিয়ে করতি বলতি পারি—অত অধম্ম করব আমি ? ডাকাতি করি বটে, কিন্তু অধম্ম করি নে, বুঝলে ঠাকুর—অধম্ম করলি কি আর এতদিন ধরা না পড়তাম ? তুমি কাঞ্চনকে বিয়ে করতি পার, কাঞ্চন বামুনের মেয়ে।

কাঞ্চন বামুনের মেয়ে ! উত্তেজনায় দেবদাস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় উঠিয়া বসিল। এত বড় শুভ সংবাদ বুঝি সে আর জীবনে শোনে নাই।

কাঞ্চন নিজে এ কথা জানে ?

কালুসর্দ্দার বলিল, আগে জানত না—কিন্তু ওর যখন বার বছর বয়স হ'ল, তখন আমি নিজেই জানায়ে দিছি। সেই থেহে ও নিজি পাক করে খায়, গেরুয়া পরে। আমি নিজি হাতে ওরে লাঠি খেলা শড়কি চালান শিহেইছি—এই এতো ত' আমার চেলাবেলা দেখতিছো, এক হীরু ছাড়া কেউ ওর লাঠির কাছে দাঁড়াতি পারে না, তুমি নিজি একবার পরখ করে দেখতি পার—বলিয়া কালু সর্দ্দার নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিল।

দেবদাসের মনটা যেন একটু স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিতেছিল।

শুধু এই গুণপনায় পাছে দেবদাসের মন না গলে, তাই সে প্রাণপণে বলিয়া চলিল, আর মা আমার র'াধে বাড়ে কি—ঠিক যেন অমেত্ত—একবার খালি তুমি আর ভুলতি পারবা না—হাজার হ'ক বড় ঘরের মেয়ে কি না ?

—কোথাকার মেয়ে—দেবদাস সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল।

কথাটা শুনিয়া কালুসর্দ্দারের মুখের ভাব মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল, দেবদাসের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল, সব খুলেই তোমার বলতিছি, তুমিও সব দিক হিসেব করেই কাজ কর, জান্ দেবা বা রাখবা ? মেয়ে ও বাড়িজ্জে ঘরের, ক'নকের ? তা' এখন তোমার বুললি আর দোষ কি—নিশ্চিন্দিপুরীর বাড়িজ্জে—ওগারে দরজায় হাতী বাঁধা থাকত, ওর বাবা আমাগারে দলের সাথে যুদ্ধ করে মারা যায়, কাঞ্চন তখন আতুড়-ঘরে, মা ভয়ে আর শোকে মুচ্ছা যায় সে মুচ্ছা আর ভাঙ্গে না,—কাঞ্চনকে তাই কুড়োয়ে নিয়ে আইছি—আর নিজে তাই ওর মা-বাবা হইছি—হাজার হ'ক ধম্ম আছে ত !

কালুসর্দ্দারের নৃশংসতার কথা শুনিয়া দেবদাস শিহরিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের প্রতি তাঁহার চিত্ত মমতায় ভরিয়া গেল।

কালুসর্দ্দার বলিয়া চলিল, এখানে মেয়েমানুষ নিয়ে কেউ থাকতি পারে না, তাই লুকোয়ে ওরে আমার পরিবারের কাছে নিয়ে গেলাম, আমার পরিবার তখন বাঁচে ছিল, সে ত' ওরে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পা'লো,—কিন্তু লোকে টের পা'য়ে যাতি পারে, তাই তারে কাঁদায়ে ওরে বনে আনেই মানুষ করিছি।

কালুসর্দ্দার একটু থামিয়া বলিল, মানুষ ও এখানেই হইছে বটে, পুরুষির মাঝে—কিন্তু কু-নজর ওরে কেউ দিতি পারে না—একজন দিছল তার শাস্তি পাইছে সে, কালু সর্দ্দার দেওয়ালে লম্বিত খড়্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, মায়ের ঐ খাঁড়া থাকতি সে সাহস আর কেউ পাবি নে। বলিয়া নিজের কৃতিত্বে নিজেই একটু হাসিল।

—এখানে ওরে সকলেই মা বুলে ডাকে, ভালবাসে, ছেদ্দা করে। দলডা আমি ওরেই দিয়ে যাব।

দেবদাস এখন কাঞ্চনের কথাই ভাবিতেছিলেন। তার দুর্ভাগ্যের কথা যতই ভাবেন, ততই দেবদাসের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে: এমন সুন্দরী পুত্র-বধূ পাইলে মা কত খুশী হইবেন, বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়, প্রজারা কত খুশী হইবে। ভগবান্ যাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাকে এমনি করিয়াই করেন। নিজের মুক্তির বিনিময়ে তাঁহাকে যাহা দিতে হইবে, তাহা তাঁহার পরম কাম্য ;—এর চেয়ে বড় আনন্দের কথা বুঝি তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

দেবদাস মনে মনে অনেক সুখের সৌধ গাঁথিয়া তুলিতেছিলেন, কিন্তু কালুসর্দ্দারের পরের কথায় তিনি বুঝিলেন—সৌধ গাঁথা হইয়াছে বালুর উপর।

কালুসর্দ্দার বলিল, এখন বোধ হয় বুঝতি পারিছো—কাঞ্চনকে বিয়ে করলি তোমার জাত যাবি নে ?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—হাঁ।

—কিন্তু আমার দ্বিতীয় পেস্তাব আছে, হেডাও শুনে

নাও···সেডা হচ্ছে—কাঞ্চনকে বিয়ে করে আমার দেওয়া টাকা-পয়সা নিয়ে তুমি এ বনে থে যাতি পারবা না।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া দেবদাস বলিলেন,—মানে!

ভ্রূ কুঁচকাইয়া কালুসর্দ্দার বলিল,—মানে! তুমি কি কচি ছাওয়াল না কি, মানে বুঝলে না, তোমারে এ বনেরথে' ছা'ড়ে দিলি আমরা বাঁচি না কি?

কথাটা শুনিয়া দেবদাস পাথর হইয়া গেল।

—কি, কথা কও না যে?

দেবদাস বলিলেন, এ কথা আমি ভেবে দেখি নি। এখানে থাকা মানে তোমাদের কাজে যোগদান করা—সে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পেলেও পারব না। আর—

আর দিয়ে কাজ নেই—কালুসর্দ্দার দুই চোখ পাকাইয়া বলিল, তুমি বড় চালাক ছাওয়াল—আমারে বাগে পাইছো—না? মরণ বাঁচায়ে তোমারে মেয়ে দিতি চাইছি—তাই ভাবিছ কিই না জানি হইছ!—তুমি ভাবিছ মেয়েরে আমি বাগে আন্‌তি পারব না—এত লোকের শাসন করি আমি—মেয়েরে আমি শাসন করতি পারব না—হা, হা হা কাল রাত্তিরি মেয়ে তোমার কাছে গিয়েল কি না—তাই তোমার বল বা'ড়ে গেছে—দেখ না কি করি আমি, আজ মেয়ের নমস্কারের দিন ছিল, তাই আজকের দিনডা ভিক্ষে দিলাম—কাল রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মত চাই—আজকের রাতটা ভাবতি দিলাম।···স্বীকার না করিলি যে ত্যাশে যায়ে রাজত্বি করতি পাবা—বা মার মুখ দেখতি পাবা—সেডা হবি নে—কাল রাত্তিরেই মার এখানে মাথা রাখতি হবি—তার চেয়ে বরং—যাক সে আর কি কবো—তুমিই ভাবে' ত্যাখো।

দেবদাস অতি স্থির কণ্ঠে বলিলেন, এতে আর আমার ভাববার কিছু নেই।

—তবু আজকের রাত ভাবতি দিলাম তোমার। বলিয়া দেবদাসের উপর হইতে দৃষ্টি অন্য দিকে সরাইয়া কালুসর্দ্দার হাঁকিল,—হীরে—হীরেলাল!

ছোট সর্দ্দার আসিয়া দাঁড়াইল।

—এডারে এখানথে' নিয়ে যাও, আমার যা বলবার তা আমি বুলিছি,—কাল সকালে শুধু ওর মতটা আনে' দেবা। যাও নিয়ে যাও।

ছোট সর্দ্দার আর দুই জন লোকের সাহায্যে দেবদাসকে সেখান হইতে লইয়া গেল।

*

কাঞ্চন পাশেই কোথায় লুকাইয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। উহারা চলিয়া গেলে আসিয়া কালুসর্দ্দারের কোলে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

কালুসর্দ্দার কাঞ্চনের পিঠে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া বলিতে লাগিল, ছি মা, অমন করতি নেই, তোর কাঁদা কি কোন দিন দেখিছি নে কি আমি,—দেখি কাল সকালে কি বোলে ও,—তুই কাঁদিস নে, তোর জন্যি ওর চেয়েও ভাল রাজপুত্তুর ধরে আনে' দেব আমি—

কিন্তু কাঞ্চনের বুঝি সে কথা কানেও ঢুকিল না।

*

পরদিন সন্ধ্যাকালে গড়ের মাঠে মা-কালীর ঘরের সমুখে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে: সেই বামুন জমিদারকে বলি দেওয়া হইবে।

দেবদাস এ বনে থাকিয়া ডাকাতি করিতে স্বীকার করে নাই, তার চেয়ে মৃত্যুও না কি ভাল!

ডাকাতরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে—লোকটা কি গোঁয়ার রে,—মরবি তউ জিদ্ ছাড়বি নে। কি লাভডা হ'ল শুনি? ফিরে যাতি পারল দেশে—মার কোলে?

ছোট সর্দ্দার বড় সর্দ্দার মায়ের ঘরের সমুখের রোয়াকে বসিয়া রহিয়াছে। ঘরটার সমুখ জবাফুল ও পাতা দিয়া সাজানো হইয়াছে।

কাঞ্চন স্নান করিয়া একখানা লাল বেনারসী পরিয়া পূজায় বসিয়াছে। বন্দী দেবদাসকে পাশে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তার চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একবার মায়ের মূর্ত্তি, একবার কাঞ্চন, একবার বাহিরের জনতার দিকে তাকাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই হেঁট হইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা লুকাইতেছেন।

সহসা কাঞ্চনের ইঙ্গিতে পূজাসাঙ্গের বাজনা আরম্ভ হইল। বাহিরের জনতা নরবলি দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। বেঁটেলোকটা খড়্গ হাতে করিয়া প্রস্তুত হইল, ছোট সর্দ্দারের আদেশে চারজন লোক বলি ধরিবার

জন্ম আগাইয়া গেল। অধীর জনতা আরও উন্মুখ হইয়া উঠিল।

কাঞ্চন হাতের ইঙ্গিতে দেবদাসের বন্ধন মোচন করিতে বলিল। দেবদাসের হাত-পায়ের বাঁধন খোলা হইল।

কাঞ্চন ইঙ্গিতেই লোকগুলিকে একটু সরিয়া যাইতে বলিল, লোকগুলি সরিয়া দাঁড়াইল।

কাঞ্চনের চোখ দু'টি অদ্ভুত দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে, লোকগুলি তাহা দেখিয়া মনে মনে মনে তাহার পায়ে মাথা নত করিল : যোগিনী মায়ের ভক্তির তুলনা নাই।

কাঞ্চন সেই অদ্ভুত দীপ্তিময় চোখে দেবদাসের দিকে চাহিয়া বলিল, এইবার তুমি মাকে প্রণাম করো ;

দেবদাস মন্ত্রমুগ্ধের মত কাঞ্চনের আদেশ পালন করিল। কাঞ্চন একটা জবাফুলের মালা হাতে লইয়া দেবদাসকে আদেশ করিল, এইবার উঠে হাঁটু গাড়ে বসো।

দেবদাস জানু পাতিয়া বসিল।

এইবার কাঞ্চন জবাফুলের মালাটা দেবদাসের গলায় পরাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের গলাটা আগাইয়া দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ওটা আমার গলায় পরায়ে দাও।

কাঞ্চনের চোখের দিকে চাহিয়া দেবদাস কি দেখিল কে জানে, অথবা তাহার কণ্ঠের আদেশেই কি মোহ ছিল,—দেবদাস যন্ত্র-চালিতের মত মালাটা কাঞ্চনের গলায় পরাইয়া দিল।

উপস্থিত সমস্ত লোক এই আকস্মিক ঘটনায় প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর নিকটে ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিতে লাগিল, কি হ'ল, কি হ'ল—কি সব্বোনাশ !

কালুসর্দ্দার প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। চকিতের জন্ম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঞ্চনের মুখে লালিমা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। আশে পাশে কেহ যেন উপস্থিত নাই, সে যেন একা তাহার পরমপ্রিয় ও চির-পরিচিত স্বামীর কাছে রহিয়াছে, এমনি ভাবে দেবদাসের হাত ধরিয়া বলিল। এইবার আবার মাকে প্রণাম করো। বলিয়া নিজেও দেবদাসের সঙ্গে এক সাথে মায়ের কাছে মাথা নত করিল।

দেবদাস বুঝিতে পারিতেছিল, কাঞ্চনের মনে কি সংগ্রাম চলিতেছে। যাহাদের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, যে দুর্দ্দান্ত কালুসর্দ্দারকে সে বাবা বলিয়া ডাকে, তাহাদের সম্মুখে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে এ ভাবে দেবদাসের সঙ্গে নিজের চিরন্তন সম্পর্ক-স্থাপনের ভূমিকা ঘোষণা করা তাহার পক্ষে কত কঠিন কাজ! কেবল তাহাই নহে, মেয়ের মত যত স্নেহই কালু সর্দ্দার তাহাকে করুক, সে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির কঠোর-হৃদয় ডাকাতের সর্দ্দার, আকস্মিক ক্রোধের বশে সে যে কি করিয়া বসিবে, তাহাও কাঞ্চনের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।

সকলে গোলমাল করিতেছিল। পাশাপাশি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মাথা তুলিবার আগে অত্যন্ত মৃদুস্বরে দেবদাস বলিল,—কেন এমন করলে ?

কাঞ্চনও তেমনি মৃদুস্বরে জবাব দিল,—জাবাব তো দিচ্ছি।

প্রণাম শেষ করিয়া কাঞ্চন দেবদাসের হাত ধরিয়াই কালু-সর্দ্দারের কাছে আগাইয়া গেল। কালুসর্দ্দারের স্থির দৃষ্টি-পাতেও তাহার দৃষ্টি নত হইল না। মনে হইল মুখখানি যেন কাঞ্চনের বিষণ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই বিষণ্নতার মধ্যেও সে একটু হাসিল।

—এবারে আমারে বলি দিতি পারো বাবা। আগে আমারে দিতি হবি।

কালুসর্দ্দারের যেন চমক ভাঙ্গিল।

—আর কি তাই পারি মা ? তোর কাছে চিরডা কাল হার মানিছি।

তারপর সমবেত জনতার দিকে ফিরিয়া কালুসর্দ্দার কি যেন ইঙ্গিত করিল। জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, জয় যোগিনী মায়ের জয় !

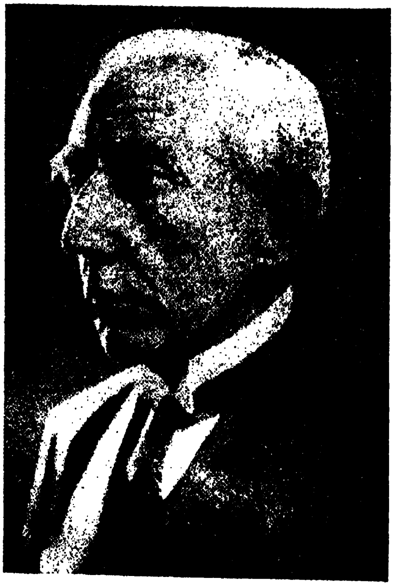
চতুষ্পাঠী

দুর্গম পথের যাত্রী

§ রোয়াল্‌ড্ আমুন্‌ড্‌সেন

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পুরাকালে নরওয়ে দেশে এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাদের 'ভাইকিং' বলত।



নরওয়ের সুবিখ্যাত মেরু-অভিযানকারী রোয়াল্‌ড্ আমুনড্‌সেন।

সমুদ্রের তরঙ্গে ছিল তাদের ঘর, ঝড় ছিল তাদের সাথী।

যখন তারা বৃদ্ধ হত, তখন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় ঘরে তারা বসে থাকতে পারত না। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় নিকট হয়েছে জানতে পারলেই, একদিন তুমুল ঝড়ের মধ্যে, সমুদ্রে যখন ঢেউ পাগল হয়ে নাচতে থাকত, তারা ছোট্ট একখানি নৌকা নিয়ে তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়ত,—হাতে থাকত চিরজীবনের সঙ্গী খোলা তলোয়ার, বুকে থাকত লোহার বর্ম্ম আঁটা,—পায়ের তলায় নাচত সমুদ্র, মাথার উপরে ডাকত বাজ, সেই নির্জ্জন, ভয়ঙ্কর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তারা নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিত।

এ হ'ল বহুকাল আগেকার কথা।

আজ 'ভাইকিং'রা নরওয়ের সমুদ্র-উপকূল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মা এখনও মাঝে মাঝে কোন কোন নরওয়েবাসীর মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের পরবশ জীবনে জানিয়ে দিয়ে যায় যে, সেই আদিম মানব-মন এখনও বেঁচে আছে, একা বেঁচে আছে সেই ভয়হীন মানুষের মন, একদা বিনা আয়ুধে বিনা-বিজ্ঞানে যা নগ্ন-দেহ নিঃসম্বল মানুষকে সমগ্র প্রাণি-রাজ্যের সিংহাসনে বিজয়ী করে বসিয়েছিল।

রোয়াল্‌ড্ আমুন্‌ড্‌সেন হলেন নরওয়ের শেষ ভাইকিং। পুরাকালের ভাইকিংদের ডাকত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, আমুন্‌ড্‌সেনকে ডেকেছিল মৃত্যু-হিম মেরু-তুহিন। সেই দিগন্ত-বিস্তৃত নিষ্কলঙ্ক মেরু-শুভ্রতার মধ্যে আমুন্‌ড্‌সেনের



স্যর উইলিয়াম প্যারীর অভিযানকারী দল ঃ নর্থ-ওয়েষ্ট প্যাসেজের অনুসন্ধান করিতেছেন।

আত্মা মিশিয়ে আছে। দক্ষিণ-মেরুতে আছে তাঁর প্রথম পদরেখা, উত্তর-মেরুতে আছে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস।

দূর-দুর্গমতার আহ্বান রক্তের সঙ্গে নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ (১৮৭২) করেছিলেন। তাঁর বাবা বোট তৈরী করতেন। তাতেই তাঁদের সংসার চলত।

ছেলেবেলা থেকেই মেরু-অভিযানের কাহিনীগুলি বালক আমুনড্‌সেন তন্ময় হয়ে পড়ত। মনে মনে বালক স্যর জন ফ্রাঙ্কলিনকে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষ বলে বরণ করে নিয়েছিল। তখন কে জানত এই বালকই একদিন



এণ্টার্টিকের ৯০০ মাইল উত্তরে একটি বিরাট ভাসমান বরফ-স্তূপ।

ফ্রাঙ্কলিনের অসমাপ্ত কাজকে সার্থক করে তুলবে! মেরু-সমুদ্রে ফ্রাঙ্কলিনের তিরোধানের সকরুণ কাহিনী বালকের মনকে অভিভূত করে তুলত।

তারা * দেখেছে চোদ্দ দিন ধরে, অবিরাম অবিরত ছায়াহীন রাত্রি-দিনের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছেদ চলেছে লক্ষ লক্ষ পেঙ্গুইন পাখীর দল! কোথায় সেই পেঙ্গুইন পাখীর জন-হীন বরফের দেশ? কোন মানুষের পায়ের দাগ এখনও সেখানে পড়েনি! আভেলাঁস্ ঠেলে মানুষ কি খুঁজে পাবে না সেখানে পৌঁছবার পথ? কোন্ দেশের পতাকা সেখানে উড়বে প্রথম? কে সে বীর, যার পায়ের দা[গ] প্রথম পড়বে সেই হিম-মৃত্যুর বুকে?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বালকের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বালকের যখন মাত্র চোদ্দ বছর বয়স, সেই সময় তার বাবা মারা গেলেন। প্রাণপণ চেষ্টা এবং কষ্ট স্বীকার করে বিধবা জননী ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবার আয়োজন করলেন। কিন্তু ডাক্তার হবার কো[ন] বিশেষ আগ্রহ ছেলের মধ্যে দেখা গেল না। ছেলে[র] একমাত্র কাজ "শী" চড়ে বরফের উপর দিয়ে ছোটা এবং শীতের মধ্যে বরফের মধ্যে ঘরের বাইরে অষ্ট-প্রহর থাকা। এইভাবে প্রথম যৌবন থেকেই আমুনড্‌সেন শীত আর বরফের মধ্যে নিজেকে শক্ত করে গড়ে তুলতে লাগলেন—মনে তখ[ন] থেকেই তাঁর দুর্ব্বার বাসনা, স্যর জন ফ্রাঙ্কলিন যে-পথ খুঁজে পান নি, আভালাঁসের পাহাড় এড়িয়ে সেই পথ তিনি খুঁজে বার করবেন।

জীবনের প্রথম পরীক্ষা রূপে তিনি ঠিক করলেন ভরা শীতে পায়ে হেঁটে অস্‌লো থেকে বারগেন্ যাবেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র উপকূ[ল] পর্য্যন্ত সমস্ত দেশটা পায়ে হাঁটবেন। একজন সঙ্গীও জুটে গেল। দুঃসাহসের প্রথম স্বাদ প্রথম অভিজ্ঞতাতে পেতে হল। সেই তুষার-রাজ্যের মধ্যে তাঁরা প[থ] হারিয়ে ফেললেন। চার দিন অনাহারে সেই নিদারু[ণ] শীত আর তুষারের মধ্যে চলে আসার পর তাঁরা বার্‌গেনে এসে পৌঁছলেন। এই চার দিন অনাহা[রে] তাঁরা যে কি করে কাটালেন, তা তাঁদের কাছে বিস্ময়কর লেগেছিল।

সেই চারদিনের অনাহারে হ'ল মেরু-পথের প্রথম দীক্ষা

* সাদার্ণ ক্রস পার্টি (Southern Cross Party)

কুড়ি বছর বয়সে তাঁর সংসারের একমাত্র বন্ধন, তাঁর মা পরলোক গমন করলেন। মার ইচ্ছা এবং পীড়াপীড়িতেই তিনি ডাক্তারী পড়ছিলেন, মার মৃত্যুর পর তা ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়েই তাঁর প্রথম ঝোঁক হল, নাবিকের কাজ শেখা। খুঁজে খুঁজে দক্ষিণ মেরু-সাগরযাত্রী এক জাহাজে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাবিকের সার্টিফিকেট অর্জ্জন করলেন; সেই সঙ্গে মেরু-সাগরের সঙ্গেও সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হলেন। সেদিন সে জাহাজে কেউ কল্পনাও করেনি যে, সেই সামান্য শিক্ষানবীশ ছেলেটির দৃষ্টি ছিল মেরু-সাগরের এক অপরতীরে পেঙ্গুইন পদ-রেখা অঙ্কিত তুষার-ভূমির দিকে।

পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনে একটা বড় সুযোগ এল। সেই সময় নরওয়ে থেকে বেলজিকা জাহাজে ডি গার্‌লাচির (De Garlache) অধীনে দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের জন্যে একটা অভিযান যাচ্ছিল। আমুন্ড্‌সেন বেল্‌জিকার প্রথম "মেট্" হলেন। সেই জাহাজে আর্কটউস্কী প্রভৃতি সেই সময়কার বড় বড় মেরু-আবিষ্কারকেরা ছিলেন। আমুন্ড্‌সেন সেই সুযোগে তাঁদের সঙ্গে পরিচিতও হলেন।

কিন্তু এই অভিযান বিশেষ সফল হল না। দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের গ্রাহাম ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত গিয়ে তাঁরা বরফে আটকা পড়ে গেলেন। সেইখানে সেই অবস্থায় তাঁদের এক বছর কাটাতে হয়। তারপর তাঁরা ফিরে আসেন। অভিযান ব্যর্থ হলেও, সেই জাহাজের একজন নাবিকের কাছে সেই অভিযানের বিশেষ সার্থকতা ছিল। সেই



বরফের দেশের পোষাক পরা আমুন্ড্‌সেন, অদূরে তাঁর জাহাজ 'দি ফ্রাম' : এই জাহাজে আমুন্ড্‌সেন মেরু-সাগরে অভিযান করিয়াছিলেন।

প্রথম, আমুন্ড্‌সেন তুষারাচ্ছন্ন ছেদ-হীন দীর্ঘ মেরু-রাত্রির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

তাঁর উদগ্রীব মন শুধু ভাবছিল,—কবে, কবে আসবে তাঁর লগ্ন? তারই অপেক্ষায় তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে

তৈরী করে তুলছিলেন।

এই সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি দক্ষিণ-মেরু থেকে একেবারে উত্তর মেরু-সাগরে গিয়ে পড়ল। এখানে একটু ভূমিকা করা দরকার।

মেরু-আবিষ্কারের ইতিহাসে নর্থ-ওয়েষ্ট প্যাসেজ বলে একটা সমুদ্র-পথের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। প্রায় চারশ বছর ধরে য়ুরোপের নাবিকেরা উত্তর-য়ুরোপ থেকে সোজা পশ্চিম-দিকে গিয়ে উত্তর-আমেরিকার উত্তর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আসবার সমুদ্র-পথ খুঁজছিল। এই সমুদ্র-পথকেই বলে নর্থ-ওয়েষ্ট প্যাসেজ,—এই সমুদ্র-পথের মত দুর্গম সমুদ্র-পথ আর নেই বললেই হয়। তবুও



স্যর জন ফ্রাঙ্কলীন ও তাঁর সহচরদের শেষ বিশ্রাম-স্থান।

এই পথ খুঁজে বার করবার জন্যে উত্তর-মেরুর সমুদ্র-পথে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। এই পথ খুঁজতেই স্যর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর লোক-জন সমেত মেরু-সাগরে অদৃশ্য হয়ে যান। আবিষ্কারের ইতিহাসে সে এক অতি সকরুণ কাহিনী।

আমুনড্‌সেন ঠিক করলেন যে, মেরু-সাগরের মধ্য থেকে তিনি সেই উত্তর-পশ্চিম পথ খুঁজে বার করবেন। কিন্তু চারশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের নাবিকেরা লোক-জন সহায়-সম্বল নিয়ে যা প্যরে নি, তিনি একা নিঃসম্বল অবস্থায় কেমন করে তা পারবেন? তার উপর আর একটা বিশেষ কথা ছিল যে, চুম্বক-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলে মেরু-সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। কিন্তু কে তাঁকে শেখাবে?

অনেক কষ্টে তিনি ন্যান্‌সেনকে ধরলেন। কিন্তু কিউ অব্‌জারভেটরী তাঁকে শিক্ষা দিতে রাজী হল না! সেখান থেকে বিফল-মনোরথ হয়ে তিনি পোষ্টডামে চেষ্টা করলেন এবং সেইখান থেকেই তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় বিদ্যা আয়ত্ত করলেন।

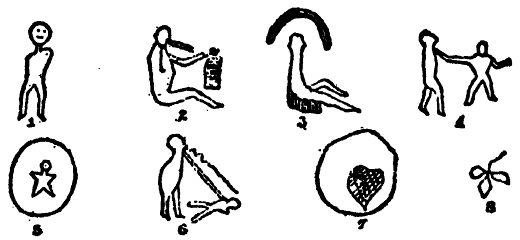
তা না হয় হল, কিন্তু মেরু-সাগরে যাবার মত জাহাজ কোথায়? অত ভাল জাহাজ ভাইকিং-এর না হলেও চলে! মাত্র পঞ্চাশ টনের একখানি মাছ-ধরা জেলে-নৌকো পুরাণো অবস্থায় পড়ে ছিল। সেইটে তিনি টাকা ধার করে অল্প দামে কিনে নিলেন। তারপর সেটাকে নিজের হাতে মেরামত করে নিলেন। সেই তো হ'ল তাঁর জাত ব্যবসা!

সঙ্গী যাঁদের পেলেন, তাঁরাও ঠিক তাঁরই মত দুর্দ্দান্ত উন্মাদ! পুরো ভাইকিংদের বংশধর সব!

এই সামান্য আয়োজন করে ১৯০৩ সালে আমুনড্‌সেন উত্তর-মেরু সাগরের দিকে যাত্রা করলেন, উত্তর-পশ্চিম-পথ খুঁজে বার করতে—যে-পথ চারশ বছরের চেষ্টাকে বারে বারে ব্যর্থ করে আভালাঁসের দুর্গমতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

প্রথমে ফ্রাঙ্কলিনের পথ অনুসরণ করে তিনি চলতে লাগলেন। ক্রমশঃ ফ্রাঙ্কলিনের সীমানা ছাড়িয়ে "ব্যাফিন বে"র মধ্য দিয়ে, ল্যাঙ্কাষ্টার সাউণ্ড এবং ব্যারো ষ্ট্রেটের ভিতর দিয়ে, ক্ল লা রোকেয়েৎ দ্বীপের ধার দিয়ে উত্তর-মেরুকে পাশ কাটিয়ে তিনি সিম্প্‌সন্ ষ্ট্রেটে এসে নোঙ্গর ফেললেন। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। শীতে চারিদিক জমে বরফ হয়ে আসছে! শীত কাটাবার জন্যে বাধ্য হয়ে তাঁকে সেখানে থাকতে হল। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'বৎসর তিনি সেখানে আটক পড়ে থাকেন। তারপর ১৯০৫

সালের আগষ্ট মাসে তিনি আবার যাত্রা করেন। "ম্যাকেঞ্জী বে"র ধারে "কিঙ্‌ পয়েন্ট" পর্য্যন্ত যেতে না যেতেই আবার এসে গেল শীত। বাধ্য হয়ে সেখানে আটকে যেতে হ'ল।



১নং ছবি : ইণ্ডিয়ানদের ভালবাসার গান।

কিন্তু এবার তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে থেকেই তিনি একটা স্লেজ-পার্টি গড়ে তুললেন। স্লেজে করে তাঁরা ১৫০০ মাইল দূরে আলাস্কার ঈগল সিটীতে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এলেন।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে আবার অভিযান সুরু হ'ল। নানা বিপদ এবং অভাবনীয় সব দৈব আক্রমণের হাত এড়িয়ে ১১০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, তাঁরা ১৯০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর "বেরিং ষ্ট্রেট" পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। চারশ বছর ধরে যে পথ খোঁজা হচ্ছিল, সে-পথের দিশা সেদিন পাওয়া গেল!

সেখান থেকে আমুন্‌ড্‌সেন আমেরিকাতে ফিরলেন। উত্তর-পশ্চিম-পথের সন্ধান দাতা-রূপে আমুন্‌ড্‌সেনের নাম জগতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি টাকা রোজগার করতে লাগলেন। সেই টাকাতে তিনি সব ধার শোধ দিলেন। আমেরিকা ছেড়ে চলে আসবার সময়, যে জাহাজে উত্তর-পশ্চিম পথ পার হয়েছিলেন, সে জাহাজখানি তিনি রেখে আসেন।

আজও পর্য্যন্ত সান্‌ ফ্রান্‌সিস্‌কোর গোল্ডেন গেট্‌ পার্কে এই ঐতিহাসিক কীর্ত্তির স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ সেই জাহাজখানি সংরক্ষিত রয়েছে।

ছবির ভাষা

অক্ষরের সাহায্যে আমরা আমাদের মনের কথা প্রকাশ করি, বই লিখি, লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি।

কিন্তু চিরকাল এরকম ছিল না। ছোট ছেলে যখন জন্মায়, তার অক্ষরজ্ঞান থাকে না। শুনে, শিখে, তার অক্ষরজ্ঞান জন্মায়।

সভ্য মানুষের অক্ষরজ্ঞান জন্মাতে অনেক সময় লেগেছিল। তার আগে মানুষ ইসারায়, ইঙ্গিতে এবং ছবির আঁকে মনের কথা বোঝাত। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও এই ইসারার এবং ছবির ভাষা প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। পাশের ১ নং ছবিটি হ'ল রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি ভালবাসার গান, আর ২ নং ছবিটি হ'ল তাদের যুদ্ধ-সঙ্গীত।

২নং ছবিতে ছ'টি আলাদা আলাদা ছবি রয়েছে। প্রথম ছবি হল স্বয়ং যোদ্ধার তার দেহে রয়েছে ডানা, তার মানে হ'ল, তার কামনা এই যে যেন তার দেহ পাখীর মত দ্রুতগামী হতে পারে; দ্বিতীয় ছবিতে সে সকাল-বেলার তারার নীচে দাঁড়িয়ে আছে; তৃতীয় ছবিতে ঠিক আকাশের মাঝখান দিয়ে সে তার যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে চলেছে; চতুর্থ ছবি হ'ল যুদ্ধ-ক্ষেত্র, মাথার উপরে শকুন উড়ছে; পঞ্চম ছবিতে সে যুদ্ধে নিহত হয়েছে; ষষ্ঠ ছবিতে তার আত্মা প্রেতমূর্ত্তি গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে, কারণ সে যুদ্ধে মরেছে।

৩নং ছবিখানি একদল রেড ইণ্ডিয়ান যুক্ত-রাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে তাদের আবেদন স্বরূপ পাঠায়।



২নং ছবি : ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধসঙ্গীত।

এই ছবির সাহায্যে তারা আবেদন জানিয়েছিল যে, লেক সুপিরিওরে তাদের মাছ ধরবার অধিকার থেকে তাদের যেন বঞ্চিত না করা হয়। ছবিতে যে-সব জীব-জন্তু দেখা যাচ্ছে, সেগুলো হ'ল যে-সব

সম্প্রদায় আবেদন করেছে, তাদের নাম। তাদের সম্প্রদায়ের সেই হল চিহ্ন। ছবিতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, প্রত্যেক জন্তুর চোখ এবং বুক থেকে



৩নং ছবি : যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে ইণ্ডিয়ানদের প্রেরিত আবেদন পত্র।

লাইন বেরিয়ে প্রথম যে জন্তু রয়েছে তার চোখ আর বুকে গিয়ে মিশেছে। অর্থাৎ তাদের যে দলপতি, তার সঙ্গে তারা একমত। যে জন্তুটি দলপতির চিহ্ন, তার চোখ থেকে একটা লাইন হ্রদে এসে পড়েছে, আর একটা গিয়েছে কংগ্রেসের দিকে। অর্থাৎ দলপতি কংগ্রেসের কাছ থেকে তার সম্প্রদায়ের সকল লোকের জন্যে সেই হ্রদ ব্যবহার করবার অধিকার চায়।

৪নং ছবিখানি একখানি মজার ইস্তাহার। ১৮১৬ সালে তাসমানিয়া দ্বীপের গভর্ণর মিঃ ডেভে সেখানকার আদিম লোকদের একটা দরকারী বিষয় বোঝাবার জন্যে এই ছবিটি আঁকিয়েছিলেন। এই ছবির ভাষার উদ্দেশ্য হ'ল, সেখানকার আদিম লোকদের বোঝান যে গভর্ণরের কাছে শাদা আর কালো লোকের কোনও তফাৎ নেই। কালো লোকেরা, অর্থাৎ সেখানকার আদিম অধিবাসীরা যদি কোন অন্যায় কাজ করে, তার যেমন সাজা হবে, কোন শাদা লোকও যদি সেই অপরাধ করে, তারও তেমনি সাজা হবে। প্রথম ছবিতে দেখান হচ্ছে, একজন শাদা লোক এবং এক জন কালো লোক গলা ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে; একটি কালো ছেলে একজন শাদা ছেলের সঙ্গে খেলা করছে; কালো মেয়ের কোলে শাদা মেয়ের ছেলে; শাদা মেয়েটির কোলে কালো মেয়েটির ছেলে। অর্থাৎ শাসকেরা চায়, তারা মিলে মিশে বাস করুক। তার তলার ছবিতেও তাই দেখান হয়েছে। উপরের দিক থেকে তৃতীয় ছবিতে দেখান হচ্ছে যে, একজন কালো লোক বর্শা দিয়ে একজন শাদা লোককে মেরে ফেলেছে—বিচারে তার ফাঁসি হ'ল।



৪নং ছবি : এই ছবির সাহায্যে টাসমানিয়ার নেটিভদের জানান হয়েছিল—সরকারের কাছে সাদা-কালোর প্রভেদ নেই।

তার নীচের ছবিতে দেখান হয়েছে যে, একজন শাদা লোক গুলি করে একজন কালো লোককে মেরে ফেলায়, তারও ঠিক সেই রকম সাজা হয়েছে।

স্বর্গভ্রষ্ট

—শ্রীবিনয় চৌধুরী

উঠানে একপাক ঘুরিয়া অমল রান্নাঘরের দিকে আগা-য়া আসিয়া হাঁক দিল—"কি রে হ'ল তোর ?"

অমি দাওয়ায় বসিয়া চা তৈরী করিতেছিল, পেয়ালায় া ঢালিতে ঢালিতে বলিল: "এই হ'ল, দাও বললে ার তর সয় না তোমার একেবারে।" তারপর হাত াড়াইয়া পেয়ালাটা অমলের দিকে ধরিয়া দিয়া বলিল, ং হয়নি যেন তেমন, না দাদা ?"

চায়ে একটা চুমুক দিয়া অমল ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, ্যগ্যতা তোমার! এমন সুন্দর চা, তোর হাতে পড়ে একে-ারে যাচ্ছেতাই হয়েছে,"—বলিয়া পর পর বার কতক ুক দিল পেয়ালায়।

চা তৈরী করিয়া দাদার কাছে প্রশংসা পাইবার বড় াত অমির। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ভাল য়নি দাদা আজ চা ?" বলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া হিল অমলের মুখের দিকে।

অমল জবাব দিবার আগে বাহিরে বুড়া তারিণী াড়ুজ্জের গলা শোনা গেল, "অমল আছিস না কি া, অমল ?" শুনিয়া অমি একবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া াখ নাচাইয়া ঘাড় বাঁকাইল,ভাবটা এই—বুড়া আসিয়াছে াদা এতক্ষণে। অমল হাসিয়া দরজার দিকে অগ্রসর ইয়া বলিল, "আসুন দাদামশাই, আসুন।"

"চা খাওয়া হয়ে গেছে না কি রে তোদের ?" বলিতে লিতে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয় বুড়া। একমাথা াদা চুল, দীর্ঘ মজবুত শরীর, গায়ে একটা পুরাতন গলাবন্ধ াট, কোটের উপর কাঁধে ঝুলানো একখানা এণ্ডির দর, কাপড়ের কোঁচা তুলিয়া কোমরে গুঁজিয়া দেওয়া, ায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, ছিঁড়িয়া গিয়া দু'পায়ে একটি করিয়া াঙুল বাহির হইয়া আছে, হাতে একটা পিতলের পাত-াড়া মোটা কাঠের লাঠি। লাঠিতে কিন্তু ভর দেয় না া, দু'হাত পিছনে লইয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া সামনে একটু ঝুঁকিয়া ডান দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়ে তারিণী চলিবার সময়। এমনই দেখিতেছে অমল বুড়াকে চির-কাল। একবার রান্নাঘরের দাওয়ায় চায়ের সরঞ্জামগুলির দিকে, একবার অমল ও অমির মুখের দিকে তাকাইয়া বুড়া বলিল "চা কি 'দি এণ্ড, ঐ শেষ' না কি রে অমি ?" দাদা-মশাই এমনি কথার মাঝে মাঝে ফার্ষ্ট বুকের বুকনি আও-ড়ায়। শুনিয়া অমি হাসিয়া কুটিকুটি হয়।

"শেষ কি বলেন দাদামশাই, এই ত আরম্ভ", অমল বলে। তারপর বোনের দিকে ফিরিয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করে, বুড়ার জন্য চা করিয়াছে কি না। অমল বাড়ী আসিলে তারিণী দাদামশাই প্রায় রোজই আসে চা খাইবার সময়—বুড়ার একটু চায়ের নেশা আছে—অমলের কলিকাতা হইতে আনা চা খুব তারিফ করিয়া খায় বুড়া। দাদামশাই-এর জন্য তাই এক কাপ চা দু'বেলাই তৈরী হয় এ-বাড়ী, আসিতে দেরী হইলে দাদামশাইকে গিয়া ডাকিয়াও আনে অমল।

উঠানে একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া অমি বলিল, "বসুন দাদামশাই, দিচ্ছি আপনাকে চা ছেঁকে এনে।"

পিঁড়ির উপর বসিয়া বুড়া মাটিতে রাখিয়া দিল লাঠিটা। তারপর চা আনিয়া দিলে কাপে একটা চুমুক দিয়া জিহ্বা ও তালুতে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিল তারিণী দাদা-মশাই, তারপর কাপটা পিঁড়ির এক কোণে রাখিয়া বলিল, "খাসা চা আনিস তুই অমল। আমাদের হীরু চা বিক্রি করে এখানে, রামঃ, সে আবার চা। এইবার যাব যখন কলকাতায়। দিস্ ত দাদা আমাকে খানিকটা, নিয়ে আসব। আর এনেই বা কি করব, তোদের দিদিমা পারে না জুত করতে। অমি যা বানায় একেবারে অমৃত, বুঝলি অমল, চা তৈরী করে দিয়েই ও বশ করে ফেলবে নাতজামাইকে, কি বলিস্ ?"

অমি মুখ বাঁকাইয়া বলে, "হাঁ ফেলবে, যান্।"

কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে পেয়ালাটা নিঃশেষ করিয়া বুড়ো বলে, "বুঝলে অমল, দি ওল্ডম্যান হ্যাজ ডান হিজ ওয়ার্ক, বুড়ো বয়সে চা-টা আসটা বড় উপকারী সর্দ্দি-টর্দ্দির পক্ষে, কি বল ?"

বুড়া এমনি একটা না একটা ছুতা দেখাইয়া নিত্য চা খাইতে আসার হীনতাটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করে।

প্রাচীরের কোলে শিউলি ফুলের গাছটা হেলিয়া পড়িয়াছে, অমির ছোট বিড়ালটা তাতে চড়িয়া নখ দিয়া গাছের ছাল আঁচড়াইতেছে, এক একবার নামিয়া আসিয়া তলায় বিছানো শিশিরভেজা ফুলের উপর আলগোছে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তখনি গাছে উঠিতেছে তর তর করিয়া। মাঝপথে ঘাড় ফিরাইয়া বিড়ালটা নীচের দিকে একবার চাহিয়া দেখে। অমল বুড়ার কথার জবাব দিতে পারে নাই। অন্যমনস্ক হইয়া বিড়ালটিকে দেখিতেছিল।

দাদামশাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ যাবি না অমল বাড়ী থেকে ? ছুটি ফুরিয়ে গেল এরই মধ্যে ?"

"হাঁ দাদামশাই, আজই যাব।"

"খাওয়া দাওয়া করে ত যাবি, আসব'খন তখন একবার।" লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বুড়া চলিয়া গেল।

কার্ত্তিক মাসের সকাল। উঠানে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের আমেজ-লাগা সকাল বেলাকার রৌদ্রটুকু বেশ লাগে এই সময়টা। অমল বারকতক এধার ওধার করিয়া বেড়াইল উঠানে, কি ভাবিতে ভাবিতে। হঠাৎ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল এক সময়, "মা কোথায় রে অমি ?"

"কি জানি, গোয়ালের দিকে ত গিয়েছে, গাই নাওয়াচ্ছে বোধ হয়।"

অমল দরজা পার হইয়া পায়ে পায়ে ওধারে আগাইয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে বাড়ী ঢুকিয়া অমল দেখিল, তাদের পুরাণ চাকর জোগু, একটা থলের মধ্যে রাজ্যের জিনিষপত্র পুরিয়া সেটার মুখ সেলাই করিয়া বাঁধিতেছে, কতকগুলা তালের আঁটি পাশে পড়িয়া। ওগুলাও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে না কি অমলকে ? মাকে ডাকিয়া বলিল, "এ সব কি কাণ্ড করছ মা ?"

অমলের মা সবে স্নান করিয়া আসিয়াছিলে বলিলেন, "কাণ্ডটা আবার কি হ'ল ?" তালের আঁটি গু দেখিয়া বলিলেন "ঐ সব ? রেখেছিল অমি ওগুে তোর জন্যে, দিতে ভুলে গিয়েছিল আগের বার ; নি যা, খাস্ কলকতায় গিয়ে।"

"কি মুসকিল" অমল বলিল, "এই সব বনবাদাড় নি যেতে হবে কলকাতায় ?"

"কেন, কি হয়েছে তাতে ? বাড়ী থাকিস্ নে, কি যদি মুখে দিতে চায় মেয়েটা। বলে, দাদা বাড়ী এ তখন খাব। রেখে গেলে ও কি আর জীবনে ছোঁ কোনদিন ওসব ? নিয়ে যা বাপু—"

অমি তখন রাঁধিতেছিলাম রান্নাঘরে। মার ক শুনিয়া লজ্জা পাইয়া সেখান হইতেই বলিল, "আহা হ কবে আবার বলিছি তোমাকে ঐ সব কথা ? মার য সব ইয়ে—নিজের ছেলে কি না, তাই মিথ্যে মিথ্যে ক লাগানো হচ্ছে আমার নামে।"

অমলের মা হাসিয়া বলেন, "মিথ্যে করে লাগাচ্ছি এ সব এনে দিলে কে তবে ? আমি ত ভুলেই গিছলা একদম, কি যে মন হয়েছে আজকাল !"

মার কথা কাণে না তুলিয়াই অমি বকিয়া যায়, "উ ভারী তো ঐ কটা জিনিষ, তাও দিয়ে আসবে বয়ে অ লোকে, তাতেই ছেলের রাগ ছাখ না ? খেলে পে যাবে যেন আমার ? না নিয়ে যায় ত বয়ে গেল, আ কখ্খনো কিছু রাখব না দাদার জন্যে।"

ভারী ঝগড়াটে মেয়ে অমি আর বড় বেশী ব আবোল-তাবোল। কথা শুনিয়া অমল হাসিয়া ফেলি মাও হাসিলেন। পূজার ছুটির শেষে অমল আ কলিকাতায় যাইবে। সঙ্গে করিয়া কিছু লইতে অমলে যত আপত্তি। নিরুপায় হইয়া শেষে বলিল, "থলে নি যায় না কি কেউ কলকাতায় ? রাখব নিয়ে কোথা গিয়ে ?"

মা বলেন, "কত লোকে যায়। আসবি ত আবার বড় দিনের বন্ধে, তখন না হয় রেখে যাস্ থলে ছুটো শীতকালে তখন কত নতুন জিনিষ উঠবে কলকাতা ছোট বোনটার জন্তে আনিস কিছু কিছু থলের করে।"

ঝার কথা শেষ করিতে দেয় না অমি, ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া ওঠে, "না, আনতে হবে না কিছু আমার জন্তে। বড় বাবু হয়ে উঠেছ কিন্তু তুমি দাদা, একটা জিনিষ হাতে করে নিতে মান যায় একেবারে। কলকাতায় আর কেউ থাকে না, না? এত বাবু কেউ না তা বলে' তোমার মত। নিয়ে যাও ওগুলো।"

অমল রাগ করিবে, না হাসিবে? এতটুকু মেয়ে অমি, তার চেয়ে কত ছোট, যাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে এক রকম, দাদার মতামত আর শাসনের একান্ত অনুবর্ত্তিনী ছিল যে, তাড়া দিলে ভয়ে কাঁপিত, বড় বড় চোখ মেলিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত ড্যাব্ ড্যাব্ করিয়া, আর জল গড়াইয়া পড়িত দু' গাল বাহিয়া, কখন ইতিমধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, এত কথা শিখিয়াছে সে! তার নিজস্ব ইচ্ছা রহিয়াছে, সাধ করিয়া দাদার জন্য যে খাবার জিনিষ তৈরি করিয়া রাখে, খাইয়া ভাল না বলিলে রাগ করে, অভিমান করে। তার ইচ্ছার বিপরীত কিছু করিতে গেলে দু' কথা শুনাইয়া দেয় অম্লান বদনে। আর বলিবার ভঙ্গিই হইয়াছে এখন ওর এমন যে, অমল আর দাদাগিরি ফলাইতে ভরসাই পায় না। ওর উপর, উপরন্তু কেমন থতমত খাইয়া যায়। তাড়া দিবার মত জোর পায় না মনে, উল্টিয়া অমিই আজকাল শাসন করে অমলকে ও আর সকলকে।

অমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "বটে, আমি বাবু হইছি? বড় বকা হইছিস কিন্তু তুই, মুখে আর বাধে না কিছু? টের পাবি তখন বিয়ে হলে পরের বাড়ী গিয়ে।"

"বয়ে গেছে আমার পরের বাড়ী যেতে, বিয়ে করলে তবে ত?"

"দেখা যাবে, ভাল কথা মা, সেই যে বাঘমারার গাঙ্গুলী-দের ছেলের কথা বলেছিলাম না, সেই যে আমাদের সঙ্গে পড়ত।"

অমি বাধা দিয়া বলে, "ভাল হবে না বলছি কিন্তু দাদা।"

"—তাদের আসতে লিখে দেই এইবার, কি বল? দেখে যাক অমিকে। পছন্দ করলে হয় এখন, যে ঝগড়াটে হয়েছে।"

"ফের"—অমি আর ঘরের ভিতর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া আসে গুম গুম করিয়া পা ফেলিয়া। বলে, "বারণ কর মা দাদাকে আমার সঙ্গে লাগতে। রান্না করতে পারব না কিন্তু ওরকম করলে তা বলে দিচ্ছি!" রাগে অমির মুখ রাঙা হইয়া ওঠে। রাগিলে ওর চোখে জল আসিয়া পড়ে। এমন মজা লাগে অমলের অমিকে রাগাইতে। অমি-র রাগ গায়ে না মাখিয়া গম্ভীর হইয়া মাকে বলে, "দিই লিখে তা হলে আসতে তাদের সুবিধে মত একদিন? আমি থাকব না যদিও তখন বাড়ী; তবে সে জন্যে ভাবনা নেই তোমার, অমিই পারে সব ঠিক করে নিতে, কি বলিস্ অমি?"

অমলের কথার সুরে বুঝিবার জো নাই যে সাংসারিক চিন্তা ছাড়া তার মনে অন্য কোন মতলব আছে, অমি-কে ক্ষ্যাপাইতে এ সব বলিতেছে, না সে নিতান্ত ভাল মানুষের মত তার অনুপস্থিতকালে অতিথি-সৎকারে মাকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছে মাত্র। কিন্তু তার মুখের চাপা হাসি সব ফাঁস করিয়া দেয়। অমি দাদার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, তারপর বলে "পারব না ত আমি কিছু করতে", বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে রান্নাঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অমল হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

অমলের মা তাহাকে তাড়া দিয়ে বলেন, "কেবল তোদের ঝগড়া ভালও লাগে। যা না একবার অস্তিদের বাড়ী, অস্তির মা এসেছিল ডাকতে।"

অস্তির মা আবার ডাকিতে গেল কি জন্য! "কেন মা?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

"বোধ হয় কিছু খাওয়াবে তোকে, কাল একবার খুঁজেছিল তোকে সন্ধ্যের পর, তুই ত তখনো ফিরিস নি ব্রজবাক্‌সা থেকে।"

"যাই"—বলিয়াও অমল ঘুরিয়া বেড়ায় উঠানে। গোলার চারিপাশে বেড়িয়া অমি দোপাটি আর গাঁদা ফুলের গাছ লাগাইয়াছে! অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিয়াছে দোপাটি গাছে। পট্‌পট্ করিয়া অমল ছিঁড়িয়া ফেলে কতকগুলি। অমলের মা বলেন, "কেন বাপু ছিঁড়ছিস্ ফুলগুলো, প্যান-

প্যান্ করবেখন এসে মেয়েটা। কোথায় আবার গেল, ও অমি, ক'টা বাজল একবার দেখ্ ত।"

অমি দালানের বাহিরে আসিয়া বলিল, "আটটা।" অমল ফুল তুলিয়াছে, দেখিয়াছে দেখিয়া কিন্তু রাগ করিল না মোটেই, কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "এবার বাড়ী আসবে যখন, গোটা কতক গোলাপফুলের চারা আনবে দাদা?"

"আনব।"

অমলের মা বলেন, "যা, বাপু আর দেরি করিসনি, ঘুরে আয় একবার ওদের বাড়ী থেকে।"

বাড়ী হইতে যাবার দিন আজ অমল কোন বিষয়েই ত্বরা করিতে পারিতেছে না, শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত বাড়ী থাকার তৃপ্তিটুকু উপভোগ করিতে চায় সমগ্র হৃদয় মন দিয়া। সকল ইন্দ্রিয় দিয়া স্পর্শ করিতে চায়—বাড়ীর সমস্ত কিছু। বস্তুতঃ এবার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে মন করিতেছে না অমলের। কালও সে তোড়জোড় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বেলা হওয়ার ওজুহাতে আর যায় নাই। চারিদিক হইতে সব যেন তাকে টানিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে অমল ঘুরিয়া বেড়ায় একা-একা। বহু বৎসরের বাস্তু-ভিটা। জীর্ণ কোঠা ভঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এখানে ওখানে, তবু কি মমতা মাখানো আছে এখানকার মাটিতে, বাগানে, গাছ-গাছালিতে! তাদের ঐ শ্যাওলাভরা পাড় ধ্বসিয়া যাওয়া পুকুর, পুকুর-ঘাটে যারা নিত্য সকালে বাসন মাজিতে, স্নান করিতে আসে, ভর্ত্তি ঘড়া কাঁখে করিয়া ফিরিবার সময় তাদের ভিজা পায়ের চিহ্ন-আঁকা বড় বেলগাছটার তলা দিয়া ঐ সরু একফালি ঘাটের পথ; পথের ওধারে সজনে গাছে বাঁধা অমলদের বুড়ী গাই রোদে দাঁড়াইয়া বাছুরের গা চাটিতেছে, আর আবেশে চক্ষু বুজিয়া নতুন বাছুরটি ক্রমাগত গলা উঁচু করিয়া ধরিতেছে; ঐ যে পেয়ারা গাছটার ছায়া উঠানে পড়িয়া কাঁপিতেছে; গোলার ছাঁচতলায় অমির হাতে পোঁতা পুষ্পিত দোপাটি ফুলের গাছগুলি আর ওধারে ঐ সান-বাঁধানো তুলসী তলা, তার মা স্নান করিয়া আসিয়া জল ঢালিয়া যেন রোজ ঐ তুলসীগাছে—সবাই আজ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায় অমলকে! তাই যে মা তার বিদায়ের আয়োজন করিয়া দিতেছেন, তিনি ও তার ঐ কুঁদুলে বোন অমি, তার বাবার পিসি, বুড়ী ঠাঁ'নদি, তাদের পুরানো চাকর জগুও ইচ্ছা হয়, থাকিয়া যায় সে বাড়ী, তার মায়ের স্নেহছায়ায় তার বোনের সেবার মাধুর্য্যমণ্ডিত আবাল্যের স্মৃতিভরা চিরপরিচিত গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সে কাটাইয়া দেয় একটি একটি করিয়া। কাজ নাই তার কলিকাতায় গিয়া টাকা রোজগারে। চারি পাশে পাঁচীল তুলিয়া দিয়া তাদের বাড়ীখানা যেমন নিজেকে গ্রামের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে যাদের সে আজন্ম জানিয়াছে চিনিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে, তাদের মধ্যে থাকিয়া সে ঠেকাইয়া রাখিবে বৃহত্তর জীবনের আহ্বান, আপনার জন হইতে বিচ্যুত হইয়া চায় না সে জীবনের উন্নতি। তার বাবার মত, ঠাকুরদাদার মত, তাদের পূর্ব্বপুরুষের ভিটায় হৌক ক্ষুদ্র, হৌক গ্রাম্য, অতি সাধারণ জীবন যাপন করিতে সে পারে না কেন?

বেলা বাড়িয়া চলে। অমলের মা ডাকিয়া তাগিদ দেন, "আজও কি যাবার মতলব নেই না কি তোর? বল তা হলে হাঁড়ি নামিয়ে রাখি, ধীরে সুস্থে হবে'খন তখন পরে।"

"না না এই যাচ্ছি—" অমল তেল মাখিতে বসে।

স্নান করিতে পুকুরের জলে নামিয়াছে তখন অমল। ঘাটে পাড়ার লোকের ভিড় চক্কোত্তি-বাড়ীর নতুন দিদি জিজ্ঞাসা করেন, "কলকাতায় যাবি না কি আজ অমল, এত সকালে নাইতে এলি যে বড়?" একটু পরে আবার বলেন, "নিতুর যে বিয়ে দিইছি রে অমল, শুনিছিস বোধ হয়, বউ দেখে এলি নি ত' একবার গিয়ে?"

অমল জিজ্ঞাসা করে, "কেমন বউ হ'ল নতুনদি! ভাল হয়েছে?"

"দেখতে যাস্ না একবার? বেশ হয়েছে বউ।", নতুন দিদি বলেন।

কুটির মা আপত্তি করিয়া বলে, "বউ বেশ হয়েছে কিন্তু মানায় নি যেন তোমার ছেলের সঙ্গে, তা যাই কেন বল না?"

"তোমাদের ঐ এক কথা", নতুন দিদি বিরক্ত হইয়া বলেন "বে-মানানটা কোথায় হল শুনি? কথা শুনলে গা জ্বালা করে।"

একটা ঝগড়া বাধিয়া যাইবে না কি? অমল তাড়াতাড়ি বলে, "ওকথা ছেড়ে দাও নতুন দি, মানান বে-মানান আর ক'দিন? কাজে কর্ম্মে কি রকম হয়েছে, তাই বল।"

অমলের কথায় খুসী হইয়া ওঠেন নতুন দিদি, হাসিয়া বলেন, "সে যা বলেছিস। তা কাজকর্ম্মেও বেশ ভাল, আজকাল সবই ত' প্রায় বউমাই করে, আমায় ত' নড়ে বসতেই হয় না বলতে গেলে; আর শাশুড়ী বলে' আমাকে ভক্তি ছেদ্দা করে খুব।"

অমূল্যের পিসি মুখ ঝামটা দিয়া বলেন, "ঘেন্না ধরাস নে আর বউ। ভক্তিছেদ্দা করবে না ত কি ধরে মারবে না কি তোকে তোর বউ?"

নতুন দিদি অবাক হইয়া বলেন, "যে কথা বললে! আজকালকার কটা বউ শ্বশুর-শাশুড়ীকে মান্যি করে শুনি?"

জল পড়িয়া ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি পিছল হইয়াছিল, রাগের মাথায় উঠিতে গিয়া নতুন দিদি পা পিছলাইয়া পড়িয়া ছিলেন আর কি। সকলে হৈ-চৈ করিয়া ওঠে এক সঙ্গে, তার পর হাসির হুল্লোড় পড়িয়া যায়। হাসি থামিলে অমূল্যের পিসি বলেন—"কলকাতায় যাবি আজ অমল? আমার বড্ড ইচ্ছে করে একবার যাই কলকাতায়। সেই কবে গিছলাম একবার অমূল্যর মার সাথে, তা সে ক'দিনই বা আর ছিলাম, দেখে যেন আশ মেটে নি। দশটা চোখ হ'তো যদি এক জোড়ার বদলে আর জীবনভোর যদি দেখতে পেতাম, দেখে তৃপ্তি হ'তো বোধ হয় তা হলে। তোরা ত' থাকিস সেখানে, নিত্য কত কি দেখিস, না?"

মনে মনে হাসি পায় অমলের, কৃপা-মেশান অভিজ্ঞ লোকের হাসি। দু'চক্ষু ভরিয়া আজীবন কত কি দেখিবার জিনিষের সন্ধান করিয়া আসিয়াছ পিসি, দেখ নাই ত তলাইয়া কলিকাতার আসল রূপ? ঐ উজ্জ্বল রাজৈশ্বর্য্যের পিছনে লক্ষ লোকের বুভুক্ষা, অসংখ্য হতভাগ্যের দীর্ঘনিঃশ্বাস? ঐ চোখ ঝলসানো, অপরূপ বিলাসবৈভবের আড়ালে উপবাসীর কঙ্কাল প্রতি নিঃশ্বাসে শুকাইয়া আসিতেছে যার বুকের রক্ত, আর নিবিয়া আসিতেছে যার আয়ু! সেও ত ছুটিয়া গিয়াছিল কত আশা করিয়া কলিকাতায়, যেখানকার পথে পথে ধূলিমুষ্টির মত অহরহঃ অর্থবৃষ্টি হইতেছে বলিয়া সে শুনিয়াছিল! ফুটা মালামাত্র সম্বল করিয়া আসিয়া যেখানে লোকে কোটিপতি হইয়া যায়, মানুষের ভাগ্য লইয়া খেয়ালী বিধাতা যেখানে ছিনিমিনি খেলেন! জীবনের কল্পনা সেও করিয়াছিল দুরায়ত, অজানা হইতে অজানায় বিসর্পিত, ভবিষ্যতের আশায় উজ্জ্বল! অজস্র দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও অসাধ্য সাধনের স্বপ্ন কি সে কম দেখিয়াছিল? কিন্তু—

গত চার বছরের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছে অমল? প্রত্যেকটি দিনের কাহিনী কি ঐ কলিকাতার পথে পথে আর দুয়ারে দুয়ারে শুব্ধ হইয়া নাই? উমেদারী আর উঞ্ছবৃত্তির সে অধ্যায় কি অমলের জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিবে কোন কালে? দিনের পর দিন গিয়াছে, যখন একটিও পয়সা সে রোজগার করিতে পারে নাই! মুড়ি খাইয়া দিন কাটিয়াছে, রাস্তার কলের জলে পেট ভরিয়াছে! বাড়ী আসিয়াও সুখ ছিল না, মায়ের শুষ্ক মুখ দেখিতে হইয়াছে, তার বোন অমি, বড় হইয়া উঠিয়াছিল, গায়ে জড়াইবার উপযুক্ত কাপড়-জামা জুটিত না সব সময়ে; অভাবের সংসারে ঠা'নদিদির কত কষ্ট গিয়াছে! তিষ্ঠিতে পারে নাই সে দু'দিন বাড়ী আসিয়া, ফিরিয়া গিয়াছে ফের কলিকাতায়। পেটের দায়ে সে কলিকাতার পথে পথে ফিরি করিয়াছে খবরের কাগজ; চীৎকার করিয়া ছুটিয়াছে—হাতে পায়ে ধরিয়াছে কতজনের, একখানা কাগজ কিনিবার জন্য! সময় মত টাকা দিতে পারে নাই বলিয়া 'দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে হোটেলওয়ালা, কত কাকুতি মিনতি করিয়াছে অমল একমুঠা ভাতের জন্য! কাহাকেও জানিতে দেয় নাই সে এসব কথা কোন দিন। যখনই পারিয়াছে, টাকা পাঠাইয়াছে তার মাকে, আর লিখিয়াছে সে ভাল আছে আর চাকরী একটা নিশ্চয় জোগাড় করিয়া লইবে সে শীঘ্রই।

এতদিন পরে জুটিয়াছে তার কাজ--পঞ্চাশ টাকার চাকরী, টিকিয়া থাকিলে উন্নতি হইতেও পারে ভবিষ্যতে। সংসারের আশু অভাব মিটিয়াছে বটে তাদের, কিন্তু কি হইল তার জীবনের? মা-বোন কোথায় পড়িয়া রহিল, দেশ ছাড়িয়া ভিটা ছাড়িয়া নির্ব্বান্ধব সহরের ঘিঞ্জিতে নির্ব্বাসনে জীবন কাটাইতে হইবে অমলের? কে সে কলিকাতার? গ্রামের সে অমল, নতুন দিদি বউ দেখিবার জন্য আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যান, অম্বির মা খাবার তৈরি করিয়া তাকে ডাকিয়া পাঠায় বারবার, অমি নিজে না খাইয়া তার জন্য রাখিয়া দেয় তালের আঁটিটা পর্য্যন্ত, কত ভাবনা তার মার অমলের জন্য? আর সেখানে অসংখ্য মানুষের মধ্যে সে একজন মাত্র, পরিচয়-হীন, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। তিন দিন যদি উপবাসে থাকে অমল কলিকাতায়, ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিবে কি কেহ, তার মুখ শুকাইয়াছে কেন? অসাবধানে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়িয়া যদি অপমৃত্যু হয় অমলের, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবে কি কেহ সেখানে তার জন্য?

নিজের আবেগে কত কথা বলিয়া যায় অমূল্যর পিসি, অমলের কান থাকে না আর সেদিকে।

আরও খানিকক্ষণ পরে। অমল তখন খাইতে বসিয়াছে, তার মা সামনে বসিয়া আছেন, আর অমি পরিবেশন করিতেছে। ওপাড়ার মহিম চাটুজ্জে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গলা খাঁকারী দিয়া বলিলেন, "অমল আজ যাচ্ছে না কি বৌ-ঠান?" তারপর আগাইয়া আসিয়া অমলকে দেখিয়া বলিলেন—"এই যে অমল, খেতে বসে গেছিস্ যে দেখছি এর মধ্যে! দুপুরের মোটরে যাবি বুঝি?" অমলের মা মাথায় কাপড় টানিয়া দেন, অমল একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলে, "হাঁ, কাকাবাবু।"

অমলের বাবার বন্ধু, মহিম চাটুজ্জে। তার বাবা যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন চাটুজ্জের খুব দহরম মহরম ছিল এ বাড়ীতে, আরও অনেকেরও ছিল, কিন্তু কেবল মহিম চাটুজ্জেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছেন। তখন ওদের সংসারের অবস্থা খুব ভাল, পঞ্চাশ বাটখানা পাতা পড়িত দু'বেলায়। দরাজ হাতে খরচ করিতেন অমলের বাবা, ভবিষ্যতের কথা ভাবেন নাই কখনও, না কুলাইলে দেনা করিতেও ছিলেন তেমনি সিদ্ধহস্ত। বলিতেন, দেনাই যদি না থাকিল, ত' বিষয় কিসের? তাঁর জীবিতকালেই একটি একটি করিয়া অনেকগুলি গাঁতি বিক্রী হইয়া গিয়াছিল, অবশিষ্ট যা ছিল, গিয়াছে তাঁর মৃত্যুর পর ঋণ পরিশোধ করিতে। অমলের বাবা যখন মারা যান, অমির বয়স তখন সবে তিন, তার পর এগার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কি দুঃখের কষ্টের এগার বার বৎসর। সংসার চালাইতে বাঁধা পড়িয়াছে শূলপাণি নন্দীর কাছে একখানা একখানা করিয়া অমলের মার যাবতীয় গহনা, মহিম চাটুজ্জে করিয়াছে অবশ্য যথেষ্ট—কিন্তু সে দুঃখ-কষ্ট অমলের বাজে নাই এখনকার মত।

"আপিস খুলবে কবে তোর?"

"কাল।"—অমল বলে, "গিছলাম ক'দিন আপনাদের বাড়ী, আপনি ত' ছিলেন না?"

"হাঁ, শুনলাম সে কথা কাল রাতে বাড়ী ফিরে। গিছলাম আমার বড় মেয়ে শিখরের ওখানে, তার ছেলে-টার বড় অসুখ গেল কি না।"

অমলের মা জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন আছে সে এখন?"

"ভাল হয়ে গেছে, কাল ভাত দিয়েছে দেখে এসেছি। এসে শুনলাম অমল যাবে আজ, ভাবলাম একবার দেখা করে আসি, কদ্দিন পরে হয় ত' আবার আসবে। না, না, আর আসনের দরকার নেই, বসব না আর, এখখুনি যেতে হবে একবার গোবিন্দকাটি। যাই হোক্, কেমন চাকরি হচ্ছে রে অমল, উন্নতির আশা আছে ত?"

"এই ত সবে ঢুকিছি, এখনো বছর পোরেনি।" অমল বলে, "দেখি—"

অমলের মা বলেন, "আশীর্ব্বাদ করো তোমরা পাঁচজনে ঠাকুরপো, অমলের উন্নতি হোক, আর যে সয় না—"

"করি বই কি বৌ-ঠান, রোজ ত্রিসন্ধ্যে গায়ত্রী করবার সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অমলের নামে। দাদা যে আমাদের কি ছিলেন—সে কি ভোলবার?

দক্ষিণের কুঠুরি হইতে অমি ডাক ছাড়, "পান নিয়ে যাও দাদা।" রাগ পড়িয়া গিয়াছে তার কোনকালে, বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকিতে পারে নাকি সে দাদার

উপর, বিশেষ করিয়া আজ যখন অমল বাড়ী হইতে যাইবে? অমলের হাতে পান দিয়া বলে, "একটা কথা বলবো দাদা, রাগ করবে না ত?"

"কি বলবি তাই বল না, অত ভণিতা শিখলি আবার করে?"

"আমাকে এক বাণ্ডিল পশম পাঠিয়ে দেবে দাদা, একটা জিনিষ বুনবো?"

"কি বুনবি?"

"বুনবো একটা জিনিষ, তুমি দেবে কি না তাই বলো না?"

"আচ্ছা দেবো, কিন্তু এর জন্যে এত!"—অমল হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

ছেলের সবতাতেই হাসি, এমন রাগ ধরে অমির। ক্ষণকাল মুখের দিকে চাহিয়া থাকে অমলের, তারপর চোখ নামাইয়া আঁচলের এক কোণ আঙ্গুলে জড়াইয়া তখনি আবার খুলিয়া ফেলে, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলে, "বিয়ে করো না দাদা এইবার, মা একলা থাকে, আমারও একটা বৌদি হয়"—বলিতে বলিতে লাল হইয়া ওঠে অমির মুখ।

"এ-ই এর জন্যে বুঝি ভণিতা হচ্ছিল এতক্ষণ মেয়ের?" কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে অমল বলে, "ও-রে ফাজিল মেয়ে!"

দু' হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলে অমি লজ্জায়।

নিরঞ্জনের মা আসিয়া বলে, "তোকে যে খুঁজছিলাম অমল একটা কথা বলবো বলে!"

"বেশ তো, বলো না এইবার খুড়িমা" অমল বলে।

গলা নীচু করিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া খুড়িমা বলে, "আর যে চলে না বাবা সংসার! নিছক উপোস দিচ্ছি এক মায়ে পোয়ে! তোর মা ছিল তাই রক্ষে—"

অমল ব্যস্ত হইয়া বলে, "নিরঞ্জন করে না কেন কিছু?"

"কি করবে বাবা, চেষ্টার ত ত্রুটি করছে না ছেলে! থাকল তো সেবার গিয়ে ক'মাস কলকাতায়, হল কিছু? বেশী তো লেখা পড়া শেখেনি তোদের মত? ছ' মাস যে চেষ্টা করবে কলকাতায় থেকে, সে টাকা কোথায়? বললাম, বলগে যা তোর দাদাকে, তার নাকি লজ্জা করে। দে না বাবা একটা কিছু চেষ্টা চরিত্তির করে আমার নিরুর জন্যে।" খপ্ করিয়া খুড়িমা হাত দুটি চাপিয়া ধরে অমলের।

"আচ্ছা খুড়িমা, দেখব আমি চেষ্টা করে নিরুর জন্যে।"—দায় এড়াইতে অমল বলে। সে কি করিয়া বুঝাইবে তার ক্ষমতা কতটুকু? চাকরী সে পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কি তার সম্মান সেখানে? নগণ্য কেরাণী সে, আপিসে হাজিরা দিতে একটু দেরী হইলে কোন দিন, বড় বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে, সারাদিন আর কথা বলে না অমলের সঙ্গে। সামান্য ভুল চুক হইলে, চাকরী খতম করিয়া দিবে বলিয়া শাসায় সাহেব। একবার তার অসুখ হইয়াছিল, উঠিতে পারে নাই ক'দিন শয্যা ছাড়িয়া, আপিসে গেলে সাহেব বলিয়াছিল, এ রকম রুগ্ন লোক দিয়া কাজ চলিবে না তার, স্বাস্থ্য ভাল করুক অমল। পদে পদে খোসামোদ করিয়া, মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হয় উপরওলার। কি তার মূল্য? সে ত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে, খণ্ডিত হইয়া কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে তার প্রথম বয়সের অসীম কল্পনা! তাই ত বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে এত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে তার মন! মেসের ঠাকুরের সেই কদর্য্য রান্না, চাকরের সেই মামুলি ন্যাতা! অমলের গা ঘিন্ ঘিন্ করিত প্রথম প্রথম! এমনি করিয়া তিল তিল করিয়া ফুরাইয়া আসিবে তার পরমায়ু, আর পঞ্চাশ হইতে পঞ্চান্ন, পঞ্চান্ন হইতে উনষাট—বাড়িয়া বাড়িয়া মাহিনা তার কোথায় গিয়া শেষ হইবে, সে ত জানে তাহা ভাল রকম! দীর্ঘকাল পরের চাকরি করিয়া কি দশা হয় মানুষের, অমল ত নিত্য দেখিতেছে তাহা স্বচক্ষে। নিভিয়া যাওয়া জ্যোতিষ্কের কথা কি অমল পড়ে নাই?

তারিণী বাঁড়ুজ্জে আসিয়া হাজির হয়, "মোটর আসার সময় হল যে রে, চল চল্, —দেরি হয়ে যাবে আবার।"

অমিকে লইয়া অমলের মা আগাইয়া দিতে আসিলেন ষষ্ঠীতলা পর্য্যন্ত। ঠানদিদি আসিলেন সঙ্গে। আসিতে আসিতে ঠানদিদি বলিলেন "অমল দাদা, শীত আসছে, গায়ের চাদর একটা যদি পাঠিয়ে দিস, বড় কষ্ট পাই শীতে। কত খোসামোদ করি অমির একখানা চিঠি লেখার জন্তে তোকে, মেয়ে কথা গেরাহ্যিই করে না, দিস দাদা

একখানা পাঠিয়ে।" একটু থামিয়া আবার বলেন, "অদ্ধোদয় যোগ হবে না কি এবার বলছিল সব, গঙ্গা-স্নানটা করিয়ে যদি দিস দাদা! আছি তোদের দোরে পড়ে, কাকে আর বলব তোকে ছাড়া?"

"বেশ ত' লিখো তখন যা হয় হবে একটা ব্যবস্থা", অমল বলে।

প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে ছায়াভরা ষষ্ঠীতলা। অমলের ঠাকুরদাদার বাবার আমলের প্রতিষ্ঠা করা গাছ, সেদিনকার শিশুচারাটি শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টি পাইয়া শাখা প্রশাখায় আর ঝুরি নামাইয়া বহু বিস্তীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আজ। মায়ের কথায় অমল প্রণাম করিয়া আসে বৃক্ষদেবতাকে।

কত চোর চোর খেলিয়াছে এই গাছের আড়ালে লুকাইয়া, কত দুলিয়াছে অমল ঝুরি ধরিয়া ছেলেবেলায়। কি বছর পৌষমাসে বনভোজন করিতে আসে গ্রামের মেয়েরা এই গাছতলায়, অঘ্রাণ মাসে এখানে পূজা হয়। যত ছেলে বুড়া, বৌ-ঝি গ্রাম ভাঙিয়া ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, কত জনের কত মানৎ থাকে সারা বছরের, ঢাক বাজে, বলিদান হয়—

জীবনে অঘ্রাণ মাস আসিবে কতবার, কত পূজা হইবে গাছতলায়, তার মা গলায় আঁচল দিয়া হয় ত' ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মাগিবে তার মঙ্গলের জন্য! অমল তখন তার আপিসের টুলে বসিয়া বিদেশী কোম্পানীর লাভের হিসাব কষিয়া খাতা ভরাইবে মোটা মোটা অঙ্ক দিয়া। আসিতে পাইবে না অমল পরের গোলামি করিতে গিয়া, ছুটি কোথায়? তাদের উঠানে অমি বাঁশ পুঁতিয়া যে আকাশ-প্রদীপ দেখাইয়াছে পিতৃলোকের উদ্দেশে, দূর হইতে শুধু তাদের সংসারের তথা গ্রামের নানা উৎসবের স্মৃতি বিদেশে তাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, অনবরত তাকে উন্মনা করিবে, বিধুর করিবে।

সকলকে প্রণাম করিয়া অমল দাঁড়াইয়া থাকে বাসের প্রতীক্ষায়।

তারিণী বুড়া বলে, "কোন ভাবনা নেই তোর বাড়ীর জন্যে অমল, রইলাম ত আমরা, কোন ভাবনা করিস নে।"

ভাবনা করিয়াই বা অমল কি করিবে? সময় যে বদলাইয়া গিয়াছে দাদামশাই, নতুন নিয়ম, নতুন ব্যবস্থা গত্যন্তর কই?

অমি আসিয়া ঢিপ করিয়া অমলকে প্রণাম করে এক সময়। ওর চোখ দুটি ছল ছল করিয়া আসে, কম্পমান ওষ্ঠপ্রান্তে তবু হাসি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে অমি, এমন একটা অসহায় ছেলেমানুষি ভাব হয় অমির মুখের।

"ব্রেইভ সফট এণ্ড কোলড" দাদামশাই বলে, "অমির বুঝলে অমল, চোখ দিয়ে জল পড়ে আর কি?"

বাস আসিয়া পড়ে। জিনিষপত্র তুলিয়া অমল চড়িয়া বসিলে বাস ছাড়িয়া দিল। অমলের মা বলেন "চিঠি দিস পৌছেই আর বাড়ী আসিস পৌষ মাসে।"

অমি চেঁচাইয়া বলে—"এস দাদা বড়দিনের বন্ধে অবিশ্যি করে।"

মোড় ঘুরিবার সময় অমল মুখ বাড়াইয়া দেখিল তখনও সকলে দাঁড়াইয়া আছে ষষ্ঠীতলায় এদিকে চাহিয়া, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া যায় তার পর।

ভারতের মুক্তি

...ভারতবর্ষকে মুক্ত বলা যাইবে তখন, যখন দেখা যাইবে যে, ভারতের অগণিত শ্রমজীবি-সম্প্রদায় ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মকুণ্ঠতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা, এক কথায়, যখন ভারতবাসী ক্রমশঃ দুঃখমুক্ত হইতে আরম্ভ করিবে, তখন ভারতবর্ষ মুক্ত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারিবে।

ইংরাজকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলে, কিংবা গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারিদিগকে হত্যা করিলে, কিংবা যে সমস্ত গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগকে অবাধ্যতামূলক কর্ম্মের (civil disobedience) দ্বারা, অথবা অসহযোগের (non-co-operation) দ্বারা, অথবা সন্ত্রাসবাদের দ্বারা অত্যাক্ত করিয়া তুলিলে, ভারতবর্ষের মুক্তিসাধন করা কখনও সম্ভব হইবে না।...

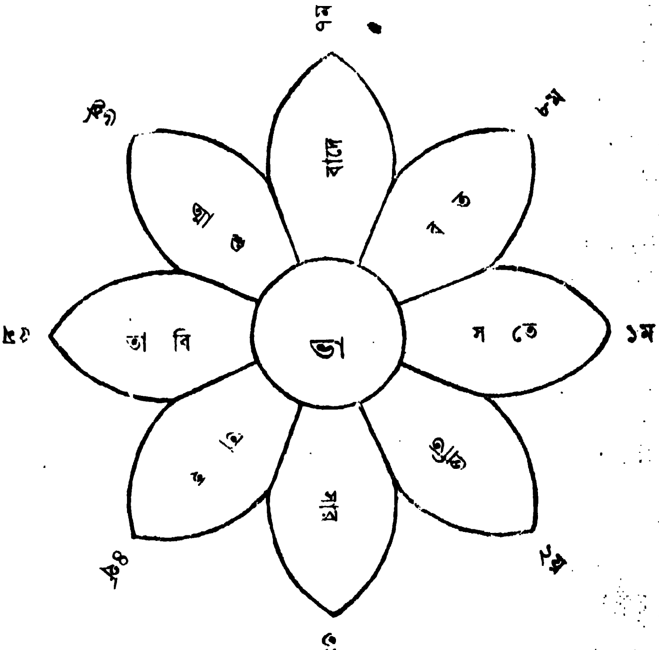
আলোচনা

সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যপ্রকাশ

* সাহিত্যের উদ্দেশ্য জনসমাজের চিত্তবিনোদন, সাহিত্য জাতির চরিত্রগত উৎকর্ষসাধনের সহায়—সাহিত্য হইতে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্তির শিক্ষা লাভ করা যায়, সাহিত্য হইতে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারে, † এক কথায় সাহিত্য কল্পবৃক্ষ ; সাহিত্য 'কান্তাসম্মিত'। ‡

সাহিত্যের আকর্ষণ অপরিহার্য্য– মানুষের হৃদয়ে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রীতি রহিয়াছে, তাহা তাহাকে সাহিত্যের অনুরাগী করিয়া তুলে। সাহিত্য সৌন্দর্য্যের আধার। সাহিত্যচর্চ্চার যে অনাবিল আনন্দ জন্মে, তাহার মাদকতা অতিতীব্র। তাই জাতির জীবনে সাহিত্যের প্রভাব অসীম ও অপরিহার্য্য। সুতরাং সাহিত্যে বিশৃঙ্খলা থাকিলে তাহা জাতির জীবনকে প্রতিপদেই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্যকে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে।

সাহিত্য হইতে কিরূপে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়, তাহা দেখাইতে যাইয়া অলংকার শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—§ [চতুর্ব্বর্গ=১ ধর্ম্ম, ২ অর্থ, ৩ কাম, ৪ মোক্ষ।]



পদ্মবন্ধঃ [সভাপ্রশস্তি-চিত্রম্]

[ভাসতে প্রতিভাসার রসাভাতা হতাবিভা।
ভাবিতাত্মা শুভা বাদে দেবাভা বত তে সভা ॥

ইহা অষ্টদল পদ্মবন্ধ। কর্ণিকাস্থিত 'ভা' এই বর্ণটি শ্লিষ্ট, উহা আটবার উচ্চারিত হইবে। অযুগ্ম দল চারিটির দুটি দুটি করিয়া আটটি বর্ণ অনুলোম-বিলোমে শ্লিষ্ট। যেমন প্রথম দলে 'ভাসতে' কথাটি শ্লোকের শেষে বিলোম-পাঠে 'তে সভা' হইবে। প্রত্যেক অযুগ্মদলের বর্ণগুলি অনুলোমে এবং বিলোমে পাঠ করিতে হইবে। ইহার নাম প্রবেশ এবং নির্গম। কর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া একদল দিয়া নির্গম এবং অপরদল দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। অযুগ্ম দলগুলিতে প্রবেশ ও নির্গম দুই-ই থাকিবে। প্রথমদল দিয়া প্রথমে নির্গম এবং সর্ব্বশেষে প্রবেশ।]

---

* এই প্রবন্ধে 'সাহিত্য' শব্দটি প্রায়শঃ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া 'কাব্য' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি,
কাব্যাদেব ... ... । (বিশ্বনাথ)

‡ শাস্ত্র ত্রিবিধ—প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত, কান্তাসম্মিত। শব্দপ্রধান বেদাদি-শাস্ত্র প্রভুসম্মিত ; কারণ, তাহার আদেশ প্রভুর আদেশের ন্যায় নির্ব্বিচারে বর্ণে বর্ণে পালনীয় ; 'অগ্ন আয়াহি'র পরিবর্ত্তে 'বহ্নে আগচ্ছ' বলা চলিবে না। অর্থতাৎপর্য্যযুক্ত পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র সুহৃৎসম্মিত। কারণ, বন্ধুর উপদেশের ন্যায় পুরাণাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থই গ্রাহ্য। যাহা প্রণয়িনীর ন্যায় অন্তরকে সরস করিয়া স্বীয় বক্তব্যে আকৃষ্ট করে, তাহা 'কান্তাসম্মিত'।

§ "কাব্যাদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তির্ভগবন্নারায়ণচরণারবিন্দস্তবাদিনা। অর্থপ্রাপ্তিশ্চ প্রত্যক্ষসিদ্ধা। কামপ্রাপ্তিশ্চার্থদ্বারৈব। মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চৈতজ্জন্যধর্ম্মফলাননুসন্ধানাৎ, মোক্ষোপযোগিবাক্যে ব্যুৎপত্ত্যাধায়কত্বাচ্চ। (দর্পণ)।

(১) সাহিত্যের অন্তর্গত ভগবানের স্তুতিগান প্রভৃতি হইতে ধর্ম্মলাভ হয়। বেদ ও পুরাণাদির অন্তর্গত স্তুতিগান আপাততঃ নীরস বলিয়া তাহাতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সরস সাহিত্যের মনোরম ভাষায় নিবদ্ধ হইলে সেই স্তোত্রাদি সহজেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে।

(২) সাহিত্যচর্চ্চায় অর্থপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। উদাহরণ-স্বরূপ মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া, অথবা নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া অর্থার্জ্জনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৩) কাম অর্থাৎ ঐহিক (স্রক্-চন্দন-বনিতাদি) অথবা পারত্রিক (স্বর্গাদি) সুখ। তাহা অর্থসাধ্য। অর্থ থাকিলে স্বর্গজনক যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় বলিয়া স্বর্গও অর্থসাধ্য হইতে পারে। সুতরাং অর্থলাভ হইলে কামলাভ হইল, ইহাও বলিতে হইবে।

(৪) সাহিত্যচর্চ্চা-প্রসঙ্গে ভগবানের নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা যে ধর্ম্ম হয়, তাহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়াই সাহিত্যচর্চ্চা মুক্তিলাভের হেতু হইতে পারে। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহা শাস্ত্র-সম্মত। * তা' ছাড়া সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা ভাষায় মর্ম্মগ্রহণে যে ক্ষমতা জন্মে, তাহা মোক্ষোপযোগী উপনিষদাদি শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণে সাহায্য করে বলিয়াও সাধারণভাবে সাহিত্যকে মোক্ষের হেতু বলা যাইতে পারে।

বেদাদি শাস্ত্র হইতেও চতুর্ব্বর্গ লাভ করা যায়, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র স্বভাবতঃ নীরস ও দুরূহ বলিয়া তাহা কেবল যাঁহাদের বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষেই উপযোগী, কিন্তু সরস সাহিত্য বিমল আনন্দ প্রদান করে বলিয়া এবং অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য বলিয়া তাহা কোমলমতিগণের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাঁহাদের বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে, তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র থাকিতে চতুর্ব্বর্গের জন্য কাব্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইবেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়—চিনি খাইয়া যদি ম্যালেরিয়া নিবারণ করা সম্ভব হয়, তবে কুইনাইন ছাড়িয়া চিনির প্রতি আসক্ত হইয়া পড়াই কি রোগীর পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক নহে? †

জাতির উপর সাহিত্যের অসাধারণ প্রভাব অপরিহার্য্য বলিয়া সাহিত্যের বিশৃঙ্খলা জাতির জীবনে শোচনীয় পরিণামের সৃষ্টি করে, তাই সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে সাহিত্যে বিশেষরূপে শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে।

অলংকার-শাস্ত্র অতি প্রাচীন, অগ্নিপুরাণ এবং ভরতী-নাট্যশাস্ত্রে প্রসঙ্গতঃ অলংকার-শাস্ত্রীয় বহু বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থকে বর্ত্তমান অলংকার-শাস্ত্রের উপজীব্য বলা যাইতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে সৌন্দর্য্যদর্শী খ্যাতনামা মনীষিবৃন্দের অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন অমর লেখনীপ্রসূত অমূল্য গ্রন্থরাজি সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। দণ্ডী খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। ইঁহার পর ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট, বামন, আনন্দবর্দ্ধন, মহিম ভট্ট, অভিনব গুপ্ত, শৌদ্ধোদনি, বাগ্ভট, বাগ্ভট, রূপাক, ভোজ, মম্মটভট্ট, হেমচন্দ্র, কেশব মিশ্র, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, গোবিন্দ ঠক্কুর, বৈদ্যনাথ, অপ্পয় দীক্ষিত, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী অলংকার-শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভামহের কাব্যালংকার, উদ্ভটের কাব্যালংকার-সার-সংগ্রহ, বামনের কাব্যালংকার-সূত্র, আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যের ধ্বন্যালোক, মহিম ভট্টের ব্যক্তিবিবেক, ভোজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ, কেশব মিশ্রের অলংকারশেখর, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ, অপ্পয় দীক্ষিতের বৃত্তি-বার্ত্তিক, বিশ্বেশ্বরের অলংকারপ্রদীপ ও অলংকার-মুক্তাবলী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত দশরূপক, প্রতাপরুদ্রীয়, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, ভাবপ্রকাশ, রসার্ণব-সুধাকর, কাব্যমীমাংসা, অলঙ্কারকৌস্তুভ ও রস-গঙ্গাধর প্রভৃতি আরও বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

কাব্যাদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইলেও পরবর্ত্তী কালে বিষয়-সমাবেশ ও বিচার-নৈপুণ্যে মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও প্রামাণিক অত্যুত্তম অলঙ্কার গ্রন্থ হিসাবে কাব্যপ্রকাশের নামই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, 'বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা'র মত কাব্যপ্রকাশও এককালে পণ্ডিতগণের পরীক্ষাস্থল বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এই জন্যই নাকি বহু পণ্ডিত যশোলিপ্সায় ইহার টীকাপ্রণয়নে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কাব্যপ্রকাশকার মম্মট ভট্টের সময় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইনি নৈষধচরিত্র ও খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রভৃতি বহুগ্রন্থপ্রণেতা মহাকবি শ্রীহর্ষের মাতুল।

কাব্যপ্রকাশ অতীব দুরূহ গ্রন্থ; সম্ভবতঃ এই জন্যই ইহার বহুসংখ্যক টীকা প্রণীত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশের যত টীকা প্রণীত হইয়াছে, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অন্য কোন গ্রন্থের এত অধিকসংখ্যক টীকা প্রণীত হয় নাই। ইহার ৪৬টি টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি ইহার দুরূহতার লাঘব হয় নাই। *

এই গ্রন্থ ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার এক একটি অধ্যায়কে এক একটি উল্লাস আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে।

প্রথম উল্লাসের প্রতিপাদ্য—

প্রথম উল্লাসে কাব্যের প্রয়োজন, কারণ ও স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে।

(১) প্রয়োজন:

† কাব্য একাধারে যশঃ ও অর্থলাভের হেতু, কাব্য হইতে ব্যবহার (অর্থাৎ সামাজিক বা জাগতিক রীতি-নীতি) শিক্ষা করা যায়, কাব্যদ্বারা

---

* "যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্"।

† "কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিণঃ সিতশর্করাপ্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ।" (দর্পণ)

* 'কাব্যপ্রকাশস্য কৃতা গৃহে গৃহে
টীকা তথাপ্যেষ তথৈব দুর্গমঃ।' (আদর্শ-টীকা)
[সং কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা—৬]

† "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।" (কাব্যপ্রকাশ)

মঙ্গলও দূর করা সম্ভব, কাব্যচর্চ্চায় পরম আনন্দ জন্মে ; প্রণয়শালিনী প্রিয়বাদিনী পত্নী যেমন প্রণয়দ্বারা হৃদয় জয় করিয়া প্রীতিপূর্ণ মধুর বাক্যে ৎ পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করে, উত্তম কাব্যও সেইরূপ সানুভূতি দ্বারা হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া মধুর ভাষায় নিপুণভাবে সৎ ও অসৎ কার্য্যের পরিণাম সম্মুখে উপস্থাপন করতঃ প্রণয়িনীর ন্যায় আদর করিয়াই যেন অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত ও সৎপথে প্রবৃত্ত করে। রস-পরবশ হৃদয়ে উত্তম কাব্যের নিপুণ উপদেশ অব্যর্থ ও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ।

অতএব কাব্যের প্রয়োজন আছে।

(২) কারণ :

অর্থাৎ উত্তম কাব্য নির্ম্মাণ বা কাব্যার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে, কারণ অর্থাৎ উপায় রূপে অপেক্ষণীয় কি কি ?

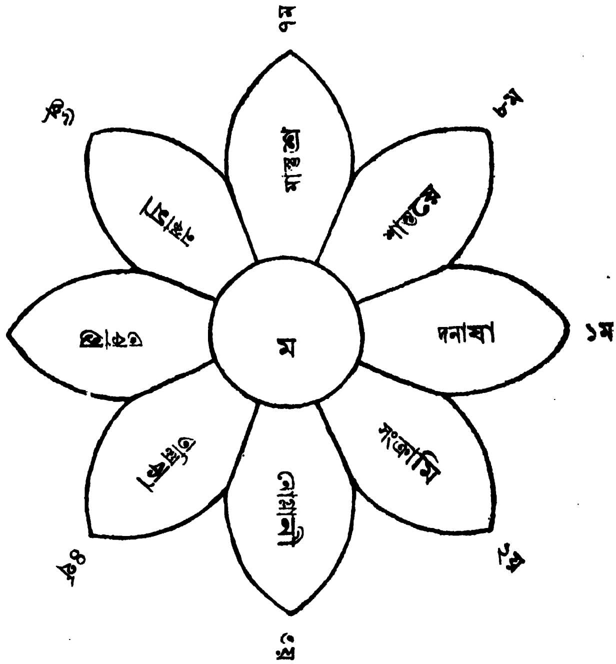
স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি এবং স্বাভাবিক রসানুভবশক্তি : ভূয়োদর্শনজনিত নৈপুণ্য অর্থাৎ—স্থাবর-জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থপর্য্যবেক্ষণ, লৌকিক বৃত্তান্ত-বিজ্ঞান, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, শিল্পশাস্ত্র, বৈদ্যকশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বহু শাস্ত্র † এবং মহাকবি-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ কাব্য প্রভৃতির পর্য্যালোচনাজনিত অভিজ্ঞতা এবং কাব্যজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ-গ্রহণ ও তদনুসারে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন—এইগুলি উত্তম কাব্য-নির্ম্মাণ ও যথার্থ কাব্যার্থবোধে অপেক্ষণীয়। ‡

(৩) কাব্যের স্বরূপ :—

কাব্যের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে, সংক্ষেপে ইহা বলা যায় যে, গুণ ও অলংকারযুক্ত নির্দ্দোষ শব্দার্থই কাব্যের স্বরূপ। উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী আলংকারিক সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কাব্য-প্রকাশকারের এই কাব্যলক্ষণে বহু দোষারোপ করিয়া তাহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন -- দোষ-মুক্ত কাব্য বিরল, অনেক উত্তম কাব্যেও দোষ দেখা যায়, দোষশূন্য না হইলে কাব্য হইবে না, ইহা সংগত নহে। দোষগুলি কাব্যের অপকৃষ্টতাপ্রয়োজক, কিন্তু কাব্যত্বনাশক নহে। যেমন কীটবিদ্ধ রত্নও রত্ন-পদবাচ্য, পরন্তু তাহা কীট-বিদ্ধ বলিয়া অপকৃষ্ট, সেইরূপ দোষযুক্ত কাব্য অনুপাদেয় হইলেও তাহা যে কাব্য ইহা অস্বীকার করা চলে না। * মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণ এবং অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলংকারগুলিও কাব্যের উপাদেয়তাপ্রয়োজক ; ইহারাও কাব্যের স্বরূপপ্রতিপাদক নহে।

রসাত্মক † বাক্যই কাব্য-পদবাচ্য। যাহা রসহীন, তাহা কাব্য-নামের অযোগ্য। দর্পণকার এইরূপে ইহার পরিচয় দিয়াছেন—



অষ্টবিধ-পদ্মবন্ধঃ [কামনাচিত্রম্]

[মদনায়ানসংক্রামি-মনোয়ানীমতল্লিকা।
মতকান্তমনস্কামা মমাস্তু শ্রমশান্তয়ে॥

ইহাতে কর্ণিকাস্থিত বর্ণটি শ্লিষ্ট, কর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দল দিয়াই নির্গম হইবে। বিশেষ বৈচিত্র্য এই যে, ইহার প্রত্যেক দলের প্রান্তস্থিত বর্ণগুলি প্রথম দল হইতে যথাক্রমে পড়িলে একটি স্বতন্ত্র অর্থপ্রকাশক বাক্য হইবে। যেমন উল্লিখিত চিত্রের প্রথম দল হইতে প্রান্তস্থিত বর্ণগুলি একত্র পাঠ করিলে 'যামিনীকান্তমাশ্রয়ে' এই বাক্য হইবে।]

---

* কথিত আছে, ময়ূর কবি সূর্য্যস্তবরূপ 'সূর্য্যশতক' কাব্য লিখিয়া কুষ্ঠরোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

† "ন তচ্ছাস্ত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন যৎ ভবতি কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥"

‡ "শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে॥" (কাব্যপ্রকাশ)

* "উক্তং চ—
কীটানুবিদ্ধরত্নাদিসাধারণ্যেন কাব্যতা।
দুষ্টেষ্বপি মতা যত্র রসাদ্যনুগমঃ স্ফুটঃ॥" (দর্পণ)

† "রস এবাত্মা সাররূপতয়া জীবনাধায়কো
যস্য, তেন বিনা তস্য কাব্যত্বানঙ্গীকারাৎ।" (বৃত্তি)

শব্দ ও অর্থ কাব্যের আত্মা ; * মানবদেহে শৌর্য্যাদি গুণের মত কাব্যশরীরে মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণগুলি উৎকর্ষপ্রয়োজক মাত্র। শ্রুতিকটুত্ব প্রভৃতি দোষগুলি মানুষের কাণত্ব-খঞ্জত্বাদি দোষের মত কাব্যের সৌন্দর্য্য-লাঘব করে বটে, কিন্তু তাহা কাব্যত্বের হানিকর নহে। মনুষ্যদেহে কুণ্ডলাদি অলংকার যেরূপ শোভাবর্দ্ধক, কাব্যের অলংকারগুলিও সেইরূপ কাব্যের শোভাবর্দ্ধক মাত্র।

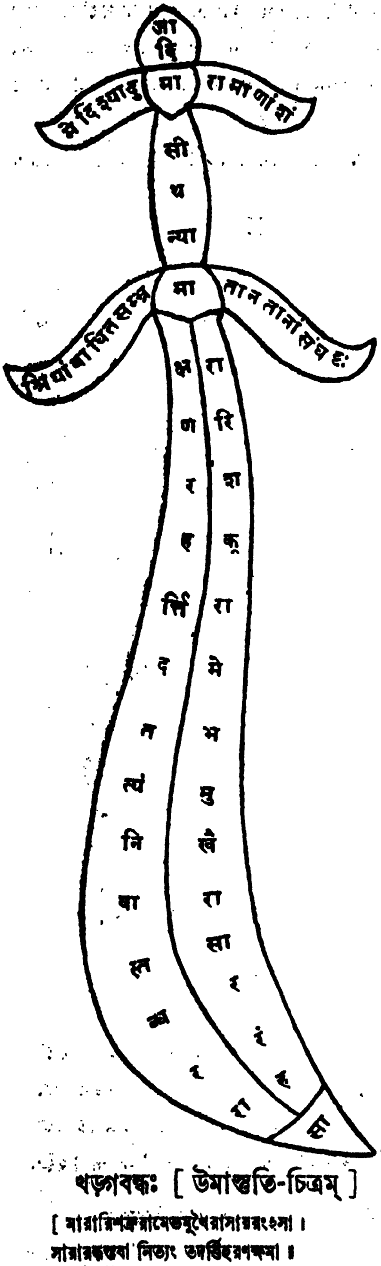
উপরে বলা হইয়াছে, রসই কাব্যের আত্মা। যদিও বর্ণনাচাতুর্য্যই কাব্যের প্রধান সম্পদ, তথাপি রসই কাব্যের আত্মা বা জীবনাধারক। † এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—রস কাহাকে বলে ? রস সহৃদয়সংবেদ্য, তাহা ব্রহ্মের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়। রস অনুভূতি বা আস্বাদযোগ্য, কিন্তু বর্ণনার যোগ্য নহে। তথাপি দর্পণকার তাহার যথাসাধ্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

সাহিত্যের যে চমৎকারিতা সহৃদয় পাঠকের অন্তরকে অভিভূত করিয়া বাহ্য-বস্তুর প্রতি বিমুখ করিয়া তুলে, তাহাই 'রস'-শব্দবাচ্য। রসাস্বাদ-মগ্ন অন্তঃকরণে জ্ঞানান্তরের অবকাশ থাকে না। রস এবং রসের আস্বাদকে পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। রসই আস্বাদ-বা আস্বাদই রস—অর্থাৎ আস্বাদ্যমান অবস্থাতেই রসের রসত্ব।

অনাস্বাদ্যমান রসের অস্তিত্বই নাই। এই জন্য ইহা অজ্ঞাপ্য, ‡ অর্থাৎ বর্ণনার দ্বারা প্রতিপাদ্য নহে। ইহাকে নিত্যও বলা চলে না, আবার অনিত্যও বলা চলে না। এক কথায় ইহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'। ইহা একপ্রকার, অলৌকিক আনন্দ ও জ্ঞানময় সহৃদয়-সংবেদ্য অনির্ব্বচনীয় বস্তু, সহৃদয়গণের আস্বাদই ইহার একমাত্র প্রমাণ। §

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উল্লাসের প্রতিপাদ্য

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উল্লাসে শব্দ ও অর্থের স্বরূপ-নিরূপণপ্রসঙ্গে বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক ভেদে ত্রিবিধ শব্দ এবং বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য ভেদে ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ এবং লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাহাদের অবান্তর ভেদ প্রভৃতি বহু দুরূহ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।



খড়্গবন্ধঃ [উমাস্তুতি-চিত্রম্]

[মারারিশক্ররামেভমুখৈরাসাররংহসা।
সারারব্ধস্তবা নিত্যং তদর্ত্তিহরণক্ষমা ॥
মাতা নতানাং সংঘট্টঃ শ্রিয়াং বাধিতসম্ভ্রমা।
মান্যাথ সীমা রামাণাং শং মে দিশ্যাদুমাদিজা ॥

ইহাতে খড়্গমুষ্টির সম্মুখবর্ত্তী 'মা', পশ্চাদ্বর্ত্তী 'মা' এবং খড়্গের অগ্রভাগস্থিত 'মা' এই তিনটি বর্ণ শ্লিষ্ট। খড়্গমুষ্টির সম্মুখস্থ 'মা' বর্ণটি হইতে শ্লোকের আরম্ভ। ঐ 'মা' বর্ণটি পাঁচবার, পশ্চাদ্বর্ত্তী 'মা' বর্ণটি দুইবার এবং অগ্রভাগস্থিত 'মা' এই বর্ণটি দুইবার উচ্চারণ করিয়া পড়িলে শ্লোকটি সম্পূর্ণ হইবে।]

---

* "কাব্যস্যাত্মনি অঙ্গিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্ বিমতিঃ।"
(ব্যক্তিবিবেক)

† 'বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।' (অগ্নিপুরাণ)

‡ 'নায়ং জ্ঞাপ্যঃ স্বসত্তায়াং প্রতীত্যব্যভিচারতঃ।' (বিশ্বনাথ)

§ কাব্যার্থ-পর্য্যালোচনায় যে রসবোধ হয়, তাহা একমাত্র স্বাদনা (অথবা ব্যঞ্জনা)-গম্য। সেই কাব্যের অন্তর্গত কোন শব্দের অভিধা বা লক্ষণাশক্তি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, অভিধা বা লক্ষণা-শক্তি তাহা প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ, তা ছাড়া, অভিধা-প্রতিপাদ্য মুখ্যার্থের অন্বয়ে বাধা না থাকিলে লক্ষণার প্রবৃত্তি হয় না—

"শ্রুতান্বয়াদনাকাঙ্ক্ষং ন বাক্যং হ্যন্যদিচ্ছতি।
পদার্থান্বয়-বৈধুর্য্যাৎ তদাক্ষিপ্তেন সংগতিঃ ॥" (কুমারিলাচার্য্য)

চতুর্থ ও পঞ্চম উল্লাসের প্রতিপাদ্য

চতুর্থ ও পঞ্চম উল্লাসে ধ্বনি-নিরূপণপ্রসঙ্গে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই নয়টি রস, ইহাদের স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব এবং বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি প্রভৃতি ধ্বনির ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কোপ, ঔৎসুক্য ও লজ্জা প্রভৃতি ভাবের উদয়, সংমিশ্রণ, সবলতা ও প্রশমনের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ উল্লাসের প্রতিপাদ্য

ষষ্ঠ উল্লাসে শব্দগত বৈচিত্র্য ও অর্থগত বৈচিত্র্য দুইটি উদাহরণসহ নিরূপিত হইয়াছে।

সপ্তম উল্লাসের প্রতিপাদ্য

সপ্তম উল্লাসে কাব্যের অপকৃষ্টতাপ্রয়োজক বহুবিধ দোষের উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা শ্রুতিকটু, চ্যুতসংস্কার, (ব্যাকরণ-দুষ্টতা) অনৌচিত্য, নিরর্থকতা, অবাচকতা, বিরুদ্ধ-বুদ্ধিজনকতা, ছন্দোভঙ্গ, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, প্রক্রমভঙ্গ, বক্তব্য বিষয়ের অপরিস্ফুটতা, পদ ও সমাসের অযথাস্থানে প্রয়োগ, অশ্লীলতা, পুনরুক্তি, হেতু উপন্যাস না করা, লোকবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করা ইত্যাদি।

এই দোষগুলিও যে আবার স্থানবিশেষে দোষ না হইয়া গুণরূপে পরিণত হইবে, একথাও বলা হইয়াছে। যেমন, যে ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে তাহার উক্তিতে 'ন্যূন-পদতা' দোষ না হইয়া গুণই হইবে; কারণ, আনন্দের আতিশয্যে দ্রুত ও গদগদ ভাষায় তাহাই স্বাভাবিক এবং বৈচিত্র্যাবহ। যে ব্যক্তি ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ভাষা ওজস্বিনী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সুতরাং তাহার উক্তিতে 'শ্রুতিকটুত্ব' দোষাবহ হইবে না—ইত্যাদি।

অষ্টম উল্লাসের প্রতিপাদ্য

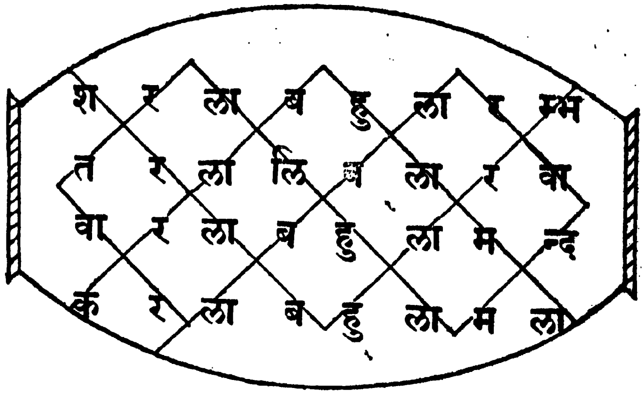
অষ্টম উল্লাসে ওজঃ, মাধুর্য্য ও প্রসাদ এই তিনটি গুণ নিরূপিত হইয়াছে এবং প্রাচীন আলংকারিক দণ্ডীর উক্ত দশবিধ গুণ যে এই তিনটি গুণেরই অন্তর্গত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

নবম উল্লাসের প্রতিপাদ্য

নবম উল্লাসে চিত্রালংকার, বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও পুনরুক্ত-বদাভাস প্রভৃতি শব্দালংকার নিরূপিত হইয়াছে এবং ইহাদের অবান্তর ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রালংকার সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অমূল্য সম্পদ্। ইহা সুধীসমাজের অতীব উপভোগ্য। ইহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র শব্দসম্পদ দর্শন করিয়া বুদ্ধিমান্ সাহিত্যিকগণের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। শব্দ সন্নিবেশের চাতুর্য্যে কতকগুলি বর্ণ শ্লিষ্ট হইয়া পদ্ম, খড়্গ, মুরজ, চক্র প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র চিত্রে সমাবেশিত হইবার যোগ্য হইলে তাহাকে চিত্রালংকার বা চিত্রকাব্য বলা হয়। এতাদৃশ শ্লোকগুলি পদ্মবন্ধ, খড়্গবন্ধ, চক্রবন্ধ, মুরজবন্ধ, ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রালংকার সমাদর লাভ করিয়াছিল। অগ্নিপুরাণে পদ্মবন্ধ, চক্রবন্ধ, গোমূত্রিকাবন্ধ, বজ্রবন্ধ, মুষলবন্ধ, অঙ্কুশবন্ধ, পুষ্করিণীবন্ধ প্রভৃতি বহুবিধ বন্ধের নামোল্লেখ দেখা যায়। *

কাব্যপ্রকাশে ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ আছে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের



মুরজবন্ধঃ [শরচ্চিত্রম্]

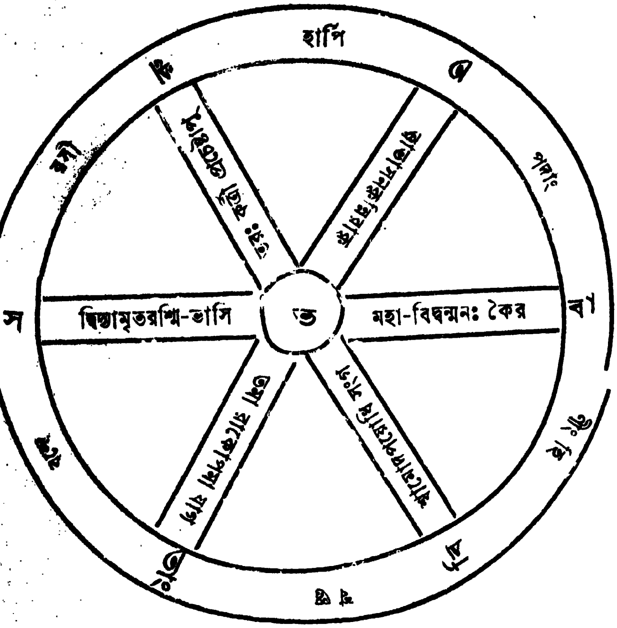
[বামদিক্ হইতে সাধারণ নিয়মে অক্ষরগুলি পড়িলেই শ্লোক সম্পূর্ণ হইবে। বৈচিত্র্য এই যে, প্রত্যেক পাদের প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে এবং উপরের দিকে রেখানু-সারে পড়িয়া গেলেও শ্লোকটি পড়া চলিবে। দ্বিতীয় পাদের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে উঠিয়া নীচে মধ্যবিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া আবার উপরে উঠিয়া নীচে নামিতে হইবে এবং তৃতীয় পাদের প্রথম হইতে নীচে নামিয়া উপরে মধ্যবিন্দু পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় নীচে নামিয়া উপরে উঠিতে হইবে। প্রথম ও চতুর্থ পাদ মধ্যবিন্দু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও পড়া যায়।]

সময়ে চিত্রালংকারের সমাদর কমিয়া আসিতেছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, কাব্যপ্রকাশকার "কষ্টং কাব্যমেতদতো দিঙ্মাত্রং প্রদর্শ্যতে" এই বলিয়া পদ্ম, খড়্গ, মুরজ ও সর্ব্বতোভদ্র বন্ধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই অবশিষ্ট বহুপ্রকার বন্ধকে "শক্তিমাত্রপ্রকাশকাঃ" বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আলংকারিক সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কেবলমাত্র পদ্মবন্ধের একটি

---

* গোমূত্রিকার্দ্ধভ্রমণে সর্ব্বতোভদ্রমম্বুজম্।
চক্রং চক্রাব্জকং দণ্ডো মুরজশ্চেতি চাষ্টধা।
বাণ-বাণাসন-ব্যোম-খড়্গমুদ্গরশক্তয়ঃ।
দ্বিচতুর্থত্রিশৃঙ্গাটা দম্ভোলিমুষলাঙ্কুশাঃ।
পদং রথস্য নাগস্য পুষ্করিণ্যসিপুত্রিকা। (অগ্নিপুরাণ)

উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই "কাব্যান্তর্গড়ু (গ্রন্থি)ভূত" বলিয়া অন্যান্তগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।



বৃহচ্চক্রবন্ধঃ [সরস্বতীস্তুতি-চিত্রম্]

[সন্বিদ্যামৃতরশ্মিভাসিতমহাবিদ্বন্মনঃকৈরবা
বিদ্যামোদপয়োধিসংগততরঃ কর্ত্রী প্রচেষ্টাপুরঃ।
ভব্যাভাসনকৃন্নিরাকৃততমা রাকোপমা যাগতাং
তাং বন্দে সরসীরুহার্পিতপদাং বাণীং হি বিশ্বস্তুতাং ॥

ইহাতে চক্রনাভিস্থিত বর্ণ এবং প্রত্যেকটি অরদণ্ড (চাকার পাখি) ও চক্রনেমির সন্নিহিত বর্ণগুলি শ্লিষ্ট। নাভিস্থিত বর্ণ ও তৃতীয় পাদের অন্তিম বর্ণটি তিনবার করিয়া এবং অবশিষ্ট শ্লিষ্ট বর্ণগুলি দুইবার উচ্চারিত হইবে।]

চিত্রকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ্। ইহার অনুশীলন ছাত্র ও পণ্ডিতসমাজে প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধের সহিত চিত্রকাব্যের কয়েকটি সচিত্র উদাহরণ দেওয়া হইল, ইহার কয়েকটি কাব্য-প্রকাশকারের এবং কয়েকটি আমার নিজের রচিত।

অগ্নিপুরাণে * ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সুধীগণ নিজ বুদ্ধিবলে আরও নানাবিধ বন্ধের উদ্ভাবন করিতে পারেন। লতাবন্ধ, নৌকাবন্ধ † প্রভৃতি আরও অনেক বন্ধ পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত আছে।

দশম উল্লাসের প্রতিপাদ্য

কাব্যপ্রকাশের দশম উল্লাসে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, তুল্যযোগিতা, রূপক, দীপক, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান্, অসংগতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক অর্থালংকার উদাহরণ সহ নিরূপিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ অলংকারসম্বন্ধীয় অপরাপর বহু তথ্য আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কাব্যপ্রকাশের একটি উত্তম সংস্করণের অভাব অনুভূত হইতেছিল। সম্প্রতি কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা হইতে বঙ্গীয় পণ্ডিত মহেশ্বর ন্যায়ালংকার কৃত আদর্শ-টীকা নামক একটি প্রাচীন টীকা ও প্রয়োজনীয় বহু তথ্যপূর্ণ টিপ্পনীর সহিত এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্য-প্রকাশের বহু টীকা থাকিলেও তদ্দ্বারা ইহার দুরূহতা নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার কারণ, টীকাগুলি প্রায়শঃই জটিল। আদর্শ-টীকা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। টীকাকার টীকার শেষে বলিয়াছেন—

কাব্যপ্রকাশস্য কৃতা গৃহে গৃহে
টীকা তথাপ্যেষ তথৈব দুর্গমঃ।
সুখেন বিজ্ঞাতুমিমং য ঈহতে
ধীরঃ স এতাং নিপুণং বিলোকতাম্ ॥

টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালংকার পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তাহা হইলে টীকাটি প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

---

* এতে বন্ধাস্তথা চান্যে এবং জ্ঞেয়াঃ স্বয়ং বুধৈঃ।
(অগ্নিপুরাণ)

† নিম্নে একটি নৌকাবন্ধের উদাহরণ প্রদত্ত হইল। স্থানাভাবে ইহা চিত্রে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইল না। এই শ্লোকটি আমার রচিত যুগ্মক শ্লোকদ্বয়ের অন্যতর—

ত্রিদিববসতিভাজা জাহ্নবীবীচিযাত্রি-
ত্রিপুরহরমুরারিধ্যানযুগ্মানসেন।
নতজনভববারিত্রাণপোতাঙ্ঘ্রি পত্রি-
ত্রিভুবনশরণাস্যাং তারয়েত্যাকুল্যেন ॥

'।' চিহ্নিত বর্ণগুলি শ্লিষ্ট।

কাল মেয়ে

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

অপর্ণা এই আষাঢ়ে পনেরয় পড়ল।...

শৈলেশ বাবুর আহারে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই। প্রথমটিকে বিদায় করতে পারলে তাঁর অনেকখানি চিন্তার অবসান হয়। শান্তর বয়স এখন সবে এগার। চার বছর তবু সময় পাওয়া যাবে। সামান্ত ৪৫৲ টাকার কেরাণী হয়ে মেয়ের বিয়েতে নগদ দিতে যে তিনি নিতান্ত অক্ষম, তা তিনি প্রতিবারেই প্রত্যেককে বলে দেন। এ কথা শুনেও যদি কেউ রাজী হন, তবেই তিনি মেয়ে দেখান, নচেৎ শুধু আলাপেই ক্ষান্ত দেন, বড় জোর জলখাবার খাইয়ে ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা করেন।

আজ রবিবার। বালী থেকে এক ভদ্রলোকের অপর্ণাকে দেখতে আসবার কথা আছে। শৈলেশ বাবু তাই আজ আর কোথাও বার হন নি। নইলে ছুটির দিনে তিনি পাড়ার আড্ডায় গিয়ে সময় কাটিয়ে আসেন। ছেলেটি বি-এ পাশ করে সম্প্রতি ওখানকারই হাই-স্কুলে মাষ্টারী পেয়েছে। যাই হোক, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা তো পায়। পরে উন্নতি হতে পারে। তা ছাড়া ছেলের বাবা হরলাল বাবু বার্মিংষ্টেলভ্ কোম্পানীর বড় বাবু। অপু ওখানে পড়লে বর্ত্তে যাবে। শৈলেশ বাবু আপন মনে অনেক কিছু ভেবে গেলেন। এ পাত্রকে হাতছাড়া করতে তিনি কিছুতেই রাজী নন। এতে যদি কিছু দিতে হয় দেবেন। ভাল ছেলে কি এমনি পাওয়া যায়! এই কথাটি তিনি স্ত্রী কমলমণিকে বোঝাচ্ছিলেন।

কমলমণি বললেন, "তা এরকম পাত্র কি বিনা পণে পাওয়া যায়? যদি তাঁরা পাঁচ সাত শ' হেঁকে বসেন দিতে হবে বৈ কি! তা'ছাড়া অপুই যখন হবে ওঁদের একমাত্র বউ, সুখেই থাকবে বলে মনে হয়।"

শৈলেশ বাবু বললেন, "তা তো থাকবে, কিন্তু মেয়ে যা ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, তাতে অত সুখ ওর ভাগ্যে সইলে হয়।"

"অমন অলক্ষণে কথা ব'লো না। অপুর মত মেয়ে আর একটা খুঁজে বার কর দেখি? না-ই বা রইল রঙ। অমন কাজের মেয়ে-"

বাধা দিয়ে শৈলেশ্বর বাবু বললেন, "নিকুচি করেছে তোমার কাজের। কাজ না শিখে গান আর একটু আধটু নাচতে যদি শিখত,এতদিন কি আর ওর বিয়ে আটকে থাকত? শান্তাকে না খেয়েও এবার থেকে গান শেখাতে হবে। মনীশ নাকি বেশ গান-টান জানে? ওকে বলে কয়ে দু'চারখানা শিখিয়ে নিতে হবে।"

"হ্যাঁ, তা শিখিও; কিন্তু এ দায় থেকে মুক্তি পেলে তো।"

"জগদীশ্বর কি এমন হবেন! তিনি কি আমাদের পানে মুখ তুলে চাইবেন না? দিন নেই রাত নেই, নিয়তই তো ডাকছি।"

"দেখ ভদ্রলোকেরা আবার কি বলেন। যা ভাঙ্গা-কপাল আমাদের।"

কমলমণি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে রান্নাঘরের পানে চলে গেলেন। ভাত চড়িয়ে এসেছেন, যদি ধরে যায়। অপর্ণা আর সবই করে, কেবল রান্না ছাড়া। কমলমণি মাঝে মাঝে ঝালটা ঝোলটা করিয়ে নেন। কোনদিন বা নুন বেশী হয়, কোনদিন বা ধরে যায়। শৈলেশ বাবু অপর্ণাকে আগুনের দিকে মোটেই ঘেঁসতে দেন না। বছর তিনেক আগে না কি সে একবার রাঁধতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে ফেলেছিল, সেই থেকে কমলমণিও অপুকে আর উনানের দিকে যেতে দেন না। শেষে কি হিতে বিপরীত হয়ে যাবে! সব মেয়েই কি বিয়ের আগে রান্না-বান্না-নিপুণা হয়ে ওঠে। নিজেই কি জানতেন ওসব কিছু বিয়ের আগে। দায়ে পড়লে সবই হবে।

অপর্ণা বাটনা বাটছিল।...

কমলমণি সোহাগ-মেশান স্বরে বললেন, "অপু, আজ দুপুর বেলা যেন কোথাও যাসনি—বুঝলি?"

অপর্ণা জানত যে, তাকে আজ দেখতে আসবে। ঘাড় নেড়ে তার নিজের মতামত জানিয়ে পুনরায় সে হলুদ বাটতে লাগল। শান্তা এসে তাড়া দিয়ে গেল, "মা ভাত হয়েছে ?"

অপর্ণা ধমক দিয়ে বললে, "যা এখন, আটটা বাজতে না বাজতে ভাতের তাড়া।"

শান্তা বলল, "আজ যে ইস্কুল থেকে জু দেখাতে নিয়ে যাবে।"

"যা যেতে হবে না"—ঝাঁঝাল মেজাজে অপর্ণা বললে।

কমলমণি বললেন, "বকিসনি মা ওকে, কোথাও তো যেতে পায় না। যদি নিয়ে যায় ইস্কুল থেকে, যাক গে—"

শান্তা চলে যাবার সময় বলে গেল, "নটার মধ্যে ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। রাণীদি বলে দিয়েছেন।"

বাটনা শেষ করে শিলখানা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে অপর্ণা আনাজের চুপড়ি নিয়ে বসল। সংসারে সে আছে বলে কমলমণির এদিকে কিছুই দেখতে শুনতে হয় না। কি রান্না হবে, কতটা কি কুটতে হবে, কোন্ জিনিষটা আনাতে হবে, কোন হিসেব তাঁর রাখতে হয় না। অপর্ণাই সব করে। অবস্থার দরুণ তাকে ইস্কুলে পড়িয়ে লেখাপড়া শেখাতে শৈলেশ বাবু যদিও পারেননি, কিন্তু সে নিজের চাড়ে 'কথামালা' শেষ করে 'সাহিত্য-প্রসূন' আরম্ভ করেছে। ফার্ষ্ট বুকেরও কিছু কিছু সে শিখে ফেলেছে। সাধারণ গেরস্ত-ঘরের পক্ষে সে যা শিখেছে তাই যথেষ্ট। সংসারের হিসেব-নিকেশ বাপের চেয়ে সে-ই বেশী বোঝে।

তবু অপর্ণার আজও বিয়ে হ'ল না। যিনিই দেখতে আসেন—বলেন, মেয়ের সব ভাল, কিন্তু বড় কাল মেয়ে।

শৈলেশ বাবু মেয়ের কার্য্যকলাপে যারপরনাই খুসী ছিলেন। তাঁর এ মনের জোর ছিল যে, অপুর বিয়ে দিতে তাঁর কোনদিনই আটকাবে না। অপু মেয়ে নয় তো, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু আজ ছ'বছর ধরে যখন এত চেষ্টা করেও তার একটা বর জোটাতে পারলেন না, তিনি বেশ মুসড়ে পড়লেন। তা মুসড়ে পরবার কথাই বটে। সামান্য ৪৫্ [illegible] উপর নির্ভর! তার উপর ভেবে ভেবে তাঁর শরীর [illegible] হয়ে গেছে। অপুর বিয়ে দিয়ে তিনি দিনকতক ছুটি [illegible]। এ শরীর নিয়ে আর আট ঘণ্টা কাজ করা চলে না।

শান্তা কান্না-কাটি সুরু করে দিয়েছে সাড়ে আটটা বাজতেই। সে আর একমিনিটও বাড়ীতে থাকবে না। না খেয়েই চলে যাচ্ছিল, শৈলেশ্বর বাবু তাকে আদর করে ডেকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন।

কমলমণি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "অপু যদি বা পার হয়ে যায়, ওকে পার করতে দেখবে'খন তখন কত বেগ পেতে হয়। এখন থেকে আদর দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে ধিঙ্গি করে তুলছ।"

শৈলেশ বাবু অপর্ণাকে ওর ভাত দেবার কথা বলছিলেন। বক্তব্য শেষ করে বললেন, "তুমি সবেতেই কেবল আদর দেখ। না খেয়ে পিত্তি পড়লে তখন সাম্‌লাবে কে ? সে তো করতে হবে আমাকেই ?"

গরম ভাতের থালাটা নিয়ে এসে অপর্ণা বলল, "খাবি আয় শান্ত। আমি খাইয়ে দি—টপ্ করে হয়ে যাবে।"

শৈলেশ বাবু বললেন, "যাও, দিদি আদর করে ডাকছে, খেয়ে নাওগে। না খেয়ে গেলে অসুখ করবে যে মা!"

শান্তা শান্ত মেয়ের মত এগিয়ে গেল।

খাইয়ে দিতে দিতে অপর্ণা বললে, "ন'টা বাজতে এখনো ঢের দেরী। গিয়ে দেখবি'খন কেউ আসেনি।"

শান্তা বললে, "না, আসেনি! তোমায় বলেছিল!"

কোনও রকমে অর্দ্ধেক খেয়ে শান্তা উঠে পড়ল। অপর্ণা এর বেশী তাকে খাওয়াতে কিছুতেই পারল না। ভাতশুদ্ধ থালাটা তুলে এনে অপর্ণা রান্নাঘরের এককোণে রেখে দিয়ে সতুকে ডেকে আনতে গেল।

সতু শ্লেটে লিখছিল আপন মনে। দিদিকে আসতে দেখে শ্লেটখানা বাঁকিয়ে ধরে বলল, "দেখ না কত লিখেছি। এক শ্লেট হয়ে গেছে।"

অপর্ণা বলল, "আজ তোমার ছুটি। খেয়ে নেবে চল, দুপুরে একটা রাজপুত্তুরের গল্প বলব।"

সতু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অপর্ণা শ্লেটখানা তুলে রেখে দিয়ে বলল, "আজ আর লেখে কাজ নেই, কাল লেখো।"

সতু বলল, "হুঁ—"

"চল, খাবে চল"—বলে অপর্ণা ছোটভাইটিকে সস্নেহে ডেকে নিয়ে গেল।

*

কমলমণি পাশের বাড়ী থেকে মালতীকে ডাকিয়ে এনেছেন অপর্ণাকে সাজিয়ে দেবার জন্যে। তিনি নিজে আর সব বিষয়ে পটু হলেও, সাজান ব্যাপারে নিতান্তই অনভ্যস্তা। যেনকার মেয়ে তিনি, তখন এত সব সাজান-র পাট ছিল না। কমী আটপৌরে সাড়ী পরে, চুল বেঁধে, পায়ে আলতা লাগিয়ে নিলেই তখন ষোল কলা পূর্ণ হত। এখন সাজান-র উপরই নির্ভর করে সব। কাকে কোন্ রঙের সাড়ী পরলে মানায় বেশী, কোন্ দিকের চুল ফাঁপিয়ে দিলে দেখায় সুশ্রী—এ সব এখনকার মেয়েদের শিখিয়ে দিতে হয় না। কমলমণি অতশত বোঝেন না।

মালতী খাটের উপর বার-করা সাড়ীখানা দেখে বলল, "আপনার কি এতটুকুও পছন্দ নেই কাকীমা? এই মেয়েকে কি ওই ফিরোজা রঙের কাপড়ে মানাবে? যদি সিপিয়া রঙের বা স্কাই-লাইট রঙের শাড়ী থাকে তো দিন।"

কমলমণি বললেন, "নেই তো মা আমার আর কোন রঙের সাড়ী। থাকবার মধ্যে আছে আমার বিয়ের বেনারসীখানা।"

অপর্ণা বললে, "বাবা যেখানা পূজার সময় এনে দিয়েছিলেন, সেখানা—"

কমলমণি ব্যগ্র হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ সেখানা আছে বটে। সেই যে কি বলে ডোরা ডোরা—"

"কাজ নেই কাকীমা, ও-সব বের করে। আমি নিয়ে আসছি"- বলে মালতী প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

মালতী চলে যেতে কমলমণি মিনতি জানিয়ে বললেন, "হে ঠাকুর, অপুকে আমার পার করে দাও। সিন্নি দেব।"

অপর্ণা লক্ষ্য করছিল মার মানত, শুনছিল তাঁর অনুনয়। তার মনের মধ্যে উঠল একটা দারুণ ঝড়। সে কি বোঝে না যে, তার জন্ত এদের খেয়ে-বসে পর্য্যন্ত সুখ নেই। সে কি বাবার মুখে উদ্বেগের রেখাগুলির ইঙ্গিত বুঝতে পারে না! সবই বোঝে—কিন্তু কি করবে সে? বিয়ে—বিয়েটা জীবনের কি তীব্র পরিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে! নিজের জীবনের বিনিময়ে সে যদি বাবার মুখে নিরুদ্বেগের শুভ্র সরলতা ফুটিয়ে তুলতে পারত! এবার সে বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে—জানিয়ে দেবে যে-কথাটি এতদিন সে অন্তরের অপার রহস্যতলে পুষে রেখেছিল সযত্নে। অন্তর তার কালি হয়ে উঠল, অকস্মাৎ মেঘের প্রাচুর্য্য আকাশকে যেন কালিমায় ঢেকে ফেললে।

কমলমণির হৃদয়ে উদ্বেগ, অন্তরে ব্যাকুলতা। কি যে তাঁকে শুনতে হবে! অপর্ণাকে যাঁরা দেখতে এসেছেন, সেই তিনটি লোকের হাতে রয়েছে যেন এই কটি প্রাণীর জীবনমরণ। ইচ্ছে করলেই তাঁরা বাঁচাতে পারেন। শুধু একটি কথা—একটি কথার এত মূল্যও যে হতে পারে, তা ছিল কমলমণির অজ্ঞাত। তিনি নিয়তই পরমেশ্বরের নিকটে মনে মনে কত কি প্রার্থনা করেছেন। সতুর সেবার যখন টাইফয়েড হয়, তখনও বোধ হয় তিনি এর চেয়ে কম ভেবেছিলেন। ভাবনা কি সাধে হয়! কতটা অনিশ্চিতকে তিনি গোপনে গোপনে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন। উপায় কি! অপুকে তো তা বলে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারেন না। পয়সাই না হয় তাঁদের নেই, কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত সুনাম তো দারিদ্র্য কেড়ে নিতে পারে নি।

অপর্ণা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্তরের অন্তরালে আত্মা তার সজাগ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত দেখে দেখে তার এ-টুকু বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, তার বিয়ে হতে পারে না। যে দুটি সম্পদের জোরে মেয়েদের বিয়ে হয়, কোনটাই তার নেই। যদি সে গরীবের না হয়ে ধনীর মেয়ে হতে পারত, তা হলে সমাজ এমন করে রুপে দাঁড়াতে পারত না। ভাগ্য—এ তার কপাল। নইলে সেবার আশীর্ব্বাদের কথা সব ঠিকঠাক্। এমন সময় সংবাদ এল, পাত্র কলেরায় মারা গেছে। সে ঘটনাও দেখতে দেখতে আজ দু' বছরের পুরানো হয়ে গেল।

মালতী আসতেই কমলমণি বললেন, "আমি যাই, জল-খাবারগুলো সাজিয়ে রাখি গে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি যান কাকীমা, এদিকে আপনাকে কিছু দেখতে হবে না।"

কমলমণি বিনা দ্বিধায় চলে গেলেন।

মালতী বলল, "চুলটায় একটু তেল দিয়ে এস। সামনেটা যেন কাকের বাসা হয়েছে।"

অপর্ণা তাই করল। আজ তাকে মরতে বললেও সে তাই করবে। বাবাকে চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিয়ে সে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়।

চুল বেঁধে দিয়ে মালতী বলল, "মুখখানা রুমাল দিয়ে ঘসে নাও। আমি ততক্ষণ হাতটা ধুয়ে আসি।"

মালতী ফিরে এলে নিজের মফ-চেনটা ঝুলিয়ে দিল তার গলায়। দু'একটা অন্যান্য অলঙ্কারও তাকে পরিয়ে দিল। অপর্ণা আপত্তি তুলেছিল। বলেছিল, "ও সব পরলেই বা কি হবে।"

মালতী বলেছিল, "ক্ষতি কি ভাই? না পরলে আমার ভারী দুঃখ হবে।"

অপর্ণা আজ সব কিছু করতে পারে। আজ তার ভাগ্য-পরীক্ষার দিন এসেছে। মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে রূপটাই সকলের আগে উঁকি মারে—এ সে জানে। সে সেজেগুজে ঠিক হয়ে রইল। তার মনেতে এসেছে দুর্ভাবনার পাহাড়, না জানি এঁরাও কি বলবেন! তার কি এতটুকুও রূপ নেই, এতই কি সে কদর্য্য যে, কেউই তাকে পছন্দ করে না? আজ মনে মনে সে পণ করে বসল, এর পর আর সে কারুর সামনে বেরুবে না। নিজেকে এতটা সস্তা করে দিতে সে কিছুতেই আর রাজী হবে না।

শৈলেশ বাবু ভিতরে ঢুকে বললেন, "হয়েছে রে মালতী—"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু—"

"তা হলে চল মা—" অপর্ণার হাত ধরে শৈলেশ বাবু বারান্দার দিকে এগোলেন।

অপর্ণা নমস্কার করে আসনে মুখ নীচু করে গিয়ে বসল।

হরলাল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি মা?"

"—কুমারী অপর্ণা রায়।"

তারপর পড়াশুনা, কাজকর্ম্ম, শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন। যে সমস্ত প্রশ্ন সাধারণতঃ মেয়ে দেখতে এসে সকলেই করে থাকেন। সব শেষ হলে পর হরলাল বাবু বললেন, "আমাদের সব কিছু জিগ্‌গেস করা হ'য়েছে—তুমি যাও মা।"

অপর্ণা পুনরায় নমস্কার করে ফিরে গেল।

শৈলেশ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখলেন হরলাল বাবু?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। আমাদের গেরস্ত-ঘরে কাজ-কর্ম্মই যখন করতে হবে, তখন রূপ দেখতে গেলে তো আর চল্‌বে না। আর তা' ছাড়া কি জানেন শৈলেশ বাবু, সদ্বংশই হচ্ছে প্রধান।"

তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিতে এসে শৈলেশ বাবু বললেন, "তা হলে আশীর্ব্বাদের দিনটা আপনার ওখানে গিয়ে একদিন ঠিক করে আসব'খন, কি বলেন হরলাল বাবু?"

মোটরে চেপে হরলাল বাবু বললেন, "হ্যাঁ, যাবেন, কিন্তু ইতিমধ্যে নবেন্দু আর তার বন্ধু-বান্ধবেরা একদিন এসে দেখে যাবে। জানেন তো, আজকালকার ছেলে! বাপ-মার পছন্দের ওপর তাদের আর বিশ্বাস নেই।"

"বেশ তো—"

"তা হ'লে আসছে রবিবারেই তারা আসবে। কি বলেন? কোন অসুবিধে হবে না তো?"

"না, না, অসুবিধে আবার কিসের!"

"আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন শৈলেশ বাবু। এ মেয়েকে আমি বৌ করে ঘরে নিয়ে যাবই।"

"সে আমার পরম সৌভাগ্য হরলাল বাবু।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার—নমস্কার।"

একটি সপ্তাহ কেটে গেল কোথা দিয়ে তা' না জানতে পারলেন শৈলেশ বাবু, না পারলেন কমলমণি। এতদিন পরে ভগবান তাঁদের পানে মুখ তুলে চেয়েছেন। কমলমণি নানা দেবদেবীর নিকটে নানা প্রকার মানত করে বসেছেন। তাঁর আনন্দের সীমা নেই। অপুকে তিনি সুপাত্রস্থ করতে পারবেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে। শৈলেশ বাবুর চেহারায় এই ক'দিনে একটা প্রফুল্লতার গরিমা দেখা দিয়েছে। অপর্ণা এখন কাজ করতে করতে খেই হারিয়ে ফেলে। শান্তা নেচে উঠেছে দিদির বিয়ের কথা শুনে। সতুর আনন্দ হয়েছে, আজ তাকে পড়তে হবে না।

দুপুর থেকেই বাড়ীতে ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। উনানে আঁচ পড়েছে। কমলমণির আজ দিবা-নিদ্রা বন্ধ। অপর্ণা দুপুরে পশমের আসনখানা শেষ করবে মনে করে চিলের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। শেষ করা দূরের কথা—কাজ একটুও এগোয়নি। কেবলই ভেবেছে, অতীত জীবনের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিসদৃশতা। শান্তা, সতু—যাদের সে বুকে পিঠে করে মানুষ করে তুলেছে—তা পর হয়ে যাবে।

সে কেঁদে ফেলল। বিয়ে যদি তার না হত! সতু তার কাছে না শুলে সে ঘুমতে পারে না। সে চলে গেলে সতু কত কাঁদবে। অপর্ণা হাতের কাজ সব সেখানে ফেলে রেখে নীচে নেমে এল। আজ তার কিছু ভাল লাগছে না। একখানা বই নিয়ে সে কত চেষ্টা করছিল ঘুমোবার জন্য, তবু ঘুমতে পারল না।

দুটো বেজেছে। এখন সে করবেই বা কি! মা'কে রান্নাঘরে গিয়ে যে সাহায্য করবে, তারও জো নেই। বাবা পই পই করে আজ রান্নাঘরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। শেষে কি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে। অপর্ণা বাবার কথা কোনদিনই অবহেলা করতে পারে নি—আজও পারল না। সে মনে মনে রচনা করে চল্‌ল অনেক কিছু। এই স্তব্ধতায় ভরা বাড়ীখানি সেদিন কতখানি মুখরিত হয়ে উঠবে, যেদিন তার বিয়ে হবে। এখন থেকে তার ভাবনা হয়েছে, এদের সবাইকে ছেড়ে সে সেখানে গিয়ে থাক্‌বে কি করে। যাবার সময় সে সতুকে নিয়ে যাবেই। সতু ঘুমোচ্ছিল—অপর্ণা তার পাশে গিয়ে বস্‌ল। অপর্ণাকে সে মার চেয়েও ভয় করে বেশী, আবার তেমনি ভালও বাসে। ও যেদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে দিদি নেই, কেঁদেকেটে রসাতল বাধিয়ে দেয়। এখানেও সে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারল না। আবার চিলে-কোঠায় গিয়ে উঠল। দু'একটা ফোঁড় দিয়েই তার অবসন্নতা এল। আজকের দিনটা তার কাছে বড় অলস ঠেকছে।

শৈলেশ বাবু বাইরের ঘরখানা সাজিয়ে তকতকে করে রেখেছেন। সাদা ফরাশে মেঝেটি মুড়ে দিয়েছেন। নিজেই সকাল থেকে ঘরের ঝুল ঝেড়ে ঝক্‌ঝকে করে ফেলেছেন। আজ সকল দৈন্যকে তিনি তাড়িয়ে দিতে চান। হরলালবাবু চিঠিতে জানিয়েছেন, নবেন্দুর যদি পছন্দ হয়, আসছে সত্তেরই শুভকাজটা সুসম্পন্ন করতে তাঁর কোন অমত নেই। শৈলেশ বাবু ঠিক করে রেখেছেন, অফিস থেকে হাজার খানেক টাকা ধার করবেন। যা হোক্, কনে-সাজান দু'চার খানা গয়না তো দিতে হবে। চুড়ি, হার, মাথার ক্লীপ ছাড়াও ব্রুচ, অনন্ত, কমদামের বার মাস পরবার জন্যে গলায় একটা কিছু তো দিতে হবে। লোকজন খাওয়ানোতেও শ' তিনেক প্রায় যাবে। সব হিসেব করে তিনি ঠিক করে রেখেছেন—হাজার টাকার দরকার। আফিসের বারীনবাবুর ভাই বড় ঘড়ির দোকানে কাজ করেন। তাঁকে ঘড়ি কিন্‌তে দিলে কিছু কমে পাওয়া যাবে। এমন সব কত কিছুই তিনি মক্সো করে রেখেছেন, যাতে না কোন ত্রুটি হয় তাড়াতাড়ির দরুণ।

পাড়ার বিনয় মুখুয্যে রাস্তা দিয়ে আড্ডায় যাচ্ছিলেন। শৈলেশ বাবু তাঁকে দেখতে পেয়ে ডেকে বললেন, "জানেন মুখুয্যে মশাই, অপুকে আজ দেখতে আস্‌ছে। ছেলের বাপ দেখে শুনে পছন্দ করে গেছেন। আজ আস্‌ছে ছেলে নিজে।"

"তা বেশ। কত দিতে হচ্ছে ভায়া?"

"দিতে তেমন কিছু হ'বে না। মোটামুটি যা না দিলে নয়।"

মুখুয্যে মশাই বিজ্ঞের মত বললেন, "অমন মেয়ে পাচ্ছে—"

"ছেলে বি-এ পাশ"—গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে শৈলেশ বাবু বল্‌লেন,—"বাপের ঐ এক ছেলে।"

"গেরস্তর ঘরে ওর বেশী আর কি হবে।"

"এর বেশী আশাও করিনি মুখুয্যে মশাই। সামান্য অবস্থা, ভাল ছেলে খুঁজতে গেলে অত টাকা কোথায় পাব?"

"তাঁদের নিবাস কোথা?"

"বালী—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ওখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের বাস। আমারই এক ভাইপোর ওখানে বিয়ে হয়েছে। খাসা গ্রাম।"

বিনয় মুখুয্যে চলে গেলেন। শৈলেশ বাবু ভিতরে ঢুকে কমলমণিকে তাড়া দিয়ে গেলেন, "চারটে যে বাজল! বলি, রান্না-বান্না সব হয়ে গেছে তো? অপু গেল কোথায়? তাকে গা-টা ধুয়ে আসতে বলে দিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ, সে গা ধুতেই গেছে মালতীদের বাড়ী।"

"মালতী অপুকে ভারী ভালবাসে, না?"

কমলমণি বল্‌লেন, "আমায় ও বল্‌ছিল কি জান? ফুল শয্যের দিন তাকে নিয়ে যেতে হবে। অত লেখাপড়া জানা মেয়ে কিন্তু এতটুকুও দেমাক নেই।"

"যেমন বাপ, তার উপযুক্ত মেয়েই বটে! চরণদা' যেন মাটির মানুষ।"

"তুমি বরং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক গে। আস্‌বার সময় হয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ, তাই যাই—" বলে শৈলেশ বাবু বেরিয়ে গেলেন। খানিকটা গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, "তুমি মালতীকে বলে দিও যেন সাজিয়ে ঠিক করে রাখে।"

"সে হবে'খন। তুমি যাও।"

শৈলেশ বাবু ফরাসে গিয়ে বসে রইলেন।

পাঁচটা বাজে, এমন সময় নবেন্দু তার দু'জন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। শৈলেশ বাবু রাস্তায় নেমে গিয়ে বললেন, "এস, বাবারা এস।"

তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। এতে আমরা ভারী লজ্জিত—"

"তাতে কি হয়েছে বাবা? তোমরা আমার ছেলের সামিল। এতে আর লজ্জার কি আছে!"

সেই ছেলেটিই নবেন্দুকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে আমাদের নবেন্দু।"

নবেন্দু দুহাত জোড় করে বাতাসে যেন মাথা ঠুকল।

"থাক—থাক বাবা। ঢের হয়েছে। হাত-পা, ধুয়ে ফেল, যা গরম পড়েছে।"

"না, না, থাক,—আপনাকে ওসব এগিয়ে দিতে হবে না। আমরাই নিচ্ছি।"

"তাতে কি হয়েছে, তোমরা কি আমার পর বাবা?"

"আপনি এদিক ছেড়ে বরং ও-দিকের ব্যবস্থাটা—"

শৈলেশ বাবু বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন।

প্রশ্নের উত্তরে কমলমণি জানালেন, "জায়গাটা হলেই ডেক।"

মালতী নিকটেই ছিল। বলল, "আপনি ডেকে আনুন কাকাবাবু। জায়গা আমি এখুনি করে দিচ্ছি।" মালতী ও-দিকে চলে গেল।

শৈলেশ বাবু বললেন, "সিল্কের পাঞ্জাবী পরা ছেলেটিই নবেন্দু।"

কমলমণি বললেন, "যাও তুমি ওদের ডেকে নিয়ে এস।"

শৈলেশ বাবু তাদের সঙ্গে করে বারান্দায় নিয়ে এলেন। নবেন্দু বসল মধ্যে। কমলমণি জানলার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মালতীতে দেখাচ্ছিলেন আর নিজেও দেখছিলেন।

মালতী বলল, "যাই বলুন কাকামী, চমৎকার চেহারা।"

কমলমণি স্থির দৃষ্টিতে নবেন্দুকে দেখতে লাগলেন।

মালতী ওঘরে গিয়ে অপর্ণাকে নবেন্দুর বর্ণনা জানিয়ে দিয়ে এল।

খেতে খেতে সেই ছেলেটিই বললে, "আপনি এত আয়োজন করেছেন যেন উঠতে আর আমাদের দেবেন না।"…

তারপর অপর্ণা এসে তাদের সামনে বসল।

প্রশ্ন হল নবেন্দুকে লক্ষ্য করে, "কর না যা জিজ্ঞেস করবার কি আছে?"

নবেন্দু বিহ্বল দৃষ্টিতে মাত্র একবার তাকিয়ে চুপি চুপি বলল, "তোমরাই জিজ্ঞেস কর ভাই।" প্রশ্ন খুব যৎসামান্যই হল।

তারপর এল বিদায়ের পালা। শৈলেশ বাবু মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখলে বাবা?"

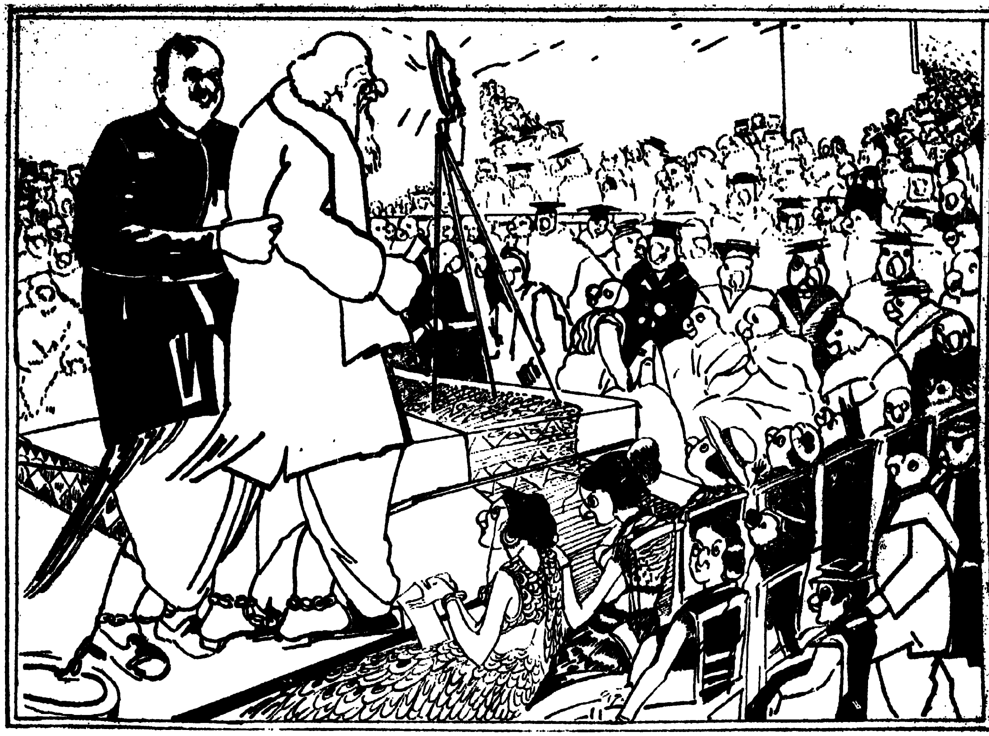
সেই ছেলেটিই উত্তরে জানাল, "নবেন্দু বল্‌ছে দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু রঙ্‌ ময়লা…।"

মোটর ছেড়ে দিল।…

একতা

…একতায় যে মানুষের উন্নতি হইয়া থাকে এবং কলহে যে মানুষের পতন হয়, তাহা গান্ধীজীর অনুচরবর্গ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের কোন উন্নতি যে হইতেছে না, তাহার বড় কারণ যে হিন্দু-মুসলমানের কলহ, তাহাও ঐ অনুচরবর্গ প্রায়শঃ অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার মূলে রহিয়াছে ইংরেজের প্ররোচনা। আমরাও বলি, ইংরেজের প্ররোচনায় ফলেই হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া এবং নানা রকমের দলাদলির উদ্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ইংরাজকে দায়ী করা যায় না।

মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে, তোমরা ইংরাজকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে এবং ইংরাজের শক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিবে, আর ইংরাজ সুবোধ ও সুশীল বালকের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা প্রকৃতির বিধির বিরুদ্ধ। কাজেই, হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের সঙ্গে যাহাতে ঝগড়া না হয়, তাহা করিতে হইবে।…



'টিয়া'-সম্মেলন [১৭ই ফেব্রুয়ারী ; কলিকাতা]



'শিক্ষা'-বিস্তারের ইতিকথা

অন্তঃপুর

নারী ও গৃহ

—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

বোধ হয় পাঁচ বৎসর বয়সেই মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সুরু হয়। রূপকথা শুনিতে শুনিতে মেয়েরা হয় তো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবে—'আমি যদি রাজকন্যা হইতাম।' তারপর একটু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনী নাইডু, স্বর্ণকুমারী দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রেটা গার্বো এবং বায়স্কোপের অন্যান্য অভিনেত্রী সকলেই মনের আকাশে ভিড় করে। হয় তো সে ভিড়ের মধ্যে দু'একজন পৌরাণিক মহীয়সী মহিলাও সমুজ্জ্বল থাকেন, কিন্তু সেই বহু-র মধ্য হইতে নিজের জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্রটিকে চিনিয়া বাহির করা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথচ জীবনের নানা প্রচেষ্টায় যে-সব নারী সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, আধুনিক কালে তাহাদের নাম, তাহাদের কথা, তাহাদের ছবিও তো বালিকাদের চোখ হইতে আড়াল করিয়া রাখা সম্ভব নয়। তাই আমাদের দেশের মেয়েরা যখন বড় হইয়া ওঠে, তখন জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি, তাহা তাহারাও জানে না, অপরেও বুঝিবার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হয়।

আসল কথা, বর্ত্তমান কালে আমাদের মেয়েদের সম্মুখে কোন আদর্শই নাই। কথাটা কেবল নীতির দিক্ হইতে বলা হইতেছে তাহা নয়। সাধারণ জীবন-যাত্রায় সুখী হইবার জন্য একটা কিছুকে বড় বলিয়া মানিতেই হইবে। নতুবা জীবনে যাহাই আসুক না কেন, সকলই মনে হইবে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। অতএব সুখী হইবার জন্য প্রয়োজন জীবনে একটা আদর্শের। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীদের সম্মুখে কোন্ আদর্শ রহিয়াছে? শিক্ষিতা মেয়েরা না কি এখন আর বিবাহ, গৃহস্থালী বা পাতিব্রত্যকে জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন না। যদি ধরা যায়, ইহা ভাল, তবে প্রশ্ন এই যে নারীদের সার্থকতা কোথায় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। এ প্রশ্নের জবাবে যে-কোনো দৃঢ় এবং বিশ্বাস-পূর্ণ উত্তর পাইলেই খানিকটা আনন্দিত হইবার কথা, কার[illegible] তাহাতে অন্ততঃ প্রমাণ হয় যে, মেয়েরা একটা ছাড়িয়া অন্য[illegible] ধরিতে পারিয়াছে। কিন্তু এই খানেই ঘোর সন্দেহ। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা কি বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়া[illegible] যে, রাজনীতিতে, অথবা সিনেমায়, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে[illegible] পরীক্ষায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারিলেই তাহাদে[illegible] জীবন সার্থক হইবে? অবশ্যই নয়। তাহারা শুধু শিখিতে[illegible] যে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে জীবন সার্থক হয় না, পাতিব্রত্য[illegible] জীবনের চরম কর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমান শিক্ষা সকল আদর্শকে ভাঙিয়া দিয়া এ-দেশের নারী-জীবনের হাল ভাঙিয়া দিয়াছে এখন তাহার গতি নির্দ্দেশ করিবে কে?

ইহা অবশ্যই আমাদের আধুনিক না-প্রাচ্য না-পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফল। সে শিক্ষা তো পুরুষও অনেকদিন ধরিয়া লা[illegible] করিতেছে, তবু নারীর সমস্যাটাই এত অল্প সময়ে এত ব[illegible] হইয়া দেখা দেয় কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, পুরু[illegible] যে-শিক্ষাই পাক, যাহাই বিশ্বাস করুক, তাহার জীবনে অন্তত একটা স্থির লক্ষ্য আছে যে তাহাকে উপার্জ্জন করিতে হইবে। এ লক্ষ্যটা সব দেশে এবং সব কালেই অল্পবিস্তর পুরুষের মধ্যে রহিয়াছে। তাই মতামত যত উগ্র ও আধুনিক হোক্ না কেন, সাধারণতঃ পুরুষ কোনোদিনই একেবারে এত সম্পূর্ণ আধুনিক হইতে পারে না যে, সে সর্ব্ব আদর্শ ও সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নিজেকেও সুখী মনে করিবে।

কিন্তু নারীর পক্ষে তাহা যেন সম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর নারীকে আমরা দেখিতে আশা করি গৃহিণীরূপে। সে গৃহিণীপনার মধ্যে সন্তানপালন আছে, স্বামীর সেবা ও যত্ন আছে, দাস-দাসীর পরিচালনা আছে, মোটের উপর গৃহে নারীই কর্ত্রী। কিন্তু গৃহিণী

যদি ভাবেন—ছেলেদের অত্যাচার সহিতে হয়—এ কি অসহ্য কষ্ট! সংসারের রান্নাবান্না দেখিতে হইবে, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখিতে হইবে, ঝি-চাকর তাড়না করিতে হইবে, এ কি বিষম অত্যাচার!—তবে ঘরকন্না তাঁহাকে হয়তো করিতেই হইবে, কিন্তু জীবন হইয়া উঠিবে বিষময়, কেবল তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার স্বামীর, তাঁহার সন্তান-সন্ততির—এমন কি তাঁহার দাস-দাসীর পর্য্যন্ত।

সেই জন্যই সংসারে সুখের জন্য জীবনে কি চাই, সে সম্বন্ধে নারীর মনে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল। এবং জীবনের ভেলাকে স্থির রাখিতে গৃহের প্রতি, স্বামীপুত্রের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে দৃঢ় নোঙর বোধ হয় আর নাই। আধুনিক মহিলারা যাহাই বলুন, পরিবর্ত্তিত শিক্ষার ফলে নারীকে আবার ফিরাইয়া আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী সুখী হইবে নারীই।

ইহারই পরীক্ষা আজ চলিয়াছে ইউরোপে। হিটলার ও মুসোলিনী যাহা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা এক কথায় নারীকে গৃহাভিমুখিনী করা। মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক তাহাতে ক্ষতি নাই, বৃহত্তর জগতের জীবন-স্রোতের সহিত সংস্পর্শ তাহার থাক্, কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে গৃহের ধর্ম্মই তাহার সকলের চেয়ে বড় ধর্ম্ম; সন্তান-পালনের কষ্ট তাহার মহিমাময় অধিকার। অর্থাৎ, যে-পুরুষ তোমার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, অর্থে, অলঙ্কারে, বাক্যে, পরিশ্রমে ও ভালবাসায় তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিতেছে, তাহাকে নিজে সুখী হইবার এবং তোমাকে সুখী করিবার সুযোগ দাও।

ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এ-মতবাদ ঠিক সাম্যবাদের পরিপন্থী নয় এবং নারীর পক্ষে অপমানজনকও নয়। নারীর কোমল হাতে স্থূল দৈহিক শ্রম-সাপেক্ষ কাজ মানায় না। কিন্তু ছোটখাট খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম কাজ তাহার হাতে ভারী সুন্দর হয়। তাই নারীর বেশ-রচনায়, এখানে একটি ফুল, ওখানে একটি অলঙ্কার যেমন নারীই সাজাইতে পারে, তেমনি গৃহের খুঁটিনাটিও তাহারই হাতে সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। তাই সেই গৃহের ভার তাহারই উপর। ইহা তো অপমানের কথা নয়। ইহা শুধু জীবনের ব্যবসায়ে (?), partnership-এ পুরুষের সহিত কাজের ভাগাভাগি (division of labour)। কেবল নারী-পুরুষের মধ্যেই যে এই কাজের ভাগাভাগি রহিয়াছে তাহা নয়। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্ব কাজেই এই কাজ ভাগ করিয়া লওয়ার প্রথা চলিতেছে। ইহারই অপর নাম 'স্পেশালাইজেশন, specialisation'। মেয়েরা তাহাদের একান্ত নিজস্ব প্রাচীনতম specialisation ভুলিতে চাহিতেছেন কেন?

জীবনের সমস্যা আধুনিক কালে এত জটিল হইয়া আসিতেছে যে, নারী যদি নিজেকে একটা সমস্যা করিয়া তোলে, তবে তাহার অধিক দুর্ভাগ্য জাতীয় জীবনে আর হইতে পারে না। নারীর কোন সমস্যা নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের পুরুষ এখন সহস্র সমস্যার ও অজস্র চিন্তার ভারে পীড়িত। গৃহে ফিরিয়া সে সকল সমস্যাকে ভুলিতে পারিলে তাহার জীবন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বাঁচিবার মত হইবে।

একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। ঊনবিংশ শতকে এলিজাবেথ ব্যারেট্ ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি পরে রবার্ট ব্রাউনিঙকে বিবাহ করিয়া এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিঙ্ নামে পরিচিতা হন। রবার্ট ব্রাউনিঙ অপেক্ষা ইহাঁরই যশ এককালে অনেক বেশী ছিল। ইঁহাদের এক সন্তান জন্মের পর মিসেস্ ব্রাউনিঙ বৃদ্ধ কবি লী হাণ্ট-এর নিকট একখানা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্তানের নিকট সহস্র সহস্র 'অরোরা লী'-(মিসেস্ ব্রাউনিঙের একখানি কাব্যগ্রন্থ)-ও তুচ্ছ, এমন কি লী হাণ্ট-এর মত প্রাচীন এবং বিখ্যাত কবির প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও।

কাব্যরচনার আনন্দও যাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়, সে আনন্দ কি? কত বড়? ভয় হয় নারী পাছে সে আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। পাছে সে অজ্ঞাত এক অধিকার লাভ করিতে যাইয়া গৃহের অধিকার হারাইয়া ফেলে!

বিবিধ

ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে National Council of Women in India গঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই কাউন্সিল হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীকমলাদেবী

চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বুলেটিন্' নামক পত্রিকায় মাদামোয়াজেল দ্য (De Busseuere) বুশেয়ার নাম্নী বেল্‌জিয়ান মহিলা লিখিত এক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। মাদামোয়াজেল বুশেয়ার এই রিপোর্টে ভারতীয় নারী সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"নাগরিক হিসাবে ক্ষমতার অভাব তাঁহাদের (ভারতীয় নারীর) উচ্চপদ লাভের অন্তরায় নয়। অনেক মহিলার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে যাঁহারা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ভূপাল রাজ্যের লোক গর্ব্বের সহিত আমাদের বলিয়াছে যে, ক্রমাগত সাত পুরুষ ধরিয়া নারী তাহাদের রাজ্য শাসন করিয়াছে। বর্ত্তমান নবাবের যে কেবল দুইটি মাত্র কন্যা, ইহাতে রাজ্যের লোক খুবই আনন্দিত।

মেয়েদের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তবু এখন অনেক কিছু করিবার আছে, ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নারীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তাহার জন্য সুবিধাও রহিয়াছে যথেষ্ট। এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদের বিখ্যাত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।"

*

যুদ্ধের পর হইতে কতকটা যথেষ্টসংখ্যক পুরুষের অভাবে কতকটা উপার্জ্জন-প্রচেষ্টায় নারীকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে শ্রম করিতে হইতেছে। তাহার ফলে আজ পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কলকারখানায় নারী-শ্রমিক প্রায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতের অনেক কারখানাতেই মেয়েরা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ভাবে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। বিলাতে পুরুষের অনুপাতে মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী; কাজেই সব মেয়েই যে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে, ইহা দুরাশা বলিয়া তাহারা জানে। কাজেই অনেক মেয়েকেই জীবিকা, বেশভূষা ও প্রসাধনের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। অবশ্য, জীবিকার্জ্জনের জন্য মেয়েদের কাজ করিতে বাধ্য হওয়া বর্ব্বরতা। তথাপি ইহা লক্ষ্যণীয় যে, মেয়েদের কারখানার কাজের মধ্যেও একটা শ্রী আছে। মেয়েদের সযত্ন নিপুণ হাতে কাজও শ্রীসম্পন্ন হয়, অথচ ব্যবসায়ীও লাভবান্ হয়। কারণ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকে।

*

সিনেমায় আমরা অভিনেত্রীদের যে-সকল পোষাকে অবতীর্ণা হইতে দেখি, তাহার পশ্চাতে বহু কল্পনা, শ্রম ও অর্থব্যয়ের ইতিহাস রহিয়াছে। পাশ্চত্ত্যদেশের প্রত্যেক চিত্র-প্রতিষ্ঠানেই একজন বা একাধিক 'বেশ-পরিকল্পক' বা dress designer থাকে। ইহাদের বেতন যথেষ্ট। ইহাদের কাজ হইল কোন একখানা বই তোলা সুরু হইবার আগে, কোন্ অভিনেত্রী কোন্ দৃশ্যে কোন্ পোষাক পরিবে তাহার পরিকল্পনা করা। ইহার জন্য যথেষ্ট কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। ইতিহাসের জ্ঞানও যথেষ্টই থাকা দরকার, কেন না 'ক্লিওপেট্রা' ছবি তুলিতে হইলে তৎকালীন মিশরীয় বেশভূষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। তাহার পর কোন্ অভিনেত্রীকে কোন্ বেশে মানাইবে, ছবিতে কোন্ পোষাক কি-রকম দেখাইবে, যে দৃশ্যে যে ভাবটা প্রধান, সে ভাবের সহিত বেশের সামঞ্জস্য আছে কি না, এ-সবও বেশ-পরিকল্পককে জানিতে হয়। বহু চিন্তার পর ছবি আঁকিয়া সে দেখাইয়া দেয় তাহার বেশের পরিকল্পনা।

*

কর্ত্রীর চোখে আদর্শ দাসী এবং দাসীর চোখে আদর্শ কর্ত্রী কে? বিলাতের একখানি মহিলা-পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে শ্রীমতী লুইসা কে নাম্নী জনৈক মহিলা লিখিতেছেন—

"সেই দাসী আদর্শ, যে কোন কিছু খুঁজিয়া না পাইলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে, অথচ এমন সবজান্তা ভাব দেখাইবে না যে, মনিবের বাক্সে কি আছে না আছে তা-ও তার অজানা নাই।

মুখ ভার করিয়া থাকিবে না, যদি কিছু অভিযোগ থাকে তবে তাহা সরল ভাবে এবং উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া বলিবে।

বাড়ীতে রাখিয়া কোথাও বেড়াইতে গেলে হাসি-মুখেই থাকিবে, এমন ভাব দেখাইবে না, যেন মনিব তাহাকে জেলে দিয়াছেন।

খুসী মনে থাকিবে, কিন্তু গান গাহিবে না। (বিলাতের কথা হইতেছে, এ দেশের বাড়ীর চাকরাণীরা আজও গান গাহিতে শিখে নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না।)

যদি সে গান গাহিতে পারেও তবু মনিব কখনও তাহা জানিতেও পারিবে না।

মনিবের ব্যক্তিগত ব্যাপার হইতে নিজেকে দূরে রাখিবে অথচ সব বিষয়েই উদাসীন এমন ভাবও দেখাইবে না।

কখনও মনিবের অর্থাভাব হইলে একটু কষ্ট করিবে।

বাড়ীতে যদি কোন জিনিষ কম আসে বা খুব ভাল জিনিষ না আসে, তবে শুনাইবে না যে, তাহার আগেকার মনিবের বাড়ীতে এই আসিত, তাই আসিত।

আগেকার মনিবের ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কখনও আলোচনা করিবে না। তাহাতে মনিবের মনে আশঙ্কা জন্মে যে, আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে সেখানেও আমাকে লইয়া আলোচনা করিবে।

ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখিবে, কিন্তু মনিব যদি তাঁহার নিজের বাড়ীতে কুটোটুকু ফেলেন, অমনি চটিয়া উঠিবে না।

নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিবে। বাড়ীতে কোন লোক আসিলে যেন বেশ-ভূষায় অপরিচ্ছন্নতা প্রকাশ না পায়।

কোন জিনিষ একেবারে ফুরাইয়া যাইবার আগেই মনিবকে বলিবে যে অমুক জিনিষ আনিতে হইবে।"

আর সেই গৃহকর্ত্রীই আদর্শ, যিনি :

সর্ব্বোপরি, নিজকে দাসীর অবস্থায় কল্পনা করিয়া তাহার দোষগুণের বিচার করিতে পারেন।

দাসীর সঙ্গে সহজ ভাবে পরিবারের লোকের মতই ব্যবহার করিবেন, অথচ তাহারই মধ্য দিয়া তাঁহার কর্ত্রীত্ব ফুটিয়া উঠিবে।

যখনই কিছু হুকুম করিবেন, সব সময়েই ধম্‌কাইয়া করিবেন না।

খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া খিচ্‌ খিচ করিবেন না।

নিজে যে মনিব এ কথা সব সময় জানাইতে চাহিবেন না।

ইহা মনে রাখিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে ক্ষমা করিবেন যে, দাসীও মানুষ, সে যন্ত্র নয়।

মনিব বলিয়া দাসীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিশ্বাস করা যায়, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তবে দাসীকে বিশ্বাস করিবেন, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া কোন ভার দিয়া তারপর ক্রমাগত সন্দেহ করিবেন না।

ছোট শিশুরাও যাহাতে দাসীর উপর 'বড়মানুষী' না দেখায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

দাসীকে নিযুক্ত করিবার সময় খোলাখুলি ভাবে সব কাজের কথা বলিয়া রাখিবেন, রোজ রোজ তাহার ঘাড়ে নতুন নতুন কাজ চাপাইবেন না।

পরীদের খেলাঘর

—শ্রীরবিদাস সাহা রায়

মরা নদীটির বুকের উপরে ছোট এক বালুচর,
জলপরীরা সেথায় বুঝি বা বাঁধিয়াছে বাড়ী-ঘর।
নিঝুম-নিশীথে নিতিই তাহারা করে সেথা আনাগোনা
জোয়ার-বেলায় নূপুরের ধ্বনি তাই বুঝি যায় শোনা।
নিশীথের ঘুম না ভাঙ্গিতে তারা লুকায় নদীর জলে,
উর্ম্মি-মুখর প্রভাতের নদী সেই কথা যেন বলে।
কাশের গুচ্ছ; হেচরা, ধুতুরা, সেচি, ঝাপিটোপা ফুল,
নদীচরে তারা ফেলে যায় নিতি তাড়াতাড়ি করি ভুল।

গায়ে মাখা কত কুঙ্কুমগুঁড়া পড়ে থাকে বালুপরে,
বিহান বেলার রবির কিরণে তাই ঝিক্‌মিক্ করে।
সুদূর গাঁয়ের কোনও রাখাল না জানি কি কাজে আসি
বিনা কারণেই চিকন সুরের বাজায় বাঁশের বাঁশী।
ঘাস ও ফুলেরে জড়াইয়া কাঁদে সেই সুরে বালুচর,
বলিতে পার কি, রাতের পথিক কোথা গেল ছেড়ে ঘর?
সে কাঁদন শুনে পায়রার দল উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
পরীর খোঁজেতে বকগুলি যেন জল-পানে চেয়ে থাকে।

দুপুরের রোদে সারা বালুচর যখন তাতিয়া যায়,
বিরহীর দুখে দমকা বাতাস করে ওঠে হায় হায়।

সেথা নাই কোন রাখাল-কুটীর, শুধু ফাঁকা বালুচর,
কচি ঘাস, আর ছোট কাশবন, পরীদের খেলাঘর।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাম্প্রদায়িকতা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভাষা এবং জাতি উভয়েরই একটা ভৌগোলিক সীমা আছে। প্রত্যেক লোকেরই মাতৃভাষা তাহার জাতীয় পরিচয়ের নির্দ্দেশক। দুইটি বা তদধিক বড় ভাষার প্রান্ত-বর্ত্তী কোনও ভূভাগে একাধিক ভাষা থাকিতে পারে। পৃথিবীর কোনও বসতিশূন্য বা বিরলবসতি স্থানে নানাদেশ হইতে লোক আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে বা কোনও বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে বা আন্তর্জ্জাতিক সামরিক বন্দরেও এরূপ ঘটা সম্ভব। কিন্তু কোন দেশ বিজিত হইলে, বিজেতৃগণ যদি বহুল সংখ্যায় আসিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন, তাহা হইলেই সেখানে ভাষা-বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে এদেশে কোন শক্তিশালী গবর্ণমেন্ট অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। আর্য্য, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির বহু শাখা এ দেশে বহুবার বিজেতৃরূপে প্রবেশ করিয়াছে; অনার্য্য দ্রাবিড়, আর্য্য, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সংস্পর্শ, মিশ্রণ, বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতে ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যা জটিল হইয়াছে। সকল জাতি মিশ্রিত হইয়া এক জাতি হইয়া না যাইয়া, একই স্থানে যে বহুজাতি পৃথক্‌ভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিতে পারিয়াছে, নিজেদের ভাষা ও আচার, ব্যবহার সকলই রক্ষা করিতে পারিয়াছে, একই প্রদেশে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকিবার তাহাই কারণ।

কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ এই সকল ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইতে যে-কারণেই হউক, কিছু দূরে ছিল বলিয়া ভাষার দিক দিয়া সমগ্র দেশে একটা অখণ্ড ঐক্য আছে। এই মূলগত ঐক্যের ফলে, বাঙ্গালার সকল প্রান্তের সকল জাতির ঐক্যবিধান, সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধি এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন অন্য অনেক প্রদেশ অপেক্ষা সহজ হইবে এবং ইহা বাঙ্গালীর উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে অনেক বাড়াইয়া দিবে। এ দিক্ দিয়া বাঙ্গালার বিশেষ আশার ও গৌরবের কারণ রহিয়াছে।

মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ অনেকটা নিরুপদ্রব থাকিলেও, পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালার ভাষা ও অধিবাসীদের মধ্যে একটা নূতন সমস্যা দেখা দিল। অবশ্য এ দেশের সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যা ধরিলে ইঁহাদের মধ্যে বৈদেশিক উপাদান নাই বলিলেই হয়। তবুও ইহা কতকটা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রেও যেমন ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও বিভাগ কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হইয়া স্বার্থান্ধ লোকদের দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের ভাষার সমস্যাও সেইরূপ কৃত্রিম কারণেই উদ্ভূত হইয়া, কৃত্রিম আবহাওয়া ও ভুল ধারণার মধ্যেই পুষ্টি লাভ করিয়া বাঁচিয়া আছে।

মুসলমান সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের লোকেরা দেশের রাজা বলিয়া, তাঁহারা স্বভাবতঃই গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন এবং দেশের অন্য লোকদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবিতে লাগিলেন। মুসলমান আক্রমণকারীরা আসিয়াছিলেন বাহির হইতে; এ দেশের লোকের সহিত তাঁহাদের আচারে ব্যবহারে, ভাষায় ও ধর্ম্মে মিল ছিল না। বিজিতদের সব কিছুকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা বিজয়ীদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে; মুসলমান বিজেতারাও নিজেদের বৈদেশিক বিশিষ্টতাকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সময়ের মুসলমান শক্তি ও সভ্যতার মূল প্রেরণা ছিল ধর্ম্মোন্মাদনা, ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়াই তাঁহারা এক হইয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহাদের চরিত্রের, ব্যক্তিত্বের এবং দলবদ্ধতার ভিত্তিভূত শক্তি ও সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যের সম্মুখে বিভিন্ন জাতির আচার, পরিচ্ছদ, ভাষা এবং অন্যান্য পার্থক্য আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। যাঁহারাই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, জাতিবর্ণভাষা

নির্ব্বিশেষে তাঁহারা এই ধর্ম্মে সমান স্থান ও মর্য্যাদার অধিকারী হইলেন। ফলে, প্রত্যেক মুসলমান তাঁহার ধর্ম্মের আদিভূমি আরবকে শুধু ধর্ম্মভূমি নয়, অনেকটা মাতৃভূমির আসন দিতে লাগিলেন এবং আরবী ভাষাকে অনেকটা মাতৃভাষার ন্যায় গ্রহণ করিলেন। যদিও জগতের অগ্রগতি ও পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমানে একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমাকে (দেশ) কেন্দ্র করিয়া জাতিগঠন ব্যতীত উপায়ন্তর নাই এবং যদিও জগতের প্রগতিশীল মুসলমান জাতিগুলি নিজ নিজ দেশকে কেন্দ্র করিয়াই অগ্রসর হইতেছেন, তবুও ভারতবর্ষ বাহিরের জগতের আবহাওয়া হইতে দূরে আছে বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, ভারতীয় মুসলমানেরা কেহ কেহ দেশ অপেক্ষা অনেকক্ষেত্রে ধর্ম্মকেই জাগতিক অগ্রগতি ও স্বার্থেরও কেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেছেন।

যাহা হউক, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অন্য সকল পার্থক্য সত্ত্বেও বিজেতাদের দলভুক্ত হইবার সম্ভবনা ছিল বলিয়া,তাঁহাদের সমান অধিকার ও মর্য্যাদা লাভ করা সহজ ছিল বলিয়া এদেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে বিজেতাদের অনুকরণ করিয়া এবং এদেশীয় সকল বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া, রাজবংশীয়দের সহিত নিজেদের জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন।

বাঙ্গালা-ভাষী মুসলমানদের উপর আর এক দিক্ দিয়াও বৈদেশিক প্রভাব আসিয়াছে। এ দেশে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এ দেশীয়দের সঙ্গে কারবারের জন্য বিদেশী মুসলমানেরা উর্দ্দু নামে পরিচিত মিশ্রভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কালে ইহাই এ দেশীয় অভিজাত মুসলমানদেরও মাতৃভাষা হইয়া উঠিল। হিন্দীর কাঠামোর উপর আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ যোগ করিয়া এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, কাজেই এ দেশীয় হিন্দীভাষী যে সকল লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ভাষা গ্রহণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইল না। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি হিন্দী ভাষার অধিকারভুক্ত অঞ্চলই মুসলমান শক্তির কেন্দ্র ছিল বলিয়া ইহা মুসলমান সভ্যতারও কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং ধনী, শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানেরা এখানেই বাস করিতেন এবং উর্দ্দুকেই মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করিতেন। কাজেই, ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানেরা উর্দ্দু ব্যবহারকে আভিজাত্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং ইহা শিক্ষা করাকে শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবতঃ এই ভাবে উর্দ্দুপ্রীতি উদ্ভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এ কথা বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে, আত্ম-গৌরববোধই মানুষের সকল উন্নতির গোড়ার কথা। নিজেদের মাতৃভাষা ও জাতীয়তাকে গৌরবের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে হইবে, অপরের নিকট প্রশংসা পাইবার জন্য আত্ম-পরিচয় গোপন করিতে যাওয়া বা অকারণে পরের অনুকরণ করিয়া সম্মান পাইবার চেষ্টা করা যে শোচনীয় কাপুরুষতা, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। দেশের সংখ্যাতীত জনসাধারণকে প্রথমতঃ তাহাদের মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াই শিক্ষা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

যাহা হউক, এই সকল নানা কারণের সমবায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে। দেশে যখন জাতীয়তার বিশেষ প্রসার ঘটে নাই, মাতৃভাষা শিক্ষার অপরিহার্য্যতার কথা দেশের কেহই যখন ভাবেন নাই, অর্থাৎ আধুনিক কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমানেরা যে এদেশের চির-পরাধীন জাতির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত নহেন, এই কথাটা বিশেষ ভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য নিজেদের মধ্যে লেখাপড়ায় যে বাঙ্গালা ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের পুঁথিপত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, দেশের প্রচলিত বাঙ্গালা হইতে তাহার বিশেষ স্বতন্ত্র রূপ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভাষার সহিত দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই নাড়ীর যোগ না থাকায় এই ভাষার সাহিত্য প্রসার বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে যে কারণে আমাদের মৌখিক ভাষায় ইংরাজী শব্দের নিতান্ত বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে, সেই একই কারণে একদিন দেশের ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্শী শব্দের বহুল প্রচলন ছিল। সেই সময়ের আদালতে

জমিদারী সেরেস্তার দলিল-পত্রাদিতে যে বৈদেশিক শব্দ-বহুল ভাষা ব্যবহৃত হইত, আজও তাহার কতকটা জের চলিয়া আসিতেছে।

এ দেশের মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে বৈদেশিক উপাদান যদি যথেষ্ট পরিমাণ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত উর্দ্দুর ন্যায় বাঙ্গালার একটা মুসলমানী রূপ গড়িয়া উঠিত। যাঁহারা এ দেশীয় থাকিলেন, তাঁহারা, অর্থাৎ এ দেশীয় অমুসলমানের অনেকটা অবজ্ঞার পাত্র হইয়া রহিলেন। এ দেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান হইলেন, পাছে এ দেশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ধরা পড়ে, এই ভয় অর্থাৎ নিজেদের প্রতি অবচেতন বিশ্বাসহীনতা তাঁহাদিগকে এই দিকে বিশেষভাবে আগাইয়া দিল। এই জন্য জাতীয়তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিহ্ন মাতৃভাষাকেও তাঁহারা যথাসাধ্য ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, অন্যান্য পরিবর্ত্তন যতটা সহজসাধ্য, মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন ততটা সহজসাধ্য নহে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী হিন্দুর মাতৃভাষা হইতে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িল না। তবুও এই বহির্দ্দেশিক প্রীতি মুসলমান জনসমাজের উপর অবিলীয়নীয় প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে; বাঙ্গালা সাহিত্যও এই প্রভাবকে যথাযথভাবে স্বীকার না করিয়া পারিবে না।

আরবী মুসলমান-জগতে ধর্ম্মের ভাষা হইলেও পার্শী হইতেছে কৃষ্টির ভাষা। মুসলমান আমলে পার্শীই এখানকার রাজভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই, এ দেশের পার্শী অনেকটা কৃষ্টির ও সাধারণ ভাষার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের রাজভাষা ও কৃষ্টির ভাষার প্রভাব যে অধিবাসীদের মাতৃভাষার উপর অনেকটা পড়িবে, তাহা স্বাভাবিক। মুসলমানেরাই এই প্রভাবের প্রধান বাহন হইলেও অমুসলমানেরাও এই প্রভাব হইতে খুব অধিক দূরে থাকিতে পারেন নাই। অনেক আরবী ও পার্শী শব্দ খাঁটি বাঙ্গালা মনে করিয়া আমরা নিত্য ব্যবহার করিতেছি। অবশ্য যে সকল শব্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমভাবে প্রচলিত, তাহা বর্ত্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে; যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা পৃথক্ আকার ধারণ করিয়া আমাদের সাহিত্যিক প্রগতির সম্মুখে কতকটা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে, সেখানকার সেই সমস্যাকে নিজের পথ গ্রহণ করিতে না দিয়া, যাহাতে আমরা তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি এবং সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তাহার সুসঙ্গত সমাধান করিতে পারি, তাহাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কিন্তু, বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে বৈদেশিক মিশ্রণ অধিক না থাকায় বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারের মধ্যে খুব অধিক সংখ্যায় বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ফলে পুঁথি বা দলিলপত্রে এই ভাষাকে বাঁচাইবার চেষ্টার ভিত্তি কৃত্রিম হইয়াছে এবং তাহা সফল হয় নাই।

যে কারণেই হউক, বাঙ্গালী মুসলমানদের তুলনায় বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বরাবরই বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। এই জন্য শিক্ষিত মুসলমানদের কতক পরিমাণে শিক্ষিত হিন্দুদের সহিত সামাজিক (সংকীর্ণ অর্থে নহে) সম্বন্ধ রাখিতে হইত এবং ইহা দ্বারা তাঁহারা কতকটা প্রভাবিত হইতেন। রাজশক্তি মুসলমানদিগের হাত হইতে যাইবার পর যখন দেশের সকল সম্প্রদায়েরই মর্য্যাদা এক-প্রকার হইল, তখন শিক্ষা-দীক্ষাই আভিজাত্যের পরিচয় হইয়া দাঁড়াইল। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী হওয়ায়, শিক্ষিত অভিজাত মুসলমানেরা এই প্রভাবের কতকটা অধীন হইতে লাগিলেন এবং এইরূপে কৃত্রিম আবহাওয়া অনেকটা কাটিয়া গেল। মুসলমান লেখকেরাও দেখিতে লাগিলেন যে, উর্দ্দু-অনভিজ্ঞ সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানকে তাঁহাদের কথা শুনাইতে হইলে তাঁহারা নিত্য যে ভাষা ব্যবহার করেন, সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে; তাহা ছাড়া হিন্দু পাঠকদের উপরও কতকটা নির্ভর না করিয়া তাঁহাদের উপায় ছিল না।

এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ বাঙ্গালা ভাষাকে যে দুই ভিন্ন মুখে লইয়া চলিয়াছিল, তাহা সফল না হওয়ায় আমাদের জাতীয় ঐক্যের সর্ব্বপ্রধান উপায়টি নষ্ট হইতে পারে নাই। যে সকল সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্র বিভাগ আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এক ভাষা এবং সাহিত্যই তাহা দূর করিতে পারিবে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনদিনই বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্যকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন

নাই। উর্দ্দুই তাঁহাদের শিক্ষার মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া ছিল; বাঙ্গালার চর্চ্চা যাহা হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই গৌণভাবে। আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসমলমানেরা সমগ্র-ভাবে বাঙ্গালাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, উর্দ্দুর প্রতি মোহ তাঁহাদের অনেককেই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তবুও মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল দুরদর্শী লোকেরা এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আধুনিক কালের বস্তুপ্রধান জগতের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে গেলে, মাতৃভাষা শিক্ষা না করিয়া বা মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। মনে হয়, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ও অগ্রবর্ত্তিতার অন্যতম প্রধান কারণ, বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ায়, শিক্ষার মুখ্যক্ষেত্রে মনের যে বন্ধ্যাত্ব অনেকটা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, শিক্ষার গৌণক্ষেত্রে মাতৃভাষার ক্রমবর্দ্ধিত সাহিত্য সেই বন্ধ্যাত্ব বহুলপরিমাণে দূর করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু, রাজ্য হারাইবার পর মুসলমানদের আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইয়া নূতন অবস্থার সঠিক ধারণা করিয়া লইতে অনেকটা দেরী হইয়া গেল। বর্ত্তমান অবস্থার এবং পশ্চাদ্বর্ত্তিতার কারণ বুঝিতে পারিয়া অনেক পরে যখন তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার দিকে প্রথম ঝুঁকিলেন, তখন প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুদের ন্যায় তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। কিন্তু, হিন্দুদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রসারের জন্য মাতৃভাষাকে অবলম্বন করিতেই হইবে।

প্রথম প্রথম যে দুই এক জন মুসলমান লেখক অসাম্প্র-দায়িক সাহিত্যসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন, তাঁহাদের রচনায় ভাষার কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দেয় নাই। কিন্তু, ক্রমে যখন অধিকসংখ্যক মুসলমান লেখক ও পাঠক বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, ইহাতে মুসলমানদের দান খুবই কম, ইস্‌লামীয় সভ্যতা বা চিন্তার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই এবং মুসলমান বাঙ্গালীদের নিত্যব্যবহার্য্য শব্দ সকল (যাহা হিন্দুরা ব্যবহার করেন না), এই সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

এই সাহিত্যে যে মুসলমানদের চিন্তাধারা বা দান নাই, তাহাতে ভাষার বা হিন্দু সাহিত্যিকদিগের দোষ নাই। হিন্দু সাহিত্যিকেরা সাধারণতঃ মুসলমান পরিবারের চিত্র আঁকেন নাই এবং মুসলমান পরিবারে মাত্র প্রচলিত কথাসমূহ দুই চারিটি ব্যতীত ব্যবহার করিবার প্রয়ো-জনীয়তাও তাঁহাদের উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু, তাহা হইলেও ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক হয় নাই এবং হইলে যে কিছু পরিমাণে মাত্রা ও সীমা ছাড়াইয়া যাইবে তাহাও সুনিশ্চিত। যদিও মুসলমান কয়েকজন সাহি-ত্যিকের কাহারও কাহারও মনে উর্দ্দু, পার্শী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মূলে এই ক্ষোভ ব্যতীত সাম্প্রদায়িক অভিমানও কিছু আছে।

বাঙ্গালী মুসলমানদের উর্দ্দুপ্রীতির এবং বাঙ্গালা ভাষার মুসলমানী রূপ গড়িয়া তুলিবার যে সকল কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে তাহাও আংশিকভাবে রহিয়াছে। যে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি আমাদের জাতীয় জীবনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে, দেশ এবং জাতি অপেক্ষা সম্প্রদায়কে বড় করিয়া দেখিতেছে, সেই সাম্প্র-দায়িক বুদ্ধিই পশ্চাতে থাকিয়া, অনেক সময় হয়ত অজ্ঞাতসারেই, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ঐক্যের পথে অকারণ জটিলতা ও বাধা সৃষ্টি করিতেছে। অন্য সর্ব্বক্ষেত্রে যাঁহারা সম্প্রদায় হিসাবে সমগ্র জাতি হইতে যেরূপ স্বতন্ত্র হইতে চাহিতেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রেও সেইরূপ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র স্থান তাঁহাদের কাম্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সকলকেই একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের জাতীয়তা অন্য সর্ব্বত্র যে সাম্প্রায়িকতার দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে, সেই খণ্ডতাকে একমাত্র সাহিত্যই ঐক্যের পথে লইয়া যাইতে পারিবে। মানুষের চিন্তা ও মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে তাহার সাহিত্য এবং এই সাহিত্যের বহন ভাষা। এখানকার অখণ্ড ঐক্য একদিন সমগ্র জাতির অন্য সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতাকে দূর করিয়া দিবে আশা করা যাইতে পারে।

আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের জনকয়েক এত অধিক পরিমাণে উর্দ্দু, পার্শী প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিতেছেন যে,

ইঁহাদের রচিত সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি ভিন্ন শাখায় পরিণত হইতেছে।

সাহিত্য এইভাবে বহুভাগে বিভক্ত হইলে যে কি প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। মুসলমান লেখকেরা আরবী, ফার্সী শব্দ বহুল ভাবে ব্যবহার করিয়া সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করিলে সেই সকল অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে। বাঙ্গালী খৃষ্টানেরা হয়ত ইংরাজী শব্দবহুল বাঙ্গালা লিখিতে চাহিবেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক লেখকই চাহিবেন যে, তাঁহার লেখা সম্ভবমত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পাঠকের নিকট পৌঁছে। সাহিত্যের রূপে যদি সাম্প্রদায়িকতা থাকে, তাহা হইলে কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহিত্য সেই সম্প্রদায়ের বাহিরে আদৃত হইবে না। ইহাতে মুসলমান লেখকেরাও লাভবান্ হইবেন না।

বর্ত্তমানে যে, লেখকদের এই শ্রেণীর লেখা হিন্দু পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে এবং খ্যাতনামা মুসলমান সাহিত্যিকদের জনপ্রিয়তা ও গুণোপলব্ধি হিন্দুদের মধ্যেই বেশী হইয়াছে, তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। মুসলমানেরা বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহিতেছিলেন না; কাজেই যখন দুই-একজন প্রতিভাবান্ লেখক বাঙ্গালা সাহিত্য-সাধনায় রত হইলেন, তখন হিন্দুরা মাতৃভাষা ও জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহাকে বিশেষ শুভ সূচনা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কারণ, মুসলমানেরা মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া শুধু যে নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রগতির পথ রুদ্ধ করিতেছিলেন তাহা নয়; ইহার দ্বারা তাঁহারা জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সংহতিকেও বিশেষ সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিতেছিলেন। হিন্দুরা অনেক পূর্ব্ব হইতেই জাতীয় মনোভাব সম্পন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ইহাতে বিশেষ আঘাত পাইতেছিলেন। এই জন্য মুসলমান সাহিত্যিক মাত্রেই হিন্দু পাঠক ও সাহিত্যিকদিগের নিকট হইতে অভ্যর্থনা পাইলেন; তাঁহাদের একটু আধটু দোষত্রুটি কেহ দেখিল না, গুণটুকুই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু ক্রমে এইভাব কাটিয়া যাইবে; সাধারণ পাঠকেরা কষ্ট করিয়া দুরূহ অজানা বৈদেশিক শব্দের বাধা অতিক্রম করিয়া সহজে এই মিশ্রভাষায় লিখিত বই পড়িতে চাহিবে না। হয়ত কোন বিশেষ প্রতিভাবান লেখকের দুই-চারিখানা ভাল বই লোকে কষ্ট করিয়া পড়িতে পারে।

অত্যন্ত সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা যে স্বাভাবিক কারণে অচল হইয়া গিয়াছে, এই মিশ্রভাষা প্রচলিত হইবার পক্ষেও সেই স্বাভাবিক বাধা রহিয়াছে। একদিকে সংস্কৃতের সহিত জ্ঞাতিত্ব খুব নিকট, আর অন্যদিকে এই সকল শব্দের অধিকাংশের সহিত বাঙ্গালা ভাষার ধাতুপ্রকৃতির মিল বা বাঙ্গালার ধ্বনি-সামঞ্জস্য নাই।

মুসলমান লেখক বাদে মুসলমান সম্প্রদায়ের দিক দিয়াও বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতার মধ্য দিয়া যদি তাঁহারা বাঙ্গালার মুসলমান সাধারণের মধ্যে ইস্লামীয় সভ্যতা, ধর্ম্মভাব এবং চিন্তাকে অধিকতর ভাবে ও সহজতর পথে ছড়াইয়া দিতে চান, তাহা হইলেও তাহা কোন কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ভাষার দ্বারা সম্ভব হইবে না। যে ভাষা লোকের নিত্য-ব্যবহৃত ভাষার যত নিকটবর্ত্তী হইবে, হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকল পাঠকের নিকটই সেই ভাষা তত বেশী প্রিয় হইবে। কাজেই সাধারণ ভাবে আশা করা যাইতে পারে যে, মুসলমান পাঠকেরাও ক্রমে এই মিশ্রভাষা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক ভাষার ভক্ত হইবেন এবং এই মিশ্রভাষায় লিখিত অনেক ভাল বই কতকটা অপ্রচলিত হইয়া পড়িবে।

যদি ইহাও ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই ভাষা অপ্রচলিত না হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং নিজ সীমার মধ্যে ইহা সম্পদশালী হইয়া উঠিবে, তবুও খণ্ডিত হওয়ার জন্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি আশঙ্কা করা যাইতেছে, এই সাহিত্যেও সেই সঙ্কীর্ণ পরিধির ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবে না। আর, সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের এই ক্ষতি হইবে যে, তাঁহাদের যে ভাব ও চিন্তার দ্বারা তাঁহাদের সম্প্রদায়বহির্ভূত লোকেরাও প্রভাবিত হইতে পারিত, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জিনিষ সমূহের সহিত পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারিত, তাহা শুধু মাত্র তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। ইহাতে ইস্লামীয়

চিন্তাধারার ব্যাপ্তির সুবিধা না হইয়া ব্যাঘাত হইবে মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আরবে মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং পারস্যের সাহিত্যের মধ্যে ইহার ভাব ও কৃষ্টি পুষ্টি লাভ করিয়াছিল বলিয়া, এই সকল ভাষার শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ভাবধারা আনিয়া ফেলা যাইবে না। কোন ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় মিশাইতে পারিলে, প্রথম ভাষার সাহিত্যিক সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য শেষোক্ত ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। সেই প্রভাব এতই বেশী যে, কোন লোক যদি ইংরাজী একেবারেই না শিখিয়া শুধু বাঙ্গালা শিখেন এবং বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক সকল শ্রেণীর বই পড়েন, তবে তিনি চিন্তায়, মনের গঠনে এবং চরিত্রের বিশিষ্টতায় একজন ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত হইবেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটি পূর্ব্বদেশীয় অধ্যায় বলা যাইতে পারে। অথচ, এই সাহিত্যে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার অতিশয় সামান্য; এবং এই সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্যাভিমুখিতার জন্য এই সকল শব্দ বিশেষ কোন সহায়তা করে নাই।

মুসলমান ধর্ম্ম যখন বহুদেশের উপর বিস্তৃত, তখন ইঁহাদের মধ্যে নানা ভাষা-ভাষী লোক থাকিবেনই; কোন এক বিশেষ ভাষার সাহায্যে তাঁহাদিগকে একতাবদ্ধ করা সম্ভব হইবে না, অথবা সকলের ভাষাতেই কিছু কিছু আরবী বা ফার্সী শব্দ মিশাইয়া দিলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে ধর্ম্মের বন্ধন, যে মনোভাবের ঐক্য, যে কৃষ্টির সংযোগ, বস্তুজগৎ বা মানবজীবনকে দেখিবার তাঁহাদের যে ভঙ্গী, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ভাষার বহু কোটি মুসলমান জনসমাজের মধ্যে ঐক্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহাতে সেই ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইতে পারে, মুসলমান হিসাবে তাহা সকল দেশের মুসলমানের কর্ত্তব্য হইতে পারে। এরূপ হইলে, প্রত্যেক বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজ মাতৃভাষার সাহিত্যে ইসলামীয় ভাবসমন্বিত পুস্তকাদি যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থার দ্বারাই মাত্র এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যে যাহাতে ইস্‌লামীয় কৃষ্টির পরিচায়ক পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ভাল ভাবে করিতে পারিলেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামীয় বিশিষ্টতাও প্রকৃতপক্ষে যথাযোগ্য স্থান পাইবে। অত্যধিক পরিমাণে আরবী বা ফার্সী শব্দের ব্যবহারে বরং এই কার্য্য কতকটা বাধাগ্রস্ত হইবে। অবশ্য এ কথা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য তখনই মাত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, সকল দেশের, সকল কালের মানুষের আদরণীয় হইতে পারে, যখন তাহা কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকল মানুষের হইয়া উঠিতে পারে। এ কথা সব সাহিত্যের পক্ষে যেমন সত্য, মুসলমান লেখকের সৃষ্ট সাহিত্যের পক্ষেও তেমনি সমভাবেই সত্য। মুসলমান হিসাবে মুসলমান সাহিত্যিকদের যেমন কিছু কর্ত্তব্য আছে, তেমনই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে।

মুসলমান সাহিত্যিকেরা যদি বাঙ্গালার মুসলমানদের জীবনধারাকে সাহিত্যে স্থান দিতে পারেন, তাঁহাদের জীবনের নানা ভিন্ন রূপ সাহিত্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তাঁহাদের জীবনের বিশেষ সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্নার সুর, রসের প্রবাহ এবং এই সমাজের বিশেষ মানুষগুলির ছবি সাহিত্যে স্থান পায়, তবেই প্রকৃতপক্ষে এই সাহিত্য বাঙ্গালার মুসলমানেরও নিজস্ব হইয়া উঠিবে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে, কতকটা সত্যের সহিত, হিন্দুর সাহিত্য বলা যায়, তাহার কারণ ইহা নয় যে, এই সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু অথবা হিন্দু কৃষ্টির প্রধান বাহন সংস্কৃতের বহু শব্দ এই ভাষা আত্মসাৎ করিয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্যের আধুনিক সংস্করণ বলিয়া অথবা হিন্দুর প্রাচীন শিক্ষা, চিন্তাধারা বা সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলিয়াও ইহাকে হিন্দু সাহিত্য বলিবার সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন হিন্দু মনের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। ইংরাজী

শিক্ষিত আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর মনের প্রতিচ্ছবি বলিয়া, হিন্দুর সমাজচিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া, হিন্দু-চরিত্রই ইহার প্রধান উপাদান বলিয়া, পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা হিন্দুদের মনে যে সকল আদর্শকে মুদ্রিত করিয়াছে, তাহাই ইহার প্রাণশক্তি বলিয়া ইহাকে হিন্দু সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, ইহাকে হিন্দু সাহিত্য না বলিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য বলাই হয়ত অধিকতর সঙ্গত হইবে। হিন্দুরা এই সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিবার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করেন নাই এবং যে ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু মনের ও হিন্দু সমাজের প্রতিচ্ছবি বলিয়া ইহাকে সাম্প্রদায়িক বলা যাইতেছে, সেই ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু-মনের সহিত ইংরাজীশিক্ষিত মুসলমান-মনের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই; যদিও সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কিছু পার্থক্য অবশ্য রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মুসলমান-জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ বাঙ্গালা সাহিত্যে যথোপযুক্ত নাই বলিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্য কিছু পরিমাণে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার দায়িত্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের উপর ন্যস্ত আছে।

হিন্দু সাহিত্যিকেরা যদি অতীত-কালের হিন্দু বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিতেন, প্রকৃতপক্ষে কোন্ জিনিষগুলি হিন্দুর, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের সীমা ছাড়াইয়া অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু সমাজ, হিন্দু জীবন, হিন্দু চরিত্র এবং হিন্দু চিন্তার কথা বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যকে সংকীর্ণ অর্থে হিন্দু সাহিত্য বলা যাইত। মুসলমান সাহিত্যিকেরা যদি সাহিত্য-রচনার সময় বিশেষভাবে অতীতকালের ইস্‌লামীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে না রাখেন, অথবা অন্য প্রদেশ বা অন্য দেশের মুসলমানদের কথা না ভাবেন এবং অন্যদিকে তাঁহারা যদি বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান কালের মুসলমান সমাজকে তাঁহাদের সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাহিত্যের প্রাণ ও রূপ, হিন্দুদের লিখিত সাহিত্য হইতে খুব বেশী পৃথক্ হইবে না।

আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালীর কথিত ভাষার সংস্কৃত হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুদের সকল ধর্ম্মগ্রন্থ, সকল শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি, এককথায় হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু চিন্তার সমগ্র ইতিহাস এই সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। এই ভাষার শব্দসকল অতি সহজে বাঙ্গালা ভাষায় চালান যাইতে পারে, অনেক সময় তাহাদিগকে চিনিয়াই বাহির করা যায় না; অনুস্বর, বিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত রচনাকে ভিত্তি করিয়াই এই সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল, তবুও হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া ভাষার এই সংস্কৃত রূপকে স্থায়ী করা যায় নাই। হিন্দু লেখকেরাই ভাষাকে সেই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক অবস্থা এবং প্রয়োজনের দাবীকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত তাঁহারা হন নাই বলিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

মুসলমান লেখকদিগকেও এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিদেশী শব্দের অতিপ্রয়োগে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষতিসমূহের কথা বাদ দিয়াও ভাষা শুধু আড়ষ্ট ও শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িবে, তাহার সহজ গতি বাধাগ্রস্ত হইবে, প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইবে এবং তাহার স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। কোন কবিতা পাঠের সময় যদি সুদীর্ঘ পাদ-টীকার সাহায্যে অর্থবোধ করিতেই প্রাণান্ত হইয়া যায়, তবে তাহা হইতে রসগ্রহণের উৎসাহ খুব অধিক লোকের থাকিবে না। এই অস্বাভাবিক অবস্থা কখনও স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। মুসলমান সাহিত্যিকেরা একেই বিলম্বে মাতৃভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভা যাহাতে কোন ভুলপথে অপচয়ের মধ্যে না যায়, তাহার দিকে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কিন্তু, অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালী সাহিত্যিকদেরও যে এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে, এবং সেই কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতে না পারায় অবস্থা যে অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, মুসলমান সাহিত্যিকদের উর্দ্দু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষার শব্দ ব্যবহারের পশ্চাতে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব রহিয়াছে; জ্ঞাতসারে না হইলেও অনেক লেখককে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থার পরিবেশ

তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই হয়ত এই অভিমুখী করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহা সহজে দূর হইবারও নহে, তবুও, হিন্দু সমাজে প্রচলিত নহে, অথচ মুসলমানেরা অপরিহার্য্য-ভাবে নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, এমন সকল শব্দকে সাহিত্যে স্থান দান না করায় বাঙ্গালী মুসলমানদের মন যে কতকটা বিক্ষুব্ধ হইবে এবং তাহার ফলে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে তাঁহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত উর্দ্দু, ফার্সী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহা কতকটা স্বাভাবিক। এই প্রতিক্রিয়া যাহাতে শক্তি লাভ করিয়া আমাদের সাহিত্যে একটা সমস্যা সৃষ্টি করিতে না পারে, তাহার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে সচেষ্টতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

সমগ্র বাঙ্গালার, অন্ততঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানের মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে কোন্ কোন্ বিদেশীয় শব্দ প্রচলিত আছে, কোন্ কোন্ শব্দ তাঁহাদের পারি-বারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণীত হওয়া উচিত। সম্ভবতঃ, ইঁহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, আত্মীয়তা ও উৎসবাদি-সম্বন্ধীয় এবং পারি-বারিক সম্পর্কের সম্বোধনসূচক কতকগুলি শব্দ ব্যতীত অন্য কোথায়ও এই প্রকার পার্থক্য নাই। এই সকল শব্দ স্থিরীকৃত ও তালিকাভুক্ত হইবার পর যাহাতে ইহারা সাহিত্যের আসরে উন্নীত হইতে পারে, অর্থাৎ ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি পুস্তকে ইহারা যথাযোগ্য স্থান পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই সকল তালিকা-ভুক্ত শব্দ ব্যতীত অপর শব্দও যাহাতে অধিক সংখ্যায় পাঠ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাদিতে স্থান পায়, তাহার জন্য সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচক সম্পাদক ও গ্রন্থকারদের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই সকল শব্দকে সরকারিভাবে সাহিত্যের দরবারে উঠাইয়া লইলে ভাষার যে অল্পকিছু রূপান্তর ঘটিবে, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু, এই পরিবর্ত্তন আরও বৃহত্তর ও ভেদ-সহায়ক পরিবর্ত্তনের পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া ইহাকে ঐক্য, সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার পথে আনয়ন করিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে, ভাষার রূপান্তর যে সকল দিক দিয়া আসন্ন হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সে সকল পরিবর্ত্তনকে যে পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, ভাষার বর্ত্তমান রূপ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কিন্তু, যাহা অনিবার্য্য তাহাকে অস্বীকার করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না, বরং তাহাতে শুধু বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম বাড়িয়া গিয়া ভাষা দুর্ব্বল ও সাহিত্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হইবে মাত্র।

"মানব-ধর্ম্ম"

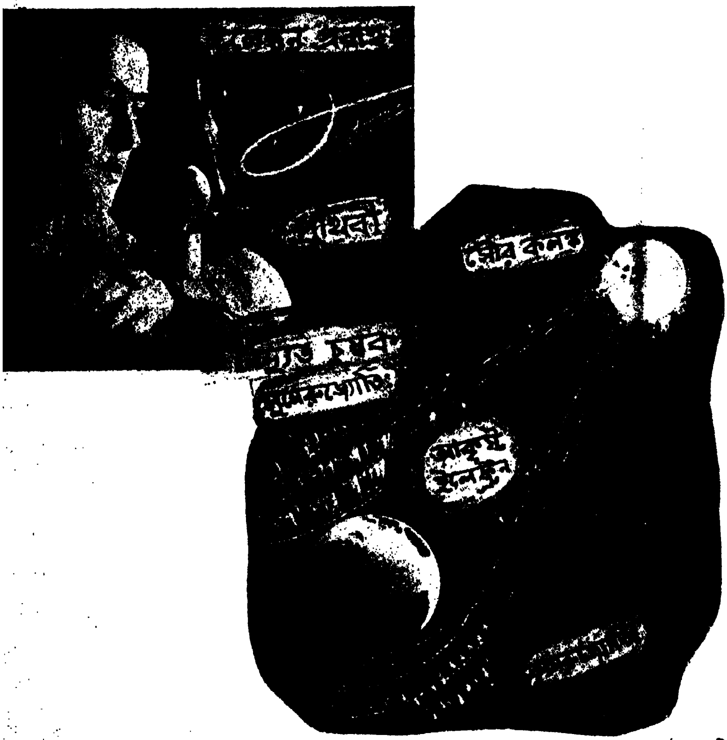
…জগতে একদিন মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র অধিকাংশ মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে পারিত। জগৎ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতাদৃশ উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তখন জগতের সর্ব্বত্র মানুষের মধ্যে একমাত্র "মানব-ধর্ম্ম" বিদ্যমান ছিল। তখন মানুষের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই। ঐ উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান ভাষায় উহার একটিকে ব্যবহারিক অংশ এবং অপরটিকে জীবাংশ বলা যাইতে পারে। মানুষের উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশ যাহাতে জগতের সর্ব্বত্র বুঝিবার উপযোগী হয়, তজ্জন্য উহা প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।…

বিজ্ঞান-জগৎ

মেরুজ্যোতি

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

পৃথিবীর উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে এক প্রকার নৈসর্গিক আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর



মেরুজ্যোতির উৎপত্তি : উপরে—ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ বৈদ্যুত চুম্বক ও ফাঁপা গোলক লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে ; অসিলোগ্রাফের মধ্যে ইলেক্ট্রন প্রবাহের বক্র পথ দ্রষ্টব্য। নীচে—সূর্য্য হইতে ধাবমান ইলেক্ট্রন প্রবাহে পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণে বিভক্ত হইতে সুমেরু ও কুমেরুজ্যোতির সৃষ্টি হইতেছে।

ও দক্ষিণ-মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে দৃশ্য এইরূপ আলোককে যথাক্রমে সুমেরুজ্যোতি ও কুমেরুজ্যোতি বলা হইয়া থাকে এবং সাধারণ ভাবে ইহাদের মেরুজ্যোতি বলিয়া অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ-মেরুপ্রদেশ অধিকতর দুরধিগম্য হওয়ায় কুমেরুজ্যোতি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকরা সুমেরুজ্যোতি সম্বন্ধে বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং মেরুজ্যোতির তথ্য এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ সুমেরু-জ্যোতি পর্য্যবেক্ষণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। নিম্নে যেখানে 'মেরুজ্যোতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ সুমেরুজ্যোতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে।

পৃথিবীর যত উত্তরে যাওয়া যায়, মেরুজ্যোতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মেরুর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে মেরুজ্যোতির সংখ্যা কমিয়া আসে। পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর নিকট মেরুজ্যোতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচুর্ভাব দেখা যায়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, য়ুরোপে বিষুবরেখা হইতে ৭০° উত্তরে এবং আমেরিকায় ৬০° উত্তরে মেরুজ্যোতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

মেরুজ্যোতির আকার নানা প্রকারের হইতে দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ আকার ধনুর ন্যায় বক্র অথবা আলোক-রশ্মির ন্যায় সরল। ইহা ছাড়া কাপড়ের পাড়ের মত বিস্তৃত অথবা ঝুলান পর্দার মত আকারের মেরুজ্যোতির সংখ্যাও

কম নহে। পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর নিকটবর্তী স্থানে অপর এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মাথার ঠিক উপরে একটি প্রকাণ্ড আলোকের বলয় হইতে চতুর্দ্দিকে রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। এই আকারের মেরুজ্যোতিকে "corona" বা মুকুট বলা হয়। এই দৃশ্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দর্শকদের মতে এই প্রকার মুকুটাকৃতি মেরুজ্যোতি অপেক্ষা সুন্দরতর দৃশ্য আর কিছুই নাই।

মেরুজ্যোতির আকৃতি এবং বর্ণ সকল সময়েই অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ, মেরু-জ্যোতির উজ্জ্বলতার উপর তাহার বর্ণ নির্ভর করে। অত্যন্ত ক্ষীণ মেরুজ্যোতির বর্ণ প্রধানতঃ শ্বেত হইতেই দেখা যায়। উজ্জ্বল মেরুজ্যোতিতে প্রায় সকল বর্ণেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে লাল ও সবুজ রঙেরই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। মাঝারি রকমের উজ্জ্বল মেরুজ্যোতি সাধারণতঃ পীতবর্ণের হইতে দেখা যায়। একটি মেরুজ্যোতির বিভিন্ন অংশের উজ্জ্বলতা সকল সময়েই পরিবর্ত্তন করায় নানা প্রকার বিচিত্র রঙের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্দ্ধবর্ষব্যাপী রাত্রির দেশ মেরুপ্রদেশে মেরুজ্যোতি কিয়ৎ পরিমাণে আলোকের অভাব দুর করে। কোন কোন মেরু-জ্যোতির আলোক এরূপ ক্ষীণ যে কোন রকমে তাহা চোখে দেখা যায় মাত্র। ফটোগ্রাফের সাহায্যে ইহা অপেক্ষাও ক্ষীণতর মেরুজ্যোতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ মেরুজ্যোতির উজ্জ্বলতা ছায়াপথের উজ্জ্বলতার সহিত তুলনীয়। অত্যন্ত উজ্জ্বল মেরুজ্যোতির আলোক পুর্ণিমার জ্যোৎস্না অপেক্ষা উজ্জ্বল হইতেও দেখা গিয়াছে।

টেলিফোনযন্ত্র দ্বারা সংযুক্ত দুইটি দুরবর্ত্তী স্থান হইতে একটি মেরুজ্যোতির কোন বিশেষ উজ্জ্বল বিন্দুর অবস্থান একই সময়ে নির্ণয় করিয়া মেরুজ্যোতির উচ্চতা পরিমাপ সম্ভব হইয়াছে। মেরুজ্যোতির বিস্তৃতি সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫০ মাইল হইতে ২৫০ মাইলের মধ্যে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ মাইলের উপরেও মেরুজ্যোতির অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কখনও কখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ১ মাইলের মধ্যেও মেরুজ্যোতি দেখা যায়; এ সম্বন্ধে অবশ্য বৈজ্ঞানিকসুলভ মতদ্বৈধের অভাব নাই।

প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, সৌরকলঙ্ক ও মেরুজ্যোতির মধ্যে একটি নিকট যোগ-সূত্র আছে। সৌরকলঙ্কের প্রাদুর্ভাব ১১ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি পায়; একই সময়ে মেরুজ্যোতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে সূর্য্যের দেহের সকল দ্রব্যের পরমাণু ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমাগত অসংখ্য ইলেক্ট্রন মহাকাশে বিকীর্ণ হইতেছে। ইলেক্ট্রন বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা বলিয়া চৌম্বক ক্ষেত্রে তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। পৃথিবীমুখী ইলেক্ট্রন-প্রবাহ এই-রূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর চৌম্বক মেরু দুইটির দিকে ধাবিত হয়। এই প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তির সংঘাতে বায়ু-মণ্ডলের অত্যন্ত বিরল বায়ুস্তরের অণুপরমাণু উত্তেজিত হয় এবং সেই উত্তেজনার ফলে আলোকের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকদের বর্ত্তমান মতানুসারে ইহাই মেরুজ্যোতির উৎপত্তির কারণ। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সূর্য্য হইতে নির্গত ইলেক্ট্রনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় সুতরাং সৌরকলঙ্কের আবর্ত্তন-কালের সহিত মেরুজ্যোতির সংখ্যাবৃদ্ধির কালের একত্ব সহজেই বোধ-গম্য হয়।

প্রচলিত মতের পোষক একটি সহজ পরীক্ষা অনায়াসেই করা যাইতে পারে। পরীক্ষার প্রণালী চিত্রে প্রদর্শিত হইল। এই পরীক্ষার জন্য একটি বৈদ্যুত চুম্বক, একটি টিনের ফাঁপা গোলক এবং একটি "ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ" (cathode-ray oscillograph) প্রয়োজন। বৈদ্যুত চুম্বকের উপর গোলকটি বসাইলে তাহা চুম্বক হইয়া যায় এবং তখন উহার নিকটে অসিলোগ্রাফটি আনিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যের ইলেক্ট্রন-প্রবাহের পথ সাধারণ অবস্থার ন্যায়—সরল না থাকিয়া, বাঁকিয়া যায়। এই বাঁকের পরিমাণ অসিলোগ্রাফ হইতে গোলকটির দূরত্বের উপর নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনী "নিয়ন সাইন"-এর (Neon sign) ক্রিয়া ও মেরুজ্যোতির ক্রিয়া অনুরূপ। নিয়ন সাইনের কাচনলের মধ্যে ইলেক্ট্রন-প্রবাহ চালিত করিয়া গ্যাসের অণু এবং পরমাণুগুলিকে উত্তেজিত করার ফলে বিভিন্ন প্রকার বর্ণের আলোকের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর

উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর উপরিস্তরে বিরল বাতাসের উপর অনুরূপ ক্রিয়ার ফলে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে, বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তর অংশে নিয়ন, আর্গন, জিনন প্রভৃতি গ্যাস অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আছে, যদিও অনেক বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান।

কৃত্রিম সন্তানের স্বার্থ-সংরক্ষণ

সন্তানোৎপাদনে অশক্ত অথচ সন্তানকামী বহু লোক আছেন। প্রাচীন কালে এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের দেশে 'নিয়োগের' ব্যবস্থা ছিল। নিয়োগের ফলে জাত সন্তান প্রকৃত জনকের সন্তান বলিয়া পরিগণিত না হইয়া লৌকিক পিতার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত। অল্প কিছুদিন হইল আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, দৈহিক সঙ্গম ব্যতীত, অপর কোন পুরুষের বীর্য্য স্ত্রী-শরীরে নিষেক করিয়া কৃত্রিম ভাবে গর্ভসঞ্চার করার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। বহু কুমারীও এইরূপে অবিবাহিত থাকিয়া এবং দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিয়া মাতৃত্ব উপভোগ করিতেছে। এই ব্যবস্থা এতই অল্পদিন প্রচলিত হইয়াছে যে, কৃত্রিম সন্তান আইনের চক্ষে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে কিনা তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতা তাহার অক্ষমতার সংবাদ গোপন রাখিবে, কাজেই চিকিৎসক ব্যতীত আর কাহারও এ সম্বন্ধে জানিবার কোন উপায় নাই। দুইজন আমেরিকান চিকিৎসক এই ব্যাপারে, আইন ঘটিত কয়েকটি অসুবিধা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে অসুবিধাগুলি এই :—

১। কৃত্রিম সন্তান আইনসঙ্গত ভাবে উত্তরাধিকারী হইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

২। বিবাহের সময় হইতেই নিজের অক্ষমতা ছিল তাহার প্রমাণ দিয়া স্বামী তাহার স্ত্রীর নামে ব্যাভিচার আরোপ করিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনিতে পারে।

৩। প্রকৃত জনককে ভয় দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পারে।

৪। বিনা অনুমতিতে কৃত্রিম ভাবে সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা করার জন্য চিকিৎসকের নামে নালিশ করা যাইতে পারে।

ভবিষ্যতে এই সকল অসুবিধা যাহাতে না হইতে পারে এবং কৃত্রিম সন্তানের স্বার্থ যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকদ্বয় একটি সম্মতিপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সম্মতিপত্রে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনে সহি ও আঙ্গুলের ছাপ দিবেন এবং তাহা রীতিমত রেজিষ্টারী করা হইবে। এইরূপ দুইখানি সম্মতিপত্র সহি হইয়া একটি স্বামী ও অপরটি স্ত্রীর নিকটে থাকিবে। বর্ত্তমানে এই সম্মতি-পত্র সম্পূর্ণ হইলে কৃত্রিম সন্তান আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

স্বামী ও স্ত্রী যখন সম্মতিপত্র সম্পূর্ণ করিতে যাইবে তখন চিকিৎসক দ্বারা স্বামীকে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে, প্রকৃতই তাহার প্রজননশক্তির অভাব আছে কিনা। আঙ্গুলের ছাপ থাকার জন্য কোন স্ত্রী অপর কোন পুরুষকে স্বামী বলিয়া চালাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না।

প্রকৃত জনক যাহাতে ভবিষ্যতে কোন অসুবিধায় না পড়ে, সেই জন্য ইঁহারা বলেন যে, স্ত্রীলোকটিকে এবং পুরুষটিকে হাঁসপাতালে রাখাই শ্রেয়, কারণ তাহা হইলে কেহই অপরকে জানিতে পারিবার কোন সুযোগ পাইবে না। যাহাতে বীর্য্যদাতা ব্যক্তির স্ত্রী তাহার নামে ব্যাভিচারের অভিযোগ না আনিতে পারে, সে জন্য অপর একটি সম্মতিপত্রেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে এইদিক হইতে গোলযোগের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প।

যে চিকিৎসক কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রসবের সময় যিনি উপস্থিত থাকিবেন, এই দুইজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে শিশুর জন্মের সার্টিফিকেটে কোনরূপ গোলমাল থাকিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপে আইনকে ফাঁকি দেওয়া হইলেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ কৃত্রিম উপায়ে জাত সন্তান ভবিষ্যতে কোন দিন নিজের জন্মরহস্য জানিতে পারিলে তাহার যথেষ্ট মানসিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

দত্তক গ্রহণ করিবার জন্য যে সকল উপায় আইন অনুসারে অবলম্বন করিতে হয় তাহা করিলে অবশ্য কোন প্রকার গোলযোগ হইবারই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কেহই এইরূপে নিজে [illegible] বলা সাধারণে জানাইতে চাহে না, কারণ

কৃত্রিম উপায়ে জাত সন্তানের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সকল ঐ দেশে প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে।

চর্ব্বন ও দন্তরোগ

আমেরিকার খাদ্যতত্ত্ব পরিষদের বাৎসরিক ভোজসভায় সুবিখ্যাত মেরুবিহারী আবিষ্কারক ভিলহিয়ালমুর ষ্টেফান্‌সন একটি বক্তৃতা দেন। ষ্টেফান্‌সন একজন সুবিখ্যাত আবিষ্কারক এবং বহুকাল একা এস্কিমোদের দেশে কাটাইয়াছেন। এস্কিমোদের সম্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষা অভিজ্ঞতর কোন ব্যক্তি বর্ত্তমানে আছেন কি না সন্দেহ।

তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আজকাল সকলেই মনে করেন যে কঠিন জিনিস খুব না চিবাইলে দাঁত দৃঢ় হয় না। এস্কিমোদের দাঁত অত্যন্ত সুগঠিত এবং তাহাদের কোন দন্তরোগ না থাকায় আমেরিকার বহু লোকের ধারণা আছে যে, তাহারা খুব বেশী করিয়া দাঁতের ব্যবহার করে। এস্কিমোদের একমাত্র খাদ্য মাংস বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, তাহারা দাঁতে করিয়া মাংস ছিঁড়িয়া খায়; কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এস্কিমোরা বাম হাতে মাংসের একটি বড় টুকরা লইয়া দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরে এবং ডান হাতে ছুরি লইয়া ঠোঁটের কাছ হইতে তাহা কাটিয়া লয়। তিনি এস্কিমোরা কি করিয়া খায় সভায় তাহা দেখান। ছুরি ও কাঁটা সাহায্যে মাংসের যেরূপ ছোট টুকরা কাটা হয়, এস্কিমোদের গ্রাস আয়তনে প্রায় তাহারই মত।

এস্কিমোরা চামড়া হইতে পোষাক তৈয়ারী করে এবং চামড়া নরম করিবার জন্য বহুক্ষণ চামড়া চিবায় বলিয়া সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। প্রকৃত প্রস্তাবে, পৃথিবীর সকল জাতি হইতে কম দাঁতের ব্যবহার করে বোধ হয় এস্কিমোরা। দাঁতের মাড়ি সংবাহন (massage) না করিলে নানা প্রকার দন্তরোগ হয় বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু এস্কিমোরা যাহা খায় এবং যেরূপ ভাবে খায় তাহাতে মাড়ির কোন ব্যায়ামই হয় না। অথচ য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে আহার শিখিবার পূর্ব্বে কোন এস্কিমোর কখনও দাঁতে পোকা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। শতকরা ১০০ জনের সুস্থ দাঁত আর কোন জাতির কখনও দেখা যায় নাই।

শরীরে কোনও বিশেষ দ্রব্যের অভাবের জন্য এই সকল রোগ হয়—ইংরাজিতে যাহাদের deficiency disease বলা হয়,—এস্কিমোদের তাহা কখনও হইতে দেখা যায় না। কেবলমাত্র মাংস খাইলে 'স্কার্ভী' (scurvy) রোগ হয় বলিয়া পূর্ব্বে ধারণা ছিল, কিন্তু এস্কিমোদের কখনও স্কার্ভী হইতে দেখা যায় নাই। রিকেট্‌স, পাইয়োরিয়া, দাঁতের পোকা প্রভৃতি এস্কিমোদের মধ্যে দেখা যায় না। শুকান মাংসে বালি থাকার দরুণ, শুষ্ক মাংস খাইলে তাহাদের দাঁত কখনও কখনও অল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাহাতে তাহাদের দাঁতের কোন রোগ হইতে দেখা যায় না। যে সকল এস্কিমো এখনও য়ুরোপীয়



পরিকল্পিত হেলিকপ্টার: মধ্যে হেলিকপ্টারের কাল্পনিক দৃশ্য। বামে—তির্য্যক্ অবস্থায় ভারসাম্যের ব্যবস্থা। দক্ষিণে—ষ্টিয়ারিং হুইলের সজ্জা। [পর পৃষ্ঠা

আহার আরম্ভ না করিয়া দেশী খানা খায় তাহাদের মধ্যে ক্যান্‌সার রোগ হইবার কথাও কখনও শুনা যায় নাই।

এস্কিমোদের স্বাস্থ্য তথা দাঁতের অবস্থা ভাল হইবার কারণ তাহাদের খাদ্য। সম্পূর্ণ মাংসভোজী হইলেও উহারা মাংসের এমন অনেক অংশ খায়, যাহা 'সভ্য' জগতের লোক খায় না। সেই কারণেই উহাদের খাদ্য সুসমঞ্জস হইতে পারিয়াছে।

ষ্টেফান্‌সন তাঁহার বক্তৃতায় কেবলমাত্র মাংসাহারের প্রশংসায় শেষ করেন নাই। তিনি বলেন যে, ঠিকমত খাদ্য হইলে কেবল মাংস, সম্পূর্ণ নিরামিষ অথবা আমিষ ও

নিরামিষের মিশ্রণ যে কোনরূপ আহারই শরীর সুস্থ রাখিতে পারে।

স্বাভাবিক বনাম কৃত্রিম রবার

পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় কৃত্রিম রবারের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। রবারধর্মী কৃত্রিম পদার্থগুলির এমন কয়েকটি গুণ আছে যাহা স্বাভাবিক রবারের নাই। এই কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রবার ব্যবহৃত না হইয়া কৃত্রিম রবার ব্যবহৃত হইতেছে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, যে স্বাভাবিক রবারে সামান্য প্রোটিন (protein) জাতীয় পদার্থের অস্তিত্বই উহার নিকৃষ্টতার কারণ। বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় স্বাভাবিক রবার প্রোটিনমুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে স্বাভাবিক রবারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বিশেষ প্রক্রিয়ায় গন্ধকের সহিত যুক্ত হইলে রবারকে 'ভাল্‌ক্যানাইজ ড' (vulcanized) রবার বলা হয়। ভাল্‌ক্যানাইজ ড রবারের প্রধান ব্যবহার বৈদ্যুতিক তারের 'আবরণী হিসাবে, কারণ রবার বিদ্যুতের পরিচালক নহে। ভাল্‌ক্যানাইজ ড রবারের প্রধান দোষ এই যে, ইহা বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার পর ইহার বৈদ্যুতিক ধর্ম এক থাকে না। প্রোটিনমুক্ত রবার জলীয় বাষ্প শোষণ করে না, সুতরাং ইহা বিদ্যুতের প্রতিরোধক হিসাবে অধিকতর উপযোগী। বিশেষতঃ, যে সকল স্থানে জলের সংস্পর্শে আসিতে হয় সেখানে প্রোটিনমুক্ত রবার ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবহার প্রায় অচল।



তোতলামির কারণ নির্ণয় করিবার জন্য পরীক্ষা করা হইতেছে। [পর পৃষ্ঠা

চিকিৎসকেরা দস্তানা প্রভৃতি নানারূপ রবারের জিনিষ ব্যবহার করেন এবং সেগুলি জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য প্রায়ই গরম জলে ডুবাইতে হয়। স্বাভাবিক রবারের পক্ষে গরম জল বিশেষ ক্ষতিকর, কাজেই পূর্ব্বে এই সকল রবারের জিনিষ অধিক দিন স্থায়ী হইত না। প্রোটিনমুক্ত রবারে এই জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে এই অসুবিধা দূর হইবে।

নূতন ধরণের হেলিকপ্টারের পরিকল্পনা

জনৈক আমেরিকান একটি নূতন ধরণের হেলিকপ্টারের পরিকল্পনা করিয়াছেন। হেলিকপ্টারটির আকৃতি অনেকটা মোচার মত। ইহার মাথায় দুইটি প্রোপেলার থাকিবে এবং প্রোপেলার দুইটি বিপরীত দিকে ঘূর্ণিত হইবে। হেলিকপ্টারটির নীচে মাছের পাখনার মত চারটি ইস্পাতের ধাতুখণ্ড লাগান থাকিবে। পিয়ানো বা ভারী আসবাবপত্রের তলায় যেরূপ চাকা লাগান থাকে (castor wheel) এই চাকাগুলিও সেইরূপ যে কোন দিকে ঘুরিতে পারিবে। যন্ত্রটির নীচে উড়িবার সময় ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। চালক ইচ্ছামত সোজা উপরে উঠিতে ও নামিতে পারিবে। কোণাকুণি ভাবেও উঠানামা করা যাইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহা ছাড়া, চালক ইচ্ছামত সমস্ত যন্ত্রটিকে শূন্যে ঘুরাইয়া যে কোন দিকে মুখ ফিরাইতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ। একটি মাত্র ইঞ্জিন প্রোপেলার দুইটি চালাইবে। হেলিকপ্টার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় করা হইয়াছিল আকাশবিহারের প্রথম হইতে সোজাসুজি উঠানামা করার উপযুক্ত আকাশযান উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে। অটোজিরে কতকাংশে সে সমস্যা মিটাইলেও সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারে নাই, কাজেই মাঝে মাঝে নূতন নূতন হেলিকপ্টারের পরি

কল্পনার কথা শুনা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে কিনা বলা যায় না।



সুপ্ত প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবনের জন্য রুশ বৈজ্ঞানিকরা তুষারাবৃত জমি খনন করিয়া মাটি তুলিতেছেন। বামে বৃত্তের মধ্যেঃ ৩০০০ বৎসর পরে পুনরুজ্জীবিত প্রাণীর আণুবীক্ষণিক চিত্র।

তোতলামির নূতন চিকিৎসা

অধিকাংশ লোক বাম হাত দিয়া সকল কাজ করিতে পারে না, অনেকের পক্ষে আবার ডান হাত মোটেই কার্য্যকরী নয়। চিকিৎসকদের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, স্বাভাবিক কার্য্যকারিতা যে হাতের বেশী সেই হাতের যাহারা সম্যক ব্যবহার করে না, তাহারা প্রায়ই তোতলা হয়। সকলকে ডান হাত দিয়া অধিকাংশ কাজ করিতে দেখিয়া অনেক শিশু ডান হাতই অধিক ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে অথচ হয়ত তাহার বাম হাত অধিকতর কার্য্যকরী; এই সকল ক্ষেত্রে তোতলা হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কোনও তোতলা লোকের কোন হাত অধিকতর কার্য্যকরী তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বর্ত্তমানে একটি পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। কয়েকটি কাঠের টুকরায় নানা রকম আঁকাবাঁকা রেখা গভীরভাবে খোদাই করা থাকে। চোখ বাঁধা অবস্থায় রোগীকে একহাতে রেখাটির আকার অনুভব করিয়া অপর হাতে তাহার প্রতিকৃতি আঁকিতে বলা হয়। দুই বিভিন্ন হাতে আঁকা ছবির তুলনা করিলেই কোন হাত রোগীর পক্ষে অধিকতর কার্য্যকরী অতি সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু রোগীকে বহু ক্ষেত্রেই বিপরীত হাত ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হাতের পুনর্ব্যবহার করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোতলামি সারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

সুপ্ত প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন

শৈত্যের প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণীর প্রাণশক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত সুপ্ত থাকিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মৃত বোধ হইলেও উপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে এই সকল প্রাণীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব। সংপ্রতি কয়েকজন রুশ বৈজ্ঞানিক সাইবেরিয়ার তুষারে বহুকাল প্রোথিত মাটির মধ্য হইতে এই প্রকার প্রাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশুদ্ধ জলে এই মাটি রাখিয়া দিলে তাহা ধীরে ধীরে গলিয়া যাইবার পর অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চিত্রে প্রদর্শিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে, এই সকল প্রাণী অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর মাটীর তলায় জমিয়া ছিল।



নূতন ধরণের আল্ট্রা-ভায়লেট বাতি। ইহাতে মাত্র ৭৫ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হয়।

নূতন ধরণের আল্ট্রা-ভায়লেট বাতি

দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সংপ্রতি এক প্রকার নূতন ধরণের আল্ট্রা-ভায়লেট বাতি উদ্ভাবন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ আল্ট্রা-ভায়লেট বাতির জন্ত 'ট্রান্সফর্মার' প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ১১০ ভোল্ট চাপের সাধারণ বৈদ্যুতিক তারের সহিত যোগ করিলেই চলে। বাতিটি বিশেষ প্রকার তাপসহ কাচের তৈয়ারী এবং দেখিতে বড় আকারের বিজলী বাতির মত। ইহাতে খরচও খুব কম পড়ে। সাধারণ আল্ট্রা-ভায়লেট বাতির জন্ত প্রায় ২০০০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে কিন্তু ইহাতে মাত্র ৭৫ ওয়াট শক্তি ব্যয় হয়।

অ্যামোনিয়ার নূতন ব্যবহার

কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় উপফল (byproduct) হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া প্রধানতঃ বাতাস হইতে প্রস্তুত হইতেছে। কয়লার গ্যাসের কারখানায় তৈয়ারী অ্যামোনিয়া বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে না পারায় তাহার কি ব্যবস্থা করা যায়, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত বিলাতে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি অ্যামোনিয়াকে অ্যামোনিয়ম বাই-কার্বনেটে পরিণত করিয়া সার হিসাবে ব্যবহার করিবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে সার হিসাবে অ্যামোনিয়া হইতে সাধারণতঃ অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, কিন্তু কয়লার গ্যাসের কারখানায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনা খরচে পাওয়া যায় বলিয়া অ্যামোনিয়ম বাই-কার্বনেট সালফেট অপেক্ষা অল্প দামে বিক্রয় করা যাইতে পারে। কমিটি বলিতেছেন যে, অ্যামোনিয়ম বাই-কার্বনেট এরূপভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে যাহাতে জমির কোন ক্ষতি না করিয়া অ্যামোনিয়ম বাই-কার্বনেটের সমস্ত অ্যামোনিয়াই শস্যের পুষ্টিসাধনে লাগিবে। ইহা অবশ্য কতদূর সত্য হইবে তাহা ভবিষ্যৎ পরীক্ষাসাপেক্ষ।

বালুচর

—আজিজুর রহমান

গোরাই নদীর চরে
আছাড় খাইয়া বারেবারে এসে ঢেউগুলি কেঁদে মরে;
তারা দরিয়ার বুকের বেদনা ঢেউ হয়ে ওঠে জেগে—
নহীন নদীতে পূবালী হাওয়ার ব্যথার পরশ লেগে,
গুমরি গুমরি গোরায়ের বুকে বেদনার কথাগুলি,
ঢেউ হয়ে যেন উঠিতেছে সদা জলের উপরে ফুলি;
দুলে দুলে তারা ছুটিয়া আসিয়া গোরাই নদীর চরে,
বুকের বেদনা কহিতে না পারি আছাড় খাইয়া মরে।

দুনিয়াকে করে পর
নিখিলের যত বেদনা লইয়া পড়িয়া রয়েছে চর,
আপনার জন নাই কেহ তার আছে শুধু কাশঝাড়
মাঝে মাঝে ক'টি বাবলার গাছ ঝোপঝাড় বিস্তার,
তাহারাও যেন চরের মতই দুনিয়াকে করে পর
অভাগা চরের সাথী হয়ে বুঝি বেঁধেছে হেথায় ঘর,—
আসে না কো কেহ এ বিজন চরে, শুধু দুটি চখাচখী
এক বেদনার সাথী যেন তারা, তাহারাই সখাসখী।

...ল বাতাস লেগে
কাশের বনের করুণ কাঁদন সারা চরে ওঠে জেগে;
ঝিরঝির করি বাতাসে সে সুর ভাসিয়া আসিয়া হায়,
...র দিগন্তে অসীমের বুকে কোথায় মিশিয়া যায়।

সে বেদনা কেহ বোঝে না তাহার সেই সুরে কত ব্যথা
বালুচরে ফেরে কেঁদে কেঁদে তাই ভাষাহারা যত কথা—
আসে যদি কেহ এ বিজন চরে নিশুতি গহন রাতে
বুকের বীণায় সুর মিলাইয়া গান গাছে তার সাথে—
বুঝিতে বেদনা তার
ব্যর্থ যে সুর কাশের বনেতে করে নিতি হাহাকার।

এক কাঁদে বালুচর
নাই কেহ নাই বেদনার ব্যথী দুনিয়া যে তার পর।

ও পারে যখন গাঁয়ের বধূরা প্রদীপ জ্বালে গো সাঁঝে
এ পারে তখন নিরালা চরেতে বেদনার সুর বাজে,
ও পারে শ্যামল তরুছায়া ঘেরা ছবিসম গ্রামখানি
এ পারে বিরাট ধু ধু বালুচর বায়ু করে কানাকানি।
গোরাই বহিছে মাঝখানে রচি মহা এক ব্যবধান
হাসি ও দুখের মাঝারেতে যেন করুণ যোগীর গান।
কুলু কুলু কুলু তানে
সে যেন চলেছে আঁখিধারা লয়ে দূর অসীমের পানে।
কতকাল নাহি জানি,
এ পার ও পার দুই বিরহীর বুকের মৌন বাণী
ভাষাহীন সঙ্গীতে
চলিবে ব্যথার আদান প্রদান শুধু শুধু ইঙ্গিতে।

পনের বছর

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চোখের উপর দেখিলাম আমাদের কৃপাসিন্ধুকে, লটারীর টাকায় বড়লোক হইয়া গেল। কৃপাসিন্ধুর দুইবেলা ভাল করিয়া আহার জুটিত না। সেই কৃপাসিন্ধু বড়লোক হইল লটারীতে টাকা পাইয়া—চার আনায় একেবারে সতের হাজার টাকা! তারপর তাহার পরিবর্ত্তন আসিল: গায়ে ছেঁড়া জামার পরিবর্ত্তে সিল্কের জামা উঠিল, পরণে শান্তিপুরের জরীপাড় ধুতি, আংটি, ঘড়ি আরও কত কি! মোটকথা কৃপাসিন্ধু একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইল। পূর্ব্বে আমরা তাহার প্রতি তাকাইলেই সে নত হইয়া নমস্কার করিত, কিন্তু এখন পথে দেখা হইলে ঠোঁটের কোণে একটু বড়মানুষী চাপাহাসি হাসিয়া বলে, কি হে, কেমন আছ? তাহার এই নব-লব্ধ বড়মানুষীর সদ্ব্যবহার সে পুরামাত্রায় করিয়া লইতেছে। আমরা আর কি করিব? শুধু চাহিয়া দেখি: চতুর্দ্দিকে কাহার কি হইতেছে। আজ এই এতটা বয়স পর্য্যন্ত বহু প্রকারে বহু চেষ্টা করিলাম, বহু লটারীর টিকিট ক্রয় করিলাম, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাওয়া গেল না। তাই ভাবি, কখন কাহার ভাগ্যে শনি ও বৃহস্পতির শুভ-সম্মেলন হয় বলা যায় না, কোন্ লোকের কখন কি হয় বলা যায় না। জীবনের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জোয়ার-ভাঁটায় কখন যে উত্থান হইবে, আবার কখন সমস্ত মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, তাহা বলা অসম্ভব—বুঝি ঈশ্বর-দর্শনলাভের মতই কঠিন।

কিন্তু কৃপাসিন্ধুর কথা বলিতে বসি নাই; বলিতেছিলাম নীলমণি দত্তের কথা। নীলমণি দত্ত দু' তিনটা জিলা ব্যাপিয়া চাউলের ব্যবসা করে; প্রতি হাটে তাহার গোলা, হাজার হাজার মণ চাউল মাসে বিক্রয় হইতেছে। বৎসরের শেষে যে লাভের অঙ্কটা সে সযত্নে সিন্ধুকে পুরিয়া রাখে, তাহা নিতান্ত কম নয়।

কিন্তু কি করিয়া নীলমণি মস্ত বড়মানুষ হইল, কি করিয়া তাহার চাউলের ব্যবসায় এক জিলা হইতে অন্য জিলায় ছড়াইয়া পড়িল, তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না। নীলমণিকে বর্ত্তমানে একজন মহাপুরুষ বলিলেই চলে: তাহার নাম গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকের দ্বারা দিনান্তে অন্ততঃ একবার করিয়া উচ্চারিত হয়, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নামটা শিখিয়া লয়। তাহার উপর শনির কোপদৃষ্টি যেটুকু ছিল, তাহাও সকলের কৃপায় কাটিয়া গিয়াছে, শনি ও বৃহস্পতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে আজ তাহাকে অবলোকন করিতেছেন।

পনের বছর আগেকার কথা। নীলমণি তাহার জন্মস্থান বিনোদপুরেই থাকিত। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা; পিতৃপুরুষের ভিটায় খান দুই খড়ের ঘর মাত্র ছিল—তাহাও পড়ো-পড়ো অবস্থায়। বর্ষায় নীলমণি স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া সারারাত্রি ঠায় বসিয়া থাকিত—চালের ছিদ্র দিয়া জল পড়িয়া সমস্ত ভাসিয়া যাইত। ঘরের চাল পর্য্যন্ত মেরামত করিবার সঙ্গতি নীলমণির ছিল না। সে তখন হাটে হাটে এটা-ওটা বিক্রয় করিয়া তিনটি প্রাণীকে কোনক্রমে জীবিত রাখিবার মত উপার্জ্জন করিত।

তারপর একদিন নীলমণিকে গ্রামে এক মুদীর দোকান করিতে দেখা গেল। চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি পল্লী-গ্রামের আবশ্যকীয় দ্রব্য তাহার দোকানে মিলিত। নীলমণি সমস্ত দিন দোকানে বসিয়া লোকের চাহিদা মিটাইত। কতক দিন চলিল মন্দ নয়; কিন্তু তারপরেই দেখা গেল গাঁয়ের লোকেরা সওদা লইতে যতটা ব্যগ্র, তাহার মূল্য দেওয়ার সময় ঠিক ততটা ব্যগ্র নয়। কাজেই তাহার ঋণের মাত্রা বাড়িয়া চলিল এবং নীলমণিকে একদিন তাহার দোকানের দরজা বন্ধ করিতে হইল।

ইহার পরের ইতিহাসটাই এই কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময়। মুদীর দোকান ফেল করার কয়েকদিন পরে স্ত্রী ও পুত্রকে নিজেদের ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাখিয়া নীলমণি নিরুদ্দেশ হইল; এমন কি স্ত্রীকে পর্য্যন্ত কিছু বলিয়া গেল না। গাঁয়ের লোকেরা নানাকথা বলাবলি করিতে লাগিল।

স্ত্রী শিশুপুত্রকে লইয়া কাঁদিয়া আকুল। দুঃখের প্রথম ধাক্কা কাটিলে নীলমণির স্ত্রী সব চেয়ে বড় সমস্যায় পড়িল; পুত্র বিপিনকেই বা কি করিয়া রক্ষা করিবে আর নিজেই বা খাইবে কি? বহু চেষ্টা, বহু কাকুতি-মিনতির পর সে পাড়ার ধনী চাটুজ্জেদের বাড়ীতে কাজ পাইল এবং তাহা দ্বারাই কায়ক্লেশে দিন চলিল।

মাস কয়েক পরে মতই নীলমণি আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত; তাহার প্রত্যাবর্ত্তন গমনের মতই আকস্মিক। মনে হইল, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। কয়েকদিন পরে গাঁয়ের হাটে তাহার গোলা উঠিল, শত শত মণ চাউল আসিতে লাগিল। সকলে অবাক হইয়া দেখিল, নীলমণি বিশাল ও বিস্তৃত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহার পর ধীরে ধীরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই নীলমণির ব্যবসায় জাঁকিয়া উঠিল; এক হাট হইতে অন্য হাটে, এক জিলা হইতে অন্য জিলায় সকলের চোখের উপরই ছড়াইয়া পড়িল। সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখিল, তাহার খ'ড়ো-ঘরের জায়গায় প্রকাণ্ড দ্বিতল দালান উঠিল, তাহার স্ত্রীর গায়ে দামী কাপড় ও গহনা উঠিল, আর ছেলে বিপিন ধনীর ছেলের মতই জুতা মস্ মস্ করিয়া সহরের স্কুলে পড়িতে গেল। গাঁয়ের প্রবীণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সখেদে বলিয়া উঠিলেন, পুরুষস্য ভাগ্যম্, কখন কার বরাত খুলিয়া যায় বলা যায় না।

*

সেই নীলমণিকে তাহার কর্ম্মবহুল জীবনে আজ প্রথম ভীত ও চিন্তিত দেখা গেল। জীবনে আজ পর্য্যন্ত বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এমন কি যখন ভবিষ্যতে বিন্দুমাত্র আশার আলোক পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, তখনও কেহ নীলমণিকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। একের পর এক বিপদ আসিয়াছে, আর নীলমণি তাহা একের পর এক অতিক্রম করিয়াছে ধীর মস্তিষ্কে, স্থির বুদ্ধিতে।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্য রকম। সকাল বেলাই আঁকা-বাঁকা মেয়েলী হস্তাক্ষরে পরিপূর্ণ একখানা পোষ্টকার্ড তিন-চারিটা ছাপ খাইয়া আসিয়া উপস্থিত। নীলমণি প্রথমটা পড়িয়া অবাক হইয়া গেল—আবার পড়িল, আবার…… কিন্তু ব্যাপারটা ঘন কুয়াসাচ্ছন্নই রহিল। নীলমণি ভাবিয়া পাইল না, কি প্রয়োজনে সৌদামিনী তাহার এখানে আসিতেছে। সে ভয় পাইয়া গেল, তাহার মনে হইতে লাগিল, শরীরে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া গেল, স্নায়ুগুলি যেন সমস্ত আল্‌গা হইয়া খসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে যেন এখনই হার্টফেল করিয়া মারা যাইবে, এখানে বসিবার ঘরের এই কেদারার উপরেই! অতি ক্ষীণ কণ্ঠে, মৃত্যু-পথযাত্রীর শেষ ডাকের মতই সে স্ত্রীকে ডাকিল।

স্ত্রী আসিয়া তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া আতঙ্কে বলিল, ও কি, তোমার কোন অসুখ করেছে?

নীলমণি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, এক গ্লাস জল আন ত।

স্ত্রী ছুটিয়া জল লইয়া আসিল। নীলমণি একনিঃশ্বাসে সমস্ত জলটুকু খাইয়া ধীরে ধীরে গ্লাসটি স্ত্রীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, সদু, সৌদামিনী বিপিনের মা কাল আসছে।

বিপিনের মা স্বামীকে ভাল করিয়া কথা বলিতে দেখিয়া একটু আশ্বস্ত বোধ করিল; জিজ্ঞাসা করিল, কে—কে আসছে?

নীলমণি এতক্ষণে আরাম-কেদারায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়াছে। অর্দ্ধ-নীমিলিত চোখেই উত্তর দিল, সৌদামিনী,—রামু ঘোষের মেয়ে সৌদামিনী। তোমার তাকে মনে নেই?

বিপিনের মাকে ভাবিতে হইল। বস্তুতঃ ব্যাপারটা ভাবিবারই। কত বছর আগেকার কথা—সকল সময় কারই বা মনে থাকে? আর সৌদামিনী এমন একটা কি যে তাহাকে মনে করিয়া রাখিতে হইবে? বিপিনের মা সৌদামিনীকে ভাল করিয়া মনে করিতে পারিল না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল: সে কে এবং কেন আসিতেছে, কিন্তু নীলমণি ততক্ষণে চোখ বুজিয়াছে, হয়ত আর উত্তর দিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সে কোন কথা বলিল না। বিপিনের মা চলিয়া গেল।

নীলমণি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ভাবিতেছে: সদু কেন আসিতেছে? দীর্ঘ পনের বছর—ইহার মধ্যে তাহার সহিত সদুর সাক্ষাত হয় নাই। দু'এক বছর পরে পরে সদুর চিঠি যে নীলমণি পাইত না এমন নয়, তবে উত্তর দেওয়া কোন দিনই ঘটিয়া উঠে নাই। কেন দেওয়া হয় নাই, সে প্রশ্নেরও জবাব নীলমণি খুঁজিয়া পায় না। বহুদিন সে সদুকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে, ভাবিয়াছে সময় খুলিয়া সে সদুকে লিখিবে

সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া—কিন্তু পত্র প্রথম পাঠের অধিক কোনদিনই অগ্রসর হয় নাই। গত পনের বছর যাবতই সে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই দুর্ব্বলতা আসিয়া শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে বাধা দিয়াছে। অথচ ব্যাপারটা এমনই যে, কাহারও নিকট বলিয়া যে এতটুকু শান্তি পাইবে, তাহারও উপায় নাই—এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্তও নয়।

নীলমণির পনের বছর আগেকার কথা মনে পড়িল। কেমন করিয়া অভাবের তাড়নায় বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পশ্চিমের এক তীর্থে সৌদামণির সঙ্গে তাহার হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছিল এবং সৌদামিনীর সাদর আহ্বানে তাহার বাড়ীতে যাইয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন অ-দেখার পরে অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সাথে আন্তরিকতা পুনরায় স্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই; নীলমণি তাহা জানিত। কিন্তু সৌদামিনী তাহাকে আন্তরিকতায় মুগ্ধ করিয়া দিল। কবে কোন্ শৈশবে দু'জনে পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল—একত্রে একই পাঠশালায় পড়িয়া মানুষ হইয়াছিল, নীলমণি তাহার অনেকখানিই ভুলিয়া গিয়াছিল। শৈশবের সে অন্তরঙ্গতা লোক-চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া উভয়ের স্নেহ-মমতায় বাড়িতে বাড়িতে কি নিবিড় ভালবাসায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার অনেকখানিই নীলমণি জানিত না। সৌদামিনী কিন্তু কিছুই ভুলিয়া যায় নাই। তাই সে নীলমণিকে সাদরে তাহার গৃহে আশ্রয় দিয়াছিল। সে তখন নিঃসন্তান বিধবা, দেবরদের সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। নীলমণি একমাস সেখানে ছিল, সৌদামিনী সে সময় প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিয়াছে। অথচ আসিবার সময় সে কেমন করিয়া সৌদামিনীর বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি লইয়া আসিল?

নীলমণি ভাবিতে ভাবিতে ঘামিয়া উঠিতেছিল; তাহার মনে হইল, সে পাগল হইয়া যাইবে। সৌদামিনীর গহনা চুরি করিয়া সে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল; হয়ত ইহার ভিতরেও সৌদামিনীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ছিল, নহিলে চুরির টাকায় ব্যবসা করিয়া সে উন্নতি করিল কি করিয়া? আচ্ছা, সে বর্ত্তমানে হাজার হাজার টাকার মালিক—টাকা-গুলি ত' সৌদামিনীকে অনেক আগেই ফিরাইয়া দিতে পারিত? নীলমণি এ কথা গত পনের বছর অন্ততঃ দৈনিক একবার ভাবিয়াছে—আচ্ছা, টাকাগুলি ফিরাইয়া দিলেই ত হয়! কিন্তু সে তাহা পারে নাই। তাহার মনে হইয়াছে, ঐ গহনা বিক্রয়ের টাকাই তাহার মূলধন, উহা ফিরাইয়া দিলে হয়ত সৌদামিনীর অভিশাপ লাগিবে, তাহার এই বহু যত্নে ও অধ্যবসায়ে গড়া ব্যবসায় তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আরও একটা কথা তাহার মনে হইয়াছে: টাকা ফেরত দিতে গেলে সৌদামিনী যদি তাহাকে অপমান করিয়া বসে; যদি মুখের উপরই বলিয়া বসে, চুরি করিয়া সেই টাকা আবার ফেরত দিতে আসিয়াছ? লজ্জা হয় না?

নীলমণি কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সে আর ভাবিতে পারিতেছে না। তাহার মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। দুই হাতে সজোরে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল—তার চেয়ে সদু আসিবার আগে বাড়ী থেকে চলিয়া গেলে হয় না?......না, না......তা' হয় না। আচ্ছা, সে আসুক, সৌদামিনী আসুক, না হয়, তখন তার হাত দুটো ধরিয়া বলিবে—সদু, আমায় ক্ষমা কর।

নীলমণি অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল।

*

সৌদামিনী আসিয়া পৌছিল প্রায় সন্ধ্যায়। সঙ্গে একটি তোরঙ্গ ও একটি পুঁটুলি। তাহার এক দেবর-পুত্র তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। বহুদিন পরে সে বিনোদপুরে, নিজের জন্মস্থানে আসিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া স্বামীগৃহে গিয়াছিল যৌবনে, আর আজ আসিয়াছে প্রায় প্রৌঢ়া হইয়া। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে গ্রামের, তখন যাহা দেখিয়া গিয়াছিল, অনেক স্থানে তার চিহ্নই নাই। নিজেদের ভিটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সেখানে কে বাড়ী-ঘর করিয়া বাস করিতেছে, সৌদামিনী তাহা জানে না।

নীলমণি দত্তের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সৌদামিনী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী। তাহার একবার মনে হইল যে, পথ-প্রদর্শক লোকটি হয়ত ভুল করিয়াছে। কিন্তু পশ্চাতে চাহিতেই নীলমণির সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। সে কোথায় যেন গিয়াছিল, সেখান হইতে

বাড়ী ফিরিতেছিল। নীলমণি সৌদামিনীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল—এক-পা পিছাইয়া গেল।

সৌদামিনী মাথার কাপড় একটু টানিয়া বলিল—নীলমণি-দাদা না ?

নীলমণির তখন কথা বলিবার অবস্থা নয়। কোন মতে সে বলিল—হ্যাঁ…হ্যাঁ…তুমি সৌদামিনী…না…তা এস, ভিতরে এস।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া নীলমণি ডাকিল, বিপিনের মা। স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল। নীলমণি অঙ্গুলিসঙ্কেতে পশ্চাতে দেখাইয়া বলিল, সৌদামিনী এসেছে, তাকে যত্ন করে বসাও।

সে সরিয়া পড়িল।

সৌদামিনী সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, এক স্থূলাঙ্গী মহিলা, গা-ময় গহনা। সে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আপনিই বুঝি বৌঠান ? আমাকে চিন্‌তে পারেন নি বোধ হয় ?

নীলমণির স্ত্রী একটু হাসিয়া বলিল, না, আপনার কথা কাল ওঁর কাছে শুনেছি। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? ভিতরে আসুন।

সে সৌদামিনীকে লইয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

ওদিকে নীলমণি তাহার ঘরে বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত শরীর যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বহুদিন পরে সৌদামিনীকে সে আবার দেখিল। সৌদামিনীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছে--সে বৃদ্ধা হইতে চলিয়াছে।

সে ভাবিয়া পাইতেছিল না এখন কি করিবে। সৌদামিনী তাহার বাড়ী আসিয়াছে, তাহার স্ত্রীর সহিতও বিশেষ পরিচয় নাই ; সুতরাং তাহারই গিয়া সৌদামিনীকে আদর-যত্ন করা উচিত। কিন্তু নীলমণির কেমন ভয় হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন এই মাত্র সৌদামিনীর গহনাগুলি চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে—সৌদামিনী যেন তাহাকে হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

সৌদামিনী ও বিপিনের মা যখন বসিয়া কথা বলিতেছিল, তখন নীলমণি সেখানে যাইয়া উপস্থিত, তাহাকে দেখিয়াই সৌদামিনী বলিল, এই যে দাদা, বৌঠানের হাতে আমাকে দিয়ে কোথায় পালালে !

নীলমণি জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এই…এই আমি একটু…আমার একটু কাজ ছিল। তারপর কেমন আছ সদু ?

সৌদামিনী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, আর আমাদের আবার থাকা ? আর ক'টা দিন কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারলেই হ'ল।

সে আরও বলিয়া চলিল—কত বছর বাদে গাঁয়ে এলুম দাদা—তোমরা ছিলে বলেই ত', নইলে কেই বা চিন্‌ত ? বাড়ী-ঘর সে-সব ত কবে চুলোয় গেছে !

নীলমণির বুক দুর দুর করিতেছে। সে সৌদামিনীর নিকট হইতে তাহার আকস্মিক আগমনের কারণটা জানিতে চায়। তাই সে সৌদামিনীর কথায় বাধা দিয়া বলিল—তা' সদু, এখন যাচ্ছ কোথায় ?

সৌদামিনী হাসিয়া উঠিল। নীলমণি লক্ষ্য করিল, ছেলে-বেলাকার মত সে এখনও কথায় কথায় পরিপূর্ণ হাসি হাসিয়া উঠে। সদু বলিল, ভয় নেই দাদা, তোমার এখানেই আড্ডা গাড়ব না। চলেছি কাশী, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে মাথা রেখে বাকী দিন ক'টা কাটাতে পারি কি না সেই চেষ্টা করতে। নীলমণির বুকের কম্প একটু থামিল। তবে সে যা ভাবিয়াছিল, তা' নয়। ভদ্রতার খাতিরে এবার একটু জোরেই সে বলিল, এখানে কয়েকটা দিন থাকবে ত ?

সৌদামিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কোথায় আর থাকছি বল ? কালকের দিনটা একটু বিশ্রাম ক'রে পরশুই রওনা দেব।

নীলমণি এবার সোজা হইয়া বসিয়া সৌদামিনীর দিকে চাহিল। তাহার সহিত চোখাচোখী হইতেই সৌদামিনী কথার মোড় ঘুরাইয়া দিল। বলিল, খাসা বাড়ী করেছ দাদা ! বৌ-ঠান আমাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার ধনসম্পদ যেন চিরদিন অক্ষয় থাকে। আর বৌ-ঠান কি ভালমানুষ দাদা ! তুমি আগে আমাকে জানাও নি কেন, তা হ'লে কবে আমি এসে বৌঠানের পায়ের ধূলো নিতুম !

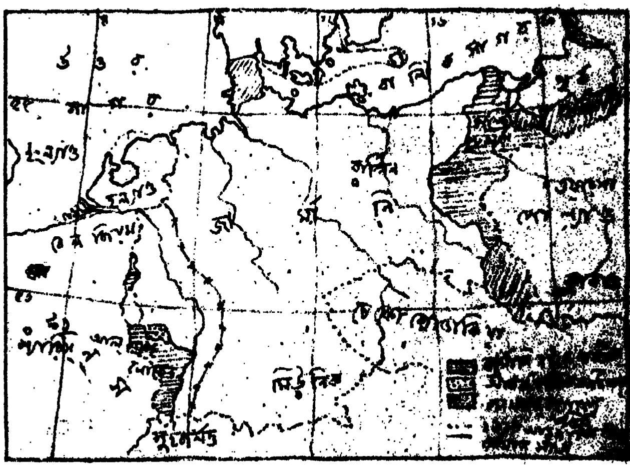
নীলমণি এবার হাসিয়া উঠিল অনেকটা প্রাণখোলা হাসি। এখন তাহার ভয় কাটিয়া গিয়াছে, সে যাহা ভাবিয়া-ছিল সদু সেজন্য আসে নাই ; পনের বছর পরে দুশ্চিন্তার নাগপাশ হইতে নীলমণি দত্ত কি আজ মুক্তি পাইল ?

ভার্সাই সন্ধি ও পরাজিত জার্ম্মানী

—শ্রীইতিহাস-পাঠক

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ বর্ত্তমান য়ুরোপের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় বৎসর। ঐ সালে খুব কম করিয়া ধরিলেও তিনটি অতি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার প্রথমটি, সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর হাতে ফরাসীদের শোচনীয় পরাজয় এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, ইটালির ঐক্যবন্ধন ও মহাশক্তিরূপে বিকাশ এবং তৃতীয়, বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্ম্মান রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যরূপে পরিণতি এবং এক শক্তিমান ও সংঘবদ্ধ জার্ম্মান জাতির প্রতিষ্ঠা। এই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর তেতাল্লিশ বছর ধরিয়া য়ুরোপে কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় অশান্তি দেখা যায় নাই। তাহার ফলে পশ্চিম য়ুরোপ কর্ম্মক্ষেত্রে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিল। আমরা প্রাচ্য দেশীয়েরা যে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার ষোল আনা প্রচার ও প্রসার এই সময়েই হইয়াছিল। মোটের উপর এই সময়টাই বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় পর্ব্ব। আবার এই গৌরবের বেশ একটা শ্রেষ্ঠ অংশ হয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জার্ম্মানীর প্রাপ্য। কেবল তাহাই নহে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির দিক হইতে না দেখিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কর্ম্মকৌশলের দিক্ দিয়া দেখিলে জার্ম্মানীকে বোধ হয় সমগ্র য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয় বিবেচনা করিতে হয়। জার্ম্মানীর আত্মবিশ্বাসও তদনুরূপ হইয়াছিল। 'সবার উপরে জার্ম্মানী' (Deutschland ueber Alles) এই ধারণা হইয়াছিল প্রত্যেক জার্ম্মানেরই বদ্ধমূল!

কিন্তু এই ধারণা কঠোর আঘাত লাভ করিয়াছে গত মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জার্ম্মানীর পরাজয়ে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে জার্ম্মানদের হাতে ফরাসীদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহার প্রতিশোধকল্পে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের অগ্রবর্ত্তীরূপে ফরাসীরা জার্ম্মানীর পরাজয়ের দুঃখ ষোল আনার উপর আঠার আনা করিবার উপায় যথাসাধ্য অবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে জার্ম্মানী যে দৈন্য ও অপমান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। তাহারই ফলে যুদ্ধান্তে কয়েক বৎসর ধরিয়া জার্ম্মানীতে বিপ্লব, অশান্তি, দারিদ্র্য, অনাহার শোচনীয় ভাবে দেখা দিয়াছিল।



ভার্সাই সন্ধির পরে জার্ম্মানী।

জার্ম্মান জাতীয় লোকেরা স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি ও সাহসের জন্য বিখ্যাত। তাহার উপর এক অতুলনীয় আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সাধন করিয়া তাহারা মানসিক শক্তি ও উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এহেন যোগ্যতাসম্পন্ন জার্ম্মান জাতি যে পরাজয়ের পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখের চাপেও নিজ সত্তাকে বিলীন হইতে দিবে না, তাহা স্বাভাবিক হইলেও খুব সহজসাধ্য হয় নাই। এই তত্ত্বই হিট্লার পরিচালিত বর্ত্তমান জার্ম্মানীর দানবীয় লীলার এবং শক্তিমদ-মত্ততার মূলে। কাজেই বর্ত্তমান জার্ম্মানীকে বুঝিতে হইলে ভার্সাই-এর সন্ধিপত্র হইতে আরম্ভ করিতে হয়।

ভার্সাই-এর সন্ধি জার্ম্মানীকে যে কঠোর আঘাত দিয়াছে

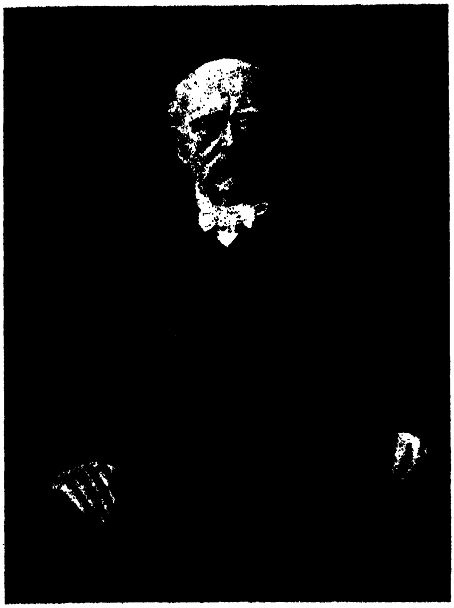
তাহা হইতেছে জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বহু অংশকে বিচ্ছিন্নীকরণ এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও শিক্ষা-দীক্ষায় ন্যূন রাষ্ট্রের অধীনতায় স্থাপন। একই শিক্ষা-সভ্যতায় পুষ্ট কোন প্রদেশকে শাসনবিভাগের জন্য খণ্ডিত করিলেও জাতির মধ্যে তাহা কিরূপ বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকারী বাঙ্গালী জাতি ভাল করিয়াই জানে। কাজেই জার্ম্মানীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ছাঁটাই করিয়া অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ায় জার্ম্মান জাতি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হইয়াছিল, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে জার্ম্মানীর ষোল আনা ক্ষতির পরিমাণ আমাদের কল্পনার অগম্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ছিল ২,০৯,০০০ বর্গ মাইল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাহা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ২৭০০০ হাজার বর্গ মাইল অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই দুই বিভাগের সমান পরিমাণ স্থান, অথবা হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের মিলিত পরিমাণ অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বেশী জায়গা। এই স্থানের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ। কিন্তু কেবল লোকসংখ্যা নহে, প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়াও জার্ম্মানীর হস্তচ্যুত অংশগুলি মূল্যবান। লোরেইনের লোহার খনিগুলি হস্তচ্যুত হওয়ায় জার্ম্মানীর লৌহসম্পদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সার (Saar) ও আপার সাইলেশিয়া (Upper Silesia) ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান হারাইয়া জার্ম্মানী তাহার কয়লা-সম্পদের চার আনি আন্দাজ হারাইয়াছে, তদুপরি উৎপন্ন রবিশস্য ও শাকসবজীর শতকরা ১২ হইতে ১৫ অংশ কমিয়া গিয়াছে, উপনিবেশগুলি একেবারেই গিয়াছে এবং বাণিজ্যবাহী জাহাজসমূহের অধিকাংশ হস্তচ্যুত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার কিয়দংশ জার্ম্মানীর বাহিরে চলিয়া যাওয়ার দরুণ জার্মানীর একাংশ মূল রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মূল জার্মানী হইতে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এর জন্মভূমিতে (Koenigsberg) যাইতে হইলে অন্য রাষ্ট্রের সীমানা ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়। কোন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক লিখিতেছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যুদ্ধের পরে সেই স্থানের উপর দিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে অন্যূন দুইটি রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে এবং তাহার দরুণ টাকা-পয়সা বদল (exchange) করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। জার্মানী হইতে গৃহীত রাজ্যাংশগুলি যেরূপে বণ্টন করা হইয়াছিল, তাহাতেও জার্মানীর প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে। জার্মানী যদি অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য হইত, তবেই বিজেতাদের ঐরূপ ব্যবহার শোভা পাইত। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ লয়েড জর্জ্জ তাঁহার (ভার্সাই সন্ধি-সভার) সহযোগীদের বলিয়াছিলেন যে, "জার্মানরা যুদ্ধ করিয়া যতই ভুল করুক না কেন, তাহারা একটি উন্নত জাতি, যে পোলাণ্ডবাসীরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক কম সভ্য, জার্মান জাতির কাহাকেও তাহাদের অধীনতায় স্থাপন করা উচিত হইবে না।" অথচ কার্য্যতঃ তাহাই করা হইয়াছে। জার্মানীর যে অংশ পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে বহু জার্মান নরনারী বাস করে। সামাজিক ও সভ্যতা-সম্পর্কিত ব্যাপারে হীনতর লোকদের অধীনে যে সকল জার্মান বাস করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগকে মাতৃভূমির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে, বর্ত্তমানে জার্মানীর সভ্যতা-সংগ্রামের (Kultur-kampf) এক প্রধান অংশ।

এই ভার্সাই সন্ধিপত্রের ফলে জার্মানীর স্থলযুদ্ধ ও নৌ-যুদ্ধের শক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার যে বিপুল সামরিক শক্তি মিত্রশক্তিবর্গের সম্মিলিত অপরিমেয় সেনাবাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে বাধাদান করিয়াছিল, তাহা সন্ধির সর্ত্তানুসারে একটি নগণ্য পুলিশবাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। এই পুলিশবাহিনী এতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য যে, ইহা আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ব্যাপারে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। জার্মান নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যপোত সকলও প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং জার্মানীর প্রধান নদীনালাগুলির কর্তৃত্বও গিয়াছিল আন্তর্জাতিক ক্ষমতার অধীনে। এবং অন্যান্য ভাবেও জার্মানীর আর্থিক পরিস্থিতি কঠোরভাবে বাহ্যিক শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এইরূপে সুসভ্য জার্মান জাতির লোকেরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হওয়ার দুর্গতি আস্বাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু জার্মানীর সমস্ত দুর্গতির বাড়া দুর্গতি হইল এব দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রায় অসীম অর্থরাশি যুদ্ধের ক্ষতিপূর

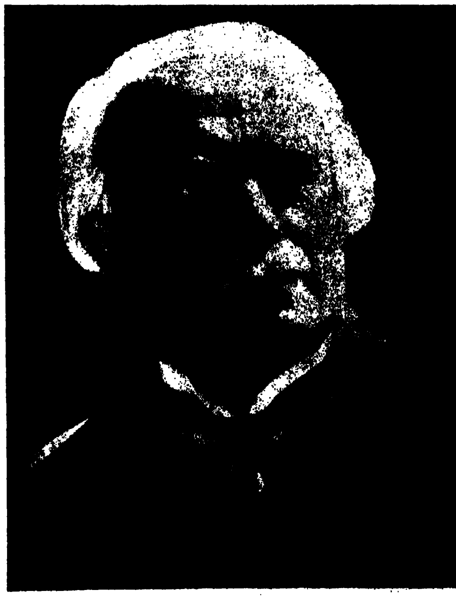
স্বরূপ বিজেতাদিগকে প্রদান করিবার সর্ত্ত। বিজয়ীবর্গ জার্মানী হইতে কিরূপ অর্থ লাভের আশা করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে লয়েড জর্জ্জ লিখিতেছেন :-



বিসমার্ক।

"আরম্ভেই ফরাসীদের দাবীতে বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব্ব ফ্রান্সের বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্নির্মাণ করিবার ব্যয় বাবদ ফরাসী পক্ষ ৩০০ কোটি পাউণ্ডের এক বিল উপস্থিত করেন, অথচ ফরাসীদের সরকারী বিবরণী (১৯১৭) মতে সমগ্র ফরাসী দেশের লোকদের গৃহসম্পত্তির মূল্য মাত্র ২৩৮ কোটি পাউণ্ড। এ দিকে দেখা যায়, ফরাসীদেশের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ফরাসী দেশের বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্নির্মিত হইলে ১৯৩২ সালে দেখা গিয়াছিল যে, ৮৩ কোটি পাউণ্ড ব্যয় লাগিয়াছে। ইহা অবশ্য সরকারী হিসাব।" কিন্তু লয়েড্ জর্জ্জ মনে করেন যে, প্রকৃত ব্যয় কিছুতেই ৬৫ কোটি পাউণ্ডের বেশী লাগে নাই। এই সমস্ত ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, জার্ম্মানীর নিকট কিরূপ অন্যায় ভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণ আদায় হইয়াছে।

এই হইল ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুসারে জার্ম্মানীর দুর্দশার খুব মোটামুটি বিবরণ। অথচ এ হেন সন্ধির বৈঠকের আরম্ভ হইতে সন্ধিপত্রের খসড়া নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর একজন প্রতিনিধির সহিতও আলোচনা করা বা তাহার মতামত লওয়া হয় নাই। সন্ধি-বৈঠকের জনৈক ঐতিহাসিক (পরাজিত জার্ম্মানীর প্রতি যাহার সহানুভূতির অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না) লিখিতেছেন যে, ঐ বৈঠকে জার্ম্মান-প্রতিনিধিকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া "আন্তর্জ্জাতিক শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য্য" হইয়াছে (Dr. Harold Temperly, A History of the Peace Conference)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটি তদপেক্ষা গুরুতর এবং গর্হিত। ইহা এক সুবৃহৎ অন্যায়। যদিও ভার্সাই-এর সন্ধি-বৈঠকে জার্ম্মানীকে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধারম্ভের জন্য সমগ্রভাবে দোষী করা হইয়াছিল, তবু অপরাধী হিসাবে তাহাকে অভিযোগকারীদের সম্মুখীন হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বিচারকগণ (যাহারা নিজেরাই অভিযোক্তা) একতরফা



লয়েড জর্জ্জ।

শুনানীর পর জার্ম্মানীর প্রতি তাঁহাদের ইচ্ছামত শাস্তিবিধান করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করিলে অধিকতর শাস্তিপ্রদানের ভয় দেখাইয়াছেন। সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি

কৌতুককর ঘটনা বলিয়া গণ্য করা চলিত, যদি না উহা একটি সুসভ্য রাষ্ট্রের বহু নর-নারীর সুখ দুঃখের নিয়ামক না হইত।

ভার্সাই সন্ধির সহিত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি প্রসিদ্ধ সন্ধির তুলনা করিলে ভার্সাই সন্ধির কর্ত্তাদের অবিচার বিশেষ ভাবে স্পষ্টীকৃত হইবে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিলিত মহাশক্তিবর্গ যখন নেপোলিয়ানের ক্ষমতাকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তখন সমগ্র য়ুরোপের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য মিলিত রাষ্ট্রনীতিকগণের বৈঠকে ফরাসী প্রতিনিধিকে বিজেতাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এবং যাহাতে সন্ধির পরে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে কোন বৈরিভাব স্থায়ী না হয়, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ মূল প্রস্তাবগুলিকে ফরাসীদের ইচ্ছার অনুকূলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ান অন্যান্য যে সকল দেশ জয় করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, সে সকল বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু মূল ফরাসী রাষ্ট্রের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করা হইল না এবং বিজেতাগণ মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে চাহিয়াছিলেন।

১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয়ান যুদ্ধের পরে ফরাসী ও জার্ম্মানীর মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহাতেও বহু মাস ধরিয়া জার্ম্মান ও ফরাসী প্রতিনিধি বিসমার্ক ও ফাব্রের (Bismarck and M. Favre) মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। এবং ফরাসীদের ইচ্ছানুসারে সন্ধি-সর্ত্ত অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করা হইয়াছিল। জার্ম্মানী আলসাস-লোরেণ (Alsace and Lorraine) গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু হাতে পাইয়াও ফরাসীদের কোন উপনিবেশ জার্ম্মানরা গ্রহণ করে নাই। ফরাসীদের নিকট যে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ কেবল ২৪ কোটি পাউণ্ড। ফরাসীরা মাত্র উহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮ কোটি পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু যখন বিসমার্ক দাবী ২০ কোটি পাউণ্ড স্থির করেন, তখন ফরাসী প্রতিনিধি ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন "ইহা এক প্রকার লুঠ", কিন্তু এই কঠোর দাবীও ফরাসীরা দুই বৎসরের মধ্যে মিটাইয়া দিয়াছিল। অধিকন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান সরকার ফরাসীদের নিকট গৃহীত সরকারী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ১ কোটি ৩ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন এবং কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি জার্ম্মানী দখল করে নাই! কিন্তু ১৯১৮ সালে মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন দেশসমূহে প্রভূত সরকারী সম্পত্তি বিনা মূল্যে অধিকার করিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মানদের ব্যক্তিগত বহুল ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে অগণ্য নিরপরাধ নরনারী শোচনীয় ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

এ হেন ভার্সাই সন্ধিকে যে গোড়া হইতেই জার্ম্মান জাতি কেবল খুব প্রীতির চক্ষে দেখে নাই, তাহা নহে, উহার অন্তর্নিহিত অবিচার, হৃদয়হীনতা ও প্রতিহিংসার ভাব সমগ্র জার্ম্মান জাতির আত্মসম্মানে অতি প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল; তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপে উদ্ভূত এক দানবীয় শক্তির প্রতীকরূপে আজ সে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জার্ম্মানীর দুর্দ্দশার জন্য দায়ী, তাহারা সকলেই আজ হয় তাহার ভয়ে ঘোরতর শঙ্কিত, অথবা তাহার মিত্রত্ব-লাভের জন্য একান্ত লালায়িত!

জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে। কঠোর ঘটনাচক্রের পেষণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কিরূপে আত্ম-মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় জার্ম্মানী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান ভারতবাসীর মত মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইলে জার্ম্মানীরা এতদিন পরলোক-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়া বা জগৎকে 'মায়াময়' বলিয়া আত্মপ্রতারণা করিতে লাগিয়া যাইত। কিন্তু কঠোর বস্তুতান্ত্রিক জার্ম্মানী তাহা করে নাই। তাহার প্রত্যেক নরনারী ভার্সাই সন্ধিকৃত অপমানকে বহুবর্ষ ধরিয়া দিন দিন মনে প্রাণে অনুভব করিয়া আসিয়াছে, তাই আজ পরাজিত জার্ম্মান জাতির অদ্বিতীয় নেতা হিট্‌লারের অধিনায়কতায় সংঘবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য জার্ম্মানীর এই অভ্যুদয়ের পরিণাম কি হইবে তাহা বলা যায় না। তবে ইহা যে একেবারে পিষ্ট, পদদলিত হইয়া থাকা অপেক্ষা ভাল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত]

দেশের অবস্থা ও কংগ্রেসের চালচলন

মন্ত্রিত্বগ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না এই সম্বন্ধে যে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে গবেষণা চলিতেছিল এবং অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটি উহার কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

সত্যাগ্রহী গান্ধীজী বর্ত্তমানে "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা লোকতঃ প্রচাসিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কংগ্রেস-কমিটির প্রত্যেক অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিয়া "দাদা মহাশয়" রূপে কংগ্রেসের বিভিন্নবিষয়ক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। কংগ্রেস যে এতাবৎ তাঁহার পরামর্শসম্মত কর্ত্তব্যসমূহ প্রায়শঃ সম্পাদিত করিয়া আসিতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই হিসাবে কংগ্রেসের প্রকাশ্য নেতৃবর্গকে গান্ধীজীর বিভিন্ন বাহু অথবা বিভিন্ন পদ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই প্রকাশ্য নেতৃবর্গের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের জওহরলালের, বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদের এবং বোম্বাই-এর বুলাভাই দেশাই-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের এই তিনটি প্রধান নেতাই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের জয়োল্লাসে উৎফুল্ল। তাঁহাদের ফতোয়া এবং বাণীর বহর বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের তথাকথিত জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া নেতৃবর্গ তাঁহাদের ফতোয়া-প্রদানে এবং বাণীপ্রচারে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না বটে এবং নেতাগণের দেখাদেখি তাঁহাদের ছোটবড় অনুচরবর্গ কখনও বা অর্থহীন গুঁফো হাসির দ্বারা, কখনও দম্ভযুক্ত আস্ফালনের দ্বারা দেশের আকাশ ও বাতাস প্রকম্পিত করিতে লজ্জাবোধ করেন না বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা ক্রমশঃই শঙ্কাপ্রদ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শিক্ষিত ছেলেদের দলে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাদের মুরুব্বীর জোর আছে এবং বেকার থাকিলেও যাহাদের কিছুদিন দুই বেলা দুই মুষ্টির সংস্থান হইতে পারে, তাহারা আর কোন কার্য্যের সন্ধান না পাইয়া জিহ্বার জোরে তাহাদের সহচরদিগকে ভারতের স্বাধীনতা প্রভৃতি অনেক কিছু দেখাইয়া দিতেছে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র জিহ্বার পরিচালনার ফলে তাহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহারাই বর্ত্তমান যুবকসমাজে কিম্ভুত-কিমাকারে পরিণত হইয়া যে নেতৃবর্গ প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, সেই নেতৃবর্গকে কখনও বা মহাত্মা, কখনও বা পণ্ডিত, কখনও বা কবিসম্রাট্, কখনও বা সাহিত্যসম্রাট্ ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিতেছে।

জাতীয় জীবনের আশা-ভরসার স্থল যুবকবর্গের এই সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা-উৎপাদক অনেক কিছু সম্পাদিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে মূলতঃ অসার অথবা অকর্ম্মণ্য বলা চলে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকেরই অভ্যন্তরে এমন কিছু লুক্কায়িত আছে, ঘসা-মাজার দ্বারা যাহার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যেই আবার ভারতীয় ঋষিগণের কার্য্যশক্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া সম্ভব হইত, এমন কি তাহারাই আবার ভারতকে শুধু স্বাধীন নহে, মানবজাতির ত্রাতা এবং শিক্ষক করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু তথাকথিত মহাত্মা এবং

কবিসম্রাট্ শ্রেণীর নেতৃবর্গের খেলায় তাহা হইবার নহে। ঐ নেতৃবর্গের আপাতমধুর উচ্ছৃঙ্খল বাণীর ফলে আজ আমাদের গৌরবের বস্তু ঐ যুবকগুলির দ্বারা অহরহঃ এমন কার্য্যসমূহ সাধিত হইতেছে, যাহার ফলে আমাদের ভারতীয় সমাজ তাহার আদর্শত্ব হারাইয়া ক্রমশঃই মনুষ্য-সমাজের ধিক্কারযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

এই ত গেল মুরুব্বীওয়ালা যুবকসম্প্রদায়ের কথা। তাহাদের অবস্থা তাহাদের নিজেদের কাছে দুর্ব্বিবহ না হইলেও উহা যে প্রকৃত পক্ষে হৃদয়বিদারক, ইহা যুক্তি-সঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না। ঐ যুবকদলের মধ্যে যাহাদের মুরুব্বী নাই, কর্ম্মস্থল লাভ করিতে না পারিলে যাহাদের দুইবেলা দুই মুঠার সংস্থান হয় না, যাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অনেক বাতব্যাধিগ্রস্ত পিতা, অনেক বিধবা মাতা ও বিধবা ভগ্নী নানা রকমের দারিদ্র্য-ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, মুরুব্বীহীন সেই যুবকদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোনদিন যে আবার তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাহাদের নির্ভরশীল পিতা অথবা বিধবা মাতা ও ভগ্নীর ভাগ্যে যে আর কোন দিন সাংসারিক স্বচ্ছলতার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবে, তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। দুর্ভাগ্য-শালী ঐ অগণিত পিতা, মাতা ও ভগ্নীর হৃদয়ঘাতী বেদনার নিঃশ্বাসে ভারতের আকাশ ও বাতাস অলক্ষ্যে উত্তরোত্তর যে অধিকতরভাবে ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাহারও নজরের বিষয় হইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তথাকথিত শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়কে ছাড়িয়া দিয়া তথাকথিত অশিক্ষিত শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলে যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। ভারতের যে কৃষিজীবিগণ একমাত্র কৃষি দ্বারাই নিজদিগের সততা, সত্যবাদিতা, ধর্ম্মপ্রবণতা ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের আহার্য্য ও পরিধেয়ের সরবরাহ করিত, সেই কৃষিজীবিগণের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। যাহাদের সততা, সত্যবাদিতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার কথা প্রতিবেশিগণের মধ্যে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল, তাহারা এখন পেটের দায়ে চৌর্য্য ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেছে। ভারতের যে শ্রমজীবিগণ একদিন মানুষের পরিচর্য্যাকে অতীব আদরের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, অথচ ঐ পরিচর্য্যার বিনিময়ে কোন পারি-শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষা করা ত' দূরের কথা, উহা গ্রহণ করাকেও অকর্ত্তব্য ও অপমানকর বলিয়া মনে করিত, যাহারা একদিন কোনরূপে পরের দাসত্বের অথবা চাকুরীর দ্বারা জীবিকার্জ্জন করাকে অকর্ত্তব্য ও অপমানকর বলিয়া মনে করিত, আজ তাহাদের মধ্যে অন্নাভাবে অন্নের জন্য চাকুরীর অন্বেষণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতবর্ষে যে শুধু অর্থাভাবই সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নহে, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবও সমান ভাবে সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই সময়ে ভারতের সত্যাগ্রহী নেতা গান্ধীজী মুখে সত্য-প্রিয়তার কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যে "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"র নীতি এবং ঐ নীতি পাশ্চাত্ত্যের তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানানুসারে কৌশল-সামর্থ্যের (tactfulness) পরিচায়ক হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা যে অসত্য-প্রিয়তার সাক্ষ্য, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

শুধু যে গান্ধীজীর কথা ও কার্য্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, দেশের এই দুঃসময়ে তাঁহার পার্শ্বচরগণের কার্য্যেও সমান ভাবের অযৌক্তিকতা, অসামঞ্জস্য ও বাল-সুলভ চাঞ্চল্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

যখন দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব উত্তরোত্তর এতাদৃশভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন কি উপায়ে অনতিবিলম্বে ঐ তিনটি অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহার চিন্তা করাই যে নেতৃবর্গের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এবং ঐ তিনটি অভাবের দূরীকরণ যে দেশের সকল মানুষের মধ্যে একতা-

স্থাপন ব্যতীত সম্ভাবিত হইতে পারে না—এতৎসম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল মানুষ অস্বীকার করিতে পারেন না। অথচ এই সমস্ত কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তাঁহাদের কার্য্যতালিকায় যাহা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোনটির দ্বারা দেশের কোন মানুষের কোনরূপ অভাব দূর হওয়া অথবা দেশের মধ্যে একতা স্থাপিত হওয়া ত' দূরের কথা, ঐ নেতৃবর্গের প্রত্যেক কার্য্যের ফলে দেশের লোকের অর্থের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এবং শান্তির অভাব যেরূপ ক্রমশঃই আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সেইরূপ আবার দেশের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এবং দলাদলি উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিবে।

কংগ্রেসের নেতৃবর্গ বর্ত্তমানে যে কার্য্য-তালিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহের ধ্বংস সাধন করিবার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ শাসনযন্ত্রের এই ধ্বংস সাধন করিবার জন্যই যে তাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা তারস্বরে দেশের মধ্যে প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধুরন্ধরগণের দ্বারা যাহাকে শাসন-যন্ত্র বলা হইয়া থাকে এবং যে অবস্থা সংঘটিত হইলে তাঁহাদিগের মতে উহার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয়, সেই অবস্থা কখনও কংগ্রেসনেতৃবর্গের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে কি না অথবা হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে বটে এবং তাহার মীমাংসার জন্য ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে বটে, কিন্তু ধ্বংসলীলায় মত্ত থাকিলে যে সংগঠনের কার্য্য-কাল দূরে অপসারিত হইয়া থাকে, ধ্বংসলীলায় মত্ততার পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সংগঠনের কার্য্যকাল যে তত দূরে অপসারিত হইয়া যাইবে—এতৎসম্বন্ধে চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন মতভেদ বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত প্রাকৃতিক সত্যটুকু মানিয়া লইতে পারিলে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ধ্বংসলীলার ফলে যে দেশের জন-সাধারণের অর্থ, স্বাস্থ্য ও শান্তির অভাব দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা ক্রমশঃই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িবে, ইহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না। শাসনযন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিবার জন্য কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের যে তাণ্ডবনৃত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ তাণ্ডবনৃত্য কখনও কোন দেশের সকলের অনুমোদনযোগ্য হইতে পারে না এবং আমাদের দেশেও উহার অনুমোদন করিতে সকলে সম্মত হইতেছে না। ফলে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতাগণের কার্য্যের ফলে দেশের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরে জাতীয়তাগঠন অথবা দেশ-বাসীর মিলনসম্পাদনব্যাপারে কি কি ঘটিয়াছে, তাহার ইতিহাস সংগ্রহ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, অল্লাধিক পঞ্চাশ বৎসর আগে যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল, তখন দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এবং ভারতীয় ও ইংরেজগণের মিলন-সম্পাদনের অথবা জাতীয়তা-গঠনের ঐ কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বাঙ্গালার কতকগুলি রাজনৈতিক ধুরন্ধরের হস্তে। আমরা ঐ ধুরন্ধরগণের কথা প্রকাশ করিয়া নিজ-দিগকে অধিকতর অপ্রীতিকর করিবার প্রয়োজন অনুভব করি না বলিয়া ঐ নামগুলি প্রকাশ করিব না বটে, কিন্তু ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, বাঙ্গালার ঐ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের নাম শিক্ষাবিভাগের তথাকথিত চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত অধ্যাপকগণের কৃপায় কলেজে-পড়া বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের কাছে প্রায়শঃ সমাদৃত।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র দলাদলি আরম্ভ হইয়া জাতীয়তাগঠনের অথবা ঐক্য-সম্পাদনের কার্য্য গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাধিক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভকাল হইতে গান্ধীজীর হস্তে। গান্ধীজীর প্রতি অবজ্ঞার উৎপাদক আমাদিগের এই উক্তিটি যে অনেকেরই মুখরোচক হইবে না, তাহা আমরা জানি, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পঞ্চাশ বৎসর আগে ভারতবর্ষে বহু সহস্র বৎসরের পরে জাতীয়তা-গঠনের অথবা ঐক্য-সাধনের যে কার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মবশে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই কার্য্য বিধ্বস্ত হইয়াছে তথাকথিত লোকপ্রিয় মিঃ এম্, কে, গান্ধীর দ্বারা, কারণ, উহা বাস্তব সত্য এবং এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের সর্ব্ব-

স্তরের মানুষের দুরবস্থা আমাদের কোন্ অপকার্য্যের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না এবং তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে না। মিঃ এম, কে, গান্ধী আজকাল সাধারণতঃ মহাত্মা নামে প্রচারিত। তাঁহাকে মহাত্মা না বলিয়া পাশ্চাত্ত্য ধরণে মিঃ বলিয়া আখ্যাত করায় অনেকে হয় ত বিরক্ত হইবেন, কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে মানুষ জানিতে পারিবে যে মিঃ গান্ধীকে পাশ্চাত্ত্য ধরণে আখ্যাত না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; কারণ, খাঁটি ভারতীয় ভাবধারা এবং চালচলন যে কি বস্তু, তাহা গান্ধীজীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা, চিন্তার ধারা, চালচলন ও অচার-ব্যবহার প্রায়শঃ পাশ্চাত্ত্য ধরণের সহিত ভেজালপ্রাপ্ত।

মিঃ এম, কে, গান্ধী প্রায়শঃ হিন্দু-মুসলমানের মিলন এবং জাতীয়তা-গঠনের কার্য্যের কথা মুখে বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ মিলন যে কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার জানা থাকিলে তাঁহারই নেতৃত্বকালে হিন্দু-মুসলমানের অমিলনের তীব্রতা এতাদৃশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মুসলমানগণের পক্ষে প্রায়শঃ কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারিত না। কাযেই বলিতে হইবে যে, তাঁহারই কার্য্যের ফলে ভারত-বর্ষের জাতীয়তা-গঠনের অথবা ঐক্য-সম্পাদনের যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে জাতীয়তা-গঠনের অথবা মিলনের যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজীর কৃত কার্য্যের ফলে বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য নেতৃত্বসময়ে কংগ্রেসের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অমিলনের কার্য্যের সহায়তা সম্পাদিত হয় নাই; কারণ, তখন ভারতবর্ষে ভেদ-নীতি 'প্রবর্ত্তিত করিবার চিন্তা কাহারও হৃদয়ে যে স্থান পাইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তখনও এতাদৃশ ভাবে সম্যক্ রূপে ভেদ-নীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে ভারতবর্ষে যে শাসনযন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে সম্যক্ রূপে ভেদনীতির বিদ্যমানতা না থাকিলে ঐ শাসনযন্ত্রের দ্বারা ভারতবাসি-গণের পক্ষে অতি সহজেই স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব হইত। কিন্তু উহাতে যে ভেদনীতি রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্যতঃ উহার উচ্ছেদ সাধন করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিলে দেশের মধ্যে ভেদনীতিরই প্রাধান্য বিদ্যমান থাকিবে এবং স্বায়ত্তশাসন লাভ করার আশা সুদূরপরাহত হইবে।

অদূরভবিষ্যতে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, ভারতবর্ষে জাতীয়তা-গঠনের অথবা ঐক্যসাধনের কার্য্য যে-গান্ধীজীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, দেশের মধ্যে অমিলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিবার কার্য্যও সেই গান্ধীজীর অনুচর জওহরলালজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং বুলাভাই দেশাই-এর দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশেই শাসনযন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিবার তাণ্ডবনৃত্য চলিতে থাকিবে এবং তাহাতে শাসনযন্ত্র প্রকৃত পক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক আর না-ই হউক, দেশের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূর করিবাব কার্য্য যে অধিকাংশ পরিমাণে স্থগিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপে দেশের পক্ষে প্রকৃত প্রয়োজনীয় কার্য্যের গবেষণা ও প্রযত্নের প্রবৃত্তি প্রায়শঃ তিরোহিত হইয়া বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের আইনের অন্যতম কুফলগুলি ফলবান্ হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের দলাদলির তীব্রতা দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু উন্নত জাতি এবং অনুন্নত জাতির মধ্যে, অথবা মুসলমান ও মুসলমানে, অথবা বাঙ্গালী ও বিহারী প্রভৃতি প্রদেশগত পরস্পরের ভাবের মধ্যে কোন দলাদলির তীব্রতা দেখা যায় নাই। সতর্ক না হইলে অদূরভবিষ্যতে মানুষ তাহা দেখিতে পাইবে।

এই সতর্কতা কেবলমাত্র কংগ্রেসের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিপথগামী মিঃ গান্ধী, অথবা মিঃ জওহরলাল প্রভৃতি তাঁহার অনুচরবর্গের বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে তাহা যে হইতে পারে না, ইহা দেশবাসী কবে বুঝিবে?

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের কর্ত্তব্য

শাসন-যন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিবার যাদৃশ নীতি কংগ্রেসের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে আমাদের কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে, পরন্তু তাহাতে যে আমাদিগের মধ্যে দলাদলির সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে, ইহা উপরে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, কিরূপ ভাবে অগ্রসর হইলে আমাদিগের সমস্যাসমূহের সমাধান, অর্থাৎ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব তিরোহিত হইতে পারে এবং আমাদিগের ঐক্য সম্পাদিত হইয়া প্রকৃত জাতীয়তার উদ্ভব সম্পাদিত হইতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রকৃত জাতীয়তা অথবা ঐক্য সম্পাদিত করিয়া দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান সম্যক্ ভাবে সম্পাদিত করা সময়সাপেক্ষ। সমস্যাগুলি সম্যক্ ভাবে সম্পূর্ণ সমাধান করা সময়সাপেক্ষ বটে, কিন্তু উহার অতীব প্রয়োজনীয় অংশগুলির সমাধান করা তত সময়সাপেক্ষ নহে এবং তাহা তত দুরূহও নহে। কংগ্রেস চেষ্টা করিলে ঐ সমস্যাসমূহের আংশিক সমাধান অনতিবিলম্বে সম্পাদিত হইতে পারে।

কংগ্রেসের নেতৃবর্গের প্রাণে প্রকৃত ভাবে ঐ চেষ্টার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে শাসন-যন্ত্র ধ্বংস করিবার নীতি এবং যে কোন কার্য্যে দেশের মধ্যে কোন রকমের বিবাদ-বিসংবাদ উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া যে কোন দল যে কোন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের গঠনকার্য্যে সহায়তা করিবার নীতি পরিগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে যে কোন দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের গঠনকার্য্যে সহায়তা করিবার নীতি কংগ্রেসের দ্বারা পরিগৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে যেরূপ কোন প্রদেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত নহে, সেইরূপ আবার কোন প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লির সহিত কোনরূপ অসহযোগ করার নীতি গ্রহণ করাও একান্ত অসঙ্গত।

বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের দ্বারা মন্ত্রিত্ব গৃহীত হইলে, কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের পক্ষে একে ত' মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইবে না, তাহার পর নিজেদের ভিতর দলাদলি ঘটিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে।

বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে যে বিদ্যা অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের মধ্যে, এমন কি সর্ব্বপ্রধান নেতৃস্থানীয় গান্ধীজী অথবা পণ্ডিত জওহরলাল, অথবা মিঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অথবা মিঃ বুলাভাই দেশাই প্রভৃতির দ্বারাও যে সম্যক্ ভাবে অর্জ্জিত হয় নাই, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ অথবা তাঁহাদিগের মুখনিঃসৃত বক্তৃতাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব বলিতে আমরা কেবলমাত্র ১৯৩৫ সালের আইনে উল্লিখিত দায়িত্বের কথা বলিতেছি না। ভারতবর্ষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবজনিত সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক মন্ত্রীকে যে যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে, সেই সেই দায়িত্বের কথা বলিতেছি।

ঐ ঐ দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী বিদ্যা সম্ভবানুযায়ী সম্যক্ ভাবে উপার্জ্জন না করিয়া মন্ত্রিত্ব গৃহীত হইলে, মন্ত্রিগণের পক্ষে একে ত' মন্ত্রিত্বের কর্ত্তব্যভার যথাযথ ভাবে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইবে না ও তাহাতে জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া তাহাদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আশঙ্কা থাকিবে, তাহার পর আবার কোন্ কোন্ বিদ্যা অর্জ্জিত হইলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের মন্ত্রিত্ব পাওয়া সম্ভব হইবে, তাহা স্থির করিয়া না লইয়া মন্ত্রিত্ব গৃহীত হইলে প্রত্যেকের পক্ষেই মন্ত্রিত্ব পাইবার আশার উদ্ভব হইবে এবং উহার ফলে যাহাকে মন্ত্রিত্ব না দেওয়া হইবে, তিনিই কংগ্রেসের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িবেন।

কোন্ কোন্ বিদ্যা থাকিলে দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী পাওয়া সম্ভব হইবে, তাহার নিয়ম স্থির করিয়া না লইয়া দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করিলে যে তাহা লইয়া নিজেদের ভিতর দলাদলি হওয়ার আশঙ্কা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ-এক্জিকিউটিভ অফিসারের পদ লইয়া

সুভাষ বাবু ও ৺বীরেন্দ্র শাসমলের মনোমালিন্য এবং মেয়র পদের জন্য সুভাষ বাবু ও ৺সেনগুপ্তের দলাদলির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ ভাবে নিজেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া অপর যিনিই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করুন না কেন, দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য গঠনকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতে যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে কংগ্রেস অচিরে দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে পারিবে এবং ভারতবর্ষে বহু সহস্র বৎসর পরে আবার প্রকৃত জাতীয়তার উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইবে।

নিজেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া অপর যিনিই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করুন না কেন, গঠনকার্য্যে কংগ্রেসের দ্বারা তাঁহার সহায়তা সাধিত হইলে ভারতবর্ষে প্রকৃত ঐক্য সাধিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে জাতীয়তার উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু তখনও মানবজাতির, তথা ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের প্রকৃত ভাবে সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে না ; কারণ, মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান মূল সমস্যাগুলি যে কি, কোন্ কারণে যে মানুষের মধ্যে প্রত্যেক দেশে এত বেকার, এত অর্থাভাব, এত অস্বাস্থ্য এবং এত অশান্তি, কি উপায়ে যে ঐ মূল সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান জগতের কোন মহীয়ানের সম্যক্ ভাবে জানা নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বর্ত্তমান জগতের অর্থনীতি হউক, রাষ্ট্রনীতি হউক, সমাজনীতি হউক, স্বাস্থ্যনীতি হউক, অথবা তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও দর্শন যাহাই ধরা যাউক না কেন, উহার প্রত্যেকটি প্রায়শঃ প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়শঃ মানুষের অহিতকর। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। ঐ নীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানসমূহ যদি মানুষের অহিতকরই না হইত, অথবা তাহার কোনটিতে যদি মানুষের কল্যাণ সাধন করিবার উপায়ের সন্ধান পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ দুর্গতি প্রায়শঃ সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর এত অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।

ভারতবাসীর, তথা মনুষ্যজাতির মূল সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবের কারণ সম্যক্‌ভাবে নির্ম্মূল করিতে হইলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণকে একদিকে যেরূপ শাসনযন্ত্রকে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করিয়া অপর যে কেহ মন্ত্রী হউন না কেন, গঠনকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে, সেইরূপ আবার তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বাস্থ্যবান্, বুদ্ধিমান্ এবং কর্ম্মঠ, তাঁহাদিগকে মনুষ্যজাতির সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার উপায় কি কি, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

উপরোক্ত ভাবে অগ্রসর হইতে পারিলে ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র মানবজাতির জাতীয়তা গঠিত করিয়া, ভারতবাসীর, শুধু ভারতবাসীর কেন, জগতের সর্ব্বত্র বেকার, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবের মূল কারণ সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মূল করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যের প্রকৃত নেতার উদ্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহা কার্য্যতঃ ঘটিবে না।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের কার্য্যকলাপ মিলাইয়া লইয়া তাহা একটু তলাইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধীজীর বুদ্ধিমত্তা ও চালচলনের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অনেক কিছু বলা যায় বটে, কিন্তু এখনও সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযোগী তাঁহার অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর আর কেহ নাই।

কাযেই বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের নেতৃত্বের জন্য পুনরায় গান্ধীজীর দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং তিনি যাহাতে প্রকৃত ভাবে সত্যাগ্রহী হইয়া প্রকাশ্যতঃ নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

যে সর্ষপ দ্বারা ভূতের অপসারণ করা সম্ভব, সেই সর্ষপই যদি ভূতের দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন জনসাধারণ অথবা গণদেবের জাগরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কাযেই গণদেবতার সজাগ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যদি কাহারও প্রাণ থাকে, যদি কাহারও চক্ষু থাকে, তাহা হইলে প্রাণের সহিত ঐ চক্ষুকে মিলাইয়া আমরা এখনও জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ আশার স্থল ঐ অসংখ্য অসহায় যুবক ও যুবতীবৃন্দের দিকে তাকাইয়া অভিমান ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে সজাগ হইবার সকরুণ নিবেদন জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি-সম্মানঘোষণা-সভা ও বাঙ্গালা ভাষা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬-৩৭ সালের বাৎসরিক উপাধি-সম্মানঘোষণা সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বাঙ্গালার গভর্ণর স্যর জন অ্যাণ্ডারসন সাহেব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কার্য্যের বিবরণী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ছাত্র উপাধি-সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়া আনার ব্যাপারটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ বৎসর একটু নূতনত্ব আছে, কারণ ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার কার্য্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি এতাবৎ কাল স্বয়ং চ্যান্সেলর অথবা ভাইস-চ্যান্সেলর সম্পাদিত করিয়া আসিতেছিলেন।

উপাধি-সম্মানপ্রাপ্ত ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কি, তৎসম্বন্ধে যদিও চ্যান্সেলর অথবা ভাইস্-চ্যান্সেলর এ বৎসর বিস্তৃতভাবে কিছুই বলেন নাই, তথাপি তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন তাহা নহে। দুই জনেই দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের মতে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাৎসরিক সভার সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ-যোগ্য কথা স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালীর মূল সূত্র কি হইবে, তাহা তাঁহার এই বক্তৃতা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

স্যর জনের সমগ্র বক্তৃতার প্রথম দুইটি কথা অনুধাবন করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। ঐ কথা দুইটি এই :—

(১) এই প্রদেশের, অর্থাৎ বাঙ্গালার রাজ্য-শাসন-নীতিতে বিপ্লবসাধক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনার সূত্র স্থির করিবার দায়িত্ব গভর্ণরের হস্ত হইতে অপসারিত হইয়া নির্ব্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে প্রদত্ত হইবে। এতাদৃশ সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন (national life of Bengal) সংগঠনে কি করিতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

(২) যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের গুণের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং যাহাতে তাহাদিগের মধ্য হইতে সংগঠনকারী নেতার উদ্ভব হয়, তাহাই এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের মতে, উপরোক্ত কথা দুইটি হইতে বুঝিতে হয় যে, যাহাতে অতঃপর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া কেবলমাত্র বাঙ্গালাদেশেই আবদ্ধ থাকে, ইহা আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অভিপ্রেত। এবংবিধ অভিপ্রায় যদি তাঁহাদের না থাকিত, তাহা হইলে "I cannot help asking myself in what direction the University can make the greatest contribution to the *national life of*

Bengal", অর্থাৎ, বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দান কীদৃশভাবে প্রদান করিতে পারে, তাহা আমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিতেছি না,—এতাদৃশ কথা স্যর জনের মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। বাঙ্গালীর কার্য্য-সীমানা কেবলমাত্র বাঙ্গালাতেই আবদ্ধ না হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত যাহাতে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় এবং যাহাতে অন্যান্য প্রদেশের লোকের সহিত বাঙ্গালী মিলিত হইয়া "ভারতবাসী" নামক জাতিতে পরিণত হয়, ইহাই যদি আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের কাম্য হইত, তাহা হইলে "national life of Bengal," এই কথার উদ্ভব না হইয়া "national life of India" এই কথার উদ্ভব হইত।

আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত "national life of India" অর্থাৎ সমগ্র ভারতবাসীকে একটি জাতিরূপে সংগঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে বিভিন্ন প্রাদেশিক জাতি (অর্থাৎ বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া এবং আসামী প্রভৃতি জাতি) রূপে গঠিত করিবার চেষ্টা হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অথবা জাতীয়তার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব থাকিয়া যাইবে। কারণ, সমগ্র ভারতবাসী যতদিন পর্য্যন্ত একই স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত হইবার চেষ্টা না করিয়া প্রাদেশিক স্বার্থে মনোযোগী হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের মধ্যে কলহে ও দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত থাকিবে। সমগ্র ভারতবাসীকে একটি জাতিরূপে সংগঠিত করিবার চেষ্টা না করিলে যেমন ভারতবর্ষে জাতীয়তার অথবা মনুষ্যত্বের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে, সেইরূপ আবার ভারতবর্ষে জাতীয়তার অথবা মনুষ্যত্বের উদ্ভব না হইলে, কোন প্রদেশের ভারতবাসীর আর্থিক সমস্যাই ধরা যাউক, অথবা বেকার-সমস্যাই ধরা যাউক, অথবা স্বাস্থ্য-সমস্যাই ধরা যাউক, অথবা মানসিক অশান্তির সমস্যাই ধরা যাউক, কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

স্যর জনের উপরোক্ত কথা দুইটি হইতে একদিকে যেরূপ বুঝিতে হয় যে, যাহাতে অতঃপর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালাদেশে আবদ্ধ থাকে, ইহা আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অভিপ্রেত, সেইরূপ আবার দেশের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সেই সমস্ত সমস্যার অপূরণের জন্য দেশবাসিগণ যাহাতে প্রাদেশিক গভর্ণরদিগকে কোনরূপে দায়ী মনে না করে, পরন্তু দেশীয় নেতৃবর্গের স্কন্ধে যাহাতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরোপিত হয়, তাহার চেষ্টা করাও আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগের অন্যতম অভিপ্রায়। এতাদৃশ অভিপ্রায় যদি তাঁহাদিগের না থাকিত, তাহা হইলে, "Governor himself will normally be relieved of any responsibility for the policy of the State as regards the University." অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সূত্র স্থির করিবার দায়িত্ব হইতে সাধারণতঃ (normally) গভর্ণর মুক্ত হইবেন, এবংবিধ কথা স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। যতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রি-নিয়োগের ভার গভর্ণরের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং ঐ ঐ মন্ত্রিগণের প্রতি বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যসূত্র স্থির করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন প্রদেশের কোন গভর্ণর কোন কালে কোন কার্য্যসূত্র নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা চলে না। অথচ যখন দেখা যাইতেছে যে, স্যর জন স্বয়ং এই কথা বলিতেছেন, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, যদিও কার্য্যতঃ এই দায়িত্ব গভর্ণরগণের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তথাপি তাঁহাদিগের ইচ্ছা যে, জনসমাজ গভর্ণরদিগকে উহার জন্য দায়ী না করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলকে দায়ী করুক ?

চ্যান্সেলর স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের বক্তৃতা হইতে যেরূপ বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশটি যাহাতে নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া আবদ্ধ থাকে, পরস্পরের সহিত দন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ যাহাতে মিলিত হইয়া একটি জাতিরূপে সংগঠিত হইবার চেষ্টার উদ্ভব না হয় এবং যাহাতে জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা-সমূহের অসমাধানের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণরের স্কন্ধে দায়িত্ব অরোপিত না হইয়া দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডলকে উহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়, ইহা আমাদিগের শাসকবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও অভিপ্রেত, সেইরূপ আবার ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতা হইতে বুঝিতে হয় যে, অতঃপর বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ টাকার অভাবের অজুহাতে প্রায়শঃ প্রকৃত সংগঠনের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিবেন এবং জনসাধারণের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য

এবং মানসিক অশান্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ যে টাকার অভাবের অজুহাতে প্রায়শঃ প্রকৃত সংগঠনের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিবেন, তাহা শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতার শেষাংশ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। ঐ অংশে তিনি বলিয়াছেন যে, "It would involve a vast expenditure of money and require ceaseless and courageous efforts undeterred by difficulties and opposition", অর্থাৎ, সংগঠনের কার্য্যে যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন হইবে এবং উহা নানা রকমের বিঘ্ন ও বাধাতে (opposition) অপ্রতিহত থাকিয়া সাহসিকতাপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-প্রযত্নের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে।

টাকার অভাবের অজুহাতে যাহাতে জনসাধারণের হিতকর প্রকৃত সংগঠনের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতে হয়, তাহার চেষ্টা করা যদি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর শ্রেণীর কর্ম্মচারিবর্গের সাধনার বস্তু হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কি উপায়ে এতদুদ্দেশ্যে কোনরূপ বিঘ্ন অথবা বাধার উদ্ভব না হইতে পারে, তাহার উপায় আবিষ্কার করিবার কল্পনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং ঐ বাধা ও বিঘ্নের উদ্ভব হইলে কিরূপ ভাবে দল পাকাইয়া দেশের মধ্যে দলাদলির প্রণয়নের (clique-making) নিপুণতা দেখাইবেন, তাহার পরিকল্পনায় ব্যাপৃত থাকিতেন না।

মোটের উপর চ্যান্সেলর ও ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তৃতা দুইটি অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছে যে, দেশের মধ্যে কোনরূপ নূতন শক্তির জাগরণ সম্ভবযোগ্য না হইলে বর্ত্তমান ভারতীয় অথবা ইংলণ্ডীয় নেতৃবর্গের দ্বারা আমাদিগের যুবকদিগের শিক্ষাসমস্যাসমূহের কোনরূপ প্রকৃত সমাধান সম্পাদিত হইবে না এবং তাহার ফলে দেশীয় জনসাধারণের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি পূর্ব্ববৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আমাদের কথা যে সত্য, ভবিষ্যতের বাস্তব অবস্থা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ইহা ছাড়া আরও মনে হইয়াছে যে, নূতন শাসন-সংস্কৃতির ফলে যাহাতে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তীব্রতর বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার চেষ্টাও চলিতে থাকিবে। এতদুদ্দেশ্যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। স্ব স্ব মাতৃভাষা অথবা প্রাদেশিক ভাষা যে অবস্থাবিশেষে কোন কোন শিক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের মতে, সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা অথবা শিক্ষার সম্পূর্ণতা কোন প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না এবং উপযোগিতার কোন স্তরবিশেষে আরূঢ় হইতে পারিলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা অথবা মাতৃভাষার প্রয়োজনও হয় না। আমাদের এই কথা যে আমাদের শাসকবর্গ বুঝিতে পারেন না, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। শিক্ষার সম্পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য যে প্রাদেশিক ভাষা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে, তাহা যদি আমাদের শাসকবর্গ না বুঝিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কোনদিন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত না। অথচ তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়া বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হওয়ার পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেন কেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি? আমাদের বাঙ্গালার শাসকবর্গের এই কার্য্যকে কি মেকলের ভ্রম-সংশোধনের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে?

আমাদের বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে পরিগৃহীত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে উল্লাসের চিহ্ন তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

সমগ্র জগতের সমগ্র মানবজাতি যখন আসন্ন বিপদে নিমজ্জিত, তখন একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, আমরা কতকাল আর এইরূপে ঘুমাইয়া থাকিব? মানব-জাতির রক্ষাকল্পে ভারতবাসীর জাগরণ যে একান্ত প্রয়োজনীয়, ইংরাজ জাতির কেহ কেহ ভুল করিতে পারেন বটে, কিন্তু ভারতবাসীর যে এখন আর একটিও ভুল করিলে চলিবে না, ভারতবাসী যে ইংরেজের প্রতি কোন অবস্থাতে যুক্তিসঙ্গত-ভাবে বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না, তাহা ভারতবর্ষের সুধীবৃন্দ কবে বুঝিবেন?

শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতায় কবি- সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তার বিচ্ছেদ অস্বাভাবিক"। তাঁহার ও তংশ্রেণীস্থ মানুষগুলির বিশ্বাস যে, এতদিন বাঙ্গালী জাতিকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করায়, শীঘ্রই বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং তজ্জন্য তাঁহারা বাঙ্গালী জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ—ইহা ঐ শ্রেণীর মানুষগুলির অভিমত।

আমাদের মতে শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর লৌকিক ভাষা কখনও সর্ব্বতোভাবে সমান হইতে পারে না এবং ঐ দুই ভাষার মধ্যে আত্মীয়তার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বাঙ্গালা দেশে যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহা খুবই সত্য। কিন্তু আমাদের মতে শুধু বাঙ্গালা দেশে নহে, আধুনিক জগতের কোন দেশেই প্রকৃত শিক্ষার বিস্তৃতি হওয়া ত' দূরের কথা, উহা যে কি বস্তু, তাহার যথাযথ সন্ধান পর্য্যন্ত বর্ত্তমান তথাকথিত পণ্ডিতগণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই।

ঐ সন্ধান তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই বলিয়াই কোন দেশের পণ্ডিতগণ আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য, ব্যাধির যন্ত্রণা, মানসিক অশান্তি এবং অকালমৃত্যু হইতে প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারেন না। আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণ প্রকৃত শিক্ষার প্রকৃত সন্ধান লাভ করিতে না পারা সত্ত্বেও তাঁহারা জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া প্রতারিত করিয়া থাকেন এবং জনসাধারণ তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ ভাবে প্রতারিত হইতে সম্মত হইয়া থাকেন বলিয়া, আধুনিক জগতের জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক দেশে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

মানুষ যে এখন আর প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে না, তাহার কারণ অসংখ্য। তন্মধ্যে, কোন্ ভাষায় শিক্ষা-দানের ও সাহিত্য-রচনার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষার অভাবের প্রধান কারণ।

আমরা দেখাইয়াছি যে, কোন প্রাদেশিক ভাষায় কোন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, একদিকে যেমন স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার প্রাধান্য গড়িয়া তুলিবার জন্য, বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ আবার ছাত্রগণ যদি কেবলমাত্র প্রাদেশিক ভাষাতেই শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সমগ্র মানব-জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়; কারণ, এক একটি প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা ঐ ঐ প্রদেশের সকল মানুষের মনোভাব অল্পাধিক বুঝা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন একটি, অথবা দুইটি, অথবা ততোধিক প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা সমগ্র জগতের অধিকাংশ মানুষের মনোভাব সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এক একটি প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা ঐ ঐ প্রদেশের সকল মানুষের মনোভাব অল্পাধিক বুঝা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা এমন কি ঐ প্রদেশের সকল মানুষের মনোভাব পর্য্যন্ত সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভাষা ধরিলে দেখা যাইবে যে, চট্টগ্রামের লোকের ভাষা সম্যক্ ভাবে হুগলী জেলার লোকের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না, আবার হুগলী জেলার লোকের ভাষা চট্টগ্রামের লোকের পক্ষে সম্যক্ ভাবে বুঝা সম্ভব হয় না।

আরও একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একদিকে যেমন দুইটি মানুষের ভাষা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে, সেইরূপ আবার কোন একটি মানুষের ভাষা তাহার জীবনের সকল অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সমান নহে।

মানুষ তাহার শৈশব অবস্থায় আধ-আধ ভাষায় কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু যৌবনে তাহার ঐ ভাষা সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া শৌর্য্যশালী হইয়া থাকে। আবার যৌবনে তাহার ভাষা যেরূপ শৌর্য্যশালী হয়, বার্দ্ধক্যে উহা বিদ্যমান

থাকে না। তখন মানুষের ভাষায় দৌর্ব্বল্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, শিশুর কোন ভাষা নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, শিশু যখন কর্ণের যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়, তখন সে যে স্বরে ক্রন্দন করে, সেই স্বর—অন্য কোন অঙ্গের যন্ত্রণায় বিহ্বল হইলে তাহার মুখ হইতে যে স্বর নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণ মানুষ সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশুর ভাষা বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহারও ভাষা আছে এবং ঐ ভাষা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

এইরূপে একই মানুষের কৌমার, যৌবন এবং জরাতে যে-রূপ ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার ক্রোধার্ত্ত মানুষের ভাষা কামার্ত্ত মানুষের ভাষা হইতে অনেকাংশে পৃথক্ হইয়া থাকে।

দুইটি মানুষের ভাষা পর্য্যন্ত যে স্বভাবতঃ সর্ব্বতোভাবে এক নহে, এমন কি কোন একটি মানুষের ভাষা পর্য্যন্ত যে তাহার জীবনের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সমান থাকে না—এই প্রাকৃতিক সত্যটুকু আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিত-গণের উপলব্ধিযোগ্য না হওয়ায় তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত দুষ্কর থাকায়, সমগ্র মানবজাতি মিলিত হইয়া একটি সাধারণ ভাষা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই এবং এই পণ্ডিতগণ গত কয়েক বৎসর হইতে ঐ মনুষ্যজাতির একটি সাধারণ ভাষা প্রণয়ন-প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রয়াস যে উপহাসযোগ্য, তাহা পর্য্যন্ত এই পণ্ডিত-গণ বুঝিতে পারেন না। জগতের মনুষ্যজাতির ভাষা-বিজ্ঞানের জ্ঞান-সম্বন্ধীয় অবস্থা চিরদিন এতাদৃশ ছিল না। ভারতীয় ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর আগেই দুইটি মনুষ্যের ভাষা পর্য্যন্ত যে স্বভাবতঃ সর্ব্বতোভাবে এক নহে এবং এমন কি কোন একটি মানুষের ভাষা পর্য্যন্ত যে তাহার জীবনের সর্ব্বাবস্থায় সমান থাকে না, এই প্রাকৃতিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষের শিক্ষা ও সাহিত্য কোন্ ভাষায় ব্যবস্থিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐ গবেষণা প্রধানতঃ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে "পূর্ব্বমীমাংসা" নামক গ্রন্থে। কিন্তু এখন আর মানুষ প্রায়শঃ তাঁহাদের ভাষা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারে না বলিয়া ঐ গবেষণা মানুষের প্রায়শঃ অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সাহিত্য-রচনা কোন্ ভাষায় সম্পাদিত হইলে উহা সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা অতীব বিস্তৃত; উহা সম্পূর্ণভাবে এই সন্দর্ভে প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় ঋষিগণ প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে, জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের লৌকিক ভাষা পৃথক্ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মানুষ যে কোন ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, প্রত্যেক কথাটি যে যে বর্ণের দ্বারা রচিত, তাহার আওয়াজ মূলতঃ কয়েকটি বর্ণের আওয়াজের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। 'ফাদার' এই কথাটির মধ্যে যেরূপ ফ্-আ-দ্-আ-র্ রহিয়াছে, সেইরূপ "পেটার" এই কথাটির মধ্যে প্-ই-ট্-আ-র্ রহিয়াছে এবং "বাবা" এই কথাটির মধ্যে ব্-আ-ব্-আ এই কয়েকটি বর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার যত কিছু কথা আছে, তাহার সমস্তই অ-কারাদি ও ক-কারাদি চৌষট্টিটি বর্ণের বিভিন্ন সংমিশ্রণের (permutation and combination) দ্বারা প্রস্তুত।

ইহা ছাড়া তাঁহারা শব্দ-প্রকৃতির (nature of sound) আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে, দেশের ও কথার বিভিন্নতাবশতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের কথার অভিব্যক্তিতেও অ-কারাদি ও ক-কারাদি চৌষট্টি বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্নতা বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষ মূলতঃ যে যে ভাববশতঃ কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সেই ভাবের অভিব্যক্তি তাহার শরীরের যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (anatomical parts) এবং শরীরবিধানের যে যে কার্য্য (physiological operations) বশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই মূলতঃ

এক। এইরূপ ভাবে তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুর যেরূপ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ নামক তিনটি অবস্থা আছে, সেইরূপ শব্দপ্রবৃত্তি এবং শব্দ-বিকাশেরও ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ নামক তিনটি অবস্থা প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিশেষে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের ব্যক্ত অবস্থা (অর্থাৎ লৌকিক ভাষা) জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শব্দের অব্যক্ত অবস্থা (অর্থাৎ শব্দমিশ্রণের প্রবৃত্তি) সমগ্র জগতে কেবলমাত্র দেশ-ভেদে ত্রিবিধ প্রকারে এবং শব্দের জ্ঞ-অবস্থা (অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের কার্য্য) সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক মানুষের অন্তরে কেবলমাত্র একই প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শব্দের জ্ঞ-অবস্থা (অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের কার্য্য) কিরূপ ভাবে সাধিত হইতেছে, তাহা যদি মানুষ কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে একমাত্র সেই বিদ্যার দ্বারাই জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের এবং এমন কি প্রত্যেক জীবের পর্য্যন্ত ভাষা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে।

যে ভাষার দ্বারা শব্দের জ্ঞ-অবস্থা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করা যায়, ঋষিগণ তাহার নাম দিয়াছেন "অঞ্জন"। এই "অঞ্জন"-নামক শব্দটি হইতে "জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা" নামক শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। অঞ্জনবিদ্যা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঋক্, সাম, এবং যজুঃ নামক তিনটি বেদে। এই তিনটি বেদের কোন প্রকৃত অনুবাদ অথবা ভাষান্তর সাধিত হওয়া সম্ভব নহে এবং উহা জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারযোগ্য। একমাত্র ঐ তিনটি বেদের অভ্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলেই মানুষের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা সমস্তই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে।

ঐ তিনটি বেদ জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যবহার-যোগ্য বটে এবং উহার অভ্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলে মানুষের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা সমস্তই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বিবিধ কারণে সকল দেশের সকল মানুষের পক্ষে এই তিনটি বেদের অভ্যাসে নিপুণতা লাভ করা সম্ভব হয় না।

যে ভাষার দ্বারা শব্দের অব্যক্ত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়, ঋষিগণ তাহার নাম দিয়াছেন—"সংস্কৃত ভাষা।" আগেই বলা হইয়াছে যে, শব্দের ব্যক্ত অবস্থা (অর্থাৎ লৌকিক ভাষা) জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শব্দের অব্যক্ত অবস্থা (অর্থাৎ শব্দ-মিশ্রণের প্রবৃত্তি) সমগ্র জগতে কেবলমাত্র দেশভেদে ত্রিবিধ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদনুসারে বলিতে হইবে যে, সমগ্র জগতে সংস্কৃত ভাষা কেবলমাত্র তিন প্রকারের হইতে পারে এবং যদিও একমাত্র 'অঞ্জন'বিদ্যার দ্বারা জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ভাষা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দ্বারা সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ভাষা বুদ্ধিযোগ্য করিতে হইলে, ত্রিবিধ প্রকারের সংস্কৃত ভাষায় অভ্যস্ত হইতে হয়। 'অ'কারাদি ও 'ক'কারাদি চৌষট্টিটি বর্ণের অর্থ, তাহাদের মিশ্রণের প্রকৃতি এবং এই মিশ্রণের পার্থক্যানুসারে অর্থ-পার্থক্যের প্রকৃতি লইয়া সংস্কৃত ভাষা গঠিত হইয়া থাকে। দেশানুসারে সংস্কৃত ভাষার তিনটি নাম, যথা—সংস্কৃত, হিব্রু এবং আরবী।

অঞ্জন-বিদ্যা লাভ করা যেরূপ দুরূহ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা তত দুরূহ নহে।

কাযেই, কোন্ ভাষায় শিক্ষা-প্রদান ও সাহিত্য-রচনা করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে তাহা সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, ইহার বিচার করিতে বসিয়া বহু সহস্র বৎসর আগে ভারতীয় ঋষি স্থির করিয়াছিলেন যে, লৌকিক ভাষার দ্বারা উহা সাধন করা অসম্ভব বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দ্বারা উহা সাধিত হইতে পারে এবং তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই মানুষের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় সংস্কৃত ভাষায় অথর্ব্ববেদ নামক গ্রন্থে, আরবী ভাষায় কোরাণ নামক গ্রন্থে এবং হিব্রু ভাষায় বাইবেল নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, অথর্ব্ববেদ, কোরাণ এবং বাইবেল নামক

তিনখানি ধর্ম্মপুস্তকের বক্তব্যে নানা রকমের মতপার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু বর্ণের অর্থ, মিশ্রণের প্রকৃতি এবং বর্ণ-মিশ্রণের পার্থক্যানুসারে অর্থ-প্রকৃতির পার্থক্যসম্ভূত সংস্কৃতভাষার জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই তিনখানি গ্রন্থের বক্তব্যে কোন পার্থক্য থাকা ত' দূরের কথা, উহা সম্পূর্ণভাবে সমান।

কোন প্রাদেশিক ভাষায় বিদ্যাদানের অথবা সাহিত্য-রচনার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, তাহা সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না, ইহা ভারতীয় ঋষিগণ সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা তৎকালীন মনুষ্যসমাজকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, ঋষি-দিগের অভ্যুদয়কালে কোন প্রাদেশিক ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হইত না এবং তাহা হইত না বলিয়াই কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত অতীব প্রাচীন কালের কোন গ্রন্থ জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোন লৌকিক অথবা প্রাদেশিক ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হইলে, অথবা এই ভাষায় বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সাধিত হইলে, তাহা যেমন সমগ্র জগতের মনুষ্যজাতির গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, সেইরূপ আবার লৌকিক ভাষার সাহায্যে কোন বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ করাও সম্ভব হয় না।

আগেই বলিয়াছি যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুর ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ-নামক তিনটি অবস্থা আছে। কোন বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে হইলে যে, ঐ বস্তুর উপরোক্ত তিনটি অবস্থাই সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতীয় ঋষিগণ ইহা দেখাইয়াছেন যে, বস্তুর ব্যক্ত অবস্থা যে-ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব, অব্যক্ত অবস্থা সেই ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। আবার, বস্তুর অব্যক্ত অবস্থা যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব, জ্ঞ-অবস্থা সেই ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। বস্তুর তিনটি অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়গণ এই সহজ সত্যটুকু বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই নানাবিধ প্রবন্ধ-সত্ত্বেও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এতাবৎ মানুষের হিতকারী হইতে পারে নাই এবং তদ্দ্বারা মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকারই সাধিত হইতেছে।

বস্তুর ত্রিবিধ অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন লৌকিক অথবা প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে ঐ তিনটি স্বতন্ত্র ভাষা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। ঐ তিনটি স্বতন্ত্র ভাষা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও ভারতীয় ঋষিগণ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

কাযেই, কোন্ ভাষায় শিক্ষাদানের ও সাহিত্যরচনার ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষ্যের পক্ষে সম্যক্ ভাবে শিক্ষা লাভ করা ও দ্বেষ-হিংসাদি বর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে আমা-দিগকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে যে-ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, উহা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নহে। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে মানুষ অনায়াসে প্রাচীন আরবী ও হিব্রু ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়।

প্রাচীন সংস্কৃত, আরবী এবং হিব্রু ভাষা এক্ষণে বিস্মৃতির অতলগর্ভে লুক্কায়িত। উহার পুনরাবিষ্কার সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে তদুদ্দেশে গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

আপাত-দৃষ্টিতে ঐ গবেষণা অতীব দুরূহ বলিয়া প্রতীয়-মান হয় বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, যাঁহাদের জিহ্বা অত্যধিক অশোধিত সুরাপানে, অথবা খেচর জীবের অত্যধিক মাংসাহারে, অথবা দম্ভযুক্ত আত্মপ্রতারণা ও তেজঃ-কলুষিত চিন্তায় বিকৃতি লাভ করে নাই, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মাক্ষরিত শব্দতত্ত্ব (প্রচলিত কথায় যাহাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে) পরিজ্ঞাত হওয়া ও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষায় অভ্যস্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে সম্ভব-যোগ্য।

সুকুমারমতি বালকগণের অভিলাষ-পরিচালিত বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে অকারণ আত্মমুগ্ধ মানুষগণের চিন্তায় এতাদৃশ গবেষণার কথা স্থান পাইবে কি ?

আমরা এখনও শ্যামাপ্রসাদবাবুকে ছাত্রদিগের অবস্থার দিকে তাকাইয়া সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত গবেষণার দ্বারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা পরিরক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-বানান-সমস্যা সমাধানের কোন কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে-ভাষা বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়াছে, ঐ ভাষা সম্পূর্ণভাবে শব্দ-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ এবং উহাকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষানুসারে ম্লেচ্ছ-ভাষা বলিতে হয়। ঐ ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত থাকিলে ছাত্রগণের পক্ষে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত না হইয়া শিক্ষিতের উপাধি অর্জ্জন করা সম্ভব হইবে এবং তাহার ফলে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের অযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকতর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে। উপরোক্ত সত্যগুলি ভাবিয়া-চিন্তিয়া উপলব্ধি করিবার উপযোগী মানুষ কি বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগ হইতে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে ?

নির্ব্বাচনান্তে দেশের অবস্থা

বর্ত্তমান কংগ্রেসপন্থিগণের মতে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লিসমূহের সংগঠন দেশীয় লোকের দ্বারা রচিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ-রচিত অ্যাসেম্ব্লিসমূহের সহায়তায় ভারতের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার, অথবা শারীরিক স্বাস্থ্যের, অথবা মানসিক শান্তিস্থাপনের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে না। আমাদের মতে কংগ্রেসপন্থীদিগের উপরোক্ত মতবাদ ভ্রান্ত। একে ত' দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজদিগের অনভিমতে একমাত্র ভারতবাসিগণের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন সংগঠন রচিত হওয়া সম্ভব নহে, তাহার পর আবার দেশের যে সংগঠন সাধিত হইলে দেশীয় সমগ্র জনসাধারণের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি দূরীভূত করা সম্ভব হইতে পারে, সেই সংগঠনের কোনরূপ পরিকল্পনা গান্ধীজীপ্রমুখ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অথবা দেশীয় কোন ধুরন্ধরের মস্তিষ্কে আছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মাসিক বঙ্গশ্রীতে "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, একদিকে যেরূপ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া, অথবা ভারতবাসিগণের পক্ষে জনসাধারণের প্রকৃত হিতকারী পরিকল্পনা স্থির করা সম্ভব নহে, সেইরূপ আবার সমগ্র জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি সম্পাদিত করিতে হইলে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প পোষণ করাও পরামর্শসিদ্ধ নহে। এতাদৃশ সময়ে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে দেশের কল্যাণকামী, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ইংরেজবিদ্বেষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে জনসাধারণের মন হইতে তিরোহিত হয় এবং যাহাতে দেশের সমগ্র জনসাধারণ হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে অথবা ভারতবাসী, ইংরেজ ও বিদেশীয়-নির্ব্বিশেষে মিলিত হইয়া প্রকৃত সম্মিলিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া। কি করিলে দেশের জনসাধারণের মন হইতে ইংরেজবিদ্বেষ তিরোহিত হইতে পারে এবং কি উপায়ে সর্ব্ব জাতি ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মিলিত সমগ্র ভারতবাসীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তাহাও আমরা উপরোক্ত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের চালচলন লক্ষ্য করিলে যে উপায়ে সম্মিলিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইতে পারে, অথবা যাহা করিলে দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বেকার অবস্থা, অথবা সমগ্র শ্রমজীবী ও জনসাধারণের অন্নাভাব, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে, তাহা করিবার কোন প্রকৃত চেষ্টা যে আমাদের হোমড়া-চোমড়া নেতাগণ করিবেন, তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এই নেতৃবর্গ জনসাধারণের আর্থিক অভাবের জন্য যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখ হইতে এমন কথা পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়াছে যে, বরং স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রয়াস কিছু দিনের জন্য স্থগিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের অর্থসমস্যা দূর করিবার চেষ্টা একদিনও স্থগিত থাকিতে পারে না। নেতৃবর্গের মুখে জনসাধারণের প্রতি সমবেদনার অনেক কথা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা এতাবৎ যাহা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির ফলে জনসাধারণের সর্ব্ববিধ দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে প্রত্যেক প্রদেশে যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহাদের কার্য্যেও যে, ঐ অবস্থার অন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহার কোন আশা করা যায় না।

প্রায় প্রত্যেক প্রদেশস্থ মন্ত্রিমণ্ডলেই প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান বিদ্যমান থাকিবেন এবং কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও কোন কোন প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকিবে এবং ইহাও দেখা যাইবে যে, কোন কোন প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলে কংগ্রেসের ধুরন্ধরগণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের প্রতি গরম কথা, ব্যারিষ্টার ও উকিল পলিটিসিয়ানদিগের মুখে নূতন নূতন ফ্রেজিওলজি, অর্থ-নৈতিক পলিটিসিয়ানদিগের মুখে কলেজের ছাত্রগণের মুখরোচক নূতন নূতন পরিকল্পনা অনেক শোনা যাইবে বটে, কিন্তু দেশের বেকারের সংখ্যা, অথবা আর্থিক অভাব, অথবা শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাইবে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের অধিকাংশ পরিবার ক্রমে ক্রমে যাদৃশ আর্থিক অভাবে, শারীরিক অস্বাস্থ্যে এবং মানসিক অশান্তিতে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে যদি অনতিবিলম্বে ঐ অবস্থার উন্নতি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে হতাশাপ্রসূত অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবের আশঙ্কা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। এতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণকে যে আশার বাণী শুনাইয়া আশ্বস্ত রাখা সম্ভব হইয়াছে, অদূরভবিষ্যতে কার্য্যতঃ কিছু করিতে না পারিলে যে কেবলমাত্র আশার বাণীর দ্বারা তাহাদের পাকস্থলীর প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাপিত রাখা যাইবে না, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দেশের এতাদৃশ দুরবস্থার জন্য দায়ী কে ?

দেশের জনসাধারণের এই অবস্থার জন্য আজকাল সাধারণতঃ ইংরেজগণকে অথবা ইংরেজের রাজত্বকে দায়ী করা হইয়া থাকে। আমাদের মতে, "ইংরেজ যে এই অবস্থার জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে," ইহা বলা যায় না বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ইংরেজ অথবা ইংরেজের রাজত্বই যে আমাদের দুরবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী, তাহাও বলা চলে না। আমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, কোন দিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা সর্ব্বতোভাবে অভিলাষানুযায়ী ছিল কি না এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, একদিন ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারণ প্রায়শঃ আর্থিক স্বাচ্ছল্য, স্বাবলম্বন, মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ যৌবন এবং দীর্ঘ পরমায়ু উপভোগ করিতে পারিত, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, কবে সেই শুভদিন ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল এবং কোন্ দিন হইতে তাহা অস্তমিত হইয়াছে। আমাদের ঐ শুভদিন অস্তমিত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন, অথবা যাঁহারা পরমকারুণিক সর্ব্বনিয়ন্তার দ্বারা আমাদিগের ভাগ্যনিয়ন্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে মূলতঃ দায়ী করা যায় না। যে কারণে এবং যাঁহাদের কর্ম্মদোষে আমাদের মা'র সন্তানগণের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই মূলতঃ আমাদিগের দুর্দ্দশার জন্য দায়ী বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামের দিকে তাকাইয়া যখন দেখা যায় যে, পঞ্চাশ বৎসর আগেও প্রত্যেক গ্রামে

যথেষ্ট পরিমাণে স্বাভাবিক উর্ব্বরতাশালী জমি বিদ্যমান ছিল, কৃষকগণ প্রায়শঃ অতি অল্প প্রয়াসেই প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদন করিতে পারিত, তাহারাই প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৮০ জন ছিল, তাহারা প্রায়শঃ কোন ঋণভারে জর্জ্জরিত ছিল না, তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য, স্বাবলম্বন, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি বিদ্যমান ছিল, তখন অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোক যে একদিন সৌভাগ্য উপভোগ করিতে পারিত, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইহার পর যখন আবার দেখা যায় যে, ঐ গ্রামের তাঁতী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি কুটীর-শিল্পিগণও কাহারও কাছে চাকুরীর প্রার্থী না হইয়া প্রায়শঃ নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, তাহাদের সংখ্যা গ্রামের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা প্রায়শঃ ১০ জন ছিল এবং তাহারাও প্রায়শঃ স্বাস্থ্য, সুখ ও মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে পারিত, তখন ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৯০ জন যে, প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অধিবাসী একদিন কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও চাকুরী না করিয়া, কাহারও পদাবনত না হইয়া স্ব পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যে, সুখে ও মানসিক শান্তিতে বার মাসের তের পার্ব্বণে যোগদান করিতে পারিত।

এইরূপ ভাবে গ্রামের দিকে তাকাইলে যেরূপ প্রায় সমগ্র অধিবাসীর সর্ব্বতোভাবে সুখ-সমৃদ্ধির অল্লাধিক পরিচয় পঞ্চাশ বৎসর আগেও পাওয়া যাইবে, সেইরূপ আবার সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত (পণ্ডিতগণের নহে) যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থের মূল ভাগ কোন অর্থপুস্তকের (ভাষ্যের) বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে যে প্রণালীতে ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজগত জীবন যাপিত হইলে মানুষ সর্ব্বতোভাবে আর্থিক স্বাচ্ছল্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ ঐ গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ভারতে একদিন এই সুখ-সমৃদ্ধি ও জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান ছিল বলিয়াই জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষ ভারতের দিকে তাকাইয়া থাকিত এবং যখন যে দেশের মানুষ উন্নতিপ্রয়াসী হইয়াছে, তখনই সেই দেশের মানুষ ভারতকে তীর্থভূমি মনে করিয়া ইহার সহায়তা যাচ্ঞা করিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র এই প্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়া একদিন ইয়োরোপীয়গণ জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া শঙ্কাকুল পথে ভারত পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আজিকার ইংরেজকে একদিন ভারতের রাজদরবারে যাচ্ঞাকারী বেশে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

ভারতে সমগ্র জনসাধারণ যে একদিন সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী ছিল এবং তাহারা যে একদিন সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল, তাহা কার্য্যকারণের সঙ্গত ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিলে কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এক্ষণে একদিকে যেরূপ ঐ সুখ-সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ আবার জ্ঞানভাণ্ডারের ঐ ঋষি-রচিত গ্রন্থসমূহও এখন আর কেহ অর্থপুস্তক (ভাষ্য) ছাড়া অধ্যয়ন করিতে পারেন না এবং ঐ অর্থপুস্তকসমূহ ভ্রমহীন অথবা ভ্রমাত্মক তাহারও পরীক্ষা করিতে পারেন না।

চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের সৌভাগ্যরবি পশ্চিম গগনে অস্তমান হইয়াছে সেই দিন, যেদিন তাহার ঋষিপ্রণীত ঐ জ্ঞানভাণ্ডার বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমাদের দুরবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী কে,—ইংরেজ অথবা অন্য কেহ? ইহার জন্য দায়ী আমাদিগের পরাধীনতা, অথবা যে কারণে আমরা পরাধীন হইয়াছি এবং পরাধীন রহিয়াছি, তাহা? অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ঋষিপ্রণীত জ্ঞানভাণ্ডারের বিলুপ্তির জন্য লৌকিকভাবে দায়ী ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং ঐ জ্ঞানভাণ্ডারের বিলুপ্তি আমাদিগের পরাধীনতার কারণ। অদূরভবিষ্যতে জগতের প্রায় সকল স্তরের সকল মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত না হইলে, ভারতে মুসলমান রাজত্ব অথবা ইংরেজ রাজত্বের উদ্ভব হইত না এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধিও বিলুপ্ত হইত না।

কাজেই আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য ইংরেজ-জাতিকে অথবা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে মূলতঃ দায়ী করা যায় না। ইহার জন্য আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লৌকিক-ভাবে মূলতঃ দায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে।

এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে, ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে তাহার সন্তানগণের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয় বটে, কিন্তু আমাদের ঐ দুরবস্থা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার জন্য এখন আর তাঁহা-দিগকে দায়ী করা যায় না, কারণ এখন আর জনসাধারণের প্রায় কেহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয় না। আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য মূলতঃ ইংরেজকে দায়ী করা যায় না বটে, কিন্তু তাহা কেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, তজ্জন্য একদিকে যেরূপ ইংরেজের দায়িত্ব রহিয়াছে, সেইরূপ আবার দেশীয় ইংরেজীশিক্ষিত নামজাদা নেতৃবৃন্দেরও ততোধিক দায়িত্ব রহিয়াছে।

ইংরেজগণের কার্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের নেতৃবর্গ অসাধু, অথবা অলস, অথবা দাম্ভিক নহে, পরন্তু তাঁহাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি উপায়ে জনসাধারণের দুরবস্থা অপনোদিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভ্যুদয়কালের প্রারম্ভ হইতে নানা রকম ভাবে চিন্তা ও কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজ নেতৃ-বর্গের এতাদৃশ সততা ও পরিশ্রম-তৎপরতা-সত্ত্বেও যে জনসাধারণের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরিপক্কতা এবং অপরি-ণামদর্শিতা। তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরিপক্কতা ও অপরিণামদর্শিতা যে ইংরেজের চিন্তাশীলগণ বুঝিতে পারেন না, ইহাও বলা যায় না, কারণ তাঁহারা নিজেদের এই ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলে তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব হইত না।

কাজেই, ভারতের অথবা জগতের জনসাধারণের দুরবস্থার বৃদ্ধির জন্য ইংরেজের দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প এবং স্বাভাবিক।

অন্য পক্ষে, ভারতীয় ইংরেজী-শিক্ষিত নেতৃবর্গের দায়িত্ব অপরিসীম। তাঁহারা প্রায়শঃ অসৎ, অলস এবং দাম্ভিক। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান যে অতীব অপরিপক্ক এবং অসম্পূর্ণ, তাহা তাহার প্রণেতাগণ পর্য্যন্ত যতটুকু বুঝিতে পারেন, তাহা পর্য্যন্ত এই নেতৃবর্গ বুঝিতে পারেন না। অথচ, তাঁহারা এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ মনে শিক্ষার দম্ভ পোষণ করিয়া থাকেন এবং জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন।

একে ত' এই নেতৃবর্গের বিদ্যাবুদ্ধি অতীব অল্প, তাহার পর আবার তাঁহাদের স্ব স্ব দম্ভবশতঃ উহা যে প্রয়োজনানু-রূপ নহে, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত সংগঠনের কার্য্য কি, তাহা বাছিয়া বাহির করা অসম্ভব হইয়া থাকে এবং কোনরূপ সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইরূপ ভাবে তাঁহারা প্রকৃত সংগঠনের কার্য্য হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হন এবং দেশবাসীকে কেবল মাত্র দ্বন্দ্ব-কলহের রাস্তায় পরিচালিত করিয়া স্ব স্ব নেতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

কাজেই, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী কে, সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতে হইলে, আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ইহার জন্য দায়ী মূলতঃ ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং বর্ত্তমানে তজ্জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরিপক্কতা কথঞ্চিৎ দায়ী বটে, কিন্তু প্রধানতঃ উহার জন্য দায়ী ভারতীয় ইংরেজী-শিক্ষিত নেতৃবর্গের অসাধুতা, আলস্য এবং দাম্ভিকতা।

যাহাতে এই নেতৃবর্গ তাঁহাদের অসাধুতা, আলস্য এবং দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, অথবা যাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হন, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেস-মণ্ডপের-নেতৃত্বাসনে সমাসীন না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় যুবকমণ্ডলী করিতে প্রস্তুত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বেকার অবস্থা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ইহা আমাদের অভিমত। আমাদের কথা যে সত্য অদূরভবিষ্যৎ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

বসন্তের প্রতিষেধক

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ সম্মেলনের উদ্বোধন-কল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন : বসন্ত ঋতু যেমনভাবে আসে, তেমনি ভাবে আমাদের দেশে সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস, ঋতু রূপে নহে, মহামারী রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। চারিপাশে মারীগুটিকার মধ্যে তাহার পরিচয় ক্ষতাক্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। বিতাড়নার্থ কঠিন প্রতিষেধকের প্রয়োজন!

অনুকরণ স্পৃহা

তাঁহার বক্তৃতার অন্যত্র আছে, প্রথম যখন সাহিত্যপরিষদের পরিকল্পনা হয়, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে অনুকরণের যে সামান্য স্পৃহা ছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া যাহা সত্য, তাহাই অতি অল্পদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ইহা বলিতে পারেন, আমরা কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম যুগের যে অনুকরণ-স্পৃহা দেখা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক খানি সামর্থ্যের পরিচয় ছিল। এখন সে সমার্থ্য নাই, অথচ অনুকরণ চলিতেছে। সে যুগের কবি বাহিরে হ্যাট-কোট প্যাণ্ট ও নকটাই পরিয়াও অন্তরে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন, এ যুগে বাহিরের সেই সাহেবী পোষাক হয়ত ঘুচিয়াছে, কিন্তু অন্তরে সাহেবিয়ানা ঢুকিয়াছে।

পাপের স্পর্শ

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পাপের স্পর্শে আজ জগৎ কলুষিত। বাস্তবতার নামে পৃথিবীর সাহিত্যকে ভুমিসাৎ করার চেষ্টা চলিতেছে। এই বিকৃতি ও কুপ্রচেষ্টার আক্রমণ হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

অত্যন্ত ঠিক কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য হইতে পরিচয় পাওয়া যাইবে, ইহা হইতে আত্মরক্ষা তিনি করিতে পারেন নাই, উপরন্তু তাঁহার সাহিত্যই সংক্রামণের বীজাণু বহন করিয়া ফিরিতেছে। ইহা তাঁহার সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

সৌন্দর্য্য ও রস

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার শেষ কথা ;—"সৌন্দর্য্য ও রসকে অস্বীকার করিলে, যে বিধাতা আমাদের অসংখ্য সৌন্দর্য্য ও রসের অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহাকেই অস্বীকার করা হয়।"

বিধাতার সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি কি হইবে, তাহা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার নিকট বিধাতার যে রূপ সুন্দর, কালী-সাধকের নিকট সে রূপ সুন্দর নহে। সৌন্দর্য্য ও রসকে স্বীকার করিবার মাপকাঠি কি, রবীন্দ্রনাথ তাহার নির্দ্দেশ না দিয়া কি করিয়া বলেন যে, সৌন্দর্য্য ও রসকে সাহিত্যে স্বীকার করিতে হইবে?

উপকথা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিহর শেঠ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—ডুপ্লের সময় চন্দন নগরে এক লক্ষেরও অধিক লোক বাস করিত। প্রধানতঃ মসলিন, রেশম, শস্য, অহিফেন প্রভৃতি পণ্যের প্রচুর আমদানী ও রপ্তানী হইত। চন্দননগরের গালা, চট, আরসি, চুরুট, কাশ্মীরি কারিগর দ্বারা প্রস্তুত শাল, মখমলের উপর জরির কাজ প্রভৃতি এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে।

কেন এই সত্য কাহিনী উপকথায় পরিণত হইল, ইহার উত্তরে শেঠ মহাশয় কি বলিবেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না, তবে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সুর শুনিয়া খানিকটা আন্দাজ করিতে পারি। দেশের এই ক্রমবর্দ্ধমান দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যে-সাহিত্য আজও পর্য্যন্ত একটি পিপীলিকার কাজও করিতে পারে নাই, সেই সাহিত্যই কি "বাঙ্গালীর গৌরব করিবার বস্তু"? এমন আত্ম-প্রতারণা করিয়া কি লাভ?

নৈতিক পঙ্গুতা

সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, নৈতিক পঙ্গুতার ফলে স্থায়ী উদ্যম, ব্যাপী চেষ্টা, সংহত সাধনা বাঙ্গালীর করায়ত্ত নহে। আজও এই পঙ্গুতা জাতির সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছে।

অর্থাৎ, এই চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে 'জাতীয় জাগরণ' নামে যে খেলা চলিয়াছে, দত্ত মহাশয় তাহার ব্যর্থতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আমরাও ইহা বিশ্বাস করি। ইহা বিশ্বাস করি বলিয়াই জানাইতেছি, শিক্ষা-সাহিত্য সর্ব্বত্র আজ গোঁজামিল চলিতেছে। এই গোঁজামিল দূরকরিবার জন্য যে-সাহিত্য-রচনার প্রয়োজন, সেই সাহিত্য যদি এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইত, তাহা হইলে কি এই পঙ্গুতা জাতির সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া থাকিতে পারিত? দত্ত মহাশয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন, জাতীয় কিংবা মনুষ্য-জীবনের পঙ্গুতার সূচনা

...হুকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার ...হন করিলেই এই পঙ্গুতা দূর হইবে না; শিক্ষার মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। সে সূত্রের সন্ধান ইউরোপ ...জিও পায় নাই।

আদিরস

দত্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে অন্যত্র বলিয়াছেন, সাহিত্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ধারা সম্বন্ধেও আমি সতর্ক করিতে চাই। এই উচ্ছৃঙ্খলতা শুকারজনক রূপ ধারণ করিয়াছে। অবৈধ প্রেমের চটুল গল্প ও চুটকি কবিতা বিলাত হইতে ধারকরা জিনিষ। আদিরস এরূপ ভাবে অবতারণা করা হয় যে, পাশ্চাত্ত্যের অনেক নাটক নভেলই শুকারজনক।

কেবল পাশ্চাত্ত্য কেন—দত্ত মহাশয় কি 'কালিদাস' ...ত্যাদির রচনাও এই রস হইতে মুক্ত, তাহা বলিবেন? শৃঙ্গারশতকম্' ইত্যাদি নিশ্চয়ই বিলাত হইতে ধারকরা ...জনিষ নহে, কিংবা এই সকল পুস্তকের কোন 'আধ্যাত্মিক (?) ...র্থও সম্ভব নহে। সাহিত্য বাদ দিলে শিল্পক্ষেত্রেও দেখিব, ...জন্তার পতাকা আদিরসেরই গৌরব প্রচার করিতেছে। ...হা হইলে গোলমালটা কোথায়, তাহা আমরা দত্ত মহাশয়কে ...ঝিবার ও বুঝাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

অদূর ভবিষ্যৎ

সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন:—শোনা যায়, তরুণ সাহিত্য অশ্লীল। কিন্তু অদূরভবিষ্যতে যদি আমাদের সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা ইকনমিক (অর্থনৈতিক) কারণে হইবে, তরুণ সাহিত্যের ধাক্কায় হইবে না।

ঠিক বুঝিলাম না। চৌধুরী মহাশয় কি বলিতে চাহেন, ...জিও আমাদের দেশে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই ...বং আজিকার যে তরুণ সাহিত্য তাহা কি ঐ বিশৃঙ্খলার ...তীক নহে? তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী দার্শনিক ...হে"। অন্ততঃ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, ...তনি 'দার্শনিক' নহেন। দার্শনিক শব্দ 'দর্শন' শব্দের সহিত ...ঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। চৌধুরী মহাশয়ের যদি প্রকৃতভাবে দর্শনে'র ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি 'সামাজিক ...শৃঙ্খলা'কে অদূরভবিষ্যতে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন ...।

ফরাসী ভাষা

ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন:—পাশ্চাত্ত্যে প্রথম সংস্কৃত উপনিষদের জ্ঞান প্রচার, বর্ত্তমান পদ্ধতিতে অঙ্কিত ভারতবর্ষের প্রায় বিশুদ্ধ প্রথম মানচিত্র, বহু পণ্ডিতের দ্বারা অসংখ্য প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথির নকল ও মূল পুঁথি খরিদ, প্যারিসে বৌদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দিবার টোল স্থাপন প্রভৃতি কীর্ত্তি ফরাসী জাতির সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ করিয়াছে। আজ ফরাসী ভাষা না জানিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সভ্যতায় সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

সরকার মহাশয়ের মত কি এই যে, যদি পালি ও সংস্কৃত ভাষার যথাযথ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদিগকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে? বোধ হয়, এই কারণেই আমাদের ঐতিহাসিকগণ সংস্কৃত ভাষার অ-আ-ক-খ না জানিয়াও প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে 'সবজান্তা' সাজিয়া বসিয়া আছেন। কেন না, ইংরাজী পড়িয়াই 'সংস্কৃত' জ্ঞান-ভাণ্ডার জানা যায়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। দুর্দ্দৈব আর কাহাকে বলে!

বহুবর্ষের সাধনা

চিকিৎসা শাখার সভাপতি ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাসের অভিভাষণে বলা হইয়াছে:—পাশ্চাত্ত্য আয়ুর্বিজ্ঞানের পশ্চাতেও বহুবর্ষব্যাপী সাধনা রহিয়াছে।

বহুবর্ষ ব্যাপী-ই বটে! যেদিন ষ্টেথেস্কোপ আবিষ্কৃত হইল, সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত বৎসর হয়? শতাধিক বৎসর হইলেই আজ আমাদের নিকট 'বহু বর্ষ' হয়, এবং এই হিসাবে মানুষ ৭০।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলেই আজ আমরা বলিতেছি, পাশ্চাত্ত্য আয়ুর্বিজ্ঞান দুঃসাধ্যসাধন করিয়াছে, সে দেশে আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সব দিক্ দিয়াই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে কিন্তু জানা যাইবে যে, তাঁহাদের 'বিস্তারাভিযানে' এমন 'অসভ্য' দেশ তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেখানকার প্রত্যেকটি অধিবাসী শতাধিক বর্ষের আয়ু লাভ করে। তবে তাহারা 'অসভ্য'! কিন্তু এই 'অসভ্যতা'র পশ্চাতে কত বহু বর্ষের সাধনা ও 'সভ্যতা'র ইতিহাস আছে—তাহা কি অনুমান করা অসম্ভব?

তিন দৃষ্টি

দর্শন শাখার সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন:—মানুষ তিন প্রকার দৃষ্টি লইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছে: (ক) বিজ্ঞানের দৃষ্টি; (খ) দর্শনের দৃষ্টি; (গ) আধ্যাত্মিক দৃষ্টি।

তা বটে! বিজ্ঞানের দৃষ্টি মাইক্রোস্কোপে, দর্শনের দৃষ্টি চশমায় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাল চোখে! মোটরকার-ব্যবসায়ীরাও ইহা হইতে শিক্ষা করিতে পারিবেন। তাঁহারা কেবল

দুইটি 'হেডলাইট'-সহযোগে গাড়ী চালাইয়া থাকেন, অতঃপর আর একটি হেডলাইটের ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা আকস্মিক দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও বাড়াইতে পারিবেন।

সহজিয়া

> বানান সমস্যা আলোচনা সভার সভাপতি ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলিতেছেন:—প্রাকৃত বানান যেমন উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল, সেরূপমত হইয়া বাঙ্গালা বানানও সেইরূপ হওয়া দরকার। ইহাতে পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালা শিখিয়াও এখন যে লোক বানান ভুল করে, সে দু'এক মাসে বানান শিখিতে পারিবে।

তাহা তো বুঝিলাম। কিন্তু এখন পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালা বানান ভুল করিয়াও বৎসরে প্রায় ত্রিশ হাজার মাট্রিকুলেট হইতেছে, দু'এক মাসে ঠিক বানান শিখিলে তখন এই সংখ্যা যে ত্রিশ লাখ দাঁড়াইবে! 'ডক্টরেট' পাইতে তখন তিন মাস লাগিবে।…সুতরাং?

সংবাদপত্রের প্রভাব

> সাংবাদিক সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন:—সংবাদপত্রের আদর্শ বজায় রাখিয়া সংবাদপত্র চালাইতে পারিলে, সমাজ ও জাতির প্রভাব আইনের ক্ষমতা অপেক্ষা কম নহে।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে বাঙ্গালার কোন পত্রিকা এ পর্য্যন্ত সে আদর্শ বজায় রাখিয়া চলেন নাই?

জীবনের পথে

অতুল ধন-সম্পদের মাঝে ডুবিয়া থাকিয়াও মানুষ অন্তর্নিহিত বেদনা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য মানুষের সুখের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু শান্তি ঐশ্বর্য্য দ্বারা মিলে না; সুখ ও শান্তি এক জিনিষ নহে। ধনৈশ্বর্য্য মানুষের বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে পারে বটে, কিন্তু যে ব্যথা, যে অশান্তির ধোঁয়া মনের ভিতর অহর্নিশি গুমরিয়া ফিরিতেছে, তাহা দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া যাঁহারা এ সংসারে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদেরও মনে যে বিষাদের ছায়াপাত হইতে পারে এ কথা সাধারণে ভাবে না। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্য-সম্পদে যে বঞ্চিত তাহার মনে শান্তি কোথায়? ভোরের শিশির-সিক্ত ফুটন্ত গোলাপের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে সংসারে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই সাসারই ত' নন্দন কানন। আর যে সংসারের সন্তানগণ নিত্যই অসুখে ভুগিতেছে, ম্লানমুখে দিবারাত্রি বিছানায় পড়িয়া আছে, সে সংসার বিষাদাগার বই আর কি!

কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি সাধারণ পরিবার সকলেরই মনে এই অশান্তি থাকিতে পারে, সাধারণ গৃহস্থ সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিলেন, বাড়ী আসিয়া সন্তানের অসুখ শুনিয়া হয়ত তাহার সমস্তই ডাক্তারের হাতে তুলিয়া দিয়া ঔষধের মূল্যের জন্ম ধার করিতে চলিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তান-সন্ততিদের সুখ-অসুখের উপর জনক-জননীর সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে। এই জন্য প্রত্যেক পিতামাতার উচিত যাহাতে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের ভিত্তি ছোট বেলা হইতেই দৃঢ় হয়, তাহার চেষ্টা করা। সামান্য সর্দ্দি-কাশি হইলে উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া।

শিশুরাই ভবিষ্যৎ পিতামাতা। সেই শিশুরাই যদি সারা বছর সর্দ্দি কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতিতে ভোগে, যদি তাহাদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন না নেওয়া হয়, তাহা হইলে শুধু তাহারাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেশও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কারণ দেশের শক্তির উৎস-ই ত শিশুরা, সুতরাং বালক-বালিকাদিগকে এই অসুস্থতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের সামান্য সর্দ্দি-কাশির ভাব দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের 'রচি' কোম্পানীর 'সিরোলিন' একটু একটু খাইতে দিতে হইবে। খাইতে সুস্বাদু বলিয়া শিশুরা ইহা নির্ব্বিবাদে খাইয়া থাকে। উপায় থাকিতে পিতা মাতা সাবধান হইবেন, অসুস্থ শিশুর পিতা মাতার নিকট দেশ ইহাই দাবী করিয়া থাকে। সর্দ্দি কাশি হইলে কিংবা হইবার পরে 'সিরোলিন' খাইলে আশু ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেন ও সতর্ক হন, তাহা হইলে সমাজের, সংসারের এবং দেশের কল্যাণ সাধন করা হইবে।

ডাঃ এন্, ব্যানার্জ্জী



"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ধান্যশ্রী

বৈশাখ—১৩৪৪

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

দেশের অগ্রগতি

দিল্লী সহরে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে "অল ইণ্ডিয়া কনভেনশন" নামক যে সভা হইয়া গিয়াছে, উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত ইন্দ্র।

তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "The Congress movement has made tremendous strides during the last eighteen years. At the start we proceeded slowly but as we marched on, our speed accelerated and it gained a momentum, which is very encouraging. The movement which at its commencement was confined only to the demand for few Government jobs has ultimately transformed into the demand for fundamental rights and taken the shape of fight." অর্থাৎ "গত আঠার বৎসরে কংগ্রেস-আন্দোলন খুব দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। প্রথমে ঐ আন্দোলন আস্তে আস্তে আরম্ভ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বেগ-সামর্থ্যও (momentum) উৎসাহজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে আন্দোলন প্রথমতঃ কেবলমাত্র কয়েকটি সরকারী চাকুরী পাইবার দাবী-দাওয়া লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল, সেই আন্দোলন অবশেষে জাতীয়-জীবনের মৌলিক অধিকার লাভ করিবার দাবীতে পরিণত হইয়াছে এবং উহা বর্ত্তমানে এক প্রকার যুদ্ধের প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছে।"

আমাদের মতে, গত আঠার বৎসরে কংগ্রেস-আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে উহার অগ্রগতির পরিচায়ক হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, গত আঠার বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস আন্দোলনের, অথবা কংগ্রেসের, অথবা দেশের কোন অগ্রগতি হওয়া ত' দূরের কথা, উহার প্রত্যেকটি পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের কথা অথবা পণ্ডিত ইন্দ্রের কথা ঠিক, তাহার বিচার করিতে গেলে, কি হইলে কংগ্রেস-আন্দোলনের, অথবা কংগ্রেসের, অথবা দেশের উন্নতি অথবা অবনতি ঘটিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। এই তিনটি বস্তুর, অর্থাৎ কংগ্রেস-আন্দোলনের, কংগ্রেসের এবং দেশের উন্নতি অথবা অবনতি ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেসকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস-আন্দোলন, অর্থাৎ কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে কংগ্রেসের উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, প্রথমতঃ তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। আন্দোলন যতই তীব্র হইতে তীব্রতর হউক না কেন, যদি দেখা যায় যে, উহার ফলে মুল কংগ্রেসের কোন উন্নতি না হইয়া তাহার অবনতি ঘটিতেছে, তাহা হইলে ঐ আন্দোলন যে অগ্রগতির সাধক অথবা অগ্রগতি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। মুল কংগ্রেসের কোন উন্নতি না দেখিতে পাইলে যেমন কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন উন্নতি হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না, সেইরূপ দেশের যে কোন উন্নতি হইতেছে, ইহা না দেখিতে পাইলে কংগ্রেসের যে কোন উন্নতি হইতেছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে না, কারণ দেশের জন্যই কংগ্রেস। দেশের কোন উন্নতি হইতেছে, ইহা না দেখিতে পাইলে যেমন কংগ্রেসের কোন উন্নতি হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ দেশবাসীর কোন উন্নতি হইয়াছে, অথবা উন্নতি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহা দেখিতে না পাইলে দেশের কোন উন্নতি হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ দেশবাসীর জন্যই দেশ।

এইরূপভাবে তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে দেশবাসীর কোনরূপ উন্নতি প্রকৃত পক্ষে হইয়াছে কি না, অথবা অদূরভবিষ্যতে কোনরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কি না, তাহার সন্ধান সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

গত আঠার বছরে দেশবাসীর কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে কি না, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এই আঠার বছরের মধ্যে দেশের অর্থাভাবগ্রস্ত, শারীরিক অসুস্থতায় জর্জ্জরিত এবং মানসিক অশান্তিতে দগ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথবা আর্থিক সচ্ছলতা-সম্পন্ন, শারীরিক স্বাস্থ্যবান্, মানসিক শান্তি-স্নিগ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে ভারতবর্ষে একদিন কোনরূপ চাকুরী অথবা দাসত্ব না করিয়াও মানুষ প্রায়শঃ তাহার আত্মীয়-স্বজন লইয়া বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতে পারিত, সেই ভারতবর্ষে যে চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গত আঠার বৎসরে যে ঐ চাকুরীপ্রার্থীদিগের মধ্যে অনেকে চাকুরীর সন্ধান করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই এই আঠার বছরে ভারতবর্ষে মানুষের অর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাওয়া ত' দূরের কথা, তৎপরিবর্ত্তে আর্থিক অভাবই যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

দেশবাসীর শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ভারতবর্ষে আঠার বৎসর আগে অল্প বয়সে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা যাহা ছিল, তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিকে যেরূপ রুগ্ন লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ আবার অকাল-বৃদ্ধের সংখ্যা এবং অকাল-মৃতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা হ্রাস পাইতেছে, তাহা নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়।

বিধিবদ্ধ ভাবে দেশবাসীর অবস্থার দিকে তাকাইলে প্রায় প্রত্যেকের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ নেতৃবর্গের কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের অবস্থায় যে আবার আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতির উদ্ভব হইবে, তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

আজকালকার দেশবরেণ্য নেতা ঐ মহাত্মা (?), ঐ পণ্ডিত (?), ঐ কবিসম্রাট (?) ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ সকলেই স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই স্বাধীনতার ভাবটি আমাদের ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভূত নহে, উহার আমদানী হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে। অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্য দেশেও আধুনিক স্বাধীনতার ভাব বেশী দিন উৎপন্ন হয় নাই। অক্সফোর্ড ডিক্‌সনারি অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে স্বাধীনতার ইংরাজী

প্রতিশব্দ Liberty, Independence, Freedom প্রভৃতি কোন শব্দ কোন ইংরাজী সাহিত্যে বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হইবার রীতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। ইউরোপের ইতিহাস তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের যে দেশে যত অন্নাভাব যখন হইতে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে সেই দেশে তত অধিক পরিমাণে ঐ স্বাধীনতার চীৎকার উত্থাপিত হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ শব্দটি অর্থশূন্য

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেমন তন্নিহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলন ব্যতীত সম্যক্ ভাবে বিকশিত হইতে পারে না, সেইরূপ তাহার সঙ্ঘবদ্ধ জীবনও সমগ্র মনুষ্যমাজের পরস্পরের মিলন ব্যতীত একক অবস্থায় সম্যক্ ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্নের ব্যবস্থা থাকিলে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। একদিন জগতে ঐ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং তখন কুত্রাপি স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই।

আধুনিক নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা শব্দটি যে বাস্তবভাবে অর্থশূন্য, তাহা না বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছেন। দেশবাসীর অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূর করিবার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে, ইহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বীকার করা যায় বটে, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা (Independence for the sake of Independence) যে কাম্য হইতে পারে না, তাহা সম্ভবতঃ কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, দেশবাসীর অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য ইংরাজকে তাড়াইয়া দেশের মধ্যে একটা তথাকথিত "স্বাধীনতা" অবশ্য-প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন্ কার্য্য-প্রণালী দ্বারা দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইতে পারে, ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইংরাজ এ দেশে সশরীরে তাহার কামান-বন্দুক এবং Ordinance প্রভৃতি লইয়া বিদ্যমান থাকিলেও দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, শারীরিক এবং মানসিক অশান্তি দূর করা সম্পূর্ণ সম্ভবযোগ্য।

দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব ও শিক্ষিত যুবকগণের বেকার অবস্থা প্রভৃতি দূর করিবার জন্য ইংরাজকে তাড়াইয়া তথাকথিত স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে বটে, কিন্তু তথাকথিত মহাত্মার মিথ্যাভাষণ, তথাকথিত পণ্ডিতের রাজনৈতিক মূর্খতা, তথাকথিত কবিসম্রাটের কবুতরের মত অর্থহীন কচ্‌কচানি এবং আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রেণীর সাংবাদিকের একদেশদর্শিতা ও চাটুকারিতা তিরোহিত হইয়া যাহাতে নেতৃবর্গ সম্যক্ ভাবে সত্যবাদী, দেশের অবস্থাভিজ্ঞ, ভাষাবিদ্, বিচারজ্ঞানসম্পন্ন ও নির্ভীক হইতে বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়

গান্ধীজী ও জওহরলালজী স্বরাজ ও স্বাধীনতার আন্দোলনের আবরণে নিজেদের স্বরূপ প্রায়শঃ লুক্কায়িত রাখিতে এতাবৎ সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের সম্মুখীন হইয়া, কি পরিকল্পনা দ্বারা দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ফাঁপা। বরং জওহরলালজীর কতকটা আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দের অবিচারিত মত্ততার ফলে গান্ধীজী চিরদিন প্রতারণা করিয়াও নেতৃত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং এখনও তাহাই চালাইতেছেন।

দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে এতখানি গোলমাল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়, তখন অদূরভবিষ্যতে জনসাধারণের কোন প্রকৃত সমস্যার সমাধান যে হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে আশা করা যায় না।

দেশবাসীর অবস্থায় যখন এতাদৃশ অবনতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন কংগ্রেস-আন্দোলন গত আঠার বছরে অগ্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

আমাদের মতে, মানুষ যখন বিপন্ন হয়, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং তখন গরলকে অমৃত ও অমৃতকে গরল মনে করিতে আরম্ভ করে। তাহারই জন্য খাঁটি ভারতবাসী না হইয়া, ভারতবাসিত্ব কি তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া, যাঁহারা ভাবতঃ সম্পূর্ণ বিদেশীয়, তাঁহারাও দেশ-প্রেমিকের নামার্জ্জন করিয়া দেশের উপর নেতৃত্ব করিতে সক্ষম হইতেছেন। তাঁহাদের আন্দোলন দেশের সর্ব্বনাশ সাধন

করিলেও দেশবাসী ঐ আন্দোলনকে হিতকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। গান্ধীজী যদি প্রকৃতপক্ষে দেশ-প্রেমিক হইতেন, জগদ্ব্যাপী নামার্জ্জন করা ছাড়া দেশের জনসাধারণের দুঃখের জন্য সমপ্রাণতা যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে দেশের কে কোথায় তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছে, কেনই বা তাহারা ঐ রূপ বিরোধিতা করিতেছে ইত্যাদি সংবাদ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার থাকিত। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ঐ জাতীয় কোন ব্যবস্থা তাঁহার নাই। ভারতবাসী আর কতদিন এই-রূপ ঘুমে ঘুমাইয়া থাকিবে?

ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের সাময়িক মূল নীতি

আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, গান্ধীজী ও জওহরলালজী প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রাণ এবং তাঁহাদের কৃত কার্য্যের ফলে ভারতবর্ষ উন্নতির রাস্তায় সমারূঢ় হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের মতে গান্ধীজীকে অথবা জওহরলালজীকে কোনরূপ দোষারোপ করা শুধু অসঙ্গত নহে, উহা পাপ। আমাদের মতে, গান্ধীজী অথবা জওহরলালজী দেশপ্রাণ অথবা দেশদ্রোহী, তাহা বলা কঠিন বটে, কিন্তু কি হইলে যে দেশের প্রকৃত হিত সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যে অপরিজ্ঞাত, ইহা নিঃসন্দেহ। আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের মত যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা গান্ধীজী ও জওহরলালজীর নেতৃত্বে দিল্লী নগরে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত কি না, এতৎসম্বন্ধে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি যে-সভা আহূত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

১৯৩৫ সালের আইন ও তদনুসারে নির্ব্বাচনের ফলে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এতাদৃশ অবস্থায় ভারতীয় তথাকথিত কংগ্রেস যদি এখনও সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসিগণের পক্ষে এখনও অদূরভবিষ্যতে তাহাদের সমস্যা-সমূহের সমাধান হওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু গান্ধীজীর অদূরদর্শিতা ও দাম্ভিকতার ফলে দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান হওয়া ত' দূরের কথা, ঐ সমস্যাসমূহ তীব্রতর রূপ ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের অভিমত।

আমরা ভ্রান্ত মতাবলম্বী, অথবা আমাদের বিরুদ্ধ-মতবাদিগণ ভ্রান্ত, ইহা স্থির করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি এবং তাহার সমাধান করিবার মূল সূত্র বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কি হওয়া উচিত, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি এবং তাহার পূরণের উপায় কি কি, এতদ্‌বিষয়ে আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগকে আমরা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভারতবর্ষের সমস্যা কি কি, তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে বসিলে হয় ত' অনেক বিষয় লইয়া অনেকের মত-পার্থক্যের উদ্ভব হইবে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যতই মত-পার্থক্য হউক না কেন, জনসাধারণের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি যে আমাদের সমস্যাসমূহের অন্যতম, তদ্বিষয়ে খুব সম্ভব কোন মত-পার্থক্য ঘটিবে না।

এই সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় কি কি, তদ্বিষয়ে সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, একদিকে যেরূপ ঐ সম্বন্ধে একটা গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার যে যে ব্যবস্থায় সমস্যা-সমূহের সমাধান সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই সব ব্যবস্থা যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য দেশবাসীর একটা বিশেষ রকমের একতারও প্রয়োজন আছে।

ভারতবাসী জনসাধারণের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে যে তৎসম্বন্ধে একটা শৃঙ্খলিত গবেষণার (research) প্রয়োজন আছে, ইহা গান্ধীজী-প্রমুখ নেতৃবর্গ স্বীকার করেন কি না, তাহা আমাদের জানা নাই বটে, কিন্তু ঐ সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে যে দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য সাধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তাঁহারা প্রকাশ্যতঃ স্বীকার করিয়া থাকেন।

ভারতবাসী জনসাধারণের সমস্যা কি কি এবং তাহার সমাধানের উপায়ই বা কি কি, এতৎসম্বন্ধে যে একটা শৃঙ্খলিত গবেষণার প্রয়োজন আছে, তাহা গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবর্গ স্বীকার করুন আর না-ই করুন—ঐ গবেষণার যে প্রয়ো-

জনীয়তা আছে, তাহা দেশের কথা একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখিলে অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রীতি অনুসারে, মানুষের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া থাকে অর্থনৈতিক-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয়-বিজ্ঞান ও আইন-প্রণয়ন বিজ্ঞানে (Economics, Politics, Political Economy and Jurisprudence); স্বাস্থ্য-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া থাকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শরীরবিধান-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়নে (Pathology, Therapeutics, Hygiene, Physiology, Physics and Chemistry)। মানুষের মানসিক শান্তিবিধানের উপায় সম্বন্ধে যে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের কি বিজ্ঞান অথবা শাস্ত্র আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। আমরা যতদূর জানি, পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের ঐ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানই নাই। তাঁহারা ফিলজফি, থিয়োলজি এবং সাইকলজি নামক তিনটি শাস্ত্র-প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ঐ তিনটি শাস্ত্রের মৌলিক ভাবুকগণ (original thinkers and not compilers) যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে মানুষের মানসিক শান্তি-বিধানের উপায় কি, তৎসম্বন্ধে কোন তথ্য নিহিত থাকা ত' দূরের কথা, উহার একখানিতেও মানুষের মন যে কি বস্তু এবং তাহা নিজ দেহাভ্যন্তরে কি উপায়ে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার কোন সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানি কতকগুলি অর্থহীন, অসংলগ্ন পদ ও বাক্যের সমষ্টি। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, যে-ভারত একদিন এই সম্বন্ধে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, সেই ভারতের মানুষগুলি পর্য্যন্ত এতাদৃশ অর্থহীন, অসংলগ্ন পদ ও বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত পাশ্চাত্ত্য তথাকথিত ফিলজফি, থিয়োলজি, সাইকলজির নিকট দাসত্ব করিতেছেন এবং পূর্ণভাবে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াও নানা রকম শ্রদ্ধাজনক উপাধিতে বিভূষিত হইতে পারিতেছেন।

কি করিয়া মানুষের আর্থিক সমস্যা, শারীরিক স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং মানসিক শান্তির সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা যদি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখায় লিপিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য ঐ সম্বন্ধে আমাদের কোন গবেষণার (research) প্রয়োজন হইত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্য ভূ-ভাগের প্রত্যেক দেশটি পর্য্যন্ত ঐ আর্থিক সমস্যায়, ঐ শারীরিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় এবং মানসিক শান্তির সমস্যায় আলোড়িত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই আর্থিক অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ রুগ্ন লোকের সংখ্যা এবং অশান্তিতে জর্জ্জরিত লোকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখাতেই যে উপরোক্ত তিনটি তথ্যের কোন তথ্য সম্বন্ধে কোন প্রয়োগ-যোগ্য সুফল-প্রদ সন্ধান পাওয়া যায় না এবং এই দেশে উহার গবেষণার প্রয়োজন আছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীর প্রকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে একদিকে যেরূপ ঐ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার ভারত-বাসীর মধ্যে ঐক্যসাধনেরও প্রয়োজন আছে এবং তাহা নেতৃবর্গ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন, অথচ তৎসম্বন্ধে কোন আয়োজনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, তখন স্বভাবতঃ নিম্ন-লিখিত দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে:—

(১) ভারতবাসিগণের মধ্যে যে ঐক্যসাধনার প্রয়োজন আছে, তাহা তাহাদের নেতৃবর্গের বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও ঐক্য সাধিত হওয়া ত' দূরের কথা, ক্রমশঃই অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে কেন?

(২) ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে যে তদ্বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে, এতৎসম্বন্ধে এতাদৃশ প্রবল যুক্তির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তদ্বিষয়ে নেতৃবর্গের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না কেন?

ভারতবাসীর ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নেতৃ-বর্গের বোধ থাকা সত্ত্বেও কেন ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের অনৈক্যের কারণ বহু। ঐ কারণ সব সময়ে এক রকমের থাকে না। উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। ঐ কারণসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমস্ত সময়েই কয়েকটি কারণ সাধারণ ভাবে বিদ্যমান থাকে। অনৈক্যের এই সাধারণ কারণ-

সমূহের (common causes) মধ্যে, "মানুষ হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, মানুষ ভারতবাসীই হউক, আর ইংরেজই হউক, আর জার্ম্মানই হউক, মানুষ যে সর্ব্বদা মানুষ, এতৎসম্বন্ধে শিক্ষা ও সাহিত্যের অভাব",—এই কারণটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সকল রকমের মানুষ যে মানুষ, এই শিক্ষা যদি ছাত্রগণ তাহার পিতা, মাতা ও শিক্ষকগণের নিকট হইতে পাইতে পারিত, তাহা হইলে, আমাদের মতে ভারতবাসীর মধ্যে এত অনৈক্য থাকিতে পারিত না।

অনৈক্যের এই সাধারণ কারণসমূহ (common causes) ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য বিভিন্ন কারণের উদ্ভব হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন (communal election) ও সাম্প্রদায়িক নিয়োগ (communal employment) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে যে, তদ্বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে, এতৎসম্বন্ধে এতাদৃশ প্রবল যুক্তির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তদ্বিষয়ে নেতৃবর্গের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না কেন, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদিগের অবিচারিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। এই অবিচারিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মূলে, তৎসম্বন্ধে ইয়োরোপীয়গণের প্রচার-নৈপুণ্য (propaganda) বিদ্যমান আছে। ইয়োরোপীয়গণের, তথা ইংরাজগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বাদ দিলে তাঁহারা লোক হিসাবে প্রায়শঃ সত্যবাদী ও পরিশ্রমী। কিন্তু তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অত্যন্ত নিন্দনীয়। লোক হিসাবে তাঁহারা প্রায়শঃ অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় সত্যবাদী ও পরিশ্রমী বলিয়া বর্ত্তমানে মনুষ্যসমাজের উপর তাঁহারা আধিপত্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্টতাবশতঃ এই আধিপত্য সত্ত্বেও আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইতেছেন।

ইউয়োরোপীয়, তথা ইংরাজগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে এতাদৃশ দুষ্ট, তাহা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তাহা বুঝিতে পারেন না।

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই যে অত্যন্ত দুষ্ট এবং ঐ দুষ্টতার জন্যই যে আধুনিক জগতের প্রত্যেক দেশের মনুষ্যসমাজকে আর্থিক অভাবে, শারীরিক অস্বাস্থ্যে এবং মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতে হইয়াছে, তাহা ইংরাজগণ প্রায়শঃ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই, আমাদের মধ্যে তাঁহাদের সংস্রবে যাঁহারা অধিক পরিমাণে আসিয়াছেন, তাঁহারাও উহা বুঝিতে পারেন না। ইহারই ফলে সমস্যাসমূহের গবেষণার (research) অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও ঐ সম্বন্ধে আমাদিগের নেতৃবর্গের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার জনসাধারণের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি দূর করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কি কি করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে উপরে যাহা বলা হইল, সংক্ষেপতঃ তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) দেশবাসীর মধ্যে যাহাতে কোন রকমের অনৈক্য বৃদ্ধি না পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা। অথচ ১৯৩৫ সালের নূতন আইন অনুসারে যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন (communal election) ও সাম্প্রদায়িক নিয়োগের (communal employment) প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ১৯৩৫ সালের নূতন আইনের কুফল যাহাতে সংঘটিত না হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে যে-সমস্ত পদের জন্য মুসলমানগণ প্রার্থী হইবেন, সেই সমস্ত পদের লালসা যাহাতে হিন্দুগণ পরিত্যাগ করেন এবং যে সমস্ত পদের জন্য হিন্দুগণ প্রার্থী হইবেন, সেই সমস্ত পদের লালসা যাহাতে মুসলমানগণ পরিত্যাগ করেন, তাহার চেষ্টা করা দেশপ্রেমিকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, মুসলমানগণ খুব সম্ভব উপরোক্ত সত্যটুকু সহজে বুঝিতে পারিবেন না। কাজেই হিন্দুদিগকে এতৎসম্বন্ধে আগুয়ান হইতে হইবে। ইংরাজ

রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে হিন্দুগণই প্রায়শঃ গভর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্য চাকুরীগুলি লাভ করিতে পারিয়াছেন। চাকুরী যতই বড় হউক—তাহার দ্বারা যদি কাহারও নিজের, অথবা সন্তান-সন্ততির দুঃখ সম্যক্ ভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অনেক হিন্দু পরিবারের দুঃখের অবসান হইত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লাটের ছেলে, জজের ছেলে, ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে প্রভৃতি বাহ্যতঃ অ্যারিষ্টোক্র্যাট দলের অনেক সভ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায়শঃ কেহই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যাঙ্কের, অথবা কোন না কোন বীমা-কোম্পানীর, অথবা তেলী ও তিলি প্রভৃতি মহাজনগণের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত নহেন। হিন্দুদিগকে এই সত্যগুলি কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে হইবে।

(২) কি করিয়া দেশের জনসাধারণের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি সম্যক্ ভাবে দূর করিতে হয়, তাহা যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে নাই, তাহা যে ইংরাজগণ জানেন না, তদুদ্দেশ্যে যেরূপ ভাবে গভর্ণমেণ্ট গঠিত ও পরিচালিত করিতে হয়, তাহার ক্ষমতা যে ইংরাজগণের নাই, তাহা যাহাতে ইংরাজগণ কার্য্যতঃ বুঝিতে পারেন ও স্বীকার করেন, তাহার ব্যবস্থা।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, উপরোক্ত দুইটি ব্যবস্থা কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে?

কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ নিজেরা যাহাতে কোন প্রদেশে কোন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া যাহাতে মুসলমানগণ প্রত্যেক প্রদেশে অধিকাংশ মন্ত্রিত্ব পাইতে পারেন এবং ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিগণকে ঐ মন্ত্রিত্বের ভাগ দিতে সম্মত হন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, উপরোক্ত দুইটি ব্যবস্থাই সাধিত হইতে পারিত।

তাহাতে একদিকে যেরূপ হিন্দুগণের পক্ষে মুসলমানগণের চক্ষে স্বার্থত্যাগী, বিশ্বাসভাজন হইয়া হিন্দু-মুসলমানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার মন্ত্রিত্বের ভার ইংরাজদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতে পারিলে তাঁহারা যে প্রজাবর্গের আর্থিক অভাব প্রভৃতি দূর করিবার কৌশল সুপরিজ্ঞাত নহেন এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা যে বৃথা আস্ফালন করিয়া থাকেন, ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারিত।

কংগ্রেসের পক্ষে উপরোক্ত নীতিতে একদিকে যেরূপ ভেদনীতি বিফল করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার ভারতবাসীর উপর ইংরাজের শিক্ষকতার অভিনয় যে সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহাও প্রমাণ করা যাইত। ঐ সঙ্গে যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ সমস্যা-সমাধানের গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে তৎসম্বন্ধে ফল লাভ করিয়া ইংরাজ ও মুসলমানের সহিত একযোগে ভারতবর্ষের জন-সাধারণের প্রকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব হইত।

কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাহা হইবার নহে। অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে যে, নেতৃত্ব ও যশ-অন্বেষী ঐ মহাত্মাজী (?) যদি তাঁহার নীতির পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে দেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আরও বৃদ্ধি পাইবে। আপাতদৃষ্টিতে জনসাধারণ কংগ্রেসের অনুরক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা যে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের পক্ষে ভোট প্রদান করিয়াছে, তাহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহাদের আর্থিক অভাব দূর করিবার প্রতিশ্রুতি-দানের ফলে সাধিত হইয়াছে। যদি জনসাধারণের আর্থিক অভাব দূর করা অনতিবিলম্বে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যে কংগ্রেসের পক্ষে ভবিষ্যতে জন-সাধারণের সম্মুখীন হইয়া দেশের কোন কার্য্য করা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইতে পারে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি?

গত আঠার বৎসর ধরিয়া দেশবাসী অনেককেই অনেক পুষ্পমাল্য ও অনেক রকমের উপাধি প্রদান করিয়াছে, কিন্তু দেশের অবস্থার ভীষণতা ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হওয়া ছাড়া বিন্দুমাত্রও যে অন্যরূপ হয় নাই, তাহা বাস্তব সত্য।

এখনও কি আমাদের সাবধান হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই?

প্রাদেশিক মন্ত্রি-নিয়োগের সূত্র

নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব শেষ হওয়া অবধি প্রত্যেক প্রদেশের লাট-সাহেবগণ মন্ত্রিমণ্ডল-গঠনব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশেই যে-দলের প্রতিনিধির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই দলের দলপতিকে ডাকিয়া লাটসাহেবগণ মন্ত্রিমণ্ডল-গঠন করিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে কে কে মন্ত্রী হইবেন, তৎসম্বন্ধে লাটসাহেবগণ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; লাটসাহেবগণের নির্লিপ্ততা কেবলমাত্র বাহ্যিক অথবা সম্পূর্ণভাবে আন্তরিক, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক কিছু বিচার করিতে হইবে। এই সংখ্যায় তাহা সম্ভব নহে। লাটসাহেবগণ মন্ত্রিমণ্ডল-গঠন ব্যাপারে লিপ্তই হউন, অথবা নির্লিপ্তই হউন, তাঁহারা যে এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দায়িত্বশূন্য নহেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অথচ এক একটি প্রদেশে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম মন্ত্রিত্বের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে ভবিষ্যতে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হওয়া ত' দূরের কথা, ঐ ঐ প্রদেশের রাজ-কর্ম্ম-চারীদিগের মধ্যে বিভিন্ন রকমের উৎকোচের আদান-প্রদান, পক্ষপাতিত্ব এবং নৈতিক অবনতি যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

কাহাকেও মন্ত্রিত্ব-পদে নিযুক্ত করিতে হইলে তাঁহার কি কি গুণ থাকা এবং কোন্ কোন্ দোষ না থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ জনসাধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রীদিগের কি কি দায়িত্ব, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। যে যে ব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ও রক্ষা করা যে মন্ত্রিগণের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদিত করিতে হইলে যে, মন্ত্রীদিগের নিম্নলিখিত বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হইতে হয়, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে:—

(১) কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় দেশের অর্থাভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতা;

(২) কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় দেশের অস্বাস্থ্য দূরীভূত হইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতা;

(৩) কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় দেশের অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতা;

এই তিনটি বিষয়ে মন্ত্রিত্বের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট হইতে হইলে যে অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, আইনপ্রণয়ন-নীতি, স্বাস্থ্যনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্য্যতঃ জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহাও বুঝিয়া উঠা খুব কষ্টসাধ্য নহে। কোন মানুষ কোন নীতি অথবা কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্য্যতঃ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার উপায়

যে কার্য্যে উপরোক্ত নীতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োগ আছে, তাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কোন ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে যেমন ঐ ব্যক্তির ঐ বিষয়ক জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য পরিমাণে আছে কি না, তাহা বুঝা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত নীতি ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কোন যুক্তি-পরিপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না, তাহার সন্ধান করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার উপযুক্ততার পরীক্ষা সাধিত হইতে পারে।

এইরূপ ভাবে জনসাধারণের হিতকর মন্ত্রী হইতে হইলে কোন্ কোন্ গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যেমন দেখা যাইবে যে, একাধারে অর্থনীতি, বাণিজ্য-নীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, আইনপ্রণয়ন-নীতি, স্বাস্থ্যনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্য্যতঃ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত মন্ত্রী হওয়া সম্ভব নহে, সেইরূপ আবার যিনি কাম, ক্রোধ এবং লোভ যথোপযুক্ত পরিমাণে সংযত করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহার পক্ষেও মন্ত্রী হইয়া জনসাধারণের প্রকৃত হিত সাধন করা সম্ভব হয় না। কারণ, তাঁহার কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার প্রবেশ করা অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক জগতে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শিক্ষার দ্বারা মানুষের পক্ষে প্রায়শঃ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ এবং লোভের কোনটি সম্পূর্ণ ভাবে সংযত করা সম্ভব হয় না। প্রচলিত শিক্ষা-বিধির বর্ত্তমান অবস্থায় উহার কোনটি জীবনের

শেষ দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে সংযত করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক মানুষের পক্ষে উহা সংযত করা যতখানি সম্ভব হয়, পঞ্চাশ বৎসরের কমবয়স্ক মানুষের পক্ষে ততখানি সম্ভব কিছুতেই হইতে পারে না।

সেইরূপ আবার যে মানুষ উপার্জ্জনের জন্য চাকুরী ও বাণিজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে সংযমের সহিত আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন, সেই মানুষের পক্ষে যাদৃশভাবে লোভ সংযত করা সম্ভব হইতে পারে, চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি উপার্জ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাদৃশভাবে লোভ সংযত করা কখনও সম্ভব হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন মানুষকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, ঐ মানুষটি পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক কি না, দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, তিনি ঋণমুক্ত কি না, তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীলোকঘটিত অভিযোগ আছে কি না, চতুর্থতঃ দেখিতে হইবে যে, তিনি প্রতিহিংসা-পরিশোধের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন কি না, পঞ্চমতঃ দেখিতে হইবে যে, চাকুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উপার্জ্জনলোলুপতা তাঁহার আছে কি না এবং ষষ্ঠতঃ দেখিতে হইবে যে, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, আইনপ্রণয়ননীতি, স্বাস্থ্যনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্য্যতঃ জ্ঞান তিনি লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না।

ঐ সমস্ত গুণ আছে কি না, তাহার পরীক্ষা না করিয়া অথবা উহার একটির অভাব সত্ত্বেও যদি কাহাকেও মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা যে অনাচারের সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালায় যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের সুযোগ্য গভর্ণর স্যর জন অ্যাণ্ডারসন যে তাঁহার এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য কোনরূপ সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করিবার প্রযত্ন করিতেছেন, ইহা মনে করা যায় না।

এতদ্বিষয়ক দায়িত্ব যথাযথভাবে নির্ব্বাহ করিবার কোন প্রবৃত্তি যদি বাঙ্গলার লাটসাহেবের থাকিত, তাহা হইলে যিনি একাধিকবার স্ত্রীলোকঘটিত মামলায় জড়িত হইয়াছেন, যাঁহার চরিত্রের প্রতি বিচারক পর্য্যন্ত কটাক্ষ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যিনি এখনও নানা রকম ভাবে উপার্জ্জনের জন্য লোলুপ হইয়া থাকেন, সেই নলিনীরঞ্জনকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহ্বান করা হইত না। আমাদের মতে একাধিক কারণে নলিনীরঞ্জন বাঙ্গালার অ্যাসেম্ব্লির সভ্য হইবার উপযোগী বটে, কিন্তু তাঁহাকে মন্ত্রিপদে বরণ করায় সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে অপমানিত করা হয় নাই কি?

হইতে পারে যে, নলিনীরঞ্জনকে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত না করিলে বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলকে স্থায়ী (stable) করা কষ্টসাধ্য হইত। কিন্তু যাঁহার অতীত কার্য্যাবলী এতাদৃশ ভাবে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের সমালোচনার যোগ্য, তাঁহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলকে স্থায়ী করা অপেক্ষা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা ব্রিটিশ শাসনের বিধানোচিত কি না, তাহা আমরা স্যর জনকে এখনও ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শুধু বাঙ্গালার কেন, প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে জনসাধারণের হিতকর মন্ত্রী হইবার আশা করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সূত্র রচিত না করিয়া এবং তদ্বিষয়ে কোন দৃষ্টিপাত না করিয়া কাহাকে নিয়োগ করিলে মন্ত্রিসভা স্থায়ী হইতে পারে, কেবলমাত্র তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রিসভার গঠন সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে যে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণমেণ্টে নানা রকমের অনাচার বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে আমাদের বৃটিশ গভর্ণরগণ এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের গুণপণার দিকে কটাক্ষ করিয়া শিক্ষিত সমাজকে কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন বটে, কিন্তু বুভুক্ষু ও অবিচার-ক্লান্ত জনসমাজ মত্ত হইয়া উঠিলে যে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

হইতে পারে, উপরোক্ত সূত্রানুসারে সম্পূর্ণ উপযুক্ত লোক ভারতবাসিগণের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া নলিনীরঞ্জন সরকার-শ্রেণীর যে সকল লোক মন্ত্রিত্বের জন্য বৃত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত লোক যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে পাওয়া যায় না, ইহা বলা চলে না। যদি উপযুক্ত লোক একান্তই না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে হইবে, এমন কোন ধারা ১৯৩৫ সালের অ্যাক্টে আছে কি? দেশবাসিগণকে বুঝাইয়া প্রাদেশিক

গভর্ণরগণের পক্ষে জনসাধারণের সর্ব্বনাশের দরজা উন্মুক্ত না করিয়া আর কিছু করা সম্ভব নহে কি?

নলিনীরঞ্জন বাবুর শ্রেণীর লোকগণের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রিত্বের জন্য বৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এতাদৃশ সময়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ে আমরা তাঁহাদিগকেও চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভাগ্যদোষেই হউক অথবা কর্ম্মদোষেই হউক, তাঁহারা দেশের শিক্ষিত-সাধারণ অনেকেরই সমালোচনাযোগ্য ও ঘৃণার্হ। নানা রকম কৌশলের দ্বারা কোন কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রিয় পাত্র হওয়া সকল সময়েই সম্ভবযোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু এতাদৃশ সময়ে শিক্ষিত-সাধারণের সমপ্রাণতা না পাইলে জনসাধারণের হিতকর কার্য্য করিয়া উঠা সম্ভব হইবে কি না, তাহা আমরা তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কৃষকের দুর্দ্দশা ও মিঃ ফজলুল হক

মিঃ ফজলুল হক প্রজাপার্টির নেতারূপে বাঙ্গালার আইন-সভায় (Bengal Legislative Assembly) প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। কৃষকের দুর্দ্দশামোচন তাঁহার দলের নির্ব্বাচন ইস্তাহারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। সুখের বিষয় যে, মিঃ হক বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াও ঐ প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন নাই। গত ২৯শে মার্চ্চ সোমবারে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক ভোজনালয়ে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, কৃষকের দুর্দ্দশা মোচন করিবার আশা মিঃ হক এখনও পোষণ করেন।

"কৃষকের দুর্দ্দশা মোচন করিব," অথবা "কৃষকের দুর্দ্দশা দুর হইয়া গিয়াছে," এবংবিধ কথা কাহারও মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেই যদি বাস্তবিকপক্ষে কৃষকের দুর্দ্দশা দুর হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সকলেরই উৎফুল্ল হইবার কারণ বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় বাঙ্গালার কৃষককুলের দুর্দ্দশা, অথবা বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বেকার-অবস্থা বাস্তবিক পক্ষে দুরীভুত হইতে পারে, তাহা মিঃ হকের অথবা বাঙ্গালার যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ভার আর যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও জানা নাই। যদি তাঁহাদের ইহা জানা থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে শুধু হিন্দু ও মুসলমানগণের নাম ছাড়া ইংরাজগণের নামও দেখা যাইত। আমাদের মতে, মিঃ হক ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের মন্ত্রিত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, সমগ্র কৃষককুলের দুর্দ্দশা ও বেকার যুবকবৃন্দের সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি। বাঙ্গালার কৃষককুলের দুর্দ্দশা ও বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালাময় চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, শঠতা, অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

আমাদের মতে, বাঙ্গালার কৃষককুলের দুর্দ্দশার ফলে শুধু যে সমগ্র বাঙ্গালায় চুরি, ডাকাতি ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে অথবা সমগ্র জগতে অরাজকতা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। অনেকে মনে করেন যে, অদূরভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে এবং ঐ যুদ্ধের ফলে ভারতবাসীর পক্ষে একটা কিছু মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। আমাদের মতে অদূরভবিষ্যতে ঐরূপ কোন আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ঘটিয়া উঠার সম্ভাবনা খুবই কম এবং ঐজাতীয় কোন আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ঘটিলে ভারতবাসীর কোনরূপ মঙ্গল হওয়া তো দূরের কথা, ভারতবর্ষে অরাজকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে মানবজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বজায় রাখা ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা বলিতে চাই যে, মিঃ হক অথবা তাঁহার সহকর্ম্মিগণের মধ্যে কাহারও যদি সময়োচিত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা অর্থ-নৈতিক কার্য্যক্ষমতা (efficiency) থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে শুধু বাঙ্গালার কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মত সমগ্র ভারতবর্ষের এবং সমগ্র জগতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ঐ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অথবা অর্থ-নৈতিক কার্য্যক্ষমতা নাই বলিয়া তাঁহাদের মন্ত্রিত্বে কাহারও কোন সমস্যার সমাধান হওয়ার আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে। আমাদের কথা যে সত্য, অদূরভবিষ্যৎ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

মিঃ হক এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণের কাহারও যে

সময়োচিত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অথবা অর্থ-নৈতিক কার্য্যক্ষমতা নাই, ইহা আমরা কি দেখিয়া বলিতেছি তাহা বুঝিতে হইলে, যিনি সর্ব্বদা মঙ্গলময়, দয়ালু, সেই ভগবানের রাজ্যে কেন মানুষের অন্নাভাব, অস্বাস্থ্য ও অশান্তির উদ্ভব হয় এবং কেনই বা ঐ অন্নাভাবাদি বর্ত্তমান জগতে মনুষ্য-সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে।

যিনি সর্ব্বদা মঙ্গলময়, কাহারও অমঙ্গল যে তাঁহার অভীষ্ট হইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। জীবের অমঙ্গলই যদি স্রষ্টার ঈপ্সিত হইত, তাহা হইলে যে জীবসমাজে প্রতি যুগে প্রতিনিয়ত মড়ক লাগিয়া থাকিত এবং তাহা হইলে যে তাঁহার নাম মঙ্গলময় না হইয়া "অমঙ্গলময়" হইত, এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। অথচ যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যসমাজের অনেকেই অন্নাভাবে অথবা স্বাস্থ্যাভাবে অথবা মানসিক শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত হইতেছেন, তখন স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অমঙ্গলই যদি মঙ্গলময়ের অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যে মানুষের এতাদৃশ নানা রকমের অভাবের বিদ্যমানতা কেন?

কেন যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে এত অমঙ্গলের ছড়াছড়ি, ইহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার এক মাত্র কারণ মানুষের মূর্খতা ও অক্ষমতা। যাঁহারা নিজেরা বাস্তবিক পক্ষে নিজদিগকে সম্পূর্ণভাবে দর্শন করিয়া দার্শনিক হইতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে, মানুষের শরীরাভ্যন্তরে যেরূপ ভগবানের কার্য্য আছে, সেইরূপ আবার মানুষের নিজের কার্য্যও বিদ্যমান আছে। যিনি তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে কতটুকু তাঁহার নিজের কার্য্য এবং কতটুকু ভগবানের কার্য্য, তাহা অভ্রান্তভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কি করিলে মানুষের স্ব স্ব অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, অর্থাৎ তাঁহার কর্ত্তব্য অথবা ধর্ম্ম কি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইতে পারে।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত দার্শনিক অথবা প্রকৃত ধার্ম্মিক বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্যসমাজে কাহারও কোনরূপ অর্থাভাব প্রভৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। আর যখন এই প্রকৃত দার্শনিক এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকের অভাব হয়, তখনই মানুষের অর্থাভাব প্রভৃতিও দেখা দেয় এবং যতই ঐ প্রকৃত দার্শনিকতা ও ধার্ম্মিকতার অভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই মানুষের অর্থাভাব প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে কখনও মানুষের অবস্থায় উপরোক্ত ভাবে আর্থিক অভাব, অথবা স্বাস্থ্যাভাব, অথবা শান্তির অভাবের পরিশূন্যতা বিদ্যমান ছিল কি না, সর্ব্বাগ্রে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বর্ত্তমানে লিখিত ইতিহাস যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে মনুষ্যসমাজে যে এইরূপ অভাবের পরিশূন্যতা কোন দিন বিদ্যমান ছিল, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। লিখিত ইতিহাসে উহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু লিখিত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে মাত্র গ্রীকগণের অভ্যুদয়-কাল অথবা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে। এই সময়ের দৈর্ঘ্য মাত্র আড়াই হাজার বৎসর। এই আড়াই হাজার বৎসরের যে ইতিহাস আছে, তাহাতেও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইতে পারে নাই এবং তাহাও কার্য্যকারণের যুক্তিসঙ্গত শৃঙ্খলাযুক্ত নহে।

মহেঞ্জোদারো এবং আফ্রিকার স্থানে স্থানে ভূগর্ভে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে বর্ত্তমান আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও যে জগতে মানুষ বিদ্যমান ছিল এবং লিখিত ইতিহাসের স্থানে স্থানে যদিও সেই কালটিকে প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বর যুগ বলা হইয়াছে, তথাপি সেই যুগেও যে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার উপর ঐ যুগে যে-সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, সেই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বেদ, বেদাঙ্গ, বাইবেল, কোরান, উপনিষদ্, মীমাংসা, দর্শন, এবং পুরাণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলে বর্ত্তমানে যে যুগটিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই যুগ যে পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্রান্ত পরিপূর্ণতায় ভরপুর ছিল, তাহা কোন যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তখনকার মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা এক, প্রকৃত বুদ্ধিমান্ মানুষের মধ্যে কোন মতপার্থক্য থাকিতে পারে না। যতই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে, ততই মানুষের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখনকার মানুষ ঐ আসল সত্যটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের একাধিক স্থানে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন,
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।

এবংবিধ কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তখন মানুষের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের অথবা শাখা-প্রশাখার উদ্ভব পর্য্যন্ত হয় নাই। কারণ, তখন বুদ্ধদেব, অথবা খ্রীষ্টদেব, অথবা নবী মহম্মদের জন্ম পর্য্যন্ত ঘটে নাই। সমগ্র জগতের মানুষের মধ্যে তখন একটি মাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল এবং সেই ধর্ম্মের নাম ছিল "মানবধর্ম্ম"। অথর্ব্ববেদ, মনুসংহিতা, বাইবেল এবং কোরাণ আমাদিগের এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। অথর্ব্ববেদ ও মনুসংহিতায় যে ধর্ম্মের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই ধর্ম্মের নাম যে "মানবধর্ম্ম", তাহা "অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন", যে-কোন মানুষের চক্ষে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। বাইবেল ও কোরাণে যে যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তাহার একটির নাম খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এবং অপরটির নাম মুসলমান ধর্ম্ম। এখনও যদি কেহ প্রাচীন হিব্রুভাষা ও প্রাচীন আরবী ভাষা যথাযথভাবে স্ফোট-বাদ অভ্যাস করিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, মানব, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান এই তিনটি শব্দ একার্থক, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম বলিতেও "মানবধর্ম্ম"ই বুঝিতে হয়।

উপরোক্ত ভাবে ইতিহাস পড়িতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যদিও আজকালকার ঐতিহাসিকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বর্ব্বরতায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই যুগে মানুষ সমগ্র মানবজাতিকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল, তখন পিতা ও পুত্রে, পিতা ও কন্যায়, মাতা ও পুত্রে, মাতা ও কন্যায়, ভ্রাতায় ও ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ও ভগ্নীতে, ভগ্নী ও ভগ্নীতে এবং স্বামী ও স্ত্রীতে যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র মানবসমাজের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিদ্যমানতা দেখা যাইত এবং এখন যেমন বৈধ ও অবৈধভাবে প্রায় সমগ্র মানুষ জাতি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পশুবৎ যৌন সম্বন্ধই অধিকতর বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন ঐ সম্বন্ধ অন্যথা বিদ্যমান ছিল। তখন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যেমন স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, সেইরূপ আবার মাতা ও পিতা, ভগ্নী ও ভ্রাতা এবং পিতা ও দুহিতার সম্বন্ধও বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক সম্বন্ধটিই অত্যন্ত মধুর ছিল বলিয়া, কামের পশুত্ব তিরোহিত হইয়াছিল এবং মনুষ্যসমাজে সম্যক্ স্নিগ্ধতার বায়ু প্রবাহিত হইতে পারিয়াছিল।

জমীর বিজ্ঞানের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কেন জমী উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর হয়, তাহা মানুষ তখনকার দিনে বুঝিতে পারিত এবং কি করিয়া কেবলমাত্র আকাশের উপর নির্ভর না করিয়া ব্যয়সঙ্কুল কোনরূপ কৃত্রিম সার, অথবা কৃত্রিম খাল ও নালার ব্যবহার না করিয়া কিরূপে স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীগুলিকে জমীর উর্ব্বরতা, পানীয় জলাশয়ের বিশুদ্ধতা এবং সেবনীয় হাওয়ার স্নিগ্ধতার জন্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তখনকার দিনের তথাকথিত বর্ব্বর (?) মানুষেও সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল।

উপরোক্ত ভাবে ইতিহাস পড়িতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র মানবসমাজে এমন একদিন বিদ্যমান ছিল, যখন মানুষ বেদ, বাইবেল, কোরাণকে কোন ভাষান্তরিত না করিয়া, কোন অর্থপুস্তকের সাহায্য না লইয়া যথাযথভাবে বুঝিতে পারিত। তখন মনুষ্যসমাজে সর্ব্বত্র অর্থের স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্যের পূর্ণতা, মানসিক শান্তির স্নিগ্ধতা সম্যক্‌ভাবে বিদ্যমান ছিল।

ঐ স্বচ্ছলতা, ঐ পূর্ণতা, ঐ স্নিগ্ধতা কেন মনুষ্যসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইল, কেন আজ ভাইএ ভাইএ এত শঠতার, কনিষ্ঠের উপর জ্যেষ্ঠের, পিতার উপর পুত্রের এত নির্ম্মমতার, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের এত পশু-স্বভাবোচিত কামুকতার উদ্ভব হইল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, উহার মূল কারণ প্রধানতঃ দুইটি, যথা :—

(১) কালের স্বভাব (Nature of Time) ;

(২) মানুষের অজ্ঞতা ও দাম্ভিকত (Ignorance and Vanity of man).

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যে দূরত্ব, প্রধানতঃ তাহা লইয়াই কালের (Time) উদ্ভব হইয়া থাকে। এই দূরত্ব প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কখনও পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, আবার কখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান যখন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তখন যত সহজে স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীগুলিকে মানুষের কার্য্যে লাগাইয়া জমীর উর্ব্বরতা, জলাশয়ের বিশুদ্ধতা এবং সেবনীয় বায়ুর স্নিগ্ধতা, অথবা অর্থের স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্যের পূর্ণতা এবং মানসিক শান্তির অকৃত্রিমতা সাধন করা সম্ভব হয়, পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলে, উহা তত সহজে ও তত সম্যক্ ভাবে সাধন করা সম্ভব হয় না।

বার হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা তৎপরবর্ত্তী বার হাজার বৎসরে অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীগুলিকে মানুষের কার্য্যে না লাগাইয়া, জমীর উর্ব্বরাশক্তি, জলাশয়ের বিশুদ্ধতা এবং সেবনীয় বায়ুর স্নিগ্ধতা বজায় রাখা অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপ একদিকে যেরূপ কালের প্রভাবে জমীর উর্ব্বরাশক্তি, জলাশয়ের বিশুদ্ধতা এবং সেবনীয় বায়ুর স্নিগ্ধতা বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, সেইরূপ আবার মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিবার প্রবৃত্তিও ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এইরূপে বার হাজার বৎসর আগে জগতের যে মনুষ্যসমাজে একদিন জমীর উর্ব্বরাশক্তি, জলাশয়ের বিশুদ্ধতা, সেবনীয় বায়ুর স্নিগ্ধতা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অর্থের স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্যের পূর্ণতা, মানসিক শান্তির অকৃত্রিমতা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল, সেই মনুষ্যসমাজ হইতে তৎপরবর্ত্তী বার হাজার বৎসরে উহার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা তখনই আবার শঙ্কাপ্রদ হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইলেও, তখনও পূর্ব্ববর্ত্তী সংগঠন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ঐ সংগঠন তখনও কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনুষ্য সমাজের অবস্থা তখনই আবার শঙ্কাপ্রদ হইতে আরম্ভ করিলেও সমাজের অস্তিত্ব তখনও আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং উহা তখনও টলটলায়মান হয় নাই।

বার হাজার বৎসর আগে মনুষ্য সমাজে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যমান ছিল, মানুষ যদি চেষ্টা করিয়া বেদ, বাইবেল ও কোরানের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্যক্ ভাবে বজায় রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তৎপরে পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইলেও অর্থাৎ কাল (Time) বিরুদ্ধভাব ধারণ করিলেও মনুষ্যসমাজে এত অর্থ, স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তির অভাব দেখা দিতে পারিত না।

এইরূপভাবে মানুষের বাস্তব জীবন ও বাস্তব ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কুত্রাপি সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তা কাহারও অমঙ্গলবিধায়ক নহেন এবং তথাপি যে মানুষ অমঙ্গল ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রধান কারণ, তাহার স্বীয় অজ্ঞানতা ও মূর্খতা।

বর্ত্তমানসময়কার মানুষের মধ্যে অনেকেই ঐ উপরোক্ত সত্যটুকু বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ সর্ব্বমঙ্গলময়ের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়া পাকেন। কার্য্য থাকিলে কারক, অথবা কর্ত্তা প্রভৃতির বিদ্যমানতা যে অবশ্যম্ভাবী, এই সত্যটুকু বুঝিতে পারিলে সর্ব্বমঙ্গলময়ের অস্তিত্ব কোন রূপে অস্বীকার করা যায় কি? কার্য্য থাকিলে কারক, অথবা কর্ত্তা প্রভৃতির বিদ্যমানতা যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা বুঝা কোন সুপথগামী মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও কষ্টসাধ্য হইতে পারে কি?

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান কালে যাঁহারা সভ্যতার গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত, তাঁহারা প্রায়শঃ অত্যন্ত মূর্খ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা যে অত্যন্ত মূর্খ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

ইহারই জন্য আমরা মিঃ হক, অথবা তাঁহার সহকর্ম্মিগণের নিকট হইতে প্রজাবর্গের অমঙ্গল ছাড়া কোন প্রকৃত মঙ্গলকর কার্য্য আশা করিতে পারি না।

কি হইলে কৃষকের দুর্দ্দশা মোচন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে হইলে, যখন মানবজাতি সম্পূর্ণভাবে দুর্দ্দশামুক্ত ছিল, তখন কি ব্যবস্থা মানবজাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তৎসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যসমাজের দুর্দ্দশা মোচন করিবার ব্যবস্থা প্রধানতঃ তিনটি :—

(১) স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীকে কি উপায়ে জমীর উর্ব্বরাশক্তি, জলের বিশুদ্ধতা এবং বায়ুর স্নিগ্ধতা-বৃদ্ধির কার্য্যে লাগাইতে হয়, তাহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার ব্যবস্থা।

(২) যে উপায়ে স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীকে জমীর উর্ব্বরাশক্তি, জলের বিশুদ্ধতা এবং বায়ুর স্নিগ্ধতা-বৃদ্ধির কার্য্যে লাগান সম্ভব হইতে পারে, দেশের মধ্যে তদনুযায়ী সংগঠন।

(৩) যাহাতে কোন রকমে কোন মানুষের অর্থাভাব, অথবা অস্বাস্থ্যের অথবা অশান্তির বিন্দুমাত্রও উদ্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা।

উপরোক্ত তিনটি উপায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে দুইটি বিধি এবং একটি নিষেধ।

মানুষ যখন বিধিসমূহকে পালন করিতে এবং নিষেধ-সমূহকে বর্জ্জন করিতে থাকে, তখন মানুষের যেমন দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়, সেইরূপ আবার মানুষ যখন বিধিসমূহকে বর্জ্জন করিয়া নিষেধসমূহকে পালন করিতে থাকে, তখন মানুষের পক্ষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ-সভ্যতা-পরিচালিত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে মানুষ ক্রমশঃ বিজ্ঞানের নামে বিধিসমূহ পালন করিবার রীতি বিসর্জ্জন করিয়া নিষেধসমূহ পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্র মানুষের মধ্যে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেন মানুষের এতাদৃশ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহার কারণের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশগণ স্বভাবতঃ পরিশ্রমী ও সত্যবাদী বটে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অত্যন্ত দুষ্ট এবং তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে দুষ্ট, তাহা তাঁহারা প্রায়শঃ বুঝিতে পারেন না।

কাযেই এতাদৃশ অবস্থায় কৃষকের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য কোন প্রকৃত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে ইংরেজগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাগুলি যে অত্যন্ত দুষ্ট, তাহার ফলে সুশাসনের নামে যে অনেক স্থলেই কুশাসন চলিতেছে এবং যাঁহারা শাসক না হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সমাজের মঙ্গলের জন্য কঠোর শাস্তি পাইবার উপযোগী, তাঁহারা পর্য্যন্ত যে শাসক হইতে পারিতেছেন, ইহা ইংরাজগণ যাহাতে বুঝিতে পারেন এবং স্বীকার করিতে সম্মত হন, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

এতাদৃশ সময়ে কৃষকের দুর্দ্দশা যাহাতে ঘুচিতে পারে, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কি করিয়া স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীগুলিকে জমীর উর্ব্বরাশক্তি, জলের বিশুদ্ধতা ও বায়ুর স্নিগ্ধতা-বৃদ্ধির কার্য্যে লাগাইতে হয়, তাহার জন্য গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-প্রতিনিধিগণকে মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কৃষকের দুর্দ্দশামোচনোপযোগী ব্যবস্থার যাচ্ঞা করিতে এবং তাঁহারা যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলিবেন, ঐ সমস্ত ব্যবস্থার দুষ্টতা কোথায়, তাহা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের অ্যাক্ট পর্য্যালোচনা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের শুভাশুভের কর্ত্তৃত্ব যেমন এক হিসাবে প্রজাসাধারণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেইরূপ আবার উহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্তে এবং মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তেও ন্যস্ত হইয়াছে।

কৃষকগণ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও পক্ষে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রকৃত হিতকর কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইতে পারে না। কাজেই একদিকে যেরূপ উপযুক্ত গভর্ণরের ও মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যকাল যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার যে গভর্ণর ও মন্ত্রিমণ্ডল অনুপযুক্ত বলিয়া সন্দেহজনক হইবেন, সেই

গভর্ণর ও মন্ত্রিমণ্ডল যাহাতে পাঁচ বৎসরও কার্য্য না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ সময়ে কৃষকের হিত সাধন করিতে হইলে—প্রথমতঃ, ইংরেজ প্রতিনিধিগণ যাহাতে মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে পারেন;

দ্বিতীয়তঃ, সন্দেহজনক-চরিত্রের কেহ যাহাতে মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে না পারেন—অথবা বরখাস্ত হন;

তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান গবর্ণরের কার্য্যকাল যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায়;

চতুর্থতঃ, যাহাতে জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্যের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা স্থগিত হইয়া যাহাতে মৌলিকভাবে কৃষি সম্বন্ধে একটা গবেষণা আরম্ভ হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া সাময়িকভাবে কৃষক যাহাতে ঋণভার হইতে মুক্ত হইতে পারে, অথবা উত্তমর্ণদিগকে যাহাতে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, যাহাতে কৃষকগণের কোনরূপ অন্নকষ্ট না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

যথাযথভাবে ভাবিয়া দেখিলে অথবা কোরাণ, অথবা বেদ, অথবা বাইবেল যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কৃষকগণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার পন্থা একাধিক নহে এবং যে পন্থার কথা আমাদের বঙ্গশ্রী এতাবৎ বলিয়া আসিতেছে উহাই একমাত্র পন্থা।

মিঃ হক অথবা তাঁহার শ্রেণীর পণ্ডিতগণ হয়ত আমাদের কথার সার্থকতা এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ভবিষ্যৎ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আমরা এখনও সাবধান হইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

কংগ্রেসের আপোষ ও সংগঠন-পরিকল্পনা

বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের অ্যাসেম্ব্লিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সংখ্যা মোট প্রতিনিধি-সংখ্যার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও বেশী হওয়ায়, ঐ কয়েকটি প্রদেশে গভর্ণরগণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ আহ্বানের উত্তরে, যাহাতে গভর্ণরগণ তাঁহাদের অত্যধিক ক্ষমতা ব্যবহার না করেন, তাহার প্রতিশ্রুতি যে প্রাদেশিক নেতৃবর্গ দাবী করিয়াছিলেন, গভর্ণরগণ যে ঐ প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকার করেন নাই এবং তাহার ফলে যে কোন প্রদেশেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা হয় নাই, এই সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

আমাদের মতে কংগ্রেসের পক্ষে একদিকে যেরূপ কোন প্রদেশেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা যুক্তিসঙ্গত নহে, সেইরূপ আবার তাহার ধ্বংসনীতিও প্রশংসনীয় নহে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে যেরূপ হাওয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশ যাহাতে উন্নতির রাস্তায় পরিচালিত হয়, দেশবাসী জনসাধারণেরও প্রত্যেকের যাহাতে অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূরীভূত হয়, তাহা করিতে হইলে এতাদৃশ অবস্থায় কংগ্রেসের নিম্নলিখিত তিনটি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য:—

(১) কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের নিজেরা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন না করিয়া যে কেহ মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবেন, তাঁহারা যাহাতে দেশের গঠনমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং ঐ মন্ত্রিমণ্ডল যাহাতে স্থায়ী ভাবে লোক-প্রিয় হইতে পারে, তাহার অকৃত্রিম (sincere) চেষ্টা করা;

(২) প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলে যাহাতে ইউরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করা;

(৩) কি করিলে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এবং শান্তির অভাব প্রকৃতভাবে তিরোহিত হইতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া।

ঐ মত পোষণ করিবার যুক্তি আমাদের কি, তাহা আমরা

ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ-শাসনে ইংরাজগণের রাজনৈতিক চাল কি, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে যাহাতে ইংরাজগণের প্রভুত্ব বজায় থাকে, তজ্জন্য তাঁহারা যত সজাগ হইয়াছেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব অথবা শান্তির অভাব যাহাতে তিরোহিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা তত সচেষ্ট হন নাই। অবশ্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে এমন কথা বলা চলে না যে, ইংরাজগণ ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের অর্থাভাবাদি দূর করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও সচেষ্ট হন নাই, কিন্তু তাঁহারা এতদুদ্দেশ্যে যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, ঐ সমস্ত কার্য্যেও যাহাতে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদাই সজাগ থাকেন।

ভারতবর্ষে যাহাতে ইংরাজগণের প্রভুত্ব বজায় থাকে, তজ্জন্য তাঁহাদের চাল কি কি, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ চালসমূহের মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :—

(১) ভেদনীতি (policy of dividing and ruling);

(২) দেশীয় শিক্ষিত সাধারণের কৃষ্টিগত বিজয় (cultural conquest of the intellectual public).

ভারতবর্ষে ভেদনীতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এ দেশে আগমনাবধি ইংরাজ ভেদনীতিকে সাময়িক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু ১৯০৯ সনের পূর্ব্বে কখনও ঐ নীতিকে শাসন-ব্যাপারে স্থায়ী ভাবে কোন স্থান প্রদান করেন নাই। এই ভেদনীতি পরিগৃহীত হইবার প্রথম অধ্যায়ে কেবল মাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে উহা যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে একদিকে যেরূপ হিন্দু ও মুসলমানের দলাদলি যাহাতে পাকা ভাবে স্থায়ী হয় তাহা সম্ভব হইয়াছে, সেইরূপ আবার সিডিউল কাষ্ট ও কাষ্ট-হিন্দু নামে হিন্দুর দলাদলি, প্রজাদল ও লীগের দল নামে মুসলমানের দলাদলি, বেহারী-বাঙ্গালী নামে প্রাদেশিক দলাদলি, এবং ধনিক ও শ্রমিকের দলাদলি যাহাতে ক্রমশঃ তিক্ত হইতে তিক্ততর হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এ দেশে ইংরাজের কৃষ্টিগত বিজয়ের (cultural conquest) ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একদিন ইংরাজ প্রায়শঃ সত্যসত্যই বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদের কৃষ্টিগত অর্জ্জনগুলি (cultural acquisition) মানুষের শুভপ্রদ এবং মানবজাতির শুভেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়াই ঐ কৃষ্টিসমূহ ভারতবাসিগণ যাহাতে গ্রহণ করে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। ইংরাজের কৃষ্টিগত পরীক্ষা (cultural experiment) যে প্রায়শঃ বিফল হইয়াছে এবং ঐ কৃষ্টিগত পরীক্ষার ফলে যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত জীবন প্রায়শঃ বিষময় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহাদের ভাবুকগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, অথচ ঐ তথাকথিত কৃষ্টিসমূহ যাহাতে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সাধারণ বিবিধ বিজ্ঞানের নামে গ্রহণ করে, তাহার চেষ্টা তাঁহারা করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত ভেদনীতির ফলে, একদিকে যেরূপ ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়তা (nationalism) গঠিত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আবার কৃষ্টিগত বিজয়ের (cultural conquest) ফলে, যে সর্ষপের দ্বারা ভূতের অপসারণ করা সম্ভব, সেই সর্ষপই ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কৃষ্টিগত বিজয়ের ফল এতাদৃশ বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কেহ কখনও উহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনুভব করিতে পারিবেন যে, এমন কি গান্ধীজী, জওহরলালজী, সুভাষচন্দ্র ও অরবিন্দ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ, স্যার সুলেমান, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বিজ্ঞানক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দও প্রায়শঃ সম্পূর্ণভাবে ঐ কৃষ্টিগত বিজয়ের (cultural conquest) কবলে পতিত হইয়াছেন। উপরোক্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় ঋষির অথবা বাইবেলের ও কোরাণের প্রাধান্যের কথা মুখে বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ কৃষ্টিসমূহ যে কি ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন মূল গ্রন্থের সন্ধান করিবার প্রয়াস না করিয়া, উহার ধারণা তাঁহারা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য গ্রন্থকার, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্যগণের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকেন এবং পরোক্ষভাবে কৃষ্টিগত বিজয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকিয়া যান।

এই কৃষ্টিগত বিজয়ের চাতুরীর ফলে যে কেবলমাত্র ভারতবাসীর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে, উহার ফলে প্রায়শঃ সমগ্র পাশ্চাত্ত্যজাতিসমূহের বুদ্ধিগত ও নৈতিক অধোগতি (intellectual and moral degeneration) সংঘটিত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের যে প্রায়শঃ বুদ্ধিগত ও নৈতিক অধোগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা এমন কি একাধিক পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকার পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা উহা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন যে তাঁহাদের উপরোক্ত অবনতি সংঘটিত হইতেছে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তাঁহারা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। প্রয়োজন হইলে ইহা আমরা প্রমাণিত করিতে পারিব যে, জগতের অন্যান্য দেশে কৃষ্টিগত বিজয়ের (cultural conquest) প্রচেষ্টা, পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের নিজেদের বুদ্ধিগত ও নৈতিক অবনতির (intellectual and moral degeneration) অন্যতম প্রধান কারণ।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টিগত বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষ ও ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের যেরূপ সমান ভাবে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, সেইরূপ ভেদনীতির ফলেও কেবল মাত্র ভারতবাসীরই যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা নহে, উহাতে সমগ্র মানবজাতির এতাদৃশ একাধিক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে যে, উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। গত ৫।৬ বৎসর সমগ্র জগতে মোট খাদ্য শস্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, সমগ্র জগতের ২০২ কোটি মানুষের সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মোট কত খাদ্য শস্যের প্রয়োজন হয়, এবংবিধ সংবাদ যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, অধুনা সমগ্র জগতে সমগ্র মানবজাতির যে খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ মানুষকে গড়ে বর্ত্তমানে একবেলা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে। ইহা ছাড়া সমগ্র জগতের জমীর উর্ব্বরাশক্তি এতাদৃশ দ্রুতগতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে যে, অদূরভবিষ্যতে তাহার প্রতিবিধান না হইলে অনেক মানুষেরই প্রায়শঃ উপবাসী থাকিয়া অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতে হইবে।

কি উপায়ে মানবজাতি উপরোক্ত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার সর্ব্বপ্রধান উপায়, ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা, কারণ ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা এখনও যেরূপ সহজ, জগতের কুত্রাপি ঐ স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা তত সহজ নহে।

আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা পাশ্চাত্ত্য কৃষিবিদ্যার উচ্চ উপাধিধারিগণকে বুঝান কঠিন হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহারা এখনও কৃষিসম্বন্ধীয় সাধারণজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইতে পারেন নাই, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের নিকট উহা আমরা প্রমাণিত করিতে পারিব।

সমগ্র জগতের মানবজাতি যাহাতে অনশন হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, এই সত্যটি বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে যাহাতে ইংরাজের ভেদনীতি ও কৃষ্টিগত বিজয়ের নীতি বিফল হয়, তাহার চেষ্টা করা যেরূপ ভারতবাসীর স্বার্থসম্মত, সেইরূপ উহা ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যজাতিগণেরও স্বার্থসম্মত।

আমরা যদি বলি যে, একাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয়গণ অনশন ও অর্দ্ধাশনে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহা হইতে তাহারা যে রক্ষা পাইতে পারিয়াছিল, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারণ পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্থাপন ও ইংরেজের সহিত ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য এবং প্রয়োজন হইলে আমরা তাহা প্রমাণ করিব।

এইরূপে একদিন ভারতবর্ষ ইয়োরোপকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু ইয়োরোপীয়গণের দুষ্ট কৃষ্টির ফলে বহুদিন হইতে প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপ যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ ইংরেজ-জাতির দুষ্ট কৃষ্টির ফলে অধুনা ভারতবর্ষও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখনও সতর্ক হইতে না পারিলে অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যেরূপ কালমেঘ দেখা যাইবে, ইয়োরোপেও উহা দ্বিগুণিত পরিমাণে উড্ডীয়মান হইবে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের ভেদনীতি ও কৃষ্টিগত বিজয়ের (cultural conquest) নীতি কি উপায়ে বিফল করা যাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবাসীর কংগ্রেসপন্থিগণ যদি নিজেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া অন্ততঃ যাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে অতি অনায়াসেই ইংরেজের ভেদনীতি বিফল হইতে পারে। আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়াছি।

প্রধানতঃ মুসলমানগণের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলকে যদি কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে যেরূপ হিন্দু-মুসলমানের সখ্য স্থাপিত হইয়া ভেদনীতির বিফলতা সাধিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার ইংরেজ-প্রতিনিধিগণকে মন্ত্রিমণ্ডলে প্রাধান্য অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ভারতবর্ষের জনসাধারণের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধান বাঞ্ছা করিলেও ইংরেজের কৃষ্টি যে

অতি নগণ্য, তাহা প্রমাণিত হইয়া তাঁহাদের কৃষ্টিগত বিজয়ের শৈথিল্য সম্পাদিত হইতে পারে।

আমাদের মনে হয়, যাহাতে ঐ ভেদনীতি ও কৃষ্টিগত বিজয়ের নীতি বিফল হয়, তাহা ভগবানেরও ঈপ্সিত, তাই কংগ্রেসপন্থিগণের বৃহত্তর অংশের লিপ্সাসত্ত্বেও পাকে-প্রকারে তাঁহাদের পক্ষে কোন প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা এতাবৎ সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, আবার গান্ধীজীর সহিত যাহাতে বড়লাটসাহেবের সাক্ষাৎ হয়, তাহার একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তখন বলিতে হয় যে, আবার সয়তানের প্রাবল্য লাভ করিবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে।

গান্ধীজী যে এতবড় সম্মানের লোভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, তাহার কোন সাক্ষ্য তাঁহার জীবনের অতীত ইতিহাসে নাই। এখনও কি তিনি তাহা দেখাইতে পারিবেন?

আমাদের মনে হয়, তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভব হইবে না এবং আবার কিছুদিনের জন্য ভারত কতকগুলি সংগঠন-পরিকল্পনার নামে মিঃ গান্ধীর হস্তে হাবুডুবু খাইবে।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সংগঠন-পরিকল্পনার প্রত্যেকটি যে দেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বনাশকর, তাহা প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আমরা দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কংগ্রেসের আপোষে ষ্টেট্‌সম্যানের দূতিয়ালী ও প্রাদেশিক মন্ত্রিগণের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

গান্ধীজী ও বড়লাট সাহেবের যাহাতে সাক্ষাৎ সংঘটিত হয় এবং যাহাতে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তজ্জন্য দেশের রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরগণের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড চেষ্টার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রকাশ্যতঃ ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে A Case for Discussion অর্থাৎ, আলোচনার বিষয় নামক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গত ৪ঠা এপ্রিল (রবিবার) তারিখে প্রকাশ করেন। তাহার পর ষ্টেট্‌সম্যানের ঐ পরিকল্পনার ওকালতীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু।

ষ্টেট্‌সম্যানের ঐ পরিকল্পনা, অর্থাৎ এদেশের এতাদৃশ অবস্থায় কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা যেমন ভারতবাসিগণের স্বার্থসম্মত হইতে পারে না, সেইরূপ উহা যে ইংরাজগণেরও স্বার্থসম্মত নহে, তাহা আমরা "কংগ্রেসের আপোষ ও তাহার সংগঠন-পরিকল্পনা" শীর্ষক সন্দর্ভে বিবৃত করিয়াছি।

আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহার বিচার করিতে হইলে, ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রকৃত স্বার্থ কোথায় এবং ভারতবাসীর কোন্ অবস্থা সংরক্ষিত হইলে তাঁহাদের ঐ স্বার্থ সংসাধিত হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে।

ভারত-শাসনে ইংরাজের প্রকৃত স্বার্থ কোথায়, তাহা স্থির করিতে হইলে, কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ইংরাজজাতি সর্ব্বপ্রথমে নিজদেশ ছাড়িয়া এতদূরে এই ভারতবর্ষে বিপৎসঙ্কুল রাস্তায় আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপ ও ইংলণ্ডে মানুষের কি অবস্থা ছিল এবং তাঁহারা তৎপরে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগে এমন একটা সময় ছিল, যখন ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এবং এমন কি ইংলণ্ডের অধিকাংশ মানুষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল এবং তখন সর্ব্বত্রই জমী স্বাভাবিক ভাবে এত উর্ব্বর ছিল যে, কৃষকগণের পক্ষে একমাত্র কৃষি দ্বারাই কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কোন চাকুরী না করিয়া, অন্য কোন দেশে না যাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইত। ইহার পরবর্ত্তী কালে ইউরোপের ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া একমাত্র কৃষি ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের দ্বারা তাঁহাদের জীবন রক্ষা করা ক্লেশসাধ্য হইয়া পড়ে এবং স্বভাবতঃই তাঁহাদিগকে বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য চেষ্টাশীল হইতে হয়। ইউরোপের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যতই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইউরোপীয়গণের পক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করা ততই ক্লেশসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহির্ব্বাণিজ্যের চেষ্টা ততই প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় ইতিহাস একটু তলাইয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের বহির্ব্বাণিজ্যের ঐ চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রকট হইয়াছিল চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে এবং উহা ফুল ও ফল-মণ্ডিত পর্য্যন্ত হইয়াছে সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ইংরাজ জাতি যে রাজত্বভার অর্পিত হইয়া, অথবা রাজ্যলাভের আশায় প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করেন নাই, তাহা এতাবৎ তাঁহাদের ঐতিহাসিক

ধুরন্ধরগণও অস্বীকার করেন নাই। পরন্তু বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের জনসাধারণের অন্নসংস্থান ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সুতরাং "ভারতশাসনে ইংরাজের প্রকৃত স্বার্থ কোথায়?" এই প্রশ্নের উত্তরে যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের অন্নসংস্থান হইতে পারে ও তাঁহাদের প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইতে পারে, তদুপযোগী ব্যবস্থাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কোন্ অবস্থা সংরক্ষিত হইলে, ইংরাজগণের প্রকৃত স্বার্থ, অর্থাৎ তাঁহাদের জনসাধারণের অন্নসংস্থান ও প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি ভারতবর্ষের সহযোগে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের **জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষিত না হইলে, ভারতবাসী জনসাধারণের অন্নসংস্থান না হইলে, ভারতবর্ষের কাঁচামাল উদ্বৃত্ত না হইলে, ইংরাজগণের পক্ষে এদেশ হইতে এমন কিছু পাওয়া সম্ভব নহে, যদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।** ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, যাহাতে ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষিত হয়, যাহাতে কৃষি ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের দ্বারা ভারতবাসী জনসাধারণের সকলের অন্নসংস্থান হয়, যাহাতে ভারতবর্ষে কাঁচামাল উদ্বৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না করিয়া তাঁহারা আর যাহাই করুন না কেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁহাদিগকে নানারূপ অশান্তিতে বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে।

আমাদের উপরোক্ত কথা যে ঠিক, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরাজের আগমনাবধি জমীর অবস্থা, জনসাধারণের অবস্থা এবং তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির অবস্থা কখন কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে।

কোন্ সময় হইতে ভারতবর্ষে ইংরাজের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষে কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ তখন বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল বটে, কিন্তু প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ তখন যে বর্ত্তমান সময়ের পরিমাণের পাঁচ গুণ ছিল, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। জনসাধারণের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের টাকার পরিমাণ তখন কম ছিল বটে, কিন্তু কোন পরিবারেরই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চাকুরীর উমেদারী করিতে হইত না। তখন প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই আধুনিক ভাষানুসারে বেকার থাকিতে হইত বটে—কিন্তু কোন পরিবারেরই অন্নাভাবের জন্য চিন্তান্বিত হইতে হইত না। তখন কৃষকগণ জমিদারকে যে ন্যায্য খাজনা প্রদান করিত, তাহা টাকার হারে ধরিলে বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল বটে, কিন্তু শস্যের বর্ত্তমান মূল্যের হারে ধরিলে তখনকার দিনে খাজনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল। অথচ কৃষকগণ তখন যে বিশেষ কোন খেদ প্রকাশ করিত, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। বণিক্‌বেশী ইংরাজগণও তখন বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে অধিকতর পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত উপরোক্ত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার ফলে রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক জগতে ইংরাজের যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। অথচ যখন দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক জগতে যে-ইংরাজের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না, সেই ইংরাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভ করিবার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজ জাতির ঐ উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন এই সময়ে ইংরাজ জাতি যে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রভূত পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ইহার পর বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ জাতি কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, যে, বিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক জগতে ইংরাজের প্রাধান্য এখনও অনেক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু উহা আর এইরূপ ভাবে বেশী দিন থাকিবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

ইংরাজের দেশে যদি খেলাধূলা, পান-ভোজন, থিয়েটার-বায়োস্কোপ এবং নর্ত্তন-কুর্দ্দনে নিমগ্ন স্ফীতমস্তিষ্ক রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া বার্ক ও পিটের মত ষ্টেটস্‌ম্যান একজনও বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে

তিনি দেখিতে পাইতেন যে, অদূরভবিষ্যতে সমস্ত জগতে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িবার অশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই আশঙ্কা হইতে মনুষ্য-জাতিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা একমাত্র ইংরাজেরই আছে, অথচ ইংরাজ জাতি এই দায়িত্ব-নির্ব্বাহে উদাসীন থাকায় সর্ব্বত্র বিশ্বাসের অযোগ্য ও ঘৃণাস্পদ হইতে চলিয়াছেন।

যে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠাবশতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ জাতি সমগ্র মানবজাতির শীর্ষস্থান লাভ করিতে পাইয়াছিল, সেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বিদ্যমান থাকাসত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ জাতির এত অবনতির আশঙ্কা কেন ঘটিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ দুইটি :—

(১) ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, অর্থাৎ প্রতিবিঘা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের হ্রস্বতা, এবং

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অত্যধিক কাগজ ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতি কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, এ কালে যেরূপ জগতে তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় রাখা সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ এখন আর অতীত যুগের ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ জনসাধারণের জন্য অন্নসংস্থান করাও সম্ভব হইতেছে না এবং তাহাদের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য অতীত শতাব্দীতে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এখন আর তাহা সম্ভব হইতেছে না।

এতাদৃশ অবস্থারই বা কারণ কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি, যথা :—

(১) ভারতবাসী জনসাধারণের নিজেদের-ই অন্নাভাব এবং উত্তরোত্তর ঐ অন্নাভাবের বৃদ্ধি;

(২) উৎপন্ন কাঁচামালের পরিমাণের হ্রস্বতা।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরাজের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে যাহা যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বিংশ শতাব্দীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল বলিয়া প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে প্রতি বৎসর অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী শস্য উপার্জ্জন করা সম্ভব হইত। ইহা ছাড়া তখন কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন অপেক্ষাকৃত অনেক কম থাকায় কৃষকগণ মুদ্রার প্রলোভনে শস্যবিক্রয় করিতে বাধ্য হইত না এবং প্রত্যেকেরই ঘরে সারা বৎসরে অন্নের সংস্থান থাকিয়া যাইত। কাহারও প্রায়শঃ কোন উল্লেখ-যোগ্য ঋণও বিদ্যমান ছিল না। এইরূপে ভারতবাসী জনসাধারণের অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী আর্থিক স্বচ্ছলতা বিদ্যমান ছিল এবং ইংরাজগণও তখন তাহাদের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অনেক বেশী লাভবান্ হইতে পারিতেন।

ইহার পর যতই দিন যাইতেছে, ততই ভারতবর্ষের জমীর প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে এবং প্রতি বৎসর প্রত্যেক কৃষকের উপার্জ্জিত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে।

কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, অধিকতর-সংখ্যক মুদ্রার প্রলোভনে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ শস্য কৃষক উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহারও বেশীর ভাগ বিক্রয় করিতে প্রলুব্ধ হয়। ইহার দ্বারা কৃষকের অন্নের অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপে ভারতবাসী জনসাধারণের দারিদ্র্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইংরাজগণের পক্ষে এখন আর ভারতবর্ষ হইতে তাদৃশ পরিমাণে উপার্জ্জন করা সম্ভব হইতেছে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারত-শাসনে ইংরাজ জাতির নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে—ভারতের জনসাধারণের যাহাতে অন্নাভাব দূরীভূত হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং উহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রধানতঃ দুইটি কর্ত্তব্য বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা :—

(১) ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা;

(২) ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন যাহাতে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা।

অবশ্য ইহা বলিতেই হইবে যে, অর্থনৈতিক জগৎ আধুনা যাদৃশ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি যাহাতে সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সম্পাদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলনে হ্রস্বতা সাধিত করা সম্ভব নহে।

কাজেই এতাদৃশ অবস্থায় ভারত-শাসনে ইংরাজ জাতির প্রকৃত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, যাহাতে ভারতীয় জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

কি করিলে ভারতীয় জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার আলোচনা আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। এখানে আর উহা উদ্ধৃত করিব না।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কৃষিবিজ্ঞানের যে অংশ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে স্বভাবতঃ ভূমির উৎপত্তি হয় কেন, কোন্ কারণে ভূমি বিভিন্নগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কাহাকে বলে, কোন জমী স্বভাবতঃ উর্ব্বরা, আবার কোন কোন জমী স্বভাবতঃ মরু ও জলা হয় কেন, এবংবিধ তথ্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান কোন কৃষিবিজ্ঞানে আলোচিত হয় নাই। উহার আলোচনা একমাত্র ভারতীয় ঋষিপ্রণীত বেদ ও বেদাঙ্গে পাওয়া যাইবে এবং ঐ বেদ ও বেদাঙ্গের মূল ভারতীয় ঋষিগণ যে-ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহার নাম স্ফোটবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষা। যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ বেদ ও বেদাঙ্গ লিখিত রহিয়াছে, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির গহ্বরে লুক্কায়িত এবং উহার পুনরুদ্ধার করা বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও জানা যাইবে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায় ভারতীয় নদ ও নদীগুলির স্বাভাবিক প্রবাহের দিক্ নির্ণয় করা (to find out the nature and direction of the sources and courses of rivers) এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের পঙ্কোদ্ধার করা।

নদ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের দিক্ নির্ণয় করা যেরূপ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, সেইরূপ আবার সর্ব্বতোভাবে উহাদের পঙ্কোদ্ধার করাও বহুব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই ঐ উভয় কার্য্যকেই অতীব দুরূহ বলিতে হইবে।

ঐ কার্য্য অতীব দুরূহ হইলেও উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ উহা সাধিত না হইলে একদিকে যেরূপ ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না, সেইরূপ আবার ইংরাজ জাতি যে-স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ভারত-শাসনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ স্বার্থও যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত হইবে না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ জনসাধারণের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে না।

ভারতের নদ ও নদীর পঙ্কোদ্ধার-কার্য্যে কি কি অন্তরায় আছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান অন্তরায় তিনটি যথা :—

(১) ভারতবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে অমিলন ;

(২) ভারতবাসিগণের ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ;

(৩) শিক্ষিত ইংরেজগণের স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আত্ম-প্রতারণা।

ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কি করিলে ঐ তিনটি অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ তিনটি অন্তরায় দূর করিতে হইলে, কংগ্রেসপন্থিগণ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া, মুসলমান ও ইংরেজ প্রভৃতি অপর যাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ, কংগ্রেসপন্থিগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে একদিকে যেরূপ মুসলমান ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সহিত মনোমালিন্য ঘটিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার তাহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অমিলন এবং এমন কি তাঁহাদের ইংরেজ-বিদ্বেষ পর্য্যন্ত তিরোহিত হইতে পারে।

শিক্ষিত ইংরাজগণ স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে আত্মপ্রতারণা পোষণ করিয়া থাকেন তাহা দূর করিতে না পারিলে একদিকে যেরূপ রেলরাস্তা, মোটর রাস্তা প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার কতকগুলি ব্যবস্থায় অনিষ্ট সাধন করিয়া নদ ও নদীর পঙ্কোদ্ধার করা সম্ভব হইবে না, অন্যদিকে আবার কি করিলে ভারতীয় ও ইংরাজ জনসাধারণের দারিদ্র্য অপসারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান যে তাঁহাদের নাই, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত ঐ শিক্ষিত ইংরাজ জনসাধারণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিত্বভার অর্পণ করিয়া তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে না।

কাজেই ভারতীয় নদ ও নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে অথবা ইংরেজ ও ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য অপসারিত করিবার কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে, প্রথমতঃ প্রাদেশিক কাউন্সিলের কংগ্রেসপন্থিগণ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ না করেন, দ্বিতীয়তঃ ঐ মন্ত্রিত্বভার যাহাতে মুসলমান ও ইংরাজগণের হস্তে অর্পিত হয়, তৃতীয়তঃ কংগ্রেসপন্থিগণ যাহাতে মন্ত্রিমণ্ডলকে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এই অবস্থায় যদি দেখা যায় যে, ষ্টেটস্ম্যান অথবা বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা উহার অন্যথা করিতেছেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহাদের দুতিয়ালী অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ?

বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক শিক্ষিত ইংরাজগণের ষ্টেট্‌সম্যান্‌শিপের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে যেমন প্রায়শঃ হতাশার কারণ পাওয়া যাইবে, সেইরূপ আবার ইংরাজগণের পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা যাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের প্রায়শঃ ক্রমিক অবনতির লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে।

যাহাতে প্রাদেশিক কাউন্‌সিলের কংগ্রেসপন্থী সভ্যগণ নিজেরা মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ না করিয়া মুসলমান ও ইংরাজ সভ্যগণের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলকে সাহায্য করিতে বদ্ধ-পরিকর হন, তাহা কি করিয়া ব্যবস্থিত হইতে পারে, এতৎ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, এই কার্য্য ও জওহরলালজী-পরিচালিত কংগ্রেসের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সহজ-সাধ্য নহে।

যাহাতে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কংগ্রেসে প্রবিষ্ট হইয়া এবং তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য সম্পাদিত করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে অধিকতর চিন্তাশীলতা প্রসার লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টায় যদি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে একদিকে যেরূপ তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর লোকপ্রিয় হওয়া সম্ভব হইতে পারে, অন্য দিকে সেইরূপ কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের দ্বারা দেশের প্রকৃত হিতকর ব্যবস্থা সম্পাদিত হওয়াও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।

আমাদের মতে কোন সংবাদপত্রের মন্তব্যে প্ররোচিত না হইয়া প্রাদেশিক গভর্ণর ও মন্ত্রিগণের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে।

১৯৩৫ সালের ভারতপরিচালনাবিধি

কংগ্রেসপ্রতিনিধিগণ যে প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবেন সেই প্রদেশে তাঁহাদের কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবংবিধ প্রতিশ্রুতি প্রাদেশিক গভর্ণরগণ দিতে অস্বীকার করা অবধি ১৯৩৫ সালের ভারতপরি-চালনা-বিধি লইয়া যে আইনজ্ঞ মহলে নানা রকমের বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ঐ সম্বন্ধে দৈনিক সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

১৯৩৫ সালের ভারতপরিচালনাবিধির যে যে বিষয় লইয়া আইনের ধুরন্ধরগণের মধ্যে এতাবৎ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য :—

(১) প্রাদেশিক গভর্ণরগণ অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতাগুলি (special powers) ব্যবহার না করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার ক্ষমতা তাঁহারা আইনানুসারে পাইয়াছেন কিনা।

(২) যদি দেখা যায় যে, ১৯৩৫ সালের ভারতপরি-চালনাবিধি অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতাগুলি ব্যবহার না করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ভারতপরিচালনাবিধি অনুসারে ভারতবর্ষে Provincial autonomy অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উদ্ভব না হইয়া Provincial autocracy অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বেচ্ছাচার-মূলক শাসনের সূচনা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে কিনা।

উপরোক্ত দুইটি বিষয় ছাড়া আমাদের মনে হয় যে, অদূরভবিষ্যতে কোন মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে No-confidence-এর অর্থাৎ অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইলেও ঐ মন্ত্রিমণ্ডলকে পরিবর্ত্তন করিতে প্রাদেশিক গভর্ণর আইনানু-সারে বাধ্য কিনা তাহা লইয়া অনেক কথাচালাচালি আরম্ভ হইবে।

আমাদের মতে ১৯৩৫ সালের ভারতপরিচালনা-বিধি অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণরগণের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি প্রায়শঃ সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন বটে কিন্তু যদি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনে হয় যে, যে কোন কার্য্য-বিশেষে অথবা প্রতিশ্রুতিবিশেষে তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশের ও ঐ প্রদেশবাসী মানুষের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে এবং তদনুসারে কোন কার্য্যবিশেষ ও প্রতিশ্রুতিবিশেষ কাহাকেও দিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাহা আইনসম্মত হইবে। এতৎসম্বন্ধে গভর্ণরের মীমাংসাকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ কোন গভর্ণর যদি মনে করেন যে, তাঁহার স্বীয় সিদ্ধান্ত আইন-সম্মত হইয়াছে তাহা হইলে ইহা আইন-সম্মত হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। আর যদি কোন গভর্ণর মনে করেন যে, তাঁহার স্বীয় সিদ্ধান্ত আইন-সম্মত হয় নাই তাহা হইলে উহার পুনর্বিচারের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।

আমাদের কথা যে ঠিক তাহা ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসনবিধির ৫০ (৩) ধারা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ ধারা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under the Act required to act in his discretion or to exercise his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion or ought or ought not to have exercised his individual judgment" অর্থাৎ কোন বিষয়ে গভর্ণরের স্বীয় বিবেচনানুসারে অথবা স্বকীয় সিদ্ধান্তানুসারে কার্য্য করা এই আইনসম্মত অথবা তদ্‌বিরুদ্ধ, এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, গভর্ণর ঐ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ বিবেচনানুসারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহাই চরম (final) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ; এবং গভর্ণরের ইহা নিজ বিবেচনায় করা কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য কিংবা এই স্থানে গভর্ণরের স্বীয় সিদ্ধান্ত ব্যবহার করা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত এবংবিধ কারণে গভর্ণরের কোন কার্য্যের ন্যায়ানুগতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

সহজভাবে অথবা "সোজাসুজি" ধরণে উপরোক্ত ধারার কথা চিন্তা করিলে গবর্ণরের কোন কার্য্য অথবা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সালিশীর কথা উত্থাপিত হইতে পারে কি? অথচ গান্ধীজী ঐ শ্রেণীর সালিশীর কথা উঠাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালের আইন দুষ্ট অথবা দোষ-মুক্ত ইহার বিচারে যাহাই বলা যাক না কেন, ঐ আইন অনুসারে যে গভর্ণরের কোন কার্য্য অথবা সিদ্ধান্তের উপর সালিশী হইতে পারে না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ গভর্ণরগণ যখন বলিয়াছেন যে,কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ যে প্রতিশ্রুতির দাবী করিয়াছেন, ঐ প্রতিশ্রুতি দিবার ক্ষমতা আইনানুসারে তাহাদের নাই, তখন গভর্ণরগণের ঐ সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে কোন সালিশী চলিতে পারে না।

যে আইনে প্রাদেশিক গভর্ণরদিগকে স্ব স্ব বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করিবার এতখানি ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, সেই আইন গান্ধীজীর মতে প্রভিন্‌সিয়াল অটোনমীর প্রবর্ত্তক হইতে পারে না, পরন্ত উহাকে অটোক্রাসির প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে।

গান্ধীজীর উপরোক্ত কথা ঠিক কি না তাহার বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ 'অটোনমী' (Autonomy) ও অটোক্রাসী (Autocracy) বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। The Oxford English Dictionary খুলিলে দেখা যাইবে যে, অটোনমী বলিতে বুঝায় "The right of self-government,of making its own la and administering its own affairs" অর্থাৎ কোন প্রাদেশিক অটোনমী বলিতে বুঝিতে হইবে ঐ প্রদেশের স্বীয়-আইনপ্রণয়ন ও সমস্ত বিষয়ে পরিচালনা দ্বারা স্বায়ত্তশাসন করিবার ক্ষমতা। আর অটোক্রাসি (Autocracy) বলিতে বুঝায় "Absolute Government"—অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী পরিচালনা।

অটোনমী ও অটোক্রাসির উপরোক্ত দুইটি অর্থ তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত কোন প্রদেশে ঐ প্রদেশের গভর্ণর তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবেন না এবং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা তাহাদের স্বীয় সুখসুবিধাবিধানের জন্য আইন রচনা করিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত গভর্ণর সময় সময় অবস্থানুসারে স্বীয় বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা পরিচালিত হইলেও ঐ প্রদেশে যে প্রভিন্‌সিয়াল অটোনমী প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কোন প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি ঐ প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লির দ্বারা আস্থাহীনতার প্রস্তাব পাশ হইলেই গভর্ণর সাহেব ঐ মন্ত্রিমণ্ডলকে বরখাস্ত করিয়া আইনানুসারে পরিবর্ত্তিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বাধ্য থাকিবেন কি না, তাহা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসনবিধির ৫১ (১) ও ৫১ (৫) ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

উপরোক্ত ৫১ (১) ধারার কথা—"The Governor's ministers shall be chosen and summoned by him, shall be sworn as members of the

Council, and shall hold office during his pleasure"—অর্থাৎ গভর্ণর তাঁহার মন্ত্রিগণের নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তিনিই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবেন, মন্ত্রিসভার সভ্যরূপে তাঁহাদিগের যে প্রতিশ্রুত্যাদি দিতে হইবে তাহা তিনিই গ্রহণ করিবেন এবং তিনি যতকাল ইচ্ছা করিবেন তত কাল এই মন্ত্রিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

উপরোক্ত ৫১ (৫) ধারায় লিখিত আছে—"The functions of the govrnor under this section with respect to the chosing and summoning and the dismissal of ministers, and with respect to the determination of their salaries, shall be exercised by him in his discretion."

উপরোক্ত দুইটি ধারার মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, অনাস্থার প্রস্তাব (no-confidence resolution) পাশ করিতে পারিলেই, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির পরিবর্ত্তন করিতে গবর্ণরগণ বাধ্য হইবেন বলিয়া যাঁহারা আশা করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। অবশ্য এমন কথাও বলা চলে না যে, অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইলেও কিছুতেই মন্ত্রিসভাগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভবযোগ্য নহে। আইনানুসারে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন করা সম্পূর্ণভাবে গভর্ণরের স্বেচ্ছাধীন। অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইলে গভর্ণরের ইচ্ছানুসারে নূতন মন্ত্রিসভার নিয়োগ হইতেও পারে এবং না-ও হইতে পারে।

কাযেই যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, যে যে প্রদেশে প্রতিনিধিগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠতাসত্ত্বেও তাঁহাদিগের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত না হইয়া অন্যান্য দলের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, সেই সেই প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে, তাঁহাদিগের কপালে যুক্তিসঙ্গতভাবে চতুষ্পদজ্ঞাপক কোন টিকিট লাগান যাইতে পারে।

ঐ ঐ প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট অচল করা সম্ভব হইবে না বটে কিন্তু কংগ্রেসপন্থী মহাত্মাগণ যদি মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থার প্রস্তাবের আয়োজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে দলাদলির তুষাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তদ্দ্বারা দেশের কংগ্রেসের দগ্ধ হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাতে মূক শ্রমজীবিগণের দারিদ্র্য এবং শিক্ষিত বেকারগণের বেকারতার বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য।

যে গান্ধীজীর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নেতৃত্বকালে দেশে দলাদলির মাত্রা, দারিদ্র্যের মাত্রা, বেকারতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া ভারতবাসীর জাতীয়তার আশা ক্রমেই চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে সেই গান্ধীজীর অনুচরবর্গ উপরোক্ত সত্যটুকু কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন?

এই সঙ্গে আমরা লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডকে ও লর্ড লিন্‌লিথগোকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, সত্য বলিতে এত কুণ্ঠা কেন? পাণ্ডিত্যের নামে অত ঘোর-প্যাচ কেন? আমরা তাঁহাদিগকে স্যার স্যামুয়েল হোর ও লর্ড উইলিংডনের পদানুসরণ করিতে অনুরোধ করি। ষোড়শ শতাব্দীর নগণ্য ব্রিটিশজাতি পরিশ্রম ও সত্যপ্রিয়তার পুরস্কারস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন কেন? ইহা কি তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের নিদর্শন নহে? ১৯৩৫ সনের অ্যাক্টে প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে যে প্রয়োজনানুসারে বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আংশিক পরিমাণে গোপন করিবার চেষ্টা-বশতঃই কি লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের ৮ই এপ্রিল তারিখের লর্ড সভার বক্তৃতা অযথা অসরল ও দীর্ঘ হয় নাই? এতাদৃশ ভাবে গোপনের চেষ্টা কেন? ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে আমাদের মনে হয়, ১৯৩৫ সনের অ্যাক্টে প্রায়শঃ নিন্দনীয় কিছু প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে যদি চিন্তাশীলতা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ভারতবাসিগণ বুঝিতে পারিত, যে খেলা জানে সে কাণা-কড়ি লইয়া খেলিতে পারে, আর যাহারা খেলা জানে না তাহারা অনবরতই অপরের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে (Bad workmen always quarrel with his tools)। এতাদৃশ ভারতবাসীর নিকট সত্য কথা বলিয়া নূতন আইনকে যথাযথভাবে বুঝাইতে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের অক্ষমতা প্রকাশ পাইল কেন?

কর্ণেল বুরক্যাঁ

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণেল বুরক্যাঁর প্রকৃত নাম ছিল লুই বার্ণার্ড। ভারতবর্ষে আসিবার পর তিনি উক্ত উপনাম (surname) লইয়াছিলেন। দেশীয় মহলে তিনি লুই সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্টের এক পুরাতন পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাঁহার আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মধ্যের ৪ খানি পৃষ্ঠা নাই। কোন লিপিকর কর্তৃক উহা অনুলিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থের শেষে বুরক্যাঁর স্বহস্তের সাক্ষর "L. Bourquien." দেখা যায় পাণ্ডুলিপিটির পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। J. P. Thompson এবং E. G. T. Smith নামক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দুই জন কর্ম্মচারী কর্তৃক উহার ইংরাজী ভাষান্তর "Punjab Historical Quarterly" পত্রের নবম খণ্ডে (১৯২৩ খৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বুরক্যাঁ সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকগণ, প্রধানতঃ তাঁহার সহকর্ম্মী মেজর লুই ফার্ডিণাণ্ড স্মিথ ও কর্ণেল জেম্‌স্ স্কিনার, যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আত্মচরিতের কাহিনীর সহিত সে সকল কথার অনেক বিষয়ে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়। এ কথা ঠিক যে, মানুষ স্বভাবতঃ নিজের অগৌরবকর প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে কুণ্ঠানুভব করিয়া থাকে। সে জন্য আত্মচরিতে কেহ লেখকের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিবার আশা করে না। সুতরাং বুরক্যাঁকেও আমরা কতকটা ক্ষমা করিয়া চলিতে বাধ্য।

প্রচলিত ইতিহাস মতে বুরক্যাঁ সর্ব্বপ্রথম এডমিরাল সাফ্রাঁ পরিচালিত ফরাসী নৌবহরে নাবিকরূপে এ দেশে আসিয়াছিলেন (১৭৮১-৮২ খৃঃ)। সাফ্রাঁ ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এডমিরাল হিউজের মধ্যে সংঘটিত বিষম জলযুদ্ধ সমূহের কথা প্রবন্ধান্তরে বলা যাইবে। এখানে সে কথা অনাবশ্যক। সমরাবসানে পন্দিচেরীতে কিছুকাল বাস করিবার পর বুরক্যাঁ কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরাজ কোম্পানীর "Captain Doxat's Chasseurs" নামে বিদেশী ভৃতিভুক সৈনিক লইয়া গঠিত একটি রেজিমেণ্ট ছিল। কলিকাতায় আসিয়া বুরক্যাঁ ঐ দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কার্য্য তাঁহাকে বেশীদিন করিতে হয় নাই। ব্যয়-সঙ্কোচোদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষ দল ভাঙ্গিয়া দিলে কর্ম্মহীন বুরক্যাঁ উপায়ান্তরাভাবে কলিকাতা



বেগম সমরু।

নগরীতে পাচকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন! তাহার পর আতসবাজীর ব্যবসা। ঐ অবস্থায় তিনি একবার কার্য্যব্যপদেশে "ভোক্সহল গার্ডেন্‌স"-এর মালিক মিঃ গেরার্ডের সহিত লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সামরিক জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সার্দ্ধানায় গিয়া বেগম সমরুর সৈন্যদলে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনও দি বইন মহাদজী সিন্ধিয়ার জন্য শিক্ষিত সেনাদল গঠনে আত্মনিয়োগ করেন নাই। হিন্দুস্থানে তখনও পাশ্চাত্য সমর-

পদ্ধতিতে গঠিত বাহিনী বলিতে বেগমের ব্রিগেড বুঝাইত। অনুমান ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে তিনি দি বইনের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাসের সহিত বুরক্যাঁর নিজের উক্তির মোটের উপর সামঞ্জস্য আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, অভিজাত কুলজাত ছিলেন না বলিয়া স্বদেশে তাঁহার পক্ষে উচ্চ সামরিক পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত দেখিয়া তিনি সামরিক জীবনে প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। দুই মাস পরে দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে তিনি কানপুরে আগমন করেন। সেখান হইতে দীগ নামক স্থানে গিয়া তিনি মহাদজীর ফরাসীজাতীয় সেনানায়ক লেস্তিনোর দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নুতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে আর বেশী দিন কর্ম্ম করিতে হয় নাই। লালসাৎ বা টোঙ্গার যুদ্ধে রাজপুত হস্তে মহাদজীর পরাজয়ের পর (মে, ১৭৮৭) তিনি "অসুস্থ হইয়া" বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে কথা কতদূর প্রকৃত বলা শক্ত। সিন্ধিয়ার ভাগ্যরবি অস্তমিতপ্রায় মনে করিয়া তিনি যে "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই মহাজনবাক্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। বরং বুরক্যাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে যে খুবই সম্ভব ছিল, তাহা অনায়াসে বলা চলে।

হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তিনি বেগম সমরুর সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজ স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন। পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার কোনই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিনি বেগমের পরিচর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বেগম ও তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে লেজওয়া (Liegeois) বেগমের সপত্নী-পুত্র জাফর আয়ার খাঁর বিদ্রোহকালে অপর চারিজন ইউরোপীয় অফিসারের সহিত বুরক্যাঁও বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কোয়েলে গিয়া সিন্ধিয়ার তৃতীয় ব্রিগেডের অধ্যক্ষ কর্ণেল পেড্রঁর দলে যোগ দিয়াছিলেন (জানুয়ারী, ১৭৯৬) বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

বুরক্যাঁর অবশিষ্ট কর্ম্মজীবন অতঃপর সিন্ধিয়ার সৈন্যদলে অতিবাহিত হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি মাত্র জানা ছিল। সে ইতিহাসও কিছু গৌরবময় ছিল না। স্মিথ, স্কিনার উভয়েই তাঁহার সম্বন্ধে বহু অপযশকর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুরক্যাঁর আত্মচরিতে তিনি যে-সকল যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত ছিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অপরাপর সূত্র হইতে পরিজ্ঞাত বুরক্যাঁর জীবনী প্রথমে বলিয়া তাঁহার লিখিত আত্মকাহিনীর অনুবাদ পরে দিব।

কমটন বলিয়াছেন যে, সিন্ধিয়ার কর্ম্মগ্রহণের পর দীর্ঘকাল বুরক্যাঁ সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। তাহার পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাকে সিন্ধিয়ার বিদ্রোহী সর্দ্দার লকবা দাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে হয়। কি কারণে উক্ত মারাঠা সর্দ্দার মহাদজীর বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন. সে ইতিহাসের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ইহার কিছু পরে পেরঁ বুরক্যাঁকে আজমীরগড় অধিকার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; বরঞ্চ ডিসেম্বর মাসে শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত স্থান অবরোধ আরম্ভ করেন এবং কয়েক মাস পরে উৎকোচপ্রদানে দুর্গরক্ষিগণকে বশীভূত করিয়া উক্ত সুদৃঢ় দুর্গ হস্তগত করিতে সমর্থ হন (৭।৫।১৮০১)। ইতোমধ্যে তাঁহার ব্যর্থতায় বিরক্ত হইয়া পেরঁ কাপ্তেন সাইম্‌স* নামক জনৈক বৃটিশ জাতীয় সৈনিককে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ

---

* এই ব্যক্তি প্রথম ব্রিগেডের এক ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষ ছিল। লকবা-দাদা এবং দাতিয়ার রাজার বিরুদ্ধে সংঘটিত সুণ্ডার যুদ্ধে (৩।৫।১৮০১) সাইম্‌স আহত হইয়াছিল। অতঃপর বুরক্যাঁর স্থলাধিকারে প্রেরিত হইয়া ঐ ব্যক্তি আজমীর আগমন করে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই উহার পতন হইয়াছিল। অতঃপর সাইম্‌স কিছুকাল নিজ সৈন্যগণ সহ টঙ্ক নামক স্থান রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, কিন্তু যশোবন্ত রাও হোলকারের আক্রমণে বাধ্য হইয়া ঐ ব্যক্তি আশ্রয়লাভার্থ রামপুরায় পলায়ন করিয়াছিল। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবার অল্প পূর্ব্বে সিকান্দ্রাতে উহার মৃত্যু হইয়াছিল। কাপ্তেন সাইম্‌সের দেশীয় মহলে পরিচিত নাম ছিল "শমস সাহেব"।

হইয়া বুরকুঁ্যা জয়পুরাধিপতির নিকট তদীয় কর্ম্মগ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু পের্ঁর বিরাগভয়ে প্রতাপসিংহের সে কার্য্য করিতে সাহস হয় নাই। সুতরাং মনের দুঃখ মনে রাখিতেই বুরকুঁ্যা বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাগ্যদেবতা কিন্তু তাঁহার প্রতি নিতান্ত সুপ্রসন্ন ছিলেন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে তিনি তৃতীয় ব্রিগেডের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়া জর্জ্জ টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনার ভার পাইয়াছিলেন; ঐ কার্য্যে তিনি নিতান্ত অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জর্জ্জগড়ের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয়ের পরে পের্ঁ পুনরায় তাঁহাকে সেনাপতিত্ব হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর কালের মধ্যে বুরকুঁ্যা দুইবার স্বীয় অযোগ্যতার জন্য পদচ্যুত হইয়াছিলেন। পের্ঁ কর্ত্তৃক যুদ্ধের গতি কতকটা অনুকূল পথে প্রবাহিত হইবার পর বুরকুঁ্যা আবার সেনাপতিত্ব লইয়া দেখা দিয়াছিলেন এবং হান্সিতে টমাসের সহিত শেষ যুদ্ধের পর তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরাজিত প্রতিপক্ষের সহিত ব্যবহারে তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্যজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অতঃপর বুরকুঁ্যা শতদ্রু প্রদেশের শিখরাজ্যসমূহ হইতে রাজস্বসংগ্রহে গিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত তিনি এতদঞ্চলে ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি ঝিন্দের রাজা ভাগসিংহের সহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি-স্থাপন, রোহতকদুর্গ অধিকার এবং কর্ণাল জেলা হইতে ১৫০০০৲ টাকা কর আদায় করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সমর আসন্নপ্রায় হইলে পের্ঁ তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আগষ্ট মাসে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধিয়া অম্বাজী ইঙ্গলিয়াকে পের্ঁর স্থলে প্রধান সেনাপতি ও হিন্দুস্থানের সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমটন বলেন যে বুরকুঁ্যা পের্ঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু (bosom friend) হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার পতন ঘটাইবার প্রধান কারণ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পের্ঁ আর সিন্ধিয়ার নেকনজরে নাই বুঝিয়া নবীন সেনাপতির প্রিয়পাত্র হইবার আশায় তিনি পুরাতনের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। বুরকুঁ্যাকে অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আরও অনেকে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু বুরকুঁ্যার আত্মচরিতে ঠিক অন্য কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে পের্ঁকে শত্রুপক্ষের সহিত ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত দেখিয়া তিনি নিমকের মর্য্যাদারক্ষাকল্পে আগুয়ান হইয়াছিলেন এবং কোন মতে তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে না পারিয়া পের্ঁই তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার আদেশ শুয়েরিনিয়ের নামক একজন সেনানীকে দিয়াছিলেন। তাঁহার



সাহ আলম।

সৈন্যদলে যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা পের্ঁর প্ররোচনাতেই ঘটিয়াছিল এবং পের্ঁ আত্মদোষ ক্ষালনার্থ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ইংরাজরা তাঁহার কার্য্যের ঘৃণার্হতা বুঝিলেও পের্ঁর অপরাধ লঘুকরণের চেষ্টা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবে প্রকৃত অপরাধী রক্ষা পাইয়াছে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে নির্দ্দোষীর স্কন্ধে অপরের অপরাধের বোঝা চাপান হইয়াছে। বুরকুঁ্যার সকল কথা কতদূর সত্য

বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে পেরঁ যে এই সময় নিতান্ত কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আচরণ বিশ্বাস-ঘাতকতারই নামান্তর, তাহা বলা আবশ্যক। বুরক্যাঁর আত্মচরিতে পরে আমরা দেখিব, তাঁহার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা ছিল। এখানে প্রচলিত ইতিহাসে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা দেওয়া যাইতেছে।

পেরঁর স্থলে অম্বাজীর নিয়োগের গুজব শুনিবার পরই তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং চারিদিকে রটাইয়া দিয়াছিলেন যে, পেরঁ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন। কোয়েলের যুদ্ধে পেরঁর নির্লিপ্তভাবে ঐ কথা কতকটা সমর্থিত হইয়াছিল। অতঃপর বুরক্যাঁ সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবেই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্রিগেডের অধ্যক্ষ মেজর গেসল্যাঁকেও তিনি স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পেরঁর প্রতি অবিচল রহিলেন। সিপাহীগণের মধ্যে শীঘ্রই অবাধ্যতা দেখা দিয়াছিল। উহারা গেসল্যাঁপ্রমুখ তাহাদের অফিসারগণকে বন্দী করিয়া বুরক্যাঁকে তাহাদের অধ্যক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। বৃদ্ধ অন্ধ সাক্ষীগোপাল সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে সেই মর্ম্মে একটি খিলাৎ সংগ্রহ করা কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য ছিল না। কিন্তু বুরক্যাঁ সম্রাটের রক্ষক দিল্লীর কিল্লাদার মেজর ড্রজ্যাঁর হিসাব করেন নাই। তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার বিষম বিপদে পড়িয়া শুধু পেরঁর অনুগ্রহবলে কোনমতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার দুর্দ্দিনে সে কথা স্মরণ করিয়া ড্রজ্যাঁ পরম বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার সাহায্যে আগুয়ান হইলেন। তিনি বুরক্যাঁর সকল দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে নিজ সৈনিকগণসহ দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সম্রাটকে জানাইলেন যে, পেরঁর নিকট হইতে অনুমোদনপ্রাপ্ত নহেন, এরূপ কোন ব্যক্তিকে তিনি মানিতে অসমর্থ।

বুরক্যাঁ তৎক্ষণাৎ দুর্গ-অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রাজঘাট নামক অন্যতম প্রাকারের অদূরে কামান সাজাইয়া দুইদিন ধরিয়া গোলাবর্ষণে তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে ভয় পাইয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ স্বয়ং তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে সকাতরে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন; বলিলেন, বলিয়া কহিয়া ড্রজ্যাঁকে রাজী করাইতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে বুরক্যাঁ পেরঁর প্রধান মহাজন হরসুখ রায়কে ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। "বুরক্যাঁ শুধু পেরঁর পদাধিকার করিয়াই নিরস্ত হন নাই; অর্দ্ধপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মথুরায় বিখ্যাত "হিন্দুস্থানী হস্" নামক সেনাদলের দেশীয় সেনানায়কগণের নিকট নিমকহারাম দাগাবাজ পেরঁকে বন্দী করিতে এবং আবশ্যক হইলে বধ করিতে আদেশ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন যে, যে-ব্যক্তির সব কিছুই পেরঁ হইতে হইয়াছিল, সে এরূপ হীন শঠতার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা এবং স্মিথ, স্কিনার ও স্বয়ং পেরঁর উক্তি হইতে ইহা সমর্থিত হইতেছে। পেরঁ বলেন যে, শুধু তাঁহার এডিকংয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।"*

আলিগড়ের পতনের পর ছত্রভঙ্গ সৈনিকগণ চারিদিক হইতে দিল্লীতে আশ্রয়-লাভার্থ আসিতেছিল। মথুরা হইতে কাপ্তেন ফ্লুরী পরিচালিত ৫০০০ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। পেরঁর বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দেওয়াতে বুরক্যাঁর প্রতি তাহাদের সবিশেষ ভক্তি হইয়াছিল। "তিনি তখন দিল্লীতে নামেই প্রধান সেনাপতিত্ব করিতেছিলেন। নিজের উদ্দেশ্য তিনি নিজেই পণ্ড করিয়াছিলেন। একবার বশ্যতার রশি হাতছাড়া করিলে অথবা সৈন্যদের বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিলে, সে আন্দোলনের বেগ প্রশমন অথবা মন্দীভূত করা সুকঠিন। মারাত্মক যন্ত্রপাতির মতই উহা যে ব্যক্তি দুর্ব্বলহস্তে তাহা ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকেই আঘাত করিয়া থাকে। বুরক্যাঁ ব্রিগেডদ্বয়ের সিপাহীগণের মধ্যে যে বিদ্রোহের

* Compton—"European Military Adventurers of Hindustan," p. 306.

...জ বপন করিয়াছিলেন,তাহাতে এইরূপ ফল ফলিয়াছিল। অবাধে স্বাথচ্ছাচরণে অভ্যস্ত হইয়া তাহারা যে ব্যক্তি তাহাদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করিতে শিখাইয়াছিল, তাহারও আদেশলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। উভয় ব্রিগেডের সকল সৈনিকের মধ্যে এইরূপ অবাধ্যতা ও অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এমন সময় বুরকঁ্যা সংবাদ পাইলেন যে, জেনারেল লেক দিল্লীর অদূরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।"* স্কিনার বলিয়াছেন যে, এ সংবাদে বুরকঁ্যার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি সৈন্যগণকে হরিয়ানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত করাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে নাকি উহাদের চক্ষু ফুটিয়াছিল, নবীন সেনাপতিও যে পুরাতনের মতই ভীরু ও বিশ্বাসের অযোগ্য তাহারা তাহা দেখিয়াছিল। দি বইনের আমল হইতে ব্রিগেড যুদ্ধে ভীত হইয়া কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। আর এক্ষণে সেনাপতি অনায়াসে সে কথা বলিলেন! মহাক্রোধে সিপাহীরা বুরকঁ্যাকে বন্দী করিয়া সরওয়ার খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে নেতৃপদে বরণ করিয়াছিল। স্কিনারের এ কথা কিন্তু সত্য বলিয়া মনে করা কঠিন; কারণ, ইংরাজদিগের আগমন সংবাদে বুরকঁ্যাকেই আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিতে দেখা যায়।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বুরকঁ্যা সসৈন্যে পটবরঘাট নামক স্থান হইতে যমুনানদী পার হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুইদিনের মধ্যে তাঁহার ১২ ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ৫০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০টি তোপ অপর তটে পৌঁছিয়াছিল। অতঃপর তিনি যুদ্ধার্থ সেনা সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ঐ কার্য্য কতকটা ভাল ভাবেই করিলেও নিজে কতকগুলি দেহরক্ষী সওয়ার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের গুলিগোলার পাল্লার বাহিরে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এদিকে লেক পূর্ব্ববৎ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। মধ্যবর্ত্তী দীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত জঙ্গলের জন্য উহারা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপথের অগোচরে থাকায় তিনি শত্রুসেনার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ নয় ক্রোশ পথ একাদিক্রমে অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত ইংরাজসেনা দিল্লী হইতে মাত্র ৬ মাইল দূরবর্ত্তী হিন্দন নদীর তীরে পৌঁছিয়া শিবিরসমাবেশ আরম্ভ করিল। সৈনিকেরা অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেহ বা ইন্ধনের সন্ধানে গিয়াছে,—সহসা অদূরে বিপক্ষের অশ্বারোহী সেনা আসিয়া দেখা দিল। সংবাদ পাইয়া জেনারেল লেক যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত তিন রেজিমেণ্ট গোরা ও দেশীয় সৈন্য সহ সম্মুখে আগুয়ান হইলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, শত্রুসেনা এক ক্রমোচ্চ জমিতে সুবিন্যস্তভাবে তাঁহার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছে।



শাহ আলম মহিষী-- জিন্নৎ মহল।

তখন মধ্যাহ্নকাল, খররৌদ্রে পর্য্যটন-ক্লান্ত সৈনিকেরা যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত অবস্থায় ছিল না। ভাদ্রের প্রচণ্ড রৌদ্রে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে সর্দ্দি-গর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। লেকের নিকট মাত্র এক রেজিমেণ্ট ইংরাজ পদাতিক, এক রেজিমেণ্ট ইংরাজ এবং দুই রেজিমেণ্ট দেশীয় অশ্বারোহী এবং সাত ব্যাটালিয়ন সিপাহীসেনা, সর্ব্বসমেত সাড়ে চারি হাজার সৈন্য ছিল। ইহা লইয়া তিন গুণেরও অধিক প্রতিপক্ষের মোহড়া লইতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। *

* L. Smith—"A sketch of the Regular Corps etc. p. 34-35.

বুরকঁ্যার সৈন্যদলের অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই। তিনি

কিন্তু প্রথমটায় তিনি বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। শত্রুসেনার ঘন ঘন গোলাবৃষ্টিতে তাঁহার সৈন্যদল সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের বাহন অশ্ব একটি গোলার আঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তিনি স্বয়ং কোনমতে দৈবক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া তিনি তখন তাঁহার সমস্ত পদাতিক ও গোলন্দাজগণকে সম্মুখে আগুয়ান হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের আসিয়া পৌছিতে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়াছিল। বিপক্ষীয় সৈন্যদল যে-প্রকার সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল, তাহাতে উহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাওয়া যে শুধু কঠিন কার্য্য, তাহা নহে, পরন্তু তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে বুঝিয়া লেক উহাদিগকে চাতুরীতে প্রতারিত করিয়া সমতলভূমিতে নামাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি অশ্বারোহিগণকে পশ্চাৎপদ হইবার ভাণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। ইংরাজরা পরাজিত হইয়া পলাইতেছে ভাবিয়া বুরক্যার সিপাহীরা মহোল্লাসে গগনভেদী চীৎকারে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া নিজেদের আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করিয়া উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সহসা অদূরে শত্রুর পদাতিকগণকে আগমনরত দেখিয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। তখন তাহারা অগ্রগমনে নিরস্ত হইল। কিন্তু তাহারা নিজেদের যে সুযোগ হারাইয়াছিল, তাহা আর পুনর্গ্রহণের সময় ছিল না। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাক্রমে প্রত্যাবর্ত্তনরত বৃটিশ অশ্বারোহী-বাহিনী সহসা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া মধ্যদেশে এক ব্যবধান-পথের সৃষ্টি করিল। সেই পথে পদাতিকরা আগুয়ান হইয়া চলিয়া গেলে তাহারা পুনঃসম্বদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া শত্রুসেনার দক্ষিণ প্রান্তের সম্মুখে গিয়া উপনীত হইল।

অতঃপর ইংরাজসেনা সমবেত বলে শত্রুকে আক্রমণ করিল। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি তাহাদের পরিচালিত করিতে লাগিলেন। গোলন্দাজদল ক্ষিপ্রহস্তে গোলাবর্ষণ করিয়া পদাতিকগণের পথ পরিষ্কার করিতে লাগি.. বন্দুকে সঙ্গীণ চড়াইয়া সিপাহীরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল। প্রতিপক্ষের অগ্নিবৃষ্টিতে অনেকে ধরাশায়ী হইল, তথাপি উহারা নিবৃত্ত হইল না। শত্রুর মাত্র একশত গজ দূরে পৌছিয়া তাহারা মুহূর্ত্তের তরে থামিল। স্কন্ধ হইতে বন্দুক নামাইয়া একবার গুলিবর্ষণ করিয়া পর মুহূর্ত্তেই তাহারা সঙ্গীণের দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে গতিবেগ বাড়াইল। কিন্তু বুরক্যার দল আর সে জন্য অপেক্ষা করিল না। মহাভয়ে সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া উভরড়ে পলায়ন করিল। কিন্তু পলাইয়াই বা যমের মুখ হইতে নিস্তার কোথায়? বিজয়লাভে যেটুকু বিলম্ব ছিল, লেকের অশ্বারোহী সেনা তাহা সমাধা করিল। দিনমণি অস্তগমন করিবার পূর্ব্বেই বিজয়ী ইংরাজসেনা দিল্লীর অপর পারে যমুনার তটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল।

সিন্ধিয়ার সৈনিকগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। মেজর লুই স্মিথ বলেন যে, যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়াও পরাজিত সৈনিকগণের ন্যায্য পাওনা যে সম্মানসূচক অনুকম্পা, তাহা দি বইনের সিপাহীরা তাহাদের আচরণের দ্বারা হারায় নাই। তাহারা শ্রেষ্ঠতর সাহস, শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রশস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠতর বশ্যতা ও শৃঙ্খলাজ্ঞানের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজকীয় এবং কোম্পানীর সৈন্যদল ব্যতীত ভারতবর্ষে অপর কেহ সমানসংখ্যক বলের দ্বারা উহাদের পরাস্ত করিতে পারিত না এবং বৃটিশ সেনার নিকট পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের অগৌরবের কিছু নাই।* কমটন ইহা অপেক্ষা সত্য কথা বলিয়াছেন; যে ব্যক্তি তাহাদের গঠিত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি যদি সেদিন তাহাদের পরিচালন করিতেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী লিখিতে হইত; অফিসরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত উপযুক্ত নেতৃবিহীন সিপাহীরা যদি প্রাণপণ না করিয়া থাকে, সেজন্য তাহাদের বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না।†

এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে প্রায় ৫০০ এবং অপর পক্ষে তিন হাজার লোকক্ষয় হইয়াছিল। শত্রুর ৬৮টি তোপ,

বলেন যে, সে কথা চক্রান্তকারীদের মুখে পূর্ব্বাহ্ণে অবগত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কার কোন কারণ নাই জানিয়া ইংরাজ-সেনাপতি যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

* P. 26

† P. 312

৩৭ গাড়ী গোলা-বারুদ এবং দুই গাড়ী ধনরত্ন লেকের হস্তগত হইয়াছিল। কামানগুলির শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া ইংরাজরা সমধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষজ্ঞ কর্ণেল হর্সফোর্ডের রিপোর্ট হইতে একাংশ উদ্ধৃত হইল,—"লোহার কামানগুলি (সংখ্যায় আটটি) ইউরোপে নির্ম্মিত। একটি পর্ত্তুগীজ তিন পাউণ্ডার ভিন্ন পিত্তলের কামান, মর্টার এবং হাউইটজার-গুলি ভারতবর্ষে ঢালাই করা। কতকগুলির গাত্রে খোদাই-করা লেখা হইতে প্রকাশ, ঐগুলি মথুরায় প্রস্তুত, কতক-আবার আগ্রায় তৈয়ারী। কিন্তু সব কয়টিরই পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণকার্য্য যে কোন ইউরোপীয় শিল্পীর কাজ, তাহা বেশ বুঝা যায়। কামানগুলি সাধারণতঃ আকারে ও ছাঁদে ফরাসী ধরণের এবং কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত কামান হইতে কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। সবগুলিতেই আধুনিকতম ফরাসী প্যাটার্ণের উঁচু-নীচু করিবার ব্যবস্থা আছে।" বলা বাহুল্য, এ উচ্চ প্রশংসা মেজর জর্জ্জ স্যাঙ্গষ্টারের প্রাপ্য।

বুরক্যাঁ এবং তাঁহার অধস্তন ফরাসী অফিসরগণ রণস্থল হইতে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলেন। লর্ড লেকের ডেস্প্যাচের ভাষায় বলিতে "বদমায়েসটা (miscreant) নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহার হতভাগাগুলার (vagabonds) সহিত ১২ই সকালে অন্যত্র পলাইয়াছিল। বুরক্যাঁ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া জনসাধারণ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা পলাতক সৈনিকগণের মালপত্র লুঠ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিল।"* ১৪ই সেপ্টেম্বর লেক যমুনা পার হইয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ করেন। সম্ভবতঃ সেই দিন অথবা পরদিন বুরক্যাঁ এবং তাঁহার অফিসরগণ তাঁহার করে আত্মসমর্পণ করেন। উহাদের নাম ছিল মেজর গেসল্যাঁ, কাপ্তেন গুয়েরিনিয়ে, দেল পের্ এবং জাঁ পীয়ের।† দিল্লী দুর্গের কিল্লাদার জর্জ্জ্যও তাঁহাকে আর বাধাদানের কোন চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন। দিল্লীদুর্গে পের‍ঁর রক্ষিত যে অর্থ ছিল, তাহা তিনি শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিশেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি উহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত বাদসাহের অর্থ, সিন্ধিয়ার নহে বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু লেক তাহা না মানিয়া লুঠের জিনিষ বলিয়া সৈন্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য প্রধান সেনা-পতির অংশেও একটা মোটা রকম টাকা পড়িয়াছিল।



জর্জ্জ টমাস।

বন্দী ফরাসী সেনানীগণকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে তাহারা ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল।

---

* ইংরাজ-সেনাপতি ভাষায় একটু সংযমের পরিচয় দিলে ভাল করিতেন, সকলেই বোধহয় স্বীকার করিবেন।

† গেসল্যাঁ দীর্ঘকাল দ্বিতীয় ব্রিগেডের এক ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষ ছিলেন। কার্ণেল জন হেসিঙ্গের দেহান্তে তাঁহার পুত্র জর্জ্জ পিতৃপদে আগ্রার কিল্লাদার নিযুক্ত হইলে গেসল্যাঁ তাহার স্থলে ঐ ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। ইংরাজদিগের সহিত সমর আরম্ভ হইবার সময় তিনি উহাদের সহিত দিল্লীতে ছিলেন। বুরক্যাঁ তাঁহাকে কোনমতে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে না পারিয়া তাঁহার সৈনিকগণকে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। বুরক্যাঁ আত্মচরিতে বলিয়াছেন যে, উহাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের জন্যই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

ইংরাজ লেখকবর্গের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ অন্ধ মোগল-সম্রাটের দুঃখ-দুর্দ্দশার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার মুক্তিলাভে আনন্দের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর লেক সাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাদসাহ তাঁহাকে বহু বাগাড়ম্বরপূর্ণ উপাধি দিয়াছিলেন। সে সকলের কোন মূল্য নাই। তাঁহার পক্ষে নবীন অধিকারিগণের সংবর্দ্ধনা করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। মিল সত্যই বলিয়াছেন যে, লর্ড ওয়েলেস্‌লি জোর গলায় বাদ-সাহকে হীনতা ও অধীনতা হইতে মুক্তিদানের কথা বলা সত্বেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, মোটের উপর তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করা হইত। অবশ্য প্রথমে কিছুকাল যখন সাহ ফকির বা কৌড়ি ফকিরের হস্তে সম্রাটের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তখন তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। ক্রুঁয়ার আমলে তাঁহার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন অনেকে সিন্ধিয়া এবং তাঁহার ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের হস্ত হইতে সম্রাট্‌কে উদ্ধার করিবার কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সে মুক্তিতে তাঁহার কি লাভ হইয়াছিল? তিনি কি তাঁহার হৃত ক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন? তাঁহার পরিত্রাতা কি সে বিষয়ে তাঁহাকে কোন সাহায্য করিয়া-ছিল? প্রভু পরিবর্ত্তনে মুক্তি হয় না।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বুরক্যাঁ হাম্বুর্গে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার আগমনের কয়েকদিন পূর্ব্বে পেরঁও তথায় আসিয়াছিলেন। ব্যারণ দি বুরিয়েণ সে সময় সেখানে ফরাসী কন্সল ছিলেন। তাঁহার আত্মচরিতে লিখিত দেখা যায়,—"জেনারেল পেরঁর আগমনের কয়েক দিন পরে বুরক্যাঁ আসিয়া পৌছেন এবং ফ্রান্সে যাইবার জন্য একটি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। পেরঁর সহিত তাঁহার বিষম বিরোধ ছিল; পেরঁও উহাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ তিক্ততার সহিত বলিতেন। উহাঁদের পরস্পরের প্রতি বিষম ঘৃণার ভাব ছিল এবং উভয়েই পরস্পরকে মারাঠাদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ বলিয়া অভিযোগ করিতেন। উভয়ে সুপ্রচুর ধনসম্পত্তি লইয়া আসিয়া-ছিলেন।* বুরক্যাঁর কি হইয়াছে আমার জানা নাই; কিন্তু জেনারেল পেরঁ ভেন্দোমের উপকণ্ঠে সুন্দর একটি সম্পত্তি কিনিয়া তথায় অবসর জীবন যাপন উদ্দেশ্যে গিয়াছেন।"

বুরক্যাঁর পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধের বুরিয়েণের কথার প্রতিধ্বনি করা ভিন্ন আমাদেরও গত্যন্তর নাই। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কেহই কোন ভাল কথা বলেন নাই। স্কিনারের মতে তিনি শুধু ভীরু কাপুরুষ নহেন, পরন্তু ঘোর মূর্খ ছিলেন। স্মিথ তাঁহাকে যেমন দুর্ব্বলপ্রকৃতি তেমনই দুষ্ট বলিয়াছেন। উহাঁরা উভয়েই বুরক্যাঁর ভীরুতা ও নীচতার বহু কাহিনী প্রদান করিয়াছেন। কমটনের মতে ভারতবর্ষে সমাগত ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদিগের মধ্যে একমাত্র সোম্রু এবং সম্ভবতঃ মাইকেল ও ফাইডেল ফিলোজ ভিন্ন একাধারে পাচক, আতসবাজি-নির্ম্মাতা ও কাপুরুষ লুই বুরক্যাঁর মত নিন্দনীয় চরিত্র আর পরিদৃষ্ট হয় না। আগামী সংখ্যা হইতে বুরক্যাঁর আত্মচরিতের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

* কথিত আছে, ইহাঁরা প্রত্যেকে ভারতবর্ষে সংগৃহীত অর্দ্ধ ক্রোর টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।

পরমুখাপেক্ষিতা

...ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র ভারতবাসী চিরদিন কোন দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের দেশে বসবাস করিয়া জীবনধারণ করিয়া আসিতেছেন এবং অন্যান্য দেশের লোকও ভারতবর্ষ হইতে স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনের সহায়তা উপভোগ করিয়াছেন। ভারতবাসী ব্যতীত জগতের আর কোন দেশের লোক বহু শত বৎসর হইতে নিজেদের দেশে বসবাস করিয়া অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই এবং এখনও হইতেছেন না।...

আজীবন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর মধ্যে দুটি বৌ। বড়-বৌএর ছেলে হিরণ, ছোট-বৌএর ছেলে কিরণ।

ছেলেদুটির আর আদরের সীমা নাই। মিল করিয়া যেমন নাম রাখা হইয়াছে, তেমনি মিল করিয়া একরকমের জামা আসে, একরকমের জুতা আসে; একজনের কিছু আনিতে হইলে দু'জনেরই আনিতে হয়।

গ্রামের সকলেই বলে, মুখুজ্যেদের সংসারটি বেশ। দুটি ভাই রোজগার করে, প্রতিমার মত সুন্দরী দুটি বৌ, দুটি বৌএর ফুটফুটে দুটি ছেলে। বলিবার কথাই।

সবাই বলে, বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদ—অভিশাপ হইতেই বা কতক্ষণ।

সে বৎসর আশ্বিনের প্রথমেই পূজা। সমস্ত গ্রাম তাহারই আয়োজনে মাতিয়া উঠিয়াছে। এমন দিনে মুখুজ্যে-বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। বড়-বৌএর হইয়াছিল সামান্য জ্বর। সেই জ্বর সহসা কেমন করিয়া কখন যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কেহ জানিতেও পারে নাই। দশদিনের দিন সে মরিয়া গেল। হতভাগীর আর পূজা দেখা হইল না। অত সাধের ছেলে হিরণ পড়িয়া রহিল পশ্চাতে। আড়াই বছরের ছেলে, মৃত্যু কাহাকে বলে জানে না, দোরের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু দেখিল, কতকগুলা নিষ্ঠুর লোক মাকে তাহার দড়ি দিয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া কাঁচা ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়া নদীর তীরে দূরের ওই আম-বাগানটার কাছাকাছি কোথায় যেন লইয়া গেল।

হিরণ কাঁদিতেছিল। ছোট বৌ তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। বলিল, 'কাঁদে না বাবা ছি, আমি রয়েছি তোমার ভাবনা কি?'

মাতৃহারা মা পাইল। ছোট বৌ এককোলে লইল হিরণকে, আর এককোলে লইল কিরণকে।

একটি বৎসর এমনি করিয়াই কাটিল। হয় ত বা চিরদিনই কাটিত, কিন্তু চাকা আবার ঘুরিল।

পরের বৎসর বৈশাখ তখন জ্যৈষ্ঠে গিয়া পড়িয়াছে। খর রৌদ্রতাপে নিদাঘের পল্লী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। আমের বাগানে রোহিনী পোকার একটানা ডাক সুরু হইয়াছে। আম পাকিবার সময়।

ছোট-বৌএর শরীরটা গত কয়েকদিন হইতে তেমন ভাল বোধ হইতেছিল না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্মের ভার এখন একা তাহারই উপর। সকালে স্নান করিয়া রান্না চড়াইতে হয়। ছেলেদুটার ঝক্কি ঝঞ্ঝাট ত' আছেই!

সব কিছু সারিয়া সেদিন দুপুরে সে হিরণ-কিরণকে ঘুম পাড়াইতেছিল। হঠাৎ মনে হইল কে যেন তাহাকে ডাকিল, 'ছোট বৌ!'

'যাই' বলিয়া ঘুমন্ত ছেলেদুটাকে ঘরে রাখিয়া ছোট-বৌ বাহিরে আসিল। চারিদিক নিঝুম। কেহ কোথাও নাই। বাড়ীর উঠানে দুইটা দাঁড়কাক শুধু কা কা করিতেছে।

ছোট-বৌএর আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল।

স্বামী বাড়ীতে নাই, ভাসুর বাড়ীতে নাই। ছোট ছোট ঘুমন্ত দুইটি ছেলেকে লইয়া স্পষ্ট দিনের বেলা ঘরে ঢুকিয়া সে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

স্বামী তাহার কাছাকাছি একটা কলিয়ারিতে চাকরি করে। সন্ধ্যায় সে বাড়ী ফিরিতেই ছোট বৌ বলিল, 'একটা ঝি রাখতে পার?'

'কেন? একা একা কষ্ট হচ্ছে?'

আসল কথাটা সে গোপন করিল। বলিল, 'হ্যাঁ।'

রাত্রিটা ছিল অন্ধকার। সেই দিন রাত্রেই ছোট বৌএর মনে হইল রান্না ঘরের পাশে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ভয় পাইয়া ছুটিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল। তাহার পর সেই যে সে শয্যা গ্রহণ করিল, সে শয্যা ছাড়িয়া তাহাকে আর উঠিতে হইল না। শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিল, ইনজেকসান দিল, ঔষধ খাওয়াইল, সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি কিছুই

হইল না, কিন্তু চারদিনের দিন ঠিক সেদিনের মত তেমনি এক নীরব নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে ছোট-বৌও মরিয়া গেল।

বাড়ীতে স্ত্রীলোক বলিতে কেহ আর রহিল না। নিতান্ত ছোট ওই দুটি ছেলেকে লইয়া শিবু ও রামু দুই ভাই বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু চিন্তার কি আছে? কথায় বলে নাকি বৌ মরে ভাগ্যবানের।

এবং তাহারা দু'ভাই যে ভাগ্যবান তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

একমাস পার হইতে না হইতেই মুখুজ্যেদের বাড়ীতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের যাতায়াত সুরু হইল। কিন্তু এমন বৌ যাহাদের এমন করিয়া মরিয়া যায়, বিবাহ তাহারা আর করিবে না, ইহাই ছিল তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প।

কিন্তু সঙ্কল্প তাহাদের শেষ পর্য্যন্ত টি'কিল না।

টি'কিল না শুধু ওই ছেলে দুটার জন্য।

সুতরাং হিরণের বাবাও বিবাহ করিল। কিরণের বাবাও বিবাহ করিল।

মুখুজ্যে-বাড়ী আবার তেমনি জম্‌জমাট্! উঠাউঠি এক বছরের মধ্যে দু'দুটা মেয়ে যে এ-বাড়ীতে মরিয়াছে, সেকথা আর কাহারও মনেও রহিল না। শুধু হিরণ ও কিরণ তাহাদের এই দুটি নূতন মায়ের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল। ইহাদের কাহাকেও ঠিক যেন তাহারা মা বলিয়া চিনিতে পারিল না।

বছর পাঁচ ছয় পরে দেখা গেল, অনেকগুলি ছোট ছোট পুত্র-কন্যায় ইহাদের দুই ভাইএর দুইটি সংসার ভরিয়া উঠিয়াছে। বড় বৌএর হইয়াছে পাঁচটি এবং ছোট বৌএর চারিটি! পৈতৃক যে বাড়ীখানি ছিল, তাহার মাঝখানে একটি দেওয়াল তুলিয়া তাহাকে দুই সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। ছেলের ছেলের কি যেন একটা ঝগড়াঝাঁটি লইয়া দুই বৌএর প্রথমে বাক্যালাপ বন্ধ হয়, তাহার পর এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেছে।

তাহাই হইয়াছে।

শিবু তাহার পুত্র হিরণকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছে, 'খবরদার বলছি কিরণের সঙ্গে মিশবি ত' ভাল কাজ হবে না।'

ওদিকে রামু বলিয়াছে কিরণকে, 'হিরণের সঙ্গে খেলা করতে যদি দেখি ত' তোমার পা খোঁড়া করে' দেবো।'

এই কথা বলিবার পর, কথা তাহারা তিন চার দিন বলে নাই। গ্রামের এক টেরে ইস্কুলবাড়ী। দু'জনেই সেখানে পড়িতে গিয়াছে, ছুটি হইবামাত্র আগে-পিছে চলিয়াও আসিয়াছে।

সেদিন শনিবার। সকাল সকাল ইস্কুলের ছুটি হইয়া গেল হিরণও বাড়ী ফিরিতেছিল, কিরণও বাড়ী ফিরিতেছিল রায়-পাড়ার পাশে মনে হইল, যেন ডুগডুগি বাজিতেছে হিরণ ছুটিল বাগ্দিপাড়ার ভিতর দিয়া, কিরণ ছুটিল তাল পুকুরের পাড়ে-পাড়ে। রায়-পাড়ার শিব-মন্দিরের সুমুখে বিস্তর লোক জড় হইয়াছে। কোথাকার পাগড়ি-বাঁ বিদেশী একটা লোক ডুগডুগি বাজাইয়া বাঁদর নাচাইতেছে।

হিরণ ওদিককার ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। কির ঢুকিল এদিককার ভিড় ঠেলিয়া। গোলাকার চক্রের এব দিকে দাঁড়াইয়াছে হিরণ, আর একদিকে কিরণ। হঠা এক সময় মুখ তুলিতেই দু'জনের চোখাচোখি দেখা! হিরণ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, কিরণও হাসিল।

বাঁদরনাচ শেষ হইতেই দেখা গেল, হিরণ ও কি দু'জনে এক সঙ্গে পাশাপাশি পথ চলিতেছে। এবং চলিতে বাড়ী যাইবার ঠিক উল্টা দিকে।

—আমি মণ্টিকে মারিনি। সত্যি বলছি আমি মারি

—আমি গোলাপফুল ছিঁড়িনি ত'! তোর মা'টা অ মিছিমিছি কাকাবাবুকে বলে দিলে।

—আমি মামার বাড়ী চলে যাব। আমার মামা সে বলে গেছে।

কথাটা শুনিয়া নিতান্ত বিমর্ষমুখে কিরণ আবার হির মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'আমার মামা নেই ভ মামার বাড়ীতে কেউ নেই, নইলে আমিও চলে যে আবার কবে আসবি?'

হিরণ বলিল, 'সেইখানেই থাকব। আর আসব না

—কবে যাবি?

—তার এখনও কিছু ঠিক নেই। মামা এসে নিয়ে যাবে।

কিরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

গ্রামের বাহিরে প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা ডাঙ্গার মাঝখানে ছোট্ট একটি আমের বাগান। ডাঙ্গার নীচে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া গ্রামের কয়েকজন রাখাল তখন এই বাগানের গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া গান গাহিতেছিল। হিরণ ও কিরণ তাহাদেরই কাছে আর একটা গাছের তলায় গিয়া বসিল। সেদিন ছিল শনিবার। সকাল সকাল স্কুলের ছুটি হইয়াছিল। বসিয়া বসিয়া তাহারা কত যে গল্প করিল, তাহার আর অন্ত নাই। হিরণ বলিল, তার মামা না কি খুব বড় লোক। সেখানে তাহার মামা আছে, মামীমা আছে, দিদিমা আছে, ঘোড়ার গাড়ী আছে, মোটরকার আছে, সুতরাং সেখানে গিয়া সে বেশ সুখেই থাকিবে। কিরণ বলিল, তাহার বাবা না কি তার জন্য একটি সাইকেল কিনিয়া দিবে বলিয়াছে। তাহার মামার বাড়ী থাকিলে সেও যাইত। কারণ এ মা'টাকে তাহার ভাল লাগে না। হিরণ বলিল, তাহার মাও না কি তাহাকে একদিন মারিয়াছিল, কথাটা তাহার বাবাকে বলিয়া দিতেই সে না কি তাহার মাকে খুব বকিয়াছে। কিরণ বলিল, তাহার মা না কি তাহাকে রোজই বকে, রোজই মারে, অথচ সেকথা বাবাকে বলবার জো নাই। বলিলে ভাল করিয়া খাইতেও দেয় না।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল, উহারা তাহাদের নিজের মা নয়। তাহারা দু'জনেই যখন নিতান্ত ছোট তখন তাহাদের দুইটা মাই মরিয়া গিয়াছে।

কিরণ বলিল, 'আচ্ছা ভাই, মানুষ মরে' কোথায় যায়?'

হিরণ বলিল, 'স্বর্গে যায়, আবার কোথায় যাবে।'

'স্বর্গ ত' ওই আকাশের ওপারে, সেখান থেকে পাখী হয়ে উড়ে আসতে পারে না?'

হিরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। ভগবান কিছুতেই আসতে দেয় না।'

হিরণের কথাটা কিরণকে মানিয়া লইতে হইল। কারণ, কিরণের চেয়ে সে ছ'মাসের বড়।

কিরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ঠিক ভাই। তা নইলে

সেই যেদিন বাবা আমাকে খুব বকেছিল না, সেদিন আমার ভারি কান্না পেতে লাগল, আমি একাই চলে গেলুম বড় পুকুরের পাশে সেই অর্জ্জুনগাছটার কাছে কেউ কোথাও ছিল না, ভারি ভয় পাচ্ছিল। মাঠের ধারে চুপটি করে বসলুম, তার পর ডাকলুম, মা! মা! ডাকতে ডাকতে কেঁদে ফেললুম। মা কিন্তু এলো না।'

হিরণ বলিল, 'আমিও কতদিন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডেকে দেখেছি। কিছুতেই আসে না।'

'বিকেল হয়ে গেল। চল্ যাই, নইলে বক্‌বে।' বলিয়া দু'জনেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ বলিল, 'বাড়ীতে নাই বা কথা বললুম, আমরা ইস্কুলে কথা বলব।'

হিরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, আমাদের কখনও ঝগড়া হবে না। ওরা করুক্‌গে ঝগড়া।'

কিরণ বলিল, 'ওরা ঝগড়া করলে ত' আমাদের কি? আমরা ঠিক থাকবো।'

তাহার পর তাহারা দুইজনে বই ছুঁইয়া শপথ করিল। সাক্ষী রহিল বাগানের বুড়া আম গাছটা!

হিরণের মামা সত্যই একদিন হিরণকে লইতে আসিল।

কিন্তু যে হিরণ মামার বাড়ী যাইবার জন্য একদিন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই হিরণ কিছুতেই যাইতে চাহিল না। বলিল, 'মাইনর পরীক্ষাটা এখান থেকে পাশ করি, তারপর ওখানে গিয়ে বড় ইস্কুলে ভর্ত্তি হব।'

হিরণের মামা বলিল, 'সেই ভাল।'

হিরণের বাবা তখন কিছুই বলিল না, কিন্তু মামা তাহার চলিয়া যাইবার পরেই হিরণকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গেলি না যে?'

হিরণ জবাব দিবার আগেই বড় বৌ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিরণের সঙ্গে যে ভাব হয়েছে! যেতে পারবে কেন?'

হিরণের বাবা বলিল, 'বটে! লেখাপড়া তা হলে তোমার কিছুই হচ্ছে না বল।'

বড় বৌ বলিল, 'ছাই হচ্ছে! বাড়ীতে ত' থাক না; থাকলে বুঝতে পারতে।'

হিরণের বাবা বলিল, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি কালই বিদেয় করছি।'

এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিবার জন্য মামাকে সে তাহার আবার আসিতে লিখিল।

এবার তাহাকে মামার বাড়ী যাইতেই হইবে।

ইস্কুলে সে কথা সে কিরণকে বলিতে পারে নাই, বাড়ী ফিরিবার পথে কে যে কখন্ চলিয়া আসিয়াছে জানা যায় নাই, কাজেই সে-দিন সন্ধ্যায় সে কিরণদের বাড়ার দরজায় ঘোরা-ফেরা করিতেছিল।

বড়-বৌ তাহার স্বামীকে বলিল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

'কেন?'

'তুমি একবার উঠেই এসো না! আমি সৎ-মা, ভাবতে পার হয় ত' সৎ-ছেলের ওপর আমার রাগ আছে। কিন্তু ওই ত্থাখো !'

হিরণের বাবা হিরণের কাণে ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। তাহার পর প্রহার!

হিরণ সারারাত্রি ঘুমাইল। কত যে কাঁদিল, তাহার আর অন্ত নাই।

তাহার পর মামার সঙ্গে একদিন সে সত্যসত্যই মামার বাড়ী চলিয়া গেল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিল—জীবনে আর কখনও সে এখানে আসিবে না।

কিরণ পড়িয়া রহিল তাহাদের গ্রামে।

হিরণের জন্য এক একদিন তাহার মন কেমন করে। মনে হয়, তাহাকে সে একখানা চিঠি লিখিবে। কিন্তু ঠিকানাও জানে না। জ্যেঠা মশাইকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করে।

কিরণের বাবা শনিবার দিন সন্ধ্যায় বাড়ী আসে, রবিবার থাকে, আবার সোমবার কাজের জায়গায় চলিয়া যায়। কিন্তু বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে, বেচারা একদণ্ডের জন্যও শান্তি পায় না। কিরণের মা বলে, 'কিরণকে হয় তুমি নিজের কাছে নিয়ে যাও, আর নয় ত' কোথাও কোনও বোর্ডিংএ রেখে দাও গে।'

কিরণ বলে, 'না গেলেই নয়! কেন, তুমি যাও মা তোমার বাপের বাড়ী!'

ছোট বৌ বলে, 'শোনো, ছেলের কথা শোনো! চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে ওই রকম করে।'

কিরণ সহ্য করিবার ছেলে নয়। বলে, 'করবে না? নিজের ছেলে-মেয়েগুলিকে নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত। রোজ আমাকে পান্তা ভাত খেয়ে ইস্কুলে যেতে হয় বাবা।'

কিরণের বাবা ছোট বৌ-এর মুখের পানে তাকায়। ছোট বৌ জিব কাটিয়া বলে, 'কি মিথ্যেবাদী ছেলে বাবা! ওরে, সৎ-মার নামে ওরকম করে' দোষ দিস্‌নি, সবাই ভাববে হয় ত, সত্যিই তাই করি।'

কিরণ বলে, 'না বাবা তুমি ওর কথা শুনো না। অমনি করে' দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছে। ভাল ও আমাকে একদম্ বাসে না, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যে ক'দিন বাড়ীতে থাকো সেই ক'দিন, বাস্!'

কিরণের বাবা বলে, 'আচ্ছা, এবার আমি বলে যাচ্ছি, আস্‌ছে শনিবার যখন বাড়ী আসবো তখন ও কি কি করে আমায় বলে' দিও।'

'বাস্! এইবার দেখাচ্ছি মজা!' এই বলিয়া কিরণ তাহার মাকে ভেংচি কাটিয়া বলিল, 'আর কিছু বলবে? দেবে পান্তা ভাত?'

কিরণের মা বলে, 'ত্থাখো গো ত্থাখো, কি রকম ভেংচি কাট্‌ছে ত্থাখো।'

কিরণের মাথায় ফট্ করিয়া একটা চড় মারিয়া দিয়া তাহার বাবা বলে, 'ছি! তুইও কম নোস্ দেখছি!'

কিরণ তাহার মাথাটা তাহার বাবার মুখের কাছে বাড়াইয়া দিয়া বলে, 'মাথায় ফুঁ দিয়ে দাও বলছি বাবা! মাথায় চড় মারলে চুল উঠে যায়।'

কিরণের মাথায় ফুঁ দিয়া তাহার বাবা বলে, 'তুমি যদি দুষ্টুমি করেছ শুনতে পাই ত' তোমাকে আমি সত্যি-সত্যিই বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দেবো।'

কিরণ বলে, 'হিরণ মামার বাড়ী চলে গেল, জানো বাবা? সৎ-মার কাছে কিছুতেই থাকতে পারলে না। আমার যে মামার বাড়ী নেই, থাকলে আমিও চলে যেতুম।'

এম্‌নি ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল।

মাইনর পাশ করিয়া কিরণ এনট্রান্স ইস্কুলে ভর্ত্তি হইল তাহাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে পলাশডাঙ্গা গ্রামে

সে ইস্কুল। তা হোক্। কিরণ হাঁটিয়াই যায়, হাঁটিয়াই আসে।

হিরণ ওদিকে কি করিতেছে কে জানে।

হিরণের সংবাদ কিরণ না জানিলেও আমরা জানি।

আমরা জানি সে ছেলে খুব ভাল। মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশোনা সে বেশ ভালই করিতেছে। মুখ তুলিয়া কাহাকেও একটি কথা বলিতে পারে না। অত্যন্ত লাজুক। কিরণের চেয়ে সে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে।

তাহার মামা সেদিন তাহার বাবাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছে।

লিখিয়াছে :

'হিরণ এখানে বেশ ভালই আছে। তাহার জন্য চিন্তা করিও না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিলেই আমি এখান হইতে তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিব। আমার এক শালীর পরমা সুন্দরী একটি কন্যা আছে। হিরণের সঙ্গে মানাইবে চমৎকার। আমি আমার শালীকে কথা দিয়া রাখিয়াছি। ইত্যাদি ইত্যাদি—

চিঠি পাইয়া হিরণের বাবা ঈষৎ হাসিল। ভাবিল, ভাগিনেয়ের প্রতি তাহার এই অসম্ভব মমতা সম্ভবতঃ কন্যাদায়গ্রস্ত শ্যালিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য। সে যাহাই হউক, চিঠির জবাবে লিখিল :

'বিবাহটা যেন আমাকে না জানাইয়া সারিয়া দিও না। বিবাহের পূর্ব্বে আমি যেন খবর পাই।'

চিঠি পাইয়া হিরণের মামাও ঈষৎ হাসিল।

হিরণ কিরণ করুক্ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। ততদিন আমরা না হয় অপেক্ষাই করি।

কিন্তু কিরণের বাবার বেতন কম, অথচ সংসারের খরচ বড় বেশী, অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। মাসের শেষে ইস্কুলের বেতন চাহিয়া চাহিয়া কিরণ হায়রাণ হইয়া যায়। ব্যাপারটা এতদিন কোন রকমে যদি-বা চলিতেছিল, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিবার পর বেতন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অচল হইয়া গেল।

কিরণ মুখ বুজিয়া সহ্য করিবার ছেলে নয়। বাবাকে বলিল, 'যাক্ তবে আর আমার পড়ে কাজ নেই বাবা, চাকরি-বাক্‌রির একটা চেষ্টা-চরিত্তির দেখি।'

কিরণের বাবা আম্‌তা-আমতা করিতে লাগিল।

কিরণ হাসিয়া বলিল, 'তোমাকে আর অমন করতে হবে না বাবা, আমি ত' আর ছেলেমানুষ নেই, আমি সব বুঝি।'

কিরণের পড়াশোনা সেইখানেই শেষ।

বাবা তাহার বিবাহের সম্বন্ধ দেখিতে লাগিল।

কিরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'সেটী হচ্ছে না বাবা। আমাকে বিক্রী করে' সেই টাকা নিয়ে যে তুমি আমার সৎ-বোনের বিয়ে দেবে, তা আমি হ'তে দেবো না। বিয়ে আমি করব না।'

বাবা তাহার অনেক বুঝাইল। কিন্তু কিরণের সেই এক কথা!

বলিল—'না বাবা। আমি হিরণ নই।'

সত্যই ত! হিরণের বিবাহের ব্যবস্থা ওদিকে একরকম সবই ঠিক হইয়া গেছে। এমন-কি যে-মেয়েটির সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে মামার বাড়ীতে আসিয়া অবধি প্রত্যহই সে তাহাকে দিবারাত্রি দেখিতেছে। হিরণের মামীমার বিধবা বোনের মেয়ে!

মেয়েটির নাম ছবি।

দেখিতে ঠিক ছবির মতই সুন্দরী বলিয়া বোধকরি তাহার ছবি নাম। গায়ের রং সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে, মুখখানি চমৎকার!

হিরণও আজকাল নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়। ছবি প্রথম প্রথম তাহার সঙ্গে বেশ ভাল করিয়াই কথা বলিত, জল চাহিলে জল দিত, হাসিত, কাছে আসিত, গল্প করিত, কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া না জানি সে বেশ বড় হইয়া উঠিল, তাহার সর্ব্ব অঙ্গে অকস্মাৎ কেমন যেন একটা আসন্ন যৌবনের সাড়া জাগিল, হিরণের সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া টানা টানা আয়ত চক্ষু দুইটি তাহার নীচের দিকে নামাইতে আরম্ভ করিল।

এখন আর সে তেমন করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না,

দূরে দূরে দুইজনের চোখোচোখি হইবা মাত্র ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে ছবি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢোকে। জানে যে হিরণ তাহার স্বামী, হিরণও জানে ছবিই তাহার স্ত্রী, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহটাই শুধু বাকী। তাহা ছাড়া মনে-মনে মিলন যেন তাহাদের হইয়া গেছে।

হিরণ সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া সুমুখে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ছবিকেই বলিল, 'এক গ্লাস জল দাও, ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে।'

জল দিতে গিয়াও জল সে দিতে পারিল না। দূরে তাহার মাকে আসিতে দেখিয়া লজ্জায় সে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ছবির মা আসিয়া বলিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বাবা!

হিরণ বলিল 'জল খাব।'

ব্যাপারটা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বুঝিলেন, ছবি লজ্জায় তাহাকে জল দেয় নাই।

'এসো বাবা এসো আমি জল দিচ্ছি।' বলিয়া হিরণকে তিনি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া ডাকিলেন, 'ছবি।'

ছবি ঘরের এক কোণে গিয়া একটা জানলার কাছে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি?'

'হিরণ জল চাইলে, দিলি না যে? দে জল দে।'

ছবি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া জল গড়াইয়া গ্লাসটি হিরণের কাছে নামাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তাহার মা তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'দাঁড়া!'

হিরণ জল খাইয়া গ্লাসটি নামাইয়া দিতেই ছবির মা আর এক হাত দিয়া তাহাকেও কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'মেয়েটাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ত' বাবা?'

ছবি একবার হিরণের মুখের পানে তাকাইয়াই হাসিয়া ফেলিল।

হিরণ কি আর বলিবে; সেও হঠাৎ হাসিয়া হেঁট মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু ছবির মা কিছুতেই ছাড়িলেন না, শেষ পর্য্যন্ত হিরণের মত লাজুক ছেলের কাছ হইতেও সম্মতি আদায় করিলেন। হিরণ তাহার মাথাটি ঈষৎ কাৎ করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

ছবির মা একবার ছবির দিকে একবার হিরণের দিকে বারংবার তাকাইতে তাকাইতে বলিলেন, 'আহা কেমন মানিয়েছে ভাখো ত!' বলিতে বলিতে বোধকরি আনন্দের আতিশয্যেই তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ওদিকে হিরণের বাবা বড় বিপদে পড়িয়াছে।

চাকরি করিয়া একটি পয়সাও সে জমাইতে পারে নাই। এদিকে এ-পক্ষের বড় মেয়েটি তাহার এমনি বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, বিবাহ তাহার না দিলেই নয়। মেয়ের বয়স খুব বেশী হয় নাই, কিন্তু গড়ন তাহার এমনি বাড়ন্ত যে, বারো তেরো বছরের মেয়ে—দেখিলে মনে হয়, যেন উনিশ বছরের। চেহারাও ভাল নয়। শুধু মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হইবার ভরসাও খুব কম। বিবাহ দিতে হইলে অনেকগুলি টাকার প্রয়োজন।

হিরণের বাবা তাহার স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গিয়া আপিস হইতে দিন কয়েকের ছুটি লইয়া কন্যার জন্য একটি পাত্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। যেখানেই যায় সেই খানেই চায় টাকা!

বিরক্ত হইয়া গিয়া শেষে একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে হিরণের মামার বাড়ীতে গিয়া হাজির।

গিয়াই বলিল, 'কোথায় হে রবি, তোমার সেই শালীর মেয়েটিকে দেখি একবার!'

হিরণের মামা রবি বলিলেন, 'কেন?'

'কেন আবার। মেয়েটি আমি একবার দেখবো না?'

'নিশ্চয়ই দেখবে' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে ছবিকে ডাকিয়া আনিল।

হিরণের বাবা বলিল, 'হুঁ, মেয়ে মন্দ নয়, কিন্তু টাকা কত দিতে পারবে বল দেখি?'

রবি বলিল, 'একটি পয়সাও দিতে পারবে না।'

নিজের কন্যার সম্বন্ধ করিতে গিয়া একে সে রাগিয়াই ছিল, তাহার উপর এই কথা শুনিয়া আপাদমস্তক তাহার জলিয়া উঠিল। বলিল, 'বিয়ে তা'হলে বন্ধ হলো।'

রবি বলিল, 'অসম্ভব। আমি তাদের কথা দিয়েছি। সবই একরকম পাকাপাকি স্থির হয়ে গেছে।'

হিরণের বাবা বলিল, 'ছেলের অভিভাবক আমি না তুমি ?'

'যেই হোক, বিয়ে এখানে দিতেই হবে।'

'আমার টাকার দরকার। টাকা না পেলে বিয়ে আমি কিছুতেই দেবো না।'

'টাকা যার নেই সে দেবে কেমন করে ?'

'আমারও মেয়ের বিয়েতে সবাইকে সেই কথাই বলছি, কিন্তু কেউ শুনতে চায় না। সবাই টাকা চায়।'

রবি বলিল, 'বুঝেছি। হিরণের বিয়ের টাকা নিয়ে তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে চাও ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা আগেই তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনের কথাকাটাকাটি চলিল।

হিরণের বাবা বলিল, 'তোমারও ত' টাকা আছে রবি, তুমিই না হয় সে-টাকাটা দিয়ে দাও।

হিরণের মামা রবি বলিলেন, 'দিতে পারতুম কিন্তু সে-টাকায় হিরণের কোনও উপকার হবে না, হবে তোমার। কাজেই টাকা আমি দেব না।'

হিরণের বাবা শেষ পর্য্যন্ত রাগ করিয়া বলিয়া বসিলেন, 'তা হলে হিরণকে আমি আজই এখান থেকে নিয়ে চললুম।'

হিরণের মামা রাগ করিয়া বলিল, 'আচ্ছা নিয়ে যেতে পার।'

বাস্ সেইখানেই হিরণের পড়াশুনা খতম! মামার উপর রাগ করিয়া হিরণের বাবা তাহাকে লইয়া আসিল।

অনেক দিন পরে হিরণ গ্রামে ফিরিয়াছে।

কিরণ কাহারও কথা শুনিল না। জানিত, তাহাদের উভয় পরিবারের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নাই, তবু সে হিরণদের দরজায় গিয়া ডাকিল, 'হিরণ!'

হিরণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'চলে এলি যে ?'

হিরণ বলিল, 'বাবা নিয়ে এল।

'পড়াশুনো হয়ে গেল ?'

হিরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

কিরণ বলিল, 'আমারও হয়ে গেছে।' বলিয়াই সে হাসিতে লাগিল।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে হিরণের বাবা ডাকিল, 'হিরণ!'

হিরণ বলিল, 'বাবা ডাকছে। দাঁড়া শুনে আসি।'

কিন্তু শুনিয়া আসিতে গিয়া যাহা সে শুনিল, তাহা নিদারুণ!

হিরণের বাবা বলিল, 'ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা নেই। কিরণের সঙ্গে কথা কোস্ না।'

হিরণ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরণ আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে ? ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল।

হিরণের বাবা দিনকয়েক এ গ্রামে সে-গ্রামে খুব ঘোরা-ফেরা করিল, তারপর হঠাৎ একদিন হিরণদের বাড়ীতে বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। হিরণের বিবাহ-সংবাদটা শুনিয়া কিরণ আর কিছুতেই থাকিতে পারিল না। হিরণদের বাড়ীর দরজায় গিয়া দেখিল হিরণ দাঁড়াইয়া আছে। কাছে গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তোর বিয়ে না কি রে হিরণ ?'

হিরণের বাবা যে দরজার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, কিরণ এতক্ষণ তাহা দেখিতে পায় নাই। হিরণ কথা কহিতেছে না দেখিয়া হঠাৎ সেদিকে তাহার নজর পড়িল। নজর পড়িতেই মুখ নীচু করিয়া সে ফিরিয়া গেল। চোখ দু'টা তাহার ছলছল্ করিতে লাগিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে হিরণের সঙ্গে কখনও কথা বলিবে না।

হিরণের বৌ হইল কালো এবং কুৎসিত। হিরণের মনের মত মোটেই নয়।

হিরণের বাবা বলিল, 'তা হোক্। মেয়েমানুষ বেশী সুন্দরী হওয়া ভাল নয়, অহঙ্কারে মাটিতে তাদের পা' পড়ে না। গেরস্ত-বাড়ীতে এই ভাল।'

হিরণ মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিতে লাগিল। বাপ হইয়া

জানিয়া শুনিয়া এ শত্রুতা তিনি যে কেন করিলেন, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। কদাকার কুৎসিত যে মেয়েটার মুখের পানে তাকাইতে ঘৃণা করে, তাহাকে ভাল বা সে বাসিবে কেমন করিয়া, তাহাকে লইয়া ঘর-সংসারই বা করিবে কোন্ সুখে?

রাগে অভিমানে হিরণের আপাদমস্তক জ্বালা করিতে লাগিল।

হিরণের মামার রাগ বড় কম হয় নাই। শালীর কন্যাটি অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে, বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলেই নয়। হিরণের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রখানা পাইবামাত্র সে ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর বিবাহ চুকিয়া গেলে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একদিন সে হিরণদের গ্রামে আসিয়া ঢুকিল।

গ্রামে আসিল বটে, কিন্তু হিরণদের বাড়ী গেল না। ধীরে-ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে গিয়া ঢুকিল কিরণদের বাড়ীতে।

কিরণের বাবা বলিয়া উঠিল, 'কি হে, রবি কি রকম—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া রবি ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। বলিল, 'চুপ কর ওরা শুনতে পাবে। আমি লুকিয়ে এসেছি।'

তাহার পর একে একে হিরণের বাবার সব কথাই তাহাকে খুলিয়া বলিল। বলিল, 'আমি ভাই, কিরণকে নিতে এসেছি।'

'কিরণের সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে দেবে বুঝি?'

রবি বলিল, 'হ্যাঁ।'

কিরণের বাবা বলিল, 'কিন্তু আমারও ত' ভাই সেই এক সমস্যা। আমারও মেয়েটি –'

'বুঝেছি, তুমিও কিছু টাকা চাও, এই ত? তা বেশ, টাকা আমি দেবো।'

কিরণের বাবা বলিল, 'তাহ'লে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

হিরণ দিবারাত্রি মুখ ভারি করিয়া থাকে। বিবাহের আটদিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হয়। শ্বশুরবাড়ী হইতে হিরণকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছে। হিরণ বলিয়া বসিল, 'আমি যাব না।'

হিরণের বাবা তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

হিরণ রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

হিরণের বাবা ডাকিল, 'হিরণ, শোন্! ফিরে' আয়।'

হিরণ কিছুতেই ফিরিল না। বাবা ভাবিল, এখনই হয় ত' ফিরিয়া আসিবে।

কিন্তু সে ফিরিয়াও আসিল না, শ্বশুরবাড়ীও গেল না, একেবারে গিয়া উঠিল তাহার মামার বাড়ীতে। এ-বিবাহ তাহার বিবাহই হয় নাই। এ বৌকে সে লইবে না। ছবিকেই সে বিবাহ করিবে। হিন্দুদের দুবার বিবাহে দোষ নাই।

মামার বাড়ীতে গিয়া দেখিল, বাড়ীর দরজায় পাল্‌কি দাঁড়াইয়া আছে। পাল্‌কি ঘিরিয়া অনেক লোকজন। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য হিরণ তাড়াতাড়ি পাল্‌কির কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই যাহা দেখিল, তাহা দেখিয়া মাথাটা তাহার ঘুরিয়া গেল। ছবির বিবাহ গত রাত্রে চুকিয়া গেছে, নব-বিবাহিতা বধূকে লইয়া পাল্‌কি চড়িয়া বর চলিয়াছে ষ্টেশনে!

পরমা সুন্দরী বধূ—তাহার সেই ছবি বসিয়া আছে মাথা নীচু করিয়া, আর তাহারই পাশে বরের বেশে বসিয়া আছে কিরণ!

হিরণ ডাকিল, 'কিরণ।'

বাপের ভয়ে হিরণ একদিন তাহার ডাকে সাড়া দেয় নাই কিরণের কাছে তাহার বাবা দাঁড়াইয়া ছিল না, সুতরাং সেও যে তাহার বাবার ভয়ে সাড়া দিল না তাহা নয়। কিরণ বোধ-করি অভিমান করিয়াই মুখ নীচু করিল।

হিরণ না পারিল মামার বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইতে, না পারিল পাল্‌কির পিছু পিছু ছুটিতে। এতগুলা লোকের মাঝখানে সে যে কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা জানিল একমাত্র সে আর তাহার অন্তর্যামী!

ইউরোপে গ্রীষ্মের ছুটি

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

হোলিশোভ হইতে প্রাহা হইয়া ব্রাটিস্লাভার উত্তরে তির্নাভা (Trnava) নামক স্থানে আসিলাম। এটি স্লোভাকিয়ার একটি সহর। প্রাহায় এক ভদ্রলোক আলাপ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, তিনি আগে স্কুল-মাষ্টার ছিলেন, এখন আবার ইউনিভার্সিটিতে সাইকলজি পড়িতেছেন। তির্নাভাতে তাঁর বাড়ী। মুখের নিমন্ত্রণ ছাড়া পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতেছিলেন, কাজেই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রাহা হইতে ইঁহাকে আগমন-সংবাদ জানাইয়া টেলি-গ্রাম পাঠাইতে ডাকঘরে গেলাম। তার আগে লেস্নীর সঙ্গে হোটেলে লাঞ্চ খাইয়াছিলাম। এ দেশের ভদ্রতার নিয়ম যে, বাড়ীতে অতিথি আসিলে তার টুকিটাকি খরচের ভারও গৃহকর্ত্তা বহন করেন। কিন্তু লেস্নীর ধারণা যতদিন চেকোস্লোভাকিয়ায়, অন্ততঃ প্রাহায় আছি, ততদিন তাঁর বাড়ীতে বাস না করিলেও আমি তাঁর অতিথি, বিশেষতঃ যতক্ষণ তিনি সঙ্গে থাকেন। একবার দোকানে গিয়াছি, প্রোফেসর সিগারেট কিনিবেন, আমারও মনে পড়িল, ডাক-টিকিট কিনিতে হইবে (এখানে ডাক-টিকিট সিগারেটের দোকানেই পাওয়া যায়, কারণ দুইটিই ষ্টেট্ মনপলি, ইটালিতেও এইরূপ দেখিয়াছি); টিকিটের দাম কিন্তু প্রোফেসার কিছুতেই আমাকে দিতে দিলেন না। বলিলেন, "আরে না না, সে কি হয়? আপনি আমাদের অতিথি!" ইহার পর প্রোফেসারের সঙ্গে বাহির হইলে কিছু কেনা সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিতাম। ডাক-ঘরটি প্রোফেসারের বাড়ীর কাছে, বলিলেন, "চলুন আপনাকে দেখাইয়া দিই।" সেখানে গিয়া খাম ভর্ত্তি করিয়া কাউণ্টারে পয়সা যেই দিতে যাওয়া, অম্‌নি প্রোফেসার অছিলা করিলেন,



ব্রিন।

তাঁরও কিছু ষ্ট্যাম্প কেনা দরকার। অতটা খেয়াল হয় নাই যে, ডাক-ঘরেও আমি তাঁর অতিথি, কিন্তু প্রোফেসার দৃঢ়মুষ্টিতে হাত চাপিয়া ধরিয়া আমার টেলিগ্রাম খরচা দেওয়া অসম্ভব করিয়া দিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রোফেসারের সদাশয়তা এইরূপ দাঁড়ায়—তাঁহাকে হয়ত বাড়ীতে টেলিফোন করিতেছি, জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যালো, হ্যালো! শুনুন, কোথা হইতে টেলিফোন্ করিতেছেন?" বাসা হইতে বা রাস্তা হইতে বলিলাম।

"পয়সা লাগিল তো?"

"হাঁ, তা লাগিবে বৈকি!"

"দেখুন দেখি! কেন মিছা পয়সা খরচ করিলেন? আমার ক্লাবে গিয়া কেন আমার নাম করিয়া টেলিফোন করিলেন না?"

"সেটা যে অনেক দূর, প্রোফেসার! আমাকে কি টেলিফোন খরচার দেড়া ট্রামভাড়া দিয়া আপনার ক্লাবে যাইতে বলেন?" তখন প্রোফেসার অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া খুব নরম গলায় আরম্ভ করিলেন "তাও তো বটে! কিন্তু দেখুন, আপনি আমাদের অতিথি—"

এক্সপ্রেস ট্রেনে সারারাত কাটাইয়া ভোরে ব্রাটিস্লাভা পৌঁছিলাম। রাত ৩টা ৪টার পর হইতে বহুলোক সেকেণ্ড ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসের করিডোরে চাপিয়া ব্রাটিস্লাভা পর্য্যন্ত আসিল, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটধারী মনে হইল না, অনুমান করিলাম, ট্রেন-কণ্ডাক্টার ঘুঁষ লইয়া শেষ রাত্রিটুকু ইহাদের সেকেণ্ড ক্লাসে চাপিতে দিয়াছে। এখানে ট্রেনে, বিশেষতঃ এক্সপ্রেস ট্রেনে, গাড়ী প্রথম ষ্টেশন হইতে ছাড়ার পর কণ্ডাক্টার আসিয়া যাত্রীদের টিকিট চেক করিয়া গাড়ীর দরজায় কতকগুলি নম্বর খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া যায়। ইহাতে বোঝা যায়, সে-কামরায় কয়জন লোক চলিতেছে। পথের ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেই এই নম্বর দেখিয়া কণ্ডাক্টার বুঝে কোন কামরায় নূতন লোক উঠিয়াছে, আসিয়া তাহার টিকিট দেখে। এবার যেখানে আমি সারারাত একলা ছিলাম, সেখানে কামরা ও করিডোর ভর্ত্তি করিয়া লোক উঠিল, কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে কণ্ডাক্টারের শুভাগমন হইল না। ঘুঁষ-ঘাঁষ এ দেশে চলে।

তিরনাভা ছোট পুরাতন সহর। স্লোভাকিয়া বোহেমিয়ার চেয়ে দরিদ্র দেশ, রাস্তাঘাটও খারাপ, সহরও পরিষ্কার নয়। এখানে অনেক পুরাতন গির্জ্জা আছে বলিয়া সহরের নাম "ছোট রোম"। যাহাদের অতিথি হইলাম, তাহারা ইহুদী, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। এ অঞ্চলে বহু ইহুদি, অবস্থাও ইহাদের বিশেষ ভাল নয়। পরিবারে দুটি ভাই, দুটি বোন ও বুড়ী মা। ছেলে দুটি বলে যে পড়ে, কিন্তু কিছুই করে না বলিয়া মনে হইল। বড় মেয়েটি একটি অপিসে চাকরি করে, ছোট মেয়েটি বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম করে। বড় মেয়েটির একটি বন্ধু আছে, প্রায় সময়ই লোকটি এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। ছোট মেয়েটির বন্ধু বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিসে গিয়াছে। ইঁহারা যত্ন করিলেন খুব।

একদিন এখানকার একটি চিনির কারখানা দেখিলাম, এটা চেকোস্লোভাকিয়ার বৃহত্তম চিনির কারখানা, দৈনিক ৩২ মালগাড়ী চিনি উৎপন্ন হয়। কর্ত্তারা প্রথমে দেখাইতে দিতে উৎসাহী ছিলেন না, সঙ্গে ইঁহাদের নামে কোন সুপারিশও ছিল না। ইঁহাদের সন্দেহের কারণ যে, পাছে কোন ট্রেড্-সিক্রেটের (trade-secret) উপর গোয়েন্দাগিরি হয়। আমার বন্ধু আমার পরিচয় দিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের ডক্টর?" বন্ধু জানাইলেন, ডক্টর ডের্ ফিলোজোফী। কেমিষ্ট্রি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডক্টর নই জানিয়া তাঁহারা একটু আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু তবু আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি নির্ব্বিকার ভাব ধারণ করিয়া রহিলাম। অবশেষে অনুমতি মিলিল। চিনির উৎপাদন যে এত জটিল ও ইহাতে এত বৃহৎ যন্ত্রপাতি লাগে, তাহা আগে ধারণা ছিল না। আমাদের ভারতীয়দের মুখে বোধ হয় একটা সাধুতা ও সত্যের আভাস থাকে, অনেক জায়গায় দু' মিনিটের মধ্যে অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া এ ধারণা আমার দৃঢ় হইয়াছে। "সৎলোক তোমাদেরই দেশে, এখানে ওটা পাইবে না" এ কথাও বহু পাকা ব্যবসায়ী লোকের মুখে শুনিয়াছি। মনের ও জীবনের অনেক গুপ্ত কথা বয়স্ক লোকে পরম আত্মীয় ভাবে বলিয়াছে, যে সব কথা কেউ কাহাকে বলে না। একদিন এখানে পথে ফটো তুলিতেছিলাম, একটি ভদ্রলোক সেই জায়গায় তাঁর নিজের তোলা কতকগুলি ফটো উপযাচক হইয়া দেখাইলেন, অনেকগুলা কপি দিয়াই দিলেন, তাঁর বাড়ীতে কিছু আর্ট-সংগ্রহ আছে, দেখিয়া যাইতে বলিলেন, ও পরে একটি কেকের দোকানের মালিকের বাড়ী লইয়া গেলেন। এই কেক-ব্যবসায়ীর অনেক পুরাতন ঘটপাত্রাদির সংগ্রহ আছে, যেন একটি ছোট মিউজিয়ম। ইঁহার বোন

আমেরিকায় চাকুরি করিয়া অনেক টাকা জমাইয়া ফিরিয়াছেন, তাহাতে কেক ব্যবসায়ের প্রসার হইয়াছে। ভদ্রলোক বাড়ীঘর, কেকের কারখানা সব দেখাইলেন, কেক কফি খাওয়াইলেন, শেষে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তাঁর স্ত্রী তাঁর প্রৌঢ় বয়সে তাঁকে ত্যাগ করিয়া অন্যলোকের রক্ষণে আছে, প্রভৃতি অনেক কথা জানাইলেন।

স্যাটার্ডে এ্যাড্‌ভেন্টিষ্টস্ (Saturday Adventists) খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের একটি চক্রের সঙ্গে আলাপ হইল। খৃষ্ট ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় মতামত, যথা ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যীশুর ঈশ্বর-পুত্রত্ব ও কুমারীর গর্ভে পবিত্র আত্মার ঔরসে নিষ্পাপ জন্ম, পুনরুত্থান প্রভৃতিতে প্রায় কোন লোকই এ দেশে আজকাল বিশ্বাস করে না। তবে গোঁড়ারা অতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিবা ক্যাথলিক, কিবা প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট, কিবা ইহুদী। "তোমাদের ধর্ম্মে বিশ্রামবার কোন্‌টা ?" ইহুদীরা ও শনিবাসরীয়েরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাদের ধর্ম্মে বিশ্রামবার নাই (অর্থাৎ, ভগবান্ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করেন নাই) শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

এখানে সপ্তাহে একদিন হাট হয়, গ্রামের লোকজন আসে, গ্রাম্য লোকের বেশভূষা বেশ দেখা যায়। মেয়েদের বহুবর্ণের বিচিত্র পরিচ্ছদ অনেক দেখা গেল। একটা বড় হাট দেখিলাম, এটি বৎসরে তিনবার হয়। দুঃখের বিষয় তরিতরকারী ছাড়া গ্রামে উৎপন্ন আর কিছু দেখা যায় না, সহরে প্রস্তুত জিনিষই গ্রামবাসীরা কিনিতে আসে। এক রকম লঙ্কা এ দেশে হয়, ঝালহীন ও বড় আমের মত আকার, ভিতরে ফাঁপা, সাধারণ তরকারি রূপে বা ভিতরে মাংস প্রভৃতির পুর দিয়া রান্না করা হয়। শশা, তরমুজ, কুমড়াও বড় আকারের হয়, কুমড়াগুলি সুন্দর টুকটুকে লাল রংএর হয়, ক্ষেতের উপরে ভারি সুন্দর দেখায়।

একটা প্রথা এখানে সব ছোট জায়গায় লক্ষ্য করিলাম, সহরের মোটা প্রধান রাস্তা, সেখানে সন্ধ্যার সময় সব লোক জড় হয়, সবাই পায়চারি করিয়া রাস্তাটা বহুবার পারাপার করে। যেখানটা যুবকদের আড্ডা, সেখানে রাস্তার মাঝখান দিয়া তরুণীরা ছোট ছোট দলে হাত ধরাধরি করিয়া হাসি-গল্প করিতে করিতে যাতায়াত করে, ভাবটা কিন্তু যেন হাওয়া খাওয়া ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই। আর যেখানটা দিয়া মেয়েরা যাতায়াত করে, যুবকরা সেখানে কোণে কোণে, আশে পাশে, মোড়ে মোড়ে



বাটিয়া কারখানার জুতা সেলাইয়ের কল।

নিজেদের দলে নানারূপ আলোচনা-চর্চ্চায় মগ্ন থাকে, যেন তরুণীদের দেখেই নাই।

তিরনাভা হইতে আর একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণে এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনে উত্তরে দেড় ঘণ্টার পথ নোভে মেষ্টো (Novo Mesto) নামক ছোট সহরে আসিলাম। এই নামের গোটা চারেক সহর এ রাজ্যে আছে, নামের অর্থ "নূতন সহর", তাই প্রত্যেকটার নামের পিছনে একটা করিয়া বিশেষণ আছে। এটির বিশেষণ নাদ ভাহোম্ (Nad Vahom), অর্থাৎ,

তাক্-নদীর ধারে। প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে সুন্দর, চারিপাশে পাহাড়। বন্ধুটি ল পড়েন, ইনিও ইহুদী, বাপ অ্যাড্‌ভোকেট, অবস্থা বেশ ভালই, বাপের অপিসেএকজন সহকারী ও দুজন মেয়ে-কেরাণী। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই বন্ধু জানাইলেন, তাঁদের পারিবারিক খবর একটু আমাকে দেওয়া আবশ্যক, তাঁর বাপ মা ডিভোর্সড্ হইয়াছেন, মা এই সহরেই আর একজনকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে ছেলেদের সম্বন্ধ ভালই, মার বাড়ীতেও আমরা যাইব। তাক্ নদীতে স্নান করিলাম। আশে পাশে বেড়াইলাম। একটি জিপ্‌সিদের বস্তীতে গিয়া তাদের বাড়ীঘর জীবন-যাত্রা দেখিলাম, জিপ্‌সি ভাষায় দু একটা কথাও বলিলাম। পরেও অন্যত্র গ্রামে বা পথে জিপ্‌সি দেখিয়াছি। ভারি দুষ্ট ইহারা। প্রত্যেকটার চোর বদমায়েসের মত চেহারা, সদা পয়সালোলুপ, আকৃতি পুরা ভারতীয়। এখানেও অনেক ইহুদী। দুই তিনটি সিনাগগ দেখিলাম, একটির উপাসনায় যোগ দিলাম ও পরে মন্দির-রক্ষক মন্দিরের সব অংশ, Holy of Holies প্রভৃতি দেখাইলেন। রেলে করিয়া পাশের একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রামে চাষাদের বাড়ীঘর দেখিলাম,—নোংরা ও বোহেমিয়ার চেয়েও দরিদ্র। এক চাষা বলিল, সে আমেরিকায় গিয়াছিল। অনেক গরীব লোক এ দেশে বাহিরে চাকরি করিতে যায়, বিদেশে দু'পয়সা রোজগার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া জমিজমা কিনিয়া চাষবাস করে। কাছাকাছি অনেক পাহাড়ের মাথায় পুরাতন ক্যাস্‌ল দেখিলাম। এটির সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে সেখানে এক রাজকুমারী রাজ্যের কুমারী মেয়েদের ধরিয়া আনিয়া তাহাদের রক্তে স্নান করিতেন। দূরের দুই গ্রামে বন্ধুর দুই জমিদার কাকা থাকেন। মোটরে গিয়া তাঁহাদের বাড়ীঘর, গরুবাছুর, শূকর প্রভৃতি দেখিলাম। একজনের একটা স্পিরিটের কলও আছে। বেশ সম্পন্ন ও সুশিক্ষিত পরিবার। বন্ধুর মা'র নূতন বাড়ীতেও প্রায়ই লঞ্চ বা কফির নিমন্ত্রণ থাকিত, ইঁহার নূতন স্বামী ডাক্তার। মা খুব বুদ্ধিমতী, অন্য কথার মধ্যে বলিলেন, "কুড়ি বছর ডক্টর বার্গারের (আমার বন্ধুর বাপ) সঙ্গে ছিলাম, এখন তিন বছর ডক্টর ভিণ্টারের সঙ্গে আছি।" ডক্টর ভিণ্টারের বাড়ীতে একজন পিয়ানোর বুড়া মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ হইল। ভদ্রলোক রুশিয়ান, এখন থাকেন ভিয়েনায়, ছুটিতে এখানে কাটাইতেছেন। চেহারা হুবহু পুরাতন ইংরেজি ছবির বুড়া পিয়ানো-মাষ্টারের মত। রকম-সকম পাগলের মত, পিয়োনো ছাড়া সংসারে আর কিছুরই জ্ঞান নাই, স্নান না কি জীবনে করেন না, সকালে উঠিয়াই অর্দ্ধোলঙ্গভাবে পিয়ানোতে বসিয়া যান।

বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর একটি ছোট ভাই, বাপ ও হাউস্‌কীপার। হাউসকীপারের একটা পাগলাটে ছোট ছেলে আছে, সেটা খাওয়ার সময় টেবিলের তলায় গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া পায়ে সুড়সুড়ি দিত। অনেক লোকের সঙ্গে এখানে আলাপ হইল। ভারত সম্বন্ধে ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজ, লোকাচার, পলিটিক্‌স, ঐতিহ্য, প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্তি বোধ হইত। এই কয় সপ্তাহ ক্রমাগত নূতন জায়গায় ঘুরিতেছি, আর বহুবার একই প্রশ্নের ও নূতন নূতন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সময়ে সময়ে মেজাজ খারাপ হইয়া যাইত। তার উপর বন্ধুর বাপ বসিলেন এক হাঙ্গেরিয় ভাষার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া, ভারতীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ এক একটা পড়িতেছেন আর প্রশ্ন নোট করিয়া রাখিতেছেন, খাওয়ার সময় এগুলি আমার সঙ্গে চর্চ্চা করিতেছেন, ভুলচুক বুঝাইয়া দিতে হইতেছে। প্রতিদিন পিতাপুত্রে আমাকে লইয়া কাফেতে যাইতেন, সেখানে জিপসি বাজনা, স্লোভাকিয় গান শুনিতাম আর অবিশ্রাম ভারতীয় আলোচনা! ছোট ভাইটিকে দাদা ও বাপ দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার চুমা খাইতেন। উঠিয়া সে দাদার বিছানায় আসিয়া খানিকক্ষণ দাদাকে জড়াইয়া থাকিত। মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলির, বিশেষতঃ এখানকার ইহুদীরা অনেকটা ওরিয়েণ্টাল স্বভাবের। একদিন মা বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছেলেদের ডাকাইয়া পাঠাইলেন, একদিন তিনি বাড়ীর মধ্যেই আসিয়া দু' মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলিয়া গেলেন, বুড়া অ্যাড্‌ভোকেটের সঙ্গে শুধু মৌখিক 'শুভদিন' বিনিময় হইল, করমর্দ্দন হইল না। ইহুদীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে দেখিলাম, ইউরোপীয়

ডিসিপ্লিনের অভাব, প্রকৃতিটা একটু যথেচ্ছ, স্বার্থসিদ্ধি ও ঐহিক লাভই একমাত্র গণনা করে এবং তাহাতে কোন নীতি বা প্রিন্সিপ্‌লের বাধা মানে না।

একদিন আহারের টেবিলে দেখা গেল সেই খরগোস উপস্থিত! একটু দুর্গন্ধ নাকে আসিল, পচার মত। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, টাটকা মাংসে না কি বুনো গন্ধ থাকে, তাই সেটাকে দূর করিবার জন্য পশুটিকে বধের পর কিছুদিন সশরীরে ঝুলাইরা রাখা হয় ও পরে আরও কিছুদিন ভিনিগারে ডুবাইয়া রাখা হয়। বাপ হাউস্‌কীপারকে ডাকাইয়া প্রক্রিয়াটা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, আমার অবগতির জন্য। সব ব্যাপার বুঝিলাম না, কিন্তু খাইবার সময় দেখিলাম, মাংস মজিয়া টিনের মাছের মত নরম হইয়াছে ও গন্ধটাও রীতিমত পচা। খাইতে রুচি হইল না, তবু যা হোক সখটা মিটিল।

চেকোস্লোভাকিয়ায় অসংখ্য স্পা (Spa) অর্থাৎ ধাতব-জলের উৎস আছে, এ গুলির ভেষজগুণে নানা ব্যাধির উপশম হয়। নোভে মেষ্টোর দুপাশে দু'টা, ঘণ্টাখানেকের পথ। প্রথমে গেলাম পিশ্‌চানিতে (Piestany), বন্ধু ও তাঁহার বাপের আগ্রহাতিশয্যে প্রাহায় ফিরিবার পর আবার এখানে একবার আসিতে হইয়াছিল। সেবারে গিয়াছিলাম ট্রেন্‌চিন্‌স্‌ টেপ্লিট্‌সেতে Trencinc Teplice। পিশ্‌চানি খুব বৃহত স্পা, এ দেশের প্রধান তিন চারটির মধ্যে। এখানে বাতের চিকিৎসা হয়। জলে গন্ধকের ভাগ খুব বেশী, দূর হইতে গন্ধ পাওয়া যায়। গরম কাদায়ও গন্ধকের মিশ্রণ আছে। এই জলে স্নান, কাদা মাখিয়া পড়িয়া থাকা প্রভৃতি চিকিৎসার অঙ্গ। প্রত্যেক স্পা-তেই প্রাইভেট্ কোম্পানী পয়সা খরচ করিয়া সুন্দর সহর, বাগান প্রভৃতি বানাইয়াছে। মস্ত মস্ত হোটেল, বেড়াইবার, বসিবার, গানবাজনা প্রভৃতির ইন্দ্রপুরীর মত আয়োজন। রোগী ছাড়া ছুটিতে এমনি বেড়াইতে ও আমোদ করিতেও বহুলোক এ সব জায়গায় আসে। জায়গাগুলি আন্তর্জাতিক 'ফ্লার্টেশনে'র জায়গা বলিয়াও বিখ্যাত। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মা বাপরা এখানে আনিয়া থাকেন। সম্পন্ন অবস্থার দেশী-বিদেশী বহু অতিথি-আগন্তুক আসেন। পয়সা খরচের জায়গা, আমোদ-প্রমোদে ভরপুর। চিকিৎসার ব্যবস্থা ও আয়োজন হাঁসপাতালের মত নিয়মাবদ্ধ, তাহার পর বাকি সময় আমোদের জন্য। পিশ্‌চানি নূতন গড়িয়া উঠিতেছে। একজন ভারতীয় মহারাজা সম্প্রতি এখানে চিকিৎসা করাইয়া গিয়াছেন, তাঁর বৈভব বর্ণনা ও কোন নর্ত্তকীর পিছনে কত পয়সা খরচ করিয়াছেন প্রভৃতি কথা লোকের মুখে মুখে!


পিশ্‌চানি জল-চিকিৎসালয়।

বন্ধুর পরিচিত পিশ্‌চানির এক ডেন্টিষ্টের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। খাওয়ার সময় এক অ্যাড্‌ভোকেট ও ডেন্টিষ্ট তর্ক তুলিলেন যে, ইংলণ্ডের শক্তি আসলে কিছুই নয়, ওটা একটা মোহ মাত্র। আমি বলিলাম, "আপনারা আছেন ছোট্ট রিপাব্লিকে, মধ্য-ইউরোপের কেন্দ্র স্থানে, বাহিরের জগতে ঘুরিয়া আসুন, দেখিতে পাইবেন ইংলণ্ডের ক্ষমতা।" ট্রেন্‌চিন্‌স্‌ আরও নূতন স্থান,—পাহাড়ের মধ্যে। পিশ্‌চানির জলের বড় উগ্র গুণ, যাঁহাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল, তাঁহারা এতটা সহিতে পারেন না বলিয়া বাতের চিকিৎসায় ট্রেন্‌চিন্‌সে আসেন। চিকিৎসার সময় প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে। পিশ্‌চানিতে একটা নাচের

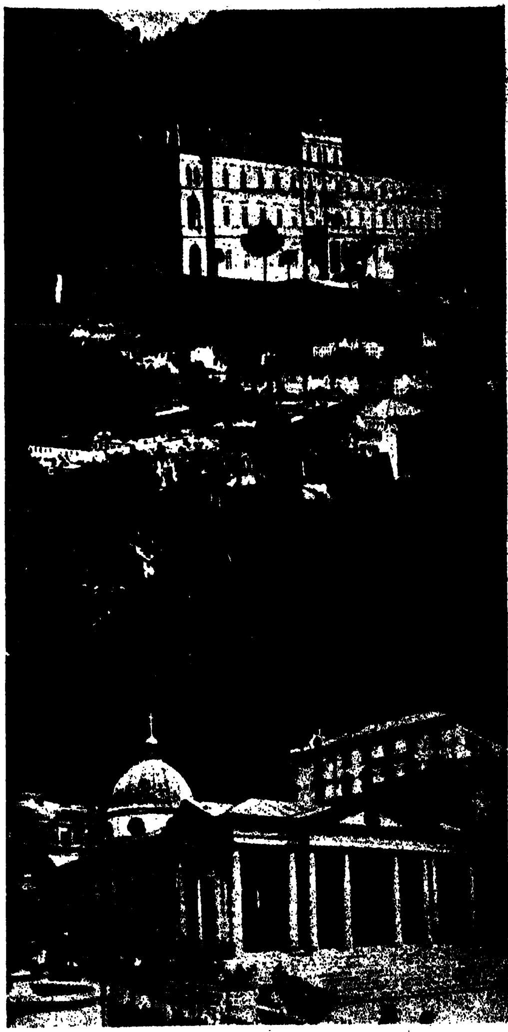
জায়গায় গিয়াছিলাম, সেখানেও এক দল ছোকরা আরম্ভ করিল ভারত সম্বন্ধে প্রশ্ন। সব স্পা-তেই বড় বড় ফোয়ারা-গুলি ঘিরিয়া বাড়ী বানান হইয়াছে, এখানে রোগীরা স্নান করে। যেখানে জলে স্নান না করিয়া জল খাইতে হয়, সেখানে প্রস্রবণে নামিয়া গেলাসে জল খাইয়া আবার উঠিয়া আসিয়া বসিবার বা বেড়াইবার জন্য বড় বড় দালান আছে। পিশ্চানির একটা বাহিরের ছোট প্রস্রবণের গরম জল যেখানে জমা হয়, সেখানে বাগানে একটা ধানগাছ লাগান হইয়াছে। বেশ একগোছা পাকা ধান ফলিয়াছে।

নোভে মেষ্টো হইতে উত্তরে তাত্রা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া তারপর পূর্ব্বে স্লোভাকিয়া ও কার্পাথিয়ার অন্য কয়েকটা সহর দেখিলাম। এ সব জায়গায় পরিচিত লোক ছিল না বলিয়া থাকি নাই, দিনে নামিয়া সহর দেখিয়া রাতে গাড়ীতে চড়িতাম। স্লোভাকিয়া ও কার্পাথিয়া আগে হাঙ্গেরীর অধীন ছিল। স্লোভাকিয়া ও কার্পাথিয়ার অনেকেই হাঙ্গেরীর ভাষা বুঝে, কার্পাথিয়ায় রুশীয়ান ভাষারও চলন আছে, ষ্টেশন প্রভৃতির নাম রুশিয়ান অক্ষরেও লেখা। রুশিয়ান ভাষা চেক-স্লোভাকিয়ান ভাষার দূর জ্ঞাতি। তাত্রা বেশ বড় পাহাড়, চিরতুষারাচ্ছন্ন। পাশ দিয়া গেলাম, উপরে ও ভিতরে গেলাম না, কারণ সেখানে বেশ ঠাণ্ডা হইবে শুনিলাম, এ দিকে আমার সঙ্গে শুধু গরমের দিনের ভ্রমণের উপযোগী কাপড়। কার্পাথিয়ার অবস্থা আরও দরিদ্র। সহরগুলি পুরাতন ও ছোট। প্রথমে গেলাম কোশিসে (Kosice), সেখান হইতে চেকো-স্লোভাকিয়ার একেবারে শেষ পূর্ব্বপ্রান্তে ইয়াসিনা (Jasina), এ দিকটা খালি পাহাড়-পর্ব্বত আর বন। ইয়াসিন হইতে ফিরিয়া আসিলাম উজহোরোড (Ujhorod), সেখান হইতে সোজা ফিরিলাম উত্তর-স্লোভাকিয়া ও উত্তর-বোহেমিয়ার মধ্য দিয়া প্রাহায়।

প্রাহা হইতে গেলাম বাটিয়া (Bata) কোম্পানির কারখানা দেখিতে জ্লিনে (Zlin), ঠিক চেকোস্লোভাকিয়ার কেন্দ্রস্থলে। সুরম্য উপত্যকার উপর বৃহৎ আমেরিকান ধরণের সহর গড়িয়া উঠিয়াছে জ্লিন্। বড় বড় ৮।১০ তলা বাড়ী, দোকান, ফ্যাক্টরি প্রভৃতি। বাটিয়া কোম্পানি জুতা ছাড়া রবার টায়ার ও ছোট এরোপ্লেনও তৈয়ারী করিতেছেন আজকাল। অতি দ্রুত, দিনে হাজার হাজার জুতা তৈয়ারীর প্রক্রিয়া দেখিলাম। এখানকার কর্ম্মচারীরা বেশ ভাল উপার্জ্জন করে, কিন্তু খাটিতেও হয় প্রাণপণে, কারণ সব ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা-মূলক, যে যত বেশী উৎপাদন করিবে, তার রোজগার তত বেশী, আর যে পিছনে পড়িয়া থাকিবে, তাহাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হইবে। মজুর-শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যবস্থাও অনেক, সুন্দর বাগানওয়ালা অতি সস্তা বাড়ী, সস্তা খাইবার ব্যবস্থা, জিনিষ-পত্রের দোকান, স্কুল ও নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যোন্নতি ও খেলাধুলার বহু আয়োজন। তবে ইহাও শুনিলাম যে এ সব না কি সোনার খাঁচায় বন্ধ থাকার আনন্দ। প্রতিযোগিতা-মূলক কাজের নিরন্তর দৌড়ে মানুষ অন্তরে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, জীবনের আস্বাদ পায় না, অর্থ উপায় করে বটে, কিন্তু শেষটা ভিতরে রিক্ত হইয়া পড়ে। লাভটা হয় বাটিয়ারই, কারণ উপার্জ্জনের টাকা শ্রমিকদের তাঁহারই কাছে জমা রাখিতে হয় এবং কেনাকাটা ও খাওয়া-দাওয়াও সবই তাঁরই দোকানে। বাটিয়া মুচির ছেলে ও নিজেও মুচি ছিলেন, অধ্যবসায় উদ্যম ও বুদ্ধিবলে এখন জগৎ জোড়া ব্যবসা স্থাপন করিয়াছেন।

জ্লিন্ হইতে ট্রেনের সুবিধার জন্য ব্রাটিস্লাভা হইয়া ফিরিতেছিলাম। ব্রাটিস্লাভার পথে এক মজার ব্যাপার ঘটিল। এক ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইতে হইল। নূতন ট্রেনখানা দূরগামী এক্স্‌প্রেস, বুদাপেস্ত, বুখারেস্ত, ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত যায়। গাড়ীতে অনেক লোক, সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলিতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কোথাও জায়গা খালি নাই, অগত্যা আরও অনেক লোকের সঙ্গে করিডোরে দাঁড়াইয়া চলিলাম। হঠাৎ একটি লোক পাশের কামরা হইতে উত্তেজনার সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া আগ্রহে মুখ লাল করিয়া একেবারে আমার ঘাড়ের উপর পড়িয়া aggressive আক্রমণের সঙ্গে বলিল, "You speak English ?" জানিতে চাহিলেন, আমার গন্তব্য কোথায়। যদিও সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দামী ও সোনার ঘড়ি প্রভৃতি আছে, তবু আচার-ব্যবহার দেখিয়া বুঝিলাম অর্দ্ধবাবু অশিক্ষিতের হাতে পড়িয়াছি। দুই

মিনিট ভদ্রতা ও হাসিমুখ দেখাইলাম, তাহাতে বাগ মানিল না, একটু ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য করিলাম, তাহাতেও দমিল না। অগত্যা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া superior condescending ভাবে তার কথার উত্তর দিতে লাগিলাম। ব্যাপার এই—লোকটি স্লোভাকিয়ার একটা সহরে জুতার দোকানের মালিক, প্রাহায় গিয়াছিল মালের অর্ডার দিতে। সেখানে চেষ্টা করিয়াছিল একটি কালো লোক পাইতে, তাহাকে আনিয়া অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরের তিন মাস জুতা বিক্রির seasonএ নিজের দোকানের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া রাখিবে, দোকানের খুব advertisement হইবে। থাকার ঘর দিবে, মাসিক ১০০৲ টাকা, এমন কি ২০০৲ টাকা মাহিনা দিবে। আমাকে ঠিক করিয়াছিল নিগ্রো, যখন বলিলাম ভারতীয়, তখন শাসাইয়া বলিল, "খবরদার! ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিও না! তুমি ভারতীয় তবে ইংরাজি বল কি করিয়া?" লোকটি বছর আষ্টেক আমেরিকায় ছিল ও সেখানকার ছোটলোকের slang আমেরিকান শিখিয়াছে। আমি কেন এমন চাকুরী লইয়া তাহার সঙ্গে যাইব না, সেজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। আমি বলিলাম, আমাকে প্রাহায় ফিরিয়া অবিলম্বে কার্ল্‌স্‌বাড ও মারিয়েন্‌বাডে যাইতে হইবে। অনেক নিগ্রো এ-দেশের কাবারে, নাচের জায়গা প্রভৃতিতে গাহিয়া-বাজাইয়া, নাচিয়া ভাঁড়ামি করিয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। ইহার স্থির বিশ্বাস যে, আমি এই দলের। বলিল, কার্ল্‌স্‌বাড হইতে ফিরিয়া তাহার ওখানে যাই না কেন? আমি বলিলাম, তাহার পরেই আমাকে আবার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কি কাজ, তাহা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করিল না, এতই স্থির প্রত্যয়। শেষটা বলিল, আচ্ছা, আমি যদি না আসি, তবে প্রাহা বা কার্ল্‌স্‌বাড হইতে একজন কালো লোক যদি পাই, তবে নিশ্চয় যেন তাহার কাছে পাঠাইয়া দিই, লোকটির পয়সা বেশী হাতে না থাকিলে যেন তাহাকে খবর দিই, সে তৎক্ষণাৎ রেলভাড়া পাঠাইয়া দিবে। আমার নোটবুকে তার ঠিকানা লিখিয়া দিল, বারে বারে বলিয়া দিল, নিশ্চয় যেন পাঠাই, এ কাজ করিতে পারিলে পরের বার যখন সে প্রাহায় আসিবে, আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কাবারেতে লইয়া যাইবে, দুজনে খুব ফুর্ত্তি করা যাইবে। আমি বলিলাম, নিশ্চয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তারপর আমাকে আরও গাঁথিবার মতলবে বলিল, "তুমি ব্রাটিস্লাভায় একদিন থাকিয়া যাও না কেন?"



মারিয়ানবাডের বিভিন্ন দৃশ্য।

"একবার ব্রাটিস্লাভা দেখিয়াছি, এবার আমার পয়সা কম পড়িয়াছে, কারণ অনেক দিন পথে পথে ঘুরিতেছি, প্রাহায় না ফিরিলে এখন আমার পকেটে আর কিছুই থাকিবে না।" কথাটা মিথ্যা, লোকটাকে একটু পয়সা

আমার পিছনে খরচ করাইবার উদ্দেশ্যে এরূপ বলিলাম। আন্দাজ ঠিকই করিয়াছিলাম, লোকটি বলিল, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে আমার হোটেলে এক রাত থাকিয়া যাও।" ব্যাপার বেশ পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলাম, "হোটেল-খর্চায় আমার সব পয়সা যে খরচ হইয়া যাইবে!"

"সে জন্য ভাবনা নাই, তোমার খরচ আমিই দিব। কিন্তু এই সর্ত্তে যে, প্রতিদানে একটি কালো লোক খুঁজিবার তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।" আমি প্রতিশ্রুতি দিলে লোকটি তার কামরায় ফিরিয়া গেল। গাড়ী ছুটিতেছে, আধ ঘণ্টা পরে লোকটি আবার উপস্থিত, বলিল, "তুমি এখানে আমাদের কামরায় আসিয়া বস না কেন, একটা সিট খালি আছে।" গেলাম তার সঙ্গে। এ দেশে প্রত্যেক সিটের উপরে মাথার পিছন দিকটায় একটা হুক থাকে, ওভারকোট ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য। সিটে লোক না থাকিলেও এই হুকে যদি ওভারকোট ঝোলে তবে বুঝিতে হয় সিট ভর্ত্তি, লোকটি হয়ত করিডোরে বা অন্যত্র গিয়াছে। এখানে আগেই দেখিয়াছিলাম একটি ওভারকোট ঝুলিতেছিল, সেজন্য বসিবার চেষ্টা করি নাই। এবারেও দেখিলাম সিট খালি, কিন্তু ওভারকোট ঝুলিতেছে। পাশে একটি মহিলা বসিয়া, তাঁকে জার্ম্মান ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, জায়গাটা কি খালি? মহিলা কোটটি তখন সরাইয়া নিজের হুকে রাখিলেন। সিটস্থ হইলে জুতাওয়ালা আরও আলাপ করিল। লোকটি হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী, হিটলারকে dirty dog প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দিল। জার্ম্মান নিশ্চয় জানে, কিন্তু আমি বার কয়েক জার্ম্মান বলা সত্ত্বেও তার আমেরিকান ইংরেজী ছাড়িল না। জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে একটু জাঁকাল ইংরেজি ঝাড়িতে লাগিলাম, একটু চঞ্চল হইল, কিন্তু দমিবে না! অনেক কথার পর আবার জিজ্ঞাসা করিল, কেন আমি তার সঙ্গে যাইব না, আমার স্ত্রী আছে কি?

"না!"

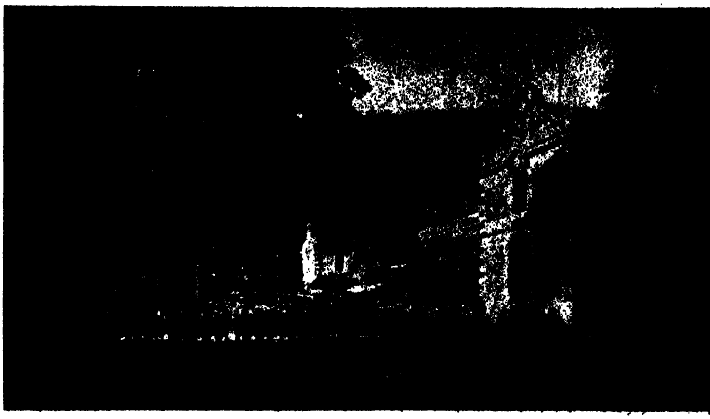
"বান্ধবী?"

"তাও নাই।"

"আমাদের সহরে অনেক মেয়ে পাইবে।"

তাহাতেও ফল হইল না দেখিয়া উপার্জ্জনের কথা তুলিল, বলিল, মাসে ২০০ টাকা কি কম পয়সা? প্রাহায় আমি কত উপার্জ্জন করি? আমার উপার্জ্জন শুনিয়া আবার একটু চঞ্চল হইল, কিন্তু pose ছাড়িল না। এতক্ষণে অনেকটা কাবু হইয়া আসিয়াছিল, শেষে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি কাজ করি। মজাটা এখানেই মাঝপথে শেষ হইয়া যাইবে মনে করিয়া আমি একটু ইতস্তত: করিলাম, একটু সবিনয় হাসিলাম। লোকটি ভাবিল, এইবার নেটা নিগ্রো, তোকে ধরিয়াছি, অর্দ্ধঝম্প দিয়া সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিজয়গর্ব্বে চেঁচাইয়া বলিল, "লজ্জা করিও না। একটা কাজ তো করিতেই হইবে। তুমি ক্যাবারেতে কাজ কর, ঠিক কি না?" আমি উত্তর না দিয়া স্মিতহাস্যে পকেট-বই বাহির করিয়া আমার কার্ড তার হাতে দিলাম। লোকটা চশমার খোঁজে পকেট হাতাড়াইবার ভান করিয়া বলিল, "কোথায় গেল চশমাটা, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না, তুমি মুখেই বল না কি কর!" আমি তাহাকে প্রথমে ইংরেজিতে, পরে অন্য যাত্রীদের অবগতির জন্য জার্ম্মানে বলিলাম, আমি ইউনিভার্সিটির লেকচারার। এইবার বাস্তবিক কাবু হইল, জিজ্ঞাসা করিল, কি পড়াই। আমি বলিলাম, ভারতীয় ভাষা। এতক্ষণে তার নিগ্রো সন্দেহ ঘুচিল বোধ হয়। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে সহযাত্রীদের সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় আলাপ করিতে লাগিল, কিছু বুঝিলাম না, শুধু ইন্‌টেলিগেন্‌জ, intelligenz শব্দটা মধ্যে মধ্যে কানে আসিতে লাগিল। খানিক আলাপের পর বলিল, "তুমি শিক্ষিত লোক, তোমাকে জুতার দোকানে ডাকার জন্য মহিলাটি আমাকে দোষ দিতেছিলেন।" আমি বলিলাম, তাহাতে দোষ কি? অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোনও কাজ নিন্দনীয় নয়। তোমাদের দেশে—না না, আমেরিকায়—ওতে কোন দোষ বলিয়া লোকে মনে করে না।" আমিও প্রবোধ দিয়া বলিলাম, না, তাতে দোষ আর কি! পরে আরও অনেক আলাপ হইল ও ঘন ঘন sir বলিতে লাগিল। ব্রাটিস্লাভায় নামিয়া হোটেলে যাওয়া গেল। সেখানে ব্যবস্থা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এইবার শুইতে যাইব তো? আমি বলিলাম, আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে, আগে খাইতে যাইব। খাওয়ার প্রয়োজন তারও ছিল, কিন্তু একত্র গেলে

আতিথ্যের নিয়মে খরচটা দুজনেরই তার বহিতে হইবে বলিয়া বলিল, "আমার বিশেষ ক্ষুধা নাই, আমি এই কাফেতে বসিতেছি, কিংবা সিনেমায় যাইতেছি, তুমি খাইয়া এস।" আমি নিজের দর বাড়াইবার জন্য বলিলাম, "তোমার যা ইচ্ছা কর, আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া তোমার কষ্ট করার প্রয়োজন নাই, আমি সিনেমার ভক্ত নই, তুমি একলাই যাও, আমি খাওয়ার পর একটু বেড়াইয়া শুইতে যাইব।" উহার একটু পয়সা আরও খসাইবার মতলবে বলিলাম, "এখানকার কাবারে কি রকম জানি না, পয়সা থাকিলে দেখিয়া যাইতাম।" লোকটা বিলক্ষণ সেয়ানা, বলিল, "আমিই তোমাকে দেখাইতাম, কিন্তু দেখ, প্রাহায় সব পয়সা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, অনেক মালের অর্ডার দিয়াছি, এই দেখ রসিদ, সেজন্য আগাম পয়সা অনেক দিতে হইল; যা হোক, পরে তুমি কাল লোক পাঠাইলে প্রাহায় তোমাকে নিশ্চয়ই কাবারেতে লইয়া যাইব।" পরে সঙ্গে গিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া একটা ভাল রেস্তরাঁর দরজায় আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি খাইয়া এস, আমি কাফে বা সিনেমায় যাইতেছি।"



ট্রেসচিনস্-টেপ্লিট্‌সের সালোন।

খাওয়ার পর ফিরিবার সময় দেখি, গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। বলিল, পরে সিনেমায় যাইবে। প্রস্তাব হইল একটু বেড়াইয়া আসা যাক। হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে বেটা জু'এর পাল্লায় পড়িয়াছি, শেষটা হয়ত ওই আমাকে ঠকাইয়া যাইবে, বলিলাম, "চল, হোটেলের ঘরটা দেখিয়া আসি।"

"সে সব ব্যবস্থা আমিই করিয়াছি।"

"তবু চল, কেমন ঘরটা দেখা যা'ক।"

গিয়া দেখিলাম, সাধারণ ঘর বটে, কিন্তু একরাত্রির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বলিলাম, ও ঘর বড়ই ছোট, উহাতে আমার থাকা অসম্ভব। তখন লোকটি আবার ম্যানেজারকে বলিয়া আর একটা ঘর দেখাইল, আগেরটার চেয়ে ডবল বড়, বাথও আছে। বলিলাম, হাঁ এটা চলিবে। নীচে গিয়া হোটেলের অপিসে লোকটার সামনে দুই তিনবার পরিষ্কার জার্ম্মানে বলিলাম, "আমি ঘরে থাকিব, কাল ভোরে চলিয়া যাইব, কিন্তু ভাড়া বা অন্য টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, উহার জন্য ইনিই সম্পূর্ণ দায়ী।" অপিস বলিল, সে ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তখন বেড়াইতে বাহির হইলাম। লোকটি এখন sir ছাড়িয়া gentleman সম্বোধন আরম্ভ করিয়াছে। অনুযোগ করিল, "আমি যখন বলিয়াছি, তুমি আমার অতিথি, তখন সব খরচ আমিই নিশ্চয় দিব। আমি ঠকাইব কেন, ভদ্রলোকের কথার ঠিক থাকা চাই, আমরা দুজনেই আমেরিকান জেণ্টল্‌ম্যান"। —বেটার নিগ্রো-কম্‌প্লেক্স তখনও ছাড়ে নাই! —"আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারিব।" সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "তোমাকে সন্দেহ করি নাই, হোটেলের লোক অনেক সময় বিদেশী দেখিলে ঠকাইতে চেষ্টা করে, তোমার কাছে পয়সা পাইয়াও হয়ত বা আমার কাছে আবার চাহিয়া বসিবে। সেজন্য ওটা পরিষ্কার করিয়া লইলাম।" বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হইল। ভারত সম্বন্ধে একেবারে নির্জলা গাধা, দেশটা কোন্‌দিকে তারও ধারণা নাই। সহরের প্রধান কাফের সামনে গিয়া বলিল, "একটু বসিবে এখানে?" বসা গেল। দু' কাপ কফি অর্ডার

করিল, কিন্তু নিজে স্পর্শও করিল না। বাহিরে আসিয়া বলিলাম, "আমিও এ সময়ে কফি খাই না, কিন্তু কেহ আমন্ত্রণ করিলে 'না' বলাটা আমাদের দেশের ভদ্রতাবিরুদ্ধ, তাই তোমার সঙ্গে গেলাম।" হোটেলে ফিরিয়াই শুইতে গেলাম। লোকটি বলিল, সেও শুইতে যাইবে, কিন্তু ভাবে বুঝিলাম মফস্বলের লোক সহরে আসিয়াছে, ফুর্ত্তি করিতে বাহির হইবে। আমাকে পুনঃপুনঃ কালো লোকের সন্ধান না ভুলিতে অনুরোধ করিল। পরদিন ভোরের এক্‌স্‌প্রেসে প্রাহা ফিরিয়া আসিলাম।

"পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না, মানুষ তো ছার!" অষ্ট্রিয়ান কাউণ্টও পাতিয়ালার মহারাজার সমান দরের লোক মনে করিয়া ক্যাস্‌লের ছবি পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, আর বেটা জুতাওলাও দারোয়ানি করিতে পাকড়াও করিবার চেষ্টা করিল!

প্রাহা হইতে গেলাম কার্ল্‌স্‌বাডে, পশ্চিম বোহেমিয়ায়। এখানকার সব অধিবাসী জার্ম্মান, প্রকাণ্ড সুন্দর সহর, বিখ্যাত স্থান। এখানকার জল খাইলে অম্বল প্রভৃতি পেটের রোগ সারে। পিশ্চানির চেয়ে তিনগুন বড় সহর এটা, ব্যবস্থাদিও তদনুরূপ। ধাতব-জলের ফোয়ারায় অতি বিস্তীর্ণ বসিবার ও বেড়াইবার বন্দোবস্ত। Seasonএর সময় এখানে লোকারণ্য হয়, বহু দেশের লোক এখানে আসে। এখান হইতে গেলাম মারীয়েনবাডে (Marienbad)। Karlsbad হইতে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। সুন্দর নূতন ঝক্‌ঝকে সহর। এখানকার জলেও পেটের রোগ আরাম হয়। কার্ল্‌স্‌বাড এখন অনেকটা সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে, রাম-শ্যাম সবাই যায়। সে জন্য ফ্যাসানেব্‌ল্‌ ধনীরা আজকাল কার্ল্‌স্‌বাডে না গিয়া মারিয়েনবাডে যাইয়া থাকেন। বাস্তবিক ইন্দ্রপুরীর মত শোভা এ জায়গাগুলির।

মারীয়েন্‌বাড হইতে প্রাহায় ফিরিয়া আবার যাইতে হইল নোভে মেস্টোতে। প্রথমবারে সেখান হইতে আসার সময় বন্ধুর বাপ বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, আরও কিছুদিন থাকিবেন, এত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন, বোধ হয় আমাদের নিরন্তর প্রশ্নে উত্যক্ত হইয়া পালাইতেছেন!" যখন বলিলাম, সময় সংক্ষেপ, অন্য দ্রষ্টব্যগুলাও আমাকে শেষ করিতে হইবে, তখন বৃদ্ধ হাতে ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন, ভ্রমণশেষে সময় থাকিলে আর একবার যেন নিশ্চয় আসি, বড়ই ভাল লাগিয়াছে আমাকে তাঁহাদের ইত্যাদি। প্রাহায় ফিরিলে বন্ধুটি, নিজের, বাপ-মা, বন্ধু-বান্ধব সকলের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করায় আবার গিয়া ট্রেন্‌চিন্‌স্‌ টেপ্লিট্‌সে দেখিলাম, সে কথা আগেই বলিয়াছি।

এখান হইতে প্রাহায় ফিরিয়া নূতন সেমেষ্টারের কর্ম্মোদ্যোগ আরম্ভ করিতে হইল। এদেশের আদ্যোপান্ত দেখা হইল, লোকের জীবন, সমাজের অবস্থাও বুঝিলাম, জ্যোতিষীর কথাও ফলিয়া গেল।

বিধি-নিষেধ

...মানুষ যখন বিধিসমূহকে পালন করিতে এবং নিষেধসমূহকে বর্জ্জন করিতে থাকে, তখন মানুষের যেমন দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়, সেইরূপ আবার মানুষ যখন বিধিসমূহকে বর্জ্জন করিয়া নিষেধসমূহকে পালন করিতে থাকে, তখন মানুষের পক্ষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ সভ্যতা-পরিচালিত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে মানুষ বিজ্ঞানের নামে ক্রমশঃ বিধিসমূহ পালন করিবার রীতি বিসর্জ্জন করিয়া নিষেধসমূহ পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্র মানুষের মধ্যে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।...

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ইন্দ্রাণী

[৯]

দুপুর বেলা ছাদের উপরে ইন্দ্রাণী রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া চুল শুকাইতেছে; আর বেঙা চৌকিদার গল্প করিয়া যাইতেছে। বেঙা বলিতেছে—বুঝলে না মা'ঠান, আমাদের মোতির মা বলত, অনভ্যাসের ফোঁটা, কপালে চড় চড় করে! আমার এসব সইবে কেন! আমার একখানা ধুতি আর গামছা হলেই ভাল! কিন্তু যখন হলাম বাবুর খাস-খানসামা, তেমন পোষাক না হলে যে বাবুর মুখ থাকে না! পরলাম ইয়া পাগ; বাবুর অন্য বরকন্দাজদের হাতে থাক্‌ত ঢাল আর তলোয়ার; কিন্তু আমি যে খাস-খানসামা; আমার হ'ল বন্দুক! আর হাতেরই বা কি তাক্! ওই যে বকটা উড়ে যাচ্ছে মা'ঠান—এই বলিয়া বহু দূরে উড্ডীয়মান বকের ক্ষুদ্র বিন্দুটাকে দেখাইল—বুঝলে মা'ঠান, ও রকম কত চিড়িয়া আমি হেঁ—। এই খানেই সে থামিল; বেঙা গল্প বলিতে জানে বটে; সে জানে স্পষ্ট করিয়া বলার চেয়ে আভাসে বলিলে আনন্দ জমিয়া উঠে বেশী; বিশ্বাসযোগ্যতাও তার বেশী হয়। একটু থামিয়া আবার সে আরম্ভ করিল—আঃ থাক্‌ত এখন একটা বন্দুক! ইন্দ্রাণী বলিল, না হয় তুই বড় শিকারী, তাই বলে নিরীহ পাখীটাকে মারবি কেন! বেঙা বলিল, মা'ঠান তুমি যে কি বল! থাক্‌ত মোতির মা, দিত এর উত্তর! আমাকে যদি শিকারী বল্‌লে তবে মারতে বারণ কর কেন! নিরীহ পশু-পাখী ছাড়া আর তেমন পশু-পাখী পাব কোথায়? বাঘও তো নিরীহ আমাকে যতক্ষণ না আক্রমণ করছে, ততক্ষণ তার দোষ কি? কিন্তু আক্রমণ করলে কি আর মারবার সময় থাকে! কি যে বল মা'ঠান—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। হাসিবার সময় বেঙার চোখের শাদা অংশ ঘন ঘন পাক খাইত, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইত; দধিবর্ণের চুল-দাড়ি কাঁপিতে থাকিত; দেখিয়া মনে হইত, কে যেন অদৃশ্য দণ্ড দিয়া তাহার মুখে দধি-মন্থন করিতেছে; সেই আবর্তনে শুভ্র হাস্য অবিরাম উত্থিত হইতেছে।

ইন্দ্রাণী বলিল, আচ্ছা সেই গল্পটা বল, কি করে তোদের জোড়াদীঘির বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল!

বেঙা বলিল—সেই কথাই তো বলছি মা'ঠান! তুমি যা বল মা'ঠান আমাদের বাবু মস্ত শিকারী। আমাদের গাঁয়ের পাশে মস্ত এক বন ছিল, তাতে ছিল বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, (যদিচ বাংলাদেশে ভালুক ও গণ্ডার থাকিবার কথা নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়; বেঙা কবি না হইলেও নিরঙ্কুশ) বাবুর প্রতিজ্ঞা ছিল একটা করে' জানোয়ার না মেরে ভাত খাবেন না! মারতে মারতে শেষে একদিন সব জানোয়ার শেষ হ'য়ে গেল! তখন—প্রতিজ্ঞার কি হয়? কি হ'ল বল তো মা'ঠান—এই বলিয়া সে ইন্দ্রাণীকে প্রশ্ন করিল

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—তা আমি কেমন করে' জানব! বেঙা যেন এই উত্তরই আশা করিতেছিল, কাজেই বলিল, তবেই দেখ কি বিপদ! আমরাও কেউ জানতাম না! তখন পড়ল ডাক পুরুত ঠাকুরের। তিনি এসে বললেন, এ আর এমন কি সমিস্যে! তিনি বললেন, ওরে আন্ তো রে মহা—মহা—মহা—মহা—কি পুঁথি মা-ঠান্? মা'ঠান বলিল—মহাভারত নাকি?

—হাঁ হাঁ; দেখ আমার কি মনে থাকে! তার উপরে আবার পাঠশালায় পণ্ডিতের দিয়েছিলাম পা ভেঙে! পুরুত ঠাকুর মহাভারত ঘেঁটে বলে দিলেন—ভাতের পরিবর্তে লুচি খেতে পায়, খিচুড়ি খেতে পায়। দেখ মা'ঠান—এই জন্যই তো শাস্তরের দরকার! তারপর থেকে বাবুর দু'বেলা লুচি খাওয়া সুরু হ'ল! কিন্তু জমিদার হলে কি হয় ভগবান্ সকলের পেটই তো সমান করে' গড়েছেন! ক্রমাগত লুচি খেতে খেতে অজীর্ণ দাঁড়াল, তখন সে আর এক বিপদ। ডাক পড়লো বদ্যি মশায়ের, তিনি বললেন, লুচি ছাড়। কাছেই ছিল পুরুত বসে; দুজনে তর্ক, হাতাহাতি, মারামারি। এক জনের টিকি ছিঁড়ল, একজনের চাদর। কিন্তু সমিস্যে তেমনি রইল। এমন সময়ে এল মোতির মা; সে সব ব্যাপার শুনে

হেসেই খুন ; হাসি থামলে বল্‌লে, অতি দর্পে হত লঙ্কা ; তোমাদের এত বিদ্যে এর উপায় ভেবে পেলে না। বাবুর কথা ছিল বাড়ীর ভাত খাবে না। তা না-ই খেলে ; বাড়ী ছেড়ে দেশভ্রমণে বের হও ; সেখানে বেশ আরামে খাও। এদিকে পাঁচ সাত বছরে বন-টা আবার জানোয়ারে ভরে' যাবে, এসে শিকার আরম্ভ ক'রো। দেখলে মা, মোতির মা'র কেমন বুদ্ধি।

বেঙা বলিয়াই চলিল—অমনি সাজল বজরা, অমনি সাজল পানসী, অমনি সাজল পাইক পেয়াদা ; বরকন্দাজ খানসামা ; বাবু আর বাবুর খাস গোলাম এই বেঙা। নৌকা চলেছে ত চলেইছে, অনেক দিন পরে বিদেশের ভাত খেয়ে বাবুর মনে বড় ফুর্ত্তি। সেদিন আমরা নামলাম পলাশীর মাঠে। শিকার করতে হবে ; অত বড় মাঠ আর ওদিকে নাই ! বাবুর হাতের কি তাক মা'ঠান ; চিড়িয়া আর জানোয়ার যে কত মারা পড়ল তার ঠিক নেই। বাবু চলেছে আগে আগে, আমি চলেছি পিছনে ; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; এমন সময়ে শুনলাম এক চীৎকার। এগিয়ে দেখি এক তাঁবু ; ঢুকলাম আমরা তাঁবুতে, দেখি আমাদের কচুবনের কালাচাঁদ এক মেয়েকে নিয়ে রাসলীলা আরম্ভ করেছে। বাবুকে দেখে মেয়েটার সে কি কাকুতি-মিনতি। তখন লাগল দুইজনে লড়াই, আমাদের বাবুতে আর সেই জোড়াদীঘির সেই বাবুতে সে কি যুদ্ধ। একবার না'র উপর গাড়ী একবার গাড়ীর উপর না'। একবার বাবু জেতে, একবার সে। কিন্তু বাবুর সঙ্গে পারবে কেন ? বাবু মেয়েটাকে নিয়ে বাইরে এলেন ; তারপরে তাকে পৌঁছে দিলেন তার বাড়ীতে। হাতাহাতির সময়ে জোড়াদীঘির লোকটা বাবুকে মেরেছিল এক ঘা ; এখনো দেখো তার কপালে আছে এক দাগ। পরে আমরা শুনলাম লোকটা জোড়াদীঘির জমিদার। জোড়াদীঘির আবার জমিদার। নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।—এই বলিয়া সে মুখমণ্ডলে হাসির দধি-মন্থনের অভিনয় করিতে লাগিল।

বেঙা লক্ষ্য করিল কি না বলিতে পারি না, ঘটনা শুনিয়া ইন্দ্রাণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ; ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল ; নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতে আরম্ভ করিল ; সে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত নিজের ঘরে প্রস্থান করিল।

[১০]

ইন্দ্রাণীর যখন আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, রাত্রি তখন গভীর। সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, ঘুম হইতে নয় ; নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী নিয়ত-চঞ্চল অশান্ত স্বপ্নের সীমান্তপ্রদেশ হইতে ; বিদেশী পুরাণে শোনা সেই গোলকধাঁধায় সে যেন প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার অন্তরতম স্থানে নরভুক্ একটা দানব বসিয়া আছে ; কতজন স্বপ্নের সূত্র ধরিয়া সেখানে প্রবেশ করে ; কিছুদূর যাইবার পরে সূত্র ছিঁড়িয়া যায়, তাহারা আর ফিরিয়া আসে না। লোকে ভাবে দানবের উদরে তাহারা গিয়াছে। কিন্তু বাস্তব অন্য রকম ; তাহারা ক্লান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পথে পড়িয়া মরে ; দানবের উদরে কেহ যায় না, কারণ ভিতরে বহুশ্রুত দানব-টা কোথায়ও নাই ; সে স্থানটা সুগভীর অন্ধকারময় ; সে অন্ধকার নিকষের মত নিরেট ও শীতল ; কিন্তু কয়জন দুঃসাহসীর প্রাণে সত্যকারের সোনা আছে, যাহার পরখ সেখানে হইতে পারে !

ইন্দ্রাণী সেই গহ্বর হইতে ফিরিয়া আসিল ; গোলক ধাঁধায় প্রবেশ এই তাহার প্রথম নয় ; দর্পনারায়ণের বিশ্বাস-ঘাতকতার পরে হইতে অনেক বার সে সেখানে প্রবেশ করিয়াছে, অনেক বার ফিরিয়া অসিয়াছে ; অন্যথা চিহ্নহীন এই পথ তাহার নিজের যাতায়াতে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে ; তাহা দেখিয়া সে প্রবেশ করে, আবার বাহিরে আসে ; সকলে এমন পারে না, কিন্তু সবাই ত' ইন্দ্রাণী নয়।

চৈতন্য ফিরিয়া আসিলেই যে বাস্তবকে তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা যায় এমন নয়,কিছুক্ষণ সময় লাগে,স্বপ্নলোকের রেশ পদে পদে তখনও তাহাকে ব্যাহত করিতেছিল। সে জানালার কাছে দাঁড়াইল ;—দেখিল দূরে নদীতীরে একটি চিতা জ্বলিতেছে ; সেই চিতাগ্নির দীপ্তিময় পটে লক্ষ্যগোচর হইল গোটা দুই মনুষ্য-মূর্ত্তি। এতক্ষণে তাহার স্বপ্নলোকের নেশা কাটিয়া গেল ; মৃত্যুর বর্ত্তিকায় জীবনকে আবার চিনিতে পারিল।

ইন্দ্রাণী ঘর হইতে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। নিষ্কলঙ্ক আকাশ যেন তারার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাহার মনে হইল আকাশটা একখানা সুবৃহৎ নিকষপ্রস্তর ; কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া কত রকমের সোনা উহাতে দাগা হইয়াছে, তাহারি চিহ্ন তারায় তারায় ; [illegible] আকাশ

গাত্রে হুস্ করিয়া একটা দাগ টানিয়া চলিয়া গেল ; তাহার মনে বলিয়া উঠিল এখনও সোনার পরখই চলিতেছে।

আর একখানা নিকষপ্রস্তর আছে, বৃহৎ নয়, কিন্তু খুব মূল্যবান, মানুষের মনে। ইন্দ্রাণী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল ; দেখিল সেখানে দুটি রেখা, একটি উজ্জ্বল, একটি ম্লান। কোটি কাহার ?

সে ঘরে ফিরিয়া আসিল ; অশান্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। কি সে ভাবিতেছে ! কাহার কথা ? আসল কথা, সে ভাল করিয়া নিজের মনকে বুঝিতে চায়। মানুষের নিজের মনের পুঁথিখানা তাহার এতই কাছে যে, অতি নিকটবর্ত্তিতার জন্য অক্ষরগুলি চোখে পড়িতে চায় না—কেমন যেন জড়াইয়া যায়। মানুষে অপরের মন বুঝিতে পারে না, কারণ তাহা অতি দূরবর্ত্তী। কিন্তু সেই যখন আবার প্রণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহার মন পড়া যায় ; ভালবাসা সেই ফোকাশ যাহার আলোতে জীবন উজ্জ্বল ভাবে বোধগম্য হইয়া উঠে ; তাহার এদিকেও অন্ধকার ওদিকেও অন্ধকার, মানুষমাত্রেই এক একটি গবাক্ষ-লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইয়া পথ চলিতেছে ; জীবনের যে অংশটুকু তাহাতে ধরা পড়িতেছে, তাহার পক্ষে সেইটুকু সত্য। সকলের লণ্ঠনের শক্তি ও ফোকাস সমান নহে। ইন্দ্রাণীর দীপরশ্মি জীবনের উপরে পড়িয়াছে ; দুইজন ব্যক্তি তাহাতে দেখা গিয়াছিল ; একজন ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে, আর একজন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে !

অশান্তভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করিবার পরে ইন্দ্রাণী কক্ষের প্রদীপটি লইয়া বাহিরে আসিল। কেন আসিল তাহা ভাল করিয়া সে জানে না। ধীর পদে তেতলা হইতে নামিল। সুবৃহৎ বাড়ী নিস্তব্ধ, নির্জ্জন ; চারিদিক অন্ধকার। সে কেবল একাকী দীপ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দোতলা হইতে অবতরণ করিল ; চলিতে লাগিল ! তাহার কি জ্ঞান ছিল ? একেবারে ছিল না বলিবার উপায় নাই, কারণ যে পথে লোকের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে, সে-পথ ত্যাগ করিয়া নিরিবিলি পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল ! পুরাতন বিশাল চণ্ডী-মণ্ডপের খিলানের মধ্যে প্রবেশ করিল ; ছাদে একদল চামচিকা ঝুলিতেছিল, আলো পাইয়া তাহারা ফরফর করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল ; অন্ধকারের প্রচ্ছন্ন সিক্ত গন্ধ ইন্দ্রাণীর নাসায় প্রবেশ করিল ; সে পা টিপিয়া শীতল পিচ্ছিল চণ্ডীমণ্ডপ অতিক্রম করিয়া বাহির-বাড়ীর কাছে আসিল ; কিন্তু সদর দরজায় না ঢুকিয়া একটা খিড়কি দিয়া প্রবেশ করিয়া যে-ঘরে পরন্তপ শয়ন করিত সেখানে উপস্থিত হইল। দরজার সম্মুখে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দরজায় হাত দিতে তাহার সাহস হইল না। একবার ভাবিল দরজা বন্ধ থাকিলে বাঁচিয়া যায়। তবে কেন সে দরজা পরীক্ষা করিয়া দেখে না ! পাছে দরজা বন্ধ থাকে সেই আশঙ্কা সে করিতেছিল ! কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে স্থির করিল দরজা বন্ধ, কাজেই ফিরিয়া যাওয়া যাক। সে দুই পা পিছনে হটিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাবিল, একবার দেখিয়াই যাই। দরজায় হাত দিল ; দরজা ভেজান ছিল মাত্র ; দরজা খুলিয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে রক্তের তাণ্ডব দ্রুততর হইয়া উঠিল !

নিজের অনিচ্ছাতেও যেন সে ভিতরে প্রবেশ করিল ! দেখিল নির্ব্বাণ-দীপ কক্ষে পালঙ্কের উপরে পরন্তপ নিদ্রিত ! সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ! নিদ্রিত পরন্তপকে বড় সুকুমার দেখাইতেছিল !

পরন্তপ দেখিতে সুপুরুষ এবং সুন্দর ; কিন্তু তাহার জীবন-যাপনের যে প্রণালী তাহাতে তাহার মুখে একটা উৎকট উগ্রতার ছাপ প্রায় স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল ! কিন্তু এই ব্যাধির প্রকোপে বহুদিন নিয়মিত জীবন যাপন করিবার ফলে সে উগ্রতা দূর হইয়া গিয়াছিল, তাই ইন্দ্রানী দীপলোকে তাহাকে সুপুরুষ ও সুন্দরই বলিয়াই মনে করিল ! রোগ-শয্যায় মানুষের শৈশব ফিরিয়া আসে ; পরন্তপকে শিশুর মত সরল, সুকুমার ও অসহায় বলিয়া মনে হইল। ইন্দ্রাণী দেখিতে লাগিল, তাহার চুলগুলি তৈলাভাবে অবিন্যস্ত ; ওষ্ঠাধর ঈষৎ ফাঁক ; কপালে কৃশতা ; চক্ষু মুদ্রিত ; দেহের বাকি অংশ আস্তরণে আবৃত। হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল, তাহার কপালে একটা দাগ ; মনে পড়িল, বেণ্ডা গল্প করিয়াছিল ইহা দর্পনারায়ণের আঘাতের ফল ; দর্পনারায়ণের কথা মনে হইতেই তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল ; প্রদীপ মাটিতে পড়িয়া নিভিয়া গেল ; ঘর অন্ধকার হইল !

ইন্দ্রাণীর মনে দর্পনারায়ণের বীর-মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ! ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইল ; তাহার ধারণা হইয়াছিল সে দর্পনারায়ণকে ভুলিয়াছে ; কিন্তু এ কি ! সুদূরতন আভাসে

অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কোথা হইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল! যদি সে সত্যই দর্পনারায়ণকে না ভুলিয়া থাকে; যদি সত্যই সে না ভুলিতে পারে? বিবাহের পরেও যদি মাঝে মাঝে তাহার আবির্ভাব ঘটে! ইন্দ্রাণী নিজেকে সান্ত্বনা দিল, বুঝাইল—ইহাই শেষ বার! ইন্দ্রাণী বোধ হয় ভুল করিল! জীবনে একটা প্রেম থাকে যাহা কিছুতেই দূর হয় না; অস্পষ্ট হইয়া বিস্মৃতির দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু তারপরে একদিন কেমন করিয়া অসম্ভাবিত-রূপে অতর্কিত ভাবে তাহার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে।

প্রদীপ পড়িবার শব্দে পরন্তপ শব্দ করিয়া উঠিল; বোধ হয় যেন জাগিল; ইন্দ্রাণী অন্ধকারে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ছায়ার মত দাঁড়াইয়া রহিল। পরন্তপ বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল; একবার অস্ফুট স্বরে বেঙার নাম ধরিয়া ডাকিল; আর ইন্দ্রাণী চোরের মত দাঁড়াইয়া সেই শীতের রাত্রে ঘামিতে লাগিল।

পরন্তপ শয্যাত্যাগ বা বিশেষ কোনরূপ গোলমাল করিল না; চকিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল! কিন্তু ইন্দ্রাণীর অনেকক্ষণ আর নড়িতে সাহস হইল না; সে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার ভয় হইতে লাগিল পাছে রাত্রি ভোর হইয়া যায়! অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া দেখিল পরন্তপ আর নড়িতেছে না, সে নিশ্চিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে দ্রুত পদে গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল! বাহিরে আসিয়া প্রায় এক রকম ছুটিতে ছুটিতে যে-পথ ধরিয়া গিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল! এ অর্গলের নিষেধ তাহার নিজের প্রতি; নিজেকে আর তাহার বিশ্বাস নাই!

[১১]

ক্রমে পরন্তপ সারিয়া উঠিল; এখন সে হাটিতে পারে, কাজেই সারাদিন ঘরে না থাকিয়া কিছু কিছু বেড়াইয়া বেড়ায়; সঙ্গে ছায়ার মত বেঙা চৌকিদার!

একদিন বেঙাকে দিয়া পরন্তপ দেওয়ানজীর কাছে প্রস্তাব করিল, এবার সে বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী বলিলেন, ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা কর! ইন্দ্রাণী বেঙার কথা শুনিয়া বলিল—বেঙা তোর বাবু না হয় যাক, তুই থেকে যা।

বেঙা বলিল—সে কি কথা মা'ঠান! সেই যে আমাদের মোতির মা বলত—দয়া করে দেয় নুন, তাত মারে দশ গুণ। দয়া করে ক'দিন আশ্রয় দিয়েছিলে তাই বলে চিরদিন তোমার উপর ভার হয়ে থাকব! মানুষের কাঁধে চড়ে থাকা যে কি অসুবিধে, সে আর কেউ না বুঝুক আমি তো বুঝি! —এই বলিয়া সে নিজের কুঁজটিকে দেখাইল!

সত্য কথা বলিতে কি, ইতিমধ্যে বেঙা যে শুধু ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়, সে বাড়ীর সকলের প্রিয় পাত্র! সে যদি সাধারণ মানুষ হইত, তবে এমন হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু সে বিকৃতাঙ্গ, বিরূপ, খানিকটা পরিমাণে মনুষ্যেতর ভাব তাহার মধ্যে ছিল; সেইজন্য মানুষে তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যে ভালবাসিত!

ইন্দ্রাণী বলিল—তোর বাবু বড় নেমকহারাম রে; বিপদের সময় আমি আশ্রয় দিলাম, আর অসুখ সারা মাত্র চলে যেতে চায়! যা, আমি কিছু জানিনে; দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা কর গিয়ে!

দেওয়ানজী বিপদে পড়িলেন; ইন্দ্রাণীর সম্মতি ব্যতীত সম্মানিত অতিথিকে কেমন করিয়া যাইতে বলে! এমন সময়ে চাঁপাঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত! দেওয়ানজী বলিলেন, চাঁপা এখন আমি কি করি! চাঁপা দেওয়ানজীকে দাদামশাই বলিত, কাজেই উভয়ের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসার সম্বন্ধ! চাঁপা বলিল—তোমার চোখের কি হয়েছে? দেওয়ানজী বলিলেন, চোখ আমার বেহাত হয়েছে; খুঁজে দেখো তোমার আঁচলে বাঁধা।

—তবে সেই চোখ দিয়ে আমি যা দেখিছি বল্‌ছি! ইন্দ্রাণীর বিয়ে দিতে হবে না?

দেওয়ানজী দৃঢ় সঙ্কল্পিত ভাবে বলিলেন—নিশ্চয়!

চাঁপা বলিল—তবে পরন্তপ রায়ের সঙ্গে চেষ্টা কর না কেন?

দেওয়ানজীর কল্পনাতে এ-কথা কখনও আসে নাই। তিনি বলিলেন—ইন্দ্রাণী তো বিয়ে করবে না।

চাঁপা—মেয়েরা কি কখনও বলে বিয়ে করবে!

দেওয়ানজীর মুখে হাসি ছুটিল—বলিলেন, তাই বুঝি আমি বিয়ে করতে চাইলে তুমি না বল!

চাঁপা—এতদিনে বুঝলে!

দেওয়ানজী বলিলেন—কিন্তু পরন্তপ বাবু কি রাজী হবেন।

চাঁপা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—সে তোমার ভাবতে হবে না। আমি বেঙার কাছে শুনেছি বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। পরন্তপ রায়ের আপত্তি নেই ধরে নিতে পার। তুমি একবার ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা কর!

দেওয়ানজী আর তিল মাত্র বিলম্ব না করিয়া খড়ম খট্ খট্ করিতে করিতে ইন্দ্রাণীর মহলে প্রবেশ করিলেন। চাঁপাও অন্য পথে ইন্দ্রাণীর মহলের দিকে চলিল।

সেদিন সন্ধ্যায় রক্তদহে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরন্তপ রায়ের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা বেলায় এই সংবাদ শুনিয়া গ্রামের মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিল; সকলেই খুসী হইল: কিন্তু চাঁপার আনন্দ সকলের চেয়ে বেশী।

[ক্রমশঃ



বন্দেমাতরম্

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদনের জীবন বৃটিশ-শাসিত বাঙ্গালী-জীবনের একাধারে সূচনা ও উপসংহার। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বাঙ্গালী যে উল্লাস অনুভব করিয়াছিল, চতুর্থ পাদে যে ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের স্বাদ একবার পাইয়াছিল এবং বিংশ শতকের মহাযুদ্ধের পরে যে ব্যর্থতা পদে পদে তাহাকে আঘাত করিতেছে, মাইকেলের জীবনে যেন অল্পদিনের মধ্যে, বহু দিন আগে, সেই লীলা অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মাইকেল বাঙ্গালীর ব্যর্থতার নীলকণ্ঠ।

ফরাসী বিপ্লবের সমুদ্র-মন্থনে অষ্টাদশ শতকের শেষে অমৃত উঠিয়াছিল। কিন্তু সে অমৃতের বার্ত্তা একজন বীরের বাহুর অপেক্ষা করিতেছিল; নেপোলিয়ানের দিগ্বিজয়ী ঈগলের পক্ষে ভর করিয়া এই বাণী ইউরোপের দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাবাণীর প্রচারের জন্য মহাবীরের অস্ত্র আবশ্যক। অস্ত্র নিরর্থক, নরঘাতক; আত্মার সে অগ্রদূত নয়, এই জাতীয় কথা আজকাল পাঠশালার বালকের মুখেও শোনা যায়; কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। মহর্ষিদের বাণীর প্রচারের জন্য মহাবীরের প্রয়োজন। সেকেন্দারের সৈন্যদলকে অনুসরণ করিয়াই গ্রীক-সংস্কৃতি এশিয়াখণ্ডে প্রসারিত; আবার জুলিয়াস সিজার রোম সাম্রাজ্যের আত্মার আবহাওয়া গল্‌ ও ব্রিটেনে বহন করিয়াছিলেন। খৃষ্টের বাণীর প্রচারক খৃষ্ট নন; তাঁহার শিষ্যগণও নন; অন্ততঃ তাঁহাদের চেষ্টায় তাঁহার প্রচার তেমন বৃদ্ধি পায় নাই; রোমক সম্রাটগণ খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তবেই ব্যাপক ভাবে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হইয়াছিল। খৃষ্ট বলিয়াছিলেন—"সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও"; খৃষ্ট ছিলেন রিয়ালিষ্ট, বাস্তবনিষ্ঠ; সিজারেরও যে একটা প্রাপ্য আছে তাহা তাঁহার অনবগত ছিল না। সিজারের প্রাপ্য ত ওই দায়িত্ব, অস্ত্র ও ঐশ্বর্য্য যে দায়িত্বকে বহন করে: অনেকে জুলিয়াস সিজারকে এণ্টিক্রাইষ্ট বলিয়াছে, এই এণ্টিক্রাইষ্টের বংশধরগণই ক্রাইষ্টের বাণীর প্রধান প্রচারক।

হোলি রোমান সাম্রাজ্যের মূলগত ভাবটিও ইহাই। সম্রাট ও পোপের যুগল বাহু যুগপৎ এই সাম্রাজ্যের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছে; এখানেও দেখি, পোপ ও সিজারের মধ্যে ক্রাইষ্ট ও এণ্টিক্রাইষ্টের সম্মেলন; বস্তুতঃ বাইবেল ও বারুদ সগোত্র ও সরিক; সরিক বলিয়াই তাহারা বাদী, বিবাদী; ইউরোপের ইতিহাস এই সরিকানি বিবাদের ইতিহাস।

ফরাসী বিপ্লবের বাণীকে স্থায়িত্ব দিয়াছিল নেপোলিয়ান, যাহাকে কল্পনাহীন গ্রন্থমাত্রজ্ঞান ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছে ফরাসী বিপ্লবের শত্রু। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সময়ে নেপোলিয়ানের আবির্ভাব না হইলে ফ্রান্সের সূতিকাগৃহে পূতনা রাক্ষসীর দল শিশু বিপ্লববাণীকে গলা টিপিয়া হত্যা করিত।

আজ যে কম্যুনিজ্‌ম যুগপৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিতেছে, তাহার মূলেও বল; রাশিয়ার বিশ লক্ষ বেয়নেট ইহার পৃষ্ট পোষণ করিতেছে; আত্মার বলের ভিত্তি বাহুবল; বারুদের বেদীতে বাইবেল ও বেদের প্রতিষ্ঠা!

ফরাসী বিপ্লবের বাণী অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের হইলেও, এই বীরের অপেক্ষা করিতেছিল বলিয়া উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের পূর্ব্বে প্রচারিত হইতে পারে নাই। এই যে বাণী যাহাকে আমরা আত্মার উল্লাস বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, ইহা ইংরাজের মারফতে ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিল। তাই সেদিনের বাঙ্গালা দেশে, এই বাণীর স্পর্শে, যে বাণী মূলতঃ ফরাসী, আসিয়াছে ইংরাজের হাতে, দেশান্তরে যাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে, প্রকৃতি যাহার বিকৃত হইয়াছে, এমন উল্লাসের বান ডাকিয়াছিল। উল্লাস-জাত আশা; আশা-জাত আকাঙ্ক্ষা; এই আশা আকাঙ্ক্ষার চারিদিকে সংস্কারের বাত্যা পড়িয়া গিয়াছিল। সমাজে,

রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে! বাঙ্গালী সেদিন ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিত।

এই আত্মার উল্লাস সেদিন অনেক বাঙ্গালীই অনুভব করিয়াছিলেন; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, কিন্তু মধুসূদনের অপেক্ষা বেশী কেহ করেন নাই। মধুসূদনের এই আত্মার উল্লাস তাঁহার জীবনের এক কোটি; যে কোটিতে কাব্য-অনুপ্রেরণা, সাহিত্য-সৃষ্টি, যেখানে কল্পনা-সমুদ্র অধীর বিক্ষোভে অলক্ষ্য চাঁদের টানে বারে বারে ফেনাইয়া উঠিতেছে; এই কোটির বাণী তাঁহার জীবনে ও কাব্যে বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, "মহাকাব্য সৃষ্টি করিব, মহাকাব্য সৃষ্টি করিব।"

কিন্তু মাইকেলের আর একটি জীবন ছিল, কিংবা একই জীবনের আর একটি কোটি।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাষ্পীয় কলের বিপুল শক্তির আবিষ্কারে অভিনব একটা চিন্তার ধারা মানুষের মনে দেখা দিতেছিল। এই ব্যাপারটি প্রধানত ও প্রথমত ইংলণ্ডেই ঘটে। ইহা ব্যাপক হইতে হইতে ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে প্রায় তত্ত্বের কোঠায় পৌঁছিয়াছিল—ইহাকে বলা যাইতে পারে সম্পদ্ তত্ত্ব; অর্থাৎ তখন সম্পদ্ আর কেবল ঐশ্বর্য্য মাত্র রহিল না, তাহা একটা নৈতিক শক্তিরূপে পরিণত হইল। ঐ সময়কার উদারতা পরিপূর্ণ উদরের স্বস্তির ফল; উদার ও উদরের মধ্যে আকার মাত্র ভেদ। ইহার মধ্যেও একটা আপাতবিরোধ আছে। লোকে বাণিজ্যের পথকেই শান্তির পথ ভাবিয়াছিল; ১৮-৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-প্রদর্শনীকে লোকে আসন্ন শান্তির যুগের অগ্রদূত মনে করিয়াছিল। কিন্তু আবার ইতিহাসের সাক্ষ্য বিপরীত। ওয়াটার্লুর পরে যে-ইউরোপের ক্লান্ত হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছিল, বাণিজ্য-বলীয়ান্ সেই ইউরোপ ঐ প্রদর্শনীর তিন বৎসর পরেই আবার অস্ত্র ধরিল; সে অস্ত্র আজিও সে ছাড়ে নাই, বরঞ্চ তাহার শক্তি ও সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে বাণিজ্যের শান্তিময় পথ কুরুক্ষেত্রের দিকে গিয়াছে, আর যাঁহারা প্রকৃত মহাবীর —সেকেন্দার, সিজার, শার্লামেন, নেপোলিয়ান, তাঁহারা আত্মার বাণীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বাষ্প-শক্তির আবিষ্কারে শিল্পজগতে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার চরম ফল ইংলণ্ড ঊনবিংশ শতকের শেষে লাভ করিয়াছিল; আমাদের দেশে এই সম্পদ্-তত্ত্ব ঊনবিংশ শতকের শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখন, এই সম্পদের, মোহ নয়, তত্ত্ব মাইকেলের জীবনার্দ্ধকে গ্রাস করিয়াছিল। একদিকে তাঁহার আত্মার উল্লাস, অপর দিকে সম্পদের উল্লাস। এ ক্ষেত্রে মনে রাখিবার কথা এই যে, আর দশজন যে ভাবে সম্পদ্ কামনা করে মাইকেল সে ভাবে করেন নাই; যতই আপাতবিরুদ্ধ হোক, এই দুই ভিন্নগোত্র বাণী, আত্মার উল্লাস ও সম্পদের উল্লাস, তাঁহার জীবনে যেন সামঞ্জস্য খুঁজিতেছিল। সামঞ্জস্য খুঁজিতেছিল বটে, কিন্তু সমন্বয় কি ঘটিয়াছিল!

মাইকেল বলিতেন চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করা যায় না; তিনি চুল কাটিয়া এক মোহর দাম দিতেন; না গুনিয়া মুঠা করিয়া তুলিয়া টাকা (অনেক সময়েই পরের টাকা) কোচম্যানকে বকশিস দিতেন; ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া আর দেশী-পাড়ায় বাসা করিলেন না; প্রয়োজন হইলে এবং না হইলেও ধার করিতেন। ইহা কি কেবল মোহ না ইহার মূলে কোন তত্ত্ব আছে!

মেঘনাদবধ কাব্যের রামলক্ষ্মণের প্রতি তিনি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, বড় জোর তাহাকে কৃপা বলা যাইতে পারে; কবি-মনের সমস্ত সহানুভূতি রাবণের দিকে; তার কারণ রামলক্ষ্মণ দরিদ্র, ঐশ্বর্য্যহীন; আর রাবণ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; কবি কল্পনা, মাইকেল রাজসিক কল্পনা ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা রাখে; রামের দিকে সে সুবিধা নাই; রাবণের দিকে আছে। যে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা তাঁহাকে পাইলে মাইকেল সম্পূর্ণ সহানুভূতিতে অঙ্কিত করিতেন; কিন্তু এ যে বিত্তহীন নিঃস্ব রামচন্দ্র; মাইকেলের কল্পনা রামের দিকেও নয়, রাবণের দিকেও নয়, ঐশ্বর্য্যের দিকে। এই ঐশ্বর্য্য তত্ত্ব, তত্ত্ব হিসাবে কি না জানি না, কিন্তু ঐশ্বর্য্য হিসাবে তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। বাল্যকাল

হইতে ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছার মূলে ঐশ্বর্য্যলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলিতেন বটে যে মহাকবি হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাওয়া তাঁহার প্রয়োজন ; কিন্তু ব্যারিষ্টার হইবার জন্যই তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনের আর একটি ধুয়া—ইংলণ্ড কতদুর ! ইংলণ্ড কতদুর !

আমরা দেখিলাম, মাইকেলের জীবনের এক কোটিতে আত্মার উল্লাস অপর কোটিতে সম্পদের উল্লাস ; কিন্তু এই দুই কোটির মধ্যে কি কোন যোগ-সূত্র নাই? তিনি কবিত্ব ও সম্পদকে পরস্পর-বিরোধী মনে করিতেন না ; একটি আর একটির অপেক্ষা রাখে ; একটি না হইলে আর একটি পঙ্গু হইয়া পড়ে।

শিল্পীর পক্ষে সম্পদ্ প্রয়োজন নয়, অত্যাবশ্যক। স্বয়ং বিশ্বশিল্পী মনের ভাবকে প্রকাশের জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। মানব-শিল্পীর পক্ষেও আগে তেমন বস্তুকে আয়ত্ত করা দরকার। মাইকেল এঞ্জেলোর দরকার মর্ম্মর পাথর ; টিশিয়ানের দরকার বর্ণ ও পট ; সেক্সপিয়রের দরকার মারমেড সরাইখানা ও গ্লোব থিয়েটার ; বিটোভেনের দরকার যন্ত্র ; গ্যেটের দরকার রাজকীয় ঐশ্বর্য্য, কারণ তিনি ছিলেন জীবন-শিল্পী। বস্তুকে, ঐশ্বর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই ভাবুকের ভাব মূর্ত্তি গ্রহণ করে ; কাজেই বস্তুবিহীন, ঐশ্বর্য্যবিহীন শিল্পীর অস্তিত্ব কল্পনা করাই যেন যায় না। বস্তুর মধ্যেই যেন ভাবুকের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে ; বস্তুই যেন ভাবুকের ব্যক্তিত্ব।

মাইকেল শিল্পসৃষ্টির জন্যই ঐশ্বর্য্য কামনা করিতেন ; ঐশ্বর্য্যের জন্য ঐশ্বর্য্য নয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই ; ঐশ্বর্য্যের উল্লাস ও আত্মার উল্লাস, মূলতঃ যাহা পরস্পর-বিরোধী নয়, মাইকেলের জীবনে তাহা সুসম হইয়া উঠে নাই। দুটি বিভিন্ন সুর তাঁহার হাতে যেন একতান হইয়া উঠিল না। এই দুই কোটির মধ্যে জ্যা আরোপ করিতে গেলে বিশাল হরধনু ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মাইকেলের জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহাই মাইকেলের জীবনের ট্র্যাজেডি! তাঁহার জীবনের দুইটি ধুয়া, দুইটি মিলিয়া একটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইতে পারে নাই, এই দুই ধুয়া তাঁহার জীবনে অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে—মহাকাব্য কত দুর ! ইংলণ্ড কত দূর !

গোলদীঘির ধারে, হিন্দু কলেজের সম্মুখে একদিন টিফিনের ছুটিতে দু'টি বালক আলাপ করিতেছিল। দুজনের বয়স সমান ; একজন গৌরবর্ণ, একজন কালো। গৌরবর্ণ ছেলেটি নীরবে নতমুখে বিষণ্ণভাবে বসিয়া, আর কালো ছেলেটি তাহার কাঁধে হাত দিয়া দণ্ডায়মান। কালো ছেলেটি বলিল,—তুমি না কি পড়া ছেড়ে দিচ্ছ? গৌর বালকটি উত্তর করিল, জান তো ভাই কত মাইনে বাকী পড়েছে, বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ এত টাকা দিতে পারবেন না, কাজেই--

প্রশ্নকারী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, আমি তো অনেক টাকা পাই, আমার কাছ থেকে তুমি নাও না কেন? টাকা শব্দটি উচ্চারণের সময় বালকের জিহ্বা সরস হইয়া উঠিল, যেন সে মনে মনে টাকা শব্দটির স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আমরা যথা সময়ে দেখিব, বালকের পরবর্ত্তী জীবন এই টাকার কেন্দ্রেই আবর্ত্তিত হইয়াছে, কিংবা তাহার পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-জীবনকে মনে রাখিলে বলিতে ইচ্ছা করে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনকে সে বলিদান দিয়াছে—এই টাকার ক্রুশ-কাষ্ঠে।

এমন সময় আর একটি বালক সেখানে আসিল ; সে কালো ছেলেটির চুল লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ কি মধু, এ কেমন ধারা চুল ছাঁটা? মধুসুদন যেন আজ সারাদিন এই কথাটি শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হাঁ ভাই, এ সাহেবী ধরণে চুল ছাঁটা—এক মোহর লেগেছে। গৌরবর্ণ বালকটি এতক্ষণ তাহার নূতন কেশবিন্যাস দেখে নাই, এবার দেখিয়া বলিল,—মধু এ তোমার উপযুক্ত হয় নাই। তুমি জিনিয়াস্ তুমি সাহেবদের বৃথা অনুকরণ না করে একটা নূতন ধরণে চুল কাটবে, এই তো আমরা আশা করি। মধু ইহাতে মোটেই দমিল না। কোথা হইতে কোন্ জিনিষটি (অবশ্য টাকা সর্ব্বত্র হইতে) লইতে হয়, তাহা সে জানিত। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন পায়ের তলার মাটি পাইলে তাহার উপর সমস্ত শক্তি দিয়া দাঁড়ায়, মধু তেমনি এই ভৎর্সনার মধ্যে জিনিয়াস্ শব্দটির উপর আপনাকে স্থাপন করিয়া সঙ্গীদের অপেক্ষা নিজেকে উচ্চতর মনে করিতে লাগিল।

সে নবাগত বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল—গৌরদাস, আমি একজন মহাকবি হ'ব, তুমি আমার জীবনী লিখবে। আমি জানি নিশ্চয়ই মহাকবি হ'ব, তার পরে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কেবল যদি ইংলণ্ডে যেতে পারি। এই বলিয়া সে হাত নাড়িয়া বলিল—I sigh for distant Albion's shore ! সে ইতিমধ্যেই ইংরেজি বচনভঙ্গী যতদুর সম্ভব ইংরেজের মত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

এই বালকের পুরা নাম মধুসূদন দত্ত, গৌরবর্ণ বালকটি ভুদেব মুখোপাধ্যায়, আগন্তুক গৌরদাস বসাক।

মধুসূদনের রং কালো, শুভ্র চাপকান, ইজার পরাতে সাদা-কালোর দ্বন্দে তাহাকে কৃষ্ণতর মনে হইতেছিল। রং কালো হইলেও মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয় ভিতর হইতে প্রতিভার দ্যুতি ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে, যেন কালো মেঘের তলে চাপা-পড়া সূর্য্য। চুল ঈষৎ কুঞ্চিত, মাঝখানে সরল সীঁথি। বড় বড় ভাসা-ভাসা উদার অচঞ্চল চোখ দুটি যেন অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাতে সন্দেহের ছায়া মাত্র নাই। সব সুদ্ধ মিলিয়া তাহার রং, স্বাভাবিক কালো ও পোষাকের সাদা বড়ই স্নিগ্ধ এবং তরল।

মধুসূদন বালক-কাল হইতেই উদার এবং স্নব; স্নব-এর প্রতিশব্দ বোধ করি বাঙ্গালায় নাই, কারণ দেশে এতই আছে।*

ক্রমশঃ

* এই রচনার কোন কোন অংশ কয়েক বছর পূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য তাহা পুনরায় মুদ্রিত হইল।

ফুলের ফসল

—শ্রীগিরীন্ চক্রবর্ত্তী

আমরা করি ফুলের ফসল সারা-বছর ধ'রে
এমন মাণিক আছে রে কা'র, নেবে সওদা ক'রে!
আকাশ-পাটে, মাঠের বাটে মোদের বেসাত-ভারা,
প্রহর জেগে দেয় পাহারা চন্দ্র, সূর্য্য, তারা॥
সাধ্য কা'রো নাই রে ঘটে হাতটি বাড়ায় আগে,
যেম্নি ছোঁয়া অম্নি নো'য়া! সাপের কামড় লাগে
ঝড়-তুফানে নৌকা মোদের সমান তালে চলে—
মোদের তরে মোমের বাতি জ্বলে জলের তলে॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা মোদের দেহে বন্ধু সম রয়—
জীবন সাথে সন্ধি করে মরণ মধু-ময়॥
দিনের শেষে রাত্রি হাসে, রাত্রিশেষে দিন,
ছয়টি ঋতু গানের মতন বাজায় ফুলের বীণ্।
রঙ্গন-পাখির শিশ্-মহলে খুসীর আসর বসে,
আমরা মজি পান ক'রে সে অমর সুধা-রসে।
হর্ষ-মগন মন্দ-পবন বহে মোদের ঘেরি—
মনের কোণে সংগোপনে বাজে সুরের ভেরী॥
গ্রীষ্মে যবে উষ্ণ লাগে তপ্ত অধীর বায়—
বর্ষা এসে ছন্দ ঢালে শৈতালি-হাওয়ায়।
কচি-ধানের নয়ন খোলে শরৎ দিনের প্রাতে,
হেমন্তে হায় 'তাই রে না না' মোদের প্রাণে মাতে!
শীতটি শুধু একটুখানি আড়া-আড়ি করে—
ফাগুনে ফের্ সমান-তালে গানটি গলায় ধরে॥
নেহাৎ যারা উদর-দায়ে ধনীর পোষাক পরে—
তা'রা-ই আসে স্রোতের মতন মোদের দুয়ার-ঘরে॥
তাদের দুঃখ দেখে মোরা অন্তরে যাই গ'লে—
অম্নিতে তাই মোদের বেসাত দিই তাদের-ই বলে!
আমরা বেজায় ভাল-মানুষ! আন্‌চানী নাই মনে,
নিজের জিনিষ পরকে বিলাই পরের কষ্ট গ'ণে॥

একটি রাত্রি

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুস্তফী

মাণিক বাড়ী ফিরল রাত প্রায় এগারটায়। সারা দিন অভুক্ত অবিশ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে ঘুরে তার দেহ তখন অবশ ও ক্লান্ত। অসম্ভব রকমের ভারবাহী একখানা শ্রীহীন মালগাড়ীর মত ঝিমুতে ঝিমুতে সে বাড়ী ঢুকল। কোথায় না ঘুরেছে সে কাজের জন্য? যেখানেই যায়, সেখানেই শোনে, হয় কাজ নেই, নয় ঠিকানা রেখে যান, প্রয়োজন হলে লিখে পাঠাব। সেই সকালে এক পয়সার 'মুড়ি' আর আধ পয়সার 'ফুলুরি' খেয়ে সে সহরের এ সীমা থেকে ও সীমা পর্য্যন্ত খুঁজেছে, তবু কোথাও কাজ পেল না। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হল। মাণিক নিত্যকার মত সেদিনও বাড়ী এল হতাশায় মন ভারি করে—ভগ্ন হৃদয়ে।

সদর দরজাটা ভেজান ছিল, একটু ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। সে সন্তর্পণে ঢুকল বাড়ীর ভিতর। ভূতের মত অন্ধকার যেন ওর ঘরখানার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। সে অনুভব করল যে, প্রতিমা হয় ত ঘুমোচ্ছে। পকেট থেকে দেশলায়ের বাক্স বার করে একটা কাঠি জ্বালতে প্রমাণ হল তার অনুমানের সত্যতা। সেই ক্ষণিকের জন্য ক্ষীণ আলোকে গৃহের শ্রীহীনতা যেন মাণিককে ব্যঙ্গ করে উঠল। একদিকে প্রায় দশবছরের ব্যবহৃত ভাঙ্গা তোরঙ্গ; তার উপরে দেওয়ালে টাঙ্গান একটা কাঠের আনলা, তাতে কয়েকটা ছিন্ন, মলিন বসন; কয়েকটা ঘটি-বাটি ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো, ওপাশে কালীর একটি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি; তাকের উপর একটি ঝুলমাখা উপেক্ষিত গণেশ-মূর্ত্তি; এদিকে একটা কাঠের প্যাকিং-বাক্স। এই আসবাব-পত্র নিয়ে মাণিকের সংসার গড়ে উঠেছে।

মাণিক আস্তে আস্তে স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, "ওগো, ওগো!"

প্রতিমা শব্দ করে আলস্য ত্যাগ করে আবার পাশ ফিরে শুল। বাস্তবিক, বেচারা সারা দিন খেটে খেটে রাত্রে একটু ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক না? আজ প্রতিমার দিকে চেয়ে মাণিক বুঝল যে, প্রতিমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অজ্ঞাতসারে একটা ব্যথিত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। এমনি করে এক মিনিট—দু'মিনিট কাটল। আবার মাণিক মৃদু কণ্ঠে ডাকল, "প্রতিমা!"

এবার প্রতিমার পূর্ণ-চেতনা ফিরে এল। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসে স্বামীর পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অর্থ-হীন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল রোজকার মত, "পেলে?"

মাণিক শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল, "এত ঘুরছি, তবুও যদি কোন কাজ পাওয়া যায়। সবাই বলে, শহরের পথগুলো টাকা দিয়ে বাঁধান; কিন্তু আমি তো একটা সিকি পয়সাও দেখলাম না সেখানে।"

মাণিক একটু থেমে, দম নিল। আবার বলল, "খেয়েছ তুমি?"

নিরুত্তর প্রতিমা কাপড়ের আঁচল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল নতবদনে। তারপর তার কাপড়ের খুঁট থেকে দুটো পয়সা বার করে স্বামীর হাতে দিয়ে বলল, "এক পয়সার আলুর দম আর এক পয়সার কেরোসিন তেল নিয়ে এস।"

দুটো পয়সা এক সঙ্গে দেখে অকস্মাৎ মাণিকের চোখ দুটো জল্ জল্ করে উঠল আনন্দে। সে সন্তর্পণে চলে গেল স্ত্রীর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে, যাবার সময়ে জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে পেলে পয়সা?"

প্রতিমা উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করে রইল। মাণিক আর কোন কথা না বলে গৃহত্যাগ করে গেল। আর প্রতিমার সারা দেহটা লজ্জায় অপমানে শিউরে উঠল। বিকাল বেলায় অনুকে সামনের দোতলা-বাড়ীর একটি যুবক লজেঞ্চুস খেতে ঐ পয়সা দুটো দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তার মার সাংসারিক খুটিনাটি কথা জেনে নিয়েছিল। অনু এসে মার কাছে কথাটা বলতে প্রতিমা তাকে খানিক

ধমক দিয়ে লোকটার সঙ্গে ভবিষ্যতে কথা কইতে বারণ করল এবং পয়সা দুটো তখনই ফেরৎ দিয়ে আসতে আদেশ করল। প্রতিমা কদিন থেকে লোকটাকে একটু একটু সন্দেহ করছিল। সে ছাদে উঠলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার পানে তাকিয়ে থাকে অসভ্যের মত। প্রতিমার আজ কান্না পেল। দরিদ্র বলে কি তাদের এমনি করে অপমান করতে হয়, এমনি করে প্রলোভন দেখাতে হয়? অনু পয়সা দুটি নিয়ে ফিরে এসে বলল যে, লোকটাকে দেখা গেল না। সেই দুটি পয়সা! পয়সা নয় ত, যেন প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার—যেন মূর্ত্তিময় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ। সেই দুটো পয়সাই তাকে ব্যয় করতে হল স্বামীর ক্ষুধা দূর করবার জন্য! স্বামী চলে গেলে তার মনে হল যে, এমন করে অপমান সহ্য করার চেয়ে না খেয়ে মরা শতগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু তার প্রতিকার করবার আর উপায় নেই, কারণ তখনই মাণিক ফিরে এল। প্রতিমা হাড়ি চেঁছে চারটি পান্তাভাত বার করল। পাশের ঘর থেকে দুটি চাল ধার করে রেঁধেছিল। ছেলে মেয়েরা খাওয়ার পর এই দুটি অবশিষ্ট ছিল।

মাণিক প্রশ্ন করল, "তোমার কই?"

প্রতিমা হেসে বলল, "আমার ক্ষিধে নেই।"

"বাজে ওজর দেখিয়ো না প্রতিমা।"

প্রতিমার চোখ অশ্রুতে ছল্ ছল্ করে ওঠল। মাণিক নিঃশব্দে একটা বাটি নিয়ে তাতে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী ভাত তুলে রাখল। প্রতিমা বাধা দিয়ে বলল, "ওই কটি তো ভাত—তার থেকে অতগুলো তুলে রাখলে তুমি খাবে কি? আমরা তো ঘরে থাকব, না খেয়ে তবু সহ্য করতে পারব; কিন্তু তুমি কাল আবার দুর্ব্বল শরীরে রাস্তায় চলবে কি করে?"

মাণিক নীরবে ভাত খেতে লাগল। বলল, "এক ভদ্রলোকের একটি চাকরের দরকার, তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছেন, কাল একবার কাজটার জন্যে চেষ্টা করে দেখলে কি হয়?"

কথাটা শুনে প্রতিমার বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দুঃসহ দুঃখে আর বেদনায়, গণ্ড বয়ে ঝরে পড়ল মুক্তার মত শুভ্র অশ্রু-কণা। মাণিক হেসে বলল, "ও কি? কি সেন্টিমেন্টাল তোমরা! না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে এ কাজ ভাল না?"

প্রতিমা আস্তে আস্তে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। তার-পর মাণিকের খাওয়া হয়ে গেলে সে ভাতকটা খেয়ে ফেলল নুন দিয়ে চট্‌কে, শুধু আলুর দমটা সরিয়ে রাখল এক পাশে।

ছেঁড়া কতকগুলি কাথা আর চট দিয়ে তৈরি বহুদিনের ব্যবহৃত ময়লা চাদর ঢাকা বিছানায় নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মাণিক বিগত দিনের কথা ভাবতে লাগল।

বি-এ পাশ করতেই মা চেপে ধরলেন, "বিয়ে-থাওয়া করে এবার ঘর সংসারী হ' বাবা। আর কদ্দিন এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবি! উনি থাকলে কি আর আমায় এত ভাবতে হত?" এখানে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। একটু থেমে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "একটি গরীবের মেয়ে আছে বাবা—দেখতে শুনতে ভাল, অনেক গুণও আছে তার।"

সব বাঙ্গালীর ছেলের মতই মাণিক বেঁকে বসেছিল। উপার্জ্জন করার আগে সে বিয়ে করবে না। মা কিছুতেই ছাড়বেন না, প্রতিবাদ করলেন, "কাজ কি তোর হবে না রে কোথাও? পাশ করে কি শুধু শুধুই সহরে বসে থাকবি?" এই বলে তিনি অজস্র নজির দেখালেন, কে অতি সামান্য লেখা পড়া জেনেই কত বড় চাকরি করছে। এমন অনেক কথায় মাণিকের তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে গেল।

একদিন সে মিশনারীদের স্কুলের দরজায় দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাবী পত্নীকে দেখেও এল। মানুষের চিত্ত সাধারণতঃ দুর্ব্বল এবং মাণিকের বিয়ের ভিত্তিও এই দুর্ব্বলতার উপর।

একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল শুভলগ্নে। সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে সে গর্ব্ব অনুভব করল খুব এবং বন্ধুরাও তার কথায় সায় দিল অকপটে। তার মামাশ্বশুর, যাঁর কাছে প্রতিমার দরিদ্রা জননী বিধবা হয়ে বাস করছিলেন এবং এই বিয়ের যিনি কন্যাকর্ত্তা—তিনি জামাইকে কোন একটা বই-এর দোকানে কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি করে দিলেন।

এমনি করে সংসার চলছিল এক রকম, পিতৃদত্ত ভগ্নপ্রায় বাড়ীতে বাস করার সুযোগে। সাত বছর এই রকমে কোন্ ফাঁকে কেটে গেল। মাণিকের জননী একদিন পুত্রকে তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সহ এই সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ও আধুনিক যুগের প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামের মাঝে ফেলে রেখে হরিবোল করতে করতে বহুবাঞ্ছিত গোলকধামের পথে যাত্রা করলেন। এ আঘাতের কিছু পরেই প্রতিমার মামা ও মামী দেহরক্ষা করলেন। তার ফলে ওদিকের সম্পর্ক প্রতিমার এক প্রকার চুকেই গেল। মামাতো ভাইরা একবার গোঁজখবরও নিত না। সুতরাং আট বছর পর দুটি প্রাণী সংসারে অভিভাবকহীন হয়ে দাঁড়াল মুখোমুখী। এদিকে মাণিক যে দোকানে কাজ করত, সে দোকানটি একদিন বন্ধ হয়ে গেল আর মাণিকও পরিণত হল একটি সম্পূর্ণ বেকারে, ঘাড়ে পরিবার পরিজন চাপিয়ে।

একটা বছর কাজ কাজ করে মাণিক শকুনের মত ঘুরে ঘুরে মরেছে, কাজ পায় নি। সংসারে সহস্র অভাব অনটন। কচিখোকার দুধ, মেয়ের সকালে বিকালে জলখাবার, দু' বেলা ভাত, নিজেদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। সংসার একেবারে হয়ে দাঁড়াল অচিরেই অচল ও শৃঙ্খলাহীন। খাদ্যাভাবে তাদের চেহারা হতে লাগল ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার। কদিন ধারধোর করে চলেছিল। এখন একেবারেই অচল!

মাণিকের চোখ বয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। হাতের চেটো দিয়ে সে চোখের জল মুছে নিল।

এমন সময়ে ওপাশের বাড়ীর ডেপুটির বৌ সহসা সুমধুর সুরে গান গেয়ে উঠল এসরাজ বাজিয়ে।

মাণিকের চোখ টন টন করে উঠল পরাজয়ের বেদনায়। সেও একদিন কত কি হবার স্বপ্ন দেখেছিল। তখন স্কুলে পড়ত। পৃথিবীর কমনীয়তা ও সরলতাই তার চোখে পড়েছিল তখন। সে ত জানত না এই পৃথিবীতে কি ভীষণ সংগ্রাম চলেছে, তার প্রচণ্ড দাপটে অহরহঃ কত ভাঙ্গন-গড়ন হচ্ছে, কত লোক তলিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে আর কত লোক উঠছে সেখান থেকে দিনের মত উজ্জ্বল পরিচয়ের ঊর্দ্ধে। তাই তার এক বন্ধু সতীশ সেন তাকে যেদিন জিজ্ঞেস করেছিল যে, ভাবী জীবনে সে কি হবে—সে তখন সদর্পে বলেছিল, "প্রফেসার হওয়া তোমার ইচ্ছা, তার চেয়ে বড় হবার চেষ্টা করব আমি।"

কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতেই তার মুখে কে যেন এক পোঁচ কালী লেপে দিল। সতীশ সেন আজ একজন নাম-করা প্রফেসর, আর সে?—তার সারা বুকখানা সহসা টন্ টন্ করে উঠল। তার মা'ই ত' তাকে এমনি করে পরাজিত হবার সুযোগ দিলেন। তার মা-ই তাকে সম্পূর্ণ একটি বাঙ্গালী করেছেন, কিন্তু মানুষ ত' করেন নি। হয় তো বিয়ে না করলে সে একটা কিছু না কিছু হত।

এদিকে প্রতিমা এসে কখন তার পাশটিতে শুয়ে পড়েছে আর ওদিকে গান চলেছে পূর্ণোদ্যমে, তাল-লয়ের সমন্বয়ে। তার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন সুরে সুরে ঝঙ্কৃত হতে লাগল। প্রতিমার দিকে তাকাল। একটি অসহায়া উপবাস-ক্ষীণা যুবতী, যৌবনের মধ্যাহ্নে যার দেখা দিয়েছে প্রৌঢ়ত্বের ভয়াবহ রেখাপাত। বাস্তবিক তার অক্ষমতার জন্যই তার সোনার প্রতিমার মত প্রতিমাকে কাল নিয়ে চলেছে ক্ষমাহীন যূপকাষ্ঠে বলির পশুর মত একটু একটু করে। এতক্ষণে পাশের বাড়ীর গান থেমে গেছে। তারা শোবার আগে রোজই এমনি একখানা গান গায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে, এক ফালি চাঁদ। বিদ্রূপ করার মত করে সে মাণিকের ঘরের জানালা দিয়ে যেন উঁকি মারছে। তার ম্লান আলোকে প্রতিমার মুখের স্বরূপ যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল। চোখের কোলে তার কালী পড়েছে, মাথার চুল অনেক উঠে গেছে, মুখের শ্রী বিগত হয়েছে। তার বড় কান্না পেল। এমনি করে বেচারাকে হত্যা করছে, অথচ সে তার উপর কথা বলে নি কখনও—যদিও সে স্বামীর অধিকারের অজুহাতে স্ত্রীর কাছে অনেক রকম জোরজুলুম করেছে। সারা বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত অন্যায় যেন ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য অস্থির হয়ে উঠল আজ সহসা।

কাদের একটা ঘড়ীতে ঢং করে একটা বাজল।

সে চুপ করে চাঁদের পানে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। আজ তার ঘুম হবে না, একটুও না। তার মাথাটা যেন একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তার শিরা উপশিরার

মধ্যে কে যেন উত্তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়েছে। তার মনে পড়ে ফ্যাসিজম্‌, কমিউনিজম, হিটলারিজম, ইটালী, রাশিয়া, জার্ম্মানী। মনে জেগে ওঠে রাজা-মহারাজার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তরুণ-তরুণীর হাস্য-লাস্য, ক্রীড়া-কৌতুক, জয়-পরাজয়, বড়লোকের সুখ আর নির্ধনের দুঃখ, বিংশ শতাব্দীর একটি নিখুঁত ছবি। সে উন্মাদের মত হয়ে যায় সহসা। অনেকদিন আগে সে এডিসনের 'কেটো' পড়েছিল। সেই আত্মহত্যাকারী মহামতি কেটোর শেষ রজনীর 'সলিলকি'টা হুবহু মনে পড়ে। আত্মা অমর আর—

> If there is a power above,
>
> ... he must delight in virtue ;
> And that which he delights in must be happy.
> But when ! or where—this world was made for Cæsar
> I am weary of conjectures. This must end them."

'This', অর্থাৎ তলোয়ার দিয়ে কেটোর আত্মহত্যার কথা বেশ স্মরণ আছে! সে-ও ত ঐ হতভাগ্যের মত পরাজিত, সে এ জগৎ আর কামনা করে না। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ভুলে যায়—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ। তাকের উপরে ত' দাড়ী কামানোর ধারাল ক্ষুর আছে। এ জন্মে সুখ পেল না, আগামী জন্মে নিশ্চয়ই সুখ পাবে। সে ত' জীবনে পাপ করে নি—অন্ততঃ যতদূর তার স্মৃতিশক্তি পৌঁছায়, ততদূর পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, সে নিষ্পাপ।

উন্মাদের মত একবার উঠে বসে—ঘরের চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। তারপর দৃষ্টি পড়ে প্রতিমার উপর। তখনও একরকম ভাবেই ঘুমোচ্ছে—চাঁদের আলোও তেমনি অসভ্যের মত তার মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে। মাণিক স্ত্রীর কাছে একবার শেষ বিদায় গ্রহণ করতে চায়। একবার মাত্র, এই শেষবার, সে প্রতিমার অধর-প্রান্তে একটি চুম্বনরেখা এঁকে দিয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে যাবে। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে সে ঘুমন্ত স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়। তারপর তার দুর্ব্বল শরীর অসাবধানতা বশতঃ ঢলে পড়ে প্রতিমার প্রায় বুকের উপর এবং প্রতিমারও গাঢ় ঘুম একটু শিথিল হয়ে যায়। সে ঘুম-ঘোরে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে নিঃসহায়ের মত—যেমন করে একটা ভীরু লতা একটা বৃক্ষকে তার বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে। মাণিকও ভুলে যায় তার আত্মহত্যা করবার দুরভিসন্ধি।

এই ভীরু স্ত্রীকে রেখে কোথায় গিয়ে সে সুখ পাবে? পাঁচ মিনিট আগের কথা ভাবতে তার রোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল নিজের দুঃসাহসিকতায়। তার নিজেকে আর বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্ত্রীকে বুকের মধ্যে নিয়ে নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল।

আকাশে তখনও চাঁদ সেই অবস্থায় রয়েছে, তেমনি করে তখনও তাদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

বর্ত্তমান সমস্যা

...ভারতবাসী তথা মনুষ্য জাতির মূল সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবের কারণ সম্যক্‌ ভাবে নির্ম্মূল করিতে হইলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণকে একদিকে যেরূপ শাসন-যন্ত্রকে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করিয়া অপর যে-কেহ মন্ত্রী হউন না কেন, গঠন-কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে, সেইরূপ আবার তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বাস্থ্যবান্‌, বুদ্ধিমান্‌ এবং কর্ম্মঠ, তাঁহাদিগকে মনুষ্য জাতির সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার উপায় কি কি, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্ম গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।...

আলোচনা

পুরাণ-প্রবেশ

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "পুরাণ-প্রবেশ" বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। এই গ্রন্থে তিনি পুরাণ সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার রীতি অভিনব, অধ্যবসায় অসীম ও কোন কোন স্থলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অতীব উপাদেয়। প্রচ্ছদপটে ও "গ্রন্থপরিচয়" অংশে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে পুরাণের অংশবিশেষে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া অনেকে যে বিশেষ উৎসাহিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অনেক সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। "পৌরাণিক কালমাপনা" ও "কল্পাব্দ" সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি আমাদের কাছে বিশেষ করিয়া অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া এই কয়টী বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

"পুরাণ প্রবেশে"র ৯ম পৃষ্ঠায় গিরীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"প্রাচীন পুরাণকার যে ক্ষেত্রে যুগের দ্বারা কাল মাপিয়াছেন, অর্বাচীন পুরাণকার সে স্থলে বর্ষমান ব্যবহার করিয়াছেন।" ইহার অর্থ কি বুঝিলাম না। প্রাচীন পুরাণকারেরা যে ২, ৫, বা ৫০০ বৎসর বুঝাইতে "যুগ", "মহাযুগ", "কল্প", বা "মন্বন্তর" প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ত' শতবর্ষ, সহস্রবর্ষ প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" "পশ্যেম শরদঃ শতম্", "বিশ্বসৃজাময়নং সহস্রসংবৎসরম্", "সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্ত্তয়ৎ" ইত্যাদি স্থানে মহাযুগ, কল্প বা মন্বন্তর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ত' দেখিতেছি না। বস্তুতঃ ৫ বৎসরের যে যুগ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রভৃতিতে দেখা যায়, উহা festal calendar এর উপযোগী একটা "মোটামুটি" লঘু যুগ। কিছুদিন পর পর এই যুগেরও সংস্কার প্রয়োগ আবশ্যক। নতুবা যথেষ্ট ভ্রম সঞ্চিত হইবার কথা। ধর্মকার্য্যোপযোগী এইরূপ লঘু যুগের ব্যবহার অন্য ধর্মেও দেখা যায়। খৃষ্টানদের মধ্যেও ecclesiastical calendar, ও মধ্যে মধ্যে তাহার সংশোধন আছে। এই লঘু যুগগুলি অল্পকালের জন্য মোটামুটি নৈসর্গিক। কিন্তু কিছু পরে সংস্কার প্রয়োগ না করিলে এ গুলি আর নৈসর্গিক থাকে না। সুতরাং গিরীন্দ্র বাবু যে বলিয়াছেন—"৫ বৎসর কালই লঘুতম যুগ। ইহা অপেক্ষা উত্তম যুগকল্পনা হইতে পারে না। এই কালের অন্তে চারি প্রকার জ্যোতিষিক ঘটনা পুনঃ পুনঃ যুগপৎ আবর্ত্তিত হইতেছে" (৪০ পৃষ্ঠা)" তাহা সত্য নহে। যে কোন জ্যোতিষীর নিকট অনুসন্ধান করিলে ইহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। নৈসর্গিক রাখিবার জন্যই তখন দীর্ঘযুগের কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেমন ৩০ দিনে মোটামুটি "চান্দ্রমাস" ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চান্দ্রবৎসর ৩৬০ দিনে ধরিলে বড় ভুল হইবে ও উহা নৈসর্গিক থাকিবে না।

গিরীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"চান্দ্রবৎসর ৩১৫ দিনে ও সৌরবৎসর ৩৬৬ দিনে। এক দিনে চান্দ্র ও সৌর বৎসর ও পূর্ব্বোক্ত চারি মাস আরম্ভ ধরিলে দেখা যাইবে যে, ৫ বৎসর অন্তর চারি মাসের যুগ হইবে ও ৩৫৫ বৎসর পর পর চান্দ্র ও সৌর বৎসর যুগ হইবে। ৩৫৫ বৎসর ৫এর গুণিতকও বটে। অতএব ৩৫৫ বৎসরে দীর্ঘ লৌকিক যুগ কল্পিত হইতে পারে। ইহাও নৈসর্গিক যুগকাল" (৪০ পৃঃ)। কিন্তু ৩১৫ দিনে চান্দ্রবৎসর গিরীন্দ্রবাবু কোথায় পাইলেন? বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রভৃতি কুত্রাপি ইহা নাই। দ্বিতীয়তঃ চান্দ্রবৎসর ৩১৫ দিনে ধরিলে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সৌর ও চান্দ্রবৎসরের অন্তর ১১ দিন হয়। ৫ বৎসরে অন্তর ৫৫ দিন হয়। চান্দ্র ২ মাস কিন্তু ৫৯ দিনে হয়। সুতরাং ৫ বৎসর পরই যুগ আর নৈসর্গিক রহিবে না। ৩৫৫ বৎসর পরে ত' অসম্ভব পার্থক্য হইবে ও যুগ তখন "নৈসর্গিকে"র ধারেও থাকিবে না। গিরীন্দ্র বাবু ৫ বৎসরের মহাযুগের মোহে মুগ্ধ হইয়া ৭১ মহাযুগে কল্প পাইতে (৭১ × ৫ =) ৩৫৫ বৎসর ও ৩৫১ দিনে চান্দ্রবৎসর কল্পনা করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

গিরীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"মোট ৫ বৎসরে মহাযুগ ও ৫০০০ বৎসরে ১ কল্প। বেণ্টলীর মতে এই বিভাগ অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। 'গ্রহমঞ্জরী' ৫০০০ বৎসরের কল্পকে সমর্থন করিতেছে।" কিন্তু যে বেণ্টলী হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থরাজিকে "আগুন্ত জাল" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার মতকে গ্রন্থকার কেন যে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধের অতীত। গিরীন্দ্রবাবু বেণ্টলীর স্বরূপ ভালরূপেই জানেন। তাঁহার পুস্তকের "বিদেশীয় পক্ষপাত" অংশে ২১৮ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই বেণ্টলীর উৎকট হিন্দুবিদ্বেষের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ইংরাজ মহোদয়টী আমাদের শাস্ত্রাদির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করার পক্ষে যে যুক্তিটী দিয়াছেন তাহা অতীব উপভোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—If we are to believe in the antiquity of Hindu works...then the Mosaic account is all a fable or a fiction. অতএব হিন্দুর শাস্ত্রাদি প্রাচীন হইতেই পারে না!

গ্রন্থকার "গ্রহমঞ্জরী"র কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তকখানির সংবাদ তিনি বেণ্টলী সাহেবের লেখা ছাড়া অন্য কোথাও পাইয়াছেন কি? ইহা যে উক্ত ইংরাজের বেতনভুক্ কোন ব্যক্তির রচিত নয়, তাহা মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? "গ্রহমঞ্জরী" জাল না হইলেও, ইহা যে প্রামাণিক

তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। প্রামাণিক জ্যোতিষিক গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের সমর্থন না পাইয়া গিরীন্দ্রবাবুকে যে অজ্ঞের অজ্ঞাত একখানি পুস্তক হইতে সমর্থন লাভ করিতে হইয়াছে, ইহাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

যাহাই হউক, "গ্রহমঞ্জরী"তে যুগমান সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেণ্টলীর প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

প্রথম হিসাবে :—

কলিযুগ-পরিমাণ	২৪০ বৎসর
দ্বাপর "	৪৮০ "
ত্রেতা "	৭২০ "
সত্য "	৯৬০ "
∴ ১ মহাযুগ "	২৪০০ বৎসর।

গ্রন্থ হইতে গণনায় পাওয়া যায় যে, বিক্রমাব্দের ৭০৭ বৎসর পূর্ব্বে ৬৭ মহাযুগের ৭ম মন্বন্তরের কলিযুগ শেষ হইয়াছে। অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভ - ১০০৪ খৃঃ পূঃ। কলিযুগের শেষ—৭৬৪ খৃঃ পূঃ।

দ্বিতীয় হিসাবে :—

কলিযুগ-পরিমাণ	½ বৎসর
দ্বাপর "	১ "
ত্রেতা "	১½ "
সত্য "	২ "
∴ ১ মহাযুগ "	৫ বৎসর।
∴ ৭১ মহাযুগ "	৩৫৫ "
সত্য "	২ "
∴ ১ মন্বন্তর "	৩৫৭ "
∴ ১৪ " "	৪৯৯৮ "
সত্য "	২ "

কল্প

"গ্রহমঞ্জরী"র কলিযুগ প্রভৃতির পরিমাণ ও আরম্ভ প্রভৃতি গ্রহণ করিলে আজকাল বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কারণ, পরীক্ষিৎ নন্দান্তর কাল অন্ততঃ ১০০০ বৎসর করিতে হইলে কল্যব্দের আরম্ভ অন্ততঃ ১৪০০ খৃঃ পূঃ হওয়া উচিত। অথচ "গ্রহমঞ্জরী"র মতে ইহা ১০০৪ খৃঃ পূঃ। অতএব গিরীন্দ্র বাবু ৫০০০ বৎসরের কল্পের $\frac{1}{10}$ অংশ অর্থাৎ ৫০০ বৎসর কলির পরিমাণ ও তাহার আরম্ভ ১৪৫৮ খৃঃ পূঃ ধরিলেন। কিন্তু একমাত্র "গ্রহ-মঞ্জরী"তে যে হিসাব পাওয়া যায়, সেই হিসাবে কলির আরম্ভ যে সময়ে বলা হইয়াছে, তাহা ও ঐ গ্রন্থের যুগাদির মান গ্রহণ না করিয়া মন্বন্তর অংশটুকু গ্রহণ করিয়া, নিজের সুবিধামত কল্যাদির মান ও আরম্ভ কল্পনা করা কি ভাবে যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমরা বুঝি নাই। ৬ মাসে কলিযুগ হইলে আবার ৫০০ বৎসরে কি ভাবে ও কি প্রকারের কলিযুগ হয়, তাহাও আমরা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"চতুর্যুগ কাল অবশ্যই যুগ হইতে পারে, কিন্তু দ্বাদশ সহস্র মানুষ বা দৈব বৎসরে কি ঘটনার আবর্ত্তন হয়, তাহা আমাদের জানা নাই" (৩৩ পৃঃ)। তাঁহার অবগতির জন্য কিছু লিখিতেছি। সূর্য্যের মন্দোচ্চ এক নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্রে আগমন-কাল (Period of Revolution of the line of apsides) ১০৮০০০ বৎসর। আবার কোনও এক বৎসর মন্দোচ্চ ও বিষুব-বিন্দু (Vernal equinoctial point) একত্র থাকিলে পুনরায় ২১৬০০ বৎসর পরে আবার উভয়ের সংযোগ হইবে। এইরূপে কোনও বৎসর বিষুব বিন্দু ও কোনও নক্ষত্রের যোগ হইলে পুনরায় ২৭০০০ বৎসর পর এরূপ যোগ হইবে (Precessional period)। এই তিনটি ব্যাপার একদিনে সংঘটিত হইলে পুনরায় ১০৮০০০ বৎসর পরে আবার এই তিনটির আবর্ত্তন বা সংযোগ হইবে। ১০৮০০০ বৎসরের চারিগুণ অর্থাৎ ৪৩২,০০০ বৎসর কল্যব্দের মান। এই ভাবে মিল করিতে গিয়াই দীর্ঘ যুগের কল্পনা আসিয়া পড়ে। গিরীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"পরীক্ষিতের কাল (১৪১৬ খৃঃ পূঃ অব্দ) হইতে প্রায় ৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে" পুরাণে "ভবিষ্য অংশসমূহ যোজিত হইয়াছে।" কিন্তু পরীক্ষিতের সময় যে ১৪১৬ খৃঃ পূঃ হইতে পারে না, তাহা ক্রমশঃ দেখাইতেছি। পুরাণে আছে, "যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ"। অর্থাৎ, যে দিন শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন সেই দিন হইতে কলির আরম্ভ। এই আরম্ভ কাল জ্যোতিষাদি গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা পাই যে, কলির আরম্ভ ৩১০২ খৃঃ পূঃ। আমাদের গ্রন্থকার এই কাল গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু গ্রহণ না করার কোন হেতুও তিনি বলেন নাই। কিন্তু এই সময় গ্রহণ করিলে যে বহুগ্রন্থোক্তির সামঞ্জস্য করা যায়, তাহা আমরা দেখাইতেছি।

বরাহমিহির তাঁহার "বৃহৎসংহিতা"র বৃদ্ধগর্গের একটি বচন তুলিয়াছেন, যথা—"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ শাসতি পৃথ্বীম্। ষড়্‌দ্বিকপঞ্চ-দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ"। অর্থাৎ, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষি-গণ মঘায় ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ও শককালের ব্যবধান "ষড়্‌দ্বিক-পঞ্চদ্বি" বর্ষ। এই শ্লোকের "ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বি" ও "শককাল" অংশগুলির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। "ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বি" অর্থে ৬২৫২ অথবা ৬৫৫২ এবং "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" ন্যায়ে ২৫২৬ অথবা ২৫৫৬ সংখ্যা বুঝাইতে পারে। আর, "শককাল" অর্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত ৭৮ খৃঃ অব্দে আরব্ধ শকাব্দ, অথবা শাক্যকাল বুঝা যাইতে পারে। কাশ্মীরীয় ভট্টোৎপল (৯৬৬ খৃঃ) শ্লোকস্থ "শককাল"কে প্রচলিত শকাব্দ ও "ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বি"র অর্থ ২৫২৬ বৎসর ধরিয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিয়া কল্‌হন (১১৪৮ খৃঃ) "রাজতরঙ্গিনী"তে যুধিষ্ঠিরের কাল (২৫২৬—৭৮, বা) ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ পাইয়া, যাঁহারা ৩১০২ খৃঃ পূঃ বলেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধগর্গ যে বর্ত্তমান প্রচ-লিত শককালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অধুনা দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সুতরাং গর্গোক্ত এই শককাল প্রচলিত "শকাব্দ" হইতে পারে না। শককাল অর্থে শাক্যকাল বা বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ (৫৪৬ খৃঃ পূঃ) ও

"ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বি"র অর্থ ২৫৫৬ বৎসর ধরিলে আমরা (৫৪৬ + ২৫৫৬ =) ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দে উপনীত হই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্যান্য জ্যোতিষ গ্রন্থের মতে ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কলির আরম্ভ। গর্গের বচনের এই ব্যাখ্যা করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, যুধিষ্ঠিরের কাল ৩১০২ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। কল্হণের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের ২য় পুলকেশীরাজের ৫৫৬ শকাব্দ ও ৩৭৩৫ কল্যব্দ বা ভারতযুদ্ধের কালদ্যোতক ঐ হোলে লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ যুদ্ধের কাল বর্ত্তমান শকাব্দের (৩৭৩৫—৫৫৬ =) ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বের, অর্থাৎ ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে।

এইবার আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল গ্রীক্ প্রমাণ দিতেছি। আলেক্‌জ্যাণ্ডারের (৩২৬ খৃঃ পূঃ) পর মেগাস্থিনিস প্রভৃতি গ্রীক-দূতগণ ভারতে মৌর্য্য রাজধানী পাটলিপুত্রে অবস্থান করেন। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতীয়েরা Dyonysios হইতে Sandracottas পর্য্যন্ত ১৫৩ রাজা গণনা করে।…তাহারা ইহাও বলে যে, Dyonysios, Herakles হইতে ১৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। এই Herakles যে কে, তাহা তাঁহাদের উক্তি হইতে সুস্পষ্ট "Under the name of Herakles again, Megasthenes describes either Krishna or Balarama, who were both incarnations of Vishnu. This seems as all but inevitable inference when we combine with the fact that these two brothers were natives of Mathura on the river Jamna the statement of Megasthenes that Herakles was worshipped by the inhabitants of the plain especially the Sauraseni, an Indian tribe possessed of two large cities, Methora and Kleisobara (Krishnapura). and who had a navigable river the Jobares flowing their territories. Now Methora is evidently a transliteration of Mathura, and Jobares a copyist's error for Jomanes i e, the river Jumna or Yamuna, on which Mathura is situated. The Sauraseni are the inhabitants of the district around Mathura of which the sanskrit name was Surasena." (M'crindle's "Ancient India as described in classical literature" P 64, Fn).

মেগাস্থিনিস্ বলিতেছেন যে, ভারতের সমতলভূমির ও বিশেষতঃ শূরসেন দেশীয় লোকেরা হিরাক্লিসের পূজা করিয়া থাকে। এই শৌরসেনীদের ২টি প্রধান নগর আছে। একটি "মেথোরা" (মথুরা) ও অপরটি "ক্লাঁসোবেরা" (কৃষ্ণপুর); এবং এই রাজ্যের মধ্য দিয়া "যোবারেস্" (যমুনা) নদী প্রবাহিত। এই "হিরাক্লিস্" যে শ্রীকৃষ্ণ, "মেথোরা" যে মথুরা, "ক্লীসোবেরা" যে কৃষ্ণপুর ও "যোবারেস্" যে 'যমুনা'র লিপিপ্রমাদ, তাহা M'crindle সাহেব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। "হীরাক্লিস্" হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ১৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী Dyonysios কে?

পুরাণমতে কুরু হইতে অর্জ্জুন পর্য্যন্ত ১৭ পুরুষ ব্যবধান। আর, এই কুরুর পুত্র ১ম পরীক্ষিৎ ও ইহার পুত্র জনমেজয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ১ম জনমেজয় হইতে কৃষ্ণার্জ্জুন ১৫ পুরুষ। পুরাণের সহিত গ্রীকদূতের উক্তির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে বলিতে হয় যে, Dyonysios হইতেছেন 'জনমেজয়ঃ'। গ্রীক্‌ভাষায় চ-বর্গের অভাব হেতু ও নবাগত বিদেশীয়ের পক্ষে ভারতীয় উচ্চারণ বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া "জনমেজয়ঃ" শব্দের Dyonysiosএ রূপান্তরিত হওয়া খুবই সম্ভব। মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৩৮ জন রাজা ছিলেন। প্রতি রাজার গড়ে ২০ বৎসর করিয়া রাজত্ব ধরিলে ১৩৮ রাজার রাজত্বকাল হয় ২৭৬০ বৎসর। চন্দ্রগুপ্তের কাল খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কাল ২৭৬০ + ৩২৬ = ৩০৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে। অতএব ৩১০২ খৃঃ পূঃ যে যুধিষ্ঠিরের কাল, তাহা গ্রীক্ বচনের সহিত পৌরাণিক বচন মিলাইলেই সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত যে ১৩৮ জন রাজার কথা গ্রীক্‌দূতেরা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম পুরাণে পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর পুরাণ হইতেই পাওয়া যাইবে। বৃহদ্রথবংশ বর্ণনা করিবার সময় পুরাণকার বলিয়াছেন—"প্রাধান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত"। অর্থাৎ, পুরাণকার রাজাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া সকল রাজার নাম করেন নাই, মাত্র প্রধান প্রধান রাজাদের নাম করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও আছে—"এবং তূদ্দেশতো বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া। নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি॥" অর্থাৎ, "আমি তোমার কাছে সংক্ষেপে নৃপতিগণের বংশাবলী কীর্ত্তন করিলাম, সকল বংশের বর্ণনা করা শত জন্মেও সম্ভব নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দকে যুধিষ্ঠিরের কাল বলিলে পুরাণোক্ত পরীক্ষিৎ নন্দান্তর কালের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। পুরাণে আছে—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্॥
এবং বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

এই শ্লোকের দ্বিতীয় অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (১) পঞ্চদশোত্তরং শতং বর্ষসহস্রম্, অর্থাৎ ১০০০ + ১১৫ = ১১১৫ বর্ষ। এই কল্পে পরীক্ষিৎ নন্দান্তর কাল ১১১৫ বৎসর হইয়া পড়ে। (২) পঞ্চদশশতম্ উত্তরং বর্ষসহস্রম্, অর্থাৎ ১৫০০ + ১০০০ = ২৫০০ বর্ষ। Bodelian library তে রক্ষিত মৎস্যপুরাণের পুঁথিতে (no. bmt, Pargiters lit) শেষ লাইনের পাঠ আছে, "এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতত্রয়ম্"। অর্থাৎ ১০০০ + ১৫০০ = ২৫০০ বর্ষ। Pargiter সাহেবের মতে এই পুঁথি "Well-written, fairly free from clerical mistakes" (Dynasties of the Kali Age, p. xxxi)। গিরীন্দ্র বাবু প্রভৃতি এই পাঠটী লক্ষ্য করেন নাই। এই পাঠের সহিত প্রচলিত পাঠের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হইলে, তাহাই করণীয়। "শতং পঞ্চদশোত্তরম্" অংশের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ কল্পনা করিলে দুই পাঠের সামঞ্জস্য সুন্দররূপে রক্ষিত হইতে পারে।

আপত্তি হইতে পারে যে, পরীক্ষিৎ নন্দান্তর কাল ২৫০০ বৎসর হইলে নন্দের রাজ্যাভিষেককাল খৃঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দীতে ফেলিতে হয়। কিন্তু

নন্দের সময় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া সর্বসম্মত। ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্লোকে "নন্দ" অর্থে চন্দ্রগুপ্তবিজিত "নন্দ" না ধরিয়া প্রদ্যোতবংশীয় "নন্দিবর্দ্ধন"কে ধরিলে সকল দিকে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। নন্দেরা ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং নন্দদের রাজ্যারম্ভকাল ৪২৫ খৃঃ পূঃ। নন্দবংশের পূর্বে শিশুনাগেরা ১৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং শিশুনাগদিগের রাজ্যারম্ভ কাল (৪২৫ + ১৬৩ =) ৫৮৮ খৃঃ পূঃ। ইহাদের পূর্ব্বে প্রদ্যোতবংশীয়েরা রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাদের শেষ রাজা নন্দিবর্দ্ধন ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভকাল (৫৮৮ + ২০ =) ৬০৮ খৃঃ পূঃ। সুতরাং পুরাণোক্তিসমূহের সমন্বয় করিতে হইলে, এই প্রদ্যোতবংশীয় নন্দিবর্দ্ধনকেই শ্লোকোক্ত "নন্দ" বলিতে হয়। যিনি (in round numbers) পরীক্ষিতের ২৫০০ বৎসর পর রাজা হন] ভিন্সেন্ট স্মিথ্ ও ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও নামসাম্যে নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দী প্রভৃতি যে "নন্দ" ইহা অনুমান করিয়াছেন। ("Early History of India" 4 th Ed. P. 41 ; Journal of the B. V. O. Research Society," 1923 P. 418 দ্রষ্টব্য।)

এইবার দেখা যাউক, পুরাণে পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে যে বংশাবলীর বর্ণনা আছে, তাহা হইতেও এই ২৫০০ বৎসর কাল পাওয়া সম্ভব কি না। বার্হদ্রথ বংশের বিবরণের শেষে সমস্ত পুরাণই বলিতেছেন—"ষোড়শৈতে নৃপা জ্ঞেয়া ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ। ত্রয়োবিংশাধিকং তেষাং রাজ্যঞ্চ শতসপ্তকম্॥" এই ১৬ জন নৃপতি ভাবী বার্হদ্রথ। এই বার্হদ্রথেরা ৭২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। এখানে Pargiter প্রভৃতি এই ১৬ জন রাজার ৭২৩ বৎসর রাজত্বকালের কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই বংশের বর্ণনার আরম্ভে পুরাণকার বলিতেছেন—"প্রাধান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি গদতো মে নিবোধত"। অর্থাৎ, তিনি যে নামগুলি করিলেন তাহা প্রধান প্রধান রাজার নাম। অন্য অনেক রাজাও ছিলেন ও ইঁহাদের সম্মিলিত রাজত্বকাল ৭২৩ বৎসর। পুরাণকার পরে আবার বলিয়াছেন—"দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপা হ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ। পূর্ণং বর্ষসাহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি"। অর্থাৎ, এই ৩২ জন রাজা ভাবী বার্হদ্রথ। ইঁহাদের রাজত্বকাল পূর্ণ সহস্র বৎসর। বৃহদ্রথ বংশসংক্রান্ত এই দুইটি উক্তির সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হয় যে, পরীক্ষিতের পর বার্হদ্রথেরা ৭২৩ বৎসর রাজত্বের অন্তে রাজ্যচ্যুত হন ও পরে আবার রাজা হইয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহাদের যে ৩২ জন রাজার কথা লেখা হইয়াছে তাহাও প্রাধান্য অনুসারে। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু আরও অনেক রাজা ছিলেন। বার্হদ্রথবংশের পর প্রদ্যোতবংশীয় রাজাদিগের বর্ণনা পুরাণে ধৃত হইয়াছে। প্রথমেই পুরাণকার বলিতেছেন—"বৃহদ্রথেষ্বতীতেষু বীতিহোত্রেষবন্তীষু। পুলিকঃ স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রমভিষেক্ষ্যতি"। অর্থাৎ বৃহদ্রথগণ, বীতিহোত্রগণ ও অবন্তীগণ (মালবগণ) অতীত হইলে পুলিক নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়া স্বপুত্র প্রদ্যোতকে রাজা করিবেন। এখানে দেখা যাইতেছে, বৃহদ্রথবংশ ব্যতীত বীতিহোত্র ও মালবগণের রাজত্বের পর প্রদ্যোতবংশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই বীতিহোত্র ও মালবগণ সম্বন্ধে পুরাণে কোনও বর্ণনাই নাই। এই মালবগণের যে প্রজাতন্ত্র-শাসন (Republican Form of Govt.) ছিল, তাহা গ্রীক ও ভারতীয় অন্যান্য প্রমাণ হইতে অনেকেই জানেন। এই বীতিহোত্র ও মালবগণ প্রজাতন্ত্র শাসন করিতেন। ইঁহাদের রাজা না থাকায়, পুরাণকার ইঁহাদের বিবরণ এক কথায় শেষ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিসও লিখিয়া গিয়াছেন— "From the time of Dyonysios to Sandracottas, the Indians counted 153 kings...but *among these a republic was thrice established......* and another to 300 years and another to 120 years (M'crindle's "Ancient India as described by Assian"—pp 203-294.)। এই মতে কৃষ্ণার্জ্জুন ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে তিনবার প্রজাতন্ত্র শাসন চলিয়াছিল। প্রথম বারের শাসনকালের বর্ণনা গ্রন্থের সেই অংশ নষ্ট হওয়ায় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয়বার ৩০০ বৎসর ও তৃতীয় বার ১২০ বৎসর প্রজাতন্ত্র শাসন চলিয়াছিল, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রজাতন্ত্র শাসন পুরাণোক্ত বীতিহোত্র ও মালবগণের হওয়াই সম্ভব বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। মালবগণ পরে আবার ৪৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নিজেদের একটী অব্দ প্রচলিত করেন।

পুরাণ হইতে পূর্ব্বে পাইয়াছি যে, বৃহদ্রথেরা (৭২৩ + ১০০০ =) ১৭২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। গ্রীক-বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, দুই বার প্রজাতন্ত্র শাসনের কাল (৩০০ + ১২০ =) ৪২০ বৎসর। উভয় কালের সমষ্টি (১৭২৩ + ৪২০ =) ২১৪৩ বৎসর। পরে নন্দিবর্দ্ধন পর্য্যন্ত প্রদ্যোত বংশের রাজত্বকাল (১৩৮ − ২০ =) ১১৮ বৎসর। উভয়ের যোগফল (২১৪৩ + ১১৮ =) ২২৬১ বৎসর। সুতরাং গ্রীক্-বিবরণী হইতে যে অন্য এক বারের প্রজাতন্ত্রশাসনের কথা লুপ্ত হইয়াছে, তাহা (২৫০০ − ২২৬১ =) ২৩৯ বৎসর হইবে। এই ভাবে পুরাণ ও গ্রীক্ বিবরণীর সহযোগে পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল যে ২৫০০ বৎসর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত তাহা বুঝা যায়।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিবেন যে, ভারতযুদ্ধ বা যুধিষ্ঠিরের কাল একটী সুস্পষ্ট সময়। প্রাচীন প্রমাণসমূহের সমন্বয়ে সেই সময়টী নিরূপণ করা কঠিন নহে। বিরুদ্ধ প্রবল প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই সময়টির যথার্থতা অস্বীকার করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। পরবর্ত্তী ভারতের পরাধীনতার যুগে কোথায় কোন ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে; সাহেবদের মতানুসারে সেই ভ্রমকে সত্য বলিয়া প্রচার করা আদৌ উচিত নহে। আমাদের অতীত কিছুই ছিল না, অল্পদিন পূর্ব্বে ইহার আরম্ভ এই সব কথা বিদেশীয় বিজেতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কাল হইতে মাত্র ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, এই সত্যটুকু বিশ্বাস করিতে আমাদের ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইংরাজের ইতিহাস ২০০০ বৎসরের বলিয়া আমাদের ইতিহাসও তদনুরূপ ধরিতে হইবে! ইহার ন্যায় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কিছু আছে বলিয়া ভাবিতে পারি না।

এই আলোচনার জ্যোতিষিক অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শিল্পী যামিনী রায়ের মতবাদ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের গত অধিবেশনে শিল্প-শাখার সভাপতি শ্রীযামিনী রায় মহাশয় কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলের প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছিলেন যে, জীবনের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা চাই। উহাদের উভয়ের সম্বন্ধ গাছ ও ফুলের সম্বন্ধের মত, দুই-এর মধ্যে বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। শিল্পী যদি জীবনের ক্ষেত্রে অসত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে তাঁহার শিল্প কখনও সত্য বা মহৎ হইতে পারে না। সেই জন্য যামিনী বাবু বলেন, আজিকার খাপছাড়া বাঙ্গালী জীবনে কোনও ভাল আর্ট জন্মিতে পারে না। ইহাতে না আছে ইউরোপের ভোগের বীর্য্য, না আছে ভারতের সাত্ত্বিক ত্যাগের মহিমা। অতএব আমাদের দেশে আর্টের ফুল ফোটাইতে হইলে প্রথমে জীবনের বর্ত্তমান দৈন্য দূর করা আবশ্যক। হয় আমাদিগকে পুরা ইউরোপীয় হইতে হইবে, নয়ত সে পথ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ভারতীয় আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে।

আর্টের সঙ্গে জীবনের যোগের কথা আমরা স্বীকার করি এবং যামিনী বাবু যখন ভাল আর্ট সৃজনের জন্য জীবনকে সমৃদ্ধ করার কথা বলেন তখন তাঁহাকে আমরা সমর্থনও করি।

যামিনী বাবু তাঁহার অভিভাষণে দ্বিতীয় এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, শিল্পে আমরা বাস্তববাদের পথই লই অথবা আদর্শবাদ অনুসরণ করি, ইহা প্রথম স্তরের কথা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একবার যে পথ বাছিয়া লওয়া যায়, তাহা হইতে কোনও মতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। ভারতীয় আদর্শবাদের পথে অগ্রসর হইলে শিল্পী অবশেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যখন বিন্দু তাঁহাকে সিন্ধুর পরিপূর্ণ আনন্দ দান করে। বাস্তববাদের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রকাশ-ভঙ্গী সরল হইতে সরলতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। আজ ইউরোপীয় শিল্প যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, শান্ত চিত্তে সেই পথে অগ্রসর হইলে অবশেষে চীন দেশের আর্টে পৌঁছাইতে হয়। চীনদেশের শিল্প বাস্তবতার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম প্রকাশ।

যামিনী বাবুর প্রসঙ্গ হইতে মনে হয় যে, শিল্প-সাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তিনি সর্ব্ববিধ উপাধি এবং সংস্কার বর্জন করিয়া সর্বলোক এবং সর্বকালের গ্রহণযোগ্য কতকগুলি আনন্দময় সত্যকে সরল এবং দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। অবশেষে হয়ত তাঁহার এমন অবস্থা হয় যখন ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার আর চিত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, অথবা সহজ সরল আনন্দে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে যে বিন্দু অঙ্কিত হয়, তাহাতেই তিনি পরিপূর্ণতার স্বাদ লাভ করেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, একজন শিল্পী যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ববিধ উপাধি পরিহার করিয়া বিন্দুতে সিন্ধু নিরীক্ষণ না করিতেছেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তিনি সত্যের সন্ধানে বার বার চিত্র হইতে চিত্রান্তরে বিচরণ করিতে থাকেন, ততক্ষণ তিনি সাধনার শেষ পইঠায় উপনীত হ'ন নাই। ততক্ষণ তাঁহার অঙ্কিত চিত্র শুধু সাধন-পথে তাঁহার অগ্রগতির পরিমাণ আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। সে চিত্র অস্থায়ী অবস্থার অস্থায়ী প্রকাশ এবং সেইজন্য ক্ষণ-ধর্মাবিলম্বী অবস্থার মত তাহাও ক্ষণিকের ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকে। যামিনী বাবুর মতে কেবল বিন্দুর মধ্যেই শিল্প-সাধক স্থির আসন লাভ করিতে পারেন। ওঁকারে সর্বসঙ্গীত যেমন স্থিতিলাভ করে, চিত্রে কেবল বিন্দু অথবা বিন্দুজাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই পরিপূর্ণতা সম্ভব। উভয়ই সমাপ্তির নিদর্শন, অবশিষ্ট সকলই অসম্পূর্ণ এবং পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ। চলার পথে প্রতি পদক্ষেপ যেমন ক্ষণিকের মায়া, জগতের অধিকাংশ ছবি তেমনই মায়ার প্রকাশ, কেন না তাহারা সত্যের পূর্ণ প্রকাশ নহে। তাহা কেবল পদচিহ্নের মত শিল্পীর অন্তরলোকের পদচারণের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেয়।

যামিনী বাবুর এই দর্শন যদি আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে অসিদ্ধ মানবের রচনাকে স্থায়ী মূল্য দেওয়া চলে না। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল রচনায় স্থায়িত্ব যোজনা করিতে পারেন। এই মতবাদ লইয়া তর্ক করা চলে না। কেন না ইহা যামিনী বাবুর ব্যক্তিগত অনুভবসিদ্ধ মত। তবে আমরা কেবল একটি কথা বলিতে চাই যে, পর্বতবেষ্টিত তীর্থপথে পথিকের নিকট যেমন দূরের পর্বতশৃঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে নূতন রূপে দেখা দেয়, অথবা সেই সকল রূপের কোনটিই যেমন শৃঙ্গের পূর্ণ প্রকাশ নয়—এখানেও তেমনই শিল্পী যখন অন্তরের দ্বন্দ্বের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সত্যের এক একটি কণা লাভ করেন এবং যাহা তাঁহার রস-রচনার ভিতরে ব্যক্তিগত সংস্কারের জালে জড়িত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাও তীর্থপথের পথিকের দেখা পর্বতশৃঙ্গের মত আংশিক সত্য বহন করিয়া আনে। পূর্ণ সত্যের সম্পূর্ণ বর্ণনা তাহার মধ্যে না থাকিলেও, সার্বভৌমত্ব বা সার্বকালীনতা গুণ তাহাতে না থাকিলেও, তাহা সত্য, কেন না তাহা সত্যেরই আংশিক প্রকাশ। অতএব সত্যনিষ্ঠ শিল্পীর যে কোন অবস্থার ছবি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়া উঠে।

আদর্শ বা পূর্ণ-সত্য যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা অবশেষে শুকদেবের মত হয়। কিন্তু যতক্ষণ মানুষ বাঁচিয়া আছে, যতদিন সে পূর্ণতা লাভ করে নাই, ততদিন অন্তরে দ্বন্দ্ব ও অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়াই সে পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হয়; অল্প প্রেম হইতে সার্বভৌম ও সকল অবস্থার প্রতি প্রেমের অভিমুখে সে অগ্রসর হইতে থাকে। এই চলার পথে অন্তরের সত্যের দাবীর বশে সে যাহা আঁকিয়া যায়, যাহা রচনা করে, তাহা সকল অসম্পূর্ণ মানবচরিত্রের মতই আমাদের প্রেম ও সহানুভূতির যোগ্য, কেন না সে শিল্পও মানুষের জীবনেরই প্রকাশ। সেই রচনার মধ্যে সত্যের বর্ত্তমান কণিকামাত্র থাকিলেই তাহা মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়। যদি কেবল শুদ্ধ আনন্দ ও শুদ্ধ শিল্পকেই আমরা রক্ষা করি তবে পথের অধিকাংশ সঙ্গীকে আমাদের ছাড়িয়া আসিতে হয়। জীবনের পথ জন-বিরল ও প্রায় নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে। সেই ভয়ে ভালমন্দে মেশান মানুষকে এবং তাহার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ভালমন্দে মেশান অর্থাৎ অসম্পূর্ণ শিল্পকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। অবশ্য সেই রচনায় যদি সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকে এবং সত্যকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য অন্তরে উৎসাহ থাকে, তবেই তাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়, অহমিকার খাদ অধিক থাকিলে শ্রদ্ধা রাখা সম্ভব নয় মানি।

এই কারণে যামিনী বাবুর সহিত আমরা সাধারণ শিল্পীর প্রতি কঠিন [illegible]ত্যার প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হই। সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে তাহাকে আমরা সহানুভূতির চোখে দেখিতে প্রস্তুত আছি।

এইবার তৃতীয় প্রস্তাব। ইউরোপীয় আর্ট এবং ভারতীয় আর্টকে চরম অবস্থায় তুলনা করিয়া যামিনী বাবু বলিয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয় আর্ট ইন্দ্রিয়-প্রতিষ্ঠিত আর্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে আমাদের বাধে। কেন বাধে তাহা বলিতেছি।

যামিনী বাবু অভিভাষণের পর আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় আর্ট সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই, কেন না চতুর্দিকের আবহাওয়া তাঁহাকে বারংবার বাধা দিয়াছিল। সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীগণ ইন্দ্রিয়ানুভূত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অবশেষে যখন ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় মানসলোকে পৌঁছিতেন, তখনকার আনন্দ যামিনী বাবু পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অবশ্য স্বপক্ষ সমর্থনে বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পীগণ অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করার ফলে তাঁহাদের রং, রেখা বা পদ্ধতির মধ্যে যতদূর পরিবর্তন সাধিত হয়, ইউরোপের শিল্পীগণের রচনায় অতীন্দ্রিয়ত্ব কখনও ততখানি প্রকাশিত হয় না। অতএব ইউরোপীয় শিল্পীর মানসলোকে বিচরণ বা তৎ-সম্পর্কিত জ্ঞান ভারতের তুলনায়, প্রৌঢ়ের জ্ঞানগর্ভ বাণীর তুলনায় শৈশবের কাকলির মত শব্দ। ইহার উত্তর আমরা হয়ত ঠিক দিতে পারিব না। কিন্তু আমরা মনে করি যে, ইউরোপের শিল্পিগণও স্বীয় সংস্কারের বাধা অতি-ক্রম করিয়া যে আনন্দলোকে পৌঁছিতেন, তাহা ভারতীয় শিল্পীর ধ্যানলব্ধ রাজ্য হইতে বিশেষ নিম্নে নহে।

নিম্নে নহে, একথা বলাও বোধ হয় ভুল। কেন না দুই রাস্তা দিয়াই অবশেষে যেখানে পৌঁছান যায়, সেখানে উঁচু-নীচু নাই, দুই আনন্দের মধ্যে তুলনা করা চলে না। রজনীগন্ধা এবং গোলাপ ফুলের ধর্ম স্বতন্ত্র। কে বড় কে ছোট বলা যায় না। দুই বৃক্ষে দুই পরম সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। ইউরোপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাজসিক ধারা যেখানে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাহার সঙ্গে ভারতের শেষ আনন্দের ইতর-বিশেষ করা যায় না।

আর কে তুলনা করিবে? যখন এক ব্যক্তি এক আনন্দে মগ্ন, তখন পূর্ব্বে সে ইউরোপের পথে শেষ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া যে-আনন্দ লাভ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিও ত' তাহার নিকট ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। সে তুলনা করিবে কেমন করিয়া? যে আনন্দে বিভোর সে চিত্রগুপ্তের মত আনন্দের জমাখরচ লেখে না। তাহার পক্ষে বিচার সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন ইন্দ্রিয়-লোক হইতে অগ্রসর হইয়া অবশেষে অতীন্দ্রিয় লোকে পৌঁছান, তখন তাঁহার যে আনন্দ, সাধু পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদের মধ্যে তুলনা কেমন করিয়া করা যাইবে?

উভয় পথে লব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞানের তুলনা করিয়া কেহ কেহ বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কি আনন্দের পরিমাপ হয়?

আর সে বিচারে শেষ পর্য্যন্ত লাভই বা কি? নুনের পুতুল আনন্দের সমুদ্র মাপিয়া কি করিবে?

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

যামিনী বাবুর উত্তর

শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বাবু আমার বক্তৃতার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি আমার বক্তব্যের সারাংশ যেমন বিবৃত করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। ইউরোপ ও ভারতীয় আর্টের সম্বন্ধে তিনি যে তুলনা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে আমি জানি। বস্তুত আর্টের যে-কোন পথ দিয়াই যাই, অবশেষে এমন প্রদেশে পৌঁছান যায়, যেখানে আর ভেদাভেদ থাকে না, শুধু রসের অনুভূতির কথা থাকে। কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছিলে শিল্পীর লেখনীও বন্ধ হইয়া যায়, কেন না তখন আর তাঁহার কোনও বস্তু, বা চিত্র বা অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ সে অবস্থা না আসে, ততক্ষণ রসের সহিত অঙ্কন-পদ্ধতি বা টেক্‌নীকের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। তখন বিচার করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের অঙ্কন-পদ্ধতির তুলনা করিতে হয়। সেরূপ তুলনা করিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইয়াছে, ইউরোপ অপেক্ষা ভারতের স্থান বহু উচ্চে। ইহার একটি মানদণ্ড আমি মানিয়া থাকি।

যাহা প্রাণপদ, যাহা স্বাস্থ্যপূর্ণ, যাহা মানুষের জীবনকে কল্যাণে মণ্ডিত করে, তাহা শ্রেষ্ঠ। যাহা রাজসিক গুণের দ্বারা স্বীয় বৈভবের সাহায্যে আমাদিগকে সম্মোহিত করে, তাহা সাত্ত্বিক বস্তু হইতে সর্বদাই নিকৃষ্ট। তাহা আমাদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত করে, জ্ঞানের পূর্ণতা এবং শান্তি আনিয়া দেয় না। এই বিচারের সাহায্যে আমার মনে হইয়াছে, ভারতীয় আর্ট ইউরোপীয় আর্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে মানুষ আর্টকে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত না করিয়া অতি সহজ, সরল ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিয়াছিল। তাহার মধ্যে অবশ্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত এবং ঐশ্বর্য্যহীন রীতি ছিল, জ্ঞানবানের রচনা ছিল, স্বল্পজ্ঞানীর জন্যও রচনা ছিল। কিন্তু সমস্ত ভারতীয় আর্ট সত্য ধর্মাবলম্বী ছিল এবং একনিষ্ঠ ছিল বলিয়া তাহা সকলের অন্তরে সৌন্দর্য্যের প্রেরণা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ও সমগ্র জাতিকে প্রাণ ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ করিয়াছিল। ইউরোপের আর্ট সে পথ গ্রহণ করে নাই। সেই জন্য একটিকে আমি অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। এ বিষয়ে মতের প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

কিন্তু নির্ম্মল বাবুর সহিত আমি ইহা স্বীকার করি যে, উভয় পথে অবশেষে যেখানে পৌঁছান যায়, সেখানে ভেদাভেদ নাই। মধ্যপথেই কেবল দোষ-গুণের বিচার চলে। বস্তুতঃ সেখানেই চিত্রের অঙ্কন সম্ভব হয়, পথের শেষে চিত্র আর থাকে না। সম্পূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে আর ইউরোপ এবং ভারতের পথে কোনও ভেদ থাকে না। বাস্তববাদের ও আদর্শবাদের মধ্যে তর্কের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীযামিনী রায়

দেশের মেয়ে

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[১

মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "দু'বছর ধরে ছেলে চাকরী করছে—যেমন তেমন চাকরী নয়, দারোগাগিরি—লোকে জজিয়তি ছেড়ে যা কামনা করে—পাড়াগাঁয়ে থাকা, তাও আবার এদেশের পাড়া গাঁ ;—ছেলের তোমার কিন্তু শরীর ফিরছে কৈ বউদি ?"

কথাটা সত্য নয় ; বসন্তের শরীর বেশ ফিরিয়াছে। স্বাস্থ্যহীনদের শরীর ফিরাইবার জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট দারোগা-গিরির প্রবর্ত্তন করিয়াছে এমন নয়,—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আছে, অনিয়ম, সুনিদ্রার ব্যাঘাত,—তবুও বেহারের পাড়া-গাঁয়ের দুধ, ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবারের জোরে এবং অগাধ একাধিপত্যের আনন্দে বসন্তের শরীর বেশ ভাল ভাবেই স্থূলত্ব লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালীর শরীরের যা চরম উৎকর্ষ। মিত্র-গৃহিণীরও যে সম্প্রতি দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়াছে এমন নয়। প্রকৃত কথাটা এই যে, তিনি আজ বসন্তের সেজ ভাইয়ের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের কথাটা পাড়িতে আসিয়াছেন। মনে মনে একটা যুৎসই গৌর-চন্দ্রিকার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীরটি লইয়া বসন্ত বাহির হইতে আসিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিল।

বসন্তর মা বিমর্ষভাবে বলিলেন, "সে-কথা কে বলবে বল ঠাকুরঝি ? বললেই একরাশ জামা বের করে বলবে—এইটে ছোট হয়ে গেছে, এইটে সেলাই খুলে পড়ছে, সাত সের ওজন বেড়েছে।...দাঁড়িপাল্লা ধরে মানুষ ওজন করা ! আমি-হার মেনে বলা ছেড়ে দেয়েছি বাপু...কই গো বউ মা, তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে পান-জর্দ্দা দিয়ে যাও।"

"আনছে, ব্যস্ত কিসের ?...হ্যাঁ, আজকাল ঐ এক ওজন ওজন বাই হয়েছে। সেদিন নন্তে এসে বললে—'মা, কাকার তিন টাকার মাংস বেড়েছে...'সে কি রে !' 'হ্যাঁ গো, ছ-আটে আট চল্লিশ, তিন ষোলং আট চল্লিশ'...বুঝতে কি পারি ? শেষে টের পেলাম খুড়া হাঁতপাতালের কলে ওজন হয়েছেন, গুণধর ভাইপো ছ-আনা দরে তার হিসেব করে লাভ দেখাচ্ছেন—বাজারে পাঁঠার যা দর আর কি !..."

একটা হাসির হুল্লোড় উঠিল। সেটা থামিলে দম লইয়া মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "জ্বালার কথা আর ব'ল না।...বসন্তর আমাদের কিন্তু তদারকের দরকার হয়ে পড়েছে বৌদি, বেটা ছেলে যদি নিজের শরীরের হেফাজৎ করতে পারত তো আর ভাবনা ছিল না। বৌমাকে সঙ্গে দিচ্ছ না কেন ?"

"এই প্রথম ঘর করতে আসা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, একটা সংসার ঘাড়ে করতে কি পারবে এর মধ্যে ?"

"ওমা, পারবে না !...আর সংসার করা তো তোমার আশীর্বাদে ঝি চাকর, ঠাকুরদের ওপর নজর রাখা ; কিসের অভাব গা বসন্তর আমার ? আর অন্য দিকেও তো দেখতে হবে বাপু।...বৌদি আমার সেই নিজের প্রথম ঘর করতে আসার কথা ধরে বসে আছেন—এগার বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এলেন, নাকে নোলকটি দুলদুল্ করছে—লক্ষ্মী প্রতিমার মতন ; এখনও চক্ষের ওপর যেন ছবিটি লেগে রয়েছে আমার..."

বসন্তর মা একটু লজ্জিত ভাবে মিত্র-গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর উনি তখন পাকা গিন্নী !... একাল সেকালের তফাৎ বুঝি ঠাকুরঝি, মনে করেছিলাম মাস দু'তিনের জন্যে না হয় দিই সঙ্গে করে ; আবার ভাবছি..."

বধূ পানজর্দ্দা আনিয়া মিত্র-গৃহিণীর হাতে দিয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। চিবুকস্পর্শে চুম্বন করিয়া পাশে বসাইয়া মিত্র-গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "হাঁগো, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে কষ্ট হবে না কি নবাবের ঝির ? আমি তো বাছা তখন থেকে তোমার শাশুড়ীর কাছে তোমার বাপের যশ গাইছি—ও তেমন লাঙল-ঠেলা চাষার মেয়ে নয়, খুব পারবে...না গো বৌদি, কোন ভয় নেই, ছেলেমানুষ হলে কি হয়, কাজে কর্ম্মে, বুদ্ধিতে মা আমার ঠিক আমার পুঁটুর মতন,

চৌকস মেয়ে; ভাবও তেমনি ছুটিতে, যেন ঠিক মায়ের পেটের বোন। সেদিন পুঁটু এসেছিল, ঠায় চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম কি না—দু'টিতে এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছিল, এমন মানাচ্ছিল। . এ তো তোমার এখানকার জর্দ্দা নয় বৌদি!"

জর্দ্দাটা এখানকারই; মিত্র-গৃহিণীর রসনার পরিচিতও। বসন্তর মা বলিলেন, "লক্ষ্ণৌয়ের; তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে একটু এনে দাও না বৌমা।"

"তা দাও, একটু মুখ বদ্‌লান হবে মাঝে মাঝে।···তুমি ঐ কর বৌদি; না বাপু, ছেলেটার দিকে যেন চাইতে পারা যায় না; আর সত্যিই তো গা!···"

"বলব ওঁকে আজ; সত্যি ক'দিন থেকে দোমনা হয়ে রয়েচি ছেলেটার শরীর দেখে···"

"শোন কথা বৌদির! উনি দাদার রায় নেবেন! কার রায়ে যে এতবড় সংসারটা চলছে সে-কথা যেন আমার কাছেও লুকোন আছে!"

বধূর পিঠে একটা সস্নেহ স্পর্শ দিয়া বলিলেন—"এই সোনার প্রতিমেই পছন্দ করে কে ঘরে এনেছিল গা?"

[২]

এই অধ্যায়টি বসন্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর একটু পরিচয় দিয়া আরম্ভ করা ভাল। সে নূতন ঘর করিতে আসিয়াছে এবং জন্ম-তারিখের হিসাবে বোধ হয় অপ্রাপ্তবয়স্কাও বলা চলে, তাই বলিয়া তাহাকে কাঁচা মেয়ে মনে করিলে বেজায় ভুল করা হইবে। তাহার বিবাহ হইয়াছে খোট্টার দেশের এক দারোগার সহিত,—তাহার মা, খুড়ী, পিসী এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন এবং সাধ্যমত তাহাকে এরূপ রুক্ষদেশ এবং উগ্র স্বামীর জন্য তালিম দিয়া পাঠাইয়াছেন। মেয়েটি বাহ্যত বেশ ধীর, নম্র এবং হাস্যময়ী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় গম্ভীর, সন্দিগ্ধ ও সতর্ক, এবং এই গাম্ভীর্য্য, সন্দিগ্ধতা ও সতর্কতা বিশেষ করিয়া দুইটি বিষয়ে পরিস্ফুট, প্রথমতঃ এ দেশের লোকের সম্বন্ধে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর সম্বন্ধে। অনেক মাষ্টার আছে যাহারা টেবিলে, বেঞ্চে, এমন কি দু'একটা নিরীহ পৃষ্ঠেও বেত আছড়াইয়া তবে সে দিনের কার্য্য আরম্ভ করে, তাহাতে না কি ফল ভাল হয়। বসন্তের নবীন দাম্পত্য জীবনের সব খুটিনাটির হিসাব রাখা সহজ নয়; মোটামুটি এই কথা বলা চলে, হিরণ স্বামী সম্বন্ধে মূলতঃ মাষ্টারের নীতি অবলম্বন করিয়াই সংসার-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বসন্ত-দারোগার অমন কুলোপানা চক্র এবং ফোঁস-ফোঁসানি এক জায়গায় আসিয়া যে কিরূপ নিষ্ক্রিয় তাহা পরে দেখা যাইবে। আগে বসন্ত ছিল অখণ্ড,—দারোগা বাবু বলিলেই তাহার পরিচয় পূর্ণ হইয়া যাইত; এখন তাহার দুইটা সত্তা আছে,—দারোগা-বসন্ত এবং স্বামী-বসন্ত। দারোগা এবং স্বামী এই পদবী দুইটি বাঙালীর অভিধানে তুল্যার্থক হইলেও এ ক্ষেত্রে কোন মিল নাই,—দারোগা-বসন্ত যে-পরিমাণে উগ্র, স্বামী-বসন্তটি ঠিক সেই পরিমাণে নিরীহ হইয়া আসিতেছে।

যা হ'ক মিত্র-গৃহিণীর পরামর্শে বসন্ত হিরণ্ময়ীর অভিভাবকত্বে যখন কর্ম্মস্থানে আসিয়া হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে ষোল মাইল পথ, সওয়ারি বলদের পাল্কিগাড়ী, স্থানীয় ভাষায় শাম্পেনি বলে।

বসন্ত যতক্ষণ একবার থানাটা তদারক করিয়া আসিতে গেল, ততক্ষণ হিরণ একবার সমস্ত বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দক্ষিণ ও পশ্চিমে দু'সারি ঘর, মাঝখানে পাঁচিল দিয়া ঘেরা উঠান। উঠানের এককোণে একটি পাতকুয়া, পাতকুয়ার পাশেই একটা জেয়ল গাছে আড়াআড়ি ভাবে একটি ধনুকাকার বাঁশ বাঁধা। তার একদিকে, ছিপের আগায় বড়শির মত একটা বড় অর্দ্ধ-ডিম্বাকার বালতি ঝুলিতেছে, অন্য দিকে ভারসাম্যের জন্য একটা ঢেঁকির আধখানা বাঁধা। সব মিলিয়া যেন একটা চড়কগাছের মত দেখিতে হইয়াছে।

নিশ্চয় বেশ ভাল করিয়া বাঁধাছাঁদা আছে, তবুও কেমন মনে হয় বাঁশ-বালতি-ঢেঁকি তিনটিই যেন ঘাড়ে পড়িবার চক্রান্ত করিয়া মাথার উপর আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে। এ-জাতীয় জিনিষ হিরণ এর পূর্ব্বে দেখে নাই—বাংলা দেশে-তো নয়ই, শশুরবাড়ী আসিয়াও নয়। মনে মনে মা-কালীকে স্মরণ করিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। মনটা যেন একটু খিঁচড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের দিকে গেল। রসুইয়া ঠাকুর মনিব আসিতেই একবার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া,—নিজের এলা-

কার মধ্যে আসিয়া চা আর হালুয়ার বন্দোবস্ত করিতেছিল। নবাগতা কর্ত্রীকে তাহার ঘরের দুয়ারে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল এবং তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। লোকটা দুর্ব্বল প্রকৃতির, বোধ হয় দারোগার আওতায় এইরকম হইয়া পড়িয়াছে। এই দৌর্ব্বল্যের জন্যই প্রতি কথাই একটু হাসিয়া বলিতে অভ্যস্ত—খোসামুদি-গোছের একটু মলিন হাসি। হিরণকে ঠায় গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া ঘরটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি টানিয়া বলিল, "চা আর জল-খৈ রান্না করছি।"

কালো সিকলিকে গোছের চেহারা। পরণে মাসখানেকের ধূলাময়লার উপর হলুদ-লঙ্কার ছোপ-ধরা একটা কাপড়। কাঁধে তদনুরূপ একখানি গামছা। শুচিতার পাওনা মিটানর মত করিয়া পায়ের পাতা-দুইটি ধোওয়া, তাহার পর হাঁটু-পর্য্যন্ত ধূলায় সাদা হইয়া গিয়াছে।

প্রণাম করিতে হিরণ নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, সেটা কুশলসূচক হইবে না বুঝিতে পারিয়া লোকটা পূর্ব্বাহ্নেই নিজের পরিচয়ে যতটা সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিল, "দো বরস্ রংপুরে থাক্‌ছিলাম, সুকতুনি রাঁধতে জানি।"

নাসিকা আরও কুঞ্চিত করিয়া হিরণ বলিল, "তবে আর কি, মাথা কিনেছিস। এত নোংরা, তোর হাতে বাবু খায়?"

লোকটা একটু অপ্রতিভ হইয়া একবার নিজের চেহারার পানে চাহিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, "বরাহ্মণ আছি; দোষ লাগে না।"

হিরণ অল্প কথার লোক, কিছু বলিল না। তাহার নাসিকাটা কিন্তু কুঞ্চিত থাকায় বুঝা গেল, সে এতটা ব্রহ্মতেজ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ঝি আসিয়া খবর দিল, গা ধুইবার জল তৈয়ার।

হিরণ ঘুরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তুই দিয়েছিস না কি জল তুলে?"

প্রশ্নের দোষ দেওয়া যায় না। কালো কুচকুচে রং, আঁটো-সাটো, জাঁদরেল গোছের চেহারা; পরণে চৌদ্দ-হাতের একটা পালের মত মোটা কাপড়। সামনেই একটা সুস্পষ্ট কোঁচা, ময়লা যেন তাহার পরতে পরতে অন্ধকারের মত জমাট হইয়া আছে। কাপড়ের যেটুকু মাথায় সেটুকু তেলে-ময়লায় তারপলিন কাপড়ের মত হইয়া গিয়াছে।

ঝিয়েরা কখনও দুর্ব্বল প্রকৃতির হয় না, দারোগার ঝিয়েরা তো নয়ই। প্রশ্নটা বুঝিতে না পারায় মুখে কাপড় দিয়া অনেকটা বেয়াদবির সঙ্গেই হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুলহীন্ (কনেবৌ) বাংলা বোলইছতিন্!"

ঠাকুর বুঝিয়াছিল প্রশ্নটা, তাহার রংপুর প্রবাসের কল্যাণে: বলিল, "চাকর পানি ভরিয়ে দিয়েছে; তাকে বোলাইয়ে দিই?"

চেহারা দেখিলে স্নানের প্রবৃত্তি হইবে না, অথচ স্নান না করিলেও নয়, "না, থাক; কোথায় জল দেখিয়ে দে, চল"—বলিয়া হিরণ কাপড়-গামছা বাহির করিতে গেল।

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বসন্ত চা-হালুয়া লইয়া বসিয়া গিয়াছে। বধূকে প্রশ্ন করিল, "কেমন দেখলে সব?"

বধূ মুখটা অতিমাত্রায় গম্ভীর করিয়া উত্তর করিল, "চমৎকার! সাধে কি শরীর ও রকম হয়ে গেছে? খেতে প্রবৃত্তি হয় তোমার ঐ ভূতের হাতে? যেমনি ঝি, তেমনি চাকর! থাক কি করে?"

"বেশ কাজ করে সব কিন্তু; নিজের সাজগোজের দিকে লক্ষ্য নেই, অসুখ-বিসুখ নেই, কামাই নেই, আমার বেশ একটানা চলে যায়। আর বামনটা নোংরা আর দেখতে কাঁকলাসের মতন হলেও রাঁধে ভাল, এ তল্লাটে বাংলা রান্না জানা লোক আর নেই-ও। তাই নিয়েই আমার দরকার; ওর রান্নাই খাব, ওকে তো আর খাব না।"

শেষের এই রসিকতাটুকুর উদ্দেশ্য হিরণের গাম্ভীর্য্যে একটু আঘাত দেওয়া। অকৃতকার্য্য হইয়া বসন্ত আর কথা না বাড়াইয়া জলখাবারে মনঃসংযোগ করিল। শেষ হইলে বলিল, "তোমাকেও এনে দিক?"

ঘিয়ে জবজবে সোনার রংএর হালুয়া, প্রচুর গাঢ় দুধ দেওয়া ঈষৎ গৈরিক রংএর চা, দীর্ঘ আট ক্রোশের যাত্রায় পরিশ্রান্ত মনকে টানে; কিন্তু তাহাদের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়া হিরণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "মা গো!—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে! আগে ওর একটা ব্যবস্থা করি তারপর ওর হাতে খাব—যদি প্রবৃত্তি থাকে। ওকে ডেকে বলে দাও

আজও থাক্, কাল যেন নেয়ে-টেয়ে পরিষ্কার হয়ে তবে বাড়িতে ঢোকে। রাত্তিরটা আমি চালিয়ে নোব'খন। ঝিটাকে ডেকে দাও, একটা ফরসা কাপড় দিই।"

বসন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি চালিয়ে নেবে মানে? এই আটক্রোশ পথ শাম্পেনিতে এসে রান্না করবে না কি? শরীর তো?—না, কি?"

হিরণ স্বামীর চোখের উপর স্থিরদৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "আমি নিজের শরীর দেখবার জন্য এখানে আসি নি। আমার শরীরের ওপর যদি মশাইয়ের এত দরদ থাকত' তো ঐ ভূত প্রেতদের হাতে যা'তা খেয়ে নিজের দেহ কালী করতে না।·· আট ক্রোশ পথ ঐ বিদঘুটে গাড়ীতে গতর চুর করে সত্যি কারোর মেজাজ ভাল থাকে না; সেটি মনে রেখে যা ভাল বুঝছি করতে দাও।···এই দাই!...চাকরটার নাম কি?"

বেশ বোঝা গেল হিরণ আসিয়া গৃহস্থালীর রাশ কড়া হাতে বাগাইয়া ধরিয়াছে। স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী প্রভৃতি এই শকট-সংলগ্ন কোন অশ্বই খাতির পাইবে না তাহার কাছে। বসন্ত খানিকটা এদিক ওদিক করিল, তাহার পর বধূর উপরকার রাগটা চাকর-দাসীদের উপর ঝাড়িয়া অফিসে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িল এবং সেখানেও কণ্ঠস্বরকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া একটা তুমুল রকমের হৈ-চৈ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। হিরণ বুঝুক সে নেহাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের-যোগ্য নয়;—একটা গোটা থানার পুলিস-কোতোয়াল তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

তাহার পর প্রায় রাত্রি বারটার সময় হিরণের হাতের আলুনি তরকারি, পোড়া লুচি এবং ধরা দুধ অজস্র প্রশংসার সহিত আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

[৩]

পরের দিন সকালেই বসন্তকে একটা তদারকে বাহিরে যাইতে হইল। হিরণ বাড়ি-ঘর-দুয়ার তিনটা লোকের সাহায্যে ধুইয়া মুছিয়া ঝকঝকে তকতকে করিয়া লইল। চাকরটা স্নান করিয়া বাবুর একটা ধোপদুরস্ত কাপড় পরিল এবং ভৃত্যোচিত নোংরা কাজ যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঝি মাইজীর ফুলকাটা চওড়াপেড়ে শাড়ী পাইয়াছে, নিজেকে এবংবিধ দুর্লভ সম্পদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য প্রায় পো-খানেক দূরে নদীতে গিয়া চুলে এঁটেল মাটি ঘসিতে লাগিল। কাজের অসুবিধা হওয়ায় অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া তাহাকে থানার লোকে ধরিয়া আনিল।

ঠাকুরটা সত্যই রাঁধে ভাল, কিন্তু একজোড়া নূতন কাপড় এবং একটা নূতন গামছা পাইয়া কোন কারণে অত্যন্ত অন্য-মনস্ক হইয়া, সব রান্না, এমন কি তাহার সবচেয়ে বড় শিল্প সুকতুনি পর্য্যন্ত বরবাদ করিয়া রন্ধনপর্ব্ব শেষ করিল। এদিক-কার দেখাশুনা সারিয়া হিরণ যখন স্নান করিতে যাইবে, দেখিল সাবানের বাক্সয় সাবান নাই। আজ সকালেই নূতন সাবান বাহির করিয়া দিয়াছে, বসন্ত একবার মাত্র ব্যবহার করিয়া বাহিরে গিয়াছে। ঝিয়ের কাছে পাওয়া গেল না, চাকরের কাছেও নয়। তখন ঠাকুরের খোঁজ পড়িল। থানার হাতায় তাহাকে পাওয়া গেল না। বাড়ীতে লোক ছুটিল, সেখানেও নাই। রিপোর্ট পাওয়া গেল, তাহাকে নদীর ঘাটে দু'একজন দেখিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, জলের ধারে কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ সাবানের গাঢ় ফেনায় আবৃত করিয়া ঠাকুর অসীম পরিশ্রম এবং অধ্য-বসায় সহকারে গাত্রচর্ম্ম সংস্করণে ব্যস্ত, পাশে বালির উপর, হলদে রংএ ছোবান দুইখানা নূতন কাপড় শুকাইতেছে।

হিরণ কোন অনিবার্য্য কারণে দিনমানে আর আসিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া বধূর নিকট গৃহস্থালির সুবন্দোবস্তের কথা শুনিয়া এবং কিছু কিছু প্রমাণও চাক্ষুষ করিয়া শঙ্কিত ভাবে বলিল, "সর্ব্বনাশ করেছ যে! সে ব্যাটাকে নতুন কাপড় দিতে গেলে কেন?"

হিরণ অনেকটা অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন বল ত'?"

বসন্ত উত্তর না দিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকেই প্রতি-প্রশ্ন করিল—"কাপড় দুটো ছুবিয়ে ছিল কিনা বলতে পার?"

হিরণ বিস্মিতভাবে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, হলদে রংএ।"

বসন্ত হতাশভাবে এলাইয়া পড়িয়া বলিল—"ব্যস, তাহলে যা ভয় করেছি তাই হয়ে বসে আছে নিশ্চয়। নতুন কাপড় পেলেই সে তাড়াতাড়ি ছুবিয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পালায়। কত কাণ্ড করে তাকে আটকে রাখি, দোকানে পর্য্যন্ত তাকে কাপড় বেচা মানা। এখন করা যায় কি? তাও কি

সেখানে লোক পাঠিয়েই তাকে পাওয়া যাবে? দুটো জেলার মধ্যে শ্বশুর বাড়ি সংক্রান্ত যে যেখানে আছে লুকিয়ে লুকিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করে বেড়াবে; ছ মাসের ধাক্কা; ওর চেয়ে দাগী চোরকে টেনে বের করা ঢের সহজ। আমি তিন তিনবার ঘা খেয়ে শেষে ঐ ছেঁড়ামহলা কাপড় পরিয়ে কোন রকমে এই বছরখানেক আটকে রেখেছিলাম। আর তুমি···"

হিরণ প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী তাহার ত্রুটিটুকু লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া এবং একবার আস্কারা পাইলে আরও বাড়াবাড়ি করিবে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "ঠাকুর গেলে কি একেবারে জলে পড়বে? আমি না হয় নেহাৎ অকর্ম্মণ্য, তোমার রান্নাঘর মাড়াবার যুগ্যিও নই; কিন্তু একমুঠো চালও ফুটিয়ে দিতে পারব না? তাতে দুটো আলুভাতে ফেলে দিতে পারব না? আমি পাড়াগেঁয়ে, জংলি; ভাল তরকারিটা আসটা না হয়..."

কথাবার্ত্তা উল্টা দিকে যায় দেখিয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি বলিল, "বাঃ, তাই কি বললাম?—ভাল রাঁধতে পার না? কাল রাত্রে ডালনা যা রেঁধেছিলে! একটু নুন কম হওয়া সত্ত্বেও সে কী সুন্দর হয়েছিল! যদি নুনটা ঠিক একটু মাপসই হত তো না জানি..."

হিরণকে একভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গেল।

হিরণ শান্তকণ্ঠে বলিল, "নুন কম হয়েছিল, কৈ কাল তো বলনি। ঐটেরই তো বেশি প্রশংসা করলে।"

বসন্ত আমতা আমতা করিয়া বলিল, "প্রশংসা না করে উপায় ছিল? অতিবড় শত্রুও প্রশংসা না করে···আর নুন কম মানে—নেহাৎ যেন একটু—মনের সন্দেহও হতে পারে···"

হিরণ সেইরূপই শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি অপরাধটা করেছি যে সন্দেহের ওপর রান্নার এই অপবাদটা হ'ল?"

বসন্ত আরও ঘাবড়াইয়া গেল। কি বলিলে সামলান যায় স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই দেখ! অপবাদ দেব কেন? আর অপরাধের কথা যে বলছ, অপরাধ তো আমারই, আমি যে একটু বেশি নুন খাই।"

"বলেছ আমায় সে-কথা এর আগে? নুন একটু বেশি দেওয়া কি খুব শক্ত—না, জিনিষটা বড় মাগ্যি?"

[৪]

ঠাকুর সত্য সত্যই নূতন কাপড়ের জয়পতাকা উড়াইয়া শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে। হিরণ নূতন পাচক আনিতে দিল না। রান্নাঘরের অসপত্ন চার্জ গ্রহণ করিয়া স্বামীর দেহচর্য্যায় পূর্ণ উৎসাহে লাগিয়া গেল।

বিশেষজ্ঞেরা যাহাই বলুন না কেন গবর্ণমেণ্ট নুন জিনিষটাকে এখন প্রয়োজন মত মহার্ঘ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন বিশেষ আইন করিয়া যদি একেবারেই জিনিষটাকে দেশছাড়া করিয়া লওয়া হয়—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, তো বসন্ত খুব কৃতজ্ঞ হয়। একবার নুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করিয়া সে আর কথাটা ফিরাইতে পারিল না এবং উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে নুন খাইয়া বধূর রান্নার অপ্রশংসা করিয়া নিমকহারামিও করিতে পারিল না। যাহ'ক পাড়াগাঁয়ের প্রচুর টাটকা মাছ আর খাঁটি ঘি দুধের জোরে দারোগাগিরির হাড়ভাঙা খাটুনি ও হিরণের প্রাণান্তকর পরিচর্য্যার মধ্যেও শরীরটা কোন রকমে খাড়া করিয়া রাখিল। কিন্তু রহস্যপ্রিয় বিধাতার বোধ হয় সেটুকুও সহ্য হইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিরণের মনটা সাধারণ ভাবে এ দেশের লোকের উপর সন্দিগ্ধ—তাহার বাপের বাড়ির লোকের তরফ হইতে ট্রেনিং-ই ঐ ধরণের। বসন্তর শরীর যে ভাঙিয়াছে এটা অবশ্য হিন্দু স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইল না। তখন সে একটু চিন্তিত হইল।—রান্নার তো কোন রকমই ত্রুটি নাই; স্বামী রোজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিতেছে, অথচ এ রকমটা হইতেছে কেন? হিরণ একদিন সমস্ত রাত গভীরভাবে ব্যাপারটা অনুধাবন করিল, তাহার পর তাহার মনে হইল যেন রহস্যটা ধরা পড়িয়াছে।

পরের দিন মাছওয়ালী মাছ দিতে আসিলে হিরণ নিজেই গিয়া সামনে দাঁড়াইল; মাছের কানকো, আঁশ সব উল্টাইয়া দেখিয়া পরম বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইয়া বলিল, "হুঁ, বুঝেছি,

তুই হারামজাদী রোজ বাসী মাছ দিয়ে যাস ; তাই বাবু মুখে দিতে পারেন না রোস্!"

মেছুনী যেন আকাশ হইতে পড়িল, তাহার ভোরের ধরা মাছ, তাড়াতাড়ি দারোগাবাবুর বাড়ি জোগান দিতে আসিয়াছে। দুই হাত তুলিয়া, বুক চাপড়াইয়া, 'আঁখকে কিরা,' 'গঙ্গাজীর শপথ' খাইয়া সহস্র ভাবে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল। শেষে মাছের কানকোর মধ্যে হাতটা চালাইয়া দিয়া খানিকটা টাটকা রক্ত বাহির করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া বলিল—"এই দেখুন মাইজী, একেবারে টাটকা খুন, পচার কথা ছেড়ে দিন, একটু বাসী হলেও কি এ-জিনিস পাওয়া যেত ?"

হিরণ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল ; তাহার পর তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "দেখ, আমি খাস বাংলা দেশের মেয়ে, তোদের কারচুপিতে তোদের দারোগা বাবু ভুললেও আমি ভোলবার পাত্রী নই। তোদের জাতকে আমাদের দেশে ঢের দেখেছি ; কি করে গেরস্তর চোখে তোরা ধুলো দিস তা যদি আমার জানা না থাকত তো আর এখানে আসতাম না। বলি, ওটা তোর মাছের রক্ত, না ? এইটে আমার বিশ্বাস করতে হবে !"

মেছুনী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একটু সম্বিত হইলে বলিল—"মাছের রক্ত নয় তো কি মাইজী ?"

"মাছের রক্ত ?—বাসী পচা মাছ সব ফেলে দিয়ে, টাটকা মাছ বেচবি সেই রকম বোকা জাত কি না তোরা ! এখানকার বাজারে লাল খুন্‌খারাবী রং আসে না ? কিছু জানি না আমি, না ?"

মাগীটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হিরণ বলিল, "তুই বলদিকিন আমার পা ছুঁয়ে রং গুলে, আর হড়হড়ে করবার জন্যে একরত্তি ফেনের সঙ্গে মিশিয়ে কানকোর মধ্যে দিয়ে বাসী মাছ নিয়ে আসিস নি ? বল, যে-মাছটা সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বিকোয় না, সেটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাস্,—সেই লোকসানটা গা পেতে নিস্ ; বল না। আ মর ! ···মাছ না হলে দারোগা বাবুর চলে না, বেশি নুন, ঝাল, দিয়ে রেঁধে দিচ্ছি আজ, কিন্তু ফের যদি কখন কানকোর মধ্যে রং ঢেলে আমায় ভোলাতে আসিস তো তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন।"

মেছুনী আবার হাজার রকম ভাবে শপথ করিল, কিন্তু কেহ যদি লক্ষ্য করিবার লোক থাকিত তো স্পষ্টই বুঝিতে পারিত,—মাছ দিয়া যাইবার সময় সে একটু চিন্তিত ভাবে যাইতেছে, মাথার মধ্যে একটা নূতন ধারণা খেলিতেছে যেন।

দু'চারদিন ভাল, অর্থাৎ পূর্ব্বের মতই মাছ পহুঁছিল, তাহার পর বসন্ত একদিন খাইবার সময় হঠাৎ হাতটা একটু গুটাইয়া লইয়া বলিল—"হ্যাগা, মাছটা যেন একটু দোরসা বলে বোধ হচ্ছে যেন।"

হিরণ পাখা করিতেছিল, হাতটা থামাইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "ঠিক এই কথাই এবার শুনব তা জানতাম। যদ্দিন পচা দোরসা মাছ মাগী দিয়ে গেছে, তদ্দিন তো মুখে একটি কথা ছিল না, আমি যেই তার বজ্জাতি হাতেনাতে ধরে টাটকা মাছের বন্দোবস্ত করলাম, অমনি তুমি দোরসা মাছের গন্ধ পেলে। দেখ, আমারও নাক আছে, চোখ আছে, নিজে কিনে, নিজের সামনে কুটিয়ে নিজের হাতে রেঁধেছি, দোরসা হলে ধরা পড়তই, পাতেও দিতাম না ; শত্রু নয় তো। আর যদি এতই অপদার্থ মনে কর, এতই অবিশ্বাস, আনিয়ে নাও না বাপু তোমার ঠাকুরকে। মাকে লিখে দিই, নিয়ে যান আমায়। কেন মিছিমিছি একটা অপযশ

বসন্ত তাড়াতাড়ি সস্নেহে মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিল "না, আমার যেন একটু সন্দেহ হচ্ছিল—সামান্য একটু, তা সন্দেহের ওপর তো একটা অপবাদ দেওয়া যায় না। আর ঠাকুর।—তোমার হাতের রান্নার পর আর সে-ব্যাটার সেই পোড়া-ধরা রান্না কি খাওয়া যাবে ? তাকে তো সরিয়েই দেব ভাবছি এবার···"

রান্না কোন দিন আলুনি হয় না, মাছও শোধরাইয়াছে ; স্বামীর শরীরের কিন্তু কোন উন্নতি দেখা যায় না, বরং উত্তরোত্তর যেন খারাপই হইতেছে। দুশ্চিন্তায় আবার হিরণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দোষটা যে কাঁচা আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না এদিকে তো পান হইতে চুনটি খসিতে দেয় না সে।

গয়লানী আসিয়াছে, উঠানে বসিয়া ঝিয়ের সামনে দুধ মাপিয়া দিতেছে। কেঁড়ে হইতে গাইয়ের দুধের ঈষৎ হরিদ্রাভ টাটকা ধারা পিতলের মেচলিতে জমা হইতেছে।

হিরণের চোখটা একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া গিয়া বলিল, "দাঁড়া, ঠিক গাইয়ের দুধ দিচ্ছিস্ তো?"

গয়লানী কেঁড়েটা মাটিতে রাখিয়া বিনীত ভাবে বলিল, "দারোগা বাবুর গাই-দুধের কম রেটে দুধ নিচ্ছেন আর আমি মহিষের দুধ দিয়ে অধর্ম্ম করব মাইজী? বেটাপুত্র স্বামী নিয়ে ঘর করছি···"

হিরণ বিরক্ত ভাবে মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, "নে বাপু, আমায় আর তোদের জাতের ধর্ম্ম দেখাস নি,—কথায় বলে গয়লার ধর্ম্ম কেঁড়ের বাইরে। ফেলত, মাটিতে দু'ফোঁটা দুধ, দেখি।"

দু'টা আঙুল দুধে ডুবাইয়া গয়লানী মাটির একটু উপরে ধরিল। গাঢ়, স্নিগ্ধ গুটিকতক দুধের ফোঁটা উঠানের সানের উপর টলমল করিতে লাগিল।

হিরণ একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"কখনও গরুর দুধ নয় তো, তা ভিন্ন খাঁটিও নয়, টাটকাও নয়। এতদিনে ঠিক ধরেছি, চিরকাল গাই-দুধ খাওয়া অভ্যাস, তার জায়গায় মোষের মাটাতোলা তে-বাষ্টে দুধ খেয়েই দিন দিন দারোগা বাবুর শরীর পাত হয়ে যাচ্ছে।"

একে দুধটা খাটি নয় বলিয়া অপবাদটা যথার্থই গায়ে লাগে, তাহার উপর দারোগাবাবুর ভয়। গয়লানী বুক চাপড়াইয়া, কপাল টিপিয়া, স্বামী-পুত্র, গঙ্গামাই, শলেশবাবা, শীৎলামাই-এর শপথ খাইয়া নানা ভাবে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সব বৃথা। হিরণ এই সমস্তর মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিল, "দেখ, আমি দেশের মেয়ে; বাড়ির পাশে গয়লাপাড়া, আমার আর কিছু জানতে বাকী নেই। না হয় যা বলছি মিলিয়ে দেখ।"

হিরণ অভিজ্ঞতার গর্ব্বের সহিত হাতের তর্জনীটা তুলিয়া বলিল, "সেরে এক পো জল, গেরস্তর বাবার সাধ্যিও নেই—এক ল্যাক্টোমিটার ছাড়া···"

গয়লানী শিহরিয়া উঠিয়া চোখ দুইটা দুই হাতে চাপিয়া শপথ করিল, "হে মাইজী, আঁখ গল্ যায়···!"

"রাত্তিরে জ্বাল দিয়ে সরটা তুলে নিস। মোষের দুধ গরুর দুধের মত পাৎলা হল। তারপর একটু কাঁচা মাখন আবার মিশিয়ে আর একবার জ্বাল দিয়ে···"

"হে মাইজী, এসব কিছু জানিও না সাত জন্মে। দোহাই ধর্ম্মের। গোরুর বাঁটের টাটকা-দোহা দুধ—রং দেখুন—মোষের দুধ তো শাদা হবে?"

হিরণ অনেকটা ভ্যাংচাইয়া বলিল—"শাদা হবে! অত বোকা দারোগা বাবুর বউ, না? তোদের দেশে হলুদ নেই তো! হলুদ বেটে, পুরু কাপড়ে তার রস নিংড়ে তোমরা দাও না তো দুধে! মাইজী তো কিছু জানে না! চালাকি করতে আর জায়গা পাও নি? গাইয়ের দুধের ডবল দাম; উনি সেই দুধে ঘি না করে বাবুকে নিত্যি জোগান দিচ্ছেন! বড় সোহাগ কিনা···। বাবুকে এতদিন যা ঠকিয়েছিস, ঠকিয়েছিস; মনে রাখিস এবার শক্ত লোকের পাল্লা···"

আর দুই তিন দিন দুধটা ভালই অর্থাৎ পূর্ব্ববৎই আসিল। খুব সম্ভব গয়লাবাড়িতে হিরণের ফরমুলা লইয়া গবেষণা চলিল একটা দিন। তাহার পর একদিন দুধের বাটিতে একটু চুমুক দিয়াই ধীরে ধীরে বাটিটা নামাইয়া বসন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁগা, যেন হলুদ হলুদ গন্ধ বেরুচ্ছে দুধটাতে।"

হিরণ ইহার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল, কিছু না বলিয়া পাখা থামাইয়া ডাকিল, "দাই!"

ঝি আসিলে বলিল, "দারোগাবাবু দুধে হলুদের গন্ধ পাচ্ছেন।"

ঝি স্বভাবতই একটু সাহসিকা, তাহার উপর ক্রমাগতই পরিষ্কার থাকিবার নানারকম দ্রব্যসম্ভার পাইয়া একেবারেই কর্ত্রীর অন্তরঙ্গ এবং তাহার ফলে আরও বেশী রকম সাহসিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টপ করিয়া দুয়ারের আড়াল হইয়া হাসিতে লুটপুট হইয়া বলিল—"গে মাই! আইকাল আর কাঁহা হরদি ফেটেইছেই?"

"নে, থাম, তোকে আর হাসতে হবে না হারামজাদী, আমার এদিকে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে রোজ রোজ কচি ছেলের মত বায়নাক্কা দেখে দেখে"—ঝিয়ের ঔদ্ধত্যের জন্য এইটুকু মৌখিক ধমক দিয়া হিরণ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দেখ, দাইও বলছে আজকাল আর হলুদ মেশায় না, তার

মানে আগে মেশাত। ছোটলোক হলেও, মেয়ে মানুষ হলেও ওর তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে। যদ্দিন ছিল দুধে হলুদের গন্ধ, তদ্দিন পেলে না ; যেই একটু বুদ্ধি করে ধরে সেটা বন্ধ করলাম…বলছ না হয় দেব'খন আর একবার চুমড়ে, কিন্তু তোমার সেই চিরকেলে হাড়-জ্বালান সন্দেহ নয় তো ?"

নিজের মুখেই এতবার মনের সন্দেহের দোহাই দিয়াছে যে সেটাকে আর অস্বীকার করা যায় না। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসন্ত ধীরে ধীরে দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিল। তাহার পর আটকান নিঃশ্বাসটা খুব জোরে নামিয়া পড়ায়, ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে একটা তৃপ্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "নাঃ, তোমার কথাই ঠিক, মনের সন্দেহই ছিল দেখছি।"

মাছ গেল, দুধ গেল, দু'দিন পরে ঘি-ও নষ্ট হইল। ঘিয়ের গয়লানী 'মাইজী'র গালমন্দর ভিতর দিয়া টের পাইল সহরে ভেজিটেবল ঘি বলিয়া ঘিয়ের এক স্বজাতি দেখা দিয়াছে, ভেজাল দিলে দুনো লাভ বাঁধা। তাহার 'পুরুষ'কে দিয়া দশক্রোশ দূর হইতে একটিন সংগ্রহ করাইল এবং অল্পে অল্পে জোগান দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ককে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ওদিকে মেছুনীর কাঁসার চুড়ির মাঝে এক এক জোড়া করিয়া রূপার চুড়ি উঠিয়াছে, দুধের গয়লানীর গা হইতে কাঁসার বালাই একেবারেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে ; এখন বেসাতি করিবার সময় তাহারা বাংলা দেশের মেছুনী গয়লানীর মতই হাত মুখ খেলাইয়া, গয়না চমকাইয়া বেসাতি করে। সমস্ত গ্রামটা ভেজালে ভরিয়া গিয়াছে, আশপাশের গ্রামেও সুরু হইয়াছে। বসন্ত গৃহে নিরীহ হইলেও বাহিরে উগ্র, ওদিকে উগ্রতাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে বরং। জরিমানা করিল, বেটাছেলেদের ডাকিয়া মার ধোর করিল, শেষে ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখাইল। কিছু ফল হইল না। হিরণের শিষ্যারা মাইজীর কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িল।

হিরণ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁগা, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি ? যদ্দিন ঠকিয়ে এসেছে তদ্দিন তো মুখ বুজে সয়ে গেলে। এখন নিরীহ বেচারীদের উত্তম কুস্তম করছ কেন বল দিকিন ? একে তো যত আঁকুপাকু করছি ততই শরীর কালী হয়ে যাচ্ছে ওদিকে, তার ওপর নির্দ্দোষীদের শাপ মন্যি খেয়ে একটা কাণ্ড ঘটুক,—কথায় কথায় হাত উঁচু করে করে দক্ষিণমুখো হয়ে যেমন সব গঙ্গার দিব্যি, গণেশ ঠাকুরের দিব্যি খায় সব—আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। রোজ পুরুৎ জোৎশীজীর হাত দিয়ে পাঁচসিকে করে পূজো পাঠিয়ে কোন রকমে কাটিয়ে যাচ্ছি ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি যে আছে অদৃষ্টে…"

* * * *

বসন্ত বুদ্ধি করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে ছুটির দরখাস্ত দিয়া দিয়াছিল ; দুইমাস পরে বাড়ী আসিয়াছে।

মিত্র-গৃহিণী ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা অনেকটা আগাইয়া আনিয়াছেন ; এখন হিরণের সাহায্যটাও কাজে লাগাইতে হইবে, কেন না পয়মন্ত বলিয়া সে শ্বশুর শাশুড়ীর বড় প্রিয়পাত্রী।

সবাই বসিয়াছিলেন, এমন সময় বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া সদরের দিকে চলিয়া গেল। মিত্র-গৃহিণী হিরণের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"তা বলতে নেই,—এ-কটা দিনেই বসন্তর আমাদের শরীরটা যেন একটু · তা হবে না গা ? বৌদিদির নিজের পছন্দ করা মেয়ে…"

বসন্তর মা বসন্ত মোটা হইয়াছে এটা ধরিয়া লইয়াছেন। মায়ের নজর নাকি বড় খারাপ, সেই জন্য অকল্যাণের ভয়ে এখনও পুত্রকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। মিত্র-গৃহিণীর উভয়স্পর্শী প্রশংসায় সম্প্রীতির সহিত বলিলেন—"তা শেয়ানা আছে বাপু তোমাদের বৌ।…কৈ গো কাশী থেকে যে জর্দ্দাটা এসেছে, তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে একটু দাও না বৌমা…"

চতুষ্পাঠী

দুর্গম পথের যাত্রী

ঃ রোয়াল্‌ড্‌ আমুন্‌ড্‌সেন

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আমুন্‌ড্‌সেন যখন আমেরিকা থেকে নরওয়েতে ফিরে এলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁকে সাদরে বরণ করে নিলেন। জয়ী পুরুষের তালিকায় তখন তাঁর নাম লেখা হয়ে গিয়েছে।

আমুন্‌ড্‌সেন স্থির করলেন, এবার তিনি উত্তর-মেরু আবিষ্কার করতে বেরুবেন। সমস্ত প্ল্যান ঠিক করে তিনি নরওয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

যে জাহাজে (Fram) ন্যানসেন উত্তর-মেরু অভিযানে গিয়েছিলেন, নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট আমুন্‌ডে্‌সেনকে সেই জাহাজ ব্যবহার করতে দিলেন। অভিযানের উপযুক্ত টাকা-কড়িও সংগৃহীত হ'ল। সবই ঠিক-ঠাক।

এমন সময় হঠাৎ খবর এল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমাণ্ডার প্যেরী উত্তর-মেরুতে গিয়ে পৌছেছেন (১৯০৯, ৬ই এপ্রিল)। সঙ্গে তাঁর একজন কালো নিগ্রো, নাম ম্যালু হেন্‌সন। একজন শাদা আর একজন কালো, সেই দুটি লোক সর্ব্বপ্রথম উত্তর-মেরুতে একই সময় পদার্পণ করল! কিন্তু ম্যালু্‌ হেন্‌সনের নাম আমরা কজনেই বা জানি!

আমুন্‌ড্‌সেনের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। তার চেয়ে সহ্য করা কঠিন হ'ল, তাঁর আশৈশবের আশা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া—উত্তর-মেরুতে প্রথম পড়বে তাঁরই পায়ের রেখা, প্রথম উড়বে তাঁরই হাতে-পোঁতা পতাকা।

কিন্তু আশা গেলেও, ভাইকিং নিরাশ হয় না। উত্তর-মেরু-জয়ের গৌরব চলে গিয়েছে। কিন্তু আর এক প্রান্তে এখনও তো রয়েছে, তেমনি মানব-পদরেখাহীন হয়ে পড়ে দক্ষিণ-মেরু! কাউকে কিছু না জানিয়ে, তিনি মনে মনে স্থির করলেন, যেমন করেই হ'ক দক্ষিণ-মেরুতে পৌছতে হবে!

পরের বছর "ফ্রাম্‌" জাহাজে তিনি দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। তখন কেউ-ই ভাবে নি যে, আমুন্‌ড্‌সেন দক্ষিণ-মেরুতে পৌছুবার অভিযানে বেরিয়েছেন—সকলে জানল যে, তিনি বেরিং ষ্ট্রেট অঞ্চলে যাত্রা করেছেন।

এখানে অন্য পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ-মেরু-পথযাত্রীদের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

দক্ষিণ-মেরু একেবারে বরফে ঢাকা। চোদ্দ হাজার মাইল তীর-ভূমির মধ্যে মাত্র চার হাজার মাইল বরফ-শূন্য। সেই তুষারের রাজ্যে মাঝে মাঝে পরিপূর্ণ-তুষারে ঢাকা পাহাড় উঠেছে—পাহড় নয়, আগ্নেয়গিরি। চির-তুষারে ঢাকা আগ্নেয়গিরি!

কিসের লোভে মানুষ এই 'ব্লিজার্ডে'র দেশের খোঁজে বেরিয়েছিল? আজও পর্যান্ত এই তুষার-রাজ্যের চারভাগের মাত্র একভাগে মানুষের পায়ের দাগ পড়েছে, আর তিনভাগ তেমনি অজানা পড়ে আছে। যেটুকু অংশ এর জানতে বা দেখতে পারা গিয়েছে, তার মধ্যে কোথাও কোথাও কয়লার স্তরের সন্ধান মানুষ পেয়েছে। মানুষের আশা, কে জানে, সেই বরফের তলায় লুকিয়ে কি খনি-সম্পদ্‌ই না আছে!

কয়লার না হোক্‌, ইন্ধনের খোঁজেই দুঃসাহসী নাবিকের দল দক্ষিণ-মেরু-সাগরের দিকে একটু একটু করে এগুতে থাকে। আলোর জন্যে দরকার ছিল তেলের। দক্ষিণ-মেরু-সাগর-বাসী শীল আর তিমির উপর পড়ল মানুষের নজর, কারণ, তাদের দেহের চর্ব্বিতে আছে প্রচুর তেল। অতএব য়ুরোপের নাবিকদের মুখের বুলি হল, Southward Ho!

এই সব শীল আর তিমি-শিকারীর দলই দক্ষিণ-জর্জিয়া, দক্ষিণ-সেটল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করে। অবশ্য তাদের

ধারণা ছিল যে, সেই সব দ্বীপগুলিই হ'ল দক্ষিণ-মেরুর আসল অংশ। এই জাতীয় শিকারীদের মধ্যে জন বিস্কো এবং জেমস্ ওয়েড্‌ডেলের নাম দক্ষিণ-মেরুর ভূগোলে* রয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের প্রথম স্মরণীয় তারিখ হ'ল, ১৭ই জানুয়ারী, ১৭৭৩; কারণ এই দিন ক্যাপটেন কুক্ সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ-মেরুবেষ্টনীর মধ্যে পৌছেছিলেন।

তারপরে, ক্যাপ্টেন ফন্ বেলিংসাউসেন (১৮১৯-২১)—৭০° পর্য্যন্ত। পিটার দি ফার্ষ্ট এবং আলেকজান্দার দি ফার্ষ্ট দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

স্যার জেমস্ ক্লার্ক রস—মাউণ্ট সাবাইনের নামকরণ করেন। ৭৫° ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। পসেসন্ এবং কউল-ম্যান দ্বীপ ও দুইটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেন। আগ্নেয়-গিরি দুটির নাম দেন Mount Terror এবং Mount Erebus.

ক্যাপ্টেন নরেস্ (১৮৭৪) - সর্ব্বপ্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ, Challenger, দক্ষিণ-মেরু সাগরে পাড়ি দেয়

আদ্রিয়ান্ ডি গেরলাশ (১৮৯৭)—শীতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই দলে নাবিক হিসাবে আমুন্ডসেন ছিলেন।

বোস গ্রেভিং (১৮৯৮)—সাদার্ণ ক্রস পার্টি। ৭৮° ডিগ্রী



অমরকীর্ত্তি মেরু-অভিযানকারিগণ: (উপরে বামদিক হইতে) স্যর ডগলাস মসন: এ, ডি গেরলাশ; রোয়াল্ড আমুন্ড-সেন; এ্যাডমিরাল দুরভিল, ক্যাপ্টেন স্কট, জেমস্ ওয়েড্‌ডেল; স্যর ই, স্যাকল্টন; এফ, ফণ, বেলিংসাউসেন; চার্লস্ উইলকিস্; সি, ই, বোর্সগ্রেভিং।

জেমস্ ওয়েড্‌ডেল্—৭৫° পর্য্যন্ত। ওয়েড্‌ডেল উপসাগর আবিষ্কার করেন।

জন বিসকো—গ্রাহামল্যাণ্ড, আডেলেড দ্বীপ, বিস্কো দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

দুরভিল্ (D'urville)†—যাঁর নামে দুরভিল্ সাগর হয়েছে।

চার্লস্ উইলকিস্—উইলকিস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত।

পর্য্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে এর বেশী আর কেউ অগ্রসর হতে পারে নি।

স্কট, স্যাকল্টন্ ও উইলসন্ (১৯০১)—দক্ষিণ মেরুতে প্রথম স্লেজে করে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত এগিয়েছিলেন।

স্যাকল্টন (১৯০৯)—দক্ষিণ মেরুর ৭০ মাইল দূর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

স্যর ডগলাস মসন—সাউথ ম্যাগনেটিক পোল আবিষ্কার করেন।

এবার ফিরে আসা যাক্ আমুন্ডসেনের জীবনে।

যখন তিনি Madeiraতে এসে পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরের বাসনার কথা জগতে জানালেন। কিন্তু সেই

* Biscoe Island, Weddell Sea.

† আর এক কারণে D'urvilleএর নাম সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে, Venus de milo নামে বিখ্যাত মূর্ত্তির রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে। এটা হ'ল প্রাচীন জগতের ভাস্কর-শিল্পের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মূর্ত্তিটি হারিয়ে যায়। D'urville মেলোস্ দ্বীপে সেই মূর্ত্তিটি খুঁজে পান।

সময় ক্যাপ্টেন স্কটও বেরিয়েছিলেন, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার জন্য। পাছে স্কট কিছু মনে করে, সেই জন্য তিনি স্কটের নামে একটা তার পাঠালেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন স্কট সে সংবাদ পান নি।

আমুন্ড্‌সেন হোয়েলস্‌ উপসাগরের ধারে Great Ice Barrier-এ উপস্থিত হলেন। সেখানে শীত কাটিয়ে তিনি ১৯১১ সালের ২০শে অক্টোবর যাত্রা সুরু করলেন।

যাত্রার লগ্ন ছিল ভাল। পথের দেবতা ছিলেন প্রসন্ন। যে বিপদ ও বাধা ক্যাপ্টেন স্কটকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল, সৌভাগ্যবশতঃ সে ধরণের বিপদ আমুন্ড্‌সেনকে ভোগ করতে হয় নি। তবে তিনি যে সান-বাঁধানো পথে হেঁটে গিয়েছিলেন, তা নয়।



দক্ষিণ-মেরুতে মানুষের প্রথম পদার্পণ : ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছিয়া আমুন্ড্‌সেন সর্ব্ব প্রথমে সেখানে নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন।

আমুন্ড্‌সেনের দলের বাহন ছিল কুকুর—স্কটের দলের বাহন ছিল, পনি ঘোড়া। বাহান্নটি কুকুর নিয়ে আমুনডসেন যাত্রা করেন। মাত্র ১৮টি দক্ষিণ-মেরুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ায় পথে ২৪টিকে মেরে ফেলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাকি ১৮টির মধ্যে ফিরে এসেছিল মাত্র ১২টি কুকুর। এই সম্পর্কে একটা কথা আছে, "The dogs won the Pole. The ponies lost it for England."

১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর! এই দিন আমুন্ড্‌সেন সদল বলে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌঁছলেন! বহু যুগের বহু মানবের সাধনা সেদিন সার্থক হ'ল। নিজের হাতে আমুন্ড্‌সেন সেখানে নরওয়ের পতাকা পুঁতলেন।

এই ঘটনার ৩৪ দিন পরে ১৮ই জানুয়ারী ১৯১২, সমস্ত দুর্দ্দৈবকে অতিক্রম করে ক্যাপ্টেন স্কট তাঁর দল নিয়ে দক্ষিণ-মেরুতে উপস্থিত হলেন। দশ বৎসর ধরে তিনি মেরুতে পদার্পণ করবার জন্যে চেষ্টা করে এসেছেন, আজ তাঁর আজীবনের সেই সাধনা সার্থক হ'ল। কিন্তু তিনি দেখলেন, তাঁর আসবার আগে, প্রথম আসার গৌরব কেড়ে নিয়েছেন আর একজন। তখনও রয়েছে আমুন্ড্‌সেনের তাঁবু, তখনও উড়ছে নরওয়ের পতাকা। তাঁবুর ভেতরে, তাঁবুর গায়ে আমুন্ড্‌সেনের নিজের হাতে লেখা রয়েছে, "Welcome to 90 degrees!"

জয়-গৌরব নিয়ে দক্ষিণ-মেরু থেকে ফিরে এলেন আমুন্ড্‌সেন। কিন্তু মেরুপ্রকৃতি স্কট আর তাঁর সহযাত্রীদের ছেড়ে দিল না। স্কট এবং তাঁর চারজন সহযাত্রী* প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম চক্রান্তের মধ্যে যে ভাবে সংগ্রাম করে মরণে অমর হয়েছেন—বীরত্বের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া দুর্ল্লভ। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

তারপর এল মহাযুদ্ধ। কামান আর বিষ-বাষ্পের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল মানুষের অন্য সমস্ত সৃজন-প্রয়াস। আমুন্ড্‌সেন যখন দক্ষিণ-মেরু থেকে ফিরে আসেন, তখন জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য নানা পদকে ভূষিত করেন। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আমুন্ড্‌সেন সেই সব পদক ফিরিয়ে দিলেন।

মহাযুদ্ধের পর আমুন্ড্‌সেনের বাসনা হ'ল যে, পায়ে হেঁটে না গিয়ে, এখন সব চেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে, বায়ু-পথে গিয়ে মেরু পরিদর্শন করা। তিনি ঠিক করলেন এবার দক্ষিণ-মেরু নয়, উত্তর-মেরু।

অর্থের সন্ধানে তিনি আমেরিকায় এলেন। তখন অর্থের তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। বক্তৃতা দিয়ে তিনি অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সামান্য অর্থে মেরু-অভিযান গড়ে তোলা যায় না।

*Dr Wilson, Lieut Bowers, Captain Oates, Evans.

একদিন তাঁর হোটেলে বসে আছেন, এমন সময় ফোন এল !

হ্যালো ! হ্যালো !

হাঁ, আমি আমুন্ড্‌সেন !

আমার নাম লিন্‌কন্ এলস্‌ওয়ার্থ ! আমেরিকার ক্রোড়-পতিদের উদ্দেশ করে আপনি খবরের কাগজে যে সব প্রবন্ধ লিখছেন, অবশ্য আপনার প্রস্তাবিত মেরু-অভিযানে সাহায্য সম্পর্কে, আমার বাবা সেই সব প্রবন্ধ পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ! কবে, কোন্ সময় আপনার সুবিধা হবে জানলে……

লিন্‌কন্ এলস্‌ওয়ার্থের বাবার সঙ্গে আমুন্‌ডসেনের সাক্ষাৎ হ'ল, ক্রমশঃ বন্ধুত্ব হ'ল। একদিন হঠাৎ বুড়ো এলস্‌ওয়ার্থ বললেন, আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আমি যদি তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য না করি……

কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে আমুন্‌ডসেন বললেন, তবু জানবেন আমি উত্তর-মেরুতে যাব-ই !

বুড়ো এল্‌স্‌ওয়ার্থ টাকা দিলেন। কিন্তু টাকার চেয়েও ঢের মূল্যবান্ জিনিস আমুন্‌ডসেন বুড়োর কাছ থেকে নিয়ে গেলেন—সে হ'ল বুড়োর ছেলে, ক্রোড়-পতির ছেলে লিন্‌কন্ এল্‌স্‌ওয়ার্থ। লিন্‌কন্ উত্তর-মেরু অভিযানে আমুন্‌ডসেনের সঙ্গী হলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমুন্‌ডসেন যাত্রার আয়োজনের জন্যে নরওয়েতে ফিরে এলেন। ঠিক হ'ল, Spitsbergen থেকে এরোপ্লেনে যাত্রা করা হবে।

১৯২৫ সালের ৯ই এপ্রিল Tromso বন্দর থেকে জাহাজে করে তাঁরা নরওয়ের তীর ত্যাগ করলেন। মোটর-বোটে ছুটি sea-plane নেওয়া হয়েছিল। সেই ভাবে তাদের Spitsbergen পর্য্যন্ত নিয়ে আসা হ'ল। Spitsbergen থেকে আকাশ-যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল।

২১শে মে তাঁরা যাত্রা করলেন, ছুটি সি-প্লেনে* ছ'জন লোক N. 24-এ রইলেন লিন্‌কন্, (ন্যাভিগেটর, ডিট্রি্‌সেন (পাইলট) এবং ওমডাল (মেকানিক), N 25-এ রইলেন আমুন্‌ডসেন (ন্যাভিগেটর), রাসার্-লার্সেন (পাইলট) এবং ফ্রস্ (মেকানিক)। তীব্র বেগে ছুটি এরোপ্লেন আকাশের দিকে উঠল। বিদায়-দাত্রীদের কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বেজে উঠল, "Welcome back to-morrow !"

যাত্রার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ তাঁরা বিশ্রী কুয়াসার মধ্যে পড়লেন। কুয়াসার হাত এড়াবার জন্যে তাঁদের তিন হাজার ফুট আরও উঁচুতে উঠতে হ'ল। সেখানে উঠে দেখেন, তাঁদের নীচে রয়েছে রামধনু—তারই ফাঁক দিয়ে তখনও



বামে লিন্‌কন ও দক্ষিণে আমুন্‌ড্‌সেন, পিছনে তাঁহাদের মেরু-অভিযানের সি-প্লেন দেখা যাইতেছে।

দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সমস্ত কুয়াসা দূর হয়ে গেল, নীচে চেয়ে দেখেন, দূর দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত ছেয়ে তুষারের শুভ্র চাদর বিছান রয়েছে—আকাশপথ থেকে উত্তর-মেরুর সেই অপরূপ শুভ্র মহিমা সেই প্রথম মানুষের দৃষ্টিগোচর হ'ল। যত দূরে দৃষ্টি যায়, কোথাও সেই শুভ্রতার মধ্যে কোন ছেদ নেই—শুধু মাঝে মাঝে তুষার-বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলি শাদা কাগজে কালো রেখার মত দেখাচ্ছে। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত মৌনতার মধ্যে তীব্র আর্ত্তনাদ করে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে ছুটি এরোপ্লেন ছুটে চলেছে।

এই ভাবে আট ঘণ্টা শূন্যপথে তাঁরা এগিয়ে চললেন। ততক্ষণের মধ্যে তাঁদের উত্তর-মেরুতে পৌছান উচিত ছিল, কিন্তু উত্তর-পূর্ব্ব বাতাসে তাঁদের গতির মুখ ঘুরে যায়। এধারে তাঁদের এঞ্জিনের ইন্ধনও প্রায় অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হয়ে

* N 24 এবং N 25।

এসেছে। ঠিক কতদূর পর্য্যন্ত তাঁরা এসেছেন, তা জানবার জন্য তাঁদের নীচে নামতে হয়, কিন্তু সি-প্লেনের নামবার উপযুক্ত জল কোথায়? হঠাৎ সৌভাগ্যবশতঃ সেই ছেদহীন বরফের মধ্যে তাঁরা একটা ফাঁক দেখতে পেলেন, সেখানে জল রয়েছে।

২২শে মে তাঁরা নামতে সুরু করলেন। ওপরে থেকে যা নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর কাছাকাছি আসতে দেখা গেল যে, সে জলে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জলের মধ্যে ছোট-বড় তুষার-খণ্ড থৈ থৈ করছে। লিন্‌কন্ তারই মধ্যে নামলেন। একটা বড় বরফের চাঁই-এর সঙ্গে তাঁর প্লেন নোঙ্গরে বাঁধলেন, কিন্তু দেখলেন যে, তাঁর প্লেন ফুটো হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময় বরফের পাশ থেকে একটা শীল মাথা তুলে উঠে আবার ডুবে গেল। প্রাণহীনের রাজ্যে সেই প্রথম প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয়।

আমুন্‌ডসেনের প্লেন কোথায়? তিনি কি নামা বিপজ্জনক দেখে সোজা উত্তর মেরুর দিকে চলে গেলেন? অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লিন্‌কন্ গ্লাসের সাহায্যে দেখলেন যে, প্রায় মাইল তিনেক দূরে আমুন্‌ডসেনের প্লেন বরফের মধ্যে থেকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

আমুন্‌ডসেনও নেমে বিপন্ন হলেন। মেসিন তো ফুটো হয়ে গিয়েছিলই, মোটরও জখম হয়েছিল। সেই অবস্থায় পাঁচদিন তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বরফের মধ্যে আটক পড়ে রইলেন। লিন্‌কন্ ও তাঁর সঙ্গীরা আমুন্‌ডসেনের কাছে পৌছবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ডেট্রিসেনের চোখ তুষার-আঘাতে অন্ধ হয়ে আসবার মত হ'ল। এধারে প্লেনও ক্রমশঃ জলে ডুবতে আরম্ভ করল। এমন সময় হঠাৎ প্রকৃতির করুণা-বশে সেই নিশ্চল জলে বেগ দেখা গেল। জলের বেগে ভাসতে ভাসতে তাঁরা ক্রমশঃ আধ-মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। তখন আমুন্‌ডসেন সিগন্যাল দিয়ে জানালেন যে, তাঁরা যেন প্লেনের আশা ত্যাগ করে, প্লেন ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। অগত্যা তাঁদের তাই করতে হ'ল।

লিন্‌কন্ এসে দেখলেন যে, সেই পাঁচদিনের মধ্যে আমুন্‌ডসেনের বয়স যেন আরও দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। প্লেনের কেবিনে নতুন করে রুটিন করা হয়েছে, রুটিন মত প্রত্যেক কাজ চলছে। কোথাও তাড়াহুড়ো, শঙ্কা বা এলো-মেলো ভাব কিছু নেই। যদি সেই তুষার-সমাধি বরণ করতে হয়, প্রাচীন ভাইকিংদের মতই বুক ফুলিয়ে তা বরণ করতে হবে!

এধারে একান্ত উৎকণ্ঠায় জগৎ অপেক্ষায় ছিল কখন আমুন্‌ডসেন্ ফিরে আসেন। ফিরে আসবার লগ্ন বহুদিন হ'ল উত্তীর্ণ হয়ে গেল—কৈ আমুন্‌ডসেন তো ফিরলেন না? তবু সকলের বিশ্বাস ছিল যে, আমুন্‌ড্‌সেন নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন! কোন দুর্য্যোগ তাঁকে আটকে রাখতে পারে না! তিনি ফিরে আসবেনই!

কিন্তু সেই নিষ্করুণ তুষার-কারাগারে ভগ্ন-যান অবস্থায় আমুন্‌ডসেন এবং তাঁর সহযাত্রীরা বুঝেছিলেন, মৃত্যু সুনিশ্চিত। তাই যদি স্থির, তবুও বীরের মত যুঝতে হবে মৃত্যুর সঙ্গেও।

সেই অবস্থায় থেকে তাঁরা এরোপ্লেন মেরামত করতে লাগলেন। ক্রমশঃ খাদ্য ফুরিয়ে আসতে লাগল। দিনে আধ পাউণ্ড করে খাদ্য বরাদ্দ হ'ল। এই ভাবে জুন মাস এসে গেল। তাঁরা ঠিক করলেন, এরোপ্লেন ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অগত্যা পায়ে হেঁটে গ্রীণল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করবেন। কবে যে বরফ গলে জল হবে, তার কোনও আশা নেই আর ততদিন কি বেঁচে থাকা যাবে? কোন রকম ভাবে ভাঙ্গা এরোপ্লেন মেরামত করা হ'ল, কিন্তু যত রকমে সম্ভব চেষ্টা করেও এরোপ্লেন ছাড়বার সুবিধা আর করে উঠতে পারলেন না।

২রা জুন মধ্যরাত্রিতে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম নেই শুধু আমুন্‌ডসেনের চোখে! প্রাণীহীন সেই অনন্ত মৌনতার মধ্যে তিনি জেগে আছেন······হঠাৎ এক বিকট শব্দ হ'ল··· তিনি বুঝতে পারলেন দুধার থেকে বরফের চাঁই এসে তাঁদের এরোপ্লেনকে আক্রমণ করেছে······সকলকে ডেকে তুললেন··· সকালবেলায় দেখা গেল এরোপ্লেন দুধার থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে······

আবার সেই ভাঙ্গা প্লেন জুড়তে লেগে গেলেন। দু'সপ্তাহ নয়, যেন দু'যুগ! ১৪ই জুন দক্ষিণ দিক থেকে এক দমকা হাওয়া এল। আশা হ'ল মনে, এইবার বোধহয় প্লেন উঠাব। কিন্তু দক্ষিণ হাওয়া বৃথায় গেল। ১৫ই জুন উত্তর

িক থেকে হাওয়া বইতে লাগল। হাওয়া ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আশায়, উৎকণ্ঠায়, তাঁরা সকলে প্লেনে যে-যার ঘরের কাছে গিয়ে বসলেন। প্লেন নড়ে উঠল·····কুয়াসার



আমুন্‌ড্‌সেন : পঁচিশ দিন উত্তর-মেরুর কাছাকাছি বরফে আটক থাকিবার পর।

মধ্যে দিয়ে ওপরে উঠল···আরও ওপরে উঠল······ঘরের দিকে, মাটির দিকে, মানুষের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলল··· ক্রমশঃ নীচে মাটি দেখা দিল······এল্‌স্‌ওয়ার্থ দেখেন তখন সকলে একসঙ্গে পাগলের মত হাতের বিস্কুট চিবোচ্ছে······ আমুন্‌ডসেন আবার ফিরে এলেন!

কিন্তু ফিরে এসেই ঠিক করলেন, তিনি আবার ফিরে যাবেন। উত্তর-মেরুতে তো পৌঁছান হয় নি! শূন্য-পথে উত্তর-মেরুর রূপ তিনিই প্রথম দু'চোখ ভরে দেখবেন। তবে এবার স্থির হ'ল, এরোপ্লেনে নয়, উড়ো-জাহাজে। বহু অনুসন্ধানের পর ঠিক হ'ল যে, যদি ইতালীর উড়ো-জাহাজ N-1 পাওয়া যায়, তা হলে বড় ভাল হয়। N-1 কেনবার জন্য আমুন্‌ডসেন রোমে গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করলেন।

মুসোলিনী বিশেষ চেষ্টা করে তার বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং ঠিক হ'ল যে, কর্ণেল নোবাইল সেই জাহাজের চালক-রূপে আমুন্‌ডসেনের সঙ্গে উত্তর-মেরুতে যাবেন। এবার যাত্রী সংখ্যা হ'ল ১২*।

কিন্তু যাত্রা-পথে তিনি শুনলেন যে, আমেরিকার ক্যাপ্টেন রিচার্ড আকাশ-পথে উত্তরমেরু পরিভ্রমণ করে সগৌরবে ফিরে এসেছেন!

প্রথম যৌবনে একদিন উত্তরমেরু এমনি করে তাঁকে ফিরিয়ে ছিল, এবারেও উত্তরমেরু তাঁর সঙ্গে বাদ সাধল। কিন্তু তবুও তিনি ঠিক করলেন যে, তিনি যাবেন। ইতালীর N-1-এর নতুন নামকরণ হ'ল Norge, অর্থাৎ নরওয়ে। ১৯২৬ সালের ১১ই মে তাঁরা স্পিট্‌সবার্গেন থেকে যাত্রা করলেন।

এবার পথে কোনও বিপদ ঘটল না। ষোল ঘণ্টার পর তাঁরা উত্তর-মেরুর ওপারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জাহাজ থেকে তিনটি পতাকা নীচে ফেলে দেওয়া হল। তারপর তাঁরা উত্তর-মেরু অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন। ৭২ ঘণ্টার পর তাঁরা সমগ্র উত্তর-মেরু অতিক্রম করে আবার মানব-জগতে ফিরে এলেন।

উত্তরে উত্তর-মেরু, দক্ষিণে দক্ষিণ-মেরু, দুই মেরুতে উড়ছে তাঁর জয়ের পতাকা! মানুষের অদম্য প্রাণ-শক্তির নিদর্শন!

উত্তর-মেরু থেকে ফিরে আসবার পর এক অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। নর্জের চালক মেজর



'নর্জ' জাহাজ স্পিট্‌স্‌বার্গেন হইতে মেরুর উদ্দেশে যাত্রা করিতেছে।

নোবাইলের সঙ্গে আমুন্‌ডসেনের হ'ল তীব্র বাদানুবাদ এবং সেই বাদানুবাদ ক্রমশঃ শত্রুতায় পরিণত হ'ল। ক্রমশঃ আমুন্‌ডসেনের নামও লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়ে গেল।

*Amundsen, Ruser-Larsen, Lincoln Ellsworth, Ramm, Gottwaldt, Wisting, Omdall, Johnson, Nobile, Cecioni, Arduino, Caratti,

যৌবনের প্রথম দিন থেকে দুর্য্যোগ আর ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অকালে নিদারুণ জরা এসে তাঁকে নিঃসঙ্গ স্থবির করে তুলল। একা লোক-চক্ষুর অন্তরালে তিনি শেষ-যাত্রার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু ভাইকিং-রা কি এই ভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় ?

ও-ধারে মেজর নোবাইল ক্রমশঃ হলেন জেনারেল নোবাইল। ১৯২৮ সালের জুন মাসে জেনারেল নোবাইল ইতালীয় উড়ো-জাহাজে আবার উত্তর-মেরুতে যাত্রা করলেন। কিন্তু নোবাইল আর ফিরে এলেন না।

কে যাবে সেই নিঃসীম নির্জ্জনতার মধ্যে, সেই পথ-হীন হিম-মৃত্যুর রাজ্যে পথ-ভ্রান্ত পথিকের সন্ধান আনতে ?

জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ আমুনডসেন এগিয়ে এলেন। তিনি যাবেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজে সেই মৃত্যুর রাজ্যে! ভাইকিং ছাড়া কে আর তা পারে ? ভাইকিং ছাড়া এ দুঃসাহস আর কার সম্ভব ?

শেষ-বিদায়ের লগ্ন এসেছে। ভাইকিং কি আর ঘরে বসে থাকতে পারে ?

বৃদ্ধ বয়সে আমুনডসেন নোবাইলকে খুঁজতে বেরুলেন উত্তর-মেরুতে। সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল সেই অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা !

জনাকীর্ণ মানুষের জগৎ ছেড়ে আমুনডসেন আবার বেরুলেন উত্তর-মেরুর পথে। এবার তিনি আর ফিরে আসতে পারলেন না। উত্তর-মেরুর তুষার-শুভ্রতার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল তাঁর দেহাস্থি কে জানে !

দক্ষিণ-মেরুতে তাঁর সফল যৌবন-বাসর, উত্তর-মেরুতে তাঁর সমাধি !

এইভাবে য়ুরোপ থেকে চলে গেল তার শেষ ভাইকিং।

সাবিত্রী

শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হে সাবিত্রি, হে জননি, ভারতের হে ক্ষত্রিয়া নারী !
সতীত্বের বজ্রে গড়া কি কঠিন লয়ে তরবারি
কালের সমুখে আসি মুখোমুখি দাঁড়ালে যেমনি।
ভয়ে ভয়ে মহাকাল পালাইয়া গেল মা অমনি।
নারীর মহিমা হেরি সে দিন কি তাঁর দেহময়,
মুহুর্মুহু উঠেছিল মর্ম্মভেদী রমণীর জয় ?
সেদিন কি নীলাকাশ শত আঁখি মেলি মুগ্ধ প্রাণে,
চেয়েছিল ধরণীর এই ছোট মেয়েটির পানে ?
অপ্সরার কণ্ঠে কণ্ঠে সে দিন কি বৈজয়ন্ত-ধামে ?
উঠেছিল জয়ধ্বনি এই দীনা মেয়েটির নামে ?
প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি বুঝেছিলে ওগো প্রেমময়ী,
অলঙ্ঘ্য কালেরও পরে প্রেম তব তাই হল জয়ী।
প্রাণ নিতে আসি কাল—চির প্রাণ করি গেলা দান।
বাঁচিয়া উঠিল তব ‘মরা-স্বামী’ তাই সত্যবান।
কেহ যাহা কোন দিন পারে নাই—সাধনায় তব,
সম্ভব করলে তুমি এ জগতে সেই অসম্ভব।

তাই না তোমার স্থান আজি মা গো বিধাতারও পরে !
সকলের মাতা হয়ে তুমি আছ সকলের ঘরে।
নারীর ললাটে হেরি মাতৃত্বের যে মহাগৌরব।
তারি মাঝে তুমি আছ, আছে তব অম্লান সৌরভ।
প্রেমের অমৃত দিয়া মরণেরে করিয়াছ জয়,
নিখিল নারীর বুকে স্থান পেয়ে হয়েছ অক্ষয়।
নারীরে করেছ ধন্য দেখাইয়া নারীর মহিমা,
রেখে গেছ এ জগতে সতীত্বের আনন্দ পূর্ণিমা।
ব্যর্থ প্রাণ নিয়ে হায় এ জগতে এসেছিল যারা
সেই সব ব্যাথাতুরা সেই সব পতি-পুত্রহারা,
এইখানে আঁখিজলে ধুয়ে সর্ব্বজীবনের গ্লানি,
চলে যায় তব লোকে সান্ত্বনার পেয়ে নববাণী।
আবার নূতন করে সেইখানে পেয়ে হারাধনে,
অনন্ত জীবনে তারা মিলে পুনঃ পতিপুত্র-সনে।
ছেড়ে গেছ কবে তুমি জ্যোতির্ম্ময় কোন ঊর্দ্ধলোকে,
আজ প্রতি রাতে আসি চেয়ে থাক অনিমেষ চোখে।

নারীর ভূষণ তুমি রমণীর তুমি শিরোমণি।
ভারতের ঘরে ঘরে আজ আছে সাবিত্রী জননী।

জাগ্রতা

— শ্রীসরোজবরণ ঘোষ

গহনা চুরির বিষয় আলোচনা হইতেছিল।

কে চুরি করিল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সে যেই হউক তাহার সুখনিদ্রার যে কোন ব্যাঘাত হইতেছে না তাহা ধ্রুব সত্য। যাঁহার চুরি হইল তাঁহারও মুখ ফুটিয়া বলিবার কথা নয়। কিন্তু তৃতীয় পুরুষের দলের,—যাহাদের চুরিও হয় নাই বা যাহারা চুরিও করে নাই, তাহাদেরই শুধু চক্ষুতে নিদ্রা নাই ও মুখে খই ফুটিবারও বিরাম নাই।

খুলিয়াই বলি। এক প্রভাতে দেখা গেল পলাশ-ডাঙ্গার সর্ব্বপূজিতা দেবী সর্ব্বমঙ্গলাকে কে বা কাহারা নিরাভরণা করিয়া পালাইয়াছে। দেবী-অঙ্গে গহনার অপ্রাচুর্য্য ছিল না। কর্ণভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ-তলস্থিত স্বর্ণপদ্ম লইয়া গহনা যা ছিল, তাহার মূল্য কম নয়।

প্রথমে এই চুরি নজরে পড়ে বৃদ্ধ কৈলাস বাঁড়ুয্যের। প্রভাতে উঠিয়া চোখে মুখে জল দিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে যাওয়া বৃদ্ধের অনেক দিনের অভ্যাস। অত প্রভাতে মন্দির-দ্বারের তালা খোলা হয় না। শিকলটা খুলিয়া দরজটা ফাঁক করিয়া প্রভাতের স্বল্পালোকে দেবীর চরণদর্শন-সৌভাগ্য একা এই কৈলাস বাঁড়ুয্যের। সেদিন প্রভাতে চরণ দর্শন করিতে যাইয়াই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন দেবীর পদতলে স্বর্ণপদ্ম নাই। চিরদিন তিনি স্বর্ণপদস্থিত দেবীপদ প্রণাম করিয়া আসিতেছেন। আজ এই ব্যতিক্রম তাঁহার অভ্যস্ত চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারিল না।

তিনি তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ মন্দিররক্ষককে আহ্বান করিলেন।

মন্দিররক্ষক পাঁড়েজী দেখিয়া শুনিয়া 'কীয়া তাজ্জব' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

অদূরে তাহার মুদিখানাটি সবেমাত্র খুলিয়া বিষ্ণু মুদী চৌকাঠে তখন জলছড়া দিতেছিল।

কৈলাস বাঁড়ুয্যে তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, বলি ও বিষ্টু, এদিকে এসে একবার কাণ্ডখানা দেখে যাও।

কি ব্যাপার কর্ত্তা, বলিয়া বিষ্ণু ছুটিয়া আসিল।

কৈলাস বাঁড়ুয্যে কিছু না বলিয়া শুধু ঈষন্মুক্ত মন্দির-দ্বার দেখাইয়া দিলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু মুদীর পো ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সে শুধু ভিতরে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, হে মা সর্ব্বমঙ্গলে, সর্ব্ব মঙ্গল ক'রো মা।

বাঁড়ুয্যে এতক্ষণ বিষ্ণুর দেবীভক্তি দেখিতেছিলেন। সে যুক্তকর কপাল হইতে নামাইলে তিনি বলিলেন, বলি দেখলে—

নির্ব্বোধের মত বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়া বিষ্ণু বলিল, এজ্ঞে কর্ত্তা।

বাঁড়ুয্যে চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে কি চোখের মাথা খেয়েছ না কি বিষ্টু,—বলি, মায়ের পায়ের তলার স্বর্ণপদ্মটা গেল কোথায়?

বিষ্ণু চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, সে কি কর্ত্তা—নির্ব্বংশ হতে সাধ গেল কার গো কর্ত্তা—বলিয়া মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিতেই দেবীপদতল শূন্য দেখিতে পাইল।

বিষ্ণুর দোকানে ততক্ষণ খরিদ্দারের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে।

মুদীর পো যাইয়া তাহার খরিদ্দারদের চুরির বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেই তাহারা ছুটিয়া আসিয়া মন্দিরদ্বারে জমায়েৎ হইল।

—এবং এই স্থলেই গহনা চুরির বিষয় আলোচনা হইতেছিল।

গোকুল দত্ত বলিল: মায়ের খানে চুরি, বলেন কি আপনারা—

কৈলাস বাঁড়ুয্যে বিজ্ঞের মত শিরশ্চালনা করিয়া বলিলেন—আর বলেন কি! এটা যে কলিকাল সেটা মনে আছে কি গোকুল?

গয়ারাম পাল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—হ'লই বা কলিকাল ঠাকুর মশায়! কলি-কাল বলে কি আর কেউ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে না।

কৈলাস বাঁড়ুয্যে গম্ভীর মুখে বলিলেন—সেই রকমই ত' বোধ হচ্ছে গয়ারাম।

এখন কর্ত্তব্যটা কি আমাদের বাঁড়ুয্যে মশায়? বলিতে বলিতে শীর্ণ বলাই গাঙ্গুলী আসিয়া দাঁড়াইলেন বাঁড়ুয্যে মশায়ের পাশে।

গাঙ্গুলী মশায় আসিয়াছিলেন বিষ্ণু মুদীকে ব্রাহ্মণকে কর্জ্জ-দেওয়া রূপ সৌভাগ্য অর্জ্জন করাইতে।

বিষ্ণুর মুখে চুরির বৃত্তান্ত শুনিয়া ভুলিয়া গেলেন যে, পয়সাটাকের কেরোসিন লইয়া না গেলে উনানে আগুন পড়িবে না।

গোকুল দত্ত আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমি বলি কি, একবার ভট্‌চায মশায়কে ডেকে এনে তালা খুলিয়ে দেখা যাক্।

কৈলাস বাঁড়ুয্যে সায় দিয়া বলিলেন—তা মন্দ যুক্তি নয়।

তখন জনকতক সর্ব্বমঙ্গলার পুরোহিত হরিশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দিকে চাবি আনিতে চলিল।

ভট্টাচার্য্য মশায় তখন সবেমাত্র ব্রহ্মতালুতে তৈল ঘসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খবর শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—তোমরা কি ক্ষেপেছ না কি হ্যাঃ? কাল সন্ধ্যেয় আরতি করে যেখানকার যা সেখানকার তা রেখে এলাম, আর রাত না পোহাতেই চাবির ভেতর থেকে চুরি হয়ে গেল—মায়ের পদ্ম? যত সব ইয়ে—

ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলিয়া উঠিল—তা আমরা এতগুলো জন কি কাণা কর্ত্তা?

আচ্ছা বাপু, এই চাবি-ই নিয়ে যাও। যেয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর—বলিয়া হরিশ ভট্‌চায পুত্র মদনকে ডাক দিয়া বলিলেন, ও মদন এদিকে একটু শোন্ ত বাপু।

মদন তখন শব্দরূপ লইয়া বড় বিরত হইয়া পড়িয়াছিল। গরুকে অতি নিরীহ প্রাণী বলিয়া মদন জানিত, কিন্তু সেই গরুই যে গো-শব্দের রূপ ধারণ করিয়া ব্যাকরণে ঢুকিয়া মানবশিশুকে এত অস্থির করিতে পারে আমাদের মদন কি তাই ছাই জানিত! পিতার ডাক শুনিয়া যেন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাই তাড়াতাড়ি বই মুড়িয়া জবাব দিল—আজ্ঞে যাই। পিতা তার হাতে একটি ক্ষুদ্র চাবি দিয়া বলিলেন—সর্ব্বমঙ্গলার ঠাকুর-ঘরটা খুলে দিয়ে এস ত।

সুবোধ পুত্র চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চাবি খুলিলে পর যাহা দেখা গেল—তাহাতে কাহারও চক্ষু উৰ্দ্ধে উঠিল, কাহারও বা নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, আবার কাহারও বা দাঁড়াইবার শক্তি লোপ পাইল।

শুধু স্বর্ণপদ্ম নয়—মায়ের যাবতীয় গহনা অন্তর্হিত হইয়াছে।

কৈলাস বাঁড়ুয্যে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

গয়ারামের চক্ষু কপালে উঠিল।

বিষ্ণু মুদী ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সর্ব্বমঙ্গলা এম্‌নি জাগ্রতা দেবী, মন্দির-প্রাঙ্গণে ততক্ষণ বেশ ভিড় জমিয়া গেছে। আর জমিবেই বা না কেন—এত বড় একটা কাণ্ড।

ভিড়ের মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রথমে মুখ খুলিলেন—পীতাম্বর ঘোষাল।

ভট্‌চাযের উপর তাঁর অনেকদিনের রাগ। যেদিন ভট্‌চায একটা মারপিটের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সদরে সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছেন, সেই দিন হইতেই এ রাগের সূত্রপাত।

তাই আজ পীতাম্বর ভণিতা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—এটা কার কাজ, তা আর তোমরা বুঝতে পারো না হে।

কৌতূহলী জনতা হইতে রব উঠিল: কার কাজ ঘোষাল মশায়, কার কাজ!

পীতাম্বরের ভণিতার তবু শেষ নাই।

গলাটা একটু নামাইয়া তিনি বলিলেন: কার কাজ বলে দিয়ে মার খাই আর কি? আমি বাপু এ সবে নেই!

ভীড়ের মধ্যে ছিল পলাশডাঙ্গা গ্রামের মহাপ্রতাপান্বিত চৌকিদার তিনকড়ি দাস, ওরফে তিনকড়ে কৈবর্ত্ত। সে এতক্ষণ সকলের পিছনে ছিল। তার পিছনে থাকিবার উদ্দেশ্য লোককে দেখান যে, এ সব বিষয়ে তার কৌতূহল অতিশয় সামান্য। কারণ এ-কেসের তদন্ত করা, আসামী ঠিক করা, তাহাকে থানায় লইয়া যাওয়া, সমস্তই ত তার এলাকার ভিতরে এবং সে একলাই ত আগাইয়া যাইবে, এখন একটু পিছাইয়া থাকিলে তাহার কোন দোষও নাই, তাহার মর্য্যাদা লাঘবেরও আশঙ্কা নাই।

কিন্তু পীতাম্বরের কথা শুনিয়া সে নিজেকে আর জাহির না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সে আগাইয়া যাইয়া পীতাম্বর ঘোষালের উদ্দেশ্যে বলিল: কার কাজ বলে মনে হয় কর্ত্তা?

ঘোষাল শিখা দুলাইয়া বলিলেন: এই যে তিনকড়ি তুমি হাজির।

চৌকিদার হইলে কি হয়, তিনকড়ি আমাদের বিনয়ের অবতার। ঘাড়টি নীচু করিয়া সে বলিল: এজ্ঞে কর্ত্তা।

পীতাম্বর হাত নাড়িয়া চোখ-মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন: এ যদি বিটলে ভট্‌চাযটার কাজ না হয় তিনকড়ি—তবে আমি নীলু ঘোষের ছেলে নই—বলে দিচ্চি।

মদন চাবি হাতে বিশুষ্কমুখে দাঁড়াইয়াছিল। ঘোষালের কথায় তার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। রাগে না দুঃখে কে জানে?

সকলেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ আর প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। কৈলাস বাঁড়ুয্যে কেবল কণ্ঠ অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর করিয়া বলিলেন: মায়ের থানে দাঁড়িয়ে এ কথাটা মনে রেখ ঘোষাল।

পীতাম্বর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন: আমার দোষটা কি দাদা—আমার দোষটা কি?

এই চুরির ব্যাপারে ক্ষুদ্র পলাশডাঙ্গা সরগরম হইয়া উঠিল।

নীচজাতির দল, যাহাদের অসুখে-বিসুখে সর্ব্বমঙ্গলার চরণামৃতের জন্য ভট্‌চাযের দ্বারস্থ হইতে হয়, তাহারা যে মরিয়া গেলেও ভট্‌চায মহাশয়ের সম্বন্ধে নীচ ধারণা করিতে পারিবে না, ইহা ত' অতি স্বাভাবিক।

অস্বাভাবিক হইতেছে যাহারা শিক্ষার বড়াই করে, যাহারা সভ্যতার অহঙ্কারে বৃহৎ ধরাকে ক্ষুদ্র সরা মনে করে, তাহারা কি করিয়া এই নির্লোভ নিঃস্ব ব্রাহ্মণকে চুরীর জন্য দায়ী করিতে পারিল!

এবং এই শিক্ষিত দলের বদ্ধমূল ধারণা যে, অভাবে সকলেরই স্বভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

পলাশডাঙ্গার শিক্ষিত দলের নেতা হইতেছে সুধীর পালিতের ছোট ভাই সুবীর পালিত।

বি-এ ফেল করিয়া ছোক্‌রা গাঁয়ে আসিয়া বসিয়াছে আজ দুই তিন বৎসর হইল এবং ইতিমধ্যেই সে মোড়লীতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। সে রটাইয়া দিয়াছে যে, তাহার মত বিদ্বান ভূ-ভারতে নাই, সে বি-এ ফেল করিল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইচ্ছা কাহাকেও পাশ না করান এবং তাহার সময়ে না কি মাত্র গণা দুই জন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহাও আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের হাতে পায়ে ধরিয়া।

এ হেন সুবীর পালিতকে নেতা করিয়া একদল পুনরায় হরিশ ভট্‌চাযের গৃহাভিমুখে চলিল। ভট্‌চায মহাশয় তখন সবেমাত্র স্নান সারিয়া আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। এই খবরটা আনিয়া দিল ভট্‌চাযের কনিষ্ঠ পুত্র রতন।

পীতাম্বর দাঁত খিচাইয়া বলিলেন: আহ্নিকে বসেচেন, এখন থানায় যেয়ে আহ্নিকে বস্‌তে বলগে। পীতাম্বরের চীৎকারে যিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্বয়ং হরিশ ভট্‌চায নন, তবে তাঁহারই বিধবা আত্মজা সর্ব্বাণী।

এই একটি মেয়ে, যে মাত্র বিংশতি বর্ষীয়া হইলেও ষাট বৎসরের বৃদ্ধের নিকট হইতেও সম্মানের রাজকর আদায় করিয়া লইতে জানে—এমনি মহিয়সী তার মূর্ত্তি, এমনি দৃপ্ত তার স্বভাব।

সর্ব্বাণী দাওয়ায় আসিয়া পীতাম্বরকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল: আপনার বুঝি থানায় বসে' আহ্নিক করা অভ্যাস পীতু খুড়ো? পীতাম্বরের আত্ম-সম্মানে

এই তীব্র শ্লেষোক্তি বড় আঘাত করিল। তিনি জ্ঞানহারা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন: তোমারও গুণের কথা কারও জানতে বাকী নেই—সর্ব্বাণী…

সহ্যেরও সীমা আছে। এতবড় একটা মিথ্যা কল্পিত অপবাদ সর্ব্বাণী সহ্য করিতে পারিল না। দাওয়া হইতে নামিয়া, উঠান পার হইয়া একেবারে ঘোষালের চোখের সমানে আসিয়া সর্ব্বাণী তীব্র স্বরে বলিল: বেরিয়ে যান্ বল্ছি বাড়ী থেকে, এক্ষনি বেরিয়ে যান্—বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সদর দেখাইয়া দিল।

সে আদেশ অমান্য করা পীতাম্বরের সাধ্যে কুলাইল না। পিছন হটিয়া তিনি সদরের চৌকাঠ পার হইতেই সর্ব্বাণী তাঁর মুখের উপর সদরটা বন্ধ করিয়া দিল।

রুদ্ধরোষে পীতাম্বর গর্জ্জিয়া উঠিলেন: আচ্ছা আমিও নীলাম্বর ঘোষালের ছেলে।

বি-এ-ফেল সুবীর পালিত অনেকক্ষণ হইতে একটা বিদ্বজ্জনোচিত মন্তব্য করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। এতক্ষণে বোধহয় সেই সুযোগ-টি সে পাইল। কারণ তাহাকে বলিতে শোনা গেল—ইস্, যেন জোয়ান্ অব আর্ক……মধ্যপথে তাহাকে থামাইয়া কৈলাস বাঁড়ুয্যে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন: চুপ কর হতভাগা।

পীতাম্বর 'থানা পুলিশ কর,' 'থানা পুলিশ কর' করিয়া লাফাইলেও চট্ করিয়া থানায় খবর দেওয়া হইয়া উঠিল না।

বি-এ ফেল সুবীরের দাদা সুধীর থানায় খবর দেওয়ায় অনেক হাঙ্গামা আছে বুঝাইয়া দিলেন—বলিলেন —বোঝ ত' তোমরা সব, তবে কথা কইতে যাও কেন? দারোগা দারোগা—সে খেয়াল আছে? ব্রাহ্মণ বলে সে রেয়াৎ কর্‌বে না—সব্বাইকেই চালান দেবে। তখন ঘোষাল মশায় থাক্‌বেন কোথায় শুনি—সে এলে কাউকে ছেড়ে দেবে—তোমরা বলতে পার?…গোকুল বলিল: তা বলে এর ত' একটা বিহিত করতে হবে সুধীরদা……

সুধীরই এইবার জবাব দিলেন, বলিলেন: বিহিত করতে হয়, যার জিনিষ তাকে আগে একটা খবর দাও।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। কথাটা হইতেছে এই—সর্ব্বমঙ্গলা সংক্রান্ত যাবতীয় দেবোত্তর সম্পত্তির একমেবাদ্বিতীয় সেবাইৎ হইতেছেন জমিদার ভূপাল চৌধুরী।

ভূপাল চৌধুরী এতদিন বরাবরই কলিকাতায় বাস করিয়া আসিতেছেন। বৎসর খানেক হইল, কলিকাতা ছাড়িয়া সোনামাটিতে পৈতৃক ভিটায় একটি সুরম্য বাংলো তৈয়ারী করিয়া পল্লী-জীবন যাপন করিতেছেন।

থানায় খবর দিবার আগে তাঁহাকেই খবর দিবার কথা সকলের মনঃপূত হইল। এবং ইহাও তৎপরে স্থির হইল যে, গ্রামের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বি-এ-ফেল সুবীর পালিতকে নেতা করিয়া তিন দিন পরে জমিদার ভূপাল চৌধুরীর কাছে এক ডেপুটেশন পাঠান হইবে।

তারপর যেমন বৃক্ষের একটি কাণ্ড হইতে বিভিন্ন দিকে অনেকগুলি শাখা বাহির হয়, তেমনি ঐ চুরি-রূপ ঘটনা-কাণ্ড হইতে অনেকগুলি ঘটনা-শাখা বাহির হইল। সবগুলিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা মাত্র দুইটি শাখার বিবরণ দিব।

প্রথমটি—আমাদের পুরাতন বন্ধু চৌকীদার তিনকড়ি কৈবর্ত্তকে লইয়া।

পুলিসের চৌকীদার। চাকরীর যুপকাষ্ঠে মনুষ্যত্বকেও বলি দিতে তার বাধে না। ছোট ভাই পাচকড়িকে পৃথক করিয়া দিয়াও তাহার মানসিক শান্তির মাত্রা বোধহয় পূর্ণ হয় নাই। কনিষ্ঠকে জেলে পুরিতে না পারিলে তাহা বোধহয় পূর্ণ হইবে না।

এইবার ভগবান যেন মুখ তুলিয়াছেন। এই গহনা-চুরির ব্যাপারে যদি একবার পাচকড়িকে জড়ান যায় ত' তার শ্রীঘর-বাস অনিবার্য্য। মনে মনে এইরূপ ফন্দী আঁটিয়া সে পীতাম্বর ঘোষালের কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করিয়া দিল।

চুরির পর দিনই সে ঘোষালের কাছে হাজির। হাজার হোক্ তিনকড়ি জাতিতে কৈবর্ত্ত। ঘোষালের মত ভণিতা করিতে ত' সে আর শেখে নাই। তাই ফট্ করিয়া সে ঘোষালের কাছে বলিয়া ফেলিল,—আমি বলি কি ঠাকুর মশায়—আমাদের পাচকড়েটাও এর ভেতর আছে। আপনি যদি সাক্ষী দেন……

ধূর্ত্ত ও হৃদয়হীন হইলেও পীতাম্বর ঘোষাল তিনকড়ির কথায় চমকাইয়া উঠিলেন। তিনি খানিকক্ষণ তিনকড়ির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—পরে বলিলেন,—হ্যাঁ রে, পাঁচকড়ে না তোর মায়ের পেটের ভাই?

তিনকড়ির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তবু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, না, না, বল্‌ছিলুম কি, ভট্‌চায্‌ মশায় আর পাঁচকড়ে ফুস্‌ফাস্‌ গুজ্‌গাজ্‌ করে—বুয়েছেন কি না—এই…এই…

কিন্তু পীতাম্বর ঘোষাল এ সব বিষয়ে বড় কড়া লোক ধমক দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—না, না, ও-সব মতলব ছেড়ে দাও, তিনকড়ি। মায়ের পেটের ভাই—অন্য কেউ নয়।

তিনকড়ি মনে মনে ঘোষালকে শাসাইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এই গেল প্রথম, দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ।

পলাশ-ডাঙ্গার অজিত নূতন বিবাহ করিয়াছে। নব-পরিণীতাকে লইয়া কিছুদিনের জন্য সে এই পলাশ-ডাঙ্গাতেই উঠিয়াছে। তার নানা কাজের মধ্যে প্রধান দুইটি হইতেছে—টো টো করিয়া ঘোরা এবং কারণে-অকারণে সুধারাণীর সঙ্গে ঝগড়া করা। সুধারাণী কিন্তু শান্ত-শিষ্ট মেয়ে। স্বামীর দুষ্টামি সে বুঝিতে পারে। সে বেশ জানে যে, স্বামীর এই গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকে রাগাইয়া মজা দেখা। সে তাই বড় একটা ও-সব গায়ে মাখে না। স্বামীর নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-বাণগুলি তাই তার তাচ্ছিল্য-বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া বারে বারেই ফিরিয়া আসে। সেদিনও নিছক ঝগড়া করার উদ্দেশ্য লইয়াই অজিত সুধারাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—শুনছ সুধা লোকে তোমার নামে যা-তা বলছে।

সুধা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল: লোকটি কে আমি জানি মশায়…

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল: দেখ সুধা, তোমার সবতাতেই ইয়ারকি আমার ভাল লাগে না। লোকে কি বলছে না শুনেই—

সুধাও মুখ গম্ভীর করিয়া সমান ওজনে জবাব দিল: তোমার সঙ্গে বাসি মুখে ঝগড়া করতে আমারও ভাল লাগে না—যাও।

সুধা চলিয়া যাইতেছিল। সুধাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া অজিত যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল: আর লোকেই কি মিথ্যা বলে না কি! অলক্ষ্মী, অপয়া না হলে কি আর গাঁয়ে পা দিতে না দিতেই এত বড় চুরিটা হয়—

সুধার আর চলিয়া যাওয়া হইল না। ঘরের মাঝখানে আসিয়া অনলবর্ষী নেত্র লইয়া সে এক মনোরম ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বলিল: তুমি কি বলতে চাও একবার শুনি…

অজিত কোনরকমে হাসি চাপিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। সুধারাণীর রাগও তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল।

এই গেল দ্বিতীয় ঘটনা।

আমি এইবার পলাশ-ডাঙ্গার উপর যবনিকা ফেলিলাম এবং যেখানে যবনিকা তুলিলাম, সে হইতেছে ভূপাল চৌধুরীর সোনামাটীস্থিত বাংলোর ছাতা। একটি অষ্টাদশী এই ছাতায় পায়-চারি করিতে করিতে প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতেছে এবং আমার সেই পূর্ব্বোক্ত ডেপুটেশনটি বাংলারে সামনে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে, কিন্তু কেহ আর ভিতরে ঢুকিতে সাহস পাইতেছে না।

এই ডেপুটেশনের ভিতর জানা-শোনা সকলেই। বি-এ ফেল সুধীর পালিত আছেন ইহাদের মধ্যে নেতারূপে, আর আছেন পীতাম্বর ঘোষাল, সুধীর পালিত, গয়ারাম পাল আর কৈলাস বাঁড়ুয্যে। বাঁড়ুয্যে মশায় আসিতে চাহেন নাই। কিন্তু হরিশ ভট্‌চায্‌ হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিয়াছিল: ওরা সব আমার নামে লাগান-বাজান করতে চলল দাদা, তুমি আমায় বাঁচিও। হরিশ ভট্‌চাযের হইয়াই কৈলাস বাঁড়ুয্যে সোনামাটী আসিবার ক্লেশ বরণ করিয়াছেন, তা না হইলে এই সব অকালপক্কদের সঙ্গ বর্জ্জন করিতেই তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাহিরে জটলা শুনিয়া অষ্টাদশীটি ফটকের কাছে আসিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিল: কাকে চান আপ-নারা?

বীর-পুরুষদের মুখ হইতে আর বাণী নিঃসরণ হয় না। ব্যাপার দেখিয়া অষ্টাদশীটি হাসিয়া উঠিলেন। অনেক চেষ্টার পর সুধীর পালিত বলিতে পারিলেন—আমরা

…আজ্ঞে আমরা জমিদার চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তা ভিতরে আসুন না—বলিয়া অষ্টাদশী আগাইয়া চলিলেন। ভূপাল চৌধুরী তখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া সংবাদপত্র পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। এতগুলি লোক দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন: কাকে চান আপনারা?

কিন্তু ইহারা প্রশ্নের উত্তর দিবে কি, নিজেরাই গোল-মাল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পীতাম্বর ঘোষাল সুবীরকে ঠেলা দিয়া বলিলেন: বল না হে ছোক্‌রা। সুবীর একবার ঘোষালের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল: আপনিই বলুন না মশায়।

ব্যাপার দেখিয়া অষ্টাদশীটি হাসিয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু পিতৃসকাশে কোনরূপে সে তাহা সংবরণ করিল। নেতা সুবীর বার দুই "স্যার", "স্যার" করিয়া থামিয়া গেল। ভূপাল চৌধুরী সৌম্য হাসি হাসিয়া বলিলেন: আমি তোমার পিতৃতুল্য বাপু—অত সম্ভ্রম-মান্য করে কথা কইতে হবে না—

কৈলাস বাঁড়ুয্যে তখন চুরির বৃত্তান্ত সব খুলিয়া বলিলেন। পীতাম্বর ঘোষাল শেষকালে একটু যোগান দিয়া বলিলেন: চাবির ভেতর থেকে চুরি হয়ে গেল হুজুর সেটা ভেবে দেখবেন, চাবিটা আবার থাকে পুরুত মশায়ের কাছে। বিদ্বান সুবীর বলিলেন, তাঁর আবার অদ্ভভক্ষধনুর্গুণ গোছ অবস্থা।

প্রৌঢ় ভূপাল চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক্‌। খানিক পরে তিনি আপন মনেই হাসিয়া উঠিলেন। পীতাম্বর মনে মনে বলিলেন: পাগল না কি! কিন্তু ভূপাল চৌধুরী যে পাগল নন বরং ঠিক তার বিপরীত, তাহা বুঝিতে ঘোষাল মশায়ের বিলম্ব হইল না। কারণ পরমুহূর্ত্তেই চৌধুরী মশায় বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: আপ-নারা কি ভট্‌চায মশায়ের নামে নালিশ করতে এসেছেন না কি? এবং অকস্মাৎ কণ্ঠের সুর বদলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন: ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি মশায়—

পরে কন্যা মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন: ব্যাঙ্কের খাতা আর সেই চিঠিটা নিয়ে এস ত' মা। কন্যা পিতার আদেশ পালন করিতে কক্ষান্তরে গেল ও মিনিট দুয়ের ভিতর পিতৃ-প্রার্থিত দ্রব্য দুইটি আনিয়া দিল। বিস্ময়ের প্রবাহ কিন্তু ততক্ষণে পলাশ-ডাঙ্গার প্রতিনিধিবর্গকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে। কন্যার হাত হইতে চিঠি লইয়া চৌধুরী মশায় কৈলাস বাঁড়ুয্যের হাতে দিলেন।

চিঠির বক্তব্য বিষয়টি বড় সাংঘাতিক। যাহারা এই চিঠি লিখিয়াছে, তাহারা আর যাহা হউক, খুব শান্তিপ্রিয় ও সজ্জন ব্যক্তি নয়, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। চিঠিটি লিখিয়াছে যাহারা, তাহারা সর্ব্ব সাধারণের নিকট 'দীন্‌ আগুরির দল' নামে পরিচিত এবং তাহাদের বক্তব্য বিষয় হইতেছে সংক্ষেপে এইরূপ—সর্ব্বমঙ্গলার অঙ্গে যে অলঙ্কার আছে, তাহা কাহারও কাজে আসিতেছে না। বর্ত্তমানে অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দরুণ তাহাদের দলের কিন্তু বড় অসুবিধা হইতেছে। সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ তাহারা আগামী অমাবস্যার দিনে অভিযান করিবে। জ্ঞাতার্থে জমিদার চৌধুরী মশায়কে ইহাই তাহাদের নিবেদন। ব্যাঙ্কের খাতায় দেখা গেল সর্ব্বমঙ্গলার প্রধান এবং অদ্বিতীয় সেবাইৎ রূপে জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপাল চৌধুরীর নামে দেবীর যাবতীয় গহনা জমা করা হইয়াছে।

এতক্ষণ পলাশ-ডাঙ্গার প্রতিনিধিবর্গ যেন বিস্ময়-সাগরে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছিলেন। এই-বার যেন তাঁহাদের সাম্‌নে কতকগুলি লাইফ্‌ বেল্ট ফেলিয়া দেওয়া হইল।

চৌধুরী মশায় ততক্ষণে ইজিচেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন: কিন্তু যাই বলুন মশায়, এসব আমার নিজের বুদ্ধি নয়, সবটি আমার মাধু'মার কাছ থেকে ধার-করা।

মাধুরী বোধ হয় লজ্জা পাইল। দেখা গেল, সে নতমুখে দাঁড়াইয়া পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে ভূমিতে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট বস্তু আঁকিতেছে।

চৌধুরী মশায় বলিয়া চলিলেন: ওই ত' আমাকে বুদ্ধি দিলে মশায়। মা-টি আমার বললে কি জানেন যে, বাবা পুলিশে খবর দিলে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবেই। তার

…য়ে গোপনে গয়নাগুলো সরিয়ে ফেলে ব্যাঙ্কে জমা দিলে …না? তাইতেই না আমি যে দিন চিঠি পাই, সেই দিন …ত্রেই আপনাদের গাঁয়ে গিয়ে গয়নাগুলো খুলে এনে …লাম। মাধু আবার ভোজপুরীটাকে লণ্ঠন দিয়ে সঙ্গে …য়েছিল, তাইতেই না একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে গয়না নিয়ে এলাম। আর আপনাদের গাঁ তখন একেবারে নিঝুম …শায়, কাউকে যে জানিয়ে আসব তার উপায় নেই। আর …ত্যি কথা বল্‌তে কি, কাউকে জানিয়ে আস্‌তে ইচ্ছেও …ল না। কারণ ব্যাপারটা তা হলে জানাজানি হয়ে পড়ত কি না—ঠিক্ কি না আপনারাই বলুন মশায়…

চৌধুরী মশায় বক্তব্য যখন শেষ করিলেন, তখন দেখা গেল, কৈলাস বাঁড়ুয্যে মূক স্নেহ-দৃষ্টির দ্বারা নতমুখী মাধবীর শিরে বক্ষের সমস্ত আশীর্ব্বাদ উজাড় করিয়া দিতেছেন।

সুবীর পালিত তখন অনেক চিন্তার পর সদ্য আবিষ্কার করিয়াছে, মাধবীর সহিত শাইলকের কবল হইতে যে মহিমময়ী নারী উদার বণিককে উদ্ধার করিয়াছিল—তাহার সাদৃশ্য -

সে ওষ্ঠ দুটি একত্র করিয়া বলিতে যাইতেছিল : ইস্ যেন পোর্শিয়া। কিন্তু কৈলাস বাঁড়ুয্যের চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষু মিলিতেই সে থামিয়া গেল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের চক্ষুতে নিষেধ যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ভট্টচায্ মশায় হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি নিঃশেষ করিয়া দেবী সর্ব্ব-মঙ্গলার আরতি করিতেছিলেন। কন্যা সর্ব্বাণী দেখিল—পিতার হস্তস্থিত পঞ্চ-প্রদীপের আলো দেবীর শ্রীমুখে পড়িতেই এক অতীব স্নিগ্ধ, স্বর্গীয় হাসি তাহা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।



দুই দিক্

পর্ত্তুগালের রাজকুমার হেনরী

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ইতিহাস আলোচনা-কালে এমন অনেক লোকের সন্ধান পাই, যাঁহাদের জাতির জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথবা যাঁহাদের প্রভাব কেবল মাত্র প্রাদেশিক বা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আরও অনেক মানুষ দেখি, যাঁহারা এই সুখদুঃখ-বিমণ্ডিত জীবনে সামান্য লোকের মতই জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিয়া অনুপম লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মত মানুষ বলিয়া তাঁহারা আমাদের একান্ত প্রিয়। মধ্যে মধ্যে এমন লোকেরও দর্শন পাই, যাঁহাদের আগমনে ইতিহাস ভিন্নপথ-গামী হইয়াছে, যাঁহাদের আবির্ভাব না ঘটিলে এই জীবন, এই সমাজ, এই সভ্যতা কি রূপ ধারণ করিত, তাহা সমস্যার বিষয়।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যদি গৌরবের বিষয় হয়, তাহাদের এই দেশদেশান্তরে প্রভুত্ব-বিস্তার, দুর্গম, অনাবিষ্কৃত প্রদেশে রাজত্ব-স্থাপনা যদি সভ্যতার বিকাশের লক্ষণ হয়, পৃথিবীর সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভৌগোলিক জ্ঞান যদি কাম্য হয়, তবে যে-ব্যক্তি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মধ্যযুগের জগৎ সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা জ্ঞানকে বিজ্ঞানপন্থী করিয়া নবদেশ আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম তাহাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রাজকুমার হেন্‌রীকে তাঁহার দেশবাসী পর্ত্তুগীজরা যে সম্মান করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

বাস্তবিক অনাচারী পর্ত্তুগীজ রাজকুলে রাজকুমার হেন্‌রীর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, আমরণ-ব্রহ্মচারী রাজপুত্র দুর্লভ। তাঁহার বিশাল দেহে ছিল অপরিসীম শক্তি এবং স্বভাবত সুপুরুষ হইলেও নিরন্তর অধ্যয়ন এবং শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাকে কৃশকায় দেখাইত। রাগান্বিত অবস্থায় তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলে অতি সাহসীর মনেও ভয়ের সঞ্চার হইত। তাঞ্জিয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রুসৈন্য পরিবৃত হইয়া তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। মহৎ কার্য্যে তাঁহার ছিল অদম্য উৎসাহ। তাই বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাগ্রেসের (Sagres) মানমন্দিরেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। নূতন দেশ আবিষ্কার, তাঁহার সমসাময়িক মুসলমানদের গর্ব্ব খর্ব্ব এবং অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন লোকদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মের আলোকদানে উদ্ধার করা, ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প।

হেন্‌রী ছিলেন পর্ত্তুগালের রাজা জন অব এভিজের [A v i z (১৩৮৫-১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ)] পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন ইংরাজ জন অব গণ্ট-এর (Gaunt) কন্যা ফিলিপা। জন দি গ্রেটের রাজত্ব-কালেই পর্ত্তুগাল অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন হইতে কিছু পরিমাণে মুক্তি পায় এবং তাহার জাতীয়তা আরও সুদৃঢ় হয়। মূররা পর্ত্তুগাল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল সলাডোর (Salado) যুদ্ধক্ষেত্রে ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে, লিসবন অধিকারের প্রায় দুইশত বৎসর পরে। মূরদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াও পর্ত্তুগালের নিস্তার ছিল না, গৃহশত্রু স্পেন সর্ব্বদাই তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত; পর্ত্তুগীজ রাজপরিবারের সহিত স্পেনের বৈবাহিক সম্বন্ধ ধরিয়া সময় বুঝিয়া তাহারা এই রাজত্ব-গ্রাসের চেষ্টার ত্রুটি করে নাই এবং অবশেষে সফলও হইয়াছিল। জন এমনই এক বিপদের কালে কইম্‌ব্রার নাগরিক সমিতি দ্বারা রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া এলজুবারোটার (Aljubarrota) যুদ্ধক্ষেত্রে স্পেনের বাহিনীকে পরাজিত করিয়া পর্ত্তুগালকে রক্ষা করেন।

জন তাঁহার পাঁচজন পুত্রকে ব্যবসায়ীর পুত্রের মতই মানুষ করেন। জ্যেষ্ঠ এডওয়ার্ড, যিনি পরে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, হইলেন আইনজ্ঞ, পেড্রো রাজনীতিজ্ঞ, হেন্‌রী বৈজ্ঞানিক এবং ফার্ডিনাণ্ড ধর্ম্মপ্রচারক।

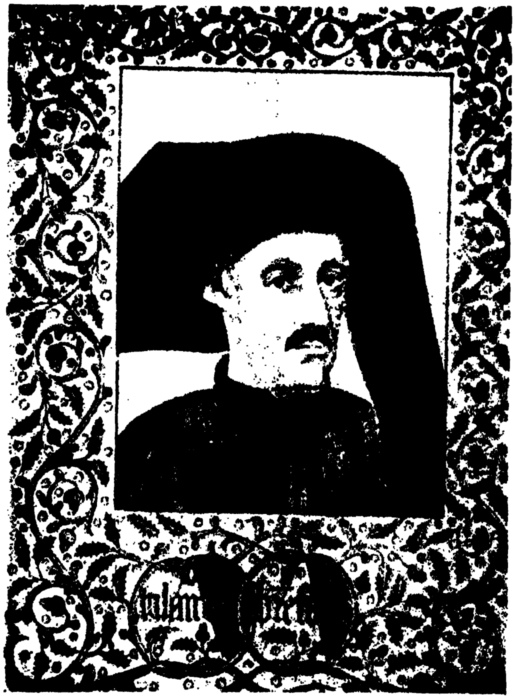
মূরদের বিরুদ্ধে হেন্‌রীর অভিযানের সূত্রপাত হয়, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে কিউটা নগরী অধিকার করিয়া। ভূমধ্যসাগরের দ্বারদেশে জিব্রাল্টারের ন্যায় এই দুর্গটি যেন দ্বাররক্ষী; ইহা মূরদের অধিকারে থাকায় পর্ত্তুগীজ রাজত্ব-বিস্তারের পথে একটি কণ্টকস্বরূপ ছিল।

কিউটা অধিকার এবং তাহার রক্ষার জন্য (১৪১৮) অভিযানের পর হইতে হেন্‌রী সাগ্রেসে (Sagres, বর্ত্তমান কেপ ভিন্‌সেণ্ট) প্রাসাদ, গীর্জ্জা, পাঠাগার এবং মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সাধনায় রত হইলেন।

অতলান্তিক মহাসাগরের ক্রোড়ে, ইউরোপের এক প্রান্তে মরুময়, অনন্ত-বিস্তার আফ্রিকার উপরে এই ক্ষুদ্র অন্তরীপটি যেন তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল স্থান। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে যে-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সাগ্রেস তাহার সর্ব্বশেষ সীমানা—যাহার পর আর কিছুই নাই, কেবল জল—লবণাক্ত সাগর। আজোর্স-এর অস্তিত্ব কেহ কেহ জানিলেও আদিম ইজিপ্‌সিয়ান, গ্রীক্ ও রোমান সভ্যতা সেখানে প্রবেশ করে নাই, অতি সাহসী ফিনীসিয়ান নাবিকেরা তাহার সন্ধান হয়ত বা জানিলেও সেখানে উপনিবেশ-স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। আরব সভ্যতা কেবল আফ্রিকা, স্পেন ও পর্ত্তুগাল লইয়া ব্যস্ত থাকে। আজোর্স অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে যে-মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হেন্‌রীর সাধনারই ফল।

সভ্যতার উত্থান-পতনের লিখিত ইতিহাসে দেখা যায়, এক সভ্যতার বহু সাধনালব্ধ জ্ঞান তাহার পতনের সহিত অন্তর্হিত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে বহু পরিশ্রমেও হয়ত তাহার আংশিক পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে ক্রীট দ্বীপে ও গ্রীসে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, রোম তাহার খণ্ডাংশের মাত্র অধিকারী হয় এবং পরবর্ত্তী কালে রোমক সভ্যতার পতনের সহিত তাহার জ্ঞানভাণ্ডার দুর্লভ মণিমাণিক্যের মতই কোথায় অন্তর্হিত হয়। তাহারই নাম মাত্র অধিকারী—মুসলমানদের (মূরদের) নিকট হইতে মধ্যযুগের ইউরোপের আবার সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় লইতে হয়।

মধ্যযুগের খৃষ্টান ইউরোপ যখন জড়তা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, তখনও তাহার দ্বারে বিধর্ম্মী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। তখন হইতে বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে ক্রুজেড অভিযানের সূত্রপাত হইল। পর্ত্তুগাল সেই যুগে মূরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া অবশেষে মূরদের আফ্রিকায় বিতাড়িত করে। এই নবজাগ্রত জাতি আফ্রিকায় মূরের প্রাধান্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। তাহা ব্যতীত অন্য কারণও ছিল, ক্রুজেডের সময় হইতে এসিয়া এবং ইউরোপের বাণিজ্যগত সম্বন্ধ আরও দৃঢ় হয়। "ইণ্ডিজ" একদিন প্রাচীন রোমের অজস্র অর্থ, প্রসাধন ও বিলাস-ব্যসন দ্রব্যের বিনিময়ে লইয়া যাইত, ইউরোপের সহিত ভারতের সে বাণিজ্যের উত্তরাধিকারী তখন মুসলমানরা। তাহাদের দর্প-খর্ব্ব করিতে হইলে এই বাণিজ্যের অধিকারী হইতে হইবে। নূতন অধিকৃত জনবিরল প্রদেশে কৃষির জন্য ক্রীত-দাস প্রয়োজন, তাহার জন্যও মূরদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ আফ্রিকায় তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ। তদুপরি মূরদের অধিকৃত মরক্কোর পরে সাহারা-মরু পার হইলে স্বর্ণভূমির সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং পশ্চিম নীলনদীর সন্ধান মিলিবে। এই নদী অনুসরণ করিয়া আফ্রিকার অপর প্রান্তে গমন করা সম্ভব। তাহা হইলেই



প্রভাতকালীন বেশধারী হেনরী : সুবৃহৎ শিরস্ত্রাণ বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুসলমানদের বাণিজ্য হস্তগত করা অতি সহজ হইবে। এইরূপে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনাও সম্ভব হইবে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া (১৪১২-৬০) হেন্‌রী সাগ্রেসে বসিয়া এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় পূর্ণমনস্কাম হন।

অদূরস্থ লোগস (Logos) বন্দরে তাঁহার তরীগুলি নির্ম্মিত হইত এবং ভিনিসীয় কাডামোসটোর (Cadamosto) মতে তৎকালে পর্ত্তুগীজ জাহাজগুলি ছিল অতুলনীয়।

১৪২০ সনের মধ্যেই প্রাপ্ত ক্যানারী, মাদেরা, পর্টো সান্টো নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইল এবং হেন্‌রী সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন।

১৪২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা ডন পেড্রো বিদেশ হইতে নানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, মানচিত্র আনিয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করেন। তাঁহার প্রদত্ত একটি ভিনিসীয় মানচিত্র হেন্‌রীকে বিশেষ ভাবে পশ্চিমে আজোর্স এবং দক্ষিণে গিনি প্রদেশের সন্ধানে অভিযান প্রেরণে উৎসাহিত করে।

তাঁহার অনুচর গঞ্জালো কাবরাল (Gonzalo Cabral) ফরমিঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ, এণ্ট দ্বীপ, সান্টা মেরিয়া ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কার করিল। কিন্তু তখনও আজোর্সের সন্ধান পাইল না। হেন্‌রী পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেও তাঁহার কোন অনুচরই বোজাদোর (Bojador) অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করিল না।

ইহার কারণও ছিল। এখানে তীরভূমি সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, লোকে বলিত প্রায় একশত মাইল, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রায় কুড়ি মাইল ব্যাপিয়া অগভীর সমুদ্রতটে ভীষণ বেগে জলস্রোত বহিত বলিয়া প্রবাদ ছিল, কাজেই তীর অনুসরণ করিয়া যাত্রা সেখানে অসম্ভব। তটভূমি পরিত্যাগ করিয়া অতলান্তিক সাগরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে তাহাদের সাহস হইত না—বিশেষ করিয়া বোজাদোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বহুকাল ধরিয়া এই অন্তরীপই ছিল খৃষ্টান-পরিচিত জগতের শেষ দক্ষিণ সীমানা। অধিকাংশ নাবিকদের বিশ্বাস ছিল কোন খৃষ্টান বোজাদোর পার হইলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকায় হইবে এবং তাহার উদ্ধত ঔৎসুক্যের এই শাস্তি আজন্ম বহন করিতে হইবে। আরবের ভৌগোলিক শাস্ত্রবিদেরা বলিতেন, ইহার পর না কি আফ্রিকার অন্ধকার সবুজ সমুদ্রে সমুদ্রবাসী দৈত্য, পর্ব্বতপ্রমাণ জলসর্প, শৃঙ্গী জলঘোটক, নিত্য বিহার করিত। তাঁহাদের রচিত মানচিত্রে যে কেবল এই সকল ভয়াবহ জীবের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায় তাহা নয়, সেই মানচিত্রে সমুদ্রের উপর শয়তানের বিরাট হস্ত প্রসারিত, যেন তাহার রাজত্বে অনধিকার প্রবেশ করিলে শাস্তি দিবে। শুধু জলপথ নয়, স্থলপথ সম্বন্ধেও ইহাঁরা অদ্ভুত উপকথা ও ও রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত করিয়াছিলেন। আফ্রিকার উত্তর ভাগই না কি মানবের বাসোপযোগী। দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার মরুপ্রদেশে সূর্য্যদেব গলিত অগ্নিশিখা নিত্য ঢালিয়া দেন এবং নদনদীগুলি অহোরাত্র উত্তপ্ত বাষ্প উদ্গীরণ করে। কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করিলেই জীবন্তে দগ্ধ হইতে হইবে। আরবীয়দের এই রচনা ইউরোপীয় নাবিকেরা বিশ্বাস করিত। রাজকুমার হেন্‌রীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে ইহাই ছিল সর্ব্বপ্রধান বাধা। অন্ধ-বিশ্বাস-পরিপূর্ণ পর্ত্তুগীজ নাবিকেরা সুদূর আজোর্সের সন্ধানে যাইতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া উপকূলস্থিত এই অন্তরীপ অতিক্রম করিতে তাহাদের কাহারও সাহস হয় নাই।

১৪৩৩ সালে তাঁহার অনুচর জিল ইয়ান্‌নেস (Gil Eannes) ক্যানারী হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে আবার পাঠাইবার সময় বলিলেন—দক্ষিণবায়ু এবং বিপরীত জলস্রোত যদি তোমাদের পথ রোধ করে করুক, কিন্তু তোমরা ক্যানারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া এরূপ কথা আমায় আর বলিবে না; আবার যাও, এসব সামান্য বাধা গণ্য করিও না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অধ্যবসায়ী হইলে এই অভিযান হইতে নিশ্চয় তোমরা সম্মান এবং অর্থ লাভ করিবে।

সত্য সত্যই এবার ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ইয়ান্‌নেস নির্ব্বিঘ্নে ও অক্লেশে বোজাদোর অতিক্রম করিল। এতদিনে হেন্‌রীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সুগম হইল।

তাহার পর ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে বোজাদোর অতিক্রম করিয়া ৩৯০ মাইল দূরে রিয়ো ডিয়োরো প্রদেশ আবিষ্কৃত হইল। জাহাজস্থ দুইজন বালক তটভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে অবতীর্ণ হইয়া কতকগুলি সশস্ত্র অসভ্যের সন্ধান পায়।

এ পর্য্যন্ত হেন্‌রীর আবিষ্কারসমূহ পুরাতন মানচিত্রে বর্ণিত স্থানগুলিতে মাত্রে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু বোজাদোর অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পর হইতে এই ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই রহিল না। ইহার পর হইতে তাঁহার সকল আবিষ্কারকেই বিশেষভাবে তাঁহারই আবিষ্কার বলা চলে। কেবল নবদেশ আবিষ্কার নয়, এইরূপে তিনি মুর রাজত্বের পশ্চাতে অমুসলমান রাজত্বে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইলেন। এই সকল রাজত্বের পশ্চিম ও দক্ষিণে হেন্‌রীর নৌ-বাহিনী ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

১৪৩৬ হইতে ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রী রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এদিকে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এডোয়ার্ড রাজা হন। এডোয়ার্ড হেন্‌রীর কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। রাজা হইবার অল্প কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার অন্য ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ডের প্ররোচনায় তিনি মুর-অধিকৃত তাঞ্জিয়ার নগরী অধিকার-মানসে অভিযান করেন। এই অভিযান বিফল হয় এবং কিউটা প্রত্যার্পণের অঙ্গীকার-সর্ত্তে সন্ধি করিয়া ফার্ডিনাণ্ডকে মুরদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন (১৪৩৭)। পর্ত্তুগাল কিউটা প্রত্যার্পণ করিতে অস্বীকৃত হাওয়ায় ফার্ডিনাণ্ড মুর-কারাগারে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্বে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দেই এডোয়ার্ড প্লেগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র রাজা পঞ্চম আলফনসোর (Alfonso) অভিভাবকরূপে কে রাজ্য পরিচালনা করিবে, তাহা লইয়া কিছু গোলযোগের পর ডন পেড্রো রাজ্য পরিচালনা করিবেন স্থির হয় (১৪৪০)। এইরূপে গৃহবিবাদের আশঙ্কা দূর হইলে হেন্‌রী আবার তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

১৪৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুচরেরা ব্লাঙ্কো অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া তৎপ্রদেশ হইতে সর্ব্বপ্রথম বন্দী লইয়া স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই সময়ে হেন্‌রীর ভ্রাতা পেড্রো সনন্দ দিলেন, রাজার প্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ লভ্য হেন্‌রী পাইবেন এবং নূতন আবিষ্কৃত প্রদেশে গমন করিতে হইলে হেন্‌রীর অনুজ্ঞা প্রয়োজন হইবে। এতদিন ধরিয়া হেন্‌রী নিজে এই সকল অভিযানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সনন্দের পরে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়।

পরবর্ত্তী অভিযানে স্বর্ণের সন্ধান মিলিল এবং তাহার পর হইতে নব দেশ আবিষ্কারের সম্বন্ধে দেশবাসীর ঔৎসুক্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইল। প্রায় ৭০০ বৎসর ধরিয়া মুসলমানেরা সাহারার প্রান্ত-প্রদেশ হইতে আনীত মসলা, স্বর্ণ-রেণু এবং দাস-ব্যবসায়ে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। এতদিন পরে সাহারা-পথের এই বাণিজ্যে অংশীদার রূপে পর্ত্তুগীজরা দেখা দিল।

ক্রমে আরও ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী আরগুইনে (Arguin) বন্দী করিবার মত অসংখ্য কৃষ্ণকায় অসভ্য লোকের সন্ধান পাওয়া গেল। আরগুইন হইতে সাহারার বিস্তৃত মরুভূমি শেষবার দক্ষিণে সেনাগল ও গাম্বিয়ার শ্যামলতটের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। এখানে হেন্‌রী ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; দশ বৎসর পরে কাডামোস্‌টো (Cadamosto) দেখেন, আরগুইন এক বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত



মধ্যযুগের পর্ত্তুগীজ চিত্র-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন: পর্ত্তুগাল যখন জগতের মধ্যে একটি বৃহৎ শক্তি ছিল, পর্ত্তুগালের সেই সময়ের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি এই চিত্রখানিতে পাওয়া যায়। নতজানু পঞ্চম আলফনসো।

হইয়াছে। এখান হইতেই ইউরোপীয়দের বর্ত্তমান প্রথম উপনিবেশ-স্থাপনের সূত্রপাত এবং পরে স্বর্ণ ও দাসের সন্ধানে ইউরোপীয়েরা যে আফ্রিকাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লয়, এই স্থান হইতেই সে লালসারও জন্ম।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সুগঠিত দেহকে দাসত্বে নিয়োগ করিয়া স্বদেশের জনবিরল প্রদেশগুলিতে চাষ-আবাদ করিবার লোভ হেন্‌রীর ছিল না। তিনি চাহিতেন

আফ্রিকানদের কুসংস্কার-পীড়িত চিত্তকে আত্মার সন্ধান দিতে, এবং সত্য-জ্ঞানের সন্ধান দিয়া তাহাদের মুক্তির পথ বলিয়া দিতে। কিন্তু তথাপি ক্রমে ক্রমে দাসত্ব-প্রথা পর্ত্তুগালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং আফ্রিকার দুঃখের দিন সুরু হইল।

ইহার পর আবার আবিষ্কারের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এতদিন ছিল কুসংস্কার একমাত্র বাধা, এখন হইতে আসিল লোভ। স্বর্ণ ও দাসের সন্ধান পাইয়া লোকে কেবলমাত্র আবিষ্কার করিবার স্পৃহা হারাইল। কয়েক বৎসর পরে ডিনিজ ডিয়াজ (Diniz Diaz) প্রকৃত নিগ্রোদের দেশে প্রবেশ করিয়া সেনিগল নদীর সন্ধান পাইলেন। সকলের মনে হইল ইহাই নিগার নদী, নিগ্রোদের বর্ণিত পশ্চিম নীল এবং ইজিপ্ট অতি নিকটেই। কারণ তখনকার ধারণা ছিল নিগার এবং নীল একই স্থান হইতে প্রবাহিত এবং নিগার নদীতে উজান বাহিয়া পরে নীল নদী অবলম্বন করিয়া ইজিপ্টে যাওয়া সম্ভব। তিনি এই অভিযানে সেনিগল অতিক্রম করিয়া ভার্দ্রে অন্তরীপ পর্য্যন্ত গমন করেন।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য অভিযান হয় ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে। ব্লাঙ্কো অন্তরীপে ডি সিণ্টা নামে হেন্‌রীর এক অনুচর স্থানীয় অসভ্যদের বন্দী করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। লোগসের (Logos) অধিবাসীবৃন্দ এবং হেন্‌রীর অনুচরেরা প্রতিশোধ লইতে সর্ব্বসমেত ২৭টি জাহাজ মিলিয়া এক 'আর্ম্মাডা' (রণতরীবাহিনী) গঠন করিয়া ব্লাঙ্কো অভিমুখে যাত্রা করিল। বলা বাহুল্য, যথারীতি প্রতিশোধ লওয়া হইলে অধিকাংশ জাহাজগুলি বন্দী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে পশ্চিমে হেন্‌রীর নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া কাব্রাল (Cabral) ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে আজোর্স-এ উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে হেন্‌রীর জীবদ্দশাতেই উপনিবেশ স্থাপিত হইল। আরও পশ্চিমে মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতের সন্ধান লইবার কথা হেন্‌রী বা তাঁহার মতাবলম্বী কাহারও মনে তখনও উদিত হয় নাই। হইলে বোধ হয় কলম্বসকে পর্ত্তুগাল হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না এবং আমেরিকা আবিষ্কারের সৌভাগ্য তাঁহাদেরই হইতে।

পর্ত্তুগালের রাজনৈতিক গগন আবার ঘনঘটাচ্ছন্ন হওয়ায় হেন্‌রীর কার্য্যে আবার বাধা পড়িল। পূর্ণবয়স্ক রাজা আলফনসোর সহিত পেড্রোর বিবাদ উপস্থিত হইল এবং অবশেষে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৪৪৯)।

পরবর্ত্তীকালে ভিনিসীয় নাবিক কাডামোস্‌টো ও হেন্‌রীর অনুচর ডিয়াগো গোমেজের অভিযান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাডামোষ্টোর যাত্রা আরম্ভ হয় ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে। প্রথম অভিযানে ভাদ্রে অতিক্রম করিয়া মাত্র গাম্বিয়া নদীর মোহনা পর্য্যন্ত গমন করিলেও কাডামোষ্টো পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলি সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বরচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আজও পরম উপভোগ্য। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি ভাদ্রে দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং পরে গাম্বিয়া অতিক্রম করিয়া রিও গ্রাণ্ডে নদীর মোহনায় উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহার নাবিকদল ক্লান্ত ও রোগগ্রস্ত হওয়াতে তিনি লিস্‌বনে ফিরিতে বাধ্য হন।

হেন্‌রীর বিশ্বস্ত অনুচর ডিয়াগো গোমেজ এই সময়েই এক অভিযানে বাহির হইয়া গাম্বিয়া নদীমুখে নোমিমনসা (Nomimansa) নামক নিগ্রো রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই নিগ্রো রাজা খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কাডামোষ্টো ও গোমেজ যখন হেন্‌রীর পতাকা অধিকতর অজ্ঞাত দক্ষিণ প্রদেশে বহন করিয়া চলিতেছিলেন, তখন হেন্‌রী আবার স্বদেশে মুরদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীর নিকট কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনের পর হইতে মুসলমান ভীতি আবার বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমে তখন পর্ত্তুগালই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত ছিল, পর্ত্তুগীজ জাতির নিকট ধর্ম্মযুদ্ধ সর্ব্বদা প্রিয় বস্তু। এবং রাজা আলফনসো রাজ্যভার গ্রহণ করিবার কিছু পরে মরক্কোতে এক ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। প্রিন্স হেন্‌রী ভ্রাতুষ্পুত্রের এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করেন এবং আলকাজার অবরোধ ও দখল করিয়া আবার সাগ্রেসে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইবার সময় হইয়াছে। ফ্রা মৌরের বিরাট মানচিত্র, মুরানোর কন্‌ভেণ্টে তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর তখন সমাপ্ত-প্রায়। ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি বিস্তৃত এই বৃহৎ মানচিত্রে হেন্‌রীর আজীবন সাধনালব্ধ

ভৌগোলিক জ্ঞান সবিশেষ ভাবে অঙ্কিত হয়। ভূমধ্যসাগরের নিখুঁত পরিচয় থাকিলেও, ইহার উদ্দেশ্য ছিল হেন্‌রীর আফ্রিকা ও অতলান্তিক অঞ্চলের আবিষ্কারসমূহের পরিচয় দেওয়া

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহাই সর্ব্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মানচিত্র। হেন্‌রীর সময়েই আবিষ্কারের মধ্যযুগ শেষ হয় এবং বর্ত্তমান যুগের সূচনা তিনিই করিয়া যান।

১৪৬০ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি অসুস্থ হন এবং ১৩ই নভেম্বর সাগ্রেসেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর বাটাল্‌হা (Batalha) মঠে তাঁহার মাতাপিতা এবং অন্যান্য ভ্রাতার পার্শ্বে তাঁহার দেহও রক্ষিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ সৌভাগ্য-রবি সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, প্রিন্স হেন্‌রীর প্রচেষ্টার ইহা প্রত্যক্ষ ফল।

আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষের পথে সর্ব্বপ্রধান বাধা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টান সভ্যতা-প্রচারের সূত্রপাত, অসভ্যদের খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা এবং উপনিবেশ স্থাপন এই সকল বিষয়ে তিনিই ইউরোপের গুরু। কেবল মাত্র ইহা নয়, অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি যে বৈজ্ঞানিক রীতির প্রতিষ্ঠা করেন, কালক্রমে তাহারই বহুল প্রচারে পর্ত্তুগাল ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ কর্ত্তৃক অত্যাশ্চর্য্য অঞ্চলসমূহের আবিষ্কার সম্ভব হয়। কলম্বস প্রভৃতি আবিষ্কারকেরা হেন্‌রীর শিষ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

কিন্তু এইরূপে প্রাপ্ত অপরিমিত ক্ষমতা এবং অর্থ ক্ষুদ্র পর্ত্তুগালের মৃত্যুর কারণ হইল। দেশে এবং উপনিবেশে ক্রমে দাসত্ব প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং অবশেষে অপরিমিত ক্ষমতা এবং অজস্র অর্থ একদিন তাহার অন্তরকে রিক্ত-সর্ব্বস্ব করিয়া দিল। সেদিনের এই দৈন্যের কথা স্মরণ করিয়া এক পর্ত্তুগীজ কবি লিখিয়াছেন—

Justice of God,—thine equity divine
Is manifest to all with eyes that see,
In the long tragedy of my decline,
My glorious past!—It is because of thee
I suffer now and search my soul with tears.
My glories?—Deeds of infamy and shame
By robbers, murderers and buccaneers!...

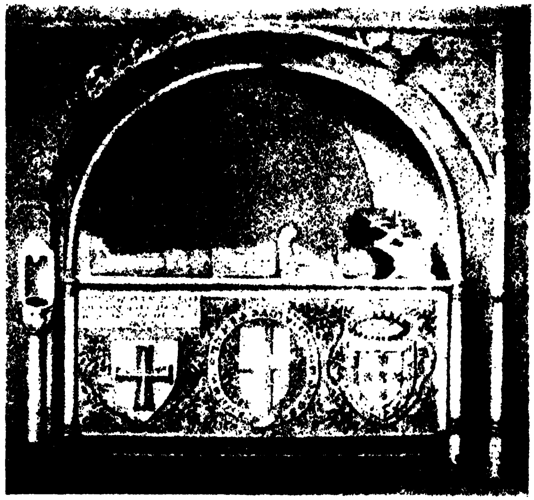
New worlds I sought, new spaces broad and long,
But not the more to worship and be wise,
A cruel greed hurried my feet along,
The pride of conquest made my sword-arm strong
And lit the light of madness in my eyes,
I shall not wash the blood I then did spill
With tears of twice ten thousand centuries,

অর্থাৎ,

ভগবানের বিচার—চক্ষুষ্মান মাত্রেই তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা প্রত্যক্ষ করিবে আমার অধঃপতনের অনন্ত দুঃখময় ইতিহাসে।

আমার গৌরবান্বিত অতীত?—তাহার জন্যই ত' আজ আমার এ বেদনা, এ অন্তর্দাহ।

আমার মহৎ কীর্ত্তি!—তাহা ত' কেবল তস্কর, হত্যাকারী এবং লুণ্ঠনকারী দস্যুদের ঘৃণিত কলঙ্ক-কাহিনী।



বাতাল্‌হা চার্চ্চে হেন্‌রীর কবরে রাজকুমার হেন্‌রীর এই শায়িত প্রতিমূর্ত্তিটি আছে।

* * * *

নূতন জগৎ, অনাবিষ্কৃত বিশাল বিস্তীর্ণ নবদেশ
আমি চাহিয়াছিলাম,
চাহি নাই দেবার্চ্চনায় অধিকতর মতি এবং জ্ঞান।
ক্রূর লোভ আমার চরণযুগলকে ক্ষিপ্রগামী করিয়াছিল,
বিজয়গৌরবমত্ত সবল হস্তে প্রহরণ ধারণ করিয়াছিলাম
এবং জয়োল্লাসে সেদিন নয়নে আমার মত্ততার আগুন
জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।
ধরণী সেদিন যে রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল
আমার লক্ষ শত বর্ষ অশ্রু-বিসর্জ্জনেও তাহা
ধৌত হইবে না।

বিচিত্র জগৎ

বাইবেল-প্রসিদ্ধ পেট্রা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পেট্রা সহর অতি প্রাচীন। ডেড্ সি ও আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী মরুময় ও পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে এই সহর অবস্থিত, বাইবেলের সময় থেকে এই সহর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সহরের প্রবেশ-পথ অতি দুর্গম ও সংকীর্ণ পাহাড়ের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে। পেট্রা সহরে বহু প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরগুলি পাহাড়ের গা কেটে তৈরী করা। বহু প্রাচীন কালের মন্দির এ সব, সংখ্যাও বড় কম নয়, এক হাজারের বেশী হবে। বেবিলোনীয়, মিসরীয়, গ্রীক্, রোমান্ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাস্কর্য্য-রীতি মন্দিরের গঠনে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাইবেলের যুগের পূর্ব্বে এখানে গুহাবাসী হোরাইট্ জাতি বাস করত। পেট্রার অদূরবর্ত্তী শৈলগাত্রে এদের অঙ্কিত চিত্রাবলী এখনও বর্ত্তমান আছে।

প্রাচীনকাল থেকে সার্থবাহদের উষ্ট্রবাহিনী এই পথে যাতায়াত করে। সমগ্র আরব উপদ্বীপই এই সার্থবাহ উষ্ট্রবাহিনীর পথ। এই পথে আফ্রিকা, আরব ও ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য নীল নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ, প্যালেষ্টাইন, ফিনিসিয়া, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ উপত্যকায় আসে। পেট্রা সহরে এসে এই সব পণ্যদ্রব্য জড় হয় ও এখান থেকে এগুলি বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়। এই বাণিজ্য-দ্রব্যের সুব্যবস্থার জন্য প্রাচীনকালে রোমানরা এখানে দুটি বড় দুর্গ তৈরী করেছিল।

কিন্তু তারপরে বহুকাল এ নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল। কেন, তার সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি।

বহু শত বৎসর কেটে গেল। কতকগুলি বর্ব্বর মরুবাসী জাতি এর গুহাগুলিতে বাস করত। তারা আশপাশের পাহাড়ের উপর মেষপাল চরাত। বেদুইন দস্যুদলে মিশে এরা মাঝে মাঝে সার্থবাহদের দ্রব্যাদি লুঠপাটও করত।

এই ভাবে কেটে গেল এক হাজার বছর।

১৮১২ সালে সুইস্ ভ্রমণকারী লুইস্ বুর্কহার্ট বেদুইন শেখের ছদ্মবেশে পেট্রা সহরে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে ফিরে সভ্য-জগতে এর নানা প্রাচীন মন্দির ও সমাধির বর্ণনা করেন।

বুকহার্টের পরে খুব কমসংখ্যক ভ্রমণকারী এখানে এসেছেন। এটা কি করে যে আরবীয়দের একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল, তার কোন কারণ ইতিহাসে জানা যায় না। আরবীয়েরা কোন বিধর্ম্মীদের এখানে প্রবেশ করতে দিতে চায় না, গুপ্তভাবে ঢুকলে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও।

এখনও যে কেউ পেট্রা সহরে বিনা উদ্দেশ্যে ঢুকতে পারে না—সশস্ত্র রক্ষীর দল না নিয়ে গেলে অনেক সময়ে বিপদের সম্ভাবনা। এখন অবিশ্যি সেখানে টুরিষ্টদের থাকবার জন্য ভাল ভাল হোটেল তৈরী হয়েছে—কিন্তু টুরিষ্টদের সাধারণ চলাচলের পথের অনেক বাহিরে বাইবেলোক্ত এই বিপদজ্জনক প্রাচীন নগরীটি অবস্থিত।

পেট্রা সহরে যাবার রেল-রাস্তা নেই, ভাল কোন মোটর-রোডও নেই। জেরুসালেম থেকে দুরূহ পার্ব্বত্য পথে একমাস উট কিংবা অশ্বতরের পিঠে গেলে তবে ওখানে পৌছান সম্ভব। পথে দুর্দ্দান্ত বেদুইন দস্যুর ভয়। ডামাস্কাস থেকে মক্কা পর্য্যন্ত রেলপথ তৈরী হয়ে এখন খানিকটা সুবিধা হয়েছে। এই রেলপথের শেষ প্রান্তের ষ্টেশনের নাম—মা'আন্। পয়সা খরচ করতে পারলে মা'আন্ থেকে এরোপ্লেনেও পেট্রা যাওয়া যায়।

মা'আন্ থেকে পেট্রা পর্য্যন্ত ভাল মোটর-রোড তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছিল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে। কিন্তু বেদুইনেরা এতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে রাস্তা তৈরী করবার

সাজ-সরঞ্জাম নষ্ট করে ফেলে। এ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয়, উভয় পক্ষে বিস্তর লোক মারাও পড়ে। অবশেষে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অর্থবলে ও অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমিত হয় এবং বেদুইন শেখদের সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়।

তবুও সন্ধির একটা প্রধান সর্ত্ত এই হয় যে, মা'আন্ থেকে পেট্রা পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী মোটর রোড তৈরী হতে পারবে না বা কোন ব্রিটিশ কোম্পানী ব্যবসা হিসাবে এ পথে মোটর চালাতে পারবে না।

জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারী সম্প্রতি এই প্রাচীন নগরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"আমরা জেরুসালেম থেকে মোটরে মা'আন্ এলাম।

যে পথেই যে আসুক, এ ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরবহুল গ্রামে তাকে আসতেই হবে। গ্রামখানির চারিপাশে বাগান ও তরকারীর ক্ষেত, মাটীর পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। বাগানে তাল ও মিষ্ট ডুমুরের গাছ। গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানের বাইরে ধূ ধূ বালুময় মরুভূমি সুদূর দিগ্‌বলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে একটা ইংরাজি স্কুল আছে এবং অনেক ভ্রমণকারী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে, গ্রামের ছেলেরা বেশ ইংরাজি বলতে ও বুঝতে পারে।

মা'আন্ থেকে মোটরে এল্‌জি এসে দুদিন অপেক্ষা করতে হ'ল। আর মোটরের রাস্তা নেই। ঐখান থেকে বেদুইন কুলি ও অশ্বতর ভাড়া করে যাত্রা করতে হবে। আমাদের আসবার খবর টেলিফোন-যোগে পূর্ব্বেই এল্‌জি পুলিস ষ্টেশনে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের লোকের চেষ্টায় কয়েকটি জীর্ণ-কায় আরব ঘোড়া ও অশ্বতর যোগাড় হ'ল, কুলিও কয়েকটি পাওয়া গেল। মার্ক টোয়েন প্যালেষ্টাইন ভ্রমণের সময় যে আরবী অশ্বে আরোহণ করেন, তাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বা'আল্‌বেক্,' অর্থাৎ 'অতীত গৌরবের ধ্বংসস্তূপ'। আমাদের ঘোড়া কয়টির পক্ষেও সে নাম চমৎকার খাটে।

এল্‌জি গ্রামে লোকের বাস খুবই কম। এখানকার লোকেরা যাযাবর প্রকৃতির; সাধারণতঃ তারা ছাগ-লোমে নির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করে এবং শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ উপত্যকায় ও গ্রীষ্মকালে উচ্চ মালভূমিতে উঠে যায়। জল এ অঞ্চলে একমাত্র পাওয়া যায় আইন মুসা নামে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীতে। এই জলে এখানকার কৃষিকর্ম্মের অত্যন্ত সুবিধা হয়। এল্‌জি থেকে আমরা যাত্রা করি সশস্ত্র বেদুইন-রক্ষী নিয়ে। পুলিশ ষ্টেশনের ওপর ট্রানস্‌জর্ডান প্রদেশের পতাকা উড়ছে। বর্ত্তমান সভ্যতা ছেড়ে দু'হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের পথে আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু।

পথ অনেকটা নেমে গিয়েছে। এত পিচ্ছিল পথে অশ্বতরই একমাত্র উপযুক্ত বাহন। পথ এসে মিশে গেল ওয়াডি মুসা নদীর শুষ্ক খাতে। ক্রমে আমরা এসে পৌঁছলাম এক বিশাল পর্ব্বত-প্রাচীরের নিম্নে। পেট্রা নগরী যে লাল বেলেপাথরের পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এটা তারই পূবদিকের শাখা।

ওয়াডি মুসা নদী ক্রমে গভীর হয়ে এল। আমরা যেন একটা অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করছি। প্রকৃতি পর্ব্বত-প্রাচীরকে দু'ভাগে ভাগ করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে দিয়েছেন। শীতকালে এ পথে ওয়াডি মুসা নদীর বন্যার জল প্রবাহিত হয়। পেট্রা সহরকে কিছু দূরে রেখে সেই জল গিয়ে মেশে ওয়াডি-এল-আরাবা নামে আর একটা পার্ব্বত্য নদীর সঙ্গে।

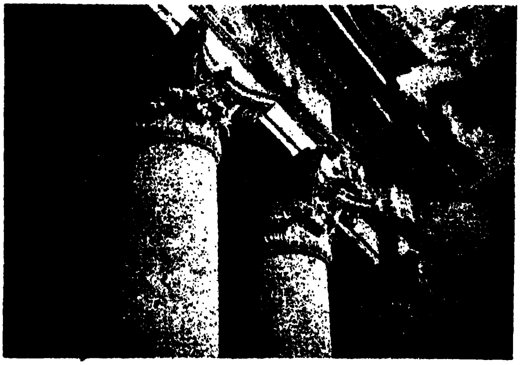
পেট্রা সহর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। সহরের বাইরে একটা নোংরা ও অপকৃষ্ট সহরতলী, গরীব ইহুদী ও আরবীয় গৃহস্থেরা এখানে বাস করে। তাদের ছোট ছোট দালান-পসারে জায়গাটা ভর্ত্তি। এখানেও পাহাড়ের গায়ে কেটে তৈরী করা কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বড়বড় পাথরের মধ্যে খুদে তৈরী কয়েকটা কুঠুরী দেখা যায়, কত প্রাচীন কালে এগুলি তৈরী হয়েছিল জানা যায় না।

পাহাড়ের মধ্যেকার যে সংকীর্ণ পথে পেট্রা সহরে যেতে হয়, স্থানীয় ভাষায় তার নাম বাব-এস্-সিক্। এই পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব সোজা ধরলে হবে ৬০০০ ফুট, কিন্তু এঁকেবেঁকে যাওয়ায় পথটি আরও অনেক দীর্ঘ ও গড়ে ২০ ফুট চওড়া। দুদিকের পাথরের খাড়া দেওয়ালের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। মাথার উপর নীল আকাশকে একফালি নীল ফিতের মত দেখা যায়।

পাহাড়ের দেওয়ালে মাঝে মাঝে ছোট বড় কুলুঙ্গি কাটা। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে এই সব কুলুঙ্গিতে দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, এখন সে সব পৌত্তলিকতার চিহ্ন নেই। বাব্-এস্-সিকের পথে বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ান।

আমাদের ঘোড়া অনেকবার পা পিছলে ও হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। অশ্বতরগুলি খুব মজবুত, একবারও হোঁচট্ খেল না।

কুড়ি মিনিট এই অন্ধকার গলির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরে আমরা পেট্রার প্রথম মন্দির দেখবার জন্য অন্ধকারের মধ্যে সামনের দিকে চাইতে লাগলাম। যারা এ পথে কি আছে জানে না, তাদের কাছে শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ এই সুপ্রাচীন দেবায়তনটি বিস্ময়জনক আকস্মিকতার সঙ্গে আবির্ভূত হবে। বাব্-এস্-সিক্ এখানে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল, উত্তর-দক্ষিণ মুখে আড়াআড়ি ভাবে প্রসারিত আর একটা শুষ্ক



পেট্রা: এল্ খাজনার এই সকল সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত কোন প্রাচীন অজ্ঞাত জাতির স্থাপত্য-বিদ্যার নিদর্শনগুলি বেদুইনদের হাত হইতে কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে।

নদীখাতের সঙ্গে এক সমকোণের সৃষ্টি করে'। এই দ্বিতীয় খাতের অপর পারে উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীরের গায়ে এল খাজনা নামে প্রসিদ্ধ এই মন্দিরটি প্রাচীনকালের কোন অজ্ঞাত জাতির শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় স্বরূপ বিদ্যমান। কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে এ মন্দির তৈরী হয়েছিল, আজ তা জানবার কোন উপায় নেই।

এল্ খাজনার প্রথম দর্শনে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। ১৯০৫ সালে আমি বীরশেবার পথে জেরুসালেম ও সেখান থেকে পেট্রাতে আসি। তখন এ পথে আসতে হ'ত প্রাণ হাতে করে। আমরা বেদুইন দস্যুদলের উৎপাতের আশঙ্কায় কোন কূপের ধারে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করতে সাহস করি নি।

কি বিপদেই পড়েছিলাম সেবার জলের অভাবে। পথের মধ্যে আইন্ মুসা একমাত্র নদী, সেখানে পৌঁছে দেখি নদী একেবারে শুষ্ক, এক ফোঁটা জল নেই শিলাস্তূপ নদীখাতে। চব্বিশ ঘণ্টা চলবার পরে ওয়াডি মুসা নদীর এক জায়গায় সামান্য একটু জল পাওয়া গিয়েছিল, তাতে আমাদের ঘোড়া ও অশ্বতরের প্রাণ বাঁচে।

তখনও পেট্রা সহর ১২ ঘণ্টার পথ। জানোয়ারগুলিকে জল খাইয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আমি একবিন্দুও জল পাইনি। ওয়াডি মুসার সে জল মানুষের পানের অযোগ্য। পিপাসায় অত্যন্ত কাতর অবস্থায় আমি বাব্-এস্-সিক্-এর দিকে অগ্রসর হই, পথ-প্রদর্শকদের মুখে শুনেছিলাম, এখানে ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায়। ছোট একটা ঝরণা দেখতে পেয়ে যখন আমি হাঁটু গেড়ে বসে দু' হাতের অঞ্জলি পুরে জল পান করছি, তখন এল্ খাজনার মন্দির আমার চোখে পড়ে। মন্দিরের সৌন্দর্য্য আমায় এত মুগ্ধ করেছিল যে, অঞ্জলি-ভরা জল আমার হাত থেকে পড়ে গেল। জীবনে আর কোন দৃশ্য আমায় এত অভিভূত করে নি।

সমগ্র পেট্রা সহরে আশপাশে এক হাজারের বেশী প্রাচীন দেবালয় ও সমাধিস্থান আছে। এদের মধ্যে মাত্র পঁচিশটির উপর গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট, বাকীগুলি আরও প্রাচীন। পেট্রা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে খুব বড় হয়ে ওঠে এবং এক হাজার বছর ধরে তার এ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

বাব-এস্-সিক্-এর পরেই যে নদীখাতের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, তার কাছে রোমান্ থিয়েটার। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রোমান থিয়েটারের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। এর বসবার আসনগুলি পাহাড় কেটে তৈরী, অনেকটা জায়গা নিয়ে সমস্ত থিয়েটারটা, প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বসবার আসন আছে (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রোমান থিয়েটার ছেড়ে কিছু পশ্চিমে গেলে প্রাচীন পেট্রা সহরের ভগ্নাবশেষ। এখানে শুধু ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না, কারণ প্রাচীন পেট্রা নগরীর কিছুই মাটীর উপরে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই।

মাটী খুঁড়ে মাঝে মাঝে এখানে প্রাচীন নগরপ্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ওয়াডি মুসার ধারে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সহরের প্রধান প্রবেশ-দ্বার ছিল এবং এই প্রবেশ-দ্বারের

নিকটেই রোমান পদ্ধতিতে নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ বিজয়-তোরণের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

পেট্রা সহর মৃতের পুরী, শুধুই প্রাচীন দিনের সমাধি-মন্দিরে ভরা। প্রথম দর্শনেই একটি অতি দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত সংকীর্ণ উপত্যকায় এরূপ একটি সহরের দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দিল যে, শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার এমন চমৎকার দুর্ভেদ্য স্থান পৃথিবীতে বেশী নেই।

তার উপর রাগ্ বিছিয়ে আমরা রাত্রে নিদ্রা যেতাম। আমাদের বিছানায় যত ফুল ছিল, ফিফ্থ্ এ্যাভিনিউ-এর যে কোন ফুলের দোকানে তাদের দাম দু'শো ডলারের বেশী।

পেট্রা সহরের পূর্ব্বে যে পর্ব্বত, তার প্রাচীরের গায়ে সবচেয়ে বড় একটি ইহুদী মন্দির অবস্থিত। এই পর্ব্বত বহু নদীখাত দ্বারা খণ্ডিত এবং এর কয়েক মাইল পূর্ব্বে ওয়াডি-এস্-সিয়াগের বিখ্যাত খাদ (gorge)। এস্-সিয়াগের পশ্চিমে



পেট্রা: বিপুল রোমক থিয়েটারের সুমহান্ দৃশ্য।

এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে সবগুলিই এত বেশী খাড়া যে, উপরে উঠা বিশেষ কষ্টকর। পূর্ব্বদিকের পাহাড় অল্প একটু ঢালু, কিন্তু এত বিভিন্ন শিলাখণ্ডের স্তূপ সেদিকে যে, অশ্বতর নিয়েও উঠতে সাহস হয় না।

এই সব শিলাখণ্ডের মধ্যে পাহাড়ের নীচে প্রচুর রক্ত-করবীর বন। রোমান থিয়েটার তো বর্ত্তমানে রক্তকরবীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আমরা যে সময়ে গিয়েছিলাম, তখন এদের ফুল ফুটেছে—ফুলের বনে আমাদের তাঁবু ফেলা হ'ল, এল্ হাবিস্ বলে ছোট একটা পাহাড়ের তলায়।

করবীফুলের এক গোছা লাল ফুলশুদ্ধ ডাল ভেঙে নিয়ে

জেবেল-এড্ ডের নামে পাহাড়। প্রথম যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের এটি একটি উপাসনার স্থান ছিল।

নিকটেই একটি পাহাড় আছে, তার শীর্ষদেশ সমতল। প্রাচীনযুগের অধিবাসীরা এখানে পাথর খুদে খুব বড় একটা চৌবাচ্চা করেছিল—এই জলহীন দেশে জল সঞ্চিত করে রাখা হ'ত এতে, যাতে শত্রুপক্ষ নগর অবরোধ করে ওয়াডি মুসা নদীর জল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে' এদের জব্দ না করতে পারে।

গ্রীক্ ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ সিকুলাস্ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে তাঁর গ্রন্থে পেট্রা সহরের নেবাটিয় অধিবাসীদের

কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁর লিখিত বিবরণ-পাঠে জানা যায়, সে সময় এদের কোনো নির্দ্দিষ্ট ঘরবাড়ী ছিল না। নিকট-



পেট্রা: জেবেল্-এড-ডের পাহাড়ের উপরকার মন্দির। এই স্থান হইতে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য চোখে পড়ে।

বর্ত্তী উপত্যকায়, নদীতীরে, মরুপ্রান্তে উট ও ভেড়া চরিয়ে বেড়ানই ছিল তাদের পেশা।

এই নেবাটিয় জাতি অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। এদের দুর্গম পার্ব্বত্য বাসস্থানের উল্লেখ উপরোক্ত গ্রীক্ ঐতিহাসিকের গ্রন্থে আছে। আলেক্জান্দারের সেনাপতি এন্টিগোনাস্ দুবার এদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, দুবারই সে অভিযান ব্যর্থ হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ওয়াডি মুসা নদীখাতের অনতিদূরে এবং এই সংকীর্ণ উপত্যকায় ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণেল টি, ই, লরেন্স একদল তুর্কী সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেন এবং প্রাচীন নেবাটিয়দের অনেক কৌশল তাঁকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। বর্ত্তমান যুগের এত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও পেট্রা সহরের ও ওয়াডি মুসা নদীর উপত্যকার দুর্ভেদ্যত্ব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি।

ওয়াডি এস্ সিয়াগ সন্ধ্যাবেলা বেড়াবার পক্ষে চমৎকার স্থান।

দুধারেই শুধু পাহাড়, মধ্যে প্রাচীনকালের নদী পাথর কেটে নিজের পথ করেছে। দুপারেই পাথরের ছোট বড় স্তূপের মধ্যে রক্তকরবীর বন। অস্তসূর্য্যের রঙে একদিকের পাহাড়ের দেওয়াল রাঙা, অন্য দিকে নিবিড় ছায়া।

আমরা একটা ছোট ঝরণার ধারে এসে বসলাম। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণাটা পড়ছে, উপলাকীর্ণ পথ বেয়ে তার গায়ে সেটা নেচে চলেছে আইন মুসার বিস্তৃততর জলধারার সঙ্গে মিশতে।

এখানে আর একটি প্রাচীন মন্দির আমাদের চোখে



পেট্রা: আম-এল-বিয়ারায় উঠিবার একমাত্র পাহাড়ের গা কাটিয়া তৈয়ারী পথ। পর্ব্বতশিখরস্থ দুর্গম আম্-এল-বিয়ারা নেবাটিয়ানদের আশ্রয়-স্থান ছিল। এই রকম ধাপে ধাপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুর্গম হইতে দুর্গমতর হইয়া পথটি উপরে উঠিয়াছে।

পড়ল। এই মন্দিরে একটা ঘরের মধ্যে আর একটা ঘর আছে। ঘরের দেওয়ালে তে-কোণা কুলুঙ্গির মত অসংখ্য গর্ত

কাটা। এগুলির উদ্দেশ্য যে কি ছিল, তা আজ বোঝবার কোন উপায় নেই।

নেবাটিয়গণ কি পায়রা পুষত ?



পেট্রা : আম-এল-বিয়ারায় উঠিবার পথের একাংশ। পথটি বন্ধ করিয়া একজন লোকের পক্ষে একটি সৈন্য-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

একটা অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথ দিয়ে আমরা এল্ হাবিস্ পাহাড়ের মাথায় উঠি। এই পাহাড়ের পূবদিকের ঢালু গা বেয়ে এই পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। পাহাড়ের মাথা সমতল, সেখান থেকে একদিকে দেখা যায় ওয়াডি এস্ সিয়াগের বিরাট নদীখাত, অন্যদিকে পায়ের তলায় সমগ্র পেট্রা সহর।

এখানে দুটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। কেউ বলেন এগুলি রোমানদের তৈরী, কেউ বলেন মধ্যযুগের ধর্ম্ম-যুদ্ধে আগত খ্রীষ্টীয় বীরদের তৈরী। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রথম বল্ডুইন সার্থবাহ বণিক্‌দলের নিকট কর আদায়ের জন্য পেট্রা সহরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন— এল্ আবিসের পাহাড়ের উপরকার এই ধ্বংসস্তূপ সে-দুর্গেরও ধ্বংসস্তূপ হতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের লেখায় পাওয়া যায় যে, নেবাটিয় জাতি সূর্য্যদেব দুশারার পূজা করত এবং একখণ্ড আস্ত কালো পাথর ছিল এই সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি। পেট্রা সহরে সর্ব্বত্র কালো পাথরের দুশারা মূর্ত্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টানদের ক্রুশ যেমন তাদের ভজনালয়ে ও সমাধি-স্থানে থাকে, নেবাটিয়গণ দুশারার মূর্ত্তি তেমনি তাদের মন্দিরে ও সমাধি-গুহায় রেখে দিত।

আরণ পর্ব্বতের মন্দিরের খুব বড় একটা দুশারা দেখবার উদ্দেশ্যে দুজন বীরশেবা আরবীয় পথ-প্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে আমরা পর্ব্বতে উঠতে আরম্ভ করলাম। দশ বছর আগেও এ সব স্থান বিদেশীয়গণের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। রাস্তা খুব দুর্গম বটে, কিন্তু আমাদের ঘোড়া একেবারে পাহাড়ের মাথায় আমাদের পৌঁছে দিল।

ঘোড়া থেকে নেমে আমরা জেবেল হারুণের মন্দির দর্শন করলাম।

পাহাড়ের মাথায় এখানেও প্রকাণ্ড বড় একটা চৌবাচ্চা খোদা আছে, প্রাচীনকালের তীর্থযাত্রীদের জন্য এখানে জল সঞ্চিত থাকত। মন্দিরের একটু নীচে, পাহাড়ের উত্তর ঢালুর গায়ে একটা প্রাকৃতিক গুহায় তিনটি তাম্রকটাহ আছে। সম্ভবতঃ দেবতার নিকট বলিপ্রদত্ত পশু এই তাম্র-



পেট্রা : এই ধ্বংসস্তূপ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। ইহা যে জেরুসালেমের রাজা প্রথম বল্ডুইনের দুর্গ ছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পাত্রে সিদ্ধ করা হত। একটা পাত্র এত বড় যে তাতে একটা গোটা উট অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে।

জেবেল হারুণের মন্দিরে এখনও স্থানীয় অধিবাসীরা ভেড়া ও ছাগল মানত করে, তার প্রমাণ আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই পাওয়া গেল। একদল গ্রাম্য লোক কয়েকটি ভেড়া নিয়ে মন্দিরে পূজা দিতে এল।

মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে গাঁথা একখানা সুবৃহৎ প্রস্তর, তার রংটা ঈষৎ সবুজাভ কালো। এই সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ডুশারা। তীর্থযাত্রীর দল চুম্বন করে করে তার উপরটা মসৃণ ও চক্‌চকে করে তুলেছে। গৃহতল থেকে পাথরখানার অবস্থান স্থান প্রায় ৫ ফুট উচুতে।

আমরা মন্দিরের বাইরে এসেছি, এমন সময় দেখা গেল দূরে একদল বেদুইন আসছে। তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। জেবেল হারুণের পবিত্র মন্দিরে বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং আমাদের পথ-প্রদর্শকদের পরামর্শে আমরা শীঘ্র সেখান থেকে সরে পড়লাম।

মন্দিরের কিছু দূরে বলির স্থান। নিহত পশুর রক্ত এনে ডুশারা প্রস্তরের সামনে পাথরের মেজের একটা গর্ত্তে রাখা হত। নেবাটিয়গণের একটি প্রথা এখনও স্থানীয় সামারিটান্ ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা হচ্ছে বলিপ্রদত্ত পশুর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখা।

নিম্নের উপত্যকার প্রবেশ-পথে ক্ষুদ্র একটি গুহায় কয়েকটি বেদুইন পরিবার বাস করে। এদের বাড়ীঘর, তাঁবু, উট কিছু নেই। সামান্য যা কিছু পরিচ্ছদ, তা তাদের পরণেই আছে। একখানা করে ছেঁড়া কম্বল পেতে রাতে শোয়। বালক-বালিকারা অনাহারশীর্ণ, উলঙ্গ ও অপরিষ্কার। যবের রুটী এদের একমাত্র খাদ্য, তাও প্রচুর পরিমাণে জোটে না।

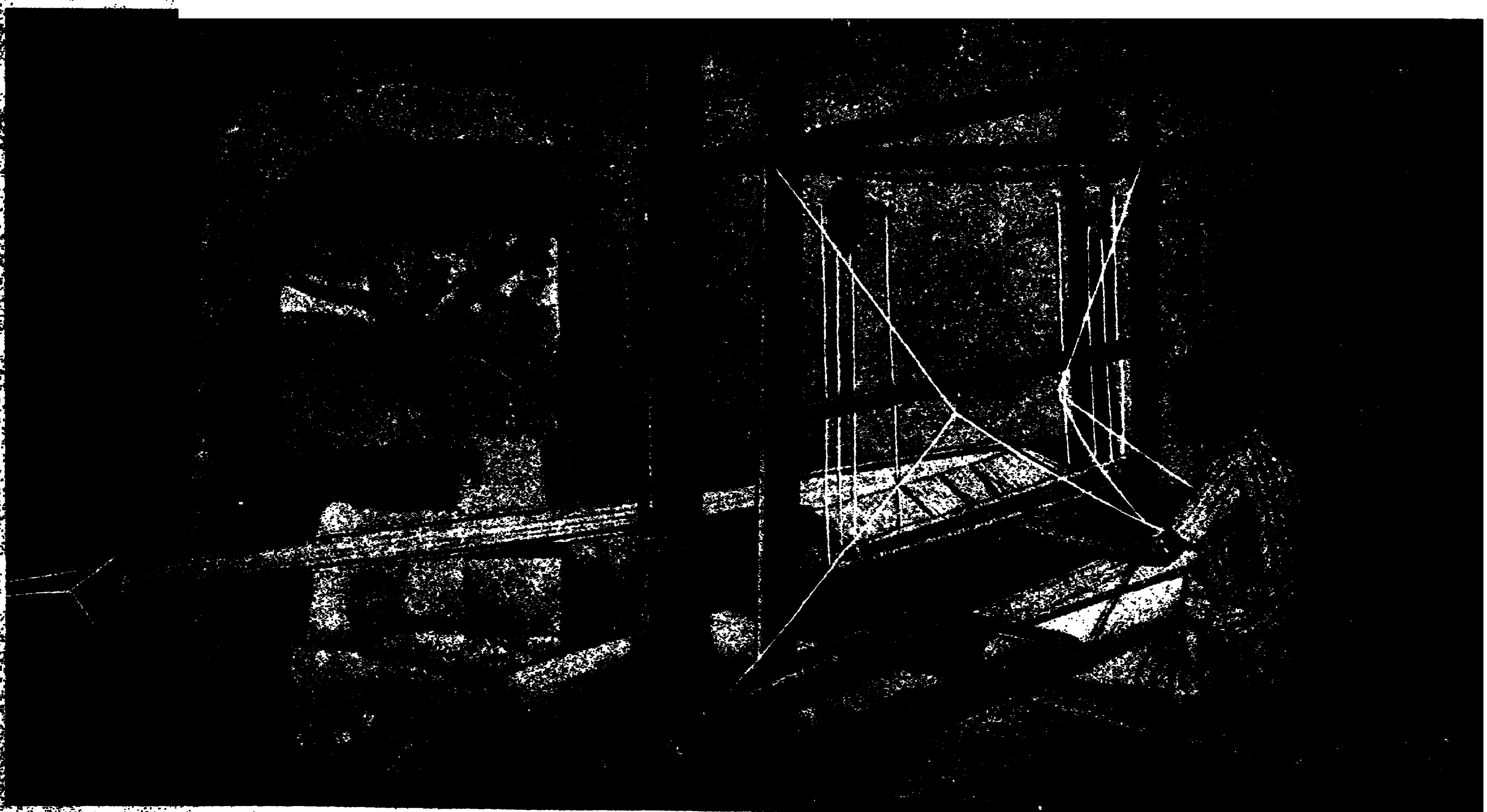
ফিরে যাও

—শ্রীবিভুদান রায় চৌধুরী

গরীব যাহারা, ক্লিষ্ট যাহারা, যাহারা অন্ধ অবচেতন,
তাহাদের তরে হৃদয়ে তোমার
জাগে না কি প্রিয় কোন বেদন ?
দিনে দিনে আর তিলে তিলে যারা
শুকায়ে শুকায়ে হতেছে ক্ষয়,
একটি মুষ্টি অন্নের লাগি' ভিক্ষা মাগিতে পেতেছে ভয়,
তাহাদের তরে হৃদয়ে তোমার
নাই কি বিন্দু করুণা মায়া,
জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার মাংসবিহীন রুগ্ন কায়া।
চেয়ে দেখ তুমি তাহাদের পানে—
কাব্যে তাদের মেটে না ক্ষুধা,
পাপিয়ার ডাকে, জ্যোছ্না নিশীথে
আকাশে চাঁদের রঙীন্ সুধা।

কচুরিপানায় স্যাঁতস্যেঁতে ডোবা পল্লীগ্রামের দূষিত জল,
তাই খেয়ে তারা রয়েছে তৃপ্ত, প্লীহাতে হরেছে দেহের বল।
সহরেতে প্রিয় থাকিয়া থাকিয়া
করিবে কি তুমি তাদের তরে ?
যাহারা তোমার সব সম্পদ্, তারা যদি যায় প্লীহাতে মরে ?
সহরের এই বিলাস ব্যসন চরিতার্থতা পাবে কি কভু,
বোঝ না কি তুমি প্রাণে প্রাণে তাহা,
চুপ ক'রে কেন রয়েছ তবু।
সহরের বুকে তোমার প্রাসাদ তাদের রক্তে হয়েছে গড়া,
তিল তিল ঐ রক্ত শুকান তাদেরই টাকায় মোটর চড়া।
তবু তাহাদের দিবে না কিছুই, সব কিছু তার লইবে নিজে,
হি হি ক'রে তারা কাঁপুক শীতেতে,
বর্ষায় তারা মরুক্ ভিজে।

ফিরে যাও এই সহর ছাড়িয়া; পাত গিয়ে গ্রামে সিংহাসন,
ক্লিষ্ট, গরীব, বুভুক্ষিতেরে অন্ন দিয়া গো কর পালন।



তাঁত [শিল্পী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

নিমন্ত্রণ

অফিসের বন্ধুরা বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া পড়িলেন,—এক দিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেও মুখে বলিলেন—"হেতু?"

"হেতু এই যে, ছুটীর একটা দিন আরাম করে কাটান,—আপনার ওখানে মজা করে খেয়ে দেয়ে আসব।"

"বেশ—সুখের বিষয়। কবে খাবেন বলুন।"

"এই সামনের রবিবার প্রশস্ত, কিন্তু বাজারের কেনা মাংস নয়। আর স্বয়ং গিন্নীর হাতের—"

বিশ্বকর্ম্মা লোকজন, বন্ধু-বান্ধব খাওয়াইতে খুব ভালবাসেন। একা বসিয়া তিনি দু'খানি গরম লুচিও খাইতে পারেন না। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, কি অতিথি আগন্তুকের সহিত বসিলে আধ দিস্তা ঠাণ্ডা লুচিই অবাধে উঠিয়া যায়। এ জন্য প্রায়ই আফিসের ফেরৎ দু'একজন সহকর্ম্মীকে সাথে আনেন এবং খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি এগারটার ট্রেনে বিদায় দেন।

বিশ্বকর্ম্মার প্রধান কর্ম্মস্থান সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে। তবে মাসের মধ্যে দশ পনের দিন সহরে ছুটিতে হয়। অন্য দিন নিজের আফিসেই কাজ-কর্ম্ম করেন।

বিশ্বকর্ম্মার অন্য নাম আছে,—সুধাকর কি তারানাথ, এমনই একটা নাম, কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত—এজন্য নাম ব্যস্তবাগীশ। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কোপন ও অসহিষ্ণু স্বভাব, এজন্য—'ব্যাঘ্র মহাশয়'। আর যে কাজে হাত দেন, তাহাই পণ্ড করেন—(অবশ্য সাংসারিক কাজ) এজন্য নাম হইয়াছে 'বিশ্বকর্ম্মা'। বলা বাহুল্য নামগুলি সবই তাঁহার গৃহিণী দিয়াছেন।

এদিকে যেমনই হন বিশ্বকর্ম্মা খুব কার্য্যদক্ষ অফিসার। চাকুরী করেন বটে,কোনরূপ নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজে যেটা ভাল বুঝিবেন, তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিবে না। একবার একটা নির্দ্দোষী লোককে বাঁচাইতে গিয়া অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নাই। যেহেতু চাকুরীকে তিনি 'পোড়াই কেয়ার' করেন।

বিশ্বকর্ম্মার অনেক গুণ—সে সব ক্রমে জানিতে পারিবেন। এক্ষণে যাহা বলিতে ছিলাম—তাহাই বলি।

*

সে দিনটা ছিল মঙ্গল কি বুধবার। বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন, "ওগো, রবিবারে ক'জন লোক এখানে খাবেন।"

গৃহিণী সুরুচি বলিলেন, "কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে এলে?"

"আহা, আমি কি বলেছি? তারা নিজ মুখে খেতে চাইলে—"

সুরুচি বলিলেন, "কবে আর ক'জন বললে?

"এই রবিবার—জন চার পাঁচ হবে।"

"মোটে চার পাঁচ জন! তারি এত গল্প?"

"এখানকারও দু'এক জন থাকবেন।"

সুরুচি বলিলেন, "আচ্ছা।"

বিশ্বকর্ম্মা চুপি চুপি একটি নধরকান্তি পাঁঠা কিনিয়া আনাইয়া ভৃত্যের জিম্মা করিয়া দিলেন এবং গোপন রাখিতে বলিলেন।

রবিবার সকাল বেলা মাইল খানেক দূরে এক বন্ধুর পুষ্করিণীতে মাছের জন্য লোক পাঠান হইল। এদিকে বেলা সাতটার সময় নিমন্ত্রিতদিগের নিকট খবর আসিল,—আজ তাঁহারা আসিতে পারিবেন না, জরুরি কাজে আটকা পড়িতে হইয়াছে। পরের রবিবার আসিবেন।

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন। সুরুচি বলিলেন, "তার জন্য কি হয়েছে? ও রবিবার তো আসবেন।"

কিন্তু বেলা প্রায় এগারোটার সময় একটা বড় রুই মাছ আসিয়া হাজির হইল। বিশ্বকর্ম্মা মাছ দেখিয়াই বলিলেন, "আসতেই হবে তাদের, লোক পাঠাচ্ছি।"

সুরুচি বলিলেন, "তাঁদের না কি মেলা কাজ, আসবেন কি করে?"

"নিশ্চয় আস্‌বে। কি এমন কাজ যে, আসতে পারবে না!"

"তবে লোক পাঠাও, আমি যোগাড়-যন্ত্র করি।"

"এখন কি যোগাড় করবে? তিনটের গাড়ীতে খবর নিয়ে লোক ফিরবে—তখন ক'রো।"

বারটার ট্রেণে একজন আরদালী সহরে চলিয়া গেল।

খবর জানিয়া সুরুচি কাজে হাত দিবেন, দই-মিষ্টির জন্য লোক পাঠাইবেন। কিছুই পারিতেছেন না,—উদ্বিগ্ন ভাবে সময় কাটাইতে লাগিলেন। আনাইয়াও রাখিতে পারেন না,—যদি তাঁরা নাই আসেন—তবে অনর্থক টাকা খরচ হইবে।

বাড়ীর সামনে তৃণাচ্ছন্ন ভূমি, পাঁঠাটি সেখানে চরিয়া খাইতেছে। সুরুচি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পাঁঠা দেখিয়া বলিলেন, "এটা কার পাঁঠা? এখানে বাঁধা যে?"

পারিচারক গিরি উত্তর দিল—"আমাদেরই।"

উত্তর শুনিয়া মুখে বলিলেন, "আমাদের আবার পাঁঠা ছিল কবে?" মনে মনে হয়ত বলিলেন, "একটি ছাড়া!"

"বাবু পরশুদিন কিনে এনেছেন।"

"বুঝেছি, এই বন্ধুভোজের জন্যে;—দিচ্ছি আর কি!"

বেলা তিনটার ট্রেণ চলিয়া গেল। ষ্টেশন আধ মাইল দূরে, কিন্তু বাড়ীর সামনে একটু দূর দিয়াই গাড়ী যায়। সাড়ে তিনটা—ক্রমে চারিটা বাজল। কারও দেখা নাই, কোন খবর নাই।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"তারা আর আসবে না—এলে এতক্ষণ আসত।"

সুরুচি বলিলেন, "কিন্তু যে তাঁদের আন্‌তে গেল—সে তো ফিরবে?"

"সে হয়তো টাউন দেখে বেড়াচ্ছে। আসবে রাত্রের ট্রেণে।"

সুরুচি কাপড় কাচিতে গেলেন। তারপর আসিয়া যে দুইজন প্রতিবেশিনী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের লইয়া বারান্দায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

কিন্তু কপাল আর কাহাকে বলে? খানিকক্ষণ পরেই গিরি আসিয়া বলিল, "মা বাবু ডাকছেন।"

সুরুচি বলিলেন, "কই তিনি?"

"বাইরে আসুন।"

সুরুচি বাইরে আসিয়া দেখিলেন, দূরে আবছায়া একটি শুভ্রবস্ত্র দেখা যাইতেছে, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, চোরের মত দাঁড়াইয়া। আগাইয়া দেখিলেন বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং; বলিলেন, "কি?"

"ওঁরা—ওঁরা সব এসেছেন।"

"ওঁরা কে?"

"যাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম।"

"এখন? এত রাত্রে? কটা বেজেছে?"

"আটটার গাড়ীতে এল।"

"তা হলে সাড়ে আটটা হয়েছে। এত রাত্রি কেন? আরদালী এসেছে?"

"সেই বেটাই তো যত অনিষ্টের মূল! বারটার ট্রেন ফেল করে ষ্টেশনে শুয়ে ঘুম দিয়েছে। চারটের ট্রেনে গেছে। ট্রেন ফেল করলি বাড়ী ফিরে আয়, তা নয় ষ্টেশনে শুয়ে রইল গাধা উল্লুক! সাইকেলে গেলে তিনটের আগেই খবর নিয়ে ফিরতে পারত। তা যখন সব এসে পড়েছে, এবার বন্দোবস্ত কর।"

"তা করছি, কিন্তু রাত্রি হবে। শেষে যে দশটা না বাজতে তুমি লাফালাফি করবে, সে পারবে না।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "হোক্ রাত্রি, ক্ষতি নেই।"

"আচ্ছা। ক'জন?"

"দশ বারো জন।"

সুরুচি ফিরিয়া ভিতরে গেলেন। সেখানে অনেক কাজ।

খানিক পরেই গিরি আসিয়া বলিল, "ভাল একটা দা চাই, বাইরের দা'টা ভাল নয়

সুরুচি চম্‌কাইয়া বলিলেন, "দা,' দা' কি হবে?"

"পাঁঠা কাটব।"

"বটে! তা বই কি? আমাকেই কেটে ফেল্ তার চেয়ে

সুরুচি স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিলে বলিলেন,"হ্যাঁগা একি বুদ্ধি? বাড়ীতে পাঁঠা কাটা তা আজ পনের বছর বন্ধ হয়ে গেছে, আজ এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল তোমার? বয়সের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা বাড়ছে না কি? তা ছাড়া এই পাঁঠা কাটতে ছাড়াতে কুটতে অনেক দেরী, রান্না হতে আরও দেরী। শেষে কি সবাইকে শেষ রাত্রে খেতে বসাবে?"

বিশ্বকর্ম্মা বুঝিলেন কথা মিথ্যা নয়। বলিলেন, 'আচ্ছা থাক্ তবে। কিন্তু ভাল বন্দোবস্ত করবে।"

সুরুচি গিরিকে বলিলেন, "পাঁঠা ঘরে বেঁধে রেখে এসে বাটনা বাটতে ব'সো।"

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন। ব্যাপার দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা বিদায় লইয়া আগেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। একটা লণ্ঠন তাঁহাদের সঙ্গে গেল। আর দুইটি লণ্ঠন লইয়া একজন বাজারে ও অন্যজন গোয়ালা বাড়ী গেল।

সুরুচি চাল বাছিতে বসিলেন। ঠাকুর ডাল চড়াইয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মার নিজস্ব অফিস বাড়ী হইতে কিছু দূরে। বাড়ী ও অফিস লোহার তার দেওয়া একটি খোলা মাঠের মধ্যে। অফিসের সামনে টেবিল পাতিয়া চেয়ারে সকলে বসিয়া হাস্যালাপে মগ্ন। ছেলেরা দেখিয়া আসিয়া বলিল, "কম লোক নয় খুড়ীমা।" বাড়ী হইতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ চেনা যায় না। সুতরাং সুরুচি চুপ করিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই বিশ্বকর্ম্মা অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "শীগগীর কর।"

সুরুচি বলিলেন, "এই বুঝি তাগাদা আরম্ভ হ'ল?"

"না। এখন ওদের জলখাবার আর চা দাও।"

সুরুচি বলিলেন, "দিচ্ছি।"

এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। অতিথিরা অফিসের বারান্দায় দুই দলে দুই টেবিল লইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। একজন আরদালী তাঁহাদের খবরদারীতে নিযুক্ত।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঠাকুর চায়ের জল চড়াও।"

সুরুচি বলিলেন, "কাঠের উনুন জেলে জল গরম করছি।"

"ষ্টোভ, ষ্টোভ কি হ'ল?"

"ষ্টোভটা জলছে না ক'দিন ধরে। বৃষ্টির জন্যে সারাতেও পারছিনা।"

"বাঃ খুব গিন্নীপনা!"

"তা আর কি করব বল?"

"তা খাবার দিতে দেরী করছ কেন?"

"ওরা কেউ বাড়ীতে নেই—কে নিয়ে যাবে? এখুনি এসে পড়বে—"

"ঠাকুর—ঠাকুর দেবে।"

"তা'হলে রান্নার দেরি হয়ে যাবে—ওরা এল বলে।"

"কেন এমন অসময়ে বাজারে পাঠিয়েছ? সময়ে আনাতে পার নি? জানাই তো আছে যে ওরা আসবে।"

সুরুচির মন কাজের দিকে—কথা বলিবার সময় নাই। তবু বলিলেন—"এই বুঝি রাগ সুরু হ'ল? এত তাগাদা করলে কি হয়?—"

বিশ্বকর্ম্মা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যাও—যাও অত কথায় কাজ নেই, তুমি কিছু না পার—শুয়ে থাকগে যাও।—যা পারে ঠাকুর করবে এখন।"

বলিয়া অবশিষ্ট লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাতাসে দেয়ালগিরি জ্বলে না। টেবিল ল্যাম্পটার চিমনী গিরির হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অফিসে একটা বড় আলো জ্বলিতেছে। আর বাড়ীতে রান্নাঘরে ছাড়া আলো নাই। ঘরে দুয়ারে ঘুটঘুটে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। তদুপরি বৃষ্টি পড়িতেছে। সুরুচি আঁধারেই ভাড়ার-ঘরে প্রবেশ করিলেন। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কিছু কিছু জিনিষ বাহির করিয়া রান্নাঘরে গেলেন।

ঠাকুর কাপড়-চোপড় আঁটিয়া ভীম বেগে ডাল নাড়িতেছিল। সুরুচি বলিলেন, "ডাল নামিয়ে চাটনী চড়াও। এই সব গুছিয়ে দিলাম।"

বাহির হইতে ডাক শোনা গেল—"মা—"

সকলেই ফিরিয়াছে। অবিলম্বে দুই তিনখানা থালা ও ট্রে-র উপর চা ও খাবার সাজাইয়া রওনা করিয়া দিয়া সুরুচি পান সাজিতে বসিলেন।

পান পাঠাইয়া দিয়া সুরুচি রান্নাঘরে গিয়া আলু কুটিয়া দিলেন। পোলাওয়ের হাঁড়ি দু'টা বাহির করিয়া ধুইতে দিয়া, চাল ধুইয়া কাপড়ে বিছাইয়া রাখিয়া মশলা গুছাইতে বসিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা দেখা দিলেন। অত্যন্ত কোমলস্বরে বলিলেন, 'আমাকে কিছু খেতে দিলে হয়।'

বন্ধুদের অপেক্ষায় সারাদিন অফিসের বারান্দায় বসিয়া থাকিয়া বৈকালিক জলযোগ হয় নাই। অনিদ্রার জন্য দিন কয়েক হইল চা-পানও ছাড়িয়াছেন।

সুরুচি গৃহজাত খাদ্যসামগ্রী আনিয়া টেবিলে ধরিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বিনা আপত্তিতে সমস্ত উদরসাৎ করিলেন। সুরুচি পান সিগারেট সামনে রাখিলেন। সিগারেট বিশ্বকর্ম্মা নিজের আয়ত্তে থাকিলে বেশী খাইয়া ফেলেন এবং তাঁহার সহ্য হয় না—মাথার যন্ত্রণা হয়। এজন্য কৌটা সরাইয়া রাখা হয়—প্রয়োজন মত দেওয়া হয়।

বিশ্বকর্ম্মা সিগারেট ধরাইতেছেন—দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন—হু হু শব্দে আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। দেশলাইয়ের বাক্স প্রায় খালি হইয়া গেল—তবু সিগারেট ধরিল না। গামছা মাথায় দিয়া থালা হাতে সুরুচি রান্নাঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া উঠিয়া দেখেন—অসংখ্য দেশলাইয়ের কাঠি মাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বিশ্বকর্ম্মা রাগিয়া বলিতেছেন, "কি ছাই জিনিষপত্র সব যে পয়সা দিয়ে কিনে আন—"

সুরুচি বলিলেন, "বাতাসে কখন কাঠি জ্বলে? আড়ালে দাঁড়ালেই তো হয়।"

দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া এবার সহজেই সিগারেট ধরিল। সুরুচিকে কথা বলিতে দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ভরসা পাইলেন। দেশলাইটা সুরুচির পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—"তুমি ভিজ না,—ভিজ না, শেষে অসুখ করবে। তুমি এখানে বসে বলে দাও,—ওরা সব করবে।"

"ওরা কি পারে?"

'কেন পারবে না? মাইনে নিতে পারে তো?"

"আচ্ছা, আজকে তো করি—পরে দেখা যাবে।"

"তা'হলে ছাতা নাও, গামছায় কি বৃষ্টি মানে?"

"ছাতায় একটা হাত জোড়া থাকে, বৃষ্টি তো বেশী না এখন।"

"যা খুসী কর। এই তোমার দেশলাই নাও—শেষে বলবে আমি হারিয়েছি।"

সুরুচি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঠের উনান জ্বালিয়া রাঁধিতে বসিলেন।

ছেলেরা সব ঢুকিল—"বাবা, এ যে অগ্নিকুণ্ড!"

আর একজন বলিল, "না হলে শীগগির হবে না। আমরা সাহায্য করব খুড়ীমা? পেস্তা, বাদাম, কিসমিস কই? দাও বেছে দেই—"

"না, না, গরম থেকে পালা! বাছা মানে তো অর্দ্ধেক খেয়ে ফেলা?"

দশটা বাজে, রান্না প্রায় শেষ। পোলাও চড়িয়াছে।

গিরি ছুটিয়া আসিল—"মা—বাবু জায়গা করতে বললেন।"

"আর একটু দেরি আছে, বলগে।"

গিরি বলিতে গেল। বিশ্বকর্ম্মা নিজেই রন্ধনশালায় আসিয়া উপস্থিত—"ওগো, শীগগির খেতে দাও, নইলে ওরা ট্রেন ফেল করবে!"

সুরুচি অবাক হইয়া বলিলেন, "ট্রেন কিসের?"

"এই এগারটার ট্রেন।"

"তা কেন, খেয়ে দেয়ে এখানেই শুয়ে থাকবেন, চা খেয়ে কাল সকালের গাড়ীতে যাবেন—এই তো কথা ছিল? সেদিন বললি?"

"তা ছিল, কিন্তু ওদের যে মফঃস্বল যেতে হবে এই এগারটার ট্রেনে।"

"না গেলে হয় না?"

"অসম্ভব। দু' একজনের বেশী তাড়া নেই, কিন্তু বাকী ক'জনের এই ট্রেনে না গেলেই নয়। জরুরি কাজ। সাহেব সন্ধ্যা বেলাই গেছেন চলে, এরা যাবে তবে কাজ আরম্ভ হবে। এই জন্যে ওরা আজ আসতে চায় নি। পরের রবিবারে দিন করেছিল।"

সুরুচি বলিলেন, "কিন্তু রান্না যে হয় নি?"

"অ্যাঁ, হয় নি? সেরেছ! একেবারেই সেরেছ!"

"আমি সেরেছি না তুমি সেরেছ? তখন বললে, হোক রাত্রি ক্ষতি নেই। সাড়ে আটটায় খবর পেয়েছি। আধ-ঘণ্টা আগেও যদি জানাতে এত তাগাদা, তবে এত রান্না নাই করতাম। কটা বেজেছে এখন?"

"দশটা বাজল।"

"তবে? বেশী দোষ তো হয়নি আমার?"

বিশ্বকর্ম্মা নরম হইয়া বলিলেন, "তা থাক্‌, এখন দাও।"

সুরুচি বলিলেন, "জায়গা করুক তবে।"

"ওরে, শীগগির কর্‌ তোরা।" বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মার প্রিয় অনুচর নীহার বাড়ী গিয়াছে। সে ভিন্ন সংসার অচল। তাই পদে পদে বিশ্বকর্ম্মাকে অসুবিধা সহিতে হয়, সুরুচিকে আগাগোড়া সব দেখিতে ও করিতে হয়।

গিরি বলিল, "মা ক'খানা ঠাঁই করব?"

সুরুচি বলিলেন, "ওরা বুঝি বারজন, বারখানা, আর তোমার বাবু, তেরখানা কর।"

বাহিরের দিকের লম্বা বারান্দায় জায়গা হইল। সুরেন আসিয়া বলিল, "গ্লাস কম পড়েছে।"

"কেন? চোদ্দটা গ্লাস বার করে দিয়েছি।"

"বাবু উনিশখানা জায়গা করতে বললেন, সেইজন্যে কম পড়ছে।"

"তবে পাঁচটা কাঁচের গ্লাস দাও গে, আমার এখন বার করবার সময় নেই।"

বিশ্বকর্ম্মা দেখা দিলেন। "কৈ গো, দাও না, ওরা কিন্তু চলে যেতে চাইছে।"

"ওমা সে কি কথা? ঠাকুর শীগগির নিয়ে যাও। এক কাজ কর দেখি, তোমার জন্য সব সরিয়ে রেখে দাও; আমি বেড়ে দিচ্ছি, তুমি পরিবেশন কর। তা হলে শীগগির হবে। নইলে সব ছুঁয়ে একাকার করে দিলে তোমার হবে না।"

ঠাকুর আর এক হাঁড়ি চড়াইয়াছে। হাত-পা ধুইয়া আসিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

"ঠাকুর একা পারবে না, আমি আসছি।" বিশ্বকর্ম্মা জামা খুলিলেন। কোঁচা কোমরে বাঁধিয়া পরিবেশন করিতে আসিলেন। ডাকিলেন, "ওরে, তোরা আয় রে!"

ছেলেরা ছুটিয়া আসিল এবং ঠাকুরের সঙ্গে পরিবেশন আরম্ভ করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমি…আমি কি নেব?"

"তুমি আর কেন নেবে? খাওয়া দেখ গে!"

"না না, ওরা পারবে না, আমিও দিইগে।"

"তবে নাও"—সুরুচি একটা ব্যঞ্জনপাত্র ও চামচ বিশ্বকর্ম্মার হাতে তুলিয়া দিলেন।

ছুটাছুটি করিয়া পরিবেশন আরম্ভ হইল। ভোক্তাদের ট্রেনের তাগিদ, আধ মাইল দূরে ষ্টেশন, কিছু পূর্ব্বেই যাইতে হইবে। এদিকে মাত্র ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বেই চা ও জলযোগ হইয়াছে, মোটেও ক্ষুধা নাই। আবার পাতে নানা নব নব সুগন্ধি সুখাদ্য পড়িতেছে। দারুণ অবস্থা-সঙ্কট উপস্থিত। ডান হাত মুখে উঠিতেছ, বাঁ হাতে সকলে ঘড়ি দেখিতেছেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং অবতীর্ণ। তাঁহাকে বাড়ীর লোকে বাঘের মত ভয় করে, যতটা পারে দূরে থাকে। সেই তিনি আজ তাহাদের সঙ্গে কাজে নামিয়াছেন! তাহাদের অবস্থাটা—

না যাইলে রাজা বধে, যাইলে ভুজঙ্গ,
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।

"কি রে, কি রকম করে দিচ্ছিস্ ওরে বেকুবের দল বেয়াক্কেলে! ঐ রকম করে পরিবেশন করে? কেবল খেতে শিখেছ; আর কিছু না। যার পাতে নেই তাকে দিচ্ছ না, যার খাওওয়া হয় নি, তাকে বিরক্ত করছ? যা-যা, মাছ নিয়ে আয়।"

ছুটিয়া তাহারা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। সুরুচি তৎ-ক্ষণাৎ হাতে পাত্র তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া বলিলেন, "দেখ, কম পড়বে না তো?"

"না ও হাঁড়ীও নামবে এক্ষুনি।"

"কৈ দেখি দেখি"—বিশ্বকর্ম্মা উনানের উপরকার পোলাওয়ের হাঁড়ির ঢাকনী তুলিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিলেন।

সুরুচি বলিলেন, "করলে কি? ছুঁয়ে ফেলে দিলে? এ হাঁড়িতে এখনো অনেক রয়েছে, ওটা দেখবার কি দরকার পড়ে গেল? বামুনের ছেলে এত মেহনৎ করলে, খেতে পাবে না।"

বিশ্বকর্ম্মা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আর দুটো রেঁধে নেবে।"

কমল আসিয়া শূন্য পাত্র রাখিয়া বলিল, "চাট্‌নী"।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এখনি চাটনী? নিশ্চয় ভাল করে দিস্ নি।"

"দিয়েছি, আর কিছু লাগবে না।"

"কখনো দিস নি, তোরা আবার পরিবেশন জানিস! বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি চাই! ওগো তুমি কোর্ম্মাটা আমার হাতে দাও দেখি, বেশী করে আমি নিয়ে আসছি।"

বিশ্বকর্ম্মা দিতে গেলেন। কমল বলিল, "উনি এত কাঁড়ি কাঁড়ি সব দিয়েছেন খুড়ীমা যে, পাতে গাদা হয়ে রয়েছে সব্বার।"

গিরি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু চাট্‌নী নিয়ে যেতে বললেন।"

বলিতে বলিতে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া পড়িলেন, তাঁহার কনুইয়ের ধাক্কায় সুরেনের হাতের জল পড়িয়া গেল। পায়ের ধাক্কায় ডালের গামলা উল্টাইয়া গড়াইয়া গেল।

"দাও আমায় দাও, আমি দেব, ওরা কিছু দিতে পারে না।"

ঠাকুর আসিয়া বলিল, "মা সন্দেশ দিন এবার।"

"তুমি থাম ঠাকুর! সন্দেশ আমি নিয়ে যাব। তোমরা তো গুণে দু' একটা করে দেবে! এতদিন ধরে দিচ্ছ, তবু শিখলে না!"

চাটনী লইয়া বিশ্বকর্ম্মা ছুটিলেন। গিরি সাবান ও তোয়ালে লইয়া যাইতেছিল, অর্দ্ধপথে দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে একরূপ পিষ্ট করিয়া বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন। ছেলেরা আসিতেছিল, একজন সামনে পড়িয়া ছুটিয়া সরিয়া গেল। একজন হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

সুরুচি এমন একটু অবসর পাইতেছেন না যে, একবার আসিয়া খাওয়াটা দেখিয়া যান। বলিলেন, "ঠাকুর তুমিই সন্দেশ নিয়ে দাওগে। উনি তো ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, শেষে মিষ্টি দেওয়াই হবে না।"

ভোক্তারা উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "মিষ্টি দেওয়া হয়নি এখনো।"

"এতক্ষণে এনেছ, আঃ, বোকা গাধা! উল্লুক!" বিশ্বকর্ম্মা সরোষে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কেন সন্দেশ দাও নি?"

"আপনি দেবেন বললেন—"

ভোক্তারা বলিলেন, "থাক্ থাক্ মিষ্টি আর খাবার যো নেই।"

"বটে! আপনাদের জন্যে আনা হয়েছে—না খেয়ে যেতে দিচ্ছি আর কি!"

অগত্যা কেহ মুখ ধুইতে ধুইতে, কেহ দাঁড়াইয়া ডান হাতে, বাঁ-হাতে যে যেমন সুবিধা পাইলেন, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। বাদানুবাদ করিতে যে সময় নষ্ট হইবে তার চেয়ে সন্দেশ খাওয়াই ভাল। চাকুরীর জ্বালা, বড় জ্বালা!"

গিরি জল ঢালিয়া দিতেছিল, কিসের সাবান, কিসের তোয়ালে, কোন মতে হাত মুখ অর্দ্ধধৌত করিয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে সকলে ষ্টেশনাভিমুখে ছুট্ দিলেন। সুরেন পানের রেকাবী হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—তাহাকে ডিঙ্গাইয়া সকলে চলিয়া গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এগিয়ে পান দিয়ে আয়।"

সুরেন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া গিয়া পান দিয়া আসিল।

ঝড় আসিল। বিশ্বকর্ম্মা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া দিলেন।

উচ্ছিষ্টাদি পরিষ্কার হইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "পাচখানা ঠাঁই কর।"

গিরি বলিল, "এক এক জনের পাতে দু'জনার মত জিনিষ নষ্ট হয়েছে, বাবু না দিলে এমন লোকসান হতো না।"

বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া বলিলেন, "আমাদের পাঁচজন কে এখন দাও।"

"আর চারজন আবার কে?"

"ওরা এইখানকারই, গিরিজা, ধীরেন, কেশব, সতোন। ওদের কোন তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে দিতে পারবে।"

"ধীরে সুস্থে যা হবার তা হয়েছে", সুরুচি একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বলেছিলে দশ বারোজন, হয়ে গেল চব্বিশ পঁচিশ জন। ভাগ্যে ভাত চড়িয়েছি, নইলে বাড়ীর সবাই উপোষ করে থাকত।"

"ও-রকম হয়ে থাকে। নাও, দাও এখন। দিয়ে তোমরাও বস।"

বাহিরের বারান্দায় বিশ্বকর্ম্মা বসিলেন। ভিতরে ছেলেরা বসিল। সুরুচি বলিলেন, "দেখ দেখি কাণ্ড! এমন করে নিমন্ত্রণ করে? না এই রকম করে খায়? কেউ খেতে পারেন নি কিছু, আর রবিবারে এসে খেলে দিব্যি ধীরে সুস্থে খেতে পারতেন, তা নয় ওর যেমন কাজ!"

কমল বলিল, "চাক্‌রীর চিন্তা সবার আগে, ট্রেন যদি ফেল করে থাকেন, তবে আরও মজা!"

সুরেন বলিল, "তা হলে হেঁটেই যাবেন। পাঁচ মাইল পথ বই তো নয়।"

বিশ্বকর্ম্মা আহারান্তে খট্টাঙ্গে লম্বমান্ হইলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন হইতে লাগিল।

সুরুচির তখনও ঘণ্টা কয়েকের কাজ বাকী।

বিজ্ঞান-জগৎ

বিলুপ্ত প্রাণি-জগৎ

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

ডিনোসর

আজি হইতে কত কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব এবং কোন্ স্মরণীয় ক্ষণে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণীর বিকাশ হয়, তাহা নির্ণয় করিবারও কোন উপায় নাই। অবশ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে পৃথিবী প্রাণীর উন্মেষের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য, কারণ সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী একটি প্রচণ্ড উত্তপ্ত বাষ্পের গোলকমাত্র ছিল। বহুকাল ধরিয়া ক্রমশঃ তাপ ক্ষয় হইয়া শীতল হইবার পরে পৃথিবীতে জল এবং স্থলের সৃষ্টি হয়। প্রথমে সৃষ্ট হয় উদ্ভিদ এবং তাহার পরে সৃষ্ট হয় জীব। বর্ত্তমান কালে এই সকল আদিম প্রাণীর কোনটিরই অস্তিত্ব নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে বহু জীবজন্তু পাওয়া যায়, যে-গুলিকে ইহাদের উত্তর-পুরুষ বলা চলিতে পারে।

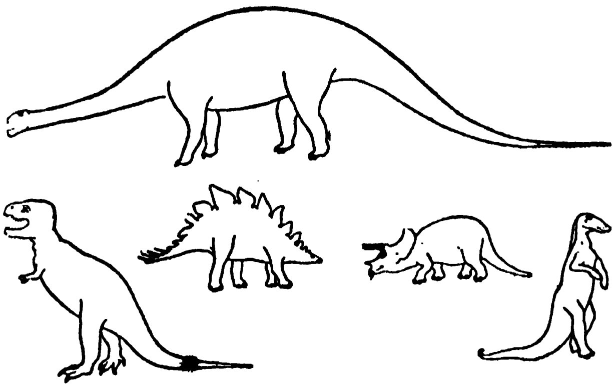
আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে কয়েকটি কালে এবং কালগুলিকে পদ্ধতি বা স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন কালের এবং তখন প্রধানতঃ যে সকল প্রাণীর সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কাল	পদ্ধতি	প্রাণী
আর্কিয়ান	লোগানিয়ান	... কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নাই।
প্রোটেরোজোয়িক	টিমিস্কামিয়ান	... চূণাপাথরের অ্যাল্গি।
	কিউয়িনাওয়ান ও হুরোনিয়ান	কৃমি ; র‍্যাডিওলারিয়া ; বালিপাথরের স্পঞ্জ।
প্যালিওজোয়িক বা প্রাইমারী	ক্যাম্ব্রিয়ান	... স্থলজ উদ্ভিদ ও জীবের অভাব। জলজ প্রাণীর উদ্ভব। ট্রাইলোবাইটের প্রাধান্য ; সেফালোপডের উত্থান, ব্রাকিওপডের প্রাচুর্য্য। আদিম ল্যামেলিব্র্যাঙ্ক ও ক্রাষ্টেসিয়া (চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় খোলাযুক্ত জীবের আদিপুরুষ)।
	অর্ডোভিসিয়ান	... প্রকৃত প্রবাল ও চর্ম্মাবৃত মৎস্যের উদ্ভব। খোলাযুক্ত জলজ প্রাণীর উত্থান—ল্যামেলিব্র্যাঙ্ক ও ব্রাকিওপড। ব্রাইওজোয়া ও গ্র্যাপ্টোলাইট।
	সিলুরিয়ান	... প্রথমে মৎস্যের বিরলতা, পরে প্রাচুর্য্য। প্রবাল, ব্রাকিওপড, ট্রাইলোব্রাইট, ক্রিনয়েড, ব্রাইওজোয়ান, গ্র্যাপ্টোলাইট। এই স্তরেই গ্র্যাপ্টোলাইটের তিরোধান।

কাল	পদ্ধতি	প্রাণী
	ডেভনিয়ান	··· এই সময়কে মৎস্যের যুগ বলা চলে। উভচরের আদিম বিকাশ। মেরুদণ্ডহীন জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য্য, বিশেষতঃ মোলাস্ক, ব্রাকিওপড, প্রবাল। ট্রাইলোবাইটের অবনতি। প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব।
	কার্বনিফেরাস অর্থাৎ অঙ্গারঘটক	··· বাইভাল্‌ভ, ক্রিনয়েড এবং প্রবাল প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর প্রাচুর্য্য। স্থলে উভচর প্রাণীর আগমন। কীট এবং ফার্ণ-জাতীয় উদ্ভিদের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য।
	পার্মিয়ান	·· ট্রাইলোবাইটের তিরোধান। কীট এবং উদ্ভিদের ক্রমোন্নতি। বাতাস হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সক্ষম মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিকাশ।
মেসোজোয়িক বা সেকেণ্ডারী	ট্রায়াসিক জুরাসিক ক্রেটেসিয়াস	বীজযুক্ত ফার্ণের বিলোপ। গ্যাস্ট্রোপড, সেফালোপড, বাইভাল্‌ভ প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য ক্রমবিকাশ। স্তন্যপায়ী জীবের বিকাশ। কনিফার শ্রেণীর উদ্ভিদের বিকাশ। জলে ও স্থলে বিভিন্ন প্রকার তৃণভোজী ও মাংসাশী সরীসৃপের উদ্ভব। উত্তরকালের পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবের পূর্ব্বাভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। এই যুগকে "সরীসৃপ-যুগ" বলা যাইতে পারে।
কেনোজোয়িক বা টারসিয়রী	ইয়োসিন	... বর্ত্তমান প্রাণিসমূহের প্রথম সূত্রপাত। ক্রেটেসিয়াস স্তর হইতে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী জীব সম্বন্ধে।
	ওলিগোসিন	··· বর্ত্তমান রূপের দিকে ক্রমোন্নতি।
	মাইয়োসিন	··· বর্ত্তমান রূপের দিকে ক্রমোন্নতি, বিশেষতঃ কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে।
	প্লাইয়োসিন	··· **মানুষের আবির্ভাব।** উদ্ভিদ এবং স্তন্যপায়ী জীবের সর্ব্বোন্নত শ্রেণী।
	প্লাইস্টোসিন	··· প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকারী 'প্যালিওলিথিক' (অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর যুগের) মানুষ।
	আধুনিক	··· মানুষের প্রাধান্য।

বহুকাললুপ্ত প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় প্রধানতঃ উহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সাহায্যে। যে প্রস্তরস্তরে কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার বয়স নির্ণয় করিয়া কোন্ প্রাণী কোন্ সময়ে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে নির্ণয় করা হইত। জলপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরের (sedimentary rocks) স্তরের স্থূলত্ব নির্ণয় করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তরের বয়স নির্ণয় করা হইত। এই হিসাবে পৃথিবীতে জীবনের প্রাচীনত্ব মাত্র ৪ কোটী বৎসর। এই পদ্ধতি ভ্রমসঙ্কুল এবং বিশেষ

নির্ভরযোগ্য নহে। বর্ত্তমানে অন্য উপায়ে প্রস্তরের বয়স নির্ণয় করা হয়। রেডিয়ম আবিষ্কারের পরে জানা গিয়াছে যে, রেডিয়ম স্বতঃই সীসায় রূপান্তরিত হইতেছে। কতখানি রেডিয়ম হইতে কতখানি সীসা কতদিনে পাওয়া যাইবে, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট হিসাব আছে এবং কোনও উপায়ে এই রূপান্তরের বেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং, কোনও প্রস্তরস্তরে রেডিয়ম ও সীসার অনুপাত পরিমাণ করিতে পারিলেই সেই স্তরের বয়সের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়। এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রস্তরের বয়স পাওয়া গিয়াছে ২০০ কোটী বৎসর। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, ইহার প্রায় ৫ লক্ষ বৎসর পরে জীবের উৎপত্তি হয়।



কয়েকটি ডিনোসরের তুলনামূলক আয়তন : উপরে—ব্রন্টোসৌরস (দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৫ ফুট) নীচে—টিরানোসৌরস রেক্স, ষ্টেগোসৌরস, ট্রিকেরাটপস এবং ট্রাখোডন।

কেনোজোয়িক কালে, বিশেষতঃ ট্রায়াসিক স্তরে, সরীসৃপ জাতীয় বহু প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল; এই সকল জন্তুর জাতিগত নাম 'ডিনোসর' (গ্রীক deinos—ভয়ঙ্কর, sauros—সরীসৃপ) অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সরীসৃপ। জীববিকাশের ঠিক কোন্ কালে ডিনোসরের উদ্ভব হয় বলা কঠিন, তবে বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে ডিনোসর জাতির জীবৎকাল প্রায় ১১ কোটি বৎসর।



দীর্ঘপুচ্ছ উভচর ডিনোসর ব্রন্টোসৌরস।

বিভিন্ন প্রকারের ডিনোসরের কঙ্কাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের আকৃতি কি রূপ ছিল নির্ণয় করা যায়। অবশ্য ইহা অত্যন্ত সহজ কাজ নহে। বহু সাধারণ লোকের ধারণা আছে যে, কঙ্কালের একটি হাড় বা একটি দাঁত পাইলেই বৈজ্ঞানিকেরা জন্তুটির আকার, আকৃতি এবং প্রকৃতি বলিতে পারেন। যতদিন পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, ততদিন বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যবেক্ষণ এবং জন্তুটির আকৃতির পুনর্গঠনের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। বর্ত্তমানে, তুলনামূলক শরীরসংস্থান বিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে খুব অল্প জিনিস হইতেই প্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্‌ব্রিজের মিঃ ফরস্টার কুপার বেলুচিস্থানে একটি কঙ্কালের মাত্র একটি পায়ের হাড়, গলার কাছের দুইখানি মেরুদণ্ডের হাড় এবং ছোটখাট আরও দুই একটি হাড় পান। কুপার মাত্র ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত করেন যে, জন্তুটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীব ছিল এবং আকার প্রকারে গণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। বেলুচিস্থানে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় বালুচি-থেরিয়ম। কুপারের আবিষ্কারের ১১ বৎসর পরে গোবী মরুভূমিতে বালুচিথেরিয়মের আরও অনেক হাড় পাওয়া যায়। 'আমেরিকান মিউজিয়ম অব ন্যাচরাল হিষ্ট্রী'র অধ্যক্ষ মিঃ রয় চ্যাপম্যান আণ্ড্রুজের নেতৃত্বে মধ্য-এশিয়ায় গোবী মরুভূমিতে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরিত হয়। এই অভিযানের আবিষ্কার হইতে বালুচিথেরিয়াম ও অন্যান্য প্রাক্-ঐতিহাসিক জীবজন্তুর বহু সংবাদ পাওয়া যায়। গোবী মরুভূমিতে বালুচিথেরিয়মের মাথার হাড়ের ৬০০ টুকরা পাওয়া যায় এবং এইগুলি সাজাইয়া সম্পূর্ণ মাথার কঙ্কালটি

পুনর্গঠন করিতে একজন লোকের সাত মাস সময় লাগিয়াছিল। কাজেই ব্যাপারটি যে নিতান্ত সহজ নহে তাহা বুঝা যায়।

সামান্য কয়েকটি হাড়, দু একটি দাঁত বা নখ হইতেও অনেক কিছু বলা যায়। পায়ের হাড় দেহের অন্য হাড় হইতে ভারী এবং সহজে ভাঙ্গে না বলিয়া পায়ের হাড়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। হাড়টি নিরেট হইলে বুঝিতে হইবে যে, জন্তুটি হয় জলচর, অথবা অত্যন্ত মন্থরগতি স্থলচর। কিন্তু হাড়টি নিরেট না হইয়া যদি ফাঁপা হয়, তাহা হইলে ক্ষিপ্রগতি স্থলচর হইবেই। সামনের পায়ের অপেক্ষা পিছনের পা বড় হইলে জন্তুটি দুই পায়ে চলিত বুঝা যায়। ধারাল নখ এবং দাঁত পাইলে জন্তুটি যে মাংসাশী ছিল, তাহা বুঝা যায়।

১০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে ডিনোসরদের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে মনে করেন। সেই প্রাচীন কাল হইতে



বামে—ত্রিশৃঙ্গ ডিনোসর ট্রিকেরাটপস, দক্ষিণে—হিংস্র ও মাংসাশী টিরানোসৌরস রেক্স।

অবিকৃত অবস্থায় আছে, ডিনোসরদের এইরূপ বহু পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পদচিহ্ন হইতে তাহাদের চলিবার ধরণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ডিনোসর খাড়া ভাবে হাঁটিত। ধীরে ধীরে চলিবার সময় অনেক সময় তাহাদের সামনের পা সামান্য মাটি ছুঁইয়া যাইত।

বিভিন্ন জন্তুর কঙ্কাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের একটা আনুমানিক আকৃতি খাড়া করা হইয়াছে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের বহু যাদুঘরে তাহা রক্ষিত রহিয়াছে। যাঁহারা সিনেমায় "কিং কং" নামে ফিল্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রাক্-ঐতিহাসিক জন্তু সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাইয়া থাকিবেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'কিং কং' নামে বিরাট বনমানুষের যে আকৃতি ছবিটিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কোন বৈজ্ঞানিক জন্তু নহে, উহা কল্পনা মাত্র।

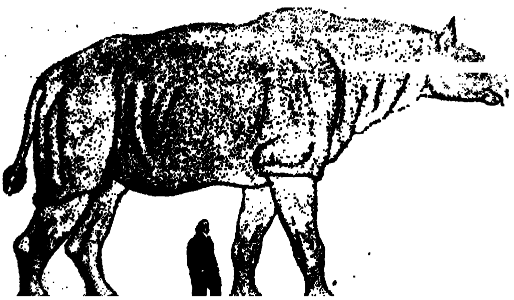
ডিনোসরগুলি অধিকাংশ অত্যন্ত বিরাট আকারের হইত। 'ব্রন্টোসৌরস' (অর্থ বজ্র-সরীসৃপ) ৬৫ হইতে ৭০ ফুট লম্বা হইত এবং ওজনে প্রায় ৭০০ মণ হইত। সকল ডিনোসরের মধ্যে ব্রন্টোসৌরসের নামই সমধিক পরিচিত, কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার নহে। জার্ম্মাণ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় এবং আমেরিকার কলোরাডোয় প্রাপ্ত 'ব্রাখিয়োসৌরস' দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ ফুট ছিল। ডিনোসরগুলি আকারে সাধারণতঃ বিরাট হইত, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিনোসরেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে 'আংখিসৌরস' আকারে একটি মুরগীর ছানার মত ছিল।

কয়েক জাতীয় ডিনোসর গাছপালা খাইয়া জীবন ধারণ করিত। দৈনিক কয়েক মণ, সম্ভবতঃ ৫।৬ মণ হইবে, তাহাদের আহার ছিল। কোন কোন ডিনোসর কেবল পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিত, কোন কোনটি আবার চলিবার সময় চারিটি পদই ব্যবহার করিত।

ডিনোসরসমূহ কেন বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার কোন সঠিক কারণ নির্ণীত হয় নাই। ব্রন্টোসৌরস এবং তাহারই জ্ঞাতি 'ডিপ্লোডোকাস' বড় বড় হ্রদের নিকটে থাকিত এবং আমাদের দেশের মহিষের মত জল ও স্থল দুইই তাহাদের প্রিয় ছিল। অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে, হ্রদগুলি কোন কারণে শুখাইয়া যাইলে ব্রন্টোসৌরস ও ডিপ্লোডোকাসের বংশের বিলোপ হয়। ডিনোসরগুলির প্রকাণ্ড দেহ সত্ত্বেও তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ছিল, কাজেই তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের বিলোপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ডিনোসরদের বিলোপ সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ আছে। ডিনোসরদের বংশবৃদ্ধি কিরূপে হয় তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। অধিকাংশ সরীসৃপ ডিম প্রসব করে এবং তাহা ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, যদিও এমন সরীসৃপও দেখা যায়, যাহারা একেবারেই সন্তান প্রসব করে। মধ্য-এশিয়ায় গোবী মরুভূমি অভিযানের পূর্ব্বে কোন স্থানেই ডিনোসরের ডিম পাওয়া যায় নাই, যদিও বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, সব না হইলেও অধিকাংশ ডিনোসরই ডিম প্রসব করে। গোবী মরুভূমিতে

যেখানে ডিনোসরের ডিম পাওয়া যায়, সেইখানে ছোট আকারের প্রায় ৬ ফুট লম্বা দন্তবিহীন অন্য এক জাতীয় ডিনো-



আধুনিক গণ্ডারের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ অতিকায় বালুচিথেরিয়ম।

সরের কঙ্কালও পাওয়া যায়। অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে, এই সকল ডিনোসর অন্য ডিনোসরের ডিম খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত। যেরূপ অবস্থায় ডিমগুলি ও ডিনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ডিনোসরটি মাটি খুঁড়িয়া ডিম খাইবার সময় বালুকাঝড়ে আচ্ছন্ন হইয়া মারা পড়ে। হয়ত এই ছোট জাতীয় ডিনোসরের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অন্য বড় ডিনোসরের সমস্ত ডিম ইহারা খাইয়া ফেলিত। ইহার ফলে বড় জাতীয় ডিনোসরের বংশবৃদ্ধি হইতে পারিল না এবং ছোট জাতীয় ডিনোসরগুলিও খাদ্যাভাবে মারা পড়িল, এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। এই সময়ে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি হয়। প্রথম স্তন্যপায়ী জীবগুলি আকারে ইঁদুর অপেক্ষা বড় ছিল না। এই প্রকার জন্তুর কঙ্কালও ডিনোসরের কঙ্কালের কাছাকাছি পাওয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, ইহারাও ডিনোসরের ডিম খাইত এবং ডিনোসর বংশের ধ্বংসের প্রধান কারণ না হইলেও ইহারা কতকাংশে দায়ী বটে।

সম্পূর্ণ কঙ্কাল হইতে কোন ডিনোসরের অবয়ব পুনর্গঠিত করা বিশেষ কঠিন কাজ নহে। এক জাতীয় ডিনোসর ‘ট্রাখোডন’এর (অর্থ, হংসচঞ্চু) গাত্রচর্ম্ম কিরূপ ছিল, আমেরিকার মনটানার বালিপাথরে তাহার ছাপ পাওয়া গিয়াছে। এই হংসচঞ্চু ডিনোসর লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট হইত এবং দাঁড়াইলে দৈর্ঘ্য হইত প্রায় ১৫ ফুট। ইহা পিছনের পায়ে ভর দিয়া চলিত এবং দেহের ভারসমতা রক্ষা করিবার জন্য ইহার একটি প্রকাণ্ড ভারী লেজ ছিল। এই লেজটি জমিতে ঠেকাইয়া রাখিয়া হংসচঞ্চু ভারসমতা রক্ষা করিত। বর্ত্তমানে বহু সরীসৃপ দেখা যায়, যাহাদের কোন দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে নূতন দাঁত গজায়। ট্রাখোডনেরও সেই সুবিধা ছিল। একটি কঙ্কালের চোয়ালে স্তরে স্তরে সাজান প্রায় এক হাজার দাঁত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ডিনোসর ছিল ‘টিরানোসৌরস রেক্স’ (অর্থাৎ, অত্যাচারী সরীসৃপের রাজা)। আকারে ইহা অপেক্ষাকৃত ছোটই ছিল। দাঁড়াইলে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ফুট হইত। ইহার সম্মুখের পায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখর ছিল। হাঁ করিলে ইহার হাঁ প্রায় দুই হাত বিস্তৃত হইত এবং ইহার



বিচিত্রদর্শন ডিনোসর জাতীয় ষ্টেগোসৌরসের না কি দুইটি মস্তিষ্ক ছিল।

মুখে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছোরার মত দুই দিকে ধারাল সুতীক্ষ্ণ দন্তরাজি ছিল। অন্য কোন ডিনোসর ইহার মত হিংস্র ছিল

না। ইহার খাদ্য ছিল অন্য ডিনোসরের মাংস। টিরানো-সৌরস রেক্স এবং ইহার ক্ষুদ্রতর জ্ঞাতি 'আল্লোসৌরস' ইহাদের অপেক্ষা বৃহদাকার ব্রণ্টোসৌরসের মাংস ছিঁড়িয়া খাইত। একটি ব্রণ্টোসৌরসের কঙ্কালে ইহাদের দাঁতের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। টিরনোসৌরস রেক্সের সহিত 'ট্রিকেরাটপ্‌স্' (অর্থ ত্রিশৃঙ্গ) ছাড়া অন্য কোন ডিনোসর আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার মাথায় তিনটি শৃঙ্গ ছিল, যদিও বর্ত্তমান কালের



ডক্টর কার্ল ডি. আণ্ডারসন।

গণ্ডারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহার মাথার হাড় উঁচু হইয়া মাথার পিছনে একটি ঢাল সৃষ্টি করিত। ইহার ওজন ছিল বোধ হয় ৩০০ মণের কাছাকাছি এবং দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০ ফুট। জন্তুদের গলা অত্যন্ত সহজভেদ্য স্থান, কিন্তু এই মোটা বর্ম্ম থাকায় আঘাত প্রতিহত করিবার সুবিধা থাকায় এবং আক্রমণের অস্ত্রস্বরূপ তিনটি প্রকাণ্ড শৃঙ্গ থাকায় টিরানোসৌরস রেক্স ইহার সহিত বিশেষ সুবিধা করিতে পারিত না।

আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার ডিনোসর পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্রদর্শন জীব ছিল 'ষ্টেগোসৌরস' (অর্থ, বর্ম্মাবৃত সরীসৃপ)। ইহাদের দেহ ছিল প্রকাণ্ড এবং ভারী মাথাটি ছিল নিতান্ত ছোট এবং পাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহার লম্বা লেজের শেষ প্রান্তে দুই জোড়া ৩ ফুট লম্বা বর্শার মত ধারাল ফলক থাকিত। ইহার শিরদাঁড়ার উপরে দুই সার বড় বড় হাড়ের ফলক থাকিত। এই দুই সারের ফলকগুলি পর পর বসান থাকিত। অন্য কোন জীবের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত বর্ম্ম-সংস্থান আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ষ্টেগোসৌরসের মাথাটি যেরূপ ক্ষুদ্র ছিল, তাহার মস্তিষ্কের পরিমাণও সেই অনুপাতে অল্প ছিল। বৈজ্ঞানিকদের মতে ইহা অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি অন্য কোন জীব ছিল কি না সন্দেহ। ইহার মস্তিষ্কের আরও একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রায় লেজের কাছে ইহার 'স্পাইনাল কর্ড' (spinal cord) বৃদ্ধি পাইয়া একটি দ্বিতীয় মস্তিষ্কের সৃষ্টি করিত। দুইটি মস্তিষ্ক থাকায় ইহার কি অবস্থা হইত তাহার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয় নাই।

ডক্টর কার্ল ডি. অ্যাণ্ডারসন

পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডক্টর কার্ল ডি. অ্যাণ্ডারসনের ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। ডক্টর অ্যাণ্ডারসন 'ক্যালিফোর্ণিয়া ইন্‌স্টিট্যুট অব টেক্‌নোলজি'র পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক। তিনি এই শিক্ষায়তনেরই ছাত্র; এইখান হইতেই তিনি গ্র্যাজুয়েট হন এবং ডক্টরেট পান।

বর্ত্তমানে, ক্যালিফোর্ণিয়া ইন্‌স্টিট্যুট অব টেকনোলজিতে তিনজন নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অপর দুইজনের একজন পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌ ডক্টর রবার্ট এ. মিলিক্যান এবং অপর জন জীব-বিজ্ঞানবিদ ডক্টর টমাস হাণ্ট মর্গ্যান। আমেরিকার অপর কোন শিক্ষায়তনে এতগুলি নেবেল-লরেট নাই।

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অ্যাণ্ডারসন ডক্টর উপাধি লাভ করেন এবং অধ্যাপক মিলিক্যানের সহযোগীরূপে ব্যোমরশ্মি সম্বন্ধীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ব্যোমরশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য তাঁহার দুইজনে একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ করেন। উইলসন প্রকোষ্ঠের সাহায্য লইয়া এবং একটি বিরাট

বৈদ্যুতিক চুম্বকের সহায়তায় তাঁহারা ব্যোমরশ্মির ক্রিয়ায় কোন্ বস্তু হইতে কি কি কণিকা বিচ্ছুরিত হয় এবং তাহার বেগ ও শক্তি পরিমাপ করেন। চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকাসমূহ বাঁকিয়া যায় এবং সরল হইতে বক্রপথের বিচ্যুতি পরিমাপ করিয়া কণিকাগুলির বেগ নির্ণয় করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা অত্যন্ত বেগে ধাবমান এবং প্রবলভাবে বিদ্যুতাবিষ্ট ইলেক্‌ট্রন পর্য্যবেক্ষণ করেন। অ্যাণ্ডারসন পরে উইলসন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি সীসার পাত রাখেন। এই বাধা অতিক্রম করিয়া যাইবার পূর্ব্বে এবং পরে কণিকার পথ নির্ণয় করিয়া অ্যাণ্ডারসন কণিকাগুলির ভার এবং বিদ্যুতাবেশ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাইবার চেষ্টা করেন।

অ্যাণ্ডারসনের এই পরীক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি দেখেন যে, সীসার ফলকের মধ্য দিয়া যাইবার পরে পজিটিভ-বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকার শক্তি কমিয়া যায় এবং তাহার পথ নেগেটিভ-বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা,—ইলেক্‌ট্রনের পথের বিপরীত দিকে বাঁকিয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই ইলেক্‌ট্রনগুলি নেগেটিভ বিদ্যুতাবেশযুক্ত নহে—পজিটিভ-বিদ্যুতাবেশযুক্ত। সুতরাং ইলেক্‌ট্রনের ন্যায় আরও একটি মূল কণিকা পাওয়া গেল। এই কণিকাকে বলা হয় 'পজিট্রন' বা পজিটিভ ইলেক্‌ট্রন।

ইহার পূর্ব্বে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্, দিরাক অঙ্ক কসিয়া এই প্রকার কণিকার অস্তিত্বের সম্ভাবনা দেখান। দিরাকও নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক, তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। এই গণিতমূলক সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া গেল অ্যাণ্ডারসনের পরীক্ষায়। এই পজিট্রন আবিষ্কারের জন্যই অ্যাণ্ডারসন নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। ডক্টর অ্যাণ্ডারসনের বয়স বেশী নহে, তিনি মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দিরাকও ৩১ বৎসর বয়সে নোবেল-পুরস্কার পান।

ডক্টর অ্যাণ্ডারসন এখন ব্যোমরশ্মি এবং পরমাণু-কেন্দ্রিন (nucleus) সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন।

অগ্নির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

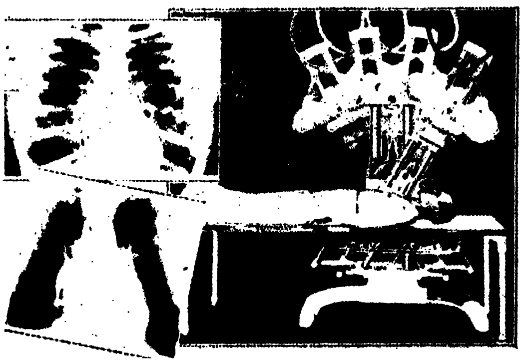
ঝরিয়া অঞ্চলে বহু কয়লার খনিতে আগুন জ্বলিতেছে। তাহা নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া, অনেক ক্ষেত্রে খনির মুখ বন্ধ করিয়া খনির কাজ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। একটি খনিতে আগুন লাগিলে তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত, যতদিন পর্য্যন্ত না দাহ্যবস্তু কয়লা শেষ হইয়া যায় জ্বলিতে থাকে। এক খনি হইতে অপর খনিতে অগ্নি সংক্রামিত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমেরিকার ওহায়ো প্রদেশে হকিং ভ্যালির একটি খনি গত ৫২ বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে। সংপ্রতি সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশের খনি-দুর্ঘটনার সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকায় ঐ অগ্নি-নির্ব্বাপণের ব্যবস্থা প্রাসঙ্গিক-বোধে "বঙ্গশ্রী"র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইল।

এই অগ্নিতে প্রায় ১৫ কোটী টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট কয়লা এবং প্রায় ৩০০ কোটী টাকা মূল্যের জমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কয়লার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নি-নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে ৭ বর্গমাইল ক্ষেত্রের মধ্যে অগ্নি আবদ্ধ থাকে এবং তাহার বাহিরে যাইতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। কয়লার স্তর যেখানে জমির নিকটে আছে, সেখানে বাষ্পচালিত যন্ত্র দিয়া কয়লা কাটিয়া ফেলা হইবে এবং সমস্ত ক্ষেত্রটির চতুর্দ্দিকে গভীর ভাবে একটি পরিখা খনন করিয়া তাহা মাটি দিয়া ভরাট করা হইবে। পরিখাটি এইরূপ চওড়া করা হইবে, যাহাতে আগুন একদিক হইতে অপর দিকে সংক্রামিত হইতে না পারে। একেবারে সমস্ত পরিখা খুঁড়িলে উপরে আগুন আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, প্রথমে উপরটি মাটি দিয়া চাপা দেওয়া হইবে এবং তাহার পর ভিতরে ড্রিল দিয়া গর্ত্ত করিয়া কাদা পাম্প করিয়া পরিখার গভীরতা বাড়ান হইবে। এই প্রচেষ্টায় খরচ পড়িবে প্রায় ১১ কোটী টাকা।

নূতন ধরণের এক্স-রে যন্ত্র

পুরাতন ধরণের এক্স-রে যন্ত্র ব্যবহারের একটি দোষ ছিল যে, তাহাতে অত্যন্ত তীব্র ছায়া পড়িত। ইহার ফলে এক্স-রে-সাহায্যে ফুস্‌ফুস্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে, ফুস্‌ফুসের কতক অংশ ছায়ার মধ্যে পড়ায়, ভাল বুঝা যাইত না। সংপ্রতি জার্ম্মানীতে এক প্রকার নূতন ধরণের এক্স-রে যন্ত্র

উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহাতে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইয়াছে। অল্প আলোতে ফটো তুলিবার সময় যখন ক্যামেরার লেন্স অধিকক্ষণ খুলিয়া রাখিতে হয়, তখন ক্যামেরার সম্মুখ দিয়া কোন লোক চলিয়া গেলে, প্লেটে তাহার ছবি উঠে না, কারণ এত অল্প সময়ে তাহার দেহ হইতে এত কম পরিমাণ আলোক প্লেটের উপর পৌঁছায় যে, তাহাতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আলোচ্য যন্ত্রটির সাফল্য এই মূল সূত্রের উপর নির্ভর করে। এই যন্ত্রে এক্স-রে নলটি এবং ফটো তুলিবার ফিল্ম দুইটিই স্থির না থাকিয়া এক দিক হইতে অপর দিকে গমন করে। নলটি বাম হইতে ডান দিকে একটি বৃত্তাংশের পথে পরিভ্রমণ করে এবং ফিল্মটি বিপরীত ভাবে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে সরিয়া যায়। যতক্ষণ



নূতন এক্স-রে যন্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী দক্ষিণে প্রদর্শিত হইয়াছে। বামে উপরে সাধারণ এক্স-রে ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফের প্রকৃতি তুলনীয়।

পর্য্যন্ত 'এক্সপোজার' দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক্স-রে নল এবং ফিল্ম বিপরীত দিকে পরিভ্রমণ করে। ইহাতে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দেহের কোন বিশেষ অংশ, যে অংশের এক্স-রে ফটোগ্রাফ প্রয়োজন, সেই অংশটি সকল সময়ে 'ফোকাসে' থাকে এবং অপর অংশগুলি থাকে না। ইহাতে ইচ্ছামত যে-কোন স্থানের ছায়া মন্দীভূত করা চলে এবং ফলে রোগনির্ণয়ের পক্ষে সাধারণ এক্স-রে ফটোগ্রাফ অপেক্ষা অধিকতর সহায়তা করে।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের নূতন এরোপ্লেন

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি সংপ্রতি সস্ত্রীক ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কর্ণেল লিণ্ডবার্গ জাতিতে মার্কিন। তাঁহার শিশুপুত্র চুরি এবং হত্যার পর তিনি আমেরিকা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। সংপ্রতি তাহার জন্য একটি নূতন এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইয়াছে। একা এরোপ্লেনে প্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া কর্ণেল লিণ্ডবার্গ বিখ্যাত হন। এরোপ্লেন নির্ম্মাণের প্রত্যেক অবস্থায় কর্ণেল লিণ্ডবার্গ নিজে তত্ত্বাবধান করেন এবং মোটামুটি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারেই যন্ত্রটি নির্ম্মিত হয়। এরোপ্লেনটির রং কাল ও কমলা, কারণ, এই দুটি রং আকাশের সকল প্রকার অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যন্ত্রটি বিলাতে তৈয়ারী হইলেও এঞ্জিনটি আমেরিকান। সাধারণ ইঞ্জিনের মত না হইয়া ইঞ্জিনটির সিলিণ্ডারগুলি উল্টাভাবে বসান হইয়াছে, ইহাতে চালকের দৃষ্টিক্ষেত্র সাধারণ এরোপ্লেন অপেক্ষা আরও প্রসারিত করা হইয়াছে। এরোপ্লেনের ডানাগুলি নীচু করিয়া বসান হইয়াছে। অধিকাংশ আধুনিক এরোপ্লেনের চাকাগুলি আকাশে উঠিবার পর এরোপ্লেনের দেহের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখা হয়, কারণ ইহাতে বাতাসের বাধা কম হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ণেল লিণ্ডবার্গের এরোপ্লেনে এরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই, কারণ বহু ক্ষেত্রে নামিবার সময় চাকা আটকাইয়া যায়, ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে চায় না। এরোপ্লেনটির মোট ওজন ৩০ মণের কিছু বেশী এবং সর্ব্বাধিক বেগ ঘণ্টায় ২০০ মাইল। এরোপ্লেনটির নূতনত্ব তাহার বসিবার স্থান বা 'কক্‌পিট'-এ। কক্‌পিটের উপরে আগাগোড়া স্বচ্ছ প্লাসটিক দিয়া আবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আবরণীর দুই পাশের অংশ ইচ্ছামত উঠান বা নামান যায়। চালক ব্যতীত আর একজনের বসিবার আসন আছে। আসন দুইটি পাশাপাশি না হইয়া একটির পিছনে আর একটি অবস্থিত। এই আসনটি কর্ণেল লিণ্ডবার্গের স্ত্রীর জন্য। আসনের পিছনে মালপত্র রাখিবার স্থান। এখানে সুটকেশ রাখিবার এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, তাহা কক্‌পিটের ভিতর ও বাহির হইতে একটি দরজা খুলিয়া বাহির করা যাইতে পারে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এরোপ্লেনের ভিতর একটি ছোট তাঁবু ও ভাঁজ করা চলে এরূপ একটি ক্ষুদ্র নৌকা আছে। রেডিয়ো এবং আকাশ-ভ্রমণ ও নৌকাবিহারের জন্য যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন, তাহাও আছে। ইচ্ছামত এরোপ্লেনের চাকা খুলিয়া সেই স্থানে

দুইটি ভেলা লাগাইয়া দিয়া এরোপ্লেনটিকে সি-প্লেনেও পরিণত করা চলিতে পারে।

শিশুপালনের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আজকাল আধুনিক মনোভাব-প্রাপ্ত সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। বিশেষতঃ খাদ্য সম্বন্ধে এই সকল ব্যক্তিরা অত্যন্ত মনোযোগ দিতেছেন। কোন্ খাদ্যের তাপ দিবার ক্ষমতা কতখানি, তাহাতে ভিটামিন আছে কি না, প্রোটিনের পরিমাণ কত ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া কেহই কোন জিনিষ খাওয়া বিজ্ঞান-সম্মত মনে করেন না। খাদ্যতালিকা সুসমঞ্জস (balanced) করিবার জন্য বিভিন্ন দেশোপযোগী বহু তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এ ঢেউ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে কোন সাময়িক পত্রিকা খুলিলেই বাঙ্গালীর খাদ্য-সম্পর্কীয় কোন না কোন প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে। আমাদের অসম্পূর্ণ খাদ্যতালিকা যে আমাদের সকল প্রকার দৈহিক, মানসিক, রাজনৈতিক (হয়ত বা আধ্যাত্মিকও) ক্ষতি করিতেছে, এরূপ মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে বিরল নহে। সরকার পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং পরিপুষ্টি-সম্বন্ধীয় গবেষণাও চলিতেছে। এই প্রকার মতবাদের বিপরীতেও যে বলিবার থাকিতে পারে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না, এমন কি অন্য কেহ ভাবিলেও তাহা সহ্য করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। গত মাসে এই সম্পর্কে ভিলহিয়ালমুর ষ্টেফানসনের মতামত "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। সংপ্রতি এই প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিরুদ্ধতার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা 'বৈজ্ঞানিক' দেশ আমেরিকা হইতে।

অনেক খাদ্য আছে যাহা শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু জনৈক আমেরিকান চিকিৎসকের একটি পরীক্ষায় ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। কয়েকজন শিশুর সম্মুখে প্রত্যহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন খাদ্য খাইতে পারে। বহু শিশুই এমন অনেক খাদ্য পছন্দ করিল এবং তাহা এই পরিমাণে খাইতে লাগিল যে, সাধারণ লোকের মতে তাহাদের মারা যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ফলে দেখা গেল যে, তাহাদের কোন শারীরিক ক্ষতিই হইল না। একদল বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ইতর প্রাণীদের মত খাদ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা শিশুদের সহজাত ক্ষমতা। এই পরীক্ষায় তাঁহাদের মতের কিছু পরিমাণে পোষকতা পাওয়া গেল। যদিও অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক কোন প্রশ্নের দুই দিক্ তলাইয়া দেখেন না। তাঁহাদের মতে যাহা ঠিক, তাহা নির্ভুল বলিয়াই তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা থাকে।

শিশুদের জন্য যে খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কোন একটি বিশেষ জিনিষ না খাইতে চাহিলে জোর করিয়া খাওয়ান অত্যন্ত অন্যায়, তাহাতে বিজ্ঞানের যতই অবমাননা হউক না কেন। কোন খাদ্য পছন্দ না হইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জন্মাইতে হয়। কোন খাদ্যতালিকার সকল খাদ্য যে প্রত্যহই খাওয়াইতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। সাময়িক বিরক্তি ঘটিলে বরং কিছুদিন বাদ দেওয়াই ভাল। জোর করিয়া খাওয়ানোর ফলে অনেক শিশুর অনেক খাদ্যে এরূপ বিরক্তি ধরিয়া যায় যে, সমস্ত জীবনে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার জন্য কোন আগ্রহের সৃষ্টি করা যায় না। ইহার ফলে হয়ত কোন প্রয়োজনীয় খাদ্য বরাবরের জন্য তাহার খাদ্যতালিকার বাহিরে চলিয়া যায়। "বঙ্গশ্রী"র বহু পাঠক-পাঠিকা হয়ত দুধ খাইতে একেবারেই নারাজ এবং তাহার কারণ শিশুকালে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রত্যহ দুধ খাওয়ান। শিশুকালে মাঝে মাঝে দুই চারিদিন দুধ খাওয়ান বন্ধ করিলে সম্ভবতঃ এই প্রকার ঘটিতে পারিত না। বর্ত্তমান কালে পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে লোকে এতদূর সচেতন হইয়া পড়িয়াছে যে, মাতারা সকল সময়েই ভাবিতেছেন, তাঁহার শিশুর বোধহয় যথাযোগ্য পুষ্টি হইতেছে না এবং তাহার জন্য সকল প্রকার সম্ভব ও অসম্ভব প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন এবং ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিতেছেন।

পৃথিবীর প্রবলতম চুম্বক

আমেরিকার সরকারী 'মাইনিং' ও 'মেটালার্জ্জী'-বিভাগের ডক্টর ফ্রন্সিস বিটার পৃথিবীর প্রবলতম চুম্বক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণের জন্য কম্পাসের

কাঁটা সকল সময় উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত থাকে। চৌম্বক আকর্ষণের পরিমাণ করা হইয়া থাকে 'গাউস' নামক একক (unit) হিসাবে। জার্মান বৈজ্ঞানিক চুম্বকতত্ত্ববিশারদ গাউসের নামে এই নামকরণ হইয়াছে। পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণের পরিমাণ প্রায় আধ গাউস, আলোচ্য বৈদ্যুত চুম্বকের আকর্ষণ-ক্ষমতা প্রথম পরীক্ষায় ৭৫,০০০ গাউস হইয়াছিল। যন্ত্রটিতে মোট ১ লক্ষ গাউস প্রবল চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে। সাধারণ লোকের ধারণা আছে যে, চুম্বক মাত্র লৌহের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে, কিন্তু প্রবল চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিয়া



পৃথিবীর প্রবলতম বৈদ্যুত চুম্বক ও তাহার উদ্ভাবক ডক্টর বিটার।

দেখা গিয়াছে যে, সকল বস্তুর উপরই চুম্বকের ক্রিয়া আছে, যদিও লৌহের তুলনায় অন্য বস্তুর উপর ক্রিয়া অত্যন্ত সামান্য। এই নূতন চুম্বক সাহায্যে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল প্রবল চুম্বক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের নির্ম্মাণ-কৌশল এইরূপ যে, প্রবল চৌম্বক ক্রিয়া অধিক সময়ের জন্য ব্যবহার করা যাইত না, অথবা চুম্বকটির ক্ষেত্র এইরূপ স্বল্পপরিসর ছিল যে, অধিক স্থানের উপর তাহার ক্রিয়ার ফল বুঝা যাইত না।

এই চুম্বকটির জন্য যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজন, তাহাতে অনায়াসে একটি ছোট শহরের বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা মিটান যাইতে পারে। একটি বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানায় এবং তাহার কর্ম্মীদের সহযোগিতায় ডক্টর বিটার তাঁহার পরীক্ষা করেন। চুম্বকটির জন্য ২৫০ ভোল্ট চাপে (কলিকাতার বৈদ্যুতিক চাপ ২২০ ভোল্ট) ১২০০০ অ্যাম্পিয়ার বৈদ্যুতিক প্রবাহ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু পরীক্ষার সময় মাত্র ৮০০০ অ্যাম্পিয়ার ব্যবহার করা হয়। এত অধিক বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই জন্য জলের প্রবাহ দ্বারা চুম্বকটি শীতল করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

মোটর চালাইবার নূতন জ্বালানী

মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য সাধারণতঃ পেট্রল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। স্বাভাবিক পেট্রল ব্যতীত কৃত্রিম উপায়েও আজকাল পেট্রল তৈয়ারী করা হইতেছে। পেট্রলের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া বর্ত্তমানে অন্যান্য জ্বালানী ব্যবহার করিয়া মোটরগাড়ী চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ডিজেল তৈলে চালিত মোটরগাড়ী এবং মিথেল গ্যাসের সাহায্যে চালিত মোটরগাড়ীর কথা পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী"তে উল্লিখিত হইয়াছে। সংপ্রতি বেলজিয়ামের 'রয়াল অটো-মোবিল ক্লাব' অন্য জ্বালানী দিয়া মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই পুরস্কার পাওয়ার আশায় অনেকে অ-সাধারণ জ্বালানী দিয়া মোটরগাড়ী চালাইয়াছেন। ইহঁাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তৈল তুলার বীজের তৈল এবং পাম তৈল (পামগাছ তাল গাছ নহে তবে ঐ শ্রেণীর বটে)। মোটরগাড়ী অপেক্ষা, মোটর লরীর পক্ষেই এইগুলি অধিকতর উপযোগী। একটি পাঁচ-টন লরী ১০০ কিলোমিটার (৬·২৫ মাইল) চলিতে ২৭ লিটার (১ লিটার প্রায় ১ সেরের সমান) তুলার বীজের তৈল ব্যবহার করে। মাইল ও গ্যালন হিসাব করিলে ইহা দাঁড়ায় প্রতি গ্যালনে ৮·৭১ মাইল। ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলার বীজ বিদেশে চালান যায় এবং বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয়া কঠিনাকার ধারণ করিয়া তথাকথিত 'ভেজিটেবল ঘি' রূপে আবার আমাদের দেশে ঘুরিয়া আসে।

ছোট ও বড়

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু ইলেকট্রন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিমিত মান ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাল' টি. কমটন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাশাপাশি ইলেকট্রন সাজাইলে ইলেকট্রনের সংখ্যা হইবে ১-এর পর ১১০টি শূন্য।

ধূলা

জনৈক বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুসারে প্রত্যেক সহরবাসী প্রশ্বাসের সহিত প্রতি মিনিটে ৯০ কোটী ধূলিকণিকা ফুস-ফুসের মধ্যে গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে ৯ কোটী ধূলিকণিকা ফুসফুসে থাকিয়া যায় এবং বাকি নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসে।

মাছের ময়দা

আমেরিকান পদ্ধতি অনুসারে রুটি-জ্যাম খাইবার ফলে জাপানী ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের সতর্ক করা সত্ত্বেও অনেকে তাহাদের অভ্যাস ছাড়িতে পরিতেছে না। তাহাদের জন্য মাছ হইতে ময়দা জাতীয় কিছু তৈয়ারী করা যায় কি না তাহার চেষ্টা জাপানে চলিতেছে। অবশ্য এই ময়দায় মাছের গন্ধ ও স্বাদ থাকিবে না। ইহা সম্ভব হইলে রুটিও খাওয়া চলিবে, অথচ স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে, এই রূপ আশা করা যাইতেছে।

সর্দ্দির ব্যয়

সামান্য সর্দ্দি সারাইবার জন্য আমেরিকার বাৎসরিক ১৫০ কোটি টাকা খরচ হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পোকার আচরণ

শৈত্য প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ পোকার জীবনীক্রিয়া মন্থর হইয়া পড়ে। একটি কীট পাওয়া গিয়াছে যাহার আচরণ বিপরীত। ক্ষুদ্র কীটের নামটি বৃহৎ গ্রিল্লোব্লটা কাম্পো-ডাইফর্মিস (grylloblatta compodeiformis। ইহার জীবনীক্রিয়া সবিশেষ বেগবতী হয় বরফ জমিবার শৈত্যের কাছাকাছি। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ৩৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে, বরফ জমে ৩২° ফারেণহাইট উত্তাপে। ৮০° ডিগ্রী উত্তাপে এই পোকার সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হয়।

তিমির কাণ্ড

তিমি যেরূপ বৃহৎ জন্তু (মৎস্য নহে—স্তন্যপায়ী জীব, অতএব মানুষের সগোত্র), তাহার বৃদ্ধির হারও সেইরূপ। এক জাতীয় তিমি (finner whale) সর্ব্বাধিক বৃদ্ধির সময় দৈনিক একটি ব্যক্তির ওজনের সমান পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রকৃত শিক্ষা

...যাহাতে ছাত্রগণ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে কোন্ উপায়ে অর্থসমস্যা, অথবা শারীরিক স্বাস্থ্যসমস্যা অথবা মানসিক অশান্তির সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে, তাহা মানুষের পক্ষে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। যে শিক্ষায় মানুষের যে কোন অবস্থায় তাহার অর্থ-সমস্যা, শারীরিক সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং মানসিক অশান্তির সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে, সেই শিক্ষাকে মানুষ আবহমান কাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া আখ্যাত করিয়া আসিতেছে এবং যে শিক্ষায় ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হইয়া, ঐ সমস্যাসমূহের জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাকে মানুষের ভাষার যুক্তিসঙ্গত ভাবে কু-শিক্ষা বলিতে হয়।...

হিন্দু-বিবাহ

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

করকমলেষু

হিন্দুবিবাহের যথার্থ পদ্ধতিটি কি, তা' জানবার তোমার কৌতূহল আছে। এর কারণ আমাদের সমাজের বিবাহ-পদ্ধতিটি এত জটিল ও জাতিতে জাতিতে, এমন কি পরিবার পরিবারে এত বিভিন্ন যে, সে সকলের ভিতর একটা ঐক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। এ মহাদেশের অন্তরে নানা প্রদেশ আছে এবং সে সব প্রদেশে নানা বিভিন্ন জাতি বাস করে, যাদের ভিতর নাড়ীরও যোগ নেই, ভাষা-রও যোগ নেই। উপরন্তু এ দেশের বয়েস হাজার তিনেক বৎসরের কম নয়। ফলে সামাজিক সকল বিষয়ের রীতি পদ্ধতি কালক্রমে এতটা বহুরূপী হয়েছে যে, হিন্দু আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্য যুগে যুগে বেড়েই চলেছে বই কমেনি। এর থেকে অবশ্য মনে ক'রো না যে, সেকালের কোন সংস্কৃত আচার ভেঙ্গে নানা প্রাকৃত আচারে পরিণত হয়েছে, অথবা নানা বিভিন্ন প্রাকৃত আচার ক্রমে সংস্কৃত হয়ে এক আচারে পরিণত হয়েছে। যা হয়েছে, তা এই—আর্য্যদের আচার আর্য্য অনার্য্য সকলে গ্রাহ্য করেছে;—অন্ততঃ আংশিক ভাবে। হিন্দুসমাজ একটা খিচুড়ি সমাজ; খৃষ্টান সমাজ বা মুসলমান সমাজের যে ঐক্য আছে, সে ঐক্য হিন্দু সমাজে খুঁজে বার করা অসম্ভব। তারপর ইংরেজী মনোভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে অবধি আমাদের সমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করে ফেলেছে—অর্থাৎ মুক্তি দিয়েছে। কেননা, কারও কারও মতে শিকল ছেঁড়ার সংস্কৃত নামই হচ্ছে মুক্তি। এই ধর না কেন, যে-সমাজের তুমি আমি মেম্বর,—সে সমাজটি কি? সেই হিন্দু-সমাজ, যে-সমাজ পুরোনো হিন্দু-সমাজের লোহার শিকল ভেঙ্গেছে। অথচ কোন নতুন সোণার শিকল আমরা গড়ে তুলিনি। ফলে আমাদের সমাজ হচ্ছে আধা-হিন্দু, আধা-বিলেতি। তাই যার যেমন খুসী তিনি সেই রকম আচার অবলম্বন করেন, অর্থাৎ তার ভিতর হিন্দু অনাচারও আছে। এ অবস্থায় আমাদের ভিতর পরম্পরাগত কোনরূপ অবিকল আচারই নেই; সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে ঠিক আচারটি যে কি, তা' বলা কঠিন।

এ দেশে আচারের ঐক্য যদি কোথাও থাকে ত শাস্ত্রীয় আচারে আছে;—লোকাচারেও নয়, দেশাচারেও নয়, কুলাচারেও নয়। ভারতবর্ষের এই বিপুল জনসঙ্ঘকে একটি ধরবার ছোঁবার মত unity দেবার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের শাস্ত্রকারেরা। এই কারণেই হিন্দুমাত্রেই এত শাস্ত্রভক্ত। হিন্দুসমাজ বলে যদি কোন সমাজ থাকে ত' সে শাস্ত্রশাসিত সমাজ। শাস্ত্র অবশ্য লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারকে উপেক্ষা করেনি। তবে এ সব আচারের মধ্যে সদাচারকেই গ্রাহ্য করেছে, অনাচারকে নয়। এবং প্রধানতঃ ব্রাহ্মণসমাজের আচারকেই সদাচার বলে গ্রাহ্য করেছে। কারণ, বহু লোকাচারকে শাস্ত্র দুর্নীতিমূলক বলে আমল দেয়নি। শাস্ত্রভক্তি সমাজের organising principle-এর প্রতি ভক্তি। এখন আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সহজে এই শাস্ত্রীয় আচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। যদিচ শাস্ত্রসম্বন্ধে আমার জ্ঞান অল্প, নানা শাস্ত্রের নানামত আছে এবং অনেকস্থলে সে সব মতও পরস্পরবিরুদ্ধ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রাচীন মতেরই উল্লেখ করব। সুধু এই কথাটা মনে রেখ যে, এদেশে প্রাচীন শাস্ত্র আজও সমাজকে শাসন করছে। শাস্ত্রের অধীনতা থেকে সমাজ আজও মুক্ত হয়নি। তা যে হয়নি, তার প্রমাণ ত নিত্যই পাও। যখনই বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা বাড়ীর ভিতর হয়, তখনই মেয়েরা সব শাস্ত্রী হয়ে ওঠেন এবং কিংকর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। সে সব মতামত আমরা গ্রাহ্য করতেও বাধ্য হই। কারণ বৈদিকশাস্ত্রের পাশাপাশি একটী মেয়েলী শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। আর এই মেয়েলী শাস্ত্রই বিবাহ-পদ্ধতিকে এত গুরুভার ও ব্যয়সাধ্য করে তুলেছে। অবশ্য মেয়েলী

শাস্ত্র বৈদিক শাস্ত্রকে অপদস্থ করতে পারেনি, শুধু তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আমি পূর্ব্বে যে ঐক্যের কথা বলেছি, তা অবশ্য এ মেয়েলী শাস্ত্রে নেই, আছে শুধু বৈদিক শাস্ত্রে। তাই আমি সেই শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দেব। স্ত্রী-আচার অবশ্য সদাচারও নয়, অনাচারও নয়,—অত্যাচার মাত্র।

শাস্ত্রমতে বিবাহ জিনিষটে আগে ছিলনা। ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু নামক জনৈক ঋষি সর্ব্বপ্রথমে বিবাহ-প্রথার প্রচলন করেন। উক্ত ঋষিটি যে কে, ও কোন সময়ের লোক, তা কেউ জানেন না। কিন্তু এই কিম্বদন্তি থেকে প্রমাণ হয় যে, আদিতে আমাদের সমাজে বিবাহ ছিলনা। এর অর্থ এ নয় যে, পুরাকালে স্ত্রী-পুরুষের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিবাহ নামক legal সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তার কোনও পদ্ধতিও ছিলনা। বিবাহ জিনিষটে আসলে legal ব্যাপার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অবশ্য free love প্রচলিত ছিলনা। যেখানে পরিণয়ের সঙ্গে প্রণয়ের বিরোধ ঘটে, সেখানেই free love কাম্য হয়; কিন্তু যে সমাজে পরিণয় নেই, সে সমাজে free loveএরও প্রয়োজন নেই।

কোন সময় থেকে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হল, তা বলা কঠিন। যে সময়ে বেদ রচিত হয়, সম্ভবতঃ সে সময়ে বৈদিক সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বেদে অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুতে বিবাহ-পদ্ধতির বর্ণনা আছে কি না জানিনে। শুনতে পাই অথর্ব্ববেদে আছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদ বহুকালাবধি বেদ বলে গণ্য হয়নি, ও-বেদ অভিচার-প্রাণ বলে। অভিচার কস্মিনকালেও সদাচার বলে ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রাহ্য করেনি।

বিবাহকে শাস্ত্রাচার্য্যেরা যে বৈদিক বলেন, তার কারণ বিবাহযজ্ঞেও ঋক্ উচ্চারণ করিতে হয়। অতি প্রাচীন-কালেও বিবাহ যে মন্ত্রবর্জ্জ নয়, এ সত্য সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল। এই কারণেই শূদ্রের বিবাহকে তাঁরা বিবাহ বলে অঙ্গীকার করেননি; কারণ শূদ্রের বৈদিকমন্ত্রে অধিকার ছিলনা।

এই বিবাহযজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম্মের আমরা প্রথম পরিচয় পাই গৃহ্যসূত্রে। এই গৃহ্যসূত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিজ-সমাজে প্রচলিত আচারকে লিপিবদ্ধ করা। আর বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যে আলোচনা ও বিচার করা হয়েছে, সে সবই গৃহ্যসূত্রের বচনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি রচনা করেছেন, তা হচ্ছে গৃহ্য-সূত্রেরই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। সুতরাং আমি গৃহ্যসূত্রের পদ্ধতিরই পরিচয় দেব। আমাদের দেশে শাস্ত্র যে পুরোনো হয় না, তার প্রমাণ গৃহ্যসূত্রে, খুব সম্ভবতঃ পঁচিশ শ' বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়েছিল; আর আজও আমরা তারই জের টেনেই চলেছি।

আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আট রকম বিবাহের উল্লেখ আছে। যে কালে মনুসংহিতা লেখা হয়েছিল, তখন যে সমাজে এই আট রকম বিবাহই প্রচলিত ছিল, তা অবশ্য নয়। কারণ এর ভিতর অনেক বিবাহকে কোন হিসেবেই Sacrament বলা যায় না, Contractও বলা যায়না। প্রাচীন শাস্ত্রে গৃহ্যসূত্রে এ সবের উল্লেখ আছে বলেই ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা তার পুনরুল্লেখ করেছেন। গৃহ্য-সূত্রকাররা যা বলেছেন,ধর্ম্ম-শাস্ত্রকাররা তাই তোতাপাখীর মত আওড়ে গেছেন। গৃহ্যসূত্রের মতে বিবাহ ব্রাহ্ম ইত্যাদি অষ্টবিধ, তার মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই আদি। কারণ, ব্রাহ্মণদের সমাজে এ বিবাহ প্রচলিত। গান্ধর্ব্ব ক্ষত্রিয়দের বিবাহ; কারণ, পুরাণে এর পরিচয় পাওয়া যায়। রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রের বিবাহ। আসুর বৈশ্যদের বিবাহ, কারণ এর ভিতর দেনাপাওনা আছে। বাকী তিনটি—দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য অনিয়ত এবং পৈশাচ নিন্দিত।

এর থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহই শাস্ত্রকারদের অনুমত। অপর সাতটি স্ত্রী-সংগ্রহের উপায়কে তাঁরা পুরোপুরি শাস্ত্রীয় বিবাহ বলে গণ্য করতেন না। আর এই ব্রাহ্ম বিবাহের পদ্ধতির তাঁরা বর্ণনা করেছেন। এবং কালক্রমে এই ব্রাহ্ম বিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকল জাতেরই একমাত্র বিবাহ-পদ্ধতি হয়ে উঠেছে,—এমন কি শূদ্রদেরও। আড়াই হাজার বছর আগে হয় ত দ্বিজ ও শূদ্রের ভিতর একটা স্পষ্ট পার্থক্য ছিল,—কিন্তু কালক্রমে সে পার্থক্য দূর হয়েছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, শূদ্র বলে গণ্য হয়েছে; এবং অনেক শূদ্র ও বৈশ্য,

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছে। আর বর্ত্তমানে সমস্ত হিন্দু জাতটাই যে বর্ণসঙ্কর, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। সকলেই এই ব্রাহ্ম বিবাহপদ্ধতিই আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং এই ব্রাহ্ম বিবাহ-পদ্ধতিটি যে কি, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেব। কারণ, হিন্দু-বিবাহ বলতে একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহই বোঝায়। আজকাল যাদের "হরিজন" বলে, শাস্ত্র অবশ্য তাদের স্পর্শ করেনি।

এখন গৃহ্যসূত্রোক্ত বিবাহ-বিধির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গৃহ্যসূত্রেরও একাধিক সংগ্রহ আছে; তাদের মধ্যে আমি শুধু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে পরিচিত। আর এ প্রবন্ধে আমি একমাত্র সেই সূত্রই অনুসরণ করব। সম্ভবতঃ সামবেদীয় গোভিল গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে।

অশ্বলায়ন বলেন যে, বিবাহ সর্ব্বকালে হয়। অর্থাৎ ও কর্ম্ম বারো-মেসে।

বিবাহের পূর্ব্বে চারটি হোম করতে হবে। বিবাহ ব্যাপারে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে কুলপরীক্ষা। এস্থলে কুল মানে হচ্ছে বর-কনের মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষ ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ পর্য্যন্ত—বিদ্যাদিতে শুদ্ধ। এ নিয়ম এখনও প্রচলিত থাকলে একালে আমাদের দেশে আর কারও বিবাহ হত না।

এর পর অপর গুণের বিধি আছে। প্রথম, বুদ্ধিমান বরকে কন্যা দান করবে। তারপর কন্যার এই সকল গুণ থাকা চাই,যথা—বুদ্ধি, রূপ, শীল, সুলক্ষণ ও রোগমুক্ত স্বাস্থ্য। এ গুণগুলি কি?—বুদ্ধির অর্থ হচ্ছে, শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে বুদ্ধি। রূপ নির্ভর করে বরের রুচির উপর, আর সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ সব দুর্জ্ঞেয়।

তারপর অলঙ্কৃত কন্যাকে পাঁচজনের সুমুখে দান করাই হচ্ছে ব্রাহ্ম বিবাহের প্রথম অঙ্গ।

তারপর বিবাহ ব্যাপারে উচ্চ-নীচ অনেক প্রকার জনপদধর্ম্ম ও গ্রাম-ধর্ম্ম আছে। এই সব ধর্ম্মের ভিতর যা সর্ব্বলোকসামান্য, তাই গ্রাহ্য। সে সামান্য ধর্ম্ম হচ্ছে এই—

"অগ্নির পশ্চাতে একখানি পাথরের আসন প্রতিষ্ঠা করে এবং সুমুখে জলের কলসী রেখে, অগ্নিতে আহুতি দিয়ে, বর তাঁর সম্মুখীন কন্যাকে বলবেন—ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।" এ কথা কটি শাস্ত্রে যেমন আছে তেমনি তুলে দিলাম।

উক্ত মন্ত্রটির বাঙ্গলা অনুবাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে এইরূপ আছে—"আমি সৌভাগ্যনিমিত্ত তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি, তুমি যাবজ্জীবন আমার সহিত অবস্থান করিবে।"

পাণিগ্রহণের পর তিনবার বিবাহ-অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়।

তারপর সপ্তপদী।

"সখা সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব"—সপ্তমপদে এই কটি কথা বলবার পর বিবাহকর্ম্ম সমাপ্ত হয়।

শাস্ত্রমতে বিবাহকর্ম্মের প্রথম কর্ম্ম হচ্ছে সম্প্রদান, দ্বিতীয় কর্ম্ম পাণিগ্রহণ, আর শেষ কর্ম্ম সপ্তপদী।

আমি যখন তোমাদের কাছে গৃহ্যসূত্রের উল্লেখ করি, তখন তোমরা অনেকে হেসে উঠেছিলে এই মনে করে যে, আড়াই হাজার বৎসরের বুড়ো শাস্ত্রকে এ ক্ষেত্রে টেনে আনবার আর কোন প্রয়োজন নেই, পাণ্ডিত্য দেখানো ছাড়া। শাস্ত্রে যে আমার কোনরূপ পাণ্ডিত্য নেই, সে কথা তোমরাও জানো, আমিও জানি।

গৃহ্যসূত্রের উল্লেখ করবার কারণ এই, আজ পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে যে বিবাহবিধি সকলে অনুসরণ করছে, সে বিধির পরিচয় আমরা গৃহ্যসূত্রে পাই।

অবশ্য ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আচার অল্প-বিস্তর বদলে গিয়েছে। কিন্তু সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী—এই তিনটি যে বিবাহবিধির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, সে বিষয়ে কি মতে, কি ব্যবহারে, কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি। আজ পর্য্যন্ত হিন্দু বর কন্যার পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে পদগ্রহণ করেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রকাররাও এ বিষয়ে একমত। মেধাতিথি থেকে কুল্লুক ভট্ট পর্য্যন্ত মনুভাষ্যকারদের এ বিষয় কোনও মতভেদ নেই। আমি প্রথমেই বলেছি যে, বিবাহ একটি legal ব্যাপার, ইংরাজীতে যাকে বলে lawful wedlock. এখনও হিন্দু বিবাহের এ তিন অঙ্গের কোন অঙ্গ বাদ দিলে সে বিবাহ বৈধ হয় না, অর্থাৎ আইনতঃ সিদ্ধ হয় না।

এখন আমি বিবাহের legal দিকটার দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি জানি যে, এ বিষয়ে লম্বা

বক্তৃতা তোমাদের পক্ষে অসহ্য হবে। কারণ এ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া স্ত্রীধর্ম্ম নয়। আমাদের দেশে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মবাদিনীর নাম আমি আজও শুনি নি। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, metaphysics স্ত্রীজাতির অধিকারভুক্ত হলেও, ধর্ম্ম (law) তাদের অধিকারভুক্ত নয়; যদিচ ধর্ম্ম তোমরা পুরুষদের চাইতে বেশী মানো।

এ স্থলে শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, পৃথিবীর যে-দেশে ও যে-সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, সেখানেই স্ত্রী-পুরুষের এ সম্পর্ক একটি legal সম্পর্ক। উপপত্নী যে ধর্ম্মপত্নী নয় এ কথা তোমরা সকলেই জান। অবশ্য এক দেশের আইন আর এক দেশের আইন নয়; কিন্তু বিবাহ জিনিষটে কোন দেশেই বেআইনী নয়;—এমন কি বর্ত্তমান রাশিয়াতেও নয়।

এখন কন্যাসম্প্রদানের অর্থ হচ্ছে এই যে, কন্যার উপর পিতার যে স্বত্ব আছে, তাই ত্যাগ করা। এ স্বত্বকে Roman Lawতে patria-potestas বলত। আমি মধ্যে মধ্যে Roman Lawর উল্লেখ করতে বাধ্য হব; কারণ, Hindu Lawর সঙ্গে Roman Lawর অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল আছে। সম্প্রদানের অর্থ মেয়েকে goods and chattels-এর মত দান করা নয়। সেকালে বাপের শুধু মেয়ের সম্পর্কে নয়, ছেলের সম্পর্কেও দান, বিক্রয়, এমন কি বধ করবারও অধিকার ছিল। সম্প্রদান অর্থাৎ এই সকল অধিকার ত্যাগ করা।

পাণিগ্রহণের অর্থ হচ্ছে কন্যাকে বরের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা।

আর সপ্তপদীর অর্থ হচ্ছে বরকে কন্যার অনুগমন করতে স্বীকৃত হওয়া। সপ্তমপদের মন্ত্রই তার পরিচয়। "সখা সপ্তপদী ভবসা মামনুব্রতাভব"। এর পর কন্যা সপ্তম পদে না এগোলে বিবাহকর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়না। তাই সপ্তম পদেই বিবাহকর্ম্ম সমাপ্ত হয়—অর্থাৎ বৈধ হয়।

প্রথমতঃ, পিতাকর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় কন্যার উপর স্বত্বত্যাগ; দ্বিতীয়তঃ, বরকর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ; তৃতীয়তঃ কন্যাকর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় বরের অনুগমন। এই তিনটি voluntary act পর পর সাজালেই বিবাহ legal হয়। বরের হাত ও কনের পা, এ দুটি অঙ্গই হচ্ছে বিবাহের দুটি প্রধান অঙ্গ। আর অগ্নি হচ্ছেন তার সাক্ষী। কারণ, অগ্নি হচ্ছেন স্বপ্রকাশ দেবতা।

এখন তোমরা মনে ভাবতে পার যে, অশ্বলায়ন, মনু, মেধাতিথি প্রভৃতি সব সেকেলে ছাতুখোরের দল—সুতরাং তাঁদের বিধিব্যবস্থা বাঙালীর কাছে গ্রাহ্য নয়। বাঙালীর যখন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে, তখন বাঙালী নিশ্চয়ই বিবাহব্যাপারের রূপ বদলেছে ও তার উপর নানারকম রঙ চড়িয়েছে। কিন্তু ঘটনা ঠিক তা নয়।

বাঙলায় যখন কোনও ধর্ম্মসংস্কারক জন্মেছেন, তখনই তিনি পুরোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন। রঘুনন্দনও তাই করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাই করেছেন। রঘুনন্দন দিয়েছেন শ্রুতি ও স্মৃতির দোহাই, মহর্ষি দিয়েছেন শুধু শ্রুতির;—এই যা তফাৎ।

এখন সকলেই জানেন, অন্ততঃ শুনেছেন যে, বাঙালী হিন্দুসমাজ রঘুনন্দনের মতই অনুসরণ করে। সুতরাং রঘুনন্দনের মত যে কি, সংক্ষেপে তাঁর কথাতেই বুঝিয়ে দেব। উদ্বাহপরিশিষ্টে বলা হয়েছে যে:—

"বঙ্গদেশতু যানি তাবৎ সংস্কার কর্ম্মাণি প্রচলিত তেষাং মধ্যে তন্মতে বিবাহাতিরিক্তানং সর্ব্বেষাম ক্রিয়া-রূপত্বং, কিন্তু বিবাহোহস্ত স্বীকাররূপ জ্ঞানবিশেষ-মায়তি।"—

এ সংস্কৃত অনুস্বরবিসর্গসম্বলিত বাঙলা, সুতরাং এ বাক্যের অনুবাদ অনাবশ্যক। অপর সকল সংস্কারের সঙ্গে বিবাহসংস্কারের প্রভেদ এই যে, অপরাপর সংস্কার ক্রিয়ামাত্র, কিন্তু বিবাহসংস্কারের প্রাণ হচ্ছে "স্বীকরণ" অর্থাৎ consent। আমি পূর্ব্বে বলেছি বিবাহকর্ম্মের তিনটি অঙ্গ আছে (১) সম্প্রদান (২) পাণিগ্রহণ (৩) সপ্তপদী। এ তিনই স্বীকরণসাপেক্ষ। কন্যা সম্প্রদান করলেই দান সিদ্ধ হয় না, তা বরের গ্রহণসাপেক্ষ। পাণিগ্রহণেই কনে কন্তার ভিতর আসে না;—এরূপ হস্তান্তর হওয়া কন্যার স্বীকরণ-সাপেক্ষ। মাম অনুব্রতা ভব—এ কথা বললেই বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। বিবাহ legal হয় কন্যার সপ্তম পদক্ষেপের পর, অর্থাৎ উক্ত প্রস্তাবে স্বীকরণের পর। রঘুনন্দন বলেন যে:—

"কন্যাকে জলস্পর্শ করিয়া দান করিলে অথবা বাক্য-দ্বারা দান করিলেই যে, গ্রহীতা ঐ কন্যার পতি হয়—এমন কথা নহে। পাণিগ্রহণ সংস্কারপূর্ব্বক সপ্তম পদ পর্য্যন্ত গমন করিলেই, গ্রহীতা ঐ কন্যার সম্পূর্ণ পতি হয়।"

সম্প্রদান দ্বারাই কন্যার স্বামিত্ব (Patria potestas) বরে জন্মায়, আর পিতার স্বামিত্ব (Patria polis) নাশ হয়, এ কথা সুসঙ্গত নয় : কারণ সপ্তপদী গমনের পরই পিতার পিতৃগোত্রের নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ সম্প্রদান বিবাহ নয়।

তারপর পাণিগ্রহণের legal ফল কি, দেখা যাক। "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র নিয়তং দারলক্ষণং। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে" (রঘুনন্দন)। অর্থাৎ পাণিগ্রহণ বিবাহকর্ম্মের পূর্ব্বাঙ্গ, অতএব পাণিগ্রহণ বিবাহ নয়। বর ও কন্যা সপ্তপদীর সপ্তম পদে জায়াপতিত্ব লাভ করে। বৈবাহিক মন্ত্রসকল স্ত্রীর বিবাহ জন্য সংস্কারের সম্পাদক, সপ্তপদী গমনের পর ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয়।

সম্প্রদান বিবাহ নয় ; কেননা পিতা কন্যা এক বরকে সম্প্রদান করে' পরে অন্য বরকেও দান করতে পারেন।

পাণিগ্রহণও বিবাহ নয়। শুধু বিবাহ জন্য কন্যার একটি সংস্কার মাত্র, যেমন—ছেলেদের উপনয়ন। পাণি-গ্রহণের পরও ত্রিশঙ্কু কন্যা হরণ করে' তাকে বিবাহ করেন।

সপ্তপদী গমনের পরই কন্যা যথার্থ পতির জায়া হয়, অথার্থ স্বামীর গোত্রভুক্ত হয়। প্রাচীন Rome-এ Usus নামক একপ্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল, যাতে করে বিবাহের পরেও স্ত্রীর পিতৃগোত্র বজায় থাকত। Patrician বংশের মেয়েরা Plebeianদের বিবাহ করতে রাজী থাকলেও, গোত্রান্তরিত হতে স্বীকৃত হত না; আভি-জাত্যের অহঙ্কার স্ত্রীজাতি সহজে ত্যাগ করতে পারে না।

এখন আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বিবাহব্যাপারে আর দুটি কর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিধি আছে। বিবাহের পূর্ব্বে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও পরে উদীচ্যকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এই দুটি পূর্ব্বকর্ম্ম ও পরকর্ম্ম বৈবাহিক কর্ম্মের অঙ্গ নয়,—সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গ। উপনয়নেও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং উদীচ্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হচ্ছে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পূজা। সেকালে লোকে যাকে সমাজ বলত, তাতে মৃত পূর্ব্ব পুরুষদেরও স্থান ছিল ; কেন না তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির বিদেহ আত্মা বাস্তুভিটেতেই বাস করে। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মা একরকম গৃহস্থ দেবতা বলে গণ্য হত। সুতরাং সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁদের পূজা অত্যাবশ্যক। জনৈক ফরাসী পণ্ডিত এই সত্যটি উদ্ধার করেছেন। এবং তাঁর রচিত *Cite Antique* নামক গ্রন্থ ইউরোপের পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হয়েছে। এই সত্যটি মনে না রাখলে, হিন্দু, রোমান ও গ্রীক্ আইনের অনেক বিধিনিষেধ আমাদের কাছে অবোধ্য হয়ে পড়ে।

এখন বিবাহকর্ম্মের পরও উদীচ্যকর্ম্ম অর্থাৎ কুশণ্ডিকা, ভাষান্তরে বাসি বিয়ের পার্থক্য কি? Roman law আইনে এ ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায়।

সেকালে প্রতি গৃহস্থের নিজ নিজ পৃথক গৃহ-দেবতা ছিল এবং সে দেবতার নিকট যে দীক্ষিত নয়, তার গৃহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করবার অধিকার ছিলনা। সুতরাং বর কনেকে বিয়ে করে আনলেও, তাকে কোলে করে চৌকাঠ পার করিয়ে পরে গৃহদেবতার কাছে দীক্ষিত করবার পর তবে সে গৃহিণী হত। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের বাসি বিয়েরও অর্থ তাই। সপ্তপদীর পরেই কনে স্বামীর ভার্য্যা হয়, এবং বাসি বিয়ের পরেই সে গৃহিণী হয়। অর্থাৎ এর পরেই স্বামীর সঙ্গে 'ধর্ম্মমাচরেৎ' এই শাস্ত্রীয় আদেশ সে পালন করতে পারত।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্ত্রী-আচার সদাচার নয়, অনাচারও নয়, কেবলমাত্র অত্যাচার। এ কথা শুনে অবশ্য তোমরা সন্তুষ্ট হওনি। কিন্তু ঐ অত্যাচার পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, এ পদের উক্ত শব্দের অপপ্রয়োগ হয়নি। স্ত্রী-আচার শাস্ত্রের হিসেবে অতি-আচার। অর্থাৎ শাস্ত্রবহির্ভূত আচার। আর সদাচারের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রপূত শাস্ত্রীয় আচার। এ আচার কে প্রণয়ন করেছিল?—রাজরাজড়া নয়, ঋষিরা। কালিদাস শিবের মুখ দিয়ে ঋষিদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "ভবৎ প্রণীতমাচারমামনন্তি হি সাধব"। আমি তোমাকে

সংক্ষেপে শাস্ত্রীয় আচারের পরিচয় দিতে চাই বলে, স্ত্রী-আচারের কোনরূপ বর্ণনা করিনি। আমরা যাকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলি, তা প্রধানতঃ আচারের শাস্ত্র; কিন্তু তাহলেও মনু-যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে নীরব। ইংরেজের আদালতেও "বর বড় কি কনে বড়" সে কথা irrelevant বলে প্রত্যাখ্যাত হবে।

তবে স্ত্রী-আচার এ সমাজে চিরদিনই ছিল; আর আমার বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় আচারের চাইতে স্ত্রী-আচারের বয়স ঢের বেশী। শাস্ত্র এ আচারকে উপেক্ষা করতে পারে; কিন্তু উচ্ছেদ করতে পারেনি। লোকমুখে শুনেছি যে, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতম স্ত্রী-আচারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অবৈধ বলেন নি। স্ত্রীজাতির conservatism-এর সঙ্গে সেকালের ধর্ম্ম-প্রচারকদেরও compromise করে চলতে হয়েছে। স্ত্রীজাতি আচারগত-প্রাণ, আর তারা অভ্যস্ত আচারের মায়া কাটাতে পারে না। আর স্ত্রীজাতির আচারব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পুরুষেরা কস্মিনকালেও সাহসী হয়নি। তা ছাড়া স্ত্রী-আচার বাদ দিলে বিবাহ ব্যাপারটা একটা উৎসব না হয়ে একটা কাঠখোট্টা ব্যাপার হয়ে উঠত। বিবাহ উৎসবই স্ত্রীজাতির সেরা উৎসব। তাই কালিদাস বলেছেন, "প্রায়েণৈবং বিধি কার্য্যে পুরস্ত্রীনাং প্রগল্ভতা"। এখন তার উপর শাস্ত্র যে টেক্কা দিতে পারে নি তার প্রমাণ, কোন বৈদিক মন্ত্র হুলুধ্বনির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনি। স্ত্রী-আচারের বর্ণনা শাস্ত্রে না থাক, কাব্যে আছে। কারণ কবির চোখেই রূপরসের মূল্য খুব বেশি। অন্য কবির কথা ছেড়ে দিলেও, কালিদাস কুমারসম্ভবের একটি পুরো সর্গে উমার বিবাহ উপলক্ষে বৈবাহিক ক্রিয়াকর্ম্মের বর্ণনা করেছেন।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের প্রথমেই কালিদাস যে সেকেলে স্ত্রী-আচারের বর্ণনা করেছেন, যাঁর খুসী তিনি সে স্ত্রী-আচারের সঙ্গে একালের স্ত্রী-আচার মিলিয়ে দেখতে পারেন। এস্থলে একটি অবান্তর কথা বলতে চাই। রঘু-বংশেও অজের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহের বর্ণনা আছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি পড়বার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ সেটি তাঁর স্বরচিত কুমারসম্ভব থেকে হুবহু উদ্ধৃত; শুধু শিবের স্থান অজ অধিকার করেছেন, আর উমার স্থান ইন্দুমতী। বোধহয় কালিদাস বিশ্বাস করতেন যে, যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। সে যাই হোক, একালে যদি কোন কবি এ কাজ করতেন, তিনি সমালোচকদের কাছে চোরদায়ে ধরা পড়তেন। অন্ততঃ আমরা বলতুম যে, একখানা বই লিখেই কবির বিদ্যে ফুরিয়েছে; তার পরেই করেছেন পুনরুক্তি।

যাক্ ও-সব কথা। কালিদাস এই স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে একটি কথা বারবার ব্যবহার করেছেন। সে কথাটি হচ্ছে কৌতুক। অর্থাৎ স্ত্রী-আচার হচ্ছে বিবাহব্যাপারের কৌতুকের অঙ্গ, ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। আর আমরা যখন বিবাহ-পদ্ধতির কথা বলি, তখন তার ধর্ম্ম অর্থাৎ legal অংশের কথা বলি। কৌতুকের অবশ্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, সুতরাং তার বৈচিত্র্যও অসীম। বিবাহ ব্যাপারটির শাস্ত্রীয় আচার বাদ দিয়ে যদি শুধু স্ত্রী-আচারই থাকত, তাহলে ব্যাপারটা হয়ত খুব যুগোপযোগী হত—অর্থাৎ সিনেমার কোটায় পড়ে যেত। কিন্তু জিনিষটে শুধু কৌতুকমঙ্গল নয়। নয় বলেই তার অন্তরে বহুবিধ Legal disabilities রয়ে গিয়েছে, যার হাত থেকে উদ্ধার পেতে স্ত্রীজাতি আজ ব্যগ্র।

ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

··· জগতের প্রত্যেক বস্তুর ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ-নামক তিনটি অবস্থা আছে। কোন বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে হইলে যে ঐ বস্তুর উপরোক্ত তিনটি অবস্থাই সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতীয় ঋষিগণ ইহা দেখাইয়াছেন যে, বস্তুর ব্যক্ত অবস্থা যে-ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব, অব্যক্ত অবস্থা সেই ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। আবার, বস্তুর অব্যক্ত অবস্থা যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব, জ্ঞ-অবস্থা সেই ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। বস্তুর তিনটি অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রয়োজন হইয়া থাকে।···

অন্তঃপুর

জাপানের নারী শিক্ষা

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে নারীর শিক্ষা একটা বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। নারীশিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, সহশিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত কি না প্রভৃতি নানা সমস্যায় এদেশে নারীর শিক্ষা বিড়ম্বিত হইতেছে। এ সময়ে আমরা জাপানে নারীশিক্ষার কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করিতেছি।



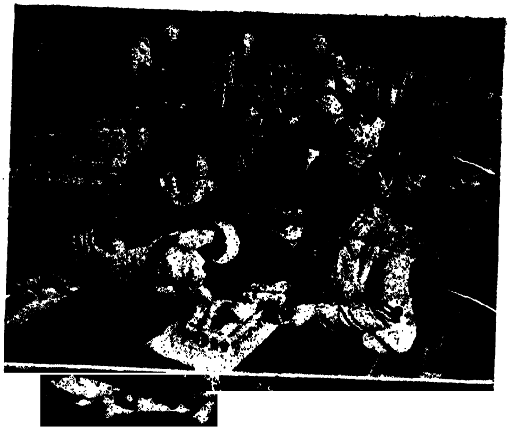
জাপানে পাশ্চাত্ত্যের ঢেউ কেমন লাগিয়াছে, উপরের ছবিতে তাহা বুঝা যাইবে। ছবিতে দেখা যায়, মেয়েদের ইস্কুলে ব্যায়ামচর্চ্চা হইতেছে।

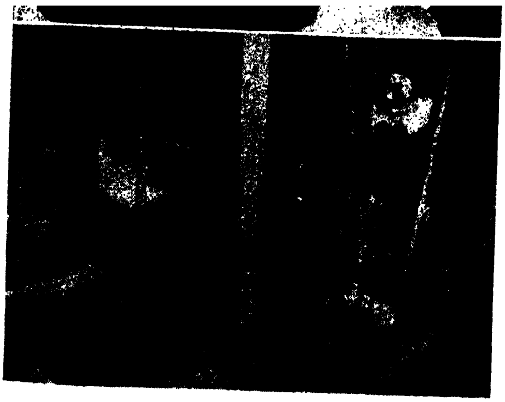
জাপানের একটি বিশেষ ইস্কুলের কথা ধরা যাক্। এই ইস্কুলটির নাম জিয়ু গাকুয়েন। জাপানের রাজধানী টোকিয়ো সহরে এই ইস্কুল। এ ইস্কুলটি শুধু মেয়েদের ইস্কুল নয়, শুধু ছেলেদের ইস্কুলও নয়, ছেলে-মেয়ে সবাই এ ইস্কুলে পড়িতে পারে। তবে তাহাদের স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। মেয়ে-বিভাগের সঙ্গে ছেলে-বিভাগের কোন সম্পর্ক নাই। শিশুদেরও একটি বিভাগ আছে। তাহাও সম্পূর্ণ পৃথক। একই পরিচালনার অধীনে থাকিতে হয়,—ইহা ভিন্ন এই তিনটি বিভাগকে তিনটি ইস্কুল বলিলেও চলে।

মেয়েদের বিভাগ মেয়েরাই চালায়। সেখানে তাহাদের স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইয়াছে বলা চলে। মেয়েদের শিক্ষার সময় সাত বৎসর নির্দ্ধারিত আছে। এই সাত বৎসর মেয়েরা ইস্কুলের পরিচালনায় যে শিক্ষা লাভ করে, ভবিষ্যতে গৃহ এবং পরিবার-পরিচালনায় তাহা তাহাদের বিশেষ কাজে লাগে।

ইস্কুলটির প্রত্যেকটি ক্লাশ চল্লিশজন ছাত্রী লইয়া। ইহার মধ্যে পাঁচটি কি ছয়টি মেয়ে লইয়া এক একটি 'পরিবার'। এক পরিবারের মেয়েদের এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে

হয়, তাহাদের নিজেদের দেখাশোনা তাহারা নিজেরাই করে। বছরের মধ্যে দুইবার 'পরিবার'গুলিকে ওলট-পালট করিয়া দেওয়া হয়। ফলে এক 'পরিবারে'র মেয়ে আর এক





জিয়ু-গাকুয়েন (জাপানী মেয়ে ইস্কুল) : উপরে—সেলাইয়ের ক্লাস ; মধ্যে—প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন ; নীচে—তাঁতের ক্লাস।

'পরিবারে' গিয়া পড়ে। ইহাতে মেয়েদের সকলের সঙ্গে মেলা-মেশার ক্ষমতা জন্মে ; সকল রকম লোকের সঙ্গে বনাইয়া চলিবার শিক্ষা হয়।

স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার যেমন মেয়েদের দেওয়া হইয়াছে, তেম্‌নি ইস্কুল-পরিচালনার দায়িত্বও তাহাদেরই। ইস্কুলে বিশেষ চাকর-বাকর রাখা হয় নাই। ইস্কুল-বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া বাগান, খেলার মাঠ প্রভৃতি মেয়েরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

তাহাদের একটি সমবায়-ভাণ্ডার আছে। ইস্কুলের এবং নিজেদের জিনিষপত্র তাহারা সেখান হইতেই নেয়। লাভও নিজেরাই ভাগ করিয়া লয়। ইস্কুলে একটি খাবার-ঘর আছে। তাহাও মেয়েরাই চালায়। এখানকার সমস্ত রান্নাও তাহাদের নিজেদেরই করিতে হয়।

সমস্ত মেয়েদের বিভাগ পরিচালনা করে একটি সমিতি। এই সমিতির ৩০ জন সভ্য। সকলেই ছাত্রী। ইহারাই স্কুল পরিচালনা করে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীও ইহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না।

এই স্কুলে মেয়েদের যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাও চমৎকার। উঁচু ক্লাশের মেয়েদের তাঁত বোনা, ঘরকন্নার কাজ, সেলাই প্রভৃতি শেখানো হয়। রান্না তো নিজেদের খাবার-ঘর চালাইতে তাহাদের শিখিতেই হয়। এ সকল ছাড়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মেয়েদের ব্যায়ামচর্চ্চাও করিতে হয়। মেয়েরা যাহাতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক্ দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য-জীবনের উপযুক্ত হইয়া উঠে, ইহাই এ প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য।

জাপানী নারীর শিল্পচর্চ্চা

জাপানের মেয়েরা তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের জন্য বিখ্যাত। জীবনের বহু ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যাপারেই তাহাদের এই সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়, জাপানের মেয়েদের একটা মস্ত সখ হইল পুতুল তৈরী করা। এই পুতুল তৈরী করার মধ্যে কোন ব্যবসাদারী বুদ্ধি নাই, নিছক রসবোধ এবং সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয়ই মাত্র ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। এই সব পুতুলের সৌন্দর্য্য অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবং ইহাদের সহিত জাপানের পৌরাণিক ভাব ও সংস্কৃতি এমনভাবে জড়িত যে, এই সব পুতুল-তৈরীর মধ্যে জাপানী মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও রসানুভূতির একটা দিক্ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।

কেবল মুখচোখ নয়, পুতুলগুলির বেশভূষা-পরিকল্পনায়ও যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। জাপানের নানা যুগের পোষাক এই



পুতুল তৈয়ারী শিক্ষা : শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার্থী।

সব পুতুলের দেহে দেওয়া হয়। পুতুলগুলিও আবার নানা ভাবের অভিব্যক্তি। কোনটি পৌরাণিক ঘটনার চিত্র, কোনটি ঐতিহাসিক, আবার কোনটি বা বিশেষ কোন পুরাতন নৃত্যভঙ্গীর অনুকরণে গঠিত।

উদ্ধৃত চিত্র কয়টি হইতে বুঝিতে পারা যায়, জাপানে পুতুল তৈরী করা মেয়েদের একটা সখের কাজ হইলেও তাহা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। জাপানী মেয়েরা যে, কেবল পুতুল তৈরী করিতেই শেখে, তাহা নয়। নানারকম জিনিষই তাহারা নিজের হাতে তৈয়ারী করিতে ভালবাসে। মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ, জাপানের বিখ্যাত চা-অনুষ্ঠানের নানা রকম সরঞ্জাম, চুল রাখিবার বিচিত্র সব আধার প্রভৃতি মেয়েরা নিজেরা রচনা করে। এবং প্রতি বৎসর এইসকল জিনিষের একটি প্রদর্শনী হয়।

ঐসব হাতের কাজ জাপানের কেবল দরিদ্র মেয়েরাই যে করে তাহা নয়; ধনীর ঘরের মেয়েরাও ভাল পুতুল তৈরী করিতে পারিলে গৌরব বোধ করে, এ সৌন্দর্য্য-রচনার পশ্চাতে কোন অর্থলোভ নাই, ইহা নিছক শিল্পের সাধনা। আমাদের দেশের যে শ্রেণীর মেয়েরা সময় কাটাইবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহারা এই জাতীয় একটি সখের চর্চ্চা করিয়া দেখিতে পারেন।

রুশিয়ার নারী

ইংরেজ মহিলা শ্রীমতী মার্গারেট রোজ সম্প্রতি রুশিয়া-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানকার জীবনযাত্রা, বিশেষ করিয়া সেখানকার নারী-জীবন ইনি একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে এক স্থানে ইনি বলিতেছেন :

পোলাণ্ডের সীমান্ত পার হইবার আগেই সৈন্যেরা আসিয়া আমাদের গতিরোধ করিল। আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা শেষ করিয়া তাহারা আমাদিগকে একটি ঘরে লইয়া গেল। আমাদের মত দুঃসাহসী বিদেশীদের চক্ষুকে দেখিবার জন্য হয় তো তাহাদের উপরওয়ালার কৌতূহল হইয়া থাকিবে।

প্রথমে তো সেই ভদ্রলোক আমাদের রুষ-ভ্রমণের দুঃসাহসিক কল্পনা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; তারপর তিনি রুশিয়ানদের সম্বন্ধে ভীষণ ভীষণ রক্ত-জমাট করা গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও যখন আমরা নিবৃত্ত হইলাম না, তখন তিনি নিজেই আমাদের সীমান্ত পর্য্যন্ত



জাপানী মেয়ের হাতের তৈয়ারী পুতুল : উইষ্টারিয়া শাখা হাতে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন নৃত্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান।

পৌছাইয়া দিতে রাজী হইলেন। রাইফেল লইয়া একজন সৈনিকও আমাদের সঙ্গে চলিল।

নব্য রুশিয়ার মেয়েদের দেখিলাম পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবতী। বোধ হয় চিরকালই তাহারা ঐরূপ ছিল। প্রত্যেকে দিন তাহাদিগকে নানা রকম কঠিন শরীরিক পরিশ্রমের কাজ করিতে দেখিতাম। কখনো দেখিয়াছি রাস্তার ধারে বসিয়া



জাপানী মেয়ের তৈয়ারী আরও কয়েকটি পুতুল : সেকালের পোষাক পরা।

তাহারা পাথর ভাঙ্গিতেছে, কখনো বা তাহাদিগকে লরী বা ষ্টিম রোলার চালাইতে দেখিয়াছি।

ভবিষ্যতে রাশিয়ান্ মেয়েদের জীবন কি হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। এখন পর্য্যন্ত তাহারা অনেকটা অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে। আরও বেশী স্বাধীনতা তাহাদের হাতে আসিয়াছিল, কিন্তু এখন সে সব ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। নূতন নূতন আইনে মেয়েদের স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব্ব হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে গার্হস্থ্য-জীবনে স্থিরতা আনিয়া দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়ার মেয়েরা এখন দোটানায় পড়িয়াছে। একদিকে লেনিনের আদর্শ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, অপরদিকে দেশ ও জাতির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্যপালন।

এস্কিমো নারী

মিঃ উইন ই হাডসন তাঁহার নব-প্রকাশিত বই Icy Hele-এ এস্কিমো মেয়েদের সম্বন্ধে একটি ভারী অদ্ভুত খবর দিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি অনেক সময় দেখিয়াছেন ও দেশের মেয়েরা না কি জিভ দিয়া চাটিয়া তাহাদের শিশুদের গা পরিষ্কার করিয়া দেয়। মিঃ হাডসনের মতে এস্কিমো মেয়েদের জিবের ও দাঁতের জোর অসাধারণ। এবং এই জোর তাহারা অনেক কাজেই লাগায়। এস্কিমোরা একপ্রকার জুতা পরে, তাহা এতই শক্ত যে, একটু নরম করিয়া না দিলে সে জুতা পায়ে দেওয়া যায় না। এস্কিমো মেয়েরাই না কি এই সকল জুতা চিবাইয়া নরম করিয়া দেয়। এমন কি যে সব মেয়েদের দাঁতে এই শক্ত জুতাগুলিকে চিবাইয়া নরম করিবার মত জোর নাই, তাহাদের না কি বিবাহ হওয়াই শক্ত।

শঙ্খ

—শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যার ঘন আঁধার এসে যখন ঢাকে ধরণীরে
তখন ঘরে, মন্দিরেতে বেজে ওঠে শাঁখ,—
মঙ্গল সেই ধ্বনি ফিরে আকাশ-বাতাস ঘিরে,
কুলায়-পানে পাখীরা সব ছোটে ঝাঁকে ঝাঁক।
জানায় সবায় রাতের আগমনী
'দেবের কাছে প্রার্থনায় হও রত',—
ফণির মাথায় জ্ব'লে ওঠে মণি,
শিশুর আঁখি ঘুমেতে হয় নত।

সপ্তসুরের পরশ পেয়ে তব
নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে তারা,
'মধুর তোমার গুণ আর কত কব
ছোটে বাতাস হয়ে পাগল-পারা!'
সকল কাজে মঙ্গলেরই মাঝে
তোমার মধুর সুরটি উঠে বাজি',
পল্লীরাণীর পূত আসনতলে
ফুটে ওঠে নব কুসুমরাজি!

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পরীক্ষার জন্য কে যে বেশী রাত জাগে, জহরলাল না অনুপম, ঠিক করিয়া বলা শক্ত। সাধ দুজনেরই সমান উগ্র, স্বপ্ন দুজনেরই সমান জটিল। জহরলাল হইবে বিদ্বান আর অনুপম হইবে বৈজ্ঞানিক। জগতে তাদের তুলনা যদিও থাকে, অমর কীর্ত্তি থাকিবে দুজনেরই, এতবড় হইবে দুজনেই যে, শ্রদ্ধায়, ভয়ে, বিস্ময়ে মানুষ থ' বনিয়া থাকিবে।

জহরের পরীক্ষাই শেষ হইয়া গেল আগে। গরমে ও গুমোটে ভাপসা একটা দিনের মাঝামাঝি। শেষ প্রশ্নের জবাবটা লিখিয়া তরঙ্গ ছাড়া এ জগতে আর কেউ নাই মনে হওয়ায় মনটা কেমন বিভ্রান্ত হইয়া গেল। বাড়ী খালি পড়িয়া আছে জানিবামাত্র চোরের যেমন মনে হয় ভারি একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই রকম মনে হইতে লাগিল জহরের। রোজ কি মানুষ এত স্পষ্টভাবে অনুভব করার সুযোগ পায় যে, তরঙ্গ ছাড়া পৃথিবীটা যখন ফাঁকা অথবা ফাঁকী, তরঙ্গকে তখন অবশ্যই পাওয়া দরকার ?

অনুপমদের বাড়ী পৌঁছিতে বেলা চারটা বাজিয়া গেল। প্রথামত কলতলায় তরঙ্গ বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, ছাই-মাখা হাতে উঠিয়া আসিয়া কনুইয়ের ঠেলায় সে খুলিয়া দিল সদরের খিল। তারপর জহরের সিল্কের জামায় ছাই লাগা বাঁচানর জন্য তাকেও ঠেলিয়া দিল কনুই দিয়াই। তাতে জামায় ছাই লাগা বাঁচিল বটে, আবেগের সঙ্গে তরঙ্গের হাত চাপিয়া ধরায় দুহাতেই কিন্তু জহরের ছাই লাগিয়া গেল।

তরঙ্গ বলিল, মনে হচ্ছে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জহরের শীর্ণ দেহ, বিবর্ণ মুখ আর উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি দেখিলে মনে হয়, শুধু মাথা নয়, দেহের সমস্ত কলকজ্জাও যেন তার খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথম যেদিন প্রায় এমনি সময় অনিচ্ছার সঙ্গে সে এ বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, সেদিনের সঙ্গে তাকে আজ মিলাইয়া না দেখিলেও সন্দেহ হয়,ইতিমধ্যে ভয়ানক একটা অসুখে সে ভুগিয়াছে। পরলোকে না গিয়া এ বাড়ীতে তরঙ্গের ছাই-মাখা হাত চাপিয়া ধরিতে সে যে আসিতে পারিয়াছে, তাই পরমাশ্চর্য্য। তবে কথা শুনিলে আর ভাবভঙ্গী দেখিলে বোঝা যায়, পরলোকের কোন একটি অগ্রদূত, সোজা কথায় যাদের লোকে ভূত বলে, এখনও তার ঘাড়ে চাপিয়া আছে।

তরঙ্গ ভাবিয়া-চিন্তিয়া জহরকে বাড়ী হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিল। বলিল, আপনি বাড়ী যান। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, কটা দিন এখন সময়মত নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে নিজেকে সামলে নিন গিয়ে। তখন বুঝতে পারবেন আজ কি রকম পাগলামি করছেন।

জহর ভালবাসা জানাইতেও জানে না, কেউ ভালবাসে কি না বুঝিতেও জানে না। তরঙ্গের কথাও সে তাই বুঝিতে চায় না, কিছু জানিতেও চায় না। ফাঁকা উঠানে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে এমন সব কথা বলিতে থাকে যে, আসল কথাটা বুঝিলেও কথাগুলি তরঙ্গের মাথায় ঢোকে না। শেষ পরীক্ষা দিয়া সে যে আজ বাড়ী ফেরে নাই, এই গরমে পথে পথে ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছে,—এইটাই না কি তরঙ্গকে সে যে ভীষণ ভালবাসে, তার অকাট্য প্রমাণ।

তরঙ্গ সায় দিয়া বলে, তাই তো বলছি বাড়ী যান, বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

জহর এসব কথা শুনিতে আসে নাই, তরঙ্গের কথা সে কানেও তোলে না, নিজের পক্ষেই ওকালতী করিয়া চলে ক্রমাগত। তরঙ্গের জন্য তার পড়ার ক্ষতি হইয়াছে, তরঙ্গের জন্য সে ভাল লিখিতে পারে নাই, তরঙ্গের জন্য সে বড় কষ্ট পাইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষতির পূরণ

হিসাবেই সে যেন তরঙ্গের হাত দুটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে, কোনদিন ছাড়িয়া দিবে না। তরঙ্গ একবার হাত ছাড়িয়া দিবার দাবী জানায়, হয় তো জহর সেই অনুরোধ শুনিতে পায় হয় তো পায় না, হাত এক ভাবেই ধরা থাকে। তরঙ্গের মুখ তাতে গম্ভীর হইয়া যায়। তাকে ভালবাসা জানাইতে আসিয়া তাকেই জহর অবহেলা করিতেছে, একটা কথা শুনিতেছে না, কেবল এইজন্য নয়, কোন অবস্থাতেই কারও অবহেলা তরঙ্গ সহ্য করিতে পারে না।

হাতটা ছেড়ে দিতে বলছি, শুনতে পাচ্ছেন? গায়ে তো জোর নেই একফোঁটা, এত জোর খাটাচ্ছেন কেন?

জোর খাটাচ্ছি?

তা নয়? জোর থাকলে জোর খাটাতেন মানাত, এদিকে কাঁপছেন ঠক ঠক করে, কিন্তু হাত ধরেছেন এমন ভাবে যেন আমার সঙ্গে কুস্তি করবেন। চলুন তো বারান্দায় ছায়াতে যাই, শুনি আপনার কি বলবার আছে।

তরঙ্গের ধমকে মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল জহরের, এবার তরঙ্গই তার হাত ধরিয়া একটা জড় বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার মত বারান্দায় লইয়া গেল। একটা টুল দেখাইয়া হুকুম দিল, বসুন।

হুকুম-পালনে দেরী দেখিয়া জহরের সিল্কের জামার জন্য যেটুকু মমতা তরঙ্গের ছিল, তাও যেন এবার উপিয়া গেল। দুই কাঁধে ছাই-মাখা হাত রাখিয়া জোর করিয়া জহরকে সে বসাইয়া দিল টুলে, তারপর কলতলায় গিয়া একটা মাজা গেলাসের সঙ্গে ধুইয়া ফেলিল হাত। গেলাসে ঠাণ্ডা জল ভরিয়া আনিয়া বলিল, জল খেয়ে নিন, গলায় কথা আটকে যাচ্ছিল। তারপর বলুন তো এতক্ষণ কি বলছিলেন, ভাল করে গুছিয়ে বলুন।

বুঝতে পার নি?

কেন বুঝব? এত বয়সে একটা মেয়েকে দুটো মনের কথা জানাতে যে ছেলে হিমসিম খেয়ে যায়, তার আবোল-তাবোল কথা বুঝেও বুঝতে নেই।

জহর এবার রাগ করিয়া বলিল, তোমার মত বয়সে যে মেয়ে এমন করে কথা বলতে পারে, তাদের ঘেন্না করতে হয়।

রাজরাণীর মত যে বাসন মাজিতে পারে, এত সহজে তাকে কাবু করা যায় না। তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আলাদা কথা।

তুমি পাগল তরু।

কে পাগল, আমি? কিসে পাগল হলাম? আপনার সঙ্গে সমান তালে পাগলামি করছি না বলে?

এই তিরস্কারেই জহর ক্ষেপিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া তরঙ্গ তাড়াতাড়ি বিনয় করিয়া বলিল, আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা হচ্ছিল, তাই হোক। একটা কথা শুনবেন আমার? আজ বাড়ী চলে যান। আজ যা বলতে চাইছিলেন, মাসখানেক পরে এসে বলবেন। এ ক'দিন সময়মত নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে সুস্থ হলেই দেখবেন, নিজেই চমৎকার বুঝতে পারছেন কত সহজ একটা ব্যাপারকে কি রকম ঘোরালো করে তুলছেন।

গ্রামোফোন বাজার মত নির্ভুল, পরিবর্ত্তনহীন উপদেশ। জহরলালের মনে হয় গ্রামোফোনের হৃদয় না থাক, এমন নির্লজ্জ হওয়ার ক্ষমতা গ্রামোফোনের নাই।

তোমার খুব মজা লাগছে, না?

তরঙ্গ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, দুঃখ হচ্ছে। এগজামিনের চাপে আপনার মত ছেলে এ রকম হয়ে যেতে পারেন ভাবলে আমার বড় কষ্ট হয়।

নভেল পড়ে পড়ে তোমার মত মেয়ে এরকম বেহায়া এ্যাকট্রেস হয়ে যেতে পারে ভাবলে আমারও কষ্ট হয়।

দুজনেরই যখন কষ্ট হচ্ছে, আপনি বাড়ী যান।

বাড়ী গিয়ে সময়মত নেয়ে খেয়ে ঘুমোব তো?

আকাশের দেবীকে মানুষের অপমান করার চেষ্টার মত জহরের খোঁচা-দেওয়া প্রশ্ন কোন কাজে লাগিল না, অনেক চেষ্টায় কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব যেন শিষ্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছে এইরকম ভাবে খুসী হইয়া তরঙ্গ বলিল, নিশ্চয়। শরীর মন সুস্থ হলে আসবেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আজকের কথা ভেবে যেন আবার পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না লজ্জায়।

উঠানে নামিয়া গিয়া জহর বলিল, আর কোন দিন তোমাদের বাড়ী আসব না।

তরঙ্গ বলিল, এটা আমার বাড়ী নয়।

গলিটা নূতনত্ব পাইয়াছে, গলির শেষে রাজপথের পারিপার্শ্বিকতায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে অভিনবত্বের। দেয়ালে মাথা ঠোকার চেয়ে হয় তো কিছু বেশী সময় লাগিয়াছে তরঙ্গকে প্রেম নিবেদন করিতে, ফলটা হইয়াছে একই রকম। জগৎটা গিয়াছে বদলাইয়া। জগৎ যে মানুষের মাথায় থাকে এতদিন কি জহর তা জানিত! পথ চলিতে চলিতে জহর অনুভব করিতে লাগিল সে হঠাৎ মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মনে হইতেছিল যে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনটাও শেষ হইয়া গিয়াছে, তরঙ্গের খাপছাড়া প্রত্যাখ্যানের পর এখনও ঠিক সেইরকম মনে হইতেছে এবং এটুকু বুঝিতে আর তার বাকী নাই যে, পরীক্ষার সঙ্গে জীবন শেষ হওয়ার অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য ও অর্থহীন অনুভূতিটাকেই শুধু স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে তরঙ্গ, আর কিছু নয়।

কে তরঙ্গ? কেউ নয়! জগত কি? মস্তিষ্কের কেমিক্যাল রিএ্যাক্‌শন। জীবন কি? যা মনে করা যায় তাই।

অতএব কষ্ট পাওয়ার কোন কারণ নাই। তবু অকারণে এ রকম কষ্ট সে পাইতেছে কেন? আস্তে হাঁটার জন্য? জোরে হাঁটে জহর, কোন লাভ হয় না। শরীরের খানিকটা ঘাম শুধু বাহির হইয়া যায়। তৃষ্ণা পাইয়াছে বলিয়া? পানের দোকানে ডাব খাইয়া তৃষ্ণা মেটানর সঙ্গে একবার রোমাঞ্চ হয় জহরের, জগৎ-ঠাসা মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়, শব্দটা পর্য্যন্ত জহর যেন শুনিতে পায়। তরঙ্গের কাছে আমল না পাওয়ায় ভিতরে যাই ঘটুক সেটা তবু বোধগম্য ব্যাপার, এ সমস্ত কোন্ দেশী প্রতিক্রিয়া? হাতে এখনও ছাই লাগিয়া আছে। খানিকটা ডাবের জলেই জহর হাত ধুইয়া ফেলিল। এও এক ধরণের রসিকতা তরঙ্গের, নিজেকে দেওয়ার বদলে খানিকটা ছাই দিয়াছে। কি সয়তান মেয়েটা, কি চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছে মানুষ-ঠকান বিদ্যা!

বন্যার মত তরঙ্গের সয়তানী পৃথিবী ভাসাইয়া দিয়াছে। পানওয়ালা পর্য্যন্ত টাকার ভাঙ্গানিতে একটা অচল সিকি চালাইবার চেষ্টা করে, তরঙ্গের জন্য জহরের যেন অচল সিকি চেনার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। গাল দেওয়ার পর পানওয়ালার অন্যায় রাগ দেখিয়া একটা চড়ও জহর তাকে মারিয়া বসে। তাতে কিছুক্ষণের জন্য একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তা হোক, ব্যাপারটা যে অস্তত স্বাভাবিক তাই জহরের ঢের। তা ছাড়া দামী জামা-কাপড় পরা ভদ্রলোক পানওয়ালাকে গাল দিয়া চড় মারিলে ব্যাপার আর কতদূর গড়াইতে পারে? একটু হৈ-চৈ হইয়াই শেষ।

যে দিকের ফুটপাথে রোদ পড়িয়াছে সে দিক দিয়াই খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর জহরের খেয়াল হয়, এতক্ষণে মনটা বেশ শান্ত হইয়াছে। ভয়ানক কিছু একটা করিবার জন্য ছটফট অবশ্য করিতেছে মনটা, তবু এতক্ষণ যেমন বিভ্রান্ত হইয়া ছিল, তার তুলনায় একেবারে জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আর ভাবনা নাই, এবার সে ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারিবে, কোন কারণে এতটুকু উত্তেজনা জাগিবে না, অবসাদ প্রশ্রয় পাইবে না, কথায় ব্যবহারে সহজ সৌম্য ভাবটি অনায়াসে বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

এই অবস্থা ফিরিয়া পাইলে তরঙ্গ তাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল, না? কয়েকদিন সময়-মত নাওয়া-খাওয়া-ঘুমের বদলে মনের জোরে আধঘণ্টার মধ্যেই যদি সে নিজের এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে, তাতে কি বলার আছে তরঙ্গের? যদি কিছু বলার থাকে, বক্তব্যটা শুনিয়া আসিতেই বা দোষ কি? এসব ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল। কোন্ কথার জবাবে তরঙ্গ কি বলিয়াছিল, কি কথা বলিবার ভঙ্গীতে তরঙ্গ কি ইঙ্গিত করিয়াছিল, এসব কিছু কি সে লক্ষ্য করিয়াছে? আগাগোড়া হয়ত ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে তরঙ্গকে। হয় তো খেলা করিতেছিল তরঙ্গ। এই গরমে বাসন মাজা কাজটা তো মধুর নয়, সেই কাজের মাঝখানে তাকে পাইয়া হয় তো একটু মাধুর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল,—এখন মনে মনে বুক চাপড়াইয়া আপশোষ করিতেছে। বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ছাই-মাখা বাসনে ঝরিয়া পড়িতেছে তার চোখের জল। মেয়েদের কথার আড়ালে যে-সব কথা থাকে তার একটাও

যে লোকটা ধরিতে পারে না, তার বোকামির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ের হয় তো অন্ত থাকিতেছে না তরঙ্গের। 'আজকের কথা ভেবে লজ্জায় যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না' এই অনুরোধের আসল মানে সে বুঝিতে পারিবে কি না ভাবিয়া দুর্ভাবনায় বুক হয় তো দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে তরঙ্গের, আরও স্পষ্ট ভাবে কথাটা তাকে বুঝাইয়া না দেওয়ার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে।

বুক যে আবার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, সে জ্ঞান জহরের রহিল না, গালে চড় মারা পানওলার দোকানের সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় সেই দোকান হইতেই এক প্যাকেট সিগারেট সে কিনিয়া লইল, পানওয়ালা যে এতক্ষণে তার পাগলামীর হদিশ পাইয়াছে, সেটুকু বুঝিতে পারিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, জোরে হাঁটিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভাড়া করিল একটা রিক্সা।

এবার দরজা খুলিল অনুপম। কোন্ চুলায় সে গিয়াছিল কে জানে, এইটুকু সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। তরঙ্গকে আর একা পাওয়ার উপায় নাই। তরঙ্গ বাসন মাজা শেষ করিয়া কলসীতে জল ভরিতেছিল, জহরকে দেখিয়া কিছু বলিল না।

অনুপম সলজ্জ বিব্রত ভাবে বলিল, তোমার সঙ্গে তো কথা বলতে পারব না ভাই, কাল আমার ফিজিক্স হবে। একদিনে দু' পেপার।

একটু হাসে অনুপম। হাত কচলায়। রাত কি সেও কম জাগিয়াছে!

জহর বলিল, না না, তুমি পড়বে যাও।

পড়ার ঘরে গিয়া অনুপম খিল দেয় বটে, তরঙ্গকে কিন্তু একা পাওয়া যায় না। উপর হইতে নামিয়া আসেন সাধনা, নীচের তলার একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে নিমি। সাধনা জহরকে বসিতে বলেন, নিমি আব্দার করিয়া বলে, ষ্টোভটা ধরিয়ে দেবেন জহর দা?

তাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাধনা বলেন, ওরকম প্যান প্যান করে কথা বলিস না নিমি, বিচ্ছিরি শোনায়। তুই ধরাতে পারিস না ষ্টোভ? জহরকে কেন?

জহর দা ভাল পারেন।

সাধনা এ কথায় আরও অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, জহর দা বলতে না তোকে বারণ করেছি নিমি? তাও এমন করে বলিস যেন 'জরদা' বলে ওর নামটা নিয়ে তামাসা করছিস। অনুর চেয়ে জহর বড়, ওকে বড় দা বলিস।

এদিকে কলসী ভরিয়া যায় তরঙ্গের, কিন্তু চোখে জল কই তার, যে জলের টপ্ টপ্ করিয়া মাজা বাসনে পড়া উচিত ছিল? চোখ পর্য্যন্ত ছল ছল নয়, মুখ পর্য্যন্ত ম্লান নয়। তাকে দেখিয়া একটু চাপা হাসিও যদি তরঙ্গ হাসিত! একটু আড়চোখেও অন্ততঃ যদি সে চাহিত বারেকের জন্য!

জলের কলসী তুলিয়া রাখিয়া তরঙ্গ কি কাজে যেন উপরে গেল, সাধনা কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রশ্নটা কানে না তুলিয়া গোঁয়ারের মত জহরও তার পিছু পিছু দোতালায় উঠিয়া গিয়া বোকার মত জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করেছ না কি?

তরঙ্গ বলিল, আপনাকে না বাড়ী যেতে বলেছিলাম?

জহর আত্মপ্রতিষ্ঠের অভিনয় করিয়া সহজভাবে বলিল, তা বলেছিলে।

কেন তবে আমাকে জ্বালাতন করছেন?

জ্বালাতন করছি?

এত করে বোঝানর পরও তা মাথায় ঢোকে নি? আপনি কি হাবা? এত সোজা একটা কথা, তাও কি মাথায় লাঠি মেরে না বোঝালে বুঝতে পারেন না? কেন যে আপনারা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মান! জানেন, আপনাদের জন্যে দেশটা রসাতলে গেল।

আরও অনেক কথা। তরঙ্গ যে বক্তৃতাও দিতে জানে, মেয়ে হইয়াও সে যে মেয়ে নয়, সে আজ মরিয়া গেলেও যে তরঙ্গ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে না, এই ধরণের অনেকগুলি সত্য অতি অল্প সময়ে আবিষ্কার করিয়া জহর আবার নামিয়া আসিল পথে। মাথার জগৎটা এবার বাহিরে আসিয়াছে, ছোট ছোট চৌকা ঘর-কাটা ফুটপাথের পানের পিক, নোংরা জল, ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া পাতা, কুকুর, মানুষ, গরু, গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী ঘর, আকাশ, যেখানে যা কিছু আছে সমস্তের মধ্যে, কারণ জগৎটা তাই, —মাথার ফাঁকীর খেলার মধ্যেও বাহিরে সব কিছু থাকার

রহস্য। জহরের কি আর বুঝিতে বাকী আছে বাস্তবতা কাকে বলে? তরঙ্গ ঠিক বলিয়াছে, মানুষ হইয়া যে একজন দু'জন মানুষের জন্য কাঁদে সে অমানুষ। কাঁদিতে যদি হয় তো বৃহত্তর মহত্তর কোন কিছুর জন্য কাঁদা উচিত, সেই কান্নাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ, আর সব ন্যাকামি। আরও যেন কি সব বলিয়াছে তরঙ্গ? বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় বড় করিয়া তরঙ্গ যত বড় বড় কথা বলিয়াছিল, ইতিমধ্যে প্রায় তার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া জহর আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এত বই পড়িয়া এত কথা এতকাল ধরিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছে, শুধু তরঙ্গের কথাগুলি দশ মিনিটের মধ্যে ভুলিয়া গেল? সে যে অপদার্থ তাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কে অপদার্থ নয়? দৃষ্টিতে যেন তার নূতন একটা রশ্মি সঞ্চারিত হইয়াছে, মানুষের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া একেবারে ভিতরটা খানাতল্লাসী করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, —এমন কি এক শ' দেড় শ' গজ দূরে দাঁড়াইয়া যে লোকটা চুরুট টানিতে টানিতে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তার ভিতরটা পর্য্যন্ত জহরের দৃষ্টির আলোতে সুস্পষ্ট। লোকটার কাছাকাছি আসিতে আসিতে ট্রাম আসিয়া পড়িল, জহরও উঠিয়া পড়িল ট্রামে। ট্রামের দেশী আর 'ট্যাঁস' নরনারীগুলিও তাই, সব অপদার্থ। কারও মুখে মনুষ্যত্বের ছাপ নাই, বৃহত্তর মহত্তর কিছুর জন্য কাঁদা দূরে থাক, দু'একজন মানুষের জন্য পর্য্যন্ত তারা কেউ কাঁদিতে রাজী কি না সন্দেহ, ট্রামের টিকিট কেনার পয়সা খরচ করার দুঃখ সহ্য করিতেই যেন সকলের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা জহরের ছিল না। তবু বাড়ী ফিরিতে হইলে একটা পার্কের যে কোণে নামিয়া তাকে বাসে উঠিতে হইবে, সেইখানে সে নামিয়া পড়িল। পার্কে একটা সভা হইতেছে, সভায় না ঢুকিয়াই বোঝা যায় দেশের নামে দেশের লোকের সভা, কারণ, সমগ্রভাবে সভার চেহারাটা কুড়ানো আবর্জ্জনার স্তূপের মত,—হুজুগের ঝাঁটা অকেজো ফেল্‌না কতকগুলি মানুষকে একত্র করিয়াছে। তরঙ্গের সঙ্গে সমস্ত জগৎ তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ভিতরে এই রকম একটা অনুভূতির প্রাবল্য থাকায় ভাঙ্গাবাড়ীর পুরাণো ইট-পাটকেলের স্তূপের মত এতগুলি মানুষের ভিড়ের জন্য জহর একটু আকর্ষণ বোধ করিল। পার্কে ঢুকিয়া সে মিশিয়া গেল ভিড়ে। লোক বড় কম জমে নাই, হাজার তিনেক হইবে বোধ হয়। বাহির হইতে সভার যে বৈশিষ্ট্য জহরের চোখে পড়িয়াছিল, ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল আশেপাশে যে ক'জনের মুখ ভাল করিয়া দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকের মুখে সেই বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিগত ছাপ। বেশ বোঝা যায়, কেউ আপিস হইতে ফেরার পথে বিনামূল্যে একটু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করিতেছে, কেউ উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ান স্থগিত রাখিয়া ভিড়ে মিশিয়াছে, কেউ নিদারুণ অত্মগ্লানিকে একটু ফাঁকী দিবার আশায় দেশের জন্য আহূত সভায় যোগ দেওয়ার মত মহৎ কাজের আত্মপ্রসাদটুকু লাভ করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে এই ভাবে সভায় সভায় উচ্ছ্বাসের রোমাঞ্চ ও শিহরণ পাওয়ার নেশা মিটাইতে। ডাইনের বুড়োমানুষটি ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া যাইতেছেন, মুদ্রাদোষের জন্য অথবা বক্তৃতায় সায় দিবার জন্য বোঝা যায় না। বাঁ দিকের প্রৌঢ় লোকটি বোকা-হাবার মত প্রায় হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন বক্তৃতামঞ্চের দিকে, মনে হয়, আগে বক্তৃতার যে কথাগুলি তার কানে ঢুকিয়াছে, তার মানে বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে বক্তার এখনকার কথাগুলি কাণে ঢুকাইয়া চলিয়াছেন। সামনের যুবকটি বোধ হয় যৌবনচর্চ্চার ফলেই নিজের দেহে বাস করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু দেশে বাস করার অধিকারটুকু বজায় রাখার জন্য সভা ছাড়িয়া চলিয়াও যাইতে পারিতেছে না।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষগুলিকেই জহরের দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে জোর করিয়া চোখ রাখিয়া সে বক্তার কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল, সে যেন তরঙ্গের কথা শুনিতেছে। তরঙ্গই যেন পুরুষ সাজিয়া গলা মোটা করিয়া মঞ্চে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, আর সমস্ত কান্না ন্যাকামি, দেশের জন্য দশের জন্য যে কান্না সেই কান্নাই আসল কান্না। [ক্রমশঃ

প্রত্যাবর্ত্তন

—শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

প্রথম অঙ্ক

[খড়ের ঘর। হোগলা পাতার বেড়া। জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা। দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে ব'সে অধীর। পিড়ি পেতে, উঠানের ডান পাশে। সামনে ভুক্তা-বশিষ্ট জল-খাবারের পাত্রে খাবারের শেষাংশ। অদূরে সামনের দোরের পাশে বাইরে ব'সে সুব্রতা। কাঠের দরজা খোলা। পশ্চিমে ঢ'লে-পড়া সূর্য্যের হলদে সোনালী আলো পড়েছে এসে দাওয়ার বাম পাশে। ঘরের পাশে শিউলি গাছের জন্য ছায়াচ্ছন্ন অন্য অংশ। সুব্রতা বেশ বলিষ্ঠ, গায়ের রঙ গৌর, পীতাভ মুখখানা চ্যাপ্টাপানা, চোখ কাল, বেশ বড় বড়, ভুরু জোড়া সরু, ঘন, টানা, নাকটা সামান্য মোটা চোখের কাছে ভাঙ্গা। বিশেষ প্রশংসা ক'রবার কিছু নেই। বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত সুন্দরী। বিশেষ কিছু লিখতে গেলেই অন্যায় হয়ে পড়বে। একটি লাইনও লেখা চলে না। তবে সৌন্দর্য্য সামঞ্জস্যেই, তাই সুন্দর যদি ব'লতেই হয় ব'লতে পারি গেরস্থ-ঘরের বউয়ের যতটুকু হ'লে চলে। মনে রাখতে হবে পরণে লাল পেড়ে আধময়লা একখানা মিলের সাধারণ শাড়ী, সীঁথির সিঁদুর লুপ্তপ্রায়, কপাল অবধি ঘোমটা টানা, চুল যা দেখা যাচ্ছে মাঝে দ্বিধাবিভক্ত কটাও অনাদৃত রুক্ষ।

অঙ্গের আভরণ? সামান্য। আজ কাল দরকার নেই ত' বেশীর! কিন্তু সে কি সুব্রতার, তোমার না আমার? যাদের আছে অপর্য্যাপ্ত তাদের। সুব্রতার কাণে দুটো টপ্। হাতে সোনার ও শাখের শাঁখা দু' দু' গাছা ক'রে। বয়স আন্দাজ একুশ।

অধীর চৌধুরী, আঠার কুড়ি বয়স। গৌর...পীতাভ। বেঁটে গোলগাল, মুখে ব্রনের চিহ্ন অনেক। অধীরের গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী—ঢোলা। পরনে নীলপেড়ে মিলের ধুতি, পায়ে রবার সোল ক্যাম্বিশের জুতো।]

সুব্রতা। কে পাঠিয়েছে আপনাকে? দিদি?

অধীর। হাঁ, 'মা'-ই।

সুব্রতা। ওঁরা বাড়ীর সব কেমন আছেন?

অধীর। ভালই!

সুব্রতা। কারুর কোন অসুখ নেই ত? (মাথা নেড়ে অধীর জানাল'—না।) শুনেছিলুম আপনার কাকার...

অধীর। তেমন বিশেষ কিছু হয় নি। সেরে গেছে।

সুব্রতা। দিদি বুঝি কাশী যাবেন?

অধীর। ঠিক নেই। সম্ভব যেতে পারেন।

সুব্রতা। মিণ্টু কেমন আছে? কথা ব'ল্‌তে পারে?

অধীর। হাঁ, কিছু কিছু। (বিরাম)

সুব্রতা। আমাকে নেবার আপনিই বুঝি বড় উদ্যোক্তা?

(সুব্রতা হাস্‌ল, মৃদু-মধুর)

অধীর। কে ব'লেছে?

সুব্রতা। শুনলাম।

অধীর। হবে! তাতে ক'রে অন্যায় বিশেষ কিছু ত' ক'রছি নে! বরং আপনার ওপর যে অন্যায়টা করা হ'য়েছিল...জানি, তাকে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়, তবু, কিছু পরিমাণেও যদি সংশোধন করা যায়, ক্ষতি কি?

সুব্রতা। আপনাদের সংসারে যাতে কোন অশান্তি হ'তে পারে, সে ভাবে ত' আর যেতে চাইছি না। নিতেও পারেন না, অসম্ভব। আমি শুধু যাব, দিদির কাছে।

অধীর। কিন্তু আপনি গেলেই সংসারে অশান্তি হবে... কেন?

সুব্রতা। আপনার কাকীমা বুঝি বলেন?

অধীর। শুধু কাকীমা নয় বলে অনেকেই।

সুব্রতা। তাদের খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না।' হয়ত ভুল বুঝেছে, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা দেখা যায়, তাই নিয়েই লোকে বিচার করে। তাদের ধারণা, (হেসে) আজ যদি আপনাদের সংসারে স্ত্রী হ'য়ে যাই···আপনার কাকীমা কি কিছুতেই সহ্য করেন? আপনার কাকাই বা তা বরদাস্ত করবেন কেন?

অধীর। তা'হলে কেন হঠাৎ আজ যেতে চাইলেন, জানতে পারি না কি?

সুব্রতা। নিশ্চয় পারেন! এবং আমি জানাতেও চাই। প্রথম থেকেই আমার ওপর অবিচার হয়েছে কিন্তু। অকারণে অপরাধী করেছিলেন। (সোজাভাবে চাইল অধীর সুব্রতার পানে, সহজ করে হেসে) একটা কথা যদিও আজ বলার কোন মানে হয় না। না বললেও চলে—নিতে চেয়ে দেখেছেন—যেতে আপত্তি? নিতে চাইলে যেতে চাইনি এমন হয়েছে কোন দিন? রেখে গেছেন—আর নেন্‌নি।

অধীর। কিন্তু নিজেও গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারতেন ত!

সুব্রতা। কোন লাভ হত না। আপনাদের সংসারের চোখে আমার যত সব দোষ ছিল, নিশ্চই অমার্জ্জনীয়। কোনদিন সারবে এ আশাও করেন নি—স্বীকার এ কথা আজ করতেই হবে। কিন্তু সেগুলি আমি ইচ্ছে করে স্বভাবদোষে করেছি, কি মনের অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিণতির ফল, কোন দিন বিশেষ করে ভেবেছেন? জীবনে যতদিন সে সব অপরাধের হাত থেকে মুক্তি না পাই—গিয়ে কি হ'ত? আবার ফিরিয়ে রেখে যেতেন ত! অবিশ্যি আজ যেতে চাইছি বলেই মনে করবেন না—তাদের সবাইকার হাত থেকে মুক্ত চির-কালের মত। জোর করে ততখানি বলবার সাহস নেই।

অধীর। স্বীকার করেন—আজ অসময়?

সুব্রতা। জানি না। উপায় নেই—আমাকে যেতেই হবে। আপনারা যাকে অসময় বলেন—নিজে যদি সাম্‌লে চলতে পারি তা'হলে সে অসময় হবে না—কোন দিন না! (সহসা) আমার যাওয়াতে আপনার কাকারই বুঝি সব চাইতে বেশী অমত?

অধীর। এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

সুব্রতা। যেহেতু সম্ভাবনা বেশী! আমার দুর্ভাগ্য তা না হ'লে সবাই অবিশ্বাস করে? তবে একথা ব'লতে পারি, যদি বিশ্বাস করেন···আমার জন্য আপনাদের সংসারে এক দিনের তরেও কোন অশান্তি হ'তে দেব না, যখন যেতে চেয়েছি এটা ঠিক জানবেন···কি হ'লে থাকা চলবে বুঝেই যাবার ইচ্ছে জানিয়েছি। নিজে যতদিন তার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি নি···যাবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা সত্ত্বেও জানাই নি। আবার ফিরে আসতে ত যাব না!

অধীর। সে ভাবে যেতে না পারলে গিয়ে আপনারই বা কি সার্থকতা?

সুব্রতা। সার্থকতা? (থামল) সুখ করা সবাই-এর ভাগ্যে জোটে না। মোহ, একটা অকারণ দুর্দ্দমনীয় মোহ, এ-ছাড়া কি আর ব'লবেন একে! (একটু পরে) কারুর বিরুদ্ধেই কোন' অভিযোগ নেই আমার। আপনার ছোট কাকীমার উপরও না। আমার প্রতি তার হিংসা, ভালবাসার স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

(শিউলিগাছ তলা দিয়ে পাকা চুলওয়ালা টেকো এক বেঁটেপানা বৃদ্ধ দাওয়ার পাশে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন। খালি গা, সুস্থদেহ, বেশ একটি ভুঁড়ি, গায়ের রঙ গৌর, লম্বা দাড়ি, আধপাকা, চোখ বড়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বয়স কম ক'রে পঞ্চাশ, গলায় লম্বা পৈতা, মাথার টিকিতে জট পাকান, ঘাড়ের উপর সিল্কের একখানা চাদর ফেলা, পরনে থান, চোখে চশমা, নাম শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)।

সুব্রতা। বাবা আজ আমি যাব!

দয়াময়। কোথায়? (অধীরের পানে চেয়ে রইলেন! সুব্রতা বলতে দ্বিধা ক'রছে দেখে অধীর উঠে দয়াময়কে নমস্কার করে ব'লল—আমি নিতে এসেছি। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন! ভাল করে অধীরকে নিরীক্ষণ করে) এতদিন পরে যে আবার!

সুব্রতা। আমিই ওদের আসতে বলেছিলাম।

দয়াময়। অর্থাৎ যাবে ব'লে লিখে পাঠিয়েছ। তা বেশ, যদি লিখেই থাক···যাও! লিখবার বেলা যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে কর নি, আজ এ অর্থহীন অনুমতির কোন সার্থকতা আছে মনে হয় না। (সুব্রতা এগিয়ে উঠান অবধি এসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল)। এ তোমার একটা অর্থহীন মোহ বইত' নয়! ইচ্ছে হ'য়ে থাকে···যাও। নিজে যদি শান্তি পাও তাতে বাধা দিতে যাওয়াও মোটেই সঙ্গত নয়! তবে অপমানিত হ'য়ে ফিরে আসবার চাইতে, আমার মতে না যাওয়াই ভাল। গিয়ে ওখানে যে অ-শান্তির সৃষ্টি করবে, নিজেও তা'থেকে অব্যাহতি পাবে মনে হয় না। জ্বলে ম'রতে হবে, অবিশ্যি অশান্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে

আমরণ। তারা শান্তিতে আছে তাতে বিঘ্ন হতে যাওয়াও সঙ্গত নয়।

অধীর। ওঁর ওপর একটা অন্যায় করা হয়েছে

দয়াময় কথা তোমার ঠাকুরদা স্বীকার করতেন না অধীর! কোন দিন না। এ যে একটা অন্যায়, এ কথা স্বীকার করতেই তিনি দ্বিধা বোধ করতেন। চাইতেন না, অচল চালিয়েছিলাম! (অধীরের পানে চেয়ে) আজকেই নিয়ে যেতে চাও?

অধীর। সেই রকম ত' ইচ্ছা।

দয়াময়। পাঁজী টাজী দেখে এসেছ?

অধীর। আজ্ঞে না!

সুব্রতা। পাঁজী দেখে কি হবে?

দয়াময়। না, দেখে আর কি হবে? অশ্লেষা! তিথিটা বড় সুবিধার নয়, কি বল? অধীর, নিয়ে যাওয়া···

অধীর। মার কাশী যাবার সম্ভাবনা রয়েছে!

দয়াময়। দু'চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছেন কি? তোমাদের পূজা আছে না?

অধীর। মার জন্য ঠেকবে না! দাদামশায়ের অসুখ···

দয়াময়। অন্ততঃ কাল···কি বল? বিশেষ কোন অসুবিধা···তুমি গিয়ে মাকে ব'ল—না নিয়ে গেলেই হয়ত শুনে তিনি ভাল বলবেন! সুবির কোন আপত্তি হয়ত নেই আজ যেতেও, আমার মনটা···একদিনের জন্য এমন কি আর এসে যাবে বল? কাল এসে নিয়ে যেও! (দয়াময় অধীরের ঘাড়ের ওপর হাত দিলেন।)

অধীর। (থেমে) আচ্ছা!

দয়াময়। অসন্তুষ্ট হলে না ত?

অধীর। (অপরাধীর মত হেসে) আজ্ঞে না!

দয়াময়। মাকে ব'ল আমার কথা, (রোগা-পট্‌কা বছর দশেকের একটা ছেলে দৌড়ে ঘরে উঠতেই) এই বিশে! (থমকে দাঁড়াল বিশ্বনাথ) তামাক সেজে নিয়ে আয় ত। (মাথা চুলকে একটু থেমে বিশ্বনাথ চলে গেল।) তুমি আজ থেকে যাও না অধীর! কাল ভোর বেলা ওকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হ'য়ো।

সুব্রতা। তাই করুন না কেন? সেই ত' সব চাইতে ভাল হয়! (অধীর সুব্রতার পানে চেয়ে মাথা নেড়ে হেসে জানাল, উহুঁ হয় না!)

অধীর। মা হয়ত চিন্তিত হয়ে পড়বেন!

দয়াময়। জলে পড় নি ত'!

অধীর। আমি যাই। কাল নিখিলবাবুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। যখন হ'ক! আমি এসে আর কি করব!

সুব্রতা। (দয়াময় ভিতরে ঢুকে গেলেন) না, সে হবে না, একটু কষ্ট হলেও আপনাকে আসতেই হবে। নিখিলদা'র সঙ্গে আমি যাব না। আসবেন বলুন!

অধীর। একবার ত' এসেই গেলাম···আবার কি হবে? যে পথ!

সুব্রতা। কষ্ট হলেও ত' শুনব না। আপনাকে আসতেই হবে···আপনিই এসে নিয়ে যাবেন! কথা দিয়ে যান! (দাওয়ার মাটী খুঁটতে খুঁটতে সুব্রতার পানে চাইতেই) সে শুনব না···এটুকু অত্যাচার আপনাকে সহ্য করতেই হবে। বলুন আসবেন!

অধীর। আচ্ছা দেখি!

সুব্রতা। কথা দিয়ে যাচ্ছেন?

(অধীর প্রণাম করতে এগুতেই সুব্রতা সরে গেল।)

অধীর। প্রণাম নিলেন না এ কথা কিন্তু ভুলব না।

সুব্রতা। অপাত্রে দান করলে কি ক'রব বলুন!

(অধীর হেসে চলে গেল শিউলিতলা দিয়ে—দাওয়া দিয়ে সেদিকে এগিয়ে) কখন আসবেন কাল?

অধীর। আজ যখন এসেছিলাম। (অধীর অদৃশ্য হলে সুব্রতা আস্তে মাথার কাপড় ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দয়াময় বেরিয়ে এলেন দাওয়ায়। এবার চাদরহীন।)

দয়াময়। হারামজাদা, এত বড় পাজী, পালিয়েছে। একটু তামাক দেজে দিতে ব'লেছি···অধীর চ'লে গেল?

সুব্রতা। (ভেতর থেকে ফিরে এসে) হাঁ!

দয়াময়। কি ব'লে গেল?

সুব্রতা। কাল বিকেলে নিতে আসবেন।

দয়াময়। কিছু অসন্তুষ্ট হ'ল মনে কর! ও নিজেই আসবে?

সুব্রতা। সেই রকমই ত' ব'লে গেলেন।

দয়াময়। আবার হঠাৎ এতদিন পরে যাবার ইচ্ছে কেন হ'ল সুবো! (সুব্রতা মাথা নীচু করল।) তোমার প্রত্যাবর্ত্তন সেখানে যে অনেকেরই অভিপ্রেত নয়…

সুব্রতা। কিন্তু কি করব বাবা, এ বয়সে স্বামীর ঘরই সব চাইতে নিরাপদ নয় কি আমার পক্ষে?

(দয়াময় বিস্মিতভাবে, নির্নিমেষ নয়নে চাইলেন সুব্রতার পানে। একটু দাঁড়িয়ে ও বেরিয়ে গেল। দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ও বিদায় নিলেন।)

অন্য দৃশ্য।

(আভাময়ীর ঘরে। বিনেয়ন্দ্র চৌধুরী, বয়স আঠাশ। বিছানার পাশে একখানা চৌকিতে ঠেস দিয়ে ব'সে। গায়ে হাফ সার্ট, পরনে আধ ময়লা নীল ফিতে পেড়ে ধুতি।

বিনয়েন্দ্র লম্বা প্রায় ছ'ফিট হবে। দেখতে বেশ, চলতি কথায় সুন্দর। চেহারা নিতান্ত মন্দ নয়, তবু বলবার কিছু আছে? না বোধহয়। মুখখানা লম্বাপানা। চোখ দুটো টানা—কটা—উজ্জ্বল। একটু মেয়েলি ঢঙের মুখ না হ'লে সাধে কি আর সাজতে হয়েছে কুড়ি বছর অবধি থিয়েটারে রাজার মেয়ে?

ভুরু পাতলা, বাদামী, ছোট, মানে চোখের সমান, না হয় সামান্য বড়। তাতেই বা এমন কি? অধুনা মুখখানা চোয়াড়ে। মাথার চুল সামনে ছোট করে কাটা। দাড়ি উঠেছে সারা মুখ ভরে। কামায় নি, না হ'লে ক্লিন-সেভ্ড হওয়াই ওর সাধারণ অভ্যাস।)

বিনয়। বৌদি! বৌদি! ও বৌদি, শুনুন! এদিকে আসুন!

(বৌদি উঠান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বিনয়ের কাছে এলেন। আভাময়ী বিধবা। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। গায়ের রঙ দুধের মত, ক্ষীনাঙ্গী, মাথার চুল কদম ফুলি ক'রে কাটা, কপাল অবধি ঘোমটা। এ আর খুব বেশী কি? আজ বছর কয়েক ত' মোটে মুখ খুলেছেন। চোখ, নাক, কাণ—মুখ, নিতান্ত সাধারণ, বলবার মত কিছু নেই ওতে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।)

আভাময়ী। কি?

বিনয়। বসুন না!

আভাময়ী। কেন? কি? বলুন; হাতে একটু কাজ আছে, সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

বিনয়। আপনাকে আমি ছোট বেলা থেকে কোনদিন অমান্য করিনি।

আভাময়ী। (হেসে) ক'রেছেন ব'লে অভিযোগ কি করেছি?

বিনয়। (মাথা ফিরিয়ে শান্ত ও সংযতভাবে) আজ অধীরকে পাঠিয়ে আপনি আমার উপর অন্যায়ই করবেন। আপনি জানেন, ও যদি আসে সংসারে শান্তি যতটুকু ছিল… ছোট বড়… (আভাময়ী বিনয়ের দিকে মুখ করে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন দরজায়।) আমার ইচ্ছে নেই ওকে আর কোন দিন এ বাড়ীতে আনার।

আভাময়ী। কেন নেই ঠাকুর পো! সে ত' আর আপনার কাছে কিছু চাইছে না। সংসারে আপনার ভাত-কাপড়ের অভাব নেই। যদি সুবো আসতে চায়? একদিন আপনিও তাকে বিয়ে করেছিলেন। অধিকার তারও কিছু আছে।

বিনয়। বে' আমি ছোট বউকে করিনি বলতে চান? সুখী তাকেও ক'রব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি।

আভাময়ী। সে ত' আর আপনার কাছে আসছে না? আনছি আমি, আসছে সে আমার কাছে। ভাল ব্যবহার যদি নাই করতে পারেন, মন্দ ব্যবহার করবার কোন মানে হবে না। আজ ছ'বছর সে বাপের বাড়ীতে আছে। একটা কথাও কেউ বলতে পারেনি, আপনি ইচ্ছে না হয় তার সঙ্গে কথা কইবেন না!

বিনয়। তা নয় বৌদি, ও এলে সংসারে যদি একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে বসে, সেই কি ভাল হবে মনে করেন?

আভাময়ী। আপনি শুধু অনুর কথাই ভাবছেন ঠাকুর পো, আর একটা জীবন…

বিনয়। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি!

আভাময়ী। সুব্রতা তখন কত ছোট ছিল বলুন ত! বছর তের-র একটা মেয়ের ভাল-মন্দ বিচার করবার কতখানি ক্ষমতা থাকে ঠাকুর পো?

বিনয়। আজ আর সে কথা ভেবে কি লাভ বলুন! আপনারা সবাই ত তখন এক রকম জোর করেই বিয়ে দিয়েছিলেন।

আভাময়ী। ভুল হতে পারে সবায়েরই, অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঠাকুর পো—আপনার সামান্য ত্যাগ আজ যদি সে ভুলের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে, তাতে দোষ কি? কেন করবেন না বলুন? সব বুঝি ঠাকুর পো, বিয়ে দিয়ে আপনার এবং সুব্রতার মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় বাধাই সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনাকে তার কথা ভাবতে দেবার নৈতিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর অধিকার কি দাবী করছে সুবো? মানুষ হিসেবে তার জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে আপনার সহানুভূতি যদি খুঁজে পায় একটু কিছু তা হলেই ও সন্তুষ্ট। অন্য কোন কিছু দাবী সে করে না। করতে চাইবেও না।

বিনয়। না, কিছুতেই আর আন্‌ব না।

আভাময়ী। (স্মিত হাসি হেসে, ঘোমটা টেনে) না আন্‌তে পারেন। কিন্তু আস্‌তে চাইলে বাধা দেবার যুক্তি আপনার কি আছে?

বিনয়। তা হলে আপনার মত আমার এ বাড়ীতে না থাকা?

আভাময়ী। লোকের সম্বন্ধে ধারণাটাকে আরও সামান্য কিছু বাড়িয়ে দিন। এতদিন পরে যখন সে আসতে চেয়েছে দেখবেন—আমি বলে রাখলাম তার ফলে এক দিনের জন্যও আপনাকে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয়, এমন কিছু দাবী সে করবে না।

বিনয়। বেশী বুঝবেন না। মেয়েদের কতকগুলো মোহ আছে, তা থেকে অব্যাহতি পায় না জীবনে কোন অবস্থাতেই।

আভাময়ী। আমি মেয়ে নই ঠাকুর পো? প্রয়োজন হলে তাদের ছেড়ে দিতেও কুণ্ঠা আমাদের খুব বেশী থাকে না। দেখছেন তো! (পরে) তাদের বাড়ীর অবস্থার কথা দেখুন!

বিনয়। বেশ, থাক ও সেখানে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

আভাময়ী। (হেসে) আপনার এ উদারতার জন্য প্রশংসা করকে পারলাম না ঠাকুর পো! আসতে চাইবার আগে কোনদিন শুনিনি সাহায্য করবার কথা।

বিনয়। কবেই বা চেয়েছে বলুন!

আভাময়ী। চাইবার কি প্রয়োজন ছিল—যদি কর্ত্তব্য-বোধেই দিতেন! অবস্থা তাদের ভাল নাই হল। বাপের সংসারে একটা অনাবশ্যক উপরি বোঝা ত! আর যদি মোহের কথাই বলেন, ধরে নিন স্বামীর ঘর করবার এ অকারণ, অর্থহীন ইচ্ছাও একটা মোহ। আপনি তাকে সাহায্য করতে রাজী। এখানে আসছে—আসুক, সংসারে কাজ করবার মত লোক ত বেশী নেই! অন্নুর শরীরও ভাল থাকে না সব দিন। দু' চারটে কাজ 'হক্ করবে, খাবে, পরবে, থাকবে!

বিনয়। অত সহজেই যদি হ' হলে আপত্তি করবার মত বিশেষ কিছু ছিল না।

আভাময়ী। নিজের উপর বিশ্বাস আপনার কতটা আছে ঠাকুর পো! (বিনয় বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইতেই) খুব বেশী মনে হয় না, বড়াই ক'রলে স্বীকার ক'রব না।

বিনয়। কেন?

অভাময়ী। সুব্রতার ফিরে আসাতে আপনার সঙ্কোচ দ্বিধা!

বিনয়। ওর ওপর বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি ব্যক্তিগত ভাবে আমার নেই। কিন্তু ছোট-বউয়ের দিকটাও তো না দেখে পারা যায় না একেবারে!

আভাময়ী। গর্ব্ব ক'রলে স্বীকার করিতে পারি না। নিজেকে সাম্‌লে চ'ল্‌বার মত সংযম আপনার খুব বেশী নেই ঠাকুর পো! তাই সুব্রতা চ'লে যাবার পর কিছু দিন পরে আপনার বিয়েতে আপত্তি করিনি! অথচ জানেন অজুহাত দিতে হয়েছে সংসারের কাজের। কেন আপত্তি করতে পারিনি এখন বুঝলেন! হয়ত বাবা অসুস্থ, ঠাকুমা অচল, কাজের লোকের অভাব ছিল, অস্বীকার করলে অন্যায় হবে কিন্তু যে করেই হ'ক চ'লে যাচ্ছিল ত'! অসুবিধা হ'লেও অচল হ'য়ে থাকত না সম্ভবতঃ।

বিনয়। যা ভাল মনে করেন করুন, কিন্তু এখনও ভেবে দেখবার অবসর ছিল।

আভাময়ী। আমার উপরেই যদি সব নির্ভর করে, আসতে যখন সে চেয়েছে, বাধা দিতে আমি পারব না
(আভাময়ী চলে গেলেন।)

বিনয়। বেশ! (হাই তুলে উঠে দাঁড়াতেই অনিমা ঢুক্‌ল' ঘরে। আধ ময়লা রঙ, কি ব'লব, শ্যাম? অতিশয়োক্তি! কাল? না অবিচার করা চ'লবে না। বেঁটে না হ'লেও লম্বা নয় ঠিক, পাতলা, মুখখানা লম্বা। কপাল প্রশস্ত ও বড়। চোখ কটা। টানা ভুরু পাতলা মোটা টানা নয়। আর সবই ঠিক আছে সামঞ্জস্য। চুলগুলি পাতলা বাদামী লম্বা সোজা। অনিমা বিনয়ের বিবাহিত স্ত্রী, কপালে সীথিতে রীতিমত দাবীর চিহ্ন সিঁদুর। হাতে শাঁখা, গলায় হার, কাণে আরও কি সব।)

অনিমা। কাকে না কি আনছ'?

বিনয়। আন্‌ছি! কে আমি?

অনিমা। হাঁ! (পাশে এসে দাড়াল' ওর।)

বিনয়। আমি আনিনি কাউকে।

অনিমা। কে তবে আন্‌ছে?

বিনয়। নিজেই সে আসছে, আনতে হয়নি।

অনিমা। ভাসুর পো' কেন গেল তবে?

বিনয়। বৌদি পাঠিয়েছেন হয় ত বা।

অনিমা। আন্‌তে আমার একটা মতামতের দরকার স্বীকার কর?

বিনয়। আমি ক'রলেও বৌদি করেন না।

অনিমা। কেন?

বিনয়। যে হেতু তোমাকে আন্‌বার বেলাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি'!

অনিমা। সুব্রতা যা ক'রে চ'লে গেছে, অন্য কে'উ হ'লে চিরকালের মত ত্যাগই ক'রে রাখত।

বিনয়। আমাদের সে দিক থেকে বৈশিষ্ট্য কোথায় দেখলে? আমরাও ত' ফেলেই রেখেছি ত্যাগ করবার মত করেই?

অনিমা। তা'হলে আজ আস্‌ছে, বাধা কেন দিচ্ছ না?

বিনয়। স্ত্রীর অধিকারে আস্‌তে চাইলে বাধা দিতুম নিশ্চয়!

অনিমা। আস্‌ছে সে কোন্ অধিকারে?

বিনয়। কোন অধিকার নিয়েই নয়, বাপের সংসারে সে অকারণ বোঝা। তাই বউদি তাকে আনাচ্ছেন।

অনিমা। এখানে এসে তবে কি করবে?

বিনয়। কি করে বলব? আগে আসুক!

অনিমা। না। কি মনে করে আসছে?

বিনয়। সাধারণ অতিথির মত থাকতে!

অনিমা। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না?

বিনয়। নির্ভর করছে আমার ওপর! (বসল চৌকিতে)

অনিমা। আমাকে জব্দ করবার জন্য দিদির এযে একটা চাল, বোঝ? সে তোমার স্ত্রী ছিল, আজ সে এসে অতিথির মত তোমার বাড়ীতে থাকবে—বিশ্বেস ক'রতে বল?

বিনয়। এ সংসারে থাকতে হলে, সে ভাবে থাকতেই হবে। কোন কিছুর জন্য যদি উদ্বাস্ত হতে হয়, তা' হলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে এলেই হল!

অনিমা। নিজে যদি ঠিক থাকতে পার'......

বিনয়। মানে?

অনিমা। যদি তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক তোমার না রাখ......

বিনয়। হাঁ তা'হলে সব·· গোলযোগ কিছু হতে পারে না! সত্যি!

অনিমা। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি! কোন দিন অন্যায় ক'রতে পার, এ ধারণা ভুলেও কখন মনে স্থান পায় না।

বিনয়। খুবই ভাল! কিন্তু বিশ্বাস সত্যি কি ভুল জেনে নিয়েছ?

অনিমা। যদি সব অবস্থাতেই নির্ব্বিবাদে তোমাকে বিশ্বাস করে যাই, অন্যায় তুমি করতে পার না।

বিনয়। যদি স্বীকার কর তোমাকে ভালবাসি, জীবনে যে কোন অবস্থাতেই সেটুকু অটুট রাখবার চেষ্টা ক'র! ভালবাসি সত্য, কিন্তু কি জান অনিমা, প্রকৃত মূল্য তার কত আজও জানতে পারিনি, খুব বেশী মূল্য কি করে দেব? পরীক্ষা হয়নি ত কষ্টি-পাথরে।

অনিমা। বললে না, থাকবে এসে সে আগন্তুকের মত? তা হলে মনে মুখে কি সে এক নয়?

বিনয়। নিজের পায়ে স্বেচ্ছায় যদি কুড়োল মারে, তোমার আমার করবার কি আছে? কিন্তু বর্ত্তমান সংসারের শান্তিকে ব্যাহত হতে দেব না কিছুতেই! অন্যায় হয়ত একদিন করেছি তার ওপর, কিন্তু আজ তার সংশোধনের অভিনয় করে আর একজনের ওপর তেমনি একটি অন্যায় করা যায় না। তোমার কোন অপরাধ নেই!

অনিমা। লোকে হয়ত মন্দ বলবে, কিন্তু স্ত্রী হিসাবে তোমার কাছে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যের পূর্ণ দানটুকু পাবার অধিকার আছে। সে দিক থেকে বোধহয় হিংসুটে নই, কোনদিন ভুলে যেও না যে অধিকারের শেষ সীমা অবধি দাবী করবার অধিকার আমার আছে। আগে থেকেই বলে রাখছি, না হলে কোনদিন ক্ষুণ্ণ দেখে যদি দাবী করে পেতে যাই, তা হলে লোকে যাই বলুক তোমার কাছে যেন অপরাধী না সাজি। যেন না বল অনধিকার চর্চ্চা করছি।

বিনয়। না। অপরাধী কোন দিনই তুমি নও অনু! অন্যায় করেছি আমি—আমরা। যদি কিছু ভোগ করতে হয়, প্রাপ্য আমাদের।

অনিমা। স্ত্রী অন্য কাউকে ভালবাসে সে যেমন কোন স্বামীই বরদাস্ত করে না, তেমনি স্বামীর একান্ত ভালবাসাও স্ত্রীর প্রাপ্য ও কাম্য, সে দিক থেকে বিচার করলেও সুব্রতা কোন সমবেদনা আশা করতে পারে কি?

বিনয়। সমবেদনা মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত।

অনিমা। নিজের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে সমবেদনা দেখাবার মত উদারতা ক'জনার আছে? (হেসে) সাধারণ ন্যায় বা অন্যায়ের মাপকাঠীতে বিশেষ কোন অবস্থাকে বিচার করতে গেলে, ভুল হবারই সম্ভাবনা।

বিনয়। নিজের অধিকার বলতে কি তুমি বোঝ অনু? (অনিমা সন্দিগ্ধ নয়নে চাইল সংযত বিনয়ের পানে) সেই বুঝে আমায় চল্‌তে হবে ত!

অনিমা। তোমার হৃদয়ে তার কিছুমাত্র অধিকার কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

(বিনয় উঠে যাবার উপক্রম করতেই) খুব নাকি লেখা-পড়া শিখেছে সুব্রতা?

বিনয়। খবর রাখিনে।

অনিমা। ভাসুরপো বললেন।

বিনয়। হবে! এ ত' খুব বেশী একটা কিছু নয়।

অনিমা। যত না কি তার দোষ ছিল সব সেরে গেছে।

বিনয়। জানি না, সেরে থাক্ বা না থাক্, অন্ততঃ সে সব দোষগুলি সামলে চলবার মত বুদ্ধি যে হয়েছে, এ কথা বুঝতেই হবে।

অনিমা। কি করে জানলে?

বিনয়। এতে জানা-জানির বড় বেশী দরকার হয় না অনিমা। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বোঝা উচিত। না হ'লে এতদিন পরে সে আসতেই বা কেন চাইবে? তাকে সাদরে গ্রহণ যে করব না এটুকু অন্তত বেশ বোঝে (মিন্টু কেঁদে উঠলে অনিমা অন্য ঘরে চলে যেতেই বিনয়েন্দ্র সামান্য ব'সে বেরিয়ে পড়ল। 'মা'! 'ও মা'! 'মা'! আভাময়ী একটা হ্যারিকেন হাতে ক'রে ঘরের মধ্য হতে বেরিয়ে এলেন। অধীর ডেকেছে, উঠানে এক পা আর এক পা দাওয়ায় দিয়ে খুটি হেলান দিয়ে বসেছে অধীর।

আভাময়ী। কই? খুড়ি মা এলনা?

অধীর। পাঠাবার আগে পাঁজীটা খুলে দেখে পাঠালে আমার পরিশ্রমটা ব্যর্থ যেত না। না করলেও চ'লত!

আভা। আবার কবে যেতে হবে? বলে দিয়েছে কিছু?

অধীর! কাল বিকেলে! সে ব্যবস্থা না করে কি আর ছেড়েছে!

আভা। কে? সুবো!

অধীর। কাকীমার আসতে কোন আপত্তিই ছিল না।

আভাময়ী। আগে থেকে কেমন দেখলি? ভাল হয়েছে, না?

অধীর। দু' ঘণ্টায় কি বোঝা যায়?

আভা। কথাবার্ত্তার কি মনে হ'ল?

অধীর। খানিকটা বদ্‌লে গেছেন।

আভা। কাকা ত' আজও আমাকে বলে গেলেন, যদি কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় তা হ'লে আজীবন দুষবেন্ আমাদের। বিশেষ ক'রে আমাকে।

অধীর। উনি কি বললেন জান? বললেন একদিনের জন্যও অশান্তি হ'তে দেবেন না।

আভা। পাঁচ জনের মুখে শুনে···না। ঠাকুর পো' কে সেই কথাই বলেছি অধীর! কেন আজ আসবার জন্য এত ব্যস্ত বুঝলি কিছু?

অধীর। তাঁর দোষের জন্য ফেলে রেখেছিলে। আজ তা হতে সে মুক্ত। কেন আনবে না!

আভাময়ী। (হাস্য) সুবো বলে!

অধীর। কাকা আবার বে ক'রেছেন, সে তাঁর অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, তাকে মাথা পেতে নেবেন।

অনিমা। (পাশ থেকে সহসা) খাবেন না ভাসুর পো?

আভাময়ী। যা খেয়ে আয় গে। মিণ্টু উঠলে ওকে কষ্ট পেতে হবে।

অধীর। ভাত বাড়ুন আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। (উঠে দাঁড়িয়ে অধীর চলে গেল)।

আভা। খেয়ে পরে আবার আসিস্ অধীর।

(একটু পরে এল বিনয়, আভাময়ী বসে ছিলেন।)

বিনয়। অধীর এসেছে বৌদি?

আভা। হাঁ, আসেনি সুব্রতা, দিন খারাপ, পাঠাতে চাইলে না, কাল অধীরকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছে।

বিনয়। নিজেরা এসে দিয়ে গেলেও দোষ হয় না।

আভাময়ী। অধীর কথা দিয়ে এসেছে ঠাকুর পো।

(বিনয় একটু দাঁড়িয়ে চলে যেতেই, আভাময়ীও নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।)

'উঠান অন্ধকার। ধপ করে একটা শব্দ হল। 'অধীর' অধীর!' 'আজ্ঞে', অধীর বেরিয়ে এল আলো হাতে। ট্রাঙ্কটা মাঝি রেখেছে দাওয়ায় তাই এই শব্দ। আভাময়ী এসে দাঁড়ালেন। এল অনিমা। মাঝে দাঁড়িয়ে সুব্রতা, কাল একখানা শাড়ী পরা, গায়ে ভাঁজ করে সিলকের চাদর জড়ান, পাশে দয়াময়। হাতে ছাতি লাঠি, গলার ওপর একটা চাদর, পায়ে চটী, পরনে থান। শাড়ীতে সুপ্রভার আপাদমস্তক ঢাকা। দেখতে পাওয়া যায় না কিছুই। অধীর, আভাময়ী, এমন কি অনিমাও আশ্চর্য্য হয়েছে কিছু।)

অধীর। আপনি আবার আজ কষ্ট করে এলেন কিসের জন্য? আমি ত বলেই এসেছিলুম কাল যাব ভোরে।

দয়াময়। কষ্ট আর কি বল? ভাবলাম ফিরিয়ে দিলাম, লজ্জায় মুখে হয় ত কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু মনে অসন্তুষ্ট হতে পার ত। আজও যা কালও তাই। তাই নিয়ে এলাম। যাও মা, যাও এখন। (একটু দাঁড়িয়ে দ্বিধাজড়িত পদে সুব্রতা উঠল গিয়ে আভাময়ীর ঘরে।)

অধীর। (দয়াময়কে) আসুন। বসবেন আসুন!

দয়াময়। না, বসে রাত বাড়িয়ে কি লাভ বল? আমি যাই।

অধীর। এত রাতে যাবেন কি? সে কি হয়?

দয়াময়। রাত তেমন আর কি বেশী?

আভাময়ী। (চাপা অথচ স্পষ্ট সুরে) কিছুতেই যেতে দিস নি অধীর, খাওয়া-দাওয়া করে কাল ভোরে যাওয়া।

দয়াময়। বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে এসেছি, কি করে থাকি বল?

অধীর। এত রাতে—আপনার না আসাই উচিত ছিল।

দয়াময়। তাতে আর কি হয়েছে অধীর! ও আমি ঢের যেতে পারব। আয় পবনা, মাঝি চলে গেল। (বাবার পানে ফিরে দাঁড়িয়েছে সুব্রতা। তাকে দেখে) যাই মা এখন! (না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন)।

আভাময়ী। খুব রাগী লোক যা হোক, কি বল। সুবো তোমার বাবা। (আভাময়ী হাসলেন)।

সুব্রতা। বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে এসেছেন ওঁদের!

আভাময়ী। এস ভেতরে এস! (সুব্রতা ভেতরে এল! আভাময়ীর বিছানা তখন পাতা ছিল। পাশে আভাময়ী বসলেন। সুব্রতা বসল বিছানার পর, ঘোমটা হতে মুখ বেরিয়েছে এতক্ষণে। সুব্রতার সোজা দৃষ্টির সামনে আভাময়ী বিব্রত! অনেকই আছে, বলবার কত কি। কোন্‌টা প্রথম? কোন্‌টা সঙ্গত হবে?)

অধীর। মা ট্রাঙ্কটা কোন ঘরে রাখব?

আভাময়ী। আপাতত এখানেই! কি বল সুবো? (মাথা নেড়ে সুব্রতা জানাল, হ্যাঁ।) এ ঘরেই নিয়ে আয়!

অধীর। (ট্রাঙ্কটা হাতে করে ঢুকে) ভার তো মন্দ নয় দেখছি! কি দিয়ে ভরেছেন?

সুব্রতা। ছাই, ভস্ম, দুহাতে যা এসেছে সবই!

আভাময়ী। অধীর গিয়ে কি বললে?

অধীর। বলুন, সব ঠিক বল্‌তে পেরেছি কি না?

আভাময়ী। (বসে) তার জন্য জিজ্ঞেস করলাম না কি?

অধীর। তা হলে কিসের জন্যে? যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলে—হয়েছে; কি বলেছি কি না বলেছি জেনে লাভ? (অনিমার প্রবেশ)

অনিমা। দিদি! (সুব্রতা যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লক্ষ্য করল অনিমা) শোবার ব্যবস্থা কোথায় করবেন?

আভাময়ী। ব্যবস্থা ত করা হয়েই আছে। ও ঘরেই!

অনিমা। আপনার কাকাকে একটু ডেকে দিন ভাসুরপো তাড়াতাড়ি করে। (অনিমা চলে গেল, সুব্রতা চেয়ে রইল।)

আভাময়ী। (সহসা) পাঁচজনের কাছে শুনে (সহসা সুব্রতা সোজা চোখে চাইল আভাময়ীর পানে) কিন্তু প্রত্যক্ষ না জেনেও অনুমান করে তোমায় আনিয়েছি সুবো। যে ব্যবহার পাবে তা আজই দেখতে পেলে। ঠাকুর পোও বোধ হয় ভাল ভাবে তোমাকে দেখতে পারবে না। দেবে না। আমি কথা দিয়েছি - তোমার জন্য সংসারে কোন অশান্তি বাধবে না, আমায় যেন মিথ্যাবাদী না সাজতে হয়। (সুব্রতা আস্তে মাথা নীচু করল। নীরব স্বীকৃতি। সহজ স্বাভাবিক ও সংযত তার দেহভঙ্গী)

(পর্দা)

[প্রথম অঙ্ক শেষ

[ক্রমশঃ

আমি বসে দেখি

(ওয়াল্ট হুইটম্যান)

আমি দৃষ্টি প্রসারিত করে' দেখি পৃথিবীর দুঃখ,—দৃষ্টি
গিয়ে পড়ে সকল অত্যাচার উৎপীড়নের উপর,
আমি শুনি তরুণ ব্যথাতুর হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন—কৃতকর্ম্মের
অনুশোচনায়,
আমি দেখি পৃথিবীতে মাতার প্রতি সন্তানের কুব্যবহার—মাতা
মৃতপ্রায়, উপেক্ষিত, দুর্ব্বল, অসহায়,
আমি দেখি নারীকে স্বামীর পদদলিত—দেখি নারীর
কুপথ প্রদর্শক কৃতঘ্নকে,
আমি দেখি পৃথিবীর বুকে স্বার্থের সংঘাত, প্রেম গোপন করার
ব্যর্থ প্রচেষ্টা,
আমি লক্ষ্য করি যুদ্ধের গতি, দেখি মহামারী, যথেচ্ছাচারিতা
দেখি বন্দীদের, আর যারা নিজেদের উৎসর্গ করছে স্বদেশকে,
আমি দেখতে পাই সমুদ্রের বুকে অন্নাভাব, আর দেখি নাবিকদের,
যারা ঠিক করছে কাকে বলি দিয়ে বাঁচাবে বাকী আর ক'জন,
আমি দেখি অত্যাচার, অবিচার বর্ষিত হতে শ্রমিকদের—
গরীবদের উপর,
এই সব—নীচতা, সীমাহীন যন্ত্রণা, আমি দেখবার চেষ্টা করি
—আমি দেখি,—
দেখি, শুনি আর চুপ করে থাকি।

অনুবাদক—শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ ও মন্তব্য

নারী-প্রকৃতি

কিছুদিন আগে বিলাত হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞ ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিষয়ক অনুসন্ধান ব্যপদেশে প্রেরিত হন্। তাঁহাদের মধ্যে একজন (মিঃ উড) কিছুদিন আগে বেতার-বার্ত্তায় এক বক্তৃতায় বলেন :—পঞ্চম বৎসর হইতে সপ্তম বৎসর বয়স্ক লক্ষ লক্ষ বালক ভারতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে একজনও শিক্ষয়িত্রী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মতে ভারতের এই রীতি প্রমাদ পূর্ণ। নারীজাতির শিশুর তত্ত্বাবধানের প্রকৃতিগত অধিকার রহিয়াছে। যে ধৈর্য্য ও সহানুভূতি শিশুগণের জন্য প্রয়োজন, তাহা নারীতে বর্ত্তমান।

বিশেষজ্ঞ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, কিন্তু মাহিনা-করা লোক দিয়া মাতৃত্বের কর্ত্তব্য যেমন সাধিত হইতে পারে না, তেমনি যে-নারীকে জীবিকার জন্য খাটিতে হয়, সে-নারী তাহার অজ্ঞাতসারেই নারীত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ভারতীয় রীতি প্রমাদপূর্ণ কি আধুনিক রীতি প্রমাদ-পূর্ণ, তাহা বিচার্য্য। আধুনিক রীতিতে নারীকে জীবিকার্জ্জনে বাধ্য করিয়াছে। ভারতীয় রীতি জানে, ইহা নারীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির কথা তুলিলে দেখা যাইবে, ভারতীয় সমস্ত রীতিই প্রকৃতির সাপেক্ষ—কেবল আধুনিক রীতির মেশালে ভারতবর্ষে আজ একটা জগাখিচুড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জগাখিচুড়ীকে ভারতীয় রীতি বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে।

সমাজের নিম্নস্তর

"সমাজের নিম্নস্তরে কংগ্রেসের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দেশের শতকরা মাত্র দশজন ভোটাধিকার পাইয়াছে। নির্ব্বাচনে ইহারা কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়াছে। বাকী শতকরা ৯০ জন দেশবাসী কংগ্রেসের প্রতি অধিক অনুরক্ত"—গত ৫ই চৈত্র শুক্রবার জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ-প্রসঙ্গে জওহরলালজী এই কথা বলিয়াছেন।

অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ভারতবাসীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত আর কাহারও উপর বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রভাব আছে; ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সমাজের নিম্নস্তর সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিলে জওহরলালজী এ কথা বলিতে পারিতেন না। সমাজের নিম্নস্তরের সকলেই আজিও জানে এটা 'কোম্পানীর আমল'ই চলিতেছে ইতিমধ্যে 'কংগ্রেসের আমলে'র কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

বৈজ্ঞানিকের দান

১৩ই মার্চ্চ 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর সভায় স্যার জন রাসেল একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :—দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন শিল্পীর দান অতি সামান্য, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য মূল্যবান কাজ করিতে পারেন।

তাহা হইলে কি এ যুগে সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ?

সাহিত্যের সংজ্ঞা

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবের সভাপতি শ্রীক্ষিতি-মোহন সেন বলিয়াছেন :—যেথানে নানা উপকরণের মিলন হইয়াছে, তাহাই সাহিত্য। যথার্থ সাহিত্য সকল সহৃদয় জনের হৃদয়ে আনন্দরূপে একটি অপূর্ব্ব যোগরস দেয়।

সেন মহাশয় কি তবে বলিতে চাহেন চণ্ডু ও তাড়ির আড্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া রেস, চোরাই-মালের বাজার সমস্তই সাহিত্য ! এখানেও তো 'উপকরণ' আছে, 'সহৃদয় জন' আছে এবং 'আনন্দ'ও আছে।

ভারতবর্ষের জমি

২০শে মার্চ্চ বাঁকুড়া জেলা কৃষক সম্মেলনের কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি কম। ইহার একটি পরোক্ষ কারণ তৈলবীজ রপ্তানি। ইহার ফলে আমরা তৈল উৎপাদনের লাভ, গরুর খাদ্য ও জমির সার একসঙ্গে হারাই।

পরোক্ষ কারণটা নির্দ্দেশ না করিয়া প্রত্যক্ষ কারণটার উল্লেখ করিলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইতেন।

বৃটেনের খাদ্য সমস্যা

কিছুদিন আগে কমন্স সভায় মিঃ লয়েড জর্জ্জ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বৃটেন খাদ্যোৎপাদনের কার্য্য শোচনীয়ভাবে অবহেলা করিতেছে। লক্ষ লক্ষ একর জমিতে কৃষিকার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনের লোকসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ কৃষিকার্য্য করিত, বর্ত্তমানে শতকরা মাত্র ৪'৬ ভাগ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেন ? ইংলণ্ডও কি তৈলবীজ রপ্তানি করিতেছে ? সেখানকার জমিতে উৎপাদিকা শক্তি কমে কেন ?

কৃষি ব্যবসায়ের অবনতি

পার্লামেন্টে বৃটেনের অর্থ-সচিব নেভিল চেম্বারলেন বলতেছেন : অধিকসংখ্যক লোককে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইতে হইবে। কেন না, বর্ত্তমানে অনেক কৃষিব্যবসায়ী তাঁহাদের জমি হইতে কোন প্রকার লাভ করিতেছে না।

পরাধীন ভারত ও স্বাধীন ইংলণ্ড দুয়েরই সমস্যা এক! সোভিয়েট রুশিয়া এবং রিপাব্লিকান আমেরিকা সর্ব্বত্রই এই একটি সমস্যা! এই একটি সমস্যার সমাধান-পন্থা একটিই আছে। সে পন্থা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও আজও পর্য্যন্ত জানে না। সে উপায়টি কি?

উচ্চশিক্ষা

লক্ষ্ণৌয়ের এক ছাত্রসম্মেলনের অধিবেশনে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর পারঞ্জপে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :— কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়া উচিত। ইহা উচ্চশিক্ষার অনুকূল নহে।

নিশ্চয়ই নহে! পরনির্ভরশীলতাই তো বর্ত্তমানে উচ্চ-শিক্ষার একমাত্র পরিচয়!

অর্থনৈতিক নীতি

গত ৭ই এপ্রিল বুধবার দিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ ডি. পি. খৈতান বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—ভারতবর্ষে আমরা এমন অনেক পুরাতন অর্থনৈতিক নীতিকে সংস্কারের মত অন্ধভাবে অনুকরণ করি, যে সকল নীতি যে-দেশে এই সকল নীতির উদ্ভব, সেই দেশেই বহুকাল হয় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজ আবার যে সব নীতি এই সব নিত্য নূতন নীতি-উদ্ভবকারী দেশসমূহে গৃহীত হইয়াছে সেগুলি আগামী কল্য তাহারা পরিত্যাগ করিবে। খৈতান মহাশয়ের যুক্তি অনুমান করিয়া সেগুলি যদি ভারতবর্ষ আজ গ্রহণ করে তাহা হইলে আগামী কল্যও বিপদ সমান।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন রায়

আমরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বাংলার কৃতী সন্তান, হাইকোর্টের প্রবীনতম এড্‌ভোকেট্ স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন রায়ের বিয়োগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গদেশ আজ একটি সুগভীর অভাব অনুভব করিতেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু খ্যাতির লিপ্সা তাঁহাকে কখনও প্রলুব্ধ করে নাই। লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়াই তিনি কর্ত্তব্যপালন করিতে ভালবাসিতেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার চন্দনপুর গ্রামে জমিদার-বংশে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই পড়াশুনার দিকে ইঁহার অসাধারণ আগ্রহ লক্ষিত হয়। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর রায় কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের একজন প্রতিষ্ঠাবান উকীল ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি লেখা-পড়া করেন। অধ্যয়নে অনুরাগ এবং বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে অল্পদিনেই তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিগণিত হন এবং শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এম, এ, এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের অধীনে 'আর্টিক্‌লড্ ক্লার্ক' রূপে কাজ করিতে থাকেন। অতঃপর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে এড্‌ভোকেট রূপে প্রবেশ করিয়া স্বর্গীয় মোহিনীমোহন রায়ের সহকারীরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। অমায়িক ব্যবহার গুণে অচিরেই তিনি সহকর্ম্মিগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন।

ওকালতিতে হিন্দু আইনের বিশেষজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেও তাহারই চর্চ্চায় তিনি সকল সময় অতিবাহিত করিতেন না। অবসর সময়ে ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিষয়ের চর্চ্চায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিবিধ শাস্ত্রাদি তিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে তিনি নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণের আচার পালন করিতেন। মনীষা ও মহানুভবতার অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার মধ্যে সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার সারল্যে, চরিত্রের মাধুর্য্যে ও পবিত্রতায় সকলেই মুগ্ধ হইত। নানা সৎকার্য্যে তিনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে দানের কথা তিনি সাধারণ্যে অনেক সময়েই প্রকাশ করেন নাই। দীন দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অনেকের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৮৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সহসা পড়িয়া যাইয়া তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন এবং শয্যাগত হইয়া পড়েন। প্রায় এক বৎসর শয্যাগত থাকিয়া গত ২৮শে মার্চ্চ, রবিবার ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ



সারদাপ্রসন্ন রায়

করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় এম. এ. এবং শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসন্ন রায় বি. এস, সি, এবং বহু দৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রাদি বর্ত্তমান। তাঁহাদের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

মাসিক বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

পাঠক ও গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক মফঃস্বলে ৬৲ কলিকাতায় ৫॥০ টাকা। ষাণ্মাসিক মফঃস্বলে ৩।০, কলিকাতায় ৩৲ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, c/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, এণ্ট্যালী, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

মাঘ হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া চলে। কিন্তু প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

গ্রাহকের বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে জমা-চাঁদা নিঃশেষ হইলেই পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হয়। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনি-অর্ডার কুপনে অথবা আদেশপত্রে 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহকসংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। না লিখিলে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ কথা মনে রাখিবেন।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২০৲, ১১৲, ৬৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, এণ্ট্যালী, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

১। সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রী প্রতি বুধবার প্রকাশিত হয় এবং মফঃস্বলের কাগজ পর দিন ডাকে পাঠান হয়।

২। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ টাকা এবং ছয় মাসের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷০ টাকা মাত্র। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। প্রতিখণ্ড বঙ্গশ্রীর নগদ মূল্য ৴০ আনা মাত্র।

৩। ভিঃ পিঃ-তে লইলে যতদিন পর্য্যন্ত ভিঃ পিঃর টাকা আসিয়া না পৌছায় ততদিন পর্য্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্ত, ভিঃ পিঃ খরচ গ্রাহককে দিতে হয়। সুতরাং মূল্য মনি-অর্ডারযোগে পাঠানই গ্রাহকগণের পক্ষে সুবিধাজনক।

৪। যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে কাগজ পাঠান হইবে।

৫। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা কাগজ পাইতে বিলম্ব হইতে পারে। চিঠি-পত্র লিখিবার সময় সর্ব্বদাই গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন।

৬। টাকা-পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনি-অর্ডার কুপনে প্রেরকের নাম-ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া "সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রীর জন্য" ইহা যেন লিখা থাকে।

সংবাদাদি সম্বন্ধে নিয়ম

মফঃস্বলের সংবাদাদি অতি যত্নসহকারে প্রকাশ করা হয়, তবে যতদূর সম্ভব অল্প কথায় কাগজের এক পৃষ্ঠায়, কালীতে স্পষ্ট করিয়া প্রেরকের নাম ও ঠিকানা-সহ লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

কার্য্যালয়: ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, ইণ্টালি, কলিকাতা।



সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

ধান্যশ্রী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৮৪

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কলিকাতার বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলন

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাবৃত্তি

গত ১লা মার্চ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক দিবস ধরিয়া কলিকাতায় যে বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, ঐ সম্মেলনের উল্লেখ-যোগ্য কার্য্যাবলী প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয়, তাহার বিচারের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে।

কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের কার্য্যাবলী নিন্দনীয় অথবা প্রশংসনীয়, তাহার বিচার করিতে হইলে, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্মেলনের অবশ্যবিধি ও নিষেধ (essential necessities and prohibitions) কি হওয়া উচিত,তাহার সন্ধান করিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্মেলনের অবশ্যবিধি ও নিষেধ যে কি হওয়া উচিত, তাহার সন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ ধর্ম্ম কাহাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে, তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি এবং চতুর্থতঃ ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

একবার যদি জানিতে পারা যায় যে, সংসারে ডাল-ভাত, অথবা কেবলমাত্র শুক্‌না রুটি খাইয়া স্বাস্থ্য-সুখের সহিত মনের শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যেমন ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে কি করিয়া ধনো-পার্জ্জন করিতে হয়, কি করিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হয়, কি করিয়া সর্ব্বাবস্থায় মনের শান্তি অটুট রাখা যায় ইত্যাদি তথ্য আমূল ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ স্বভাবতঃই ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া থাকে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া, "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে, "ধর্ম্ম-জ্ঞান" কাহাকে বলে, "ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি" ইত্যাদি তথ্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এবং ঐ ঐ তথ্য অবগত হইতে পারিলে, ধর্ম্ম সম্মেলনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, উহার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিলে ঐ প্রয়োজনীয়তা কি কি, এবং সম্মেলনের বিধি ও নিষেধই বা কি কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যে সহজ-সাধ্য, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ঐ উদ্দেশ্যে আমরা চৈত্র সংখ্যায় 'ধর্ম্মে'র সংজ্ঞা কি, তাহাই প্রথমে আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্মের সংজ্ঞা কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, "শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার উপায় কি" এবং "সংস্কৃত ও লৌকিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য কোথায়", তাহার আলোচনা করিতে হইয়াছে।

"ধর্ম্মের-সংজ্ঞা কি", তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায়

"ধর্ম্ম-জ্ঞান" লাভ করিবার উপায় কি, তাহা জানিতে হইলে যে, প্রথমতঃ "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ "ধর্ম্ম-জ্ঞান" কাহাকে বলে, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে একাধিকবার বুঝাইয়াছি।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে,তাহার আলোচনায় আমরা এতাবৎ যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যমাত্রেই জীবন ধারণ করিবার জন্য কতকগুলি কার্য্য করিয়া থাকে। ঐ কার্য্যগুলিকে বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় physiological functions অথবা শরীরবিধানের কার্য্য বলা হইয়া থাকে। মলমূত্র ত্যাগ করা, খাদ্য গ্রহণ করা, খাদ্য পরিপাক করা, শ্বাস গ্রহণ করা, কথা বলা, কথা শোনা, রূপ দেখা, রূপবান হওয়া ইত্যাদি যে যে কার্য্য মানুষ করিয়া থাকে, উহার প্রত্যেকটি তাহার শরীরবিধানের কার্য্য। শরীরবিধানের কার্য্য কি কি, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের মধ্যে Physiology নামক যে গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে, উহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং অবিশ্বাসযোগ্য। কোন একটি মানুষ তাহার শরীরের বিধান সম্পূর্ণ করিবার জন্য, অথবা ঐ বিধানের অস্তিত্ববশতঃ যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, প্রত্যেক মানুষই উহার প্রত্যেক কার্য্যটি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন দুইটি মানুষের উহার কোন কার্য্যটি করিবার প্রকার (manner), অথবা উহার মাত্রা (degree or magnitude) সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। উদাহরণ স্বরূপ খাদ্যগ্রহণের কার্য্যটি ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মানুষই খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কেহ ভাত, কেহ বা রুটী, কেহ বা মাংস, কেহ বা ফলমূল ইত্যাদি খাইয়া থাকেন, কাহারও খাওয়া পাঁচ মিনিটে, আবার কাহারও খাওয়া এক ঘণ্টায়, কেহ বা দুই সের পরিমাণ খাইয়া থাকেন, আবার কেহ বা একপোয়া খাইয়াই দিনাতিপাত করেন।

মানুষের উপরোক্ত সমতার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, ঐ বৈশিষ্ট্যও আবার দুই রকমের। কখন কখন স্ব স্ব খেয়াল ও সংস্কারবশতঃ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, আবার কখন কখন কার্য্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানবশতঃ বৈশিষ্ট্য অবলম্বিত হয়।

সুতরাং জগতের হরেক-রকম মানুষ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য করে, তৎসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ঐ কার্য্যগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শরীরবিধানের যে যে কার্য্য মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়, সেই সেই কার্য্য এবং যে যে কার্য্য স্ব স্ব খেয়াল ও সংস্কারবশতঃ মানুষ করিয়া থাকে, সেই সেই কার্য্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত। আর যে যে কার্য্য সাধনালব্ধ-জ্ঞান, অর্থাৎ কেন শরীরের মধ্যে বিবিধ বিধানের উৎপত্তি হয় এবং শরীরের কোন্ বিধানবশতঃ কোন্ অঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহা যে-জ্ঞানের দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, সেই জ্ঞানবশতঃ মানুষ যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই সেই কার্য্য অপর শ্রেণীর অন্তর্গত।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় 'ধরম্' বলা হইয়া থাকে। ধরম্-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ও আমূল আলোচনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে জৈমিনীসূত্রে, অথবা পূর্ব্বমীমাংসা নামক মীমাংসায়।

আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যকে 'ধর্ম্ম' বলা হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত ও আমূল আলোচনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কণাদসূত্রে অথবা বৈশেষিক দর্শন নামক দর্শনে। জৈমিনী-

*জৈমিনীসূত্র এবং কণাদসূত্র বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণের মধ্যে যে অর্থে প্রচলিত রহিয়াছে, সেই অর্থে ঐ দুইখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না। ভাষ্যকারগণের প্রচলিত কোন ব্যাখ্যা যে বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ীসূত্র-পাঠসম্মত নহে এবং যে ব্যাখ্যা অষ্টাধ্যায়ীসূত্র-পাঠসম্মত নহে, সেই ব্যাখ্যা যে গ্রন্থপ্রণেতা ঋষির মর্ম্মোদ্ঘাটক হইতে পারে না, তাহা আমরা একাধিকবার যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি। মীমাংসায় ও দর্শনে ঋষিগণ কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাদের ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। ঐ ভাষা বুঝিতে হইলে স্ফোট-বিদ্যা জানিবার প্রয়োজন হয়। স্ফোট বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া জৈমিনীসূত্র ও কণাদসূত্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

সূত্র এবং কণাদসূত্রের কথা বাদ দিয়া সাধারণ পাঠকগণ যদি তাঁহাদের সাধারণ বুদ্ধির (common sense) দ্বারা ধরম্ ও ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তৎসম্বন্ধে ধারণা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, দেখিতে পাইবেন যে, মানুষ তাহার শরীরবিধানের কার্য্য,স্ব স্ব খেয়াল এবং সংস্কারবশতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকে (what a man does), তাহাই তাহার ধরম্। আর কি করিলে মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সম্পূর্ণ ভাবে দূর হইয়া অবিমিশ্র সুখ সম্ভোগ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা উহা পরিজ্ঞাত হইয়া, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কি তাহার সন্ধান করিবার জন্য (to find out what a man should do), অথবা তাহার সন্ধান পাইবার পর কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া মানুষ যাহা যাহা করে, তাহার নাম মানুষের ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের এই সংজ্ঞাটি আরও তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে কোন্ কার্য্যটি কর্ত্তব্য, আর কোন্ কার্য্যটি অকর্ত্তব্য, কোন্‌টি ভ্রমহীন (right), আর কোন্‌টি ভ্রমপূর্ণ (wrong), তাহা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়।

আমাদের মনে হয়, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, এতাদৃশ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানা সম্ভবযোগ্য হয় বলিয়া একদিন সারা জগতের সকল মানুষ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইত। কিন্তু এখন আর কেহ ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন না এবং উহা বুঝিতে পারেন না বলিয়াই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষ প্রায়শঃ উদাসীন থাকিয়া যান।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যে-কার্য্যের দ্বারা কোন্ কার্য্যটি কর্ত্তব্য, আর কোন্ কার্য্যটি অকর্ত্তব্য, কোন্‌টি ভ্রমহীন, আর কোন্‌টি ভ্রমপূর্ণ, ইহা বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম "ধর্ম্ম"-কার্য্য—এতাদৃশ ধর্ম্মের সংজ্ঞা যতদিন মানবসমাজে বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধর্ম্মের কথার উদ্ভব হইতে পারে না। পরন্তু সকল মানুষের একই ধর্ম্ম ইহা বুঝিতে হয়।

কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব হইবার আগে সারা জগতে এমন একদিন ছিল, যখন সর্ব্বত্র মানুষ একই রকম ধর্ম্মের উপাসনা করিত। তখন খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের,অথবা তৎসংলগ্ন কোন সম্প্রদায়েরই উদ্ভব হয় নাই।

যে জগতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজে একদিন মানুষ একই রকম ধর্ম্মের উপাসনা করিত, সেই জগতে সেই মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মের এত বিভিন্নতার উদ্ভব হইল কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইবে যে, উহার কারণও "ধর্ম্ম" ও "ধর্ম্মজ্ঞানে"র যথাযথ সংজ্ঞা সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা।

বিভিন্ন ধর্ম্মের এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-যাজক ও সন্ন্যাসিগণের সহিত "ধর্ম্ম" ও "ধর্ম্মজ্ঞানে"র সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমাদের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যাহাকেই ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না কেন, দেখা যাইবে যে, প্রায় সকলেই প্রথমতঃ প্রকারান্তরে ঐ কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহাদের ঐ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কেহ তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসু থাকিয়া যান, তাহা হইলে সম্প্রদায়গত এক একটি সংজ্ঞার কথা শুনা যাইবে বটে, কিন্তু ঐ সংজ্ঞার ভিত্তি যে কোথায়, তৎসম্বন্ধে কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইবে না।

মানুষ তাহার শরীরবিধানের কার্য্য, স্ব স্ব খেয়াল এবং সংস্কারবশতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকে (অর্থাৎ what a man does তাহার নাম "ধরম"—আর কর্ত্তব্য কি, অথবা কি করিলে দুঃখের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, মানুষ যাহা যাহা করে (অর্থাৎ what a man should do, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অথবা তাহা অবগত হইয়া, মানুষ যাহা যাহা করে), সেই সেই কার্য্যের নাম তাহার "ধর্ম্ম"। "ধরম" ও "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এই দুইটি সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, "ধর্ম্মজ্ঞান" কাহাকে বলে, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে যে মানুষের বিভিন্ন 'ধরমে'র উদ্ভব হয় কেন, অর্থাৎ মানুষ কখনও বা সাধু, আর কখনও বা চোর, কখনও বা অল্পবুদ্ধি, কখনও বা প্রতিভা-বান্, কখনও বা স্থির, ধীর, আবার কখনও বা অস্থির ও

অধীর ইত্যাদি হয় কেন, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মানুষের বিভিন্ন "ধরমে"র উদ্ভব হয় কেন, তাহা সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে মানুষের শরীরের গঠন ও শরীরের বিধান সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাও সহজেই বুঝা যাইতে পারে। মানুষের শরীরের গঠন (anatomy) ও শরীরের বিধান (physiology) সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, যে অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়বশতঃ মানুষের প্রত্যেক অবয়বের প্রত্যেক অংশটি প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন ভাবে গঠিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, সেই অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয় অথবা সংস্পর্শ যে শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্র বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়।

এই জন্যই আমরা চৈত্র-সংখ্যায় বলিয়াছি যে, "মানুষের প্রত্যেক অবয়ব যে অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত, তাহা অনুভব করিতে পারিলে, মানুষের ধর্ম্মকার্য্য যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া সহজসাধ্য হইয়া থাকে।"

এইরূপ ভাবে ধরম্, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মকার্য্যের সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যেক অবয়ব অসংখ্য পরমাণুর যে-সমন্বয় অথবা সংস্পর্শবশতঃ গঠিত হইয়াছে, সেই সমন্বয় অথবা সংস্পর্শ কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয় এবং যে যে উপায়ে উহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করা যায়, সেই সেই উপায়ের নাম "ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায়।"

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইলে মানুষকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূক্ষ্মতা ও কাঠিন্যের তারতম্যে মনুষ্যাবয়বে অসংখ্য রকমের স্পর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ অসংখ্য রকম স্পর্শকে প্রধানতঃ বায়বীয় স্পর্শ (gaseous), তরল স্পর্শ (liquid) এবং কঠিন স্পর্শ (solid) নামক স্পর্শের ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের শরীরাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্পর্শকে যেরূপ মূলতঃ বায়বীয়, তরল এবং কঠিন নামক ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সেইরূপ মানুষের আভ্যন্তরীণ অসংখ্য রূপ, অসংখ্য রস এবং অসংখ্য গন্ধকেও মূলতঃ ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

অসংখ্য পরমাণুর যে সমন্বয় ও সংস্পর্শে মানব-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ গঠিত, সেই সমন্বয় অথবা সংস্পর্শ কি উপায়ে কার্য্যতঃ উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ আবার প্রাচীন হিব্রু ভাষায় বাইবেলে ও প্রাচীন আরবী ভাষায় কোরাণেও লিখিত রহিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, পরমাণুর ঐ সমন্বয় অথবা সংস্পর্শ কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানবশরীরের প্রধান প্রধান সন্ধি (interlink) কোথায় এবং তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার মানবদেহাভ্যন্তরের যে শরীরবিধানে বিবিধ কার্য্য (physiological operations) বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি কোন্ কোন্ অঙ্গের সন্ধিবশতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহার কার্য্যকারিতাই বা কি, তাহাও উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে উপায়ে মানবশরীরের প্রধান প্রধান সন্ধি কোথায়, তাহা উপলব্ধি করা যায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম "বৈদিক সন্ধ্যা" এবং ঐ সন্ধিসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ-সূত্র কোথায়, তাহা যে উপায়ে উপলব্ধি করা যায়, তাহার নাম "গায়ত্রী জপ"।

"বৈদিক সন্ধ্যা" ও "গায়ত্রী"সাহায্যে যে মানবশরীরের প্রধান প্রধান সন্ধি ও তাহাদের সম্বন্ধসূত্র কোথায়, তাহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, ইহা প্রয়োজন হইলে যাঁহারা স্ব স্ব অভিমানকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত করিতে পারিয়াছেন ও সর্ব্বদাই উহা সংযত করিবার প্রয়াসী এবং যাঁহাদের জিহ্বা অত্যধিক পরিমাণে অপেয়পানের দ্বারা, অথবা অভক্ষ্যভক্ষণের দ্বারা প্রাকৃতিক তাপ ও রসহীন হয় নাই, তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত আছি।

মানবশরীরের প্রধান প্রধান সন্ধি কোথায়, কয়টি এবং তাহাদের কার্য্যকারিতাই বা কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে

পারিলে জানা যাইবে যে, মানবশরীরের প্রধান সন্ধি তিনটি এবং ঐ তিনটি প্রধান সন্ধির কার্য্যও তিনটি। সর্ব্ব-প্রধান সন্ধিটির বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষ তাহার দেহাভ্যন্তরে বায়ু গ্রহণ করিয়া উহা বিশুদ্ধ করিতে পারিতেছে এবং ঐ বিশুদ্ধ বায়ু সমস্ত শরীরে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইতেছে। দ্বিতীয় সন্ধিটির বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষ তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে রস (অম্বু) ও তেজ (বহ্নি) রূপে পরিণত করিয়া ঐ রস ও তেজকে সারা শরীরে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইতেছে। তৃতীয় সন্ধিটির বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষ তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ রস ও তেজকে ক্রমশঃ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মরূপে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেছে।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম সন্ধিটির বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষের পক্ষে বিশুদ্ধ শ্বাস গ্রহণ করা ও শরীরস্থ বিকৃত বায়ু নিশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব হইতেছে, দ্বিতীয় সন্ধিটির বিদ্যমানতাবশতঃ অহরহ শরীরাভ্যন্তরে বায়ু হইতে রস ও তেজের উদ্ভব করা এবং শরীরস্থ রস ও তেজের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পুনরায় তাহাকে বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলা সম্ভব হইতেছে। তৃতীয় সন্ধিটির বিদ্যমানতাবশতঃ অহরহ শরীরাভ্যন্তরে রস ও তেজ হইতে মেদ ও অস্থি প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে এবং শরীরস্থ মেদ ও অস্থি প্রভৃতির রস ও তেজের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা সম্ভব হইতেছে।

একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, মানবশরীর অসংখ্য পরমাণুর যে সমন্বয়ে অথবা সংস্পর্শে পরিচালিত, সেই সমন্বয় অথবা সংযোগ কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে মানবশরীরের উদ্ভব কিরূপভাবে হইতেছে, তাহা অনুভব করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আবার, মানবশরীরের উদ্ভব কিরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে একদিকে যেরূপ উপরোক্ত তিনটি সন্ধির কোন্‌টি কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার ঐ তিনটি সন্ধির পরস্পরের মধ্যে সংস্রব কিরূপভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহাও উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত প্রথম সন্ধিটির নাম ললাট, দ্বিতীয় সন্ধিটির নাম হৃদয়, তৃতীয় সন্ধিটির নাম নাভি। ঐ তিনটি সন্ধি শরীরাভ্যন্তরে কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যই বা কিরূপভাবে সাধিত হইতেছে,তাহা বৈদিক সন্ধ্যার "প্রাণায়াম" ও "আচমন" যথাযথভাবে সম্পাদিত করিতে পারিলে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

প্রাণায়াম ও আচমন যথাযথভাবে সম্পাদিত করিতে পারিলে যে, শরীরাভ্যন্তরস্থ তিনটি সন্ধির কোন্‌টি কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য কিরূপভাবে সম্পাদিত হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে শব্দের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশ কিরূপভাবে স্পর্শ করা যাইতে পারে, তাহা অনুভব করার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

শব্দের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপভাবে স্পর্শ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বৈদিক সন্ধ্যার 'মার্জ্জন' ও 'পুনর্ম্মার্জ্জন' নামক অংশে।

এইরূপ ভাবে মার্জ্জন, প্রাণায়াম, আচমন ও পুনর্ম্মার্জ্জন —এই চারিটি প্রক্রিয়ার দ্বারা মানবশরীরের প্রধান তিনটি সন্ধির কোন্ সন্ধিটি কোথায় বিদ্যমান আছে, তাহা বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপে একক ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ উপলব্ধি কি করিয়া স্থায়ী করা সম্ভব এবং ঐ তিনটি সন্ধির উপলব্ধি যুগপৎভাবে কিরূপে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

ঐ তিনটি সন্ধির উপলব্ধি যুগপৎ ও স্থায়িভাবে করিতে হইলে "অঘমর্ষণ","সূর্য্যোপস্থান"হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক সন্ধ্যার "গায়ত্রীধ্যান", "গায়ত্রীজপ" ও "গায়ত্রীবিসর্জ্জন" পর্য্যন্ত প্রক্রিয়াসমূহের সহায়তা লইতে হয়।

তিনটি সন্ধির উপলব্ধি যুগপৎ ও স্থায়িভাবে করিতে পারিলে ঐ তিনটি সন্ধির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঐ তিনটি সন্ধির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষের কোন্ প্রক্রিয়াকে 'বুদ্ধি' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহা অনুভব করা সম্ভব-

যোগ্য হয়। ইহারই জন্য বলা হইয়া থাকে যে, "গায়ত্রী" যথাযথ ভাবে জপ করিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হয়।

বৈদিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারা মানবশরীরের প্রধান তিনটি সন্ধি কোথায় কোথায় বিদ্যমান আছে এবং ঐ তিনটি সন্ধির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি কি, তাহা এতাদৃশ ভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং ঐ উপলব্ধি দ্বারা মানবশরীর অসংখ্য পরমাণুর যে সমন্বয় অথবা সংস্পর্শে গঠিত, সেই সমন্বয় অথবা সংস্পর্শ ক্রমশঃ অনুভব করা যায় বলিয়াই বৈদিক সন্ধ্যাকে কর্ম্মতঃ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার প্রথম ও প্রধান সোপান বলা হইয়া থাকে।

মানবশরীরের প্রধান প্রধান তিনটি সন্ধি কোথায় কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ঐ তিনটি সন্ধির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি কি,তাহা বৈদিক সন্ধ্যার ও গায়ত্রীর প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু ঐ তিনটি সন্ধির প্রত্যেকের কার্য্য যে কি কি এবং ঐ প্রত্যেক সন্ধিটির মধ্যে যে সমস্ত শাখা-সন্ধি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বৈদিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্যক্ ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

ঐ তিনটি সন্ধির প্রত্যেকটির কার্য্য যে কি কি, তাহা জ্ঞানতঃ (theoretically) অবগত হইবার নাম এক একটি দেব অথবা দেবতার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া।

প্রধান প্রধান তিনটি সন্ধির প্রত্যেকটির মধ্যে যে সমস্ত সন্ধি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কর্ম্মতঃ (practically) পরিজ্ঞাত না হইয়া জ্ঞানতঃ (theoretically) পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। প্রত্যেক সন্ধির মধ্যে যে সমস্ত সন্ধি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কোথায় কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিবার নাম—ঐ সন্ধিস্থ দেবতার সন্ধ্যা করা।

মানবশরীরের প্রত্যেক প্রধান সন্ধির মধ্যে যে সমস্ত শাখা-সন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই শাখা-সন্ধিসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া প্রধান সন্ধির কার্য্য (functions) নিষ্পন্ন করিতেছে। প্রত্যেক প্রধান সন্ধির মধ্যে যে সমস্ত শাখা-সন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই শাখা-সন্ধিসমূহের পরস্পরের যে মিলনবশতঃ প্রধান সন্ধির কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, পরস্পরের সেই মিলনকে কর্ম্মতঃ অবগত হওয়ার নাম ঐ সন্ধিস্থ মূল দেবতার "গায়ত্রী" জপ করা।

প্রত্যেক প্রধান সন্ধির কার্য্য যে কি কি, তাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিবার নাম ঐ সন্ধিস্থ দেব অথবা দেবতার পূজা করা।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, মানবশরীরের ললাটের বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষ নিজ শরীরাভ্যন্তরে শ্বাসরূপ বায়ু গ্রহণ করিতে ও উহাকে পরিশুদ্ধ করিতে এবং শরীরস্থ বিকৃত বায়ুকে নিঃশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং এই ললাটকে মানুষের প্রথম সন্ধি বলা হইয়া থাকে।

কি উপায়ে ললাটের সহায়তায় মানবশরীরের প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশলাভ করিতে পারিতেছে, কিরূপ ভাবে মানুষ দেহাভ্যন্তরে ঐ বায়ুর বিশুদ্ধি নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেছে এবং কিরূপভাবে মানুষ তাহার দেহস্থ বিকৃত বায়ুকে নিঃশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছে, তাহা কর্ম্মতঃ (practically) উপলব্ধি করিবার নাম "শিব পূজা" করা।

ললাটের মধ্যে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ শাখা-সন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিবার নাম "শিবের সন্ধ্যা" করা। আর ঐ শাখা-সন্ধিসমূহের পরস্পর যে মিলনবশতঃ ললাট-সন্ধির কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সেই মিলন কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিবার নাম "শিবের গায়ত্রী" জপ করা।

মানবশরীরে হৃদয়ের বিদ্যমানতাবশতঃ যে, মানুষ তাহার শরীরস্থ বায়ুকে রস ও তেজরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হয়, তাহাও আগেই বলা হইয়াছে।

মানবশরীরে হৃদয় কোথায় বিদ্যমান আছে এবং ঐ হৃদয়ের সহিত ললাট ও নাভির সন্ধি-সূত্রে কোথায়, তাহা বৈদিক সন্ধ্যা ও বৈদিক গায়ত্রীর সহায়তায় কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করা যায় বটে, কিন্তু হৃদয়ে যে কিরূপভাবে শরীরস্থ বায়ু হইতে রস ও তেজের উদ্ভব সাধন হইতেছে, তাহা বৈদিক সন্ধ্যা অথবা বৈদিক গায়ত্রী অথবা শিবপূজা প্রভৃতির দ্বারা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করা যায় না। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা, কি উপায়ে শরীরাভ্যন্তরে হৃদয়ের সাহায্যে বায়ু হইতে রস ও

তেজের উদ্ভব হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয়, সেই প্রক্রিয়াসমূহের নাম "বিষ্ণু পূজা"।

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে, হৃদয়স্থ শাখা-সন্ধিসমূহ কোথায় কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই প্রক্রিয়া কর্ম্মতঃ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম "বিষ্ণু সন্ধ্যা"।

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে, হৃদয়স্থ শাখা-সন্ধিসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ কর্ম্মতঃ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার —"বিষ্ণু-গায়ত্রী"।

মানবশরীরে ললাটের বিদ্যমানতাবশতঃ যে বায়ু-গ্রহণ, বায়ুর বিশুদ্ধি ও অবিশুদ্ধ বায়ুর বিসর্জ্জন করা সম্ভব হইতেছে, আবার হৃদয়ের বিদ্যমানতাবশতঃ যে বায়ু হইতে রস ও তেজের উদ্ভব সাধন করা, উহার বিশুদ্ধি সম্পাদন করা এবং অবিশুদ্ধ রস ও তেজের বিসর্জ্জন করা সম্ভব হইতেছে, তাহা যেরূপ আগেই বলা হইয়াছে, সেইরূপ নাভির বিদ্যমানতাবশতঃ যে শরীরস্থ রস ও তেজ হইতে ক্রমশঃ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উদ্ভব হওয়া, তাহাদের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা এবং অবিশুদ্ধাংশের বিসর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে, তাহাও আগেই বলা হইয়াছে।

বৈদিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর সাহায্যে নাভিটি কোথায় এবং নাভির সহিত ললাট ও হৃদয়ের সন্ধিসূত্র কোথায়, তাহা শরীরাভ্যন্তরে কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করা যায় বটে, কিন্তু ঐ বৈদিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর সাহায্যে একদিকে যেরূপ নাভির মধ্যে যে সমস্ত শাখা-সন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই শাখা-সন্ধিসমূহের অস্তিত্ব এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায় না, সেইরূপ আবার নাভির বিদ্যমানতাবশতঃ যে কিরূপ ভাবে শরীরস্থ রস ও তেজ হইতে ক্রমশঃ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উৎপত্তি, পরিশুদ্ধি, অবিশুদ্ধাংশের বিসর্জ্জন সাধিত হইতেছে, তাহাও কার্য্যতঃ উপলব্ধি করা যায় না

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কিরূপ ভাবে নাভির সহায়তায় শরীরস্থ রস ও তেজ হইতে ক্রমশঃ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উৎপত্তি, পরিশুদ্ধি, অবিশুদ্ধাংশের বিসর্জ্জন সাধিত হইতেছে, তাহা কর্ম্মতঃ (practically) উপলব্ধি করা যায়, সেই প্রক্রিয়ার নাম "ব্রহ্মার পূজা"।

নাভির মধ্যে যে সমস্ত শাখা-সন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব কোথায়, তাহা যে-প্রক্রিয়ার দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেই প্রক্রিয়ার নাম "ব্রাহ্ম-সন্ধ্যা"। ঐ শাখা-সন্ধিসমূহের পরস্পরের সন্ধিসূত্র কোথায়, তাহা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম "ব্রাহ্ম-গায়ত্রী"।

বৈদিক সন্ধ্যা ও বৈদিক গায়ত্রীর সাহায্যে মানুষের শরীরের প্রধান প্রধান সন্ধি-স্থল কোথায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-সূত্রই বা কোথায়, তাহা কর্ম্মতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিলে শিব-সন্ধ্যা, শিব-গায়ত্রী ও শিবপূজার সাহায্যে মানুষ তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে কিরূপে বায়ুগ্রহণ, বায়ুর বিশুদ্ধি-সাধন ও অবিশুদ্ধ বায়ুর বিসর্জ্জন সাধন করিতেছে, বিষ্ণু-সন্ধ্যা, বিষ্ণু-গায়ত্রী ও বিষ্ণু-পূজার সাহায্যে মানুষ তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে কিরূপে বায়ু হইতে রস ও তেজের উৎপত্তিসাধন, রস ও তেজের বিশুদ্ধি-সাধন ও মূত্র এবং স্বেদরূপে অবিশুদ্ধ রস ও তেজের বিসর্জ্জন সাধন করিতেছে, ব্রাহ্ম-সন্ধ্যা, ব্রাহ্ম-গায়ত্রী ও ব্রহ্মা-পূজার সাহায্যে মানুষ শরীরাভ্যন্তরে যে কি প্রকারে রস ও তেজ হইতে ক্রমশঃ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উৎপত্তি ও তাহার বিশুদ্ধি সাধিত হইতেছে এবং ঐ মেদাদির অবিশুদ্ধাংশই যে কি প্রকারে মলরূপে বিসর্জ্জিত হইতেছে, তাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে পারে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কি প্রকারে যে মানবশরীরে বিশুদ্ধ শক্তির উদ্ভব হয়, এবং ঐ বিভিন্ন শক্তির মূলাধারই বা যে কোথায়, তাহা পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ললাটে, হৃদয়ে এবং নাভিতে যে কি প্রকারে তাহাদের বিভিন্ন কার্য্য করিবার শক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

শিব-পূজা দ্বারা বায়ু-সম্বন্ধীয়, বিষ্ণু-পূজা দ্বারা রস ও তেজ-সম্বন্ধীয় এবং ব্রহ্ম-পূজার দ্বারা মেদ ও অস্থি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্য শরীরের কোন্ কোন্ অংশের সাহায্যে সাধিত হইতেছে, তাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করা যায় বটে, কিন্তু কি প্রকারে সে শক্তি মানবশরীরে কার্য্য করিতেছে এবং ঐ শক্তির মূল উৎস কোথায়, তাহা

পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে ললাটে, হৃদয়ে এবং নাভিতে যে তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য করিবার শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা উপলব্ধি করা যায় না।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, মানবশরীরে যে প্রকারে বিভিন্ন কার্য্য করিবার শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে "গুরুতত্ত্বে" এবং জগতের সমস্ত জীবের সর্ব্ববিধ শক্তির মূলাধার কোথায়, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে "কৌলিক তত্ত্বে"।

চরাচর সমস্ত জীবের শক্তির মূলাধার যে কোথায়, তাহা যে সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করা যায়, তাহার নাম দেবীপূজা অথবা কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী প্রভৃতি শক্তির পূজা। ঐ শক্তি কি করিয়া মানবশরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিবার নাম গুরুপূজা।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, এই সমস্ত কথা অতীব বিস্তৃত এবং উহা মাসিক পত্রিকার কোন প্রবন্ধে সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, জ্ঞানতঃ (theoretically) ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, স্ফোট-বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা, অথবা প্রকৃত হিব্রু ভাষা, অথবা প্রকৃত আরবী ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা সঠিক ভাবে জানিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, যথাক্রমে গুরুতত্ত্ব,কৌলিকতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইবে

কার্য্যতঃ (practically) ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, বৈদিক সন্ধ্যা ও বৈদিক গায়ত্রী

দ্বিতীয়তঃ, গুরু সন্ধ্যা ও গুরু গায়ত্রী ;

তৃতীয়তঃ, গুরুপূজা ;

চতুর্থতঃ, শক্তিপূজা অথবা দেবীপূজা ;

পঞ্চমতঃ, ব্রহ্মপূজা ;

ষষ্ঠতঃ, বিষ্ণুপূজা ;

সপ্তমতঃ, শিবপূজা অভ্যাস করিতে হইবে।

উপরোক্ত তত্ত্ব ও পূজাসমূহ যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার উহা যে প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে প্রথমতঃ লৌকিক প্রয়োজনীয়তা কাহাকে বলে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষায় লৌকিক প্রয়োজনীয়তা বলিতে যাহাই বুঝা যাক না কেন, আধুনিক ভাষায় মানুষ যাহা যাহা সাধারণতঃ চাহিয়া থাকে, তাহাদের নাম মানুষের লৌকিক প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রত্যেক মানুষের প্রার্থিত বস্তু, অন্য কোন মানুষের প্রার্থিত বস্তুর তুলনায় পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে বটে এবং এইরূপ ভাবে দেখিলে কোন দুইটি মানুষের প্রার্থিত বস্তুসমূহ সর্ব্বতোভাবে সমান নহে, তাহাও দেখা যাইবে বটে, কিন্তু সমস্ত মানুষের প্রার্থিত বস্তু কি কি, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও দুইটি মানুষের প্রার্থিত বস্তুসমূহ সর্ব্বতোভাবে সমান নহে, তাহা হইলেও এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যাহা প্রত্যেক মানুষই চাহিয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন্ মানুষের কোন্ ভোজ্য কাম্য, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কেহ হয়ত মাছের ঝোলভাতের প্রার্থী, আবার কেহ হয়ত রুটি-ডালের প্রার্থী, আবার কেহ হয়ত রুটি-মাংসের প্রার্থী, কেহ হয়ত ফলমূলের প্রার্থী ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে কোন দুইটি মানুষের রুচি হয়ত সর্ব্বতোভাবে সমান নহে বটে, কিন্তু কোন ভোজ্যই কাম্য নহে—এমন কোন মানুষ দেখা যাইবে না। এইরূপ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আপাতদৃষ্টিতে জগতের সমস্ত বস্তুর পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এমন বহু গুণ (qualities),কার্য্য (functions) এবং দ্রব্য (composing material) প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আছে, যদ্বিষয়ে সমস্ত বস্তুর সমতা দেখা যায়।

এমন কি কি বস্তু আছে,যাহা জগতের প্রত্যেক মানুষই চাহিয়া থাকে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি চাহেন না, এমন কোন মানুষ জগতের কুত্রাপি দেখা যায় না। কাজেই ঐ তিনটি বস্তু, অর্থাৎ মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বচ্ছলতাকে মানুষের লৌকিক প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে।

যদি দেখা যায় যে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার যে লৌকিক প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার পর যদি আবার দেখা যায় যে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে যাদৃশ পরিমাণে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে না, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করাই যে মানুষের লৌকিক প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যাদৃশ পরিমাণ মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা যে আর কোন উপায়ে লাভ করা যায় না, ইহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রমাণ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

হোমশিখা

— শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

নির্দ্দয় শীতের রাত্রি, দ্বিপ্রহরে ভেঙে গেল ঘুম,
স্বপ্ন গেল টুটি,
স্বপন-বুলানো ক্লান্ত নয়ন মেলিয়া শয্যা পরে
বসিলাম উঠি'।
চাহিয়া বাহির পানে নেহারি' গগনতলদেশে
ঘন অন্ধকার—
মহান্ শূন্যের তলে ধ্যানমগ্ন, তান্ত্রিকের সম
আসনে তাহার।
যে মহাশ্মশান-তলে চলিয়াছে বীভৎস উৎসব
রুদ্র ভয়ঙ্কর
উন্মুক্ত অম্বরসাথে বধূবেশী প্রগল্‌ভা ধরার
মত্ত স্বয়ম্বর।

সে-আঁধারে পাতি' কান একা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে,
নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে,
শুনিলাম নৃত্যপরা কোন্ এক অলক্ষ্য অপ্সরী
নূপুর গুঞ্জনে,
তৃষ্ণাহীন শীর্ণবক্ষে যৌবনের উত্তপ্ত প্রবাহ
বহাইতে প্রাণে,
রোষ-কষায়িত চক্ষ গমনের পথে তার পরে
বহ্নি-শিখা হানে।
বিস্তৃত কাননতল অশ্রান্ত-ঝিল্লীর কলতানে
বাজাইছে বাঁশী,
গমন-বিলাস তা'র সুকঠোর তপশ্চর্য্যাপানে
হাসে অট্টহাসি।

নিরখি' তোমার পানে শিহরিয়া মোর পানে চাহি
ব্যর্থ হাহাকারে
অন্ধতার বন্ধ ছেদি প্রকাশিয়া দিতে চাহি মম
আপন সত্তারে।
নিমন্ত্রণ-লিপি প্রাণ পাঠাইতে চাহে মুক্তাকাশে;
চাহে যুক্তকরে
না করি' বিচার-দ্বিধা, বৈশাখের সূর্য্যকরোজ্জ্বল
দীপ্ত দ্বিপ্রহরে।

সূর্য্যরশ্মি-বিচ্ছুরিত বালুপূর্ণ নির্দ্দয় রাক্ষসী
তপ্ত মরুভূমি,
যৌবন-নিকুঞ্জ-দ্বারে সাগ্রহে ডাকিতে চাহে আজি
মৃত্যু-মুখ-চুমী।

হে মহাসন্ন্যাসী, তব তৃতীয়-নয়ন-বহ্নিশিখা
দহুক অবনী
নব-নবীনের কণ্ঠে উচ্ছ্বসি' উঠুক মহাবেগে
মুক্ত জয়ধ্বনি।
সে নবীন সৃষ্টি তব জানিবে না স্বপ্নেও কামের
সে ব্যর্থ সন্ধান;
সে বহি' আনিবে বাণী সুন্দরের, মুক্ত জীবনের,
—অক্লান্ত, অম্লান।
তপো ভঙ্গ-বার্ত্তা বহি' আনিলেও ধরণীর কানে
সে জানাবে স্থির,
সর্ব্ব-বিসর্জ্জন-বার্ত্তা মহোল্লাসে দীপ্ত হোমানলে
—সুন্দর, গম্ভীর।

সে-দুঃসহ হোমানলে, আমার এ ক্ষুদ্র কুটীরেতে
যাহা কিছু পাই,
যাহা কিছু অ-সুন্দর, অন্ধকার,—দিনু সঁপিয়া
পুড়ে হোক্ ছাই।
অশ্রু যদি নামে চক্ষে শুষ্ক হোক্ উগ্র বহ্নিতাপে,
লুপ্ত হোক্ ত্রাস,
উন্মত্ত পুলক বহি' সর্ব্ব অঙ্গে, হেরিব কৌতুকে
দীপ্ত সর্ব্বনাশ।
সে-মহাশ্মশানতলে উচ্চশির করিব সন্নত
ছাড়ি' অহঙ্কার,
ভয়াল বিষাণ-মন্ত্রে মুহূর্ত্তে মিশায়ে দিব ক্ষীণ
বীণার ঝঙ্কার।

হে দস্যু, তোমার দ্বারে শুষ্ক তুচ্ছ শীর্ণ প্রাণ খানি
দুটি করপুটে
বহিয়া এনেছি আজ, মসীকৃষ্ণ দস্যুতার ক্ষণে
লহ লুটে পুটে।

নিঃশেষিয়া ফেলে দাও পানপাত্র উদগ্র আসব
মিটায়ে—পিপাসা,
হে প্রচণ্ড কাপালিক, হে ভয়াল, নিষ্ঠুর-ভীষণ
পূর্ণ কর আশা।
তার পরে ছিন্নস্কন্ধ অতীতের নগ্ন বক্ষ পরে—
করহ আসন,
লুব্ধ হোমানল-মাঝে জীর্ণতারে প্রদানো আহুতি,—
শাসন-ত্রাসন।

মোও প্রাণ পর্য্যুসিত আসবের দিবে তীব্র জ্বালা,
আনিবে উৎসাহ,—
সেই ক্ষণে পরিত্যক্ত পানপাত্রে পুনঃ দিও ঢালি'
বিদ্যুৎ-প্রবাহ।
তীব্র-হলাহল-জ্বালা সম্মুখের যজ্ঞাগ্নি-সমান
জ্বালিবে অনল,
জীর্ণতার, শীর্ণতার, কুৎসিতের সম্মুখে দাঁড়াবে
সহজ-প্রবল।
তোমার বিষাণ মোর হাতে তুলে দাও মহাকবি,
অশনি-গর্জ্জনে—
লভিবে পরম-শান্তি লজ্জা-ভয় কর্ম্মের কাহিনী
আত্মবিসর্জ্জনে।

তরুশ্রেণী পরপারে মন্দিরের চূড়ার পশ্চাতে,—
দূরে যায় দেখা
অন্ধকার ছিন্ন করি, ভাসিয়া উঠিছে পূর্ব্বাকাশে
রবি-রশ্মিরেখা।
অমনি আমার বক্ষে, আঁধারের আগল ভেদিয়া
রক্ত-চক্ষে চাই,
অন্তরের অন্তস্থলে আলোকের বহুক অকূল
ফল্গুর প্রবাহ।
সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভেদি নগ্নমূর্ত্তি কঠোর সত্যের
হউক প্রকাশ,
আঁধার সমুদ্রপরে উঠুক ফুটিয়া একখানি
প্রভাত আকাশ।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একেবারে বক্তৃতামঞ্চে গিয়া চড়াও হওয়ার খেয়ালটা জহরের চাপিল দু'নম্বর বক্তাকে দেখিয়া। ভদ্রলোক জহরের চেনা। তবে যে একা তারই চেনা নন, আরও অনেকেই যে তাঁকে চেনে সেটা বোঝা গেল তিনি উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র সভায় মৃদু একটা জয়ধ্বনি উঠায়। ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য্য মনে হইল জহরের। বছরখানেক আগেও যিনি ফাঁকি দিয়া—সাধারণ জুয়াচুরির চেয়েও খারাপ আইনসঙ্গত জুয়াচুরি করিয়া—বীরেশ্বরের হাজার তিনেক টাকা মারিয়া দিয়াছিলেন, তাঁকে দেখিয়া জনতার উল্লাস? কাগজে সম্প্রতি একজন লীলাময় ঘোষের নাম দেখা যাইতেছিল বটে মাঝে মাঝে, তিনিই কি ইনি? পাশ-বালিশের মত গোলগাল লীলাময়ের এতো এক অপরূপ লীলা!

মঞ্চে উঠিবার অধিকার জহরের ছিল না, কিন্তু রাজসিংহাসনে উঠিবার অধিকারও শুধু অপেক্ষা রাখে অর্জ্জনের। বাধা মানিবার মত মন তার ছিল না, বাধা সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল দু'হাতে, গম্ভীর মুখে একটু মাথা হেলাইয়া সমস্ত প্রতিবাদে সায় দিয়া বসিয়া পড়িল লীলাময় ঘোষেরই খালি চেয়ারটিতে। উদাস মধুর সজল কান্নার সুরে লীলাময় তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সুর যেমনই হোক থাকিয়া থাকিয়া এমন সব বিশ্রী হাসির কথা তিনি বলিতে লাগিলেন যে সভায় চাপা হাসির গুঞ্জন উঠিতে লাগিল। বক্তৃতার এ একটা ষ্টাইল। কাঁদ' কাঁদ' গোপাল ভাঁড় মানুষকে মুগ্ধ করে বেশী।

একবার হাসিটা হইল প্রবল, মিনিটখানেক গোলমাল থামিল না। সেই অবসরে লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর, জহর?

আমি কিছু বলব।

বলবে? আমাকে না সভায়?

সভায়।

কি সর্ব্বনাশ! ওসব দুর্ব্বুদ্ধি কোরো না।

লীলাময়ের বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র জহর বিনা ভূমিকায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, বন্ধুগণ, অনাহুত ভাবে আমি আপনাদের একটা সুপরমর্শ দিচ্ছি, আপনারা ন্যাকামি ছাড়ুন। আপনারা সকলে ন্যাকা। কেন জানেন? আপনারা সকলে একের জন্য, দুয়ের জন্য, তিনের জন্য কাঁদেন, দশের জন্য কাঁদেন না। আপনারা অমানুষ, পশু, অসভ্য, বর্ব্বর। আপনাদের লজ্জা করছে না এখানে বসে থাকতে? ঘরের কোণের একজন দু'জন তিনজনের জন্য নিজেকে আপনারা উৎসর্গ করে দিয়েছেন জানোয়ারের মত, এই সভায় এসে ভিড় করবার কি অধিকার আপনাদের আছে? আমি যদি বলি আপনাদের মাঝখানে এখন একটা বোমা ছুঁড়ে মারব, আপনারা যে যার প্রাণ নিয়ে আগে পালাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবেন, বড় জোর সঙ্গে নেবার চেষ্টা করবেন একজন দুজন কি তিনজনকে, অথচ এমন জমাট বেঁধে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এমন গলাগলি মাখামাখি ভাব আপনাদের,—

থামানর চেষ্টা, টানিয়া বসানর চেষ্টা, স্বয়ং সভাপতির উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রোতাদের ব্যাপারটা বুঝানর চেষ্টা, সব ব্যর্থ হইয়া গেল। চার পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যখন একসঙ্গে জহরকে চাপিয়া ধরিল, সে গলা ফাটাইয়া শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা আমায় বসিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা আমার কথা শুনবেন না?

গালাগালি-মুগ্ধ শ্রোতারা বলিল:

শুনব'! শুনব!

বেশ তো বলছিল বাপু, বলুক না।

এই ভলান্টিয়ার শালারা, ছেড়ে দে পাগলাটাকে।

বন্দেমাতরম্!

আস্তে! আস্তে! বড় গোল হচ্ছে!

পাগলাটার নাম কি?

বার করে দাও পাগলটাকে—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দাও।

কি বলছিল, বলুক না শুনি।

চার পাঁচজন নেতার হাতগুলি মিনিট পাঁচেক শূন্যে আন্দোলিত হওয়ার পর গোলমাল একটু কমিল। তার পর লীলাময় ঘোষ উঠিয়া বুকের কাছে দুটি হাত জড় করিয়া ধীরে ধীরে বার সাতেক নিজেকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে পাক খাওয়ার পর গোলমাল থামিয়া গেল। তখন সভাপতি ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন যে, সকলে গোলমাল করিলে তো সভার কাজ হয় না, অতএব সকলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁর সবিনয় নিবেদন মন দিয়া শেষ পর্যান্ত শুনুন। এই যে এই লোকটি বলা নাই কওয়া নাই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইনি কে কেউ তা জানে না, এ সভায় এঁর বক্তৃতা দিবার কোন কথা ছিল না, তা'ছাড়া সভা যে জন্য আহ্বান করা হইয়াছে তার সঙ্গে এ ভদ্রলোকের বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নাই, আর এভাবে যার যখন খুসী যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গেলে কোন সভার কাজ হয় না, তবু সভার সকলে যদি এই ভদ্রলোকের কথা শুনিতে চান, সভাপতি হিসাবে তিনি সকলের ইচ্ছার মর্য্যাদা রাখিয়া এঁকে বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি দিবেন, মুখে কিছু না বলিয়া যারা এঁর বক্তৃতা শুনিতে চান যদি দয়া করিয়া হাত তোলেন—

হাত উঠিল অনেকগুলি এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে জহর সভায় বলিবার অনুমতি পাইল। এবার কিন্তু সে না পাইল কথা খুঁজিয়া, না পারিল উদ্ধত উন্মাদনার সঙ্গে গগনভেদী চীৎকার করিতে। প্রত্যেকটা শব্দ যেন গলায় আটকাইয়া যাইতে লাগিল। একবার ভাবিল, উপস্থিত সকলকে আরেকবার জানোয়ার বলিয়া গাল দেয়, অন্ততঃ অমানুষ বলে। কিন্তু হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এতগুলি মানুষকে ওসব কথা বলিবার সাহস সে কোথায় পাইবে? ভদ্রভাবে নীচু গলায় জড়াইয়া জড়াইয়া কয়েক মিনিট কি যে সে বলিল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। তারপর আচমকা বক্তৃতা থামাইয়া বসিয়া পড়িল। দুই কানে তখন তার আগুন ধরিয়া গিয়াছে, মনে জাগিয়াছে সীতাদেবীর সেই সাধ, যে সাধের মর্য্যাদা রাখিতে প্রকাণ্ড সভা-ভূমিতেই ধরিত্রী দ্বিধা হইয়া গিয়াছিলেন।

একসময় সভার কাজ শেষ হইয়া গেল। লীলাময় ডাকিতেই সে কলের পুতুলের মত তার পিছু পিছু দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড গাড়ীতে গিয়া উঠিল। লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝলাম না বাপু, এরকম কেলেঙ্কারী কেন করলে?

জহর বোকার মত বলিল, কি জানি।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিক, জানলে কি আর করতে?

লীলাময় পরিচয় করিয়া দিলেন। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের নাম কেদারনাথ রায়, মফঃস্বলে কিছু জমিদারী আছে, কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ী আছে।

কাগজে মাঝে মাঝে নাম ছাখো না জহর? দেখবে কি, খবরের কাগজ কি আর পড়! হাতের কাছে যদি একখানা কাগজ পেলে ত' নারী-হরণ, সিনেমা আর খেলাধুলা সংবাদ পড়েই খতম। বেশ নাম হচ্ছে কেদারবাবুর, আর বছরখানেক বছর দুই থাক্‌, লোকের মুখে মুখে ওঁর নাম ঘুরবে। নেতা হওয়া কি সহজ? কত হিসাব করে কত ভেবে চিন্তে প্রত্যেকটি পা ফেলতে হয়। তোমার মত বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ সভায় এসে গলাবাজী করলেই কি হয়! আজ তিন বছর ধরে কেদার বাবু কত চেষ্টা করেছেন, তবে আজ মিটিং-এ একটু খাতির পান।

আজ ত উনি কিছু বললেন না?

বললেন বৈকি, সকলের আগে উনি বলেছেন। ওঁকে আগে বলতে দিতে একটু আপত্তি হয়েছিল, হিংসুটে লোকের ত অভাব নেই, সভার রিপোর্টে কাগজে আগে ওঁর নামটা বেরুবে, তাতেও লোকের গা জ্বলে। আমি কিন্তু ছাড়বার ছেলে নই বাবা, স্পষ্ট বলে দিলাম প্রথমে বলতে না দিলে উনি যে একশ' টাকা চাঁদার কথা বলেছেন সেটা ক্যানসেল হয়ে যাবে। শুনে সবাই চুপ।

কেদারনাথ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন,—একশো!

জহর দেখিতে পাইল কেদারের উরুতে অঙ্গুলের খোঁচা দিয়া লীলাময় কি যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না।

লীলাময় খুসী হইয়া জহরকে বলিলেন, কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে আমি কিন্তু থ' বনে গেছি ভাই। ইচ্ছাটা কি বল ত? এই বয়সে বড় হওয়ার সখ চেপেছে না কি?

জহর ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, তবু গাম্ভীর্য্য ক্ষোভের উদ্ধতভাব বজায় রাখিয়া বলিল, বড় হওয়ার সখ কোন বয়সে থাকে না ?

কিন্তু ও ভাবে কি বড় হওয়া যায় রে দাদা ! তার ধরা বাঁধা মেথড্ আছে। এই যে এত কাণ্ড করলে, তুমি ভাবছ কাল কাগজে কাগজে তোমার নাম বেরিয়ে যাবে ? সে গুড়ে বালি।—এক লাইন শুধু লিখে দেবে, একজন পাগলাটে ইয়ংম্যান মিটিং-এ গোলমাল করেছিল। তোমার নামটি পর্য্যন্ত করবে না।—কি করছ তুমি এখন ?

—কিছু না।

এ লাইনে আসবে ?

বলিয়া জহরের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই খুসীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, জহরের হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, বেশ, কিছু ভেবো না তুমি, আমার উপর সব ভার ছেড়ে দাও, আমি সব ঠিক করে দেব। কিন্তু সে তো দু' একদিনের ব্যাপার নয়, দু' এক কথাতেও সব ঠিক হয়ে যাবে না। এক কাজ কোরো তুমি, কাল দুপুরবেলা একবার এসো আমার বাড়ীতে—কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে। হঁ্যা কেদারদা, এই সন্দে বেলা বাড়ী ফিরে যাব ? কোথাও একটু কিছু—একজন ইয়ংম্যান সঙ্গে রয়েছে, আজ বেশ জমত।

কেদার বলিলেন, কণকের ওখানে—?

জহর আবার দেখিতে পাইল কেদারের উরুতে আঙ্গুলের একটা খোঁচা দিয়া লীলাময় আবার কি যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না। এতটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় অনুভূতি জহরের ভিতরে ম্যাজিকওয়ালার চারা-গাছের মত মিনিটে মিনিটে গজাইয়া উঠিতেছিল। জীবনে যেন হঠাৎ একটা রহস্যময় এ্যাডভেঞ্চার সুরু হইয়া গিয়াছে। কণক যে কে এবং কেন যে সে বাতিল হইয়া গেল বুঝিতে জহরের বিশেষ কষ্ট হইল না। ছেলে সে কেমন, কণক নামধেয়ার স্ফূর্ত্তির বাজারে সওদা কিনিতে যাওয়াটা সে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, এখনও লীলাময় তার হদিস পান নাই। চালাক-চতুর মানুষ, হিসাব না করিয়া একপা চলেন না, কণককে তাই এখনকার মত আড়ালেই রাখিয়া দিলেন।

চৌরঙ্গীর এক হোটেলে গিয়া সামনে ধরিলেন শুধু একটা পেগ্। শুকনো নীরস জীবন মানুষের, কঠিন বাস্তবতার ধূ ধূ প্রস্তর পার হইয়া চলিতে হয় মানুষকে—হয় না ভাই জহর ? বিষ—জীবনে শুধু বিষ। মাঝে মাঝে তাই একটু অমৃত চাই মানুষের—চাই না ভাই জহর ?

জহর সায় দিয়া বলিল, নিশ্চয়।

বলিয়া এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করিয়া নিজের হাতে নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া জহরের মুখ বাকান'র রকম দেখিয়া লীলাময় ও কেদার দুজনেই হাসিলেন। কিন্তু গ্লাসে চুমুক সে যে দিয়াছে, দমে সে যে ভিড়িয়াছে, ইহাতে পরম স্বস্তিও দুজনে যে পাইয়াছেন, সেটা বেশ বোঝা গেল।

কেদার বলিলেন, আনাড়ি।

লীলাময় রসিকতা করিয়া বলিলেন, নাড়ীজ্ঞান পাবে কোথায় দাদা, নাড়ী কি কখনও ধরেছে !

নাড়ীজ্ঞানী কেহ তখন জহরের নাড়ী ধরিলে ভয়ে ভয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। ভিতরের জালাটা কিসের বুঝিতে না পারিয়া জহর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। মাথাটাও ঝিম ঝিম করিতেছে। বিনা আয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে আজ সন্ধায় সে একি চমৎকার নবজীবন আরম্ভ করিয়া দিল ! মিটিং এর লীলাময়ের মুখোস এখনও খসে নাই, উপর হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া গিয়াছে মাত্র। এখনও লীলাময়ের মুখ দেখিলে মনে হয়, রসে টইটুম্বুর একটা মানুষ কান্নার ভান করা রসিকতায় কাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। কেদার কি বক্তৃতা দিয়াছিলেন জহর শোনে নাই, লীলাময়ের কথাগুলি তার মনে আছে। এখন যে সুবাস বাসা বাঁধিয়াছে লীলাময়ের মুখে, মিটিং-এর কথাগুলির সঙ্গে সেটা মিশিয়া থাকিলে না জানি আরও কত শ্রুতিমধুর হইত তার বক্তৃতা, আরও কত মুগ্ধ হইয়া যাইত সভার লোক ! ভাবিতে ভাবিতে জহর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

লীলাময় গদগদ হইয়া বলিলেন, এন্‌জয় করছ ? দাঁড়াও দাঁড়াও, এই তো সবে সন্দে !

তাই কি ? জীবনের এটা কোন তিথির সন্ধ্যা সেটা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। এমনি সাধারণ তিথিটা আজ কি ছিল, জহর তাই মনে করিবার চেষ্টা করিল। পূর্ণিমার কাছা-কাছিই হবে, হয় এদিক নয় ওদিক। মনটা কেমন করিতে লাগিল জহরের। পরীক্ষায় পড়া করিতে করিতে কতবার জানালা দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্না দেখিয়া, ছাদে হোক মাঠে হোক ঘাটে হোক জ্যোস্নায় চুপচাপ অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার

যে সাধটা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত, কত কষ্টে পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য সাধটা সে তখন সঞ্চয় করিত! হোক না ছেলেমানুষী, এসব চিরন্তন ছেলেমানুষীর দাম কোনদিন কমে না মানুষের। এখানে সে কেন আসিয়াছে? এই কড়া আলো, চড়া নির্লজ্জতা, কুৎসিত গুণ্ডামির আব-হাওয়ায়? কোমলতা বিসর্জ্জন দিতে? নিজের যে কোমলতার জন্য তরঙ্গের কথা ভাবিয়া এখনও তার মন কেমন করিতেছে?

বাকী সকলেও কি এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে এখানে, এই নারী-পুরুষের দল? নিজের কোমলতা যে নিজেকে কষ্ট দেয়, এই রোগের চিকিৎসা করিতে?

মাঝ বয়সী মাংসল মেয়েরাও যে এখানে আসিয়া রোগটার হাত হইতে রেহাই চান, একটু পরেই জহর তা সুন্দর বুঝিতে পারিল। বিদেশী পোষাক পরা একটা হ্যাংলা পোকার সঙ্গে যে মহিলাটি সটান তাদের টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মুখের রঙ তার খাঁটি রং। মিসেস সেন তিনি, নমিতা নাম। লীলাময়ের যে তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেটা বোঝা গেল খাপছাড়া অভ্যর্থনার জবাবে লীলাময়ের ঘাড়ে তাঁর ছোট একটি চড় মারায়।

আড় চোখে জহরের দিকে চাহিয়া তিনি বসিলেন। উঠিলেন একঘণ্টা পরে। বলিলেন, আপনার গাড়ীটা বাইরে দেখছিলাম কেদার বাবু, এসব তো অনেক খেলাম, একটু হাওয়া খাওয়াবেন?

কেদারনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মিসেস সেন গাড়ীতে উঠিলেন আগে, উঠিয়াই বলিলেন, আসুন জহরবাবু আপনি, আপনার সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হল, আপনি আমার পাশে বসবেন। ডায়মণ্ড হারবারের দিকে যাওয়া যাক্, কেমন?

সহরে জ্যোৎস্না নাই, সহরের বাহিরে অজস্র। পথের ধারে লাইট রেলওয়ের লাইন পাতা, দুদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে বাড়ী ঘর গাছপালায় জমাটবাঁধা আবছা আবছা গ্রাম। কোমলতা-ব্যায়ামের চিকিৎসাটা জীবনে আজ প্রথম হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় জহরের স্রেফ কান্না আসিতে লাগিল। এমন অদ্ভুত রকমের কোমল মনে হইতে লাগিল নিজেকে যে, বাঁয়ে লীলাময়ের পকেটের সিগারেটের কেস্‌টার চেয়ে মিসেস সেনের কোমল শরীরটা বেশী বিঁধিতে লাগিল তার দেহে।

মিসেস সেন বলিলেন, একবার এদিকে এসে তালের রস খেয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে কেদার বাবু? আহা, কি স্বাদ টাটকা তালের রসের!—আজও জিভে জড়িয়ে আছে। কেবল গন্ধটা ভারি বিশ্রী।

মিসেস সেনের জড়ান জিভে তালের রসের স্বাদ জড়াইয়া থাকা আশ্চর্য্য নয়, জহরের হৃদয় কিন্তু একবার স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গেল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, গ্রামটা চিনতে পারবেন? কাছাকাছি এসে পড়েছি নিশ্চয়। চলুন না একটু চেখে আসি? রাত্তির বেলা তালের রস—কি মজাই হবে!

বস্তু-তান্ত্রিকতার এই রোমান্সের পরিচয় জহর ভাসা ভাসা ভাবে রাখিত—লোকের মুখে শুনিয়াছে, মনস্তত্ত্ববিদের মুখে। রোজ যে পাঁচসিকা দামের সাবান মাখে, ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়া নাকি তার কাছে রোমান্সের চরম। অপরাহ্ণ হইতেই নিজের মনের মধ্যে বসিয়া নিজেকে জহর ঘৃণা করিতেছিল, এখন রীতিমত চাবুক মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবু, সেই যন্ত্রণাতেই যেন সে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব অনুভব করিতে লাগিল, বোধ করিতে লাগিল নিজেকে নিজে পীড়ন করার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার তাগিদ। মেরুদণ্ড টান করিয়া এতক্ষণ সে সোজা হইয়া বসিয়াছিল, এবার মিসেস সেনের দিকে একটু হেলিয়া ঠেসান দিয়া বসিল। তাতে খুসী হইয়া মিসেস সেন হোটেলে লীলাময়ের ঘাড়ে যেমন একটা চড় মারিয়াছিলেন, জহরকেও তেমনি একটা চড় মারিয়া আদর করিলেন। লীলাময়ের সিগারেটের আগুনে তার আংটির পাথরটা বিপদের লাল আলোর মতই চমকাইয়া উঠিল।

মাইল দেড়েক গিয়া পাওয়া গেল একটা গ্রাম। তখনও গ্রামের আলো নেভে নাই, পথের ধারে ছোট ছোট দোকান-গুলি বন্ধ হয় নাই। তাড়ির দোকানটা গ্রাম পার হইয়া একটু তফাতে। দেখা গেল, দোকানের খানিক দূরে ছোট খাট একটি ভিড় জমিয়াছে, দোকানের সামনে পুলিশ।

লীলাময় সভয়ে বলিলেন, পিকেটিং হচ্ছে।

পিকেটিং ?—মিসেস সেনের শিহরণ অনুভব করিয়া জহরের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, কাজ নেই তালের রসে বাবা, মানে মানে এখন ফিরে যাওয়া যাক।

গাড়ী ফিরাইতে ফিরাইতে দেখা গেল, যোল সতর বছর বয়সের একটা ছেলে পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশের হাতে পড়িল।

ব্যাক করিবার সময় গাড়ীর পিছনের চাকা নর্দ্দমার কাদায় ডাবিয়া গেল। কেদার ড্রাইভারকে এমন একটা গাল দিলেন যে অদূরে তাড়ির আড্ডায় যারা রোজ তাড়ির সঙ্গে গালাগালির রসও উপভোগ করে, শুনিলে তারা নিশ্চয় সমস্বরে বলিত, সাবাস! এখানে কেউ কিছু বলিল না, মিসেস সেন শুধু খিল খিল করিয়া একটু হাসিলেন। নর্দ্দমা ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টায় গাড়ীর ইঞ্জিন পরক্ষণে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, জহরের মনে হইল, মিসেস সেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গাড়ীটাও যেন হাসিতেছে।

মাথার মধ্যে সব ওলট পালট হইয়া যাইতেছিল জহরের। সবই সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু যেন সব আবছা, এলো-মেলো—কোথায় ছিল সে, কি করিয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সব তার মনে আছে, তবু যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কিছুই স্মরণ হইতেছে না। কয়েক ঘণ্টা আগের অতীতও একান্ত অবাধ্য হইয়া ভবিষ্যতের কল্পনার মত স্মৃতির আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর ভিতরে একটা কষ্ট হইতেছে অকথ্য। একসঙ্গে আগুনে পোড়া আর শীতে জমিয়া যাওয়ার মত অদ্ভুত যন্ত্রণা।

গাড়ী নর্দ্দমা হইতে উঠিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রাম পার হইয়া যাওয়ার পর জহর বলিল, আমার গা কেমন করছে।

মিসেস সেন সভয়ে বলিলেন, সেরেছে!—সরুন, সরুন, ওদিকে সরুন, ওদিক দিয়ে মুখ বার করুন।

গাড়ী বাঁধিতে বলিয়া ব্যাকুলভাবে জহরকে তিনি দু'হাতে দূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গাড়ী থামা মাত্র দরজা খুলিয়া টুক করিয়া নামিয়া গেলেন। জহরকে বলিলেন, আপনি নেমে আসুন তো।

জহর পথে নামিয়া দাঁড়াইল। তফাতে দাঁড়াইয়া মিসেস সেন বলিলেন, পথের ধারে বসে বমি করে নিন। একটু সরে যান, বমিকে আমি বড্ড ঘেন্না করি। আপনারা নামুন না একজন কেউ, একটু হেলপ্ করুন না ওঁকে? আচ্ছা তুমিও ত নামতে পার? নাম, আমি সামনের সিটে বসব।

মিসেস সেনের সেই সঙ্গী চুপ চাপ সম্মুখের আসনে বসিয়া ছিলেন, চুপ চাপ নামিয়া আসিলেন। মিসেস সেন সেখানে উঠিয়া বসিলেন।

জহর বলিল, আপনিও উঠে বসুন, আমি হেলপ চাই না।

মিসেস সেন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, বমি করবেন বললেন যে?

কখন বললাম?

তবে গাড়ীতে উঠুন, তাড়াতাড়ি এখন টাউনে ফিরতে পারলে বাঁচি।

আপনারা যান, আমি গ্রামে ফিরে যাব।

বলিয়া জহর গ্রামের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

লীলাময় হাঁকিয়া বলিলেন, পাগলামো কোরো না জহর, গ্রামে গিয়ে কি করবে?

পিকেটিং করব।

আরও কয়েকটা আহ্বান আসিল, জহর কানে তুলিল না। একটু টলিতে টলিতে সোজা আগাইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া গাড়ী ছাড়িবার শব্দ কাণে আসিতে সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর আবার গ্রামের দিকে আগাইয়া চলিল। এবার চলিল আস্তে। গ্রাম বেশী দূরে নয়। এই নাম-না-জানা গ্রামের তাড়িখানায় পিকেটিং করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে যতটুকু সময় পারা যায় পরীক্ষা-শেষের জন্য তুলিয়া রাখা এই জোৎস্নাকে একটু উপভোগ করা যাক। আজই তো তার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।

কিন্তু পিকেটিং জহর কেন করিবে? কে মাথার দিব্য দিয়াছে? জহর তা জানে না। তার কেবল মনে হইতেছিল, আজ সারাদিন সে অনেক সুখ উপভোগ করিয়াছে, এবার কিছু দুঃখ তাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

[ক্রমশঃ

সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জের অভিষেক

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৬ সালের ২০শে জানুয়ারী!

আজিকার এই অভিষেক-উৎসবের দিনে সে দিনের কথা মনে পড়ে। বর্ত্তমান জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক-প্রিয়



বিবাহের পূর্ব্বে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী: সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী বিবাহে তাঁহাদের সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিবার পর এই ছবি তোলা হয়।

নরপতি পঞ্চম জর্জ্জ সেদিন পরলোক গমন করেন। কোনও রাজার মৃত্যুতে জগতের এত লোক একসঙ্গে এমন ভাবে শোক প্রকাশ করে নাই।

কোন দিন জগৎ কোন রাজাকে শুধু রাজা হিসাবে স্মরণ রাখে না; যাহাকে মানব চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে চায়, তাহার মধ্যে মানবত্বকেই তাহারা বড় করিয়া দেখে।

জীবনের প্রদীপ নিভিয়া আসিতেছে। চোখের উপর মৃত্যুর শেষ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। তখনও তাঁহার প্রশ্ন হইতেছে, "আমার প্রজাদের কুশল ত?"

সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছে। তবু স্বাক্ষর করিতে হইবে। নিঃশ্বাস লইতে পর্য্যন্ত কষ্ট হইতেছে। শয্যার চারি পাশে মন্ত্রীরা দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের চোখ অশ্রু-সিক্ত। তিনি কলম ধরিতে পারিতেছেন না, কিন্তু অবিরত চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রীদের দাঁড় করাইয়া রাখিতে তাঁহার মন ক্ষুব্ধ হইতেছিল। কলম ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, আর মন্ত্রীদের দিকে চোখ তুলিয়া বলিতেছেন, "আপনাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত।" তাঁহার নিজের চরিত্র দিয়া, তাঁহার মানবতা দিয়া, তাঁহার ব্যক্তিগত মহিমা দিয়া তিনি সেই প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার তিরোধানে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শোকবাণী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, "The man was a King indeed!" রবীন্দ্রনাথ সেই সময় লিখিয়া-



বাল্যস্বপ্ন: সম্রাজ্ঞীর মনে এই বনভূমির সহিত বাল্য ও যৌবনের বহু সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে। এই বনানীতেই সম্রাট্ তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন।

ছিলেন, তাঁহার তিরোধানে জগতের শান্তি-কামীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আজ

তাঁহারই নাম লইয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জ শুভেচ্ছার স্বর্ণ-মুকট শিরে লইয়া অভিষিক্ত হইলেন।



শৈশবক্রীড়া : সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ বালিকা বয়সে পৈতৃক ভিটা গ্লামিস ক্যাস্‌ল-এ গার্ডেন পার্টিতে যোগদানের বেশে।

আজ নূতন দিনের সূর্য্যের আলো নবীন স্বর্ণ-কিরীটে ঝল মল করিতেছে।

আজ আবার কেন পুরাতন দিনের জন্য দীর্ঘশ্বাস? ইহা দীর্ঘশ্বাস নহে। ইহা শুভ-যাত্রার সূচনায় পুণ্য নাম-স্মরণ।

যোজনান্ত দূরে, সমুদ্রের ওপারে আজ অভিষেক হইতেছে। বিজ্ঞানের কৃপায় গঙ্গার তীরে বসিয়া টেম্‌স্ নদীর তীরের সেই অভিষেক-বাহিনীর গতি-শব্দ আমরা শুনিতে পাইতেছি। সম্রাটের যে-বাণী সেখানকার উপস্থিত লোকেরা শুনিতে পাইতেছেন, সেই বাণী আমরা সেইক্ষণে ঘরে বসিয়া শুনিতেছি। আমরাও সেই অভিষেক-উৎসবের শ্রোতা।

কিন্তু তাহার চেয়েও এক নিকট ব্যাপার আছে—তাহা হইল ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক। সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জের এই অভিষেক-দিনে কেন যে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নাম স্মরণ করিতেছি, তাহার মূলে রহিয়াছে, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক। কারণ এই সম্পর্ককে পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়া এক প্রীতির স্পর্শ দিয়া গিয়াছেন। সেই প্রীতির দাবী লইয়া ভারতবর্ষ আজ তাহার নূতন সম্রাটের অভিষেকে উপস্থিত হইয়াছে। এই বিরাট সাম্রাজ্যের মধ্যে কত না



কৈশোর-মাধুর্য্য : স্কুলের ছাত্রী। এই বয়সেই সম্রাজ্ঞীর চরিত্রে সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করিবার এমন একটা বিশেষ ক্ষমতা দেখা দিয়াছিল যে, সকলেই তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইতেন।

বিভিন্ন জাতি আছে, কত না বিভিন্ন ধর্ম্ম আছে, কত না বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোক আছে। এই সব বিভিন্ন জাতি লইয়া এক বিরাট সম্মিলিত মহাজাতি গড়িয়া উঠিতেছে—যাহারা নিজের নিজের ঘরে স্বতন্ত্র, কিন্তু এক জায়গায় সকলে এক—এক বিরাট লীগ অফ নেশনস্।



১৯২০ সালে বর্ত্তমান সম্রাট (তখন ডিউক অব ইয়র্ক) প্রথম লর্ড-সভায় আসন গ্রহণ করেন। তখনও তিনি ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র।

অনেক বৃটিশ রাজনৈতিক অনেক ভাবে এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ একটি কথায় সেই আদর্শকে প্রাণ দিয়া গিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গেলেই তিনি বলিতেন, "The family." এই দুইটি কথার মধ্য দিয়া তিনি ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ডের সম্পর্ককে এক নূতন ভিত্তিতে দাঁড় করাইয়া গিয়াছিলেন!

আজ নূতন সম্রাটের অভিষেক-দিনে সেই সম্পর্ক আরও সত্য ও সহজ হইতে চলিয়াছে। আজিকার এই অভিষেক যেন সেই আদর্শের অভিষেক হয়, ভারতের অন্তর হইতে এই প্রার্থনা বাজিয়া উঠিতেছে। তাই সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নাম স্মরণের একটা স্বার্থকতা আছে। সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জের জীবন আলোচনা করিতে হইলে আর এক কারণে একটু পিছনের দিকে চাহিতে হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পর হইতে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং চরিত্র-গঠন এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে যিনি বসিবেন, 'রাজার ছেলে' হওয়া ছাড়া, তাঁহার যে এক সবিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে, সে কথা প্রথম বোঝেন সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড। রাজার ছেলে, সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বরকমে সাধারণ মানুষের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া, এক বিশেষ স্বতন্ত্র আড়ম্বরে কাঠের পুতুলের মত সাজাইয়া গুজাইয়া রাখিতে হইবে, যুবরাজদের শিক্ষার এই যে পুরাতন নীতি, ইংলণ্ডের রাজ-পরিবার তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করেন। জীবনের তপ্ত স্পর্শ থেকে এই ভাবে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ছেলেমেয়েদের শুধু 'রাজার ছেলে' করিয়া গড়িয়া তোলায় সপ্তম এডওয়ার্ডের বিশেষ আপত্তি ছিল।

সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন এটা করিতে নাই, রাজার ছেলে ও-টা বলিতে নাই—ওখানে চলিতে নাই, এই জাতীয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণহীন ফ্রেমে তাঁহার শিক্ষাকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি সেই প্রাণহীন শিক্ষার অসারতা থেকে ইংলণ্ডের রাজবংশকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দাসত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে, লৌহ-শাসনের যুগ চলিয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত মানুষের মনে নব নব শক্তি, নব নব আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রতিদিনই নিবিড়তর, স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। তাই, এই অগ্র-গতির যুগে, রাজতন্ত্রকে যদি আত্ম-মহিমায় থাকিতে

হয়, তাহা হইলে, সকলের সঙ্গে তাহাকেও চলিতে হইবে। সিংহাসনে যাহাকে বসিতে হইবে, এই নব-জাগরণের যুগে



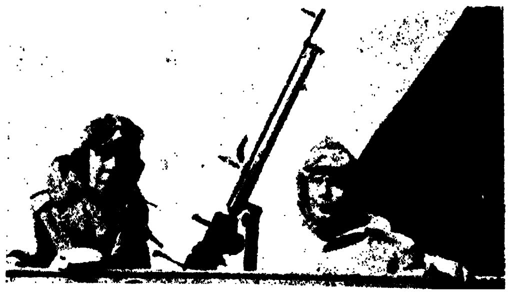
যুদ্ধের পর সম্রাজ্ঞী (তখন লেডী এলিজাবেথ) লণ্ডন সোসাইটিতে নৃত্য-কৌশলের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। থিয়েটার দেখিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন।

তাহাকে আগে মানুষের মধ্যে মানুষ হইতে হইবে—রাজার চরিত্রের মধ্য দিয়া জনসমাজ এবং রাজসিংহাসনের মিলন-সেতু গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই আদর্শ উপলব্ধি করিয়াই সপ্তম এডওয়ার্ড, যদিও তিনি তখনও যুবরাজ, তাঁহার দুই ছেলেকে, সাধারণ নাবিকদের সঙ্গে, রাজপ্রাসাদের বিলাস হইতে সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন জর্জ্জের বয়স মাত্র বারো এবং তাঁর বড় ভাই-এর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ। সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট আদেশ দেন যে, রাজপুত্র বলিয়া তাঁহার দুই ছেলের প্রতি কোন রকম স্বতন্ত্র আচরণ না করা হয়। সপ্তম এডওয়ার্ডের এই আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার দুই ছেলেকে, রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড এবং ষষ্ঠ জর্জ্জকে, শিশুকাল হইতে এই বৈজ্ঞানিক যুগের আদর্শ নাগরিক করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই শিক্ষা এবং আবহাওয়ার ফলে আজ ইংলণ্ডের রাজবংশ ভব্যতা, শালীনতা এবং মানবতায় জগতে আদর্শ-স্থল এবং তাহারই ফলে জগতের এই শ্রেষ্ঠ অভিজাত-বংশের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক নমনীয়তা আছে, যাহা বিনা আড়ম্বরে যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে।

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের জীবন-কথা আলোচনা করিতে হইলে, সেই জন্য প্রথমেই এই আদর্শের কথা স্মরণে পড়ে। এই আদর্শ সফল হইয়াছিল বলিয়াই, আজ ঝড়ের রাত্রির প্রদীপের মত যেখানে রাজার রাজ-ভাগ্য নিভিয়া যাইতেছে, সেই জগতে ইংলণ্ডের রাজ-আসন প্রজার প্রীতিতে দৃঢ়তর হইয়া আছে। এই বিশেষ গৌরব ইংলণ্ডের রাজবংশকে সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর দুই দিন পরে বাইশে জানুয়ারী প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্ সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড রূপে বিঘোষিত হইলেন।

সিংহাসনে বসিবার আগে তিনি মানব-কল্পনায় এক অপরূপ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিলেন, চির-ভ্রাম্যমাণ, চির-কিশোর, রাখালের বন্ধু, নাবিকের সাথী, অসহায়ের সহায়, গাইড-বালকদের নেতা, সব-সময় সব জায়গায় উপস্থিত রূপকথার রাজকুমার!



যুদ্ধের শেষ ভাগে সম্রাট্ বিমান বিভাগে যোগ দেন এবং বিমান-পোতের পাইলটের কার্য্য গ্রহণ করেন।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাদের দুই ভাইকে, তাঁহাকে এবং আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জকে, এই বৈজ্ঞানিক যুগের

মানুষ হিসাবে সকল রকমে সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহাদের সেই শিক্ষার সূচনা হয়। অষ্টম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন



যুদ্ধের পরে এবং ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্ব্বে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ যখন বিমান-বিভাগে ছিলেন : ১৯১৯ সালে উইণ্ডসরে তোলা ছবি।

তাঁহার গতিবিধি, কার্য্যকলাপ বেশী করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। জ্যেষ্ঠের চলমান জীবনের বিজয়-দুন্দুভির আড়ালে আমরা তখন সব সময়ে রাজার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ ইয়র্কের প্রাণবন্ত জীবনের অনুরূপ গতি-শব্দ শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু এই দুই পরিব্রাজক রাজকুমার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, কুটীরে, খনির অভ্যন্তরে, দুঃস্থ লোকদের পল্লীতে পল্লীতে, খেলার মাঠে, সৈনিকদের আবাসে, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাম্রাজ্যের অন্তরের অন্তরতম স্থলে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজত্ব-কাল দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইল না। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া এক মহা রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইল। সম্রাট্ দেখিলেন যে, যখন তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শ-রক্ষার জন্য দেশে রাজনৈতিক অশান্তি হইতে পারে, তখন তিনি স্বেচ্ছায় এই এক-চতুর্থাংশ পৃথিবীর রাজ-সম্মান পরিত্যাগ করিলেন এবং নিজের ভাই ডিউক্ অফ ইয়র্ককে এই সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। অন্য দেশে হইলে এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া একটা তুমুল অশান্তির এবং রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের কারণ ঘটিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজবংশের শিক্ষা-দীক্ষা সে রকম নয়। রাজ্যের কল্যাণ এবং অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ অষ্টম এডওয়ার্ড বিনা-দ্বন্দ্বে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান স্বেচ্ছায় নামাইয়া রাখিলেন, উপযুক্ত ভ্রাতা নিজের নিরুদ্বিগ্ন শান্তিময় সহজ জীবন-ধারা পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্ব্ববৃহৎ দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইলেন।

১৪ই ডিসেম্বর বিঘোষিত হইল যে, ডিউক্ অফ ইয়র্ক সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

আমাদের নূতন সম্রাট্ পুরাদস্তর এই বিংশ শতাব্দীর সন্তান। তিনি এই শতাব্দীর চেয়ে মাত্র চার বছরের বড়। অথবা বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ জন্মগত অধিকারে আলবার্ট ফ্রেডারিক আর্থার জর্জ্জ—ইহাই হইল তাঁহার পূরা নাম—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম পুরুষ—কিন্তু নিজের প্রতিভায় এবং সাধনায় তিনি তাহার আগেই, সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অন্যতম সর্ব্বপ্রিয় লোকের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই বিংশ-শতাব্দীর সন্তানরূপে, এই অপরূপ যুগের সমস্ত ভাব-ঐশ্বর্য্য, অভিজ্ঞতা, তিনি দিনের পর দিন, সাধনায় আত্মস্থ করিয়াছেন, অর্জ্জন করিয়াছেন। এই যুগের সব

ভাবনা, সব ভাব এবং সকল ভরসার সঙ্গে তাঁহার মনের সুনিবিড় পরিচয় আছে।

তিনি একদিকে তাঁহার জন্মভূমির প্রত্যেক গিরি-নদী, উপবন, প্রত্যেক কুটীরের সঙ্গে যেমন পরিচিত, তেমনি পরিচিত তিনি এই দূর সমুদ্র-মেখলা-পরিবেষ্টিত বিশাল সাম্রাজ্যের দূর-দুরান্তর অঞ্চলের সঙ্গে। পিতার হৃদয়ের উদারতা, ব্যবহারের সহজ অমায়িকতা এবং আচরণের স্বাভাবিক সরলতার তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে বসিয়াছেন, এবং তাঁহার রাজ-জীবনের সর্ব্বোচ্চ কামনা, পিতা পঞ্চম জর্জ্জ যে-চরিত্র-গৌরবে রাজ্যের সকলের অন্তর জয় করিয়া গিয়াছেন, চরিত্র-গৌরবে এবং আত্ম-সাধনায় সেই অবিনাশী প্রীতি এবং খ্যাতি অর্জ্জন করা।

রাজকুমার রূপে তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল, সকলের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করা, যাহাদের লইয়া রাজত্ব তাহাদের সকলের প্রীতি অর্জ্জন করা। তাই তিনি ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে সমানে মিশিয়াছেন, তাহাদের খেলার সময় খেলার সাথী হইয়া, তাহাদের কাজের সময় কাজের সঙ্গী হইয়া।

তিনি জানেন এই আপাত-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কোথায় দৈন্য লুকাইয়া আছে। প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কুটীরের বেদনার তিনি প্রত্যক্ষ-দর্শী। মহাযুদ্ধের ক্রোড়ে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছেন—সাক্ষাৎ ভাবে মহাযুদ্ধের অঙ্গনে তাঁহার উন্মুখ যৌবনের দিন কাটিয়াছে।

কিন্তু তিনি তাঁহার আপনার মত নিজের জীবন গড়িয়া তুলিতেছিলেন। হঠাৎ সেই সময় একদা নিশীথে আসিল কর্ত্তব্যের নিষ্করুণ আহ্বান—শান্তিময় জীবন ত্যাগ করিয়া জগতের সব চেয়ে বিরাট, সব চেয়ে কঠিন দায়িত্ব বহন করিতে হইবে! অষ্টম এডওয়ার্ড দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া যুবরাজরূপে রাজতন্ত্রে আদর্শ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিছনে ছিল পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, পঁচিশ বৎসরের সঞ্চিত এবং উদ্বুদ্ধ প্রজা-প্রীতি, তাই অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন-আরোহণ এবং ভ্রাতার নিকট হইতে রাজ্যের সংহতির জন্য সহসা এক রাত্রির আহ্বানে সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ আর এক ব্যাপার!

কিন্তু প্রকৃত বীরের মত, প্রকৃত মানুষের মত, তিনি কর্ত্তব্যের সে আহ্বানে সাড়া দিলেন!

১২ই ডিসেম্বর সেণ্ট জেম্‌স্ প্রাসাদের সিংহাসন-কক্ষে রাজ্যের প্রতিনিধিদের সম্মুখে শাসন-ভার গ্রহণ উপলক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করিলেন,—

"আজ আমরা যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, আমাদের দেশের ইতিহাসে তাহা আর পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। আজ যখন রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব আমাকে লইতে



সম্রাজ্ঞীর কুড়ি বৎসর বয়সের ছবি। পাঁচ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের রাজকুমার ও ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়—আঠার বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় প্রথম সাক্ষাতের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল।

হইয়াছে, তখন আমি ঘোষণা করিতেছি যে, নিয়ম-তান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিবে, এবং সকল কাজের আগে আমার সর্ব্ব-প্রথম সাধনা হইবে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের পরিবারভুক্ত বিভিন্ন জাতির কল্যাণ সাধন করা। সহকর্ম্মিনীরূপে আমার পত্নীকে পার্শ্বে লইয়া এই বিরাট

কর্ত্তব্যের ভার আমি তুলিয়া লইলাম। আমার প্রত্যেক প্রজার সহানুভূতি আমার সকলের চেয়ে কাম্য।”

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর স্যান্‌ড্রিংহামের ইয়র্ক কটেজে আমাদের সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আঠারো মাস আগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ এডওয়ার্ড জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তখনও মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ড তখন প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্ এবং সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তখন ডিউক্ অফ্ ইয়র্ক। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জও তাঁহার পিতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন।

যেদিন আমাদের সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স কন্‌সার্ট এ্যালবার্টের মৃত্যু-তিথি। সেই কারণে রাজকুমারের আর এক নাম হইল এ্যালবার্ট, যুবরাজ এ্যালবার্ট। যুবরাজ এ্যালবার্টের জন্ম-গ্রহণ করার ষোল মাস পরে রাজকুমারী মেরী জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহাদের তিন ভাই-বোনের শৈশব-কাল সান্‌ড্রিংহামেই অতিবাহিত হয়। যখন রাজকুমার এ্যালবার্টের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স, সেই সময় শিশু-পুত্রকে ইংলণ্ডে রাখিয়া, অষ্ট্রে-লিয়ার ফেডারেল্ পার্লামেন্টের উদ্বোধন-কার্য্যের জন্য তাঁহার জনক-জননীকে চলিয়া যাইতে হয়। ম্যাডাম ব্রিকা নামে তাঁদের একজন গভর্ণেস্ ছিলেন। ম্যাডাম্ ব্রিকা এককালে শিশুদের জননীরও গভর্ণেস্ ছিলেন।

সাম্রাজ্য-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, পঞ্চম জর্জ্জ রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেন। বিংশ-শতাব্দীর যোগ্য নাগরিকরূপে তাঁহাদের দুইজনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য শিশু-কাল হইতে শিক্ষার যথোপযুক্ত আয়োজন করা হইল। মিঃ এইচ্. পি. হ্যান্‌সেল নামক শিক্ষকের কাছে তাঁহারা দুই ভাই একসঙ্গে শৈশবের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাধারণ ইংরাজ কিশোরদের মত প্রিন্স এ্যাল-বার্টের কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়। সান্‌ড্রিংহামের গ্রাম্য বালকের সঙ্গে ফুটবল খেলিয়া, সাঁতার কাটিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার কিশোর-কাল অতিবাহিত হয়। সপ্তম এড-ওয়ার্ড রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজকুমার বলিয়া তাঁহাদের যদি ননী পুতুল করিয়া সকলের নিকট হইতে আলাদা করিয়া সরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যে ভুল করা হইবে, তাহা সংশোধিত হইবার নয়। তিনি সে ভাবের শিক্ষায় আস্থাবান ছিলেন না। যে শিক্ষা মানুষকে সবল করে, জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে শিখায়, যাহা জীবনের সকল কর্ম্মে আনিয়া দেয় সহজ আনন্দ, সেই হইল প্রকৃত শিক্ষা। সপ্তম এডওয়ার্ড সেই পক্ষে নাবিকের শিক্ষাকে খুব মূল্য দিতেন। উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে, তরঙ্গের নিত্য সংঘাতে, প্রতিদিনের ধরা-বাঁধা কঠিন কাজে, দেহে এবং চরিত্রে একটা সহজ দৃঢ়তা আনিয়া দেয়। সেইজন্য তিনি কিশোর-কাল হইতে দুইজন রাজ-কুমারকে সেই শিক্ষা দিবার জন্য সংকল্প করিলেন। যখন যুবরাজ এ্যালবার্টের মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স, সেই সময় তাঁহাকে অসবর্ণের (Osborne) নেভাল ট্রেনিং কলেজ (Naval Training College) ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেইখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর তিনি ডার্টমাউথের কলেজে যোগদান করিলেন। সেখানে নাবিকের কাজ শিখিয়া তিনি কলিংউড (Collingwood) যুদ্ধের জাহাজে মিডশিপম্যানের চাকরী গ্রহণ করিলেন।

১৯১৫ সালে যখন মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখা লেলিহ জিহ্বায় জ্বলিয়া উঠিল, তখন প্রিন্স এ্যালবার্ট এই কলিংউড জাহাজে “মিডি”র পদে কাজ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার মাত্র উনিশ বৎসর বয়স।

এই সময় স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দু’বার তিনি বিশেষভাবে বিপন্ন হন এবং দুবারই অপারেশন করিতে হয়। প্রথমবার অপারেশনের পরই তিনি জাট্‌ল্যাণ্ডের সামুদ্রিক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চলিয়া যান এবং সেদিন অতি অন্তরঙ্গ ভাবে জগতের সর্ব্ব-বৃহৎ নৌ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন। সেই ভয়াবহ যুদ্ধে অষ্ট-প্রহর মৃত্যুরূপী গোলা-বর্ষণের মধ্যে এ্যালবার্ট যে ধীরতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নাবিকদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় একবার এক যুদ্ধের জাহাজের অফিসারকে জিজ্ঞাসা করা হয়—সেই জাহাজে তখন রাজকুমার এ্যালবার্ট ছিলেন—সেই অগ্নিবর্ষণের সময় যুবরাজ কোথায় ছিলেন?

“সেই সময় নাবিকদের কোকো পান করবার জন্য

নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজকুমার যথারীতি নাবিকদের জন্য কোকো তৈরী করছিলেন!"

দ্বিতীয়বার অপারেশনের পর ঠিক হয় যে, তাঁহার স্বাস্থ্য নাবিকের কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। তখন তিনি বিমান-বাহিনীতে যোগদান করিলেন। একদল বিমান-বাহিনীর ক্যাপ্টেনরূপে তিনি ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন। তখন মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল।

মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাকে নাইট অব দি গার্টার (Knight of the Garter) উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।

মহাযুদ্ধে তাঁহার যে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, মহাযুদ্ধের পর তিনি আবার তাহার সূচনা করিলেন। তিনি ক্যাম্‌ব্রিজের Trinity College-এ ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে তিনি আণ্ডার-গ্রাজুয়েট রূপে ইতিহাস, অর্থনীতি এবং সিভিক্স-এ শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্যাম্‌ব্রিজের আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট রূপেই তিনি ডিউক অফ ইয়র্কের উপাধিতে ভূষিত হন এবং ডিউক অফ ইয়র্ক-রূপে ১৯২০ সালে তিনি সর্ব্ব প্রথম পার্লামেণ্টের লর্ড-সভায় আসন গ্রহণ করেন।

ক্যাম্‌ব্রিজের শিক্ষা-কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামাজিক কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজার ছেলে না হইলেও, তাঁহার সামাজিক কাজের জন্য তিনি ইংলণ্ডের সমসাময়িক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার নামের সঙ্গে ইংলণ্ডের তিনটি সর্ব্বপ্রধান কল্যাণকর অনুষ্ঠানের নাম চিরদিন বিজড়িত থাকিবে, একটি হইল Industrial Welfare Society, আর একটি হইল Duke of York's Camp এবং তৃতীয়টি হইল Playing Fields Association. এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের তিনি যে মুখ্য পুরুষ তাহা নয়, এই তিনটি প্রতিষ্ঠান তাঁহার স্বতঃ-উৎসারিত প্রেরণায় প্রাণ-শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। সমাজের মেরুদণ্ড-স্বরূপ যাহারা, সেই ছেলেমেয়েদের সুখ-সুবিধার জন্যই মুখ্যত এই তিনটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

একবার Welfare Societyর তত্ত্বাবধানে কারখানা থেকে একদল ছেলেকে পনেরো দিনের ছুটিতে লণ্ডনে লইয়া আসা হয়। তাহাদের সহিত ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলের ছেলেদের এক ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতার প্রথম বল "কিক্" করেন 'ডিউক অফ ইয়র্ক'। সেই খেলা দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রথম মনে হয় যে, এই ভাবে দেশের



সম্রাট যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন বাৎসরিক 'ডিউক অব ইয়র্কস্ ক্যাম্প' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ছেলেদের লইয়া যদি অবকাশের সময় "ক্যাম্প" গড়া যায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের পরিচয়ের মধ্য দিয়া এক নূতনতর জীবনের স্বাদ পাইতে পারে। সেই চিন্তা হইতে

Duke of York's Camp-এর পত্তন হয়। প্রথম ক্যাম্পে ইংলণ্ডের একশো পাবলিক্ স্কুল এবং একশো কারখানা থেকে দু'জন দু'জন করিয়া চারশত ছেলেকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সেই চারিশত ছেলে পনেরো দিন একত্রে ক্যাম্প-জীবন যাপন করে।



অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন-ত্যাগ ও ষষ্ঠ জর্জ্জের সিংহাসনারোহণের আলোচনার সময় সম্রাট, (তখনও ডিউক অব ইয়র্ক) ব্যস্তভাবে পিকাডিলিতে নিজের গৃহে প্রবেশ করিতেছেন।

ডিউক্ অফ ইয়র্ক স্বয়ং প্রতি সপ্তাহে একদিন এবং একরাত্রি সেই ক্যাম্পে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের জীবন যাপন করেন। এই ভাবে আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ছয় হাজার ছেলে পরস্পর পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার রাজ-সুযোগ পাইয়াছে।

যখন আর্ল অফ ষ্ট্রাথমোরের কন্যা লেডী এলিজাবেথ বাওয়েস লিয়নের সঙ্গে তাঁহার শুভ-পরিণয় হয়, তখন জনসাধারণ সেই উপলক্ষ্যে ২৫ হাজার পাউণ্ডের এক ফাণ্ড গঠন করে। সেই ফাণ্ডের সমস্ত টাকা তিনি কারখানার শ্রমিকদের আনন্দবর্দ্ধন ও কল্যাণে ব্যয়িত করেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবেতে বিবাহ হয়। বিবাহের পর যখন নব-দম্পতী সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, সেই সময় নব-পরিণীতা বধূ ডেভিড লিভিংষ্টোনের কবরের পাশে যেখানে মহাযুদ্ধে নিহত নামহীন সৈনিকের স্মৃতি-স্তম্ভ আছে, সেইখানে সহসা খানিক দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁহার গলার ফুলের মালা সেই কবরে শ্রদ্ধায় নামাইয়া রাখিলেন। আজ সেই কল্যাণী নারী ইংলণ্ডের রাণী, ভারতের সম্রাজ্ঞী-রাণী এলিজাবেথ।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত তাঁহার মধ্যেও এক যাযাবর পথিক আছে। তাঁহার আফ্রিকা ভ্রমণ-কাহিনী সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য বই। আফ্রিকার বন্য পথের সমস্ত আকস্মিক ভয়ঙ্করতাকে পদে পদে অনুভব করিয়া তিনি আফ্রিকার গহনতম জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

আজ দৈব ইঙ্গিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি বীরের মত সে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার পিছনে আছে একটা সত্যকারের বলিষ্ঠ জীবন-অভিজ্ঞতা।

প্রকৃত শিক্ষা

...ভারতবাসীর ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নেতৃবর্গের বোধ থাকা সত্ত্বেও কেন ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের অনৈক্যের কারণ বহু। ঐ কারণ সব সময়ে এক রকমের থাকে না। উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। ঐ কারণসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমস্ত সময়েই কয়েকটি কারণ সাধারণ ভাবে বিদ্যমান থাকে। অনৈক্যের এই সাধারণ কারণ সমূহের (common causes) মধ্যে, "মানুষ হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, মানুষ ভারতবাসীই হউক, আর ইংরেজই হউক, আর জার্ম্মানই হউক, মানুষ যে সর্ব্বদা মানুষ এতৎসম্বন্ধে শিক্ষা ও সাহিত্যের অভাব",—এই কারণটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সকল রকমের মানুষ যে মানুষ, এই শিক্ষা যদি ছাত্রগণ তাহার পিতা, মাতা ও শিক্ষকগণের নিকট হইতে পাইতে পারিত, তাহা হইলে, আমাদের মতে ভারতবাসীর মধ্যে এত অনৈক্য থাকিতে পারিত না।...

কর্ণেল বুরকঁ্যার আত্মজীবনী

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সামরিক জীবনে প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলাম। ফ্রান্সে তাহা পরিতৃপ্তির আমার কোন সুযোগ ছিল না। কারণ সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠা যাহাদের জন্য বিশেষ করিয়া সংরক্ষিত ছিল, আমি সেই অভিজাতকুল-জাত ছিলাম না। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে সতত যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত, তাহার কয়েকটিতে আমি কর্ম্মনিরত ছিলাম। পরিশেষে আমি মারাঠা নৃপতি দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার নিয়মিত সৈন্যদলে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদ এবং তিনটি ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিলাম। যতদিন না উক্ত "কোর" (corps) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ততদিন অবধি আমি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম।

এই সকল কারণে নিজ সুনামরক্ষার জন্য উক্ত বিষম কলঙ্কজনক দুর্ঘটনায় যে আমার কোন অংশ ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি। ষড়্‌যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার একমাত্র কারণ ছিল। তাহা ছাড়া উক্ত দেশ সম্বন্ধে আমি যে জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি, আমার স্বদেশবাসিগণকে তাহা জানান আমি আবশ্যক বিবেচনা করি। তাহার কারণ এই যে, ঐ দেশের বিষয়ে তাহাদের সবিশেষ কৌতূহল হইবার কথা। কারণ, তাহাদের স্বাভাবিক শত্রু কর্ত্তৃক লব্ধ লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে উহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। আমার সামান্য কর্ম্ম-জীবনের কাহিনী এবং তাহার সহিত প্রধান প্রধান যে সকল ঘটনা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অথবা ঘটনাস্থলে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে এতদুভয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমি স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লিখিব। সেজন্য আমার সনতারিখগুলি কতকটা আনুমানিক হইবে। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে আমার কোন ভুল হইবে না; শুধু যেগুলি আমি স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারিব, সেইগুলিরই উল্লেখ করিব।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি বঙ্গদেশে আসিয়া পৌছাই। দুইমাস পরে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের অধীনে চাকুরীর সন্ধানে আমি গঙ্গাযোগে কানপুর আসি। সে সময় ইংরাজরা ফরুখাবাদে আত্মপ্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ করিতেছিল। কানপুর হইতে আমি স্থলপথে দীগে গিয়াছিলাম। সেখানে মারাঠারাজ মহাদজী সিন্ধিয়ার সেনাদল দেখিয়াছিলাম। হিন্দুস্থান জয় করিয়া বাদসাহ-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি দেশ-শাসন করিতেছিলেন। মহাদজী একজন সুদক্ষ, সাহসী, পুরাতন সৈনিক ছিলেন; আহম্মদসাহের আক্রমণ কালে তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে সময় যে ভীষণ সংগ্রামে মারাঠারা পরাজিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি একখানি পা হারাইয়াছিলেন। আমার কাহিনীর মধ্যে তাঁহার নিজের, তাঁহার উত্তরাধিকারীর, তাঁহার সৈন্যদলের যুদ্ধসমূহের ও তাহাদের অধিকৃত জনপদের গুরুত্বের একাধিক বার উল্লেখ করিতে হইবে।

লোস্তোনো নামক জনৈক ফরাসীর প্রতি তিনি পূর্ণ প্রত্যয় ন্যস্ত করিয়াছিলেন। উহাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও ধর্ম্ম-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনটি ব্যাটালিয়ন সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। লোস্তোনো তিন দিন পূর্ব্বে পের নামক একজন ফরাসীকে স্বীয় কর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে তাঁহার নাম অনেক বার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিনি আমাকেও কর্ম্ম দান করিয়াছিলেন। শীঘ্রই আমরা সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হইয়াছিলাম।

রাজপুত নামক ভারতবর্ষীয় একটি সমরপ্রিয় জাতির অধিপতি জয়পুরের রাজার বিরুদ্ধে সমর ঘোষিত হইয়াছিল। সৈন্যদল তাঁহার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। অমীমাংসিত একটি যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। রাজপুতেরা নৃপতির* মন্ত্রীকে এবং তাঁহার সাহায্যে সেনাদলের অনেকাংশকে বশীভূত করিয়াছিল। কয়েকদিন পরে নৃপতি যুদ্ধ করিতে মনস্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ৩২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য শত্রুপক্ষে

* অর্থাৎ সিন্ধিয়ার।—বুরকঁ্যা সিন্ধিয়ার উল্লেখ করিতে অনেক সময় "prince" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

যোগ দিয়াছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতার পর মহাদজী সিন্ধিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে পলায়ন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গোয়ালিয়র দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। লোস্তোনোর পদাতিক সৈন্য ভিন্ন অপর কিছু ছিল না, তিনি সিন্ধিয়ার সহগামী হইতে পারিলেন না। সেজন্য তিনি আগ্রায় গমন করিয়াছিলেন। তখনও তিনি প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এই সময় আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম।

মহাদজী সিন্ধিয়ার পলায়নের পর ইস্মাইল বেগ এবং গোলাম কাদের নামক দুইজন রোহিলা সর্দ্দার বাদসাহ শাহ আলমের আদেশে, যিনি প্রবলতমের "অনুরোধে" সদাই আদেশ দিতে তৎপর ছিলেন, হিন্দুস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঠিক যে সময়টিতে গোলাম কাদের তাহার পাশবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্ভাগ্য ক্রীড়নকের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিল, সেই সময় আবার আমি উক্ত অন্তহীন বিপ্লবের লীলাভূমে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। উক্ত বর্ব্বরোচিত ক্রূর কার্য্যের ফলে সর্ব্বত্র সঞ্জাত বিষম আতঙ্ক, তৎকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে জাঠদিগের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ এবং তাঁহার স্বদেশবাসী বামন রাওয়ের নিকট হইতে মহাদজী সিন্ধিয়ার আর্থিক সাহায্য লাভ, —এই সকল কারণে সিন্ধিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ হইয়াছিল। তিনি মীরাটে গোলাম কাদেরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। সম্রাটের উপর ঐ ব্যক্তি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিল। অধিকতর বর্ব্বরোচিত নির্দ্দয়তার সহিত তিনি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তিনি উহাকে একটি পিঞ্জরমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; একে একে তাহার নাসিকা, কর্ণযুগল, হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অবস্থায় গোলাম কাদেরকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চারিদিকে পরিভ্রমণ করাইয়া তাহার মৃতদেহ একটি নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইস্মাইল বেগ* যোধপুর-রাজের নিকট আশ্রয় লইয়াছিল। তথা হইতে বেগম হামদানী কর্ত্তৃক কনৌন্দ দুর্গরক্ষায় তাহাকে সাহায্য করিতে আহূত হইয়া ঐ ব্যক্তি তথায় বন্দীকৃত ও আগ্রায় নীত হইয়াছিল। সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে যে, মহাদজী সিন্ধিয়ার অনুপস্থিতিতে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

মহাদজী সিন্ধিয়ার প্রতি তাঁহার অনুরক্তি সত্ত্বেও লোস্তোনো ইস্মাইল বেগের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার আগ্রা অবরোধকালে তাঁহার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিজ সামান্য সেনাবলে নগর উদ্ধার তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ নিজ পরিজনবর্গকে রক্ষা করার জন্য বিজেতৃগণ প্রদত্ত সর্ত্ত গ্রহণ ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। মহাদজী সিন্ধিয়ার প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার কোপের আশঙ্কায় তিনি পেরঁর উপর সেনাদলের ভারার্পণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময় মহাদজী সিন্ধিয়া স্বীয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত হইয়া—কতকটা নিজ প্রাধান্য-রক্ষার জন্য এবং কতকটা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবার অভিপ্রায়ে—সামরিক বশ্যতা-জ্ঞান যাহাদিগকে বরাবরের মত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত রাখিবে, পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে গঠিত সেরূপ একদল সৈন্য পাইতে ইচ্ছুক হইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাকে একটি ব্রিগেড দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটীশ রেসিডেণ্ট মেজর পামারের মধ্যস্থতায় সৈন্যদলের কতকাংশকে নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করিবার উপযুক্ত মাত্র একজন অফিসর লাভ করা তাঁহার পক্ষে শুধু সম্ভব হইয়াছিল। ঐ অফিসর ছিলেন ম্যাসিয় দি বইন।

ইউরোপীয় পদ্ধতিতে দেশীয় রেগুলার সেনাদলের প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুস্থান দি বইনের নিকট ঋণী। উহারা যে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা এই ধরণের শিক্ষার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহার জন্য মহাদজী সিন্ধিয়া ইউরোপীয়দিগকে সমাদর করিতেন এবং সেনাদলের নেতৃত্ব তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক দৌলৎরাও সিন্ধিয়াকে তিনি সিংহাসন দিয়া গিয়াছিলেন।

দি বইনের ব্রিগেড শীঘ্রই গঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে লোস্তোন কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈনিকগণ, পেরঁ যাহাদের এক্ষণে নেতৃত্ব করিতেছিলেন, জন হেসিঙ্গ নামক একজন ওলন্দাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত অপর একটি দল এবং লেউতে (Layeute) নামক জনৈক ফরাসী এবং মিগুয়েল ফিলোজ নামক পর্ত্তুগীজ

* বুরকাঁ এখানে একটি ভুল করিয়াছেন। নজফকুলি খাঁর বিধবা পত্নী ইস্মাইল বেগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন।

কর্তৃক যথাক্রমে পরিগালিত দুইটি ব্যাটালিয়ন—ইহা লইয়াই ব্রিগেডটি রচিত হইয়াছিল। নৃপতির অপরাপর সৈনিকবৃন্দের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল

এই ব্রিগেড সর্ব্বপ্রথম জয়পুরাধিপতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইত, যদি না তিনি সন্ধিস্থাপন করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতেন। কিন্তু অপর একটি সমরপ্রিয় ভারতবর্ষীয় জাতি, যোধপুরের রাঠোররা, ইস্মাইল বেগকে আশ্রয় দিয়া নৃপতির সহিত মনোভঙ্গের কারণ ঘটাইয়াছিল। ইহাতে দি বইন অচিরে নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। সৈন্যদল যোধপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল এবং মের্তার রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের উপর লব্ধ বিজয়ের যে অংশ ব্রিগেডের প্রাপ্য, তাহা তৎক্ষণাৎ দি বইনের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

শীঘ্রই আবার মহাদজী এবং তুকোজীরাও হোলকর নামক অপর একজন মারাঠা নৃপতির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ডুদ্রেনেক নামক একজন ফরাসী কয়েক মাস পূর্ব্বে হোলকরের অধীনে একটি ব্রিগেড গঠন করিয়াছিলেন। লাখেরীর গিরিপথে উভয় ব্রিগেডে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং চারি ঘণ্টাব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর ডুদ্রেনেকের ব্রিগেড সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত । কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার প্রতি প্রভুর অনুকম্পার ভাব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হোলকর তাঁহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ডুদ্রেনেক তাঁহার সহিত পঞ্চাশ জনের অধিক লোক ফিরাইয়া না আনিলেও ব্রিগেডের ছয় মাসের বক্রী বেতন তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

অতঃপর দি বইন নিজ হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া অন্যত্র গমনের অনুমতি লাভ করিয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং পের‍ঁকে, যিনি মেজর-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, প্রথম ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা দিয়া গিয়াছিলেন। উহা সে সময় পুণাতে দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার সন্নিধানে কার্য্যনিরত ছিল। হিন্দুস্থান রক্ষাকার্য্যে দি বইন কর্ত্তৃক গঠিত দ্বিতীয় ব্রিগেড নিযুক্ত ছিল। উহাদের প্রথম অধ্যক্ষ ইংরাজ-জাতীয় মেজর গার্ডনারের মৃত্যুর পর কাপ্তেন সাদারলণ্ড নামক অপর একজন ইংরাজের নেতৃত্বে উহারা স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে সাদারলণ্ডের অবিচার এবং লোভের নিদর্শনস্বরূপ একটি কথার উল্লেখ করিতে আমি বাধ্য। জগুবাবু এবং লকবা দাদার চক্রান্তে সিন্ধিয়ার হিন্দুস্থানস্থ মন্ত্রী গোপাল ভাও পদচ্যুত হইয়াছিলেন এবং উঁহারা দুইজনে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধিয়া ভিন্ন তাঁহাকে অপর কাহারও হস্তে সমর্পণ করা হইবে, না এই সর্ত্তে গোপাল ভাও দি বইনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যাত্রাকালে দি বইন তাঁহাকে সাদারলণ্ড ও তাঁহার ব্রিগেডের আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জগুবাবু ও লকবা দাদা প্রদত্ত উৎকোচে বশীভূত হইয়াছিলেন এবং গোপাল ভাওকে তাঁহার বিষম শত্রুদ্বয়ের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গোপাল ভাও এবং তাঁহার স্ত্রীর যাবতীয় দ্রব্যাদি, এমন কি পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি ভিলসাতুর্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনায় আমি কোন অংশ লই নাই। হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি বেগম সমরুর ফৌজে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং ছয় বৎসর কাল তথায় ছিলাম। বেগম ভারতীয় মহিলা, তিনি জার্ম্মান জাতীয় সোম্বের বিধবা, তাঁহার স্ত্রী হইবার পূর্ব্বে ক্রীতদাসী ছিলেন। তিন ব্যাটালিয়ন সিপাহী লইয়া গঠিত তাঁহার একটি 'কোর' ছিল। তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে সর্দ্ধানা, বরোৎ, বুধানা, জেবর, টপ্পল, বাচপুর (?) এবং বর্ণানা এই কয়টি পরগণা জায়গার দেওয়া হইয়াছিল, উহাদের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টাকা। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। আমি যতদিন সেনাদলে ছিলাম, ততদিন উহারা গ্রাণ্ড আর্ম্মি হইতে প্রেরিত মারাঠা সর্দ্দারগণের আদেশানুসারে সাহারাণপুর সুবা হইতে রাজস্ব-সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। বেগম প্রথমে তাঁহার ফৌজের অধ্যক্ষতা লিয়েজ প্রদেশে জাত

কারণ লিয়েজোয়া নামে অভিহিত জনৈক অফিসরকে দিয়াছিলেন। পরে কিন্তু তিনি জর্জ্জ টমাস নামক একজন ইংরাজের, যিনি দুই বৎসর কাল যাবৎ জেবর এবং টপ্পাল জেলা শাসন করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মক্ষমতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অধিকারভুক্ত রাজ্যের শাসনভার এবং সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন। তিন বৎসর কাল আমরা তাঁহার অধীনে ছিলাম। তদনন্তর উপকারিকার বিরুদ্ধে একবার স্বাধীনতা অবলম্বনের বৃথা চেষ্টা করিবার পর তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া অনুপসহরে

গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি বামন রাওয়ের কর্ম্মে প্রবেশ করেন। তাঁহার পদে লেভাসু নিযুক্ত হইয়া ছয় মাস পরে বেগমের পাণিপীড়ন করেন। দলের পুরাতন অফিসারগণের নিকট এই বিবাহ বিষম অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, লেভাসুর বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার গর্ব্বিত চালচলন উহা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। সোম্ব্রের অপর এক পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পিতৃ-সম্পত্তিতে তাঁহার পুরাতন ক্রীতদাসীর প্রতিষ্ঠায় গভীর ভাবে বিরাগ বোধ করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি বেগমের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সুযোগ লইয়াছিল এবং ভূতপূর্ব্ব সেনানায়ক লিয়েজোয়ার সহযোগিতায় সৈন্যদলে বিদ্রোহ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। অপর চারিজন অফিসারের সহিত আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম; উহারাও আমার মত নিমকের মর্যাদা-রক্ষায় তৎপর হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা বেগম এবং তাঁহার স্বামীকে ধরিবার অভিপ্রায়ে বাচপুর হইতে সর্দ্ধানাভিমুখে অভিযান করিয়াছিল। আমাদের কারাগার হইতে কোন সুযোগে প্রেরিত পত্রাবলী হইতে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্কীকৃত হইয়া, তাঁহারা টপ্পলে আশ্রয় লওয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। চারি কোম্পানী সিপাহী পরিবৃত হইয়া তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন; উহারা তাঁহাদের রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। সর্দ্ধানা পরিত্যাগকালে তাঁহারা পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, পলায়নের চেষ্টায় ব্যাহত হইলে তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন।

তাঁহার তিন লিগও যান নাই, এমন সময় বিদ্রোহিগণের দুইজন চর একটি ঘোষণাপত্রসহ সমীপবর্ত্তী হইল। উহাতে তাঁহাদের সৈন্যগণকে তাঁহাদের ধরাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; জানান হইয়াছিল যে, অন্যথায় তাহাদের প্রতি নিতান্ত কঠোর আচরণ করা হইবে। ইহাতে ভয় পাইয়া রক্ষী সেনা তাঁহাদিগকে বন্দী করিতে সচেষ্ট হইল। বিদ্রোহের সূচনাতেই বেগম নিজ শিবিকামধ্যে স্বীয় দেহে ছুরিকা বিদ্ধ করিবার ভাণ করিলেন। তাঁহার পরিচারিকাগণের মধ্যে একজন ছুটিয়া গিয়া লেভাসুকে জানাইয়াছিল যে, বেগম প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অবমাননার পর বাঁচিয়া না থাকিবার শপথের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। হতভাগ্য অফিসর তৎক্ষণাৎ নিজ পিস্তলের দ্বারা মাথার খুলি উড়াইয়া দিলেন; অশ্ব হইতে বিগত-প্রাণ তাঁহার দেহ ধরাশায়ী হইল। এই বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ের পর বেগম তাঁহার চারি কোম্পানী সিপাহীসহ সর্দ্ধানায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। দুই দিন পরে বিদ্রোহীরাও আসিয়া উপনীত হইল। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে বেগম তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দুই মাসের বেতন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ফিকিরও ব্যর্থ হইল। যুবক সোম্ব্রু তাঁহাকে বন্দী করিয়া অপরিসর এক অন্ধকারময় কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার পর মারাঠা শক্তির মধ্যস্থতায় বেগম স্বীয় পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তরুণ সোম্ব্রু ও লিয়েজোয়াকে তাঁহার পথ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন। আমার চারিজন দুর্ভাগ্যের সাথীর সহিত আমিও বাচপুর হইতে সর্দ্ধানায় আনীত হইয়াছিলাম। তথায় উহারা আমাদিগকে নিজ নিজ আবাসে প্রহরীর তত্ত্বাবধানে থাকিতে দিয়াছিল। পরিশেষে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম এবং পরিচ্ছৎগড়ে জনৈক রাজার নিকট গিয়াছিলাম। এক কালে আমি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। তিনি স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন এবং পঞ্চশত দেহরক্ষী সওয়ার লইয়া নিজে আমাকে কোয়েলে পঁহুছাইয়া দিয়াছিলেন।

দি বইনের লক্ষ্ণৌযাত্রার পনের দিন পরে আমি কোয়েলে আসিয়া পৌছি। * তাঁহার ব্রিগেডদ্বয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হিন্দুস্থানের দুইটি জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ম্যঁসিয় পেঁদ্রর নিকট আমি আবেদন করিলাম। তিনি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আমি চারি ব্যাটালিয়ন সৈনিক, ৫০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ রোহিলা লইয়া মেবাৎ প্রদেশে শান্তিস্থাপনে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। দি বইনের যাত্রার পর তথায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই কার্য্যে আমার চারিমাস কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। অতঃপর আমি হিন্দুস্থান আক্রমণকারী একদল শিখকে বিতাড়ণ-কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমি উহাদের বিতাড়িত করিয়াছিলাম এবং উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের নিজেদের জনপদে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই সকল কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমি দ্বিতীয় ব্রিগেডে "এনসাইন"

* দি বইন ২৫শে ডিসেম্বর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। সুতরাং ৯ই জানুয়ারী ১৭৯৬ সালে বুরক্যাঁ আলিগড়ে আসিয়াছিলেন।—অনুবাদক

পদে উন্নতি হইয়াছিলাম। উহারা সে সময় সিন্ধিয়ার বন্ধু ও প্রধান সামন্ত গোয়ালিয়রের রাজা অম্বাজীকে দিবার জন্য দাতিয়া প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারগণের দুর্গসমূহ অধিকার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল।

সে যাহা হউক, মেজর পের‍ঁ পুণায় থাকিয়া ষোড়শবর্ষীয় বালক রাজার প্রাত্যহিক সান্নিধ্যের লব্ধ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অতি দ্রুত লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং সিন্ধিয়াকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাহাকে হিন্দুস্থানে তাঁহার আধিপত্য-রক্ষার ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তরুণ সিন্ধিয়াও এই বিশ্বাস মত কার্য্য করিতে আগ্রহবান্ ছিলেন, কারণ স্বীয় অবিবেচনার ফলে তিনি নিজ প্রধান প্রধান প্রজাপুঞ্জকে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ম্যঁসিয় পের‍ঁ সুবাসমূহের শাসনকর্ত্তা ও ব্রিগেড-গুলির জেনারেল নিযুক্ত হইয়া হিন্দুস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। নূতন কর্ম্মভার লইতে যাইবার জন্য পুণা ত্যাগকালে তিনি ম্যঁসিয় দ্রুজিয়ঁ নামক একজন ফরাসী সৈনিক পুরুষকে প্রথম ব্রিগেডের ভার দিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার জন্য তিনি মেজর পদও যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্তর আমি দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহীসহ মারাঠা সর্দ্দার গোলাপরাও কাদমকে (?) যে রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন, তাহা সংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম। সিন্ধিয়ার পুণাস্থ মন্ত্রী ভাওবক্সী সিন্ধিয়ার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতেছেন সন্দেহে সেই সময় নিগড়াবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ ব্যক্তিদ্বয় জগুবাবু এবং লকবা দাদাও হিন্দুস্থানে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু লকবা দাদা তাঁহার প্রহরী মারাঠা সৈনিকগণকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া জগুর সহিত পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পলায়ন দ্বিতীয় ব্রিগেডকে মথুরা যাইতে বাধ্য করিয়াছিল, তথায় তাঁহাদের কার্য্যারম্ভ আশঙ্কা করা গিয়াছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। কাপ্তেন সাদারলণ্ডের ভয় হইয়াছিল, পের‍ঁ আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহার নিকট হইতে ব্রিগেডের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে। যেহেতু আমি একমাত্র ফরাসী অফিসর ছিলাম এবং কোনরূপে একটু নাম করিয়াছিলাম, সে জন্য পের‍ঁ হয়ত তাঁহার স্থলে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা প্রণোদিত হইয়া সাদারলণ্ড আমাকে সরাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এবং তাঁহার ব্রিগেডে এযাবৎ আমাকে কোন প্রমোশন দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি আমাকে মাসিক ৪৫০৲ টাকা বেতনে স্বতন্ত্র এক ব্রিগেডে কাপ্তেন পদ দিতে চাহিলেন। তাঁহার শ্বশুর জন হেসিঙ্গ উহার অধ্যক্ষ ছিলেন; জনের পুত্র জর্জ্জ হেসিঙ্গের পরিচালনায় উহা সে সময় পুণায় অবস্থিত ছিল। আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইবার আমার কোন কারণ না থাকায় আমি তাহা গ্রহণ এবং যথাকালে আগ্রায় জন হেসিঙ্গের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ৭০০ রিক্রুটসহ দুইদিন পরে পুণায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাত্রাকালে আমি জেনারেল পের‍ঁ নিকটে আছেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা মঞ্জুর হইল না। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাও পথের মধ্যে খোয়া গেল। আমি উজ্জয়িনী হইতে পুনরায় দ্বিতীয় একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। এ খানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। ইহার উত্তর ঠিক যে সময়টিতে আমি পুণায় আমার নিতান্ত বিরাগকর কতকগুলি আদেশ-পালনে ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সময় আমি পাই। পেশোয়ার অমাত্য নানা ফড়ণাবীশের সিন্ধিয়ার সহিত বিরোধ হইয়াছিল। সিন্ধিয়া নানাকে বৈঠকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিতে অসম্মত হইলেন। পর্ত্তুগীজ জাতীয় মাইকেল ফিলোজ, যিনি সিন্ধিয়ার জন্য দুই ব্রিগেড সৈন্য গঠিত করিয়াছিলেন, শপথ করিয়া তাঁহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং ফড়ণাবীশ পরিশেষে সিন্ধিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইতে রাজী হইয়াছিলেন। ফিলোজের ব্রিগেড তাঁহাকে রক্ষা করিবার অজুহাতে সশস্ত্র অবস্থায় সজ্জিত ছিল। যেইমাত্র তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই তাহারা তাঁহাকে ধৃত করিল। এই সময় আমি আমার দুই ব্যাটালিয়ন-সহ নানার দেহরক্ষী ৩০০০ হাজার আরবকে প্রতিহত করিতেছিলাম। অচিরেই আমি উহাদিগকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিলাম। কার্য্য সমাধা হইলে পরে আমি জর্জ্জ হেসিঙ্গকে পের‍ঁর চিঠি

দেখাইয়াছিলাম; উহাতে তিনি আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে লিখিয়াছিলেন এবং আমি পুণাতে মাত্র এক পক্ষ কাল থাকিয়াই হিন্দুস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

পথিমধ্যে আমি শুনিলাম, দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার দরবারে বিষম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা বাধিয়াছে। তিনি মহাদজী সিন্ধিয়ার অন্যতম বিধবা পত্নীকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা দেশের প্রচলিত নীতি-জ্ঞানের উপর অত্যাচারস্বরূপ ছিল; তথায় সকলে এই ধরণের স্ত্রীলোকদিগকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিধবাগণ তাঁহাদের অবমাননার লজ্জাকর কথা রাষ্ট্রের পুরাতন সর্দ্দারবৃন্দের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। সৈনিকগণের মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিল। মাইকেল ফিলোজও সদলে এই দলে যোগ দিবার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজ পুত্রের নায়কত্বে ব্রিগেডদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া সত্বর বোম্বাইয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়াও তাঁহাকে অপসারিত করিতে সাহস করিলেন না; ব্যাপারটি পাছে আরও জটিল হইয়া পড়ে সেই ভয়ে নিজ মনোভাব গোপন করিতে বাধ্য হইলেন।

দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এবং তাঁহার পিতৃব্য-পত্নীগণের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রাম বাধিয়া উঠিলে উভয় পক্ষে পুণার অদূরে ৭৷৮টি খণ্ডযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। তাহাতে কোনরূপ সুস্পষ্ট ফলাফল নির্দ্ধারিত হইল না। অবশেষে উঁহারা পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কায় আশ্রয়ের নিমিত্ত হিন্দুস্থানে পলায়ন করা মনস্থ করিয়াছিলেন; তথায় জগুবাবু এবং লকবা দাদার নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা তাঁহারা করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন যশোবন্ত রাও হোলকারের আশ্রয়েরও তাঁহারা ভরসা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে উঁহারা উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যশোবন্ত রাও তখন সেখানে ছিলেন। সিন্ধিয়াও তাঁহাকে লিখিলেন যে, যদি তিনি মহারাণীগণকে বন্দী করিয়া তাঁহার করে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিবাদ মিটাইয়া লইতে ও কাশীরাও হোলকারের বিরুদ্ধে তদীয় পক্ষাবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এখানে যশোবন্ত রাও সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। নর্ম্মদাতটে ইন্দোরচোলি মহেশ্বর* নামক একটি রাজ্যের রাজা তুকোজীরাওয়ের জারজপুত্র। মৃত্যুকালে তুকোজী কাশীরাও এবং মলহররাও নামক দুইটি বৈধপুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাজ্যাধিকার লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ কাশীরাও নিজ দাবী পেশ করিবার জন্য পুণায় গিয়াছিলেন এবং সিন্ধিয়াকে স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন। তিনি মলহররাওকে অতর্কিত আক্রমণ এবং তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর প্রাণ বধ করিয়া বিবাদের সত্বর নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। যশোবন্তরাও মলহররাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। বিজেতার হস্তে নিপতিত হইয়া নাগপুরে বিরারের রাজার নিকট বন্দীভাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কাশীরাওয়ের নামে দুদ্রেনেক দুই বৎসরকাল দেশ-শাসন করেন।

তাহার পর যশোবন্তরাও বন্দীদশা হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হন এবং ইন্দোর সন্নিধানে গমন করেন। তথায় স্বল্পকাল মধ্যে তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং সকলকে দেখান যে, রাজ্যাধিকার করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। দুদ্রেনেক তাঁহার শক্তিকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া মঁ্যসিয় মার্টিন এবং লাপারেৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। এক পার্ব্বত্য পথে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া উহারা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। উহাদের পরাজয়ে যশোবন্তের সমর্থনকারীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং দুদ্রেনেক কোটাধিপতির নিকট আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিজ সৈন্যদল পুনঃ সমৃদ্ধ করিয়া যশোবন্তের উপর নিপতিত হইলেন এবং এবার তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। কিন্তু লব্ধ বিজয়ের কিরূপে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল না বলিয়া তিনি শত্রুকে, নিজেকে সামলাইয়া লইবার, এমন কি তাঁহার নিজের অনুচরবৃন্দকে ভাঙ্গাইয়া লইবার অবসর দিয়াছিলেন। ফলে তিনি যশোবন্তের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে এবং কিছুকাল পরে স্বীয় জামাতা মঁ্যসিয় প্লুমেকে প্রতিভূ রাখিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যশোবন্ত রাও যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষ হইতে আর বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহাকে প্রত্যয় করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে একটি ব্রিগেড গঠনের অনুমতি দিলেন। অতঃপর যশোবন্তের ক্ষমতা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিল এবং ইহাতে দৌলাৎরাওয়ের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল; তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে কাশীরাওয়ের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

* নর্ম্মদা তটবর্ত্তী মহেশ্বর ইন্দোর রাজ্যের পুরাতন রাজধানী। উহা সাধারণতঃ "চোলি-মহেশ্বর" নামে খ্যাত; চোলি উহা হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র সহর।

জাপানের কৃষি

—শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

শিল্প ও বাণিজ্যে অসামান্য উন্নতি করিয়া জাপান বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি এ কথাও বলা চলে যে,কোন কোন বিষয়ে জাপান পাশ্চাত্যের অনেক শিল্পপ্রধান দেশকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,জাপানে কৃষিতে আশানুরূপ আদৌ উন্নতি হয় নাই। পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা বা দুরবস্থাকে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই; বিশেষতঃ বিগত কয়েক বৎসরে অবস্থার আরও অবনতি ঘটায় উহা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, জাপানের জাতীয় জীবন হইতে কৃষিকে বাদ দিবার উপায় নাই। ইহাতে নিয়োজিত লোকসংখ্যার পরিমাণ ও অন্যান্য কারণে অর্থের দিক দিয়া কৃষির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কেবল প্রয়োজনীয়তা আছে বলিলে অতি সামান্যই বলা হইবে; বস্তুতঃ জাতির জীবনধারণ ও অগ্রগতির জন্য ইহার অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে।

জল, বায়ু, ভূমি এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপরই প্রধানতঃ কৃষির উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার কোনটিই জাপানের কৃষির পক্ষে অনুকূল নহে। উত্তরে কারাফুটো (সাখালিন দ্বীপের জাপানী অংশ) হইতে দক্ষিণে ফরমোজা পর্য্যন্ত জাপানের দৈর্ঘ্য দুই হাজার মাইলের বেশী বলিয়া উত্তর ও দক্ষিণে আবহাওয়া ও তাপের বিশেষ বৈসাদৃশ্য আছে। জাপানের বেশীর ভাগ অংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও জমির অনুর্ব্বরতা ও পর্ব্বত শ্রেণীর আধিক্যের জন্য চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহা হইলেও এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জাপানীরা তাহাদের সহজাত উদ্যমশীলতা ও কর্ম্মসহিষ্ণুতার জন্য যথাসম্ভব সর্ব্বত্রই কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

নিজ জাপানের আয়তন ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৩ শত বর্গ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার=প্রায় ⅝ মাইল)। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষের হিসাব অনুযায়ী উহার ১৫·৬% অংশ জমিতে চাষ-আবাদ হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ খুব কম, কারণ আলোচ্য বর্ষে গ্রেট বৃটেনে ২২·৩%,জর্ম্মানীতে ৪৩·৭%, ফ্রান্সে ৩৯·৪%, ইটালীতে ৪১·৪% অংশ জমিতে আবাদ হইয়াছে। এমন কি আমে



জাপান : গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ধানের চারাগুলি উঠাইয়া জলপ্লাবিত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। শরৎকালে এই ধান কাটা হয়।

রিকার যুক্ত-রাষ্ট্র, যেখানে এখনও চাষের উপযোগী প্রচুর জমি পতিত অবস্থায় আছে, সেখানেও ১৮% অংশ জমিতে আবাদ হইয়া থাকে। জাপানীরা কৃষির জন্য যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধির

সম্ভাবনা আছে। খাদ্যদ্রব্যের জন্য যাহাতে পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, সে জন্য জাপান চেষ্টা করিতেছে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে সে জন্য এক কমিশন বসে (Commission for Research into Population and Food Problems)। তাঁহাদের রিপোর্ট ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই কমিশন আশা করেন, বিশেষ আবশ্যক হইলে জাপানের আবাদী জমির পরিমাণ বর্ত্তমানের এক-তৃতীয়াংশ বাড়ান যাইতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণের শতকরা অংশ অনেক কম থাকিবে।

জাপানের জাতীয় জীবনে কৃষির বিশেষ মূল্য ও আবশ্যকতা আছে। দেশের মোট অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেকের উপজীবিকা কৃষি। সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা বা অভাব জাতির পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। অন্য দিকে কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হইলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না, কারণ কৃষকদের ক্রয়শক্তির উপর তাহা নির্ভর করে।

১৯২৯-৩৩ এই পাঁচ বৎসরে কৃষিজাত দ্রব্যের গড়পরতা বার্ষিক মূল্য ২৭০০ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের তুলনায় এই আয় অনেক কম হওয়ায় সহজেই কৃষকদের অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা অনুমান করা যায়। এই কয় বৎসরে খনি ও মৎস্য ব্যবসায়ের হিসাবে দেখা যায়, ইহাদের সমবেত মূল্য কৃষিজাত দ্রব্য অপেক্ষা কম। সাধারণ ভাবে দেখিলে শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেও, উহা হইতে উৎপাদন-মূল্য বাদ দিলে নীট মূল্যের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। জাপান হইতে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য বিদেশে বিশেষ রপ্তানী হয় না, দেশের অভাব মিটাইবার জন্যই উহা উৎপন্ন হয়।

কোন কোন স্থানে অসুবিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কম হইলেও মোটের উপর গড়ে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার কারণ, আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও চাষের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার উন্নতি। ১৯৩৩ সালের হিসাবে দেখা যায়, ধান, গম, আলু, শাকসব্জি, ফল, তুত ফলের গাছ প্রভৃতির চাষ বাড়িয়াছে। উপনিবেশসমূহেও আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া কোরিয়ায় ফলের চাষ বিশেষ বাড়িয়াছে। যাহা হউক, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলেও ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তাহার মূল্য কমিয়া আসিতেছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের হিসাবে অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যায়—ঐ বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৩০০০ মিলিয়ন ইয়েন (১ ইয়েন=২ শিলিং ৬ পেনী)। কিন্তু বর্ত্তমানে ইয়েনের মূল্য বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। এখন ১ ইয়েন আমাদের চৌদ্দ আনার সমান। এই চাষের ৪৮% অংশ ধান ও ১৭% কোকুন (গুটি পোকার আবরণ, যাহা হইতে সিল্কের সূতা বাহির হয়) হইতে পাওয়া গিয়াছে। বাকী অংশের মধ্যে গম, বার্লি ও আলুই প্রধান।

জাপানের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান ও কোকুন প্রধান এবং উৎপন্ন মালের মূল্যের কম-বেশী প্রধানতঃ ইহাদের উপরই নির্ভর করে।

রুশ-জাপানের যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানের উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ৪২ মিলিয়ন কোকু (১ কোকু=প্রায় পাঁচ বুশেল, ১ বুশেল=৮ গ্যালন) হইতে বর্ত্তমানে ৬১ মিলিয়ন কোকুতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে ফসল অনেকটা ভাল হইয়াছে—১৯৩০ সালে ৬৬·৮ মিলিয়ন কোকু এবং ১৯৩৩ সালে ৭০·৪ মিলিয়ন কোকু উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালে ঝড়, বন্যা ও অত্যধিক শীতের জন্য উৎপন্ন মালের পরিমাণ কমিয়া যায় (৫১·৮ মিলিয়ন কোকু)। তাহার পর হইতে ফসলের পরিমাণ বাড়িতেছে।

নিজ জাপানে উৎপন্ন ধানে জাপানের চলে না। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৭ সালের কাছাকাছি প্রথম অনুভূত হয় যে, উৎপন্ন ধান দেশের অভাবের পক্ষে অপ্রচুর। ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত বরাবর ধান উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে, তার পর হইতে ঘাটতি পড়িতে পড়িতে ১৯২৮-৩৪ সালের হিসাবে বার্ষিক গড়পরতা ১০ মিলিয়ন কোকু ধান ঘাটতি হইয়াছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিই ইহার কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ পূর্ব্বের তুলনায় উৎপন্ন ধানের পরিমাণ প্রচুর বাড়িলেও অভাব বাড়িতেছে। যদি কোরিয়া, ফরমোজা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি হইতে যে ধান বা চাউল আমদানী হয়, তাহা ধরা হয়, তবে জাপানের চিন্তার কারণ নাই। বরঞ্চ নিজ জাপানের কৃষকদের ভয়ের কারণ আছে, কারণ যদি এই সব চাউল বেশী আমদানী হয় ও সস্তায় বিক্রয় হয়, তবে জাপানে উৎপন্ন মালের মূল্য বাধ্য হইয়া কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে উপনিবেশসমূহ হইতে চাউল আমদানী কতকগুলি সরকারী

নিয়মের উপর নির্ভর করে। যাহা হউক, যদিও ইহা একটা সমস্যায় পরিণত হইয়াছে তথাপি আশা করা যায়, যদি উপনিবেশগুলি হইতে বর্ত্তমানের মত চাউল আমদানী হয়, তবে জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাহিদাকে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না।

ধান বাদে গম, বার্লি, রাই, সোয়াবিন প্রভৃতি শস্যাদির চাষও জাপানে হইয়া থাকে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর হইতে গম ব্যতীত অন্যান্য সব শস্যাদির চাষের পরিমাণ কমিতেছে। সরকারী রক্ষণ-নীতি ও আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধির জন্যই গম চাষের সুবিধা হইয়াছে এবং উৎপন্ন মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯ লক্ষ কোক্ হইতে ৮০ লক্ষ ৫ হাজার কোক্‌তে দাঁড়াইয়াছে। বার্লি, রাই প্রভৃতির চাহিদা ও সঙ্গে সঙ্গে চাষও কমিয়াছে। কিন্তু সোয়াবিনের যথেষ্ট চাহিদা থাকিলেও তাহার চাষ কমিতেছে এবং সে স্থানে ফল, শাকসব্জি ও গুটীপোকার খাদ্য হিসাবে তুতগাছের চাষ বাড়িতেছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে এই সমস্তের পর ফল-ফুলুরী ও শাক-সব্জিই প্রধান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে নিজ জাপানে ৩৪১ মিলিয়ন ইয়েন মূল্যের ফসল উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের ১৪% অংশ। ফল ও শাক-সব্জি, চাষের জমি ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন মালের পরিমাণ পর পর বাড়িতেছে। তাহার ফলে, বর্ত্তমানে দেশের চাহিদা মিটাইয়া, এই সব জিনিস বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে। ১৯৩১—৩৫ এই পাঁচ বৎসরে গড়-পরতা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ইয়েন মূল্যের জিনিস চালান হইয়াছে,—অবশ্য ইহার মধ্যে টিনে বোঝাই সংরক্ষিত ফল-ফুলুরী আছে। এই সময়ে, কিছু বিদেশী জিনিস আমদানী হইলেও, তাহাদের পরিমাণ অতি সামান্য, উহা দুই মিলিয়ন ইয়েনেরও কম মূল্যের।

সিল্ক প্রস্তুতের জন্য গুটিপোকার চাষ জাপানে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। গুটিপোকার চাষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশে প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ইহার বিরাট বিস্তৃতি হইয়াছে। দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে যে সব জিনিস কাঁচামাল হিসাবে শিল্পকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে কোকুনই সর্ব্বপ্রধান। গত পাঁচ বৎসরের (১৯৩১-৩৫) উৎপন্ন কোকুনের গড় মূল্য ৩১৬ মিলিয়ন ইয়েন এবং শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন অন্যান্য কৃষিজাত জিনিসের মূল্য ৮৯ মিলিয়ন ইয়েন। ইহা হইতেই সহজে গুটিপোকার চাষের বিশেষ আবশ্যকতা ও পরিমাণের প্রাচুর্য্য সহজেই উপলব্ধি হইবে। পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র কোকুনের ৭০% অংশ নিজ জাপানেই উৎপন্ন হয়, যদি ইহার সহিত কোরিয়া ও ফরমোজা ধরা হয়, তবে উৎপন্ন মালের পরিমাণ প্রায় ৭৫% অংশে গিয়া দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক কৃষি-সমিতি প্রদত্ত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের হিসাবেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে।

জাপানের জাতীয় সম্পদের দিক হইতেও গুটিপোকার চাষের বিশেষ মূল্য আছে। আধুনিক সরকারী বিবরণে দেখা যায়, জাপানে প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার এই কার্য্যে নিযুক্ত



জাপান: জল-প্রবাহের শক্তি দ্বারা আধুনিক বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র-পরিচালনার জন্য বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।

আছে। নিজ জাপানে যে সব পরিবার কৃষিকার্য্যে লিপ্ত আছে, এই সংখ্যা তাহার ৩৭% অংশ। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী বিবরণে দেখা যায়, দেশের সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের ১৩% অংশই কোকুন হইতে পাওয়া গিয়াছে। উপরের এই কয়টি উদাহরণ হইতেই জাপানে সেরিকালচারের (গুটিপোকার চাষের) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাইবে।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই সেরিকালচারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে—তাহার প্রধান কারণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অপরিষ্কৃত সিল্কের চাহিদা-বৃদ্ধি। ১৯২৫—২৯ পাঁচ বৎসরে জাপানে গড়ে বার্ষিক ৯৮ লক্ষ ২৯ হাজার কোয়ান (১ কোয়ান=৮.২৬৭১৯ পাউণ্ড) অপরিষ্কৃত সিল্ক উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপন্ন মালের ৮২% অংশ রপ্তানী হইয়াছে এবং তাহার ৯৫% অংশই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে বিশ্বব্যাপী অর্থ-সঙ্কট আরম্ভ হওয়ায় হঠাৎ আমেরিকায় জাপানী অপরিষ্কৃত সিল্কের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় জাপান বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়ে। কারণ এই সময় উৎপন্ন মালের পরিমাণ না কমিলেও মূল্যের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায়; ফলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইতে থাকে। ১৯৩৫ সালের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে—কোকুন ও অপরিষ্কৃত সিল্কের মূল্য ও রপ্তানী অনেক বাড়িয়াছে।

কোকুন বাদে দেশে শিল্পকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত উৎপন্ন কাঁচামালের পরিমাণ অতি অল্প। নিজ জাপানে কৃষি-কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত জমির মাত্র ৪% অংশে এই সব জিনিসের চাষ হইয়া থাকে। দেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর মাল আমদানী করিতে হয়। ১৯৩৫ সালে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ৭৬৮ মিলিয়ন ইয়েন। শিল্পকার্য্যে ব্যবহারের জন্য নিজ জাপানে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে তামাক, আখ, রাই, মাদুর প্রভৃতি বুনিবার জন্য ঘাস, পিপার-মেন্ট প্রভৃতি প্রধান। ইহা ব্যতীত শন, জাপানী ধরণের কাগজ প্রস্তুতের জন্য কোজো, মিৎসুমাতা প্রভৃতি গাছও উৎপন্ন হয়। দেশজাত তুলা, শন, আখ, তামাক প্রভৃতিতে জাপানের চাহিদা মিটে না। এই সব মাল প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী করাইতে হয়, তবে আখ জাপানের উপনিবেশ ফরমোজা হইতে আসে।

জাপানে বয়ন-শিল্পের জন্য যে কাঁচামাল উৎপন্ন হয়, তাহার পরিবাণ অতি সামান্যই। ১৯৩১—৩৫ পাঁচ বৎসরে মাত্র ১,৪২,০০০ ইয়েন মূল্যের তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। উপ-নিবেশ সমূহ হইতে যে সব কৃষিজাত দ্রব্য জাপানে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ এখনও অতি নগণ্য—মাত্র কোরিয়া হইতে আমদানী তুলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত পাঁচ বৎসরে কোরিয়ায় ১৭'৪° মিলিয়ন ইয়েন মূল্যের তুলা উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা হইতে ৭ মিলিয়ন ইয়েন মূল্যের তুলা জাপানে আসিয়াছে।

জাপানী কৃষকের আয়ের প্রধান উপায় চাষ-বাস, বিশেষতঃ ধানের চাষ। তবে কয়েক লক্ষ কৃষক সমুদ্রের উপকূলে অবসর সময়ে মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে। এই প্রকারেও তাহারা বৎসরে কিছু কিছু উপায় করিয়া থাকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সরকারী কৃষি ও বন-বিভাগের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, সে বৎসরে জাপানী কৃষকদের গড়ে আয় হইয়াছিল ৯৮৫ ইয়েন। ইহার মধ্যে ৫২% অংশ ধানের চাষ হইতে, ১৫% অংশ সেরিকালচার হইতে, ১৬% অংশ অন্যান্য চাষ হইতে এবং বাকী ১৭% অংশ আয় কৃষি ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে হইয়াছে। এই অন্যান্য উপায়ের মধ্যে উল্লিখিত মৎস্য ব্যবসায় একটি প্রধান। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই আয় সামান্য বেশী হইলেও, ১৯২৫ সালের তুলনায় ইহা অনেক কম। আলোচ্য বর্ষে কৃষকদের শস্য উৎপাদনের ব্যয় গড়ে ৪২১ ইয়েন, অর্থাৎ মোট আয়ের ৪৩% অংশ পড়িয়াছে।

এই উৎপাদন-ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই ব্যয়ের ৩১'৭% অংশ খাজনা, ২২% অংশ সার, ট্যাক্স ও অন্যান্য ৯'৪%, গবাদি পশুর খাদ্য ৮'৫%, মজুর ৩'৭% এবং কর্জ্জ টাকার সুদ ৩'৪% অংশ। ক্রমে ক্রমে উৎপাদন-ব্যয় কমিতেছে সত্য, কিন্তু কৃষকের মোট আয়ের সহিত তাহার সামঞ্জস্য না থাকায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। মোট আয় হইতে উৎপাদন-ব্যয় বাদ দিলে যে টাকা লাগে তাহাই কৃষকের প্রকৃত আয় ধরিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, সম্প্রতি কৃষকের এই আয়ে সংসার চলিতেছে না। তবে কয়েক বৎসর আগের তুলনায় বর্ত্তমানে অবস্থার একটু উন্নতি হইলেও, কৃষকের আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয় নাই।

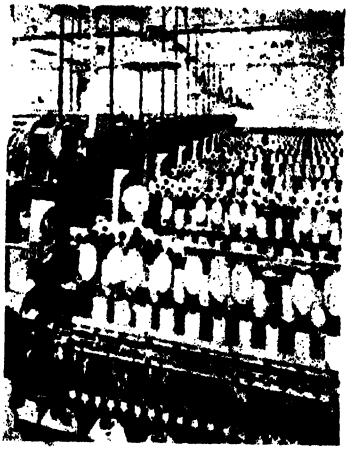
কৃষক-পরিবারের এই আয়-ব্যয়-বৈষম্যের জন্য তাহার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরকারী অর্থবিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিসাবে, এই ঋণের পরিমাণ পরিবার-প্রতি ১৩৫ ইয়েন ছিল। তাহার পর, ঋণের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সরকারী কৃষি ও বন-বিভাগের প্রদত্ত হিসাব অনুসারে, পরিবার-প্রতি তাহা প্রায় ৮৪০ ইয়েনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষকের ঋণ বৎসরে বৎসরে বাড়িতেছে এবং অনুমান হয় বর্ত্তমানে গড়ে প্রতি কৃষক পরিবারের ঋণ এক হাজার ইয়েনেরও বেশী।

বিগত কয়েক বৎসরের বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-মন্দার প্রতি-ঘাত জাপানের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুভূত হইয়াছে।

জাপানী কৃষকদের অর্থকৃচ্ছ্রতা ও কৃষি-সমস্যার একমাত্র কারণ ইহা না হইলেও, এই মন্দার দ্বারা উহা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমতির লক্ষণ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই পরিস্ফুট হয়। ১৯২৯ সালে দেখা যায়, জাপানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান ও কোকুনের মূল্য যথাক্রমে ৩০% ও ৩৭% কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩০ সালেই কৃষকদের দুরবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। এই সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক দুরবস্থা ও ব্যবসায়-মন্দার জন্য কোকুনের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায়, হঠাৎ জাপানী বসন্তকালীন কোকুনের মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়। এই সময় উৎপন্ন কোকুনের পরিমাণ খুব বেশী হইলেও, মূল্য-কমতির জন্য কৃষকদের টাকার পরিমাণ কমই হইয়াছে। ইহার পর, গ্রীষ্মকালীন ও শরৎকালীন কোকুনের মূল্য ও সঙ্গে সঙ্গে গম, ফুল, শাকসব্জি প্রভৃতির মূল্যও কমিতে থাকে। উৎপন্ন মালের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য ধানের দিক দিয়াও কৃষকদের কোন সুবিধা হয় নাই। ইহার ফলে, আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের মোট মূল্য ৫৪% কমিয়া যায় এবং কৃষকদের অর্থকৃচ্ছ্রতা ও দুরবস্থার অবধি থাকে না।

ইহার পরে, কৃষকদের অবস্থার একটু উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ১৯৩৪ সালে কোকুনের মূল্য আবার অসম্ভব রকম কমিয়া যায়। এই বৎসর ধানের দাম কিছু বাড়ে বটে, কিন্তু, বন্যা ও ঝড় প্রভৃতির জন্য উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অল্প হওয়ায় কৃষকদের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। ১৯৩৫ সালেও ফসল বিশেষ ভাল হয় নাই, কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্য কৃষকদের হাতে কিছু বেশী টাকা আসে। টোকিও হইতে প্রকাশিত 'মান্থলি সারকুলার' নামক মাসিকের ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ সংখ্যায় দেখা যায়, ১৯৩৬ সালে ধান ও কোকুন দুই ফসলই বেশ ভাল হইয়াছে। নিজ জাপানে, আলোচ্য বর্ষে ৬ কোটী ৭৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৭২৩ কোকু ধান উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহা ১৭·২% বেশী, কোরিয়া ও ফরমোজাতেও পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা ভাল ফসল হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৮ কোটী ৬৬ লক্ষ ৭ হাজার ২৮১ ইয়েন মূল্যের কোকুন উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উৎপন্ন মালের পরিমাণ মাত্র ১% বেশী হইলেও, মূল্যের পরিমাণ ১০·২% বেশী হইয়াছে। ১৯৩২-৩৬ পাঁচ বৎসরের গড় হিসাব করিলে, উৎপন্ন মালের পরিমাণ ৯·৩% কমিলেও মূল্যের পরিমাণ ১৮·৮% বাড়িয়াছে। সুতরাং উপরের এই হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯৩১ সালে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক ভাল গিয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের একটা সংক্ষিপ্ত আমদানী-রপ্তানীর হিসাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাঁটী কৃষিজাত জিনিসের রপ্তানী-মূল্যের পরিমাণ খুব বেশী নয়, গত কয়েক বৎসরে উহা ৫০ হইতে ৭০ মিলিয়ন ইয়েনের মধ্যে উঠা-নামা করিয়াছে। তবে যদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত জিনিষপত্র ধরা হয়, তবে রপ্তানী-মূল্যের পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে উহা ৫৯৩ মিলিয়ন ইয়েনে উঠিয়াছে। এইরূপ জিনিসের মধ্যে অপরিষ্কৃত সিল্ক, ময়দা, চিনি, চা ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রধান। এই রপ্তানী জিনিষের মধ্যে কিছু কিছু বিদেশাগত কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত। কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ রপ্তানী অপেক্ষা বেশী—১৯৩৫ সালের পরিমাণ ১২৩২ মিলিয়ন ইয়েন। আমদানী জিনিষের মধ্যে অপরিষ্কৃত তুলা ও পশমই প্রধান—তবে ইহা ব্যতীত গম, সোয়াবিন, গবাদি পশুর খাদ্য, খইল, শস্যের বীজের পরিমাণও কম নয়।



তুলাজাত সূতা প্রস্তুতের মিলের একাংশের দৃশ্য।

উপরের বিবরণ হইতে জাপানের কৃষি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারিবে।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বনমালা

[১]

পরদিন অতি প্রত্যুষে দর্পনারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে শয্যার উপরে জাগিয়া দেখিল বনমালা তখনও ঘুমাইতেছে। অনেক দিনের পরে তাহার মনের উপর হইতে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নামিয়া গেল, সে ভারি হাল্কা অনুভব করিতে লাগিল। বনমালাকে বিবাহ করিবার পর হইতে একটা চাপা আতঙ্ক তাহার মনকে চাপিয়া ধরিয়াছিল; উদয়নারায়ণ কি বলিবেন ইহাই ছিল তাহার স্বপ্নের সমস্যা, জাগরণের দুশ্চিন্তা। এখন তাহার সমাধান হইয়া গিয়াছে। যে-অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহা সুখকর নয়, কিন্তু স্বস্তিদায়ক; তাহা দুঃখ, কিন্তু দুঃখের চিন্তা নয়; আমরা দুঃখের চিন্তাকে ভয় করি, দুঃখকে নয়।

সে বজরার ছাদের উপরে আসিয়া বসিল। শীতের কুয়াশা তখনও নদীর উপরে ও দুই তীরের মাঠের উপরে অতি সূক্ষ্ম মলমলের থানের মত বিলম্বিত; নদীর জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কলধ্বনিই তাহার অস্তিত্বের যেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুই পাশের তীরে কুয়াশার মলমল বিদীর্ণ করিবার জন্য সূর্য্যের ভূমিশায়ী রশ্মিরেখা চেষ্টা করিতেছে; আশে পাশের গাছ-পালার অস্পষ্ট আকার আলো-ভীরু প্রেতাত্মার মত শঙ্কিত ভাবে কাঁপিতেছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্পনারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জল-কণায় আর্দ্র হইয়া গেল।

সূর্য্যের কিরণ প্রখরতর হইয়া উঠিল; কুয়াশার মলমল অপসারিত হইতে হইতে দিগন্তের ধারে গিয়া ঠেকিল; দুই তীরে তীব্র পীতবর্ণ সরিষার ক্ষেত প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সরিষার ক্ষেতের মদির গন্ধে বাতাস মন্থর, বজরা ভাসিয়াই চলিয়াছে, দুই তীরের মাঠে কখন বা ছোলার কচি ক্ষেত, কখন কচি মশুরের, কখন বা কচি আখের; শস্যের শ্যামলবর্ণ শিশিরের শুভ্র প্রলেপে ম্লানতর; নদীতে তরঙ্গ নাই; মাঠে লোক-জন নাই; আকাশে মেঘ নাই, বাতাস যেন এখন নিদ্রিত। সমস্তটা মিলিয়া দর্পনারায়ণের কাছে একটা স্বপ্ন-জগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল; তাহার মনে হইল পৌরাণিক কবিরা যে উর্ব্বশীর কল্পনা করিয়াছেন, তাহার মূলে ছিল এমনি একটি শীত-প্রভাতের মূর্ত্তি। উর্ব্বশীর মত ইহা চির প্রাচীন, বয়োলেখাহীন, চিরযৌবনময়ী; উর্ব্বশীর মুখের সদ্যোজাত সৌকুমার্য্য যেন অতাপচিহ্নিত ধরণীর মুখচ্ছবি হইতেই পাওয়া। এই ধরিত্রী মানবের আদিমতম শিশুর কাছে যেমন নবীনা মনে হইয়াছিল, আমাদের কাছেও তেমনি করিয়া প্রতিভাত; ধরিত্রীই উর্ব্বশী; আমাদের গৃহ-প্রান্তের ক্ষুদ্র উদ্যানই গল্পে শোনা নন্দন-কানন।

[২]

ক্রমে মাঝি-মাল্লারা জাগিয়া উঠিল, দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দিকে ডাকিয়া পাঠাইল। আলিবর্দ্দি আসিলে দর্পনারায়ণ বলিল—আলিবর্দ্দি রাগ করে ত চলে এলাম। কোথায় যাব সে জন্য ভাবি না, যতদিন বজরাখানা আছে না হয় নদীতে নদীতেই ঘুরে বেড়াব। কিন্তু টাকা-পয়সা যে ফুরিয়ে গেল রে!

আলিবর্দ্দি বলিল—টাকা পয়সা-ই না হয় ফুরাল, কিন্তু জমিদারি ত আছে।

দর্পনারায়ণ খানিকটা অনুমান করিয়া বলিল—তা আছে!

আলিবর্দ্দি বলিল—তবে আবার কি! জমিদারি আছে, তুমিও আছ, তবেই হ'ল! এই বজরাই আমাদের কাছারী। অনেক দিন ত জমিদারি দেখতে কেউ যায় নি। কর্ত্তা ত ও কাজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মনে কর না কেন, তুমি সেই জন্য বেরিয়েছ।

প্রস্তাবটা দর্পনারায়ণের মন্দ লাগিল না; কিন্তু কর্ত্তা দাদার ভীতিটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। আলিবর্দ্দি তাহা বুঝিল; কিন্তু সে বিষয়ে তর্ক তুলিল না; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা সে বুঝিয়াছে যে, তর্কে কখন মীমাংসা হয় না; চরম মীমাংসা কাজ! তর্কের অপেক্ষা

কাজ অনেক সহজ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে কাজকেই ভয় করে।

সকালের দিকেই দর্পনারায়ণের বজরা চররুইমারিতে লাগিল। আলিবর্দ্দি গ্রামের মধ্যে খবর দিবার জন্য নামিয়া গেল।

চররুইমারির একটু ইতিহাস আছে। এই গ্রামখানি চৌধুরীদের খুব বেশি দিনের নয়; টাকা-পয়সা দিয়াও কেনা হয় নাই। দর্পনারায়ণের পিতা কন্দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দিই এক সময়ে লাঠির জোরে ইহা দখল করিয়াছিল; তখন গ্রামখানা নগণ্য ছিল; তারপরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে; চৌধুরীদের কৃপায় ও শাসনে চররুইমারি আজ বড় হইয়াছে, লাভের সম্পত্তি হইয়াছে।

আলিবর্দ্দির নিকটে খবর পাইয়া গ্রামের প্রধানেরা আনন্দিত হইয়া উঠিল, নিজেদের অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করিল; সেকালে জমিদার গ্রামে আসিলে প্রজারা খুসি হইত; বিশেষ কন্দর্পনারায়ণকে তাহারা ভয় করিত কাজেই ভক্তিও করিত, তাঁহার লাঠির জোর তখন অনেকের মনে ছিল, তাঁহারই পুত্র আসিয়াছে, ভবিষ্যৎ জমিদার, খুসী হইবারই কথা। গ্রামের প্রধানেরা প্রচুর পরিমাণে নজর লইয়া বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত লোক ঘাটে আসিয়া ভিড় করিল। সকলেই সাধ্যমত কিছু কিছু ভেট আনিয়াছে। গোয়ালা দই, ক্ষীর, ঘি আনিল; জেলে টাটকা-ধরা মাছ আনিল; ময়রা সন্দেশ আনিল; চাষীরা তরিতরকারি আনিল,—বেগুন, মূলা, কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে; নানা রকমের শাক; রুইগঞ্জের বিখ্যাত তাঁতীরা ধুতি, চাদর, শাড়ীর ভেট আনিল; দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বজরা নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া গেল; মাঝিরা বাবুকে বলিল যে, আর অধিক জিনিষ চাপিলে নৌকা চলিবে না।

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হইলে গ্রামের প্রধান বদর মণ্ডল বলিল—দাদাবাবু কোন্ দুঃখে আপনি নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াবেন! তার চেয়ে রুইমারিতে বাস করেন আমরা সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি! কর্ত্তার আর কতদিন।

সে আলিবর্দ্দির নিকট হইতে সব ঘটনা শুনিয়াছে।

প্রজাদের আনুকূল্যে ও শ্রদ্ধায় দর্পনারায়ণের মন ভিজিল বটে, কিন্তু সে তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইতে পারিল না। সে বলিল—তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে, কিন্তু রুইমারিতে থাকতে পারব না; যদি এ গাঁয়ে থাকি, তবে আবার অন্য গাঁয়ের লোকেরা অসন্তুষ্ট হবে। তার চেয়ে আমি বজরা করে সব গাঁগুলো দেখে বেড়াব, কেউ রাগ করতে পারবে না।

দর্পনারায়ণের যুক্তি সকলে স্বীকার করিল

বদর বলিল—দাদাবাবু, আমাদের গ্রামে থাকলেন না, কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে! পৌষ কিস্তির খাজনার সময় হয়েছে, এ কিস্তির খাজনা আমরা আপনাকেই দেব।

দর্পনারায়ণ বলিল—কিন্তু শেষে কি তোমরা দ্বিগুণ দেবে! আমাকে যদি খাজনা দাও, কাছারীতে দেবে কি?

বদর বলিল—হিসাব! দাদাবাবু গ্রামের আমিই তশীলদার। খাজনা আপনাকে দিলাম—হিসাব রইল; কাছারীতে এই মাসের শেষে গিয়ে হিসাব দিয়ে আসব। বুড়ো মানুষের টাকা ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার মেহনৎ-টা বাঁচল!

উদয়নারায়ণের কথা স্মরণ করিয়া দর্পনারায়ণের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কিন্তু—

বদর তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—কিন্তু আমরা বুঝব।

বিকালের দিকে প্রজারা গ্রামে ফিরিয়া গেল; তাহারা জমিদারকে রাখিতে পারিল না বটে, কিন্তু আজকার দিনটা তাহাদের একটা স্মরণীয় তারিখ হইয়া রহিল।

রাত্রে আহারাদির পরে বজরা খুলিয়া দেওয়া হইল; বর্ত্তমানের মত দর্পনারায়ণের অর্থাভাব মিটিল।

রাত্রে শুইতে গিয়া দর্পনারায়ণ দেখিল বনমালা কাঁদিতেছে। দর্পনারায়ণ অনেক সাধাসাধি করিবার পরে বনমালা বলিল—আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট!

সে বলিল—কষ্ট তা কি করে জানলে।

—ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছ!

—ভেসে বেড়াচ্ছি সে কথা ঠিক। কিন্তু ভেসে বেড়াবার চেয়ে যে ডুবে মরা বেশী সুখের তা কে বলল!

উত্তর শুনিয়া বনমালা হাসিয়া ফেলিল—বলিল—যাও।

ক'দিন আগেও বনমালা দর্পনারায়ণকে আপনি বলিত। সে কত সাধিত, বলিত, স্বামীকে আপনি বলা ভাল দেখায় না, আপনি বলিলে পর মনে করা হয়, কিন্তু বনমালা তখন রাজী

হয় নাই। তারপরে কখন কি ঘটিল, বনমালা নিজের অজ্ঞাতসারে স্বামীকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বনমালা বলিল—আমাকে বিয়ে করাতেই কর্ত্তার রাগ হয়েছে।

দর্পনারায়ণ তাহার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইতে সরাইতে বলিল—কিন্তু তোমাকে দেখলে তাঁর রাগ কখনও থাকবে না।

—ইস্ কি করে বুঝলে!

দর্পনারায়ণ বালিশটা দোভাঁজ করিয়া তার উপরে মাথা রাখিয়া বলিল—নিজেকে দিয়েই বুঝেছি।

—তোমার কথা ছাড়; তুমি যাকে দেখ তাকেই তোমার ভাল লাগে!

দর্পনারায়ণ বুঝিল বনমালা ইন্দ্রাণীর কথা ভাবিতেছে। সে ইন্দ্রাণীর ঘটনা আদ্যন্ত তাহাকে বলিয়াছিল।

সে বলিল—সে কথা সত্যি! কিন্তু আরও ভাল না পেলে কেউ ভালকে ছাড়ে?

বনমালা বালিশে মুখ গুঁজিয়া বলিল—না, তোমাদের বিশ্বাস নাই।

ইহা বনমালার কথা নয়, পুরুষ জাতির প্রতি নারী জাতির উক্তি।

বনমালা ভাবিতে লাগিল, অনেকবার ভাবিয়াছে—সে নিশ্চয় ইন্দ্রাণীর চেয়ে সুন্দর, নতুবা দর্পনারায়ণ তাহাকে বিবাহ করিবে কেন? এই বিজয়ে ত তাহার আনন্দিত হইবার কথা! কিন্তু কেন জানি সে এই কল্পনায় নিছক আনন্দ অনুভব করিতে পারিত না; কোথা হইতে বিষাদের একটা সুর আসিয়া মিশিত। বনমালা জানিত না জীবন-উত্তরীয়ের একটা সুতা সুখের, একটা দুঃখের; সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েনে ইহার বয়ন, তাই জীবন এত বিচিত্র; জীবন সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়; ভালও নয়; মন্দও নয়; স্বর্গীয়ও নয়, নারকীয়ও নয়; ইহা বিচিত্র, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব; ইহার আর দোসর নাই। ইহার জুড়ি নাই বলিয়াই ইহাকে বুঝিয়া ওঠা কঠিন, কার সঙ্গে ইহার তুলনা করিব! স্বয়ং বিধাতাও ইহাকে সমগ্রভাবে বুঝিতে পারেন না।

বনমালার মুখ তুলিবার জন্য দর্পনারায়ণ সাধিতে লাগিল, কিন্তু সে যে সেই মুখ গুঁজিল আর নড়িল না; কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করিবার পরে সে বুঝিল বনমালা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দর্পনারায়ণ ভাবিল, শেষরাত্রে তাহার মানভঞ্জন করিতে হইবে। কি অভিনব উপায়ে তাহাকে খুসী করিবে ভাবিতে ভাবিতে দর্পনারায়ণ ঘুমাইয়া পড়িল।

[৩]

দর্পনারায়ণ প্রত্যাখ্যাত হইবার পর হইতে উদয়নারায়ণ বৈঠকখানা হইতে বাহির হওয়া বন্ধ করিল; বাড়ীর ভিতরেও কদাচিৎ যাইত; সে লোকজনের সঙ্গে দেখা করিত না: তাহার সে অট্টালিকা-কম্পনকারী হাসি আর ধ্বনিত হয় না; বৃহৎ বাড়ী ভয়ে গম্ গম্ করিতে থাকে। লোকজন মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলে; ধীরে ধীরে চলাফেরা করে; জোরে নিশ্বাস ফেলিতেও যেন লোকের ভয় করে।

ইতিপূর্ব্বে উদয়নারায়ণ কখনও আব্বরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে নাই, আর বলিবেই বা কি প্রকারে। সে ত' বোবা! কিন্তু এখন ঘন ঘন আব্বরের ডাক পড়ে! সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া আব্বারের সঙ্গে কি আনন্দ করে, কেমনভাবে আনন্দ করে লোকে বলিতে পারে না! কেবল মাঝে মাঝে লোকে ঘরের মধ্যে হইতে আব্বরের শুষ্ক হাসির ধ্বনিতরঙ্গ ও দাঁড়কাকটার কঃ কঃ শব্দ শুনিতে পায়।

দর্পনারায়ণ চলিয়া যাইবার পর হইতে উদয়নারায়ণ একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল; বৃদ্ধ বয়সে নিরাশ্রয়ভাবে মেরুদণ্ড সন্নত রাখিতে কয়জনে পারে! শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও লতার আশ্রয় নহিলে চলে না! লতার পক্ষে বিতান, বৃদ্ধের পক্ষে সন্তান!

হঠাৎ তাহার আব্বরকে মনে পড়িয়া গেল। আব্বর দর্পনারায়ণের স্নেহের পাত্র ছিল, সেই সূত্রে সে আব্বরের মধ্যে পৌত্রের একটা কোমল অংশের প্রতিচ্ছায়া যেন পাইল। বিশেষ, আব্বর মূক ও বধির। সে এমন একটা নিঃশব্দ ও নির্ব্বাক জগতের অধিবাসী যাহা অন্তিম শব্দহীন বাক্যহীন জগতের সগোত্র। উদয়নারায়ণ আজ প্রায় সেই জগতের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত, কাজেই অতি অনায়াসে যেন আব্বরের সঙ্গে সে নিজের মিল খুঁজিয়া পাইল। শিশুরাও এইরূপ একটা জগতের প্রতিবেশী; কাজেই একদা বালক দর্পনারায়ণ অত লোকের মধ্যে আব্বরকে বুঝিতে পারিয়াছিল,

আজ আবার বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ তাহাকে বুঝিতে পারিল। আব্বর একাধারে শিশু ও বৃদ্ধ।

উদয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিত—ওরে আব্বর, দর্পনারায়ণ কি আমাকে ভালবাসে?

কাকটা ডাকিয়া উঠিত কঃ কঃ; আব্বর তাহার মাথায় চড় মারিত; কাকটা থামিত। আব্বর দুইহাতে ভর করিয়া একটা ডিগবাজী খাইত; মানব-ভাষায় ডিগবাজীটাকে অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—বাসিত বইকি! আমাকেও বাসিত।

উদয়নারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিত—তবে ছেড়ে গেল কেন?

কাক-টা ডাকিয়া উঠিত কঃ কঃ; আব্বর আবার তাহাকে চড় মারিয়া থামাইয়া দিত। তারপরে দুইহাত শূন্যে তুলিয়া একবার ঘুরপাক খাইত; অর্থ এই যে আবার ফিরিবে।

এই রকম করিয়া প্রতিদিন অলৌকিক ভাষায় উভয়ের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত! অথর্ব্বের সঙ্গে অবোধের সংলাপ-ভগ্নাশ্রয়ের সঙ্গে নিরাশ্রয়ের আলাপ; মৌনের সঙ্গে চিত্ত-বিনিময়।

এমন সময় একদিন চৌধুরীবাড়ীতে চররুইমারির বৃদ্ধ তহশীলদার আসিয়া উপস্থিত হইল। দেওয়ানজীর সঙ্গে খাজনার হিসাবনিকাশ করিয়া নগদ টাকার পরিবর্ত্তে দর্পনারায়ণের সইকরা কাগজ ফেলিয়া দিল! বলিল—টাকা দাদাবাবুকে দিয়াছে; তাহাকে চালান সই করিয়া দেওয়া হোক! আদ্যন্ত শুনিয়া দেওয়ানজীর পক্ক গোফজোড়ার দুই প্রান্ত আপনা হইতেই ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কেবল একটি কথা তাহার মুখ হইতে দীর্ঘায়িত হইয়া বাহির হইল, চা-লা-ন! বৃদ্ধ তহশীলদার বলিল—আজ্ঞে, একটু তাড়াতাড়ি, এখনি আবার ফিরতে হবে—অনেকখানি পথ।

কাছারীতে একটা বিপ্লব পড়িয়া গেল! ইহা ত' নিয়ম নয়; সব টাকা কাছারীতে জমা হইবে; অন্য কেউ টাকা লইলে সরকার দায়ী হইবে না; তহশীলদার এতদিনের লোক হইয়াও যে কি করিয়া এমন কাজ করিল! ইহার জন্য সে-ই দায়ী! ও-টাকা তাহাকেই পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

এইবার তহশীলদারের বলিবার পালা! সে রুখিয়া উঠিয়া বলিল—ভাল রে ভাল! তোমরা সবাই মিলে জমিদারির যে মালিক তাকে দিলে তাড়িয়ে; আর আমরা তাকে খাজনা দিয়ে করলাম অপরাধ!

দেওয়ানজী তাহাকে উচ্চস্বরে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বলিল—আমরা কি করব! কাণ্ডখানা করলেন ত' কর্ত্তা!

তহশীলদার কণ্ঠের স্বর পূর্ব্ববৎ রাখিয়া বলিল—আমি কি কাউকে ছেড়ে কথা বল্‌ছি! আমি সব্বাইকে বলছি! অমন যদি কর, তবে চররুইমারির খাজনা এক পয়সাও আর কাছারীতে আসবে না! সব যাবে দাদাবাবুর কাছে! দেওয়ানজী তাহাকে শান্ত করিলেন; বলিলেন, আচ্ছা বাপু বেশ করেছ! এখন কর্ত্তার একটা হুকুম নেওয়া চাই।

কিন্তু মুস্কিল বাধিল ওইখানে! কে হুকুম আনিতে যাইবে?

দেওয়ানজী জমারনবিশকে বলিল; সে বলিল—আজ আমার একাদশী; একসঙ্গে দুটো বিপদ আজ আমি সহ্য করতে পারব না। তারপরে শুমারনবিশকে হুকুম হইল; শুমারনবিশের পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি ছিল; সে বলিল—দেওয়ানজী পশ্চিমের পুকুর পাড়ের জঙ্গলে একটা বাঘ এসেছে বলে শুনছি; লোকের বাছুরটা ছাগলটাও ধরছে; বরঞ্চ হুকুম করেন সেখানে যাই!

একে একে সকলকেই দেওয়ানজী সাধিল; কেহই কর্ত্তার কাছে যাইতে রাজী নয়। শেষে একজন নব নিযুক্ত কর্ম্ম-চারীকে দেওয়ানজী হুকুম করিল—তোমাকে যেতেই হবে, নইলে চাকুরী থাকবে না! সে কয়দিন মাত্র আসিয়াছে; কর্ত্তার পুরা পরিচয় পায় নাই, বিশেষ তাহার উভয়-সঙ্কট। সে অগত্যা রাজী হইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লইয়া গুটি গুটি বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইল। কাছারীর সমস্ত লোক, চৌধুরী-বাড়ীর সকলে বৈঠকখানার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল; এমন মজা দেখিবার সৌভাগ্য অনেক দিন তাহাদের হয় নাই।

ঔৎসুক্যের বশে জনতা নিশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কই তর্জ্জন গর্জ্জন ত' শোনো যায় না! তবে কি একেবারেই লোকটার হইয়া গেল না কি!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সকলে দেখিল বৈঠকখানায় দরজা ঈষৎ মুক্ত হইল; আরও একটু খুলিল—লোকটা সবেগে

বাহির হইয়া আসিল—তাহার কাঁধের উপর কর্ত্তার গায়ের দামী শালখানা; আর মুখে তাহার কর্ণস্পর্শী হাসি! ব্যাপার কি? সকলে এক নিমেষে লোকটাকে ঘিরিয়া ধরিল—খবর কি? দেওয়ানজী তাহাকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে ঘোষ, খবর কি? ঘোষ-পুত্র দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া বলিল, আজ্ঞে কাশ্মীরি শাল! তারপরে অনেক ধমক খাইয়া, অনেক ঢোক গিলিয়া সে বলিল, আজ্ঞে কর্ত্তা খবর শুনে খুসী হয়ে বলে উঠলেন, বেশ করেছে, বাপকা বেটা বটে! এই বলে তিনি গা থেকে শালখানা খুলে আমাকে বকশিস দিলেন! তারপরে সে দেওয়ানজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে আপনারা ভয় পাচ্ছিলেন কেন?

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার বাপের পুণ্যে বেঁচে গেছ—আবার ভয় পাচ্ছিলেন কেন? অদৃষ্টের বিচার-বিড়ম্বনায় দেওয়ানজীর মন যেন খারাপ হইয়া গেল; সে ক্ষুণ্ণ স্বরে তহশীলদারকে বলিল, চল হে তোমার রসিদখানা দিয়ে দিই। হতাশ জনতা রসভঙ্গজনিত দুঃখে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল; যাইতে যাইতে সকলেই একবার মানসাঙ্কে কাশ্মীরি শালখানার মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। [ক্রমশঃ

আঁধারের আহ্বানে

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

তৈলবিহীন প্রদীপে সলিতা জ্বলিছে শেষের জ্বলা,
উজ্জ্বলতম আলোক উগারে তার বক্ষের জ্বালা।
বন্ধু হে, আজ এই আলোকেতে
তোমার স্মরণ ব'য়ে বক্ষেতে
সুরু হবে মোর অমাবস্যার রজনীতে পথ চলা,—
তৈলবিহীন প্রদীপে সলিতা জ্বলিছে শেষের জ্বলা ॥

ওগো দীপালীর সঙ্গী আমার, বিদায় বিদায় তবে
এসেছে আমার দুর্ব্বার ডাক আঁধারে চলিতে হবে।
লুপ্ত তারকা সুপ্ত ইন্দু,
শুষ্ক প্রদীপে তৈল-বিন্দু,
মৌন বীণার রাগিণী আজিকে মিলনের উৎসবে,
ওগো দীপালীর সঙ্গী, আজিকে বিদায় বিদায় তবে ॥

শোন শোন প্রিয় আমার বক্ষে অতি ধীরে রাখি কান,
রক্তে আমার নাচে উল্লাসে আঁধারের আহ্বান।
অশ্রুজলের তিক্ত নেশায়
রিক্ত হাস্য আঁধারে মিশায়,
ইন্দ্রধনুর বর্ণ ধুইয়া এল অশ্রুর বান,—
সব সুর ছাপি বাজিছে বক্ষে আঁধারের আহ্বান ॥

উজ্জ্বলতম আলোকেতে আজ ভরেছি শেষের ডালা,
পদ্মের সাথে এনেছি জড়ায়ে পদ্মবীজের মালা।
লও সব লও হে আলোর সাথী,
লও হৃদয়ের সকল আরতি,
শূন্য হস্তে সুরু হোক্ আজ আঁধারের পথ চলা,—
আঁধারের তীরে ধীরে অতি ধীরে মিটুক্ জ্বালা ও জ্বলা ॥

বাঙ্গালা ভাষার বিপদ্

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভাষার যে সকল রূপান্তরের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার আভাস সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। যাহাতে এই পরিবর্ত্তনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই আসন্ন পরিবর্ত্তনকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া ভাষার স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়—তাহা আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, যাঁহাদের কার্য্যের ফলে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হইতেছে, তাঁহাদেরই উপর যে এই দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান রূপ অদূরভবিষ্যতে সম্পূর্ণ অপর একদিক হইতে আক্রান্ত হইবে, এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের সূচনা সাহিত্যে আজিও দেখা যায় নাই, কাজেই সাহিত্যিকদের এ দিক্ দিয়া সাবধান হইবারও সময় আসে নাই এবং তাঁহাদের চেষ্টা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ফলবতী হইবে, এমনও সম্ভাবনা অধিক নাই।

দুইটি ভিন্নভাষাভাষী জাতি যখন পরস্পরের নিকট-সংস্পর্শে আসে, তখন উভয় ভাষার সাহিত্যই যে শুধু পরস্পরের সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া সমৃদ্ধতর হয়, তাহা নয়, উভয় ভাষাই পরস্পরের অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ শব্দসম্ভার বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু, পরস্পরের সম্মুখীন দুইটি ভাষার মধ্যে যদি একটি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অপরটি তুলনায় অত্যধিক সবল হয়, তাহা হইলে, এই মিলন দুর্ব্বল ভাষাটির পক্ষে শক্তিবৃদ্ধির কারণ না হইয়া দুর্ব্বলতার কারণ হইতে পারে। এই দুর্ব্বলতর ভাষা আবার যে জাতির মাতৃভাষা, জাতি হিসাবে যদি তাঁহারা সুগঠিত ও শক্তিশালী না হন, মাতৃভাষা, স্বজাতি এবং নিজ কৃষ্টির গৌরব অন্তরে অন্তরে পোষণ না করেন এবং অপর পক্ষে সবলতর ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা যদি শক্তিশালী, সুপ্রতিষ্ঠিত, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন জাতি হন, তাহা হইলে, দুর্ব্বলতর ভাষার পরাজয় ও ক্ষতি আরও বেশী হয়। এই দুর্ব্বলতর ভাষার যদি আবার গঠনের যুগ শেষ হইয়া না থাকে, তাহার আভ্যন্তরীণ বিরোধ ভিতর হইতেই ঐক্যকে আঘাত করিতে থাকে, তবে বাহিরের সংস্পর্শের ফলে তাহার সংহতি আরও নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার দানা বাঁধিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের পার্থক্য এত অধিক যে, বাঙ্গালার সংস্পর্শে ইংরাজীর লাভবান হইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়াও আমরা আমাদের নিজস্বতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরেজের সহিত মিশিতে পারি নাই; নিজেদের সব কিছু বিসর্জ্জন করিয়া, আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় ইংরেজ হইয়া তবে ইংরেজের সহিত আমাদের মিশিতে হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া বলা যাইতে পারে, আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু, ইংরেজকে আমাদের সংস্পর্শে আসিতে হইলেও, আমাদের ভাষা বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সান্নিধ্যে আসিতে হয় নাই। ইংরেজ ও বাঙ্গালীদের সম্পর্কেই শুধু এই কথা সত্য নহে, ইংরেজ ও সকল ভারতবাসী বা সকল বিজয়ী ও বিজিত জাতি সম্বন্ধেই এই কথা সত্য। কাজেই, সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজী সাহিত্যকে বিজিত জাতিদের সাহিত্যের বা ইংরাজী ভাষাকে এই সকল জাতির ভাষার সংস্পর্শে আসিতে হয় নাই। তাহা হইলেও, ইংরাজী সাহিত্য পৃথিবীর সকল সাহিত্য হইতেই শ্রেষ্ঠ জিনিষ সকল সংগ্রহ করিয়াছে এবং প্রয়োজন মত নানাভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করে নাই।

কিন্তু, ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের লাভ বা ক্ষতি কতটুকু হইয়াছে, তাহা দেখা যাইতে পারে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ধরিলে, এই উভয় সাহিত্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে

বলা অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যের প্রেরণায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত। ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য আমাদের মনে যে চেতনা আনিয়া দিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়াছে ও ইহাকে উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছে।

এইরূপে যদিও ইংরাজী সাহিত্যকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টির ও উন্নতির একমাত্র কারণ বলিয়া ধরা যায়, তবুও ইংরাজী ভাষার সহিত আমাদের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক আমাদের সাহিত্যের উন্নতির পথে কতকটা বাধার সৃষ্টিও করিয়াছে।

ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা যদি আমাদের মধ্যে বর্ত্তমানের ন্যায় বহুল পরিমাণে না হইত এবং আমাদের শিক্ষিত প্রায় সকল লোকেরই বর্ত্তমানের ন্যায় ইংরাজীর সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় না ঘটিত, তবে আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাপুষ্ট মন আত্মপ্রকাশের জন্য বাধ্য হইয়া মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইত এবং তাহা সাহিত্যের সমৃদ্ধিকে নিশ্চয়ই বাড়াইয়া দিত। বাঙ্গালী লেখকেরা ইংরাজী ভাষায় যে সকল বই লিখিয়াছেন, সে সকল বই বাঙ্গালায় লেখা হইলে বাঙ্গালার সম্পদ অনেক গুণ বাড়িয়া যাইত এবং বাঙ্গালী পাঠকেরা বর্ত্তমানে যে সকল ইংরাজী বই পড়িয়া ও কিনিয়া থাকেন, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি বাঙ্গালা বই কিনিতেন ও পড়িতেন, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক ও খরিদ্দারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইত। ইহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক বেশী বই প্রকাশিত হইত, এখন যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাঁহারাও আরও বেশী লিখিবার জন্য উৎসাহিত হইতেন এবং আরও ভালভাবে লিখিবার সময়, অর্থ এবং শিক্ষার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিত। এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, দেশী ভাষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত না।

ইংরাজী ভাষার সহিত আমাদের অত্যন্ত নিকট সংস্রব অন্য দিক্ দিয়াও আমাদের ভাষার উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হইয়া আছে। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যে রাজনীতির, সমাজনীতির, অর্থনীতির নানাবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনের কিছু কিছু বই, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ছোট বড় নানা প্রবন্ধ, আলোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে। সাধারণতঃ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখিবার সময়, লেখকেরা অনেকেই যথাসাধ্য বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই শব্দের দৈন্য থাকে বলিয়া, লেখকদিগকে সব সময়েই ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়। এই সকল শব্দ নানাজনের নানাপ্রকার ত হয়ই, কাহারওটিই ভাষায় স্থায়ী ভাবে চলিতে চাহে না। এইরূপে লিখিবার সময় যদিও আমাদের কাজ কোনও প্রকারে চলিয়া যাইতেছে, তবুও ভাষার শব্দের দৈন্য ইহাতে ঘুচিতেছে না।

আমাদের সাধারণ শিক্ষা, দীক্ষা ও প্রয়োজন এখন এমন হইয়াছে যে, দশজন শিক্ষিত লোক একত্র হইলেই এ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। সভাসমিতি প্রভৃতি স্থানে বন্ধু-বান্ধবের বৈঠকে এই সব আলোচনা না করিয়া উপায় নাই। দেশের উপর দিয়া যে রাজনীতিক আন্দোলন, অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন, সামাজিক বিপ্লব চলিয়া যাইতেছে, সে সকল ব্যাপার সম্বন্ধে দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণেরও উদাসীন থাকা সম্ভব হইতেছে না। এই কারণেই সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই এ সকল বিষয় কিছু কিছু বুঝিবার ও আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

এই সকল আলোচনার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজী শব্দের সাহায্যে আমরা কাজ চালাইয়া থাকি; কখনও বা আকারে ইঙ্গিতে বা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কোনও প্রকারে কাজ চালাই। মৌখিক আলোচনার তুলনায় লিখিবার প্রয়োজন হয় কদাচিৎ এবং নূতন-সৃষ্ট সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের সহিত দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ নহে। কাজেই এই সকল শব্দ ভাষায় স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয় না। কোনও লেখক এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু লিখিতে যাইয়া যখন শব্দের দৈন্য অনুভব করেন, তখন উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক কোন শব্দ শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পান না। হয় তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বগামী কাহারও অনুসরণ করিতে হয়, না হয়, কোন শব্দ সৃষ্টি করিতে হয় বা ইংরাজী শব্দের আশ্রয় লইতে হয়।

ইংরাজী ভাষার বহুল প্রচলন যদি আমাদের মধ্যে না থাকিত, অর্থাৎ সামান্য প্রয়োজনেই আমরা ইংরাজী শব্দের সাহায্য লইতে না পারিতাম, তবে দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে শব্দ গড়িয়া লইতে হইত। কোনও সাহিত্যিক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ভাল শব্দ আমরা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইতাম। যে শব্দ এই ভাবে কথাবার্ত্তা ও আলোচনার মধ্য দিয়া চল হইয়া যাইত, পরবর্ত্তী সাহিত্যিকেরাও আর তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারিতেন না। এইরূপে সকল রকমের শব্দই এতদিনে আমাদের ভাষায় হয় সৃষ্ট হইত, নতুবা বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া ইহার অঙ্গীভূত হইয়া যাইত।

এখন যদি বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষাদানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, বা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ সকল গঠিত ও গৃহীত হয়, তবে হয় ত সাহিত্যের দিক্ দিয়া আমাদের শব্দের দৈন্য কতকটা ঘুচিবে। আমরা কিছু লিখিবার সময় এই সকল শব্দ ব্যবহার করিব এবং পড়িবার সময় এগুলির সংস্পর্শে আসিব, কিন্তু মৌখিক কথাবার্ত্তা ও আলোচনায় ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করিয়া চলিব। অর্থাৎ, আমাদের ভাষায় বর্ত্তমানের ন্যায় দ্বৈত নিয়মই চলিতে থাকিবে এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি কখনই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা হইয়া উঠিবে না।

ইংরাজী শব্দের সাহায্যে কাজ চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আমাদের ভাষায় যেমন নূতন শব্দসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং শব্দ গৃহীত ও গঠিত হইলেও যে সহসা তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি না, তাহা বলা হইল। এই শেষোক্ত সম্ভাবনার একটা প্রমাণ আমরা বর্ত্তমানের মধ্যেও পাইতে পারি। যে সকল ভাবপ্রকাশক শব্দ বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় আছে, বহুকাল ধরিয়া যাহা সদাসর্ব্বদা আমরা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, যাহা ইংরাজী-অনভিজ্ঞ সংখ্যাতীত বাঙ্গালী এখনও নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, এমন বহু কথার পরিবর্ত্তে এই সকল কথা অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে,—এমন ইংরাজী প্রতিশব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করিতেছি এবং ইহাতে এতটা অভ্যস্ত হইয়াছি যে, খাঁটি বাঙ্গালায় সাধারণ কথাবার্ত্তা বলিতেও আমরা অসুবিধা বোধ করিয়া থাকি। আমাদের আত্মগৌরব-বোধ নাই বলিয়া, নিজেদের সব কিছুকেই আমরা ছোট ও হেয় মনে করি বলিয়া, খাঁটি বাঙ্গালায় কথা বলিলে নিজেদের গৌরব ঠিক রক্ষা পাইল বলিয়া মনে করি না। সামান্য ইংরাজী শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যথাসাধ্য ইংরাজী কথা বাঙ্গালার মধ্যে মিশাইয়া নিজেদের শিক্ষা ও ভদ্রতা প্রমাণ করি। এই সকল কথা আমাদের সাহিত্যে গৃহীত হওয়া কেন বাঞ্ছনীয় নহে এবং কেনই বা সে সম্ভাবনা নাই, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অথচ আমাদের মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের সাহিত্যের ভাষাকে অপেক্ষাকৃত পর এবং দূরবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে।

একেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা আজিও ভালভাবে দানা বাঁধে নাই, তাহার উপর এই বিদেশী আক্রমণ সমস্যাকে আরও জটিল করিয়াছে। বাঙ্গালাভাষী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে, শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে ভাষার অনেক অনৈক্য রহিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ইংরাজী ভাষার অতিপ্রচলন এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

অবশ্য ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার কিছুমাত্র মিল না থাকায় কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বাঙ্গালার ক্ষতি অনেক কম হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা যদি বাঙ্গালার নিকট-জ্ঞাতি হইত, ইহা শিক্ষা করা যদি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইত, ইংরেজদের সহিত সাধারণ বাঙ্গালীর এতটা মেলামেশা থাকিত, যাহাতে পুস্তক পাঠ না করিয়াও বহু বাঙ্গালী চলনসই ইংরাজী শিখিতে পারিতেন, তাহা হইলে, এই ক্ষতি আরও অনেক বেশী হইত। বর্ত্তমানে যাহা মাত্র এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, ইংরাজী শব্দের সেই বহু ব্যবহার সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ছড়াইত এবং যাহা ভাষা হইতে বাদ দেওয়া বা সাহিত্যে গ্রহণ করা, উভয় ব্যাপারই শক্ত হইত এমন বহু শব্দ লইয়া আমাদের খুব মুস্কিলে পড়িতে হইত। অবশ্য এখনও অনেক সাধারণ ও সহজ ইংরাজী শব্দ সবশ্রেণীর বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছেন।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের নিকট হইতে আমরা অনেক পাইয়াছি, আমাদের সাহিত্যের সূচনা ও উন্নতির মূলেও ইংরাজী সাহিত্যেরই প্রেরণা রহিয়াছে। কাজেই ইংরাজীর জন্য কিছু অসুবিধা ভোগ আমাদিগকে সন্তুষ্ট চিত্তেই করিতে হইবে।

যে নূতন বিপদের উল্লেখ করা হইয়াছে, বাঙ্গালার ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার পক্ষে এই বিপদ্ হিন্দীর দিক্ হইতে আসিবে।

ভারতবর্ষের ভাষাগুলি পরস্পরের যতটা নিকটবর্ত্তী হইবে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠ হইবে। ভারতে বহু ভাষার প্রচলন থাকিলেও আর্য্যপরিবারভুক্ত পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত ভাষাগুলিতেই ভারতের অধিকাংশ লোক কথাবার্ত্তা বলেন। অন্য ভাষার কথা বাদ দিলে শুধু হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষাতেই ভারতের অর্দ্ধেকের উপর লোক কথাবার্ত্তা বলেন। কাজেই এই দুই ভাষা যদি পরস্পরের খুব নিকটবর্ত্তী হয়, তবে তাহাতে অন্য দিক্ দিয়া যেমন দেশের উপকার হইবে, এই দুই ভাষারও তেমনই অনেক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। বাঙ্গালীর পক্ষে যদি হিন্দী আয়ত্ত করা আরও সহজ হয় এবং হিন্দীভাষীর পক্ষেও বাঙ্গালা শিক্ষা করা সহজতর হয়, তবে একে অপরের ভাষা অধিকতর আগ্রহের সহিত শিখিতে প্রয়াস পাইবেন। ইহাতে সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্র বাড়িবে এবং তাহার মধ্য দিয়া ভাব ও চিন্তার ঐক্য বাড়িবে।

উভয় ভাষার মিলন যদি সমানক্ষেত্রে আসিয়া হইত, তবে উভয় ভাষার পক্ষেই এই সম্ভাবিত সুবিধার বণ্টন সমান হইতে পারিত। কিন্তু, বর্ত্তমান ভারতে হিন্দীর স্থান অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলির অনেক উপরে। হিন্দী ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে বলিয়া অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দীর প্রাধান্য ও গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের সাধারণ ভাষার স্থান অধিকার করিবার দাবী যে, হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গালার কম নাই তাহা লেখক কর্ত্তৃক প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার এই দাবী থাকা সত্ত্বেও, গান্ধীজীর উপর এব গান্ধীজীর সময় কংগ্রেসের উপর হিন্দীভাষী নেতাদে অপ্রতিহত প্রভাব যে হিন্দীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সর্ব্বা পেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গান্ধীজীর নিজের মাতৃভাষা গুজরাটির সকল ভার তের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা কোন দিক্ দিয়া কো প্রকারেই ছিল না। কাজেই, এ সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী নেতাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা এবং গুজরাটির প্রতিবাসী ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভাষা হিন্দীর উপর স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকে হিন্দী বলে ও হিন্দী বুঝে এই কথা বলা হইল। এ সময় বাঙ্গালার নেতারা বাঙ্গালার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে পারিতেন। ইহা না করায় মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের যে সহজ কর্ত্তব্য ছিল, তাহা অবহেলা করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, হিন্দীভাষীর সংখ্যা যত অধিক বলিয়া বোধহয়, ইহার প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম এবং বাঙ্গালাভাষীদের অপেক্ষাও কিছু কম। যাহা হউক, বর্ত্তমানে এ সকল কথা অরণ্যে রোদন মাত্র। হিন্দীর তুলনায় বাঙ্গালার স্থান যে, অনেকটা গৌণ ও অপ্রধান করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

হিন্দীর প্রাধান্য পাইবার ও বাঙ্গলার কোণঠাসা হইয়া থাকিবার অন্য কোন কোন কারণও অবশ্য আছে, তাহার কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হইবারও আছে। বাঙ্গালাভাষীদের সংখ্যা অধিক হইলেও, ইঁহারা প্রধানতঃ বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের বাঙ্গালা ভাষার সংস্রবে আসিবার অধিক সুযোগ ঘটে নাই। যে সকল বাঙ্গালী সাধারণতঃ অন্যান্য প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজীশিক্ষিত লোক বলিয়া ইংরাজীর সাহায্যেই কাজকর্ম্ম চালাইয়াছেন, অথবা সহজেই নিজেদের কর্ম্মভূমির ভাষা শিখিয়া লইয়াছেন।

অন্য পক্ষে হিন্দীভাষী লোকেরা বিপুল উদ্যমের সহিত

তুচ্ছতম হইতে বৃহত্তম সর্ব্বপ্রকার ব্যবসাসূত্রে, শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য, সাহসসাপেক্ষ নানা প্রকার কার্য্যে ভারতের সকল প্রদেশে বহু সংখ্যায় ছড়াইয়া পড়েন। পুলিশ ও সৈন্যবিভাগের সাহায্যেও হিন্দীভাষী লোকেরা ভারতের নানা প্রদেশে যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইহাঁরা কখনও নিজ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করেন নাই; কাজেই অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাতীত লোককে হিন্দীভাষার সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, প্রত্যেক প্রদেশের লোকের মনে ক্রমে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অন্য প্রদেশবাসীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইলে হিন্দীই শিক্ষা করিতে হইবে। হিন্দীকে বহুলোকের ভাষা মনে করিবার আর একটা কারণ এই হইতে পারে যে, অহিন্দী-ভাষীরা হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য উত্তর-ভারতের সকল ভাষাকেই হিন্দী মনে করিয়া থাকেন।

উর্দ্দু সারা ভারতের মুসলমানদের সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় এবং সকল প্রদেশের মুসলমানেরাই ইহা শিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দীর সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব নিকট বলিয়া, ইহাও হিন্দীর বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য হিন্দীভাষী লোকদের হাতে থাকায়, অভারতীয় বণিকেরাও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দীই শিক্ষা করেন।

যে সকল অভারতীয় বণিক বা রাজকর্ম্মচারী এ দেশে বাস করেন, তাঁহারা এবং সকল প্রদেশের ভারতীয় ধনী লোকেরাও প্রধানতঃ হিন্দীভাষী লোকদের মধ্য হইতেই ঝি, চাকর, দারোয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করেন। ইহার মধ্য দিয়াও হিন্দীভাষা ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়াছে এবং ভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়দের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতে হইলে, হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে লোকের মনে ক্রমে এই ধারণা জন্মিয়াছে। এইরূপে ধীর ও দৃঢ়ভাবে হিন্দীভাষা সকল প্রদেশেই স্থান করিয়া লইয়াছে এবং ইহার সর্ব্বজনগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে কথা সহসা কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

এইরূপে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী অসাধারণ প্রাধান্য পাওয়ায় ইহা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার পক্ষে অনেকটা বিপদের কারণ হইবে এবং বাঙ্গালীর চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্য বাঙ্গালাভাষার পক্ষে ইহা বিশেষ বিপদ্ সৃষ্টি করিতে পারে।

স্বভাবতঃ আমরা পরের অনুকরণ করিতে চাই। পরের ভাষা বলিতে পারাকে বাহাদুরীর বিষয় বলিয়া মনে করি। অন্য ভাসা ভাল করিয়া না জানিলেও নিজেদের মাতৃভাষার সহিত স্বল্পজ্ঞাত ভাষার শব্দ মিশাইয়া গৌরব অনুভব করি। ইহার পশ্চাতে নিজেদের উপর মজ্জাগত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে; আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা যে সহসা সংশোধিত হইবে,এমন সম্ভাবনাও কম।

ইংরাজীর সংস্পর্শে আসায় ভাষার দিক্ দিয়া যে সকল ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, হিন্দীর সংস্পর্শে সেই সকল ক্ষতি আরও অনেক অধিক পরিমাণে হইতে পারে। তাহার কারণ, হিন্দী অনেক বেশী সহজে লোকে শিখিতে পারিবে এবং পুস্তক পাঠ না করিয়াও, হিন্দীভাষী লোকদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে অনেক লোকে ইহা শিখিতে পারিবে বলিয়া বড় বড় সহরে, ব্যবসার কেন্দ্রে এবং অন্যান্য স্থানেও, সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ইহা ব্যাপ্তিলাভ করিবে। ইঁহারা দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় ইহার অনেক শব্দ ব্যবহার করিবেন (এখনও করিতেছেন), এবং এই সকল শব্দের অনেকগুলির ব্যবহার তাঁহাদের মধ্যে স্থায়ী হইবে। ইহার ফলে, ভাষার গঠনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। দেশের সকল শ্রেণীর বা অধিকাংশ লোকে যদি এই সকল কথা সমভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, পরিবর্ত্তনের ফলে ভাষা শিথিল ও তাহার কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও লোকের বিশেষ অসুবিধার কারণ না হইতে পারিত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে হিন্দীভাষা প্রবেশ করিবে না, অথচ অনেক লোকের মধ্যে ইহার বহু প্রচলন হওয়ায়, সাহিত্যে ইহা প্রবেশ লাভ করিবে এবং বহু পাঠকের অসুবিধার কারণ ঘটাইবে।

ইহাতে আরও একটা ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্য যদি কখনও হিন্দী শব্দবহুল হইয়া উঠে বা বাঙ্গালা ভাষার কেন্দ্রস্থলগুলিতে মৌখিক কথাবার্ত্তায় হিন্দী শব্দ অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়,তবে বাঙ্গালা-ভাষী হিন্দীপ্রান্তবর্ত্তী লোকেরা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা

করিবেন না, তাঁহাদের লিখিত ভাষায়ও অধিক পরিমাণে এই সকল শব্দ ব্যবহার করিবেন। বেশী দিন এইরূপ হইবার পর উভয় ভাষার ভৌগোলিক সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। হিন্দী ভাষা প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া, সীমারেখা অস্পষ্ট হইলে, প্রান্তবর্ত্তী লোকেরা ক্রমে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া হিন্দীই শিখিবেন।

বাঙ্গালা এবং হিন্দী উভয় ভাষার মর্য্যাদা এক প্রকারের হইলে, উভয়ের সান্নিধ্যের ফলে উভয় ভাষাই সমান লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হইত। বাঙ্গালার মধ্যে যেমন হিন্দী ঢুকিত, হিন্দীর মধ্যেও তেমনই বাঙ্গালা প্রবেশ লাভ করিত। হিন্দীর দ্বারা বাঙ্গালা গ্রাসিত না হইয়া, উভয় ভাষাই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইত। হিন্দী ভাষা শ্রেষ্ঠ স্থান না পাইলে, বাঙ্গালীদের হিন্দী শিখার জন্য অত্যধিক ঝোঁক থাকিত না, যতটুকু থাকিত, হিন্দীভাষীদেরও বাঙ্গলা শিখিবার জন্য ততটুকু ঝোঁক অপর দিকে থাকিত। প্রান্তবর্ত্তী লোকেরা কতক যেমন হিন্দী শিখিতেন, যাঁহারা এখন হিন্দী বলেন ও শিখেন, তাঁহারা কতক আবার তেমনই বাঙ্গালাও শিখিতেন।

হিন্দী ভাষার সংস্পর্শে বাঙ্গালা ভাষায় গঠনে যে রূপান্তরের কথা বলা হইল, তাহা ছাড়া হিন্দী ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য পাইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অনেক দিকে বিশেষ ক্ষতি হইবে। তথ্যমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থাদি এই ভাষায় লিখিত হইবার সম্ভাবনা কমিবে, বহু প্রচারিত সংবাদপত্রাদি থাকিবার সম্ভাবনা কমিবে এবং আরও ছোট বড় নানা ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকিবে।



"যত বার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে………"

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

ভ্রমণ

বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী যাইবেন।

বাড়ী অনেক দূরে—পদ্মা পাড়ি দিয়া যাইতে হয়।—অবশ্য সাঁতার দিয়া নয়,—ষ্টীমারে।

বেলা আড়াইটায় ট্রেন। পূর্ব্বদিন বৈকালে সুরুচি জিনিষ-পত্র গুছাইতেছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন। বলিলেন—"বেশী কিছু নিয়ো না, বেশী কিছু নিয়ো না। রাস্তা-ঘাটে বোঝা টানতে আমি পারব না।"

সুরুচি বলিলেন—"তুমি কেন টানতে যাবে? কুলীরাই তো টানবে।"

"দেখাশোনা করতে হয় না বুঝি?"

"সে—সঙ্গে ওরা রয়েছে—ওরাই দেখবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা যা দেখে, তা আমার জানা আছে। ও সবই আমার ঘাড়ে চাপে। তোমার তো তদারক করতে হয় না, তাই মনের সাধে বোঝাই করছ। বেশী হয়—ষ্টেশনেই ফেলে রেখে যাব।"

সুরুচি বলিলেন, "এই ছোট ট্রাঙ্কটা আমার নিয়েছি। এইটা ছেলেদের তিনজনার। তোমার সুটকেশ…"

"ওতে সব ধরেছে?"

"দেখ না—" সুরুচি খুলিয়া দেখাইলেন। বলিলেন, "পাঞ্জাবী চারটে, সার্ট দুটো, গেঞ্জি চারটে, রুমাল পাঁচখানা, ধুতি আটখানা, ঢাকাই চাদর দু'খানা—"

"এতে একমাস চলবে? এই গরমের দিনে পাঞ্জাবী মোট চারটে?"

"গরদ আর মটকার দুটোও দিয়েছি।"

"তা হোক—সাদা পাঞ্জাবী আর দুটো দাও। খদ্দরের চাদরখানা দাও নি, সেই মুগা পাড়টা? আর সরু পাড়টাও দেখছি নে!—গরমের দিনে রুমাল একখানায় একদিনের বেশী চলে না। ঢাকাই ধুতি জোড়া দিয়েছ?"

"না, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরগুলোই দিয়েছি।"

"তবে তো খুব দিয়েছ! দাও—আর দু'তিনখানা ধুতি দাও। লুঙ্গী বোধ হয় একখানাও দাও নি? গেঞ্জি আর দুটো দাও, রুমালও দাও।"

যাহা যাহা দেওয়া হয় নাই—তাই দিয়া সুরুচি আর একটি সুটকেশ বোঝাই করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আয়না, চিরুণী-সাবান?"

"এই যে—" সুরুচি এটাচি কেসটা খুলিয়া দেখাইলেন। তন্মধ্যে প্রসাধন ও ঔষধাদির নানাবিধ ছোট বড় অসংখ্য শিশি ও কৌটা।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এ হয়েছে। কিন্তু গরম জামা একটাও দাও নি। বৃষ্টি হলে কি ঠাণ্ডা পড়লে গায়ে দেব কি?"

"তা দিচ্ছি।"

"তার পর কোট কই? ষ্টকিং, প্যাণ্ট, বেল্ট কিছুই তো দেখছি নে?"

"ছুটীতে যাচ্ছ—ওগুলি দিয়ে করবে কি? বাড়ীতে আপিস করবে না কি?"

"বলা যায় কি কখন কি দরকার হয়? সঙ্গে থাকা ভাল। ও সব দাও।"

এবার একটা বড় ট্রাঙ্ক হরেক রকম সুটে বোঝাই হইয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "কিন্তু রাস্তায় তো এ বাক্সগুলো খোলা হবে না, সম্পূর্ণ দুটি দিন পথে থাকা, ষ্টীমারে স্নান করব সকালে, নৌকায় স্নান করব বিকালে। দুখানা ধুতি, দুটো গেঞ্জি, একটা পাঞ্জাবী, একটা তোয়ালে আলাদা ভাবে সঙ্গে নিতে হয়। দরকার মত যেন সহজে পাওয়া যায়।"

"—তবে এই বেতের বাক্সটায় নিই।"

"তাই নাও—তোয়ালে বেশী করে কয়েক খানা নেবে। প্রায়ই তোয়ালে পাওয়া যায় না। অথচ কেনা হচ্ছে ডজনে ডজনে। ও তারের ঝুড়িটায় কি?"

"ওটায় তোমার জন্যে ফল-মূল-লেবু-মিছরী-পান।"

"আর এ বড় ডালিটায়?"

"ওটায় ষ্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম।"

"কেন—কেন, ওগুলোর জন্যে আবার আলাদা, আলাদা বোঝা কেন? টিফিন ক্যারিয়ার তো নিচ্ছই?"

"সেটায় খাবার যাবে। এগুলো না নিলে চলবে কি করে?"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "বোঝা বেড়ে যায় কত বোঝ না? অনর্থক—"

"তাই বটে, তোমার একার হলো পাঁচটা, সেগুলো বোঝা হয় নি, আর এইগুলো বোঝা হ'লো? এ দুটোই তো হ্যাণ্ডেল দেওয়া,—হাতে করে নিজেরাই নামতে উঠতে পারা যায়। এর জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। এখন জুতো ক'জোড়া নেবে বলে দাও?"

"জুতো আর কি নেব, পায়ে দিয়ে যাব—"

"সে তো এক জোড়া, স্যাণ্ডেল নেবে না? সব সময় কি পরে থাকবে?"

"তা নিলে হয়—কিন্তু অনর্থক বোঝা হয় যে—"

সুরুচি গিরিকে বলিলেন, "জুতো জোড়া কাগজে জড়িয়ে আন—একটা বাক্সে দিয়ে দিই।"

"থাম, সুট দেওয়া হলো সু' কই? সু দু'জোড়াই নিতে হচ্ছে দেখছি।"

গিরি জুতা তিন জোড়া ব্রাস করিয়া ব্রঙ্ক দিয়া আনিয়া রাখিল।

বিশ্বকর্ম্মা চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু বর্ষাকাল, হঠাৎ বৃষ্টি নেমে কাদা হয় যদি—বড় মুস্কিল হবে। রবারের জুতো জোড়া—"

"নেবে?"

"নিলে ভাল হয়। জল-কাদার দিন,—বুঝে দেখ।"

"দেখেছি বুঝে, তবে আন।"

গিরি সে জোড়াও আনিয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "খেলার জুতোটার কিন্তু নেহাৎ দরকার ছিল, কি বল—নয়? ছুটীর সময়টা খেলব বই কি!"

সুরুচি বলিলেন—"পুরনো বেতের বাক্সটায় জুতো ক' জোড়া সাজিয়ে দাও গিরি।"

বিশ্বকর্ম্মা চমকিয়া বলিলেন, "বাক্স?"

"নইলে যাবে কিসে? হাতে করে তো নেওয়া যাবে না—যা তা করে দেওয়াও চলবে না।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"অগত্যা।"

জুতা বাক্সবন্দী হইল। এখনও বাক্সে জায়গা আছে দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "দেখ যে জুতো পরে আছি, এ'তো পুরনো,—এই পায়ে দিয়েই যাব। কিন্তু নূতন পাম্পসু জোড়া আনলাম এখানেই পড়ে থাকব? ধর, কোথায়ও নিমন্ত্রণে যেতে হ'লো,—কি পায়ে দিয়ে যাব? বুঝলে না?"

সুরুচি বলিলেন—"বুঝেছি, তবে দিক।"

"বেশ গিন্নী,—বেশ—বেশ!"

"কি হ'লো আবার?"

"হ্যাট দিয়েছ?"

"তুমি দাও না,—কোন্‌টা নোব আমি কি জানি?"

দু'টি হ্যাট বাছিয়া লওয়া হইল। আপাততঃ সঙ্গেই যাইবে। দরকার হইলে মাথায় চড়িবে।

অতঃপর বিশ্বকর্ম্মা নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওঠ ওঠ, এ সব ফেলে রাখ—সকালে করা যাবে এখন।"

সুরুচি বলিলেন, "তুমি শোওগে না?"

"তুমি এই রকম কাজ করতে থাকবে আমার ঘুম হয় কি করে বল?"

"আর রসিকতায় কাজ নেই। তুমি ঘুমোলেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারি।"

শেষরাত্রে বিশ্বকর্ম্মা সকলকে ডাকিয়া তুলিলেন। সুরুচি বলিলেন, "যাব সেই দুটোয়—এখনই কি?"

"তোমার স্নান করতেই তো দশটা বেজে যাবে। তারপর অন্য কাজ আছে। ওঠ ওঠ, উঠে চট করে সব বন্দোবস্ত করে ফেল—ট্রেনে মজা করে ঘুমিয়ো এখন।"

অগত্যা সুরুচি উঠিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আরদালীকে গাড়ী ঠিক রাখিতে বলিলেন এবং বারান্দায় বসিয়া আদেশ দিয়া সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।

রাত্রি থাকিতেই রান্না চড়িল। সাড়ে সাতটার সময় বিশ্বকর্ম্মার স্নান এবং ভ্রমণোপযোগী সাজা শেষ হইল। দুই মিনিটে খাইয়া উঠিয়া সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "গাড়ী এসেছে গাড়ীতে ওঠ।"

সুরুচি পান সাজিতে বসিয়াছিলেন। বলিলেন, "কেন গো, গাড়ী দু'টোর সময় যে!"

"রাখ তোমার দু'টো। ষ্টেশনে যাওয়া—জিনিষপত্রের গতি করা—টিকিট করা কম সময়ের কাজ? শেষে ট্রেন ফেল করে গোষ্ঠীশুদ্ধ আবার ফিরে আসি। নাও, চট্ পট্ কর। ও পান টান রাখ, রাস্তায় ঢের পান পাওয়া যায়। এই কমল—তোদের হয় নি এখনো?"

কমলরা খাইয়া উঠিয়া বেশভূষা করিতেছিল। বিশ্বকর্ম্মার গলা পাইয়া তাহারা গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

বিশ্বকর্ম্মা আবার হাঁকিলেন —"এই গিরি, সুরেন, ঠাকুর।"

তাহারা খাইতে বসিয়াছিল—পাত্রস্থ অন্ন গো-গ্রাসে গিলিয়া উঠিয়া পড়িল। সুরুচিও গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিল।

ওয়েটিং-রুমে বিশ্বকর্ম্মা কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সুরুচি ইজি-চেয়ারে শয়ন করিলেন। ছেলেরা ইচ্ছামত ষ্টেশনে বেড়াইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া উঠিয়া সুরুচি দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা নাই, তাঁহার ত্যক্ত কাগজখানা কমল পড়িতেছে। সুরুচি বলিলেন, "আমাদের ট্রেন কি আজ আসবে না?"

কমল বলিল, "দেরী আছে।"

বিস্তর ট্রেন যাতায়াত করিতেছে। সুরুচি বলিলেন, "এর একখানা আমাদের দিক্ না! মাগো, কি মানুষ! ভোর রাতে সবাইকে এনে ষ্টেশনে বেঁধে রেখেছেন।"

বিশ্বকর্ম্মা দেখা দিলেন, বলিলেন, "কোন্ ক্লাশের টিকিট করব?"

সুরুচি বলিলেন, "তোমার সেকেণ্ড ক্লাশের—আমাদের সব মালগাড়ীর—"

"কেন?"

"খরচ বাঁচবে।"

বিশ্বকর্ম্মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বল—বল, সময় নেই।"

"বললাম তো, তোমার সেকেণ্ড ক্লাশ। আর আমাদের ইণ্টার—"

"তোমরা ইণ্টার কেন?"

"তাই কর। এ খরচ নিজের থেকে দিতে হবে। অনর্থক কেন টাকা নষ্ট করা?"

"তবে আমিও ইণ্টার করি।"

"না—না, শেষে তুমি খুঁত খুঁত করবে। যাও, যা বললাম, কর গিয়ে।"

আরদালী টিকিট করিতে গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "চল প্লাটফর্ম্মে।'

সুরুচি বলিলেন, "কমল বললে—'এখনো অনেক দেরী'।"

"কে বল্লে রে তোকে যে অনেক দেরি? ট্রেণের ঘণ্টা পড়ে গেল। আর তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস?"

কমল প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বকর্ম্মা কুলী ডাকিয়া জিনিষপত্র তুলিয়া সুরুচিকে লইয়া বাহির হইলেন।—বলিলেন, —"দেখেছ ভিড়? শীগগীর চল।"

প্লাটফর্ম্মে আসিবামাত্র ট্রেণ আসিয়া পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা ছুটিবার উপক্রম করিতেই আরদালী বলিল, "এ ট্রেণ নয়।"

"নয়? ঠিক জান তুমি?"

"হাঁ—হুজুর।"

ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারীর নিকট ভালরূপে জানিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা নিঃসন্দেহ হইলেন।

অতঃপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে প্লাটফরমে সকলে দগ্ধ হইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

কমল রৌদ্রে বসিয়া বিরক্ত হইয়া হাত-মুখ ধুইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"কোথায় যাস্?"

"এই—কলে।"

"কলে আবার কি দরকার পড়ল? এ দিক ও দিক যাও, এর মধ্যে ট্রেণ এসে পড়ুক—আর তোমাদের খুঁজতে ট্রেণ ফেল করি!"

কমল ফিরিয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিল। বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না। কমল বলিল—"আপনি উঠুন, আমরা সব দেখে তুলছি।"

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচিকে তুলিয়া দিয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আরদালী বিছানা পাতিয়া দিল। বিশ্বকর্ম্মা দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন,—এবং হাঁকডাক, চেঁচামেচি যথা নিয়মে চলিতে লাগিল,—"ওরে ওই যে,—ওই বেডিংটা পড়ে রইল।—ছোট—ছোটটা—তোল শীগগীর!—খাবারের বাক্সটা—কই বাক্সটা?"

কমল বলিল—"তুলেছে সেটা—"

"তুলেছিস্ না ওয়েটিং-রুমে ফেলে এসেছিস্?"

"তুলেছি—এই যে।"

"ছাতা—আমার ছাতা!—"

"আপনার গাড়ীতে দিয়েছি।"

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া দেখিলেন ছাতা ব্র্যাকেটে ঝুলিতেছে। আবার আরম্ভ করিলেন—"ওঠাস্ দেখে শুনে সব, এই ঠাকুর! তোমরা কি করছ? কুলীরাই সব তুলে দিচ্ছে, সংয়ের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ শুধু! ট্রেণ ছেড়ে দিক—থাক প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পড়ে!—যাও, যাও গাড়ীতে গিয়ে বস গে।"

ঠাকুররা গাড়ীতে গিয়া বসিল।

কুলীরা জিনিসপত্র ঠিকঠাক্ করিয়া নামিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"দে ওদের ভাড়া মিটিয়ে। নে এখন তোরা চট্‌পট্ গাড়ীতে উঠে পড়—গাড়ী ছেড়ে দেবে এখনি।"

ছেলেরা গাড়ীতে বসিয়া আর মুখ বাড়াইল না।

বিশ্বকর্ম্মার মনে হইল ওয়েটিং-রুমে নিশ্চয় কিছু পড়িয়া আছে। আসিবার সময় দেখিলেন—এত মোট—মাট্‌রী—আর ষ্টেশনে আসিয়াই কমিয়া গেল!—হয় জুতার বাক্স—নয় তো হল্‌দে ট্রাঙ্কটা—কি এটাচি কেস্‌টা—অথবা টিফিন ক্যারিয়ার—নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পড়িয়া আছে। যতই ভাবিতে লাগিলেন—ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন—ট্রেণ ছাড়িতে তখনও মিনিট দশেক দেরী,—পাঁচ মিনিটে ঘুরিয়া আসিবেন।

যেমন সঙ্কল্প—অমনি গাড়ী হইতে নামিলেন। চলিলে ওয়েটিং-রুম অভিমুখে।

সুরুচি জানালায় বসিয়াছিলেন। বলিলেন—"কোথা যাও?"

"ওয়েটিং-রুমটা দেখে আসি—কিছু পড়ে আছে কি না।"

"কিচ্ছু নেই। সব বার করে দিয়ে তবে আমি এসেছি।"

ওয়েটিং-রুমে দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিলেন। তখন ট্রেণের কাছে ভয়ানক ভিড়। হঠাৎ ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মার সামনে পড়িয়াছিল ফিমেল কামরাগুলি। সেগুলি অতিক্রম করিয়া আর ট্রেণ ধরিতে পারিলেন না। উচ্চস্বরে সুরুচিকে বলিলেন—"কোন চিন্তা ক'রো না—আমি পরের ট্রেণে আসছি।"

পরদিন ট্রেণ গোয়ালন্দে পৌছিল। সঙ্গে অনেক দেশীয় ভদ্রলোক সপরিবারে সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"চলুন ষ্টীমারে।"

সুরুচি বলিলেন—"না, যদি না আসতে পারেন? তখন ষ্টীমার থেকে নামতে পারা যাবে না,—ছেড়ে দেবার সময় হবে। কখন ট্রেণ আসবে?"

"ঘণ্টাখানেক পরে।"

সুরুচি বলিলেন—"তবে এইখানেই থাকি। উনি এলে তখন একসঙ্গে ষ্টীমারে উঠব। না এলে আজ গোয়ালন্দে থাকতে হবে।"

ষ্টীমারে যাইবার পথের ধারে দলবল সহ সুরুচি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। সহযাত্রিগণ ষ্টীমারে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে আবার ষ্টেশন হইতে যাত্রীর ভিড় ষ্টীমারের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। সুরুচি সেই দিকে চাহিয়া আছেন,—দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা আসিতেছেন।

নিকটে আসিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"এখানে কেন? ষ্টীমারে যাওনি কেন?"

সুরুচি বলিলেন—"তুমি আস কি না আস,—তাই ভেবে—"

"দেখ দেখি পাগলামী! আমি আসবই তো। চল এবার যাই। কুলী কই? এই কুলী!—নে সব তোল্—শীগ্‌গীর চল!—ষ্টীমার ফেল করবি তা না হলে।" তারপর সুরুচিকে বলিলেন—"নাও, আমার হাত ধর,—চট্‌পট্ চলে এস। এতক্ষণ ষ্টীমারে গিয়ে বসা উচিত ছিল তোমাদের। লোকে বোঝাই হয়ে গেছে দেখবে এখন।"

বিচিত্র জগৎ

কোমোডো : ড্রাগন দ্বীপ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেনিস্ পামার পৃথিবীর নানা অদ্ভুত স্থানে বেড়িয়েছেন, বিশেষ করে এমন সব স্থানে যেখানে সখের টুরিষ্টরা মোটেই যায় না। 'বিচিত্র-জগৎ'এর মধ্যে আমরা মিঃ পামারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ এর আগেও কয়েকবার দিয়েছি। এ বার ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের কোমোডো দ্বীপ ভ্রমণের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। কোমোডো দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বংশধর অতিকায় সরীসৃপ এখনও বাস করে। এরাই 'ড্রাগন লিজার্ড' নামে খ্যাত। মিঃ পামার এই অদ্ভুত সরীসৃপের সন্ধানেই ভারত সাগরের উক্ত সুদূর ও সুদুর্গম দ্বীপে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই কৌতূহলপ্রদ।



ড্রাগন বা বিরাটকায় গিরগিটি আকর্ষণ করিবার জন্য এই হরিণটি মারা হইয়াছিল। ড্রাগনেরা মাংসাশী—পচা মাংস ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

"বলীদ্বীপে ডেন পাসার গ্রামের তালগাছের ছায়ায় আমি দাঁড়িয়ে গ্রাম্য নৃত্য উপভোগ করছিলাম, এমন সময় একজন দীর্ঘকায় আমেরিকান এসে আমার হাত ছুঁয়ে দাঁড়াল। প্রথমটা আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক এ ভাবে আমার আমোদ-উপভোগে বাধা দেওয়াতে। কিন্তু আমার বিরক্তি শীঘ্রই কৌতূহলে পরিবর্ত্তিত হ'ল যখন সে আমায় বললে—তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সারা সকাল বেলাটা। হোটেলের লোকে বলছিল তুমি না কি ফ্লোরেস্ সাগরের কোন্ দ্বীপে কি একটা অদ্ভুত জানোয়ার খুঁজতে যাচ্ছ? সত্যি কি তেমন দ্বীপ আছে?"

—আছে বলেই তো জানি।

—থাকলেও না কি ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট টুরিষ্টদের সেখানে যাবার অনুমতি দেয় না?

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি সৌখীন টুরিষ্ট শ্রেণীতে পড়িনে, কাজেই আমার সেখানে যেতে কেউ বাধা দেবে না। ডাচ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না দেওয়ার একটা প্রধান কারণ এই যে, কোমোডো দ্বীপে যাওয়ার পথ বড় বিপজ্জনক। টুরিষ্টরা যেতে গিয়ে যদি মারা পড়ে, তবে তার খানিকটা দায়িত্ব পড়বে ডাচ গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে। তবে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়ে গেলে স্বতন্ত্র কথা। আমি সেখানে যাচ্ছি সেই উদ্দেশ্যেই।

আর একটা কারণেও গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণকে সেখানে

যেতে দেয় না। কোমোডো দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর কুত্রাপি ও ধরণের অতিকায় গিরগিটি পাওয়া যায় না। সুতরাং যে গিরগিটিগুলো ওখানে আছে, অবিবেচক সৌখীন শিকারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের আর একটা উদ্দেশ্য।

আমেরিকান লোকটি বললে—আমি সিঙ্গাপুরে বেড়াতে



মিঃ পামার এবং তাঁহার বন্ধু যে পাতলা বেড়ার আড়ালে বসিয়া ছিলেন, হরিণের পচা মাংসের জন্য অপর একটি গিরগিটির সহিত লড়াই করিয়া একটি গিরগিটি হঠাৎ বেড়া ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এসেছিলাম, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি আমায় তোমার সঙ্গে যেতে দেবে?

রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। লোকটি বড় সরল প্রকৃতির।

সেই রাত্রেই ডাচ ষ্টীমারে আমরা দুজনে সুম্বাওয়া অভিমুখে রওনা হই। সুম্বাওয়া দ্বীপের বিমা নামে একটি ক্ষুদ্র বন্দরে দুদিন পরে আমরা ষ্টীমার থেকে অবতরণ করি—এর পরে আর ষ্টীমার যাবে না, আমাদের যেতে হবে দেশী নৌকাতে।

বিমা থেকে মোটরবাসে পার্ব্বত্যপথে অতি সুন্দর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমরা গিয়ে পৌছলাম সাপি বলে একটা গ্রামে। রাস্তা মোটর চলার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সমস্ত পথটা ঝাঁকুনির চোটে আমরা যখন সাপি এসে পৌছলাম, তখন প্রায় আমরা উত্থানশক্তিরহিত। গবর্ণমেণ্ট ডাকবাংলোতে জিনিষপত্র রেখে আমরা স্থানীয় জেলেদের একটা নৌকা ভাড়া করবার চেষ্টা করলাম এক মাসের জন্যে। মাঝি-মাল্লা-সমেত এ রকম নৌকা একখানা ভাড়া না করলে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছবার আর কোন উপায় নেই। কাজটা কিন্তু বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াল, তারা একবর্ণও ডাচ বা ইংরেজি জানে না, আমরাও একবর্ণ স্থানীয় ভাষা জানিনে—অতি কষ্টে আকারে ইঙ্গিতে তাদের খানিকটা জানিয়ে দিলাম আমরা কি চাই। দরদস্তুরও ঠিক হয়ে গেল।

খুব সকালে আমরা রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে এক দল কুলি, তাদের মাথায় নানাবিধ জিনিস। লম্বা সারি বেঁধে তারা আমাদের পেছনে আসছে। নৌকোতে পৌছে ভেবে দেখলাম, আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব আছে, যেমন আমার ক্যামেরাতে টেলিফটো লেন্স ছিল না, আমাদের কারও কাছে একটাও বন্দুক ছিল না।

নৌকা কিছুদুর অগ্রসর হতেই বুঝলাম যে, কেন এখনও কোমোডো দ্বীপ অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে বা টুরিষ্টদের ভিড় কেন সেখানে হয় না। কোমোডো দ্বীপের চারিদিকে অতি বিপজ্জনক সংকীর্ণ প্রণালী, জোয়ারের সময় এই সব প্রণালীতে বহির্সমুদ্রের জল ঢুকে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দেয়, এই রকম দেশী নৌকায় এখন সে পথে যাওয়া নিতান্ত প্রাণ হাতে করে যাওয়া।

পথেই পড়ে সাপি প্রণালী। দূর থেকে দেখা গেল সাপি প্রণালীর জলরাশি যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠে আকাশকে ছোঁবার জন্যে লাফালাফি করছে—চওড়া যে নিতান্ত কম তা' নয়, প্রায় আধ মাইল।

মাঝামাঝি গিয়ে হঠাৎ আমরা একটা টানের মুখে পড়ে অর্দ্ধমগ্ন তীক্ষ্ণধার শিলারাশির দিকে সবেগে নীত হচ্ছি মনে হ'ল—হয় তো অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকা শিলামূলে আছাড় খেয়ে শতখণ্ডে চূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আর একটা বিপরীত ঘূর্ণীস্রোতের মুখে নৌকাখানা একটা শুকনো

পাতার মত হঠাৎ বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। আমাদের মাল্লারা ভগবানের নাম নিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টানতে টানতে আধ ঘণ্টা পরে অতি কষ্টে জায়গাটা পার হয়ে গেল।

এ দেশের এ রকম নৌকাকে বলে 'প্রোই'—আমাদের 'প্রোই'খানায় এক টুক্‌রো মাদুর দিয়ে ছই তৈরী করা, তাতে ভাল ভাবে রোদ বা বৃষ্টি আটকায় না। দুদিন দুরাত্রি আমরা কাটালাম এই নৌকায়। যখন হাওয়া পড়ে যায়, মাল্লারা একটা পেতলের ঘণ্টা পিটিয়ে বিকট আওয়াজ করে, পবনদেবের অনুগ্রহ পাবার জন্যে—সে কি ভয়ানক কাণ্ড! আমরা মাথা ধরে শয্যা আশ্রয় করলাম পবনদেবের আরতি-ঘণ্টার এই বাজখাঁই ধ্বনিতে।

যে মুহূর্ত্তে এসে আমরা কোমোডো দ্বীপের বিস্তীর্ণ বালুময় উপকূলে নঙ্গর ফেললাম, সেই মুহূর্ত্তটি থেকে দ্বীপটার কূলরেখা ও দূরস্থ শৈলমালার একটা ছন্নছাড়া রহস্যময় দৃশ্য আমায় সত্যই বড় মুগ্ধ করলে। সমুদ্রের ধারে একটা মাত্র ক্ষুদ্র গ্রাম। উঁচু খোঁটার উপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে তার উপর গ্রামের ঘরগুলো তৈরী করা হয়েছে। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে এ ধরণের ঘর নদীতীরের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বড় বড় পাহাড়ের চূড়া নীল আকাশের গায়ে ঠেকেছে। নানা রকম তাদের আকৃতি। দেখে মনে হল বহু প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্যময় প্রাণীকুল যেন ঐ বিশালদেহ পর্ব্বতের অন্ধকার উপত্যকায় ও নিভৃত অরণ্যানীতে আত্মগোপন করে আছে। একটা পাহাড়ের চূড়া দেখে মনে হচ্ছিল সেটা যেন খুব প্রাচীন একটা মধ্যযুগের ব্যারণদের প্রাসাদ-দুর্গ। পর্ব্বতের উপরে স্থানে স্থানে ঘন অরণ্য। সমতলভূমিতে চারিদিকে তালজাতীয় গাছ

নৌকা থেকে নেমে আমরা গ্রামের মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করলাম। গ্রামের অধিবাসীদের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটের বেশী নয়। তারা দল বেঁধে আমাদের চারিদিকে জড় হল, তাদের চোখমুখে রাগ বা শত্রুতার কোন চিহ্ন নেই দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। মেয়েরা শান্তভাবে নিজেদের গৃহকর্ম্ম করে যাচ্ছে, দুখানা বড় জাঁতার পাথরের মধ্যে কেউ চাল গুঁড়ো করছে, কেউ বা রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত, তারাও আমাদের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

আমরা বিশ্রামের জন্যে একটি ছোট খড়ের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে একটুখানি বসেছি, এমন সময়ে আমাদের পাশের লম্বা ঘাসের বনের মধ্যে কিসের শব্দ হল।

গ্রামের মণ্ডল আমাদের সঙ্গে ছিল, সেই এ ঘরটি আমাদের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিল। শব্দটি শুনেই সে চীৎকার করে হাত পা নেড়ে কি বললে, তারপর উত্তেজিতভাবে জঙ্গলের দিকে আঙ্গুল তুলে আমাদের কি দেখাবার চেষ্টা করলে।



বার ফুট লম্বা ড্রাগন বা গিরগিটি : সম্মুখের পা দুইটি হরিণের মৃতদেহের উপর চাপাইয়া দিয়াছে।

আমরা এক সেকেণ্ডের জন্যে একটি ধূসরদেহ আঁসওয়ালা জানোয়ারকে লেজ তুলে ঘাসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে পালাতে দেখলাম।

গ্রামের মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করতে সে দুর্ব্বোধ্য দেশী ভাষায় কি বললে, তার আমরা কিছুই বুঝলাম না। যা হোক্, আমাদের খুব ভয় হল, ড্রাগনদের বাসস্থানে এসে পড়েছি, সব সময়েই অজানা বিপদের ভয় আছে। সাবধান হয়ে থাকাই ভাল।

পরবর্ত্তী কয়েক ঘণ্টা আমরা আমাদের জিনিসপত্র খুলে বার করতে ও ক্যাম্পখাট পেতে বিছানা ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত

করলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সমুদ্রতীর থেকে একবার বেড়িয়ে এসে নৈশভোজন সমাপ্ত করে আমরা শয্যা আশ্রয়



একটি বিরাটাকার ড্রাগন।

করে বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু ঘুম হঠাৎ এল না। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে গ্রামবাসীদের হাস্যকলরবের ধ্বনি আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল—আমরা সভ্য-জগৎ থেকে বহুদূরে এক অজ্ঞাত বিভীষিকাপূর্ণ দ্বীপে রাত্রিযাপনের জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

আমার সঙ্গীর সঙ্গে কি ভাবে ড্রাগনদের দেখা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে লাগলাম। সে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু আমার ঘুম কিছুতেই আসে না। গরম তো বটেই, তা ছাড়া ঘরটার দোর নেই—দোরের জায়গায় মস্ত একটা ফাঁক, সেখান দিয়ে তারা-ভরা নৈশ আকাশ দেখা যাচ্ছে। আমার ক্যাম্পখাটখানাও তেমন চওড়া না। বাইরে গ্রামের অধিবাসীরাও নিদ্রিত, কোমোডো দ্বীপের রহস্যাবৃত অন্ধকারে ও নিঃশব্দতার মধ্যে আমিই কেবল জেগে আছি।

হঠাৎ আমি উঠে বসলাম বিছানার ওপর। আমার মনে হল ঘরের বাইরে অন্ধকারে আমি যেন কি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, ওটা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা কিংবা গ্রাম্য কুকুরের পদধ্বনি মাত্র। ভয় কিন্তু তাতে দূর হল না। ঘরের কোণে বাক্সে আমার টর্চ্চটা ছিল, সেটা নিয়ে আসবার মতলব করছি, এমন সময় কি একটা জানোয়ার ঘরের খড়ের বেড়ায় ধাক্কা মারলে।

আমেরিকান বন্ধুটি সেই শব্দে জেগে উঠল। বিছানার উপর উঠে বললে, কিসের শব্দ?

আমি গলার মধ্যে শান্ত সুর আনবার চেষ্টা করে বললাম কিছু না, বোধহয় কুকুর-টুকুর হবে। টর্চ্চটা বার করে দেখছি।

একটু পরে টর্চ্চের আলো বাইরের দিকে ফেলে দেখলাম, কোথায়ও কিছু নেই। কুকুরই তা হলে হবে। আমাদের জেগে উঠতে দেখে পালিয়ে গিয়েছে। বাকী রাতটুকু শান্তিতে কেটে গেল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর ঘুম ভেঙে বাইরে এসে গত রাত্রের ভয় পাওয়ার দরুণ মনে মনে লজ্জিত না হয়ে পারলাম না। নতুন জায়গায় এই রকমই হয় বটে; ভয় কিসের? পঞ্চাশ হাতের মধ্যে গ্রাম রয়েছে, অতগুলো লোক শান্তভাবে ঘুমুচ্ছিল। ড্রাগনগুলো যদি সত্যই বিপজ্জনক হত, তবে কি তাদের আবাসস্থানের অত কাছে একটা গ্রাম থাকতে পারত?

কয়েক সেকেণ্ড পরে নরম বালির উপরে আমি একটি অজ্ঞাত জানোয়ারের পদচিহ্ন দেখে থমকে দাঁড়ালাম। জঙ্গলের দিক থেকে পায়ের দাগগুলো সোজা আমাদের কুঁড়ে-ঘরটার দিকে চলে এসেছে। দুটো পায়ের দাগের মধ্যে একটা ভারী জিনিষ টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ, সম্ভবতঃ জানোয়ারটার ভারী লেজের দাগ।



কোমোডো দ্বীপের 'গাবং' তালগাছ।

তবে তো দেখছি আমাদের গত রাত্রের ভয়টা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়! একটা ড্রাগন জঙ্গল থেকে কাল রাত্রে আমাদের ঘরের দিকেই এসেছিল!

আমেরিকান বন্ধুটি বললে, কিন্তু দেখ, অনিষ্ট না করলে কোন জন্তুই কখন বিনা কারণে মানুষকে আক্রমণ করে না।

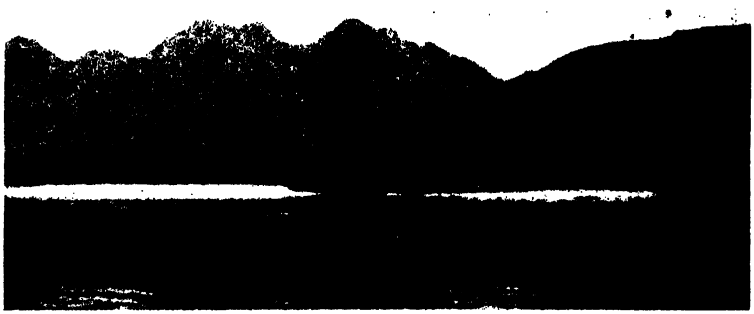
বন্ধুর এ কথা যে সত্য নয় তা আমি খুবই বুঝি, তবুও মনে হল এর চেয়ে গভীরতর সত্য আর কখন আমার শোনবার সৌভাগ্য ঘটে নি। বোধ হয় নিজেও ঐ কথাটা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম!

কয়েকদিন কেটে গেল। কোমোডো দ্বীপে গরম বড় বেশী, এত গরমে কোন কাজ এগোয় না। প্রতিদিন সকালে উঠে প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করে আমরা পাহাড়ে উঠতাম এবং বন-জঙ্গল ঘুরে কোমোডো ড্রাগনের অনুসন্ধানে ফিরতাম। পায়ের চিহ্নের অপ্রাচুর্য্য কিছু ছিল না; বনে, সমুদ্রতীরের বালুভূমিতে, উচ্চ পর্ব্বতের মাথায় দীর্ঘ ঘাস-জঙ্গলে, এদের পায়ের নখের দাগ বহু স্থানে দেখেছি। দেখে মনে হ'ত, এ দ্বীপের সর্ব্বত্রই এরা চলাফেরা করে। কোন কোন জায়গায় বহুদিন ধরে যাতায়াত করার ফলে দীর্ঘ তৃণভূমিতে দিব্যি সরু একটা পথ তৈরী হয়েছে।

একদিন একটা উপত্যকায় আমরা অনেকগুলি বড় বড় গুহা দেখলাম—বড় বড় ড্রাগনের পায়ের দাগ গুহার মুখে। সন্তর্পণে নিকটে গিয়ে আমরা গুহার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। কোন শব্দও গেল না কানে।

কিছুদিন পরে আমরা এ রকম অনেক গুহা দেখতে পেয়েছিলাম দ্বীপের নানা স্থানে। সবগুলিরই মুখে অতিকায় গিরগিটিদের আনাগোনার চিহ্ন বর্ত্তমান। আমাদের মনে হ'ল তাদের আমরা কোনদিনই দেখতে পাব না, তবুও তাদের বাসস্থান দেখে গেলাম বলে মনকে বুঝাতে পারব। বেলা চারটার আগে বেরুন যায় না, অসম্ভব গরম। চারটার পরে গরম একটু কমে গেলে আমরা গ্রাম থেকে কিছুদূরে একটা জলাশয়ে স্নান করতাম। তার চারি ধারে পাহাড়, একদিকে বালুকাময় সমুদ্রবেলা। ভারী চমৎকার দৃশ্য জায়গাটার। এখানে এমন একটা শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় রূপ ধারণ করেছে দ্বীপ, সমুদ্র ও আকাশ যে, ভুলে যেতাম এক-জাতীয় অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার এই বনময় দ্বীপের সর্ব্বত্র শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

জলাশয়টা আসলে সমুদ্রেরই একটা ছোট খাড়ি, চারি পাশের প্রস্তরস্তূপে তার গতি রুদ্ধ হয়ে ঐ জলাশয়টা সৃষ্টি করেছে—কিন্তু তার একটা মুখে এখনও সমুদ্রের সঙ্গে যোগ আছে! কাজেই জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হলেও বেশী দূর সাঁতার দিয়ে যেতে ভরসা হ'ত না। কি না থাকতে পারে এ রকম জলাশয়ে—হাঙ্গর, কুমীর, অতিকায় গিরগিটি, কংগার বাইন মাছ—সুতরাং সাবধানের মার নেই।



কোমোডোর সমুদ্রোপকূল।

একদিন আমরা জলাশয়ের ধারে বসে আছি, এমন সময়ে দেখলাম পিছনের ঘন জঙ্গল থেকে কালো মত কি একটা জানোয়ার বার হয়ে জলাশয়ের ওপারে বালুচরের দিকে আসছে। আমেরিকান বন্ধুটিও সেই মুহূর্ত্তে সেটাকে দেখতে পেয়েছিল।

দু'জনেই আমরা মুগ্ধ ও সচকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলাম। এতকাল পরে আমাদের অভিযান সার্থক হল। দিনের আলোয় এই আমরা বিখ্যাত কোমোডো ড্রাগন দর্শন করলাম। সে কি উত্তেজনাপূর্ণ মূহূর্ত্ত! আমরা নিঃশ্বাস ফেলতে সাহস পাইনে, পাছে শব্দ শুনে সেটা পালিয়ে যায়। অতিকায় গিরগিটিটা খুব কম করেও বার ফুট লম্বা, পা গুলো ছোট ছোট ও মোটা। চামড়াটা কোলা ব্যাংএর চামড়ার

মত কোঁচকান, দানাদার, কৃষ্ণাভ ধূসর বর্ণের। চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে যেন জলছে, দেখলে ভয় হয়।

ড্রাগনটা আমাদের দিকে চেয়ে সোজা চলে আসতে লাগল। আমাদের দিকে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি দিয়ে এমন ভাবে চেয়ে আছে যেন আমাদের অস্তিত্বই নেই। ওটাকে একগুঁয়ে ভাবে আমাদের দিকে আসতে দেখে আমাদের ভয় হল। তবে কি আমাদের সাড়া পেয়ে আক্রমণ করতেই আসছে না কি! ভয়ে হাত পা আড়ষ্ট না হয়ে গেলে লাফিয়ে উঠে আমরা ছুট দিতাম হয় তো।



কোমোডোয় একটি মাত্র গ্রাম আছে—এইটিই সেই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাস্তা। উপরে সপরিবারে গ্রামের মোড়লকে দেখা যাইতেছে।

গিরগিটিটা যখন জলের ধারে এসে পৌছেছে, তখন আমাদের কাছ থেকে তার দূরত্ব পাঁচ গজের বেশী নয়। আমাদের মনে হল চারি পাশের জগৎটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, পাখীর কূজনও যেন বন্ধ হয়ে গেছে—কেবল বেলাভূমিতে ছোট ছোট ঢেউয়ের ধাক্কার শব্দ ছাড়া আর কিছু কোথাও শোনা যায় না।

গিরগিটিটা এবার সামনের দুপায়ে একটুখানি উঁচু হয়ে উঠে বার বার তার দ্বিখণ্ড রাঙা জিবটা বার করতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার বাঁকা ধারালো বড় বড় দাঁত গুলো দেখতে পেলাম।

আর কিছুক্ষণ পরে কি হত জানি না, এই সময় হঠাৎ আমার সঙ্গী হাঁচলে। গিরগিটিটা বিদ্যুৎ গতিতে পেছন দিকে লাফ দিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হল। এই এক সেকেণ্ড আগে এখানে ছিল, এক সেকেণ্ড পরে আর নেই। আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে গ্রামে ফিরে এলাম। বোধ হয় একটু তাড়াতাড়িই এসেছিলাম।

আমার বন্ধু বললে, আচ্ছা যদি আমি না হাঁচতাম, তবে জানোয়ারটা কি করত? ওটা কি আমাদের দিকেই তেড়ে আসছিল, না শুধু বিকেলে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল?

যখন আমাদের সাহস ফিরে এল, তখন বুঝলাম অমন একটা জানোয়ারের ফটো নেবার কি অমূল্য সুযোগই হারিয়েছি!

পনের দিন কেটে গেল, ড্রাগন গিরগিটির আর কোন চিহ্ন নেই। আমরা দেখলাম দৈবের আশায় বসে থাকলে চলবে না, কোমোডো দ্বীপের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আমাদের শরীরের উপর ক্রিয়া সুরু করেছে। যত সত্বর হয় এখান থেকে পালাতে হবে, কিন্তু তার আগে গিরগিটিদের আরও ভাল করে দেখা চাই। আমরা একটা হরিণ মেরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে ড্রাগনদের প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করব স্থির করলাম।

গিরগিটিগুলোর ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির একটা পরিচয় এক দিন সকালে পাওয়া গেল। একটা গ্রাম্য কুকুর পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছিল, যখন সে ফিরে এল তখন তার শরীরের একদিকের মাংস কোন জানোয়ারে ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে পাঁজরা বার করে দিয়েছে। রক্তাক্ত দেহে কুকুরটা টলতে টলতে গ্রামের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল।

আমরা একটা হরিণ মেরে উঁচুগাছের মাথায় সেটাকে টাঙিয়ে রেখে দিলাম তিন দিন, কারণ যবদ্বীপের পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলে দিয়েছিলেন, পচা মাংসের গন্ধে কোমোডোর ড্রাগন গিরগিটি লোভে উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

মাংস পচে যখন অসহ্য গন্ধ বেরুচ্ছে, তখন আমরা একদিন নাকে রুমাল বেঁধে কুলি ও লোকজন নিয়ে হরিণটা নামিয়ে পাহাড়ের একটা জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার একটুখানি ফাঁকা জায়গায় রেখে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে

রইলাম। নিকটেই একটা বড় গুহা, গুহার মুখে অনেক-গুলো ছোট বড় গিরগিটির পায়ের দাগ ছিল

মিনিট কুড়ি লুকিয়ে বসে থাকবার পরে একটা ছোট গিরগিটি গুহা থেকে বেরিয়ে মৃত হরিণটার দিকে ছুটে গেল। সেটা সাত ফুটের বেশী নয়। প্রথমতঃ সেটা সন্দিগ্ধ ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলে, তারপরে মরা হরিণটার কাছে গিয়ে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগল। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা ছোট গিরগিটি এসে জুটল। আমরা এদের একটা ফটো নিলাম।

হঠাৎ সেগুলো ছুটে লম্বা ঘাসের মধ্যে পালাল। ওদের পালাবার কারণ কি, না বুঝতে পেরে আমরা চেয়ে দেখছি, এমন সময় একটা কাসির ধরণের গম্ভীর ঘড় ঘড় শব্দ কানে গেল। একটু পরে আমেরিকান বন্ধু বিস্ময়ের সুরে বললে—ঐ দেখ তাকিয়ে।

দেখি যে গুহার অন্ধকার অভ্যন্তর থেকে প্রায় পনের ফুট লম্বা এক বিরাটকায় ড্রাগন গিরগিটি ধীরে ধীরে সতর্কতার সঙ্গে বার হয়ে ক্রমশঃ মড়া হরিণটার দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরে সেটা মৃতদেহটার ওপরে দাঁড়িয়ে তার তীক্ষ্ণধার বাঁকা বড়শির মত দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগল। এক কামড় মাংস খায়, আবার সন্দিগ্ধ ভাবে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ করে। মিনিট দশেক পরে আর একটা সুবৃহৎ গিরগিটি গুহা থেকে বার হয়ে এল, সম্ভবতঃ পচা মাংসের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে। প্রথম ড্রাগনটাকে খেতে দেখে দ্বিতীয়টা সবেগে ভীষণ রেগে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল- তার পরে ছুটোতে ঝটাপটি যুদ্ধ! ও রকম একটা দৃশ্য দেখবার সুযোগ খুব কম সভ্য লোকেরই ঘটেছে।

কিছুক্ষণ পরে প্রথম ড্রাগনটা আহত হল, তারপর তীর-বেগে ছুটে পালাতে গিয়ে একেবারে আমাদের বেড়ার মধ্যে লুকানো ক্যামেরার উপরে এসে পড়ল, ক্যামেরার পিছনেই আমরা। সঙ্গে আমাদের বন্দুক নেই, কেবল কয়েকটা ছোট বর্শা। আমরা প্রাণের দায়ে বর্শা উঁচিয়েই দাঁড়ালাম। ড্রাগনের গতির বেগে ক্যামেরা কোথায় গিয়ে পড়ল, ভয়ে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাবার মত হল। আমরা আগেই বুঝেছিলাম, এ ভয়ানক সরীসৃপের বিরুদ্ধে আমাদের বর্শাগুলো কোন কাজেই আসবে না, হয় তো আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ গুরুতর আহত হব। সৌভাগ্যক্রমে ড্রাগনটা অন্য দিকে তার গতির মুখ পরিবর্ত্তিত করে দীর্ঘ ঘাসের বনে হয়ে গেল।

বিকেলবেলা আমরা গ্রামে ফিরি।

তিন সপ্তাহ পরে আমরা সাপি ফিরে এসে শুনলাম, লর্ড ময়ন কোমোডো দ্বীপে রওনা হয়েছেন ড্রাগন গিরগিটি ধরবার জন্যে। লর্ড ময়ন ফাঁদ পেতে তিনটে ছোট ছোট গিরগিটি ধরে এনেছিলেন, বর্ত্তমানে সেগুলো লণ্ডন পশুশালায় আছে।

ইংলণ্ডের বাণিজ্য

...কোন্ সময় হইতে ভারতবর্ষে ইংরাজের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষে কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ তখন বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল, কিন্তু প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ তখন যে বর্ত্তমান সময়ের পরিমাণের পাঁচ গুণ ছিল, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। জনসাধারণের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের টাকার পরিমাণ তখন কম ছিল বটে, কিন্তু কোন পরিবারেরই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চাকুরীর উমেদারী করিতে হইত না। তখন প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই আধুনিক ভাষানুসারে বেকার থাকিতে হইত বটে—কিন্তু কোন পরিবারেরই অন্নাভাবের জন্য চিন্তান্বিত হইতে হইত না। তখন কৃষকগণ জমিদারকে যে ন্যায্য খাজনা প্রদান করিত, তাহা টাকার হারে ধরিলে বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল বটে, কিন্তু শস্যের বর্ত্তমান মূল্যের হার ধরিলে তখনকার দিনে খাজনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল। অথচ কৃষকগণ তখন যে বিশেষ কোন খেদ প্রকাশ করিত, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। বণিক্‌বেশী ইংরাজগণও তখন বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে অধিকতর পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারিতেন।...

প্রত্যাবর্ত্তন

—শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বেলা পড়ে এসেছে, রোদ বাঁকা হয়ে হেলে পড়েছে উঠানে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে ভাগ হয়ে এসেছে লম্বা লম্বা উজ্জ্বল ফালিতে। কর্ম্ম-মুখর দুপুরের অবসাদ নেমে এসেছে সূর্য্য হেলে পড়তেই, অনেকেই আজ এমনি সময় ঘুমে। অনিমা শোবার ঘরে ঘুমাচ্ছে, মিণ্টুও চৌকিতে। লম্বা বড় একটা টিনের ঘর, টিনের বেড়া দেওয়া। মাঝখানে বাঁশের চাঁচের বেড়াতে দু'ভাগ করা। এ পাশে থাকে অনিমা-বিনয়, অপর দিকে সুব্রতা।

এর মানে আছে। অনেকদিন ভেবেছে সুব্রতা। এ কি অনিমার চাল? না, দিদির অনুমতি? অনিমা দেখাতে চায় তার আধিপত্য বিনয়ের উপর। হাসতে ইচ্ছা হয় সুব্রতার—হাসে। তার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই সে আসে নি?

আজ মিণ্টুর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলখানার উপর থেকে টেনে অনেকদিন আগেকার কয়েকটি মাসিক পত্রিকা দেখছিল, হাত থেকে একটা পড়ে যেতেই ধপাস্ করে যে শব্দ হল, মিণ্টুর ঘুম ভাঙ্গবার পক্ষে যথেষ্ট। সে কেঁদে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি সুব্রতা এসে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলে। চুপ করে একটু পরেই আবার কেঁদে উঠল মিণ্টু, শান্ত করবার চেষ্টা করতেই মিণ্টু উঠে বসল, কোলে করে ঘুম পাড়াবার জন্য ওকে তুলে নিলে সুব্রতা। থামল, কিন্তু শান্ত হল না মিণ্টু।]

সুব্রতা। না, এ আমায় সাজে না! ঘুমোও, ঘুমোও। না…না…না ও…ও…ও…ও (মিণ্টু কাঁদল। বাইরের বারান্দা দিয়ে পেছনের দিক হতে সহসা বিনয়ের কণ্ঠ শোনা গেল্।)

বিনয়। ওর মার কাছে দিয়ে এলেই হয়, শুধু শুধু জোর করে কাঁদিয়ে কি লাভ? (একটু আস্তে) যার যা কাজ না…(আর শোনা গেল না। বিনয় আবার অদৃশ্য হল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারান্দার পারে চেয়ে সুব্রতা ফিরতেই দোর-গোড়ায় দেখতে পেল অনিমাকে, হাস্‌ছে। সুব্রতা এগিয়ে মিণ্টুকে অনিমার কোলে দিতেই চুপ করে গেল।)

অনিমা। কি বদ্‌মাইস দেখ! কখন উঠল?

সুব্রতা। বেশ মার কোলটি চেনে! কিছুতেই কি শান্ত করতে পেরেছি! (বিনয় উঠে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। অনিমা ও সুব্রতা এসে বস্‌ল অনিমাদের বিছানার উপর।)

অনিমা। তোমাকে আমার হিংসে করাই না কি স্বাভাবিক, লোকে বলে—কিন্তু কেন আমি পারি না!

সুব্রতা। সেটা তোমার হৃদয়ের উদারতা, তোমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

অনিমা। কোনদিন করতাম। স্বীকার করছি।

সুব্রতা। বিস্মিত হব না।

অনিমা। পরিচয় যে অবধি না হয়েছিল…করতাম।

সুব্রতা। পরিচিত হয়ে এমন কি পেলে?

অনিমা। ঈর্ষ্যা করবার প্রয়োজন নেই!

সুব্রতা। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই!

অনিমা। হতে চাও-ও না!

সুব্রতা। কি করে বুঝলে? (হাস্‌ল)

অনিমা। যা দিয়ে সাধারণ চেনা যায়। আলাপে, ব্যবহারে, চোখে, মুখে।

সুব্রতা। কোনদিন রাগ করব বলে বসেও তোমার উপর রাগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ভেবেছি, তোমার কি অপরাধ? আমার উপর যে অন্যায়টা করা হয়েছে তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছ তুমি—অন্যায় তোমার নয়। আমার মত দাবী আছে তোমারও নিজের কথা বলতে গেলে—এ আমার অদৃষ্ট, তাকে পরিবর্ত্তন করতে পারি এমন শক্তি নেই। কারুর না।

অনিমা। স্ত্রী হয়ে থাকতে কি তোমার কখনও…

সুব্রতা। স্ত্রী হয়ে থাকা ছাড়া এ সংসারে আমার আর কি অধিকার আছে বল? অন্য কোন পরিচয়…কি থাকতে পারে বল? কিন্তু তার জন্য আমি উৎসুক নই! কি হবে? উপোস্ করে থাকা হয়তো সহজ, কিন্তু আধপেটা খেয়ে বাঁচা অসম্ভব। আমার আর ওর মধ্যে তুমি আছ, তোমাকে

মধ্যে আমি নেই। অনন্ত সুখের মধ্যেও তোমার দীর্ঘনিশ্বাসের অনুভূতি চিরকাল কাঁটার মত বিঁধবে। কি লাভ? কি হবে ক্ষুধাকে করে অপূরণীয়, সর্ব্বগ্রাসী!

অনিমা। আজ আস্‌বার সাধ কেন হল?

সুব্রতা। সবায়ের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে—আমার না এলে উপায় ছিল না, এর বেশী আর জানতে চেও না। হয়ত এ একটা অকারণ সাধ, মোহ; জানি এ সাধ পূরাতে কতটা সংযম দরকার। কতটা দাবী ছেড়ে দিলে সম্ভব। সব জানি, বুঝি, কিন্তু তবু তার জন্য প্রস্তুত হতে না পারলে আসতাম না। না!

অনিমা। কি পেলে তুমি সুখী হতে পার? আমার কাছ থেকে কি আশা কর?

সুব্রতা। যা পেয়েছি যথেষ্ট। আমি সন্তুষ্ট অনু। সাধারণ মানুষের প্রতি মানুষের যা থাকা উচিত, ভাল ব্যবহার। চেয়েছি, দিলে।

অনিমা। বে'র বেলা আপত্তি কেন করলে না?

সুব্রতা। করতে পারতাম। অধিকার ছিল। কিন্তু অনু, নিজে যদি আমি উপযুক্ত হতে না পারি, বাধা দেব কোন্ অধিকারে?

অনিমা। তারা অপেক্ষা করত হয়ত বা, তুমি জানালে তারা করত।

সুব্রতা। নিজের উপর বিশ্বাস আমার খুব বেশী কোন দিনও ছিল না, নেই। সংসারে যত সব অভাব পূরণের জন্য আনা হয়েছিল আমায় দিয়ে হল না। অনিশ্চিতের পানে চেয়ে কত দিন আর তাঁরা অপেক্ষা করতে পারেন?

বিনয়। (বারান্দা হতে) ওগো! ওগো! দেখ কে এসেছে!

(অনিমা উঠে দাঁড়াতেই কেশব ভট্টাচার্য্য প্রবেশ করলেন। অনিমার বড় ভাই,—বলিষ্ঠ, সুস্থ, কায়দা-দুরস্ত, দেহে ও আবরণে একটা বেশ সুন্দর আড়ম্বরহীন সামঞ্জস্য, কেশবের পিছনে বিনয় ঢুকল—সুব্রতা পালিয়েছে ইতিমধ্যে।)

বিনয়। কি বল্‌ছে শোন!

কেশব। আজ যেতে পারবি? বিনয়কে জিজ্ঞেস্ করলাম, ও তোর উপর ঠেলে দিলে,—জিজ্ঞেস্ কর ওকে।

অনিমা। (মাথার কাপড় কপাল অবধি টেনে) আমায় জিজ্ঞেস্ করার বিশেষ সার্থকতা? অমতে কোন দিন গেছি না কি?

বিনয়। যেতে কবে জিজ্ঞেস্ করলে মতামত? কি বলছ যে!

অনিমা। কোন দিন জিজ্ঞেস্ করি নি!

বিনয়। মনে পড়ে না। অনুমতির একটা প্রয়োজন—এই তোমার মগজে আসে না!

অনিমা। কেন সেবার বর্ষাকালে…

বিনয়। ব্যতিক্রম সব কিছুতেই আছে।

অনিমা। বাদে তোমার ন্যাকাম!

বিনয়। হাঁ, তুমি বৌদিকে জিজ্ঞেস্ করে এস কেশব, তার মত থাকলে…

কেশব। যাচ্ছি পরে, তোমার মতটা বল।

বিনয়। পরে গেলে চললে বলতাম না। জিজ্ঞেস্ করে এস।

(কেশব বেরিয়ে গেল পিছনের দরজা দিয়ে।)

অনিমা। দিদির মতামতের জন্য পাঠালে? (বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল।)

বিনয়। জিজ্ঞেস্ করে আসুক—দেখি না তিনি কি বলেন!

অনিমা। শোনবার অধিকার নেই আমার?

বিনয়। কে অস্বীকার করে!

অনিমা। তবে!

বিনয়। প্রয়োজন ও অধিকার এক নয়! কিছু থাকলে ত' শুনবে।

অনিমা। কোন দিন যখন জিজ্ঞেস্ করা হয় না।…

বিনয়। আজ যখন হচ্ছে, 'কিছু' নিশ্চয়ই আছে।

অনিমা। তোমার নিজের কি মত?

বিনয়। নিজের মত না যাওয়া।

অনিমা। অনেক দিন যাই নি…

বিনয়। যেহেতু আমন্ত্রণ পাও নি। নিতে এলে কবে না গিয়ে ছেড়েছ?

অনিমা। কালই আসব ভোরবেলা। একটা রাত।

বিনয়। তা কখন হয়? মা দেবেন আসতে? আসা হবে?

অনিমা। আমি বলছি হবে। কেন হবে না? হতেই হবে।

বিনয়। আজ যদি নূতন হয়!

অনিমা। প্রতি বারই একটা না একটা অজুহাত তোমার আছেই।

বিনয়। তবু রাখা যায় কই? কি বললেন বৌদি? (কেশব ঢুকল)।

কেশব। 'আমি কি জানি! তাদের যা ইচ্ছা তাই করুক্, কোন দিন আপত্তি করি নি ত'! তোমার তেমন যদি আপত্তি থাকে···আজ চলুক্ কাল বিকেলে আসবে; এমনি সময়!

বিনয়। যাক্ বার পেরুল না। ভোর থেকে মোটে বিকেল···সন্ধ্যা!

অনিমা। প্রস্তুত হব?

বিনয়। বাপের বাড়ীর নাম শুনলে নেচে উঠবার অভ্যাস তো তোমার চিরকালের। (বিনয় চলে গেল)।

কেশব। তা হ'লে ঠিক হ', আমি আসছি একটু ঘুরে। (কেশবের প্রস্থান)।

সুব্রতা। (ঢুকে) যাচ্ছ?

অনিমা। কাল এমনি সময়েই আসব।

সুব্রতা। কাল ভোরে গেলে হয় না?

অনিমা। দাদা আজকে নিতেই এসেছেন। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুব্রতা। ও! (শব্দটার মধ্যে অনেক কিছুর সংযত আভাস পাওয়া গেল। একটা উচ্ছ্বাস সংযম হারিয়ে হঠাৎ গলার কাছে এসেই যেন শান্ত হয়ে সহসা কোথায় লুকিয়ে পড়ল। বাইরে তার প্রকাশ পেল বাধা। চাপা পড়ল সংযত ও চাপা একটা শ্বাসের স্বস্তির মধ্যে। সুব্রতা চলে গেলে, একটু সন্দিগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল অনিমাও।)

[বিনয় বাড়ী ফিরল। রাত কটা ঠিক করা কঠিন। প্রহরের ডাক দিয়েছে বাজপাখী—সে কখন? প্রহর রাত বারটা গ্রামে, ঘুমিয়ে পড়বার পক্ষে যথেষ্ট, কিছু করবার না থাকলে কতকাল থাকতে পারে বসে?

পাশের বাড়ীতে বসেছে আড্ডা তামাকের। মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য একসঙ্গে, অনেকের, দুপুর রাতে বাজ ডেকে ওঠবার মতই সহসা ও উচ্চ, আবার চুপ। নিস্তব্ধ, নিথর, নিস্পন্দ, শোনা যায় কুকুরের কোরাস্, সবিরত, কিছু কালের জন্য।

আজ শুক্লাষষ্ঠী। চাঁদ গ্রামের দিগন্তের শেষ সীমায়, আড়ালে পড়ে গেছে। আলো—কিছুটা কাল মেশান, কি রকম স্যাঁতসেঁতে, ফ্যাকাশে। আম, সুপারী, চাল্‌তা গাছের ঘন কাল ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। তার মধ্য দিয়ে লম্বা ফালিতে ফেটে পড়ছে আলো, উঠানে, গোটা কয়েক রেলিঙের মধ্য দিয়ে খোলা জানালার সাহায্যে আলো এসে পড়েছে ঘরে, সুব্রতার বিছানায়, দেহে।]

(দরজার কড়া নাড়তেই, সুব্রতা এসে খুলে দিল।)

বিনয়। আজ অনেক রাত হয়েছে। (সুব্রতা সোজা চলে গেল তার খোপে।) আমার জুতো···সব কোথায়? (সামান্য চোখ ঘুরিয়ে দেখি।) কোথায় যে রাখে এরা! খুঁজে আর পাওয়া যাবে না দেখছি। জানে রোজ (সুব্রতা এসে দাঁড়াল) পায়ে দিতে হয়। (নীরবে সুব্রতা পূবের বারান্দায় গিয়ে জুতো এনে দিল। ঘটীটা হাতে নিয়ে হ্যারিকেন্‌টা তুলতেই।) জলও এনে দিতে হয়ে নিশ্চয়! (ঘোমটা ছিল ওর কপাল অবধি) দেখা যায় চোখের দৃষ্টি—অন্তরালে) না, কাজ নেই আমার পা' ধুয়ে, দরকার নেই!

সুব্রতা। এ রাগ হচ্ছে কার উপর?

(বিনয়—বিস্মিত, চাইল ওর পানে—সোজা)

বিনয়। কারও উপর নয়! যাবার বেলাই বারণ করেছিলাম। জানি এ সব হবে!

সুব্রতা। এ ত নতুন কিছু নয়! সবই যদি আমায় দিয়ে চলত তা হলে অনুকে আনবার কি প্রয়োজন ছিল?

বিনয়। দরকার হত না সে একশ বার! এ আমি জানি। অনু জানে···জানে সবাই!

সুব্রতা। জানা থাকলে কেন এ অনুযোগ? (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল বিনয়।) অনু হয়ত বসে থাকত। সব জোগাড় করে রাখত—সে ত আর বেশী কিছু নয়! অসুবিধা সহ্য না করতে পারলে আটকে রাখলেই হত! এ জানা কথা। যাকে দিয়ে যা হবার নয়, প্রত্যাশা করে লাভ? (কতকটা শুষ্ক হ'য়ে এসেছিল সুব্রতার স্বর শেষের দিকটায়)

বিনয়। ভুল সবারই হতে পারে, তাতে বলবার কিছু নেই। কিন্তু ইচ্ছে করে—

সুব্রতা। উপায় কিছু নেই বলেই ত ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। আমায় দিয়ে যে নির্ভুল কিছু হবে না, এ ত অনেকদিনকার প্রতিষ্ঠিত সত্য। (থেমে) ভুল একটা হয়ে গেছে। স্বীকার করছি। মনে ছিল না বলেই! তার জন্য বাঁকা কথা শোনাবার কি দরকার ছিল? বললে করে দিতুম না! দিই নি কোনদিন! (সহসা থামল, নীরবতা) আমি চাই না কিছু এ কথা একশবার কিন্তু···কিন্তু···মানুষের সঙ্গে সাধারণ ভাল ব্যাবহারটা করতেও কি কিছু দোষ ছিল? না পার ক'রো না। কিন্তু অভিযোগ শুনতে আমি পারব না। কেন? কি করেছি? কেন? কেন শোনাবে তুমি অমন করে? কিসের জন্য? (সুব্রতা বেরিয়ে গেল দমকা হাওয়ার মত। একটু বসে—নির্ব্বাক ভাবে উঠে চলে গেল বেরিয়ে। সুব্রতা এসে দাঁড়িয়ে রইল দোরের পাশে। বর্ষণে মেঘের ভার কিছু কমেছে। দাঁড়িয়েছে কেন? বিনয় কোথায় গেল এত রাতে, দেখবে বলে?—নারী! একটু পরে দরজাটা ঠেলতেই ঠকাস্ করে লাগল ওর কপালে। চুপ করে চলে গেল ফিরে সুব্রতা। ফিরে···দাঁড়িয়ে···দেখে··· বসল অনুর বিছানার পাশে, উঠে।)

বিনয়। লেগেছে নিশ্চয়! (সুব্রতা বসে ছিল বিনয়ের দিকে পেছন ফিরে।) দেখতে পাইনি বলেই···

সুব্রতা। কে বলছে দেখতে পেয়ে দিয়েছ? কে অভিযোগ করছে?

বিনয়। ব্যথা পেয়েছ ত!

সুব্রতা। (মাথা নেড়ে জানাল—না) সেরে গেছে।

বিনয়। এই সেই বাঁকা কথা শোনান হল না?

সুব্রতা। ব্যথা পেয়ে যদি কিছু বলি···

বিনয়। তা হ'লে এতদিনকার ধরিত্রীর সঙ্গে তুলনাটা নিতান্ত অকাব্যিক হয়ে পড়ে।

সুব্রতা। ব্যথা যদি পেয়ে থাকি পেয়েছি আমি। মাথা ফুল্‌তে হয় ফুল্‌বে আমার!

বিনয়। মানুষের উপর সাধারণ সহানুভূতি···সমবেদনা ···যা তুমি চেয়েছিলে সামান্য আগেই!

সুব্রতা। না পেলেও বাঁচতে পারব, এ বিশ্বাস হয়েছে। আজ ছ' বছর চলেছে ত'!

বিনয়। ভবিষ্যতে চলতে পারে না জেনেই না আসতে তোমাকে হয়েছে, এতদিন পরে। কিসের মোহ তোমার? কিছু চাও'না ··জন্ম হতেই যারা তোমার আপন, তাদের ছেড়ে যাদের কাছে আসতে তুমি পাগল···তারা তোমার কে? কোন্ সূত্রে তারা তোমার আপন? যে অধিকার-বলে এ সংসারে বাস করবার দাবী জানিয়ে লিখেছিলে···নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে পারলেও···তুমি আমার স্ত্রী এ সম্বন্ধ বাদে এ সংসারে কি তোমার আছে? কি থাকতে পারে? আমার সহানুভূতি চাও না! আমার সহানুভূতির জন্য তুমি পাগল। না হলে জীবনে বাঁচতে পার না। এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে।

সুব্রতা। স্ত্রী হয়ে ছাড়া এ সংসারে থাকা চলবে না!

বিনয়। নির্ভর করছে আমার উপর। তুমি প্রার্থী··· আমি রাজী হই কি না নির্ভর করবে আমার উপর! কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই কি করে তুমি ভুলে যাও···স্ত্রীর অধিকারেই এ সংসারে তোমার স্থান!

সুব্রতা। সেই আমার দাবী হলেও তার জন্য লালায়িত নই! আদৌ না। স্ত্রী হয়ে থাকতেই আসি নি!

বিনয়। (আলো নেমে গেছে জানালা থেকে) তুমি না বল্‌লেই স্বীকার করব কেন? কিছু চাই না বললে শুনব কেন? গ্রামে সবাই জানে তুমি আমার স্ত্রী—সবাই বলে, আমি জানি সেই অধিকার নিয়েই তুমি এসেছ। অথচ তুমি আমার স্ত্রী নও। অস্বীকার পাও, কোন সম্বন্ধই থাকবে না তোমার সঙ্গে। (হঠাৎ একটা গুবরে পোকা এসে মাটীর প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিলে) এ বিড়ম্বনার বোঝা কেন অকারণ বইব? (নীরবতা, মিনিট পাঁচেক। অন্য পাশে আলো··· হ্যারিকেন্‌টা জলছিল—তার একটা কাল ছায়া এসে পড়েছে তাদের বিছানায়।)

সুব্রতা। আলোটা এখনও জলছে!

বিনয়। জলুক।

সুব্রতা। অকারণ জলবে?

বিনয়! জলতে দাও! নিভে যাবার প্রয়োজন হলে নিজেই ও নিভবে।

সুব্রতা। না, নিভিয়ে দিয়ে আসি!

বিনয়। ···আ···আ···আ...থাক না! (পর্দ্দা নামল)

[দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

আলোচনা

পুরাণ-প্রবেশ

গত সংখ্যায় যে সকল পৌরাণিক ও প্রাক্ প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভারত যুদ্ধের কাল ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই—বৃদ্ধগর্গের "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ শাসতি পৃথ্বীম্" এই বচনটীর অর্থ কি? রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন ইহার অর্থ কি?

বৈদিক সাহিত্য ও নিরুক্ত দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে, "সপ্ত ঋষয়ঃ," "গাবঃ," "কিরণাঃ," "রশ্ময়ঃ" ইত্যাদি শব্দ সূর্য্যরশ্মির অপর নাম। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রে আছে, "সূর্য্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতায়মবাসৃজৎ। অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্য্যুহ্যতে।" (১০-৮৫ ১৩)। এই মন্ত্রের সুস্পষ্ট জ্যোতিষিক অর্থ এই যে, অঘা (মঘা) নক্ষত্রে সূর্য্যের কিরণ (গাবঃ) নষ্ট অর্থাৎ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং ফাল্গুনী (অর্জুনী) নক্ষত্রে আসিলে তাহা আবার ফিরিতে থাকে; যেন সূর্য্যা ফাল্গুনী নক্ষত্রে (ইহার চারিটি তারা, দেখিতে একখানি পাল্কীর মত। "ফাল্গুনী" শব্দ হইতে palanquin শব্দ হইয়াছে কি?) চড়িয়া স্বামিগৃহে যাইতেছেন। মঘানক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে সূর্য্যকিরণ একেবারে নিস্তেজ, ইহা সেই সময়, যখন উত্তরায়ণ মঘায় হইত। জ্যোতিষিক গণনায় পাওয়া যায় ১৬০০০ হইতে ১৫০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আর যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষিরা মঘায় থাকার অর্থ এই যে, সে সময় সূর্য্য মঘায় আসিলে সূর্য্য পূর্ণভাবে "সপ্ত ঋষয়ঃ" বা কিরণ বিতরণ করিতেন, অর্থাৎ তখন দক্ষিণায়ন কাল। ভারত-যুদ্ধকাল বা কল্যব্দের আরম্ভ ৩১০২ খৃঃ পূঃ। এই সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অনুমান ৭০° অংশ অয়নগতি হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সায়ন বিষুব বিন্দু হইতে ৭০°+৯০° বা ১৬০° অংশ পূর্ব্বে ক্রান্তিবৃত্ত স্থানে ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দে দক্ষিণায়ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে মঘা (Regulus) তারার সায়ন স্ফুট ১৪৮° অংশ। আর প্রাচীন বৈদিকযুগে মঘা তারা হইতেই মঘা নক্ষত্র বিভাগের আরম্ভ ধরা হইত, অর্থাৎ সে সময়ের মেষ বা অশ্বিনীর আদি বিন্দু, ঠিক বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় তারাচিত্রাবলীর (Star Atlas) মেষের আদি ছিল। ইহা কেতকর, যোগেশবাবু প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তখনকার মঘানক্ষত্র বিভাগের অন্তের (বা পূর্ব্বফল্গুনীর আদিবিন্দুর) বর্ত্তমান সায়ন স্ফুট (১৪৮°+১৩.৩°)=১৬১°.৩ অংশ। ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দের দক্ষিণায়ন-বিন্দুর বর্ত্তমান সায়নস্ফুট ১৬০° অংশ পূর্ব্বেই পাইয়াছি। সুতরাং সুন্দরভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কল্যব্দের আরম্ভে দক্ষিণায়ন-বিন্দু পূর্ব্বফল্গুনী ছাড়াইয়া বিলোম গতিতে মঘায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়ে মঘানক্ষত্রের অন্তভাগে দক্ষিণায়ন। সুতরাং বাসন্ত বিষুববিন্দু রোহিণীতে অবস্থিত ছিল। কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের উত্তর বিক্ষেপ ৪° অংশ বিধায় এই সময় কৃত্তিকাপুঞ্জ ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত।

শতপথব্রাহ্মণে এই সময়ের কৃত্তিকার অবস্থানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "কৃত্তিকাসু অগ্নী আদধীত এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে" (২—১—২)। কৃত্তিকাতে অগ্ন্যাধান করিবে, কারণ, কৃত্তিকাপুঞ্জ ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। বস্তুতঃ ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৩০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত কৃত্তিকাপুঞ্জকে ঠিক পূর্ব্ব দিকে উদিত হইতে দেখা যাইত। আর এই শতপথব্রাহ্মণে (১৩—৫—৪) পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় ও শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। ইহা যে প্রথম জনমেজয়ের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বা অর্জুনের ১৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা গিরীন্দ্রবাবু প্রভৃতি স্বীকার করিবেন। ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বেই শতপথব্রাহ্মণের রচনা শেষ হইয়াছে। ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পর ইহার কোনও অংশ রচিত, এরূপ প্রমাণ ইহাতে কুত্রাপি নাই। এই প্রমাণটী এতই প্রবল যে, ইহাকে না উড়াইতে পারিলে শতপথব্রাহ্মণ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতযুদ্ধের কাল যে অনুমান ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি পূর্ব্বে "The Hindu Nakshatras" শীর্ষক প্রবন্ধে (Journal of the Department of Science, Calcutta University, Vol. VI, 1924.) ইহা দেখাইতে চেষ্টা করি। Winternitz সাহেব এই প্রবন্ধ দেখিয়া কৃত্তিকাপুঞ্জের ঠিক পূর্ব্বদিকে উদয়ের ব্যাখ্যাটি অন্যরূপ হইয়া পরবর্ত্তী সময় বুঝাইতে পারে কি না সেই চেষ্টা দেখিলেন। Prague বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষের অধ্যাপক Prey সাহেবের সাহায্যে তিনি একটা নূতন ব্যাখ্যা চালাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মনে অবশ্য ভারতযুদ্ধের কাল যে ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের (যাহা Bentley আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন) পূর্ব্বে নহে, এই সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল হইয়াছিল। Prey সাহেব জানাইলেন ১১০০ খৃঃ পূঃ অব্দে কৃত্তিকাপুঞ্জ ২৫° অক্ষাংশ দেশে ঠিক পূর্ব্বদিক হইতে প্রায় ১৩° অংশ উত্তরে উদিত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে হেলিতে হেলিতে প্রায় দুই ঘণ্টার বেশী সময় পূর্ব্বাপর বৃত্তের উত্তরেই থাকিত। সুতরাং কৃত্তিকাপুঞ্জ দেখিয়া এই সময় পূর্ব্ব দিক ঠিক করা হইত। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটী যে কিরূপ অসম্ভব, তাহা দেখাইতেছি। কৃত্তিকাপুঞ্জের উদয় দৃষ্টে ঠিক পূর্ব্বদিক নির্ণয় করিয়া যজ্ঞশালার কড়িগুলি ঠিক পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল (বৌধায়ন শ্রৌত সূত্র ২৭।৫)। অনুমান ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ও পরে কৃত্তিকাপুঞ্জের উদয় ঠিক পূর্ব্বদিকে হইত। সুতরাং ইহার উদয় দেখিয়া সে সময় ঠিক পূর্ব্বদিক নির্ণয়ানন্তর যজ্ঞগৃহাদি নির্ম্মিত হইত। ঠিক পূর্ব্ব বিন্দুর ১৩° অংশ উত্তরে উদয় হওয়ার পর কৃত্তিকা দেখিয়া যদি পূর্ব্বদিক স্থির করা

হয়, তবে তাহা মোটামুটি পূর্ব্বদিক হইবে। ইহা অতিশয় স্থূল (rough)। ইহাই সূত্রকারের উদ্দেশ্য হইলে, তিনি ত' বলিতে পারিতেন, বসন্ত ও শরৎ-কালে সূর্য্যের উদয় দেখিয়া পূর্ব্বদিক ঠিক করিয়া যজ্ঞগৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে। (বিষুব দিনের একমাস পূর্ব্বে ও পরে সূর্য্যের ক্রান্তি অনুমান ১৩° অংশ উত্তর বা দক্ষিণ হয়)। সূর্য্য সকলেই চিনেন। কৃত্তিকা তারা অনেকেই চিনেন না। বিশেষতঃ রাত্রিতে প্রত্যহই সন্ধ্যার পর ইহার উদয় হয় না। অনেক সময় অর্দ্ধরাত্রির পর পশ্চিম গগনে উদয় হয়; আবার অনেক রাত্রি একেবারে অদৃশ্য থাকে। সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বদিকে বৎসরে দুই সময় মাত্র দেখা যায়। আর কৃত্তিকাপুঞ্জ অনুমান ৩১০০ খৃঃ পূঃ অব্দে (অথবা যে কোনও কালে বিষুবদ্বৃত্তে অবস্থিত কোনও তারা) সমস্ত বৎসরই যখনই তাহার উদয় দৃষ্ট হইবে, ঠিক পূর্ব্বদিকেই উদিত হইবে। সুতরাং Winternitz সাহেব যে ব্যাখ্যা অনুমান করিয়াছেন—

"The passage in which we read that 'the Pleiades do not swerve from the East' should probably not be interpreted as meaning that they rose due east (which would have been the case in the Third Millenium B.C. and would point to a knowledge of the Vernal Equinox) ; the correct interpretation is more likely that they remain visible in the eastern horizon for a considerable time during several hours—every night, which was the case about 1100 B. C." তাহা অসঙ্গত ও কৃত্তিকার ঠিক পূর্ব্বদিকে উদয় ও ভারতযুদ্ধের কাল অনুমান ৩১০০ খৃঃ পূঃ।

এখন যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন "ইহার অর্থ, তখন দক্ষিণায়ন মঘায় হইত ইহা বুঝাইলে, সপ্তর্ষির অন্য নক্ষত্রে গমন 'অয়নগতি'কে (precessional motion) কে বুঝাইবে। এক নক্ষত্র হইতে পুনরায় সেই নক্ষত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের কাল বর্ত্তমান জ্যোতিষ অনুযায়ী অনুমান ২৬০০০ বৎসর, অর্থাৎ বার্ষিক অয়নগতি (precession in longitude) প্রায় ৫০″ বিকলা। কিন্তু পূর্ব্বে যে এই মান কম ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। "The Rev. Charles Turnor (Newtonian Turno has recently lent me a very valuable Ms. Almanac of 1340···Among its contents is a list of 35 principal stars, and their constellation places, brought up from Ptolemy's catalogue by applying 45″ for the annual change of longitude" (Smyth's Cycle of Celestial Objects". Vol II p525)। বেন্টলী সাহেব ও নিম্নতম বার্ষিক অয়নগতি ৪৬″·২ বিকলা ও উর্দ্ধতম বার্ষিক গতি ৫০″·২ বিকলা; অতএব মধ্যম অয়নগতি ৪৮″·২ বিকলা পাইয়াছেন। গড় বার্ষিকগতি ৪৮″ বিকলা লইলে সপ্তর্ষি ভ-গণের (এক নক্ষত্র হইতে পুনরায় সেই নক্ষত্রে আগমনের) অর্থাৎ ২৭ নক্ষত্র ভোগ কাল ২৭০০০ বৎসর হয়। (অতএব এক এক নক্ষত্র ভোগ কাল ১০০০ বৎসর)। ইহাই যে সপ্তর্ষি ভ-গণের কাল তাহা পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায়। মৎস্য ও বায়ুপুরাণের অধিকাংশ পুঁথিরই পাঠ এই :—"সপ্তর্ষীণাং যুগং হ্যেতৎ দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতাঃ। মাসা দিব্যাঃ স্মৃতাঃ ষষ্টি-দিব্যাব্দানি তু সপ্ততিঃ।" সপ্তর্ষিগণের এই যুগ দিব্যসংখ্যায় ৬০ মাস ও ৭০ বৎসর, অর্থাৎ ৭৫ দিব্য বৎসর। এক এক দিব্য বৎসরের মান মানুষ মানের ৩৬০ গুণ। সুতরাং সপ্তর্ষিযুগের মান (৭৫ × ৩৬০ =) ২৭০০০ বৎসর। অর্থাৎ এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল ১০০০ বৎসর, ১০০ বৎসর নহে। পার্জিটার সাহেব উপরোক্ত পাঠ দেখিয়াও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অজ্ঞতা নিবন্ধন বলিলেন যে, এই পাঠটি "erroneous" (Dynasties of the Kali Age p. 60 fn.)। গিরীন্দ্রবাবুও এই পাঠটী লক্ষ্য করেন নাই। Colebrooke সাহেব তাঁহার "On the Indian and Arabian divisions of the Zodiac" প্রবন্ধে হিন্দু জ্যোতিষ ও পুরাণ হইতে সপ্তর্ষি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় দক্ষিণায়ন মঘায় হইত, এই অনুমান করেন। বস্তুতঃ পুরাণের উপরোক্ত পাঠটী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে দৃঢ়তার সহিতই তিনি ইহা বলিতেন। তাঁহার উক্তি এই—

"...for the circle of declination passing between Kratu and Pulaha (the first two of the seven Rishis) and cutting the ecliptic only 2° short of the beginning of Magha was the *solsticial colure*, when the equinox was near the beginning of Krittika ; and such probably was the reason of that line being noticed by ancient Hindu astronomers. It agrees with the Solsticial Colure on the sphere of Eudoxus, as described by Hipparchus A similar circle of declination, passing between the same stars, intersected the ecliptic at the beginning of Magha when the solstitial colure passed through the middle of Aslesha ; and a like circle passed through the next asterism when the equinox corresponded with the first point of Mesha" (Miscellaneous Essays. p. 317)। Brennand সাহেবও তাঁহার Hindu Astronomy" গ্রন্থে (১৩-১৭ পৃঃ) বলিয়াছেন :—"In the preceding passages with respect to the Rishis quoted by Colebrooke from various astronomical works of the Hindus, the writers agree in the common mistake of the supposed motion of the line of Rishis, and in the opinion that a *solstice* moves through each asterism in 100 years ; but we can only regard these mutilated fragments of a nearly perfect theory as having had a common origin in a remote age. We may suppose that they have been handed down from the same Jyotisha family by its scattered descendants and that the original doctrines have lost their true form, from repeated transcripts, during long periods of time, and this liability to error would be increased by the complex nature of the subject without sufficient explanation. In short, the rate of motion of the solstices originally known and so near the truth, became lost to the successors of the earliest astronomers. From extracts above given it will be seen

that the several writers *refer to a motion which they themselves evidently did not understand, but which they were endeavouring to explain from traditional doctrine received from previous astronomers, to whom the subject was really clear*...It will be observed that the astronomers of the period between the 16th and 14th centuries before the Christian era had made n any discoveries and among others this that the solisticial colure was moving backwards along the signs...Now, what is more natural that omissions and mistakes should be made in the numerous copies of the statements of the original astronomers, who lived more than 28 centuries ago, or *that a cypher should have been lost, or even a dot (which, we are told, ancient writers used in lieu of a cypher)* at the end of the number, and that the modern Hindu writers should have been misled in stating 100 instead of 1000 years, 2700 years for a revolution instead of 27000 years'? ২৭০০০ বৎসরের স্থানে ২৭০০, ও ১০০০ বৎসরের স্থানে ১০০—এইরূপ ভুল যে হইয়াছে, তাহার কারণ Brennand সাহেব সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। একটী শূন্য "o" নষ্ট হওয়ায়, অথবা প্রাচীনকালে যে বিন্দু '॰' দ্বারা শূন্যকে বুঝান হইত, তাহা লেখকের অনবধান বশে নষ্ট হওয়ায় ঐরূপ ভ্রমের উৎপত্তি। ঐরূপ ভ্রম যে হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ দিতেছি।

আল্‌বেরুনী (১০৩২ খৃঃ) ভারতে আসিয়া হিন্দু জ্যোতিষ ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া অনেক কথা নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই সপ্তর্ষি ভ-গণ সম্বন্ধে বরাহমিহিরের "বৃহৎসংহিতা" হইতে "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ…"ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি, "শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্ একৈকস্মিন্ ঋক্ষে"—যে পাঠ আজকাল সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, সে স্থানে "ষট্‌শতং তে…"এই পাঠ দেখেন। অর্থাৎ সপ্তর্ষিরা এক এক নক্ষত্রে ৬০০ বৎসর অবস্থান করেন। কিন্তু এই বিষয়টী ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া আল্‌বেরুনী অনেক আলোচনা করিয়াছেন (Alberuni's India Vol I: Sachau's Trans. pp. 389—393; "On the Constellation of the Great Bear ।) বস্তুতঃ বরাহমিহিরোক্ত গর্গের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা দেখাইতেছি। ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বে যে মঘানক্ষত্রের অন্তভাগে দক্ষিণায়ন হইত, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সে সময় অয়নান্তবৃত্ত অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ তারাদ্বয়ের মধ্য দিয়া নিকটবর্ত্তী ধ্রুবতারা A Draconis এর পাশ দিয়া গিয়াছিল। (পরে অনুমান ১৫২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে অয়নান্তবৃত্ত B Ursa Majoris তারা স্পর্শ করিয়া গিয়াছিল। আবার ৯১০ খৃঃ পূঃ অব্দে অয়নান্তবৃত্ত A Ursa Majoris তারা স্পর্শ করিয়া গিয়াছিল)। ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের অনেক পরে অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ তারা দুইটীর সায়নধ্রুবের (polar longitude) পরিবর্ত্তনকেই সপ্তর্ষির গতি বলা হইত মনে হয়। অর্থাৎ গিরীন্দ্রবাবুর ভাষায় "সপ্ত ঋষয়"-এর 'দিবি আরোহণ' হইল। যেমন ১৫০০ খৃ পূঃ অব্দে E Ursa Majoris (বশিষ্ঠ) তারার সায়ন ধ্রুব ১৩৫°৫ ও ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বের সায়ন ধ্রুব ১৬১°৯ অংশ। উভয়ের অন্তর ১২০০ বৎসরে ২৬°৪ অংশ, অর্থাৎ দুই নক্ষত্র। সুতরাং গর্গাচার্য্য বলিতেছেন সপ্তর্ষির এক এক নক্ষত্র ভোগ কাল ৬০০ বৎসর। মুনীশ্বর (১৬০২ খৃঃ) তাঁহার "সিদ্ধান্ত সার্ব্বভৌম" নামক গ্রন্থে, সপ্তর্ষিরা কোন্ নক্ষত্রে আছেন তাহা নির্ণয় করিবার একটী নিয়ম দিয়াছেন। সেটী এই :—কলাব্দ হইতে ৬০০ বাদ দিয়া অবশিষ্টকে দ্বিগুণ করিয়া, উহাকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল সপ্তর্ষির অবস্থান অংশে (Degreeতে) পাওয়া যাইবে। এক্ষণে মুনীশ্বরের সময় (৩১০২+১৬০১=) ৪৭০৩ কলাব্দ। ইহা হইতে ৬০০ বাদ দিলে ৪১০৩ বৎসর হয়। ইহার [৮২০৬। ইহাকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে ৫৪৭ অংশ হয়। ৩৬০° অংশ বাদ দিলে মুনীশ্বরের সময় (১৬০০ খৃঃ অব্দে) সপ্তর্ষির স্থান ১৮৭° অংশ হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে সূক্ষ্ম ধ্রুবক গণনায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে Ursa Majoris (মরীচি) তারার সায়নধ্রুবক ২০৪°৭ অংশ পাওয়া যায়। ইহা হইতে সে সময়ের অয়নাংশ ১৮° অংশ বাদ দিলে ঐ তারার নিরয়ন ধ্রুবক ১৮৬°৭ অংশ পাওয়া যায়। সুতরাং মুনীশ্বর যে Ursa Majoris (মরীচি) তারার স্থান নির্ণয় করিতে বলিতেছেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। লল্লাচার্য্য ও নিজগ্রন্থে মরীচি প্রভৃতির স্থান নির্ণয়ের নিয়ম দিয়াছেন। আল্‌বেরুনী, বিত্তেশ্বর (৯০০ খৃঃ) নামক এক জ্যোতিষীর "করণসার" নামক গ্রন্থে সপ্তর্ষিদের গতিগণনা সম্বন্ধে একটি নিয়ম দেখেন। উহা হইতে জানা যায় যে ১০০,০০ কে ৪৭ দিয়া ভাগ করিলে সপ্তর্ষিদের একরাশি বা ৩০ অংশ গমনের কাল পাওয়া যায়। এই হিসাবে ৩০° অংশ গমনের কাল ২১২°৩ বৎসর। বস্তুতঃ এখানেও একটী শূন্যের ভুল হইয়াছে। ১০০'০০০কে ৪৭ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে ৩০° অংশ গমনের কাল ২১২৩ বৎসর। অতএব এক অংশ গমনের কাল ৭০°৩ বৎসর (বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষমতে এক অংশ অয়নচলনের কাল প্রায় ৭২ বৎসর)। আল্‌বেরুনী কাশ্মীরে গিয়া শুনিলেন যে, তথাকার লোকেরা বলে, সপ্তর্ষিরা ১০০ বৎসরে এক নক্ষত্র ভোগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাশ্মীরী ভট্টোৎপলের পর হইতে বোধ হয় বরাহমিহিরের সংহিতার এই '৬০০" বৎসরের পাঠটী একেবারে লোপ পাইয়া ১০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ভ্রমের কারণ সম্বন্ধে আল্‌বেরুনী অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের কোন কোন পুথিতে "তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা জ্ঞেয়া অষ্টশতং সমাঃ।" এই পাঠ ও আছে। এগুলি ভ্রম নহে। সপ্তর্ষি তারাগুলি ক্রান্তিবৃত্তের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। এই কারণে এক এক নক্ষত্র ভোগকাল বিভিন্ন সময়ে অসমান। অনেক হিন্দু জ্যোতিষীই নিজ নিজ সময়োপযোগী সপ্তর্ষিদের স্থানগণনা সম্বন্ধে নূতন নূতন নিয়ম দিয়াছেন। অয়নগতি ১০০০ বৎসরে এক নক্ষত্র ভোগ স্থলে ১০০ বৎসর ধরায় ভুলে, ও সপ্তর্ষিদের (solstitial pointএর) গিরীন্দ্র বাবুর কথিত "দিবি আরোহণ" ও অতি উর্দ্ধে স্থিত তারার প্রাপ্তি হেতু, তাহাদের এক এক নক্ষত্রভোগকাল বিভিন্ন সময়ে অসমান। এই কারণ empirical

formula সৃষ্টি করিয়া তাৎকালিক স্থান দেখানর প্রয়াস। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে গিরীন্দ্র বাবু দেখিবেন যে, সপ্তর্ষির গমন একটি নৈসর্গিক ব্যাপার। তাঁহার অনুমিত কাল্পনিক ব্যাপার মোটেই নহে।

যুধিষ্ঠিরের সময় (৩১০২ খৃঃ পূঃ) মঘানক্ষত্রের অন্তভাগে দক্ষিণায়ন ছিল। মৈত্রায়ণী উপনিষদের সময় মঘানক্ষত্রের আদি ভাগে দক্ষিণায়ন হইত উক্ত হইয়াছে। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "The Age of the Brahmanas" নামক প্রবন্ধে (Indian Historical Quarterly Vol. X, 1934) এই উক্তি হইতে মৈত্রায়ণী উপনিষদের কাল ১৮৮০ খৃঃ পূঃ গণিয়াছেন। কিন্তু সে সময় মঘা তারা (Star Regulus) হইতেই মঘা নক্ষত্রভাগের আদি ধরা হইত। ইহা কেতকর, যোগেশ বাবু প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মঘার আদি, প্রবোধ বাবু যে স্থানে ধরিয়া গণিয়াছেন, তাহা হইতে আরও ৬° অংশ পূর্ব্বে। অর্থাৎ মৈত্রায়ণী উপনিষদের কাল আরও (৬ × ৭২ =) ৪৩২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ (১৮৮০ + ৪৩২ =) ২৩১২ খৃঃ পূঃ হইবে। প্রবোধ বাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, পাণ্ডবেরা মৈত্রায়ণী কালের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে বৈদিক ব্রাহ্মণসাহিত্যের কাল, পূর্ব্বফাল্গুনীর আদিতে দক্ষিণায়ন হইত ধরিয়া গণিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বফল্গুনীর অন্ত ধরিলে ব্রাহ্মণসাহিত্যের কাল ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে (৪১০০ খৃঃ পূঃ) হয়। কিন্তু ইহাই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঊর্দ্ধতম সময়ের নিদর্শন নহে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে চিত্রা পূর্ণমাসেও দক্ষিণায়ন হইত, এইরূপ প্রমাণ আছে। তিলক মহাশয় লিখিত "Orion" গ্রন্থে এই সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। "চিত্রা পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্। চক্ষুর্বা এতৎ সংবৎসরস্থ যৎ চিত্রা পূর্ণমাসো মুখতো বৈ চক্ষুর্মুখত এব তৎ সংবৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে তস্য ন নির্য্যাস্তি।" তাহা হইলে ব্রাহ্মণসাহিত্যের ঊর্দ্ধতম কাল অনুমান ৫০০০ খৃঃ পূঃ হয়। এ সম্বন্ধে এস্থানে অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

আমরা বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পাই অশ্লেষার অর্দ্ধে দক্ষিণায়ন। সুতরাং এ সময় ১৮০০ খৃঃ পূঃ। পরে বরাহমিহিরের সময় পুনর্বসুর অন্তে কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন হইত পাইতেছি। সুতরাং প্রাচীন মঘার বা অশ্বিনীর আদি স্থান হইতে গণিলে এই অবস্থা খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে প্রথম শতাব্দীতে হইয়াছিল পাওয়া যায়। প্রথম বরাহমিহিরের সময় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী। ইহার সময়ের পর চিত্রা (Spica) তারার ১৮০° অংশ দূরস্থিত ক্রান্তিবৃত্ত-স্থানকে অশ্বিনী বা মেষের আদি বলিয়া হিন্দুজ্যোতিষে ধরা হইয়াছে। ৩০০ হইতে ১০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষেও এই ভাবে প্রাচীন বৈদিক অশ্বিন্যাদি প্রবর্ত্তিত হয়। অনেকের ধারণা পরবর্ত্তী কালের ভারতবর্ষ ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষের অশ্বিন্যাদি গ্রহণ করিয়াছে। ইহা সত্য হইলে প্রাচীন বৈদিক অশ্বিন্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ব্যাবিলোনীয় চিত্রাপক্ষীয় অশ্বিন্যাদি গ্রহণই সেই অনুকরণ। রেবতী তারা অশ্বিন্যাদিরূপে গ্রহণ ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষের অনুকরণ নহে। কারণ, রেবতী তারা কোনও সময় ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষের আদিবিন্দু ছিল না। পরবর্ত্তী কালে হিন্দু জ্যোতিষে রেবতী তারা অন্য কারণে আদিবিন্দুরূপে গৃহীত হইয়াছে। উহা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

পুরাণ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, রাজা ভরত ২৭০০০ বৎসরের চক্র (সপ্তর্ষিচক্র) প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। "সর্বান্ কামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী। সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্ত্তয়ৎ॥" (ভাগবত ৯—২০—৩২)। অর্থাৎ রাজা ভরত ত্রিনব (৩ × ৯ =) ২৭ সহস্র বৎসরের চক্র (cycle) সর্বত্র প্রচলিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক, জ্যোতিষিক ও গ্রীক্ প্রমাণগুলি বিবেচনা করিয়া গিরীন্দ্রবাবু তাঁহার পুরাণ-প্রবেশের "কল্যব্দ বা ভারতযুদ্ধের কাল" হইতে "কালনির্দ্দেশ" অংশ শোধন করিয়া প্রকাশ করিলে আমরা সুখী হইব।

— শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান

...ইউরোপীয়, তথা ইংরাজগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে এতাদৃশ দুষ্ট, তাহা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তাহা বুঝিতে পারেন না।

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই যে অত্যন্ত দুষ্ট এবং ঐ দুষ্টতার জন্যই যে আধুনিক জগতের প্রত্যেক দেশের মনুষ্যসমাজকে আর্থিক অভাবে, শারীরিক অস্বাস্থ্যে এবং মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতে হইয়াছে, তাহা ইংরাজগণ প্রায়শঃ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই, আমাদের মধ্যে তাঁহাদের সংস্রবে যাঁহারা অধিক পরিমাণে আসিয়াছেন, তাঁহারাও উহা বুঝিতে পারেন না। ইহারই ফলে সমস্যাসমূহের গবেষণার (research) অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও ঐ সম্বন্ধে আমাদিগের নেতৃবর্গের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না।...

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল চৌদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কলেজের দশ জনের মধ্যে একাদশ জন হইয়া উঠিবার শক্তি মধুর ছিল। চরিত্র-মাহাত্ম্য অপেক্ষা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কলেজের ছাত্রদিগকে বেশি আকর্ষণ করে; আধুনিক কলেজগুলি বুদ্ধিকে প্রখর করিয়া তুলিবার শান-পাথর; চরিত্রবান্ ছাত্ররা সেই অনুপাতে বুদ্ধিমান্ না হইলে স্কুল কলেজে একেবারে নিষ্প্রভ। কলেজের চর্চ্চা বুদ্ধির, পরীক্ষা বুদ্ধির; এই কলেজীয় মাপকাঠিতে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে গিয়া বাঙালী এক শতাব্দীর মধ্যে ধীসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ইন্টেলেক্ট্ শেষ পর্য্যন্ত চারিত্রিক পীঠ-ভূমি ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না; বাঙালী এক শতাব্দীর কলেজীয় শিক্ষার অবসানে আসিয়া আজ যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তার কারণ বাঙালীর ইন্টেলেক্ট্ ও চরিত্র সমান ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ইন্টেলেক্ট্ মাত্র সহায় খঞ্জ বাঙালী ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, যেমন করে ভিড়ের মধ্যে আর দশ জনের চেয়ে খোঁড়া লোক্‌টা।

মধুসূদনের কলেজের খ্যাতির মূলে এই ব্যালান্সের অভাব; সকলেই জানিত মধু বুদ্ধিমান্, আবার সকলেই সন্দেহ করিত মধু সে পরিমাণ চরিত্রবান্ নয়; এই সময় হইতেই ছাত্রদের নিকটে, বন্ধুদের নিকটে মধুসূদন রহস্যময় ছিলেন; তাই সকলের ছিল মধুর প্রতি এমন আকর্ষণ।

মধু ধনীর সন্তান ছিলেন, কাজেই ব্যাবহারিক দিক্ দিয়া বিদ্যার বেশি প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই; কলেজকে তিনি একান্তভাবে অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি হিন্দু-কলেজের প্রথম আমলের অনেক ছাত্রই সেরূপ মনে করিত না। সে আমলের ছাত্ররা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গিয়া টাকার স্বাদ পাইয়াছিল—আর এ আমলের ছাত্ররা···!

মধুসূদন কলেজে প্রবেশ করিবার পর হইতেই বিখ্যাত—কলেজের মধ্যে; এই কলেজীয় খ্যাতি মধুর পরবর্ত্তী জীবনে কাজে লাগিয়াছিল; কারণ, এখানে যে-সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকেই ভবিষ্যতে বাঙলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল—মধুকে পরবর্ত্তী দুঃসময়ে সাহায্য করিয়াছিল। মধুর জীবনে বন্ধুপ্রীতি একাধিক অংশে সার্থক; আত্মীয়রা তাঁহাকে বাধা দিয়াছে, বন্ধুরা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে, প্রীতি এবং ঋণ দিয়া।

মধুর সহপাঠীরা, সমপাঠীরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে, তাঁহার মত এমন বুদ্ধিমান্, সাহিত্য-রসিক, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ, মেধাবী ছাত্র কচিৎ দৃষ্ট হইত। হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন মধুর আদর্শ ছিল; সাধারণ ছাত্ররা অনেক সময়ে রিচার্ডসনকে বুঝিতে পারিত না, তাহারা মধুকে আদর্শ করিয়া লইয়াছিল।

ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন সে আমলের বাঙালী ছাত্রদিগকে দুই দিক্ দিয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছে; ডিরোজিও ধী-প্রবণ, রিচার্ডসন ভাবপ্রবণ; ডিরোজিও বাঙালীর বিচার-বুদ্ধিকে, রিচার্ডসন বাঙালীর রস-পিপাসাকে জাগ্রত করিয়াছে; আবার দুইজনেরই নৈতিক চরিত্রের অভাব ছিল। এই ব্যালান্স-হীনতাই দুইজনকে বাঙালীর ছাত্র-সমাজের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। হেয়ারকে তাহারা ভক্তি করিত, কিন্তু ভালবাসিত এই দুই চারিত্র্য-মাহাত্ম্যহীন অধ্যাপককে। ভালবাসিবার পক্ষে একটুখানি খুঁৎ প্রয়োজন। ডিরোজিওর ছাত্রদের অনেকেই পরবর্ত্তী কালে সংস্কারক হইয়াছে; রিচার্ডসনের ছাত্রদের অনেকে সাহিত্যিক; মধু এই শেষোক্ত দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মধুর কলেজীয় খ্যাতির প্রধান কারণ মধু কবিতা লিখিত: ছাত্ররা ডিরোজিও, রিচার্ডসনকে কবিতা লিখিতে দেখিয়াছে, মধুও কবিতা লেখে—ইংরাজী ভাষায়, তাহারা অবাক্ হইয়া যাইত, মধুকে রিচার্ডসন, ডিরোজিও ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করিত! বলা বাহুল্য কেহই মধুর কবিতা বুঝিত না—অবাক্ বনিবার পক্ষে না বোঝাই ভাল—বুঝিলে মধুর এই সব কাব্য-আবর্জ্জনা কেহ সযত্নে রক্ষা করিত না।

তাহারা মধুর কাব্য বুঝিত না বলিয়াই কেহ তাঁহাকে স্কট, কেহ মুর, কেহ বায়রণ বলিত। খৃঃ ১৮৪০-এর কথা বলিতেছি, বাঙালী ছাত্রমহলে ইউরোপের আসনচ্যুত এই সব কবিরাই বোধ হয় তখন কাব্যের অধিদেবতা ছিল! সে-আমলের ছাত্রদের তুলনায় আজকালকার ছাত্রদের আর যে-দোষই থাক, কাব্য বিষয়ে আধুনিকেরা অধিকতর সজাগ—বোধ হয় কিছু বেশি-ই সজাগ।

রিচার্ডসন মধুকে তাঁহার বন্ধুগণের অপেক্ষা বেশি বুঝিয়াছিলেন—তিনি মধুকে পোপ বলিতেন, বলা বাহুল্য মধু খুসি হইত। অবশ্য পোপের প্রতিভা মধুর আছে রিচার্ডসন এ কথা মনে করিতেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন মধুর ইংরাজী কবিতা পোপের কাব্যের নকল। সেকালের ছাত্ররা যে স্কট বায়রণের কাব্যের অনুকরণ করিত, সে-স্কট বায়রণ, পোপের শিষ্য, অষ্টাদশ শতকের ধরণের তাহারা কবি। যে-স্কট-বায়রণ রোমাণ্টিক কবি, তাহাদের বুঝিবার ও অনুকরণ করিবার শক্তি তখনকার ছাত্রদের ছিল না, অনেক কাল পরের ছাত্ররা তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, মধু স্কট-বায়রণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা পোপের অনুপ্রেরণা। স্কট ও বায়রণ উভয়েই পোপকে কাব্যাদর্শ মনে করিত, এবং ওয়ার্ডস্বার্থ কেহই বুঝিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে মধুর কাব্য জীবনে রোমাণ্টিক কবিদের কোন প্রভাব নাই; রোমাণ্টিক কবিতা উপলব্ধির শক্তি তাহার ছিল না; তাহার কাব্য-জীবনের আরম্ভে পোপ ও পরিণামে মিল্টন্; পোপের pretty-ness হইতে মিল্টনের sublimityতে, পোপের psuedo-classicism হইতে মিল্টনের classicism-এ উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস মধুসূদনের কাব্যে!

মধুসূদনের ইংরাজী কাব্যের তেমন আলোচনা হয় নাই—বাংলা কাব্যের আওতায় তাঁহার ইংরাজী কাব্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজী কবিতার আলোচনা করিলে মধুসূদন দত্ত ব্যক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে, কারণ অধিকাংশ কবিতা লিরিক্, ইহাতে কবির ব্যক্তিত্বের সূচনা আছে। পরবর্তী অধিকাংশ বাংলা কাব্য কম বেশী নৈর্ব্যক্তিক; ইহাতে কবি আপন প্রতিভার অন্তরালে অন্তর্হিত; মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও নাট্যসমূহ অনেক পরিমাণে privacy of glorious light এর মত কাজ করিয়াছে; কেবল শেষ জীবনের সনেটগুলিতে কবি আবার ধরা দিয়াছেন।

এই সময়কার কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে:—

(ক) এই সব কবিতায় কবি-জীবনের এমন পূর্ব্বাভাস আছে, যাহাতে মনে হয় কবির জীবন যে সুখের হইবে না, তাঁহার জীবন যে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায়; দুর্যোগের বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রির মত, কবি যেন কোন অপূর্ব্ব মন্ত্রবলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

(খ) মধুসূদনের জীবনের ব্রত যে কাব্য-রচনা; তিনি যে মহাকবি হইবেন; এমন পরিচয়ও আছে।

(গ) মধুসূদনকে আমরা পূর্ব্বে একস্থলে 'স্বব' বলিয়াছি; এই 'স্ববামি'র বহু লক্ষণ কবিতাগুলিতে আছে।

(ঘ) জীবনে তাঁহার শান্তি নাই। শান্তি ও প্রতিভার স্ফূর্ত্তি যদি কোথাও থাকে তবে তাহা বিলাতে, ইহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ঝঞ্ঝামথিত, মসীকৃষ্ণ সমুদ্রের আহ্বান যেন কবি অল্প বয়স হইতেই শুনিতে পাইতেছিলেন—

Like the weed which angry Tempests throw,
Far from the native soil in the dark wave,
Now sinking, as if buried, disappears;

... ...

And e'en the dark and ever-lasting sea
All, all these bring oblivion for my woes
And all these have transcendent charm for me!

অশান্ত কবি-হৃদয়ের সান্ত্বনা যেন ওই চিরন্তন মসীকৃষ্ণ সমুদ্রে!

আর একটি সনেটে কবি বলিতেছেন, প্রকৃতির মুগ্ধ সৌন্দর্য্যে সান্ত্বনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হায়—

But oh! man's brightest day,
Is e'er succeeded by a night of gloom,
And peace and rest for thee is only in the tomb.

আর একটি কবিতা আছে, ঝঞ্ঝা—

A storm.
Proclaim, the storm is nigh,

The Sun himself is fled.

আর একটি কবিতা—

The slave.
The ship that wafts him far away
From country, home, Love's sunny hold.
... ...
And sever thee from all that's thine.

কবি যাহা মনে করিয়াই লিখুন, ইহার মধ্যে কবির ভবিষ্যৎ জীবনের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

কবি-জীবনের এই অংশটা আলোচনা করিতে করিতে আমার কেবলি কবির কথায় মনে হইয়াছে—Proclaim the storm is nigh.

এই ঝঞ্ঝা তাহার বিশ বছর বয়সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—কবির ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে। বলা বাহুল্য ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের নৈতিক যুক্তি আমি তুলিতেছি না, কারণ মধুসূদনের বিশ বছর বয়সে খৃষ্টধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে সমান আস্থা ছিল। ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ না করিলেও হিন্দু থাকিয়াও যথেষ্ট সামাজিক বিপ্লব তিনি করিতেন!

যে ঝঞ্ঝা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই প্রাথমিক প্রলয়-নিঃশ্বাসে তিনি নঙ্গর ছিঁড়িয়াছিলেন; আবার একদিন ইংরাজী সহিত্যের নঙ্গর ছিঁড়িয়া কবি অতর্কিত ভাবে বাংলা সাহিত্যের কূলে ভিড়িলেন। মাইকেলের জীবন বারে বারে নঙ্গর ছিঁড়িবার ইতিহাস!

Song of Ulysses নামে কবিতায় কবি নিজেকে Ulysses ভাবিয়া বলিতেছেন—

O Penelope! O Penelope!
My chaste, my faithful maid!
Lo! I shall love, nor love thee less,
Tho' life decay and fade!

এই Penelope কে জানেন? আমি জানি—কবির কাব্যলক্ষ্মী। কিন্তু Penelope কেন? মধুর কবির আদর্শ হোমার, কাজেই হোমারের সৃষ্ট Penelope তাঁহাকে যে অনুপ্রাণিত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! মধুসূদন নিজে ইউলিসিসের মত সমুদ্রে ভ্রাম্যমাণ; সে সমুদ্র জীবন-সমুদ্র। সে সমুদ্র গ্রীক-রোমান ক্লাসিকাল কাব্যের অকূল রহস্যময় সমুদ্র! মধুসূদনের কাব্য-জীবন এই দুস্তর সমুদ্রে তরঙ্গ-তাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—কবিগুরু বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, আর এক পারে হোমার, ভার্জ্জিল, মিল্টন; মধুর কাব্য-জীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।

আবার কতকগুলি কবিতায় বিলাতের আকর্ষণ! মধুর কাছে চিরদিন বিলাত ও কাব্যাদর্শ অভিন্ন! কি যুক্তিবলে জানি না বিলাতগমন ও মহাকাব্য রচনা এক হইয়া গিয়াছিল; তাহার বিশ্বাস ছিল বিলাত যাইতে পারিলেই তিনি মহাকবি হইতে পারিবেন।

হিন্দু-কলেজে থাকিতেই একখানি পত্রে তিনি গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন—

"Oh! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

বিলাতের প্রতি এই আকর্ষণ আজিও বাঙ্গালীর মনে আছে, কেবল রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিতে পারিলে বড় চাকুরী পাইব—এরূপ চিন্তা, বহুতর দুঃখকর অভিজ্ঞতার পরেও, বাঙ্গালী আজিও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মাইকেলের উক্তি হইতে বোঝা যায়, কবিখ্যাতি সম্বন্ধে তিনি এক প্রকার কৃত-নিশ্চয় ছিলেন; ইহা একাধারে কবিত্বের প্রতি স্পৃহা ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ 'স্ববামি'।

মাইকেল কবি, কাযেই এই ভাবটিকে গদ্যে বলিয়া শান্তি পান নাই—পদ্যেও বলিয়াছেন—নাম Extemporary Sorry; মোটেই extemporary নয়—বহুচিন্তা-প্রসূত।

I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountains high;
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime, yet, oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless grave!
My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From sad eyes like winter's dew,
And oh! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land!

এ কোন্ ইংলণ্ড? যে-ইংলণ্ডে তিনি কার্য্যতঃ ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়াছিলেন, সেই দেশ কি? না, এ ইংলণ্ড আদর্শ ইংলণ্ড, যাহার পরিচয় পাই আমরা ইংরাজি কাব্যে। কিন্তু সেই আদর্শ ইংলণ্ডের পরিচয়ের জন্য কি সে দেশে যাওয়া আবশ্যক? সে-দেশের পরিচয় এ দেশে থাকিয়াই হইতে পারে; মধুরও হইয়াছিল, মহাকাব্য লিখিবার জন্য তাঁহাকে

ইংলণ্ডে যাইতে হয় নাই। মধু আদর্শ ও বাস্তবে প্রভেদ করিতে জানিতেন না, শিশুরাও জানে না, মধু কি বয়সের কথা ছাড়িয়া দিলে, শিশু ছিলেন ? তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে সেইরূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়।

গৌরদাস বসাককে তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন—

Perhaps you think I am very cruel, because I want to leave my parents. Ah! my dear! I know that, and I feel for it. But "to follow poetry" (Says A. Pope) "one must leave both father and mother."

মাইকেলের মধ্যে একটা দানবীয় শক্তি মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল; সেই দানবটাই তাঁহাকে সমাজছাড়া করিয়াছিল; বারংবার দেশছাড়া করিয়া ইংলণ্ডে লইবার চেষ্টা করিতেছিল; মাদ্রাজ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; আবার সবেগে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল; বাংলা কবিতার পয়ার রূপ পায়ের বেড়ি এক আঘাতে শত খান করিয়া ফেলিয়াছিল এবং অবশেষে সত্য সত্যই ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিল।

এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, মাইকেল ইংরাজী কাব্যের যে form গ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইতেছিল না, কোথাও একটা অশান্তি ছিল, নতুবা মাইকেলের মত একগুয়ে লোক যে বেথুনের উপদেশ শুনিয়াই ভাল ছেলের মত বাংলা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা মনে হয় না। মাইকেল কাহারো উপদেশ শুনিবার পাত্র ছিলেন না।

আর কতকগুলি কবিতা আছে যাহাতে মাইকেলের 'মবামি' প্রকাশিত! তাঁহার ভক্তেরা এই গুলিই যেন বেশী পছন্দ করিতেন।

ভোলানাথ চন্দ্র মাইকেলের রচিত 'Night holds her Parliament' শব্দ-সমষ্টি শুনিয়া পাগল হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, পঞ্চাশ বছর পরেও তিনি কথাটা ভুলিতে পারেন নাই। কাহারো কাহারো দুষ্ট-বাক্য মনে রাখিবার অসীম শক্তি থাকে। মাইকেলের এই চিত্রে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের সেক্‌স্‌পীয়ের, বায়রণ কতজনকে মনে পড়িয়া গিয়াছে। সেকালের ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে ইনি না কি সেরা ইংরাজী-নবিশ ছিলেন!

গৌরদাসকে মাইকেল এক শিশি পমেটম পাঠাইতেছেন; ল্যাভেণ্ডার পাঠাইতে না পারিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত। এই পত্রখানিতে তিনবার 'd-d' আছে, 'curse' আছে কয়েকবার; ভাঙা কলমের প্রতি অভিশাপ আছে; কলেজের অধ্যক্ষ K-r সাহেবের প্রতি ধিক্কার আছে; তাঁহার দোষ, বোধ করি, তিনি মধুর প্রতিভা ধরিতে পারেন নাই। মধুর 'মবামি'র পূর্ণ পরিচয় এই চিঠির ছত্রে ছত্রে।

মাইকেলের মনে সকল প্রকার খ্যাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ খ্যাতি ছিল কবিখ্যাতি, কিংবা কবি-খ্যাতিকেই তিনি একমাত্র খ্যাতি মনে করিতেন। স্বদেশের ভাবী গৌরবের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার খ্যাতির কথাই মনে পড়িয়াছে; হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—

> ···budding now
> Perchance; unmarked some here are
> Whose temples shall with laureate-
> wreaths be crowned,
> Twined by sisters Nine;—

ইহাদের মধ্যে একজনের সম্বন্ধে মধুর চিত্তে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কবিতা রচনা করিয়াই মধু সন্তুষ্ট ছিলেন না; এ দেশের কোন কোন কাগজে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত, কিন্তু তাহাতেই বা তৃপ্তি কোথায়? ইংলণ্ডে তাঁহার যাইতে না হয় দু'চার দিন দেরি আছে, কিন্তু তাঁহার কবিতার যাইতে বাধা কি? বরঞ্চ, তাঁহার কবিতা আগে গিয়া সেখানে তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তিনি নিয়মিত ভাবে তাঁহার কবিতা বেণ্টলিস্‌ মিসেলেনি, ব্লাকউড ম্যাগাজিনে পাঠাইতেন। ভোলানাথ চন্দ্রের দলের 'আহা মরি মরি' সত্ত্বেও ইংরাজ সম্পাদকেরা ভুল করেন নাই; মাইকেলের একটি কবিতাও বিলাতী কাগজে ছাপা হয় নাই। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—"নিজের রচিত কবিতা শৈশব-সুহৃদ্‌দিগকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইত না; তিনি ওয়ার্ডস্বার্থের ন্যায় কবি-কুল-তিলককে উদ্দেশ করিয়া কবিতা উৎসর্গ করিতেন।" ইহা নিশ্চয় ১৮৪৩ বা তার পরের ঘটনা, কারণ ১৮৪৩এ ওয়ার্ডস্বার্থ Poet Laureate হইয়াছিলেন; ওয়ার্ডস্বার্থের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার মন মাইকেলের ছিল মনে হয় না, তিনি ওয়ার্ডস্বার্থের বিশেষ ধার ধারিতেন না, কিন্তু রাজকবি, সে যে স্বতন্ত্র কথা। সে আসনে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কবি থাকিলে মাইকেল তাঁহাকেও সমান আগ্রহে কবিতা উৎসর্গ করিতেন! কবিত্ব কাম্য, কিন্তু রাজকবি, সে যে একেবারে কামনার অতীত! মাইকেল পরবর্ত্তী জীবনে বর্দ্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহাকে রাজকবি রূপে নিয়োগ করিতে।

বিজ্ঞান-জগৎ

§ ব্যক্তিত্ব

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

মনোবিদ্যাবিশারদগণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন। ব্যক্তিত্ব বলিতে কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে সকলেরই মোটামুটি ধারণা আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দেওয়া কেবলমাত্র কঠিন নহে, অসম্ভব বলিলেও চলে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বিশিষ্টতা কোন বিশেষ ব্যক্তির অন্য ব্যক্তি হইতে স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে, তাহাই ব্যক্তিত্ব। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে, কোন লোকের ব্যক্তিত্ব মোটামুটি হিসাবে কয়েকটি গুণ বা ধর্মের সমষ্টি, কিন্তু মাত্র এই ধর্মগুলির সমষ্টি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিত্ব নহে। ব্যক্তিত্বের এরূপ একটি সমগ্র সত্তা আছে যে, বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব কোন মূর্ত্ত বস্তু নহে, নিতান্তই বস্তুনিরপেক্ষ ও অমূর্ত্ত, কিন্তু পণ্ডিতেরা অমূর্ত্ত বস্তুর মূর্ত্ত রূপ ধরিবার চেষ্টা করিয়াই বিপদে পড়িয়াছেন। নিতান্তই ঘটি-বাটির মত সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রকট করিবার সকল চেষ্টাই তাঁহাদের ব্যর্থ হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও বহু পণ্ডিত আত্মার স্বরূপ লইয়া এরূপ বহু 'গবেষণা' করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কোন লোকের ওজন লইয়া আত্মার ওজন নির্ণয় করিবার মত 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণারও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মা বস্তুধর্মী নহে, সুতরাং তাহার কোন বস্তুগত প্রমাণ পাওয়াও সম্ভব নহে। ব্যক্তিত্বও সেইরূপ বস্তুধর্মী নহে, সুতরাং ইহার স্বরূপ আলোচনায় বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি এবং তথ্য নিতান্তই অচল। ব্যক্তিত্ব ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের অতীত মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়; সুতরাং মনোবিদ্যাবিশারদ অপেক্ষা দার্শনিকেরই ইহা আলোচনার বিষয়।

এখানে অবশ্য ব্যক্তিত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি এবং সাধারণ হিসাবে যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলা হয়, এই দুইটি বিভিন্ন বস্তু। সাধারণ ভাবে ব্যক্তিত্ব বলিতে আমরা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কয়েকটি বিশেষ বিকাশ বুঝি। কোন বিখ্যাত গায়ক, বক্তা, অভিনেতা, সেনাপতি প্রভৃতির ব্যক্তিত্ব বলিতে আমরা তাঁহাদের বিশেষ একটি দিক্ মাত্র লক্ষ্য করিয়া থাকি। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অন্য ব্যক্তির সহিত তাহার আচরণের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তির এই আচরণগত বৈশিষ্ট্য সাধারণ হিসাবে তাহার ব্যক্তিত্ব বলিয়া প্রকাশ করা হয় এবং এই হিসাবে ব্যক্তিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে মনোবিদ্যার আলোচনার বিষয়। এই স্থলে ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তি হইবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, অথবা যে জন্য তাহাকে ব্যক্তি বলা হয়, তাহাই ব্যক্তিত্ব। বৃহত্তর অর্থে ব্যক্তিত্ব আচরণ-সাপেক্ষ নহে, আচরণ বহির্ভূত।

ব্যক্তির আচরণ মনোবিদ্যার আলোচনার বস্তু এবং আচরণ সম্বন্ধে পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বাহির হইতে পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত নিজের আচরণ সম্বন্ধে অন্তর্দর্শন দ্বারাও কিছু জানা যাইতে পারে। বাহির বা ভিতর কোন দিক্ হইতেই কিন্তু ব্যক্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; কয়েকটি সুখপ্রদ বা কষ্টদায়ক অনুভূতি, বিভিন্ন প্রকারের ধারণা, নানা প্রকারের ভাব, চিন্তা এবং স্মৃতি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। পর্য্যবেক্ষণের ফলে কোন মানুষের

মধ্যে নানা প্রকারের অভ্যাস, আসক্তি, বিশেষত্ব ও মুদ্রা-দোষের সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করিলে এই সকল বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাইবে, সুতরাং উপর্য্যুক্ত সকলগুলিই ব্যক্তিত্বের অংশ, কিন্তু কেবলমাত্র অংশগুলির সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব নহে। যেমন কোন ইঞ্জিনের 'ইঞ্জিনত্ব' বলিতে কি বুঝায় তাহা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু যে-কোন ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের সঠিক বিবরণ বলা যায়।

বর্ত্তমানে মনোবিদ্যাবিশারদগণ এই সকল কারণে ব্যক্তিত্বের কোন পরিমাপ করিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশগুলি মাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান, হাতের কাজ, প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা, নৈতিক, ধর্ম্ম-নৈতিক, সমাজনৈতিক প্রবণতা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি পরিমাপ করিবার জন্য শত শত পরিমাপ-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল পরিমাপ-প্রণালীর প্রয়োগযোগ্যতা এবং কার্য্যকারিতা সন্দেহ-যোগ্য।

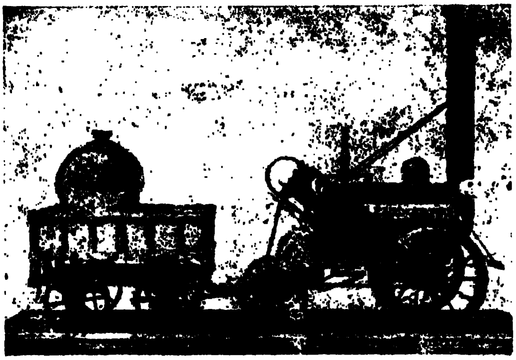
প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত জটিল বস্তু এবং বহু বিভিন্ন অংশের সমবায়ঘটিত, কিন্তু দেখা যায়, এই সকল বিভিন্ন অংশগুলিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, ইহার প্রত্যেকটি আবার বহু ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে কোন লোকের নৈতিক মনোভাব তাহার সাধুতা, নিরপেক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, কিন্তু ইহার কোনটিই বস্তুধর্ম্মী নহে, গুণ বা ধর্ম্মবাচক শব্দ মাত্র। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুতা বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু সাধু আচরণের অস্তিত্ব আছে। কোন লোকের সাধুতা আকস্মিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বহু সহস্র শিশুদের, তাহাদের অজ্ঞাতসারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের আচরণের মধ্যে কোন সঙ্গতি নাই। কোন শিশু কোনও কোনও অবস্থায় সাধু আচরণ করে, কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। কাজেই সাধুতা বলিতে কি বুঝায় তাহারই কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং যে সকল গুণ বা ধর্মের সমবায়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা একরূপ অসম্ভব।

কিছুকাল পূর্ব্বে একদল দার্শনিক বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে চিন্তা বা মননেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে। যে কোন একটি উদাহরণ দিলেই তাঁহাদের চিন্তাধারা বুঝা যাইবে। যেমন মনে করা যাক একটি গোলাপ ফুল। ফুলটির স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমরা মাত্র কয়েকটি গুণ পাই, যথা ফুলটির বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল গুণের অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে আমাদের মনে, ফুলটির মধ্যে নহে; আমাদের বিভিন্ন স্নায়ু বিভিন্নভাবে উত্তেজিত হইলে বিভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক হয়, সুতরাং সকল অনুভূতিই কেবল মাত্র মননের ব্যাপার, বস্তুগত নহে। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে বাহ্যজগতের কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। এই প্রকার চিন্তাধারা যুক্তিসঙ্গত হইলেও সহজাত বুদ্ধি অনুসারে গোলাপফুলের বস্তুগত মূর্ত্ত অস্তিত্বে সকলেই আস্থাবান্। সমগ্র গুণগুলির সমষ্টিগত অভিব্যক্তি ছাড়াও গোলাপফুলের, তথা অন্য যে কোন বস্তুর, যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহা আজকাল এই সকল পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিতেছেন। বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যেমন খণ্ডজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে, ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে যে, খণ্ডিত করিয়া দেখিলে কোন দিনই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ পাওয়া যাইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সহজাত বুদ্ধি অনুসারে জড়বস্তুর অস্তিত্ব প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যাহাকে আমরা সহজাত বুদ্ধি বলি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা আমাদের মানসিক ইচ্ছার প্রতীক মাত্র, কিন্তু ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সহজাত বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তাধারা উভয়ই একমত।

যাঁহাদের রসায়ন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন যে, জল একভাগ অক্সিজেন ও দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সমবায়ে গঠিত, কিন্তু জলের ধর্ম অক্সিজেন বা হাইড্রোজেনের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কেহ অক্সিজেন পান করিবার বা হাইড্রোজেনে কাপড় কাচিবার চেষ্টা করিলে তাহার সুস্থ-মস্তিষ্কতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। জলের স্বাতন্ত্র্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের স্বাতন্ত্র্যের উপর মোটেই নির্ভর করে না। জলের উপাদান দুইটি মিশ্রিত করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা আর যাহাই হউক না কেন, জল নহে।

বর্ত্তমানে বহু বৈজ্ঞানিক জীববিজ্ঞানকে খণ্ডিত ভাবে আলোচনা না করিয়া সমগ্রভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকল প্রাণীর মূল উপাদান জীবপঙ্ক বা



পুরাতন রেল-ইঞ্জিন—জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের 'রকেট'।

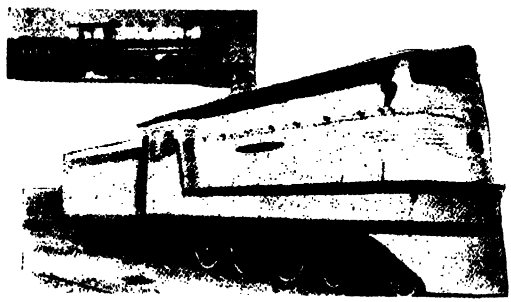
'প্রোটোপ্লাজম্' কেবল মাত্র কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ মাত্র নহে। একটি সামান্য কোষ বা cellএ যে জীবন রহিয়াছে, ইহাতে কোষটিকে তাহার রাসায়নিক পর্য্যায় ছাড়াইয়া আরও উচ্চতর অবস্থায় লইয়া গিয়াছে। অবশ্য কোষের উপাদান ঐ জীবপঙ্ক এবং জীবপঙ্কের উপাদান কিছু পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ, কিন্তু কেবল মাত্র ঐ রাসায়নিক-গুলির সমাবেশ সম্পূর্ণ কোষটির পরিচয় নহে। একটি সামান্য কোষের প্রাণশক্তির ফলে এমন বহু ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, যাহা কেবল মাত্র তাহার উপাদানগুলির পর্য্যালোচনা হইতে বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে।

যে কোন একটি ইতর প্রাণী অসংখ্য কোষের সমষ্টি, সুতরাং তাহার জটিলতা আরও অধিক। একটি ব্যাঙের ভ্রূণ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্বভাবতঃ যে অংশ পরে ব্যাঙের চর্ম্ম হইত সেই অংশ মস্তিষ্কের সহিত 'কলম' বাঁধিলে তাহা চর্ম্ম না হইয়া মস্তিষ্কেরই অংশ হইয়া গড়িয়া উঠে। জীবশরীরের বহু অংশই এই ভাবে প্রয়োজন-মত বিভিন্ন ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

বস্তুতঃ, ব্যাপারটি দাঁড়াইতেছে এই যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা ব্যক্তিত্ব বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহার আলোচনা না করিয়া ব্যক্তিত্বের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের, তাহা মনোগতই হউক বা আচরণগতই হউক, আংশিক আলোচনা মাত্র করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সমগ্রত্ব এবং একত্বের কোন বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা হয় নাই। তাঁহারা বলেন, ইহা হইতেও পারে না, কারণ উহা বস্তুধর্মী নহে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের ধারণা ছিল ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র কতকগুলি গ্রন্থির বা গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং তাহা ইচ্ছামত গ্রন্থির চিকিৎসার ফলে পরিবর্ত্তিত করা চলে, কিন্তু এখন অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ব্যাপারটি তাঁহারা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, ততখানি সহজ নহে। বৈজ্ঞানিকদের আত্মম্ভরিতা যে তাঁহারা অনেকাংশে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা জ্ঞানের দিক্ দিয়া কম লাভের কথা নহে, কারণ ভুল জানা অপেক্ষা না জানা অনেক শ্রেয়ঃ এবং ভুল স্বীকার করিতে পারা সাহসের পরিচায়ক।

আধুনিক রেলগাড়ীর ইঞ্জিন

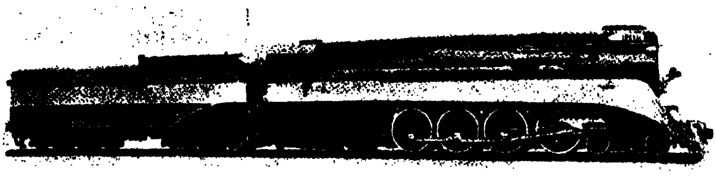
রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের বর্ত্তমান রূপ প্রায় ১১০ বৎসর চেষ্টার ফল। ইহার মধ্যে প্রায় ৮০ বৎসর রেলের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কোন প্রতিযোগী ছিল না। ইহার প্রথম প্রতিযোগী বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম চলিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও সেইরূপ আছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আরও একটি প্রতিযোগী অল্পদিন হইল দেখা



পুরাতন রেল-ইঞ্জিনের আধুনিক সজ্জা। উপরে—১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনটির রূপ। নীচে—ইঞ্জিনটিকে ষ্ট্রীমলাইন্‌ড করিয়া আধুনিক সজ্জা দেওয়া হইয়াছে।

দিয়াছে,—ডিজেল ইঞ্জিন। বর্ত্তমানে রেলগাড়ী চালাইবার জন্য ডিজেল ইঞ্জিনের বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, কাজেই ইহার ফল কি হইবে তাহা এখন বলা কঠিন, তবে অন্য ক্ষেত্রে

যাহাই হউক রেলগাড়ী চালাইবার জন্য এখনও বহুকাল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকিবে।



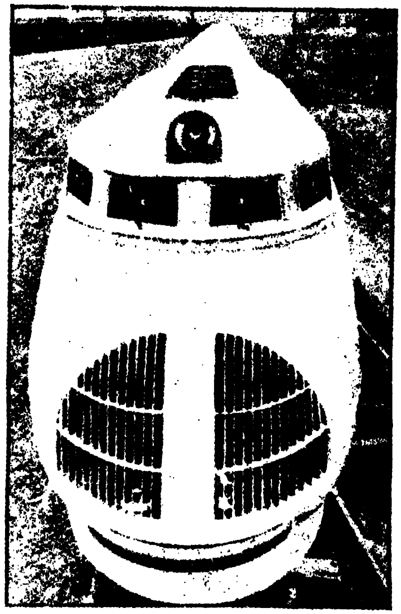
পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ ষ্টীমচালিত রেল-ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটির দৈর্ঘ্য সর্ব্বসমেত ১০৮ ফুট ১১ ইঞ্চি। আনুমানিক বেগ ঘণ্টায় ৯০ মাইল।

মনে রাখিতে হইবে যে, রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের সহিত কোন স্থির ইঞ্জিনের তুলনা করিলে চলিবে না। রেলগাড়ীর ইঞ্জিনকে সচল হইতে হইবে এবং উপরন্তু সমগ্র রেলগাড়ীর আলো প্রভৃতির শক্তি যোগাইতে হইবে এবং জল ও জ্বালানী বহন করিতে হইবে। এই সকল অসুবিধার জন্য স্বভাবতঃই ইহার কার্য্যকারিতা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া সেতুর ভারবাহিতা ও আয়তন এবং লোহার রেলের ভারবাহিতার উপর উহার আয়তন নির্ভর করিবে। এই সকল কারণে রেলের ইঞ্জিন দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুটের, প্রস্থে ১২ ফুটের এবং উচ্চতায় ১৭ ফুটের বেশী হইতে পারে না। সাধারণতঃ, ইঞ্জিনের চাকা পিছু ৩৫,০০০ পাউণ্ডের বেশী ভারী ইঞ্জিন তৈয়ারী করা যৌক্তিক নহে। এই সকল অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও বর্ত্তমান ৫,৫০০ অশ্বশক্তির বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করা যে সম্ভব হইয়াছে এবং ইহাতে ১,৪০,০০০ পাউণ্ডের আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায়, ইহা ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে।

বর্ত্তমান ইঞ্জিন ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ইঞ্জিনের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই, যদিও আকার, আয়তন ও কার্য্যক্ষমতায় বর্ত্তমান ইঞ্জিন ৯০ বৎসর পূর্ব্বের ইঞ্জিন অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইঞ্জিন পূর্ব্বের ইঞ্জিন অপেক্ষা ১০ হইতে ১৫ গুণ ভারী; বাষ্পচাপ ৭০।১০০ পাউণ্ড হইতে ২৫০।৩০০ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে; অশ্ব-ক্ষমতা প্রায় বিশ গুণ বাড়িয়াছে এবং আকর্ষণ প্রায় ২৫।৩০ গুণ বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমান ইঞ্জিনের কার্য্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখন বাষ্প ও কয়লা শতকরা ২০।২৫ ভাগ কম খরচ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ১ ঘণ্টায় ১॥ পাউণ্ড কয়লা পোড়াইয়া ১ অশ্বশক্তি কার্য্যক্ষমতার সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের সহিত স্থাবর ইঞ্জিনের তুলনা করিলে অবশ্য শেষেরটিই অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, কিন্তু দুই শ্রেণীর ইঞ্জিনের নির্ম্মাণ-কৌশল এত বিভিন্ন যে, উহাদের তুলনা করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। স্থাবর ইঞ্জিনে আজকাল বহুক্ষেত্রে ৭০০ পাউণ্ড, সময়ে সময়ে ১০০০।১২০০ পাউণ্ড চাপে ষ্টীম ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে অত অধিক চাপে ষ্টীম ব্যবহার করিতে হইলে বয়লারের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তাহাতে ইঞ্জিনটি এত জটিল হইয়া পড়ে এবং খরচও এত বেশী পড়ে যে, তাহা সুবিধাজনক নহে। য়ুরোপের বহু দেশে, প্রধানতঃ জার্ম্মানী, ব্রিটেন এবং



নূতন ধরণের রেলগাড়ী। এই ইঞ্জিন ঘণ্টায় ১১০ মাইল বেগে চলিবে। চিত্রে গাড়ীর সম্মুখে যে জানালা দেখা যাইতেছে, ঐ জানালা দিয়া বাতাস ঢুকিয়া মোটর ঠাণ্ডা রাখিবে।

ফ্রান্সে এ সম্বন্ধে চেষ্টা চলিয়াছিল। ১৭০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাপে ষ্টীম ব্যবহার করা চলে, এরূপ ইঞ্জিনও নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইঞ্জিনগুলি বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। এমন কি জার্ম্মান সরকার উচ্চ চাপের ষ্টীমসাহায্যে রেলের ইঞ্জিন চালাইবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে কোন নূতন ইঞ্জিনের পরিকল্পনায় ৩৫০ পাউণ্ডের অধিক চাপের ষ্টীম ব্যবহার করা হয় না।

স্থাবর ইঞ্জিনে সিলিণ্ডার হইতে নির্গত বাষ্পকে শীতল করিয়া পুনরায় জলে পরিণত করিবার জন্য 'কনডেনসার'-এর ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ কন্‌ডেন্‌সারের জন্য এত প্রচুর জল আবশ্যক হয় যে, রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে তাহা ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। আমেরিকার সেণ্টলুই নামে একটি শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য ষ্টীম-ইঞ্জিন সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র চালাইবার সময় ইঞ্জিনের কন্‌ডেনসারের জন্য যে পরিমাণ জল প্রয়োজন হয়, সমস্ত শহরের দৈনিক জলের চাহিদা অপেক্ষা তাহা অন্ততঃ তিন চার গুণ অধিক।

সাধারণ বাষ্পীয় ইঞ্জিনে সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্প প্রসারিত হইয়া ইঞ্জিনটিকে চালায়। ইহা ছাড়া 'টারবাইন' নামক আর এক প্রকার যন্ত্র বাষ্পের সাহায্যে চলে। এক প্রকার খেলনা সকলেই দেখিয়াছেন, যাহাতে হাওয়া লাগিলেই সেটি ঘুরিতে থাকে, টারবাইন ইহারই উন্নত সংস্করণ। ইহাতে একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে 'ব্লেড' থাকে এবং ষ্টীম প্রবেশ করিলেই সেগুলি অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকে। যেখানে খুব বেশী কার্য্যক্ষমতার প্রয়োজন, সেখানে সাধারণ ষ্টীম-ইঞ্জিন না ব্যবহার করিয়া টারবাইন ব্যবহার করা হইয়া থাকে। টারবাইনের কার্য্যকারিতা সাধারণ ষ্টীম-ইঞ্জিন অপেক্ষা অধিক। টারবাইন সাহায্যে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন চালাইবার চেষ্টাও হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই, কারণ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থির বেগে না ঘুরিলে টারবাইনের কার্য্যকারিতা অব্যাহত থাকে না, সুতরাং রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে, যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই বেগ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, টারবাইন কার্য্যকরী করিতে হইলে এত জটিল যন্ত্রসজ্জার প্রয়োজন যে, তাহা মোটেই সুবিধাজনক হয় না।

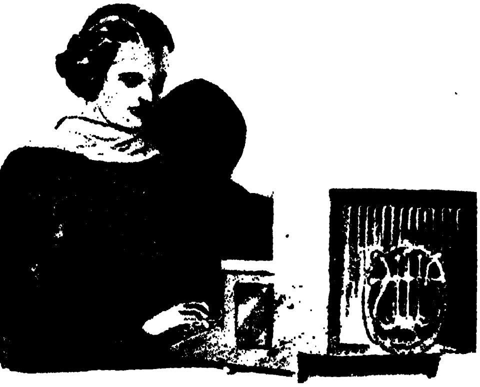
পূর্ব্বে ডিজেল ইঞ্জিনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ডিজেল ইঞ্জিনের মূলতত্ত্ব পূর্ব্বে এই পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ডিজেল ইঞ্জিনে তৈল জ্বালাইয়া ইঞ্জিন চালান হয় এবং সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদক সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয় এবং ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা মোটর চালাইয়া রেলগাড়ীর ইঞ্জিন চালান হয়। ডিজেল ইঞ্জিনের কার্য্যকারিতা সাধারণ ষ্টীম-ইঞ্জিনের প্রায় ৪ গুণ। ষ্টীম-ইঞ্জিনে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ শক্তি কাজে লাগান যায়, কিন্তু ডিজেলে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ শক্তি কাজে লাগান যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ডিজেল-চালিত রেল-ইঞ্জিনে ধূম বা শব্দের অসুবিধা নাই। ষ্টীম ইঞ্জিন কিছুক্ষণ চলিবার পর পরিষ্কার করা প্রয়োজন, কিন্তু ডিজেল-চালিত ইঞ্জিন মোটর গাড়ীরমত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেখানে জ্বালানীর দাম অধিক অথবা জ্বালানী রাখিবার স্থানের অভাব, যেমন জাহাজে, সেই খানেই পূর্ব্বে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইত। ডিজেল ইঞ্জিনের বহু সুবিধা সত্ত্বেও তাহার প্রধান অসুবিধা সেগুলির মূল্য অত্যধিক।

মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ডিজেল ব্যবহার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রেলগাড়ীর বেগ বৃদ্ধি করিবার জন্য বর্ত্তমানে বহুল পরিমণে "ষ্ট্রীমলাইন্‌ড্" রেলগাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে। ডিজেল-চালিত রেলগাড়ীর অনুকরণে ষ্টীমচালিত বহু রেলগাড়ীও আজকাল ষ্ট্রীমলাইন্‌ড করা হইয়াছে। বেগের দিক্ দিয়া ডিজেল-চালিত ইঞ্জিন যে সাধারণ ষ্টীম-ইঞ্জিন অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী তাহা নহে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সকল বিখ্যাত বেগসম্পন্ন রেলগাড়ী যাতায়াত করে, তাহাদের অধিকাংশই ষ্টীমচালিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে ডিজেল-চালিত রেলগাড়ী এখনও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ষ্ট্রীমলাইন্‌ড গাড়ীর প্রচলনও আরম্ভ হয় নাই। বৈদ্যুতিক ট্রেন অল্প কিছু চলিতেছে, কিন্তু ইহা বিস্তারের এখনও যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

আয়োডিনের ব্যবহার

জনৈক আমেরিকান চিকিৎসক সম্প্রতি কয়েকটি সাধারণ ঔষধ লইয়া পরীক্ষা করেন। অল্প কাটা প্রভৃতির জন্য যে সকল পচননিবারক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহার কতকগুলির কার্য্যকারিতা তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল

তাঁহার পরীক্ষিত ঔষধের মধ্যে চারটি দ্রবণে আয়োডিন ছিল, দুইটিতে পারদ ছিল, দুইটিতে ক্লোরিন ছিল এবং তিনটিতে



মূক ব্যক্তিদের ব্যবহারোপযোগী সবাক্ টাইপরাইটার যন্ত্র। [পর পৃষ্ঠা

অন্যান্য জিনিষ ছিল। ১৬টি ঔষধ লইয়া তাঁহার এই পরীক্ষায় ৫টি বিষয় সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেন—(১) ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করিবার ক্ষমতা, (২) শতকরা ৫০ ভাগ ঘোড়ার 'সিরম'যুক্ত মিশ্রণে ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করিবার ক্ষমতা, (৩) শীঘ্র মিশ্রিত হইবার ক্ষমতা, (৪) বিষাক্ততা এবং (৫) মূল্য।

তাঁহার পরীক্ষায় সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে আয়োডিনের জলীয় দ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঔষধ। তাঁহার পরীক্ষায় 'মারকিউরোক্রোম', 'হেক্সিল্‌রেসোর্সিনোল,' 'লিষ্টা-রিন', 'পেপ্‌সোডেণ্ট,' 'জোনাইট' প্রভৃতি আয়োডিনের মত কার্য্যকরী প্রমাণিত হয় নাই। তাঁহার পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে,সকল ঔষধের মধ্যে মাত্র আয়োডিনই সিরমের মিশ্রণেও ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করিতে পারে। সাধারণতঃ যে 'টিংচার আয়োডিন' ব্যবহার করা হয়, তাহাতে আয়োডিন সাধারণতঃ শতকরা ৭ ভাগ বা ৩·৫ ভাগ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু আয়োডিনের আধিক্য ও স্পিরিট থাকায় টিংচার আয়োডিন ব্যবহার করা কষ্টকর। চিকিৎসকটির মতে শতকরা ১ ভাগ বা ½ ভাগ আয়োডিনের জলীয় দ্রবণ সকল সাধারণ কাজের পক্ষেই যথেষ্ট ও টিংচার আয়োডিন ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, বিশুদ্ধ জলে আয়োডিন প্রায় অদ্রবণীয়, কিন্তু সামান্য পোটাসিয়ম্ আয়োডাইড দিলে জলে অতি সহজেই আয়োডিন দ্রবীভূত করা যায়।

আয়োডিনের আরও একটি ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে গ্রামে বিশুদ্ধ জল পাওয়া প্রায়ই কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ জলের সহিত সামান্য পোটোসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত করিয়া পানীয় জল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জনৈক চিকিৎসকের মতে প্রতি সের জলের জন্য ১ ফোঁটা টিংচার আয়োডিন যথেষ্ট।

আকাশবিচরণের আগামী পাঁচ বৎসর

সম্প্রতি আমেরিকায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের একটি যুক্ত বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 'আমেরিকান সোসাইটি অব্ মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারস্', 'ইন্‌স্টিটিউট অব এরোনটি-ক্যাল সায়েন্সেস' এবং 'সোসাইটী অব্ অটোমোবিল এঞ্জিনি-য়ার্স্' এই বৈঠকে যোগ দিয়া "আকাশবিচরণের আগামী পাঁচ বৎসর" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনার একটি চুম্বক দেওয়া যাইতেছে।

অদূরভবিষ্যতে ১০০০ অশ্ব-শক্তির ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইবে এবং এত বড় ইঞ্জিন হওয়া সত্ত্বেও তাহা বাতাস দিয়া ঠাণ্ডা করা হইবে। এখন হইতে অশ্বক্ষমতা হিসাবে ইঞ্জিনের ভার কমিয়া যাইবে; প্রতি অশ্বশক্তির জন্য ১ পাউণ্ডেরও কম হিসাবে ইঞ্জিনের ওজন হইবে। বর্ত্তমানে প্রতি ঘণ্টা প্রতি অশ্ব-শক্তি হিসাবে ০·৫ পাউণ্ড পেট্রল আবশ্যক হয়, কিন্তু আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ সংখ্যা ০·৩৫ পাউণ্ডে



পোর্সিলেন এনামেল-করা বাড়ী। [পর পৃষ্ঠা

দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান পেট্রল হইতে ভবিষ্যতে ব্যবহার্য্য পেট্রলে 'অক্টেন'-এর পরিমাণ অধিকতর থাকিবে এবং সেই জন্য জ্বালানী পেট্রলের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

আকাশযানের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহারের স্বপক্ষে বিশেষ কিছুই কেহ বলেন নাই। জার্ম্মানীতে ভারবাহী এরোপ্লেনে ডিজেল ইঞ্জিন যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে,কিন্তু তাহার কারণ জার্ম্মানীতে পেট্রলের অভাব, ডিজেল ইঞ্জিনের সুবিধা নহে। জার্ম্মানীতে প্রচুর পেট্রল পাওয়া যাইলে জার্ম্মানরা প্রথমেই এই সকল এরোপ্লেনের ইঞ্জিন পরিবর্ত্তন করিবে বলিয়া জনৈক জার্ম্মান বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন।

বিখ্যাত রুশ এরোপ্লেন-ডিজাইনার ইগোর সিকোরস্কী ১ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বিরাট আকারের এরোপ্লেন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এইরূপ বিরাট আকাশযান নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইবে; সাধারণ এরোপ্লেনের বেগ ঘণ্টায় ২০০ মাইল এবং সি-প্লেনের বেগ ঘণ্টায় ২৫০ মাইল হইয়া দাঁড়াইবে।

বিরাট আকারের এরোপ্লেনের একটি প্রধান অসুবিধা যে, তাঁহা যথেচ্ছভাবে আঁকান বাঁকান যায় না। বড় বড় জাহাজকে জেটিতে লাগাইতে বহু সময় প্রয়োজন, সেইরূপ বড় বড় এরোপ্লেনের জমিতে নামিবার জন্য এবং উঠিবার জন্য অত্যন্ত বিরাট অবতরণক্ষেত্র প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান।

যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ করিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য হইবে এখন বলা অসম্ভব।



২০ মিনিটে কংক্রিট জমাইবার কৌশল। দক্ষিণে—কংক্রিট ঢালাই করিবার ছাঁচ লাগান হইতেছে। বামে—ঢালাই করা হইতেছে; নলগুলির সাহায্যে বাতাস ও জল ঢালিয়া কংক্রিট জমান যায়। [৬১৩ পৃষ্ঠা

সবাক্ টাইপরাইটার

সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন মূক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন চালাইতে পারে। যন্ত্রটি আকৃতিতে টাইপরাইটারের মত। যন্ত্রটির চাবিগুলি টিপিলে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়। তাড়াতাড়ি চাবি টিপিলে এই শব্দগুলি যুক্ত হইয়া পদের সৃষ্টি করে। একটি শব্দবহ ফিল্ম্ ও লাউডস্পিকারের সাহায্যে এই শব্দগুলি যে কোন লোককে শুনান যাইতে পারে। টাইপরাইটারে যেরূপ বিভিন্ন শব্দের মধ্যে বিরাম দিবার জন্য 'স্পেস্-বার' থাকে ইহাতেও সেইরূপ একটি স্পেস্-বার আছে। একটি বাক্যের বিভিন্ন শব্দগুলি ইহা দ্বারা পৃথক্ করা যাইতে পারে। কিছুদিন মনোযোগ-সহকারে অভ্যাস করিলে এই যন্ত্রসাহায্যে বেশ ভালভাবে কথোপকথন চালান যায় বলিয়া প্রকাশ।

নূতন ধরণের বাড়ি

পূর্ব্বে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় কারখানায়-নির্ম্মিত বাড়ীর সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি আর একটি নূতন ধরণের বাড়ীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বলা বাহুল্য যে, বাড়ীটি মার্কিন। বাড়ীটির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ব্যতীত বাড়ীটি যে মালমশলায় তৈয়ারী, তাহাও অ-সাধারণ। বাড়ীটির বহির্ভাগ আগাগোড়া ইস্পাতের চাদরে তৈয়ারী এবং বহির্ভাগে সাধারণ উপায়ে রঙ না লাগাইয়া শাদা পোর্সিলেন এনামেল করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাড়ীটির বহির্ভাগ কোন দিনই ময়লা বা কাল হইবে না, কেবলমাত্র জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অবশ্য এ বাড়ীটিও কারখানার তৈয়ারী, তবে এটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত। বাড়ীটিতে 'এয়ার-কণ্ডিশনিং'-এর সমস্ত আধুনিক পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে।

কংক্রিট্ জমাইবার নূতন কৌশল

আজকাল বহুল পরিমাণে কংক্রিট্ ব্যবহৃত হইতেছে। ছাঁচের মধ্যে কংক্রিট্ ঢালাই করিবার পর তাহা শুখাইতে দুই তিন দিন সময় লাগে। সম্প্রতি আমেরিকায় একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সময় ২০ মিনিট সময়ে কংক্রিট্ জমাইয়া দেওয়া হয়। কংক্রিট্ প্রস্তুত করিবার সময় মিশ্রণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে, জল শুখাইতে যত সময় লাগিবে, কংক্রিট্ জমিতেও তত দেরী হইবে। আলোচ্য বাড়ীটিতে যে ছাঁচের মধ্যে কংক্রিট্ ঢালাই করা হয়, তাহাতে অনেক গুলি নল লাগাইয়া নলগুলি একটি বায়ু নিষ্কাশক পাম্পের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। বাতাস টানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে পাম্প কংক্রিট্ হইতে জল এবং জলীয় বাষ্প টানিয়া লয় এবং ২০ মিনিটের মধ্যে জমিয়া যায়। এই পদ্ধতি অবশ্য পরীক্ষামূলক ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সাধারণ ভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হইবে কি না, তাহা এখনও বলা যায় না।

ধূম ও কুয়াশা অপসারক যন্ত্র

আমেরিকার 'বুরো অব মাইনস্' ধূম অপসারণ করিবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহা শব্দরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ৩০এর কম বা ৩০,০০০এর অধিকসংখ্যক কম্পন আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। সেকেণ্ডে ৩০,০০০ কম্পনের অধিক কম্পন হইলে তাহা শ্রুতিগোচর হয় না বলিয়া এই অশ্রুত শব্দকে ইংরাজীতে supersonic waves বলা হয়। আমরা 'শব্দোত্তর' কম্পন বলিতে পারি। পরীক্ষায় ফলে দেখা গিয়াছে, এইরূপ অত্যন্ত উচ্চ গ্রামের কম্পন ধূমের মধ্যে সৃষ্টি করিলে ধূমের কণিকাগুলি নীচে প্রক্ষিপ্ত হয়। পাঠকপাঠিকারা মনে রাখিবেন যে, ধূম বাতাসে বিলম্বিত থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কঠিন পদার্থের অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণিকা মাত্র, কোন বায়বীয় পদার্থ নহে; উহাদের ভারের তুলনায় বাতাসের বাধা অধিক বলিয়া পড়িয়া যায় না। উদ্ভাবকগণের বিশ্বাস যে, এই



ধূম-অপসারক যন্ত্র। কাচের নলের মধ্যে ধূম সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহার উপর শব্দ তরঙ্গ নিক্ষেপ করিলে ধূম অপসারিত হইয়া যায়।

যন্ত্রসাহায্যে ধূম ব্যতীত কুয়াশাও অপসারণ করা সম্ভব হইবে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাকে কেন্দ্র করিয়া জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কুয়াশার সৃষ্টি করে। প্রদর্শিত চিত্রে কাচের নলের মধ্যে ধূম চালনা করা হইতেছে। শব্দতরঙ্গ উহার উপর নিক্ষেপ করিলেই ধূম নীচে পড়িয়া যায়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান

…বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে কোন সূক্ষ্ম বস্তুর গুণ অথবা কর্ম্মশক্তি দেখিবার জন্ত চক্ষুর ব্যবহার করিতে পারেন না, কারণ অতি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে হইলে চক্ষুর যে তীব্র দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন সেই তীব্র দৃষ্টিশক্তি তাঁহার নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিলে প্রকৃত ক্ষুদ্র বস্তুকে যে বড় করিয়া লওয়া হয়, ক্ষুদ্র গুণ ও কর্ম্মশক্তিকে যে বৃহত্তর করিয়া লওয়া হয় এবং তাহাতে যে মূল বস্তুটাকে যথাযথ না দেখিয়া অন্ত রকম করিয়া দেখা হয় এবং তাহার ফলে যে উপলব্ধি লাভ হয়, তাহা যে প্রকৃত মূল বস্তু সম্বন্ধীয় উপলব্ধি হইল না এবং তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান যে ভ্রমাত্মক হইয়া গেল, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না।…

দুরাশা

—শ্রীবিনয় চৌধুরী

মেঝেয় দাঁড়াইয়া টুলু কাপড় পরিতেছিল আর ঘাড় ফিরাইয়া মাঝে মাঝে ঠাকুমাকে দেখিয়া লইতেছিল এক-নজর। কাপড়ের খুঁট্ টুলুর আঁটে না কিছুতে, কেবল খুলিয়া যায়। দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরের ভিতরে আজিকর, বাদলায় বুঝিবার জো নাই ভোর হইয়াছে কি না। বাহিরে ছাদের নল বহিয়া বৃষ্টির জল পড়িতেছে একটানা হুড়্ হুড়্ করিয়া। জলের শব্দ শুনিলে ভারি আনন্দ হয় টুলুর, ঘরে আটকাইয়া রাখা তখন তাকে দায়। তাদের বাড়ীর পিছন দিক্কার সুঁড়িপথে বৃষ্টির জলের স্রোত বহিয়া যায়। টুলু—দেখ গিয়া, স্নানযাত্রার বাজার হইতে কেনা তার ছোট রঙীন ছাতা মাথায় চলিয়াছে ছপ্ছপ্ করিয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে। সামনে জলের স্রোতে কাগজ ভাসাইয়া দিয়াছে এক টুকরা, আর পিছনে পিছনে সে। এমন মজা লাগে টুলুর! ঠাকুমার কেবল—ঠাকুমার কাণ্ড দেখিয়া টুলু হাসিয়া ফেলে। মুখ টিপিয়া নিঃশব্দে হাসিবার চমৎকার ভঙ্গি পাঁচ বছরের টুলুর, আর হাসিলে সুন্দর টোল খায় তার দু' গালে। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে নিঃসাড়ে উঠিয়া পড়িয়াছে, ঠাকুমা ত তখন ঘুমাইতেছে, তবু যে কি করিয়া টের পায় ঠাকুমা! চোখ বুঁজিয়া শুইয়া শুইয়াই তাকে খুঁজিতেছে বিছানা হাৎড়িয়া! সে কি বিছানায়?

ঠাকুমা ডাকিল টুলুকে বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িতে, টুলু যাইবে না আর কিছু! মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা হইয়াছে, এইবার পাকাইয়া পাকাইয়া উরুর উপর কাপড় তুলিতেছে গুটাইয়া। তারপর পেরেকে টাঙানো ছাতাটা পাড়িয়া লইল ডিঙি মারিয়া। স্বর্ণময়ী ততক্ষণে উঠিয়াছে বিছানায়। টুলুর মতলব বুঝিয়া কত আদর করিয়া ডাকিল—"লক্ষ্মী সোনা আমার বেরিও না এখন, বৃষ্টি মাথায়। তোমার জন্যে এক 'সামিগ্গিরি' রেখিছি, দেব'খন এদিকে এস।" 'সামিগ্গিরি' না হাতী, যত ফন্দি ঠাকুমার। দরজা খুলিয়া টুলু সটান বাহির হইয়া যায়। স্বর্ণময়ী তখনও পিছনে ডাকিতেছে—"যাস্‌নে বৃষ্টিতে টুলু, বলে দেব তোর বাবাকে, ও টুলু—।" সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে টুলু চেঁচাইয়া জবাব দেয়—"কি-ই?"

"দেখলে একবার, তবু গেল এই বৃষ্টিতে! কি বাক্যি-ঘ্যাঁচড়াই হয়েছে ছেলেটা, একটা কথা যদি শোনে! বল কও, গেরাহ্যিই করে না ঐ টুকু ছেলে—" স্বর্ণময়ী সরিয়া গিয়া ওদিক্কার জানালাটা খুলিয়া দিল। ঘুণ ধরিয়া কপাটের নীচের দিকটা ক্ষইয়া গিয়াছে, মরিচা-পড়া কব্জায় লাগেও না ঠিক মত। উপরের একখানা কপাট খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, একটা চট্ টাঙানো সেখানে আর নীচে বড় পিঁড়ি একখানা ঠেক্‌নো দেওয়া। খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আসে ঘরের ভিতর, তবু স্বর্ণময়ী বাহিরে একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া দেখে জল পড়িতেছে কি না। কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড! সেই যে কাল বিকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে, একবার কি ধারণ হইল একটু? অস্থির হইয়া ওঠে স্বর্ণময়ী।

কোথায় বেড়াইবে'খন জল-কাদায় ভিজিয়া ভিজিয়া! একটা কিছু হইলে তখন তোমার দোষ, থাকে যে তোমার কাছে! কিন্তু কি করিবে স্বর্ণময়ী, শুনিল কি তার কথা টুলু? আর সে মেয়েও উঠিয়া গিয়াছে কোন সকালে। এ তল্লাটে নাই যে তাকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া স্বর্ণময়ী বকিয়া যায় আপন মনে।

হুড়্মুড়্ করিয়া কি একটা পড়িয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া স্বর্ণময়ী ডাকিল—"ও-বীণা, বীণা!" কেহ আসিল না, স্বর্ণময়ী দরজার দিকে আগাইয়া গিয়া গলা বাড়াইয়া চাহিয়া দেখে। উত্তরের কোঠার ওদিক্‌টা ফাঁকা ঠেকি-তেছে না? ভাল ঠাহর হয় না কিছু আজকাল স্বর্ণময়ীর, সব সময়ে চোখের সামনে যেন একখানা পরদা ঝুলিতেছে, কুয়াশা-করা সকাল বেলার মত সবই ঘোলাটে, ধোঁয়া-ধোঁয়া। স্বর্ণময়ী চোখ কচ্‌লাইয়া লয় বার বার,—পরদা

খানা দুহাতে ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে পারা যায় না? ছাদের আলিসার সেই অশ্বত্থগাছটা নাই ত! ফাটল-ধরা দেয়ালে জল বসিয়া গোড়া আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল গাছটার, ঝড়ের ঝাপ্‌টায় আজ উপ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ওদিক্‌কার এক সারি কোঠাও ধ্বসিয়া গিয়াছে। স্বর্ণময়ী শিহরিয়া ওঠে আতঙ্কে। ও ঘরগুলা ব্যবহার করা হয় না ইদানীং, পড়িয়াই থাকে এমনি, তবু—ছেলেটা বাহিরে রহিয়াছে, গোয়াল-ঘরও তারই পাশে, টুলুর মা কি করিতেছে আজ সকালে?

কে যেন সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া টুলুর বাবার ঘরের দিকে গেল বোধ হইল। স্বর্ণময়ী ডাকিল—"ওরে ও কে যাস্ ওখেন্ দিয়ে? ও বীণা, ও বী' ! কে রে, টুলু? ও খোকা, শুনে যা একবার এদিকে

কেহ আসিল না, সাড়াও মিলিল না কারও। মিনিট দুই কাটিল। যে ওদিকে গিয়াছিল, সে বুঝি এইবার ফিরিয়া যাইতেছে নীচে! স্বর্ণময়ী আবার ডাকিল,—"কে যাচ্ছ, বৌমা? ও বৌমা, কোঠা কি পড়ে গেল না কি?

কোথায় কে? যে আসিয়াছিল তার পায়ের শব্দ ক্রমে মিলাইয়া গেল দূরে। স্বর্ণময়ীর গাল দিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসে। সেই ত যাতায়াত করিতেছে সব সুমুখ দিয়া, একটু দাঁড়াইয়া কথাটার জবাব দিয়া গেলে কি মহাপাতক হয় যে ওদের।

সংসারে সকলে এড়াইয়া চলে স্বর্ণময়ীকে। অনেক বয়স হইয়া একেবারে জবুথবু হইয়া পড়িয়াছে, আর বসিয়া বসিয়া এমন বক্ বক্ করা স্বভাব হইয়াছে স্বর্ণময়ীর। কাঁহাতক লোকে বকিয়া পারিবে। নিষ্কর্ম্মা ত বসিয়া নাই কেহ। কাজকর্ম্ম আছে, সংসারধর্ম্ম রহিয়াছে, দুই হাঁটু এক করিয়া স্বর্ণময়ীর মত নিজের ঘরটিতে বসিয়া থাকিলে ত লোকের চলে না। নিজের হাতে করিতে পারিবে না কিছু, ঘরে বসিয়া সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের তল্লাস করা চাই স্বর্ণময়ীর, ইহার উহার তার কাছে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিবে কত কি। কথার কিন্তু জবাব দেয় না কেহ দুদণ্ড তিষ্ঠিয়া। ঐ যে বীণা, হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে যাকে স্বর্ণময়ী, কত রাত জাগিয়াছে ঐ মেয়ে লইয়া, সেও না

বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া ঘরের মেঝে ভিজিয়া ওঠে, ঠাণ্ডা ভিজা বাতাসে শীত ধরিয়া যায়। কাপড়ের আঁচল দুফের্‌তা করিয়া স্বর্ণময়ী গায়ে জড়াইয়া দিল। বাড়ীর লোকগুলা কি আজ ঘুমাইতেছে, না মরিয়াছে, সাড়াশব্দ নাই কারও। স্বর্ণময়ী উঠিয়া বীণার মার ঘরের দিকে চলিল। উঠিয়া দাঁড়াইলে পা কাঁপে স্বর্ণময়ীর ঠক্ ঠক্ করিয়া,ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেয়ালে ভর দিয়া তবে চলিতে হয়

পঞ্চাশ বছর আগেকার কিশোরী বধূ, ঐ বীণার মতই পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, অমনি চঞ্চল, পায়ে পায়ে ছুটিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইত গুরুজনের সামনে পড়িয়া, জ্যোৎস্না রাতে কোমরে কাপড় জড়াইয়া সমবয়সীদের সাথে কত খেলা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে সারা রাত বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া। এই সাবেকী বাড়ীখানার মত সেও বদলাইয়া গিয়াছে। শরীরে সামর্থ্য নাই, জানালার ঠেক্‌নো-দেওয়া পিঁড়িখানাও আর সরাইতে পারে না; গায়ের চামড়া ঢিলা হইয়া কুঁচকাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে সর্ব্বাঙ্গে। শণের মত শাদা একমাথা পাকা চুল; দাঁত পড়িয়া গিয়া তোব্‌ড়ানো ফোক্‌লা গাল, একলা বসিয়া বসিয়া স্বর্ণময়ী পাক্‌লাইতে থাকে অনবরত, আর বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকে আপন মনে। বীণা আর টুলু দেখিয়া লুটোপুটি খায়। ঠাকুমার দন্তহীন ফোক্‌লা গালের অনুকরণ করিয়া বীণা বলে—"ঠাকুমা দেখ—"

স্বর্ণময়ী তার দিকে মুখ ফিরাইলে মুখ বাঁকাইয়া ভেঙচাইয়া বলে "আহা হা বুড়ী।" দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া কি ভাবিয়া টুলুও খুব হাসে। স্বর্ণময়ীর হাড়পিত্ত জ্বলিয়া যায়। মাথা নাড়িয়া বলে নাৎনীকে—"ততে হবে না এক দিন আমার মত? চিরকাল অমনই কিছু থাক্‌বিনে কচি খুকী। বুড়ী বুড়ী বলা তখন টের পাবি—হাসি বেরুবে।"

বীণা মুখ ভার করিয়া বলে—"শাপ দিচ্ছ ঠাকুমা? বেশ দাও, দাও, খুব দাও, আমি মলে ত তোমার ভাল হয়।"

স্বর্ণময়ী আকাশ হইতে পড়ে। "বলিসনে ও কথা, শাপ দিলাম আবার কখন? শাপ দেব কেন আমি তোকে? ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বীণার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, "বালাই ষাট্!" তার চিবুক ধরিয়া ফোক্‌লা গালে হাসি টানিয়া ছড়া কাটিয়া বলে—"আমার বীণাপণি—

রায়। বাঘিনী—গজোমুক্তার হার"—তের বছরের মেয়ে বীণা ঠাকুমার বুকে মুখ গুঁজিয়া দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া অমনি বসিয়া থাকে কতক্ষণ। জরাগ্রস্ত মুখের চেহারা আবেগে বিকৃত হইয়া যায় স্বর্ণময়ীর। টুলুও আসিয়া ঠাকুমার কাছ ঘেঁসিয়া বসে।

বীণার বাবার পালঙ্কখানা খুলিয়া দুজন লোকে মাথায় করিয়া নীচে নামিয়া গেল। লোহা-বসানো পূর্ব্বপুরুষের কাঠের সিন্দুকটা বাহিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে; রাজ্যের বালিশ-বিছানা ঘরের এক কোণে জড়ো করা, বাক্স, পেঁটরা আর বাসন-কোসন ছড়ানো ঘরময়। এক পাশে বীণার বাবা পিঠের নীচে একটা বালিশ দিয়া মাদুরের উপর আধশোয়া অবস্থায় দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া, ওধারে দাঁড়াইয়া ঘোষালদের শীতল। স্বর্ণময়ী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। বাস উঠাইয়া চলিয়া যাইতেছে না কি ইহারা? দরজার চৌকাটে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একবার ছেলের মুখের দিকে, একবার শীতলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে। কি বলিতে আসিয়াছিল, সে কথা চাপা পড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে,"কি হয়েছে বাবা সীতেনাথ? কোথা যাবে এই সব জিনিষপত্তর?" সীতানাথ মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না, স্বর্ণময়ী এবার শীতলকে ডাকিয়া বলে "ও শেতল কথা বলিস্‌নে কেন তোরা? বল না বাবা, কি হয়েছে? পালঙ্ক নিয়ে গেল ওরা কারা? কোথায় গেল?

"হবে আর কি জ্যেঠিমা—এই কুণ্ডুদের মামলার—" বাধা দিয়া সীতানাথ বলিল, "ওসব পরিচয় দেবার ঢের সময় পাবে শীতল, এখন একটু চট্‌পট্ হাত চালিয়ে নাও ভাই—দয়া করে দাও আমাকে উদ্ধার করে এই বিপদ থেকে। আর বল্‌বই বা কি? সব সমান আমার কপালে। তোমার বৌদিদি গেল ত জন্মের মতন গেল—"

বলিতে বলিতে অরুন্ধতী আসিয়া পৌছিল। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "উত্তরের সারির ঘরগুলোই গেল—তা যাক্ গে, ভাবছি এখন এইগুলো চাপা পড়ে কোন্‌দিন আমরাই না যাই।" বলিয়া একটু হাসিল।

রোগশীর্ণ, পাণ্ডুর মুখ সীতানাথের গম্ভীর হইয়া ওঠে, বলে—"হুঁ। কিন্তু গা দুলিয়ে যে বেড়াচ্ছ, বেলা বাড়ছে না কমছে—।"

"শোন কথা", অরুন্ধতী অবাক হইয়া বলে—"গরু-বাছুর সরিয়ে রেখে আসতে হলো না।"

"চুলোয় যাক্‌গে তোমার গরু! এখন যা কর্‌বার তাই কর। এসে পড়লে তারা তখন ছেড়ে দেবে তোমায় দেখে, না?" সীতানাথ বিরক্ত হইয়া বলে।

"আমার ত হয়ে গেছে সব বার করে দেওয়া কোন্ কালে, এখন তোমার লোকেরা বয়ে উঠতে পারলে হয়। দেখ না একবার শীতল ঠাকুরপো, সে মানুষ দুটো কি হলো আর সে মেয়েও ত আচ্ছা, গিয়েছে ত আজ না? আসুক আগে—?"

স্বর্ণময়ীর দিকে কেহ নজর দেয় না। পাশ কাটাইয়া বীণার মা ঘরে ঢুকিল, শীতল বাহির হইয়া গেল। বীণার বাবা তেমনি বসিয়া রহিল ঘরের ভিতরে, কেহ একবার ডাকিয়াও বলিল না ঘরে আসিয়া বসিতে স্বর্ণময়ীকে। স্বর্ণময়ী কিন্তু থাকিতে পারে না চুপ করিয়া, কৌতূহলে আশঙ্কায় বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে তার।

"ও বৌমা এ সব কি কাণ্ড? ঘর পড়ল ও দিক্‌কার, আর ঘর খালি করে এ দিক্‌কার জিনিষ-পত্তর কোথায় চালান দিচ্ছ তোমরা—? "বলিতে বলিতে আগাইয়া আসিতে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিল স্বর্ণময়ী।

ফুটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে। জীর্ণ কোঠা তালি দিয়া দিয়াই ত চলিতেছে এ যাবৎ। বর্ষার আগে চিড়-খাওয়া ছাদের উপর দাগরাজি করিয়া লওয়া হয়। সীতানাথ ত বিছানায় শুইয়া, এবারে তাহাও হয় নাই। ঘরে ঢুকিতে দরজার পাশে, যেখানটায় অতিরিক্ত জল পড়ে একখানা গামলা পাতিয়া রাখা ছিল; পায়ে বাধিয়া স্বর্ণময়ী মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। গামলাখানা উল্টাইয়া জল গড়াইয়া গেল ঘরময়। সানে ঠুকিয়া কপালটা ফুলিয়া উঠিল স্বর্ণময়ীর, গামলার কানায় লাগিয়া হাঁটুর নীচে কাটিয়া গিয়া রক্তপাত হইল।

শশব্যস্তে ছুটিয়া গিয়া অরুন্ধতী ধরিয়া তুলিল শাশুড়ীকে। বড় অপ্রতিভ হইয়া যায় স্বর্ণময়ী। ওদিকে সীতানাথ চীৎকার করিয়া ওঠে, "কি বিপদেই আমি

পড়িছি! এর চাইতে মেরে ফেল আমাকে তোমরা সকলে মিলে, এ দগ্ধানির চেয়ে সে ভাল! এখনো কেন মরণ হয় না আমার? হে ভগবান—"বলিয়া মাথা ঠুকিতে থাকে দেয়ালে। শাশুড়ীকে ছাড়িয়া অরুন্ধতী স্বামীকে গিয়া ধরিল। শোয়াইয়া দিয়া বাতাস করিতে করিতে বলে—"হ'লো কি তোমার? কি আরম্ভ করলে বল ত! এর পর বুকের যন্ত্রণা বাড়লে তখন দেখবে কে?"

"বাড়ুক বুকের যন্ত্রণা—। আমি মরলে যদি নিষ্কৃতি দেয় সব আমাকে!" সীতানাথ শুইয়া শুইয়া হাঁফাইতে থাকে। "ছাড়বে না কিছুতে আমাকে, না মেরে ছাড়বে না! একে এই রোগের যন্ত্রণা, তার উপর এই আর এক জ্বালা! কি করতে এসেছে বল ত, কোন্ কর্ম্মে? রাগ হয় কি মানুষের সাধে!"

মনের গ্লানিতে স্বর্ণময়ী আসিতে ত চায় না এ ঘরে, মা বলিয়া ডাকে না আর সীতানাথ, নাম ত করেই না, স্বর্ণময়ী নিজে হইতে কাছে গেলে বিরক্ত হয়, মার-মুখো হইয়া ওঠে। আজ ছয় মাস ধরিয়া রোগে ভুগিতেছে সীতানাথ, পয়সার অভাবে না হয় তেমন করিয়া চিকিৎসা, না জোটে পথ্য। কিন্তু সে কি স্বর্ণময়ীর অপরাধ? পয়সা দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ বলিবে না কেমন আছে সীতানাথ? ছেলে ত কথাই কয় না, বীণার কথায় প্রত্যয় হয় না স্বর্ণময়ীর। বীণার মাকে জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্রূপ করে—বলিতে হয় তাই বলে—"ঐ আছেন এক রকম।" তবু স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করে—"ঘুমিয়েছিল কাল রাতে একটু—?"

"কেন?"

"না এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম"। থতমত খাইয়া যায় স্বর্ণময়ী।

"ওঃ আমি ভাবছিলাম" ঠোঁট উলটাইয়া বীণার মা বলে, "ঘুম না হলে বুঝি ডাক্তার-বদ্যি ডেকে এনে দেখাবে ছেলেকে?"

পোড়া কপাল স্বর্ণময়ীর উপায় থাকিলে মা হইয়া ছেলেকে কি কেহ রোগ-ভোগ করিতে দেয় সাধ করিয়া? কিন্তু স্বর্ণময়ীর দিন ফুরাইয়াছে। পেটে ধরিয়াছে বুকের রক্ত দিয়া বাঁচাইয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে, তবু সে আর কেহ নয়,—পরের মেয়ে, তার ছেলের বউ, সেও আজ তামাসা করিতে সাহস পায়। দেখিয়া শুনিয়া ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে স্বর্ণময়ীর সংসারের উপর।

"কি করলাম বাবা আমি তোর? কি অপরাধ করেছি আমি তোদের কাছে যে দেখলেই অমন করিস! হাজার হোক, মা ত আমি তোর?"

"বেশ বেশ, সে সবাই জানে। কি করতে হবে তা বলে? সকালে উঠে পাদোদক খেতে হবে?"

"অত চাইনে বাবা, একটু মিষ্টি মুখে কথা বললে বর্ত্তে যাই—"

"বলছি ত, অত মিষ্টি কথা আমার নেই, আসে না মিষ্টি মুখ।" হঠাৎ আবার চেঁচাইয়া উঠিল সীতানাথ—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ হারামজাদা মেয়ে? বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে? খুব মজা পেয়ে গিয়েছ না? মজা দেখাচ্ছি চেন না আমাকে?" বলিয়া পাশে পড়িয়া ছিল এক জোড়া চটি, একপাটি তুলিয়া লইয়া সীতানাথ তাড়াইয়া গেল।

বীণা ইতিমধ্যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দোর ধরিয়া। পিঠের উপর দিয়া মাথায় একখানা গামছা ভাঁজ করিয়া দেওয়া, কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া পরা, ভিজা কাপড় হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। অরুন্ধতী গিয়া না ঠেকাইলে ঐ জুতা আজ বীণার পিঠে পড়িত। এক পাও নড়িল না বীণা, যেমন আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি রহিল মুখ অন্ধকার করিয়া।

উত্তেজিত হইলে হাঁফের টান বাড়ে সীতানাথের, শুইয়া পড়িয়া হাফাঁইতে থাকে—"মাথা কপাল ভেঙে কি মরব আমি তোমাদের জন্যে?" সীতানাথের বুক ডলিয়া দিতে দিতে অরুন্ধতী বলে—"চুপ করে শোও দিকিনি—মিছিমিছি মাথা গরম করে এ কষ্টভোগ কেন? আমার হয়েছে যত ঝঞ্ঝাট, দোষ করবে সকলে আর ঝক্কি পোহাবার বেলা মর তুই মাগী ভুগে—!"

লোক দুইটা সঙ্গে লইয়া শীতল ফিরিয়া আসিল। ধরাধরি করিয়া কাঠের সিন্দুকটা সকলে তুলিয়া দিল তাদের মাথায়। অরুন্ধতী বলিয়া দিল—"একটু শীগ্‌গির করে ফিরো বাপু।"

"সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন কাঠ হয়ে?" বীণার আপদমস্তক অগ্নিদৃষ্টি বুলাইয়া সীতানাথ বলিল—"দেখতে পাচ্ছ না চোখে? না, একজন বলবে, তবে মুছবে জলটা? থুবড়ী!"

বীণা হক-চকিয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারে না, কি ত্রুটি হইয়াছে তার! তাদের পুকুরের ওপারে বড় বাগান পারাইয়া, আচার্য্যিদের বাড়ী, সুন্দর ঠাকুমাদের বাড়ী রাখিয়া তবে ত শীতল কাকাদের বাড়ী—আর বৃষ্টি পড়িয়া যা পিছল হইয়াছে পথ, কেবল আছাড় খাইতে হয়। জিনিষ লইয়া যাইতে বুঝি সময় লাগে না? পড়িয়া যায় যদি তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া, তখনও ত আবার দোষ হইবে? মুখ গোঁজ করিয়া বীণা দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুন্ধতী বলিল,—"যা যা, নিয়ে আয় একখানা কিছু—মুছে নে মেঝেটা।"

হাতের কাছে তেমনি কি কিছু পাইবার জো আছে! বারান্দায় রেলিং-এর ফাঁকে গোঁজা ছিল টুলুর একটা ছেঁড়া জামা, সেটা আনিয়া বীণা ঘরের মেঝে মুছিতে যাইবে, তার বাবা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ওঠে—"যা যা বাপু, তুই আমার সামনে থেকে যা, তোর আর কাজ করতে হবে না।" বীণা ত' থ'—ন যযৌ ন তস্থৌ। তার হাতের ছেঁড়া জামাটা দেখাইয়া সীতানাথ অরুন্ধতীকে বলিল, "দেখলে আক্কেল! বিবেচনাটা একবার তোমার মেয়ের এত বড় ধাড়ী হলো, ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে! আস্ত জামাটা নিয়ে এল জল মুছতে! লক্ষ্মীছাড়া আপদ।"

জামাটা ছেঁড়া—কিন্তু হইলে কি হয়, বীণার বাবার এমনি স্বভাব। সংসারের অভাব যত বাড়িতেছে, জিনিষ-পত্রের উপর মায়াও তার তত বাড়িয়া চলিয়াছে। সামনে দিয়া একটা পোড়া দেশালাই-কাঠিও ফেলিবার উপায় নাই, বকিয়া বকিয়া অনর্থ বাধায়। অরুন্ধতী বলিল, "পেলি না আর কিছু? আচ্ছা আমি দেখছি।" বলিয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া কোথা হইতে এক টুকরা চট্ আনিয়া মেয়েকে দিল। বীণা ঘাড় গুঁজিয়া মেঝের জল মুছিতে লাগিল। সীতানাথ বলিল,—"আচ্ছা এতে রাগ হয় কি না? তুমি ত পেলে, তবে ও পায় না কেন? বিয়ে দিলে যে সাতটা ছেলে হ'তো এদ্দিন!"

"সে দোষও কি ওর না কি?" অরুন্ধতী বলিল—"কি যে বল তার ঠিক নেই।"

"যা বলি তা ঠিক, বুঝবে পরে।" বলিয়া সীতানাথ চুপ করে।

বাহিরে তখনও একটানা বৃষ্টি পড়িতেছে। কোঠার গায়ে আর গাছের ডালপালায় বাধিয়া বাতাসের শব্দ উঠিতেছে সোঁ সোঁ করিয়া। ঘরের মধ্যে কয়জন প্রাণী, নিঃশব্দে যে যার কাজ করিতেছে, সহজ সাধারণ ভাবে বলিবার মত কথা খুঁজিয়া পায় না কেহ, বলিতে গেলে রূঢ় হইয়া ওঠে কথা। লোক দুইজন আসিতেছে মাঝে মাঝে। অরুন্ধতী, বীণা আর শীতল জিনিষপত্র বহিয়া সিঁড়ির মুখে আনিয়া দিতে লাগিল, এক এক বোঝা লইয়া তারা বহিয়া রাখিয়া আসিতে লাগিল শীতলদের বাড়ী। ঘরের মধ্যে এত গুলা লোক, চলাফেরা করিতে অসুবিধা হয়। স্বর্ণময়ী এখানে ওখানে সরিয়া বসে। অরুন্ধতী এক সময় বলিল—"নিজেদের জ্বালায় নিজেরাই মরছি আমরা, তার মধ্যে তুমি আর মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াচ্ছ কেন বল ত' মা? তোমার ত কোন কাজ নেই এখেনে!"

স্বর্ণময়ী একপাশে উঁচু হইয়া বসিয়া ছিল গালে হাত দিয়া, আর চাহিয়া চাহিয়া ইহাদের কাণ্ড দেখিতেছিল। হা অদৃষ্ট! উহাদের নিজেদের জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে আর স্বর্ণময়ীর কোন স্থান নাই আজ! কাজ দেখায় বীণার মা—যাকে সে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছে আর যার আঁচলে নিজের চাবির গোছা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া সংসারের ভার অর্পণ করিয়াছে? কাহার সংসারে কে কাহাকে কাজ দেখায়! স্বর্ণময়ী একবার অরুন্ধতী একবার সীতানাথের দিকে চাহিয়া দেখে। ঘন ঘন পলক পড়িয়া দীপ্তিহীন চোখ দুটি পিট্‌পিট্ করে। একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। মায়ের ইঙ্গিতে বীণাও এক ঝাঁকা বাসন তুলিয়া লইয়া বৃষ্টিতে বাহির হইয়া গেল।

ঠাকুমা যেন কি? শোনে না কেহ ঠাকুমার কথা, গায়ে পড়া হইয়া তবু যাইবে বারবার? বিরক্ত হয় সকলে রাগ করে; কিছুতে যদি হুঁস হয় বুড়ীর। বলিলেও কথা শুনিবে না, সাধ করিয়া বকুনী খাইবে সকলের।

এমন রাগ ধরে বীণার! তার বাবারও যে কি হইয়াছে আজকাল, রাত দিন কেবল রাগিয়াই রহিয়াছে সকলের উপর? তাদের বিষয় নীলাম হইয়া গিয়াছে, বঙ্কু কুণ্ডুদের সাথে মামলায় তাদের হার হইয়াছে, তারা এবার বাড়ী-ঘর ক্রোক্ করিতে আসিবে। কিন্তু কি করিবে বীণা? সে ত' সেই ভোর বেলা হইতে ভিজিয়া ভিজিয়া বহিয়া রাখিয়া আসিতেছে সব শীতল কাকাদের বাড়ী। তবু তাকে বকিবে খালি খালি? তার বাবা যে কেন অমন করিয়া একটুতেই চেঁচাইয়া ওঠে, ভাবিয়া কূল পায় না, বীণা। আস্তে বলিলে কি বুঝিতে পারে না কেহ, না শোনে না কথা? বীণার আর থাকিতে ইচ্ছা করে না বাড়ীতে, যে দিকে দুচক্ষু যায়, চলিয়া যাইবে সে একদিন!

বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাদের আতা গাছটার তলায় আসিয়া বীণা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। বাঃ, বেশ বড় বড় আতা পাকিয়াছে ত গাছে! গাছ-পাকা আতা যা মিষ্টি! বীণার চাইতে কিন্তু পাকা আতা খাইবার লোভ টুলুর বেশী। এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল বীণা, তারপর কি ভাবিয়া চলিয়া গেল বরাবর। ফিরিবার পথে আর মন মানিল না বীণার। ডালে আঁচল বাধাইয়া নীচু করিয়া ধরিয়া পাড়িয়া লইল একটা, আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া পিঠে ঝুলাইয়া চলিল। পুকুরের পাড় দিয়া যাইবার সময় আঁচলের গিরো খুলিয়া আতাটা কিন্তু জলে পড়িয়া গেল। বর্ষায় পুকুর ছাপাইয়া জল উঠিয়াছে বাগান পর্য্যন্ত; পথের উপর দিয়া স্রোত চলিয়াছে, পায়ে বাধিয়া জলের আওয়াজ হয় ছপ্ ছপ্। বীণা পায়ের পাতা কাৎ করিয়া জলের স্রোত রোধ করিবে। কাণায় কাণায় পুরিয়া পুকুর ভাসিয়া গিয়াছে। এমন টই টম্বুর জল দেখিলে মন কেমন করে বীণার। বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া জলে বুদ্বুদ উঠিতেছে ফোস্কার মত। বাবা রাগ করিবে তাই, নহিলে, আঁটিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া বীণার নামিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে জলে! সে পারাপার করিতে পারে তাদের পুকুর দশ, পনের, কুড়ি বার। সাঁতরাইতে পারে বীণা খুব। সাঁতার দিতে দিতে তার খোঁপা খুলিয়া গেলে সে দু'হাত জলের উপর তুলিয়া খোঁপা বাঁধিয়া লইতে পারে ফের ভাসিতে ভাসিতে! পাড়ে দাঁড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিঃশ্বাস পড়ে বীণার!

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বীণারা খাইতে বসিয়াছে। একে বাড়ীতে নানান হাঙ্গাম, তার উপর এই বাদলা, বড় দেরি হইয়া গিয়াছে আজ রান্না করিতে। আর রান্নাই বা কি হইয়াছে। একটা বলিতে আনাজ ছিল না ঘরে, বাগান কুড়াইয়া তরকারী বানাইয়াছে আজ অরুন্ধতী। বিরক্ত ধরিয়া যায় মানুষের। সংসার করার চূড়ান্ত একেবারে—পরিবেশন করিতে করিতে আপন মনে গজর গজর করিতেছিল অরুন্ধতী। দুধটুকুও আজ মিলিল না, গাই-বাছুর দুটাও রাখিয়া আসিতে হইয়াছে শীতলদের বাড়ী, বাঁধা ছিল না বাছুর, সব দুধ খাইয়াছে সে, দুহিতে গিয়া অরুন্ধতী আর এক ফোঁটা পাইল না। ভাত কোলে করিয়া টুলু বসিয়া আছে, একটু দুধ তার চাই শেষে, নহিলে উঠিবে না কিছুতে। বীণা বলে "বসে আছিস কেন—মেখে দেব ভাত?"

"না। দুধ দিয়ে খাব।"

"দুধ আজ নেই বোধ হয়—ঝোল দিতে বলব মাকে?" বীণা বলে।

"না।"

অরুন্ধতী খানিকটা ঝোল আনিয়া ঢালিয়া দিল ছেলের পাতে। বলিল—"দুধ নেই আজ, ঐ দিয়ে খেয়ে নাও।"

"না-দুধ দাও—"টুলু জিদ ধরিয়া বসিল।

"বলছি বাছুরে খেয়ে ফেলেছে, নেই আজ দুধ, শুনিস নে কেন? তোরা ত রোজ খাস, একদিন আর বাছুরের খেতে নেই।"

"না" টুলু কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল মাটিতে। পড়িয়া হাত-পা ছুড়িতে লাগিল চীৎকার করিয়া। অরুন্ধতী তাড়া দিয়া উঠিল। টুলু একবার চুপ করিয়া দেখিয়া লইল মাকে, তারপর আবার কান্না জুড়িয়া দিল।

"ফের—মেরে হাড় ভেঙে দেব, চুপ কর, বলছি এখন—" অরুন্ধতী শাসাইয়া বলে। টুলু চোখ বুজিয়া আরও জোরে চেঁচাইতে লাগিল।

"বটে, বারণ করলে আবার বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো—" ছুটিয়া গিয়া টানিয়া তুলিল অরুন্ধতী টুলুকে হাত ধরিয়া

তারপর যতদূর পারিল একচোট হাত চালাইল টুলুর সর্ব্বাঙ্গে। টুলু প্রাণপণে চেঁচায়, আর যত মারে—অরুন্ধতীর রাগ বাড়িয়া যায় ততই। পালটিয়া মার লাগাইতে সুরু করে ফের।

"খাও, দুধ খাও, জন্মের শোধ খাওয়াই তোমাকে দুধ—।" বীণা ত ভয়ে কাঠ হইয়া ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, একবার টুলুকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিল মার কবল হইতে, ধমক খাইয়া সরিয়া আসিয়াছে!—

ইতিমধ্যে স্বর্ণময়ী কখন উঠিয়া আসিয়াছে। অবাক কাণ্ড! বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হইয়া যায় স্বর্ণময়ীর। মারিয়া ফেলিবে না কি ছেলেটাকে?

"হলো কি বৌমা? মরে গেল যে ছেলেটা! অত মারছ কেন?"

"মারের হয়েছে কি এখনো। কত বড় শালভাঙ্গা ছেলে আজ আমি দেখে তবে ছাড়ব। এত জিদ—"

"ব্যাগ্যোতা করছি তোমার কাছে—আর মেরো না।" স্বর্ণময়ী ছিনাইয়া লইতে গেল টুলুকে—জরাগ্রস্ত দুর্ব্বল হাতে। অরুন্ধতীর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে না কি আজ? শাশুড়ীকে ঠেলিয়া দিয়া ঘা কতক আরও বসাইয়া দিল ছেলের পিঠে।

"আস্‌পদ্দার মুড়ো নেই একেবারে—খবরদার বল্‌ছি হাত দিও না ছেলের গায়ে।" বিশ বছর আগেকার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বিদ্যুৎচমকের মত ঝলকিয়া ওঠে। মুহূর্ত্তকালের জন্য থতমত খাইয়া যায় অরুন্ধতী, টুলুকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। গায়ের, মাথার কাপড় সামলাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে থাকে। তারপর—গর্জ্জাইতে থাকে নিজের মনে। বেশ করিবে অরুন্ধতী, তার নিজের ছেলেকে সে মারিবে, কাটিবে, তার খুসী! উনি আসিয়াছেন দরদ দেখাইতে! আর কাজের কেহ নন্—অমন আলুনি আদর দেখাইতে সবাই পারে—বায়না ধরে যখন, শান্ত করিলেই ত হয় আসিয়া!··

স্বর্ণময়ী আর দাঁড়াইল না সেখানে, টুলুর হাত ধরিয়া অশক্ত পায়ে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া নাতিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসে, ঠাকুরমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকে টুলু। "কেন যাস্ ওর কাছে?—মা না ত রাক্ষুসী, আধমরা করে ছেড়েছে ছেলেটারে! আর ধন্যি তোর বাবা! ঘরেই ত রয়েছে, মেরে ফেললেও একবার মানা করে না—সবই সৃষ্টিছাড়া এদের···।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া টুলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া মারের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে লাল হইয়া। জানালার বাহিরে চাহিয়া স্বর্ণময়ী টুলুর পাশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। বৃষ্টি থামিয়া গেলেও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই আদৌ, জলভরা পাটল মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে এবং মেঘের ওপার হইতে একটি স্তিমিত চাপা আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া উঠিয়া গাছের পাতায় জমা জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ছাদের ফাটল দিয়া এখনো জল পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা। বীণা ছিল এতক্ষণ ঠাকুমার কাছে, মায়ের ডাকে এই খানিক আগে চলিয়া গিয়াছে। বীণার মুখে শুনিয়াছে সব স্বর্ণময়ী। কি সংসারের কি হইয়াছে! গিয়াছে ত সবই, ছিল এই বাস্তুভিটাখানা, এইবার ঢোল পিটাইয়া সেখান হইতেও বাহির করিয়া দিবে! শুষ্ক কোটরগত চোখ দুইটা স্বর্ণময়ীর জ্বালা করিয়া ওঠে। নিজের চোখেই ত দেখিয়াছে সব স্বর্ণময়ী! বাহিরের উঠানে ঐ যে ইট স্তূপাকার হইয়া আছে—সাপের আস্তানা হইয়াছে আজকাল—দরদালান ছিল, বৈঠকখানা ছিল ওখানে, তার ওধারে ছিল নহবৎ-বাড়ী। ঠাকুরবাড়ীটা এখনো আছে, ঠাকুরের পূজাও হয় বটে, কিন্তু নৈবেদ্য জোটে না অধিকাংশ দিন! নিজেদের কুলাইয়া তবে ত ঠাকুর দেবতা? বাড়ী ঢুকিতে প্রকাণ্ড সিংদরজা পড়িয়া গিয়া একটা থাম ঝুঁকিয়া আছে, চাপা পড়িয়া কবে যে কার মৃত্যু আছে অপঘাতে! কি জাঁকই ছিল! দোল-দোল-দুর্গোৎসব হইত বাড়ীতে, সাতখানা গাঁয়ের লোকের নিমন্ত্রণ হইত। আর একফোঁটা দুধের জন্য ছেলেটা এক চোরের মার খাইল আজ? ভোজবাজির মতই যেন সব উড়িয়া গেল দেখিতে দেখিতে। যতদূর চোখ যায়, ঐ কাকডাঙ্গা, হাকিমপুর, রাখিয়া, কায়বা-চন্দনপুর পারাইয়া চাঁচুড়ের খেয়াঘাট পর্য্যন্ত ছিল এদের জমিদারী। বাড়ীর বাহির হইয়া কর্ত্তারা পরের জমিতে পা দেন নাই কোন

দিন—ষোল বেহারার পাল্কী হাঁকাইয়া যখন এ বাড়ীর কেহ যাইত, দেখিয়া পঞ্চাশখানা গ্রামের লোক মাথা নুয়াইত পথের দুধারে। পরের খাইয়া মানুষ ঐ বঙ্কু কুণ্ডু আজ পেয়াদা আনিয়া ক্রোক করিবে স্থাবর-অস্থাবর! পূর্ব্বপুরুষের ভিটা হইতে বাহির করিয়া দিবে! কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা হইলে সকলে? একজন অথর্ব্ব, একজন রুগ্ন, একটা বালক, আর ঐ সোমত্ত মেয়ে—কে আশ্রয় দিবে? মাথার ভিতরে ঝিম ঝিম করে স্বর্ণময়ীর! বাঁচিয়া থাকিয়া আরও কি দেখিতে হইবে! যম কি ভুলিয়া গিয়াছে তাকে? দুহাতে শক্ত করিয়া মাথাটা চাপিয়া ধরিল স্বর্ণময়ী।

অনেকক্ষণ পরে, রাত্রি নয়টা হইবে আন্দাজ টুলু তার বাবার ঘরে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। সমস্ত দিন সকলের অতিশয় উৎকণ্ঠায় কাটিয়াছে। যাদের আগমন আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তারা আসে নাই। না আসিলেও তাদের এবার ঠেকাইতে পারিবে না কেহ। আজ না আসিয়াছে, কাল আসিবে, না হয় পরশু তারা আসিবেই। সারাদিন উদ্বেগের পর সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া সীতানাথ শুইয়া আছে চোখ বুঁজিয়া। ঘুমাইতেছে কি জাগিয়া আছে, বুঝা যায় না। অরুন্ধতী এক পাশে বসিয়া ছেঁড়া কাপড়ে পটি বসাইয়া সেলাই করিতেছে, বীণা বিমর্ষমুখে মা'র পিছনে বসিয়া। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সীতানাথের চোখের আড়াল করিয়া চিম্‌নির গায়ে একখানা পুরু কাগজ জড়ানো। সকলেই চুপচাপ, কেবল মাঝে মাঝে ফোঁস করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতেছে এক একবার। সন্ধ্যার পরে আবার বৃষ্টি নামিয়াছে টিপ টিপ করিয়া। কোথায় বাগানে ঘেঁটু ফুল ফুটিয়া দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে। বাহিরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, দু' একটা জোনাকী কচিৎ ঝোপে ঝাড়ে জ্বলিয়া উঠিতেছে দপ্ করিয়া।

হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলিয়া অরুন্ধতী বলিল—"এখেনে বসে ঝিমুচ্ছিস্ কেন? শুগে যা না তোর বিছানায়।"

কয়েকখানা প্রায় অব্যবহার্য্য ঘর পারাইয়া স্বর্ণময়ীর ঘর। টুলু উঠিয়া গিয়া তখনি আবার ফিরিয়া আসিল। অরুন্ধতী বলিল—"কি হলো?"

ভয়ে ভয়ে মার দিকে চাহিয়া টুলু বলিল—"অন্ধকার ওঘরে।"

"তা হোক্, যা, তোর ঠাকুমা ত আছে।"

"না, আমার ভয় করে।"

"ভয় কিসের—আমরা রইছি এ ঘরে। কথা বলছি, যা—"

টুলু বীণার কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"ও দিদি—"

টুলুকে লইয়া বীণা চলিয়া গেল। একটু পরেই টুলুকে কোলে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ঠাক্‌মা কোথায় মা, ঘরে ত নেই?"

"ঘরে নেই ত কোথায় যাবে? আলোটা নিয়ে গিয়ে দেখ, হয়ত শুয়ে পড়েছে

"না, পড়েনি শুয়ে? আমি ত ডেকে দেখলাম।"

আলো লইয়া গিয়াও দেখা গেল, স্বর্ণময়ী ঘরে নাই ঘর ছাড়িয়া কোথাও ত যায় না স্বর্ণময়ী, বিশেষ রাত্রে! বীণা চেঁচাইয়া ডাক পাড়িল—"ঠাক্‌মা।" টুলু দিদির আঁচল ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ভয়ে অরুন্ধতী আলো লইয়া এঘর ওঘর খুঁজিতে লাগিল সীতানাথ শুনিয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। খুঁজিতে খুঁজিতে যখন তারা নীচে নামিয়াছে, বাগানের ও ধার হইতে স্বর্ণময়ীর গলা শোনা গেল—"ওরে, আমি এখেনে, আলো ধর একবার এদিকে তোরা।" ঐখানে? ঐখানে কেন? বাগানের প্রায় শেষ প্রান্তে বড় বাদাম গাছটার তলায় আশসেওড়া, বনমূলো আর আদাড়বাগের ঘন জঙ্গল, স্বর্ণময়ী সেইখানে গিয়া হাজির হইয়াছে। আলো ধরিয়া ঘরে আনিল বীণা ঠাকুরমাকে। ভিজিয়া ভিজিয়া স্বর্ণময়ী একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়াছে। আসিতে আসিতে বীণা জিজ্ঞাসা করে—"কি ওখানে ঠাক্‌মা? ওখানে গিছলে কেন?"

"গিছলাম"—, স্বর্ণময়ী চুপ করিয়া যায়।

তারপর চলিল একচোট তিরস্কার ও কটু মন্তব্যের পালা। অরুন্ধতী যদি বলে—"তোমার কি ভীমরতি ধরেছে মা, কি দরকার ছিল তোমার ঐ বাগানে রাত্ত-দুপুরে? একজনকে ডাকতে কি হয়েছিল"? সীতানাথ

বলে—"তাহলে আর জব্দ করা হলো কি? হাতে দড়ি না পড়লে কি নিস্তার আছে আমার--"

স্বর্ণময়ী মুখ বুজিয়া সব শুনিয়া গেল, না করিল 'প্রতিবাদ, না বলিল কৈফিয়ৎ দিয়া একটা কথা। কেবল নিরীহ অসহায়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল জনে জনের দিকে, তারপর নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাতে সকলে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বীণার ঘুম আসিতেছে না, শুইয়া শুইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছে শুধু। ঠাকুরমার উপর অত্যন্ত রাগ হইয়াছে বীণার। যত বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড বুড়ীর! গায়ে হাত দিলে স্বর্ণময়ীর হাত ঠেলিয়া সরাইয়া দিল বীণা,—"আর আদর করতে হবে না।" খানিকক্ষণ পরে স্বর্ণময়ী ডাকিল—"ঘুমুলি, ও বীণা?"

বীণা কথা বলে না, গুম্ হইয়া শুইয়া থাকে।

"বীণা, ও বীণা—"

"কেন?" ঝঙ্কার দিয়া বীণা বলিয়া উঠিল—"কি বলবে বল না, বীণা বীণা করছ কেন?"

"বলছিলাম কি—" স্বর্ণময়ী থামিয়া যায়—" কোথায় গিছলাম শুনলি নে?"

"দরকার নেই আমার শুনে, যেখানে খুসী তোমার যাও গে—"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বর্ণময়ী থামিয়া থামিয়া নিজের মনেই বলে—"মরণ আমার, এখন ভাবছি—তেমনই আমার কপাল বটে! কি যে দশায় ধরেছে!"

"কি বলবে তাই বল না, ঘুম পায় না বুঝি আমার—" বীণার এবার বেশ কৌতূহল হইয়াছে।

"অথচ পষ্ট দেখলাম যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে ঐ ঝোপের ঐখানটায়! এমনি রাত্তিরেই ত আসে তারা।"

"কারা আসে ঠাক্‌মা—?"

"নাম করতে নেই রাতে, লতারা। মাথার মণি মাটিতে নামিয়ে রেখে, বনে জঙ্গলে শীকার খুঁজে বেড়ায়। সাত রাজার ধন এক মাণিক—"

"ওঃ, তাই বুঝি গিছলে তুমি বাগানে—বীণার হাসি পায় শুনিয়া—"ও ত গল্প, সত্যি হয় না কি আবার ঐ সব?"

"তোদের ত বিশ্বাস হবে না জানি, ঐ জন্যেই ত কিছু বলিনে তোদের কাছে।"

"না, তা বলছিনে", বীণা ঠাকুমার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া বলে—"ও সব কি সত্যি সত্যি হয় ঠাক্‌মা?"

"হয় রে দিদি হয়"—স্বর্ণময়ী আর কিছু বলে না। একহাতে ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোল ঘেঁসিয়া বীণাও চুপ করিয়া শুইয়া থাকে।

টুলু অঘোরে ঘুমাইতেছে। অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত ও জাগ্রতের নিঃশ্বাসের শব্দ একই সঙ্গে শোনা যায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে এবং গুর্ গুর্ শব্দে অবিরত মেঘ ডাকিতেছে, আর সেই সঙ্গে জানালায় টাঙানো চটের ফাঁক দিয়া বিদ্যুতের আলো আসিয়া ঘরের অন্ধকার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে চমকলাগার মত।

স্বাধীনতা

...মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেমন তন্নিহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলন ব্যতীত সম্যক্ ভাবে বিকশিত হইতে পারে না, সেইরূপ তাহার সঙ্ঘবদ্ধ জীবনও সমগ্র মনুষ্যসমাজের পরস্পরের মিলন ব্যতীত একক অবস্থায় সম্যক্ ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্নের ব্যবস্থা থাকিলে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। একদিন জগতে ঐ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং তখন কুত্রাপি স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই।...

শিক্ষাপদ্ধতিতে ভারতের ইতিহাস

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

আপনারা আমাকে এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করে যে সম্মান দেখিয়েছেন, সে জন্য আমি আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।* কিন্তু যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তা'কে সমৃদ্ধ করে তোলা, সে সম্মেলনের নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা যে আমার নেই, তা আমি ভালভাবেই জানি। এ কথা যে আমি শুধু বিনয় প্রকাশ করবার জন্য বলছি তা নয়, কারণ শিক্ষকতাকার্য্যে আমি অর্ব্বাচীন না হলেও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সত্যই সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া যাদের শিক্ষা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তাদের সঙ্গে আপনাদের যে সাক্ষাৎ পরিচয় এবং তাদের সম্বন্ধে আপনাদের চিন্তা করবার যে সুবিধা ও যোগ্যতা আছে, আমার তা নাই। উপমার ভাষায় বলতে গেলে বীজ অঙ্কুরিত করবার এবং উপযুক্ত আবহাওয়ায় সে অঙ্কুরকে গাছে পরিণত করা ও সে গাছকে পরিপুষ্ট করে তুলবার গুরুভার আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সে গাছকে ফল-ফুলে সমৃদ্ধ করে তুলবার ভার হয়ত আমাদের, কিন্তু সে ভার অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু, কারণ উপযুক্ত আবহাওয়ায় যে গাছ বর্দ্ধিত হয়েছে, সে স্বীয় প্রভাবেই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

আমরা এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির একটি যুগান্তরের সময় মিলিত হয়েছি। যুগান্তর বলছি, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বতোভাবে শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয় নি। ইতিপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষাকে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে নির্দ্ধারিত করেছিল সত্য, কিন্তু সে ভাষা যে ছাত্রমণ্ডলীর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা পায় নি, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এখন হতে যে মাতৃভাষা আমাদের শ্রদ্ধা সম্পূর্ণভাবে পাবে, এ আশা করা হয়ত দুরাশা নয়। বহুদিন আমাদের চিন্তাশক্তি তার স্বকীয় বাহনের অভাবে সহজভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। ফলে শিক্ষা যে অঙ্গহীন হয়ে পড়েছিল, সে কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ শৃঙ্খল আমরা যে এক সময়ে নিজেরাই বরণ করে নিয়েছিলাম, সে কথা হয়ত আমরা আজ বিস্মৃত হয়েছি। শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা, বিহার প্রদেশে লক্ষাধিক বিদ্যালয় ছিল এবং এ সব বিদ্যালয়ে প্রাচীন রীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হত। ১৮৩৫ সালে বাংলা সরকার এডাম সাহেবকে এ প্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার অর্পণ এবং সে পদ্ধতির কি সংস্কার সাধন করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে বলেন। এডাম সাহেব সাগ্রহে এ ভার গ্রহণ করলেন ও এ সম্বন্ধে যে বিবরণী সরকার পক্ষের নিকট পেশ করলেন, এই শতাধিক বৎসর পরেও তা আমাদের অনুধাবনযোগ্য। এডাম সাহেব এই বিবরণীতে বলেন—"এ দেশে পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি প্রবল, পাঠশালার সংখ্যা দেখে মনে হয় ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য এ দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মনেও গভীর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি এ দেশের লোকের সামাজিক প্রথার অনুবর্ত্তী"।*

এই কারণে এডাম সাহেব এ প্রদেশে কোনও নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এ দেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার যে সব বিদ্যায়তন ছিল, সেইগুলি অবলম্বন করে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করাই ছিল সব চাইতে প্রশস্ত, লোকানুবর্ত্তী, স্বল্পব্যয়সাধ্য এবং কার্য্যকরী উপায়। তিনি এই উপায়

*হাওড়া জিলা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে পঠিত।

*"That the system of village schools is extensively prevalent, that the desire to give education to their male children must be deeply seated in the minds of parents, even of the humblest classes and that these are the institutions closely interwoven as they are with the habits of the people and the customs of the country."

—Adam's Report on Vernacular Education,

অবলম্বন করে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করাই সমীচীন মনে করেছিলেন; এবং তাঁর মতে এ ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করা ছিল এ দেশের পক্ষে অহিতকর।*

এডাম সাহেবের উপদেশ সরকার পক্ষ অগ্রাহ্য করেন এবং বিখ্যাত মেকেল সাহেব ঠিক করলেন যে, এ দেশে এমন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে হবে যা হবে তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক। তাঁর মতে সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতির চাইতে ইংরাজী শিক্ষাই ছিল এ দেশের পক্ষে বেশী হিতকর এবং তিনি চেয়েছিলেন এমন একদল লোক সৃষ্টি করতে যাদের রক্ত ভারতীয় হলেও রুচি, আদর্শ এবং বুদ্ধিবৃত্তি হবে ইংরাজী।† হয়ত মেকলে সাহেব আজ বেঁচে থাকলে এ দেশ দেখে আজ সুখী হ'তেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি তাঁর এই আদর্শানুযায়ী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে প্রিন্সেপ প্রমুখ ইংরাজদের নিকট হ'তে বাধা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এ দেশবাসীর নিকট হ'তে কিছুমাত্র বাধা পান নি, বরং পরোক্ষভাবে এ দেশের লোকের সহায়তা পেয়েছিলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আপত্তি করে সরকার পক্ষকে যে খোলা চিঠি লেখেন, তাতে তিনি মুক্তকণ্ঠে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন, অথচ সে শিক্ষার বাহন কি হবে, সে সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হবার সঙ্গে আমরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির খোঁজ পেলাম বটে, কিন্তু সরকারের সহায়তার অভাবে পাঠশালার সংখ্যার হ্রাস হতে লাগল এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই অবহেলার জন্য বিশ বৎসর পরে শতকরা প্রায় ৩৩ জনের স্থানে তিনজনের বেশী শিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া গেল না। মাতৃভাষা ক্রমশঃ শিক্ষার আসর হ'তে নির্ব্বাসিত-প্রায় হল এবং নূতন শিক্ষার ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বর্ত্তমানে যে সুকঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন।

মাতৃভাষাকে আমরা পুনরায় শিক্ষার আসরে ফিরিয়ে পেয়েছি, কিন্তু বহুদিন ধরে শিক্ষার বাহন ছিল না বলে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট উপযুক্ত শ্রদ্ধা পায়নি বলে সে ভাষা যে যথেষ্ট পরিমাণে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, তা' স্বীকার না করে উপায় নেই। বাংলা ভাষার প্রচলিত ব্যকরণগুলি এখনো সংস্কৃতের অনুবর্ত্তী, ক্রিয়াপদের রূপ অনিশ্চিত, বানানসমস্যা জটিল এবং বিজ্ঞানের পরিভাষা নানাভাবে অভাবগ্রস্ত। অনেক পাঠ্যপুস্তকে এখনো শুদ্ধ বাক্যরচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না; এবং বিশুদ্ধ রচনারীতিকে তার চাইতেও বেশী অবহেলা করা হয়। ফলে আমাদের ছাত্রগণ অনুকরণযোগ্য গাঢ়বদ্ধ রচনা খুব কমই পেয়ে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বানানসমস্যা সরল করবার ও পরিভাষার দারিদ্র্য দূর করবার জন্য যত্নবান হয়েছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সে চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারে শুধু আপনাদের সহযোগিতায়।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ইতিহাস সব চাইতে অনাদৃত। আমরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস যা' পড়েছি বা পড়িয়েছি, তা হচ্ছে এ দেশের অতি মামুলীধরণের রাজনৈতিক ইতিহাস। অথচ ইতিহাস হবে ছাত্রদের পক্ষে প্রধান অনুপ্রেরণার বিষয়। স্বদেশের সাহিত্য, শিল্প, কলা, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেবে ইতিহাস। রাজনৈতিক ইতিহাস যোগাবে কাঠামো মাত্র, আর সেই কাঠামোর অন্তরে থাকবে ভারতীয় সভ্যতার সুসংবদ্ধ চিত্র। সে সভ্যতাকে গড়ে তুলতে যে সব বিভিন্ন জাতি সহায়তা করেছে, সে ইতিহাসে তা'দের

---

*"Existing native institutions from the highest to the lowest, of all kinds and classes, were the fittest means to be employed for raising and improving the character of the people—that to employ those institutions for such a purpose would be the simplest, the safest, the most popular, the most economical and the most effectual plan for giving that stimulus to the native mind, which it needs on the subject of education, and for eliciting the exertion of the natives themselves for their own improvement, without which all other means must be unavailing"—Adam's Report.

†"that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic, that the natives are desirous to be taught English"...

"a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons, Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and intellect."

প্রত্যেকের প্রকৃত স্থান নির্দ্ধারিত করতে হবে। ভারতবর্ষের মাটি, জল, বায়ু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নানা জাতি-দল্প সে ইতিহাসকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং নিত্য নূতন অবদানে সে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তা আমাদের জানতে হবে।

ভারতবর্ষ বহির্জগতের সঙ্গে যে সব যোগসূত্র স্থাপিত করেছিল, এবং সেই যোগসূত্রের আকর্ষণে কালক্রমে এশিয়াখণ্ডের বহু জাতি ভারতীয় সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সে কথা এ ইতিহাসে স্থান পাবে। কারণ এ-দেশের মাটির সঙ্গে আমাদের সকলের সম্বন্ধই অতি নিগূঢ় ও অচ্ছেদ্য, সুতরাং এ-দেশের প্রাচীন গৌরবকাহিনী সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে এবং এ-দেশের সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধার চোখে না দেখলে আমাদের মন যে পরিপুষ্টি লাভ করতে পারবে না, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। সে কথা কথঞ্চিৎ অবান্তর হ'লেও, প্রাচীন যুগে বহির্জগতের ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কারণ সে সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাস-গুলিই যে শুধু নীরব তা নয়, সে সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও নাই বললে চলে।

প্রায় হাজার বছর ধরে প্রাচ্য এশিয়ায়, পারসীক, তুর্কী, মঙ্গোলীয়, চীন, তিব্বতী, জাপানী, আনামী প্রভৃতি জাতির ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে ও তাদের গঠনে সহায়তা করেছে। যে সব জাতি অধুনা-লুপ্ত এবং যাদের অস্তিত্ব নিবদ্ধ এমন সব নিদর্শনে, যা মরুভূমির বালুকাস্তূপ বা অজ্ঞাত দেশের নিভৃত গিরিগুহা হ'তে উদ্ধার করা হয়েছে, সে সব জাতির কথা না-ই বা বললাম। বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে যে সব জাতির একটা স্বতন্ত্র স্থান আছে এবং যে সব জাতি প্রাচীন সভ্যতার ধারা এখনো অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তা'দের মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব অটুট রয়েছে। আমরা যদি সুদূর সাইবিরিয়ার মালভূমিতে মঙ্গোলীয় লামাদের নানা বৌদ্ধ-বিহারে অনুসন্ধান করি, তা' হলে দেখতে পাব যে, সে সব প্রতিষ্ঠানে এখনো বহু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্র গভীর ভাবে আলোচনা করেন, এবং সে শাস্ত্রে ও ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনে তাঁদের এমন অধিকার ও অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে, যার তুলনা এখন ভারতেও নাই। অথচ এই মঙ্গোলীয় জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষা লাভ করেছিল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে।

কি ভাবে তারা এ ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, সে কথা আপনাদের বলতে চাই, কারণ তা' ঘটেছিল এমন একটি ধর্ম্ম-সভায় যাকে Convention of Religion বলা চলে। জেঙ্গিসের বংশধর কুবলাই খাঁ তখনো চীনদেশ জয় করেন নি এবং সমস্ত মধ্য-এশিয়ায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হন নি। গোবি মরুভূমির একান্তে কারাকোরাম নামক শহরে তাঁর রাজধানী এবং তাঁর রাজসভায় নানা ধর্ম্মের প্রতিনিধি তাঁকে দীক্ষিত করবার জন্য ব্যস্ত। কুবলাই খাঁ বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিগণের এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন এবং ঠিক করলেন যে, সেই সভায় ধর্ম্মালোচনায় যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হবে, সেই ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করবেন। এই সভায় যোগদান করলেন—সিরিয়া হতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধি, ইরাণ হতে অগ্নি-উপাসক, চীন হতে কনফুসীয় পণ্ডিত ও তা'ও ধর্ম্মের প্রতিনিধি এবং তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষ হতে বৌদ্ধ পণ্ডিত। এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম শাক্যপণ্ডিত, তিনি তিব্বত হতে গেলেও জাতিতে ছিলেন ভারতীয়, আর তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর হলেও পাণ্ডিত্য হিসাবে ছিলেন তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজে শ্রেষ্ঠ। তিব্বত হতে কারাকোরাম পর্য্যন্ত দুর্গম পথের কষ্ট শাক্যপণ্ডিতকে নিরুৎসাহিত করতে পারে নি, সভায় উপস্থিত অন্যান্য ধর্ম্মের বয়োবৃদ্ধ ও পারদর্শী পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমানও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। দিনের পর দিন নানা ধর্ম্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর কূটতর্ক চলল এবং অবশেষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন। সে ধর্ম্মে তখন কুবলাই যে নিজেই দীক্ষা নিলেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে সমস্ত মঙ্গোলীয় জাতি সে ধর্ম্মকে গ্রহণ করল এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিয়ে একটি যাযাবর জাতিকে সভ্যতার কোঠায় উন্নীত করল। পরে কুবলাই খাঁ যখন অর্দ্ধ-এশিয়ার অধীশ্বর হলেন, তখন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল ধর্ম্মরাজ্য সংগঠনের পরিকল্পনা করলেন।

সে চেষ্টা ব্যর্থ হলেও মঙ্গোলীয় জাতি বিশেষ ভাবে উপকৃত হ'ল, কারণ এই অবসরে বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হল, আর এই অনূদিত গ্রন্থই হল মঙ্গোলীয় জাতির একমাত্র সাহিত্য, যা হ'তে এ-পর্য্যন্ত সে জাতি শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছে এবং বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাপ্রণালী সে দেশকে তার প্রাচীন আদর্শ হতে বিচলিত করতে পারে নি। সুতরাং তাদের দেশে যদি আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ-বিহারগুলিই হচ্ছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আর সেই বিহারের লামা বা আচার্য্যেরা ব্যাকরণ শাস্ত্র, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতির আলোচনায় এখনো প্রাচীন ভারতীয় পন্থা অনুসরণ করছেন, তা হ'লে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নাই।

এশিয়াখণ্ডের অন্য প্রান্তে জাপানী সভ্যতার সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। এ কথা সত্য যে, জাপানী-জাতি বহু পরিমাণে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্ত্তমান জাপানের রাজনৈতিক শক্তি, তার সৈন্য-সমারোহ, নৌ-বল ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভের চেষ্টার পেছনে যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তার সভ্যতার মর্ম্মস্থল যদি আমরা খুঁজে বের করি, তা হ'লে দেখব যে, জাপান ভারতীয় সভ্যতাকে বর্জ্জন করে নি বা করতে পারে নি। বর্ত্তমান যুগের আদর্শে গঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'বার পূর্ব্বেও, অর্থাৎ বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্তও জাপানী শিক্ষালাভ করত যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, সেগুলি ছিল বৌদ্ধ বিহার, আর এ কথা আপনারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন যুগে ভারতেও নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিহারগুলি এত বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল যে, সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়-পদবাচ্য ধরা হয়েছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন জাপানীরা তার জাতিসংগঠন-কার্য্য সুরু করে, তখনই এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয়। জাপানী জাতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শোতোকু-তাইশি এই সময়ে যে রাজকীয় অনুজ্ঞা প্রচার করলেন, তাতে তিনি স্পষ্ট করে বললেন, 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ অবদান, সেই ধর্ম্মই হচ্ছে অন্যান্য দেশের শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন, সুতরাং জাপানী-জাতি যদি শিক্ষিত হ'তে চায়, যদি সভ্য জাতির গোষ্ঠীভুক্ত হ'তে চায়, তা হ'লে তাকে সেই ধর্ম্ম অবলম্বন না করলে চলবে না।' সুতরাং শোতোকুর সময় হ'তে জাপান এই ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করল। চীন দেশ হ'তে ভারতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য, ভারতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রভৃতির অনুবাদ জাপানে প্রচারিত হ'ল ও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। বর্ত্তমানে জাপানে বৌদ্ধসম্প্রদায় বারটি, আর প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সুতরাং বর্ত্তমান জাপান নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করলেও প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জ্জন করে নি, বরং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করে আসছে, কারণ এ ভয় তাদের আছে যে, সেগুলিকে পরিত্যাগ করলে তারা হয়ত নিজেদের সভ্যতার মূল সূত্রগুলি হারিয়ে ফেলবে। এই কারণে জাপানের প্রধান নগরগুলি হ'তে দূরে নিভৃত পল্লীর যে কোন বৌদ্ধ-বিহারে, নারার প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে, বা মধ্য যুগের সব চাইতে বড় প্রতিষ্ঠান কোইয়াসান পাহাড়ের উপরে কোবো দাইশির আশ্রমে আমরা যে নিষ্ঠার পরিচয় পাই, ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়নে যে আন্তরিকতা দেখতে পাই এবং অধ্যাত্মসাধনায় যে অন্তর্দ্দৃষ্টির খোঁজ পাই, তা যে ভারতীয় সভ্যতার অবদান তা'তে সন্দেহ নাই।

ভারতের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে, যবদ্বীপ বা বলিদ্বীপে, কিংবা ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া ও আনামে, এবং শ্যামদেশে যে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল, সে কথা বিস্তৃত করে বলবার দরকার নেই। এই সব দেশে ভারতীয় সভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে প্রচারিত হয়েছিল, এবং সে সব দেশের ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে ও ধর্ম্মে সে সভ্যতার সম্পূর্ণ প্রভাব এখনো বর্ত্তমান।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তার পূর্ব্বে সে দেশে কোন সাহিত্য, বা সাহিত্যের বাহন, লিপি ছিল না। এই সময়ে তিব্বতের প্রথম সম্রাটের আজ্ঞানুসারে তিব্বতী পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে আসেন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং দেশে ফিরে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে তিব্বতী ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লেখেন ও তিব্বতী ভাষার জন্য তৎকালীন ভারতীয় লিপির প্রচলন করেন। এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হ'তে ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত প্রায় ছ'শো বছর ধরে বহু তিব্বতী পণ্ডিত

ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সমস্ত বৌদ্ধ-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেন। এই অনূদিত সাহিত্য বিপুল, তিব্বতী মুদ্রিত সংস্করণ প্রায় ৫০০০ গ্রন্থে সমাপ্ত। এই বৌদ্ধ-সাহিত্যই হচ্ছে তিব্বতের প্রধান সাহিত্য, এ ছাড়া আধুনিক কালে তিব্বতী ভাষায় অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার অনুপ্রেরণাও মূলতঃ ঐ প্রাচীন সাহিত্য হতে এসেছে, সেগুলি হচ্ছে তিব্বতের নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শাস্ত্র-গ্রন্থ। বর্ত্তমান তিব্বতের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা পরিত্যাগ করে নি, সেই কারণে বৌদ্ধ বিহারগুলিই এখনো একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তিব্বতে শিক্ষার প্রচলন হয়।

এ পর্য্যন্ত আমি চীন দেশের কথা বলি নাই, তার কারণ চীন দেশের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল। সেই জন্য কনফুসীয় সম্প্রদায়ের চীনা পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসারে বাধা দেন, এবং সে ধর্ম্মের বহুল প্রচার ও প্রসার সত্ত্বেও চীন দেশে সে ধর্ম্ম কোন দিনই রাজকীয় ধর্ম্ম হিসাবে গৃহীত হয় নি। কিন্তু এ বাধা সত্ত্বেও খৃষ্টীয় প্রথম শতক হ'তে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারত ও চীনদেশের মধ্যে যোগসূত্র খুব দূর ছিল না। সেই কারণে এই যুগে ভারতবর্ষ হ'তে বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীন দেশে যেতেন, চীনা পণ্ডিতেরাও ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সেই সব ভারতীয় ও চীনা পণ্ডিতদের সমবেত চেষ্টায় এই যুগে সমগ্র বৌদ্ধ-সাহিত্য চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অনূদিত হয় বলে চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্য অতুলনীয়, কারণ তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষায় শুধু একটি মাত্র সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অনূদিত হয়েছিল। এই বিরাট চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্প্রতি জাপান হতে নূতন প্রকাশিত হয়েছে। এই নূতন সংস্করণ প্রায় ৬,০০০ হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কালক্রমে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও নূতন শাস্ত্র, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি লিখিত হয়। এই সব টীকা-টিপ্পনী হ'তে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চীনা পণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন আলোচনার জন্য কতটা উৎসাহী ছিলেন ও কতটা পরিশ্রম করেছিলেন।

পূর্ব্বে যা বলেছি, তা থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতক হ'তে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত প্রাচ্য এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ, পারস্যের প্রান্তভূমি হ'তে জাপান ও সাইবেরিয়া হতে ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমিভাগের বিভিন্ন জাতি ভারতীয় সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। এ সব জাতির মধ্যে যারা যাযাবর, যেমন শক, তুর্কী, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি এবং যাদের কোন স্বকীয় সভ্যতা ছিল না, যেমন তিব্বতী, ও ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশের নানা জাতি, তারা সকলেই ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের দেশের আবহাওয়ার মধ্যে সে সভ্যতাকে ক্রমশঃ স্বকীয় করে তুলেছিল। আর, যে সব জাতির একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল, যেমন চীনা, জাপানী ইত্যাদি, তারা ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু সে সভ্যতার সেই উপাদানগুলিই নিজস্ব করে নিয়েছিল, যা তাদের নিজেদের সভ্যতায় ছিল না।

প্রাচ্য এশিয়াখণ্ডের শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা করলে এ কথা আরও স্পষ্ট হবে। ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত নানা দেশে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্রহ্মদেশ হতে আরম্ভ করে চীন, জাপান পর্য্যন্ত নানাদেশে যে সব বৌদ্ধ মন্দির দেখি, যাকে সাধারণতঃ পাগোদা বলা হয়, এবং যা নানাস্তরে বিন্যস্ত হয়ে নির্ম্মিত হয়, এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল যে ভারতীয় তা সম্প্রতি নির্দ্ধারিত হয়েছে। এ সব মন্দির কাঠে নির্ম্মিত এবং অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষেও মন্দির এই রীতিতে কাঠে নির্ম্মিত হত। কিন্তু এ-দেশের আবহাওয়ায় কাঠের মন্দির অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হয় বলে ক্রমশঃ পাথর ও ইটে মন্দির নির্ম্মিত হতে লাগল। প্রথম যুগে পাথরে নির্ম্মিত মন্দিরগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সেগুলি নানাস্তরে বিন্যস্ত কাঠের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া ভারতবর্ষের যে সব প্রদেশের আবহাওয়ায় কাঠ টিকতে পেরেছে, যেমন নেপাল ও মালাবার, সে সব প্রদেশে এখনও কাঠে নির্ম্মিত পাগোদার অনুরূপ বহু মন্দির দেখা যায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এ

শিল্প প্রাচ্য দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে ; চীন, জাপান সে শিল্প অতি সযত্নে রক্ষা করেছে, পরবর্ত্তী কালে তাকে পল্লবিত ও নিজেদের আবহাওয়ার মধ্যে তাকে পরিপুষ্ট করেছে। সেইজন্য জাপানে নানা অঞ্চলে খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম শতকের যে সব বৌদ্ধ মন্দির পাই, সে গুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রীতির অনুযায়ী, পরবর্ত্তী কালের মন্দিরগুলি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

ভাস্কর্য্য-চিত্রকলায় প্রাচ্য জগৎ বহু পরিমাণে ভারতীয় সভ্যতার নিকট ঋণী। ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার ধারা যে মধ্য-এশিয়ার নানাদেশ হয়ে চীন ও জাপান পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেই সব দেশেই পাওয়া যায়। চীন দেশের পশ্চিম প্রান্তে তুন-হোয়াং নামক স্থানে ও উত্তর প্রান্তে শান্-শি প্রদেশে ইউয়ান-কাং নামক স্থানে প্রাচীন যুগের দু'টি বিরাট বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই দুই স্থানে গিরিগুহা-গুলিকে বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত করা হয়েছিল, আর সে গুহা-মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ ও সুশোভিত করবার কার্য্যে যোগদান করেছিলেন, ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু ও চীন এবং অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ ভারতের শিল্পীরা। এই দুই স্থানের চিত্রকলার বিচার করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে চিত্রাঙ্কনের সেই ধারা অনুসৃত হয়েছে, যা আমরা পাই অজন্তায় এবং অজন্তার অনুকরণে চিত্রিত আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে ও মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে। ভাস্কর্য্যে সেই নির্ম্মাণকৌশল পরিস্ফুট হয়েছে, যার পরিচয় পাই গুপ্তযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যে। ভারতীয় শিল্পের এই ধারা চীন হতে জাপান পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। নারার নিকটবর্ত্তী হোরিউ-জি নামক বৌদ্ধ মন্দিরে আমরা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের যে সব চিত্র পাই, তা সর্ব্বতোভাবে অজন্তার আদর্শ ও চিত্রণ-কৌশল গ্রহণ করেছে এবং কোইয়া-সান্ মন্দিরে যে সব বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে, তার মধ্যেও গুপ্তযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে।

অন্য দিকে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন রাজধানী এঙ্কোরের এঙ্কোরভাট ও যবদ্বীপের বোরোবোদোর নাম আপনারা সকলেই শুনেছেন। এঙ্কোরভাট খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের বিষ্ণু-মন্দির, বোরোবোদোর বৌদ্ধ মন্দির, এঙ্কোর-ভাটের কিছু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এ দুই মন্দিরের তুল- ভারতবর্ষেও দুর্লভ। এঙ্কোরভাট ও বোরোবোদোরে- বিরাট পরিকল্পনা দেখে ইউরোপীয় ও আমেরিক- পণ্ডিতেরা বিস্মিত হয়েছেন এবং প্রতি বৎসর বহু বিদে- এই সব মন্দির দেখতে সে সব দেশে যান। এই দু- মন্দিরের শুধু পরিকল্পনা কেন, তাদের নির্ম্মাণকৌশল, প্রাচীরগাত্রে খোদিত রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি গল্পের অসংখ্য চিত্রাবলী, আর্টের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই মন্দিরগুলি সে সব দেশে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

চীন, তিব্বত, জাপান, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি দেশকে যে বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্য ভারত দান করেছে, তা ছাড় সেই সব দেশের সাহিত্যের অন্য দিকেও ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চীনা সাহিত্যে প্রথম নাটক রচিত হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে, আর সে নাটকের নাম 'বোধিসত্ত্বমালা'। এ নাটক ভারতীয় নাটকের অনুকরণে রচিত। সুতরাং নাটক রচনায় চীনা সাহিত্যিকেরা প্রথম অনুপ্রেরণা পান ভারতীয় সাহিত্য হতে। জাপানের বিখ্যাত 'নো'-নৃত্যের মধ্যে ভারতীয় 'যাত্রা'র প্রভাব স্পষ্ট ধরা যায়। ভারত-বর্ষে যাত্রা লুপ্তপ্রায়, অনাদৃত। অথচ, জাপানে 'নো'-নৃত্য দেখবার জন্য শুধু যে জাপানীরা তা নয়, ইউরোপ ও আমেরিকা হতে নবাগত বহু বিদেশী পাগল।

বহির্জগতের সভ্যতার সংগঠনে ভারতীয় কৃষ্টির এই অবদানের ইতিহাসের দু' একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলতে হল। তার কারণ শিক্ষক ও ঐতিহাসিক সকলেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই গরিমাময় অধ্যায়কে অবহেলা করেছেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে হলে এ দিকে যে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, তা'তে সন্দেহ নাই। কারণ বহির্জগৎ ভারতবর্ষ হতে যে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান পেয়েছে ও সযত্নে রক্ষা করছে, আমরা বহু পরিমাণে তা হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার সেই সব লুপ্ত রত্ন ফিরিয়ে আনতে পারলে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে এবং সেই ইতিহাস হবে ছাত্রদের প্রধান অনুপ্রেরণার বিষয় ও জাতিসংগঠনের প্রকৃত সহায়।

কিন্তু এ কথা আমি বলতে চাই না যে, উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবস্থা হলেই যথোচিত শিক্ষার প্রচলন হবে। 'বই পড়ানো' ও শিক্ষাদান এক কথা নয় এবং বর্তমানে আমরা যে বেশীর ভাগ 'পড়াই', তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতে পারব। স্কুলের নিম্নশ্রেণীগুলির শিক্ষাপদ্ধতিতে 'স্বাস্থ্য' ও 'প্রকৃতি'-বিজ্ঞানের প্রচলন আছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে এবং দাঁত পরিষ্কার না রাখবার বিষময় ফল সম্বন্ধে অনেক উচ্ছ্বসিত রচনা পড়া সত্ত্বেও বাপমায়ের তাড়া না খেলে যে দাঁত পরিষ্কার রাখে না, তা আমরা সকলেই জানি! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা সম্বন্ধে তারা সেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে অনেক বিষয় পড়ে ও শিক্ষকের মুখে শোনে, অথচ কর্তৃপক্ষের অবহেলাতেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক, তাদের স্কুলগৃহে সে আদর্শ অনুসরণ করা হয় না। স্কুলের অনেক বদ্ধ ঘরেও মুক্ত হাওয়া সম্বন্ধে তাদের বক্তৃতা শুনতে হয়। প্রকৃতি-পরিচয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'মটর' ফুলের বিশ্লেষণে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েও তাদের অনেকে মটর ফুল যে চিনতে পারে না, এ কথা আপনারাও জানেন। যতদিন আমাদের শিক্ষা এই ভাবে পুঁথিগত থাকবে, ততদিন আমাদের ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি যে পরিপুষ্টি লাভ করবে না, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বিজ্ঞানের অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক তথ্য সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েও তাদের জ্ঞানকে কার্য্যকরী করতে পারবে না। জল যে অম্লজান ও উদজানে গঠিত, তা বইয়ে পড়ে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জল সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না এবং পুং-বিদ্যুৎ ও স্ত্রী-বিদ্যুতের সম্বন্ধে নানা বক্তৃতা, যে সব ছাত্রেরা কখনো বিদ্যুৎ ব্যবহার করে নি, তাদেরও বেশী দূরে এগিয়ে দেবে না।

এ সম্বন্ধে আমি আর বাগ্‌বিস্তার করতে চাই না। যা বলেছি তা থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্দোষ নয় এবং সে জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে তাঁদের অনেকের পরিচয় নাই এবং সে সম্বন্ধে স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ যে শিক্ষকদের সুবিধা দিতে মুক্তহস্ত নন, তা আমরা সকলেই জানি। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষকদের শিক্ষা যাতে অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সাধিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে সব শিক্ষক সেখানে গত দু'বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-লাভ করেছেন, তাঁদের অনেকেই যে স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের নিকট হতে যথোচিত উৎসাহ পান নি, তা বলাই বাহুল্য।

যাঁরা শিক্ষকতাকার্য্য গ্রহণ করেছেন, লক্ষ্মী যে তাঁদের কৃপা করেন নি, তা আমরা সকলেই জানি। লক্ষ্মীর বর-পুত্র হ'বার অভিলাষ তাঁরা রাখেন না বটে, কিন্তু ভদ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করবার উপযুক্ত দাবী তাঁরা দেশবাসীর নিকট করতে পারেন। কিন্তু সে দাবী পূরণ করতে সর-কার বা দেশবাসী কেহই এ-পর্য্যন্ত যথোচিতভাবে অগ্রসর হন নি। শিক্ষা-বিভাগ স্কুলগুলিকে যে সামান্য অর্থসাহায্য করেন, তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া দূরের কথা, দৈব-দুর্বিপাকে কোন স্কুলের ছাত্রসংখ্যার সাময়িক হ্রাস হলেই কর্তৃপক্ষ সে সামান্য অর্থসাহায্য হতেও তাকে বঞ্চিত করেন। অপরপক্ষে যে সব অবস্থাপন্ন অভিভাবকগণ 'প্রাইভেট টিউটর' রেখে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন, স্কুলের বেতনের হার সামান্য বৃদ্ধি করলেই তাঁদের মধ্যে অনেকের ঘোরতর আপত্তি করতে দেখা যায়। উপরন্তু গ্রাম্য বিবাদের জন্য অনেক স্থানে একটি বিদ্যালয়ের পরি-বর্ত্তে দু'তিনটি বিদ্যালয় স্থাপিত হতেও দেখা যায়। ফলে শিক্ষকদের দারিদ্র্য বেড়েই চলে।

কর্তৃপক্ষের অবহেলা, দারিদ্র্যের নিপীড়ন, উপরন্তু শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্বন্ধে ছাত্রমণ্ডলীর ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অশ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করতে হয়। এ কর্ত্তব্য যে অতি কঠোর তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষকতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা যদি প্রসন্নচিত্তে নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে যাই, তা হলে যে দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসবে, তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এ দেশের একজন প্রধান তত্ত্বদর্শী বলেছেন—

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে প্রসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী।

"মনই দৃশ্যমান জগৎকে সৃষ্টি করে, সুতরাং এ-জগতে মনই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যদি কেহ প্রসন্নমনে কথা কহেন, বা কার্য্য করেন, তবে সুখ তাঁহাকে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।"

চতুষ্পাঠী

দুর্গম পথের যাত্রী
৪ ষ্টানলী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[১]

আফ্রিকার পথের কথা, কিন্তু আরম্ভ করতে হল উত্তর-ওয়েলস্ থেকে। সেখানে ডেনবিঘ্ বলে একটি ছোট্ট



স্যার হেন্‌রি মর্টন ষ্টানলী।

সহর আছে—সেই সহরের পরম গর্ব্বের বিষয় যে, সেইখানে একদিন স্যার ষ্টানলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন—

স্যার এচ, এম, ষ্টানলী—যিনি আফ্রিকার অন্তঃস্থলের সঙ্গে সভ্য-জগতের পরিচয় করিয়ে দেন, জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্য্যটক এবং আবিষ্কারক।

পুরানো এক কাস্‌ল্-এর ভগ্নাবশেষের পাশে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—সেই ঘরখানিকে জাতীয় সম্পদ্ হিসেবে তারা রক্ষা করে রেখেছে—সেইখানে ষ্টানলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন বিদেশী অতিথি এলে, তারা সগর্ব্বে সেই ঘরখানি দেখায়।

বলে, ডেন্‌বিঘের পরম সৌভাগ্য, এইখানে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে একদিন স্যার ষ্টানলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন তাঁর অন্য নাম ছিল। ষ্টানলী নাম পরে তিনি নিজে নিয়েছিলেন এবং সেই নামেই আজ তিনি জগতে পরিচিত। তাঁর বাপ-মা নাম রেখেছিলেন "Rollant"—সেটার ইংরেজী করলে হয় Rowlands, রোল্যাণ্ডস্। তাঁর বাবা ছিলেন সামান্য এক চাষীর ছেলে।

ষ্টানলীর (আমরা এই নামই করব) যখন মাত্র দু' বছর বয়স, তখন হঠাৎ তাঁর বাবা মারা গেলেন। মিসেস্ প্রাইস্ বলে একজন স্ত্রীলোক সেই শিশুকে লালন-পালন করবার ভার নিলেন। বালকের যখন জ্ঞান হল, তখন সে মিসেস্ প্রাইস্‌কেই মা বলে জানে।

মিসেস্ প্রাইসের স্বামী বাগানের কাজ করতেন। তাঁর ওপর একটা বড় বাগান তত্ত্বাবধান করবার ভার ছিল। তিনি বাগানের কাজ করতেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টানলী সারাক্ষণ মুক্ত-আকাশের তলায় আলো-বাতাসের মধ্যে প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। সেই ভাবে মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে থাকার দরুণ, তাঁকে বেশ সুঠাম এবং বলিষ্ঠ দেখতে হয়েছিল। যে-ই দেখত, সে-ই আদর করত। সেই সরল কৃষি-জীবনের মধ্যে, রোদে আর বাতাসে ছেলে-বেলা থেকেই তাঁর হাড় পাথর বইবার মত শক্ত হয়ে ওঠে।

যখন তাঁর ছ'বছর বয়স হল—তখন তাঁর পালক-পিতা রিচার্ড প্রাইস্ ঠিক করলেন যে, ষ্টানলীকে স্কুলে দিতে

হবে। সেণ্ট আসাফ্ বলে কিছু দূরে এক নগরে একটা ভাল বোর্ডিং-স্কুল ছিল। ঠিক হল, ষ্টানলীকে সেই বোর্ডিং-এ রাখা হবে। রিচার্ড প্রাইস্ নিজে কাঁধে করে, বালককে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। পাছে পথে ছেলের কষ্ট হয় বলে, সঙ্গে একজন চাকরাণীও নিয়েছিলেন। তখন কে জানত, একদিন এই ছেলেকেই চলতে হবে মৃত্যুর রাজ্যের ভেতর দিয়ে, একা, সম্পূর্ণ নিঃসম্বলভাবে।

এই বোর্ডিং-এ ষ্টানলী দশ বছর ছিলেন। দশ বছর পরে যখন তিনি বোর্ডিং থেকে বেরুলেন, তখন তাঁর বয়স ষোল। কিন্তু তখন তিনি অভিভাবকহীন। সংসারে একা। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর জন্মদাতা পিতা দু'বছর বয়সের সময়ই তাঁকে ছেড়ে চিরকালের মত চলে যান—তাঁর মা পালিকা-জননীর হাতে তাঁকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তাই বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে তিনি যখন দেখলেন যে, সংসারে তিনি সম্পূর্ণ একা, তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না। তিনি ঠিক করলেন, তাঁর পথ তিনি খুঁজে বার করবেনই।

আফ্রিকার মরু-পথের দিশা তখনও ছিল বহুদূরে।

তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই-এর এক স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ছেলে পড়িয়ে তিনি নিজের পড়াশোনা চালাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ভাইটির মেজাজ ছিল ভারী রুক্ষ এবং লোকটা ছিল বিশেষ হিংসুটে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ষ্টানলীর সঙ্গে লোকটার অ-বনিবনাও সুরু হল—লোকটা ক্রমশঃ ষ্টানলীর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতে লাগল। তখন বিরক্ত হয়ে ষ্টানলী সোজা সেই স্কুল ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালেন—

জগতের রাজপথ—নানা ভাবে, নানা দিকে চলে গিয়েছে—তার মাঝে খুঁজে নিতে হবে, কোন্ পথে আছে জীবনের ঈপ্সিত ধন! কেউ নেই পথের সন্ধান বলে দেবার, পথে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবার! একা খুঁজে নিতে হবে পথ—নিজের হাতে জ্বালিয়ে নিতে হবে নিজের পথ-চলার বাতি।

যুবক তাই ঠিক করলেন। ঠিক করলেন, তিনি খুঁজে নেবেন তাঁর পথ।

গৃহ নেই, যে দু'দিন আশ্রয় নেবেন—বন্ধু নেই যে, দু'দিন আশ্রয় দেবে। আছে শুধু সোজা, এঁকা-বেঁকা নানা পথ পকেটে আছে মাত্র গুটিকতক পেনী। সেই সম্বল নিয়ে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন সেই সুরু হল পর্য্যটকের জীবনের প্রথম পথ-চলা।

তখন লোকের মুখে মুখে, আকাশে, বাতাসে এই কথা ঘুরে বেড়াত যে, আমেরিকার পথে ঘাটে না কি ছড়িয়ে আছে সোণা—কোন রকমে সেখানে একবার যেতে পারলেই না কি হয়! লিভারপুল থেকে না কি অনেক লোক সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে, সেখান থেকে থলে ভরে ভরে সোণা নিয়ে এসেছে। অতএব এখন উচিত, সোজা লিভারপুলে যাওয়া।

এই স্থির করে ষ্টানলী হাঁটা-পথ ধরে লিভারপুলের দিকে যাত্রা করলেন—কে জানে কতদূরে লিভারপুল? ষ্টানলী হাঁটতে সুরু করলেন। সেখানে কার কাছে যাবেন? কোথায় থাকবেন? এ দীর্ঘ পথের শেষে কি আছে কে জানে?

তবে এ কথা ঠিক, এ পথ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কেউ সন্ধ্যায় স্নেহ-হস্তে শয্যা পেতে বসে নেই—ঘরে



ওয়েল্‌সের এই কুটিরে ষ্টান্‌লী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এখনও ছেলে ফিরে আসে নি বলে কেউ উৎকণ্ঠিত আগ্রহে পথের দিকেও চেয়ে নেই!

লিভারপুলে এসে ষ্টানলী হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, বিশাল পাষাণ-পুরীর উদাসীনতা। এত বড় সহর এর আগে আর তিনি দেখেন নি—একশটা ডেনবিঘ্ এর পেটের ভেতর অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। সান-বাঁধান ফুট-পাথের ধার দিয়ে দিয়ে দীর্ঘ রাস্তা সব দিকে দিকে চলে গিয়েছে—তার ধারে ধারে বিশাল সব বাড়ী—নিঃসহায় পথিকের জন্যে তার একটিরও দরজা খোলা নেই। চারিদিকে মানুষের ভিড় অবিরাম চলেছে আর চলেছে, যে নিঃসম্বল, যে অসহায় তাকে সযত্নে এড়িয়ে।

রাস্তার ভিড় ঠেলে ষ্টানলী বন্দরের ধারে এসে পড়লেন। বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, কোথাও মাল বোঝাই হচ্ছে, কোথাও মাল নামান হচ্ছে। ভিক্ষুকের মত ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে লাগলেন। ঐ সব জাহাজে তাঁর একটুখানি জায়গা হয় না? যে জাহাজ যাবে আমেরিকায়, তাতে কোথাও কি একটু একজন লোকের দাঁড়াবার মত জায়গা হয় না?

কিন্তু ক্ষিদের তাড়ায় আবার সহরের ভেতরে ঢুকলেন। দু'তিন পেনী খরচ করে কিছু খাবার জোগাড় করলেন। ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হয়ে এল। পথ-ঘাট ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে আসতে লাগল। গৃহহীন পথিক কোথায় যাবে?

একটা গলির ভেতর ঢুকে একটা পড়ো-বাড়ীর পাশে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়লেন। সেইখানেই ঘুমিয়ে রাত শেষ হয়ে গেল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আবার তিনি ডকের দিকে চললেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, নিউ অর্লিন্‌স্ অভিমুখে এক জাহাজ ছাড়ব ছাড়ব করছে। দেখেন, জাহাজের নীচের ডেকে গাদাগাদি করে একদল লোক চলেছে—খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন তারা সব হতাশ হয়ে কাজের সন্ধানে ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমেরিকা চলেছে। তাদের সম্বল একটা করে কাপড়ের পুঁটলী—লাঠির মাথায় পিঠের কাছে ঝোলান! সেই তাদের সম্বল! ষ্টানলীর তা-ও নেই। তারা ত তবু পয়সা জোগাড় করে টিকিট কেটে জাহাজে চড়েছে! সেই জাহাজে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ষ্টানলীর মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু যাবেন কি করে? তাঁর ত আর টিকিটের পয়সা নেই।

হঠাৎ তাঁর মাথায় এক খেয়াল এল। সেই জাহাজের কয়েকজন নাবিক সেইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ষ্টানলী তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ভাই ঐ জাহাজে আমাকে একটা কাজ দিতে পার?

ষ্টানলীর কথার মধ্যে হয়ত তখন এমন একটা আবেদন ফুটে উঠেছিল, অথবা তাঁর সেই অসহায় অবস্থা সারা দেহে এমন ভাবে ফুটে উঠেছিল যে, নাবিকেরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলে না। কিন্তু তারা ত আর চাকরী দিতে পারে না। বললে—চল, আমাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কাছে।

ষ্টানলী নাবিকের সঙ্গে জাহাজে উঠলেন। তাঁর কথা-বার্ত্তা শুনে ক্যাপ্টেনের ভাল লেগে গেল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিনা পয়সায় আমেরিকা নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তোমাকে কেবিন-বয়ের কাজ করতে হবে।

ষ্টানলী ত হাতে চাঁদ পেলেন। ক্যাপ্টেন যে সত্যি সত্যি তাঁকে জাহাজে করে নিয়ে যাবে, প্রথমে তাঁর তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। যেদিন জাহাজ দুলে উঠল, লোক-জন তীর থেকে সরে গেল, ক্রমশঃ লিভারপুলের বাড়ীগুলো রেখায় পরিণত হতে চলল, ষ্টানলীর অন্তর আনন্দে দুলে উঠল - তা হলে সত্যই তিনি চলেছেন আমেরিকায়! পিছনে পড়ে রইল উত্তর ওয়েল্‌স্-এর নগণ্য সহর ডেনবিঘ্!

অনির্দ্দেশ লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চল্‌ল ভাগ্যের তরণী!

[২]

নিউ অর্লিন্‌স্-এ এসে ষ্টানলী জাহাজ থেকে আমেরিকার মাটীতে নামলেন। সম্পূর্ণ অজানা জগৎ—অজানা সব লোকজন—তার মধ্যে এল সুদূর উত্তর-ওয়েল্‌সের পাড়াগাঁ থেকে এক সহায়-সম্বলহীন ছেলে! এমনি করে যারা ভাগ্যকে খোঁজে, ভাগ্য নিজেই তাদের খুঁজে নেয়।

বেশীদিন তাঁকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হল না। এক মার্চ্চেন্ট-আফিসে ছোট-খাট একটা কেরাণীর চাকরী গেল। যাঁর আফিস, তাঁর নাম হল ষ্টানলী। তাঁর

ছেলে-পুলে কেউ ছিল না। ওয়েল্সের সেই ছেলেটির কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহার দেখে ক্রমশঃ তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন যে, সেই অসহায় ছেলেটিকে তিনি দত্তক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন। এবং যথারীতি তিনি তাঁকে দত্তক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। সেইখান থেকে তাঁর পুরানো নাম রোলাণ্ডস্ বদলে নতুন নাম গ্রহণ করলেন হেনরী মর্টন ষ্টানলী। অসহায় পথের বালক থেকে সহসা একজন ধনী বণিকের উত্তরাধিকারী!

কিন্তু এ ভাগ্যের ক্ষণিক ছলনা। হঠাৎ বড় ষ্টানলী মারা গেলেন—একেবারে হঠাৎ—তিনি উইলও করে যেতে পারলেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলে মিলে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল—ষ্টানলী যেমন পথ থেকে এসেছিলেন, তেমনি আবার তাঁকে পথে তারা বার করে দিল। মাঝখান থেকে শরৎকালের হঠাৎ এক ঝলক বৃষ্টির মতন, ভাগ্যদেবী অসহায় পথের ভিক্ষুককে জীবনের সুখ-ধারায় একটু ভিজিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আবার সেই পথ—আবার সেই ক্ষুধার্ত্ত দিনের শেষে শয্যাহীন রাত্রির বিভীষিকা! কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। তাঁর মনে ছিল এক প্রবল আত্মবিশ্বাস। অন্ধকার যত ঘন হ'ক না কেন, আলোর আশা যারা কিছুতেই ছাড়ে না, ষ্টানলী ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি জানতেন, যতক্ষণ পা চলে, ততক্ষণ পথও আছে। যারা চলে না, পথ তাদের পায়ের কাছেই শেষ হয়ে যায়; যারা চলতে পারে, তারা পথ তৈরী করে চলে।

সেই সময় আমেরিকায় ভয়ানক গৃহ-যুদ্ধ চলছিল। উত্তর অঞ্চলের যত রাজ্য, তারা হয়েছিল একদল—আর দক্ষিণ অঞ্চলের যত রাজ্য, তারা হয়েছিল আর একদল। ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে আমেরিকার এই বিরাট গৃহ-যুদ্ধ বাধে। উত্তরের দল বলে, ক্রীতদাস-প্রথা তুলে দিতে হবে, দক্ষিণের দল বলে তাদের ঘরের ব্যাপারে বাইরের কারুর হস্তক্ষেপ তারা স্বীকার করবে না, ক্রীতদাস-প্রথা তারা রাখবেই। এই নিয়ে বাধল তুমুল যুদ্ধ।

সুবিধে পেয়ে ষ্টানলী দক্ষিণ দলে সৈনিক হিসেবে যোগদান করলেন। সেই সময়কার অনেকের মত, ক্রীতদাসদের দেখতে দেখতে, তারাও যে জীবনের অন্য নানা আবর্জ্জনার মত একটা অঙ্গ, ষ্টানলী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া আর মনে হয়, ষ্টানলীর তখন সব চেয়ে দরকার ছিল একটা কাজের, একটা কিছু করার



আফ্রিকায় লিভিংষ্টোন ও ষ্টানলীর সাক্ষাৎ।

প্রথম সুবিধা যেখান থেকে এল, সেইটেই তিনি গ্রহণ করলেন। হয়ত তখন তাঁর কাছে জীবনের একমাত্র মানে ছিল, বৈচিত্র্য, অথবা ইংরেজীতে বললে যাকে বলা যেতে পারে, adventure.

জেনারেল জন্‌ষ্টোনের সৈন্যমণ্ডলীতে তিনি যোগদান করলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁকে বেশী দিন থাকতে হল না। পিট্‌সবার্গের যুদ্ধে জেনারেল জন্‌ষ্টোন হেরে গেলেন এবং তাঁর দলের অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে ষ্টানলীও বন্দী হলেন।

সার বেঁধে বন্দীদের পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা নদীর বাঁকের মুখে, সুবিধা বুঝে, ষ্টানলী দল ভেঙ্গে নদীতে মারলেন ঝাঁপ! দেখতে দেখতে রক্ষীদের হাতের বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। জলের ওপর চাবুকের মত

গুলি গিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু একটি গুলিও সেই দুর্দান্ত, দুঃসাহসী লোকটির গায়ে লাগল না। ডুব-সাঁতার কেটে কেটে ষ্টানলী একেবারে নদীর ওপারে গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে, পথে পথে কাজ করে, তিনি সমুদ্রের তীরে এসে পৌছুলেন।

সেখান থেকে আবার এক জাহাজে একটা কাজের যোগাড় করে নিয়ে তিনি ওয়েল্স্-এ ফিরে এলেন।

বাড়ী ফিরে এসে কয়েকদিন বেশ শান্তভাবেই কেটে গেল। লিভারপুলে একটা কেরাণীর চাকরীও জুটে গেল। কিন্তু যাযাবর হয়ে যে জন্মেছে, কেরাণীর একঘেয়ে চাকরীতে কি তার মন বসে ?

কিছুদিন কেরাণীর কাজ করতে করতেই, ষ্টানলীর মন হাঁফিয়ে উঠল।

সুদূর, বিপুল সুদূর, ব্যাকুল বাঁশী বাজিয়ে ঘর-ছাড়া যাযাবরদের ডাকে—বলে, ঘরের প্রদীপ তোদের জন্যে নয়, বজ্রে যে আলো জ্বলে, সেই তোদের আলো !

নিশির ডাকে যেমন করে মানুষ ঘুম ছেড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি এরা বেরিয়ে পড়ে অজানা অন্ধকারে, অনিশ্চিতের আহ্বানে !

কেরাণীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে ষ্টানলী আবার নিউ ইয়র্কে চলে এলেন। সেবার সুবিধা হয়েছিল, দক্ষিণ-দলের সৈন্যমণ্ডলীতে যোগদান করবার, এবার সুবিধা হল উত্তর-দলের যোগ দেওয়ার—তাই সই !

তিনি উত্তর-দলের নৌ-বাহিনীতে যোগদান করলেন। এক মাসের মধ্যেই তিনি ফ্লাগ-শীপ্* Ticonderoga-তে চলে এলেন এবং দেখতে দেখতে তিনি এ্যাড্মিরালের সেক্রেটারী হয়ে গেলেন।

তাঁর কর্ম্ম-তৎপরতা এবং দুঃসাহসিকতায় সকলে অবাক্ হয়ে যেত। একবার যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের একটা জাহাজ তারা ফেলে যায়। কিন্তু তখনও যুদ্ধ চলছিল। মাঝখানের নদীতে তখন বুলেটের বুদ্বুদ উঠছে। তারই মাঝখানে ষ্টানলী দড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেই পরিত্যক্ত জাহাজটার গায়ে সেই দড়ি বেঁধে আসবার জন্যে।

কাজ সেরে ফিরেও এলেন তিনি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নৌ-বিভাগের সম্মান-সূচক পদক তিনি পেলেন এবং যুক্ত-রাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের একজন অফিসর হলেন।

কিন্তু তারপর ? পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যাদের কাছে শান্ত, নিরুদ্বেগ, সুখের জীবন অসহ্য মনে হয়। তারা চায় অনবরত চলতে, সে-ই তাদের সুখ, সে-ই তাদের শান্তি !

ষ্টানলী নৌ-বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমেরিকার বিখ্যাত খবরের কাগজ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড'-এ যোগদান করলেন। প্রুফ দেখবার জন্যে নয়, চেয়ারে বসে বসে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখবার জন্যে নয়, তিনি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে যোগদান করলেন, তাদের সামরিক সংবাদ-দাতা হিসেবে ! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সংবাদ পাঠাতে হবে ! এর চেয়ে রোমাঞ্চকর জীবন আর কি হতে পারে ?

তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছিল। নেপিয়ারের অধীনে বৃটিশ-বাহিনীর সঙ্গে তিনি আবিসিনিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গেলেন। মাগডালা-বিজয়ের কাহিনী লণ্ডনের কাগজে যখন বেরুল, তার পুরো একদিন আগে সেই খবর নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে বেরোয়।

এইভাবে ষ্টানলীর বয়স হয়ে এল ত্রিশ। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের কোনও গতি নির্দ্দিষ্ট হয় নি। চোখের সামনে কোনও স্পষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল না। শুধু চলার বেগে তখন চলেছেন। কিন্তু নদী যেমন চায় সমুদ্রকে, তেমনি জীবন-ধারা চায় তার কোন স্থির লক্ষ্যকে। নইলে লক্ষ্যহীন হয়ে কত স্রোতের ধারা মরু-পথে হারিয়ে যায় !

ত্রিশ বছরের অশান্ত জীবনযাপন করার পর, এক পথ থেকে আর এক পথে ঘূর্ণীর মতন ঘুরে বেড়ানোর পর, ষ্টানলী একদা তাঁর পথের সন্ধান পেলেন—তাঁর আদর্শের, আদর্শ-পুরুষের সন্ধান পেলেন—কিন্তু তা-ও সহজে পেলেন না, পথ-রেখা-হীন, মানচিত্র-হীন অনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে সেই আদর্শ লুকিয়ে ছিল—তাঁর চেয়ে মহত্তর এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে।

* এগুলো হলো প্রধান যুদ্ধ-জাহাজ, কারণ এইগুলিতে দলের পতাকা থাকে।

ভাগাভাগি

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাধি কঠিন। কাল হইতেই কবিরাজ জবাব দিয়া গিয়াছে। পাড়া-প্রতিবেশী হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবরা যদুনাথের অদৃষ্ট লইয়া মাথা ঘামাইতেছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন চক্ষে যদুনাথ স্ত্রীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিল। এতকাল যাহাকে বুকে আগলিয়া সংসার-কণ্টকমরুর অধিকাংশ পথটাকেই অতিক্রম করিয়া আসিল, দুর্বার নিয়তির কঠিন হস্ত আজ তাহাকে হৃদয়ের আবরণ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে।

সেদিন অমাবস্যার দুর্যোগ-ঘন রাত্রি। ভোরের দিকটায় ঝঞ্ঝাবেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। গৃহকোণে রাতজাগা প্রদীপটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে অবশেষে নির্বাপিত-প্রায়। যদুনাথের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল।

অকস্মাৎ কে তাহার হাতখানা আপনার শীর্ণ মুঠির মধ্যে চাপিয়া লইয়া বলিল—"ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে; আর সহ্য হচ্ছে না যে! আমার দেখা ফুরিয়ে এসেছে, কর, আশীর্বাদ কর;—বল আর জন্মে আবার তোমায় পাব!"

যদুনাথ শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চক্ষুর সমস্তটাই যেন অতি অকস্মাৎ ঝাপসা হইয়া আসিল। মানসিক দৌর্বল্য চাপিয়া রাখিয়া আপনাকে শক্ত করিয়া লইল। ডাকিল—

"মহামায়া!"

পার্শ্বে ঘুমন্ত একটি অবোধ শিশু পাশ ফিরিয়া শুইয়া সবলে মহামায়াকে আঁকড়িয়া ধরিয়া পরমুহূর্তেই নিশ্চল হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। যদুনাথ রুদ্ধকণ্ঠে আবার ডাকিল, "মহামায়া!"

মহামায়া ততক্ষণ অবাক্ দৃষ্টিতে যদুনাথের চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া আছে। ভাবাহীন, বিহ্বল, অবাক্;—কেবল বোবা চক্ষু দুটির প্রান্ত দিয়া অবিশ্রাম জল গড়াইয়া পড়িতেছে, উপাধান সিক্ত হইয়া গিয়াছে। যদুনাথ অতি সযত্নে আপনার বাম বাহু দ্বারা কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পত্নীকে কোলের উপর উঠাইয়া লইল। অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া অশ্রু মোছাইয়া বলিল "শেষ রাত্তিরের অষুধটা মেড়ে দি?"—

মহামায়া একটু হাসিল। ম্লান, অপরিচ্ছন্ন, বিষাদ-কাতর।

ভোরের দিকে প্রায় সজ্ঞানেই মহামায়া যদুনাথের কোলে মাথা রাখিয়া পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করিল। প্রথম এয়োতির সিন্দুর-চিহ্নটুকু অব্যাহত রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ঘুমের সোপান-পথে সে চলিয়া গেল।

বাড়ীর পূর্বদিক্কার বহু প্রাচীন আম গাছটার মাথায় যখন নবারুণ-রেখা সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় প্রতি-বেশীরাও ধীরে ধীরে আসিয়া জুটিল। নারী, পুরুষ, শিশু, যাহারা মহামায়াকে চিনিত, কেহই বাকী রহিল না।

প্রথম শোকের সুতীব্র অনুভূতিটা কাটাইয়া উঠিয়া যদু-নাথ শব-সৎকারের আয়োজন-অনুষ্ঠানে ব্রতী হইল। গ্রামের লোকজন ততক্ষণ মহাকলরব সুরু করিয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছে, "আহা! সতীলক্ষ্মী, স্বামীর কোলে মাথা রেখে, ঠাকুরের নাম জপতে জপতে চলে গেছে, এর জন্য দুঃখু কিসের? এমন মহামৃত্যু কজনের হয়?"—

ও পাড়ার মোক্ষদা পিসী মালা জপিতে জপিতে আসিয়া-ছেন। বিরাট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—

"সবই ত হ'ল ভালো, কিন্তু—"

আর একজন বলিল, "কিন্তু কি গো!"

পিসী অপরার কানের অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া বলিলে—"পুরো অমাবস্যাটা পেয়েছে!—"

মনে হইল যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, সে কথাটা ঠিক মত বুঝিতে পারিল না। পিসী সরাসরি যদুনাথের কাছে গিয়া বলিলেন—"বুঝলে বাবা, যদু! শ্রাদ্ধের সময় একটা প্রায়-

শ্চিন্তিও ঐ সঙ্গে ক'রে ফেলো। বুঝলে না?—সাত পুরুষের ভিটে! শেষে কি মাগী আনাচে কানাচে ঘুরবে?—"

যদুনাথ হাঁ বা না কোন কথাই বলিল না। কেবল হাঁ করিয়া পিসীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সৎকারের সমস্ত অনুষ্ঠান যখন প্রস্তুত,যদুনাথ ঘরে ঢুকিল, গৃহ শূন্য। প্রতিবেশীরা শব বাহির করিয়া ঠাকুর-ঘরের প্রান্তে তুলসীমঞ্চের নীচে নামাইয়া রাখিয়াছে। যদুনাথের সমস্ত চিত্ততল মথিত করিয়া একটা বিরাট ক্রন্দনের জলোচ্ছ্বাস যেন তাহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুঃখ-সমুদ্রের কোন্ অন্ধকার অতলে তলাইয়া লইয়া গেল। সংসারে আর কেহই নাই। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে ভগবান তাহাকে নিঃস্বতার বেশী আর কিছুই দান করেন নাই। সে নিঃসন্তান। সমগ্র পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র একটি নাবালক ভাই। দশ বৎসর বয়স হইতে চলিল, তথাপি মহামায়ার বুকের একান্ত সন্নিকটে ঘেঁসিয়া না শুইলে তাহার ঘুম আসে না; দিনের মধ্যে পঁচিশ বার মহামায়ার সাথে কোঁদল করে, লক্ষবার অভিমান করিয়া চলিয়া যায়, মহামায়া পিছু পিছু "বাবা" "বাছা" বলিয়া তাড়া করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া খাওয়ায়। নিতান্ত দুরন্ত।—

পিতা-মাতা কেবল মাত্র ছ'মাসের রাখিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি মহামায়া আত্মসন্তানেরও অধিক স্নেহে, মাতৃহৃদয়ের অপরিপূর্ণ বভুক্ষায়, অপরিসীম মমতায় তাহাকে আপনার বক্ষনীড়ের স্নেহ-আবেষ্টনে আগলিয়া রাখিয়া মানুষ করিয়াছে;—তিলে তিলে, দিনে দিনে, এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছে। মধু তাহাকেই মা বলিয়া ডাকিত।

যদুর ও তাহার স্ত্রীর এই পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদ্র মানব-শিশুটির প্রতি অফুরন্ত মমতার কথা সমস্ত গ্রামের আলোচনার বিষয় ছিল। ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ দেখাইতে গেলে লোকে অসঙ্কোচেই যদুনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বসিত।

যদুনাথ গৃহাভ্যন্তরে মধুকে খুঁজিতেছিল। কোথাও না পাইয়া দুই একবার জোরে জোরে ডাকিল—"মধু!" "মধু!"

কিন্তু সাড়া আসিল না। ও পাড়ার কুঞ্জলাল যদুনাথের সমসাময়িক। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল—"ছোঁড়াটাকে খুঁজছ?—কেন?" যদুনাথ বলিল—"কোথায়, দেখেছ?"

—"বৌঠানের আঁচল-তলায় ত' ছিল ঘুমিয়ে; মড়া বের করবার সময় টেনে হিঁচড়ে ছুটিয়ে নি। চোখে ঝাপটা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিনু;—উঠে ব'সে অবাক্ হ'য়ে রইল কিছুকাল, তার পর এদিক পানে গেছে—"

বলিয়া হস্তসঙ্কেতে রান্নাঘরের পানে দেখাইয়া দিল।

যদুনাথ উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন রান্নাঘরের দরজার ঝাঁপের বাঁশটা ধরিয়া বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া মধু দাঁড়াইয়া আছে, ওখান হইতে তুলসীতলাটা সম্পূর্ণ দেখা যায়;—পরিধানের বস্ত্রখানা প্রতিবেশীরা খুলিয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ দিগম্বর। দুই চক্ষু লাল, কিন্তু এক বিন্দু অশ্রু নাই। মূকের মত অবাক্ বিস্ময়ে কাপড় ঢাকা দেওয়া শবদেহটার পানে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি রহস্য-গভীর, অব্যক্ত আশঙ্কায় শঙ্কাতুর। অন্য দিন এত বেলায় তাহার একাধিক বার আহার হইয়া যায়, আজ মুখ-খানা শুষ্ক। বাসি মুখে জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। সমস্ত বাড়ীটার চেহারাই যেন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে।

যদুনাথের অশ্রুজল বাধা মানিল না। বালকের মত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিতান্ত বলে বক্ষের অতি সন্নিকটে চাপিয়া ধরিলেন। যাহার সান্নিধ্য হইতে সে চিরকালের মত বঞ্চিত হইয়াছে, আজ ইহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া তাহার শীতল স্পর্শই সে উপলব্ধি করিতে চায়। যদুনাথের নয়নজলে মধুকেও ভাসাইয়া দিল। দাদুর কাঁধে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কী যে তার ক্রন্দন! মৃত্যুর পরপারে যদি জীবন থাকে, তবে মহামায়া নিশ্চয়ই সে ক্রন্দন শুনিতে পাইল। যদুনাথ বক্ষবেষ্টনে ঢাকিয়া মধুকে লইয়া ঘরে আসিলেন।

ওদিকে ততক্ষণ সমস্ত আকাশটাকে আচ্ছন্ন করিয়া মহামায়ার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইতেছে। আগুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া রুদ্র বীভৎস ধ্বনি জাগিতেছে—

—"বল হরি। হরিবোল—"

তিন

সময় বসিয়া থাকে না। যদুনাথের স্ত্রী-বিয়োগের পর বহু দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। যে অশ্রু উথলিয়া উথলিয়া

উঠিত আজ তাহা পাষাণ-চাপা নির্ঝরের মত হৃদয়ের অতি অন্তঃস্থলে তলাইয়া গিয়াছে। কখনও কখনও কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তের ছিদ্র পথে চুয়াইয়া পড়ে, দেহ মন সিক্ত করিয়া দেয়, আবার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথের অন্তলে বিলীন হইয়া যায়। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস জাগে, হৃদয় কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া আবার মিলাইয়া যায়।

তবে নদীর ভাঙ্গন যেমন তিল তিল করিয়া একদিককার পাড়টাকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলে, এবং সেই তটের যত কিছু সঞ্চয়, অন্তর আবর্ত্তের অতল পথে বহিয়া বহিয়া অপর প্রান্তে আনিয়া সঞ্চয় করে, তেমনি করিয়াই এই দৈববিপর্য্যয়ের ভাঙ্গন যদুনাথের সমগ্র সত্তাটাকে চূর্ণ করিয়া গ্রাস করিতে করিতে অতি সঙ্গোপনে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহাকে সংসার সীমার কূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সংসারের অপর প্রান্তে আনিয়া নিক্ষেপ করিল। একদিন যে সংসার ছিল তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আজ সেই আসক্তি তাহার কাছে শৃঙ্খলের মত কঠিন হইয়া উঠিল। দীর্ঘ দশ বৎসরের চাপা আগুনে তাহার হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে পোড়াইয়া ফেলিয়াছে; যাহা আছে তাহা কেবল ভস্মরাশি মাত্র।

সেই ভস্মের বিভূতি সমস্ত দেহে মাখিয়াই সে দিনে দিনে ঐহিকের পথ হইতে পারত্রিকের, ভোগ হইতে বৈরাগ্যের প্রাঙ্গণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সাত পুরুষের ঠাকুর। কাষ্ঠ-সিংহাসনের উপর দশচক্র শালগ্রাম। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাহাদেরই কুলপুরুষদের হস্তে পূজিত, মহামায়ার বহু পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের দ্বারা সেবিত; আজ সেই ক্ষুদ্র ঠাকুরঘরখানিই হইয়াছে যদুনাথের একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যদুনাথ কুলুপ আঁটিয়া সেই ঘরখানার মধ্যে বসিয়া থাকে; মহামায়া যে পূজাপাত্রগুলি নিষ্ঠাভরে ঘসিয়া মাজিয়া দিত, যে ধূপদানে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইয়া দিত, যে আসনখানা দেবতার সিংহাসনের সম্মুখে আপন হাতে পাতিয়া দিত, অতি প্রত্যুষে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া, ভূমি হইতে দূর্ব্বা চয়ন করিয়া যে পুষ্পপাত্রটিতে সাজাইয়া রাখিত, পেলব হস্তে যে পাথর পাটায় চন্দন ঘসিয়া ঠাকুরের জন্য গুছাইয়া রাখিত, যে পিতলের রেকাবীতে করিয়া পরম নিষ্ঠায় তণ্ডুল, কদলী, চিনির ভোগ সাজাইয়া রাখিত, যদুনাথ সেই সব কিছুই ভোলে নাই। সেও ঠিক সেই রকম করিয়াই সমস্ত কিছু করে, সেই বাসনপত্রগুলি নিজের হাতেই ধোয়, মোছে, পরিষ্কার করে, আবার পূজান্তে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখে। সেখানকার সমস্ত কিছুতেই মহামায়ার হাতের স্পর্শ মাখান। তাহার স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

সমস্ত হারাইয়া মানুষ যেমন কেবল মাত্র চিন্তা লইয়া বসে, যদুনাথও তেমনই করিয়া সচল মহামায়াকে হারাইয়া আজ তাহার এই অচল স্মৃতিগুলি লইয়া একমুখী হইয়া বসিল। পূজা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যায়, দেবতার সিংহাসনমূলে মাথা কুটিতে কুটিতে কাঁদে, মন্ত্র পড়িতে পড়িতে চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে, নয়নজলে গণ্ড ভাসিয়া যায়, বক্ষ ভাসিয়া যায়, আসন অভিষিক্ত হইয়া ওঠে। সমস্ত শরীর তড়িতাহতের মত কাঁপিতে থাকে, দৃষ্টি, মর্ত্ত্যলোকের সীমা পার হইয়া সকল জিজ্ঞাসার অতীত কোন এক অপরূপ অপরিচিত, মুক্ত লোকের প্রান্তে গিয়া ঠেকে;—যদুনাথ অচৈতন্য হইয়া যায়।

ভাত রাঁধিয়া, ভাত বাড়িয়া, ব্যঞ্জন সাজাইয়া, আসন পাতিয়া মধু ঠাকুরঘরে আসিয়া ঢোকে, দাদাকে বুকে আগলিয়া টানিয়া ওঠায়। কাছে বসিয়া খাওয়ায়, বিছানা পাতিয়া দিয়া ঘুম পাড়ায়। সংসারের এক প্রান্তে মধু অপর প্রান্তে যদু। মধু সংসার দেখে, যদুনাথ সংসারের কিছুই দেখিতে চাহে না, শুনিতে চাহে না। কেবল মাত্র ঠাকুর ঘরখানি জুড়িয়াই তাহার সংসার। দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত পোহাইলেই আবার দিন। ইহার বেশী সে কিছুই জানে না।

চার

এমনি করিয়াই যখন দুই ভ্রাতার জীবন-রথ সংসারাশ্রমের উপর দিয়া শ্লথ শৈথিল্যে গড়াইয়া চলিতেছিল, একদিন পরম শুভানুধ্যায়ী হলধর রায় আসিয়া দেখা দিল। এমন করিয়া ক'দিনই বা চলে! চলিলেও চালান ঠিক নয়, এই তাহার যুক্তি।

যদুনাথ সমস্তই শুনিল এবং রায় দিল, "তোমরা যা ভাল বোঝ কর। মধুকে সে বুকে টেনে মানুষ করেছে হলধর। জান ত' কত দুঃখে মানুষ! দুবেলা পেট ভরে

দুমুঠো ভাত পর্য্যন্ত পাই নি। চালে খড় ছিল না, বাস্তুভিটেটি পর্য্যন্ত ছিল বাঁধা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আজ তোমাদের আশীর্ব্বাদে দুটো আনি খাই। 'সবই ত জান। কিন্তু ও ছোঁড়াকে কখনও, কোন সময়ের জন্য সেই অভাবের এক তিলও বুঝতে দেয় নি সে।"

হলধর বিজ্ঞের মত সায় দিল। যদুনাথ বলিয়া চলিল—"আজ ত সবই ফুরিয়ে গেছে হলধর। সংসার মঞ্চের ঘৃতের দীপ আমার নিভে গেছে"—দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আবার বলিল—"ওঁর বড় ইচ্ছে ছিল, মধুর বৌ আনবে, বৌকে দেখবে, শুনবে, নাড়বে, চাড়বে, মনের মত ক'রে গ'ড়ে পিটে নেবে। সারা জীবন যে কষ্ট সে সয়েছে, তা কি মানুষে সইতে পারে হলধর?—ইচ্ছে ছিল মধুর বৌএর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সে হাঁফ ছাড়বে।"

একটু দম লইয়া বলিল—"এখন আছি কেবল আমি, তা, আমারও দিন ক'টি গোনা।

হলধর রায় বাধা দিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ ও কি কথা? ও কথা ব'লো না যদু।"

যদুনাথ বালকের মত অভিভূত হইয়া বলিল—"আর বাঁচব কি জন্য হলধর?—কেবল ব'য়ে বেড়াবার জন্য?"

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল যদুনাথ। করুণ কণ্ঠে কহিল "আর অবশেষ কি কিছু রেখেছে ভাই?—যে টুকু ছিল সবই ত সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।"

হলধর বাধা দিয়া বলিল—"তবুও ত একটা কর্ত্তব্য আছে! মধু বড় হয়েছে সংসার ধর্ম্ম করুক, যে চলে গেছে সে ত আর ফিরে আসবে না। তার অপূর্ণ আশা তোমার হাতেই পূর্ণতা পাক্, এই আমাদের ইচ্ছে।"

মধু এতক্ষণ কাছেও আসে নাই। হলধর মধুকে ডাক দিয়া কহিল—"কই হে ছোকরা! তামাকের ডিবেটা কোথা? হুঁকো কল্কের পাট ত যদু ছেড়েই দিয়েছে।"

মধু তামাক সাজিয়া দিয়া চলিয়া গেল। হলধর তামাক খাইতে খাইতে যাহা বলিল তাহার পরিষ্কার অর্থ এই যে, মধু দিবা জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে। চেহারাও মন্দ নয় এবং এই বয়সে একটা কিছু না হইলে পরে আর সুবিধা হইয়া উঠিতে চায় না ইত্যাদি এবং বলিতে বলিতে পিতৃপিতামহের আমলে উদ্বাহ কার্য্যটা কিরূপ অল্প বয়সে সুসম্পন্ন হইত তাহার দৃষ্টান্ত নিজের এবং যদুনাথের দ্বারাই দেখাইয়া দিল। পরিশেষে বলিল—"ঘরে মেয়ে মানুষ না থাকলে সে ঘরের না হয় ছিরি, না থাকে চেহারা।"

যদুনাথ সমস্তই শুনিতেছিল। বাহিরের রৌদ্রলিপ্ত উঠানের উপর ধান শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের যত পাখী সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে। মধু তাহাদের তাড়াইবার ভান করিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাহাদের কথাগুলি শুনিতেছে। যদুনাথ সানন্দে বলিল "আমার ত পরম আনন্দ হলধর। এর চেয়ে অধিক সুখ আর আমার কিছুই নেই।"

এবার হলধর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তবে আর বিলম্ব ক'রো না ভাই! মেয়ে আমার হাতেই আছে। লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ মা কমলা, এই তোমায় ব'লে রাখলুম যদুনাথ। তবে কিনা, বড্ড গরীব। আজ খায় ত' কালকের সংস্থান নেই। এমনি পাকে-চক্রের অবস্থা।" হুঁকায় একটা টান মারিয়া বলিল—"দুখানা মাত্র ভুঁই, তাইতেই বহু কষ্টে চলে।" সুর নীচু করিয়া বলিল—"এক কালে যাই থাকুক, আজ আর ভগবান তোমার অভাব রাখেন নি যদু। তোমার ঘরে যদি একটি অনাথার স্থান হয়, তবে তা তুমি অবশ্যই কর্ব্বে—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

যদুনাথের চক্ষে জল আসিয়া পড়িতেছিল। দারিদ্র্যের যে কী জ্বালা তাহা সে জানে।

হলধর বলিয়া চলিল—"গত বছর মেয়েটির হয় ব্যামো। বদ্যির পয়সা নেই। জয়কান্ত কোব্রেজের দুচারটে বড়ি চেয়ে চিন্তে খেয়ে মেয়েটা শেষ পর্য্যন্ত মরণের দোরে এসে দাঁড়াল। মার তার কী কান্না! সে কান্না শুনলে পাষাণ গলে যায় যদুনাথ।"—বক্ষে হাত দিয়া বলিল—"তার পর, আমি—এই আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দি' এবং ধীরে ধীরে ওকে বাঁচিয়ে তুলি। অবিশ্যি খরচ পত্তরও যে কিছু না হয়েছে তা নয়। তা, সে যাক্; কেন কল্লুম জান? মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। আহা!—"

বলিয়া হলধর একরাশ ধোঁয়া টানিয়া লইল। কল্কেটা পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে।

যদুনাথ গদগদ কণ্ঠে বলিল "তা তোমরা দশজনে যা ভাল বুঝবে আমার তাতে আপত্তি কি! তবে দেখো যেন, মা

আমার ছোঁড়ার উপযুক্ত হয়। সংসারটাকে বইতে পারে।"

হলধর সহসা উচ্চ হাস্যে ঘরখানাকে কাঁপাইয়া দিয়া কহিল—"তোমার আবার একটা সংসার! দাদা, ভাই,—দুটি প্রাণী। সব ঠিক হয়ে যাবে যদুনাথ, দেখে নিও রায়ের কথা!"

ব্যাপারটা শুধু এই পর্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত রহিল না। একদিন নিয়মিত গোধূলি লগ্নে নন্দন গাঁয়ের কৈলাস চাটুয্যের কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর সহিত মধুর বিবাহ হইয়া গেল। যদুনাথ যথেষ্ট খরচ করিল। সৌদামিনী দস্তুর মত আট পাকে মধুকে বেড়িয়া ধরিল এবং মধুও শুভদৃষ্টির চকিত মুহূর্তে অকস্মাৎ সৌদামিনীর বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে তড়িতাহত না হইয়া পারিল না। নিমন্ত্রিতেরা মিষ্টান্ন খাইয়া চলিয়া গেল। ঢাক, ঢোল, নহবতের ঐক্যতান বাদনেও সমাগত কুল মহিলাদের শুভ মাঙ্গলিক ও হুলুধ্বনির মধ্যে যদুনাথ ভ্রাতৃবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিল

ফুলশয্যার গভীর রাত্রিতে সকলেই যখন উৎসবমগ্ন, একা যদুনাথ তখন বাটির প্রান্তাবস্থিত ঠাকুরঘরখানার দরজা নিঃশব্দে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খুলিয়া ফেলিল। দীপ জ্বালিল না। অন্ধকারে অভিভূতের মত সেই অচল বিগ্রহের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল। নয়নে তাহার অশ্রুর সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

পাঁচ

গৃহে বধূ আসিয়াছে। বহুদিন পরে বাড়ীটা আবার যেন হাসিতেছে। যদুনাথের আনন্দ ধরে না। আনন্দ অধিক হইলে কান্না আসিয়া পড়ে, সেই মুহূর্তেই অন্তরালে গিয়া চক্ষের জল মুছিয়া আসে।

মহামায়ার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই মধুর বউকে নিঃশেষে দান করিয়া আজ সে রিক্ত হইতে পারিয়াছে এই আনন্দে সে ভরপুর। নিজের যাহা কিছু ছিল সমস্তটা দিয়া সোনা কিনিয়া সে মধুর বউকে অলঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে যে জিনিষটি ভাল দেখে যদুনাথ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আনিয়া ভাদ্রবধূকে দেয়, যাহা সে খাইতে ভালবাসে বলিয়া শোনে তাহাই আনিয়া খাওয়ায়, যে কাপড় পরিতে ভালবাসে সেইরূপ বস্ত্র আনিবার জন্য বাটী হইতে দুই ক্রোশ দূরে মাধবপুরের হাটে এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়াও দৌড়াইয়া যায় মধুর জন্য নূতন করিয়া ঘর তুলিয়া দিয়াছে। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর কল্যাণে প্রতিদিন ঠাকুরকে তুলসী দেয়, পূজান্তে বহুক্ষণ ধরিয়া কঠিন মৃত্তিকাতলে পড়িয়া উঁহাদের কুশল প্রার্থনা করে। মধু খায়, দায়, সংসার চালায়। যদুনাথ মধুর বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে উঁহাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া জানে, সামান্য ত্রুটি হইলে ভাবিয়া সারা হয়। মধুকে পরোক্ষভাবে ডাকিয়া বলে, উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

বাহির হইতে অন্ধকার গৃহের ভিতর অকস্মাৎ প্রবেশ করিলে প্রথমে যেমন কিছুই চক্ষে পড়ে না, তারপর ক্রমশঃ সেই জটিল পুঞ্জীভূত অন্ধকারের অন্তস্থল হইতে সমস্ত পদার্থই নয়ন-সম্মুখে ক্রমে ক্রমে প্রতিভাত হইতে থাকে, যদুনাথের সংসারেও ঠিক তাহাই ঘটিল। নববধূ সমাগমের কিয়ৎকাল পরে প্রথমকার নিবিড় আনন্দ ও অপরিচয়ের অন্ধকার মোহ অপসারিত হইলে পর নবাগতার সমস্তটুকু ক্রমশঃ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইবার পথ পাইল। প্রথম মিলন সম্মোহনের মায়া-ছায়া-সমাচ্ছন্ন প্রহরগুলিতে এই ক্ষীণাঙ্গী বালিকা বধূটির যত কিছু ত্রুটি সংগুপ্ত থাকিয়া যাইত, আজ ক্রমপরিচয়ের প্রখরালোকে সেই অশোভন জিনিষগুলি অত্যন্ত তীব্র হইয়াই দেখা দিল।

যদুনাথ যাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভাল বাসিয়াছিল, সে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবারও অবকাশ পাইল না। ইহাই বোধ হয় পৃথিবীর নিয়ম। অথচ বহুদিন পরে ইহাকে পাইয়া যদুনাথের সমস্ত অন্তর মহামায়ার জীবিত কালের মতই সেবা বুভুক্ষিত হইয়া উঠিল। যে সেবা এতকাল কেবলমাত্র মধুর হস্তেই সীমাবদ্ধ ছিল, সে চাহিয়াছিল এই নববধূটি অত্যন্ত সুচারুরূপে সেবা ব্যবস্থার সেই পরিপূর্ণ পাত্রটি মধুর হস্ত হইতে টানিয়া লইয়া সর্বাঙ্গীনভাবে তাহার দিকে মহামায়ারই মত পরিপূর্ণ মমতায় ধরিয়া রাখিবে।

না চাহিতেই সমস্ত কিছুই সে পাইবে। যে সুখ মহামায়া ভোগ করিয়া যাইতে পারে নাই তাহাই সে দ্বিগুণ করিয়া ভোগ করিবে ইহার হাতে। তাই ইহাকে দেখিবামাত্রই যদুনাথের সমস্ত শ্রমশক্তি যেন নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ইঁহার হাতে নিজেকে একান্তভাবে ছাড়িয়া দিয়া নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া পারমার্থিক গতিপথে আপনাকে ভাসাইয়া দিবার প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই যদুনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিত, তাহার মুখ ধুইবার জল, গাড়ু, গামছাটিকে বোধ হয় দোরগোড়ায় প্রস্তুত দেখিতে পাইবে। স্নানকালে তৈলের বাটিটা বোধ হয় একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে; স্নানান্তে পূজাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই সে বোধ হয় সমস্ত পূজা-উপচারই অভাবনীয়ভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখিতে পাইবে। পূজার অবসান বেলায় মহামায়া যেমন দ্বার সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইত, কণ্ঠে অঞ্চল বেষ্টন করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত, তারপর যতক্ষণ তাঁহার পূজা শেষ না হয়, অভুক্ত অবস্থায় নিশ্চল হইয়া কল্যাণী প্রতিমার মত সেই দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, কথা কহিত না পাছে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া যায়,—তেমনি করিয়াই বুঝি কোন একটি ক্ষুদ্র বধূ লজ্জা-জড়িত চরণে, ধীরে ধীরে দেবগৃহের দ্বার-প্রান্তটিতে আসিয়া দাঁড়াইবে; পূজান্তে পাকশালার প্রান্তে থাকিয়া দ্বারান্তরাল হইতে মায়ের মত তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবে।

কী সে চায় তাহা সমস্তই সে জানিবে। মার কোলে একান্তভাবে ছাড়া পাইয়া সন্তানের যে সুখ এই অপূর্ব্ব আরামের কল্পনায়ও যদুনাথের দুই চক্ষু যেন ততোধিক আনন্দে বুজিয়া আসিতে চাহিত।

—কিন্তু তাহা হইল না। যে আশা যদুনাথের মনে মনে পুষ্পকোরকের মত ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, তাহা আর বিকশিত হইবার পথ পাইল না;—অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। যদুনাথ তাহার জন্য অশ্রুজল ফেলিল না। অধিক দুঃখে তাহাকে পাষাণ করিয়া ফেলিল।

মধু প্রথম প্রথম পত্নীর এই অনাচরণে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিত। পত্নীকে বুঝাইয়া বলিত, তিরস্কার করিত, ভয় দেখাইয়া স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিত, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত উৎপীড়ন করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু তাহার ফল হইল বিপরীত। বধূর ক্রন্দনে পাড়াপড়শীরা আসিয়া জড় হইল, মধুর অমানুষিকতায় নিঃসন্দেহে সকলে আস্থাবান হইল এবং যদুনাথের নিষ্ক্রিয়তায় তাহাকেও দোষারোপ না করিয়া পারিল না। পাশের বাড়ীর নিতাইয়ের মা স্পষ্টই বলিল—"থাকত' যদি বড় জা! এমনটি কি হ'তে পাত্তো? আজ কাল কি আর এ সব আছে গা?—ঘেন্না! ঘেন্না!"

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মধু আপনাকে সংযত করিল। তারপর ধীরে ধীরে মর্ম্মপীড়া সত্ত্বেও প্রতিবাদ করিতে ভুলিয়া গেল। পরিশেষে আরও অধিক গা সহা হইয়া গেলে মর্ম্ম-পীড়া বোধ করিতেও বিস্মৃত হইল! অবশেষে এমন দিন আসিল, যখন মধু বুঝিতে শিখিল যে যদুনাথ দাসী হিসাবে সৌদামিনীকে গৃহে আনিয়াছে, তাহাকে দিয়া পরিচর্য্যা করাইবে, ভাত রাঁধাইবে, কাপড় কাচাইবে প্রতিদানে দুই মুঠা খাইতে দিবে মাত্র এবং সামান্য ত্রুটি হইলেই মধুকে প্ররোচিত করিয়া শাসন করাইবে; এমন কি শারীরিক নির্য্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। সৌদামিনী দরিদ্র কন্যা হইলেও, মাতাপিতার অত্যধিক আদরে মানুষ, তাঁহাদের নয়নের মণি, সোহাগের দুলালী। তাহার গতরে এই বিরাট সংসারের সমস্ত দাসীজনোচিত খাটুনিগুলি খাটিবার মত সামর্থ্য একেবারে নাই। সে দেখিতেই স্বাস্থ্যবতী কিন্তু শরীরে পদার্থ নাই। যাহাও আছে এই কঠিন সংসারের গুরুচাপে তাহাই বা কয় দিন?

আরও বুঝিল বিষয় সম্পত্তির গর্ব্বে অন্ধ যদুনাথ তাহাকে যে দুই মুষ্টি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিবে, ভিক্ষুকের মত তাহাই তাহাকে কুড়াইয়া খাইতে হইবে, আজ লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিলে উভয়কে নিঃসন্দেহে গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সন্তানাদি হইলে ত' কথাই নাই। অতএব সময় থাকিতে—ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে এই কথা কৈলাস চাটুয্যের কানে উঠিল।

দুই দিন পরে সৌদামিনী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। যদুনাথ কিছুই জানিত না। শুনিতে পাইয়া খড়মজোড়া পায়ে টানিতে টানিতে ছুটিয়া বাহির হইল। বধূর পাল্কী তখন তখন বাটী ছাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী মাঠে নামিয়াছে। যদুনাথ স্বপ্নোত্থিতের মত ছুটিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—"থামাও! থামাও।"

নিকটে আসিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল—"বুড়োটা বুঝি বাজে! তাই মা আমায় একলা ফেলে চলে যাচ্ছে! আমায় একটু খবর কি দিতে নেই? মধুটাও কি ভুলে

গেছে! ক'দিন আর বাঁচব, নারায়ণের পায়ের তলায় পড়ে থাকি, তোরা যদি মা, খুঁজে না নিস্!—"

বলিতে বলিতে যদুনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। যেন রৌদ্রালোকের মধ্যে বৃষ্টি। পর মুহূর্ত্তেই অশ্রু মুছিয়া বলিল "ঠাকুর পেন্নাম ক'রে গেলিনে মা! বাপ পিতামো'র ভিটে, তাদের আশীষ কুড়িয়ে, তবেই না যেতে হয়। দিনক্ষণ ত' কিছুই দেখি নি।"

সঙ্গে ছিল একটি নাবালক ছোঁড়া, বধূ তাহাকে কি বলিল; ছেলেটি বলিল—"আপনার ভাই মশাই দিন দেখে দিয়েছেন।" যদুনাথ ভগ্নকণ্ঠে বলিল "তা বেশ। তা বেশ। তা' মাথাটা নীচু কর ত' মা! এই চরণামৃতটুকু মাথায় ঠেকিয়ে নাও। চৌদ্দপুরুষের ঠাকুর, বড় জাগ্রত। দাও ত' বাবা, নির্ম্মাল্যটুকু মায়ের আঁচলে বেঁধে!"

একটু থামিয়া সজল চক্ষে বলিল "ভুলে যাসনি মা, বুড়ো ছেলেকে ভুলিস নি। আশীর্ব্বাদ করি সন্তানের মা হও। জন্ম জন্ম সুখী হও! মধুকে চিঠি পত্তর লিখিস মা, ওটা যে পাগল"—বলিয়া কেমন যেন একটু হাসিয়া উঠিল। তাহা হাসি কি কান্না ঠিক বোঝা যায় না। প্রত্যুত্তরে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের নিম্ন হইতে বধূ কি বলিল ধরা কঠিন। ছেলেটি বাহকদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "চল।"

যতক্ষণ দেখা যায়, যদুনাথ সেই দূর পাল্কীখানার পানে চাহিয়া রহিল। গৃহের কথা ভুলিয়া গেল। আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেল, নিজের অস্তিত্বটাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। চক্ষে জলটুকু পর্য্যন্ত নেই। বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ জল-রেখা-হীন ধূ ধূ বালুচরের মত সে আঁখি রুক্ষ, পলকহীন।

ছয়

কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বেশী দিন লাগিল না যে ভ্রাতৃপ্রেমের উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদুনাথের প্রতিপক্ষ শুনিল যে, যদুনাথের রূঢ় ব্যবহারে মধুর মত অনুজেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে; বৃদ্ধ বয়সে যদুনাথ পাগল হইয়াছে, এমন লক্ষ্মণের মত কনিষ্ঠ সহোদরকেও গলাধাক্কা দিয়া খেদাইয়া দিতে তাহার প্রাণে বাজে নাই ইত্যাদি, আর মধুর প্রতিপক্ষেরা শুনিল যে, বৌ নামক যে কালনাগিনীটিকে যদুনাথ দুধ কলা দিয়া পুষিয়াছে তাহারই বিষে মধুর মত অনুগত ভাইও যদুনাথের পর হইয়া গেল। মধুটা মানুষ নহে, একটা আস্ত গাধা। অকস্মাৎ সমস্ত গ্রামের লোকে একদিন জানিল যে রামের বাড়ীর দুই ভাই ভিন্ন হইতেছে। যাহারা প্রথমে অবিশ্বাস করিল, পরিশেষে তাহারাও বুঝিল, কথাটা সত্য।

নীরব, নিশুতি রাত; অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে বাহিরে এক হাত দূরের জিনিস পর্য্যন্ত দেখা যায় না। প্রাঙ্গনের আমলকী গাছটার উপর হইতে একটা শ্মশান পেচক মূর্ত্তিমান অমঙ্গলের মত বসিয়া বসিয়া ডাকিতেছে। মধু সেই যে সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। বর্ত্তমানে যদুনাথ লক্ষ্য করিয়াছে, মধুকে পূর্ব্বের মত প্রতি পদক্ষেপে আর তাহার নিকটে দেখা যায় না। কখন আসে, কখন চলিয়া যায়, কি করে, কোথায় থাকে, সবই যেন যদুনাথের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িলে সঙ্কুচিতের মত সরিয়া যায়; ডাকিয়া কথা কহিলে প্রয়োজনটুকু সমাধা হইলে আর সে তিলমাত্র সেখানে দাঁড়ায় না। অথচ মধু কোন কালেই এমন ছিল না! বহু অনুসন্ধান করিয়াও যদুনাথ মনের মধ্যে ইহার যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মধুকে নানারকম জেরা করিয়াও সদুত্তর মিলে নাই।

আজিকার রাত্রে যদুনাথের একা একা কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। ঠাকুরকে শয্যা দিয়া সবে মাত্র ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। চতুর্দ্দিকে কেমন যেন একটা কুশ্রী খুট্ খাট্ শব্দ মনে হয় ঐ বুঝি মধু আসিল কিন্তু কেহই আসিল না, বাহিরে শিয়াদল চীৎকার করিতেছে।

পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া দেখা যায়, একটা কেরোসিনের ডিবা হাতে লইয়া বৈষ্ণবাড়ীর একটি বধূ পুকুরে আসিয়া নামিল! যদুনাথ কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল মধুর বৌএর কথা। আহা, ছেলে মানুষ, নিতান্ত বালিকা। আজ এখানে থাকিলে এই নিশুতি রাত্রে আহারান্তে বাসনের পাঁজা লইয়া এমনি করিয়াই হয়ত তাহাকে পুকুর ঘাটে নামিতে হইত। ঠিক এই সময় নামিলে ঐ বধূটির সঙ্গে হয়ত তাহার দুই চারিটি বাক্যব্যয়ও হইত। যদুনাথ আড়ালে থাকিয়া শুনিত। কতদিন এই বাটীতে লক্ষ্মীসমাগম নাই; আজ মহামায়া বাঁচিয়া থাকিলে উহারা দুইজন

রান্নাঘড়ে বসিয়া হাসিতামাসায় উহারা ভোজন করিত; তাঁহারা দুইভাই পরস্পরের শয়নগৃহ হইতে সেই আনন্দের ঐক্যতান উপভোগ করিতে পারিত। কিন্তু আর উহা হয় না। দুই তারের একটি তার আজ ছিন্ন। তবু এই সামান্য একতারাটিকেই কত যত্নে যদুনাথ জোর করিয়া বাঁধিয়াছে। আহা। বাঁচিয়া থাক্। তাহার ভাবনা কি? মধুর ঘরে সন্তান হইলেই তাহার নিঃসঙ্গ জীবনটা মুহূর্ত্তমধ্যে আনন্দ কোলাহলে ভরিয়া উঠিবার পথ পাইবে। নানা চিন্তায় যদুনাথ কাতর হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে উঠিয়া উঠানে আসিল। ঠিক এমন একটা কাল অন্ধকার রাত্রিতেই মহা-মায়া বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। মানুষ মরিয়া কি আর ফিরিয়া আসে না?—আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল তারা গুলি জ্বলিতেছে। বোধ হয় উৰ্দ্ধে, বহু উৰ্দ্ধে মহামায়া মিলাইয়া মিশাইয়া গিয়াছে।

—"কে—মধু?" যদুনাথ ডাকিল।

"না। রাজীব—" বলিয়া আগন্তুক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। —"রাজীব? এত রাত্তিরে!"—

—"এলুম। বিশেষ কথা আছে। আহার হয়েছে ত?

যদুনাথ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "না এখনও হয় নি। মধু এখনও ত ফেরে নি। কোথায় গেছে কোন খবর জান?"

রাজীব জাতে কৈবর্ত্ত্য। যদুনাথের বাল্যবন্ধু। ব্রাহ্মণ হইলেও যদুনাথ রাজীবের সঙ্গে বাল্যকালে একই পাঠশালে বিদ্যাচর্চ্চা করিত একসঙ্গে গলা ছাড়িয়া নামতা মুখস্ত করিত, একত্র গাছে উঠিয়া আম চুরি করিয়া নষ্টচন্দ্র সম্পন্ন করিত, রাজীবের পিতাকে যদুনাথ খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিত। পরবর্ত্তী জীবনে বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজীবকে বহুল পরিমাণে ছাড়াইয়া গেলেও বন্ধুত্ব তাহাদের অটুটই ছিল। সকাল সন্ধ্যায় রাজীব আসিয়া তামাক সাজিয়া যদুনাথকে খাওয়াইয়া নিজে প্রসাদ লইত। সংসারের নানা আলাপ আলোচনায় যোগ দিত, ঠাকুর ঘরের দরজায় বসিয়া গড় হইয়া চরনামৃত গ্রহণ করিত। দুঃখে, বিপদে, অভাবে, দৈন্যে পরস্পর পরস্পরকে বুক দিয়া আগলিয়া রাখিত।

ঘোলাটে হারিকেনটা অঙ্গনে নামাইয়া রাখিয়া রাজীব বলিল, "সেই কথাই ত বলতে এলাম। তুমি বুঝি কিছুই খবর রাখ না?

যদুনাথ আকাশ হইতে পড়িল—"কিসের খবর রাজীব?" আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। মধুর কোন বিপদ হয় নাই ত?

রাজীব হাত বাড়াইয়া যদুনাথের পদধূলি লইয়া মাথায় ঠেকাইতে ঠেকাইতে বলিল—"কলি! ঘোর কলি! জান দা'ঠাকুর? দুধ দিয়ে সাপ পোষা। ছমাসের পুঁটুলি, ঘসে মেজে বড় কল্লে, বিয়ে দিলে, অভাবের কিছু রাখলে না। আজ সে বলছে ভিন্ন হব। কি আশ্চর্য্য!"

যদুনাথ অবাক বিস্ময়ে কহিল—"কার?"

—"কার আবার! তোমার ভাই মধু ঠাকুরের কথা বলছি। তিনি গেছেন পাড়ায় সালিশ ডাকতে, কালকে বাটোয়ারা ক'রে নেবেন বিষয় আসয়, যা কিছু রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, খেয়ে না খেয়ে তুমি করেছ।"

পথ চলিতে চলিতে অকস্মাত অতি সন্নিকটে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন করিয়া সহসা চমকিয়া ওঠে, তেমনই করিয়া যদুনাথের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া একটা কঠিন শীত প্রবাহ যেন মেরুদণ্ডটাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। চক্ষের জ্যোতিঃ যেন অকস্মাৎ অবলুপ্ত হইয়া আসিল। নিষ্কম্প গলায় বলিল, "রাজীব! এও কি সত্যি! —মধু তাই কর্ব্বে? কেন? আমার জন্য ত আমি কিছুই রাখি নি। সবই ত' ওর। সমস্তই ত' ওদেরকে দিয়ে আমি খালাস। জীবনটাকে যেমন ব'য়ে বেড়াতে বেড়াতে একদিন মানুষ মৃত্যুর হাতে দিয়ে মুক্ত হয়, তুমি ত' জান রাজীব এই বিষয় আমি কেবল মধুর মুখ চেয়েই করেছি। ও যে আমার ছোট ভাই।"—

রাজীবের কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল। বলিল—"বউ ঠাকরুণ ছিলেন সতী লক্ষ্মী, এই অনাচার তাঁকে দেখতে হ'ল না।"

যদুনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এই কি সেই মধু?—সেই মাতৃস্তন্যবঞ্চিত অসহায় ক্ষুদ্র শিশু? একবার চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। মনে হইল—চতু-ষ্পার্শ্ব হইতে মহামায়া যেন এই সব শুনিতেছে। শুনিয়া শুনিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

সেই রাত্রে রাজীবের নিকট যদুনাথ সমস্তই শুনিতে পাইল। অধিক রাত্রিতে মধু গৃহে ফিরিল। যদুনাথের নিদ্রা নাই। প্রদীপ নিভাইয়া অন্ধকারে জড়ের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল। দিনান্তের পরিশ্রমে জীর্ণ, শত ভাবনায় বিক্ষুব্ধ, অনাহারে দুর্বল, মধু তাহাকে দেখিল না, ডাকিল না, কাছে আসিয়া কথা কহিল না!

সাত

পরদিন বেলা হইতেই মধুর শ্বশুর "এই যে বাবাজি" বলিয়া আসিয়া উদয় হইলেন। দুই দশ মিনিটের মধ্যেই গ্রামের বিশ পঁচিশ জন মাতব্বর আসিয়া জুটিল। নিকটবর্ত্তী আরও দুই একজন নরনারীও না আসিয়া পারিল না। কৈলাস চাটুয্যে পুরোবর্ত্তী হইয়া সকল ব্যবস্থায় তৎপর হইলেন।

যদুনাথের কুল পুরোহিত তর্কবাগীশ মহাশয় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা চাটুয্যে মশায়, মেয়েকে রেখে এলেন যে বড়? এ বাড়ীতে—"

মধুর শ্বশুর অভিব্যঞ্জনার সুরে বলিল "আগে বাড়ী হোক্ তবে ত আসবে! বাড়ী কোথায় ছাই, যে পা দেবে! যদুনাথকে দেখেই ত মেয়ে দিলুম ঠাকুর মশাই, কিন্তু এমন যে হবে—"

কথাটা শেষ করিতে দিল না পদ্মলোচন। সে রূক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তা হলে বিলি ব্যবস্থা সব হ'য়ে যাক। চাটুয্যে মশাই এ দিকে আসুন। এই ত বাসন পত্তর। আপনার মেয়ে জামাইয়ের যৌতুকগুলো আলাদা করে দিন দেখি।"

হরু লস্কর কেবলমাত্র মামলাবাজই নহে পরন্তু উচিতবক্তা বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। সে নিঃসঙ্কোচে বলিল—"তাইতো সাবাস ছেলে মধু! ন্যায্য যা, কেন বুঝে নেবে না, এ্যা!" বলিয়া আকাশকে যেন কি জিজ্ঞাসা করিল। পরক্ষণে বলিল "কিন্তু জমি জমা সংক্রান্ত বিলিব্যবস্থাগুলোও ত ভুললে চলবে না। ক'বিঘে ভুঁই তোমাদের মধু?"

মধু জবাব দিবার পূর্ব্বেই সমাগত জনতা হইতে নারীকণ্ঠে কে কহিল—"ওসব হচ্ছে পরে। আগে ঘর দোর, বালিস বিছানা, মাদুর সতরঞ্চ, হাঁড়ি কুঁড়ি, তেল নুন, মসলা পাতি, জামা কাপড়, ছাতি লাঠিগুলো ঠিক করে নিন্।—"

আর একজন বলিয়া উঠিল "মধুর বৌ ওপাশের ঘরখানায় থাকতেই ভালবাসে।"

"সে হচ্ছে, সে হচ্ছে," বলিয়া হরু লস্কর যদুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিলে মনে হয় দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ, গৃহ নীরব।

"কি দাদা, এখনও ঘুমোচ্ছ?—এ দিকে বাড়ীতে যে ছোট আদালত বসিয়েছি, দেখলে না?"—বলিয়া এক ঝলক হাসিয়া লইয়া হরু অগ্রসর হইয়া আবার ডাকিল—"যদু! ও যদুনাথ!"

কোনও উত্তর আসিল না। মধুর শ্বশুর আসিয়া দরজাটা ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল, ভিতরে কেহই নাই, কেবল শয্যার উপর বিছানাটা পড়িয়া আছে। দেখিলে মনে হয়, সমস্ত রাত্রি কেহ তাহাকে স্পর্শও করে নাই। তাহারই এক পাশে বহুদিনের একটা রূপা বাঁধানো হুঁকা কাৎ হইয়া আছে। খড়মজোড়া পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে। একে একে সকলেই আসিয়া জুটিল, সকলেই অবাক, হতবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যদুনাথ কোথায়?

মধু এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই জন সমারোহ উপভোগ করিতেছিল কিন্তু এবার আর থাকিতে পারিল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া এক ধাক্কায় ঠাকুর ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। কই? কেহ নাই। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল ঠাকুরের সিংহাসন শূন্য। শিলাবিগ্রহ নাই। আসনখানা তেমনই পাতা। সমস্ত সরঞ্জাম অবিকল পূর্ব্বেরই মত; যেখানের যেটি ঠিক সেখানেই আছে। মধু বাহির হইয়া আসিল। ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল "দাদু দাদু"! কণ্ঠস্বরে তার অশ্রুজলের ভাষা। কালী পোদ্দারের আঠার বৎসরের ভাই ষষ্ঠিচরণ অগ্রসর হইয়া আসিয়া মধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"জান' কোথায় গেছে মধুদা?" বলিয়া একটু হাসিল। স্বর লঘু করিয়া বলিল "নিশ্চয় গেছে সহরে মামলা রুজু কত্তে, না হয়ত কান কেটে—"

মধু প্রবল ধাক্কায় তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

অনেক খোঁজা খুঁজিতে কেহ যদুর সন্ধান পাইল না। তন্ন তন্ন করিয়া বাড়ীর আনাচে কানাচে মধু খুঁজিয়া দেখিল, কোথায়ও নাই। অভিভূতের মত মধু যদুনাথের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল। বালিসটা গড়াইয়া ফেলিতেই তাহার নিম্ন

হইতে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লেখা একখানা চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বোধ হয় যেন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল গলিয়া পড়িয়া অক্ষরগুলিকে মধ্যে মধ্যে মুছিয়া দিয়াছে। কম্পিত হস্তে মধু তাহা খুলিয়া ফেলিয়া এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া ফেলিল। তাহার পদতল হইতে মৃত্তিকাস্পর্শ যেন সরিয়া গেল। যদুনাথ লিখিয়া গিয়াছে,

কল্যাণীয় প্রিয় ভাই মধু,—

দাদা থাকিলে তোমার অসুবিধে হয় তাই আমি চলিলাম। আমি নিঃসন্তান; তা ছাড়াও আমি পূজারী, ঠাকুরের সেবক' আমার আবার সংসার কি? আমি ত সন্ন্যাসী। ভগবানই নিজের হাতে আমার বন্ধন কাটিয়াছেন। বাকি ছিলে তুমি, তুমিও আপন হাতেই কাটিলে। জীবনে তোমার চেয়ে প্রিয় আমার বা তোমার পরলোকগতা বৌ-ঠাকুরাণীর আর কেহ ছিল না। আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই আজ হইতে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তোমায় দান করিয়া গেলাম। সম্পত্তির মূল্যই কি সবটুকু? আমার সকল সম্পত্তির অধিক যে তুমি, তাহা জানাইবার উপায় কি? আজ যাত্রাকালে মনে হইতেছে কে যেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মত অলক্ষ্যে থাকিয়া থাকিয়া চলিতেছে। মনে হয় কাহারা যেন পশ্চাৎ হইতে টানিয়া আটকাইয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু সম্মুখে যাহার পথ ছাড়া আর কিছুই নাই, সে কি ফিরিয়া চাহিতে পারে?

শুনিলাম সংসারের সবই তুমি চাও। তোমাদের যা, তোমরা নিও একটি জিনিষ কেহ চাহে নাই অথবা তাহার ভাগাভাগি হয় না। সেইটি আমি নিলাম। সে হচ্ছে আমার মদনমোহন। আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের হাতের ছোঁয়া তাঁর গায়ে, চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রনাম তাঁহার পায়ে, তাই লইয়াই আমি চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি সন্তানের পিতা হও। আমি দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। বোধ হয় এই বাটীর আনাচে কানাচে বসিয়াই তোমার "মা" তাহাদের প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। উহাদের লইয়া সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, দেখিবে যেন ভাইয়ে ভাইয়ে তাহারা ভাগাভাগি না হইয়া যায়। সে যে কী কঠিন দুঃখ! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি আশীর্ব্বাদক—তোমার দাদু।

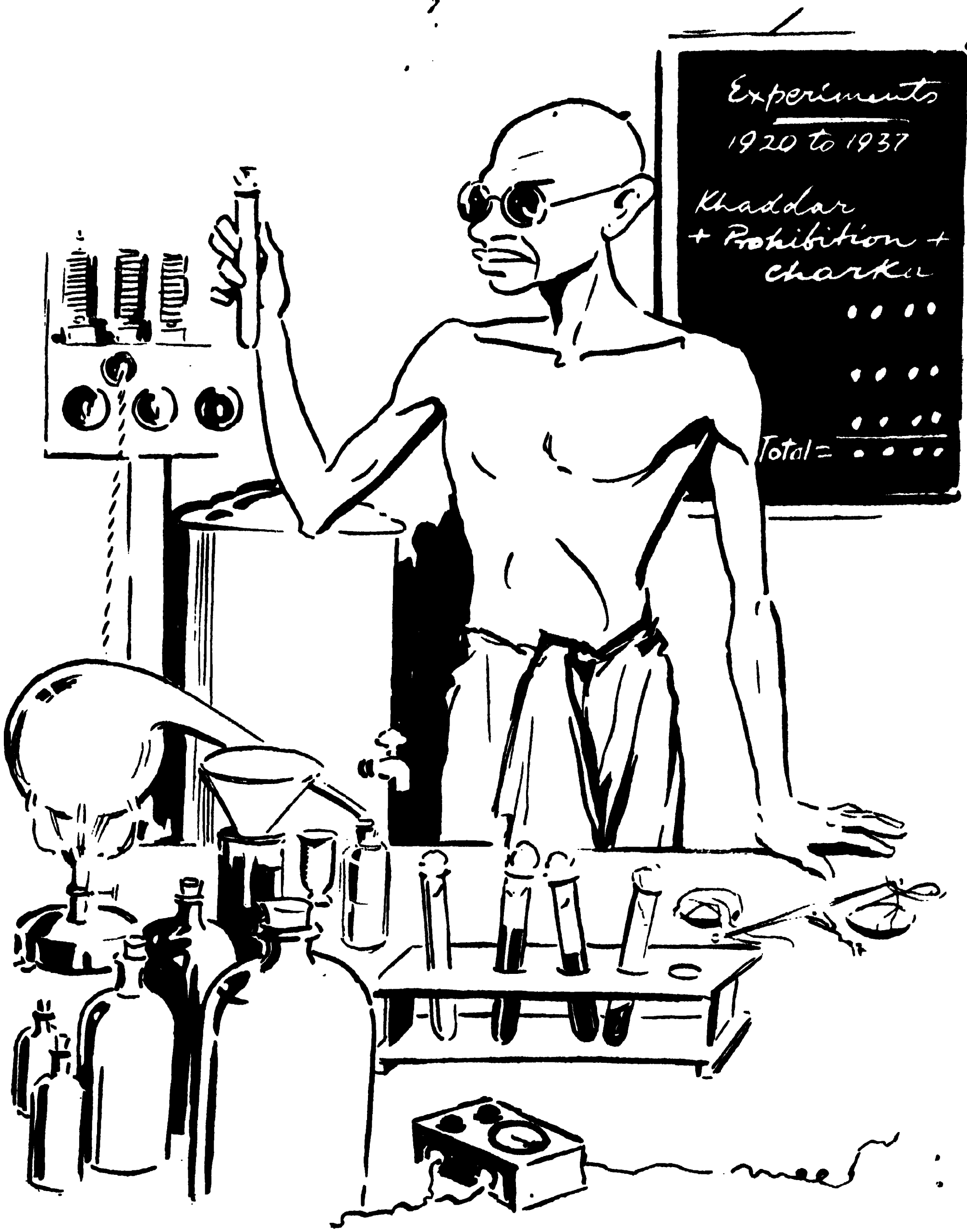
ততক্ষণ জনতার উল্লাস বহুল পরিমানে সংযত হইয়া আসিয়াছে। মধু যন্ত্রচালিতের মত বহিঃপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল বাড়ী হইতে বাহির হইবার যে পথটি দক্ষিণ দিকে নামিয়া গিয়াছে, তাহারি বামে, খালের ধারে যদুনাথের স্ত্রীর শ্মশানের উপরকার বেল গাছটার গোড়ায় পূজাশেষের কতকগুলি পুষ্পাঞ্জলি কে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, আর তাহারই শাখায় কাঁটায় বিঁধিয়া ঝুলিতেছে যদুনাথের পুরাতন শতচ্ছিদ্র নামাবলীখানি।

যতদূর দেখা যায় কোথায় যদুনাথের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

গবেষণার নির্দ্দেশ

...কি করিয়া মানুষের আর্থিক সমস্যা, শারীরিক স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং মানসিক শান্তির সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা যদি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখায় লিপিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য ঐ সম্বন্ধে আমাদের কোন গবেষণার (research) প্রয়োজন হইত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্য ভূ-ভাগের প্রত্যেক দেশটি ঐ আর্থিক সমস্যায়, ঐ শারীরিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় এবং মানসিক শান্তির সমস্যায় আলোড়িত হইতেছে এবং প্রত্যেক দেশেই আর্থিক অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ রুগ্ন লোকের সংখ্যা এবং অশান্তিতে জর্জ্জরিত লোকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখাতেই যে উপরোক্ত তিনটি তথ্যের কোন তথ্য সম্বন্ধে কোন প্রয়োগ-যোগ্য সুফল-প্রদ সন্ধান পাওয়া যায় না এবং এই দেশে উহার গবেষণার প্রয়োজন আছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।...

আর কত কাল...?



...এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির যে বৈঠক হইয়াছে, তাহার গঠনমূলক কর্ম্ম-পদ্ধতিতেও গান্ধীজী সেই মিলের কাপড় বয়কট, খদ্দর-প্রচার, মদ্যপান-নিবারণ ইত্যাদির অবতারণা করিয়াছেন... ।

আলোক-ভিক্ষা

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

আজো যারা শতাব্দীর জীবন-প্রবাহ
চলিয়াছে টেনে,
আজো যারা অতীতের স্মৃতি-ভরা
ভারতের তপোবন-গীতি,
গাহিয়া চলিছে নিতি সুখ-দুখ মাঝে,
আজো যারা সহরের শত প্রলোভন
অবাধে রাখিয়া দূরে,
সাথী করি সরল শিশুর সম শত পল্লীপ্রাণ,
চলিয়াছে পিতৃ-পিতামহ-স্মৃতি বুকেতে করিয়া
তাহাদের কণ্ঠে আজি দিয়ে যাও ভাষা,
তাহাদের দাও অন্ন, দাও প্রাণ,
দাও আরো আলো !

এ জাতির পুঞ্জীভূত পাপ আর
যুগান্তের মাখানো কালিমা,
অন্ধ অন্ধকার আর মৃত্যুর লেলিহ জিহ্বা,
ভেদ, গ্লানি, পঙ্ক ছিল যত,
সব আজি নিয়াছে শিরেতে টানি,
মরণেরে করিছে বরণ,
রিক্ত, শূন্য হাতে ফিরিতেছে
দারিদ্র্যের কঠোর আঘাত সহি !
তাহাদের জীবনের ক্লেদ আর আবর্জ্জনা-ভার,
আজিকে করহ দূর !
মুছে দাও অন্তরের সঞ্চিত বেদনা !
পরাও তাহার ভালে দীপ্ত জয়টীকা !
তোমার জীবন সাথে—বেঁধে দাও প্রণয়ের রাখী ।

প্রতীচীর পল্লীবুকে, প্রতীচীর মানবের মুখে
আজো যে বিজয়-বার্ত্তা উঠিতেছে ধ্বনি,
সৃজনের জয়োল্লাস নিয়ে,
যে-বাণী ধ্বনিছে আজো জীবনের পরতে পরতে,
সর্ব্বহারা, হৃতগর্ব্ব---পথের ভিক্ষুক দলে,
আবার শুনাও সেই যৌবনের গান !

দেখিতে পাওনি কভু,
দেবতারে আজি রাখি দূরে,
বিগ্রহের অঙ্গে মাখি' ক্লেদ পঙ্ক যত
বড় হতে চেয়ে তুমি টানিয়াছ নীচে
আপন স্বজনগণে !
উপবাসে রাখিয়া পল্লীরে,
সহর হতেছে ক্ষীণ প্রতি পলে পলে !
নিরন্ন পল্লী যে আজি
তাহার ক্ষুধার অন্ন তোমার দুয়ারে আসি'
মাগিছে সজল চোখে ।
তাহারে রাখিয়া দূরে
সারাটি জীবন ভরি করিয়াছ ভুল !
পল্লী হ'লে লক্ষ্মী-হারা,
পল্লী হ'লে রিক্ত, ক্লিষ্ট, ধ্বংসের বাহন,
তোমার ধ্বংস যে বন্ধু রহিবে না দূরে !

তাই বলি তুমি যদি চাহ শুধু তোমার মঙ্গল
পল্লীরে আপন জ্ঞানে লহ বুকে তুলি !
সে যে তব অন্নদাতা ।
তোমার ক্ষুধার অন্ন সে যে কত সহি'
যোগায় তোমারে নিতি সস্নেহ আদরে !

হে বন্ধু ! তোমার বিষাণখানি
আজি লহ তুলি,'
শুনাও মরণাতুর পল্লীবাসিগণে
জীবনের জয়োল্লাস-গীতি ;
...তোমরা মানুষ,
অমৃতের সন্তান তোমরা !
আবার এ ক্ষীণ কণ্ঠে ফুটিবে বিজয়-বাণী !
আবার এ অভিশপ্ত প্রাণে,
ক্ষীণ ধারা মাঝে বহিবে জীবন-স্রোত !
দাও বন্ধু ! দাও আজি স্বচ্ছন্দ বিকাশ,
দাও আজি প্রেম, প্রীতি, শান্তি সুমহান,
দাও আরো আলো !

সেকালের কথা

—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ঠাকুরদাদাদের মুখে সে-কালের কাহিনী শুনিতাম। আজ ঠাকুরদাদারা গত হইয়াছেন। আজ বয়সের 'ক্লাশ-প্রমোসান্' পাইয়া আমরাই তাঁদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছি। তাঁদের তখনকার 'এ-কাল'টা, আমাদের এখন 'সে-কাল' হইয়া পড়িয়াছে। তখন ভুলেও ভাবি নাই যে, 'সে-কালের' কাহিনী শোনাইবার গর্ব্ব আমরাও কোন দিন লাভ করিব। লাভ যখন করিয়াছি আর শ্রোতারও অভাব নাই, তখন বলিবার আনন্দ ত্যাগ করি কেন।

বর্ত্তমানের তুলনায়, মানুষের মনে, অতীতের প্রভাবটাই বেশী। তার মাধুর্য্যও বেশী। অতীতের যা-কিছু সবই যেন ভাল, সবই যেন বড়। 'আছে'র অপেক্ষা 'ছিল'র মূল্যটা একটু বেশী করিয়া দেওয়াই আমাদের স্বভাব। রামের এ ছেলেটি খুবই ভাল বটে, কিন্তু যে ছেলেটি মারা গিয়াছে, সেটি ছিল রত্ন। হরির আগেকার বৌ, এ-বৌয়ের তুলনায় অপ্সরা ছিল। আগেকার দিনে গাছে কুল ফলতো,—ঠিক এক একটা বেলের মত। সেকালের লোকের রোগই হইত না ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতীতের কথা বলিতে তাই এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত তৃপ্তি।

খুব যে বেশীদিনের কথা, তা' নয়। বড় জোর বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ হইবে। আমার বয়স তখন চৌদ্দ কি পনর। রাজু ঘোষালের পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়া তখন আমি পাশের গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়িতে যাই।

গ্রামের নাম—সুন্দরপুর। এখন যেখানে হুগলী জেলার ত্রিশবিঘার জঙ্গল, সুন্দরপুর উহারই কাছাকাছি। সুন্দরপুর আমার পিত্রালয় নয়, মাতুলালয়, বাল্যকালটা মাতুলালয়েই কাটিয়াছে। বড় সুখেই কাটিয়াছে। আজ পরিণত বয়সে সুন্দরপুরের সেই সব স্মৃতি মাঝে মাঝে যখন কর্ম্মহীন অন্তরে আসিয়া পড়ে, তখন অন্তরটা যেন কোন বিস্মৃতপ্রায় সুখ-স্বপ্নমধ্যে নাচিয়া বেড়ায়। যেন সে আজিকার এ পৃথিবী নয়। সে যেন এ পৃথিবীর বাহিরে কোথাও কোন সুন্দর দেশ, যার আকাশ ছিল আলাদা, বাতাস ছিল আলাদা, মাটি ছিল আলাদা। যার পথ, ঘাট, বন, জঙ্গল, বাড়ী, ঘর-দোর, মানুষ—সবই ছিল আমার একান্ত পরিচিত, একান্ত প্রিয়। এখনকার সঙ্গে সে-সবের কিছুরই মিল নেই। সে 'আমাকে'ও আর আমার মধ্যে এখন খুঁজিয়া পাই না। পাই কচিৎ কখন কখন, যখন কোন কর্ম্মহীন দিনে, বর্ত্তমানের কোলাহল-ময় জীবনের ক্ষণিক অবকাশে সেইসব দিনের মধুর কথা মনের মধ্যে অপূর্ব্ব হইয়া অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠে, শুধু তখনই।

সেই সুন্দরপুর আজও আছে। আজও গাঁয়ের উত্তর-পশ্চিম কোণ বেড়িয়া সেই অ-নামা অপরিসর নদীটার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। তবে তা'তে বর্ষাকাল ভিন্ন আর জল থাকে না। আর জল যখন থাকে, তখনও তার ঘাটে ঘাটে পূর্ব্বের মত আর মেয়েদের সে ভীড় দেখা যায় না। নদীর সে ঘাটগুলো অ-ঘাট হইয়া জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সেই মন্দিরটি বুকে করিয়া আজও সর্ব্বমঙ্গলাতলা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু সেদিনের সে শ্রীও নাই, সে মাধুর্য্যও নাই, সে জমজমানিও নাই। তাই সন্দেহ হয়, প্রতিমার মধ্যে আসল মা-টি আছেন কি না। সম্ভবতঃ নাই। সর্ব্বমঙ্গলময়ী মা যখন ছিলেন, তখন গাঁয়ের সর্ব্ব বিষয়েই মঙ্গল ছিল। আজ মন্দিরমধ্যে বোধ হয় তিনি শ্মশানকালীরূপে বিরাজিতা।

কিন্তু বর্ত্তমান লইয়া বলিতে গেলে ত' অনেক কিছুই বলিতে হয়। তার দরকার নাই। অতীতের সেই সুন্দর-পুরের সুখের স্মৃতি, যাহা অন্তরকে আনন্দ দান করে, যাহা মনের উপর একটা মদির স্বপ্নের জাল বিস্তার করে, তাহার কথাই বলি।

গাঁয়ের আধখানা জুড়িয়া—উত্তরপাড়া। বাকী আধ-খানার মধ্যে কুলীনপাড়া, দক্ষিণপাড়া, মধ্যের পাড়া, দৈবক-পাড়া। দুইপাড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থলে সর্ব্বমঙ্গলাতলা। সেই খানেই উত্তর দিক্ ঘেঁসিয়া হাটতলা। সোম, শুক্রবার তথায় হাট বসে। আশে-পাশে ময়রার দোকান, মুদীখানা, সেকরার দোকনে, কাপড়ের দোকান প্রভৃতি।

ফাল্গুন মাস। আর কয়েকটা দিন বাদেই আমাদের পাড়ার 'বারোয়ারী' হইবে। আমাদের পাড়া মানে উত্তর-পাড়া বাদে যে কয়টি পাড়া, তাহাই। উত্তরপাড়ার সঙ্গে এ পাড়ার মনের মিল নাই,—অনেক দিনের দলাদলি। চৈত্রের প্রথম দিকে এ পাড়ার বারোয়ারী হইয়া গেলেই আবার বৈশাখের মাঝামাঝি ও-পাড়ার বারোয়ারী। সুতরাং এখন থেকেই গ্রামে একটা উৎসাহ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উভয় পাড়ার মধ্যে দলাদলি থাকায় রেষা-রেষিতে আনন্দ-উৎসাহটা যেন সকলের আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আমাদের পাড়ার বারোয়ারীর যাঁরা সব পাণ্ডা, তাঁরা সর্ব্বসময়ই এ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা, শলা-পরামর্শ করিতেছেন। কিরূপ আতস-বাজী পোড়ানো হইবে; কয় কুড়ি 'ব্যোমে'র অর্ডার দেওয়া হইবে; কিরূপ উদ্যোগ—আয়োজন, সমারোহ আদি করা হইবে; কাহার দল গাওয়ান হইবে; ভিন্ গাঁ হইতে কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে;—এই সব।

সর্ব্বমঙ্গলাতলায় নিবারণ ঘোষের দোকানেই সকাল-বিকাল পাণ্ডাদের কমিটী বসে। কমিটীতে আমাদের ছেলেদের দলের দু'চারজন উপস্থিত থাকি।

সেদিন কানু ঘোষাল তামাক খাইতে খাইতে কহিল, এবার যাত্রাটা কিন্তু ভাল দেখেই বায়না করতে হবে। 'বৌ-কুণ্ডু' না পাওয়া যায় ত' 'শশী অধিকারী'। যুগল ভট্‌চার্য্যি কহিল, যদি 'মতি রায়'কে মেলাতে পারি তা হলে আর কা'রেও নয়। বলিয়া যে যুগল ভট্‌চার্য্যি আসনপিড়ী হইয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে উবু হইয়া বসিয়া কানু ঘোষালের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া জোরে জোরে টান দিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু 'সুখটান' দিবার মাহেন্দ্রক্ষণেই দেখিল যে হুঁকার শীর্ষদেশে কলিকা নেই। পশ্চাৎ হইতে অন্নদা পাল নিঃসাড়ে উহা হস্তগত করিয়া, হস্তদ্বয়ের যোগাযোগেই নীরবে তাঁহার ধূমসেবায় লাগিয়া গিয়াছে। কানু ঘোষাল নিবারণের উদ্দেশে কহিল, হ্যাঁরে নেবা, বলি—বারোয়ারীর সময়টাতেও একটা করে কল্‌কে বাবা! এ সময়টা দুটো করে কল্‌কের ব্যবস্থা কর্! নিবারণ কহিল, দু'টো ছেড়ে পাঁচটা করে করতে পারি, বারোয়ারীর চাঁদাটা কিছু কম করে ধর দেখি, ঠাকুর!

সর্ব্বমঙ্গলাতলায় মায়ের মন্দির পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। সম্মুখে, মন্দিরের পশ্চিমাংশে সুপ্রসর উন্মুক্ত স্থান। এক পার্শ্বে বহুকালের প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ গাছ। প্রতি বৎসর এই স্থানেই দুই পাড়ার বারোয়ারীর উৎসব সম্পন্ন হয়। এবারেও স্থানটিকে দিন থাকিতে সু-পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ঐ উচ্চ বট ও অশ্বত্থ গাছের শীর্ষদেশে 'লগি'-বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে রক্তবর্ণের নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই সুন্দরপুরের বারোয়ারী আনন্দের বৈজয়ন্তী।

এ পাড়ায় যাহাদের যাহাদের বাঁশ-ঝাড় আছে, তাহাদের সেই সব বাঁশ-ঝাড় হইতে কিছু কিছু করিয়া বাঁশ কাটিয়া আনিয়া এক জায়গায় জড় করা হইয়াছে, মেরাপ নির্ম্মাণ, আসর সাজান, পূজাস্থান, রন্ধনের চালা,—বাঁশের কাজই ত' সব। সুতরাং বর্ত্তমানে সকলে বাঁশ লইয়াই ব্যস্ত। ছেলে-ছোকরার দলকে—অর্থাৎ বিশ বছর হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স যাদের, তাদের—সেই সব বাঁশের কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কেহ কেহ বাঁশ চিরিতেছে, কেহ বা বাঁখারি প্রস্তুত করিতেছে, কেহ শলা বানাইতেছে, কেহ ঐগুলি চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করিতেছে, আবার কেহ বা মাপ-মত খুঁটি কাটিতেছে। সকালবেলা এগারটা সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত এই সব কাজ করিয়া সকলে ঘরে যায়। তারপর আবার সন্ধ্যার পর হইতে কাজে লাগে। এই সময়টিই মধুর। সারাদিনের প্রখর রৌদ্র এবং উত্তাপের পর এই সময়টা যখন মৃদুমন্দ বসন্তের বাতাস বহিতে থাকে, তখন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আলোকে সকলে মহা উৎসাহে ও আনন্দে পরস্পর গল্প করিতে করিতে কাজ করিতে থাকে। আমরা একেবারেই নাবালক। এই 'বুনিয়ার' দলেও যোগদানের অধিকার আমাদের ছিল না। তবে ভরসা ছিল, আর কয়েক বৎসর পরেই যখন সাবালকত্বের জয়টীকা আমাদের কপালে অঙ্কিত হইবে, তখন আমরাও এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ হইব।

গ্রামের অধিবাসীরা তখন সকলেই গ্রামে থাকিতেন। গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাত্র দুইজন বিদেশে থাকিতেন। একজন, আমারই মাতামহ। তিনি মেদিনীপুর জেলায় ডাক্তারী

করিতেন। অপরজন—সারখেল বাড়ীর কুঞ্জমামা। তিনি ভাগলপুর জেলায় কোন এক নীলকুঠীতে কিছু একটা কাজ করিতেন। এঁরা দু'জনেই এই সময়টা একবার করিয়া দেশে আসিতেন; আর একবার আসিতেন—পূজার সময়।

বারোয়ারীর দিন কয়েক থাকিতে কুঞ্জমামা আসিয়া পড়িলেন। বাটীতে পদার্পণ করিয়াই, তিনি নিবারণ ঘোষের দোকানে আবির্ভাব হইয়া সোল্লাসে কহিলেন,—

'ইউ' - নিবারণ ঘোষ,
'হোয়্যার্ ইজ দি' ঘোষ?

এমন সময় কানু ঘোষাল আসিয়া কহিল, সকলে মিলে তোর কথাই ভাবছিলুম। যাক্, এসে পড়েছিস্ তা হলে। নীলকুঠী থেকে সঙ্গে কিছু নীল-টীল এনেছিস্ কি?

নীল? চাই না কি? হ্যাঁ তা'—

ওরে, 'হ্যাঁ—'তা' নয়? খানিক নীলের এবার দরকার পড়বে। উত্তরপাড়ার গন্শা মুকুজোকে আর বীরু রায়কে এবার নীল-বাঁদর সাজা'তে হবে কি না; তাই খানিক নীলের দরকার। বুঝিছিস্ ত? পশ্চাৎ হইতে যুগল ভটচার্যি হঠাৎ আসিয়া কহিল, দুছড়া পাকা মর্ত্তমান কলারও ত তা' হোলে দরকার হবে; সেটা নিবারণকে ফরমাস্ দেওয়া যাক। নিবারণ, হাত দুটো কপালে ঠেকাইয়া কহিল, তোমাদের বামুন-দেবতার ও-সব কথায় আর আমায় জড়িও না ঠাকুর; । পাপের তা' হলে আর অন্ত থাকিবে না।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে আর একজনের কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া গেল—মোটা খাদের নারীকণ্ঠ। কণ্ঠের অধিকারিণী সিধু জেলেনী অনুযোগের স্বরে সম্বোধন করিয়া উঠিল, বলি হ্যাঁ গা কুঞ্জ ঠাকুরপো!

কুঞ্জমামা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সিধু কহিল, আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি! দুগগো পূজার সময়ে আমার মাছের পাঁচটা পয়সা না দিয়েই তুমি চলে গেলে? কুঞ্জমামা প্রথমটা চম্কাইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সিধুর কথার উত্তরে কহিল, বাপরে! সেই পাঁচটা পয়সার কথা এই ছ'মাসেও তুই ভুলিস্ নি?

ভুললে চলবে কি করে বল? পাঁচ পাঁচটা পয়সা! এবার দিয়ে দিও। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার পর দিন মামার সঙ্গে চারি পাঁচদিনের জন্য মাসীর বাড়ী গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া, আমাদের ক্লাসের সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ রে, গাঁয়ের খবর কি বল্। সুরো মোটামুটি খবর জানাইয়া শেষে কহিল, আর একটি খবর হচ্ছে, সিধু জেলেনী মারা গিয়েছে।

মাইরি?

মাইরি। তার কলেরা হয়েছিল।

শুনিয়া একটু দুঃখ হইল। লোকটা নেহাৎ মন্দ ছিল না। তাহার বাড়ীর উঠানে একটা কুল গাছ ছিল। সেই গাছের কুল, যেমন বড় তেমনি মিষ্টি। সিধু কাহাকেও সে কুলে হাত দিতে দিত না; কিন্তু আমাকে কেন জানি না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কুল খাইতে দিত। সেই জন্য তার মৃত্যুসংবাদে মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল।

ইহার পর দিন নদীর ও-পারে দাই-পাড়াতে আমাদের প্রজা নন্দ বোষ্টমের কাছে খাজনা আনিতে দিদিমা আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া নদীর সাঁকোর কাছে আসিয়া পড়িলাম, সাঁকোর বাঁ-ধারেই মড়া-শ্মশান। এখানটাতে সকলেরই একটু গা ছম্-ছম্ করে। আমারও করিতে লাগিল। শ্মশানটা পার হইয়া যাইতে পারিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হইয়া এ-পারে আসিতেই—সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! সিধু জেলেনী নদীর ঘাটে নামিয়া পা ধুইতেছে!

ছুট! ছুট!- কোন দিকে না চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। পড়ি কি মরি, সে জ্ঞান তখন আর নাই। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ী ঢুকিয়াই একেবারে রান্নাঘরে। মা বলিল, ছুটে এলি যে? দিদিমা কহিল, কি রে, কি হয়েছে? আমি কহিলাম, সিধু জেলেনীকে দেখলুম মা! মাইরি বলছি! মা কহিল, তা'র আর হয়েছে কি। গাঁয়ের লোক, দেখবি না কেন? দিদিমা বলিল, তার সঙ্গে বুঝি কিছু করেছিস্, তাই ছুটে পালিয়ে এলি।

কি বলছ গো! সে ত মরে গেছে!

তোর মুণ্ডু!—বলিয়া দিদিমা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিতে গেল আর মা অনর্গল হাসিতে লাগিল।

তখন বুঝিতে পারা গেল, সুরোর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পরে জানা গেল, তাহাকে কুল দেয় নাই বলিয়া, তাহার উপর সুরোর খুব রাগ হইয়াছিল। তাই সে—

যা'ক্; সিধুর মরার ব্যাপারটা তখন বেশ বোঝা গেল।

কুঞ্জ মামা কানু ঘোষালকে কহিল, হোয়্যার ইজ দি মোষ?—অর্থাৎ বারোয়ারীতে প্রতি বৎসরই মহিষ বলিদান হইত; সেই মহিষের কথা। কানু ঘোষাল কহিল, মোষের সন্ধান দু'এক জায়গায় পেয়েছি, দু'এক দিনের মধ্যেই যেখান থেকে হোক যোগাড় করে ফেলতে হবে।

পূজার দিন দুই চার থাকিতে, কয়জন চাঁই মিলিয়া এক দিন সকাল সকাল আহারাদির পর মহিষ কিনিতে বাহির হইল। তখন আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে এত মহিষের আমদানী হয় নাই। এত - দূরের কথা, একটি মহিষ যোগাড় করিতেও বহু স্থানে ঘোরা-ঘুরি করিতে হইত। এখন ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা। দেশের—অর্থাৎ আমাদের বাংলা-দেশের এই অঞ্চলটায় এখন অসংখ্য মহিষের আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব। মাঝে মাঝে বড় বড় শিং-ওয়ালা মানুষ-মহিষের উৎপাতেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এই সকল মনুষ্য-মহিষ —। কিন্তু সে সব কথা এখানে নয়; যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি

দিন দুই পরে বলিদানের মহিষ আসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে, যিনি মহিষ বলিদান করিবেন, তিনিও আসিয়া পড়িলেন। তিনি অন্য কেহ নহেন,—দাদামশাই। বারোয়ারীর মহিষ বলিদানের ভার ছিল তাঁহারই উপর। তাঁহার গায়ে ছিল যেমন অসীম শক্তি, মনে ছিল তেমনি পূর্ণ আনন্দ উৎসাহ। তবুও, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার বয়স ৫২।৫৩ বৎসরের কম নহে; অর্থাৎ যে-বয়সে এখন আমাদের মহিষ দূরের কথা, একটা মশা মারিতেও হাতের কব্জীতে ব্যথা লাগে। তখনকার দিনে দেশ এবং দেশের লোক আধুনিক মতে অবনত ছিল, সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি তাদের শক্তি সামর্থ্য, আয়ু, আনন্দ এখনকার তুলনায় যে অনেক বেশী ছিল তাহাও ঠিক। তখন আহার-দ্রব্যের প্রাচুর্য্যও ছিল, লোকে আহার করিতে পারিতও বেশী এবং তাহা হজম করিবার শক্তিও সকলের ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাতঃ-কালীন জল-খাবার অনেক স্থলেই ছিল—কাঁচা চাউল, জলে ভিজানো আর তাহার সহিত আখের গুড়। আমাদের পাড়ার প্রসন্ন স্বর্ণকার আধসের-আড়াইপো ভিজা চাউল গুড়-সংযোগে প্রত্যহ 'ব্রেক্‌ফাষ্ট' করিয়া তাহার দিনের কাজে বসিত। তাহার পর মধ্যাহ্নের আহার হইত বেলা ১টা ১॥০টার সময়। সে অন্ন-ব্যঞ্জনের পরিমাণ এখনকার একটা লোকের চারি-গুণ। শুধু প্রসন্নই নয়, সকলেই তখন এই রকম খাইতে পারিত।

আমাদের, অর্থাৎ কি না ছেলেদের পক্ষে বারোয়ারীর দুইটি বিষয়ে লোভ থাকিত। একটি মহিষ-বলি, অপরটি যাত্রা।

আশায়, আনন্দে, উৎসাহে, কয়দিন কাটিয়া যাইবার পর বারোয়ারী পূজার দিন সমাগত হইল। আসল পূজা কিরূপ হইল, কাহার পূজা হইল, কে পূজা করিল, সে-সব সংবাদের জন্য আমাদের আগ্রহও নাই, আমরা তাহা রাখিও না। আমাদের লক্ষ্য—মহিষ-বলি। যত ছেলের দল সেই বেচারা মহিষকে ঘিরিয়া সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া। মহিষ-বলির জন্যই আনন্দ; আবার বলিদান দেখিয়া, সেই মহিষের জন্যই অন্তরে একটা নিদারুণ ব্যথা পাওয়া, বালক-হৃদয়ের অপূর্ব্ব মনোবৃত্তির অপূর্ব্ব পরিচয়!

যাহা হউক, বিপুল হর্ষ ও কলরবের মধ্যে মহিষ-বলি হইয়া গেল।

এইবার 'যাত্রা'। সে 'বৌ-কুণ্ডু'র দলও পাওয়া যায় নাই, 'শশী অধিকারী'র দলও পাওয়া যায় নাই। 'মতি রায়ে'র ত নয়-ই। বায়না হইয়াছিল—'পাতিরাম নস্করে'র দল। দল নূতন হইলেও অল্পদিনের ভিতরেই নাম করিয়াছে। কিন্তু পাতিরামই হউক, সীতারামই হউক, দল আসিয়া পড়িলে যে হয়। আমরা সব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। যদি দল না আসে, তাহা হইলে পৃথিবী থাক বা যাক, ভূমিকম্পই হোক আর জগত রসাতলেই গমন করুক, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। দলের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এক মাইল পর্য্যন্ত পথে আমরা 'ডাক' বসাইয়া দিলাম।

অবশেষে আসিয়া পড়িল। আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া, আমাদের অন্তর এবং চক্ষুকে তৃপ্ত করিয়া আসিয়া পড়িল—দুইখানা মাল-পত্র বোঝাই গো-যান। তখন সকলের মধ্যে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এ দুইখানা গাড়ীতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছিল—যাত্রাদলের সাজ-পোষাকের বড় বড় কাঠের বাক্সগুলি। তাই দেখিয়াই আমাদের কি আনন্দ!

সে আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হইল—যখন কিছু পরে যাত্রা-ওয়ালারা সদলবলে আসিয়া পড়িল এবং ঘোষালদের চণ্ডী-মণ্ডপের মধ্যে তাহাদের ডেরা পাতিল।

পাছে গোড়া হইতে যাত্রা শোনাটা না ঘটে, সেজন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছুটিয়া বাড়ী গিয়া তাড়াতাড়ি আধ-পেটা আহার করিয়া ভোজনের হাঙ্গামাটা মিটাইয়া আসিলাম। কিন্তু যাত্রা যখন বসিল, তখন মধ্য-রাত্র। তখন সেই সন্ধ্যাবেলার আধ-পেটা আহার জীর্ণ হইয়া গিয়া ক্ষুধাতে উদর অঝোর-ঝারায় কাঁদিতেছে। কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আর উপায় এবং সাধ্য কোনটিই নাই। উপায় নাই এইজন্য যে উঠিয়া গেলে, আসরের পুরোভাগে বসিবার স্থানটি বে-দখল হইয়া যাইবে; আর শক্তি নাই এইজন্য যে, প্রথমেই না কি গদা-হাতে ভীমের আগমন। সুতরাং সে-অবস্থায় সেই মধ্য-রাত্রে আকাশে-সূর্য্যের উদয় হওয়াও যদিচ সম্ভব হইতে পারে, আমাদের আসর ত্যাগ করিয়া উঠা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, যাইবই বা কোথা? বাড়ীতে ত কেহই নাই। মা, দিদিমা, মামীমারা—সকলেই ত যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। বাড়ী ত তালা-বন্ধ।

যাহা হউক, পেটের খোরাক না জুটিলেও, চক্ষু-কর্ণের খুবই জুটিল। সমস্ত রাত এবং পরের দিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত, সেই অর্দ্ধ-হস্ত পরিমিত স্থানে, একাসনে, একই ভাবে, পরমোৎসাহে যাত্রা শুনিতে শুনিতে কাটিয়া গেল।

যাহা হউক, এ-পাড়ার বারোয়ারী ত সাঙ্গ হইল; এইবার ও-পাড়ার বারোয়ারী। ও-পাড়ার বারোয়ারীতে মহিষ-বলির বিধি নাই। তবে 'যাত্রা' নিশ্চয়ই আছে। সুবিখ্যাত সাঁতরা কোম্পানীর দলকে উহারা বায়না করিয়াছিল। এ-পাড়ার সঙ্গে 'টেক্কা' দিয়া ও-পাড়ার 'গাওনা' হইল। পালা হইল—কর্ণ-বধ। গাওনা শেষ হইলে শোনা গেল, ও-পাড়ার পাণ্ডারা মিলিয়া আসরে একটা 'সং'য়ের পালা দিবে। এ-পাড়ায় 'পালা' হইয়াছিল—'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'; উহারা সং দিবে—'বৌদিদির হস্তধারণ'। দিলও তাই। ব্যাপারটার গুহ্য কথা এই যে, এ-পাড়ার বিপত্নীক দু'কড়ি গাঙুলি নাকি তাঁর বিধবা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-বধূর সহিত কি-সব নিন্দনীয় কাণ্ড করিয়া গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। সেই সব কথা লইয়াই এই 'সং'-য়ের পালা রচিত। ইহার মধ্যে আরও একটু মজা ছিল। আসল দু'কড়ি গাঙুলীর বয়স ছিল বছর চল্লিশ। কিন্তু পালায় দু'কড়ি গাঙুলী সাজিয়াছিল—ভুতো; ভুতোর বয়স বছর দশেক। আর 'গাঙুলীর বৌদিদি' সাজিয়াছিল, বাগদীদের পঞ্চা। তার বয়স বছর চৌদ্দ পনর হইবে। বিধবা বৌদির একটি পনর ষোল বছরের ছেলে ছিল অমূল্য। অমূল্য আমাদেরই সঙ্গে পড়িত। 'অমূল্য' সাজিয়াছিল—কালী মুকুজ্যে। তাঁর বয়স হবে—বছর ষাট। তখন ব্যাপারটা মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি 'সং'য়ের সেই পালাটা সব দিক দিয়াই রীতিমত 'সং'-ই হইয়াছিল। আর 'দলা-দলি' উপলক্ষ্য করিয়া সেকালের সমাজ-শাসনটা এমন প্রবল ছিল যে, কাহারও কোন অন্যায় করিয়া পার পাবার যো ছিল না। সুতরাং 'দলা-দলি'র মন্দের দিকটাও যেমন ছিল, ভালর দিকটাও তেমনি ছিল। পালার একখানা গানের অধিকাংশ এখনও আমার মনে আছে। কিন্তু আজকালকার দিনে তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না। কিছু অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট হইয়া পড়ে। তবে তাহার প্রথম দু'টি লাইন বলা যাইতে পারে। তাহা এই :—

> "কড়ি হে তোমার নিমগাছেতে মিষ্টি মধুর চাক্।
> দেখো যেন যায় না উড়ে, কোরো কিছু তুক্-তাক্॥"

গাঙুলী-বাড়ীর উঠানে খুব বড় একটা নিমগাছে একটা মৌচাক হইয়াছিল। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া গাঙুলী-গিন্নী সর্ব্বাগ্রে নিমগাছটার গোড়ায় বাঁ পায়ের তিনটা লাথি মারিত —এটা একটা মেয়েলা 'তুক্'। এতে না কি মৌমাছিরা চাকের মধু খাইয়া অন্যত্র উড়িয়া যায় না।

ঐ গানখানা গয়লাদের ভুতো গাহিত। ভুতোর গলাটা ছিল ভারি মিষ্টি। এই গানখানা তার মুখে কি সুন্দরই যে লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, ধরিতে গেলে, ও-পাড়ারই জিত হইল। ও-পাড়ার উপর এ-পাড়ার আক্রোশের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। ও-পাড়া-ওলাদের জব্দ করিতে এ-পাড়া-ওলারা নানা রকম মতলব আঁটিতে লাগিল। কানু ঘোষাল বলিল, এ সব ঐ নীরু রায়েরই মতলব। কুঞ্জকে বললুম, খানিকটা নীল সঙ্গে করে আনতে হয়। তা হলে ওর মুখে মাখিয়ে দিয়ে ওকে নীল-বাঁদর সাজানো যেত। যুগল ভট্টচার্য্যি

কহিল, দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যস্ত হ'য়ো না ; এর বিহিত আমি করব এখন। এমন জব্দ ওদের করবো যে বাছাধনরা।

কিন্তু আর জব্দ করিবার দরকার হইল না। একটা চরম অশুভের মধ্য দিয়া এই গ্রামের পরম শুভ ঘটিয়া গেল। গ্রামের বহুকালের দলা-দলি মিটিয়া গেল। এ-পাড়া ও-পাড়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন-বদ্ধ হইল।

চৈত্র-বৈশাখের এই সময়টায় আশ-পাশের গ্রামসকলে প্রায়ই 'কলেরা' লাগিত। তবে সুন্দরপুরে কখনো বড় একটা এ ভয় হয় নাই। এবার ও-পাড়ার বারোয়ারী হইয়া গেল, বাগ্দীপাড়ার কার্ত্তিক বাগ্দীর ছোট মেয়েটি হঠাৎ ঐ রোগে আক্রান্ত হইল এবং ঘণ্টাকতক মধ্যেই মারা গেল। তারপর মারাণ বাগ্দীর মায়ের হইল। সে-ও মারা গেল। আরও দু'চার জনের হইল। তাহাদের মধ্যে দুইজন সারিয়া উঠিল, দুইজন মরিল, ইহার পরই দেখিতে দেখিতে রোগ বাগ্দীপাড়া হইতে সারা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। আতঙ্কে সকলে কাঁপিয়া উঠিল। কখন্ কাহার ঘরে বিপদ আসিয়া পড়ে, কিছুরই স্থির হয় নাই। দুর্ভাবনায় ও ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। পাশের গ্রামের রজনী ডাক্তারই এ তল্লাটে নাম-করা ডাক্তার, তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন, আপনারা ভয় পাবেন না, শুধু একটা কাজ যদি দুর্দ্দিনে আপনারা করেন, তাহলে ভগবানের দয়ায় আর আমার প্রাণপণ চেষ্টায় কোন বিপদই আপনাদের হবে না। আপনারা দু'পাড়া এক হোন্, এই আমার ইচ্ছা।

অবশেষে তাহাই হইল। রজনী ডাক্তারের মধ্যস্থতায় দুই পাড়া এক হইল। বহুদিন হইতে যে দলা-দলি কিছুতেই যায় নাই, আজ তাহা এমনিভাবে মিটিয়া গেল। বিপদ ও অমঙ্গলের মধ্য দিয়া এক মহা-মঙ্গল সাধিত হইল।

রজনী ডাক্তারেরই যে চেষ্টা, আর ভগবানেরই যে দয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সত্যই ভগবানের দয়া। ক্রমে ক্রমে ভীষণ ব্যাধি দুই পাড়ার অনেককেই যদিও আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু একটি মাত্র বলি ছাড়া, আর সে দ্বিতীয় বলি পায় নাই। অবশ্য প্রথম আমলে বাগ্দীপাড়ার কথা স্বতন্ত্র। একটি প্রাণ যা' গিয়াছিল, তা' যাওয়ারই দরকার ছিল। ভগবান সবদিক্ দিয়া সুবিচার করিয়া বুঝি সুন্দরপুরে এবার এই ভীষণ মহামারী আনিয়াছিলেন। মরিয়া গিয়াছিল—দু'কড়ি গাঙ্গুলীর সেই বিধবা ভ্রাতৃজায়া। সে ত মরিল না, সে মরিয়া বাঁচিল। এ কথা ত ছেলে বয়সে বুঝি নাই, আজ বুড়া বয়সে বুঝিতেছি।

যাক, সুন্দরপুর শান্ত হইল। সব দিক্ দিয়াই শান্ত। এই উপলক্ষে সারা গ্রামে আনন্দ-উল্লাসের বন্যা বহিয়া গেল। স্থির হইল, বহুকাল দুই পাড়ার লোক একসঙ্গে বসিয়া আহারাদি করে নাই, সুতরাং এক ভোজের আয়োজন—অতীব প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গেই পরামর্শ পাকা হইয়া গেল। দাদামহাশয়কে আসিবার জন্য সবিস্তারে এক পত্র দেওয়া হইল। আর কুঞ্জমামাকে করা হইল—টেলিগ্রাম। নইলে সাহেব এত তাড়াতাড়ি হয়ত পুনরায় ছুটি মঞ্জুর করিবেন না। টেলিগ্রামে কুঞ্জমামীরই জবানীতে লেখা হইল, 'Aunt died. Come at once !' কিন্তু কুঞ্জমামার সংসারে কুঞ্জমামী ছাড়া দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোকই আর ছিল না। বলা বাহুল্য, মামাকে সঙ্গোপনে খামের মধ্যে এক পত্র দেওয়া হইয়াছিল।

যাহা হউক, দাদামশাইও আসিয়া পড়িলেন, কুঞ্জমামাও আসিয়া পড়িলেন। সর্ব্বমঙ্গলাতলায় তখন ও-পাড়ার বারোয়ারীর 'ম্যারাপ' বাঁধাই ছিল। অমনি থাকে। তবে এ-পাড়ার বারোয়ারী হইয়া গেলে, এ-পাড়ার লোকেরা তাঁহাদের 'ম্যারাপ' ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কারণ, তাঁহাদের গড়া 'ম্যারাপ' শত্রুপক্ষ ব্যবহার করিবে! 'ম্যারাপ'-তলায় আশে-পাশে, চতুর্দ্দিকে আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইল, ঘাস চাঁচিয়া ফেলা হইল। সব স্থানটা গোবর দিয়া নিকান হইল। বহুদিনের রাগা-রাগি, দ্বেষা-দ্বেষি, বিবাদের পর, এই-খানেই মায়ের সমুখে মহা-মিলনের মহাভোজ সম্পন্ন হইবে।

ভোজের দিন সকলে কী আনন্দ! সকলে যখন খাইতে বসিয়াছে, তখন ও-পাড়ার গণেশ মুকুজ্যে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোমরে হাত দিয়া, নাচের ভঙ্গীতে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল—

'কড়ি হে তোমার নিম গাছেতে মিষ্টি মধুর চাক।
দেখ যেন যায় না উড়ে—কোরো কিছু তুক-তাক্।'

হাসির একটা উচ্চ শব্দে 'ম্যারাপ' ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ঠিক সেই মহেন্দ্রক্ষণে সহসা কানু ঘোষাল পিছন হইতে বীরু রায়ের সমস্ত মুখখানাতে নীল রং মাখাইয়া দিয়া, বক্তৃতার ভঙ্গিমায় কহিল, বৎস! নীলপদ্ম আনবার

ভার যে তোমার উপর !—আবার একটা হাসির উচ্চরোলে সমস্ত স্থান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবার বাটি আসিবার সময় কুঞ্জমামা খানিকটা নীল সঙ্গে করিয়া আনিতে ভোলে নাই।

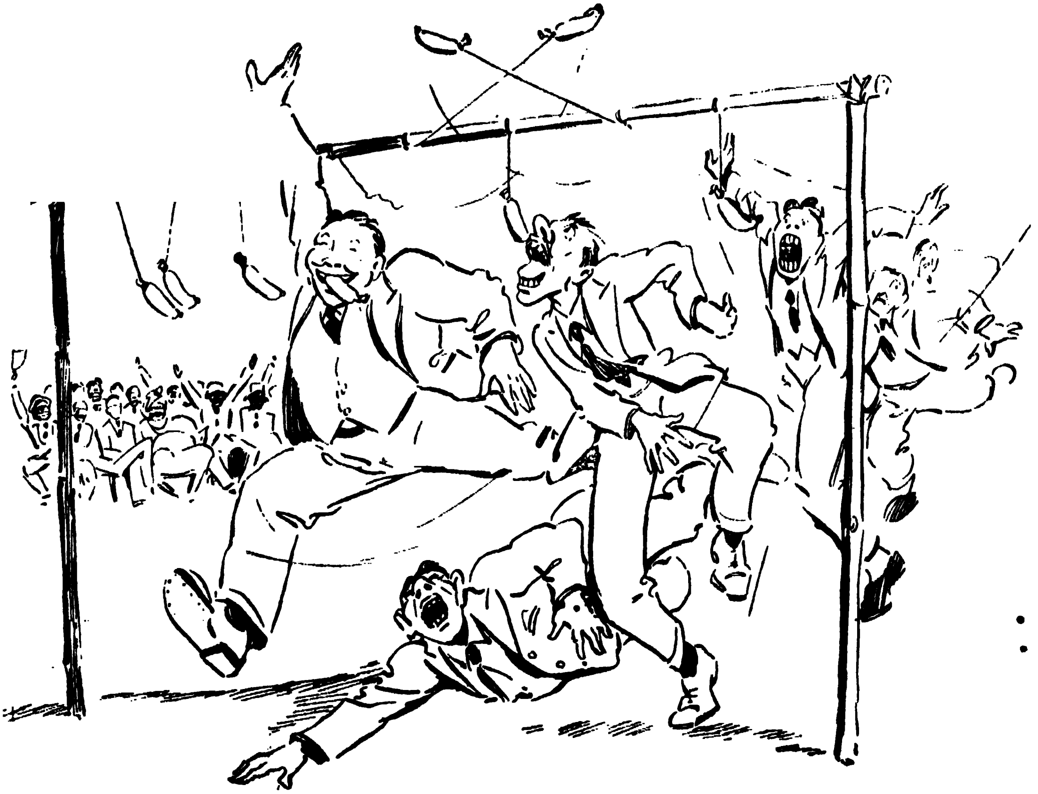
বড়দের আনন্দ-ভোজ হইয়া গেল, আমরা ছোটরা পরামর্শ করিলাম, আমরাও একদিন সকলে মিলিয়া 'ফিষ্ট' করিব। সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া গেল,—খিচুড়ী, আলু ভাজা, ডিম আর হালুয়া। আমি দিব চা'ল, শশী দিবে দা'ল, যতীন ঘি, অবিনাশ—হাঁসের ডিম, আর সুরো দেবে—সুজি, চিনি, তেল।

যথাদিনে 'চৈতন পুকুরে'র পাড়ের আম-বাগানটার মধ্যে মহানন্দ, মহা উৎসাহে আমাদের 'ফিষ্ট' সমাধা হইল। আহারান্তে 'চৈতন পুকুরে'র ঘাটে নামিয়া সকলে হাত-মুখ ধুইতেছি, পিছন হইতে মোটা খাদের নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, বাগানে সব 'চড়ি-ভাতি' হল বুঝি ? ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, সিধু জেলেনী। তাহাকে আজিকার এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে, আর একদিনের দেখাটা টপ্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। সুরেনকে বলিলাম, সুরো, সিধি মরেছে না বেঁচে আছে, ঠিক করে বল ভাই।

সেই একদিন আর এই একদিন ! সেদিনের সেই সব স্মৃতি লইয়াই যেন বাকী কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকি। বাল্যকালের স্মৃতি,—এ যে স্বপ্নে ভরা, মধুমাখা। এর আর তুলনা নাই। গত জীবন মানুষের অমূল্য সম্পত্তি। তাই, এক এক সময় উচ্ছ্বাসে, আবেগে, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে—

ফিরে এস স্বপ্নময়
মধুভরা গত দিনগুলি।
ফিরে এস স্রোত ঠেলে
আবার উজানে পাল তুলি'।

গণতন্ত্রের দৌড় ঃ নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতা



ঘোড়দৌড় ও মানুষ-দৌড়ের তফাৎ কি ? এই মানুষ দৌড়েও 'জকি' চোখে না দেখা গেলেও কাছাকাছি হয়তো আছে। বাজীও বোধ হয় চলিতেছে।

কনারক

-স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

কনারকের সূর্য্য মন্দির!

কোন্ সে মহাপ্রাণ যাঁর প্রচেষ্টায় অগণিত শিল্পীর বহু বর্ষব্যাপী একনিষ্ঠ শিল্প-সাধনার সুমহান্ তপস্যায় এই মন্দির রূপ পরিগ্রহ করেছে? কোথা থেকে এত প্রস্তর সংগৃহীত হল এবং কি উপায়ে তখনকার যুগে এত উচ্চে এতগুলি প্রস্তরের সংস্থাপন সম্ভব হল?

রাজা নৃসিংহদেব যখন উড়িষ্যায় রাজত্ব করছিলেন, তার পূর্ব্বেই ভুবনেশ্বরে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের কারু-কার্য্যময় বহু সুশোভন মন্দির ও গুম্ফা ছিল, পুরীতেও মন্দির ছিল। রাজা ভাবলেন, এ সব মন্দির অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য ও সুন্দর একটি সূর্য্যমন্দির তৈরী করতে হবে। রাজার আদেশে তাঁর কর্ম্মচারীবৃন্দ স্থাননির্দ্দেশে ব্যস্ত হল এবং পুরী ও ভুবনেশ্বরের মধ্যস্থলে সমুদ্রসৈকতে যেখানে দিক্ চক্রবালে সর্ব্বপ্রথম প্রভাতে রক্ত-ইঙ্গিত ফুটে উঠে, সেই স্থানটিই মন্দিরের জন্য নির্দ্ধারিত হল। পুরীর মন্দিরের উচ্চতা এবং ভুবনেশ্বর মন্দিরের শিল্প-সৌন্দর্য্য হ'তে এ মন্দির সুন্দরতর ও উচ্চতর হবে—এই কল্পনা নিয়েই কনারকের দেব-দেউল তৈরী আরম্ভ হয়। দূর থেকে মন্দিরটিকে একটি সুসজ্জিত রথ বলেই প্রতীয়মান হবে, এই ছিল এর রূপক কল্পনা। এই মন্দিরের কার্য্যভার রাজমন্ত্রী শিবসামন্ত রামের উপরই ন্যস্ত ছিল। শোনা যায়, দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপী সুকঠোর পরিশ্রমে কয়েক সহস্র শিল্পী ও কর্ম্মী এই মন্দির তৈরী করেছিল। রাজা অকাতরে ধনভাণ্ডার মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মন্দির-নির্ম্মাণের প্রস্তর নদীপথে, ভেলায় করেই এসেছিল। সুনিপুণ কৌশলে বালির ধাপের পর ধাপ তৈরী করে তার উপর দিয়েই পাথর ওঠান হয়েছিল— অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের ভিন্ন মত রয়েছে, যাক্ মোটের উপর এ ভাবেই মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল।

সেবারে পুরী গিয়ে এই কনারকের মন্দির দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কয়েকটি দিন পুরীতে আমাদের বেশ আনন্দ এবং স্ফূর্ত্তিতে কেটেছে। এখানকার প্রসিদ্ধ প্রায় দেব-মন্দিরই দেখা হয়েছে। কি যেন অজানা আকর্ষণে নিত্যই একবার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের দিকে যাই আর ঘুরে আসি। এরই মধ্যে কলকাতা হতে আর কয়জন বন্ধু এসে আমাদের দল পুষ্ট করলেন।

এই বারে একদিন সবাই উড়িষ্যার বিখ্যাত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কনারকের মন্দির দেখতে যাব স্থির হল। কোন্ পথে যাব তাই নিয়ে বিতণ্ডা উপস্থিত। কেউ পরামর্শ দিলেন গরুর গাড়ীতে যেতে, অতি সোজা পথ, আবার কেউ বললেন মোটরেই সুবিধা। সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটা রাস্তাও না কি একটি রয়েছে। ভ্রমণেচ্ছুরা কেউ বড় ও পথে যায় না। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মোটরে যাওয়াই স্থির হল। প্রায় ৫০।৫২ মাইল পথ, ট্যাক্সী পঁচিশ টাকার কমে যায় না। তার উপর মাত্র পাঁচ জন যাত্রী তাতে নেয়। আমাদের দলটি একেবারে নেহাৎ ছোট নয়, তাই একখানা বাসই ঠিক করা হল। ব্যবস্থা হল মাঝ-রাতে রওনা হব, ভোরে গিয়ে কনারকে সূর্য্যোদয় দেখতে হবে।

মোটরবাস রাত তিনটায় এসে ঘরের দুয়ারে দাঁড়াল—পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত ছিলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, এত দেরী হল কেন? সে বিশেষ প্রত্যুত্তর করলে না। এগার জন যাত্রী বাসে উঠে পড়লাম। সঙ্গে আহার্য্য ফল—মিষ্টি প্রচুর নেওয়া হল। দুপুরের আহার বা জলযোগ ওখানেই হবে। বাস তীব্র হর্ণের ধ্বনিতে নিদ্রিত জগৎকে সচকিত করে ছুটে চল্‌ল।

জ্যোৎস্না রাত—চাঁদের স্নিগ্ধ শান্ত আলোর সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব-জগতে। সমুদ্রবক্ষে আলোর প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, যেন উজ্জ্বল রৌপ্যধারার অনন্ত বিস্তার। উর্ম্মি-আঘাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দেখা যাচ্ছে যেন শত শত চাঁদের টুকরা আছড়ে পড়ছে সাগরের বেলাতটে। সুন্দর! প্রকৃতি যেন নিজ হাতে এই

সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন। গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত বালুকার প্রচণ্ড উত্তাপ আর এখন অনুভবে আসে না।



কনারকের যাদুঘরে রক্ষিত সূর্য্যমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়—কারুশিল্পের অপূর্ব্ব উৎকর্ষের নিদর্শন।

নীরব রাতের শান্ত শীতল বাতাসের স্নেহস্পর্শ আমাদের শরীরে একটা তৃপ্তি এনে দিলে।

চক্রতীর্থ হতে সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিকটা এসে মোড় ঘুরে ঘুমন্ত সহরের বুকের উপর দিয়ে জগন্নাথ রোড ধরে আমাদের বাস সোজা চলেছে। দূর গ্রাম হতে গরুর গাড়ী জিনিষপত্রে বোঝাই হয়ে রাত্রিশেষেই সহরের দিকে আসছে। গরুগুলো বোধহয় এখনও সহরের সভ্যতা বা চাল-চলনে অভ্যস্ত হয় নি—তাই মোটরের সাড়া পেয়েই ভয়ে গাড়ী নিয়ে এদিক ওদিক পালাতে চাইছে। গাড়োয়ান অতি কষ্টে অবিশ্রাম যষ্ঠি-সঞ্চালনে তাদের আটকাবার চেষ্টা করছে। কোনটি একেবারে মোটরের সামনে এসে হাজির। আমাদের ড্রাইভার কিন্তু খুবই সতর্কভাবে গাড়ী চালাচ্ছে এবং উৎকল ভাষায় গাড়োয়ানদের গাল দিচ্ছে। তার গাল দেওয়াটা সমর্থনীয় এই হিসাবে যে, চলার পথে যে একটু দেরী ও ব্যাঘাত হচ্ছে তা যথার্থ। রাস্তাটি প্রশস্ত এবং ভাল করে বাঁধান। দুই দিকে সার দিয়ে বিরাট বৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে থেকে আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পথটিকে ছায়া-শীতল করে রেখেছে। শুনেছি এই পথেই না কি চৈতন্য মহা-প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে এসেছিলেন। রাত প্রায় ভোর হয়ে এল। রাত্রিশেষের প্রহরী পাখী নিবিড় বনানীর অন্তরাল হতে ডেকে উঠল। গাছের ফাঁক দিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর ও পল্লীর ছায়া আবছা দেখা যাচ্ছে,—এখনও যেন ঘোর কাটে নি। আমাদের ভিতর কেউ নিশাশেষের স্নিগ্ধ বাতাসে ঘুমের ঘোরে এলিয়ে পড়ছেন—একে অপরের গায়। সর্বকনিষ্ঠ বন্ধুটি রগড় করে টর্চের আলো চোখের উপর ধরছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি চোখ চেয়েই চাঁৎকে যাচ্ছেন। সকলের হাসির রোলে বাসখানা মুখর হয়ে উঠেছে।

মাত্র ত্রিশ মাইল এসেছি, আমাদের কনারকের



কনারকের সূর্য্যমন্দির।

সমুদ্রতীরে সূর্য্যোদয় আর দেখা হবে না—রাস্তায়ই দেখতে হবে। বাস খুবই জোরে চলেছে। এখান হতে ভুবনেশ্বর

ভিন্ন একটি পথ চলে গেছে। অপর দিকে আমাদের বাস আর একটি বাঁক ঘুরে ছুটল। এবার প্রভাত-আলোর স্পর্শে পৃথিবীর বুক থেকে আঁধারের আবরণ টুটে গেছে। ভোরের পাখী ডেকে উড়ে যাচ্ছে। এখনও সূর্য্য উঠে নি। আরও এগিয়ে মাঠের মাঝ দিয়ে যাচ্ছি। পূর্ব্বাচলে ঐ দূর গ্রামের প্রান্ত ভেদ করে আকাশ ও প্রান্তরকে স্নিগ্ধ রক্তিমার অঞ্জলি দিয়ে সংবর্দ্ধনা জানিয়ে দিনের দেবতা উদয় হচ্ছেন। তাঁর নবীন আলোর সম্মোহন-দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

দূরবীক্ষণ দিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলাম। একটু পরেই কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে সব ঢেকে গেল—কিছুই দেখতে পেলাম না। এবার গ্রামের ভিতর দিয়ে—ঘরের পাশ দিয়ে, আম নারিকেল-কুঞ্জের ফাঁক দিয়ে চলেছি। উড়িষ্যার পল্লীর সৌন্দর্য্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মোটরের ভোঁ ভোঁ শব্দে অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। হাঁটুর উপর কাপড়-পরা, মাথার সামনের দিকটা কামান, পিছনে দীর্ঘ কেশ বিলম্বিত বা বাঁধা, জনকয়েক যুবক ও বৃদ্ধ তারাও দেখছে। মাটীর দেওয়ালের ঘরগুলো নানা বর্ণে চিত্রিত, ঘরের সামনে গরু বাঁধা আছে। পল্লীবাসীরা প্রায়ই চাষী। মাঝে একটি শীর্ণ নদী পার হয়ে এসেছি, কিছু দক্ষিণাও দিতে হয়েছে। এখন উঁচু-নীচু কাঁচা-রাস্তায় চলেছি। বাস বড়ই ঝাকুনি দিচ্ছে, ভিতরে সবাই গড়িয়ে একে অপরের গায় পড়ছেন। নিদ্রার জড়তা আর কারো নেই। কতকগুলো দগ্ধ-বদন হনুমান আমাদের দিকে চেয়ে পরমানন্দে মুখ বিকৃতি করে আম খাচ্ছে। জংলার ধারে মাঠে দু একটি চঞ্চল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল।

দূর হতে সামনের দিকে কনারকের মন্দিরের বিরাট ভগ্নস্তূপ দেখতে পেলাম। মনে আশা হল, কাছে এসেছি। আবার একটি মোড় ঘুরতেই মন্দির গ্রামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে, প্রায় সাতটায় আমাদের গাড়ী এসে গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁচুল।

অদূরে ঝাউ-বনের ফাঁক দিয়ে ভগ্ন মন্দির দেখা যাচ্ছে। গাড়ী আর অগ্রসর হতে পারবে না। এখান হতে প্রায় এক মাইল বালুকার রাজত্ব,—তার মাঝ দিয়েই হেঁটে যেতে হবে। বালুতে গাড়ী আটকে যায়, তাই সব মোটরই এখানে থামে। দুটি কুলির মাথায় সব জিনিস চাপিয়ে দিয়ে খুবই উৎসাহে এগিয়ে চললাম। কয়েক জনের রোদে খুবই কষ্ট হতে লাগল। তাই তাদের জন্য হাঁক-ডাক করে গ্রাম থেকে দুখানা গোযানের ব্যবস্থা করা হল। তাঁরা গোযানারোহণেই আরামে এলেন। যেতে যেতে মনে হল, ফেরবার সময় বালুকার তাপ আরও বেড়ে যাবে, তখন আমাদেরও দুরবস্থা হবে।

মন্দিরের দিকে চেয়ে চেয়ে এগিয়ে আসছি, যতই কাছে আসছি ততই যেন মন্দিরের আকার বেড়ে যাচ্ছে, দূর হতে মন্দিরটি অত বড় বলে মনেই হয় নি। সামনে এসে দেখছি কি বিরাট, কি গম্ভীর!—চারদিকে সাহারার মরুভূমির মত বালু ধূ ধূ করছে। সমুদ্রও যে খুব নিকটে তার সাড়া পাচ্ছি, কিন্তু তার বিরাট রূপ এখনও দেখতে পাচ্ছি না।

আরও এগিয়ে গিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতেই খানিকক্ষণ সবাইকে কেবল মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হল। সম্মুখে ঐ প্রস্তর-নির্ম্মিত সুসজ্জিত রথের মত বিশাল ভগ্ন মন্দির কত যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার নিম্নের চক্রগুলি আজও অক্ষত ভাবে বালিতে ঈষৎ আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। এ-যেন মন্দিরের প্রধান দেবতা সূর্য্যদেবেরই সপ্ত-অশ্ব-চালিত সুসজ্জিত রথ। দেবতা আজ মন্দিরে নেই; মূল মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তার গর্ভগৃহে শূন্য সিংহাসন আজও বর্ত্তমান এবং প্রধান মন্দিরের সম্মুখ ভাগের বিরাট দেউল—যেখানে ভোগ, আরতি ও ভক্তগণের দেবদর্শনের স্থান ছিল—একমাত্র সেই সংলগ্ন মন্দিরটিই আজ ভগ্নশীর্ষে কনারকের পূর্ব্ব-স্মৃতি বক্ষে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অতীত দিনের গৌরব ঘোষণা করছে। তারও প্রবেশদ্বার চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। ছাদ পড়ে যাবার আশঙ্কায় সরকার-পক্ষ থেকে বালি ও পাথর দিয়ে অভ্যন্তর-ভাগ পূর্ণ করে দরজায় দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর সামনেই ছাদ-বিহীন প্রশস্ত নাট-মন্দির। মন্দিরের বাহিরে চার দিকেই চারটি প্রবেশ-দ্বার ছিল—সম্মুখ এবং পশ্চাতের দ্বারই প্রশস্ত ছিল। সামনের তোরণ-দ্বারে দুইটি তেজোদ্ধত সিংহ প্রহরীরূপে

রয়েছে। পশ্চাতের দ্বাররক্ষী আজ নিশ্চিহ্ন, উভয় পার্শ্বের দুধারে একদিকে দুইটি হস্তী, অপর ধারে অশ্বদ্বয় প্রহরীরূপে আজও দাঁড়িয়ে আছে! অদূরেই পশ্চিম দিকে কারু-কার্য্যময় মায়া দেবীর ভগ্ন-প্রায় শূন্য মন্দিরটি রয়েছে।



মন্দিরের সিংহদরজা।

এবার বিভিন্ন দলে স্বাধীন ভাবে আপন মনে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে তার শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখতে লাগ্‌লাম। পথ-শ্রমের অবসাদ আর কারও মনেই নেই। যতই ঘুরে ঘুরে দেখছি, মন্দির-গাত্রের শিল্প-চাতুর্য্যে আরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি। কত বিভিন্ন ভাবের, কত বিভিন্ন রূপের সুন্দর সব মূর্ত্তি—লতা, পাতা, ফুল, হাতী, ঘোড়া, সিংহ, মকর, নাগ, মানুষ, দেবতা, নর্ত্তকী এবং কাম-কলার নানাভাবের বিকাশ—এ সব সূক্ষ্ম শিল্পের জীবন্ত রূপ দেখে মানুষ মাত্রেই মুগ্ধ হয়। রসলেশহীন রুক্ষ প্রস্তর-ফলকের বুক চিরে রূপদক্ষ শিল্পী কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই না ফুটিয়ে তুলেছেন, যা আজ শিল্প-জগতে—শুধু উড়িষ্যার কেন, ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে—বিস্ময় উৎপাদন করছে। এ সৌন্দর্য্য আজও এতই প্রাণবান ও পরিস্ফুট যে, মনে হয় যেন, মাত্র কয়দিন পূর্ব্বেই এ সব তৈরী হয়েছিল। এবার নাট-মন্দিরের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে ধ্বংসপ্রায় মূল মন্দিরের পিছনের দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছি। সামনেই একটি বিরাট সূর্য্যমূর্ত্তি পশ্চিমাস্যে অটুট দেহে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশ দিয়ে আরও উপরে—প্রায় চারতলার সমান—সামনের দিকে, অর্থাৎ প্রধান মন্দিরের সম্মুখভাগে যে মন্দিরটি আজও বর্ত্তমান রয়েছে, তার উপরে উঠে—অতি সন্তর্পণে ঘুরে চারিদিকের মূর্ত্তিগুলো দেখে আরও অবাক্ হলাম। এখানকার সব মূর্ত্তিই আকৃতিতে মানুষের মত বড়। মন্দিরের সম্মুখে ও পিছনে শিল্পী তাঁর যে রূপসৃষ্টি এই মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে সার্থক করে তুলেছিলেন, তা আজও লুপ্ত হয় নি। দেখে মনে হয়, নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে খোল, করতাল, বাঁশী ও চামর নিয়ে তাদের দেহ-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়ে দেবতার আহ্বানকে রূপায়িত করে তুলেছে, আজও তাদের দেহের



অপর পার্শ্বের দরজা : দুইদিকে দুইটি ঘোড়া।

সাবলীল সুন্দর নৃত্য-ভঙ্গিমা ও মুখের দেবোপম হাসির বিকাশ নিষ্প্রভ হয় নি। এখানকার বিশেষত্বই দেখছি

যে ভাবের যে মূর্ত্তিটি তৈরী হয়েছে, রূপটিও সেই ভাবেরই দ্যোতক। হে অতীত দিনের শিল্পী, তুমি ধন্য। জানি না তুমি কোন্ শুভক্ষণেই এখানকার শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলে! আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর উপরে আর একটি ছাদ, তার চারদিকেও নানারকম মূর্ত্তি আছে এবং মাঝখানটাই হল এ মন্দিরের সু-উচ্চ ভগ্ন শীর্ষ—এর উচ্চতাও নেহাৎ কম নয়। এ দেশে প্রবাদ যে, প্রধান মন্দিরশীর্ষে এক খণ্ড বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তর ছিল, প্রভাতের রবিরশ্মি প্রথমেই ঐ প্রস্তরে প্রতিফলিত হয়ে বহু বিচিত্র বর্ণে মন্দিরকে আলোকিত করে তুলত এবং ঐ চুম্বকের প্রবল আকর্ষণে নিকটে সাগরে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। এই প্রস্তরখানা কোন্ সময়ে যে অপসারিত হয়েছে, তা আজও নির্দ্ধারিত হয় নি। বিশ্রামের আশায় এখানেই মন্দিরের প্রশস্ত কর্নিসে বসলাম বন্ধ পাত্রের মুখ খুলে কেউ বা একটু তৈরী চা খেলেন।

রোদ বেড়ে গেছে, মন্দির-চত্বরের বালুকারাশি উত্তপ্ত হয়ে চক্ চক্ করছে। কাছেই নিঃসীম সাগরের সুগম্ভীর রূপ; অপর দিকে চন্দ্রভাগা নদীর ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত। মন্দির-অঙ্গনের চারিদিকে নিবিড় ঝাউবৃক্ষের শ্রেণী। তাদের গাঢ় সবুজ শাখাগুলি নিশিদিন পত্রমর্ম্মর-ধ্বনিতে যেন অতীত দিনের এই দেব-দেউলের নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন রহস্য মানুষকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে। আমরাও তার উদাস সাড়া শুনতে পেলাম। মাঝে মাঝে সাগরের স্পর্শ-স্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের দেহ ও মন জুড়িয়ে দিচ্ছিল। বিশ্রামান্তে ধীরে ধীরে নেমে আসছি, নিম্নে তাকিয়ে দেখলাম, প্রধান মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে দেবতার কারুকার্য্যময় শূন্য বেদীটি দেখা যাচ্ছে, এই বেদীর গাত্রে উৎকীর্ণ সূক্ষ্ম শিল্পকলা বড়ই সুস্পষ্ট। এখানকার যে-দিক পানেই তাকান যায়, সর্ব্বত্রই সুন্দরের মোহন ইন্দ্রজাল! নীরস প্রস্তর-ফলকে অপূর্ব্ব রূপ-সুষমা ফুটে রয়েছে। নানা বর্ণের প্রস্তর, কাল-সাদা-সবুজ-ফ্যাকাসে—প্রত্যেক প্রস্তরই বেশ উজ্জ্বল। এ সব দেখে মনে হয় প্রধান মন্দির (অর্থাৎ যেটি ধ্বংস হয়ে গেছে) না জানি কতই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলায় ভূষিত ছিল।

ঘুরে ঘুরে সরকার-রক্ষিত যাদুঘরে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে এই মন্দিরেরই কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভগ্নমূর্ত্তি রাখা হয়েছে। আমরা নিবিষ্ট ভাবে একটির পর একটি দেখে খুবই মুগ্ধ হতে লাগলাম। ভগ্ন মূর্ত্তিগুলির হস্ত, পদ, মস্তক এবং দেহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্ষিত। তবে কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি যা এখানে রয়েছে, তা বোধ হয় আর কোথাও নেই। পশ্চিম দিকের সারিতে নিকষ কৃষ্ণপ্রস্তরে অটুটদেহ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিটির ভিতর থেকে কি শান্ত সৌন্দর্য্যই না ঝরে পড়ছে। দুয়ারের নিকট প্রস্তরে খোদিত সূর্য্যদেব সপ্ত-অশ্বে সুসজ্জিত রথে চলেছেন। যদিও এই মূর্ত্তিটির হস্ত ও নাসিকা ভগ্ন অবস্থায়, তা হলেও এ দেবতার লোকোত্তর রূপ মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়। কেউ বলেন, এই মূর্ত্তিটিই মন্দিরে পূজিত হত, অপর মত সেই মূর্ত্তিটি এখন পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে রক্ষিত আছে।

এখানকার অরুণ-স্তম্ভটিও আজ পুরী-মন্দিরের সামনে শোভাবর্দ্ধন করছে। কে জানে ইহার কোন্‌টি সত্য। তারপর জগতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানকার নবগ্রহের মূর্ত্তি কয়টি—এক খণ্ড বিরাট কৃষ্ণপ্রস্তরে নয়টি গ্রহের মূর্ত্তি বিভিন্ন ভাবে পরিমিত আকারে অতি দক্ষতার সহিত শিল্পীর সুনিপুণ হস্তে খোদিত হয়েছে—যা দেখে অধুনাতন নবীন শিল্পী শুধু এই রূপসৃষ্টির সম্ভাব্যতাই অবনত মস্তকে বসে চিন্তা করবেন। নবগ্রহের এই মূর্ত্তিটি মন্দিরের প্রধান তোরণ-দ্বারের উপরে স্থাপিত ছিল। এত বড় প্রস্তরখণ্ডকে কি ভাবে যে উপরে রাখা হয়েছিল, তাও ভাববার কথা। যাদুঘর হতে বাইরে এসে দেখলাম, আমাদের অন্য সব সাথীরা সামনের বিরাট বট-গাছটির শাখা-প্রশাখা আচ্ছাদিত ছায়াশীতল স্থানে বসে আরাম করছেন। কুলিরা ওখানেই জিনিষপত্র রেখেছে। প্রাঙ্গনের চার দিকেই মন্দিরের হাজার হাজার ভাঙ্গা পাথরের টুকরা সেই পুরাণ দিনের স্মৃতির বোঝা নিয়ে বালির উপর পড়ে আছে—সে সব টুকরাও আবার কত যে শিল্পসম্ভারে উৎকীর্ণ। মন্দিরের সব দিকটাই দেখা হ'ল। ফিরে এসে সঙ্গীদের পাশে বসে আরাম করছি। বেলা যেমন বেড়েছে, রোদের তাপে বালিও তেতে উঠেছে। সবাই ক্ষুধার্ত্ত, স্নান কোথায় করব তাই ভাবছি, চৌকীদার নিকটের বাঁধান জলের কূপটি দেখিয়ে বললে,

ওখানকার জল খুব ভাল, আপনারা স্নান ও পান করতে পারেন। মহা উৎসাহে কয়জন স্নান করতে এগিয়ে গেলেন।



প্রায় ধ্বংস-প্রাপ্ত মন্দিরের প্রস্তর-নির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত চক্রযুগলের একটি।

কূপের জল সত্যই শীতল ও পরিষ্কার। স্নান করে বেশ তৃপ্তি বোধ হ'ল, পার্শ্বেই দেখলাম মন্দিরের একটি লোহার কড়ি পড়ে আছে—তার নির্ম্মাণ-কৌশল বড়ই আশ্চর্য্যজনক। দেখে মনে হল সরু সরু লম্বা কতগুলি লৌহখণ্ডকে এক সঙ্গে জুড়ে বোধ হয় একটি ছাঁচে ফেলে পরে লৌহ গালিয়ে তরল লৌহ ঐ ছাঁচে ঢেলে দিয়ে একটি আকারে পরিণত করা হয়েছে। এতে জিনিষটি খুবই মজবুত ও দৃঢ় হয়েছে। আজ এসব দেখে শুধু অবাক্ হয়ে ভাবতে হয়, সে দিনের কর্ম্ম-কৌশলের কথা—বিজ্ঞান যেদিন বিংশ শতাব্দীর মত এতদূর অগ্রসর হয় নি। এই মন্দির তৈরীর সময় এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, তা নিঃসন্দেহ। আজ শুধু অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল স্বরূপ দূরে জন-বিরল দরিদ্র পল্লীগুলি স্তিমিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের আশে পাশে শুধু ধূ ধূ করছে মরুভূমির বালুকা রাশি, আর কিছুই নেই। যে দেশের প্রজাবৎসল পরম ধার্ম্মিক রাজা, স্বেচ্ছায় অর্থভাণ্ডার মুক্ত করে, এরূপ মন্দির তৈরী করেছিলেন—আজ সে দেশবাসী অন্নাভাবে অর্থ উপায়ের জন্য নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কালের কি গতি!

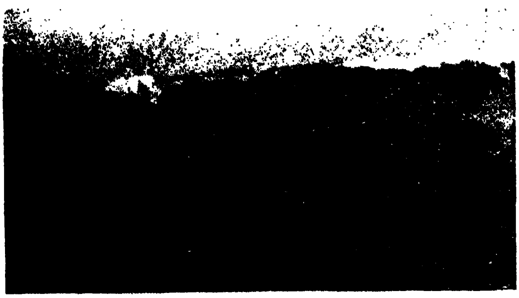
এখানে দাঁড়িয়ে আজ সেই অতীত যুগের বিস্মৃত সাধনার এক উজ্জ্বল অধ্যায় যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল—আর কত কথাই না মনে এল, আবার মনেই বিলীন হয়ে গেল। এখানে আজ কিছুই নেই, দেবতা নেই, পূজা নেই, নেই পুণ্যলুব্ধ অগণ্য ভক্তের কল-কোলাহল, নেই সন্ধ্যারতির পবিত্র মাধুর্য্য, শুধু অতীতের বিরাট শিল্পের শ্মশান বুকে আঁকড়ে পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির পড়ে আছে। কিন্তু একদিন এর সবই ছিল। সে দিন সমুদ্র তার ফেনশীর্ষ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সসম্ভ্রমে এই মন্দিরকে প্রণতি জানিয়ে সুগম্ভীর গর্জ্জনে স্তবমন্ত্র পাঠ করত, প্রভাতী আলো এসে জানিয়ে যেত তার অন্তরের স্নেহ-স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা-বাণী—আর বিহঙ্গের কলকাকলীতে ধ্বনিত হয়ে উঠত এর আবাহনগীতি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে স্বাধীন ভারতের ভক্ত নরনারী তাদের প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য দেবতাকে নিঃশেষে সমর্পণ করে অপূর্ব্ব তৃপ্তি নিয়ে ফিরে



ভগ্ন-মন্দিরের দেওয়ালে উপবিষ্ট যাত্রীদল।

যেত। মনে হল আজ তার কিছুই নেই—কেন তবে এ শ্মশানে প্রতি বৎসর এত দর্শকের আগমন হয়, কার

...কি দেখতে আসে? অমনি আপন মনেই উত্তর পেলাম,—এখানকার শিল্প-সাধনায় যে রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল—তা আজও জীবন্ত, জাগ্রত ঐ ধ্বংসপ্রায় মন্দির-গাত্রে। তার সৌন্দর্য্য একটুও মলিন হয় নি। তাই আজও অগণ্য নরনারী এই শিল্প-তীর্থে এসে ধন্য হয়ে যায়। জানি না কোন্ সেই রূপদক্ষ শিল্পী সাধকদল অতীতের বিস্মৃত শুভলগ্নে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে অন্তরের একাগ্র ... এখানকার শিল্প-কলার মূর্ত্ত বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা আজও জীর্ণ অবস্থায় আপন অতুল সৌন্দর্য্য-মহিমায়—দিক্ দিক্ হতে সৌন্দর্য্যের পূজারীকে টেনে আনছে। ধন্য হে সাধক শিল্পী, তুমিই অমর—ধন্য তোমার অমর কীর্ত্তি।



মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র।

একটু বাদেই বটগাছের তলায় আমাদের ফল মিষ্টান্নাদির ভূরিভোজন সমাপ্ত হল। সবাই আমরা মন্দিরের শিল্প-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি,—অনেকের মনেই কত যে প্রশ্ন উঠছে। আরও কিছু সময় বট-বৃক্ষ-মূলেই বিশ্রাম-আলাপে কাটান গেল—এখানকার প্রহরী ও কুলিদের সাথে গল্প হতে লাগল।

তারা বললে, প্রতি বৎসর মাঘী-পূর্ণিমায় চন্দ্রভাগা নদীতীরে একটি বড়মেলা হয়, সে সময় ...শবাসী বহু লোক ধ্বংসপ্রায় এই মন্দিরে এসে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায়। নবগ্রহ মূর্ত্তিটিকে কয়েকটি ব্রাহ্মণ নিত্যই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকেন।

পার্শ্বে সাধুদের প্রাচীন মঠে দুপুরে দেবতার ভোগ-নিবেদনের শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠল। বেলা প্রায় দুটা, আমাদের বাস সেই এক মাইল দূরে অপেক্ষা করছে। ...এখন এই উত্তপ্ত বালুকাময় পথে হেঁটে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। চৌকিদারটি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দূর গ্রাম হতে কয়েক খানা গোযান নিয়ে এল। আমরা ফিরবার পথে আর একবার সব দিকটা চেয়ে গাড়ীতে উঠলাম। কুলি চৌকিদার বখ্‌সিস্ পেয়ে খুসী হল। গোযানগুলি রৌদ্রতপ্ত পথে বালি উড়িয়ে আমাদের নিয়ে চলল। খানিকটা বালির বাঁধ—উঁচু-নীচু, পরে সোজা পথে এসে আমাদের মোটরবাসে পৌঁছে দিল।

মোটর ড্রাইভার পূর্ব্ব হতেই আমাদের পথ চেয়ে ছিল। আমরা বাসে উঠতেই সে হর্ণের ধ্বনি করে পূর্ব্ব-পরিচিত পথে পল্লীর মাঝ দিয়ে প্রান্তরের পাশ দিয়ে ছুটে চলল। উত্তপ্ত বাতাস আমাদের একটু ত্যক্ত করছিল। উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এবার বেশ ভাল রাস্তায় চলেছে। ফিরবার পথে নদীর ট্যাক্স দিতে হল না। একবারই মাত্র ট্যাক্স দিতে হয়। কনিষ্ঠ বন্ধুটির এবার খেয়াল হল, বাসখানা সে নিজেই চালিয়ে নেবে। সকলে খুবই উৎসাহ দিলেন। যদিও বয়সে ছোট, তা হলেও তার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। নিজের ছোট গাড়ী খানা সে চালায়। আমিও তাকে নিরুৎসাহ করলাম না। শুধু হাসতে হাসতে বললাম, দেখ জীবনটি এখনো বীমা করি নি, সাবধান। সে মুচকি হেসে ড্রাইভারের পার্শ্বে বসে বাসখানা চালাতে লাগল, কিন্তু সুবিধা হল না। কারণ এতদিন সে ছোট গাড়ী চালিয়ে অভ্যস্ত, এত বড় বাস চালান তার পক্ষে একটু মুস্কিলই; তাই তাকে আমরা নিরস্ত করে দিলাম। ড্রাইভার আবার পুরাদমে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে এল।

পুরীর নিকট রাস্তার ধারে একটি বড় ধানের মাঠ দেখিয়ে সে বললে—এর নাম লক্ষ্মী-জলা—চেয়ে দেখুন—এখানে বার মাস ধান বুনছে, কোনটি চারা, কোনটি সবুজ, আবার কোনটি পেকেছে, এই ক্ষেত্রের চাউলেই শ্রীমন্দিরে নিত্য মা-লক্ষ্মীর ভোগ হয়। আমরা চেয়ে দেখলাম—সত্যই প্রশস্ত ধানের ক্ষেতটি বড়ই সুন্দর। একটু পূর্ব্বেই আঠারনালাও পেরিয়ে এসেছি—এ স্থানটি আঠারটি নালার সংযোগ-স্থল। প্রবাদ—শ্রীচৈতন্য দেব ভক্তদের সাথে এখানে হেঁটে আসতেন। উপরে পুল—অদূরে জগন্নাথ মন্দিরের উন্নত চূড়া দেখা যাচ্ছে। একটু বাদেই বাস-খানা জন-কোলাহল-মুখরিত পুরী সহরের বুকের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে আমাদের চক্রতীর্থে নামিয়ে দিল।

মাকড়সার জাল

—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

কলিকাতার কোন একটি বড় রাস্তার ধারে মাকড়সা একটি সুবৃহৎ জাল তৈয়ারী করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। যে কোন সময়ে একটা না একটা মাছি আসিয়া পড়িবেই। সেদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া এই জালে মাছি পড়া লক্ষ্য করিতেছিলাম। অবসর অতিবাহনের পক্ষে ডাক্তারখানায় বসিয়া এই জালে মাছি পড়া ব্যাপার দেখা এক চমৎকার জিনিষ।

*

—ডাক্তারবাবু!

—বলুন।

—আমি যে পেটের যন্ত্রণায় মরে গেলুম ডাক্তারবাবু!

—আপনাকে তো কালই আমি বলেছি, আপনাকে এমিটিন্ ইঞ্জেকসন্ নিতে হবে!

—ইঞ্জেকসনই নিতে হবে?

—হ্যাঁ তাই নিতে হবে। অন্য রকমে সারলে আমরাও সেই ব্যবস্থাই করতাম।

—আচ্ছা তবে তাই দিন।

জালে একটা মাছি পড়িল। মাছিটি সুস্থ ও সবল মাছি। যেরূপ ভাবে ছটফট্ করিতেছে, তাহাতে সে অনায়াসে জাল ছিঁড়িয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে পারে। কিন্তু ছিঁড়িবে না।

—নমস্কার স্যার!

—হ্যাঁ। কী?

—স্যার, আপনাকে একবারটি ভেতরে যেতে হবে স্যার। সাম্ থিং প্রাইভেট।

—বেশ চলুন।

উভয়ে গিয়া ল্যাবরেটরীর মধ্যে ঢুকিলেন। আমরা একটু মুচকিয়া হাসিলাম। কারণ আমরা, যারা ডাক্তারখানায় বসিয়া আড্ডা দিই, উক্ত প্রাইভেট শব্দটির প্রাইভেট অর্থ জানি। চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকের বড় বড় উস্কোখুস্কো চুল, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পিঠের দিকে একটি ছিদ্র রহিয়াছে। বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় না যে তাঁহার অবস্থা ভাল। তবু-কী জানি! হয়ত কষ্টার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া, কোন এক জোৎস্না-মদির রাত্রে...ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিয়া হাঁকিলেন —

—যতীন। একটা 'স্যালভারসন্' দেখি!

জালে আর একটা মাছি পড়িয়াছে। এখন স্থির হইয়া আছে বটে, কিন্তু ঠিক জানি মাকড়সা উহাকে স্পর্শ করিলেই উহার ছট্‌ফটানি সুরু হইবে।

*

বড় রাস্তা দিয়া কত রকমেরই যে মানুষ চলিয়াছে, তাহার আর সীমা-সংখ্যা নাই। বসিয়া বসিয়া এই চলমান জীবন-স্রোতের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙিল ডাক্তার বাবুর গলার আওয়াজে। রাস্তা দিয়া যে লোকটি দ্রুতপদে হন্ হন্ করিয়া বোধ করি অফিসের দিকেই যাইতেছিল, ডাক্তার বাবু তাহাকেই ডাকিয়াছেন। চাহিয়া দেখিলাম, লোকটির গায়ে একটি মলিন লংক্লথের পাঞ্জাবী পায়ে এক জোড়া বহু পুরাতন এ্যালবার্ট। মুখে পান আছে বটে, কিন্তু এখনও চিবাইতে সুরু করে নাই, সম্ভবতঃ ট্রামে বসিয়া চিবাইবার ইচ্ছা আছে। সে হাসিমুখে ডাক্তারখানায় উঠিয়া আসিল।

—কী হে! তোমার বাড়ীর খবর কি? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

—আজ্ঞে ভালই।

—ছোট মেয়ের সেই যে টাইফয়েড্ হয়েছিল—

—ভালই আছে আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

—বেশ, বেশ। তোমার স্ত্রী--

—সেই রকমই আছে।

—বেশ, বেশ। আর তোমার সেই হাঁপানিটা—

—আজ্ঞে, ওতো আমার সঙ্গের সাথী। এই ভাবেই কাটিয়ে দেব কোন রকমে জীবনটা।

—না, না, এ কি একটা কথা হল? কেন, হাঁপটা কি তোমার সম্পূর্ণ যায় নি?

—কই আর গেল ! এখনও প্রায়ই—

—বটে ! দেখি একবার বুকটা। এদিকে এস।

লোকটি আগাইয়া গিয়া ডাক্তার বাবুর পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া, পাঞ্জাবীটা ও তাহার নীচের একটি ঘামে ময়লা ফতুয়া তুলিয়া ধরিল। ডাক্তারবাবু ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া বসাইয়া 'কমজোরী' জায়গার খোঁজ করিতে লাগিলেন।

—হুঁ। ডাক্তারবাবু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চারণ করিলেন।

—কি রকম দেখলেন ? লোকটি ডাক্তারবাবুর চোখে চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল।

—ও আর দেখাদেখি কি ! আচ্ছা, রক্তটক্ত কখনও—?

—কই না তো ! কেন ! সে রকম কি কিছু ?

—হুঁ, তাই তো মনে হল।

—তা হলে কী হবে ডাক্তারবাবু ? লোকটি যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

—কী আর হবে ! আসবেন সব একবারে শেষ করে ! দেখুন গোটাকতক ইন্‌জেক্‌সন্ নিয়ে !

—তাই দিন তবে। ভদ্রলোক ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলেন।

—যতীন ! দু গ্রেন্ সোয়ামিন্ তৈরী করে দাও। ভয় নেই, কমে যাবে।

বেচারা মাছি ! জালকে দূরে রাখিয়া পাশ কাটাইতে গিয়া অবশেষে সেই জালেই আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছে।

*

রাস্তা হইতে উচ্চ হাসির শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একদল যুবক আখড়া হইতে কুস্তি অভ্যাস করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। একখানি ডাব-বোঝাই গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করিতে করিতে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, আজ বাড়ী যাইবার সময় দোকান হইতে একটি ডাব কিনিয়া লইয়া যাইব কি না ! কারণ গত কয়েক দিন হইতে আমার সামান্য একটু একটু পেটের গোলমাল সুরু হইয়াছে। ডাবের জলটা অ্যাল্‌কালাইন্ বটে।

—ডাক্তারবাবু, আজকে কাশির সঙ্গে আবার অনেকখানি রক্ত উঠল যে !

—ক্যালসিয়াম কটা দেওয়া হয়েছে একে—প্রফুল্ল ?

—সাতটা।

—ওহে ! এত খরচ তুমি যোগাবে কোত্থেকে ? তুমি এক কাজ কর। হস্‌পিট্যালে যাও।

—আপনি যা বলেন।

—হ্যাঁ তাই যাও। খরচও লাগবে না, ভালও হয়ে যেতে পারেন।

—তাই যাই। ছেলেটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

জালে একটি মাছি পড়িয়া, তৎক্ষণাৎ জালের একাংশ ছিন্ন করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গেল। কিন্তু হতভাগ্য জানে না যে, এ জালের চেয়েও আর একটি বৃহত্তর জাল হয়ত তাহার পথের উপরেই ওৎ পাতিয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

*

গুণ গুণ শব্দ শুনিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম যে, সূর্য্যালোকিত শূন্য ভরিয়া গান করিতে করিতে একদল মৌমাছি উড়িয়া চলিয়াছে। উহারাও মাছি বটে, কিন্তু মৌমাছি ! অন্ধকার ঘরের কোণে মাকড়সার জালের খবর উহারা রাখে না। শুধু অনন্ত আকাশের নীচে এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে মধু সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়…

*

আমার গল্পের নায়ক মাকড়সার আজ অত্যন্ত সুদিন। লক্ষ্য করিলাম, যদিও অনেকগুলি মাছি জালে আটকা পড়িয়া আছে, তথাপি জালের আশেপাশে এখনও অসম্ভব ভীড়, বোধ হয় কে আগে পড়িবে, সেই মহৎ কর্ত্তব্য লইয়া তর্ক চলিয়াছে।

—একটু সরে বসুন তো মশায়, আমি একবারটি দেখিয়ে নি। ওহে ডাক্তার !

—আসুন আসুন।

—দেখ, কালকে হঠাৎ চেয়ারের ওপর বসে কাজ করতে করতে একটুখানি অজ্ঞানমত হয়ে গিয়েছিলাম। এখনও মাথাটা অল্প অল্প ঘুরছে। একবার দেখ তো ভাই হাতটা।

—কত বয়স হ'ল ?

—বেয়াল্লিশ।

—হুঁ, এসব হচ্ছে শেষ বয়সের রোগ।

—শেষ বয়সের ?

হ্যাঁ। আপনার ব্লাডপ্রেশার হয়েছে বোধ হয়। দেখছি। প্রফুল্ল! ব্লাডপ্রেশার দেখবার যন্ত্রটা আন।

—বলি বাঁচব ত হে?

—তা—আ বাঁচতে পারেন। দেখুন তো প্রেশার কত হয়! ভদ্রলোক হতাশভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

একটা।

*

—কী গো তোমার কি?

—আমার বাবা, এই খোকার পায়ে একটা ফোঁড়া হয়েছে, উঠছেও না বসছেও না।

—কই দেখি। হুঁ। ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও, কাটতে হবে।

—কাটতে হবে? কাটাকুটি করলে এইটুকু ছেলে কি আমার বাঁচবে বাবা?

—বাঁচবে না তো কি মরে যাবে? যত সব—যাও, যাও, ভেতরে নিয়ে যাও।

আর একটা।

*

—এই যে, রক্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কালাজ্বরই তো?

—হ্যাঁ।

—আমি তখনই বলেছিলাম। ও হতেই হবে। যাই-হোক আজ থেকেই চিকিৎসা সুরু করি, কি বল?

—যা ভাল বোঝেন।

—প্রফুল্ল! ইউরিয়া ষ্টিবামিন্ দাও।

—আরও একটা।

*

—বাবু!

—ক্যা খবর?

—পেট্‌মে দরদ, ওঃ। মর্ যাতা হ্যায়।

—ইলাজ নেই করনেসে এ্যায়সাই হোতা হ্যায়।

—ক্যা করে বাবু! গরীব আদমি।

—ইধার আও।

বিদেশী মাছি। জাল দেখিয়াই বোধ করি আগাইয়া আসিয়াছে।

*

—ডাক্তারবাবু আছেন?

—হ্যাঁ, কী বলুন।

—ছ্যাখেন, মাথার যন্ত্রণায় তো আমি গ্যালাম্ গিয়া!

—কি, হয়েছে কী?

—ওই যে কইলাম মাথার যন্ত্রণা।

—রাত্রে বাড়ে?

—হঁ।

—সম্ভবতঃ আপনার চোখ খারাপ হয়েছে।

—চোখ খারাপ হইছে? এখন করুম্ কি তাই কন্!

—চোখটা একবার দেখান। লহরী বাবু! এর চোখটা একবার টেষ্ট করুন।

প্রাদেশিক মাছি।

*

রাস্তা দিয়া একদল লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে একটি মড়া লইয়া গেল। পিছনে পিছনে চলিয়াছে একটি রোরুদ্যমানা তরুণী। দুইজন লোক দুইদিক হইতে তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে।

সামনের বাড়ীর পাশের ছোট্ট মাঠটিতে একটি শিমুল গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। গন্ধ-বিহীন পুষ্প-প্রদীপ জ্বালিয়া সেখানে বিশ্ব-দেবতার আরতি চলিয়াছে। উপেক্ষিত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাসি, ওখানকার শূন্য ভরিয়া উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।

একটি সুস্থ ও সবল শিশুকে কোলে করিয়া একটি সুন্দরী তরুণী ডাক্তারখানায় হাসিমুখে প্রবেশ করিল। তাহার চোখে মুখে আনন্দের রং।

—এই যে! বাঃ! এ তো বেশ সেরে গেছে দেখছি।

—হ্যাঁ। ওকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনিই তো ওর জীবনদাতা!

—না, না, না—কী যে বল। ভগবান বাঁচিয়েছেন।

—কী, হয়েছিল কী? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

—ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রি। ডাক্তারবাবু বলিলেন। —সত্যি ভগবান বাঁচিয়েছেন ওকে। যা হয়েছিল!

*

সম্মুখের দরজার ফাঁকের উপর বাহিরের একটুকরা সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া ঘরের ভিতরকার মাকড়সার জালটার উপর পড়িয়াছে। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, সেই সামান্য একটুখানি প্রতিফলিত সূর্য্যালোকে, সেই বহু পুরাতন কালো ও সূক্ষ্ম মাকড়সার জালটি রীতিমত সাতরঙা হইয়া উঠিয়াছে…

ছোট কবি

—শ্রীকানাইলাল দেবশর্ম্মা

আমি ছোট কবি
সাধ্য নাই রচিবারে পারি 'মেঘদূত' ;
অথবা রচিতে পারি এমন কবিতা
লক্ষকোটি হৃদিমাঝে জাগাইবে যৌবনের গাথা
আনন্দে বিস্ময়, পুলকে বেদনা, মহাজয়ে ব্যথা।

সাগর গর্জ্জন-গানে মানবের আত্মার হুয়ারে
[illegible]নী বহিয়া আনে ;
গগন-গৃহের ঐ অগণিত তারা কার পানে
লক্ষ্য রাখি স্থির জড়াইছে এ ধরারে ;
তুচ্ছতম মানব-জীবনে,—নাহি জানি আমি।
আমি বুঝি মোর গ্রামকোলে
যে-নদী বহিয়া চলে, বুকে তা'র রাজ্যের জঞ্জাল
নাহি তা'র সাগর-গর্জ্জন ফেনিল উত্তাল :
নীরবে বহিয়া চলে ধীরে
নতচোখে পুছিয়া কুশল তা'র হুই তীরে।
যদি কোন বসন্ত মলয় তা'র বীণাতারে
জাগাইয়া তোলে কভু অস্ফুট মর্ম্মর—
লজ্জাশীলা নিজ মাঝে লুকাইতে চায়।
সেই যে কুণ্ঠায় ভরা, লাজনম্র সুর
বুঝিবারে পারি।
সে যেন ঘরের গান, নহেক সুদূর।

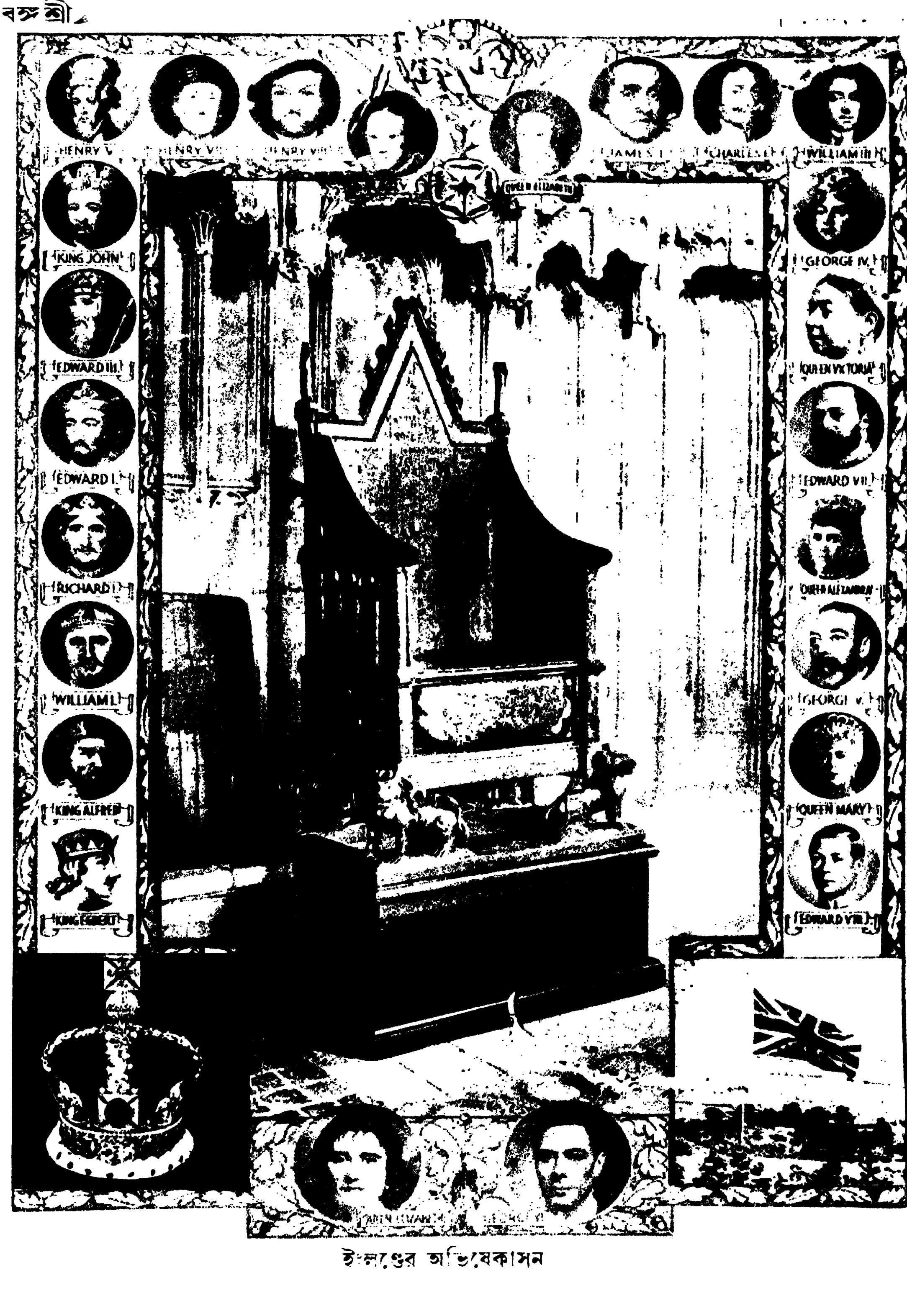
ছোট কবি আমি।
অলকাপুরীর সেই ঘরে
কালিদাস রহিয়াছে রত যেথা
অভ্যর্থিতে মহাকবিজনে ; সুধাপাত্র রহিয়াছে ভরা
রসচর্চ্চা নিয়মিত, নর্ত্তকীর নূপুর-শিঞ্জন,
রূপসীরা আঁকে যেথা চোখের অঞ্জন—
আমার প্রবেশ নাই।

নাই বা থাকিল দাবী, হুঃখ নাহি পাই।
আমার ঘরের পাশে থাকে রাখালীয়া
গান গায় ভাল, প্রাণের সোহাগ ঢালি।
সমুখে নাচিয়া ফিরে দিয়া হাতে তালি
রাখালীর ছোট ছেলেমেয়ে।
রাখালীর নাই অলংকার
জংগল ভরিয়া আছে কল্মীর লতা ;
তা'র ফুল গুঁজি কবরীতে, জড়াইয়া কটিপরে পাতা
রাখালী নিতুই সাজে হয়ত বা দেবীর মতন !

আমি ছোট কবি---
দৃষ্টি মোর ছোট গ্রামে হয়ে আসে ঘোর।
ক্ষেতে দেখি কায করে মোর চেনা লোক
অবসর নাহি মোর ভাবিবার ভূলোক-দ্যুলোক।
আমার পাশের লোক আমারে পরশ করে
তা'দের জীবনস্রোত, বিকাশ-বেদনা।
তা'দের হৃদয় বুঝি আমি
আমারে বুঝেছে ভাল তা'রা।

ছোট কবি আমি—
আমার মরণ পরে গাহিবে না বিশ্ব শোকগীতি
স্মৃতির পরমপটে রহিব না আঁকা, বিশ্বপ্রীতি
করিবে না অশ্রু-বরিষণ আমার অভাবে।
হয়ত বা কেহ চাহিবে জানিতে, 'অমুকে মরিল বুঝি' ?
যদু খুড়া হুক্ হ'তে ক্ষণতরে তুলি মুখ তা'র
রহিবে চাহিয়া। ক্ষেতের কাযের ফাঁকে
কৃষাণ শুনিবে তা'র আপন নিয়তি
মোর মৃত্যুমাঝে।
শুধু এই, এর বেশী নয়।

ছোট কবি, ছোট গান করি।
মোর নাই আদরের মিথ্যা অনাচার,
অত্যাচার—সর্ব্ব সৃষ্টিনাশা।
এই শুধু আশা।
আমার শশ্মানদৈন্য মাঝে
ফুটিবে একদা সাঁঝে
অজানা ফুলের গাছে গোত্রহীন ফুল।
ক্ষুদ্র আমি, শুধু চাই
মোর সৃষ্টি হ'বে না অতুল ॥



ইংলণ্ডের অভিষেকাসন

সম্পাদকীয়

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।

সংগঠন-পরিকল্পনা ও তৎসম্বন্ধে বিবেচ্য

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে যে সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই গত এক মাস কাল হইতে স্ব স্ব সংগঠন-পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। দেশের ও দশের কোন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কোন না কোন সংগঠন-পরিকল্পনা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সত্য বটে, কিন্তু ঐ সংগঠন-পরিকল্পনা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের চিন্তাপ্রসূত না হইলে উহা অধিকাংশ সময়ে হিতকর না হইয়া অহিতকর হইতে পারে। এই হিসাবে আমাদের মতে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যে সমস্ত সংগঠন-করিকল্পনা তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের জন্য উপস্থাপিত করিতেছেন, তাহাতে জনসাধারণের উপকার সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, তদ্দ্বারা প্রায়শঃ অনিষ্ট সাধিত হইবে। আমাদের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা পরিস্ফুট করিতে হইলে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল কোন্ কোন্ সংগঠন-পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

এ যাবৎ যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা ঐ মন্ত্রিমণ্ডলের বিবিধ আলোচনায় শুনা গিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ;

(২) কুটীরশিল্পের প্রসারসাধন ;

(৩) পল্লীগ্রাম-জাত কুটীরশিল্পের ক্রয় ও বিক্রয় অথবা বাণিজ্য সহজ-সাধ্য করিবার জন্য সরকারী রাস্তার বিস্তৃতিসাধন ;

(৪) পল্লীগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহের সংখ্যার বৃদ্ধি-সাধন ;

(৫) পল্লীগ্রামের জলকষ্ট নিবারণ করিবার ব্যবস্থা ;

(৬) জমির করহ্রাসের ব্যবস্থা ;

(৭) কৃষি-যোগ্য জমির পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা ;

(৭) কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত আটটি পরিকল্পনা প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ কার্য্যতালিকায় কোন না কোন আকারে স্থান পাইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে ঐ আটটি পরিকল্পনা প্রায়শঃ জনসাধারণের হিতকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উহার প্রত্যেকটি বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সাধিত করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

শিক্ষা যে সকল সময়েই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ইহা সত্য, কারণ মানুষ ও পশুর মধ্যে যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ মানুষের শিক্ষা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সু-শিক্ষা যেমন মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, সেইরূপ আবার কু-শিক্ষা মানুষকে পশু করিয়া তুলিতে পারে। মানুষ সুশিক্ষিত হইলে যেরূপ পৃথিবীর মত ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীল হইতে পারে, সেইরূপ আবার কু-শিক্ষিত হইলে পশুর মত প্রতিহিংসাপরায়ণ হই[illegible] যুদ্ধে মত্ত হইতে পারে। সু-শিক্ষার ফলে যে পুরুষ নিজ প্রাণ-বিনিময়ে মাতা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী ও কন্যাবোধে স্ত্রীজাতির শ্লীলতা রক্ষা করিয়া থাকে এবং স্ত্রীজাতিকে জীবিকার জন্য উপার্জ্জনোদ্যত দেখিলে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকে, কু-শিক্ষার ফলে সেই পুরুষ সেই

গোজাতিকে বিলাসের উপকরণের মত, অথবা পণ্যদ্রব্যের মত ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান জগতে যত তথাকথিত শিক্ষার বিস্তৃতি সাধিত হইতেছে, ততই প্রত্যেক দেশে মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অন্নাভাব, অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু ও স্ত্রীলোকের শ্রীলতার অরক্ষাদি বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন বর্ত্তমান জগতে যাহা শিক্ষা বলিয়া আখ্যাত হইতেছে, তাহা যে প্রকৃত সু-শিক্ষা নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ কু-শিক্ষা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সু-শিক্ষা কি, তাহা স্থির না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নামে যাহাই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, তাহাতে যে সুফল অপেক্ষা কুফল বৃদ্ধি পাইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করা যাইতে পারে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা শ্রমজীবিসন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প-শিক্ষিত হইয়া 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দিকে নজর করিলেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি যে যে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই দেশে জনসাধারণ কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

ইহা সত্য বটে যে, মনুষ্যসমাজে এমন একদিন ছিল, যখন কতিপয়াংশ কেবলমাত্র কুটীরশিল্পের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং সেই হিসাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে,ভারতবর্ষে যে-তাঁতী, জোলা, যুগী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি একদিন কুটীরশিল্পের দ্বারা বারমাসে তেরপার্ব্বণের আনন্দ-কোলাহলে মত্ত থাকিতে পারিত, সেই তাঁতী, সেই জোলা, সেই যুগী, সেই কুম্ভকার, সেই কর্ম্মকার ও সেই স্বর্ণকারের সন্তানগণ এখন ... অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়াইতে বাধ্য হইতেছে। বারমাসে তেরপার্ব্বণের আনন্দ-কোলাহলে মত্ত হওয়া ত' দূরের কথা, এখন যদি তাহারা তাহাদের নিজ নিজ কুটীর-শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ পরিবারের দুই বেলা দুই মুঠো শাকান্নের সংস্থান পর্য্যন্ত করিয়া উঠা সম্ভব হয় না। একদিন যে কুটীর-শিল্প করিয়া বারমাসে তেরপার্ব্বণের আনন্দ-কোলাহলে মত্ত থাকা সম্ভব হইত, সেই কুটীর-শিল্পের দ্বারা এখন আর শাকান্নের পর্য্যন্ত সংস্থান করা সম্ভব হয় না কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যখন তাঁতী, জোলা, কুম্ভকার ও কর্ম্মকার প্রভৃতি কুটীর-শিল্পিগণ স্ব স্ব কুটীর-শিল্পের দ্বারা বারমাসে তেরপার্ব্বণের আনন্দ-কোলাহল উপভোগ করিতে পারিত, তখন ঐ কুটীর-শিল্পিগণ তাহাদের জীবিকার জন্য স্ব স্ব কুটীর-শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাহাদের প্রত্যেকের বারমাসের জীবিকা নির্ব্বাহ করা হইত পাঁচ মাসের কৃষিকার্য্যের দ্বারা। তখন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে অধিক ছিল বলিয়া প্রত্যেকের পক্ষে কৃষিকার্য্য অত্যন্ত সহজ হইয়াছিল, প্রত্যেকে বৎসরের মধ্যে ৩।৪ মাসের পরিশ্রমের দ্বারা সারা বৎসরের খাদ্যাদির সংস্থান করিতে পারিত এবং বাকী সময় নিজ নিজ কুটীরশিল্পে মনোযোগী হইয়া অতি সুলভে সমাজের সকল স্তরের মানুষের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করিতে পারিত। তখন কুটীর-শিল্পিগণের পক্ষে তাহাদের স্ব স্ব পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ঐ কুটীর-শিল্পের প্রতি নির্ভরশীল হইতে হইত না বলিয়া কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য এত সুলভে বিক্রয় করা সম্ভব হইত যে, কুটীর-শিল্পের সহিত যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দেশের মধ্যে কুটীর-শিল্পের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সাধিত হইলে দেশের জনসাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং যাহাতে দ্রব্যমূল্যের সমতা (parity) সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা না হইবে, কোনরূপ লাভজনক (profitable) কুটীরশিল্পের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা ততদিন সম্ভব হইবে না। গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের যে সমস্ত ধুরন্ধর এই সম্বন্ধে গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেই দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাঁহাদের চিন্তা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, উহা প্রায়শঃ ভিত্তিহীন এবং অসংলগ্ন। দেশে এখনও যাঁহারা কুটীরশিল্প

অথবা কোনরূপ যন্ত্রশিল্পের চাকরীর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সারাজীবন কিরূপ অস্বাস্থ্য, অশান্তি এবং অর্থাভাবে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেও আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অধিকাংশ পল্লীগ্রামে যাতায়াতে যেরূপ অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার দিকে নজর করিলে মনে হইবে বটে যে, মোটর-রাস্তার বিস্তৃতি সাধিত হইলে এই অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে এবং তাহাতে পল্লীগ্রামজাত পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়েও সুবিধা অল্পাধিক হইতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত পল্লীগ্রামের অতি সন্নিকটে রেলরাস্তা অথবা আধুনিক মোটরকার-যাতায়াতের যোগ্য আসফাল্টের রাস্তার বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পল্লীগ্রামের দিকে লক্ষ্য করিলে প্রায়শঃ দেখা যাইবে যে, একদিকে ঐ সমস্ত পল্লীগ্রামের জমীর উর্ব্বরাশক্তি যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে, সেইরূপ আবার ঐ ঐ স্থানে নানারকমের অস্বাস্থ্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন ঐরূপ হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ঐ রেলরাস্তা এবং আসফাল্টের মোটর-রাস্তাই উপরোক্ত জলবায়ুর অস্বাস্থ্য এবং জমীর অনুর্ব্বরতার প্রধান কারণ। অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, যে-সমস্ত পল্লীগ্রামে আজকাল যাতায়াতে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিয়াছে, চিরদিন প্রায়শঃ ঐ অসুবিধা বিদ্যমান ছিল না। পাঁচশত বৎসর আগেও ঐ সমস্ত পল্লীগ্রামের অধিকাংশ স্থলেই জলপথে যাতায়াত করা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল এবং তখন একদিকে যেরূপ জমীর উর্ব্বরাশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল, সেইরূপ আবার জলবায়ুও অপেক্ষাকৃত অনেক স্বাস্থ্যকর ছিল।

এইরূপ ভাবে দেখিলে যেমন দেখা যাইতেছে যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (compulsory primary education), অথবা কুটীরশিল্প (cottage industry), অথবা রাজপথের বিস্তৃতি (road development) মানুষের মনোরম হইলেও উহা প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক, সেইরূপ আবার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিস্তৃতি অথবা বৈজ্ঞানিক জলসরবরাহ অথবা জমীর করহ্রাস, অথবা কৃষিকার্য্যে জমীর পরিমাণের বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে উল্লাসকর হইলেও উহাও পরিশেষে জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে আশঙ্কা করা যাইতে পারে। আমাদের এই কথা যে যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে আবার আমরা আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিব।

বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোনটির সাহায্যেই যে কোন রোগ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায় না, পরন্তু জীবনের প্রারম্ভ হইতেই যে প্রত্যেক মানুষ অল্পাধিক পরিমাণে ব্যাধিযন্ত্রণায় অধীর হইতে বাধ্য হয়, ইহা বাস্তব সত্য। যতদিন পর্য্যন্ত গবেষণার দ্বারা প্রকৃত শরীরগঠনতত্ত্ব, শরীরবিধানতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং চিকিৎসাতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের বৃদ্ধির দ্বারা রোরুদ্যমান শিশুদিগকে সান্ত্বনা দিবার কার্য্যের মত একটা কিছু সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত কোন হিত সাধিত হইবে না।

যাহাতে পুষ্করিণী ও খাল প্রভৃতিতে বারমাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইয়া যদি কতকগুলি নলকূপের সৃষ্টির দ্বারা জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করা হয়, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে ঐ জলকষ্ট কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিবারিত হইবে বটে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, নলকূপ-প্রবাহিত জলের দ্বারা মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সাধিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। মানুষের যত কিছু পানীয় আছে, তন্মধ্যে যে-জল সূর্য্যের উত্তাপের দ্বারা এবং বিশুদ্ধ বায়ু-শোধনের দ্বারা সর্ব্বদা পরিশোধিত হইয়া থাকে, সেই জল সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। বর্ত্তমান সময়ে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত সামান্য (common to every one and everywhere) সত্যটুকু বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া জগতে সর্ব্বত্র মানুষ হৃত-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা মানুষ যতরকমের অস্বাস্থ্যে ভুগিতেছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাহার অধিকাংশেরই মূল কারণ বিশুদ্ধ বায়ুর ও বিশুদ্ধ জলের অভাব। নলকূপের বিস্তৃতির দ্বারা ঐ অভাবের পূরণ করা সম্ভব হইতে পারে না।

কৃষিকে লাভবান্ করিবার জন্য জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, মুখ্যতঃ তাহার ব্যবস্থা

না কাঁদে। বর্ত্তমান অবস্থায় আর যাহাই কিছু করা হউক না কেন, তাহাতে অবোধ শিশুদিগকে সান্ত্বনা দিবার কার্য্য সাময়িক ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষিকে সম্যক্ ভাবে লাভবান করা সম্ভব হইবে না এবং কৃষকগণের বুভুক্ষার জ্বালাও স্থায়ী-ভাবে নির্ব্বাপিত হইবে না।

মন্ত্রিমণ্ডলকে আমরা এখনও সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে বলি।

কোন্ কোন্ সংগঠনের কার্য্যে অগ্রসর হইলে দেশের ও দশের সমস্যাসমূহ স্থায়ী-ভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। মন্ত্রিমণ্ডলকে আমরা ঐ প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে অনুরোধ করি।

অনেকে মনে করেন যে, দেশের ও দশের সমস্যাসমূহের পূরণ করা একাধিক উপায়ে সম্ভবযোগ্য। কিন্তু তাহা সত্য নহে। যাঁহারা বেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্ম কাহাকে বলে, কোন্ অবস্থায় কোন্ কার্য্য প্রকৃতিসম্মত, অথবা সহজ, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এক একটি অবস্থায় এক একটি সমস্যা সম্যক্ ভাবে পূরণ করিবার এক একটি মাত্র উপায়ই বিদ্যমান থাকে। দেশের ও দশের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের পূরণ সম্যক্ ভাবে কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা উপরোক্ত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্য কোন উপায়ে যে কোন দেশের ও দশের আধুনিক সমস্যাগুলি সম্যক্ ভাবে পূরণ করা সম্ভব নহে, তাহা অনেকেই হয়ত বর্ত্তমানে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের মধ্যে যে বুভুক্ষানল গত ত্রিশ বৎসর ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অদূরভবিষ্যতে যাহাতে নির্ব্বাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাহা যেরূপ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে অনেকেরই দগ্ধ হইবার আশঙ্কা আছে।

ঐ ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই নদীতে জল এবং তাহার পরে চাই বিনিময়ের সুব্যবস্থা। দেশের সর্ব্বত্র নদীতে যাহাতে বারমাস জল থাকে, অথবা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যের যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তাহা করিতে হইলে, ভারতবর্ষে যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতীয় এবং ব্রিটিশগণের মিলিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

যতদিন দেশের মধ্যে ঐ প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দেশে প্রকৃত হিতকর কোন সংগঠনের কার্য্য করা সম্ভব হইবে না।

যদি কাহারও কাল-প্রকৃতি এবং দেশ-প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবার চক্ষু ও মস্তিষ্ক বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষে যাহাতে উপরোক্ত প্রকৃত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা বর্ত্তমানে প্রকৃতিদেবীর ঈপ্সিত। কিন্তু তাহাতে বাধা প্রদান করিতেছেন বিকৃতির রাজা গান্ধী মহারাজ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ।

দেশের হিতকর কোন সংগঠনের কার্য্য করা যদি প্রকৃত পক্ষে কোন প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের ঈপ্সিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় কংগ্রেস যাহাতে গান্ধী মহারাজের প্রভুত্ব হইতে রক্ষা পায় এবং উহা যাহাতে শৃঙ্খলিত ভাবে সংগঠিত হইয়া অপেক্ষাকৃত যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের করায়ত্ত হয়, তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রাদেশিক গভর্ণরগণের সহায়তায় চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা আর কতদিন তাণ্ডব-নৃত্যে মাতিয়া থাকিব?

কলের ধর্ম্মঘট ও মিঃ শরৎ সি বসু

গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে পাটকলের ধর্ম্মঘটীদিগের সাহায্যকল্পে এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন মিঃ শরৎ সি. বসু।

মিঃ শরৎ সি. বসু যে বাঙ্গালাদেশের অন্যতম বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

ধর্ম্মঘটীদিগের দাবী কি কি, তৎসম্বন্ধে মিঃ বসু তাঁহার

শ্রোতৃবর্গকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) পাটকলের শ্রমজীবী-সঙ্ঘকে (Jute Workers Union) মানিয়া লইতে হইবে।

(২) শ্রমজীবীদিগের চাকুরীকে স্থায়ী করিতে হইবে (Permanency of Tenure)।

(৩) ১৯৩১ সাল হইতে পারিশ্রমিকের যে যে স্থলে হ্রাস করা হইয়াছে, তাহা পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

(৪) শ্রমিকদিগের বাসের ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(৫) নারী-শ্রমিকগণ যাহাতে প্রসবের সময় পূর্ণবেতনে ছুটী প্রভৃতি পাইতে পারে (Maternity Benefits), তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) শ্রমিকগণ যাহাতে বৃদ্ধ বয়সে পেনসন পাইতে পারে (Old Age Pension) তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া মিঃ বসু আরও বলিয়াছেন যে, "no victimization" এবং "uniform wages"-এর দাবী ও শ্রমিকগণ উপস্থাপিত করিয়াছে—এই দুইটি শব্দে যে মিঃ বসু কিসের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সঠিকভাবে বুঝিতে পারি নাই।

মিঃ বসুর মতে শ্রমিকদিগের উপরোক্ত দাবীসমূহের মধ্যে কোনটিই অসঙ্গত নহে, অথচ উহার প্রত্যেক দাবীটি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রমিকগণের উপরোক্ত প্রত্যেক দাবীটি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু কলের অংশীদারগণ প্রতি বৎসরই যথেষ্ট পরিমাণে লভ্যাংশ লাভ করিয়া আসিতেছেন।

উপসংহারে মিঃ বসু বলিয়াছেন যে, যদিও বর্ত্তমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করা হইয়াছে এবং দেশ নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণের দ্বারা শাসিত হইতেছে বলিয়া শুনা যায় বটে, কিন্তু কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ পূর্ব্বাপেক্ষাও খারাপ হইয়াছেন এবং ঐ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নীতি পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের দিকে দৃক্‌পাত করিলে উহা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত হইলেও উহা যে কোন পক্ষে প্রাচীন ব্যুরোক্রেসী অপেক্ষা শ্রেয়ঃ নহে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কলের ধর্ম্মঘট ব্যাপারে শুধু যে মিঃ শরৎ সি. বসুই কলের কর্ত্তৃপক্ষ, গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি তীব্র বিদ্বেষানল প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং তাঁহার অনুগামীবৃন্দও তৎসদৃশ অথবা তদপেক্ষা তীব্রতর ভাষায় ঐ বিদ্বেষানল জাগরিত করিতেছেন।

আমাদের মতে মিঃ শরৎ সি. বসু ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যে সত্যানুসন্ধান না করিয়া দেশের শ্রেণীবিশেষের উপর দায়িত্বের আরোপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং তাহার ফলে তাঁহাদের দ্বারা যে সত্যের অপলাপ ঘটিয়া থাকে, পাটকলের ধর্ম্মঘট-সম্বন্ধীয় তাঁহাদের উক্তি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উহা আরও একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা এতাদৃশ ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন অসত্য উক্তির প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং তাঁহারা যে এতাদৃশ অবিশ্বাসভাজন হইয়া পড়েন, তাহার মূল কোথায়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কোন্ কারণে জনসাধারণের কীদৃশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, তদ্বিষয়ক কাণ্ডজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাববশতঃই উহা ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষগুলির স্কন্ধে কংগ্রেসের পরিচালনার ভার অর্পিত হওয়ায় ভারতবর্ষে যে-কংগ্রেস না হইলে বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; অথবা এক কথায় ভাবিতে গেলে যে-কংগ্রেসের দ্বারা অশেষবিধ ভাবে সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণ সম্পাদিত হওয়া সম্ভব, সেই কংগ্রেসের দ্বারা গত আঠার বৎসর হইতে, অথবা তাণ্ডব নৃত্যের নেতা গান্ধীজীর নেতৃত্ব-কাল হইতে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক পরিবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিপন্ন হইয়া ভারতে জাতীয়তা-গঠনের আশা সুদূরপরাহত

করিয়া তুলিতেছে এবং দেশের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের সিদ্ধান্ত যে যথার্থ তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ, মিঃ শরৎ সি. বসু এণ্ড কোম্পানী যে সত্যানুসন্ধান না করিয়া দেশের শ্রেণীবিশেষের উপর দায়িত্বের আরোপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, মিঃ শরৎ সি. বসু তাঁহার বক্তৃতায় এমন কোন ঘটনার (facts) প্রচার করিয়াছেন, যাহা প্রায়শঃ ভিত্তিহীন (baseless), অথবা তিনি এমন কোন সম্প্রদায়বিশেষের উপর কলের ধর্ম্মঘটের দায়িত্ব আরোপিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে ন্যায়তঃ উহার জন্য দায়ী করা যায় না, তাহা হইলে মিঃ শরৎ সি. বসু এবং তাঁহার জয়ঢাকবৃন্দ যে জনসাধারণের অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

মিঃ শরৎ সি. বসু তাঁহার বক্তৃতায় শ্রমিকবৃন্দের দাবী সম্বন্ধে যাহা যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, শ্রমিকবৃন্দের ঐ সমস্ত দাবী কলের কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা পরিরক্ষিত হয় নাই বলিয়াই যে, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে ইহা বুঝিতে হয়, অর্থাৎ ইহা বুঝিতে হয় যে, শ্রমিকবৃন্দ প্রথমতঃ কতকগুলি দাবী তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দাবীসমূহের সন্তোষজনক কোন উত্তর দেন নাই বলিয়াই ধর্ম্মঘটকারিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

যাঁহারা খুনী আসামীকে আদালতে বক্তৃতার দ্বারা নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের বক্তৃতায় কখন কখন চোরকে সাধু এবং সাধুকে চোর বলিয়া মনে করিবার কারণ উপস্থিত হয়, তাঁহারা হয়ত "হয়কে নয় এবং নয়কে হয়" প্রতিপন্ন করিবার অমানুষোচিত কৃতিত্বের দ্বারা ধর্ম্মঘট-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইলেও হইতে পারেন বটে, কিন্তু কোন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বাস্তব ঘটনার সন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, অধিকাংশ কলেই ধর্ম্মঘটকারিগণ প্রায়শঃ কোন দাবী-দাওয়া তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উপস্থাপিত করে নাই এবং ২।১টি কলে সামান্য ২।১টি দাবী-দাওয়া যাহা উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহাও প্রায়শঃ সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসিত হইয়াছিল।

কি করিয়া ধর্ম্মঘটের সূচনা উপস্থিত হয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ স্থলেই কতকগুলি কল্পনাপ্রবণ কুচক্রী মানুষ শ্রমিকদিগকে লোভ দেখাইয়া থাকে বলিয়াই ধর্ম্মঘটের সূচনা হয়। "তোরা ধর্ম্মঘট কর, তাহা হইলে আমরা তোদের 'সপ্তাহ' (weekly wages) বাড়াইয়া দিব"—ইহাই সাধারণতঃ শ্রমিকদিগের প্রতি ঐ কুচক্রী মানুষগণের প্রথম বুলি হইয়া থাকে। কোন একটি কলে যখন এইরূপে ধর্ম্মঘটের প্রথম সূচনা উপস্থিত হয়, তখন ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা, অর্থাৎ "আমরা ধর্ম্মঘট করিয়া না খাইয়া মরিতেছি, তোরা হয় আমাদের সাথে যোগ দে, নতুবা আমরা তোদের পরিবারবর্গকে প্রহার করিব"—এবংবিধ প্রচারের দ্বারা ঐ ধর্ম্মঘটের বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে কুচক্রী মানুষগণ ধর্ম্মঘটের সূচনা ও বিস্তৃতি সাধন করিয়া যেমন একদিকে নিরীহ শ্রমিকবৃন্দের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার অন্য দিকে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান অধুনা মানুষের জীবিকার জন্য সর্ব্বপ্রধান কাম্যবস্তু হইয়া পড়িয়াছে, দেশীয় সেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে। শ্রমিকবৃন্দের কোন দাবী-দাওয়ার অপূরণের জন্য কোন ধর্ম্মঘটের সূচনা ও বিস্তৃতি হয় কি না, তাহা একদিকে যেরূপ আমাদের উপরোক্ত উক্তির সত্যতা অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, সেইরূপ আবার মিঃ বসু যে সমস্ত বিষয়ের দাবী-দাওয়ার অপূরণের কথা বলিয়াছেন, সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কোন কলে কোন অসন্তোষজনক ব্যবস্থা আছে কি না, তাহার সন্ধান করিলেও ধর্ম্মঘটের মূলে কোন দাবী-দাওয়ার অপূরণ বিদ্যমান আছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কোন কলে ঐ ঐ বিষয়ে কোনরূপ অসন্তোষজনক ব্যবস্থা আদৌ বিদ্যমান নাই, ইহা বলা যায় না বটে, কিন্তু যে সমস্ত কলে ধর্ম্মঘট হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কলেই যে, যেমন একদিকে অংশীদারগণের লাভের দিকে লক্ষ্য করা হয়, সেইরূপ আবার শ্রমজীবিগণের সুখ-সুবিধার দিকেও যে যথাসম্ভব লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা অন্যান্য

বিভাগের শ্রমজীবিগণের তুলনায় কলের শ্রমিকগণের বেতনের হার, চাকুরীর স্থায়িত্ব, বাসের ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। যদি দেখা যায় যে, যে-শ্রমজীবী অন্য কোন স্থলে কার্য্য করিয়া দৈনিক চারি আনা, অথবা ছয় আনা মাত্র উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, সেই শ্রমজীবী কোন কলে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দৈনিক বার আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে কলের শ্রমিকগণের বেতনের হার যে অপেক্ষাকৃত কম নহে, তাহা ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে হয় না কি? সেইরূপ আবার যদি দেখা যায় যে, অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকবৃন্দ যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের অনেকেরই পক্ষে কোন ঘরভাড়া করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বসবাস করা সম্ভব হয় না, পরন্তু এমন কি ফুটপাথের উপর রাত্রিযাপন করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, আর কলের শ্রমিকবৃন্দ অনেক স্থলে এমন কি দ্বিতল পাকাগৃহে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্র লইয়া বসবাস করিতে পারে,তাহা হইলে অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকগণের তুলনায় কলের শ্রমিকগণ যে অপেক্ষাকৃত সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মিঃ শরৎ সি. বসু তাঁহার বক্তৃতায় শ্রমজীবিগণের দাবী ও অবস্থা সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা প্রায়শঃ ভিত্তিহীন এবং তিনি যে কলের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও প্রায়শঃ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত নহে।

এইরূপ ভাবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মঘট অবসান না হওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলের স্কন্ধেও ঔদাসীন্যের অথবা শঠতার দায়িত্ব আরোপ করা যায় না। যদি দেখা যাইত যে, একমাত্র বাঙ্গালাদেশে এবং ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘটের তীব্রতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং উহা জগতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না, তাহা হইলে আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলের ঐ জাতীয় একটা দায়িত্ব আরোপ করিবার যুক্তি থাকিলেও থাকিতে পারিত বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যখন দেখা যায় যে, ধর্ম্মঘটের হৈ-চৈ শুধু বাঙ্গালাদেশ, অথবা ভারতবর্ষকেই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে তাহা নহে, উহা জগতের প্রত্যেক দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অল্লাধিক অস্বস্তিগ্রস্ত করিতে পারিয়াছে, তখন উহার অনবসানের জন্য কেবলমাত্র আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলকেই যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যায় না, তাহা খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যারিষ্টার মিঃ বসু স্বীকার না করিলেও করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের যুক্তিযুক্ততার উপর কোন শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের জীবিকার্জ্জনের জন্য আধুনিক জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় (under the present condition of the economical world) একান্ত প্রয়োজনীয়, যাহার চাকুরী অর্থ-লাভ (monetary gains) হিসাবে বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যান্য বিভাগের চাকুরীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী লোভনীয়, সেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপন্ন করিয়া তোলা, আর যে ডালে দাঁ থাকা যায়, তাহা কাটিয়া ফেলা একই কথা।

ধর্ম্মঘটের মুল কারণ

মানুষ কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এতাদৃশ ভাবে নিজের পায়ে কুড়ালি মারিতে উদ্যত হয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব। মনুষ্যসমাজে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা লাভ করিয়া সমস্ত কাজ ও বিষয় যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবিদ্যমানতা বশতঃ মানুষ প্রায়শঃ অল্পবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে এবং এই অল্পবুদ্ধি বশতঃই মানুষের মধ্যে অযথা গর্ব্বের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করিবার ফলে মানুষকে এম-এ (M. A.) প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয় বটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলে মানুষ 'মাষ্টার অফ অ্যারিষ্টক্রেসি,' অর্থাৎ মিঃ শরৎ সি. বসুর মত যুক্তিজ্ঞানহীন অহঙ্কারী মানুষে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত মানুষের হিত-

কারী শিল্প অথবা সংস্কৃতি কাহাকে বলে, তাহা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার কোন সুযোগ লাভ করিতে পারে না।

কাযেই মনুষ্যসমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষ যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং যাহাতে চিরদিনের জন্য ধর্ম্মঘটের ও ধর্ম্মঘটীর ক্লেশের অবসান হয়, তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে জগতের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত রত্ন দাসত্ব ও অল্পাধিক প্রতারণা বিনা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়াও অযথা নিজদিগকে নানাভাবে গর্ব্বিত করিয়া তোলেন, সেই সমস্ত রত্নকে আত্ম-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতে হইবে। ঐ আত্ম-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, শুধু মিঃ শরৎ সি. বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নহে পরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অধিকাংশ উৎপন্ন বস্তুই বৃথা অহঙ্কারের পুঁটুলি। তাঁহারা ও তাঁহাদের কুশিক্ষা ও কুসংস্কৃতি বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বপ্রধান অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপন্ন বস্তুগুলি যখন এইরূপ ভাবে আত্মপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই কোন্ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মনুষ্যজাতির প্রকৃত সমস্যার সমাধান যথাযথ ভাবে সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রকৃত প্রশ্ন উপস্থিত হইবে এবং তখন গবেষণার দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব হইবে। এইরূপ ভাবে প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় মানুষের জীবিকা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইলে, কিছুদিনের জন্য আধুনিক-যন্ত্রনিষ্পন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু যতদিন ঐ যন্ত্রনিষ্পন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকিবে এবং অন্য কোন উন্নত সংগঠনের উদ্ভব না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইবে না। আমাদের এই উক্তির কারণ ক্রমশই পরিস্ফুট হইবে।

বর্ত্তমান জগৎ এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, এখন আর মানুষের সর্ব্বতোভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অর্থাৎ একসঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি উপভোগ করা সম্ভব নহে। এই অবস্থার কারণ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ, দেশের মধ্যে অথবা মানবসমাজের মধ্যে এমন কোন সংগঠন (organisation) হইতে পারে কি না, যে সংগঠনের ফলে মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষটি চেষ্টা করিলে অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাদৃশ সংগঠন (organisation) করা অসম্ভব নহে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, একদিকে যেমন দেশের মধ্যে যথোপযুক্ত সংগঠন বিদ্যমান না থাকিলে ঐ দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ আবার দেশের সংগঠন যতই যথোপযুক্ত হউক না কেন, ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ প্রযত্নশীল না হইলে কোন মানুষেরই পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব নহে।

গত ৫০।৬০ বৎসর হইতে জগতের প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এত ধর্ম্মঘট কেন আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ ধর্ম্মঘটের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর কেন এত প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা আমূলভাবে বুঝিতে হইলে, মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন্ রকম সংগঠন বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে প্রযত্নশীল হইলে সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি রকমের সংগঠন বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার আলোচনা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক (মাসিক বঙ্গশ্রী—১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৪৩ সালের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত) প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আমরা করিয়াছি।

ঐ প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, যাহাতে মনুষ্য-জাতির প্রত্যেকে সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জন করিতে, অর্থাৎ অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু দুর করিতে পারে, দেশের মধ্যে তাদৃশ

সংগঠন করিতে হইলে অনেক বিষয়ে অনেক রকমের সতর্কতা ও প্রধানতঃ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার প্রয়োজন। ঐ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান, অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করে এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই তীর প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিস এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচা ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৭) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প-বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা।

কোন দেশে উপরোক্ত প্রথম তিনটি ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে ঐ দেশে কোন খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের অভাব থাকা তো দূরের কথা, উহা প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইতে পারে। দেশের নদীগুলি যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে ঐ দেশস্থ খাল ও পুষ্করিণীসমূহের পক্ষেও সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকা সম্ভব হয় এবং তখন ঐ দেশে যেমন কোন জলকষ্ট থাকা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার দেশের মধ্যে সর্ব্বদা জলের বাষ্পকণিকাপূর্ণ হাওয়া প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয়। তখন বৈদ্যুতিক পাখা ব্যতীত সুশীতল ও স্নিগ্ধ বায়ু উপভোগ করা সম্ভব হয় এবং হাওয়াগাড়ী ও রেলগাড়ী না থাকিলেও জলপথে দেশের সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে যাতায়াত করা সম্ভব হয়।

দেশের নদীগুলি যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলেই এইরূপে একদিকে যেরূপ প্রচুর শস্যোৎপাদনের দ্বারা মানুষের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হয়, সেইরূপ আবার দেশের অস্বাস্থ্য ও অতৃপ্তি বহু পরিমাণে দূর করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া তলাইয়া চিন্তা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যাহাতে নদীগুলি সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি স্বতঃই বৃদ্ধি পায় এবং তখন মানুষের পক্ষে বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস মাত্র পরিশ্রম করিলেই একমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারা স্ব স্ব পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। তখন যদি মানুষ বৎসরের বাকী ৭।৮ মাস কুটীর-শিল্পের কার্য্যে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে কোন যন্ত্রজাত-শিল্পের পক্ষে কুটীরজাত-শিল্পের প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব নহে।

উপরোক্ত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইলে দেশের মধ্যে একদিকে যেরূপ ধনের অসমান বিতরণ (irregular distribution) স্থগিত হইতে পারে, অন্যদিকে সেইরূপ উপযুক্ততানুসারে, অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমশীলতার তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তাহার নিয়ম সম্পাদিত হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাতে ধনের অসমান বিতরণ (irregular distribution of wealth) স্থগিত হয়,

তাহা করিতে পারিলে, কাহারও পক্ষে প্রকৃত বিদ্যা ও বুদ্ধি উপার্জ্জন না করিয়া এবং পরিশ্রমশীল না হইয়া ধনবান্ হওয়া সম্ভব হয় না। তখন প্রকৃত বিদ্যা ও বুদ্ধি উপার্জ্জন করিয়া এবং পরিশ্রমশীল হইয়া নির্ধন থাকা সম্ভব হয় না, তখন নির্ধনতার জন্য অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকিতে পারে না এবং তখন আপনা হইতেই মানুষ প্রকৃত বিদ্যা ও বুদ্ধি উপার্জ্জন করিবার জন্য ও পরিশ্রমশীল হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া পড়ে।

জগতের প্রত্যেক দেশের অবস্থা মানসনেত্রে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একদিন জগতের প্রত্যেক দেশের সংগঠন উপরোক্তভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। জগতের প্রত্যেক দেশের নদী, খাল ও পুষ্করিণী তখন বারমাস জলে ভরপূর থাকিত এবং তখন প্রত্যেক দেশের জমি সরস (অথবা সরেস) হইয়া ধরিত্রীর কার্য্য সম্পাদিত করিত। তাই তার বুকের ধনগুলি জীবিকার জন্য অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া, কোনরূপ দ্বেষ, হিংসা অথবা বিজয়ের স্পৃহা পোষণ না করিয়া পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যভাব পোষণ করিতে পারিত।

যদি মানুষ আবার কখনও স্ফোট-বিদ্যা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রকৃত সংস্কৃত, অথবা প্রকৃত হিব্রু, অথবা প্রকৃত আরবী ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উপরোক্ত সংগঠনের পরিকল্পনা এই লেখকের মত অল্পবুদ্ধি ও উত্তেজনাশীল মানুষের মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সংগঠনে মানুষ সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জনশীল হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে, তাহার কথা যেমন সংস্কৃত ভাষায় বেদে পরিলক্ষিত হইবে, সেইরূপ আবার উহা যে হিব্রু ভাষায় বাইবেলে এবং আরবী ভাষায় কোরাণে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইবে।

স্ফোট-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া মূল বেদ, বাইবেল ও কোরাণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঋষিপ্রণীত ও অপরাপর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এক-দিন জগতের প্রত্যেক দেশে জমী স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অনেক পরিমাণে উর্ব্বর ছিল এবং তখন মানবসমাজের অধিকাংশ মানুষই কৃষিকে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তখন তাহারা প্রায়শঃ কৃষিকে উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া যে, শিল্প-কার্য্য অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে। পরন্তু রেশম, পশম ও তুলাজাত বস্ত্রশিল্প, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু-শিল্প ও অন্যান্য যে কোন শিল্পের কথাই ধরা যাক না কেন, তখন উহার প্রত্যেকটি বর্ত্তমান কালের তুলনায় সহস্রগুণে সূক্ষ্মাকারে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছিল। বেতার, বিদ্যুৎ ও বাষ্প প্রভৃতি বর্ত্তমান তথাকথিত বিজ্ঞানের যে সমস্ত পরিকল্পনা দেখিয়া মানুষ এখন মুগ্ধ হইয়া থাকে, উহা যে তখনকার মানুষ জানিত না, তাহা মনে করা যায় না। পরন্তু উহা যে অনেক প্রকৃষ্টতর ভাবে তখনকার মানুষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিল, এখনকার মানুষ যেমন বিদ্যুৎ ও বাষ্প-সম্বন্ধীয় যানের পোনের আনা কথাই না জানিয়া গর্ব্বস্ফীত হইয়া পড়িয়াছে, তখনকার মানুষ যে তেমন ছিল না, পরন্তু এই সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই, অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া উহার প্রত্যেকটির উপকারিতা ও অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল, এবং কোন্‌টি বর্জ্জনীয় ও কোন্‌টি ব্যবহার্য্য হওয়া উচিত, তাহা বাহির করিতে পারিয়াছিল ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ এই ঋষিপ্রণীত গ্রন্থসমূহের ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাসমূহের কোন্‌টি গ্রহণীয় ও কোন্‌টি বর্জ্জনীয়, তাহা যথাযথভাবে তখনকার মানুষ স্থির করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই তখনকার মানুষ কোথায়ও বা চক্ষুরত্ন নষ্ট করিয়া, কোথায়ও বা জীবনী শক্তিকে তিল তিল ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া আপাতমনোহারী যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ ও নর্ত্তন-কুর্দ্দনে প্রমত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত আমোদ-প্রমোদের বস্তু ও ব্যবহারকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জিত করিয়াছিল।

বিদ্যুৎ ও বাষ্প-পরিচালিত আধুনিক জল-যান, স্থল-যান ও আকাশ-যানগুলি দেখিয়া আপাতভাবে মুগ্ধ হইবার অনেক কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি জমীর

স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির ও মানুষের স্বাস্থ্যের অপহারক। ঋষিপ্রণীত মূল গ্রন্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কত রকমের জল-যান, কত রকমের স্থল-যান, কত রকমের আকাশ-যান প্রচলিত হইতে পারে, উহার কোন্‌টি কি রকমের ইষ্টানিষ্টসাধক—এবংবিধ আলোচনা তন্মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালের যানসমূহ যে মানুষের স্বাস্থ্যের অল্পাধিক অনিষ্টসাধক, তাহাও দেখান হইয়াছে। ঐ আলোচনাসমূহ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বলিতে হইবে যে, এখনকার কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাই তখনকার মানুষের অপরিজ্ঞাত ছিল না বটে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও মানুষের স্বাস্থ্যের অপহারক বলিয়া ঐ ব্যবহারসমূহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

এখনকার তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিয়া থাকেন বটে যে, জগতের বিভিন্ন মানুষগুলি যে পরস্পরের সহিত বাণিজ্যের আদান-প্রদান করিতে, অথবা বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করিতে পারে, তাহা তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন যানসমূহ বশতঃ সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, যখন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন যান আবিষ্কৃত হয় নাই, তখনও এমন একদিন ছিল, যখন জগতের সর্ব্বত্র পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান হইত এবং প্রায়শঃ কোন সমুদ্রগামী যানের সহায়তা না লইয়া একমাত্র নদীপথে অতি দ্রুতগতিতে ভুবনের সর্ব্বত্র সপ্তাহের মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব হইত। তখন মানুষের পরিজ্ঞাত ভুবনের পরিধি যত বিস্তৃত ছিল, অদ্যাপি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ঐ পরিধি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

তখন জগতের সর্ব্বত্রই কুটীর-শিল্প প্রচলিত ছিল এবং কুত্রাপি যন্ত্র-শিল্প বিদ্যমান ছিল না। তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, লাভজনক কৃষি সহজসাধ্য হইলে এক-দিকে যেরূপ যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে কুটীর-শিল্পের সহিত প্রতি-যোগিতায় দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার কুটীর-শিল্পে মানুষের স্বাস্থ্য যেরূপ অটুট থাকে, যন্ত্র-শিল্পে মানুষের স্বাস্থ্য তাদৃশ অটুট রাখা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে যে দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার কথা
প্রধানতঃ তাহার প্রবর্ত্তন দ্বারাই তখনকার মানুষ মনুষ্যজাতির এতাদৃশ উন্নতি সম্ভবযোগ্য করিতে পারিয়াছিল।

কালক্রমে সমৃদ্ধির শীর্ষদেশে আরূঢ় হইয়া মানুষ সমৃদ্ধির উপভোগে মত্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষের ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। দেশের সর্ব্বত্র নদীগুলি যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা যে সর্ব্বত্র একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়া পড়ে। জগতের এই কাল প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। তখন হইতে মানুষ আর জগতের কুত্রাপি নদীগুলির সংস্কার সাধন করে নাই এবং তদবধি জগতের প্রত্যেক দেশের নদীগুলি শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। এইরূপে গত সাত হাজার বৎসর হইতে জমীর উর্ব্বরাশক্তি জগতের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং অধুনা জমীকে আর ভাষাজ্ঞানানুসারে ধরিত্রী বলা চলে না। সন্তানগণের দুষ্কৃতির ফলে মা শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন এবং যে পীযূষধারা সন্তানগণকে স্বভাবতঃ রক্ষা করিয়া থাকে, সেই পীযূষধারা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতিদেবী মানুষকে সর্ব্বত্র বাঁচাইতে চাহেন, তাই অর্থের সম্পূর্ণ স্বচ্ছলতা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং মনের পূর্ণ শান্তি লইয়া সর্ব্বতোভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা এখন অসাধ্য হইয়া পড়িলেও কি করিলে আংশিকভাবে অর্থা-ভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি দূর হইতে পারে, তাহার উপায়সমূহ মানুষের মনে মধ্যযুগে উদ্ভাসিত হইয়াছে। মানুষের বিদ্যা ও বুদ্ধি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রারম্ভের যুগে মানুষ যে বিজ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা যে পূর্ণ বিজ্ঞান নহে এবং উহা যে মন্দের ভাল, তাহা মানুষ বুঝিতে পারে নাই। উহা মানুষ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই পরবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে এবং মনুষ্যসমাজে বিজ্ঞানের নামে বিবিধ রকমের উচ্ছৃঙ্খলতাসমূহ স্থান লাভ করিয়া মানুষকে সর্ব্বনাশের পথে প্রধাবিত করিতেছে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা সোজা কথায় বলিলে বলিতে হয় যে, জগতের সর্ব্বত্র নদীগুলি মজিয়া গিয়াছে বলিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং এখন আর কৃষিকে কৃষকের পক্ষে লাভবান্ করা সম্ভব নহে এবং সর্ব্বত্রই খাদ্য-শস্যের ও কাঁচামালের অভাব দেখা দিয়াছে।

মনুষ্যসমাজে একদিন ছিল, যখন নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল। তখন একে তো কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপত্তি প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইত, তাহার উপর আবার উহাদের পরস্পরের বিনিময় নামমাত্র কড়ির মূল্যে সাধিত হইত বলিয়া মনুষ্যজাতির কাহারও কোন অভাবের উদ্ভব হইতে পারিত না। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রচুর পরিমাণে নামমাত্র কড়ির মূল্যে পাওয়া যাইত বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের জন্য চৌর্য্য, দস্যুতা, অথবা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

যে দিন হইতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইয়া আসিতেছে, সেই দিন হইতে খাদ্যশস্যের ও কাঁচা-মালের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দিন হইতে খাদ্যদ্রব্যের ও কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে আর মানুষের পক্ষে উহাদের পরস্পরের বিনিময় নামমাত্র কড়ির মূল্যে সম্পাদিত করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং কড়ির পরিবর্ত্তে বিনিময়ের জন্য অতর্কিত ভাবে নোট ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার উদ্ভব হইয়াছে। যে দিন হইতে কড়ির পরিবর্ত্তে বিনিময়ের জন্য নোট ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার উদ্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল দুর্ল্লভ ও মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং মানুষকে জীবিকার জন্য কখনও বা 'দেশ-বিজয়ের নামে, কখনও বা দস্যুতার নামে, কখনও বা চৌর্য্যের নামে, কখনও প্রবঞ্চনার নামে পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়িতে হইয়াছে। যে দিন হইতে উপরোক্ত দস্যুতা প্রভৃতি প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যথাযথভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি ও পরিশ্রমশীল না হইয়া মানুষের পক্ষে আংশিকভাবে ধনবান্ হওয়া সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জনশীল হওয়া, অর্থাৎ যুগপৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মান-সিক শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দিন হইতে যথাযথভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি ও পরিশ্রমশীল না হইয়াও আংশিকভাবে ধনবান্ হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতে মনুষ্যসমাজে ধনের অসমান বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন হইতে ধনের অসমান বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সোস্তালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্ প্রভৃতি 'ইজ্‌ম'খ্য অসন্তোষ-চিহ্নের উদ্ভব হইয়াছে।

যে দিন হইতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া আসিয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষিকে লাভবান্ করা কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যে দিন হইতে কৃষিকে লাভবান্ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে খাদ্য-শস্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মানুষের পক্ষে কুটীরশিল্পে যথোপযুক্তভাবে মনোযোগী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যেই দিন হইতে যে দেশে কুটীর-শিল্পে যথোপযুক্তভাবে মনোযোগী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে সেই দেশে যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

যখন জগতের সর্ব্বত্রই জমিতে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তখন কুত্রাপি যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হয় নাই এবং সর্ব্বত্রই মানুষ কুটীরশিল্পের দ্বারা নিজ নিজ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

সর্ব্বাগ্রে ইয়োরোপে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে, তাই জগতের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে ইয়োরোপীয়গণ কুটীরশিল্প পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য স্বাস্থ্যাপহারক হইলেও যন্ত্রশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিছুদিন আগেও ভারতবর্ষে জমীতে স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলিয়া ভারতবাসিগণ সেদিনও জগতের সমস্ত জাতিকে তাহার কৃষিকার্য্যের দ্বারা খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিতে পারিয়াছে এবং সে দিনও ভারতবাসী যন্ত্রশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কুটীরশিল্পের দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভাবে সরবরাহ করিতে পারিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের জমীও দ্রুতগতিতে শুষ্কতা প্রাপ্ত

হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ভারতবাসিগণও যন্ত্রশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেছে।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, এই যন্ত্রশিল্পের দ্বারা মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নহে। তথাপি, যতদিন পর্য্যন্ত যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যন্ত্রশিল্প কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপরিহার্য্য। যন্ত্রশিল্পের দ্বারা যে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা সম্ভব নহে, এবং উহা সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় যে কিছু দিনের জন্য যন্ত্রশিল্প কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপরিহার্য্য, তাহা শমজীবিগণ ও তাহাদের মস্তিষ্কহীন হিংসাপরায়ণ তথাকথিত শিক্ষিত বন্ধুগণ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র অহরহঃ এত ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হইতেছে।

ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যন্ত্র-শিল্পের কথঞ্চিৎ পরিমাণে আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা মানুষ তাহার জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হইবে না। এরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হয় না, তাহার বিরুদ্ধে সময় সময় বিদ্রোহী হইয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কাজেই যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত কুটীরশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা মানুষের জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রমিকবৃন্দের ধর্ম্মঘট প্রবৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে।

এই ধর্ম্মঘটের প্রবৃত্তি যাহাতে সময় সময় প্রকট হইয়া দেশ ও দশকে বিভীষিকাময় করিতে না পারে, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ, যাহাতে দেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ধনের অসমান বিতরণ বন্ধ হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য, সেইরূপ অন্যদিকে আবার যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করা যে সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা শ্রমিকবৃন্দ যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের মতে দেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বাগ্রে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া আর যাহাই করা যা'ক না কেন, তদ্দ্বারা জনসাধারণের অসন্তোষের বিন্দুমাত্রও হ্রাসসাধন করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। যখন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি সাধিত হইবে, তখন অনায়াসেই জনসাধারণের অসন্তোষ তিরোহিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা সময়সাপেক্ষ। কাজেই ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, ঐ কার্য্যে যে যথাযথ ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা যেমন শ্রমিকবৃন্দের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, সেইরূপ আবার কিছুদিনের জন্য তাহাদিগের পক্ষে যে যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা আংশিক পরিমাণে যাহা উপার্জ্জিত হইতেছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, তাহাও বুঝাইতে হইবে।

এই দুইটি কার্য্য রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থায় যথাযথভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ প্রয়োজন, অন্যদিকে সেইরূপ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরাজ ও ভারতীয়-নির্ব্বিশেষে বে-সরকারী জনসাধারণের ঐকান্তিকতার প্রয়োজন আছে।

নদীর সংস্কার এবং ধনের অসমান বিতরণ যাহাতে সম্পাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে যেমন গভর্ণমেণ্টের সহায়তার একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের মত দেশের মধ্যে বৃথা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তির উৎপাদন করিতেছেন, তাঁহারা উহা

যাহাতে না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলেও জনসাধারণের ঐকান্তিকতার একান্ত প্রয়োজন। কোন কার্য্য করিতে হইলে একদিকে যেরূপ সাধুত্বকে উৎসাহ দেওয়া একান্ত বিধেয়—অন্য দিকে দুষ্কৃতকে শাস্তি দেওয়াও একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গান্ধীজী-প্রমুখ দুষ্কৃতিগণের শাস্তি বিধান করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিবৃত্ত করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জনসাধারণ মিলিত হইলে উহা অতি সহজসাধ্য।

জনসাধারণ মিলিত হইলে গান্ধীজী-প্রমুখ মানুষগুলির উচ্ছৃঙ্খলতাময় কার্য্য সহজেই প্রশমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও রাজপুরুষগণ ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট না হইলে জনসাধারণের পক্ষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরাজ ও ভারতবাসী-নির্ব্বিশেষে মিলিত হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মঘটের প্রবৃত্তি যাহাতে আমূল ভাবে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং ধনের অসমান বিতরণ যাহাতে তিরোহিত হয়, তৎসদৃশ সংগঠনের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, সেইরূপ আবার গবর্ণমেণ্টের ভেদনীতির জিদ যাহাতে পরিলক্ষিত না হয়, তাহাও করিতে হইবে। এইরূপে গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ সংগঠনের কার্য্যে এবং ভেদনীতির পরিহারে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে, সেইরূপ গান্ধীজী-প্রমুখ নেতৃবর্গ যাহাতে গবর্ণমেণ্ট-বিদ্বেষ এবং ইংরাজ-বিদ্বেষ দেশের মধ্যে অথবা শ্রমিকবৃন্দের মধ্যে ছড়াইতে না পারেন, তাহাও জনসাধারণকে করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তাঁহারা সংগঠনের কার্য্যে সর্ব্বদাই মনোযোগী রহিয়াছেন এবং রাজ্য-শাসনে তাঁহারা কোনরূপ ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা সংগঠনের কার্য্যে যতই মনোযোগী হউন না কেন, দেশের ও দশের দারিদ্র্য যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন ঐ সংগঠনের কার্য্য যে যথোপযুক্ত হইতেছে না, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সেইরূপ আবার তাঁহারা স্থায়ী-ভাবে কোন ভেদনীতি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যতই প্রতিশ্রুতির প্রচার করুন না কেন, যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন, সাম্প্রদায়িক চাকুরী-বণ্টন, প্রাদেশিক অটোনমি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে দেশের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, অনুন্নত জাতি, বাঙ্গালী বেহারী প্রভৃতি নামে নানারূপ বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতিতে যে ভেদ সংঘটিত হইতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে লুক্কায়িত রাখা সম্ভব হইবে না। পরন্তু ১৭৭৩ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত ভারত-শাসনকল্পে যে সকল আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ—

(১) ১৭৭৩ সালের রেগুলেসন অ্যাক্ট
(২) ১৭৮৪ সালের পিট্‌স ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট
(৩) ১৭৯৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৪) ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৫) ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৬) ১৮৫৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৭) ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাবাণী
(৮) ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(৯) ১৮৭৪ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(১০) ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(১১) ১৯০৯ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(১২) ১৯১৯ সালের রিফর্ম্মস্ অ্যাক্ট
(১৩) ১৯২৪ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট
(১৪) ১৯২৭ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট

গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিলে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থায়ী-ভাবে কোন ভেদনীতি গ্রহণ করেন নাই এবং ১৯০৯ সালের পর হইতে যে এই নীতি স্থায়ী-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপে এক দিকে ভেদনীতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার ঐ নীতি যে গান্ধীজীপ্রমুখ রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের

উচ্ছৃঙ্খলতাময় কার্য্যের ফলে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের এই ভেদনীতির ইতিহাসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ইংরাজ মনীষিবৃন্দই প্রধানতঃ 'স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভারতীয়গণের একতা সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে জাতীয়তা বন্ধনে বদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়গণ যখন বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পরোক্ষভাবে ঐ ইংরাজগণকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে "স্বরাজে"র প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজগণও তাহার প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসপন্থিগণ যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া শক্তিবৃদ্ধি সাধন না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাপর উপরোক্ত সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে গবর্ণমেণ্ট যে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যেরূপ রাজপুরুষগণ অস্বীকার করিতে পারেন না, সেইরূপ জনসাধারণও গভর্ণমেণ্টের ঐ ভেদনীতির জন্য গান্ধীজীপ্রমুখ রাষ্ট্রীয়-নেতৃবৃন্দকে দায়ী না করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিগণকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করিতে পারে না।

জনসাধারণ অনুসন্ধান করিলে আরও জানিতে পারিবেন যে, যে সমস্ত অপ্রিয় ঘটনার জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে অথবা অন্যান্য বিভাগের রাজপুরুষগণকে দায়ী করিয়া থাকেন এবং যাহার জন্য পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের ও অন্যান্য রাজপুরুষগণের প্রায়শঃ লোকপ্রিয় না হইয়া কর্কশ হইতে হয়, তাহার মূলেও রহিয়াছে গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান এই ভেদনীতি এবং এই ভেদনীতির মূলে রহিয়াছে গান্ধীজীপ্রমুখ রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের ও তাঁহাদের জয়ঢাকবৃন্দের গভর্ণমেণ্ট ও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ।

উপসংহারে আমরা আবার জনসাধারণকে ও গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

সংবাদ ও মন্তব্য

কে জাগে ?

শান্তিনিকেতনে চীন-ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন:—আমরা যে-যুগে বাস করিতেছি, তাহা মানুষের জগতের রাত্রি, সমগ্র জগৎ আজ ঘুমাইয়া আছে। আজ কেবল চোর ও ডাকাতেরা জাগিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ কি ভুলিয়া গিয়াছেন, যৌবনে তিনিই লিখিয়াছিলেন—'আজি এ প্রভাতে রবির কর' ইত্যাদি ? যে যুগকে তিনি রাত্রি বলিতেছেন, যে যুগে তাঁহার মতে কেবল চোর ও ডাকাতের জাগিয়া থাকার পালা—সেই জগতেই আবার তাঁহার 'প্রভাত-পাখীর গান' শুনিয়া মন আনচান করিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্তবিভ্রম কেন ?

রেল, জাহাজ ও বিমানপোত

ঐ অভিভাষণেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:—রেল, জাহাজ ও বিমানপোত মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি আনিয়াও যতদূরে সরাইয়া দিয়াছে, দূরত্বের ব্যবধান কোনদিন তাহা পারে নাই।

অথচ, যদি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করা যায়, বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানুষের পক্ষে 'আশীর্ব্বাদ' না, 'অভিশাপ' ?—তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কথাটা ঘুরাইয়া লইবেন। এবং কোন রেল কি জাহাজ, বা বিমানপোত কোম্পানী তাঁহার নিকট যদি 'সার্টিফিকেট' চাহে—তাহাও তিনি দিবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা।

পুরাতন ও নূতন

অভিভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন:—পুরাতন কিছুকে জরাজীর্ণ বলিয়া ত্যাগ করিয়া আধুনিক সমস্ত কিছুকে অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবার ভ্রান্ত মনোবৃত্তি আমাদের দূর করিতে হইবে। আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

এই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণের সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালার পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা যে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়া নিজের ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধান করিতে সে দেরী করে নাই এবং ইহার প্রভাব অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া উঠিতে পারিয়াছে।" ইহারই মধ্যে তাঁহার মত বদলাইল কেন ? সেদিন তিনি বলিলেন, আমরা অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছি, আজ বলিতেছেন, অনুকরণের ভ্রান্ত মনোবৃত্তিকে দূর করিতে হইবে। একটা

কারণ অবশ্য বুঝিতেছি, ইতিমধ্যে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত 'কবি'র মনে চিন্তার জোয়ার-ভাটা খেলিতে পারে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

অহিংস অসহযোগ

ফেকোহা ঘাটের জনৈক ব্যবসায়ীর একটি হস্তিনী তাহার শাবক লইয়া মাঠে বিশ্রাম করিতেছিল। সেই সময় একটি কুলিরমণী তাহার কন্যাকে লইয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। মেয়েটির হাতে আখ ছিল। হস্তি-শাবকটি সেই আখ কাড়িয়া লয়। কুলিরমণী সেই আখ হস্তি-শাবকের মুখ হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে হস্তিনী রমণীকে শুঁড় দিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

হস্তিনীটি খাস ভারতীয় হইয়াও অহিংস অসহযোগের দীক্ষা পায় নাই দেখিয়া আমরা গান্ধীজীর সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছি।

কল্পনা

ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর স্যর সি, ভি, রমন সম্প্রতি মহীশূর বণিক সম্প্রদায়ের এক সভায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—বিজ্ঞানের যুগ বলিয়াই ভারতবর্ষের কুটিরশিল্প নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং বিজ্ঞানের জন্য কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নতি হইতেছে না, এরূপ কথা আমি কখনও কল্পনাও করিতে পারি না।

যাহা বাস্তব সত্য, তাহা কল্পনা করিবার জন্য রমণ সাহেবের এত ব্যাকুলতা কেন? মানুষ যে চোখ দিয়া দেখে, কান দিয়া শোনে—তাহাও হয় তো রমণ সাহেবের কল্পনা করিতে বাধিবে—কিন্তু তাহাতেই কি সকলে স্বীকার করিয়া লইবেন—কান দিয়াই মানুষ দেখে এবং চোখ দিয়া সে শোনে?

চাকুরী-বোর্ড

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা ও পরামর্শের ফলে স্থির হইয়াছিল যে, অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ প্রভৃতির অনুকরণে এই বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি চাকুরী-বোর্ড গঠিত হইবে। উক্ত বোর্ডের একজন সেক্রেটারী থাকিবেন। সহরে ব্যবসায়ী ও কারবারীদিগের সহিত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। সংপ্রতি ঐ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

অক্সফোর্ড কিংবা ক্যাম্ব্রিজ ইহার প্রেরণা না যোগাইলে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দিক্ মাড়াইতেন না। নিজেরা স্বাধীন চিন্তা করিয়া একটা কিছু খাড়া করিবার চেষ্টা তাঁহাদের নাই। থাকিলে আজ এতদিন পরে 'ক্রীতদাস-প্রথা' কায়েম করিবার জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইত না। কিন্তু এম-এ ডিগ্রী পাইয়া ছেলেরা যদি চাকুরী না পায়, তাহার জন্য তো ব্যবস্থা হইল—মেয়েরা যদি বর না পায়, তাহার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই হইবে না কি? একটি 'সার্ভিস সিকিয়োরিং এজেন্সি', আর একটি 'ম্যাট্রিমোনিয়াল বুর্‌্যো'—বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রান্তে দুইটি মানাইবে ভাল। নূতন যে স্থাপত্য ডিগ্রীর কথা উঠিয়াছে, তাহার প্রথম পরীক্ষার প্রথম প্রশ্নপত্রের প্রথম প্রশ্ন এই হওয়া উচিত—এই দুইটি বিভাগের জন্য ঘর তৈয়ারী করিবার 'ডিজাইন' কি হইবে?—ফুল মার্ক—১০০ শত।

মা-সরস্বতী, এত লাঞ্ছনাও তোমার ভাগ্যে ছিল!

স্বাধীন চিন্তা

খুলনা জিলা ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁহার অভিভাষণের একাংশে বলিয়াছেন:—ভারত সরকার সমুদ্র শুল্ক আইনের দ্বারা অনেক পুস্তকের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে ছাত্রগণ স্বাধীন চিন্তার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

সমুদ্রের ওপার হইতে বই না আসিলে যদি 'স্বাধীন চিন্তা' সম্ভব না হয়—তাহা হইলে বরং 'চিন্তাটা' 'পরাধীন'ই থাক্। প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া তো "স্বাধীন চিন্তা" বহুৎ হইয়াছে—আরও কেন?



[জনন

'লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ধান্যশ্রী

আষাঢ়—১৩৪৪

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কলিকাতার বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলন

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা

আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে যাদৃশ পরিমাণে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একদিকে যেরূপ ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি তাহা স্মরণ করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার মানসিক অশান্তি, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং আর্থিক অস্বাচ্ছল্যতার উদ্ভব হয় কেন, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হয়, সেই সমস্ত অভ্যাসে প্রযত্নশীল হইলে, যে যে কারণে মানসিক অশান্তি, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার উদ্ভব হয়, সেই সেই কারণের উদ্ভব হইতে পারে না, তাহা হইলে ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যে মানসিক অশান্তি, অথবা শারীরিক অস্বাস্থ্য, অথবা আর্থিক অস্বচ্ছলতার উদ্ভব হয় না, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতে হয়। ইহার পর যদি আবার দেখা যায় যে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার পথে যে সমস্ত অভ্যাসে প্রযত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত অভ্যাস, মানসিক শান্তি অথবা শারীরিক স্বাস্থ্য অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিবার যে যে পন্থা বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত পন্থার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার বৃদ্ধি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি, তাহার আলোচনা আমরা বঙ্গশ্রীর পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় করিয়াছি। ঐ আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞানতঃ (theoretically) ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,

প্রথমতঃ, জ্যোতির্বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা, অথবা প্রকৃত হিব্রুভাষা, অথবা প্রকৃত আরবী ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা সঠিক ভাবে জানিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, যথাক্রমে গুরুতত্ত্ব, কৌলিকতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

কার্য্যতঃ (practically) ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, বৈদিক সন্ধ্যা ও বৈদিক গায়ত্রী,

দ্বিতীয়তঃ, গুরুসন্ধ্যা ও গুরুগায়ত্রী,

তৃতীয়তঃ, গুরুপূজা,

চতুর্থতঃ, শাক্তসন্ধ্যা ও শাক্তগায়ত্রী,

পঞ্চমতঃ, শক্তিপূজা অথবা দেবীপূজা,

ষষ্ঠতঃ, ব্রহ্মপূজা,

সপ্তমতঃ, বিষ্ণুপূজা,

অষ্টমতঃ, শিবপূজা অভ্যাস করিতে হইবে।

কার্য্যতঃ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উপরোক্ত যে আটটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা অভ্যাস করিতে পারিলে জীব সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা সমস্তই অনুভব করিতে এবং পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। তখন মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক জীবই যে সৎ এবং অসৎ, অথবা জড় এবং অজড় এই দুইয়ের সমষ্টি * তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিয়া জীবশরীরে প্রতি মূহুর্ত্তে যত কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটি অনুভব করা সম্ভবযোগ্য হয়।

কি কি কারণে মনের অশান্তি, শরীরের অস্বাস্থ্য এবং অর্থের অস্বচ্ছলতার উদ্ভব হয়, তাহার সঠিক সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন, অশান্তি, শরীর, অস্বাস্থ্য, অর্থ এবং অস্বচ্ছলতা—এই ছয়টি কথার সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে বুঝিতে না পারা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনের অশান্তি, শরীরের অস্বাস্থ্য এবং অর্থের অস্বচ্ছলতার যে কেন উদ্ভব হয়, তাহা বুঝা সম্ভব হয় না।

মনের সংজ্ঞা

বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব মনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মন বলিতে যে কি বুঝায় এবং মানব-শরীরের মধ্যে উহা যে কোথায় আছে, তাহা আধুনিক জগতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষ পরিজ্ঞাত আছেন।

* যথা সদসতাং নৈব
বিশেষোঽস্তি নিজাত্মনি।
জড়াত্মজানামপ্যেবং
নাস্ত্যসাবিতি নিশ্চয়ঃ
(অজড়প্রমাতৃসিদ্ধি)

প্রায়াধিক (approximately) গত তিন শত বৎসর হইতে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বটে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যেকখানি তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও মানবদেহের কোন্ অংশকে, অথবা কোন্ কার্য্যকে যে মন বলা হয় এবং তাহা নিজ শরীরাভ্যন্তরে যে কি করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহার কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

শুধু যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের প্রণীত কোন কোন গ্রন্থেই উপরোক্ত সন্ধান পাওয়া যায় না তাহা নহে, প্রাচ্য দেশেরও একমাত্র ঋষি ও মুনিগণের প্রণীত গ্রন্থ ছাড়া আর কাহারও গ্রন্থে উহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রে ও প্রধান প্রধান কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থেও মন সম্বন্ধে অনেক কথাই পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু মানবদেহের কোন্ অংশকে, অথবা কোন্ কার্য্যকে যে মন বলা হয় এবং তাহা নিজ শরীরাভ্যন্তরে যে, কি করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহার কোন সন্ধান শঙ্করের কোন গ্রন্থে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না।

আমাদের মনে হয়, মানুষের মনের সম্বন্ধে উপরোক্ত সন্ধান অধুনা সমগ্র মনুষ্যসমাজে এতাদৃশভাবে অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়ায় মনে প্রকৃত শান্তি লাভ করাও প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আজকাল একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে যত কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা সম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলিতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে অথর্ব্ববেদের প্রথমাংশে এবং ঐ সম্বন্ধে যত কিছু উপলব্ধিযোগ্য, তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সামবেদের প্রথমাংশে। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা যাহা উপলব্ধিযোগ্য, তাহা উপলব্ধি করিবার পন্থাসমূহ সামবেদের যে যে মন্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহার প্রত্যেক মন্ত্রটি "দ্যোতক" ভাষায় লিখিত এবং কোনটিই "বাচক" ভাষায় লিখিত নহে। সায়ণাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ ভাষার ঐ "দ্যোতকতা" উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, বিরুদ্ধভাবে

উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে, বেদ বুঝিতে হইলে যে সমস্ত প্রাথমিক উপলব্ধি মনুষ্য-সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আজ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহার সাহায্যে মনুষ্য-সমাজ তাহার অজ্ঞাত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইবে, সেই বেদ আজ রাহুর কবলে পতিত হইয়া 'চাষার গানে'র মত অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যে শূদ্রগণ চিরদিন যে বেদ ও বেদজ্ঞগণের প্রতি অপার্থিব শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, সেই শূদ্র-বংশধরগণ পর্য্যন্ত বেদকে 'চাষার গান' বলিয়া জাহির করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। যে বেদ লইয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব লইয়া মানুষের সম্পূর্ণতা, সেই বেদ, সেই ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণত্ব আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। নাই ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে আজ কোন পার্থক্য নাই। তাহারই ফলে আজ মনুষ্য-সমাজের প্রায় প্রত্যেককেই দুঃখ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে।

সাম ও অথর্ববেদের যে যে মন্ত্রের সাহায্যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও উপলব্ধিযোগ্য বিষয়সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া উহা উপলব্ধি করা যায়, সেই সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শরীরের কোন্ অংশকে মন বলা হয়, তাহা বুঝাইতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘতা লাভ করিবে এবং আমাদের আশঙ্কা হয়, বেদের ঐ মন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে ঐকান্তিকতার প্রয়োজন হয়, অর্থাভাব, দাম্ভিকতা এবং ঈর্ষ্যাক্লিষ্ট মানুষের পক্ষে সেই ঐকান্তিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবযোগ্য নহে।

গীতার কর্ম্মযোগাধ্যায়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধে

> "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥" (৩।৪২)

যে শ্লোকটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, উহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে মানবদেহের কোন্ অংশ যে মন এবং সেই অংশ উপলব্ধি করিবার উপায়ই বা যে কি, তাহা মোটামুটি ভাবে অনুধাবন করা যায়।

শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ গীতার যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তদনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত করিয়া বলিলে বলিতে হয়:-

"ইন্দ্রিয়গণ (দেহাদি হইতে) শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি কিন্তু বুদ্ধির পর (শ্রেষ্ঠ), তিনিই আত্মা।"

শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রচলিত ভাষ্যকারগণের উপরোক্ত অর্থ যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ' ইত্যাদি শ্লোকে, মানবের কোন্ অংশ যে মন এবং তাহা অনুভব করিবার উপায়ই বা যে কি, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং আমাদের উক্তি সম্পূর্ণ বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণের ঐ অর্থটি যে অলীক, তাহা যাঁহারা বেদাঙ্গের শিক্ষা, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ এবং নিরুক্ত প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য।

উপরোক্ত শ্লোকে "পর" শব্দ যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ 'উৎকর্ষাত্মক' অথবা 'তু' শব্দের অর্থ যে 'কিন্তু' হইতে পারে, তাহা আধুনিক মহামহোপাধ্যায়গণের অনুমোদিত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন বেদাঙ্গের মত-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত করা সম্ভব হইবে না।

এইরূপে শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণের অর্থ একদিকে যেরূপ বেদাঙ্গপ্রোক্ত অর্থবিধির বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার ঐ ভাষ্যকারগণ উপরোক্ত শ্লোকটি যাদৃশ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতা-বিরুদ্ধ। বাস্তবতঃ ইন্দ্রিয়গণ হইতে যদি মন শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে মানুষের কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও একমাত্র মনের দ্বারাই অনেক কিছু কার্য্য করা সম্ভব হইত। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, তিনি যতই দুর্ব্বলমনা হউন না কেন, তাঁহার দ্বারা যে-সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব, সেই সমস্ত কার্য্য যিনি সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়হীন, অর্থাৎ একসঙ্গে অন্ধ, বধির ও খোঁড়া হইয়া নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্‌হীন হইয়া পড়েন, তিনি যতই দৃঢ়মনা হউন না কেন, তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না। কাযেই যুক্তিসঙ্গতভাবে মনকে ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। অন্যদিকে কোন ইন্দ্রিয়কেও যুক্তিসঙ্গতভাবে মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। পরন্তু

মানুষের চলাফেরার জন্য তাহার ইন্দ্রিয় ও মন উভয়ই সমান প্রয়োজনীয়।

কাযেই, শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণের উপরোক্ত অর্থ যথাযথ বলিয়া মানিয়া লইলে গীতা-প্রণেতা ব্যাসদেবকে পরোক্ষভাবে অবাস্তব অথবা অসত্য উক্তির প্রচারক বলিয়া দোষারোপ করা হয়। অন্যদিকে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, "ব্যাসদেবের উক্তি কখনও অবাস্তব অথবা মিথ্যা হইতে পারে না," তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণের ভাষ্য যে অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

সুতরাং এক্ষণে প্রশ্ন করিতে হইবে যে, শঙ্করাচার্য্য বিশ্বাসযোগ্য অথবা ব্যাসদেবের লেখনী হইতে যে অবাস্তব কথা নির্গত হইতে পারে না, তাহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ?

কে ৺ব্যাসদেব, আর কেই বা শঙ্করাচার্য্য, এই তথ্য যাঁহারা কথঞ্চিৎভাবে অবগত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বীকার করিবেন যে, একজন অল্পবয়স্ক বুধ-সন্ন্যাসীর পক্ষে ৺ব্যাসের উক্তি যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠিতে না পারা খুবই সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষির লেখনী হইতে অবাস্তব উক্তি প্রচারিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। "বৃক্ষের পরিচয় ফল হইতে"—এই উক্তিটির সত্যতা অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যাসদেবের কাছে শঙ্করাচার্য্য যে অতীব নগণ্য, তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। ৺ব্যাসদেবের অভ্যুদয়কালে যে-ভারত সমগ্র মানবজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া সকলের গুরু-স্থানীয় হইতে পারিয়াছিল, সেই ভারত শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই যে পরপদানত বিশৃঙ্খল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আধুনিক ইতিহাস হইতে পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, ব্যাসদেবের শিক্ষা প্রকৃতভাবে অনুধাবন করিতে পারিলে মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে আর শঙ্করের শিক্ষা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাগপশুবৎ করিয়া ফেলে ?

আজ, ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের ভাষা মানুষ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে, তাই ব্রহ্মসূত্রের বিকৃত ভাষ্য-প্রণেতা একটি যুবককে সাক্ষাৎ শঙ্কর বলিয়া পূজা করিয়া থাকে এবং তাঁহার প্রণীত ভাষ্যসমূহকেই শ্রদ্ধা প্রদান করে। কিন্তু যদি আবার কখনও ঋষির ভাষা মানুষ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

শিক্ষা, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ এবং নিরুক্ত—এই তিনখানি বেদাঙ্গে কারিকার অর্থ গ্রহণ করিবার যে বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিলে—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—

"মানুষ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ তাহার ইন্দ্রিয়গণের পৌরুষেয় (অথবা চৈতন্য শক্তি) এবং তেজস্বিতা। ইন্দ্রিয়সমূহের পৌরুষেয় এবং তেজস্বিতা কোথা হইতে আসিতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে "মন" কি তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং মন কি তাহা বুঝিতে পারিলে বুদ্ধি কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধি কি তাহা অনুভব করিতে পারিলে অনুভূতি যে কি প্রক্রিয়া এবং কেন যে পাপপ্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আধুনিক পণ্ডিত-সমাজের পুণ্যকার্য্যের (?) ফলে শিক্ষা, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ এবং নিরুক্ত, এই তিন খানি বেদাঙ্গ যে অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে, তাহাতে আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা যে ঐ বেদাঙ্গসম্মত, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় হইবে। উহাতে এই প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই তাহা সম্ভব নহে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা লেখকের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিলে স্ব স্ব অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে কি প্রকারে মানুষের চিৎ (যাহা লইয়া সচ্চিদানন্দ শব্দের গঠন সাধিত হয়), চিত্তের (অথবা প্রবৃত্তির) ও চৈতন্যের উদ্ভব হইতেছে এবং কেনই বা অহরহ তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষায় এই তথ্য "তত্ত্বকথা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তত্ত্বকথার জ্ঞা ভাগ (theoreti-

cal portion) সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে অথর্ব্ববেদে। কি করিয়া মানুষের চিৎ, চিত্তের ও চৈতন্যের উদ্ভব হইতেছে এবং কেনই বা ঐ চিৎ, চিত্তের ও চৈতন্যের অহরহ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে কি কি লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের উদ্ভব ও পরিবর্ত্তন তিন কারণে হইয়া থাকে—

(১) বায়ুর অস্তিত্ব ও চলাচলবশতঃ;

(২) মাতা, পিতা প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তি এবং বস্তুর সহ মানুষকে তাহার জীবনে সংশ্লিষ্ট হইতে হয়, সেই সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুর চৈতন্যশক্তিবশতঃ;

(৩) মেদের অস্তিত্ব ও পরিবর্ত্তনবশতঃ।

বায়ুর অস্তিত্ব ও চলাচলবশতঃ যে দেহাভ্যন্তরস্থ চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের অহরহ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে "ঋক্"বেদে। পরিদৃশ্যমান জীব ও বস্তুর চৈতন্যের বিদ্যমানতাবশতঃ যে প্রত্যেক মানুষের চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের অহরহ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে "যজু"র্ব্বেদে, আর মেদের অস্তিত্ব ও পরিবর্ত্তন বশতঃ যে চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের অহরহ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে "সাম"বেদে।

সুতরাং কি প্রকারে চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের উদ্ভব হইতেছে এবং কেনই বা অহরহ তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার জ্ঞানভাগ পরিজ্ঞাত হইতে হইলে একদিকে যেরূপ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার অথর্ব্ববেদে যে সমস্ত কথা ঐ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা যে যথাযথ, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সাম যজুঃ ও ঋক্-বেদের প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইতে হয়।

চারিটি বেদে চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা আছে, তাহা একদিকে যেরূপ অতীব বিস্তৃত, অন্যদিকে আবার ঐ সমস্ত কথা কল্পনাতীত সূক্ষ্মতম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সমস্ত কথা সন্নিবেশিত করিতে হইলে একদিকে যেরূপ প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, অন্যদিকে আবার সেই সমস্ত কথা অনেকের কাছে রসহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবার আশঙ্কা আছে।

বেদ ছাড়া, এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা আরও অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পণ্ডিতগণের লিখিত অনেক গ্রন্থই বিশ্বাসের অযোগ্য। খুব সম্ভব ঐ সমস্ত পণ্ডিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া এবং তাহার প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত না হইয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের প্রণীত যতগুলি গ্রন্থ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, তত্ত্বপ্রকাশ, সিদ্ধিত্রয় এবং প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা নামক চারিখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভাবে সত্যদ্রষ্টা ঋষির পন্থার অনুবর্ত্তী এবং বিশ্বাসযোগ্য।

চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সম্বন্ধে আমরা এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিব, তাহা মুখ্যতঃ ঐ চারিখানি গ্রন্থের কথা।

চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কি প্রকারে হয়, তাহা আমূল বুঝিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তিনটি বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কি প্রকারে হয়, তাহা আমূল বুঝিতে না পারা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিৎ, চিত্ত, ও চৈতন্য বলিতে যে কি বুঝায়, তাহাও আমূল ভাবে বুঝা সম্ভব হয় না।

সংক্ষেপতঃ বাঙ্গালা ভাষায় অনুভূতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার নাম চিৎ, প্রবৃত্তি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার নাম চিত্ত, আর মানুষ যে শক্তিবশতঃ প্রবৃত্তির দাস না হইয়া কখন কখন বস্তুর স্বরূপানুভূতির জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে, সেই শক্তির নাম "চৈতন্য"।

মানুষের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়, তাহার তথ্যও অতীব বিস্তৃত। মানুষের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়, তাহার কথা বলিতে বসিলে যখন কোন মানুষ ছিল না, তখন সর্ব্বপ্রথম মানুষটির, অথবা মানুষগুলির উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, প্রথমেই তাহার কথা উপস্থিত হয়। সৃষ্টির প্রথম বিকাশ কিরূপ ভাবে হইয়াছিল, তাহার

বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মানুষের সৃষ্টি হইলে কিরূপ ভাবে আবার নূতন নূতন মানুষের ও তাহার নূতন নূতন অবস্থার উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয়, কেবল মাত্র তৎসম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব।

কিরূপ ভাবে নূতন নূতন মানুষের ও তাহার নূতন নূতন অবস্থার উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, কিরূপ ভাবে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে অন্ততঃ পক্ষে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা নিতান্ত আবশ্যক, কিরূপ ভাবে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তাহা এমন কি সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্বের প্রকাশ তাহার জড়াবস্থায় এবং ঐ জড়াবস্থার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে অজড়, অথবা অসৎ, অথবা অব্যক্ত অবস্থা। ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, যে অজড় অবস্থা হইতে জড়াবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অজড়াবস্থায় যখন বহ্নি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকট হয়,তখনই ঐ অজড় অবস্থা হইতে জড়াবস্থার উদ্ভব হইতে থাকে।

বিশ্বের উৎপত্তি কি রূপ ভাবে হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, যথা অজড়-প্রমাতৃসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি এবং সংবন্ধসিদ্ধি।

যে জড়াবস্থা লইয়া বিশ্বের প্রকটতা, তাহার মূলে যে বিশ্বকারণের অজড়াবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার পন্থার নাম "অজড়-প্রমাতৃসিদ্ধি।"

বিশ্বকারণের অজড়াবস্থায় যখন বহ্নি প্রকটতা লাভ করে, তখনই যে বিশ্বের জড়াবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার নাম "ঈশ্বরসিদ্ধি।"

জড় এবং অজড় এই দুই-এর মিলিত অবস্থার নামই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নাম "সংবন্ধ-সিদ্ধি।"

বিশ্বের মূল কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহা বিশ্বের মূল, অর্থাৎ যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বত্রই ও সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কোন্ বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, বায়ু, অপ্ ও বহ্নি এই তিনটি বস্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া মানুষের অলক্ষ্যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যমান আছে।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, বায়ু, অপ্ ও বহ্নি এই তিনটি বস্তুর অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত যে বস্তু সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, সেই বস্তুর মধ্যে যখন বহ্নি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকট হয়, তখন পরিদৃশ্যমান জগতের এক একটি জড়াবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বায়ু, অপ্ ও বহ্নি এই তিনটি বস্তুর অঙ্গাঙ্গিভাবের মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয় এবং যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় অব্যক্ত (অর্থাৎ অদৃশ্য অথবা অস্পষ্ট) ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাকে বিশ্বের "অজড়" অথবা "অসৎ" কারণ বলা হইয়া থাকে। যখন ঐ অব্যক্ত বস্তু হইতে বিশ্বের ব্যক্ত অবস্থার উদ্ভব হয়, তখন সংস্কৃত ভাষায় "জড়" অথবা "সৎ" অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে বায়ু, অপ্ ও বহ্নি এই তিনটি বস্তুর অঙ্গাঙ্গিভাবের মিলনে যে "অজড়" অথবা "অসৎ" বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই বিশ্বের "জড়" অথবা "সৎ" অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে।

বায়ু, অপ্ ও বহ্নি, এই তিনটি বস্তুর অঙ্গাঙ্গিভাবের মিলনে যে "অজড়" অথবা "অ-সৎ" অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বায়ু, অপ্ ও বহ্নির অঙ্গাঙ্গিভাবের মিলনে যে 'অজড়' অথবা 'অসৎ' অবস্থার, অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে অবস্থায় বহ্নি প্রকটতা লাভ করে এবং জড় অবস্থার উদ্ভব হইতে আরম্ভ করে, সেই অবস্থার নাম "ঈশ্বর"।

জড় অবস্থার পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ যে 'ঈশ্বর' ও 'অজড়' ব্রহ্ম, অর্থাৎ বায়ু, অপ্ ও বহ্নি, এই তিনটি বস্তুর অঙ্গাঙ্গিভাবের মিলন, সেই তিনটি বস্তুর উদ্ভব কোথা হইতে হইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ তিনটি বস্তুর মূল কারণ একটি এবং তাহার নাম 'ব্যোম'।

এইরূপ ভাবে বিশ্বের মূল কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, এক 'ব্যোম' হইতে ক্রমে ক্রমে বায়ু, অপ্ এবং বহ্নি, এই তিনটি অজড় বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে এবং ঐ তিনটি বস্তু মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মাকারে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্ম যখন ঈশ্বরাকারে উপনীত হন, তখন অজড়াবস্থা হইতে জড়াবস্থার উৎপত্তি হইয়া পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হইতেছে।

কিরূপ ভাবে নূতন নূতন মানুষের ও তাহার বিবিধ অবস্থার উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, পিতার শুক্র, মাতার শোণিত এবং ব্রহ্ম, (অর্থাৎ বায়ু, অপ্ ও বহ্নির মিলনে যে অজড় অবস্থা, সেই অজড় অবস্থা) এই তিনটি বস্তু মিলিত হইলে যখন তন্মধ্যস্থিত বহ্নি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকট হয়, তখন অজড় অবস্থার ভ্রূণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ অজড় অবস্থার ভ্রূণ ক্রমশঃ মেদাবৃত হইয়া অণ্ডাকারে পরিণত হয়। অণ্ডাকারে পরিণত হইবার পর, অণ্ডো পরিস্থিত মেদ হইতে ক্রমশঃ অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং ঐ অগ্নি ও মেদের সংযোগে ক্রমশঃ চক্ষু, কর্ণ স্কন্ধ, জিহ্বা, চোয়াল এবং নাসিকার উন্মেষ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তখনও

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে সক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। জিহ্বার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ত্বকের উন্মেষ সাধিত হইয়া থাকে। আভ্যন্তরীণ ত্বকের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হৃস্বাস্থির উদ্ভব হয় এবং ঐ হৃস্বাস্থি ও নাসিকা বিকশিত হইবার পর যে-দুইটি বেষ্টনীর উপর দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত দণ্ডায়মান, সেই দুইটি বেষ্টনীর উদ্ভব হয়। ইহার পর অস্থির বিকাশ আরম্ভ হয় এবং তৎপর ক্রমে ক্রমে মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের বিকাশ সাধিত হয় এবং তখন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

অজড়াবস্থার ভ্রূণ ক্রমশঃ মেদাবৃত হইয়া অণ্ডাকারে পরিণত হইলে জড়াবস্থার অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্ত্বার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। মেদাবৃত অণ্ড হইতে যখন জিহ্বা এবং আভ্যন্তরীণ ত্বকের উদ্ভব হয়, তখন অনুভূতি, অথবা চিৎশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। যখন ভ্রূণে অস্থির উন্মেষ হয়, তখন উহার প্রবৃত্তির, অথবা চিত্তের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। যখন চর্ম্ম পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন শিশুর চৈতন্য লাভ করিবার শক্তি বিকশিত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুর চৈতন্য লাভ করিবার শক্তি বিকশিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে সক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। যখন ভ্রূণে অস্থির উন্মেষ হয়, তখন উহার চিত্তের, অথবা প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু চৈতন্যের উদ্ভব হয় না।

'চিৎ'-এর অর্থাৎ অনুভব-ক্ষমতার উন্মেষ না হইলে 'চিত্ত'-এর অর্থাৎ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না এবং 'প্রবৃত্তি'র উদ্ভব না হইলে চৈতন্যের উদ্ভব হয় না। চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্য, এই তিনটি ক্রিয়ার উপরোক্ত ধারা এবং অসৎ অথবা অজড় হইতে সৎ অথবা জড়ের উদ্ভব কিরূপে হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পরিলে, সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং সত্ত্বা, আত্মা ও শরীর বলিতে কি বুঝায়, তাহা সঠিকভাবে অবগত হওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ এতদ্বিষয়ে শব্দের ঝঙ্কারময় যে সমস্ত কথা তাঁহাদের প্রণীত বিবিধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ অবিশ্বাসযোগ্য এবং উহা অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই তাঁহাদের বর্ণিত অনেক বিষয়ই প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কোন্ বস্তুর অস্তিত্ববশতঃ মানুষের চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের উদ্ভব হইতেছে এবং কেনই বা অহরহ তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহা উপরোক্তভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" ইত্যাদি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি, সেই ব্যাখ্যার সাহায্যে শরীরের কোন্ অংশ অথবা ক্রিয়াকে "মন" বলা হইয়া থাকে এবং ঐ "মন"কে শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা কি তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়সমূহের পৌরুষেয় এবং তেজস্বিতা কোথা হইতে আসিতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে "মন" কি তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কোন্ বস্তুর অস্তিত্ববশতঃ মানুষের চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের উদ্ভব হইতেছে এবং কেনই বা অহরহ তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, এতৎপ্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে,

প্রথমতঃ, অজড়াবস্থার ভ্রূণ ক্রমশঃ মেদাবৃত হইয়া অণ্ডাকারে পরিণত হয় এবং জড়াবস্থায় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্ত্বায় উপনীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অণ্ডোপরিস্থিত মেদ হইতে ক্রমশঃ অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং ঐ অগ্নি হইতে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ হয়।

তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়সমূহের উন্মেষ হইবার পর ক্রমশঃ মেদ হইতে অস্থি, মজ্জা, বসা, [illegible]স, রক্ত এবং চর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং চৈতন্যশক্তির উদয় হয়।

চতুর্থতঃ, চৈতন্যশক্তির উদ্ভব হইলে পর ইন্দ্রিয়গণ তেজস্বিতা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

কাযেই মানুষের কোন্ প্রক্রিয়াবশতঃ তাহার ইন্দ্রিয়-সমূহের পৌরুষেয় এবং তেজস্বিতার উদ্ভব হইতেছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, যে-প্রক্রিয়াবশতঃ অণ্ডোপরিস্থিত মেদ হইতে ক্রমশঃ অগ্নির উৎপত্তি হয়, ঐ অগ্নির সাহায্যে একটির পর একটি করিয়া অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং তাহা অব্যাহত থাকে, সেই প্রক্রিয়ার সহায়তায় মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের পৌরুষেয় এবং তেজস্বিতার উদ্ভব হইতেছে।

এক্ষণে শব্দ-স্ফোটের বিধি অনুসারে "মন" এই পদটির অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, "মন" বলিতে বুঝায় সেই ক্রিয়াশক্তি, যে-ক্রিয়াশক্তির সহায়তায় মানুষের স্পর্শশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া গন্ধশক্তি পর্য্যন্ত কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ কি প্রকারে মানুষের স্পর্শশক্তির উদ্ভব হয় এবং স্পর্শশক্তি হইতে কি প্রকারে ক্রমশঃ রূপ, রস এবং গন্ধ-শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহা যে-শক্তির দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম "মন"।

গীতায় "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" প্রভৃতি শ্লোকে মন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত পদ-স্ফোটের বিধি অনুসারে "মন" এই পদটির যে অর্থ হয়, উহা মিলাইয়া

লইলে, মানুষের মন বলিতে কি বুঝায়, তাহা পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করা যাইবে।

অজড় অবস্থা হইতে জড় অবস্থায় উপনীত হইবার পর, অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মতেজ হইতে মেদের উৎপত্তি হইবার পর মানুষের যে-ক্রিয়াশক্তির প্রথম উন্মেষ হয়, মেদ হইতে ক্রমশঃ অগ্নি, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস এবং রক্তের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে-শক্তির পরিণতি ঘটিয়া থাকে এবং যে-ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে মানুষের স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধশক্তিতে, সেই ক্রিয়াশক্তির নাম মানুষের "মন"।

মানুষের মনের সংজ্ঞা আরও পরিস্ফুট করিতে হইলে মানুষের বুদ্ধি কাহাকে বলে, অন্ততপক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বদা অজড়, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মতেজ হইতে জড় অবস্থার উৎপত্তি হইতেছে, তাহা মানুষ যে ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অনুভব করিতে পারে এবং যে ক্রিয়াশক্তির পরিণতির ফলে মানুষের চিৎ, চিত্ত ও চৈতন্যের উদ্ভব হয়, তাহার নাম মানুষের বুদ্ধি।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

এই শ্লোকটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে, বাঙ্গালা ভাষায় বুদ্ধির উপরোক্ত সংজ্ঞা যে অতীব যুক্তিসঙ্গত, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

মন ও বুদ্ধির উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের মন আছে বলিয়াই তাহার ইন্দ্রিয়শক্তির উন্মেষ ও উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়শক্তি আছে বলিয়াই মানুষের বুদ্ধিশক্তির উন্মেষ ও উদ্ভব হয় এবং বুদ্ধিশক্তি আছে বলিয়াই তাহার মনঃশক্তির উন্মেষ ও উদ্ভব হইয়া থাকে।

মানুষের যে ক্রিয়াশক্তিকে "মন" বলা হইয়া থাকে, তাহা নিজ দেহের মধ্যে অনুভব করিতে হইলে, কি রূপ ভাবে প্রতিনিয়ত শরীরাভ্যন্তরস্থ মেদাবরণের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিরূপ ভাবে ঐ মেদাবরণ হইতে অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উদ্ভব হইতেছে, এবং কিরূপভাবে ঐ মেদাবরণের সহিত চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশ-পটের উপর তারকাগুলির মত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন।

আপাতদৃষ্টিতে এই উপলব্ধি অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত কৌলিকতত্ত্বে উহা এতাদৃশ সহজসাধ্য করিয়াছেন যে, আমাদের মতে যে কোন শ্রদ্ধা ও প্রযত্নশীল ব্যক্তির পক্ষে উহা সামান্য চারি পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় উপলব্ধিযোগ্য হইতে পারে।

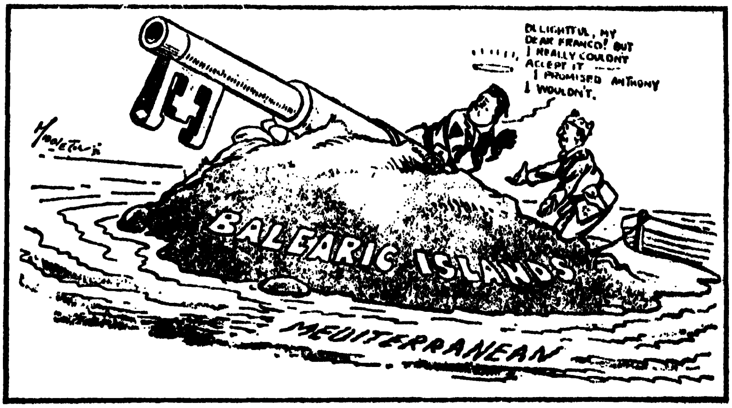
বর্ত্তমানে যে উহা কাহারও উপলব্ধিযোগ্য নহে, তাহার কারণ ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষার বিলুপ্তির ফলে একদিকে যেরূপ ঐ কৌলিকতত্ত্বের যথাযথ মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, অন্য দিকে পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ পঞ্চম বর্ণে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, অথবা প্রকৃত ক্ষত্রিয়, অথবা প্রকৃত বৈশ্য, অথবা প্রকৃত শূদ্র হইতে হইলে যাদৃশ জ্ঞান এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে যাদৃশ শ্রদ্ধার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রায়শঃ নাই। যদি তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের কোন প্রকৃত জ্ঞান অথবা ঋষিদিগের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নব্যস্মৃতি অথবা নব্য-ন্যায়ের উদ্ভব ও প্রচলন হইতে পারিত না এবং মানবসমাজে তাঁহারা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের বিধান অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ অথবা পণ্ডিত বলিয়া জাহির করিতে অসঙ্কুচিত বোধ করিতে পারিতেন না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, বহুদিন হইতে তথাকথিত পণ্ডিতগণ কি উপায়ে যে কোন্‌খানি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ এবং কোন্‌খানি যে তদ্-বিরুদ্ধ, তাহার নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতবিদ্‌গণ উপরোক্ত তথা-কথিত ভারতীয় পণ্ডিতগণের ছাত্র এবং আধুনিক নামকরা মহামহোপাধ্যায়গণ প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে হয় ঐ ইয়োরোপীয় সংস্কৃতবিদ্‌গণের ছাত্র, নতুবা উপরোক্ত তথাকথিত ভারতীয় পণ্ডিতগণের ছাত্র। ইহারই ফলে যে-বিদ্যা মনুষ্য-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যাহা একদিন মানবসমাজের অনেকেই পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহা আজ বিলুপ্ত হইয়াছে।

মনের শান্তি, শরীর, শরীরের স্বাস্থ্য, অর্থ এবং অর্থের স্বচ্ছলতা—এই পাঁচটি বিষয়ের সংজ্ঞা এবং ঐ পাঁচটি বিষয় লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। [ক্রমশঃ

যুদ্ধ কি বাধিবে ?

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

আজকের দিনে ইউরোপের সব চেয়ে বড় খবর হচ্ছে স্পেনের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ফলাফলের উপর ইউরোপের ভাগ্য নির্ভর করছে। বৃটেন এবং ফ্রান্স এখনও নিরপেক্ষ। কিন্তু জার্ম্মানী এবং ইটালী যে পরোক্ষভাবে বিদ্রোহী নেতা জেনেরাল ফ্রাঙ্কোকে অস্ত্র শস্ত্র এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে এ বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্র নেই। এ কথাও নিঃসংশয়ে জানা গেছে যে, বহুদিন আগে থেকেই হিটলার এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে জোসি প্রাইমো ডি রিভেরো, জেনেরাল সান্জুরজো প্রভৃতির যোগাযোগ চলছিল। প্রেসিডেণ্ট ম্যানুয়েল আজানা গত অক্টোবরেই বলেছিলেন, এই ব্যাপারটা শুধু স্পেনের অন্তর্বিপ্লবই নয়, এর সঙ্গে বাইরের শক্তিপুঞ্জেরও যোগ আছে। তখন অবশ্য তিনি ইটালী কি জার্ম্মানীর নাম করেন নি; কিন্তু তার পরে এমন সব অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল, যার পরে এ সম্বন্ধে আর কারও মনে কোন সন্দেহ রইল না। এখন প্রশ্ন এই যে, জার্ম্মানী এবং ইটালী কি স্বার্থে বিদ্রোহীদের সাহায্য ক'রছে ?



বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের চাবিকাঠি হয় তো কোন দিন— —বার্মিংহাম গেজেট

ইটালীর স্বার্থ

এ সম্বন্ধে অনুমান করতে বিশেষ শ্রম-স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। স্পেনের কাছ থেকে ইটালীর অনেক কিছু নেওয়ার আছে। ভূমধ্যসাগরে স্পেনের দানে ইটালীর শক্তি আরও অনেকখানি বাড়তে পারে; জিব্রাল্টারে এবং বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে নৌ এবং বিমান-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুবিধা পেতে পারে; স্পেনীয় মরক্কোয় প্রাধান্য পেতে পারে এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে নৌ-কেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছাও তার আছে। বস্তুতঃ পক্ষে কিছুকাল আগে থেকেই ইটালী স্পেনীয় মরক্কোতে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত সঙ্গোপনে উপনিবেশ স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে। স্পেনের খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে পারদের উপরও তার যথেষ্ট লোভ আছে। বিস্ফোরক তৈরী করতে পারদ চাই। হিসাব ক'রে দেখা গেছে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইটালী ৩১% এবং স্পেন ৬০% পারদ সরবরাহ করত। যুদ্ধের পরে অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী রাজ্যের খানিক ইটালীর দখলে আসায় তার পারদ-সম্পদ আরও কিছু বেড়েছে। এর পরে স্পেনের পারদের খনিও হাতে এলে ৭৫% পারদের মালিক হতে পারবে। অর্থাৎ পারদের উপর তার প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মাবে। এবং এ বিষয়ে তার আরও সুবিধা হবে এই জন্যে যে, উত্তর-আমেরিকা এবং মেক্সিকোয় পারদের পরিমাণ দ্রুত কমে আসছে। এ ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির উচ্ছেদ-সাধনের উদ্দেশ্য তো দুই দেশেরই আছে।

জার্ম্মানীর স্বার্থ

বহু জার্ম্মান ব্যবসাসূত্রে স্পেনে বসবাস ক'রছে। সুতরাং এখানে ডিক্টেটারী শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হ'লে বহু জার্ম্মানকে তৃতীয় পরিষদে (Third Reich) ঢোকান যেতে পারে এবং তাদের দ্বারা জার্ম্মানীর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অনেক

সুবিধা হতে পারে। এমনি করে ধীরে ধীরে এখানে একটা উপনিবেশ-স্থাপনের ইচ্ছা জার্ম্মানীর আছে।

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যদিচ ইটালী এবং জার্ম্মানী এই ব্যাপারে এক সঙ্গে কাজ করছে, যে কোন মুহূর্ত্তে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কারণ যে স্বার্থ নিয়ে ইটালী নেমেছে, জার্ম্মানীরও সেই একই স্বার্থ। লোভের বস্তু নিয়ে দুজনে কাড়াকাড়ি লাগা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে আসন্ন যুদ্ধের মুখে স্পেনের আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর-কূলে সাবমেরিন-ঘাঁটি স্থাপনের তার নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধোপকরণ তৈরীর জন্যে তারও পারদ এবং ম্যাঙ্গানিজ চাই। কিন্তু হিটলারের উচ্চাশা শুধু এতেই তৃপ্ত হবে না। স্পেনকে তিনি জার্ম্মান পদ্ধতিতে নূতন করে গড়তে চান। তাঁর "চার বছরের সঙ্কল্প" অনুযায়ী তাতে জার্ম্মানীর অনেক টাকা এখানে খাটাতে পারবেন। এবং ভরসা করেন যে, বছর দুই এইভাবে শোষণ চালাতে পারলে জার্ম্মানীর আর্থিক দুরবস্থার অনেকখানি সুরাহা হবে। বিদ্রোহীদের সাহায্যে জার্ম্মানী যে ব্যয় করছে, বিদ্রোহ সফল হলেও তারা যে সঙ্গে সঙ্গে সে টাকা পরিশোধ করতে পারবে, এমন আশা নেই। শোনা যাচ্ছে তার বদলে জার্ম্মানী না কি এই রকম দাবী করবে:

তামা, লোহা, পারদ, ম্যাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে জার্ম্মানীকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। আর স্পেনকে নতুন করে গড়ার কাজে তার কাছ থেকে মোটা রকম সাহায্য নিতে হবে। এই 'সাহায্যে'র অর্থ এই যে, মালপত্র এবং লোকজন যা কিছু দরকার হবে, তা কিনতে হবে জার্ম্মানীর কাছ থেকে। লোকজন যারা আসবে, তারা স্পেনেই বসবাস করে বংশপরম্পরায় স্পেনের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনেই মনোযোগ দিতে পারে।

এ ছাড়া নানা স্থানে, বিশেষ করে ফ্রান্সের সীমান্তে তাকে দুর্গ ও বিমান-ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে হবে। তা হ'লে পশ্চিম এবং মধ্য-ইউরোপে তার প্রভাব অপ্রতিহত হ'তে পারে। যে সব জার্ম্মান সৈন্য-হিসাবে এখন থেকেই দলে দলে স্পেনে আসছে, নাৎসি-নীতির তারাই হবে প্রবর্ত্তক।

রুশিয়ার স্বার্থ

কিন্তু রুশিয়াও যে সরকার-পক্ষের সাহায্যে দলে দলে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে, তার স্বার্থ কোথায়?

রুশিয়া সম্বন্ধে সত্যকার কথা এই যে, বিদ্রোহের প্রথমে সে সরকার-পক্ষে কোন সাহায্যই করে নি। এ শুধু তার নিজের মুখের কথাই নয়, স্পেনের কমিউনিষ্ট দল প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছে, সোভিয়েট দু'মাসের মধ্যে স্পেনের সাহায্যে আঙুলটি পর্য্যন্ত তোলেনি। এই নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বরের সভায় তারা একটা প্রস্তাবও এনেছিল। এই প্রস্তাবে আরও একটা অভিযোগ ছিল যে, সোভিয়েট স্পেনের কুলি-মজুর-শ্রেণীকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করেছে। দুটি অভিযোগই সত্য। কারণ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মাদ্রিদে একজন সোভিয়েট রাজদূত এবং বার্সিলোনায় একজন সোভিয়েট বাণিজ্যদূত নিযুক্ত করা হয়। অতএব স্পেনে কমিউনিজম্ প্রচারের কোন ইচ্ছা যে রুশিয়ার নেই, এমন নয়। কিন্তু বিদ্রোহের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে মনে হয় না, সে ইচ্ছা তাদের বিশেষ প্রবলভাবে আছে। বরং যাঁরা স্পেনের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করছেন, তাঁদের মত এই যে, গণতান্ত্রিক দেশে যাতে ফ্যাসিজম্ শক্তিশালী না হয়ে ওঠে, শুধু সেই চেষ্টাই সোভিয়েট করছে। গত বৎসর মস্কোর কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বৈঠকে এই নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট যে এখন স্পেন-বিপ্লব পরিচালনা করতে চায়, এ কথাও মিথ্যা নয়। কারণ, স্পেনে প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় ইটালী এবং জার্ম্মানীর যে স্বার্থ, রুশিয়ারও তাই। সুতরাং রুশিয়াও যে নিজের প্রয়োজনানুরূপ সুবিধালাভের চেষ্টা করবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু স্পেনের কমিউনিষ্ট দলের মতে (P. O. U. M.) রুশিয়ার স্বার্থ আরও একটু আছে। স্পেনে স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ রুশিয়ার সাহায্য ছাড়া, কোন শ্রমিক-বিপ্লব হ'লে তার ফলে ষ্টালিনের আমলাতন্ত্র বিপন্ন হ'তে পারে। ষ্টালিনের কমিউনিজম্‌কে পাকা কমিউনিষ্টরা খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখে।

ইংলণ্ড আর ফ্রান্স

এই ব্যাপারে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স একটু অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে চলছে। ইটালী আর জার্ম্মানী বারংবার এদের

স্বার্থে ঘা দিলেও ইংলণ্ড তার ভূমধ্যসাগরের স্বার্থরক্ষায় এবং শান্তি-স্থাপনের বাসনায় এখনও মিঠে-কথায়-চিঁড়ে-ভিজাইবার আশায় আছে। এদের নিশ্চেষ্টতায় স্পেন যে ক্ষুব্ধ হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তার একটা কারণ এই যে, যে যুদ্ধ সে করছে, সে যুদ্ধ ইংলণ্ডেরও এবং ফ্রান্সেরও, যে হেতু এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকে বাঁচান। দ্বিতীয়তঃ গণতান্ত্রিক, এমন কি বিপ্লববাদী স্পেনও কোনদিন ফ্রান্স ইংলণ্ডের ভয়ের কারণ হবে না, বরং বিপদে-আপদে তার সাহায্যই করবে। পক্ষান্তরে জেনেরাল ফ্রাঙ্কো গ্রেটবৃটেনের শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন; এবং তার হাত থেকে জিব্রাল্টার ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করছে। এমন ক্ষেত্রে বৃটেনের এই ঔদাসীন্যের কারণ দুর্জ্ঞেয়।

আর ফ্রান্সের অবস্থা এখন ঘুড়ির লেজুড়ের মত। ইটালীর সঙ্গে লাভাল গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের ফলে বেচারা ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব হারাতে বসেছিল। সে শিক্ষা সে জীবনে ভুলছে না। আসন্ন সমরের মুখে সে স্থির করেছে, ইংলণ্ডের পায়ে পা মিলিয়ে চলা ছাড়া আর কিছুই সে করবে না। তথাপি সে ইংলণ্ডের মত অতখানি অন্ধ এবং নিশ্চেষ্ট নয়। সে বুঝতে পেরেছে তার স্বার্থ স্পেনের সরকার-পক্ষের জয়ের মধ্যেই নিহিত। আর বোধ করি, সেই কারণেই ফ্রান্স থেকে সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র স্পেনে আসছে।

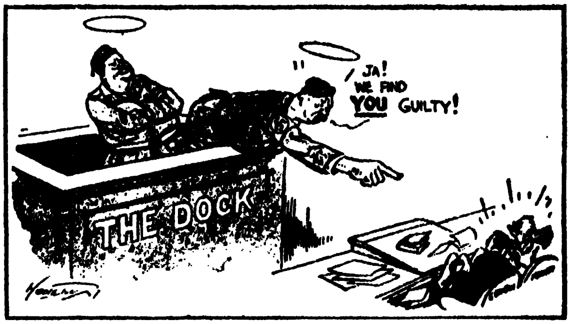
জেনেরাল ফ্রাঙ্কো

এই প্রসঙ্গে জেনেরাল ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কোর সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। আমাদের এ দেশের খবরের কাগজে তাঁকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে তাঁকে বাচ্চা-ই-সাকোর স্পেনীয় সংস্করণ বলে ভুল করা স্বাভাবিক। অন্য ডিক্টেটর-দের মত তিনি রাজনীতিক ষড়যন্ত্র এবং আত্ম-প্রচারের দ্বারা বড় হন নি। তিনি অস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং তাঁর কৃতিত্বও সেইখানে। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি জেনেরাল বেরেঙ্গুয়েরের অধীনে মরক্কোয় যুদ্ধ করতে যান। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে তিনি যুদ্ধে যেতেন। সুতরাং সহজেই তাঁকে চেনা যেত। ফলে তাঁর পেটে গুলি লাগে। এর অল্প কিছুদিন পরে তিনি মেজরের পদে উন্নীত হন।

এর পরে তিনি স্পেনীশ লিজীয়ন গঠনে আত্ম-নিয়োগ করেন। প্রথমে এই স্বল্পভাষী, চিন্তাশীল অধিনায়ক সৈন্যদলের অপ্রিয় হয়ে পড়লেন। ক্রমে তাঁর সাহস এবং স্পষ্টবাণী ধীরে ধীরে সকলের চিত্ত জয় করল। তারপরে এই বাহিনী নিয়েই তিনি রিফদের কাছ থেকে মেলিল্লা জয় করেন। দু'বার তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান মিলিটারী-মেডালে ভূষিত হন। এবং ১৯২৬ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে জেনেরাল হন।

ফ্রাঙ্কোর পিতা গ্যালিসিয়ার অন্তর্গত ফেরোলের নৌ-সেনাপতি ছিলেন।

ফ্রাঙ্কোর আর একটি কৃতিত্ব সারাগোসায় সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯৩১ সালে রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টি বন্ধ ক'রে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্কোরও কাজ



আসামীর কাঠগড়ায়। হিটলার (ইংরাজ ও ফরাসীকে)—বিলক্ষণ! আমাদের বিচারে তোমরাই অপরাধী। —বার্মিংহাম গেজেট

যায়। তারপর নরম-পন্থীদের হাতে শাসনভার এলে তিনি বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সেখান থেকে তাঁকে পাঠান হয় অষ্ট্রিয়াস্ বিদ্রোহ-দমনে। তার পরে মরক্কো-বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন।

ফ্রাঙ্কো স্বল্পভাষী এবং কিছুতে বিচলিত হন না। গোঁফ-দাড়ি কামান, হাস্যময় মুখ। মাথায় নেপোলিয়ানের সমান উঁচু। তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং কর্তব্য-নির্দ্ধারণে কখনই বিলম্ব হয় না। তাঁর সমর্থনকারী বিভিন্ন দলের একতা রক্ষার ব্যাপারেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত বড় বিচক্ষণ সেনাপতি হয়ে তিনি মাদ্রিদ্ আক্রমণের মত ভুল কি ক'রে করলেন!

সে যাই হোক, ফ্রাঙ্কোর দেশপ্রীতি অকৃত্রিম। অভিজাত

সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কোন দরদ নেই। কিন্তু যদি তিনি জয়লাভ করেন, তাঁর মুস্কিল বাধবে রাজনীতিজ্ঞানের অভাবে।

পোর্টুগালের সমস্যা

স্পেনের নিকটতম প্রতিবেশী পোর্টুগাল। গত দশ বৎসর যাবৎ এই রাজ্য এক রকম নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে যবনিকার অন্তরালেই ছিল। অকস্মাৎ দেখা গেল, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে তার অংশও সামান্য নয়। স্পেনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ কমিটী গঠনে সে এত জোর বাধা দিয়েছিল যে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যথেষ্ট ভয় হয়েছিল, পাছে তার জন্যে বিশ্বশান্তির সমস্ত চেষ্টাই বা ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে যখন বৈঠকে যোগ দিলে, তখনও সে যত গোলযোগ বাধিয়েছে, এমন আর কেউ নয়। দেখা গেল, সেও ইটালী এবং জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ইউরোপের বদ-ছেলের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

পাশাপাশি দেশ হলেও সকল দিক দিয়েই স্পেনের সঙ্গে পোর্টুগালের পার্থক্য অনেক। জাতি হিসাবে এরা আইবেরিয়ান। জলবায়ু এই দুই দেশের এক নয়। অত্যন্ত শীত এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের ফলে স্পেনের জাতীয় চরিত্রে এসেছে অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্য। আর ঠাণ্ডা, বর্ষাপ্রধান আবহাওয়ায় পোর্টুগীজরা হয়েছে ঢিলা, নিরিবিলি ধরণের জাত। লিসবন হল পুরোনো, গোঁড়া, পরিবর্ত্তন-বিরোধী, স্বপ্নপুরী। আর মাদ্রিদ একেবারে হালের সহর, অস্থির, কর্ম্মচঞ্চল। দুই দেশেরই অবশ্য আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু পোর্টুগাল স্পেনের মত অতখানি দরিদ্র নয়। এই সব নানা কারণে পোর্টুগাল বহুকাল গোলমাল থেকে দূরে দূরে থাকত।

অবশ্য, এ ছাড়াও তার দূরে থাকার আরও একটা কারণ ছিল। তার আর্থিক স্থিতি অনেকখানি বৃটেনের উপর নির্ভর করছে। বৃটেনের কাছে তার দেনার পরিমাণ ১৫ কোটি ডলার। লিস্‌বনকে চিরকাল প্রয়োজনের সময় টাকা জুগিয়েছে লণ্ডন। লিসবনের সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কো ন্যাশনাল আলট্রামেরিনো সম্পূর্ণভাবে অ্যাংলো-পোর্টুগিজ ক্যলোনিয়াল এণ্ড ওভারসীজ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পরিচালিত। এটা লণ্ডনের একটা কোম্পানী এবং পোর্টুগাল ও তার উপনিবেশের অনেকগুলি ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই কারণে অনেকে পোর্টুগালকে বৃটেনের "অর্থনৈতিক উপনিবেশ" (Economic Colony) বলে থাকে। ১৩৭৩ সাল থেকে বৃটেনে আর পোর্টুগালে বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব ইতিপূর্ব্বে আর চিড় খায়নি। বরং মাঝে মাঝে তাতে নতুন করে চুণকামই করা হয়েছে। ভারতে গোয়া, দমন, দিউ পোর্টুগালের হাতে। এই জন্যও বৃটেন পোর্টুগালের বন্ধুত্ব সর্ব্বদা বজায় রাখার চেষ্টা ক'রে এসেছে।

এই সব নানা কারণে পোর্টুগাল এতকাল আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বৃটিশ উপনিবেশের মত ব্যবহার করে এসেছে। বড় জোর বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ডের মত। ইটালীর সঙ্গে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় জেনেভায় আঠার জন সদস্য নিয়ে যে কমিটী গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি হয়েছিলেন পোর্টুগীজ প্রতিনিধি। সেনর ভ্যাস্‌কনসেলস্‌ জাতিসঙ্ঘে সমানে বৃটেন ও ফাসিষ্ট-বিরোধী অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাজ ক'রে এসেছেন।

স্বার্থের সংঘাত

তার পর নিস্তরঙ্গ জীবনে চঞ্চলতা জাগল প্রথম, গত বৎসর, যখন হিটলার তার আফ্রিকার হৃতরাজ্য ফিরে চাইলেন। ভার্সাই সন্ধির ফলে এই রাজ্য বৃটেনের করতলগত। কিন্তু ভয় পেলে পোর্টুগাল। আফ্রিকায় তারও একটা বিস্তীর্ণ, সমৃদ্ধ রাজ্য আছে। তার উপর হিটলারের দৃষ্টি পড়া বিচিত্র নয়।

এমন সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী আফ্রিকায় আরও বেশী অংশ দাবী করেছিল। মরক্কোর উপর কাইজারের লুব্ধদৃষ্টি দেখে বৃটেন এবং ফ্রান্স বিচলিত হয়ে উঠেছিল। বৃটেন তখন পোর্টুগালের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে জার্ম্মানীকে তুষ্ট করার জন্যে গোপনে একটা চুক্তি করেছিল। তাতে স্থির হয়েছিল, পোর্টুগাল তার অংশ থেকে কিছুটা জার্ম্মানীকে বিক্রি করে দিক। ভাগ্যক্রমে এই ব্যবস্থা বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই মহাযুদ্ধ বেধে গেল। নইলে পোর্টুগালের অদৃষ্টে কি যে হ'ত, কে জানে। সেবারে আফ্রিকার উপনিবেশ রক্ষা করবার জন্যেই

তাকে বাধ্য হয়ে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে ১৯১৮ সালে যখন যুদ্ধবিরতি হল, তখন পূর্ব্ব-আফ্রিকার জার্ম্মান সৈন্য পোর্টুগীজ উপনিবেশের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার পর থেকেই উপনিবেশের ব্যাপারে পোর্টুগালের অবস্থা হয়েছে ঘর-পোড়া গরুর মত। রক্ত-মেঘ দেখলেই বিচলিত হয়ে পড়ে। এমন কি কিছুকাল পূর্ব্বে একটা রেল-পথ নির্ম্মাণের ব্যাপারে বেলজিয়ামকে আফ্রিকার সামান্য একটুখানি জায়গাও বিক্রয় করবার জন্যে পোর্টুগালকে রাজি করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তার ভয়, এই নজির দেখিয়ে পরে আবার না আরও বেশী জায়গা বিক্রয় করতে হয়।

তা' ছাড়া মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকার উপনিবেশের উপরে তার মমতাও অনেক গুণে বেড়েছে। আগে বিস্তীর্ণ অরণ্যের কোলে কোলে এই সব ঘুমন্ত জনপদের কোনো মূল্যই ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি এই সব স্থানের সমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। লুয়েনকো মার্কিস, বাইরা এবং লোবিটোর বন্দরে বহু রেলপথ এসে শেষ হয়েছে, যার ফলে দূরবর্ত্তী স্থান থেকে তামা, শস্য এবং গোরু-মহিষ প্রভৃতি আমদানী সহজ হয়েছে। আর, এই বর্ত্তমান সমৃদ্ধিই তার আরও ভয়ের কারণ হয়েছে।

ভয়ের আরও নানা কারণ ঘটেছে। একটি এই যে, একটা কথা উঠেছে পোর্টুগীজের উপনিবেশের শাসন মোটেই সন্তোষজনক নয়। স্থানীয় অধিবাসীদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়। অর্থাৎ পোর্টুগাল সাম্রাজ্য-শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হাইলে সেলাসীর হাত থেকে আবিসিনিয়া ছিনিয়ে নেবার আগে ইটালীও এমনি অভিযোগ তুলেছিল। তার উপর দক্ষিণ-আফ্রিকার রক্ষামন্ত্রী মিঃ অস্ওয়াল্ড পিরাও এমন একটা কথা বলেন, যাতে পোর্টুগালের অস্বস্তি আরও গেল বেড়ে। তিনি বললেন, জার্ম্মানী তার আফ্রিকার হৃত রাজ্য ফিরে পাবে, কথা এখন আর ভাবা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এও ভাবা যায় না যে, আফ্রিকায় জার্ম্মানীর কোন রাজ্যই থাকবে না। এ কথায় কারও বুঝতে দেরী হল না যে, মিঃ পিরাও পোর্টুগীজ রাজ্যের দিকেই আঙুল দেখাচ্ছেন।

সেই সঙ্গে বৃটেন যখন জার্ম্মানীর দাবী সরাসর প্রত্যাখ্যান করলে, তখন ভয় আরও বাড়ল। ১৯৩৬ সালে সাম্রাজ্য হারাবার ভয়ে পোর্টুগাল রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এই বিভ্রাটের সঙ্গে আবার স্পেনের সমস্যা এসে যোগ দিল। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্পেনের রক্ষণ-পন্থীদের হারিয়ে যারা শাসন-ভার হাতে নিলে, তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বোঝা গেল, কমিউনিজমের আর দেরী নেই। জোর গুজব উঠতে লাগল, পোর্টুগালেও সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হল ব'লে। দুশ্চিন্তায় পোর্টুগালের রক্ষণ-পন্থী সরকার ঘেমে উঠলেন।



"আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে!" ফ্রাঙ্কোর জয়যাত্রা।

—গ্লাসগো রেকর্ড

পোর্টুগালের শাসন-পদ্ধতি

পোর্টুগাল নামে গণতান্ত্রিক (রিপাবলিক) হলেও আসলে সেখানে ফাসিষ্টদের মত ডিক্টেটরী-প্রথাই বলবৎ। শাসন রশ্মি এ্যান্টোনিও ডি অলিভাইরা সালাজারের হাতে। এই বিদ্বান, শান্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক অর্থনীতির অধ্যাপক। পোর্টুগালের রাষ্ট্রসভার (National Assembly) সদস্য প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তার ভোটে নির্ব্বাচিত হন। এ ছাড়া একটি কর্পোরেটিভ কাউন্সিল আছে। সেটি জেলা ও কর্পোরেশনগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু এ দুইটি সভাই যে শাসন-পরিষদের (Executive Council) অধীনে, সেটি সালাজারের হাতের মধ্যে। রাষ্ট্রসভা কিংবা কাউন্সিলের শাসন-পরিষদ-গঠনে কোন হাত নেই, পরিষদের সিদ্ধান্ত নাকচ করারও অধিকার নেই। এই শাসন কায়েম করার জন্যে

সালাজার যে রকম সুসজ্জিত সৈন্য-বাহিনী, পুলিশ এবং গুপ্তচরের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে জন-সাধারণ ভয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে কিংবা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে সাহস পায় না।

অবশ্য সালাজার বাজেট-নিয়ন্ত্রণে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও স্কুল-নির্ম্মাণে এবং শান্তি-প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন



নিরপেক্ষ নীতি। স্পেনীয় সরকারের কাছ থেকে নিরপেক্ষ কমিটীর কাছে ডেস্‌প্যাচ্ আসিয়াছে। কিন্তু পড়িবে কে? লেখা স্পেনীস ভাষায়। —ইল্ ফোর টোরেন্টি, ফ্লোরেন্স

করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল থাকলে হয় তো কোন অসন্তোষই দেখা দিত না। কিন্তু ব্যবসার বাজার মন্দা, বহু লোক বেকার, শ্রমিকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পল্লী-অঞ্চলে কৃষকের মজুরী সপ্তাহে পঞ্চাশ সেণ্ট মাত্র। এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে স্পেন-সীমান্ত থেকে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আবির্ভাব অসম্ভব নয়। এর উপর সালাজারের বিরোধী একটা উগ্র ফাসিষ্ট দলও আছে। সুতরাং স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে উগ্রতর পথে মোড় ফিরতে দেখে পোর্টুগালের ফাসিষ্ট সরকার যে বিদ্রোহী ফাসিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি-পরবশ হবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। এই সব কারণেই পোর্টুগাল তার পুরান বন্ধু এবং মুরুব্বী বৃটেনকে উপেক্ষা ক'রে প্রকাশ্য ভাবে জেনেরাল ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করছে।

যুদ্ধ কি বাধবে?

এই সমস্ত আলোচনার পরে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে,—যুদ্ধ কি বাধবে? বিখ্যাত লেখক মিঃ এমিল লাডউইগ একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে বলেছেন, নিশ্চয়ই বাধবে। "বাধবে এই জন্যে যে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে জার্ম্মানী তার অংশ অভিনয়ের এখনও সুযোগ পায় নি। তার বিশ্বাস সেই সুযোগ এতদিনে এসেছে। বাধবে এই জন্যে যে, জার্ম্মানী তার পশুশক্তির সঙ্গে যোগ ক'রেছে ফাসিজ্‌মের দার্শনিক তত্ত্ব। কারণ জাতিকে আত্মোৎসর্গের জন্যে ডাক দিতে হলে এই তত্ত্বটুকু চাই।

"অনেকে মনে করেন, এতদিন জার্ম্মানী যে ভাবে হুম্‌কি দেখিয়েই কাজ সারলে, শেষ পর্য্যন্তও তাই করবে। এ অনুমান ভুল। অবশ্য হিটলারেরও তাই ইচ্ছা; সংঘর্ষ বাঁচিয়ে কাজ হাঁসিল করতে কে না চায়? কিন্তু তা হবে না। ফ্রান্স অবশ্যই শান্তি চায়। শান্তি চায় ইংলণ্ডও। কিন্তু ডিক্টেটারীর একটা গতি আছে, যার বেগ রোধ করা নেপোলিয়নের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্‌ও যুদ্ধ এড়াতেই চেয়েছিলেন, তবু সেই যুদ্ধই বাধল। পশুবলের উপর যে ডিক্টেটারীর সৃষ্টি এবং স্থিতি, তার লয়ও সেই পশুশক্তির মধ্যেই নিহিত। এই প্রচণ্ড আকর্ষণের হাত থেকে জার্ম্মানীরও অব্যাহতি নেই। লড়াই তাকে করতেই হবে।"

বর্ত্তমান রাষ্ট্রজগৎ

…মনুষ্যসমাজ রাষ্ট্রবিষয়ে মৃতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অচিরে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। যে পরিবর্ত্তনে আবার মনুষ্যসমাজের সুপ্রভাতের অথবা রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যাবস্থার উদয় হইতে পারে, সেই পরিবর্ত্তন কখনও পাশ্চাত্য সোস্যালিজম্ ও বল্‌শেভিজম্‌পন্থী অখণ্ডিবের দ্বারা যে হইতে পারে না, তাহা মানুষ অদূরভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে। উহার জন্য যাহা চাই, তাহা পাইতে হইলে, মানুষকে তাহার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে মিলিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে …

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

সাধনার যে বিজন-ঠাকুরপো তরঙ্গের বাবা, তিনি ছিলেন প্রোফেসার। বছর দুই তরঙ্গ যে স্বামীর ঘর করিয়াছে, তিনিও ছিলেন প্রোফেসার—তরঙ্গের বাবার চেয়ে বড় ডিগ্রীধারী আর বেশী নাম-করা। দু'জন প্রোফেসারের কাছে কত কিছুই যে তরঙ্গ শিখিয়াছে। তবে বাঙ্গালীর মেয়ে-বৌ যা কিছু শেখে শুধু কল্পনা করার জন্যই শেখে—এবং কল্পনা করিতে করিতে কারও কারও কল্পনা আকাশ-পাতাল ছাড়াইয়া যায়। যন্ত্রের মত এটা করিয়া গেলে কেউ বিশেষ কিছু মনে করে না, বড় জোর আনমনা উড়ু-উড়ু স্বভাবের জন্য একটু নিন্দা রটে। লোকে বলাবলি করে যে, এর বড় আনমনা উড়ু-উড়ু স্বভাব, এ যদি সর্ব্বনাশ না করে ছাড়ে তো আমার কান কেটে নিও। কিন্তু এমন উদ্‌ভ্রান্ত যদি কারও কল্পনা হয় যে, লোকের বলাবলির ভয় না করিয়া কল্পনাটা পরিণত করিতে যায় কাজে, তখন বাধে সাংঘাতিক গোলমাল। এমন গোলমাল বাধে যে, তরঙ্গের স্বামীর মত পুরাপুরি আধুনিক স্বর্গীয় স্বামীর আধা-আধুনিক আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে টিঁকিতে পারে না।

তার উপর যখন বাপের বাড়ী বলিয়া কিছু না থাকে, আর অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ী বাস করা যে সম্ভব হইবে না তাও ভাল করিয়া জানা থাকে, তখন তরঙ্গের মত মেয়ে সাধনার মত কারও বাড়ীতে আসিয়া বাস করে,—যার সঙ্গে সম্পর্কটা আসলও নয়, নকলও নয়, তবু অতীব ঘনিষ্ঠ।

তবে আশ্রিতা হিসাবে নয়, খরচ দিয়া। প্রোফেসার বাবা, প্রোফেসার স্বামী তরঙ্গের জন্য কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য দেবর-ভাসুরের প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া তরঙ্গ তার কাছে আসিয়া থাকিতে চায় শুনিয়া সাধনা যেমন আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, মাসে মাসে নিজের খরচ বাবদ সে টাকা দিবে শুনিয়া হইয়াছিলেন তেমনি আহত।

'কেন? একবেলা দু'টি খাবে, তাও আমি তোমায় দিতে পারব না তরু?'

তরঙ্গ একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, 'একবেলা তো খাব না খুড়িমা। চারবেলা খাব। খাওয়া-দাওয়া চলাফেরার সব নিয়ম-কানুন আমি ঠিক করে ফেলেছি। আমার নিজের নিয়ম মেনে চলতে চাইলাম বলেই তো ওখানে সবাই ক্ষেপে গেল। তবে আমি সাধ্য করি খুড়ি-মা, তোমার কোন অসুবিধা হবে না, তোমার অত কুসংস্কার নেই জানি বলেই তো তোমার কাছে এলাম।'

সাধনা বলিয়াছেন, 'সংসারে যা খুসী তাই করলে কি চলে তরু?'

'সে রকম যা খুসী তাই করা তো নয়,—অসংযমের কথা ভাবছ তো? আমার সংযম দেখে তুমি ভয় পেয়ে যাবে খুড়িমা। যা দরকার নেই তা করব না, যা দরকার নেই তা খাব না, যা দরকার নেই তা ভাবব না—'

অনেকক্ষণ ধরিয়া তরঙ্গ সাধনাকে বুঝাইয়াছিল,—তার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাধনার কথা। স্তরে স্তরে জীবনকে সে ভাগ করিয়া ফেলিবে, এখন তো উনিশ বছর বয়স তার, চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ঘরের কোণে সে দেহ-মনকে বশ করার শক্তি অর্জ্জনের জন্য তপস্যা করিবে, তিরিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী শুধু অন্তঃপুরে ঘুরিয়া মেয়েদের বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও শিখিয়া লইবে কি করিয়া অজানা অচেনা মেয়েদের নানাকথা শিখাইতে হয়, তারপর আরম্ভ করিবে আসল কাজ—প্রবল প্রকাণ্ড আন্দোলন, দেশকে যা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, ঘরে ঘরে হৈচৈ বাধাইয়া দিবে।—'একটু বয়েস না হলে তো কেউ আর আমার কথা শুনবে না খুড়ি-মা!'

শুনিতে শুনিতে সাধনার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, আহা, এই বয়সে শোকে তাপে মাথাটা খারাপ

হইয়া গিয়াছে মেয়েটার। ওকে তো একটু স্নেহ-মমতা করা দরকার!

সেদিম তর্কও তিনি করেন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা সে তো পরের কথা—যে ভাবে ভাল লাগে, তুমি সেই ভাবে এখানে থেকো তরু। কিন্তু টাকা-পয়সার কথাটা তুলো না, তুমি আমার মেয়ের মত, খাইখরচ বাবদ তুমি আমায় টাকা দেবে, আমার তা সইবে না বাছা।'

তরঙ্গ বলিয়াছিল, 'কেন সইবে না খুড়ি-মা? আমার যদি না থাকত, তা হলে অন্য কথা ছিল। তা ছাড়া, তুমি যদি খরচ না নেও, আমি এখানে থাকব না।'

সাধনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এও তরঙ্গের মাথা খারাপ হওয়ার একটা লক্ষণ। আর কিছু তিনি বলেন নাই।

কিন্তু স্নেহ-মমতা করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, তরঙ্গ ওসব চায়ও না, তরঙ্গের ওসব প্রয়োজনও নাই। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের যে প্রণালী সে ঠিক করিয়াছে, তার মধ্যে হৃদয়টা গিয়াছে একেবারে বাদ। সুখ, সুবিধা, আলস্য, আনন্দ, উপভোগ,—এ সমস্তের জন্য এতটুকু ফাঁক সে প্রতিদিকার জীবনে রাখে নাই। ঠিকা-ঝিকে তরঙ্গ দু'দিনের মধ্যে বিদায় দিল, নালা আর বাড়ীর নালার চেয়ে নোংরা অংশ সাফ করিবার জন্য যে মেথর আসিত, তারও আসা বারণ হইয়া গেল।

'না খুড়ি-মা, বাধা দিও না। এ সব আমার দরকার।'

বাসন মাজা, জল তোলা, মসলা বাটা, রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, বিছানা তোলা, জামা সেলাই করা, যত কিছু কাজ আছে বাড়ীতে, মনে হইল সব যেন তরঙ্গ একা অধিকার করিতে চায়।

'না খুড়ি-মা, বাধা দিও না। এসব আমার দরকার।

'এত কাজ করে কেউ বাঁচে তরু? রাত জেগে তুমি আবার বই পড়।'

'অতিরিক্ত কিছু তো করব না খুড়িমা। কতটা কাজ আমার সইবে তা তো জানি না, কি নিয়মে কখন কি করলে ভাল হয় তাও জানি না,—তাই পরীক্ষা করার মত এ ভাবে আরম্ভ করেছি। আস্তে আস্তে কমিয়ে বাড়িয়ে সময় বদলে সব খাপ খাইয়ে নেব খুড়ি-মা, কিছু ভেব না। রাত জেগে পড়া চলবে না, সেটা বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে দুপুরে সেলাই না করে পড়ব।'

ধীরে ধীরে তাই করিয়াছে তরঙ্গ, খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। কয়েকটা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, অসহিষ্ণু ব্যস্ততার সঙ্গে অতিরিক্ত কম সময়ে যে সব কাজ করিত, সে সব কাজে প্রয়োজনীয় সময় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সকালের কোন কাজ লইয়া গিয়াছে বিকালে, বিকালের কোন কাজ লইয়া আসিয়াছে সকালে।

মাস তিনেক পরে বাড়ীতে মেথরকে আসিবার অনুমতিও দিয়াছে।

এমন যে তরঙ্গ, তার জন্য একদিনে জহর কাণ্ড বড় কম করে নাই। গরমে ও গুমোটে ভাপসা একটা দিনে পরীক্ষার হলে বসিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া লিখিয়াছে প্রশ্নপত্রের জবাব, হৃদয় বিনিময় করিতে গিয়া তরঙ্গের সঙ্গে করিয়াছে মাথা ঠোকাঠুকি, তিন হাজার লোকের সামনে পরিচয় দিয়াছে মাথা খারাপ হওয়ার, হোটেলে গিয়া জীবনে প্রথম টানিয়াছে পেগ, তার পর সহরের অনেক দূরে তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিয়া গিয়াছে জেলে।

অথচ অনুপমের মারফতে খবরটা শুনিয়া তরঙ্গ শুধু বলিল, 'মোটে একুশ দিন!'

সাধনা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'জহরের আরও বেশী দিন জেল হলে তুমি বুঝি খুসী হতে তরু?'

তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'তা হতাম। এ তো জেল নয় খুড়ি-মা, ওষুধ। একুশ দিন জেলে থেকে ভাবপ্রবণতা যদি একটু কমে তো জহর-দা বাঁচবে।'

'কি যে বল তুমি ঠিক নেই।'

'ঠিক কথাই বলি। শুনতে ভাল লাগে না।'

সাধনা গম্ভীর মনে বলিলেন, 'নাই বা বললে ঠিক কথা? যা শুনতে ভাল লাগে না মিছি মিছি তা বলবার দরকার? মিষ্টি কথা বলা আর দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলা হল মেয়েমানুষের কাজ, এমন কথা যদি খালি খালি তুমি বল যা শুনলে মানুষের রাগ হয়, তোমায় তো কেউ দু'চোখে দেখতে পারবে না।'

কেউ যদি ঠিক কথা না বলে, সব যে তা হলে বেঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি ঠিক কথা বললেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে ভাব?'

'খানিকটা তো হবে।'

সাধনা রাগ করিতেও ভালবাসেন না, বকুনি দিতেও ভাল বাসেন না। প্রুফ-রীডারের মত তিনি শুধু সংশোধন করিয়া যান,—মানুষকে আর সংসারকে। বানান না জানা প্রুফ-রীডারের মত হয়ত ভুলের সংশোধনেও তাঁর ভুল হয়, যা ভুল নয় তার সংশোধনও ভুল হয়, কিন্তু সে জন্য সংশোধন করিতে তিনি কোন অসুবিধা বোধ করেন না। কারণ, তিনি নিজে তো জানেন, তিনি যা সংশোধন করিয়াছেন তাই ঠিক। কিন্তু বাংলা প্রুফ-রীডারের সংস্কৃত প্রুফ দেখার মত, তরঙ্গের বেলায় তিনি পড়েন বিপদে। তরঙ্গকে শোধরাইতে গেলেই তাঁর মনে হয়, নিমি আর অনুপমের বেলা যে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগান, এর বেলা সে সব কাজে লাগিবে না। সংসারে কি নিয়মে চলা উচিত সে উপদেশ তিনি যেন দিতে বসিয়াছেন সন্ন্যাসিনীকে।

তরঙ্গ তর্ক তুলিলেই সাধনার উপদেশ তাই পরিণত হয় মিনতি ও আপশোষে। মাথা নাড়িয়া তিনি বলেন, 'না তরু, তোমার কথাবার্ত্তা চালচলন দেখে আমার বড় ভাবনা হয়। কারো না কারো আশ্রয়ে মেয়ে-মানুষকে থাকতেই হবে, সবাই যদি তোমার কথা শুনে বিরক্ত হয়—'

তরঙ্গ আর তর্ক করে না, করে কাজ। সাধনা কাজের খুঁত ধরিলে নীরবে সায় দিয়া খুঁত সংশোধন করে। কিন্তু গভীর একটা জ্বালা বোধ করে তরঙ্গ, একটা অচিন্তিত আত্মগ্লানি জাগে। এখন তার তপস্যার সময়, বিরাট এক ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে তৈরী করিতেছে। তবু, সাধনার মত মানুষকে এই সব তুচ্ছ ছোট ছোট কথাগুলিও যদি সে এখন বুঝাইতে না পারে, তপস্যা সাঙ্গ করিয়া সাধনার চেয়েও অপদার্থ হাজার হাজার মানুষকে আরও বড়, আরও ব্যাপক কথাগুলি সে কি বুঝাইতে পারিবে? প্রতিদিন এত যে কষ্ট সে করিতেছে, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তার কোন ফলই ফলিবে না। মানুষের মধ্যে নিজে সে কেবল হইয়া থাকিবে অদ্ভুত, বেমানান।

ভাতের হাঁড়িতে চাল দিয়া চিংড়ীমাছ সিদ্ধ রাঁধিবার জন্য সরিষা বাটিতে বসিয়া তরঙ্গ এই গ্লানি ও হতাশার ভাব দমন করিবার চেষ্টা করে, এ চেষ্টাও তার তপস্যার অঙ্গ। দুঃখ,বেদনা,হতাশাকে সে মনে স্থান দিবে না বলিয়া নয়, সমস্ত বাহুল্য মনোভাবকে, সমস্ত বাহুল্য অনুভূতিকে ইচ্ছামত দমন করিবার ক্ষমতা তার চাই। অসংখ্য হাজার হাজার নরনারী একদিন তাহার কথা শুনিতে রাজী হইবে কি না, এ সমস্যার বিচার করিতে সে রাজী আছে, কারণ সেটা প্রয়োজনীয় চিন্তা,—কিন্তু ওই সমস্যার বিচারের সঙ্গে মনটা খারাপ করিয়া ফেলিতে সে রাজী নয়। কি লাভ আছে মন খারাপ করিয়া? তার জীবনে, তার জীবনের পরিকল্পিত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে কোন্ কাজে লাগিবে মন খারাপ করা? কি যুক্তিই বা আছে মন খারাপ করিবার? এই অনাবশ্যক বাহুল্য মানসিক অবস্থাটিকে কেন সে প্রশ্রয় দিবে?

সরিষা বাটা শেষ হইয়া যায়, তবু তরঙ্গের মন কিন্তু ভাল হয় না। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া হইয়া যায়, ভাবে যে, প্রায় দু'বছর চেষ্টা করিয়া নিজের মনকে সে এটুকু বশও করিতে পারে নাই না কি? ভাবিয়া আরও বেশী খারাপ হইয়া যায় মন। তখন তরঙ্গ বুঝিতে পারে, মনের একটা চাপাপড়া জটিল আবর্ত্ত আজ মুক্তি পাইয়াছে। মন খারাপ হওয়া দমন করিবার চেষ্টার মধ্যে পর্য্যন্ত আজ তার মন খারাপ হওয়ার কারণের কারখানা বসিয়াছে। আজ তার মহাপরীক্ষার দিন।

গরমের দিন। রান্নাঘর আরও বেশী গরম। তরঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। গরমের দিনে উনানের গরমে ঘামে ভিজিবার একটা কষ্ট আছে, এতদিন এ কষ্ট সহ্য করিতে তরঙ্গ গর্ব্ব বোধ করিয়াছে, আজ তার মনে হইতে লাগিল, এসব অকারণ, যাচিয়া এ কষ্ট সহ্য করা শুধু বোকামি। এরকম কথা মনে হওয়ার জন্য রাগে তরঙ্গের গা জ্বালা করিতে লাগিল। গা জ্বালা করিবার জন্য নিজের উপর তার অভিমানের সীমা রহিল না। আর অভিমানের সীমা না থাকায়—

একটা বেতের মোড়া আনিয়া অনুপম রান্নাঘরে বসিল। 'ঘামলে তোমায় যেন কেমন, কি রকম দেখায় তরঙ্গ।'

'কি রকম দেখায়?'

'রোদের মধ্যে বৃষ্টি হলে যেমন দেখায়, তেমনি।'

তরঙ্গ ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না। হাত ধুইয়া একদিকের দেয়ালে বসান লম্বা কাঠের তাক হইতে এক প্লেট কাসুন্দী-মাখা জাম পাড়িয়া অনুপমকে দিল। তারপর ঢাকনি লাগান এলুমিনিয়মের পাত্রে চিংড়ীমাছে নুন-মসলা মাখিতে মাখিতে বলিল, 'আর কেউ এ রকম কবিত্ব করলে আমার গা জ্বলে যায়, কিন্তু তোমার মুখে শুনলে খারাপ লাগে না। কবিত্ব করাটা বোধ হয় তোমার পক্ষে স্বাভাবিক অভ্যাস।'

অনুপম জামের বীচি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'কবিত্ব করলাম বুঝি? কথাটা মনে হল, তাই বললাম।'

'এ রকম কথা মনে হওয়া আর বলাকেই কবিত্ব করা বলে। সরল ভাবে কবিত্ব কর বলেই বোধ হয় তোমাকে

সইতে পারি। তা ছাড়া, তোমার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। দু'বছর বলে বলে তোমায় সিগারেট ছাড়াতে পারলাম না!'

অনুপম হাসিয়া বলিল, 'তুমি বল বলেই একেবারেই ছাড়ি নি। তোমার হুকুম শুনব কেন?'

তরঙ্গ মুখ তুলিয়া বলে, 'হুকুম আবার কিসের? খুড়িমাকে এত হিসেব করে সংসার চালাতে হয়, তোমার একটা পয়সা নষ্ট করা উচিত নয়।'

'মার পয়সা তো নষ্ট করি না, আমার টুইসনির টাকায় খাই।'

'তাই বা খাবে কেন? সিগারেটে যে টাকা উড়িয়ে দাও, খুড়িমাকে সে টাকাটা দিতে পার না?"

অনুপম একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলে, 'সেই জন্যেই তো কমিয়ে দিয়েছি, একটা দুটোর বেশী খাই না।'

তরঙ্গ মুখ নামাইয়া বলে, 'একটা দুটো নয়। কাল বেলা দশটার সময় এক প্যাকেট কিনে এনেছিলে, রাত্রে ঘুমোন পর্য্যন্ত ছ'টা খেয়েছ।'

এ কথায় লজ্জা পাওয়ার বদলে অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'তুমি গুণে দেখেছ না কি?'

'গুণব না? আলো জেলে ঘুমোও কেন?'

'আমি আলো জেলে ঘুমোই বলে কটা সিগারেট খেয়েছি গুণে দেখেছ, ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না।'

তরঙ্গ এবার হাসিল।

'কাল আলো নেভাতে গিয়ে তোমার পকেট থেকে প্যাকেট বার করে গুণে দেখেছি।'

অনুপম গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তুমি তা হলে চুপি চুপি আমার পকেট হাতড়াও?'

'চুরি করবার জন্য হাতড়াই না কিন্তু।'

অনুপম গম্ভীর মুখেই খানিকক্ষণ তরঙ্গের ঘামে ভেজা মুখখানা নিরীক্ষণ করে,—আবিষ্কারকের দৃষ্টিতে। তারপর মৃদুস্বরে বলে, 'মাঝে মাঝে আমার পকেটে খুচরো পয়সা বেড়ে যায়, তা জান?'

'জানি বৈ কি। আমি বাড়িয়ে দিই, আমি জানব না তো কে জানবে?'

'কেন বাড়াও?'

'খুড়ি মার জন্যে। পকেটে পয়সা না থাকলেই তো খুড়ি মার কাছে হাত পাতবে।'

রান্নাঘরের গরমে নয়, অপমানেই মুখ লাল করিয়া অনুপম বসিয়া থাকে।

তরঙ্গ নীরবে নির্ব্বিকার চিত্তে চিংড়িমাছ সিদ্ধ করার পাত্রটির ঢাকনি ভাল করিয়া বন্ধ করে, তাকের উপর হইতে সরু খানিকটা তার লইয়া পাত্রটি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধে। তখনও অনুপমের মুখে লালাভ মেঘ সঞ্চারিত হইয়া আছে দেখিয়া বলে,.'এতে রাগ করার কি আছে? সহজ সরল ব্যাপারকে ঘোরাল ক'র না অনুদা। আমি প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব রেখেছি, যখন রোজগার করবে শোধ দিয়ে দিও—না হয় সুদও দিও কিছু, তিন কি চার পারসেণ্ট। আমি তোমায় দান করি নি, ধার দিয়েছি।'

অনুপম রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'তুমি আমার সঙ্গে আর কথা ব'ল না।'

রাত্রে অনুপম আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। আলো নিভাইতে গিয়া তরঙ্গ আলো নেভানর বদলে বিছানার কাছে গিয়া অনুপমের ঘুমন্ত মুখখানা একটু দেখিয়া বলিল, 'ঘুম আসে নি, চোখের পাতা কাঁপছে।'

শ্লেষ নয়, তরঙ্গ শ্লেষ করিতে জানে না।

অনুপম চোখ মেলিয়া বলিল, 'কেন জ্বালতন করছ? তোমার জ্বালায় একটু ঘুমোতেও পারব না?'

'আমারও ঘুম আসছে না। চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

'এত রাত্রে?'

'রাত্রি ছাড়া সহরের রাস্তায় ভিড় ঠেলে বেড়ান যায়? ওঠ, জামা পরে নাও।'

তরঙ্গের মুখে এমন শ্রান্ত গাম্ভীর্য্য অনুপম কোনদিন দেখে নাই। আর কথা বলিতে তার সাহস হইল না। উঠিয়া জামাটা গায়ে দিয়া পাম্পসুতে পা ঢুকাইয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল।

সাধনার তন্দ্রা আসিয়াছিল। তরঙ্গ তাকে ডাকিয়া তুলিল।

'আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি খুড়ি মা।'

'এত রাত্রে!'

'গরমে শরীরটা কেমন করছে।'

সাধনা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'বেড়াতে হয় ছাতে গিয়ে পায়চারি কর। এত রাত্রে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে না।'

তরঙ্গ উদ্ধত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

'কেন তাও তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে? এটুকু বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই?'

'একা তো যাচ্ছি না, অনুদা'র সঙ্গে যাচ্ছি।'

'অনু যাবে না।'

'তবে আমি একাই যাব। দরজাটা দিয়ে যাও তো অনুদা।'

সোজা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া তরঙ্গ বাহির হইয়া গেল। একটু দ্বিধা করিয়া সাধনা বলিলেন 'সঙ্গে যা অনু। কাল ওকে স্পষ্ট বলে দেব, আমার বাড়ীতে আর থাকা চলবে না।'

[ক্রমশঃ

জ্যেঠামশায়

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অতি অদ্ভুত মানুষ এই মণিলাল! মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বা গোঁফ আর লম্বা দাড়ি, পরণে ধুতি। হঠাৎ দেখিলে সাধু সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আসলে সে সাধু মোটেই নয়। বিবাহ করিয়াছিল, বৌ মরিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর বিবাহ করে নাই। কেহ বলে, বৌএর জন্যই লোকটা ওই রকম। কেহ বলে, লোকটা বুজরুক্। কেহ বলে উহার সবই ভণ্ডামি।

তা ভণ্ড হয়ত সে হইতেও পারে। কারণ টাকাকড়ির উপর তাহার অসাধারণ মমতা। গ্রামের লোককে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দেয়। লোকে বলে না কি খুব ভাল ডাক্তার, কিন্তু পয়সা ছাড়া তাহার সঙ্গে কথা নাই। একা মানুষ, তবু এত পয়সার কাঙ্গাল কেন?

অথচ সে পয়সা কারও কাজে লাগে না। এমন কি তাহারই সহোদর ছোট ভাই জীবন একবার বলিল, 'আমায় কিছু টাকা দেবে দাদা? অনিলার মাকে তা'হলে একবার কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাটা করাই।'

মণিলাল বলিল, 'যাও না কল্‌কাতায়, সেখানে ত' তোমার শালা আছে।'

'শালা আছে, কিন্তু টাকা ত' নেই!'

মণিলাল বলিল, 'টাকা আমারই বা কোথায়?'

এই বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে জবাব দিল। স্ত্রীকে আর জীবনের কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইল না। বিনা চিকিৎসায় দেশেই একদিন সে মরিয়া গেল। রাখিয়া গেল একটি মাত্র মেয়ে। অনিলা তাহার নাম। অনিলাকে জীবনই মানুষ করিতেছিল, কিন্তু কেমন করিয়া না জানি জীবনেরও একদিন ডাক পড়িল। মণিলালের হোমিওপ্যাথী কোনো প্রকারেই তাহাকে রাখিতে পারিল না। মণিলালের বোধকরি ভালই হইল।

একটি মাত্র ভাই, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির ভাগ লইয়া কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ কেহ আর টানাটানি করিবে না। অনিলা ছেলে নয় মেয়ে; তাহার বিবাহ হইবে, ছেলে হইবে—সে এখন অনেক দিনের কথা। ততদিন মেয়েটা বাঁচিবে কি মরিবে তাহার স্থিরতা নাই। মেয়েটা বাঁচুক আগে! লোকে বলিতে লাগিল, মণিলাল যে-রকম লোক, কোন্ দিন হয়ত তুকতাক্ করিয়া মেয়েটাকেও সে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, পাঁচ ছ'বছরের কুটকুটে ছোট্ট ওই মেয়েটি জ্যেঠামহাশয়কে তাহার কি মন্ত্র দিয়া যে বশ করিল কে জানে, মণিলাল নিজেই তাহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল। মণিলালের অভ্যাস—নিজেই রান্না করিয়া খাওয়া, কিন্তু অনিলার জন্যই বোধ করি একজন রাঁধুনী তাহাকে রাখিতে হইল। একজন রাঁধুনী রাখিল, একজন চাকরও রাখিল। লোকজন বলিতে লাগিল, কিছু যে না হইয়াছে তাহা নয়। গরদের ধুতি সহজে ময়লা হয় না বলিয়া যে গরদ পরে, সহজে একটি পয়সাও যে-লোক খরচ করিতে চায় না, সেই মণিলালকেই একদিন দেখা গেল, শহরে গিয়া অনিলার জন্য ভাল ভাল জামাকাপড় কিনিতেছে, হাতগুলা খালি থাকিলে ভাল দেখায় না তাই সে অনিলার জন্য কয়েকগাছি সোনার চুড়ি পর্য্যন্ত গড়াইতে দিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও অনিলা যখন রাত্রে এক-একদিন মা মা বলিয়া ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠে, উদাস দৃষ্টিতে এক-এক সময় চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে, তখন মণিলালের কেমন যেন মনে হয়। মনে হয় মেয়েটা বুঝি-বা তাহার মাকে খুঁজিতেছে। বাড়ীতে মেয়েমানুষ নাই, কেই বা তাহার মনের দুঃখ বুঝিবে!

মণিলালেরও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। আহা, মা-বাপ-হারা ওই একরত্তি মেয়ে, এমন করিয়া মনের দুঃখ চাপিয়া চাপিয়া যদি গুমরাইতে থাকে, হয়ত বা কোনদিন অসুখে পড়িয়া যাইবে। তাহার চেয়ে কাজ নাই—

মণিলাল একদিন অনিলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। কলিকাতায় অনিলার মামার বাড়ী। মামা আছে, মামীমা আছে, তবু দুটা মেয়ের মুখ দেখিতে পাইবে।

মামা বলিল, 'তা বেশ, থাক ও এইখানে।'

মণিলাল বলিল, 'আমি এমনি রাখব না। ওর জন্যে মাসে আমি পাঁচটি করে টাকা—'

কথাটা মামা শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'আজ্ঞে না। টাকা আপনাকে পাঠাতে হবে না। তবে ওর বিয়ের সময় যদি পারেন ত' কিছু সাহায্য করবেন। আমার অবস্থা তেমন ভাল নয়।'

অনিলা রহিল তাহার মামার বাড়ীতে।

এইবার আমাদের গল্প সুরু। দশ বৎসর পরের ঘটনা। অনিলার বয়স এখন পনেরো। দেখিলে আর চিনিবার জো নাই। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দরী! মামা তাহার বিবাহের জন্য মনের মত একটি পাত্রের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু মণিলালের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। সেই যে সে অনিলাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর কোনও সংবাদ নাই। টাকা পাঠানো দূরের কথা, একখানা চিঠিও সে লেখে না। লোকটা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তাই বা কে জানে!

অনিলার মামীমা বলিল, 'এই সময় সে মিন্সেকে একবার খবর দিলে হয় না? অনিলার বাবার বিষয়-সম্পত্তি

'দিচ্ছি খবর।' বলিয়া অনিলার মামা তাহাকে একখানি চিঠি লিখিল।

চিঠি লিখিবার দিন চার-পাঁচ পরেই একদিন সকালে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে মণিলাল আসিয়া হাজির! ঠিক সেই চুল, সেই দাড়ি, পরণে গরদ, পায়ে খড়ম্! এই দশ বৎসরে চুলে তাহার পাক ধরিয়াছে, কিন্তু দাঁত একটিও পড়ে নাই। আসিয়াই বলিল, 'সময় পাই না ভাই, মরবার ফুরসুৎ নেই। কই, দেখি আমার মাকে কত বড়টি হয়েছে!'

অনিলা আসিয়া তাহার জ্যেঠামহাশয়কে একটি প্রণাম করিয়া হেঁট মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিলাল বলিল, 'এই জন্তেই এখানে রেখে গিয়েছিলাম। আমার কাছে থাকলে কি আর এ চেহারা হ'তো! কাজ করে' করে' খেটে খেটে হয়ত'—

অনিলার মুখের উপর তাহার চোখ পড়িতেই দেখা গেল, বড় বড় চোখদুটি তাহার জলে ভরা।

মণিলাল বলিল, 'ও কি রে? চোখে জল কেন?'

অনিলার দুই চোখের কোণ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মণিলাল নিজের দুই চোখ বন্ধ করিয়া খানিক চুপ থাকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, 'খুব কষ্টে যদি কোনদিন পড়িস্ মা, তৎক্ষণাৎ আমায় একখানি চিঠি লিখে জানাস্। কেমন, জানাবি ত'?'

মুখে কোনও কথা না বলিয়া অনিলা তাহার মাথাটি ঈষৎ কাৎ করিয়া নীরবে তাহার সম্মতি জানাইল।

মণিলাল বলিল, 'কই ডাক্ দেখি তোর মামাকে!'

মামা আসিলে মণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'ওর বিয়ের কি কোথাও কিছু ঠিক করেছ?'

মামা বলিল, 'করেছি। কিন্তু পাঁচশ' টাকা চায়।'

'পাত্রটি ভাল?'

মামা বলিল, 'ভাল।'

মণিলালের সঙ্গে ছিল একটা গেরুয়া কাপড়ের ঝুলি। ঝুলির ভিতর হাত ঢুকাইয়া মণিলাল এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, 'ঠিক পাঁচশ' টাকাই এনেছি'। নাও ধর্।'

টাকা পাইয়া মামা অবাক্ হইয়া গেল। —লোকটা সত্যই অদ্ভুত!

অনিলার বিবাহ হইয়া গেল। বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামে তাহার শ্বশুর-বাড়ী। মধুবুনী ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া মাইল খানেক পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। তা হোক্। জামাইটি ভাল। লেখাপড়া তেমন না শিখিলেও মধুবুনীতে তাহার পৈতৃক একটা কারবার আছে। ধান-চালের ছোট একটি আড়ত। আড়তের আয় তেমন বেশী না হইলেও ছোট খাটো সংসারটি তাহাদের তাহাতেই চলে। নিজেদের জমিজমাও কিছু আছে।

অনিলার স্বামীর নাম অনিল! ভাগ্যগুণে মিলিয়াছে ভাল। অনিলের মুখ দেখিলেই মনে হয় অনিলাকে তাহার খুব পছন্দ হইয়াছে। বিবাহের পর, অনিলাকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার আগে মামাকে ও মামীকে সে বলিয়া আসিয়াছে, সংসারে তাহার মা আর ছোট ছোট দুটি ভাই। কাজেই বৌকে এখন আর সে কলিকাতায় পাঠাইবে না।

গ্রামটির নাম রতনপুর। অনিলা যখন গ্রামে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। সেই অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অনিলা দেখিল, চারিদিকে বাঁশের গাছ, ঝোপ-জঙ্গল আগাছার মাঝখানে এক-একখানি বাড়ী। ইহাই রতনপুর। তাহার নারী-জন্মের তীর্থক্ষেত্র। কাছাকাছি মাঠে কোথায় যেন শৃগাল ডাকিতেছিল। নববধূকে বরণ করিয়া লইবার জন্য শাশুড়ী বাহির হইয়া আসিলেন, পশ্চাতে আট-দশ বছরের একটি ছেলে আসিল লণ্ঠন হাতে লইয়া, ঘরের ভিতর কোথায় যেন শাঁখ বাজিল, তাহার পর পাড়াপড়শী কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে অনিলা ঘরে গিয়া ঢুকিল। বহুদিনের পুরানো দোতালা একটি দালান-বাড়ী। বাহিরের দিকে লাল লাল ইঁটগুলা যেন দাঁত বাহির করিয়া আছে, কিন্তু ভিতরের ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে তোমার মন টিঁকবে ত?'

অনিলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তা কেমন করে' বলব?'

অনিল বলিল, 'নিশ্চয়ই টিঁকবে। আসলে তুমি ত' পাড়াগাঁয়েরই মেয়ে!'

সে কথা সত্য। আসলে সে পল্লীগ্রামেরই মেয়ে। বীরভূম জেলার পল্লীগ্রামে তাহার শৈশবের পাঁচটি বৎসর কাটিয়াছে। তাহার পর পল্লীগ্রাম আর সে জীবনে কোনদিনই দেখে নাই। অনিলা নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। একা শাশুড়ীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া পরের দিন হইতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম সে নিজের হাতে গ্রহণ করিল, রান্নাবান্না বাসনমাজা কোনও কাজ করিতেই কষ্ট তাহার কিছুই হয় না, কষ্ট হয় শুধু পুকুরে স্নান করিতে। বাড়ীর পাশেই পানায় ভর্ত্তি ছোট একটি পুকুর। ঘন গাছপালার জঙ্গলে পুকুরের পাড় চারটা দিবারাত্রি যেন অন্ধকার হইয়াই থাকে। ঘাটের ধাপগুলি খেজুরগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া ঘাটের জলে গিয়া নামিতে হয়। পুকুরের জলটাও আবার ঠিক বরফের মত ঠাণ্ডা!

পল্লীগ্রামের কত মনোরম বিবরণ সে কত গল্পে উপন্যাসে পড়িয়াছে, বাল্যের আবছা স্মৃতি-বিজড়িত তাহার

সেই এত সাধের পল্লীগ্রাম! ভাবিয়াছিল তাহার সেই কল্পনার পল্লীগ্রাম, তাহার সেই স্বপ্নের পল্লীগ্রামের সঙ্গে রতনপুরের বিশেষ কোনও প্রভেদ-পার্থক্য থাকিবে না, কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে, অনিলা ততই যেন হতাশ হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে। দিবারাত্রি ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, পথ-ঘাট সব পিছল্ হইয়া ওঠে, চারিদিকে ব্যাংগুলা লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়ায়, এদিকে কেঁচো, ওদিকে কেন্নু, দিনের বেলাটা কোনরকমে কাটাইয়া সন্ধ্যায় প্রসাধন সারিয়া ভাল একখানি শাড়ী পরিয়া সে দোতলার একখানি ঘরে গিয়া চুপটি করিয়া বসে। মধু-বুনীর আড়ত হইতে অনিল যতক্ষণ না বাড়ী ফেরে, সময়টা তাহার যেন কিছুতেই আর কাটিতে চায় না। তাহার পর অনিল আসিলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দু'জনে যখন উপরে উঠিয়া যায়, আবার যখন চারিদিকে অবিরল ধারে বৃষ্টি নামে, তখন তাহার মনে হয়, যেন পল্লীগ্রামটাকে যত খারাপ সে ভাবিয়াছিল তত খারাপ নয়। তাহাদের দুজনকে এমনি করিয়া সারা পৃথিবী হইতে আড়াল করিয়া দিয়া বর্ষার জলধারা এমনি অবিশ্রান্ত গতিতে চিরকাল ধরিয়া ঝরিতে থাকুক!

কিন্তু বর্ষা চিরকাল থাকে না। ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে হঠাৎ একদিন মনে হয়, যেন মাথার উপরের আকাশটা পরিষ্কার হইয়া গেছে, কোথায়ও একবিন্দু কালো মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বর্ষাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল।

বর্ষার পর শরৎ আসিল। কাপড় শুকাইতে দিবার জন্য অনিলা সেদিন তাহাদের ভাঙ্গাবাড়ীর ছাদে উঠিয়া দেখিল, গ্রামের বাহিরে শুক্‌নো যে মাঠগুলা এতদিন খাঁ খাঁ করিত, ইহারই মধ্যে কখন যে তাহারা শস্যে শস্যে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে টেরও পায় নাই। চারিদিকে কচি কচি সবুজ ধানের গাছ প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, চারিদিকে গাছপালাগুলা বাড়িয়া উঠিয়াছে, যেদিকে তাকাইতেছে সেই দিকেই কেমন যেন একটা ঘনশ্যাম স্নিগ্ধ সজীবতা!

হাতেই পূজা আসিতেছে। অনিলা ভাবিল, পল্লীগ্রামে শারদীয়া পূজার অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার এই প্রথম। স্বামীর সঙ্গে কতই না আনন্দে তাহার দিন কাটিবে। ষষ্ঠীর দিন হইতে ত্রয়োদশীর দিন পর্য্যন্ত অনিলকে সে তাহার কাছ-ছাড়া করিবে না। এই কয়টা দিন কারবার তাহার বন্ধ থাকিলেই বা ক্ষতি কি! এমন একটা অজানা আনন্দের প্রতীক্ষায় তাহার দিন কাটিতেছে, এমন দিনে তাহার শাশুড়ীঠাকুরাণী অকস্মাৎ জ্বরে পড়িলেন। হন্ হন্ করিয়া কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিল। তাহার পরদিন জ্বরে পড়িল তাহার মেজ দেওর সুনীল, তাহার পরের দিন বিমল। বাড়ীতে তিনজন লোক, তিনজনই [illegible]! অনিলার মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

অনিল হাসিয়া বলিল, 'ও কিছু না, ও ম্যালেরিয়া! বর্ষার পর এই সময়টায় এমন সকলেরই হয়।'

অনিলা একটুখানি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'সে আবার কি!'

'হ্যাঁ। ও আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তুমি একটু সাবধানে থেক, এই সময়টায় চান-টান বড় একটা ক'র না।'

অনিলা বলিল, 'তা হ'লে কি বলতে চাও—এমনি ধারা আমারও হবে?'

অনিল হাসিয়া বলিল, 'হ'তেও পারে। আমারও হবে, তোমারও হবে।'

কি সর্ব্বনাশ! অনিলা ভাবিল, বর্ষাটা তাহার এত ভাল লাগিল বলিয়াই কি এমনি করিয়া ভগবান তাহাকে শাস্তি দিবেন?

সত্য সত্যই দেখা গেল, গ্রামের প্রায় সব বাড়ীতেই ম্যালেরিয়া তাহার কায়েমী বন্দোবস্ত পাকা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই ব্যাধিটা যেন ইহাদের নিত্যকার সঙ্গী, অতি-পরিচিত বলিয়া কেহ আর তাহাকে এতটুকু ভয় পর্য্যন্ত করে না।

সুনীল সেদিন অনিলার কাছে এক গ্লাস জল চাহিল। বলিল, 'বৌদি, আমায় এক গ্লাস জল দেবে?'

'কেন দেব না ভাই!' বলিয়া জলের গ্লাস আনিয়া অনিলা তাহার শিয়রের কাছে গিয়া বসিল। মাথায় হাত দিয়া বলিল, 'কেমন আছ ঠাকুরপো?'

সুনীল হাসিয়া বলিল, 'ভালই আছি। কাল ভাত খাব।'

'কাল ভাত খাবে কি রকম? আজও তো তোমার জ্বর ছাড়েনি!'

সুনীল বলিল, 'তুমি জান না বৌদি, আজ রাত্তিরে দেখবে জ্বর ছেড়ে যাবে, কাল ভাত যদি না খাই তা হ'লে এত দুর্ব্বল হয়ে যাব যে আর উঠতে পারব না। তোমার এক-আধবার হোক্ তা হ'লেই বুঝতে পারবে।'

অনিলা বলিল, 'না ভাই আমার হয়ে কাজ নেই।'

সুনীল হাসিয়া বলিল, 'হবেই। এখানে থাকলে এর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।'

'তোমার দাদারও হবে?'

সুনীল বলিল, 'বা, হবে কি রকম! দাদার ত' পুরানো জ্বর প্রায় রোজই হয়। আড়তে থাকে বলে বুঝতে পার না। তা বুঝি তোমায় বলেনি?'

'পুরানো জ্বর হয় আর রোজ ভাত খায়?'

'জ্বর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ খায় না। তোমার বুঝি খুব ভয় হয়ে গেল বৌদি?'

অনিলা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কথাটার জবাব দিল না।

অনিল সেদিন বাড়ী ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর উপরের ঘরে শুইয়া শুইয়া বিড়ি টানিতেছিল, অনিলা ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাহার পর বুকে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'কই না, কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।'

অনিল হাসিতে লাগিল। বলিল, 'ভেবেছ বুঝি আমারও জ্বর হয়েছে?'

অনিলা বলিল, 'না। ঠাকুরপো বলছিল তোমার রোজ পুরানো জ্বর হয়!'

অনিল বলিল, 'এক একদিন হয় বটে, রোজ হয় না।'

অনিলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সেই খানে পড়িয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গ্রামে তোমাদের ডাক্তার নেই? জ্বর হ'লে কই কাউকে ত' দেখি না ওষুধ খেতে!'

অনিল বলিল, 'ডাক্তার আছে, ওষুধও খায়, কিন্তু, ওষুধে কিছু হয় না। এ-জ্বর এমনই সেরে যায়।'

তা এম্‌নিই হয়ত' সারে। কারণ অনিলা তাহার চোখের সুমুখেই দেখিল, দিন দুই পরে শাশুড়ীঠাক্‌রুণ উঠিয়া বসিয়াছেন, আবার ঠিক আগের মত কাজকর্ম্মও করিতেছেন, ভাতও খাইতেছেন, স্নানও করিতেছেন। সুনীল ও বিমল দু'জনেই আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর ছাদের উপর পায়রার একটা টোং আছে। টোঙে প্রায়ই পায়রার বাচ্ছা হয়। বিমল সেদিন বলিল, 'আমাকে আজ একটু পায়রার মাংস রেঁধে দিতে হবে। বৌদি, চল পায়রা আনিগে!' এই বলিয়া বৌদিকে সঙ্গে লইয়া সে ছাদে গেল পায়রা আনিতে। ছাদের কার্ণিসে পা দিয়া বিমল টোং হাতড়াইয়া পায়রা খুঁজিতেছে আর অনিলা তাকাইয়া আছে মধুবুনী ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশন বেশি দুরে নয়। ধানের মাঠের মাঝখান দিয়া সাপের মত আঁকা-বাঁকা রেলের লাইন পাতা। তাহার উপর দিয়া ট্রেন চলে। কলিকাতা এখান হইতে কতদুর কে জানে। সেই যে ট্রেণে চড়িয়া বিবাহের পর ওই ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর একটি দিনের জন্যও এখান হইতে বাহির হয় নাই। বাহির হইবার প্রয়োজন জীবনে হয়ত আর কোনোদিনই হইবে না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনিলা অমনি সব নানান্ কথা ভাবিতেছে, এমন সময় বিমল একটি পায়রার বাচ্ছা হাতে লইয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল।

অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, 'এখান থেকে তোমার দাদার আড়ত দেখা যায় না?'

বিমল বলিল, 'ওই যে দেখছ ওই গাছটা, ওই গাছের ওপারে—টিনের চাল দেওয়া আমাদের গদি। এখান থেকে ভাল দেখা যায় না।'

অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে ওই ধোঁয়া কিসের উঠছে বিমল?'.

বিমল বলিল, 'বা রে তাও জান না? ওই ত' শ্মশান, গয়লাদের একটা মেয়ে মরেছে আজ। ওকেই পোড়াচ্ছে ওইখানে।'

'এই ত' পায়রার বাচ্ছা পেয়েছ একটা। চল।' বলিয়া অনিলা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। সেইদিন হইতে কি যে তাহার হইল, ছাদে উঠিলেই অনিলার সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়ে সেই শ্মশান! ছোট্ট একটি শুকনো নদীর বাঁকের মুখটা দেখা যায়, সাদা বালি চিক্ চিক্ করে, প্রকাণ্ড একটা তেঁতুলের গাছ, আর তাহারই পাশ দিয়া রোজই সে দেখিতে পায়—ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক্ দিয়া দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে! অনিলার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে সে নীচে নামিয়া আসে।

এমনি করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। বিবাহের সময় অনিলার বয়স ছিল পনেরো, এখন তাহার বয়স হইয়াছে কুড়ি। শুধু যে তাহার বয়সেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নয়। এখন আর তাহাকে দেখিলে সে অনিলা বলিয়া চিনিবার জো নাই। ম্যালেরিয়া তাহাকেও ধরিয়াছে। এবং ম্যালেরিয়ার কল্যাণে কোথায় গিয়াছে তাহার সেই স্বাস্থ্য,কোথায় গিয়াছে সেই সৌন্দর্য্য, কুড়ি বছরেই একেবারে যেন বুড়ি হইয়া গেছে। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের সে রং নাই, হাতের চুড়ি ঢল্‌ঢল্ করে, জামাগুলা গায়ে আর তেমন আঁট হইয়া বসে না, মাথার সে একপিঠ চুল এখন হাতের মুঠিতে ধরা যায়।

গ্রামের বহু লোক এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। শুধু এই অনিলের বাড়ীতে কেহ এখনও মরে নাই। মরিয়া শুধু বাঁচিয়া আছে। ম্যালেরিয়ার নিয়ম-কানুন অনিলা এখন সবই জানে। জানে—জ্বরের সময় কতক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, জানে পুরানো জ্বরের মেয়াদ কতক্ষণ, জানে জ্বর আসিবার কয় ঘণ্টা পরে ভাত খাইলে জ্বর আর আসে না, জানে টক্ জাতীয় কোনও বস্তু তাহাদের খাইবার উপায় নাই।

অনিলের লক্ষ্য শুধু টাকা রোজগার। জ্বর-জ্বালা, জল-ঝড় কিছুই সে মানে না। মধুবুনীর আড়তে তাহার যাওয়া চাইই।

অনিলা বলে, 'পরশু জ্বর থেকে উঠেছ, আজ সেখানে নাই-বা গেলে!'

অনিল হাসিয়া বলে, 'তিন কুড়ী চাল আমি ধরে রেখেছি অনিলা, বিক্রি না করতে পারলে লোকসান হয়ে যাবে।'

অনিলা বলে, 'শরীরই যদি যায় ত' কি হবে আমাদের টাকায়?'

'কি হবে?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে অনিল চলিয়া যায়। কাহারও নিষেধ-বারণ শোনে না।

সেইদিনই চাল তিনগাড়ী বিক্রি করিয়া ফিরিবার সময় অনিলার জন্য একখানি রঙীন শাড়ী সে কিনিয়া আনিল।

শাড়ী পাইয়া যে অনিলা খুসী হইল না তাহা নয়। শাড়ীখানি নাড়াচাড়ি করিতে করিতে বলিল, 'শাড়ী পরবার আর আমার সে দেহ কোথায়? সে রূপ কোথায়? এখন আর আমাকে কিছু মানাবে না।'

অনিল বলিল, 'খুব মানাবে। কাল তোমায় এই শাড়ীখানি পরতে হবে।'

পরের দিন সেই রঙীন শাড়ীখানি পরিয়া অনিলা ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিল, শাশুড়ীর হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়িল। বলিলেন, 'ছেলে আমার অভাব ত' তোমার কিছুই রাখেনি মা, কিন্তু বিয়ে হ'লো আজ পাঁচ ছ'বছর, অন্য মেয়ে হলে এতদিন তিন চার ছেলের মা হ'তো! কি জানি মা, তোমরা আজকালকার লেখাপড়াজানা মেয়ে, তোমাদের মহিমে তোমরাই জান!'

ছেলে না হইবার কথা শাশুড়ী আজকাল তাহাকে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। শাশুড়ী চান তাহার একটি ছেলে হোক। কিন্তু, হে ভগবান! অনিলা মনে মনে বলে, আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ ঠাকুর! নিজের কষ্টই সহ্য করিতে পারি না, তার ওপর নিজের পেটের ছেলেকে যদি দেখি জ্বরে ভুগছে, তখন কি যে করব···তার চেয়ে এ বরং বেশ আছি।'

কিন্তু শাশুড়ীঠাকরুণ কাহারও কোনও কথা শুনিতে চান না। রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ লইয়া সেদিন তিনি দু'ক্রোশ হাঁটিয়া নিজেই গেলেন ভাদুইপুরের কালীর কবচ আনিতে। এ কবচ না কি একেবারে অব্যর্থ। পাঁচটি পয়সা মা'র নামে তুলিয়া রাখিয়া মঙ্গলবার প্রভাতে এই কবচটি ধারণ করিলে বন্ধ্যা নারীও না কি সন্তানসম্ভবা হইয়া থাকে।

বৌমাকে সেই কবচটি পরাইয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, 'ছেলের জন্যই বিয়ে দেওয়া, তা যদি না হয় মা ত' ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব। আমার কাছে লুকানো ছাপানো কথা নেই।'

কথাগুলা শুনিয়া অনিলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ছেলের মা হইতে কে না চায়!

সেদিন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অনিল বাড়ী আসিলে কথাটা তাহাকে বলিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'ছেলে যদি না হয় তুমি কি করবে? আমায় তাড়িয়ে দেবে? আবার বিয়ে করবে?'

অনিল তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'দুর পাগলী! মা তোমায় কিছু বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া মাথা নাড়িয়া অনিলা কাঁদিতে লাগিল।

অনেক বুঝাইয়া, অনেক আদর করিয়া অনিল তাহাকে চুপ করাইল।

কিন্তু ঠাকুর তাহার মুখরক্ষা করিয়াছেন। অনিলার একটি ছেলে হইয়াছে।—রুগ্না অনিলার ততোধিক রুগ্ন একটি পুত্র সন্তান!

শাশুড়ীঠাকুরাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ভাদুইপুরের মা-কালীকে প্রণাম করিয়া মনে-মনেই তিনি সঙ্কল্প করিলেন এইবার একদিন ছেলেকে ও ছেলের মাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মা'র মানৎ শোধ করিয়া আসিবেন।

কিন্তু মানৎ শোধ করা দূরে থাক, সন্তানটিকে প্রসব করিয়া অবধি অনিলা কেমন যেন ছটফট করিতেছে, পেটের ভিতর কোথায় যেন কিসের একটা অকথ্য যন্ত্রণায় মনে হইতেছে, যেন সে এখনই মরিয়া যাইবে।

শাশুড়ী বলিলেন, 'ও কিছু না। প্রথম পোয়াতি, তার উপর দুর্ব্বল শরীর, ও রকম হয়েই থাকে!'

অনিলা কিন্তু যন্ত্রণাটাকে কিছু না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না, স্বামীকে সে একটি বার দেখিতে চাহিল।

অনিলের সেদিন মধুপুরীর আড়তে যাওয়া হয় নাই। আঁতুড়-ঘরের দরজায় গিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, 'কি গো, কি বলছ?'

একজন দাই বসিয়াছিল, অনিলা তাহাকে আর লজ্জা করিল না, স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'এস।'

অনিল তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ?'

অনিলা বলিল, 'ভাল নেই। তুমি একটি কাজ করবে?'

'কি কাজ?'

'জ্যেঠামশাইকে একখানি চিঠি লিখে দাও।'

জ্যেঠামশাই-এর নাম শুনিয়া অনিল একটুখানি রাগ করিল। বলিল, 'যে লোক কোনদিন একখানা চিঠি লিখেও খবর নেয় না, তার কাছে চিঠি কেন?'

অনিলা বলিল, 'জ্যেঠামশাই আমাকে বলেছিলেন, জীবনে যেদিন খুব বেশি দুঃখু পাবি সেদিন আমাকে যেন একখানি চিঠি লিখে খবর দিস্।'

অনিল একটুখানি অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, 'আজই কি তোমার জীবনে সব চেয়ে বেশি দুঃখের দিন?'

অনিলা তাহার আয়ত দুইটি চোখ এবং মাথা একসঙ্গে নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

অনিল হাসিয়া বলিল, 'তোমার পাগলামি এখনও ঘুচল না।'

অনিলা বলিল, 'চিঠি তুমি লিখবে কি না বল।'

'তা বেশ, তুমি যখন বলছ তখন দিচ্ছি লিখে।'

'কি লিখবে?'

'লিখব, আমার একটি ছেলে হয়েছে, তারপর—তারপর আর কি লিখব বল।'

অনিলা বলিল, 'না। তা লিখবে না। আমার নাম দিয়ে লিখে দাও—আজ আমি বড় বিপদে পড়ে আপনাকে ডাকছি জ্যেঠামশাই, যদি পারেন ত' একটিবার এখানে আসবেন। বাস্, আর কোনও কথা লিখ না।'

অনিল রাজি হইল এবং সেইদিনই একখানি পোষ্টকার্ডে ঠিক সেই কথাগুলিই মণিলালকে লিখিয়া জানাইল।

অনিলার পেটের যন্ত্রণা কিছুতেই যেন কমিতে চায় না! পরের দিন মনে হইল যন্ত্রণা যেন তাহার আরও বাড়িয়াছে।

অনিল দুইজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তারেরা ঔষধ দিলেন। অনিলা সে ঔষধ কিছুতেই খাইতে চাহিল না। সকলে মিলিয়া পীড়াপীড়ি করাতে ঔষধটুকু গোপনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, খাইয়াছি।

দু'দিন কাটিয়া গেল। তিনদিনের দিন অনিলা একেবারে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ডাক্তারেরা বলিলেন, 'ঔষধের গুণে ও রকম হয়েছে। যন্ত্রণা কমেছে তাই ঘুম পাচ্ছে।'

সকলেই বলিল, 'দু'রাত্রি ঘুমোতে পারে নি, আহা ঘুমোক্। ওকে এখন কেউ জাগিয়ো না।'

অনিলা নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

সেইদিনই দুপুরে মধুবুনী ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে জ্যেঠামশাই রতনপুর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। অনিলার কাছে অনিল শুধু তাহার নামই শুনিয়াছে, জ্যেঠামশাইকে চোখে সে কখনও দেখে নাই। দেখিল জটাজুটধারী বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী!

মণিলাল আসিয়াই বলিল, 'কোথায় সে? কোথায় আমার মা কোথায়?'

অনিল বলিল, 'ছেলে হবার পর থেকে বড় কাতর হয়ে পড়েছে। এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। তা হোক, আপনি আসুন।'

মণিলাল আঁতুড়ের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। অনিলা একাই শুইয়া আছে। দাই তাহার ছেলেটিকে রৌদ্রে শোয়াইবার জন্য বাহিরে লইয়া গিয়াছে।

মণিলাল ডাকিল, 'অনিলা!'

গভীর নিদ্রামগ্ন অনিলার কাছ হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া মণিলাল ভিতরে ঢুকিল। অনিলার কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল, 'মা!'

বলিয়াই তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কেমন যেন সহসা চমকিয়া উঠিয়া মণিলাল চোখ বুজিয়া ধ্যানমগ্নের মত কিয়ৎক্ষণ তাহার শিয়রের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া অনিলের কাছে গিয়া বলিল, 'ছেলে হয়েছে?'

অনিল বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সন্ন্যাসী বলিল, ''কোথায় সে ছেলে?'

'কোথায় সে ছেলে?'

'ওই ত!' বলিয়া রৌদ্রদীপ্ত উঠানের একপাশে আঙুল বাড়াইয়া অনিল দেখাইয়া দিল।

'কই দাও ছেলেকে আমার কোলে দাও।' কঠোর কণ্ঠে সন্ন্যাসী যেন আদেশ করিল! বলিল, 'দাও আর দেরি ক'র না।'

অনিল যন্ত্রচালিতের মত ছেলের দিকে আগাইয়া গেল, তাহার পর দুই হাত দিয়া অতি সাবধানে কচি ছেলেটিকে তুলিয়া আনিয়া সন্ন্যাসীর প্রসারিত দুই হাতের উপর নামাইয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিলাল বলিল, 'আমি চললাম। ও আমায় এই জন্যেই ডেকেছিল।'

'সে কি! ওই কচি ছেলে নিয়ে যাবার জন্যে?'—অনিলা! অনিলা! বলিতে বলিতে অনিল ছুটিয়া একেবারে আঁতুড়ে গিয়া ঢুকিল—'ছেলে তুমি জ্যেঠামশাইকে নিয়ে যেতে বলেছ অনিলা? অনিলা! অনিলা!'

কিন্তু কোথায় অনিলা!

নিসাড় নিঃস্পন্দ প্রসূতির মৃতদেহ পড়িয়া আছে। জ্যেঠামশাই আসিয়া পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনিল হো হো করিয়া কাঁদিয়া একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। মা কাঁদিলেন, ভাইএরা কাঁদিল, ধাত্রী সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া হায় হায় করিতে লাগিল।

সে বৎসরও তখন বর্ষার পর শরৎ আসিয়াছে।

ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ট্রেন চলিয়াছে। ট্রেনের কামরায় বসিয়া আছে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, তাহার প্রসারিত দুই হস্তের উপর নবজাত এক শিশু! দূরে দেখা যায় রতনপুরের সেই শ্মশান! নদীর বাঁকে অস্তসূর্য্যের আলো পড়িয়া সাদা বালি চিক্ চিক্ করিতেছে, আর সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটার পাশ দিয়া মনে হয়, যেন কোন্ অভাগিনী জননীর চিতাধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে।

বিচিত্র জগৎ

অজ্ঞাত তুবা জাতির দেশে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশাল ইনিসে নদীর উৎপত্তি-স্থান অনুসন্ধান করিতে গিয়া মিঃ ডগলাস কারুথার্স ও তাঁহার সঙ্গী তুবা জাতির সন্ধান পান। ইনিসে নদীর উৎপত্তি-স্থান যে পর্ব্বত-বেষ্টিত অরণ্যময় প্রদেশে, এক সময় সেখানে তুবা জাতির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল, এখন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। খুব কম ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর এদের দেশে গিয়া এদের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। মিঃ কারুথার্স লিখিত বিবরণ হইতে নিম্নের অংশ সংগৃহীত হইয়াছে।



তুবা-পরিবার: 'টেপি'র বাহিরে।

"এসিয়া মহাদেশ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, পৃথিবীর মধ্যে বারোটি সুবৃহৎ নদীর অবস্থান এইখানেই। এদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হবে ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীদ্বয়ের, এসিয়ার মধ্যে এরা যে শুধু দুই বৃহত্তম নদী তাই নয়, বহুতর জাতি এদের দুপারে বাস করে, যাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা অতীব প্রাচীন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। স্যালউইন ও মেকং দৈর্ঘ্যে খুব বড়।

এই সব নদী তিব্বতের মালভূমি থেকে উঠে হয় পূবদিকে চীন-সমুদ্রে, নয় তো দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরে পড়ছে। এদের সঙ্গে ইরাবতী নদীর কয়েক হাজার মাইল দৈর্ঘ্য যোগ দিলেই যে সব নদী উত্তরবাহিনী নয়, তাদের মোট দৈর্ঘ্যের একটা হিসেব পাওয়া যাবে।

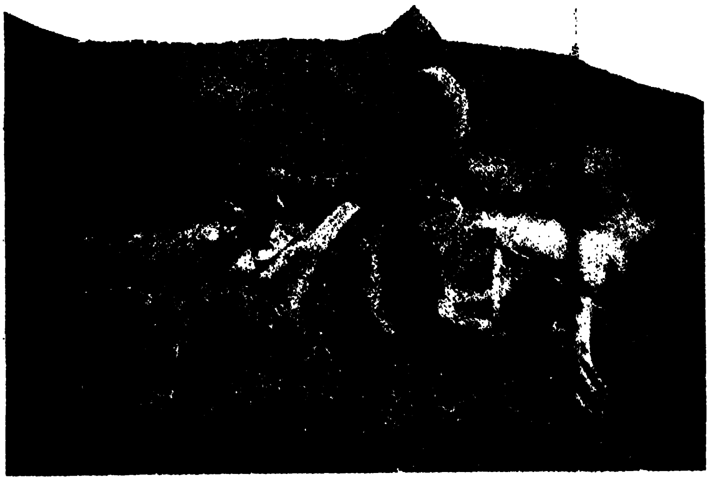
বাকী নদীগুলিকে বলা যায় সাইবিরীয় ও উত্তর মেরুদেশীয় নদী—কারণ যদিও তাদের উৎপত্তি-স্থান এসিয়ার মধ্যস্থলের পর্ব্বতশ্রেণীতে বা মালভূমিতে, কিন্তু এরা উত্তর মুখে বয়ে গিয়ে উত্তর-মহাসাগরে পড়েছে।

এদের মধ্যে কতকগুলি নদী আছে, যাদের উৎপত্তি-স্থান কখনই কোনো ইউরোপীয় ভ্রমণকারী দেখেন নি। যেমন অক্সাস নদীর উৎপত্তি-স্থান, যেমন ঘোর নির্জ্জন ও ঊষর তুন্দ্রা অঞ্চল, হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীদ্বয় যেখান থেকে বার হয়ে আসছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্বন্ধেও এ কথা অনেকটা খাটে। স্যালউইন ও মেকং নদীর খাত উৎপত্তি-স্থানের দিকে এত গভীর ও দুর্গম যে, এই ভীষণ নদীখাতের জন্যেই চীনদেশ ব্রহ্মকে গ্রাস করতে পারে নি কখনও।

যে সব নদী অপেক্ষাকৃত সুগম মঙ্গোলীয় মালভূমি থেকে বেরিয়েছে, তাদের উৎপত্তি-স্থানও যথেষ্ট রহস্যাবৃত—যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আলতাই পর্ব্বতশ্রেণীর যে

উচ্চ অঞ্চলে ইরতিশ নদীর জন্ম, বা মধ্য-এসিয়ায় যে সৌন্দর্য্যময় হ্রদমালার মধ্যে ইনিসে নদীর জন্ম—সে পার্ব্বত্য-প্রদেশ বা সে রহস্যাবৃত হ্রদ ক'জন ভ্রমণকারী দেখেছেন ?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইনিসে নদীর উৎপত্তি-স্থান নিজেদের চোখে দেখব। আমরা শুনেছিলাম ঐ অঞ্চলে বহু কৌতূহলপ্রদ দ্রষ্টব্য স্থান আছে, বাইরের লোকে যাদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সাইবিরিয়ার বিরাট সমতলভূমির মধ্যে দিয়ে যে সব নদী বয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে ইরতিশ, লেনা ও আমুর নদীর উৎপত্তি-স্থানে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু ইনিসে নদী যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে, তার চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যের উপত্যকা গভীর অরণ্যময়।



তুঙ্গাদের প্রায় সকল কাযেই বল্গাহরিণ অপরিহার্য্য সঙ্গী।

ম্যাপে দেখা যায়, এই পর্ব্বত-বেষ্টিত সমতলভূমি আকারে প্রায় ইংলণ্ডের সমান বড়, এতে প্রায় হাজার খানেক ছোট ছোট হ্রদ আছে, চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতমালার জলধারা এসে জমা হয় এই সব হ্রদে। পর্ব্বতশ্রেণীর প্রাচীরের এক জায়গায় সংকীর্ণ একটা পথ আছে, এই সংকীর্ণ খাত দিয়ে ইনিসে নদী সবেগে বেরিয়ে আসছে।

বোতলের গলার মত এই সংকীর্ণ স্থানটা পার হয়ে ইনিসে অন্যান্য সাইবিরীয় নদীর মত বিস্তৃত উর্ব্বর সমতলভূমি, বিশাল আরণ্যভূভাগ ও উষর তুন্দ্রার ওপর দিয়ে বয়ে এসে উত্তর উপসাগরে পড়ছে।

আমাদের যাত্রা পিকিং থেকে আরম্ভ করা চলত—কিন্তু তা হলে ১২০০ মাইল ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। সাইবিরীয় রেলপথের যে কোনো নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন থেকে এই অঞ্চল অন্ততঃ দুশো মাইল ঘন অরণ্য ও দুর্গম জলাভূমির পারে অবস্থিত। আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল বসন্ত ঋতুতে ওদিকের পথ অনেকটা সুগম হয়।

কিন্তু বসন্তে বিপদও আছে। বরফ গলতে আরম্ভ করার ফলে এই সময়ে নদীতে বন্যা আসে। জলাভূমি টাটকা বরফ-গলা জলে ভর্ত্তি হয়ে যায়।

মে মাসের মাঝামাঝি আমরা এমন একটি যায়গায় এসে তাঁবু ফেললাম, যার পর ফসল আর জন্মায় না। আমাদের সম্মুখে শুধু অরণ্যাবৃত শৈলমালা ও জলাভূমি সাইনস্ক পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদ-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে যে উপত্যকার কথা বলা হয়েছে, এই পর্ব্বতমালা সেই উপত্যকার উত্তর দিকের প্রাচীর। আমাদের সঙ্গে ছিল জন কয়েক সাইবেরিয়ার লোক, এরা তুন্দ্রা-অঞ্চলের মাঝে মাঝে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করে। প্রতি দিন ঘোড়ার পিঠে আমরা পাঁচ মাইলের বেশী যেতে পারতাম না।

মাঝে মাঝে উঁচু একটি পাহাড়ে উঠে আমরা সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। শুধু পাহাড় আর ঘন অরণ্য পাহাড়ের মাথায়, এ ছাড়া আর কিছু তো চোখে পড়ে না।

ক্রমে আমরা উচ্চতর অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম।

গাছপালা ক্রমশঃ কমে গেল—যাও বা রইল, তারা উচ্চতায় বেশী বড় নয়। আমরা একটা গিরিবর্ত্ম দিয়ে যাচ্ছি, দুধারে তার তুষারাবৃত পর্ব্বত-শিখর। সমুদ্রবক্ষ থেকে গিরিবর্ত্মটার উচ্চতা কিন্তু খুব বেশী নয়, মাত্র ৪৫০০ ফুট।

আমাদের পায়ের নীচের সমতলভূমিতে অনেক ছোট-খাটো নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে উত্তর মুখে তাদের দু'হাজার মাইল দীর্ঘপথে ভ্রমণ সুরু করেছে। কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রাচীরবেষ্টিত নিম্নস্থান অতিক্রম করতে তাদের

যেতে হবে আরও আড়াই শো মাইল রাস্তা। তারপরে এরা গিয়ে পড়বে সাইবেরিয়ার সমতলভূমিতে। আমাদের সামনে যে অঞ্চল, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সত্যই অপূর্ব্ব, পাহাড়ের পাদদেশে ঘন অরণ্য, তারপরে পার্কের মত তৃণাবৃত ভূমি, নানাবিধ বিচিত্র বন্যপুষ্পে ভরা।

মাঝে মাঝে দু' একটা নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও পর্ব্বতচূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ দিকে যে পর্ব্বতমালা, সেটা আমরা ঠিকমত দেখতে পেলাম না, কারণ তার দূরত্ব অনেকটা। খুব যেখানে সংকীর্ণ, সেখানেও এই উপত্যকা অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইল চওড়া। দৈর্ঘ্যে ৫০০ মাইলের কম নয়।

এই সব অজানা অঞ্চলের বহু বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে সারা গ্রীষ্মকাল আমরা কাটিয়ে দিলাম। যেখানে নদী-পথে নৌকা চালান সম্ভব, ততদূর গিয়ে আমরা খুব বড় একটা কাঠের ভেলা তৈরী করে জলে ভাসালাম। তিনটি শাখানদী পরস্পর মিলিত হয়ে ইনিসে নদীর বৃহত্তর জলধারা সৃষ্টি করেছে।

সমগ্র উপত্যকার সৌন্দর্য্যে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়। ইনিসে অতীব সৌন্দর্য্য-শালী নদী, যদিও এর উভয় তীরের অধিকাংশ অঞ্চল জনহীন অরণ্যে আবৃত, কিন্তু যে পর্ব্বত-প্রাচীর-বেষ্টিত উপত্যকায় এর জন্ম, তার বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। এই অঞ্চলের গাছ-পালা, জীবজন্তু ও অধিবাসী সবই বিচিত্র।

অতি দুষ্প্রাপ্য জাতীয় কস্তুরী-মৃগ এখানকার বনে পাওয়া যায়।—খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় সেব্‌ল্, ইনিসে নদীর উৎপত্তি-স্থানের অরণ্যে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই অরণ্যেই তুবা জাতি বাস করে। এই তুবা জাতির আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত।

প্রস্তর-যুগের সভ্যতার আবহাওয়া থেকে এরা সবে বার হয়েছে। অনেক সময় নিয়েছিল প্রস্তর-যুগকে অতিক্রম করে আসতে। এরা গরু ও বল্গা-হরিণ পোষে, কৃষিকার্য্যে অনেকটা জ্ঞান লাভ করেছে, ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত এরা লৌহের ব্যবহার জানত না।

বহু প্রাচীনকাল থেকে ইনিসে নদীর উপত্যকায় তুবা জাতি বাস করত। মাঝে মাঝে অন্য জাতি এসে বাহুবলে এদের বিতাড়িত করে গভীরতর অরণ্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। উত্তর দিকে গিয়ে এরা এমন জায়গায় পৌছুল, যেখানে মাছ ও শিকারের জীব-জন্তু প্রচুর পরিমাণে মিলে। তারা সেখানে গিয়ে কৃষিকার্য্য ভুলে গেল, জীব-জন্তু শিকারই তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়াল। তুবা জাতির এই অধঃপতিত শাখা উত্তর-মেরু-বৃত্তের অন্তর্গত তুন্দ্রা-অঞ্চলে বিচরণ করে।



তুবা-পল্লী : বার্চ বঙ্কলের তাঁবু 'টেপি' ও বল্গাহরিণ দেখা যায়।

তুবা জাতির অন্যান্য শাখা বৈদেশিক আক্রমণের বেগ সহ্য না করতে পেরে গভীর আরণ্য প্রদেশে পালিয়ে যায়। এরাই চীন সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ইউরিয়ান-খাই জাতি, ইনিসে নদীর আরণ্য অঞ্চলে এদের বাস।

আমরা বাই-কেম্ নদীর উত্তর দিকের একটি শাখা-নদীতে ভ্রমণ করবার সময় ইউরিয়ান্-খাই জাতির একটি পরিত্যক্ত বাসস্থানে এসে পৌছুই। তাঁবুর খোঁটাগুলি তখনও মাটিতে পোঁতা ছিল, কেবল ওপরকার বার্চ্চ বঙ্কলের আচ্ছাদন ছিল না।

এদের বাসস্থান বছরের মধ্যে অনেক বার বদলায়। এক জায়গায় থাকা এদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমরা যখন গিয়ে-ছিলুম, তখন জুন মাস, ও সময়ে পাহাড়ের ওপরে বনে তারা তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে ফলমূল ও বন্যজন্তু শিকারের

সন্ধানে। শীতকালে আবার উপরে এসে এখানেই বাস করবে। আমরা স্থির করলাম, পাহাড়ের ওপরে তুবা জাতির সন্ধানে আমাদের যেতে হবেই।

কয়েকদিন পরে আমাদের তাঁবুর কুকুর বনের মধ্যে বিচরণশীল একটা বন্যহরিণকে তাড়া করলে। কিছু পরে বন্যহরিণে চড়ে একজন খর্ব্বাকৃতি লোক বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। আমরা আমাদের কুকুরকে ডেকে শান্ত করলাম, খর্ব্বাকৃতি মানুষটি আমাদের নিয়ে গেল বনের মধ্যে ওদের তাঁবুতে।

এই ভাবে আমরা তুবা জাতির প্রথম সন্ধান পাই।

বনের মধ্যে একটি শান্ত উপত্যকা। চারি ধারে অরণ্যাবৃত পর্ব্বতমালার মধ্যে এখানে অনেকখানি অঞ্চল সবুজ



ইনেসির উৎপত্তি-স্থান।

তৃণভূমি। এই তৃণভূমিতে সারি সারি বার্চ্চ বন্ধলের তাঁবু, ওপরের দিকে সরু, নীচের দিকটা গোল। এ ধরণের তাঁবুকে এরা বলে "টেপি"।

তাঁবুর চারি পাশের মাঠে বড় বড় বন্যাহরিণের দল শুয়ে আছে বা দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে। এরা তুবাদের পোষা বন্যহরিণ, বন্য নয়। আমরা এদের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মাঠের ঠিক মাঝখানে আমাদের তাঁবু ফেললাম। ওদের প্রত্যেক লোকে আমাদের সাহায্য করলে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এরা অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ ও ভদ্র।

আমাদের এরা কোন দিন দেখে নি—কিন্তু এই অপরিচয়ের দরুণ আমাদের প্রতি ওদের কোন রকম সন্দেহ বা বিদ্বেষের ভাব জাগল না—বরং ওদের ব্যবহার দেখে মনে হল, আমাদের আগমনে ওরা সন্তুষ্ট হয়েছে। যদিও প্রথমটা দেখে মনে হয়েছিল যে, এরা অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ জাতি, কিন্তু কয়েকদিন থাকার পরে বোঝা গেল যে, বনের মধ্যে বেশ মনের আনন্দেই ওরা আছে।

পালিত পশুর শ্রেণী হিসাবে তুবা জাতি দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত।

একটি শাখা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে বাস করে এবং ঘোড়া, ভেড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি পোষে। আর একদল শুধু বন্য-হরিণ পোষে, এবং বাস করে গভীর অরণ্যের মধ্যে। অরণ্যচারী তুবা জাতি সংখ্যায় অল্প, বাইরের জগতের সংস্পর্শে এরা বড় একটি বেশী আসে না বলে জাতিগত বৈশিষ্ট্য এখনও এদের মধ্যে বজায় আছে। গ্রীষ্মকালে এরা সমতল-ভূমিতে আর থাকে না, পাহাড়ের ওপরকার উচ্চ স্থানে বন্যাহরিণের দল নিয়ে গিয়ে ওঠায়, কারণ বন্যাহরিণ গরম মোটে সহ্য করতে পারে না।

আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছিলাম, সেটা ওদের গ্রীষ্মকালের আবাস-স্থান, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু।

সেখানে যথেষ্ট পশুচারণ-ভূমি আছে, শরৎকালের পূর্ব্বে সেখান থেকে অন্য স্থানে যাবার কোন আবশ্যক হবে না। এদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যে তিনটি জিনিষের আবশ্যক অত্যন্ত বেশী, বন্যপশু, বন্যাহরিণ ও বার্চ্চ বন্ধল। আমরা যখন ওদের তাঁবুতে প্রবেশ করলাম, তখনই আমাদের মনে হল প্রকৃতিদত্ত বন্য ফলমূল, বন্যজন্তু, বন্য গাছের ছালের ওপর এদের কতটা নির্ভর করতে হয়। এদের গৃহস্থালীর বাসন-কোসন সবই বার্চ্চ কাঠের, বার্চ্চ গাছের ছালের এবং বন্যাহরিণের চামড়ায় তৈরী। বিদেশী কেট্‌লি দু'একটা তাঁবুতে দেখতে পাওয়া যায়।

তুবা জাতি অত্যন্ত দরিদ্র। সাতাশটি পরিবার সাতাশটি তাঁবুতে বাস করে, সবশুদ্ধ ছ'শো বন্য হরিণ আছে এদের দলে। এক একটি পরিবারের পিছু বন্যাহরিণের সংখ্যা গড়পড়তা খুব বেশী নয়।

এর ওপরে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, বল্গা-হরিণ বিনা কারণে বিনা নোটিসে হঠাৎ মরতে সুরু করে, মড়ক একবার আরম্ভ হলে পাল সাবাড় হতে বেশী সময় নেয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তুবা জাতি—যাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় বল্গাহরিণ—জীবন ও মরণের মাঝখানে দড়াবাজির খেলোয়াড়ের মত অতি সন্তর্পণে বাস করে।

বল্গাহরিণের দল সারাদিন তাঁবুর আশে পাশে গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে—কারণ রোদ এরা আদৌ সহ্য করতে পারে না। বিকেলের ছায়া পড়লে গাছতলা থেকে উঠে বাইরের মাঠে চরতে যায়। অনেক সময় এদের সঙ্গে রাখালের দরকার হয় না, আপনা আপনিই আবার তাঁবুতে ফিরে আসে।

বল্গাহরিণ অত্যন্ত পোষ মানে। তারা সব সময়ই আমাদের তাঁবুর আশে-পাশে বেড়াচ্ছিল, খুব সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিল যে, আমাদের সঙ্গে নুন আছে। বল্গাহরিণ নুন খেতে ভারী ভালবাসে—নুনের লোভ দেখিয়ে এদের অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যায়। তুবা মেয়েদের দেখতাম ছোট ছোট চামড়ার থলের মুখ খুলে নুন বার করে এদের খাওয়াচ্ছে। নুন খেতে না পেলে বল্গা-হরিণের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, মেজাজও খারাপ হয়ে যায়।

বল্গাহরিণের পিঠে চড়ে ও জিনিষপত্র চাপিয়ে তুবা জাতির লোকরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। এই সব দুর্গম পর্ব্বত ও আরণ্য অঞ্চলে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হত বল্গাহরিণ না থাকলে—বিশেষ করে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের পক্ষে। বল্গাহরিণের দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর, তুবাদের এ একটি প্রধান খাদ্য। তারা মাংসের জন্যে হরিণ কখনো মারে না। তাঁবুর বল্গাহরিণের পালের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের খুব বন্ধুত্ব, তারা কোনো রকম জিন বা লাগাম ব্যবহার না করে অনায়াসেই বল্গাহরিণের পিঠে চড়ে এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে যাতায়াত করছে।



তুবা জাতির রমণী, সঙ্গে বল্গাহরিণ।

তুবা জাতির মধ্যে যে মঙ্গোল ও চৈনিক সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা তাদের মুখাবয়ব থেকে অনুমান করা শক্ত নয়। অনেকেরই চোয়ালের হাড় উঁচু, চোখ তেরচা, নাক খাঁদা—যদিও কারো কারো বাঁশীর মত নাকও দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি, দড়ি দড়ি চেহারা, চর্ব্বি বলে কোনো জিনিস এদের দেহে বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। চুল খুবই কম, গোঁফ-দাড়ির বালাই নেই।

এদের একটা দোষ, এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। বনের নির্জ্জনতা অত্যন্ত ভাল বাসে, বাইরের জগতের কর্ম্ম-সংঘর্ষ ও ব্যস্ততাকে সযত্নে দূরে পরিহার করে চলে। দারিদ্র্যে কষ্ট পাবে, না খেয়ে বরং মরতেও প্রস্তুত, তবুও কখনো কোনো রুশীয় বা চীনা ঔপনিবেশিকের বাড়ী মজুরী বা চাকুরী করে অর্থ সংগ্রহ করবে না। স্বাধীনতা ও মনের আনন্দকে এরা এত ভাল বাসে যে, সাংসারিক স্বচ্ছলতার বিনিময়েও তাদের ত্যাগ করতে রাজী হয় না। জীবনের পথে এদের আবশ্যক হয় খুব কম জিনিসেরই, কোনো প্রকার বিদেশী বিলাসদ্রব্যের এরা ধার ধারে না, কেবল চা, তামাক ও বারুদ ছাড়া।

তুবা জাতির তাঁবুতে মুদ্রার ব্যবহার প্রায় নেই। জঙ্গলে প্রচুর বন্য জন্তু আছে, তাদের অনেকেরই গায়ে দামী লোম আছে। এই পশুচর্ম্মই তুবা জাতির মুদ্রা। গ্রীষ্মকালের পোষাক ছিঁড়ে গেলে এরা জঙ্গলে লোমশ পশু শিকার করতে

বার হয়, তাদের চর্ম্মের বিনিময়ে চীনা বণিকদের কাছে পোষাক কিনতে পায়। তামাক ফুরিয়ে গেলেও ঐ ব্যবস্থা। গবর্ণমেণ্টকে কর দেয় সেব্‌ল্‌-চর্ম্মের।

বিদেশী আমদানী খাদ্যের মধ্যে দই-পান্তা ঘোটকীর দুগ্ধ এদের অত্যন্ত প্রিয়। চামড়ার বিনিময়ে এই অতি উপাদেয় খাদ্যটিও নিকটস্থ কোনো চীনা মুদীর দোকানে কিনতে পাওয়া যায়



শা'মান তুবা: জাতির হাতুড়ে বৈদ্য, ভূত-প্রেতের সাহায্যে চিকিৎসা চালায়। হাতে দামামা রহিয়াছে।

পূর্ব্বে শিকারকার্য্যে এরা তীর-ধনুকের ব্যবহার করত। এখন লম্বা নলওয়ালা সেকেলে ধরণের বন্দুক দ্বারা শিকার করে। পুরাতন আমলের তীর-ধনুক এখনও কিছু কিছু এদের তাঁবুতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তুবা জাতীয় লোকেরা নিশ্চয়ই খুব কৌশলী শিকারী ছিল, কারণ এই আদিম কালের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঐ গভীর জঙ্গলে মুজ বা ওয়াশিটি শিকার করা বড় সহজ কাজ নয়।

কস্তুরী-মৃগ সাধারণতঃ শিকার হয় মাংসের জন্যে, কিন্তু ওয়াশিটি শিকার করা হয় তার শিঙের জন্যে। এই শিঙ যখন নরম থাকে, চীনা ব্যবসায়ীরা বেশী দামে কিনে নেয়। সব চেয়ে দামী হচ্ছে পশুলোম ও লোমশ চর্ম্ম। সাইবিরিয়ার অরণ্য ও তুন্দ্রা অঞ্চলে যত ধরণের লোমশ পশু আছে, পৃথিবীর মধ্যে উত্তর-কানাডা ছাড়া এত আর কোথাও নেই। তুবাদের বসতিস্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যের লোমশ-চর্ম্ম পশুদের মধ্যে সেবল্‌, মার্টেন, শাদা খেঁকশিয়ালী, লিংক্‌স ও ও কাঠবিড়ালী প্রধান।

বনের মধ্যে যতগুলি পার্ব্বত্য নদী আছে, অধিকাংশই স্যামন্‌ মাছে পরিপূর্ণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তুবা জাতি মাছ ধরতে জানে না। জল দেখে এরা কেমন একটু ভয় পায়—ভাল মাঝিও নয় এরা। জলে বেড়ানোর উপযুক্ত নৌকা বা ভেলা এদের নেই। জলপথে যাওয়া অপেক্ষা স্থলপথে যাওয়াটাই এরা বেশী পছন্দ করে। ভেলা বা নৌকা তৈরী করবার উপযুক্ত শক্ত কাঠের অভাব নেই স্থানীয় অরণ্যে, অথচ ওসব জিনিষ এরা গড়তে জানে না। বড় বড় প্রাকৃতিক হ্রদ ও নদীর দেশে বাস করেও তারা যে নৌকার ব্যবহার জানে না—এটা খুব আশ্চর্য্যের কথা।

নদী পার হওয়ার দরকার হলে এরা সাঁতার দিয়ে পার হয়। সঙ্গে যদি জিনিসপত্র থাকে, তবে ছেলেমানুষী ধরণের একটা ভেলা তৈরী করে তাতে জিনিসপত্র রেখে নিজেদের পোষা ভারবাহী জন্তু দিয়ে টানিয়ে সেটা অপর পারে উত্তীর্ণ করতে চেষ্টা করে।

খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী এ ভাবে উত্তীর্ণ হতে গিয়ে অনেকে মারা পড়েছে। প্রত্যেক নদী পার হওয়ার ঘাটে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রস্তরস্তূপ দেখতে পাওয়া যাবে, নিরাপদে নদীপার হওয়ায় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সেগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়েছে।

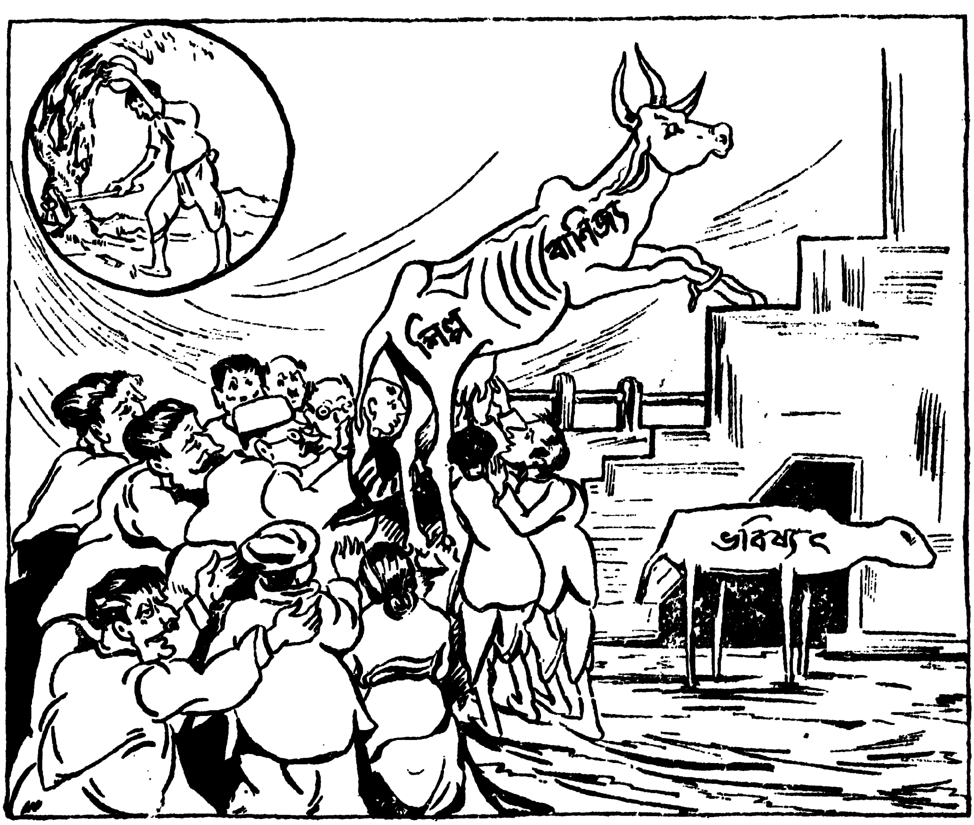
এদের জীবন নানারকম কুসংস্কার-পূর্ণ। বহু অপদেবতাকেও ভয় করে চলতে হয় এদের। বনের প্রত্যেক ঝোপঝাপ, গাছপালায় বিবিধ শ্রেণীর দেবতা ও অপদেবতার ভিড়। তাদের সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করে না চলতে পারলে সহস্র রকমের বিপদের সম্ভাবনা। অপদেবতাদের ভয়ে বেচারীরা সর্ব্বদা কাঁটা হয়ে থাকে।

নিজেদের জন্যে ঘরবাড়ী তৈরী করতে এরা জানে না—হয় তো তার দরকারও হয় না—কিন্তু এই সব অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে লতাপাতা ও কাঁচা ডালপালায় তৈরী মন্দির অনেক জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

তুবাদের অনেক মন্দিরেই বুদ্ধের রঙীন ছবি দেখা যায়। বাইরে এরা যদিও বৌদ্ধ, আসলে এরা কিন্তু প্রকৃতির উপাসক।

মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির দেহকে একটি পাহাড়ের ওপরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় রেখে আসা এদের নিয়ম। এদের বিশ্বাস পুণ্যবান্ ব্যক্তির মৃতদেহ বন্য জন্তুরা এসে খেয়ে ফেলে, কিন্তু পাপীর দেহের ত্রিসীমানায় তারা ঘেঁসবে না। সমাধি-স্থানের ওপরে একটা সাদা নিশান উড়িয়ে দেওয়া থাকে। সমাধি-স্থান মানে পাহাড়ের ওপর এই রকম ফাঁকা জায়গা, যেখানে অনেক সময় মৃত ব্যক্তির এক টুকরো হাড়ও পড়ে থাকে না।

সুতরাং তুবা জাতির বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় পুণ্যবান্।



শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

মীমাংসা

—শ্রীরমাপতি দাস

বিদায়ের দিনে সব চাপা দিয়া স্নেহটাই জাগিয়া উঠে। তাই, যে চলিয়া যায় তাকে ভীতির চক্ষে দেখিলেও বিদায়ের সময় অন্ততঃ সবাই ভালবাসার কথাই বলে। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর কে, সি, নিয়োগী মহাশয়ের ভাগ্যেও আজ তাই জুটিল। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সরকার বাহাদুরের সেবা করিয়া আজ তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগান করিল, সকলেই অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইল। রায় বাহাদুর সমস্ত শুনিলেন, যথাযথ উত্তর দিলেন; কিন্তু কি জানি কেন সমস্তই তাঁর বুকে আজ কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। গলার মালা হইয়াছে যেন উত্তপ্ত লৌহশৃঙ্খল, আসন হইয়াছে কণ্টক-শয্যা। যতই সময় যাইতেছে রায় বাহাদুর ততই অস্থির হইতেছেন, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, বুক দুর্ দুর্ করিতেছে, কোন প্রকারে ছাড়িয়া পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু পলাইবার জোর পায়ে আছে কি না সন্দেহ। বহু কষ্টে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া এজলাসের দিকে একবার শেষ চাওয়া চাহিয়া লইলেন, তারপর আস্তে আস্তে মোটরে গিয়া চাপিলেন। বোধ হয় হাকিমী থাকিয়া গেল পিছনে কোর্টের মধ্যে, এতদিনের পর মোটরগাড়ী হর্ণ দিতে দিতে লইয়া চলিল শুদ্ধ রায় বাহাদুর কে, সি, নিয়োগী মহাশয়কে।

মনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে কাজের। রায় বাহাদুরও তাই করিয়াছিলেন। হাকিম ও রায় বাহাদুরের মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্যবধান কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। নেপথ্যে তাঁহাকে অনেকে বলিত কাজ-পাগলা; এ কথা কখনও তাঁহার কানে পঁহুছিলে তিনি আনন্দিতই হইতেন এবং যে বলিত তাকে তাঁর অজানিত ভাবে পুরস্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেন! কিন্তু যদি কেউ তাঁকে বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ পাইত, সে বলিত, এটা আগ্নেয়-গিরির উদ্গিরণ-ন চাঞ্চল্য। এ কথা শুনিলে তিনি তার ভীষণ প্রতিবাদ করিতেন, বলিতেন, "কর্ম্মই জীবন, কাজকে এড়িয়ে চলা মানে জীবনকে ফাঁকী দেওয়া; তোমরা ভুল বোঝ কেন?"

কে জানে এটা রায় বাহাদুরের প্রকৃতই মনের কথা, না, ছাই দিয়া আগুণ ঢাকিবার চেষ্টা!

আজ কিন্তু সেই কাজের হাত হইতে মুক্তি। চিরকাল বোঝা বওয়া যার অভ্যাস, তার মাথা হইতে হঠাৎ বোঝা নামাইয়া লইলে আরাম হওয়া দূরের কথা, বে-আরাম বা ব্যারামই অনেক সময় উপস্থিত হয়। শোনা যায়, যখন ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হয়, তখন না কি অনেক বৃদ্ধ ক্রীতদাস কাঁদিয়াই আকুল হইয়াছিল! হাকিমীর বোঝা নামাইয়া দিয়া বেচারী রায় বাহাদুরের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল! সব ফাঁকা, কলিকাতার পথগুলি ফাঁকা, বাড়ীগুলি যেন একটি আলিপুরের চিড়িয়াখানার খাঁচা বিশেষ, তিনি নিজে আজ যেন দুনিয়ার একটা কিম্ভূত-কিমাকার পরিদর্শক। কয়েক ঘণ্টা আগে পর্য্যন্ত পৃথিবীটা ছিল একরকম, হঠাৎ অদ্ভুতভাবে বদলাইয়া গেল। এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে রায় বাহাদুর বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

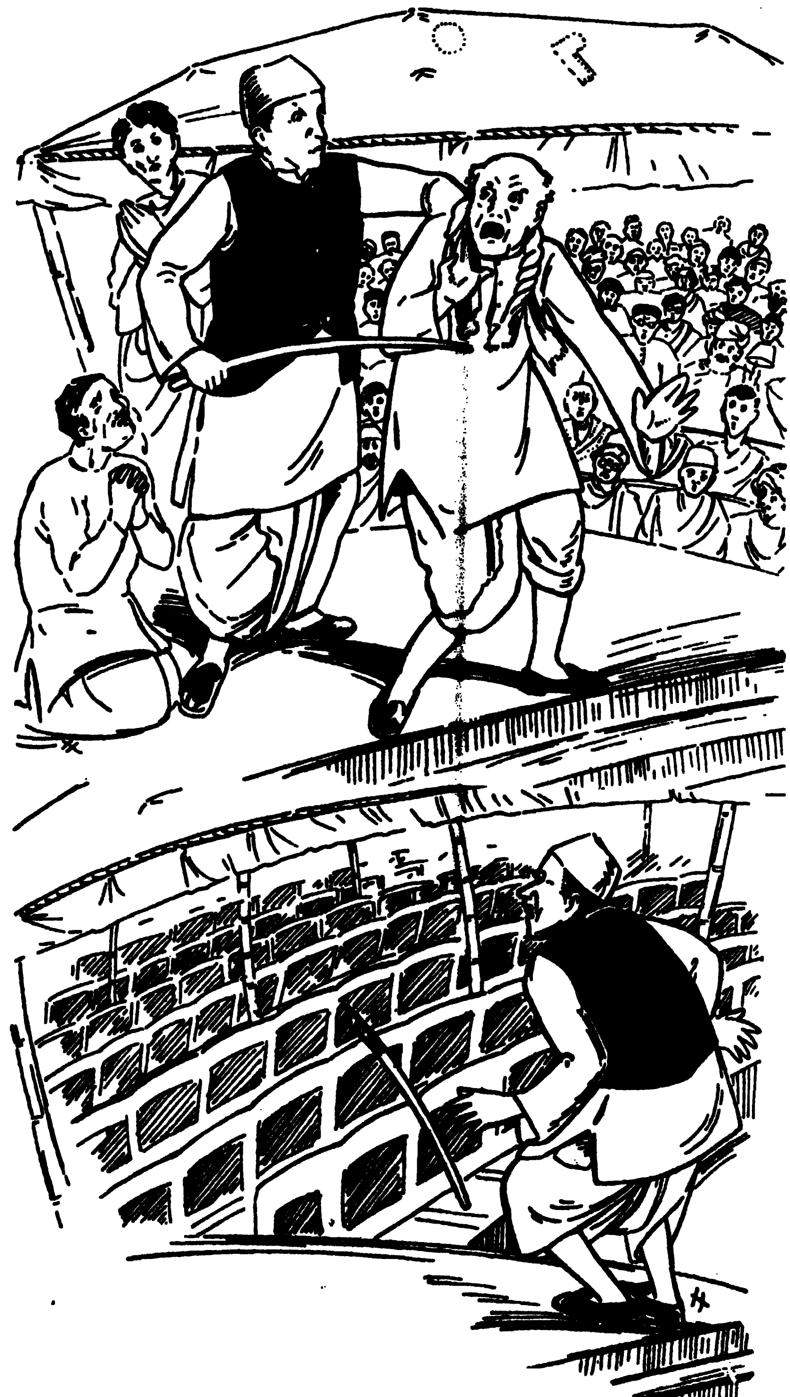
গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া লাগিল। চাকর রাম ছুটিয়া আসিল। রায় বাহাদুর উপরের ঘরে চলিলেন, রামও পিছন পিছন চলিল। অন্যদিন আসিয়াই কোট-প্যাণ্ট ছাড়িয়া জলযোগে বসেন; আজ ঘরে ঢুকিয়াই চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। রাম একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, 'কাপড় ছাড়বেন না? খাবার আনব!' রায় বাহাদুর কাপড় ছাড়িতে লাগিলেন, রাম খাবার আনিতে গেল। প্রত্যহ যেমন জলযোগে বসেন আজও তেমনি বসিলেন, আহারে তেমন রুচি হইল না, অল্প একটু খাইয়াই বলিলেন, 'নিয়ে যা,—চা নিয়ে আয়।' রাম চা আনিয়া দিল, চা খাইতে খাইতে বলিলেন, 'রাম, কাল থেকে আর কোর্টে যেতে

দেশের জন্য



"যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে…"

নূতন শাসন-তন্ত্র (কংগ্রেস)



(উপরে ঃ প্রথম পর্ব্ব। নীচে ঃ দ্বিতীয় পর্ব্ব)

হবে না, বুঝলি?' রাম শুনিয়াছিল, আজ বাবুর অবসর গ্রহণের দিন। তবু জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?' 'আজ সব চুকিয়ে দিয়ে এলাম, বুঝলি?' রাম বলিল, 'তা অনেক দিন কাজ করলেন, এখন একটু জিরিয়ে নিন, ভালই তো।' 'হাঁ এইবারে দিন কতক জিরিয়ে নেওয়া যাক্, কি বলিস্?' 'আজ্ঞে হাঁ।' 'আচ্ছা তুইও ত অনেক দিন কাজ করলি, তোরও ত জিরানো দরকার।' রাম জোড়হাত করিয়া বলিল, 'ও কথা বলবেন না হুজুর, কোথায় যাব?' 'কেন? দেশে ত তোর ছেলে-পিলে রয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে থাকতে পারিস। আমি যেমন পেন্সন্ পাব, তুইও তেমনি পাবি।' 'সে আমি পারব না, হুজুর, আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাব? সবাই থাকলে—' আর বলিতে পারিল না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; রাম তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রায় বাহাদুরের নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র বন্ধু এই ভৃত্য রাম। তিনি বিশেষভাবে জানিতেন তাহাকে বাদ দিয়া তাঁহার কিছুতেই চলিবে না, তবু কেন তাহাকে এ কথা বলিয়া ফেলিলেন, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। রাম রাজী হইল না দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন, আনন্দিতও হইলেন। যদি সে রাজী হইত?—বাকীটা আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি লাঠি লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। বৈকালে বেড়ান তাঁহার কোন কালে অভ্যাস ছিল না; কাজেই রাম ভাবিল বাবু বোধ হয় কোথায় যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিল, 'গাড়ী বের করতে বলব?' 'না, একটু পার্কটায় ঘুরে আসি।' রামও সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল; রায় বাহাদুর কি একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'না, থাক্, আমি একাই যাই।' রাম বিরত হইল, শুধু বলিয়া দিল বেশী দেরী যেন না হয়।

কলিকাতা সহরে এত কাণ্ডও আছে! ঐ একটা লোক তিন হাত দাড়ি আর এক হাত গোঁফ লাগাইয়া এমন ভাবে চলিতেছে যে, মনে হইতেছে ও যেন চেয়ারে বসিয়া আছে, আর চেয়ারটি হাঁটিয়া চলিয়াছে; ওর মুখ হইতে কথার ফোয়ারা বাহির হইতেছে;—

সর্ব্বসিদ্ধি কবচ, বাবু, সর্ব্বসিদ্ধি কবচ—
হাঁপ সারে, কাশ সারে, বাধক বেদনা বাত সারে
কি চাই, বাবু,—আসুন—

আবার সুর করিয়া বলিতেছে—

থাকলে আমার কবচ পাশে
রুষ্ট গিন্নী মুচ্‌কি হাসে…

এমন মুখভঙ্গী করিয়া কথাগুলি বলিতেছে যে, পাশের লোকেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিতেছে। রায় বাহাদুর জোর করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিলেন। কয়েক পা আগাইয়া দেখেন, একটি লোক ভূতের মত মুখোস পরিয়া নাকি-সুরে অনর্গল কি বকিতেছে। তার ভাষা হিন্দি-বাঙ্গলা-ইংরাজিতে এমন অপূর্ব্ব এক খিঁচুড়ি হইয়াছে যে তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য—হাতে রহিয়াছে কতকগুলি মুখোস্, এগুলি বিক্রয় করিবার জন্যই এ আয়োজন। আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় একটি লোক কাণের কাছে মুখ লইয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'প্যারিস পিকচার চাই বাবু, নেকেড পিকচার!' রায় বাহাদুর রুখিয়া দাঁড়াইলেন,—লোকটা বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল; রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প একটু গিয়াই দেখেন সাম্‌নে একটি স্ত্রীলোক পথের এককোণে বসিয়া করুণ কণ্ঠে সকলের কাছে একটি পয়সা চাহিতেছে—পরণে একটা ফর্সা কাপড়, মাথায় ঘোমটা, ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয়; কোলে একটি চার পাঁচ মাসের শিশু, তার পাশে একটি দশ এগার মাসের,—সামনে আরও তিনটি শুইয়া আছে, তাদের বয়স যথাক্রমে এক বছর, আঠার মাস ও দেড় বছর হওয়া উচিত। সবগুলি যদি সেই মহিলার সন্তান হয়, তবে…? রায় বাহাদুর কাঁপরে পড়িলেন। আরও তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাম্‌নের রেলিং-এ অনেক পুরাণ বই সাজান আছে, এবার সেইগুলি দেখিতে লাগিলেন। বই কেনা তাঁর অভ্যাস ছিল যথেষ্ট, কিন্তু পুরাণ বই দেখা এই প্রথম। "শিশুর মন", বইটা তুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদ; 'শিশুর জগৎ', 'শিশুর একটা নিজস্ব জগৎ আছে, যার সঙ্গে আমাদের জগতের খাপ খায় না, আমাদের এ জগতে তাকে জোর করিয়া টানিয়া আনা মানে তাকে হত্যা করা,'

এই সব কথা বলিয়া লেখক আরম্ভ করিয়াছেন। কথাগুলি বড় ভাল লাগিল,ঠিক করিলেন বইটা কিনিবেন। দেখিলেন তার পাশেই আর একটা বই রহিয়াছে, 'মৃত্যুর পরপারে'। 'শিশুর জগৎ' যথাস্থানে রাখিয়া আগ্রহের সহিত বইটি টানিলেন ও নিবিষ্ট-চিত্তে পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। 'এ জীবনই শেষ নয়, ইহার পরে আর একটা জগৎ আছে, মানুষ নিজের চেষ্টায় সে জগতের সন্ধান পাইতে পারে—' এই ভাবে বইটার আরম্ভ। স্প্রিং যেমন হঠাৎ ছাড়া পাইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া উঠে, রায় বাহাদুরেরও সমস্ত জিজ্ঞাসাবৃত্তি নিমিষের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। কোথায় সে জগৎ ? কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ? কে তাহার সন্ধান বলিতে পারে ? তন্ময় হইয়া রায় বাহাদুর পাতা উল্টাইতেছেন, হঠাৎ যেন কাণে গেল, 'বাবা কোথায়, বলুন না ?' ফিরিয়া চাহিলেন, একটি চার পাঁচ বছরের বালক পাশে দাঁড়াইয়া, তার চোখে জল। 'কি খোকা, কি হয়েছে ?' 'বাবা কোথায় ?' গম্ভীর ভাবে রায় বাহাদুর বলিলেন, 'তা আমি কি জানি ?' অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্য্যে বালক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তবুও আবার বলিল, 'বাবার কাছে যাব।' এবারে রায় বাহাদুর একটু সুর নরম করিয়া বলিলেন, 'কোথায় ছিল বাবা তোর ?' 'এই খানেই তোমার কাছে ছিল যে।' 'আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে।' শিশু নির্ব্বিবাদে তাঁর একটা অঙ্গুলি ধরিয়া সঙ্গে আসিতে লাগিল

তখন বিকাল হইয়াছে। কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে খুব ভিড়। রায় বাহাদুর বালককে লইয়া চলিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর বাবার নাম কি ?' বালক নির্ব্বিবাদে বলিল, 'বাবু'। এর মধ্যেই সঙ্কোচ চলিয়া গিয়াছে, বালকের চোখে আর জল নাই, সে যেন কর্ণধার পাইয়াছে। রায় বাহাদুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, তোর বাড়িটা কোন পথে জানিস্ ?' 'বা রে, সেই যে সামনে তেতালা বাড়ি আছে—খুব গান হয়, ভোঁ—পোঁ —পোঁ—ভোঁ—পোঁ—পোঁ'—সে প্রায় গানই জুড়িয়া দিল। রায় বাহাদুরের হাসি পাইল ; কিন্তু চাপিয়া গেলেন। 'আচ্ছা, বাড়ির সামনে আর কি আছে বল ত ?' 'সেই গাছটা যাতে পাখী সব গান করে—দেখ নি !' 'আর কি আছে ?' 'আর—আর—ট্রাম গাড়ি, সামনে একটা লোক ঘণ্টা বাজায়—ঢং—ঢং—ঢং—চাকা ঘুরোয়, আর গাড়ি চলে—' 'বেশ, আর ?' 'আর পেটের অসুখের দোকান।' 'কিসের ?' 'হ্যাঁগো সেই কেমন বড় বড় খাবার বিক্রী হয় যা খেলে পেটের অসুখ হয়।' 'তোর বুঝি হয়েছিল ?' 'না হয়নি, বাবা বলেছে হয়।' 'আর ?' 'আর মেনীর শ্বশুরবাড়ি। মেনীকে দেখনি ? মিউ মিউ করে ডাকে ?' রায় বাহাদুর এবার হাসিয়া উঠিলেন,– 'আচ্ছা বেশ, তোর নাম কি ?' 'আমার নাম অপু। তোমার নাম কি ?' একটু হাসিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, 'দাদু', 'ও তুমি দাদু ?' এ যে তার অতি পরিচিত নাম।

অপু দাদুর হাত ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়াছে। সে জিজ্ঞাসার প্রতিমূর্ত্তি, যা কিছু নূতন তা তাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে। লোকগুলি তার ফুটপাথ দিয়া না গিয়া অপর ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে কেন তাহাকে বলিতে হইবে ; ঐ সামনের লোকটি প্যাণ্ট-কোট পরিয়া ঐ বাড়িটার সামনে দাঁড়াইয়া আছে কেন তা তার জানা চাই ; কলেজ স্কোয়ারে অত লোক কি করিতেছে, সামনের পথটি কোথায় গিয়াছে, বাসটা যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইল কেন, এ সাহেবটা বাঙ্গালী পাড়ায় কি করিতেছে, এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হইবে। দাদু দুই এক কথায় সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অব্যাহতি নাই, সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে। হঠাৎ পাশে একটা ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'হিপ্ হিপ্ হুররে, বৌবাজারের মোড়ে।' বলিয়াই ছেলেটি দৌড় দিল। অপুও চীৎকার করিয়া উঠিল 'হিপ্ হিপ্—'সঙ্গে সঙ্গে ছুট। 'আরে, যাস্ কোথায় ? যাস্ কোথায় ?' রায় বাহাদুর এক প্রকার ছুটিয়াই তাহাকে ধরিলেন, তিনি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন, এ পথে-পড়িয়া-পাওয়া ছেলে। 'ওকে বলতে হবে।' 'কি বলতে হবে ?' 'ও ভুল বলেছে।' 'কি ভুলটা হয়েছে শুনি।' 'হিপ্ হিপ্ হুররে বাগবাজারের মোড়ে।' বালকের প্রাণ এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাচিয়া উঠিয়াছে। সে আবার ছুটিতে চায়। রায় বাহাদুর জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই কিন্তু একটা প্রকাণ্ড সমস্যার আংশিক মীমাংসা হইয়া গেল. রায়

বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ও তবে, বাগবাজারের ওড়া পাখী।

বৌবাজারের মোড় পার হইয়াছেন। সামনে ফুলের দোকান। অপু চীৎকার করিয়া উঠিল, 'দাদু একটা ফুল নাও না।' রায় বাহাদুর দুটি গোলাপ ফুল কিনিলেন, একটি নিজে লইলেন, আর একটি দিলেন অপুকে। ফুল পাইয়া অপুর মহা আনন্দ; সে একে চঞ্চল, এ বারে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক লাফে রায় বাহাদুরের হাতের ফুলটি কাড়িয়া লইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রত্যক্ষ মানহানি! তিন ঘণ্টার ভূতপূর্ব্ব হাকিমের প্রাণে লাগিল, মনে করিলেন রাগ করিবেন, কিন্তু সে হাসির কাছে রাগের সমস্ত আয়োজন কোথায় উড়িয়া গেল; রায় বাহাদুরও হাসিয়া উঠিলেন। অপু দুইটি ফুলই এবার তাঁহাকে দিয়া বলিল, 'দাদু তুমি নাও।' 'না, তুই নে, আমি আরও কিন্‌ছি।' অনেক ফুল কিনিলেন; অপুকে আরও দুই তিনটি দিলেন; বাকীগুলি দোকান-দারকে তুলিয়া রাখিতে বলিলেন,—একটু পরে তাঁহার লোক আসিয়া লইয়া যাইবে।

হঠাৎ পিছনে এক ভীষণ শব্দ হইল। অপু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কোলে উঠিয়া বসিয়াছে,—তিনিও তাহাকে কোলে ধরিয়া আছেন। একটা বাসের সঙ্গে মোটর গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়াছে। দোতালা বাসটা ভাঙ্গিয়া পড়িল, অনেকগুলি লোক পথের উপর ছিটকাইয়া পড়িল; কাহারও মাথা ফাটিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল; কাহারও কান কাটিল,—সব চেয়ে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের, বেচারীর একটি হাত উড়িয়া গিয়াছে, মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়াছে,—প্রাণ আছে কি না বুঝিবার উপায় নাই। অপুর কান্না তখনও থামে নাই। রায় বাহাদুর তাহাকে চুপ করাইতেছেন, 'চুপ কাঁদছিস্ কেন? কোন ভয় নেই।' '...নমস্কার, রায় বাহাদুর, কেমন আছেন? ওঃ—কি কাণ্ড দেখেছেন—ড্রাইভার বেটাগুলো...এটি কে? নাতি বুঝি?' 'হাঁ—না—তা, কোথায় চলেছেন?' 'একটু শাঁখারীটোলা...' যাব—নমস্কার।' পরিচিত ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল; রায় বাহাদুর প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোলে অপু।

অপু কোল হইতে নামিয়াছে; রায় বাহাদুর দাঁড়াইয়া আছেন, গভীর চিন্তামগ্ন। অপু কয়েকবার ডাকিয়া কোন সাড়া না পাইয়া চুপ করিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই মানুষ যেমন জাগিয়া উঠে, রায় বাহাদুর হঠাৎ তেমনি জাগিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সামনের ট্যাক্সি থামাইয়া তাহাতে অপুকে লইয়া চাপিয়া পড়িলেন,—ড্রাইভারকে বলিলেন, 'লালবাজার থানায় চল।'

গাড়ী থানায় ঢুকিল। সামনেই পড়িল একজন দারোগা। রায় বাহাদুর অপুকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এই ছেলেটিকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে, খোঁজ নিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেবে।' দারোগার কাছে তিনি অপরিচিত নন, সে সম্ভ্রম ভাবে বলিল, 'যে আজ্ঞা, হুজুর।' অপুকে গাড়ী হইতে কোলে তুলিয়া লইল, আদর করিয়া গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'খোকা তোমার নাম কি?' রায় বাহাদুরকে বলিল, 'হুজুর, নিশ্চিন্ত থাকুন, এখনই একে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।' 'ওর ঠিকানা পাওয়া যায় নি, সম্ভবতঃ বাগবাজার অঞ্চলে বাড়ী।' 'হুজুরের আশীর্ব্বাদে আমরা—।' বালক ইত্যবসরে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, 'দাদু, বাবা কাছে যাব—বাবা কাছে—।' রায় বাহাদুরের ইঙ্গিতে গাড়ী ষ্টার্ট দিল, বালক আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'দাদু তোমা কাছে যাব—দাদু।' গাড়ী থামিল। 'আচ্ছা, ওকে আমার কাছে দাও,—ওর বাড়ীর খোঁজ ক'রে আমার বাসা থেকে নিয়ে এস।' দারোগা সেলাম করিয়া বালককে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। বালক জোরে রায় বাহাদুরের গলা জড়াইয়া ধরিল, 'বাবা কাছে যাব—যাব না—বাবা কাছে—' অর্থাৎ রায় বাহাদুরের বাসায় যাইবে না, বাবার কাছে যাইবে। 'আচ্ছা চুপ, বাবার কাছে দিয়ে আসছি।' গাড়ী ছুটিয়া চলিল। ড্রাইভারকে হাঁকিয়া বলিলেন, 'ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।' অভিমানে অপুর ঠোঁট ফুলিতেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে ও মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহাকে থামাইতে অনেক বেগ পাইতে হইল, বহু খোসামোদের পর

আবার বালকের মুখে হাসি দেখা দিল,—রায় বাহাদুরও হাঁপ ছাড়িলেন!

অপুকে ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া রায় বাহাদুর ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। জানালার ফাঁক দিয়া আনমনে আকাশের দিকে চাহিতেছেন,—এ চাওয়া নূতন নয়—এটা এক প্রকার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ছোট ছোট কয়েকটি মেঘ আকাশের বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, শেষ-সূর্য্যের কিরণে তাদের প্রান্তগুলি বেশ একটু রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে, দূরে দুইটি পাখী ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতেছে—রায় বাহাদুর চাহিয়া আছেন—পাখী দুইটি উড়িয়া চলিয়াছে—ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে—যত দূরে যাইতেছে, তত রায় বাহাদুর মাথা উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন—দূরে, আরও দূরে—রায় বাহাদুর উঠিয়া বসিয়াছেন—ধীরে ধীরে পাখী দুইটি মিশিয়া গেল মেঘের মধ্যে, রায় বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইলেন আর দেখা গেল না—কিন্তু দেখা চাই—জোর করিয়া চাহিয়া রহিলেন—ধীরে ধীরে মেঘটি চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল—সামনে কেবল নীল আকাশ—কোথাও কিছু নাই, সব ফাঁকি মনে হইল, তাই ত! আকাশের নীলিমাটাই ত একটা অনন্ত ফাঁকি! ঘরের মধ্যে দ্রুত পাইচারি করিতে লাগিলেন। কাজের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রায় বাহাদুর হইয়া পড়িলেন দার্শনিক, একেবারে ঘোর মায়াবাদী! আলমারি হইতে একটা বই টানিয়া বাহির করিলেন, নাম "মায়াবাদ"। মলাটটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দুই এক পাতা উল্টাইয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। দেওয়ালে নজর পড়িল দুইটি ছবির উপর, একটি তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রীর, আর একটি স্বর্গীয় পুত্রের। হঠাৎ মনে পড়িল আজ তাঁর পত্নীর জন্মতিথি, গত বৎসর এমনি সময়ে তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীকে নূতন বর সাজাইয়া কত কৌতুকই না করিয়াছিল! আর আজ!...

ক্রমশঃ সে দিনের সমস্ত স্মৃতি একে একে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। কোর্ট সেদিন বন্ধ, সকাল হইতেই সরমার ব্যস্ততা দেখে কে? বিছানা আসবাব-পত্র গোছাইয়া শুইবার ঘরটি সুন্দর ভাবে সাজাইল, রায় বাহাদুর কিনাইয়া আনিলেন ফুলের মালা, তোড়া, ইত্যাদি কত কি। সরমার গলায় মালা পরাইয়া দিলে সেই মালা খুলিয়া লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া সে যখন তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল! রায় বাহাদুর শিহরিয়া উঠিলেন—চারি চক্ষু মিলিত হইতেই উভয়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আকুল রায় বাহাদুর সরমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন—উভয়ের ভিতর হইতে অস্ফুট-স্বরে ক্রন্দন বাহির হইল,—উভয়েই চাহিলেন দেওয়ালে স্বর্গীয় পুত্রের ছবির দিকে!...রায় বাহাদুর এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন দেওয়ালের দিকে। আজ তাঁর পুত্রের পাশে সরমার ছবিও স্থান পাইয়াছে। দু'জনেই গভীর চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর তিনি আছেন! আলিপুরের অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, আসামীর ভূতপূর্ব্ব দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, আইন ও শৃঙ্খলার মূর্ত্তিমান রক্ষক! তিনি আছেন! চমৎকার...কঙ্কাল জীবন্ত শরীরকে অতিক্রম করিয়া থাকে কেন? পত্রপুষ্পহীন নীরস বৃক্ষ শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে কেন?

হঠাৎ কানে গেল, 'ক্ষিদে পায়নি বুঝি?' চাহিয়া দেখিলেন অপু তাঁহাকে চিম্‌টি কাটিতেছে, হাত দিয়া ঠেলিতেছে, ইত্যাদি। 'কি? ক্ষিদে পেয়েছে? আচ্ছা।' টেবিলের উপর নজর পড়িতেই দেখিলেন দোয়াতটা এক কোণে পড়িয়া আছে, কলমটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাইতেছে, খানিকটা কালি প্যাডের উপর ছড়ান। 'তুই বড় দুষ্টু, এখানে আয়'—বালক কাছেই ছিল, আরও কাছে আসিল 'কি খাবি?' বালক দুই হাত দিয়া দেখাইল, 'এতটা খাব' 'তাতো বুঝলাম। খাবি কি?' 'খাব ভাত, রুটী, আলু, মাছ, রসগোল্লা, ডিম, আর—আর—', রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, 'ঘোড়ার ডিম।' রাম অন্তর্য্যামীর মতই ঠিক সেই সময় একথালা খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল। রায় বাহাদুর একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন, রাম শুনিয়াছে না কি? এতদিনের হাকিমী আবার উঁকি মারিতে লাগিল,—রায় বাহাদুর হাকিম সাজিয়া বসিলেন।

রাম বালককে খাওয়াইতেছে। খাওয়া ত নয়, যেন খাদ্যের সঙ্গে যুদ্ধ! খাইতে খাইতে আধখানা রসগোল্লা

রায় বাহাদুরের কাছে লইয়া হাজির হইল। 'দাদু, তুমি খাও।' কোন উত্তর নাই। রায় বাহাদুর তখন জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের তারা গণিতেছেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বালক ফিরিয়া আসিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; রাম খাওয়াইতে চাহিল, বালক মুখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর আড়চোখে দেখিতেছেন। শেষে বলিলেন, 'যা, আমি খেয়েছি।' সুরে গাম্ভীর্য্য কম। বালক আবার খাইতে লাগিল। রায় বাহাদুর হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন, ইহার দৌরাত্ম্যের কাছে রায় বাহাদুরের বাহাদুরি টেঁকা কঠিন!

খাওয়া হইয়া গিয়াছে। রাম চলিয়া গিয়াছে। অপু টেবিলের উপরের কাগজ চাপা দিবার কাচের বস্তুটি লইয়া এবার পড়িয়াছে, উহার ভিতরের ফুলটি তাহার চাই। সেটি দাদুর কাছে লইয়া গিয়া হাজির হইল,—'দাদু, ফুলটি বের করে দাও।' 'বের করব কি করে?' 'বা রে! ওর ভিতর থেকে বের করা যায় না বুঝি?' 'কেমন করে? ভাঙ্গতে হবে যে।' 'ভেঙ্গে বের করে দাও না।'—ওটি ভাঙ্গিয়া ফুলটি বাহির করিয়া দিতে হইবে! 'আচ্ছা হচ্ছে থাম।'—মনে পড়িল সেই দোকানের ফুলের কথা। রামকে ডাকিয়া সেই ফুলগুলি আনিতে বলিলেন, অপুকে বলিলেন, 'থাম, ফুল আনুক।' অপুও ভাল মানুষের মত কি জানি কেন কথাটা শুনিল, চুপ করিয়া রায় বাহাদুরের পাশে বসিল। রায় বাহাদুর তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটু পরেই নিদ্রিত বালকের কোমল বাহু তাঁহার কোলে লুটাইয়া পড়িল; বালক তাঁহার পাশে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

মনের মধ্যে প্রলয়ের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। কোথা হইতে কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল বালক আসিয়া তাঁহাকে এইরূপে অধিকার করিতে বসিয়াছে। কত লোকের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয়, এমন ধৃষ্টতা ত কাহারও হয় না! এই দুর্ব্বল অসহায় শিশু, এখনই ইহাকে বিদায় দিয়া দেওয়া যায়,—হয় ত দিতেও হইবে। কিন্তু কেন এই উৎপীড়ন? কেন এ সমস্ত অম্লানবদনে সহ্য করা? আইনের শাসনে চির অভ্যস্ত তিনি একটা শিশুর বে-আইনী শাসনের ফাঁসে পড়িবার লোক নন। কোথায় হৃদয়ের কোন্ কোণে একটু দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, তাহারই সুবিধা লইয়া এ বালক আজ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এর প্রশ্রয় কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না, কিছুতেই না! তাঁহাকে শক্ত হইতে হইবে, যেমন করিয়া হউক নিজের প্রতিষ্ঠা অটুট রাখিতে হইবে। রায় বাহাদুর শক্ত হইয়া শিশুর দিকে চাহিলেন! সে তাঁহার কোলে হাত রাখিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে! লৌহ-শৃঙ্খল যে অনায়াসে চুরমার করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, সে সঙ্কোচ করিবে সামান্য লতার বেষ্টনকে? কিন্তু···কিন্তু রায় বাহাদুরের শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

আবার নজর পড়িল দেওয়ালের ছবি দুইটির পানে। একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। এক বছর আগে ঠিক এমনি দিনে!···আর আজ!—তারও বছরখানেক আগে?—এ ঘরে সুখ ছিল, শান্তি ছিল, ভালবাসা ছিল, হয়ত স্বর্গই বাসা বাঁধিয়াছিল এর সীমানার মধ্যে। আজ সুখ শান্তি সব গিয়াছে; ভালবাসা!—তাও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; রহিয়াছেন তিনিই কেবল ভাঙ্গা হাটে গাছের তলায় সুপ্ত দীর্ঘ পথের যাত্রীর মত, উৎসবের শেষে নিজের একা ঘরে পরিত্যক্ত হতভাগ্য অতিথির মত! যেখানে ছিল উপবনের শোভা, আজ সেখানে উৎকট পরিহাসপূর্ণ মরুভূমি, এক ফোঁটা জল নাই, একটু ছায়া নাই, চারিদিকে কেবল বালি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আর তার মাঝে তিনি– হাঁ, আছেন,—ঐ সূর্য্যমণ্ডলে ভ্রাম্যমান অগ্নিকণাগুলি যেমনভাবে আছে, কবরের মধ্যে কঠোর মৃত্তিকার আবেষ্টনে অস্থিগুলি যেমন ভাবে থাকে, তিনিও তেমনি আছেন। দুনিয়াটা ঠিক তেমনি চলিতেছে, কোথাও একটু বিচ্যুতি ঘটে নাই, তেমনি হাসি, তেমনি কান্না, তেমনি অপরাধ, তেমনি বিচার, তেমনি শাস্তি, তেমনি হাকিমী, সব ঠিক তেমনি! রায় বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন; বালকের বাহু তখনও তেমনি তাঁর কোলের উপর! উঠা হইল না। অস্ত্রোপচারের টেবিলে রোগী যেমন চোখ কান বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে, রায় বাহাদুরও তেমনি পড়িয়া রহিলেন!—ঐ বালকটা নিঃসঙ্কোচে তাঁহার পাশে ঘুমাইতেছে, কি অসম্ভব সাহস ওর!

কুকুরের মত তিনি পাহারা দিয়া বসিয়া আছেন, আর ও ঘুমাইতেছে। ধৃষ্টতার সীমা থাকা উচিত।—ডাকিলেন 'রাম'। রাম গো-বেচারীর মত আসিয়া দাঁড়াইল, হাতে সেই ফুলগুলি। রায় বাহাদুর তেমনি পড়িয়া রহিলেন, কোন কথা নাই। রাম ফুলগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'রাম।' রাম সাড়া দিল। 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যা।' 'আজ্ঞে, ওর বাবা নীচে আছেন, ডাকব।' 'আগে বলিস্ নি কেন?' 'এই একটু আগে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' 'কোন দরকার নেই, নিয়ে যা।' রামের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ব্যাপার কি? বালককে তুলিতে গেল, রায় বাহাদুর কি ভাবিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ডাক।'

অতি ত্রস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে একটি যুবক ঢুকিল; নমস্কার করিয়া সামনে দাঁড়াইতেই রায় বাহাদুর অতি রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে সামলাতে পার না? আবার যদি এ রকম—' যুবক অপ্রস্তুত। একটু সামলাইয়া লইয়া বিনীতভাবে বলিল, 'কি করব বলুন? গরীব স্কুলমাষ্টার, সারাদিন পেটের দায়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, কি করি? অপরের ছেলে দেখে বেড়াতে হয়, নিজের ছেলে দেখি তার উপায় নাই। কুক্ষণে আজ ওকে নিয়ে পড়াতে বেরিয়েছিলাম, পড়াতে পড়াতে খেয়াল ছিল না, ও কখন বেরিয়ে এসেছে বুঝতেই পারি নি। আপনি ও কে না দেখলে কি যে হত! আজ আমার যা উপকার করেছেন—' রায় বাহাদুর হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'কৃতজ্ঞতা জানাতে তো বলা হয় নি।' যুবক বেকুবের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া ছেলে কোলে লইয়া অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল; বালকের ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই।

গরীব স্কুলমাষ্টার! রায় বাহাদুর চমকিয়া উঠিলেন। এ আর এক ষড়্‌যন্ত্র। সকলে কি তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে? তাঁর পিতাও যে ছিলেন একজন স্কুলমাষ্টার। রায় বাহাদুর উঠিয়া ঘরের মধ্যে জোরে জোরে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘদিন রায় বাহাদুরের কাছে থাকিয়া রাম তাঁহার নাড়ী-নক্ষত্র ভাল করিয়া চিনিয়াছে। ব্যাপারটা তার কাছে ভাল বোধ হইল না, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না; দরজার সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর বলিলেন, 'কি? কোন দরকার আছে?' রাম নিরুত্তর। তাঁর সুস্পষ্ট মনে হইল কি যেন চুরি করিতে গিয়া রামের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। জোর করিয়া বলিলেন, 'কি? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! কোন দরকার আছে?' রাম দেখিল একটা কিছু না বলিলে আর চলে না। 'আজ্ঞে, না ঠাকুর বলছিল আপনার শরীরটা ভাল নেই—তাই…' 'হাঁ—শরীরটা ভাল নাই, মাথাটা কেমন করছে, আজ আর কিছু খাব না, বুঝলি?' 'একটু শুলে হ'ত না?' 'যা, তোরা খেয়ে নে।' রায় বাহাদুর শুইয়া পড়িলেন।

চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রায় বাহাদুর অসুবিধায় পড়িবেন তা রাম বুঝিয়াছিল; কিন্তু এতদূর চাঞ্চল্য সে আশা করে নাই। সে মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে। ছেলেটা অনেক জিনিষ গোলমাল করিয়া দিয়া গিয়াছিল; সেগুলি গুছাইয়া রাখিল। টেবিলের উপরের ফুলগুলি কোথায় রাখা যায় তা খুঁজিয়া পাইল না। হঠাৎ গিন্নিমার ছবির দিকে নজর পড়িল, মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া হইয়া গেল,—আজ যে গিন্নিমার জন্মদিন! এবারে বুঝিল, রায় বাহাদুর কেন ফুল কিনিয়াছিলেন। তিনি যে এ কথা মনে করিয়া রাখিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার প্রতি মনে কৃতজ্ঞতাও আসিল, একটু আনন্দও হইল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার কথা মনে হওয়ায় মনটা বিষাদে ভরিয়া উঠিল। গিন্নিমা! তিনি তাকে বড় ভাল বাসিতেন; যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন, 'ওঁর কেউ রইল না রাম, তুই ওঁকে দেখিস; ওঁকে ছেড়ে কোথাও যাবিনে বল।' রাম তাঁহাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল,—আজ পর্য্যন্ত সে প্রতিশ্রুতির অপমান সে করে নাই এবং কখনও করিবে বলিয়া ভাবিতেও পারে না। ফুলগুলি লইয়া গিন্নিমার ছবিটি সাধ্যমত ভাল করিয়া সাজাইতে লাগিল; সাজায় আর মাঝে মাঝে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে; মনে হয় যেন ছবি জীবন্ত হইয়া তাহাকে বলিতেছে,'ওঁকে ছেড়ে কোথাও যাবিনে বল!' তার চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াইতে লাগিল। হঠাৎ কানে আসিল এক করুণ কণ্ঠের আহ্বান,

'রা—ম,—' কি করুণ সে সুর! যেন ঝর্ণা পাষাণের আবরণ টুটিয়া বাহির হইতেছে। রাম সেই অবস্থাতেই ফিরিয়া চাহিল, দেখে রায় বাহাদুর বিছানায় বসিয়া তার দিকে চাহিয়া আছেন। দুইজনে চোখাচোখি হইতেই রাম চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বেলা হইয়াছে। রায় বাহাদুর এখনও উঠেন নাই। রাম কয়েকবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গিয়াছে, জাগায় নাই। প্রায় আটটার সময় বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'বেলা হয়েছে, উঠলে হত না!' রায় বাহাদুর উঠিয়া বসিলেন। প্রথমেই নজর পড়িল কালিকার সাজান ছবির উপর, তারপর রামের উপর; বলিলেন, 'ও ফুলগুল সব ছিঁড়ে ফেলে দে।' রাম স্তম্ভিত। 'কি বললাম শুনতে পাসনি?' রাম মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। 'কি? দাঁড়িয়ে রইলি যে?' রাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ও কথা বলবেন না, হুজুর, অকল্যাণ হবে।' 'অকল্যাণ হবে, বটে!' রায় বাহাদুরের একটু হাসিই পাইল; জোর করিয়াই আবার বলিলেন, 'হোক্ অকল্যাণ, তুই ফেলে দে।' 'আচ্ছা ফেলে দেব।' ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিবার কথা বলিয়া রায় বাহাদুর একটু ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন,—যদি রাম কথা না শুনে! এবার নিজেই একটু চাপিয়া গেলেন, বলিলেন, 'হাঁ, তাই দিস্—যা এখন, একটু পরে উঠব।' আবার শুইয়া পড়িলেন। রাম চলিয়া গেল।

রাম বেশ বুঝিল এই মুখস্থ-করা রাগের মধ্যে কোন দুর্জ্জয় অভিমান আছে। সে বিশেষভাবে জানে, বাধ্যতামূলকভাবে যে চলিয়া যাওয়া তার উপর অভিমান খাটে না,—কিন্তু তবুও আসে। এ আসার উপরেও হাত নাই তাও সে বুঝে। কিন্তু করিবেই বা কি?

বেলা প্রায় দশটা হইল। রায় বাহাদুর এখনও শুইয়া আছেন। রাম অনেকক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল শেষে আস্তে আস্তে কপালে হাত দিল। কপাল অত্যন্ত গরম। তবে ত জ্বর হইয়াছে! কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; অনেকক্ষণ ভাবার পর শেষে ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

হরিধন বাবু ডাক্তার সম্প্রতি এ পাড়ায় আসিয়া বসিয়াছেন। রাম তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া রায় বাহাদুরের নাড়ী টিপিলেন, বুক পরীক্ষা করিলেন, ব্যবস্থা-পত্র লিখিলেন, শেষে টাকা পকেটে ভরিয়া প্রস্থান করিলেন। ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর রায় বাহাদুর কতকটা জড়িত কণ্ঠে রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে রাম, তোকে ডাক্তার ডাকতে বললে কে?' রাম বিনীত ভাবে বলিল, 'দেখলাম আপনার গা গরম, তাই ডেকে আনলাম।' 'কেন মিছামিছি ডাকতে গেলি?' 'আজ্ঞে, অসুখ হ'লে একটু ওষুধ খেতে হয়।' রায় বাহাদুরের হাসিই পাইল, হাঁ, অসুখ হইলে ঔষধ খাইতে হয় বটে! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ম্যাক্‌বেথের সেই লাইনটি,—

"Can'st thou not minister to a mind diseased…!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, যা, এখন আর বিরক্ত করিস নে, একটু ঘুমুতে দে।' রাম চলিয়া গেল।

ঔষধ লইয়া আসিয়া রাম বিছানার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সাহস নাই যে ডাকে। হঠাৎ মনে পড়িল রায় বাহাদুরের সকাল বেলার সেই ফুল ছিঁড়িয়া ফেলিবার আদেশ। একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, এখন ও ছবি দুইটি কর্ত্তার চোখের সামনে না থাকাই ভাল; কে জানে এ ছবি দুইটির সঙ্গে আজিকার এ অসুখের কোন সম্বন্ধ হয় ত থাকিতেও পারে! কিছুক্ষণ ভাবিয়া ছবি দুইটি নামাইতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ শুনিতে পাইল রায় বাহাদুর বলিতেছেন, 'রাম ও কি করছিস?' 'আজ্ঞে, কিছু না, ওখানে বড় ধুলোমাটী লাগে; তাই ভাবছিলাম ও-দুটোকে পাশের ঘরে—।' 'ওখানেই থাক।' রাম ভাল মানুষের মত বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'ওষুধটা খেলে হত না?' "না রে, ওষুধ খায় না, যা।'

বৈকাল হইয়াছে। রায় বাহাদুরের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া রাম বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে এটা এমন কিছু নয়; সেও জানে এটা এমন কিছু নয়।

কিন্তু এইখানেই তার যত চিন্তা,—বুঝি কর্ত্তার কোন বড় রোগ হওয়াই এর চেয়ে ছিল ভাল। ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ সে কি যুক্তি করিল; শেষে কিছুক্ষণের জন্য কর্ত্তার পরিচর্য্যার ভার ঠাকুরের উপর দিয়া সে বাহিরে গেল। যাইবার সময় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণ লাগবে?' রাম বলিল, 'বেশীক্ষণ আর কি? যাব আর আসব; বাগবাজার, কতক্ষণ আর লাগবে?' ঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বেশীক্ষণ লাগিবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বলিয়া দিল, 'একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এস, বুঝলে?"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পাশের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; প্রত্যহই এমন সময় বাজে। রায় বাহাদুর কোন দিনই সেটা লক্ষ্য করেন না; আজ কিন্তু সে শব্দ তাঁর কাছে বড় উৎকট বোধ হইতেছে এবং সেইজন্য তাঁহার শান্তিভঙ্গের একটা প্রকাণ্ড কারণ হইয়াছে, মনে হইতেছে তাঁকে বিরক্ত করিবার জন্যই আজ ওরা জোর করিয়া ঘণ্টা পিটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৪৪ ধারা জারি করিবার উপায় থাকিলে হয়ত তিনি করিতেন, কিন্তু উপায় নাই। আঙ্গুল দিয়া দুই কান বন্ধ করিলেন, কানের মধ্যে পোঁ পোঁ শব্দ হইতে লাগিল। কান ছাড়িয়া দিলেন; ঘণ্টার শব্দ আরও ভীষণ ভাবে কানে প্রবেশ করিতে লাগিল। হঠাৎ শব্দ হইল, 'দাদু' 'আরে যাঃ'—রায় বাহাদুর বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। সেই দুরন্ত ছেলেটিকে ঘরে রাখিয়াই রাম বাহিরে চলিয়া গেল।

'তুই আবার কোত্থেকে এলি?'

'তুমি যে যাবে বলেছিলে?'

'কখন বললুম?'

'বা-রে! বলনি?'

রায় বাহাদুরের মুখে একটু হাসি ফুটিল। ঘণ্টার কচকচানিও তখন কমিয়াছে। বালক আসিয়াই তার চিরাভ্যস্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিল। বালিসটি টানিয়া তাঁর গায়ে ফেলিয়া দিল, 'বা রে! তুমি বলনি? তুমি ভারি···!' অভিযোগ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই! আবার বালিসটি টানিয়া যথাস্থানে রাখিল এবং নিজেই তাহার স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিল। রায় বাহাদুর কোন কথা বলিলেন না, কোন আপত্তিও করিলেন না। বালক তাঁর হাত লইয়া খেলা করিতে লাগিল আর ইচ্ছামত আবোল-তাবোল বকিতে লাগিল।

বাহিরের কোলাহল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্তম্ভিত রায় বাহাদুর স্তিমিত লোচনে বসিয়া আছেন। রায় বাহাদুর এক অপূর্ব্ব অনুভূতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন।

'দাদু!' —সাড়া নাই। 'দাদু, ও দাদু!' বালক রায় বাহাদুরকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিতে সাড়া আসিল, 'কি?' 'তুমি কাল থেকে কিছু খাওনি?' 'না।' 'কেন, অসুক করেছে?' কোন উত্তর নাই। বালক মুখ ভার বসিয়া রহিল। দুজনেই নির্ব্বাক, যেন বোবার বৈঠক বসিয়াছে।

ডাক্তার আসিল। 'নমস্কার, কেমন আছেন এ বেলা?' অপরিচিতকে দেখিয়া অপু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় বাহাদুর ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, 'আছি ভাল।' 'বেশ, কিছু ভাববেন না। It's partly nervous breakdown. তা এখন তো retire করলেন, দিন কয়েক change-এ যান না? এ রকম case-এ change-এ খুব বেশী উপকার হয়।' 'হাঁ, তাই যাব মনে করছি।' 'বেশ, কোথায় যাবেন মনে করছেন? এ সময়ে Hillsএ যাওয়াই ভাল।' 'যাব মনে করেছি একবার দেশের দিকে।' 'ও! তা বেশ; আপনার দেশটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে পারি কি?' 'বাঙ্গালা দেশের কোন এক অখ্যাত পল্লী।' 'তাই তো! কিন্তু······আচ্ছা, একটু সেরে সেখানে গেলে ভাল হয় না?' 'কেন? ম্যালেরিয়া ধরবে?' 'অসম্ভব নয়। গত পূজায় চার দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছিলাম; তার জের এখনও সামলাচ্ছি।' 'আপনাদের পক্ষে ভয়ের কথা বটে, আমাদের এ বয়সে আর সে ভয় নেই।' 'নেই কেন? ম্যালেরিয়ার একটা প্রকাণ্ড গুণ যে তার কাছে পক্ষপাতিত্ব বলে কোন জিনিষ নেই,—ও যুবার হাড়ে যেমন ঠক্‌ঠকানি আনে বুড়োর হাড়েও ঠিক তেমনি আনে। বৃদ্ধ বলে যে আপনি অব্যাহতি পাবেন তা নয়।' 'অব্যাহতি চাচ্ছে কে? জন্মটা যখন সেখানেই রেজেষ্ট্রি করা হয়েছে, মৃত্যুটাও সেইখানেই হওয়া উচিত নয় কি?' 'তার এখন অনেক দেরী। এই তো সবে বিশ্রাম নিলেন,

এখন দিন কয়েক বিশ্রামটা উপভোগ করুন;—তার পর।' রায় বাহাদুর একটু শুষ্ক হাসি হাসিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

শেষে ডাক্তার বাবু কলম লইয়া প্রেস্ক্রিপ্‌সন লিখিতে বসিলেন। 'এই নার্ভ টনিকটা দুই একদিন খান, তার পর একটু সুস্থ বোধ করলে দিন কয়েক কোথাও গিয়ে বেরিয়ে আসুন।'

হঠাৎ রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'আচ্ছা, ডাক্তার বাবু, মনের সঙ্গে শরীরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে কি? যদি থাকে তবে সম্বন্ধটা কি রকম?' কলম রাখিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'ওটা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা, a big physiological problem. যেটা আমরা মন বলি সেটা brain-এর function মাত্র। Nervous system কোন কারণে উত্তেজিত হলেই সেটা সঙ্গে সঙ্গে brain গিয়ে পৌঁছায়, brain protoplasm active হয়ে উঠে—এই function-এর নাম mind বা মন। কাজেই মনের ভিত্তি শরীরের উপর,—শরীরটা নিয়েই মন।—'

'অর্থাৎ ঘোড়ার ডিমের নাম অশ্ব-ডিম্ব।' ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রায় বাহাদুর আবার প্রশ্ন করিলেন, 'লুপ্ত-স্মৃতি মাঝে মাঝে হঠাৎ জেগে উঠে কেন?'

'Association-এর ফলে। এই কলমটার কথা যখন ভাবি তখনই এক বন্ধুর মুখ মনে পড়ে, কেন না সেই বন্ধু আমাকে কলমটা দিয়েছিল। তার কথা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে উঠে তার অন্তিম শয্যা, তার মৃত্যু-মলিন মুখ; সে মৃত্যুর কথা মনে হলেই আবার মনে পড়ে আমার মা'র কথা, যিনি প্রায় এক সময়েই দেহত্যাগ করেন, তা থেকে মনে পড়ে তাঁর আদর-যত্ন, তাঁর ভালবাসা, তাঁর…' ডাক্তারের গলা ধরিয়া আসিয়াছে। রায় বাহাদুর স্পষ্ট দেখিলেন, এখানেও সেই চোরা বালি; যে ডাক্তারি করিতে আসিয়াছে তাহারই ডাক্তারের প্রয়োজন।

বালক এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; ডাক্তারের ফাউণ্টেন পেনটি লইয়া প্রেস্ক্রিপসনের উপর হিজিবিজি দাগ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আপনমনে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, 'আ—মি—ই চ—অ—ল্—বো—ও বা—হি—রে—এ…।' উভয়েরই নজর পড়িল। ডাক্তার লাফাইয়া উঠিয়া কলমটি কাড়িয়া লইলেন—'যাঃ প্রেসক্রিপসনটাই নষ্ট করে দিলে, দুষ্টু ছেলে!' হিংস্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতেই বালক প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিষ্প্রভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর অবস্থাটা একটু উপভোগ করিলেন, বালকের প্রতি অনুকম্পাই হইল; বলিলেন, 'বড় অন্যায় করেছে বটে!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, 'কিসের অন্যায়? আমার মনের কথাটা কাজে পরিণত করেছে মাত্র।' বালকের প্রতি শ্রদ্ধাও হইল;—ও তাঁর মনের কথা জানিল কি করিয়া? 'আর কোন দুষ্টামি কর না, এবারে এসে চুপ করে বস।' বেচারী চোরের মত বিছানার এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল।

'আপনার মা তা হলে নেই! কতদিন গত হয়েছেন?'

'আজ তিন বৎসর হল।' ডাক্তার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—'হাঁ, তা হলে আমি এখন উঠি, একবার কালীঘাট যেতে হবে, ভুলেই গিয়েছিলাম,—নমস্কার।' উঠিয়া পড়িলেন। রায় বাহাদুর অনুমান করিলেন, association-এর ক্ষেত্রে নিশ্চয় কোন ভীমরুলের ঝাঁক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ প্রস্থান বোধ হয় তাহারই প্রতিক্রিয়া।

'Assoiciation'—বিজ্ঞান নামকরণ করে বেশ! এটা লইয়া গবেষণা করা যায় অনেক। কিন্তু জল লইয়া গবেষণা করিতে করিতে যখন বান আসে, তখন যে গবেষণার পুঁথি কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়! হাবুডুবু খাইতে খাইতে গবেষণাকারী তখন কোথায় তলাইয়া যায় তা কে বলিবে?

ছেলেটির দিকে নজর পড়িল। 'কি, বড্ড বকেছে, না?'—কাছে টানিয়া লইলেন,—'কেমন, দাদু,—না?' বালক নির্ব্বাক। 'দূর বোকা ছেলে, রাগ কিসের?' একটু আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইলেন। 'ও আমাকে দুষ্টু বলবে কেন?' 'তার কি হয়েছে?' 'ও বলবে কেন?'—অর্থাৎ দাদু বলিলে অশোভন হইত

না। যে নির্লিপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা মনে কত প্রকার কসরৎ করিতেছে, তাহার কাছে স্নেহের অত্যাচার পাইবার জন্য আবদার। এ যেন দুর্ভিক্ষের বাজারে অনাহারক্লিষ্ট উদরে গুরুভার খাদ্য ঢালিবার চেষ্টা, সুখের সন্ধান দিতে আসিয়া অসুখের আস্বাদ দিয়া যাওয়া। বালকের খোলা প্রাণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হাকিমি-ভারক্লিষ্ট রায় বাহাদুরের মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কিন্তু বুভুক্ষিত হৃদয়ে আবার তুমুল স্পন্দন আরম্ভ হইল। জল ও স্থলের কিনারায় যেন বাঘে ও কুমীরে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। রায় বাহাদুর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারি করিলেন, গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিলেন, তার পর একটু চিন্তা করিয়া অভিমান-বিশারদ বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া আবার পায়চারি করিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'ছিঃ, দাদু, রাগ করে না।' 'তুমি ওকে বকলে না কেন?' 'আচ্ছা, এবার এলে বকব।' আশ্বস্ত বালকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; দাদুর পাকা চুল ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল আর অনর্গল বকিতে আরম্ভ করিল।

ঝড় থামিয়াছে, রায় বাহাদুর এবার শান্ত। বালকের মুখের হাসি অনেকটা রায় বাহাদুরের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ আবার ডাক্তার আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। 'প্রেসক্রিপসনটা লিখে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম।'—কলম বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, 'থাক্, ওষুধ পেয়েছি। নমস্কার।' 'আচ্ছা, তবে না হয় এখন থাক, পরে—' মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাহির হইয়া গেলেন। বালক তখন রায় বাহাদুরকে কানে কানে বলিতেছে, 'দাদু, ওকে বকে দাও না।' 'আচ্ছা।' বকা আর হইল না, ডাক্তার তখন চলিয়া গিয়াছেন। 'দাদু—দাদু—' 'কি?' 'আমি কাল তোমাকে ওষুধ এনে দেব।' 'কোত্থেকে?' 'আমার সর্দ্দি হয়েছিল, বাবা একশিশি ওষুধ এনে দিয়েছিল, অর্দ্ধেকটা খেয়েছিলাম, অর্দ্ধেকটা আছে, সেইটা কাল তোমাকে এনে দেব।'

'আচ্ছা।'

মুখে দুষ্টহাসি লইয়া রাম আবার ঘরে ঢুকিল। এবার রায় বাহাদুরের হাসিভরা মুখ আর গম্ভীর হইল না। 'রাত হয়েছে অনেক, এবারে একটু কিছু খেলে হত। খাবার আনব?' রায় বাহাদুর তেমনি হাসিভরা মুখেই বলিলেন, 'আচ্ছা!'

ম্যালেরিয়া

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

ছাড় সখি, ছেড়ে দাও, এত প্রেম ভাল নয়
কাজ-টাজ ফেলে রেখে কেবল কি প্রেম সয়?
দেখ দিকি লোকে কত বলিতেছে মন্দ,
দিন দিন বেড়ে চলে রূপেয়ার ধন্দ,
সকলেই করে আছে মুখটাকে ভার ভার
কাছেতেও ঘেঁসে নাক বিরক্ত সংসার।
প্রেমটা তোমার নয় গোপনেই চলত
তা'হলে কি এত লোকে এত কথা বলত?
তুমি বাপু যে বেহায়া সবার সুমুখে
কি করে জড়ায়ে ধর—সর্ব্বদা—কি সুখে?

স্পর্শেতে কি যে আছে তাও ছাই জানি না
যেই ধর আমিও ত কোন বাধা মানি না।
থর থর কাঁপে মোর সমস্ত অঙ্গ
চোখেতে ঘনিয়ে আসে সাগরের রঙ্গ।
অবশ হইয়া ক্রমে ঢলে পড়ি শয্যায়
শিথানে লুকাই মুখ সুগভীর লজ্জায়।
কি লজ্জা বল দেখি! দেহে নাই কান্তি
একটুতে এসে পড়ে ভয়ানক শ্রান্তি।
বেরিয়ে পড়েছে ঠেলে বিট্‌কুর পাঁজরা
কুইনিনে মাথাটাকে করে দেছে ঝাঁঝরা।

ছি ছি সখি ছেড়ে দাও ব্যগ্রতা করুছি
তাতেও হল না? বেশ এই পায়ে ধরুছি।

ভারতের প্রাচীন ক্রীড়া-কৌশল

—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আনন্দ ব্যতীত কোন জীবই বাঁচিতে পারে না। মানব জীবশ্রেষ্ঠ এবং এই মানবের সমষ্টি জাতি, সুতরাং জাতির স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের বিকাশ ক্রীড়া-কৌতুক ও উৎসবাদিতেই হইয়া থাকে। যে সকল জাতি এখনও বসন পরিধান করিতে শিখে নাই বা নর-মাংস ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করে না, তাহাদেরও জীবন-যাত্রা অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবনের প্রতি নূতন মুহূর্ত্ত তাহারা উৎসব ও আনন্দের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করে। উৎসব, ক্রীড়া-কৌতুক ও নৃত্যগীত জাতির প্রাণের সূচনা করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই খেলিতে শিখে, হাত-পা নাড়িয়া তাহার আনন্দ ব্যক্ত করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়াইয়া, লাফাইয়া, নাচিয়া একাকী বা সঙ্গীদিগের সহিত ক্রীড়া করে। আদিম যুগ হইতেই পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে ক্রীড়া-কৌতুক প্রচলিত আছে এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রীড়া-কৌতুকেরও ক্রম-বিকাশ হইতেছে।

আধুনিক যুগে সমগ্র জগতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ায় ইউরোপীয় ক্রীড়া-কৌতুক এক প্রকার সর্ব্ব-জাতিরই ক্রীড়া বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপীয়গণ প্রাচ্য জগতের কয়েকটি ক্রীড়া সভ্যতা ও সময়োপযোগী করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন; তাহার মধ্যে আধুনিক পোলো (প্রাচীন চৌবান বা চৌহান) এবং 'হকি' ক্রীড়ার নাম উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্দেশীয় চতুরঙ্গ বা শতরঞ্জ বা দাবা খেলাও ইউরোপীয়গণ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ব্যায়াম-সাধ্য (game of skill) ও দৈব-সাধ্য (game of chance) ক্রীড়া সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাই আলোচনা করিব।

প্রাচীন গ্রীসে এলিস প্রদেশের অলিম্পিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র সমতল ভূখণ্ডে দেবরাজ ZEUS-এর মন্দির-সমক্ষে চারি বৎসর অন্তর যে ক্রীড়া-কৌশল ও কলা-নৈপুণ্যের প্রতি-যোগিতা হইত, তাহার নাম অলিম্পিক উৎসব। আজিও ইউরোপীয়গণ সেই প্রাচীন উৎসবের কথা স্মরণ করিয়া একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে সমগ্র জগতের অধি-বাসিগণ ক্রীড়া ও ব্যায়াম-নৈপুণ্য দেখাইয়া পুরস্কার লাভ করে, তবে আধুনিক উৎসবে কাব্য বা অন্য কোন কলার প্রতি-যোগিতা হয় না। প্রাচীন ভারতে এই অলিম্পিক উৎসবের বহু পূর্ব্বে ঐরূপ উৎসব হইত; তাহার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ না পাওয়া গেলেও বৈদিক সাহিত্য হইতে পণ্ডিতগণ তাহার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন—এই উৎসবের নাম "সমন"।

ঋক্[১] ও অথর্ব্ববেদে[২] এবং যজুর্ব্বেদের[৩] বাজসনেয়ী সংহিতায় এই উৎসবের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সায়ণ এই "সমন" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সংগ্রাম"[৪] ও "যজ্ঞ"[৫] বা "উৎসব"*। কিন্তু সমস্ত প্রয়োগ মিলাইয়া

১—ঋক্—১·৪৮·৬ ; ১২৪·৮ ; ২·১৬·৭ ; ৪·৫৮·৮ , ৬·৭৫·৩—৫ ; ৭·২·৫ ; ৯·৪ ; ৮·৬২·৯ ; ৯·৯৬·৯ ; ৯৭·৪৭ ; ১০·৫৫·৫ ; ৬৯·১১ ; ৮৬·১০ ; ১৪৩·৪ ; ১৬৮·২ ।

২—অথর্ব্ব—২·৩৬·১ ; ৬·৯২·২ ।

৩—বাজসনেয়ী সং—৯·৯ ; ১৭·৯৬ ; ২৯·৪০ ৪১ ।

৪—সায়ণ-ভাষ্য—ঋক্—২·১৬·৭ ; ৬·৭৫·৩·৫ ; ৭·৯·৪ ; ৯·৯৬·৯ ; ১০·৫৫·৫ ; ৮৬·১০ ; ১৪৮·২ , ৬৯·১১ । এই সকল ঋকের ভাষ্যে সায়ণ "সমন" শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন 'সংগ্রাম' ।

৫ যজ্ঞ—৭·২·৫ ; ৯·৯৭·৪৭ ; ১০·৮৬·১০ । এই সকল ঋকে সায়ণ "সমন" শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন "যজ্ঞ" ।

* "সমনে অননমনঃ প্রাণনং সম্যগননোপেতে সংগ্রামে" এইরূপে সায়ণ "সমন" শব্দের সংগ্রাম অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। "সমনেষু সমন্তি কর্ম্মাণি—ধৃষ্টাঃ প্রগল্‌ভা যস্মাত্রেতি সমনা যজ্ঞাঃ তেষু" এইরূপে সমন শব্দের অর্থ যজ্ঞ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই 'সমন' শব্দের অর্থ যজ্ঞ বা উৎসব—যেখানে ধৃষ্ট, প্রগল্‌ভ বা বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিগণ সমবেত হইতেন। কয়েকটি ঋকে (৬·৭৫·৪ ; ৮·৬২·৯ ; ৪·৫৮·৮) সায়ণাচার্য্য 'সমন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সমনস্ক' বা 'সমান মনস্ক', কিন্তু আমাদের মনে হয় সেই সকল অর্থ কষ্টকল্পনা। 'সমন' শব্দের অর্থ যজ্ঞ বা উৎসব ধরিলে সমস্ত ঋকেরই অর্থ সরল হয়। St. Petersburg অভিধানে পণ্ডিতপ্রবর Roth সায়ণকে অনুসরণ করিয়া 'সমন' শব্দের

দেখিলে বোধ হয় ইহা অলিম্পিক উৎসবের মতই একটি সর্ব্ব-সাধারণের উৎসব। এই উৎসবে ধনুর্ব্বেত্তা৬ প্রতিযোগিতায় নিজ কৌশলের পরিচয় দিয়া পুরস্কার অর্জ্জন করিত। রথী ও অশ্বারোহিগণ৭ নিজ নিজ অশ্বের দ্রুতগামিত্বের প্রতিযোগিতা করিত। কবিগণ৮ নিজ নিজ কাব্যকলার কৌশল দেখাইয়া প্রতিযোগিতায় যশঃ ও পুরস্কার অর্জ্জনের চেষ্টা করিত, রমণীগণ৯ আমোদ-প্রমোদ করিত, যুবতীগণ১০ মনোমত পতি-লাভের আশায় সুসজ্জিতা হইয়া তথায় গমন করিত এবং বারাঙ্গনাগণ১১ ধনলাভের আশায় নিজ নিজ রূপ ও কৌশলের জালে প্রণয়িগণকে বশীভূত করিত। এই উৎসব সমস্ত রাত্রি ধরিয়া১২ এমন কি উষার উদয়১৩ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইত। সম্ভবতঃ এই উৎসবে অক্ষ প্রভৃতি নির্জ্জীব দ্যূত ক্রীড়া ও মেষ-কুক্কুট যুদ্ধ প্রভৃতি সমাহ্বয় বা সজীব দ্যূত-ক্রীড়া হইত। মল্ল-যুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বংশক্রীড়াদি ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়া মল্ল ও নটগণ পুরস্কার লাভ করিত। যদিও বৈদিক সাহিত্যে এই সকলের কোন বিশেষ উল্লেখ নাই, পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য হইতে ইহার অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। বৈদিক যুগে যে নানাবিধ ক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে 'ক্রীড়া' শব্দের বহু প্রয়োগ। আমরা বৈদিক সাহিত্যে অক্ষক্রীড়ার বহু উল্লেখ দেখিতে পাই এবং এই সকল বৈদিক সূক্ত হইতে মনে হয় বৈদিক যুগে ভারতবাসী অত্যন্ত দ্যূতপ্রিয় ছিলেন। দ্যূত ব্যতীত যে অক্ষক্রীড়া হইত না তাহা নয়—সমাজে (club) বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সুহৃদ্দ্যূতক্রীড়া হইত। আমরা এক্ষণে প্রাচীন ভারতের অক্ষক্রীড়ার একটি ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিয়া তাহার পর অপরাপর ক্রীড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ঐ দুই অর্থ ই করিয়াছেন বটে, কিন্তু Pischel মনে করেন 'সমন' শব্দের অর্থ একটি সাধারণ উৎসব, যাহাতে শস্ত্রজীবী, সুদক্ষ অশ্বারোহী, রথী ও কবিগণ নিজ নিজ কৌশল প্রদর্শন করিতেন।

৬—ঋক্—৬'৭৫'৩—৫।
৭—ঋক্—৯'৯৬'৯ ; অথর্ব্ব—৬'৯২'২, বাজসং ৯·৯।
৮—ঋক্—২'১৬'৭ ; ৯'৯৭'৪৭।
৯—ঋক্—১'১২৭'৮ ; ৪'৫৮'৮ ; ৬'৭৫'৪ ; ৭'২'৫ ; ১০'৮৬'১০।
১০—ঋক্—৭'২'৫।
১১—ঋক্—৪'৫৮'৮।
১২—ঋক্—১০'৬৯'১১।
১৩—ঋক্—১'৪৮'৬।

অক্ষক্রীড়া ভারতবর্ষে কত প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। মনে হয় ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিকাশের সময় হইতেই ইহা ভারতবাসীর অত্যন্ত আদরের ও আনন্দের ব্যসন ছিল। মোহেঞ্জোদোড়োর সভ্যতা যদি বৈদিক যুগের পূর্ব্বের সভ্যতা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে - বৈদিক যুগের পূর্ব্বেও পাশক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। কারণ—মোহেঞ্জোদোড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হইতে বহু মৃণ্ময় ঘনচতুষ্কোণ (cubical) পাশক এবং অস্থি বা গজদন্ত-নির্ম্মিত চতুরস্র-শলাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাশা বলিয়া অনুমান হয়। মোহেঞ্জোদোড়োতে যে ঘনচতুষ্কোণ পাশক পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি প্রায়ই সম-ঘনচতুষ্কোণ (১'২ × ১'২ × ১'২ বা ১'৫ × ১'৫ × ১'৫), কেবল একটি পাশক আয়তাকার। আধুনিক যুগের এইরূপ পাশকের উপর যে বিন্দু চিহ্নিত থাকে, তাহার দুইটি বিপরীত দিকের বিন্দু সংখ্যা ৭, কিন্তু মোহেঞ্জোদোড়োর পাশকগুলির বিন্দুচিহ্নের ক্রম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে দিকে একটি বিন্দু আছে, তাহার বিপরীত দিকে দুইটি বিন্দু, যে দিকে তিনটি বিন্দু আছে, তাহার বিপরীত দিকে চারিটি বিন্দু এবং যে দিকে পাঁচটি বিন্দু আছে, তাহার বিপরীত দিকে ছয়টি বিন্দু*। এই সকল পাশক মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও অগ্নিদগ্ধ এবং কোন কোনটি আবার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। এই অক্ষগুলির অক্ষত ধার দেখিয়া মনে হয় ইহা কোমল মৃত্তিকা বা কোন কোমল আস্তরণের উপর নিক্ষিপ্ত হইত।

বৈদিক যুগে সাধারণতঃ বিভীতক বা বহেড়া লইয়া অক্ষক্রীড়া হইত। বহেড়ায় চারিটি পল আছে; ঐ চারিটি পলে চিহ্ন করিয়া অক্ষ নির্ম্মিত হইত বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী যুগে বহেড়ার পরিবর্ত্তে কড়ি লইয়া এক প্রকার ক্রীড়া হইত, তাহা বোধ হয় আধুনিক যুগের দশ-পঁচিশ খেলার পূর্ব্বরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫'৪'৪৬) এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৮'১৬) সুবর্ণনির্ম্মিত অক্ষের কথা আছে। তাহা সম্ভবতঃ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেই নৃপতিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। বিভীতক বা বহেড়া লইয়া বৈদিক যুগে ক্রীড়া হইত ইহা নিশ্চিত, কিন্তু তখন পাশক অর্থাৎ অস্থি কিংবা গজদন্ত-নির্ম্মিত শলাকা অথবা সম-

* Bellasis ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণাবাদে এক প্রকার অক্ষ পাইয়াছিলেন, তাহার বিন্দু আধুনিক নিয়মে সজ্জিত।

Arch—Survey Ind-Assam—Rep. 1900-09, p 85,

ঘনচতুষ্কোণ অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত কি না, তাহা জানা যায় না। তবে মহাভারতে বহুস্থলে দ্যূতক্রীড়া বা দুরোদরের কথা আছে, কেবল বিরাট্ পর্ব্বে পাশক শব্দের উল্লেখ আছে। বিরাট পর্ব্ব মূল মহাভারতের বহু পরে লিখিত বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, সুতরাং ইহা হইতে ঠিক কিছু বোঝা যায় না। তবে শকুনি প্রভৃতি কপট অক্ষদেবিগণ যে সীসকাদি ধাতুগর্ভ অক্ষ ব্যবহার করিত, তাহা কেহ কেহ শকুনির উক্তি হইতে অনুমান করেন। (গ্লহান্ ধনুংষি মে বিদ্ধি শরাণ্যক্ষাং শ্চ ভারত। অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্ফুরম্॥) কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন "অক্ষহৃদয়" অর্থে অক্ষের চিহ্ন, সুতরাং মহাভারতের অক্ষ যে কি উপাদান হইতে নির্ম্মিত হইত, তাহা সঠিক ভাবে বুঝিবার উপায় নাই।

পাণিনির একটি সূত্রে লিখিত আছে—"অক্ষশলাকা সংখ্যাঃ পরিণা" অর্থাৎ দ্যূতব্যবহারে পরাজয় বুঝাইলে অক্ষ, শলাকা এবং সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত "পরি" শব্দের সমাস হয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই সূত্রের টীকায় লিখিত আছে—

অক্ষাদয়স্তৃতীয়ান্তাঃ পূর্ব্বোক্তস্য যথা ন তৎ।
কিতবব্যবহারে চ একত্বেঽক্ষশলাকয়োঃ॥

এবং নারদস্মৃতির "অক্ষবধ্রশলাকাদ্যৈর্দেবনং জিহ্মকারিতং পণক্রীড়াবয়োভিশ্চ পদম্দ্যূতসমাহ্বয়ম্" (১৬·১)। এই শ্লোকটির টীকায় শলাকা শব্দের অর্থ লিখিত আছে, "দন্তাদি-মধ্যো দীর্ঘচতুরস্রাঃ" অর্থাৎ দন্তাদি নির্ম্মিত দীর্ঘ চতুরস্র। সুতরাং শলাকা শব্দ হইতে আমরা পাশকের দ্বারা দ্যূতক্রীড়ার প্রমাণ পাইতেছি। পাণিনি অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। বিদুর পণ্ডিত জাতকের একটি ব্রহ্মদেশীয় পাণ্ডুলিপিতে শলাকার দ্বারা দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ আছে। অধিকন্তু মোহেঞ্জোদোড়োয় আবিষ্কৃত মৃন্ময় পাশক এবং গজদন্তনির্ম্মিত দীর্ঘ চতুরস্র-শলাকা হইতেই স্পষ্টই প্রতীতি হয়, অক্ষক্রীড়া ও পাশকক্রীড়া, দুইটি স্বতন্ত্র ক্রীড়া, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল।

অক্ষক্রীড়ার নিয়ম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে জানিতে পারি না। তবে ঋগ্বেদের "চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদানিধাতোঃ" (১·৪১·৯) সূক্ত হইতে মনে হয় চারিটি অক্ষ লইয়াই সচরাচর ক্রীড়া হইত। "সেনানীর্মহতোগণস্য (১০·৩৪·১২) এবং "ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত" (১০·৩৪·৮) এই দুইটি ঋক্ হইতে কেহ কেহ মনে করেন, বহু অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত; কিন্তু পনেরটি বা তিপ্পান্নটি অক্ষ হস্তে ধারণ করিয়া ক্ষেপণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। "ত্রিপঞ্চাশঃ" শব্দে সম্ভবতঃ কোন "গ্লহ" বা দানকে বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী যুগে পাচটি অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করার প্রমাণ আমরা পাই (তৈঃ ব্রাঃ ১·৭·১০)। বৈদিক যুগে অক্ষক্রীড়ায় কোন ছক ব্যবহৃত হইত কি না জানা যায় না, তবে Woolley সাহেব উর্ নামক স্থানে খনন কালে চতুরস্র অক্ষের সহিত চতুরঙ্গের ছকের ন্যায় একটি ছক পাইয়াছেন। আমরা চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করিব। তবে পরবর্ত্তী যুগে যে অক্ষক্রীড়ার ছক ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ আমরা পাই—ভারহুত স্তূপের রেলিংয়ে খোদিত চিত্র হইতে। তাহাতে দুইটি লোক একটি ছক লইয়া অক্ষ-ক্রীড়া করিতেছে, সেই ছকে ছয়টি পংক্তি আছে এবং প্রতি পংক্তিতে পাঁচটি করিয়া ঘর আছে। ছকের বাহিরে ছয়টি সমঘনচতুষ্কোণ ও বিন্দু-চিহ্নিত পাশক পড়িয়া রহিয়াছে (Cunningham Pl. XLV No. 9)। বৈদিক যুগে কোন কোমল আস্তরণে অথবা মাটিতে একটু গর্ত্ত করিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করা হইত, উহাকে 'অধিদেবন,' 'দেবন,' বা 'ইরিণ' বলা হইত। শতপথ ব্রাহ্মণের টীকায় লিখিত আছে সভ্যাগ্নি স্থাপনের সময় পুরোহিতগণ যজ্ঞস্থলের উত্তর ভাগে ভূমিতে একটি বৃষচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া তাহার উপর একটি পিতলের পাত্র অধোমুখে বসাইয়া তাহাতে পাঁচটি কপর্দ্দক ক্ষেপণ করিতেন। বৈদিক যুগে অক্ষগুলি যে আধারে রাখা হইত, তাহার নাম 'অক্ষাবপন' এবং যজ্ঞের সময় যাহার নিকট অক্ষ থাকিত তাহার নাম অক্ষাবাপ। দানকে 'গ্লহ' বা 'গ্রাভ' এবং জয়সূচক দান পড়াকে 'অয়' বলা হইত। পণকে বলা হইত 'বিজ'। অক্ষে যে দিকে একাঙ্ক চিহ্নিত থাকিত তাহার নাম 'কলি,' দুই অঙ্ক চিহ্নিত দিক্ 'দ্বাপর,' তিন অঙ্ক চিহ্নিত দিক্ 'ত্রেতা' এবং চারি অঙ্ক চিহ্নিত দিক্ 'কৃত'। ক্রীড়ার নিয়মভেদে কোথায়ও 'কৃত' এবং কোথায়ও বা 'কলি' সর্ব্বোচ্চ 'অয়' বলিয়া পরিগণিত হইত।

মহাভারতের টীকায় (৪·৫০·২৪) নীলকণ্ঠ পরবর্ত্তী যুগের

দ্যূত ক্রীড়ার একটি নিয়মের এই ভাবে একটু আভাস দিয়াছেন, যথা :—ক্রীড়ার সময় পাঁচটি নিজের ও পাঁচটি অপরের মুদ্রা পণ ধরা হয়; 'কলি' দান পড়িলে নিজের একটি মুদ্রা মাত্র জয় করা হয়, 'দ্বাপর' পড়িলে নিজের একটি ও অপরের দুইটি মুদ্রা জয় করা হয়, 'ত্রেতা' পড়িলে নিজের তিনটি ও অপরের তিনটি জয় হয় এবং 'কৃত' পড়িলে নিজের ও অপরের সকল মুদ্রাই জয় করা যায়। নীলকণ্ঠ বৈদিক যুগের বহু পরবর্ত্তী-কালের লোক, সুতরাং তাঁহার টীকার যুক্তি বৈদিক যুগের ক্রীড়ার প্রণালীর যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কপর্দ্দক বা কড়ি লইয়া দ্যূত ক্রীড়ায় জোড় ও বিজোড় ক্ষেপণের উপর জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইত, ইহার প্রমাণ আমরা বৈদিক ও পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য হইতে পাইয়া থাকি।

মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের দ্যূতক্রীড়া, বিরাট্-রাজের সহিত যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া ও নলরাজার দ্যূতক্রীড়ার কথা কাহারও অবিদিত নাই। বিরাট্ পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস করিবার পূর্ব্বে কি ভাবে বিরাট্-ভবনে যাপন করিবেন, সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"সভাস্তারো ভবিষ্যামি তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
কঙ্কোনাম দ্বিজোভূত্বা মতাক্ষঃ প্রিয়দেবনঃ॥
বৈদূর্য্যান্ কাঞ্চনান্ দান্তান্ ফলৈর্জ্যোতীরসৈঃসহ।
কৃষ্ণাক্ষান্ লোহিতাক্ষাংশ্চ নির্বৎর্স্যামি মনোরমান্॥"

(৪।১।২৩-২৪)।

এই শ্লোক ও তাহার টীকা* হইতে বুঝা যায় যে, মহাভারতের বিরাট্ পর্ব্ব যখন লিখিত হয়, তখন অক্ষক্রীড়া আধুনিক কালের ন্যায় ফলক ও গুটিকা সাহায্যে করা হইত। নীলকণ্ঠের টীকা হইতে অর্থ হয় "হরিত বর্ণ, লোহিত-বর্ণ ও পারদ বর্ণ বা শ্বেত বর্ণ পর্ব্বতসানুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শারী বা গুটিকা সকল ও কাষ্ঠময় ফলকের সাহায্যে মনোহর কৃষ্ণ ও লোহিত অক্ষসকল আমি চালনা করিব।"**

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দ্যূতক্রীড়া ও আকর্ষক্রীড়ার উল্লেখ আছে (১।৩।১৬)। টীকাকার যশোধর দ্যূতক্রীড়া অর্থে লিখিয়াছেন, "ইহা নির্জ্জীব দ্যূত। তাহার মধ্যে প্রাপ্তি আদি পঞ্চদশ অঙ্গসমন্বিত মুষ্টিকুল্লকাদি দ্যূতক্রীড়া বুঝাইতেছে"। আকর্ষক্রীড়ার অর্থ টীকাকার লিখিয়াছেন পাশকক্রীড়া। বাৎস্যায়ন দ্যূত ও আকর্ষক্রীড়ার ফলক বা ছকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১।৪।১২)। ** আমাদের মনে হয়, দ্যূত ও আকর্ষ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করায় বাৎস্যায়ন অক্ষাদি দ্যূত অর্থাৎ পণ রাখিয়া দ্যূত ক্রীড়া ও সুহৃদ্দ্যূত বা পণ ব্যতিরেকে 'বাদহীন' দ্যূতক্রীড়ার কথা বুঝাইতেছেন। অক্ষক্রীড়া দ্যূতক্রীড়ার অঙ্গীভূত, সুতরাং দ্যূত বলিতে অক্ষক্রীড়াকে বাদ দিয়া কেবল অন্যান্য দ্যূত ক্রীড়াকে বুঝাইতেছে বলিলে ভুল হইবে। দশকুমারচরিতের উত্তর পীঠিকার দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে দ্যূতক্রীড়ার বহুবিধ প্রকারের কথা লিখিত আছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে অক্ষদ্যূত ও সুহৃদ্দ্যূতের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।†

একটি কথা বলিয়া আমরা অক্ষক্রীড়ার কথা শেষ করিব। অতি প্রাচীনকাল হইতে যক্ষরাত্রি ও কৌমুদী-জাগর নামক দুইটি উৎসব ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রথমটি কার্ত্তিক পূর্ণিমার উৎসব, মতান্তরে আধুনিক দীপান্বিতার উৎসব ও দ্বিতীয়টি কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দুই তিথিতে আধুনিক কালের ন্যায় সমস্ত রাত্রিব্যাপী দ্যূতক্রীড়া হইত।

অন্যান্য ক্রীড়ার মধ্যে আমরা বৌদ্ধসূত্রসমূহে‡ নিম্নলিখিত

* "দান্তান্ গজদন্তময়ান্। দন্তঃ পর্ব্বতসানু তৎসদৃশান্ বা শারীন্ নির্বৎর্স্যামি চালয়িষ্যামি 'দন্তঃ সানুনি কথ্যতে' ইতি বিশ্বঃ। তানেব চতুর্ব্বর্ণানাহ—বৈদূর্য্যান্ হরিন্মণিময়ান্ নীলান্, কাঞ্চনান্ সৌবর্ণান্ পীতান্ জ্যোতীংষি চ রসাশ্চ জ্যোতীরসাস্তৈঃ সহ জ্যোতীঃশব্দেনাত্র লোহিতং লক্ষ্যতে 'যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপমিতি শ্রুতেঃ জ্যোতীরূপাঃ লোহিতাঃ। রসঃ পারদঃ তদ্রূপাঃ শ্বেতাঃ তৈরুক্তৈঃ সহ চতুর্ব্বর্ণসম্পত্তিঃ, তথা ফলৈঃ শারীস্থাপনানি কোষ্ঠযুক্তানি কাষ্ঠাদিময়ানি ফলানি তৈঃ সহ তেষাং নির্বর্ত্তনে করণমাহ—কৃষ্ণাক্ষান্ কৃষ্ণাঃ অক্ষাঃ পাশাঃ যেষাং চালনার্থমিতি কৃষ্ণাক্ষাস্তান্ শারীনেব তথা লোহিতাক্ষানিত্যপি।"

* সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণীয় টীকায় দান্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন শ্বেতবর্ণ।

** এই ফলক নাগরিকের গৃহে দেয়ালে ঠেস্ দেওয়া থাকিত এবং আবশ্যক মত তাহা লইয়া ক্রীড়া করা হইত।

† প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা ইহার বিশেষ বিবরণ দিতে বিরত রহিলাম. কৌতূহলী পাঠক 'বঙ্গীয় মহাকোষে' মল্লিখিত 'অক্ষক্রীড়া' প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

‡ সূত্রকৃতাঙ্গ ১-৯-১৭; সুত্তবিভঙ্গ সঙ্ঘাদিদেস ১৩-১-২ তেবিজ্জসুত্ত মজ্‌ঝিমসীলম্ (২-৩-৪) দীঘনিকায়—ব্রহ্মজালসুত্ত মজ্‌ঝিম সীলম্।

কয়েকটি ক্রীড়ার উল্লেখ পাই যথা—(১) অট্‌ঠপদ, (২) দসপদ, (৩) আকাস, (৪) পরিহার পথ, (৫) সন্তিক, (৬) খলিক, (৭) ঘটিকা, (৮) সলাকহত্থ, (৯) অক্‌খ, (১০) পঙ্গচীর, (১১) বঙ্কক, (১২) মোক্‌খচিক, (১৩) চিঙ্গুলক (১৪) পত্তাল্‌হক, (১৫) রথক, (১৬) ধনুক, (১৭) অক্‌খরিকা, (১৮) মনেসিকা, (১৯) যথাবজ্জ।

(১) অট্‌ঠপদ বা অষ্টাপদ ক্রীড়া পরবর্ত্তী যুগের চতুরঙ্গ ক্রীড়া। ইহা অক্ষ ক্রীড়ার একটি প্রকার। বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধঘোষ "দীঘনিকায়" গ্রন্থের টীকা "সুমঙ্গলবিলাসিনী"তে অট্‌ঠপদ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"একেকায় পন্তিয়া অট্‌ঠ অট্‌ঠ পদানি অস্‌সাতি অট্‌ঠপদং" অর্থাৎ এক এক পংক্তিতে আট আটটি করিয়া পদ বা ঘর থাকে। ইহাতে আধুনিক যুগের draught খেলার মত অন্য কোন ক্রীড়া বুঝাইতে পারে, কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত রাজানক রত্নাকরের হরবিজয় মহাকাব্যের

"শ্রিয়ং দধানং চতুরস্রতাশ্রয়ামনেকপত্রাখরথদ্বিপাকুলম্।
বিপক্ষমাবিষ্কৃতসন্ধিবিগ্রহং তথাপ্যনষ্টাপদমেব যো বাধাৎ॥"
(১২।৯)

এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অষ্টাপদ ক্রীড়া চতুরঙ্গ ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। টীকাকার রাজানক অলক ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।*

(২) দসপদ বা দশপদ ক্রীড়াও অষ্টাপদ ক্রীড়ার ন্যায়। এই ক্রীড়ার ফলকে আটটি পংক্তিতে দশ দশটি করিয়া পদ বা ঘর থাকে। ইহা চতুরঙ্গ বা draught জাতীয় ক্রীড়া। মোহেঞ্জোদোড়োয় কতকগুলি আধুনিক কালের পাশা খেলার ঘুঁটি বা দাবা খেলার বলের ন্যায় মৃণ্ময় ও মর্ম্মরাদি বহুবিধ প্রস্তরনির্ম্মিত ও শঙ্খনির্ম্মিত ক্রীড়নক পাওয়া গিয়াছে (PL CLV NOS. 11 to 25)। বৌদ্ধসূত্রের সিংহলীয় টীকাকার লিখিয়াছেন, এই অষ্টাপদ ও দশপদ ক্রীড়ায় পাশক লইয়া দানখেলা হইত ও সেই দান অনুসারে ছকের উপর হস্তী-অশ্ব-পদাতি বল সকল চালিয়া ক্রীড়া করা হইত এবং ঐ সকল বলকে সিংহলীয় ভাষায় বলে 'পোরু' পালি 'পুরিস' বা আধুনিক 'বোড়ে' বা বিলাতী chess খেলার men। আমরা পূর্ব্বে যে উর্ নামক স্থানে আবিষ্কৃত ছক ও অক্ষের কথা বলিয়াছি, তাহা খুব সম্ভব অষ্টাপদ বা চতুরঙ্গ ক্রীড়ার ছক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত তিথিতত্ত্বনামক গ্রন্থে আমরা পরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত চতুরঙ্গ খেলার একটি বিশদ বিবরণ পাই।

(৩) আকাস—অষ্টাপদ ও দশপদ এই ক্রীড়াদ্বয় কখনও কখনও আবার দাবাবোড়ে বা ছকের সাহায্য ব্যতীত কাল্পনিক হিসাব দ্বারা ক্রীড়া করা হইত, তাহাকে বলা হইত আকাশ বা শূন্য। যাঁহারা আধুনিক যুগের গৈবী খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। ইউরোপে ইহার নাম blindfold chess।

(৪) 'পরিহারপথ' শব্দের অর্থে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, "ভূমিয়ং নানাপথং মণ্ডলং কত্বা তত্থ পরিহারিতব্বং পরিহারতানং কীলনং" অর্থাৎ ভূমিতে নানাপ্রকার ছক কাটিয়া সেই ছকের এক একস্থানে ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া ক্রীড়া করা। সিংহলীয় টীকাকার বলেন যে, এক পায়ে লাফাইয়া এই ক্রীড়া করা হইত। আধুনিক যুগে একটি টাকার ন্যায় গোলাকার ও চেপ্টা মৃন্ময় বা প্রস্তরনির্ম্মিত চাকৃতি লইয়া এক প্রকার খেলা প্রচলিত আছে। তাহাকে পশ্চিমবঙ্গে "একা দোক্কা" খেলা বলিয়া থাকে। ভূমিতে ঘর কাটিয়া এক পায়ে লাফাইয়া সেই চাকতিটিকে বিভিন্ন ঘরে সরাইয়া দেওয়া এই ক্রীড়ার বিশেষত্ব। ইহার সহিত ইউরোপীয় hop-scotch ক্রীড়ার তুলনা করা যাইতে পারে।

(৫) সন্তিকা বুদ্ধঘোষ এই ক্রীড়ার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"একজ্ঝং ঠপিত্বা উপনেন্তি চ, সচেতত্থ কাচি চলতি পরাজয়ো হোতি। এবরূপায় কীলয়েতং অধিবচনং।" অর্থাৎ একস্থানে কতকগুলি দ্রব্য জড় করিয়া অতি সন্তর্পণে নখাগ্র দ্বারা তাহা হইতে একটি সরাইয়া লইতে বা অপর একটি দ্রব্য সেই স্থানে রাখিতে হয়, যাহাতে অপর দ্রব্যগুলি নড়িয়া না যায়; নড়িয়া গেলেই পরাজয় হইল। অধুনা পূর্ব্বোক্ত "একা দোক্কা" খেলার এইরূপ একটি রূপান্তর

* চতুরস্রতায়াঃ সর্ব্বতোরম্যত্বস্যাশ্রয়ঃ শ্রীকারো যত্র তাদৃশীমপি লক্ষ্মীং বিভ্রতমপিমনষ্টাপদমবহিষ্কৃতাপদমেব যঃ কৃতবান্। সন্ধিবিগ্রহৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ নয়গুণৌ। আবিষ্কৃতসন্ধিঃ ফলকদ্বয়োপরচিতত্বাদভিব্যক্তিত-বন্ধদ্বয়ো বিগ্রহঃ শরীরং যস্য তাদৃশং যৎ কৃত্রিমরূপৈঃ পদাত্যাদিভিরারচিতং চতুঃস্রতাশ্রয়াং চতুষ্কোণত্বশ্রিয়াং শোভাং বিভর্তি। সমর্থ্যাচ্চতুরঙ্গফলকম্। অষ্টাপদম্। নেতি চ বিরোধঃ। তত্র হি পঙ্‌ক্তৌ পঙ্‌ক্তৌ পদাষ্টকোপেতত্বাদষ্টাপদমিতি সংজ্ঞা।

আছে, তাহাতে কতকগুলি চাক্তি এক একটি করিয়া এক পায়ে লাফাইয়া এক স্থানে জড় করিতে হয় এবং এক একটি করিয়া পায়ের নখ দিয়া সরাইয়া লইতে হয়, যাহাতে অপরগুলি নড়িয়া না যায়। ইহার সহিত ইউরোপীয় spellican ক্রীড়ার তুলনা করা যাইতে পারে।

(৬) খলিকা—বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন "জূতখলিকে পাসককীলনং" অর্থাৎ দ্যূতক্ষেপণ বা পাশা খেলা। এই ক্রীড়ার নিয়ম সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ কিছুই বলেন নাই।

(৭) ঘটিকা—বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন "দীঘ দণ্ডকেন রস্সদণ্ডকেন পহরণকীলা" অর্থাৎ দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা একটি হ্রস্ব দণ্ডকে আঘাত করিয়া এই ক্রীড়া হয়। ইহা আধুনিক যুগের "ডাণ্ডাগুলি।" মহাভারতে লিখিত আছে "একদা কুরু-বালকগণ গজসাহ্বয় নগর হইতে বহিরাগমনপূর্ব্বক 'বীটা' লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল; দৈবাৎ সেই 'বীটা' একটি কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহারা বহু চেষ্টাতেও সেই 'বীটা' উদ্ধার করিতে পারিল না। সেই সময়ে দ্রোণাচার্য্য সেই পথে গমন করিতেছিলেন, তিনি বালকগণকে নিরুৎসাহ দেখিয়া ঈষিকা সাহায্যে সেই বীটা কূপ হইতে উদ্ধার করেন।" নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় "বীটা" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, "বীটয়া যবাকারেণ প্রাদেশমাত্রকাষ্ঠেন যৎ হস্তমাত্রদণ্ডেন উপর্য্যুপরি কুমারাঃ প্রক্ষিপন্তি, লোহগুলিকয়েত্যন্যে।" অর্থাৎ "বীটা" বা যবাকার অর্দ্ধহস্তপরিমিত দণ্ডকে হস্তমাত্রপরিমিত দণ্ড দ্বারা উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়া বালকগণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। কেহ কেহ "বীটা" অর্থে লৌহগুলিকা মনে করেন, কিন্তু বালকগণ লৌহগুলিকা লইয়া ক্রীড়া করিবে ইহা অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনা। সিংহলীয় টীকাকার "ঘটিকা" শব্দের অর্থ সিংহলে প্রচলিত 'সিম্কেলিময়ু' ক্রীড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার সহিত ইউরোপীয় "tip-cat" ক্রীড়ার তুলনা করা যাইতে পারে।

(৮) সলাকহত্থ—বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন, "লাখায় বা মঞ্জেট্ঠিয়া পিট্ঠউদকে বা সলাকহত্থং তেমেত্বা 'কিং হোতুতি' ভূমিয়ং বা ভিত্তিয়ং বা তং পহরিত্বা হত্থি-অস্সাদি-রূপ-দস্সন কীলনং।' অর্থাৎ হস্তের অঙ্গুলী সকল সোজা করিয়া লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা বা আলতা অথবা পিষ্টোদকে (পিঠুলি গোলা বা ময়দাগোলা জলে) হাত ভিজাইয়া ভূমিতে বা দেওয়ালে আঘাত করিয়া "কি হবে বল তো" বলিতে বলিতে হস্তী-অশ্ব প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া এই ক্রীড়া করা হয়।

(৯) অক্খ—ইহা পাশক বা দ্যূতক্রীড়া নহে। বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন, "গুল কীলং" অর্থাৎ আধুনিক যুগের গুলিখেলা বা মার্ব্বেল খেলা। সিংহলীয় টীকাকারও ইহার এই অর্থ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদোড়োতে অকীকপ্রস্তর, ও অন্যান্য কঠিন প্রস্তরনির্ম্মিত এমন কি শঙ্খেরও ছোট বড় বহু আকারের সুবর্ত্তুল মার্ব্বেলগুলি পাওয়া গিয়াছে। ভূগর্ভস্থ গৃহাদির প্রাঙ্গণে পাওয়া যাওয়ায় ও তাহাতে কোনরূপ ছিদ্রাদি নাই বলিয়া তাহাকে ক্রীড়নক ব্যতীত অপর কিছু বলিবার উপায় নাই। এই মার্ব্বেল বা বলগুলিতে বহু বৃত্ত অঙ্কিত আছে।

(১০) পঙ্গচীর—বুদ্ধঘোষের টীকায় লিখিত আছে "পন্ন-নালিকা। তং ধমন্তা কীলন্তি।" অর্থাৎ তাল বা নারিকেল পত্রনির্ম্মিত বংশীবাদন করিয়া ক্রীড়া। অদ্যাপি রথযাত্রা ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে বালক বা বালিকাগণ তালপত্রের বাঁশী বা ভেঁপু লইয়া খেলা করে।

সিংহলে এই ক্রীড়াকে বলে 'পৎকুলাল'। মারাঠা ভাষায় 'পুঙ্গী' শব্দের অর্থ বাঁশী। Rev. Morris মনে করেন 'পঙ্গচীর' শব্দ 'চীরপঙ্গ' শব্দেরই রূপান্তর। 'চীরপঙ্গ' শব্দের অর্থ বৃক্ষত্বক্‌নির্ম্মিত বংশী। (J. P. T. S. 1889 p. 205)। মোহেঞ্জোদোড়োতে পক্ষীর আকারবিশিষ্ট কতকগুলি মৃন্ময়-বংশী পাওয়া গিয়াছে।

(১১) বঙ্কক—বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, 'গামদারকানং কীলনক-খুদ্দক-নঙ্গলং" অর্থাৎ গ্রাম্য বালকগণের ক্রীড়নক ক্ষুদ্র লাঙ্গল। Rev. Morris মনে করেন, সংস্কৃত বৃক (লাঙ্গল) হইতে পালি 'বক' এবং তাহা হইতে রূপান্তরিত হইয়া 'বঙ্কক' শব্দের উৎপত্তি (J. P. T. S. 1889 p. 206)। ক্ষুদ্র লাঙ্গল এবং মৃন্ময়-শকটাদি লইয়া গ্রাম্য বালকগণ ক্রীড়া করিত। মোহেঞ্জোদোড়োতে কয়েকটি মৃন্ময় শকট পাওয়া গিয়াছে।

(১২) মোক্খচিক—ইহা এক প্রকার ব্যায়ামসাধ্য ক্রীড়া বা gymnastic। বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন, "সম্পরিবত্তক কীলনং। আকাসে বা দণ্ডং গহেত্বা ভূমিয়ং

বা ঠপেত্বা হেট্‌ঠপুরিয়া ভাবেন পরিবত্তনা কীলনন্তিবুত্তং হোতি।" অর্থাৎ ইহা সম্পরিবর্ত্তক ক্রীড়া—শূন্যে পুনঃ পুনঃ ডিগবাজী খাওয়া (somersault) শূন্যে খালি হাতে বা একটি দণ্ড গ্রহণ করিয়া অথবা ভূমিতে দণ্ড স্থাপন করিয়া হেটমুণ্ডে পুনঃ পুনঃ ডিগবাজী খাইয়া ক্রীড়া করা।* অধুনা ব্যায়াম-কুশল যুবকগণ শূন্যে অথবা দুই হাতে একটি লাঠি ধরিয়া তাহার একদিক্ ভূমিতে স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ পাক খাইয়া ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়া থাকে।

জাতকে লিখিত আছে একদা এই ক্রীড়া করিতে করিতে বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীর পুত্রের অন্ত্রে জট পাকাইয়া গিয়াছিল।**

(১৩) চিঙ্গুলক—বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"তালপন্নাদীহি কতং বাতপ্পহারেণ পরিব্ভমন-চক্কং" অর্থাৎ তালপাতার তৈয়ারী চাকা যাহা বাতাস লাগিলে চরকার মত ঘুরে। আজকাল রথযাত্রা প্রভৃতি বহু মেলায় তালপাতার, কাগজের অথবা রাংতার ঐরূপ বায়ু-তাড়িত চাকা (wind mill) বিক্রীত হইয়া থাকে। ঐ চাকা হাতে করিয়া বালকগণ দৌড়াইতে থাকে আর বাতাস লাগিয়া তাহা সজোরে ঘুরিতে থাকে। জৈন অমুপপাতিকসূত্তে (§১০৭ পৃঃ ৭৭) ইহাকে "বট্ট-খেড্ড" বলা হইয়াছে। ইহার সহিত প্রাচীন ইউরোপের whirligig ক্রীড়ার তুলনা করা যাইতে পারে।

(১৪) পত্তালহক—বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন, "পন্ননড়ি। তায়বালিকাদীনি মিনন্তা কীলন্তি" অর্থাৎ পত্র-নির্ম্মিত দাঁড়িপাল্লা, বালকগণ ইহা দ্বারা কৃত্রিম ওজন করিয়া ক্রীড়া করিত।

(১৫) রথক—বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, "খুদ্দকরথং" অর্থাৎ কৃত্রিম ক্ষুদ্র রথ লইয়া ক্রীড়া। মোহেঞ্জোদোড়োতে অনেকগুলি মৃন্ময় রথ বা শকট পাওয়া গিয়াছে। অধুনা রথযাত্রা উপলক্ষে বালক-বালিকাগণ মৃন্ময়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বা টিনের রথ লইয়া ক্রীড়া করে। পল্লীগ্রামে বালকগণ বাঁশের কঞ্চি, শর বা পাটকাঠি দ্বারা গরুর গাড়ী নির্ম্মাণ করে এবং মাটীর চাকা লাগাইয়া তাহা টানিয়া লইয়া খেলা করে।

(১৬) ধনুক—বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, "খুদ্দকধনুমেব" অর্থাৎ ক্ষুদ্র ধনু। এখনও বালকগণ বাঁশের বাঁকারি লইয়া ধনু নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করে। যাহারা শোলার খেলনা বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট একপ্রকার ধনু থাকে, তাহার তীরটি ধনুর ছিলার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে এবং তীরের 'ফলা'র পরিবর্ত্তে একটি কাগজের ঠোঙ্গা থাকে, তাহার মধ্যে কাঁকর দিয়া বালকগণ তীর ছোড়ার খেলা করিয়া থাকে।

(১৭) অক্খরিকা—বুদ্ধঘোষ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন, "বুচ্চতি আকাসে বা পিট্‌ঠিয়ং বা অক্খর-জানন-কীলা" অর্থাৎ শূন্যে বা সঙ্গীর পৃষ্ঠে অক্ষর লিখিয়া তাহা জানিবার ক্রীড়া। এই ক্রীড়ায় একজন অপরের পৃষ্ঠে অথবা শূন্যে খুব দ্রুত অক্ষর লেখে, অপরে তাহা বলিতে পারিলে লেখকের হার হয় এবং তখন পাঠক লেখে, এইভাবে ক্রীড়া হয়। এই ক্রীড়া বহুস্থানে এখনও প্রচলিত আছে। বাল্যকালে আমরাও এই ক্রীড়া করিয়াছি।

(১৮) মনেসিকা—বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, 'মনসা চিন্তিত-জানন-কীলা' অর্থাৎ সঙ্গীর মনের কথা জানিবার ক্রীড়া। একজনে কিছু চিন্তা করে, অপরে তাহা কল্পনা করিয়া বলিবার চেষ্টা করে।

(১৯) যথাবজ্জং—বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, "কাণকুণি-খঞ্জাদীনং যং যং বজ্জং তং তং পয়োজেন্তা দস্সন-কীলা" অর্থাৎ অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতির ন্যায় অনুকরণ করিয়া ক্রীড়া।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

* Childers প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহাকে আধুনিক কালের trapeze-এ পাক খাইয়া ক্রীড়া করা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বুদ্ধঘোষের টীকা হইতে মনে করেন, ইহার অর্থ শূন্যে দণ্ড ধারণ করিয়া এবং ভূমিতে মস্তক স্থাপন করিয়া পাক খাওয়া। এই অর্থ কিন্তু টীকার ভাষা হইতে বোধগম্য হয় না, অধিকন্তু পদদ্বয় দ্বারা দণ্ডধারণ না করিলে শূন্যে দণ্ডধারণ অসম্ভব এবং সেই দণ্ড trapeze-এর ন্যায় শূন্যে না ঝুলিলে ধরা যায় না।

** "তেন খো পন সময়েন বারাণসেয্যকস্স সেট্‌ঠিপুত্তস্স মোক্খচিকায় কীলন্তস্স অন্তগণ্ঠাবাধো হোতি।"—জাতক।

† অঙ্গুত্তরনিকায়ে (৩. ১৫. ২) চিঙ্গুলায়িত্বা শব্দ 'চাকা ঘুরাইয়া' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। Vide Note on Chingulaka in J. P. T. S. 1885 p. 50.

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

-শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বনমালা

[৪]

তিন দিন চলিবার পর দর্পনারায়ণের বজরা চলন-বিলে আসিয়া পৌছিল।

চলন-বিল কুম্ভকর্ণের মত; ছয় মাস জাগিয়া থাকে, ছয় মাস ঘুমায়; শীতের কয়েকমাস তার নিদ্রা; বাকি কয়েক মাস তার জাগরণ। শীতের শান্ত চেহারা দেখিয়া তাহার বর্ষার প্রতাপ বুঝিবার উপায় থাকে না, তাই বলিতেছিলাম, শীতের মাস কয়টা সে পড়িয়া ঘুমায়।

জল তখন সরিতে থাকে, মাটি বাহির হইতে থাকে; জল যতই নামিয়া যায়, ডাঙা ততই হাত পা ছড়াইতে থাকে; শেষে একদিন জল ন্যূনতম ও মাটি গরিষ্ঠতম হইয়া দাঁড়ায়।

নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে ভয় করে কে? সে তখন শিশুর চেয়ে নিরীহ। মানুষ লাঙল লইয়া ধীরপদে বাহির হইয়া আসে, গরু আনে, বীজ আনে, দৈত্যের নিদ্রার সুযোগ লইয়া চাষ করিয়া ফসল বোনে। সরিষা, হলুদ, মটর, মশুর, ছোলা বাড়িতে থাকে, ফুল ধরে, ফসল পাকে, আবার মানুষ ব্যস্তপদে আসিয়া কাটিয়া লইয়া যায়, দৈত্যটা অকাতরে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে, কিছুই জানিতে পারে না।

এই কয়মাস সদ্য-জাগা চরে মানুষ দেখা যায়, গরু দেখা যায়; রাখাল দেখা যায়, ইতর প্রাণী দেখা যায়; এই কয়মাস মানুষের রব, রাখালের বাঁশী, গরুর ঘণ্টা শোনা যায়; কিন্তু সব দৃশ্য ও শব্দের মধ্যেই যেন অনধিকার প্রবেশের একটা চাপা আশঙ্কা আছে।

তারপরে একদিন বৈশাখের প্রারম্ভে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ব্রহ্মপুত্রের কালো জল কালসর্পের কুটিল গতিতে শত-মুখ দিয়া বিলের মধ্যে প্রবেশ করে; কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া বসে। আবার একদিন আষাঢ়ের প্রারম্ভে পশ্চিম দিগন্ত হইতে পদ্মার ঘোলা জল দুধরাজ সর্পের সর্পিল গতিতে বিলের মধ্যে প্রবেশ করে; সদ্যোত্থিত দৈত্য আলস্য ভাঙিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠে। তখন কোথায় ডাঙা, কোথায় মানুষ; তখন কে বলিবে এই দুর্দান্ত দানব ঘুমাইয়া ছিল। একদিক হইতে আসে ঘোলা জল, আর দিক হইতে কালো জল, মাঝখান দিয়া প্রবাহিত হয় কালো শাদার যুক্ত-বেণীর সঙ্গম। যতদূর তাকাও মানুষ নাই, গ্রাম নাই, লোকালয়ের কোন চিহ্ন নাই; মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রামের ক্ষীণ অবশেষ, তাহা যুক্তজলের দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত; প্রকৃতির বন্দী মানুষ; দু'একখানা নৌকা দেখা যায় বটে, কিন্তু সে-ও যেন বিলের ইচ্ছাতেই বাঁচিয়া আছে, বিলের অমনোযোগে বাঁচিয়া আছে—একটা দমকা বাতাসে, একটা ঢেউয়ের তাড়নায় অনায়াসে ডুবাইয়া দিতে পারে; অক্লেশে মারিতে পারে বলিয়াই আমায় সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বিলের মারণেও উদারতা আছে। তখন জল থৈ থৈ বিশাল দুস্তরতা লইয়া বিল সমুদ্রের লীলা করিতে থাকে।

বিলের মধ্যে দর্পনারায়ণের বজরা চলিতেছে, জানালায় বসিয়া বনমালা ও সে দুই তীরের দিকে চাহিয়া আছে। কোথাও একটানা বহুবর্ণ-রঞ্জিত বিচিত্র শস্য-ক্ষেত দ্রৌপদীর ক্রমবর্দ্ধমান অঞ্চলের মত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে; শেষ নাই, চোখেরও ক্লান্তি নাই, কোথাও বালুকাবন্ধুর অনুর্ব্বর তীরভূমি, এখনও সে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নাই; লাঙলের চিহ্নে তাহার পৃষ্ঠ কলঙ্কিত হয় নাই; কোথাও ঘাসের ক্ষেত, গরু চরিতেছে, লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতেছে; দু'-একটা গরু বসিয়া চোখ বন্ধ করিয়া রোমন্থন করিতেছে, একটা শালিক ঠোঁট দিয়া তাহার কানের পোকা বাছিতেছে, মুখ দেখিয়া মনে হয় গরুটার ভারি আরাম। কোথাও বা একটা গরু দল হইতে দূরে আপন মনে চরিতেছে, তাহার পিছনে একটা গো-বক পায়ে পায়ে চলিতেছে।

কোথাও বা গ্রামের ঘাট; কেহ কলসী ভরিয়া জল তোলে; কেহ স্নান করে; ছেলেরা সাঁতার কাটে; বউ ঝি-রা এক পাশে ডুব দেয়; জেলেরা আড় বাঁধিয়া জাল শুকাইতে দিয়াছে; ঘাটে বাঁধা নৌকার গায়ে শেওলা জমিয়া

গিয়াছে ; গোটা কয়েক পাতি-হাঁস জল ছিটাইয়া চঞ্চুপ্রসাধনে রত ; নৌকা বাঁধিবার খোঁটার উপরে দুটা মাছরাঙা এক দৃষ্টে জলের দিকে চাহিয়া উপবিষ্ট ; মাঝে মাঝে এক একবার এক খণ্ড সজীব মরকতের মত সশব্দে জলে পড়িতেছে ; পুঁটি জাতীয় একটা মাছ মুখে করিয়া খোঁটার উপরে গিয়া বসিতেছে ; আকাশের উচ্চতম প্রান্তে শঙ্খচিলের বুকের একটা শ্বেতবিন্দু।

ক্রমে বেলা বাড়িতে থাকে ; ঘাটের লোক কমিয়া যায় ; নদীর তীর জনশূন্য হয়, রৌদ্র প্রখর হইয়া ওঠে, আর সমস্ত মাঠঘাট, জলস্থল, প্রকৃতির উপরে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের প্রযোজক অতি সূক্ষ্ম নীলাভ বাষ্পের মল্‌মলের একখানা যবনিকা টানিয়া দেয়।

দর্পনারায়ণ ও বনমালা জানালায় বসিয়া দুই তীরের দৃশ্য দেখিতে থাকে ; সব জায়গাই বনমালার এত ভাল লাগে যে, তাহার ইচ্ছা করে সেখানে নৌকা বাঁধিয়া চিরকাল কাটাইয়া দেয়। এইমাত্র যে স্থানটাকে সব চেয়ে সুন্দর মনে হইয়াছিল, তার পরের স্থানটাকে তার চেয়েও সুন্দর মনে হয়। অর্দ্ধ-পরিচয়ের রহস্যময় তীর হইতে এই সব স্থান তাহাকে ইসারা করিতে থাকে। সেই জন্যই দূরের শেওলা ঘন দেখায়, দূরের পাহাড় নীল দেখায়, অতীতের দুঃখকেও আর যেন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না।

বজরা মাঝে মাঝে এক জায়গায় বাঁধা হয় ; স্নানাহার সম্পন্ন হইলে আবার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয় ; বনমালার মনে হয়, পৃথিবীর সব চেয়ে মনোরম স্থানটা অকারণে ছাড়িয়া যাওয়া হইল। বজরার ছাদের উপরে আলিবর্দ্দি বসিয়া থাকে ; সে মাঝে মাঝে নূতন নূতন গ্রামের নাম হাঁকিয়া বলে ; দর্পনারায়ণ সেই গ্রামের বিষয়ে কোন গল্প জানা থাকিলে বনমালাকে শোনায়।

সেদিন বিকাল বেলা আলিবর্দ্দি ছাদের উপর হইতে হাঁকিয়া বলিল—দাদাবাবু, এই হচ্ছে কইজুড়ি, ওই যে উঁচু ভিটে, ওটা হচ্ছে বেণী রায়ের কালীবাড়ী ; ওই যে ফাঁসি-বট।—দুইজনে তাকাইয়া দেখিল প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, বহুকালের প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় একটা অজগরের মত সর্পিল ভঙ্গীতে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড বনস্পতি সহস্র শাখা দিয়া অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এতবড় গাছ সচরাচর দেখা যায় না।

বনমালা জিজ্ঞাসা করিল, বেণী রায় কে? কই তার কালীবাড়ীর কোন চিহ্ন নাই! গেল কোথায়? মাগো, এত বড় গাছ তো জন্মে দেখি নি!

দর্পনারায়ণ বলিল, ছিল, এখানে মস্ত গ্রাম ছিল এককালে, এখন কিছু নাই—সে অনেক দিনের কথা।

বনমালা বেণী রায়ের কাহিনী শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। তখন দর্পনারায়ণ শীতের ঘনায়মান অন্ধকারে আরম্ভ করিল—

বেণী রায়ের কাহিনী

সে অনেক দিনের কথা, প্রায় আড়াইশ বছর হবে, এখানে মস্ত গ্রাম ছিল, আজ তার কিছুই নাই, কেবল নামটা আছে, নাম হচ্ছে কইজুড়ি। ওই বটগাছও তেমনি ছিল ; ওর বয়স যে কত তা কেউ জানে না ; একশ বছরের বুড়োও বলে সে অমনি দেখছে, তার পিতামহরাও ওই গাছকে অমনি দেখে আসছে।

ওই গাছের নীচে ছিল মস্ত এক দীঘি ; এখন তার খানিকটা আছে, আর সমস্ত ভেঙে নদীর সামিল হয়ে গেছে। বর্ষকালে দীঘিতে আর নদীতে এক হয়ে যায়—গাছটার কোমর অবধি জলে যায় ডুবে। গ্রীষ্মকালে নদী সরে যায়, দীঘির পাজরা বেরিয়ে পড়ে, তার শুষ্ক তলদেশ দেখা যায়, সেখানে প্রকাশিত হয়ে পড়ে শত শত নর-কঙ্কাল। কতক এখনও কঙ্কাল বলে বোঝা যায়, আর কত যে মাটিতে মিশিয়ে মাটি হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। ওই যে উঁচু পাড়, গাছটার ঠিক নীচেই, ওইখানে ছিল বেণী রায়ের কালীবাড়ী। এখন শুধু ভিটেটা আছে—কিন্তু তার খ্যাতি এমনি যে কালী পুজোর রাত্রে দূর-দূরান্তর থেকে সব লোক এসে পুজো দিয়ে যায়। বছরে সেই একটা দিন—এখানে লোকের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়, আর সারা বছরের মধ্যে কেউ আসে না। এ জায়গাটাকে এ অঞ্চলের লোক এমন ভয় করে যে, খুব গরমের সময়েও রাখাল ছেলেরা এ গাছের তলায় এসে বিশ্রাম করতে ভয় পায়। বরঞ্চ তারা কাঠফাটা রোদে মাঠের মধ্যে বসে থাকবে, তবু এখানে আসবে না।

বনমালা ঔৎসুক্যের আতিশয্যে জিজ্ঞাসা করিল—বেণী রায় কে ?

সেই কথাই তো বল্‌ছি। বেণী রায় ছিল এই অঞ্চলের দুর্দান্ত এক জমিদার ; আর সেকালের সব জমিদারদের মত ডাকাতও বটে।

এই কইজুড়ি গ্রামে ছিল একদল ছোটলোক ডাকাতের বাস ; একদল কেন—গ্রামের সব লোকই ছিল ডাকাত। এদের অত্যাচারে আশে পাশের লোক উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল ; কত গ্রাম যে জনশূন্য হ'য়ে গেল তার ঠিক নাই ; কেউ এদের শাসন করতে পারে না, আর শাসন করবেই বা কেন ? রাজা তো নেই ! শেষে এদের সাহস এত বেড়ে গেল যে, একবার এরা বেণী রায়ের বাড়ীতে গিয়ে পড়ল ! বেণী রায় তখন বাড়ীতে ছিল না ; ডাকাতরা টাকাকড়ি লুটে আন্‌ল আর আন্‌ল তার বোনকে ধরে !

বেণী রায় ফিরে এসে সব শুনল। তার দলবল সংগ্রহ করল ; পাঁচশ ছিল তার নৌকা ; হাজার তার ঢালী ; বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, শড়কি নিয়ে সবাই পড়ল এসে কইজুড়িতে। সেই এক রাত্রে কইজুড়ি গ্রাম বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল—ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দা একটা প্রাণী বাঁচল না ; সকলের ছিন্ন দেহ পড়ল ওই দীঘির জলে। কিন্তু তাতে বেণী রায়ের উদ্দেশ্য সফল হ'ল না—কারণ তার আসবার আগেই তার বোন দীঘিতে ঝাঁপ দিয়েছিল।

কইজুড়ি গ্রাম জনশূন্য করেও কিন্তু বেণী রায়ের রাগ পড়ল না—ক্ষুধিত দাবানলের মত তা বেড়েই চল্‌ল ! সে ওই দীঘির ধারে বটগাছের তলায় এক কালী স্থাপন করল, আর প্রতি রাত্রে চল্‌তে লাগল সেই কালীর কাছে নরবলি। ক্রমে চলন-বিল জনশূন্য হ'ল, কিন্তু বেণী রায়ের মন প্রতিহিংসা-শূন্য হ'ল না। পূবে যমুনার ধার থেকে পশ্চিমে পদ্মা পর্য্যন্ত বেণী রায়ের প্রতিহিংসা বলি খুঁজে ফিরতে লাগল—প্রতি-রাত্রে তার একশো আটটা বলি চাই-ই। শেষে লোক সব পালাতে আরম্ভ করল—কতক পালাল যমুনা পার হয়ে ময়মনসিংহ জেলায়—কতক পালাল পদ্মা পার হয়ে নদীয়ায়।

এই সময়ে রাজা মানসিংহ এলেন সুবে বাংলা জয় করতে, আকবর বাদশার সেনাপতি অম্বরের অধিপতি রাজা মানসিংহ। বাংলা দেশ জয় করে' যখন তিনি ফিরছেন, সেকালে দক্ষিণ আর পশ্চিম বঙ্গকেই লোকে বাংলা দেশ বল্‌ত—এ সব অঞ্চলের বড় কেউ খোঁজ রাখত না, তখন তাঁর কানে বেণী রায়ের অত্যাচারের কথা গেল। তিনি সসৈন্যে বেণী রায়কে দমন করতে এলেন পদ্মা পার হয়ে। কিন্তু তার পরে ? এদিকে সব বিল আর জল, নদী আর খাল ; বাদশাহী ফৌজ যাবে কেমন করে ? তা ছাড়া বেণী রায় কি মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ? সে আজ এখানে কাল ওখানে। মানসিংহ তাকে ধরবেই বা কেমন করে ? মানসিংহ প্রকৃত অবস্থা বুঝে এক কাজ করলেন, চরের হাতে বেণী রায়ের নামে এক চিঠি পাঠালেন, তাতে লিখলেন—তোমার কোন ভয় নাই, তুমি একাকী এসে আমার সঙ্গে দেখা কর, আমিও একা দেখা করব—একা এবং নিরস্ত্র। বিশ্বাসঘাতকতার ভয় নেই, রাজপুতরা বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

বেণী রায় সাহসী পুরুষ, সে একা এসে মানসিংহের সঙ্গে দেখা করল।

মানসিংহ বলিলেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার তোমার প্রতি-হিংসা শান্ত হোক।

বেণী রায় বলল, কিন্তু এখনো যে ওদের বংশ নির্ব্বংশ হয় নি।

মানসিংহ বললেন, একের অপরাধে অন্যকে সাজা দেওয়া কি উচিত !

বেণী রায় শুধু বলল, ওরা সবাই এক।

মানসিংহ তার হাত ধরে' বললেন, তুমি বীর পুরুষ, এবার ক্ষান্ত দাও।

বেণী রায় নীরব। মানসিংহ বুঝলেন। তিনি বললেন, তুমি কাশী বাস কর গিয়ে, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বেণী রায় বললেন, আমার জন্য ভাবনা করি না, কিন্তু আমার সঙ্গে বহু লোক আছে, তাদের কি হবে ? মানসিংহ তাদের ডেকে জমিদারী দিলেন ; চলন-বিলের চারদিকের জমিদারদের বনিয়াদের ইতিহাস এই রকমে সুরু হল। বেণী রায় তার কালীমূর্ত্তি দীঘির জলে বিসর্জ্জন দিয়ে কাশী যাত্রা করল।—সে আজ আড়াইশ বছরের আগেকার কথা !

দর্পনারায়ণ যখন থামিল, তখন রাত্রি গভীর।

সে রাত্রে বনমালার ভাল ঘুম হইল না, সারারাত্রি তন্দ্রায়-জাগরণে স্বপ্নে-নিদ্রায় পাক খাইতে লাগিল। কখন বেণী

রায়ের প্রতিহিংসা-প্রবণ চক্ষু, কখন মানসিংহের বীর্য্য-উদার মুখশ্রী, কখন ডাকাতদের আক্রমণ, যখন বেণী রায়ের জিঘাংসা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে জাল বুনিতে লাগিল।

বিছানায় শুইয়া থাকা যখন তাহার পক্ষে অসহ্য হইল, সে উঠিয়া দেখিল, পাশেই দর্পনারায়ণ নিদ্রিত; তখন বজরার জানালা ফাঁক্ করিয়া সে বিলের দিকে চাহিল।

কিন্তু এ-কী! এ তো দিনের বেলার নির্জ্জীব দৃশ্য নয়, এ যে জীবন্ত সত্তা! মাঠের মধ্যে ওই কিসের আলো? একটি, দুটি নয়, শত শত জোনাকী, না আলেয়া? না, বেণী রায়ের দলের লোকদের প্রতিহিংসায় উগ্র চক্ষু মাঠের মধ্যে আজিও বলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! দূরে ও কিসের শব্দ! হাজার হাজার পাখার না হাজার হাজার হাতের? মাথার উপরে আকাশ পথে হুঃ হুঃ শব্দে কি উড়িয়া গেল? জলে কলধ্বনি জাগিয়াছে, গাছে মর্ম্মর রব! দিনের বেলায় তো এ সব শোনা যায় নাই। এ যেন সেই গল্পে শোনা দৈত্যপুরী, দিনের বেলায় যেখানে কোন সাড়াশব্দ নাই, রাত্রিকালে যেস্থান সহস্র সত্তায় সজীব। বনমালার কেমন ভয় করিতে লাগিল, সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

হে রহস্যময়ী, হে তিমিরাবগুণ্ঠিতা, অন্ধকার শর্ব্বরীর নিকষ-পাষাণ-রচিত সিংহাসনশায়িনী, হে প্রকৃতি, হে আদিম-তমা, তোমাকে চিনি না, কেমন করিয়া এমন কথা বলি? তোমাকে দেখিয়াছি তবু দেখি নাই—কারণ তোমার অবগুণ্ঠন খানিই দেখিয়াছি, তোমার মুখ দেখিবার দুরূহ সৌভাগ্য ঘটে নাই; তোমাকে জানি এমন কথাই বা বলি কেমন করিয়া! তবু মন বলে, সংস্কার বলে, তুমি আমার আত্মীয়া, তুমি আমার আত্মার আত্মীয়া। তোমারই রক্তপ্রবাহ আমার নাড়ীতে রণিত; অনুভব করি কিন্তু বলিতে পারি না! তুমি সহস্র-রসনাময়ী তবু তুমি মূক; তুমি অযুত-দৃষ্টিশালিনী তবু তুমি অন্ধ; তুমি সহস্র-কর্ণিকা তবু তুমি তুমি বধিরা; তুমি সর্ব্বজ্ঞানময়ী তবু তুমি রহস্যাবৃতা! মানব ও তুমি সহোদর, তবু তুমি কত ভিন্ন!

বিধাতার হাতের চরম সৃষ্টি প্রকৃতি নির্দ্দোষ, নিখুঁৎ, আদর্শ। মানব বহুদোষাপন্ন, বহু ত্রুটিসমাকীর্ণ, পদে পদে খণ্ডিত! মানুষ আপনার অগোচরে প্রকৃত্যান্বিত হইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মকতা স্থাপনই মনুষ্যত্বের আদর্শ। কারণ নিঃসঙ্গ মানুষ অসম্পূর্ণ আর প্রকৃতি স্বয়ম্পূর্ণা।

[৫]

গ্রামের নাম বামুনডাঙা; নদীর নাম কঙ্কণ; কঙ্কণ বড়ল নদীর ছোট একটি শাখা; বর্ষার সময়ে বিলের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়; শীতকালে সে স্বতন্ত্র। বামুনডাঙা গ্রামে কঙ্কণ নদীর তীরে সস্ত্রীক দর্পনারায়ণ আজ এক মাস বাস করিতেছে।

নৌকা ছাড়িয়া বাসা বাঁধিবার কারণ এই যে মানুষ একাধারে স্থাবর ও জঙ্গম। নৌকায় বসিয়া ভাসিয়া যাওয়াতেও এই দ্বৈধভাব আছে, কিন্তু ইহাতে দীর্ঘকাল মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; তাহার মন চায় পৃথিবীর স্পর্শ; বহু যুগের অভ্যাসে মাটির টানে তাহার মন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

এত গ্রাম থাকিতে বামুনডাঙা গ্রাম বাছিয়া লইবার কারণ, গ্রামখানি চৌধুরীদের জমিদারির এলাকাভুক্ত নয়, অথচ আশে পাশে তাহাদের জমিদারী।

বামুনডাঙা গ্রামটি ছোট, অধিকাংশই চাষী গৃহস্থের বাস; নদীর ধারে একটি দীঘি, দীঘির উঁচু পাড়ের উপরে দর্পনারায়ণের কুটীর। ইহাকে কুটীর বলাই সঙ্গত; বামুনডাঙার চাষী গৃহস্থদের স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠিতে ইহা মনোরম বাসভবন, কিন্তু জোড়াদীঘির চৌধুরীদের পরিমাপে ইহা কুটীর ছাড়া কিছু নয়।

গ্রামের চারিধারে বিস্তৃত মাঠ, রবিশস্যে ভরা; কতক কাটা হইয়াছে, কতক কাটা হইতেছে, কতক এখনও ভাল করিয়া পাকে নাই।

নদীর ঘাটে বজরাখানা বাঁধা থাকে—দূর গ্রামের হাট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনা হয়, মাঝে মাঝে বজরা বাজার করিবার জন্য পাবনা সহরে যায়; আলিবর্দ্দি যায়, কখন কখন দর্পনারায়ণও সঙ্গে থাকে।

সেদিন সকাল বেলা দীঘির ঘাটে বসিয়া আলিবর্দ্দি ও দর্পনারায়ণে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। দুজনের মনেই এক চিন্তা, এক আশঙ্কা—আবার দুজনেই তাহাকে নানা প্রবোধ দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আলিবর্দ্দি বলিতেছিল—দাঁড়াও না দাদাবাবু, বুড়ো এল বলে।

দর্পনারায়ণও তাহাই চায়, এবং বিশ্বাসও করে, কিন্তু ধরা না দিয়া বলিল—কই আর এল, তিন মাস তো হয়ে গেল। আসবার হলে এতদিনে আস্‌ত।

আলিবর্দ্দি বলিল—দাদাবাবু পৃথিবীটা তো ছোট নয়। আর পৃথিবীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চলন-বিলটাও তো নেহাত কম নয়।

দর্পনারায়ণ বলিল—তা আমরা যে চলন-বিলের দিকেই এসেছি তা তারা জানবে কি করে?

আলিবর্দ্দি উত্তর দিল—ঠিক জানবে দাদাবাবু, ঠিক জানবে! তারপরে হাসিয়া বলিল—চর-রুইমারির তহশীলদারকে আমি বলে দিয়েছিলাম, সে কি ভাবছ কাছারীতে গিয়ে সে কথা বলেনি!

দর্পনারায়ণ বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল—কেন বল্‌তে গেলি!

দর্পনারায়ণের ইহা বিরক্তির ভাণ মাত্র। সে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল—সত্যই যদি কর্ত্তা-দাদা তাহার খোঁজ না করেন! একা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ভাসিয়া বেড়ানতে না আছে সুবিধা না আছে গৌরব! আর বনমালাই বা কি ভাবিতেছে! স্ত্রীর কাছে তাহার আত্মসম্মান আছে তো!

পাঠক হয় তো ভাবিতেছেন, মন্দ কি। বাড়ী ফিরিবার জন্য এত তাড়া কেন? বাড়ীতে তো সবাই ফেরে, কিন্তু এমন ভাবে শীতের রোদে বজরা করিয়া ভাসিয়া বেড়াইবার সুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। এমন মধুর 'হনিমুন'-যাপন ছাড়িয়া বেরসিকের মত বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ততা কিসের?

আমিও পাঠকের সঙ্গে অভিন্নমত, শুধু তাই নয়, কবি-কুল পিতামহ স্বয়ং বুড়ো বাল্মীকিরও ইহাই মত ছিল; নতুবা তিনি বিবাহান্তে রাম সনাথা সীতাকে বনে পাঠাইতেন না! রামের বনবাস 'হনিমুন' ছাড়া আর কিছু নয়; তবে চৌদ্দ বছর কালটা আমাদের কিছু দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়;" কিন্তু ত্রেতাযুগের লোক না কি পঞ্চাশ ষাট হাজার বছর বাঁচিত; সে মাপকাঠিতে চৌদ্দবছর অত্যন্ত ক্ষণ-স্থায়ী বলিয়াই মনে হইবে!

কিন্তু বিপদ এই যে, দর্পনারায়ণ এ কাহিনীর পাঠক নয়, নায়ক, অর্থাৎ সে দ্রষ্টা নয়, ভোক্তা; বিশেষ হনিমুনের রোমান্স ও ফিলজফি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ, এ রকম ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির প্রভেদই স্বাভাবিক।

সে চিন্তিত হইয়া পড়িল, কিন্তু চিন্তা ঢাকিবার চেষ্টায় জোর করিয়া বলিল—না এল, না এল, এতদিন কাটল, এর পরেও কাটবে!

আলিবর্দ্দি মনে মনে হাসিল। 'এতদিন' ও 'এর পরেও' অনেক প্রভেদ, বিশেষ দর্পনারায়ণের কণ্ঠস্বরে তেজের তেমন ঝঙ্কার ছিল না।

এই নির্ব্বাসনের জন্য বনমালা নিজেকেই দায়ী করিত। সে স্বামীকে বলিত, তাহাকে বিবাহ না করিলে তাহার এমন বিপদ ঘটিত না। মনে মনে অবশ্য সে এ কথা স্বীকার করিত না—কোন স্ত্রী-ই করে না।

দর্পনারায়ণ তাহার ভীতিকে অমূলক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত; মনে মনে অবশ্য সে এত জোরে হাসিতে পারিত না—অনেকেই পারে না।

বনমালা ও দর্পনারায়ণের সাংসারিক দিক্ দিয়া কোন অসুবিধার কারণ নাই। টাকার অভাব ছিল না; প্রজারা যথেষ্ট টাকা দিয়াছে; বামুনডাঙা গ্রামে আশ্রয়টিও মন্দ নয়; চাকর ও পরিচারকবর্গও যথেষ্ট—সকলের উপরে আলিবর্দ্দির মত এমন বিশ্বস্ত ভক্ত ভৃত্য।

বনমালার সঙ্গিনী তারাসুন্দরীকে পাঠকের মনে থাকিতে পারে। তারা বনমালার বাপের বাড়ীর লোক; বনমালার সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিল; তারা তাহার দিবা-রাত্রির সহচরী!

তা ছাড়া দু'তিন জন ভৃত্য আছে; তাহারা সব কাজ করে; বনমালা যত পারে করে; তারাও করে। বামুনডাঙা গ্রামে আসিয়া গফুর নামে এক বুড়া মুসলমান চাষা বনমালা-দের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। গফুরের ইতিহাস কেহ জানে না—লোকটা এত ভাল যে, কেহ তার অতীত কাহিনী জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত না; তার বর্ত্তমানই তাহার অতীতের যথেষ্ট প্রতিভূ। গফুরের থাকিবার মধ্যে ছিল একটা শিক্ষিত লোটন পায়রা; ছোট্ট পাখীটি গফুরের পোষা; গফুর তাহাকে যেখানেই ছাড়িয়া দিক্ না কেন, ফিরিয়া আবার তাহার হাতে আসিবে। বনমালা সারাদিন সেই পায়রাটি লইয়া খেলিত। শেষে পাখীটা তাহার এমন বশ মানিল যে, ছাড়িয়া দিলে ঠিক তাহার হাতে ফিরিয়া আসিয়া বসিত। তাই পায়রাটিকে লইয়া বনমালার অনেকটা সময় কাটিত। [ক্রমশঃ

ইতিহাসের ধারা

—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আজকাল কোন দেশের ইতিহাস পড়তে গেলে, ইতিহাসের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে আকুল হ'য়ে উঠতে হয়,—রাজনৈতিক ইতিহাস, বিদেশের সহিত আদান-প্রদানের ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, শাসন-প্রণালীর ইতিহাস, অর্থ-নৈতিক ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের ইতিহাস, ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠে এইগুলি পড়লেই কি জাতির ইতিহাস জানা যাবে। মানুষের জীবন-কাল অল্প, এই বিশাল ইতিহাস-সমুদ্র পার হ'বার সাহস বা শক্তি সকলের নাই। আরও সন্দেহ হয়, হয়ত শেষে দেখা যা'বে এই সমস্ত পাঠের পরও জাতির ইতিহাস কিছুই জানা হয় নাই। মনুষ্য-শরীরের প্রতি জীব-কোষের, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবনী জানলেই ত মানুষটির জীবনী জানা হ'ল না। দন্তোদগম ও দন্তের পতন মানুষের জীবনের ঘটনা বটে, কিন্তু অবান্তর ঘটনা বই কিছুই নয়। পিতৃপুরুষগণের কাছ থেকে মানুষ শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক কোন্ কোন্ সম্পদ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, জীবনে কোন্ আদর্শ সম্মুখে রেখে' অগ্রসর হয় ও সেই আদর্শ কতদূর বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম হয়, তাহাই মানুষের প্রকৃত জীবনী,—তার সফলতার নিষ্ফলতার ইতিহাস।

মানুষের যেমন একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে, আর এই জীবন কেবল মাত্র তা'র শরীরের জীবকোষের জীবনের সমষ্টি মাত্র নয়, তেমনই জাতিরও একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে। মানুষের মানসিক জীবনই তা'র বহির্জীবনকে গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে, জাতির মানসিক জীবনও তেমনই জাতির বহির্জীবনকে গঠিত করছে, নিয়ন্ত্রিত করছে, সফলতার নন্দনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করছে বা নিষ্ফলতার মহামরুতে নিক্ষেপ করছে। প্রাচীন জাতির মধ্যে যাঁরা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, উচ্চভাবে ভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরাই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। বটধানার মধ্যে যেমন বিরাট মহীরুহ গুপ্ত আছে, অরণির মধ্যে যেমন বৈশ্বানর প্রচ্ছন্ন আছেন, কলকণ্ঠ-বিহগের সঙ্গীত যেমন তার অণ্ডের মধ্যে সুপ্ত আছে, তেমনই জাতির মনের ভাবরাশির মধ্যে তার বিরাট ভবিষ্যত-কীর্ত্তির অঙ্কুর লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে, অনুকূল জল-বায়ু-উত্তাপ-আর্দ্রতার সহায়তায় তা' প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রব্যাপারে, বাণিজ্যে, বিদ্যায়, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে জাতীয় প্রতিভা প্রকাশিত হয়, বিকশিত হয়, ফুলে ফলে সুসমৃদ্ধ, সুন্দর হ'য়ে উঠে। জাতির ইতিহাসে জাতিটা কি কীর্ত্তি রেখে গিয়েছে, তার বর্ণনাই ইতিহাস নয়, কোন্ ভাবরাশি তার মনোরাজ্য অধিকার করেছিল, কোন্ মন্ত্র তাকে প্রবুদ্ধ করেছিল, কোন্ আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল, তাই তার ইতিহাসের মর্ম্মবাণী, প্রকৃত ইতিহাস।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, একই আবেষ্টনের মধ্যে বাস, একই ভাষা বা একজাতীয় ভাষা ব্যবহার, একই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ও বিজয়লাভের ফলে, একটি জাতির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ভাবের, কতকগুলি সাধারণ ধারণার উদয় হয়। এই সকল ধারণাকে সুসংযত ও প্রণালিবদ্ধ করে' আদর্শে পরিণত করেন জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, দার্শনিকগণ, আদর্শবাদিগণ। মূক অমূর্ত্ত ভাবরাশি কল্পনাব্যবসায়ী লেখকগণের হাতে শরীর গ্রহণ করে, কমনীয় হয়ে উঠে ও জাতির কবিগণ, চারণগণ তা'দিগকে ভাষা দেন, মুখর করে' তোলেন। ক্রমে এই সকল ভাব জাতির মনোরাজ্য এরূপ অধিকার করে বসে যে, তার অন্য কিছুই ভাল লাগে না, যে অবস্থার ভিতর সে এতদিন বেঁচে ছিল, তা' অসহ্য বোধ হয়, যে রাষ্ট্রযন্ত্র, যে সমাজ, যে শিল্প-সাহিত্য, কারু-কলা এতদিন তাকে আনন্দ দান করে এসেছে, তা' অসার, নীরস, বিস্বাদ মনে হয়, নূতন ভাবরাশিকে, নূতন আদর্শকে বাস্তব জীবনে পরিণত করতে না পারলে' জীবন দুর্ব্বিষহ বোধ হয়, আর এই নূতন রাষ্ট্র, নূতন সমাজ, নূতন শিল্প-সাহিত্য গড়ে' তুলতে যত কিছু দুঃখকষ্ট, অভাবদৈন্য বরণ করে' নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তা'ও তার শ্রেয়ঃ বলে' মনে হয়। তখন জাতির জীবনে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব ফরাসী জাতির জীবনে এইরূপ একটি অধ্যায়। ফিউড্যাল্ রাষ্ট্রপ্রণালীতেই ফরাসী জাতি গড়ে উঠেছিল, একীভূত হয়েছিল, শিল্পে, সাহিত্যে, সম্পদে, যুদ্ধ-বিগ্রহে, সভ্যতায় ইউরোপে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু এই গৌরবে সাধারণ ফরাসী প্রজার কোনই স্থান ছিল না, এটা ছিল ফ্রান্সের অভিজাত-শ্রেণীর, ফ্রান্সের রাজার গৌরব। সাধারণ ফরাসী প্রজারা রাজকর দিতে সর্ব্বস্বান্ত, অশনহীন, বসনহীন, অভিজাত প্রভুর অত্যাচারে উৎপীড়িত। এই নিবিড় দুঃখদৈন্যের মধ্যে আশার বাণী শুনালেন অষ্টাদশ শতকের ফরাসী মনীষিগণ, দার্শনিকগণ, বিশ্বকোষপ্রণেতৃগণ। রুসো বোঝালেন যে, রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার উৎস জনসাধারণ, সেই ক্ষমতা সাধারণের হিতার্থে প্রয়োগ করবার জন্য রাজা জনসাধারণের প্রতিনিধি মাত্র। মন্তেস্কু বোঝালেন, দেশের আইন-কানুন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছার লিখিত প্রতিরূপ মাত্র। ভোল্তেয়ার্ ও বিশ্বকোষপ্রণেতৃগণ সমাজ, শাসনযন্ত্র, ধর্ম্ম, নীতি, সকল বিষয়কেই প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত আলোকে তন্ন তন্ন করে' বিশ্লেষণ করতে লেগে গেলেন। বিদেশের সাহিত্য, বিদেশের চিন্তার ধারা এই সময় ফরাসী দেশে প্রবেশ করে' স্বাধীন উন্মুক্ত উদার বহির্জগতের বাণী বহন করে' আনল। ফরাসীরা আর পুরাতন শাসনতন্ত্রের, পুরাতন ভেদ-অত্যাচারের মধ্যে থাকতে চাইল না। নবলব্ধ জ্ঞান, চিন্তা ও ভাবরাশিকে রাষ্ট্রে, সমাজে ধর্ম্মে, শিল্পে-সাহিত্যে মূর্ত্ত করে' তোলবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠল। বিপ্লব-স্রোতে পুরাতন সব কিছুই ভেসে গেল,—ভালও গেল, মন্দও গেল,—রাজা গেল, অভিজাতবর্গ গেল, পুরোহিত সম্প্রদায় গেল, প্রাচীন ধর্ম্ম গেল, উন্মাদনার মুখে মাস দিন বৎসরের নাম হিসাব পর্য্যন্ত ভেসে গেল। এমন কি, মাপের ওজনের আদর্শ পর্য্যন্ত ভেসে গেল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কোন ইতিহাসে যদি কেবল ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্তর্বিপ্লবের বিবরণ মাত্র থাকে, তা' হলে সে ইতিহাস থেকে রাষ্ট্র-বিপ্লবের হেতু বা তার গতির কিছুই বোঝা যাবে না। যে ভাবকে, আদর্শকে ফরাসী জাতি বাস্তব জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী মনীষিগণের যে সকল চিন্তায় ফরাসী জাতির মানসিক গগন সমাচ্ছন্ন ছিল, সেইগুলি জানতে পারলেই ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মর্ম্মকথা জানা যায়।

তেমনই গত জার্ম্মান মহাসমরের ইতিহাস কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতির ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনীরূপে দেখলে তার কোন অর্থই হয় না। উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নীট্‌শে প্রমুখ জার্ম্মান দার্শনিকগণ যে অতি-মানুষবাদ, হিরণ্যকুণ্ডল নর্ভীক জাতির বিশ্ববাসরে অধিকারবাদ প্রচার করে' আসছিলেন, এই মহাসমর তার বাস্তব জগতে প্রকাশ মাত্র।

তেমনই রুষ রাষ্ট্রবিপ্লব ওয়েন, ফুরিয়ের, কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি সাম্যবাদ প্রচারকগণের চিন্তার বাস্তব জগতে বিকাশ মাত্র। রুষ রাষ্ট্রবিপ্লবে নির্ম্মম কঠোরতা ও ভাবপ্রবণ স্নেহ-কোমলতার অদ্ভুত সমাবেশের হেতু অনুসন্ধান করতে গেলে পাওয়া যাবে রুষ কৃষকের গভীর দুর্দ্দশা, বিরাট অজ্ঞতা ও রাষ্ট্রচালনে সমস্ত জাতির অনভিজ্ঞতা।

অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক ঘটনার অঙ্কুর পাওয়া যাবে জাতির মানসিক জগতে; তার চিন্তার ধারায়, তার ভাবৈশ্বর্য্যের বিশেষত্বেই এই সকল ঘটনার রূপ ও বেগের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক মনে করেন যে, জাতির ইতি-হাসের সূত্র পাওয়া যায় দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জাতি লালিত হয় তাতে। এ কথা আংশিক সত্য মাত্র। জাতির জীবনে আবেষ্টনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না; জাতির চিন্তা কোন্ আকারে ফুটে উঠবে, জাতির প্রাণশক্তি কোন্ পথে আত্মপ্রকাশ করবে, তা' অধিকাংশ স্থলেই আবেষ্টনের দ্বারা নির্ণীত হয়। কিন্তু জাতির মানসিক সম্পদ, ভাবৈশ্বর্য্যই তার ঐতিহাসিক ভাগ্যের প্রধান নিয়ামক। যত দূর বিবরণ পাওয়া যায়, গ্রীসের প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, উত্তাপ-আর্দ্রতা সুপ্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় একই আছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীকদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা সেই প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে লালিত হ'য়েও স্মরণীয় কোন কীর্ত্তিই রেখে যেতে পারেন নি। আর প্রাচীন গ্রীক জাতির তিরোধানের পর সেই দেশে বসবাস করে, সেই জলহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হয়ে, রোমান বিজেতৃগণ বা তুর্কগণ বা মিশ্রজাতি আধুনিক গ্রীকগণ কোন কীর্ত্তিই রাখতে পারেন নি। প্রাচীন গ্রীকজাতির কীর্ত্তি-কলাপের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে, তাদের মনোরাজ্যে

প্রবেশ করতে হবে, গ্রীসের জাতীয় প্রতিভা বুঝতে হবে। গ্রীক-মন ছিল চঞ্চল, আনন্দময়, নমনীয়, সুন্দরের পূজারী, সুসঙ্গতি ও সৌষ্ঠবজ্ঞানে অতুলনীয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবগ্রাহী। এই গ্রীক-মন নির্ম্মল নীল আকাশের তলে, নীলসাগরের বুকে, ছোট ছোট নীল পাহাড়ের মধ্যে, ছোট ছোট উপত্যকায়, নীল-বনানীর ছায়ায়, নির্ঝরের কলতানে পূর্ণতার, সৌন্দর্য্যের, সর্ব্বাঙ্গীন সুষমার অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন গ্রীক-জাতি অমর করে রেখে গিয়েছে তার স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, নাট্যে, কাব্যে, দর্শনে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়। এই গ্রীক মন কিন্তু তার কীর্ত্তিকলাপ বিস্তার করতে পেরেছিল কেবলমাত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মাঝে। কোন বন্ধনের মধ্যে, পরাধীনতার পাশে পড়লেই গ্রীক প্রতিভা নীরব হয়ে যেত, তার নবনবোন্মেষ-শালিনী শক্তি তিরোহিত হত। এসিয়া মাইনরের গ্রীকগণ হোমর হেরোদোতস্‌কে জন্ম দিয়েছিল, সকল প্রকার শিল্প ও বিলাসিতার প্রচার করেছিল; কিন্তু পারস্য-সম্রাটের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হবার পর, তাদের জাতীয় প্রতিভা একেবারেই ম্লান হয়ে গেল, আর কিছুই সৃষ্টি করবার শক্তি রইল না। অথচ পারস্য-সম্রাটের অধীনতা আদৌ অত্যাচার-কলঙ্কিত ছিল না বললেই হয়। সেই জন্যই বলছিলাম যে, প্রাকৃতিক আবেষ্টন জাতির প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করে নিশ্চয়, কিন্তু তার মধ্যেই জাতির ইতিহাসের মূলসূত্র অনুসন্ধান করা সমীচীন নয়। তার মূলসূত্র পাওয়া যাবে জাতির মনে, জাতির প্রতিভায়।

কোন জাতির ইতিহাসকে এইভাবে তার মানসিক জীবনের বহির্জগতে অভিব্যক্তি বলে' ধরলে দেখা যাবে যে, এই অভিব্যক্তির পথ প্রায়ই চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয় (moves in cycles)। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, কিছুকাল ধরে' একই আবেষ্টনের মধ্যে একই ভাবে জীবন-যাপনের ফলে একটি জাতির মনে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সামাজিক আদান-প্রদান, নীতি, ন্যায়-বিচার, শান্তি পবিত্রতার বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ ভাব জেগে উঠে, একটা আদর্শ গড়ে উঠে। এই ভাবরাশি, এই আদর্শ ক্রমে জাতির মনোজগৎ এরূপ অধিকার করে বসে যে, রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রণালীতে, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের চিত্রে সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে সমগ্র জাতি ব্যগ্র হয়। এই ভাবরাশি এই অমূর্ত্ত আদর্শকে কেন্দ্র করে জাতির জীবন-ধারা কিছুদিন আবর্ত্তিত হতে থাকে ও সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে কার্য্যে কল্পনায় এইগুলিই প্রাণসঞ্চার করে। কালক্রমে জাতির মনের উপর এই সকল ভাবের আদর্শের প্রভাব হ্রাস হয়ে আসে, এ সকলের প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকে এবং সেই সঙ্গেই যে সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বিধি-ব্যবস্থা, শিল্প-সাহিত্য এগুলির চতুর্দ্দিকে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল তাদের কান্তিও ম্লান হয়ে আসে; ক্রমে শিথিল-মূল হয়ে সেগুলিও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তখন মনে হয়, জাতির জীবনস্পন্দন মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে আসছে, বুঝি বা কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে থেমে যাবে। এইরূপ অবসাদের সময় বাইরের সামান্য আঘাতেই, বিদেশীর আক্রমণেই হ'ক, ধর্ম্ম-বিপ্লবেই হ'ক, জাতির যে কীর্ত্তিকলাপ বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, সে সকল নিমেষেই ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। জাতির সংস্কৃতি যখন পূর্ণ-প্রাণবন্ত থাকে, তখন এরূপ কত আঘাতই হেলায় সহ্য করে, কিন্তু অবসাদের দিনে সামান্য আঘাতও সহ্য করবার শক্তি থাকে না। মনে হয় এ জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, কিন্তু কালক্রমে আবার কতকগুলি নূতন ভাব, নূতন চিন্তা জাতির হৃদয়ে জেগে উঠে, নূতন আদর্শ গঠিত হয়, ও সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য আবার নূতন রাষ্ট্র-প্রণালী, নূতন সামাজিক ব্যবস্থা, নূতন রীতিনীতি, নূতন শিল্প-সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে, সৌন্দর্য্যে সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে,—আমরা বলি জাতির নবজীবন সঞ্চার (Renaissance) হয়েছে। জাতি একই বা প্রায় একই আছে, তার মনোজীবনে একটা ক্রমবিবর্ত্তন ঘটে গেছে। এই জন্যই বলা হয় যে, জাতীয় সংস্কৃতি কুটিলাবর্ত্তে উন্নতির দিকে বিবর্ত্তিত হয় (cultural evolution proceeds in spirals),—মনে হয় অবনতির দিকে পিছিয়ে গিয়ে আবার উন্নতির পথে চলেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ কয়েকটি বিভিন্ন যুগ লক্ষিত হয়। সর্ব্বাগ্রে প্রবল বৈদিক যুগ। এই যুগের ইতিহাস নাই। ভারতের প্রধান কলঙ্ক যে, তার ইতিহাস নাই, ভারতবাসী ইতিহাস লেখে নাই, ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক্ দিয়ে দেখলে কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। কিন্তু ভারতবাসী

চিরকালই যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ ও ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকে প্রকৃত ইতিহাসের আলেখ্যের ফ্রেম মাত্র বলেই গ্রহণ করেছে, এই ফ্রেমের মধ্যের ভারতবাসীর জীবনযাত্রার আলেখ্যখানি তারা চিত্রিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। বৈদিক যুগে এই ফ্রেমখানি প্রায় নাই বললেই চলে। দু'চারিটা ঘটনা, দু'-চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু ফ্রেমের ভগ্ন খণ্ডগুলি বৈদিক যুগের বিরাট চিত্রের কোন্‌খানে বসান উচিত, তা' নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য। এই অপরিসর, অসম্বদ্ধ, আড়ম্বরহীন ফ্রেমের মধ্যে বৈদিক আর্য্যগণ তাঁদের জীবনের যে চিত্র রেখে গিয়েছেন, সেরূপ উজ্জ্বল চিত্র বোধ হয় আর কোন দেশেই নাই। আর্য্যগণের ভারতে প্রবেশ, বিজয়লাভ ও অভ্যুদয়ের সমস্ত ঘটনাই প্রায় গাঢ় তিমিরে আবৃত। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ কিরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন, কোন্ কোন্ চারুশিল্প ও কারুশিল্পের চর্চ্চা করতেন, কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা করতেন, কোন্ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করতেন, কিরূপ সমাজবন্ধনের মধ্যে বাস করতেন, ইহজীবনে তাঁদের কোন্ বস্তু কাম্য ছিল ও পরকালে তাঁরা কি আকাঙ্ক্ষা করতেন, তাঁদের অন্তরজগতের আশা, কল্পনা, স্বপ্ন আমরা যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি, এরূপ বোধ হয় বর্ত্তমানকালের কোন দেশের কোন জাতির সম্বন্ধে জানি না। অতএব বলতে হবে, প্রাচীন ভারতবাসীর ইতিহাসের আদর্শ, আধুনিক ইতিহাসের আদর্শ অপেক্ষা বিভিন্ন, বোধ হয় উন্নততর ছিল। এই দিক্ দিয়ে দেখলে মনে হবে, প্রাচীন ভারতবাসী তার ইতিহাসের যেরূপ প্রচুর, বিচিত্র ও সর্ব্বাঙ্গীন উপাদান রেখে গিয়েছেন, সেরূপ আর কোন দেশে নাই।

বৈদিক যুগের অবসানে ভারতে এল একটি অবসাদের কাল। পুরাতন সমাজবন্ধন, রাষ্ট্রযন্ত্র, পুরাতন ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই শিথিলমূল, মরণোন্মুখ হয়ে উঠল। বৈদিক ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুললেন ভগবান্ বুদ্ধদেব। বৌদ্ধ মতকে কেন্দ্র করে' আবার নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নূতন বিধি-ব্যবস্থা, নূতন শিল্প-সাহিত্য গড়ে উঠল। বৈদিক যুগের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস-স্তূপের তলে তলে ভারতবাসীর মনোরাজ্যে যে নূতন ভাবরাশি দানা বেঁধে উঠছিল, জাতির অবচেতনের মধ্যে যে নূতন সৃষ্টি চলেছিল, তা' প্রকাশিত হ'ল বৌদ্ধ যুগের কীর্ত্তি-কলাপে। বৌদ্ধ যুগে ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিন্তা ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে' পশ্চিমে মিশর ও গ্রীক জগতের উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হল ও পূর্ব্বে চীন ও জাপানকে পরিপ্লাবিত করে' দিল। যে ভূখণ্ডের উপর দিয়ে সেই সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হল, সে সকল দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ-বিধি-বিধানের মধ্যে যা' কিছু শ্রেষ্ঠ পেল, সে তা' আত্মসাৎ করে নিল,—অবশিষ্ট কোথায় ভেসে গেল!

কালক্রমে এই ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থল থেকেই এই প্লাবনের স্রোত অপসৃত হয়ে গেল। কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র পল্বলে একটু আবদ্ধ হয়ে রইল। Central Asian Excavationsএ এরই কিছু কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে।

কালক্রমে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা আবার শিথিল হয়ে এল, নানারূপ অনাচারে বৌদ্ধ আদর্শ ম্লান হয়ে উঠল, সমাজ ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল। এই দুর্দ্দিনেই হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান (Renaissance)। বৈদিক ধর্ম্মের সহিত এই নবোত্থিত হিন্দু ধর্ম্মের নাড়ীর যোগ থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই নূতন ব্যবস্থা আড়ম্বরপূর্ণ, প্রাকৃত মনের উপযোগী নানা দেবদেবীর উপাখ্যানে, কবিত্বপূর্ণ পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও তীর্থযাত্রার উৎসবে সমৃদ্ধ, নানারত্নালঙ্কার-ভূষিত প্রতিমার আবাসস্থল কারুকার্য্য-খচিত, বিপুল বিচিত্র মন্দির দেবালয়ে বাদ্যধ্বনিমুখর পূজারতিতে মনোরম। এই নূতন হিন্দু-ধর্ম্ম যেমন একদিকে প্রাকৃত মনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম, তেমনই অদ্ভুত প্রতিভাশালী মহামনীষিগণের অতুলনীয় চিন্তাসম্ভারে গরীয়ান্। এর মধ্যে অনেক কিছু আছে যা'র উৎপত্তি এখনও নিঃসংশয়ে বোঝা যায় না। মনে হয়, যেন নির্ম্মল আর্য্যরক্তের সঙ্গে অনেকখানি অনার্য্যরক্ত মিশে গিয়েছে, ইতিহাসের প্রায়ান্ধকারে অনেক অনার্য্য দেবদেবী, আচার-নিষেধ আর্য্য দেবায়তনে প্রবেশ লাভ ক'রেছে ও তা'তে হিন্দু-ধর্ম্ম যেমন সকল স্তরের লোকের উপযোগী ও সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনই তার বিশুদ্ধতার কিছু হানি হয়েছে। এই নূতন যুগে ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভার এমন একটি সর্ব্বতোমুখী বিকাশ দেখা যায়, যার তুলনা জগতের ইতিহাসে একমাত্র পেরিক্লিসের যুগের এথেন্সে মিললে মিলতেও পারে। এই বিপুল সংস্কৃতির প্লাবন বহুদিন যাবৎ ভারতবর্ষে চলেছিল,

একাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে এটা মন্দীভূত হ'য়ে এল। কতদিক দিয়ে মানুষের জীবনকে যে এই যুগ পূর্ণতর সমৃদ্ধতর করে গিয়েছে, তা' এখনও আমরা ভালরূপ বুঝিতে পারি না, কারণ আমরাও এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নই।

যে মানসিক তেজ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আর্য্য-ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, দৃপ্তবক্ষে বিপক্ষের সমক্ষে যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়েছিল, তা-ও আবার ক্রমে নিভে এল, হিন্দু আদর্শ ম্লান হয়ে এল, গৃহ-বিদ্বেষ ও কলহে আর্য্য-মনের চিত্তশুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল। এই সময়ে বহির্শক্তির আক্রমণে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রাচীন আদর্শ বিপন্ন হয়ে ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হল, এই যুগে বাঙলার নব্যন্যায়ের অভ্যুত্থান ব্যতীত ভারতীয় প্রতিভা স্মরণীয় বিশেষ কিছুই করে নাই ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষাকল্পে সমাজের চারিদিকে শুধু প্রাচীর গড়া চলছিল। যে সকল অনুশাসন, বিধি-নিষেধ মনের বিশুদ্ধি, জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল, তাই এখন শতগুণ বেড়ে উঠে সারাজীবনটাকে পাশবদ্ধ করে' ফেলল। স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের এই সকল বিধি-ব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষিতদের উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু কি বিপদের দিনে যে আত্মরক্ষার জন্য সেগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, তা' ভাবলে উপহাস শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। এরূপ পঙ্গু জীবন কেবল বেঁচে থাকা মাত্র। হয়ত আর কিছুকাল এইভাবে কাটলে আর্য্য-সংস্কৃতি প্রাচীন মিশরের সংস্কৃতির মতই বিলুপ্ত হয়ে যেত।

ভারতে আর্য্য-প্রতিভা যে এতদিন মাত্র সুপ্ত ছিল, মরে নাই, তা' বর্ত্তমান ভারতের জাগরণ লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে। ইউরোপের সংস্কৃতির সংঘর্ষে সে সুপ্তির ঘোর কেটে যাচ্ছে। ভারতবাসী কীটদষ্ট ধূলিধূসরিত প্রাচীন পুঁথি ঝেড়ে নিয়ে জ্ঞানের সাধনায় আবার বসে' গেছে। বিশ্বসভায় আবার জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতের বাণী শোনা যাচ্ছে। বিলাস-লিপ্ত ইউরোপের মোহ কেটে যাচ্ছে। আর্য্যপ্রতিভা আবার পিতৃপিতামহের পদাঙ্কপূত পথে সত্যের সন্ধানে, অমৃতের সন্ধানে যাত্রা করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এখনও আমরা অনুকরণই করছি, কিন্তু এই অনুকরণের অপরিসীম গ্লানি সাহিত্যে, শিক্ষাব্যবস্থায় যে নবজিজ্ঞাসার বোধনের আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তা' তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি অতিক্রম করে নি। আমরা নবজীবনের ঊষাকালে দাঁড়িয়ে আছি, সেই জন্যই বোধ হয়, এর প্রথম কিরণ-সম্পাত ভাল বুঝতে পারছি না। পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ আমাদের আনম্রশিরে বর্ষিত হ'চ্ছে, আবার ভারতের জীবন সৌন্দর্য্যে, পবিত্রতায়, সত্যে, জ্ঞানে শৌর্য্যে মহনীয় হ'য়ে উঠবে। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন একটি অমৃতত্বের বীজ আছে, যা' তা'কে বহু-শতাব্দীব্যাপী দাসত্ব, অত্যাচার, বিদেশী শিক্ষার মধ্যে সকল দুঃখদুর্দ্দিনে অম্লান-সুন্দর রেখেছে

ভারতের ইতিহাস এই সংস্কৃতির ইতিহাস, আর্য্যপ্রতিভার সকল ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের ইতিহাস। ভারতবাসী জানে যে, দৃশ্যমান বহির্জ্জগত কেবল অন্তর্জ্জগতের নামরূপ বিকাশ মাত্র। ভারতের ইতিহাস বুঝতে গেলে, আমাদিগকে ভারতের অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করতে হ'বে, বুঝতে হ'বে ভারত কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত, যুগযুগান্ত ধরে' কোন্ আদর্শের সাধনা করে' আসছে, ও সকল দিক্ দিয়া রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে কিরূপভাবে তা'কে বিকশিত করে' তুলেছে। কেবল রাজবংশের বিবরণ ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস নয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজবংশ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস সঙ্কলনেই আধুনিক গবেষকগণ সকলে নিযুক্ত। এই রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠন এরূপ বিপুল উৎসাহে চলছে যে, ভারতের ইতিহাসের কোন প্রান্তই বোধ হয় আর অন্ধকার থাকবে না। এই কার্য্যে তাম্রশাসন ও শিলালিপির পাঠোদ্ধার, মুদ্রাপরিচয়, বিদেশী পর্য্যটকগণের বিবরণ, সংস্কৃত, পালী, প্রাকৃত সাহিত্য, চীন ও তিব্বতের ভাষায় যে সকল ভারতীয় গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল, সেগুলির উদ্ধার,—সকল প্রকার বিদ্যারই সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে, উপাদান সংগৃহীত হচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে, ব্যাখ্যাত হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের গুরু ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী। তাঁদের অনেকেই ভারতীয় জীবনের কিছুই জানেন না, ভারতের আদর্শের উপর কোন শ্রদ্ধা নাই, বরং একটা অহেতুক অবজ্ঞা আছে;—আর

পিতৃপুরুষগণের উপর একটা বিপুল অবজ্ঞা পোষণ করছি। ফলে উপাদানের ভারে আমাদের গবেষকগণ ভারাক্রান্ত, কিন্তু শ্রদ্ধার অভাবে তার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করতে পারছেন না। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" তাই কৌটিল্য অধ্যয়নকালে আমরা মেকিয়াভেল্লির অনুসন্ধান করি, কালিদাসের রস-সম্ভোগ করতে সেক্সপীয়রের তুলনা মনে পড়ে। আমাদিগকে এই মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে, স্বাধীনভাবে মূল অনুশাসনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে হবে, তার অন্তর্নিহিত বাণী শুনতে হবে।

ভারতেতিহাসের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বা তাঁদের ভারতীয় শিষ্যগণের কার্য্যের নিন্দা করছি না। কিন্তু তাঁদের কার্য্যের স্বরূপটা কি তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করছেন মাত্র। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জাতির ইতিহাসের প্রয়োজনীয় অংশ বটে, কিন্তু খুব বড় অংশ নয়, এর পুনর্গঠনে তাঁরা এক একখানি করে' ইষ্টক বা প্রস্তর সংগ্রহ করছেন মাত্র। ইতিহাস-সরস্বতীর মন্দির-গঠনে এঁরা সাধারণ শ্রমিক মাত্র, মিস্ত্রীও ন'ন, ইঞ্জিনিয়ারও ন'ন। এঁদেরকে স্থপতি বললে মহাভ্রম হবে। এঁদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিকের প্রতিভা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

প্রকৃত ঐতিহাসিক ভারতীয় চিন্তার ধারা বেয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের বিলুপ্তস্মৃতি দুর্গম আদিম জন্মভূমিতে আমাদিগকে নিয়ে যাবেন, মন্ত্রদ্রষ্টা যজ্ঞব্রত আর্য্যঋষিগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম চিন্তার সহিত পরিচয় করিয়ে দেবেন, তাঁদের জীবন-ধারা অনুসরণ করে অতীত থেকে বর্ত্তমানের অভিমুখে আমাদিগকে নিয়ে আসবেন; তিনি দেখাবেন এই ধারা কোন্ পথ বেয়ে, কোন্ ভীষণ গিরিকন্দরের মধ্য দিয়ে, কোন্ সূর্য্যালোকিত হরিৎক্ষেত্র অতিক্রম করে, কোন্ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির শাখাস্রোতে পুষ্ট হয়ে, দু'ধারে কীর্ত্তিকলাপ পরিবেশন করতে করতে আধুনিক জীবনস্রোতে পরিণত হয়েছে। এই কার্য্যে যেরূপ বিপুল ও বিচিত্র জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহৃদয়তার প্রয়োজন, তা' হয়ত অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক যে কীর্ত্তি রেখে যাবেন, তা মানবজাতির চিরকালের জ্ঞান ও আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে, মহাকালের বিচারে অমরত্ব লাভ করবে।

বুভুক্ষা

—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

ধরিত্রীর বুকে ওরা তুলিতেছে অজস্র ক্রন্দন,
দরিদ্র ভিখারী ওরা—পৃথিবীর অপদার্থ জীব!
ওদের বুকের তলে জমা আছে ব্যথার বারিদ,
অজস্র বেদনা দিয়ে গড়া হলো ওদের জীবন।
অশেষ লাঞ্ছনা আছে, আছে জ্বালা, সুতীব্র বচন!
ওদের জীবনে আছে দুঃখ জ্বালা অশেষ বিবিধ,
অনাহারে অনিদ্রায় নিভে আসে প্রাণের প্রদীপ।
পদে পদে হতাশার তীব্র-জ্বালা করিছে দংশন।
ওদের জীবনে জাগে বাঁচিবার আকুল বাসনা,
অসীম পিপাসা জাগে মর্ত্তালোকে গাহিবার গান;
সাঁতারি চলিতে চাহে কষ্টগ্লানি দুঃখের পাথার!
ভুখার শ্মশানে ওরা বেঁচে থাকে—নাহিক চেতনা,
দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফেরে—এ পৃথিবী নির্ম্মম পাষাণ;
বুভুক্ষু মানুষ ওরা—অন্নাভাবে তোলে হাহাকার!

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

ঘড়ী

বিশ্বকর্ম্মার ঘড়ী তিনটি—একটা সোনার চেন-ঘড়ী আর একটা রিষ্ট-ওয়াচ—সেটি সব সময় হাতে বাঁধা থাকে। আর একটা আছে—সেটা ছেলেদের ঘরে থাকে, এবং তাদের পকেটেই ফেরে।

সুরুচি বলিলেন—"আমার একটা ঘড়ী চাই।"

বিশ্বকর্ম্মা খুসী হইয়া উঠিলেন—"কি, রিষ্ট-ওয়াচ? অর্ডার দাও।"

"না গো, অত সখ নেই আমার। সময়টা দেখবার জন্যে—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সে তো রয়েছে—"

"কই রয়েছে? একটা বাক্সে, একটা তোমার হাতে, একটা ওদের কাছে।"

"বাক্সেরটা বার করে নিলে হয়।"

—"অত দামী জিনিষটা বার করে রাখি—আর চুরি যাক্, সে হয় না। অল্প দামের একটা এনে দাও। ঘড়ী না থাকলে ভারি মুস্কিল। সময় ঠিক পাইনে—এদিকে তুমি হুলুস্থুলু বাধিয়ে দাও।"

"আচ্ছা, একটা এনে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

কলিকাতা প্রায়ই লোকে যাতায়াত করে। বিশ্বকর্ম্মা একজনের কাছে ঘড়ী আনিতে দিলেন। কয়েকদিন পরে ঘড়ী আসিল।

বিশ্বকর্ম্মা উচ্চনাদ ছাড়িলেন, "ওগো শীগ্‌গির, শীগ্‌গির এস।"

সুরুচি আসিয়া বলিলেন, "কি?"

"দেখ—তোমার ঘড়ী এসেছে।"

সবুজ কাগজের বাক্স খুলিয়া বিশ্বকর্ম্মা ঘড়ী দেখাইলেন। সুরুচি বলিলেন, "দাম কত?"

"দু'টাকা।"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "দু'টাকায় কখনও ঘড়ী হয়? নিশ্চয় খেল্‌না ঘড়ী। গ্যারাণ্টি দিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত দিনের?"

"এক বছরের।"

"এক বছরের? তা হলে একমাস চলেই বেঁকে বসবে।"

"কেন চলবে না, খুব চলবে। কোন্ টাইম রাখবে ঘড়ীতে?"

"ফাষ্ট টাইম। একঘণ্টা ফাষ্ট টাইম এ বাড়ীতে চাই। নইলে তোমার তাল সামলান যাবে না।"

ঘড়ী চলিতে লাগিল। পরের দিন চাবি দিতে গিয়া সুরুচি তাড়াতাড়ি ঘড়ী রাখিয়া দিলেন। স্প্রাং অত্যন্ত কড়া, ঘুরাইতে বিষম জোর লাগে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঘড়ীতে চাবি দিতেও জান না?"

"না।"

"আমি দিচ্ছি দেখ, নতুন ঘড়ীর স্প্রাং একটু কড়া হবে না?"

পরদিন দেখা গেল—ভোর চারিটা বাজিয়া ঘড়ী বন্ধ হইয়া আছে। সুরুচি বলিলেন, "এখন?"

"ও ক'দিন পরে ঠিক হবে।" বলিয়া চাবি দিলেন।

পরদিন দেখা গেল, রাত্রি দুইটা সাত মিনিট হইতে ঘড়ী অচল রহিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "চাবি দাও না, চলবে।"

সুরুচি রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

"শোন! শোন!—আমার রিষ্ট-ওয়াচটা দেখছিনে যে টেবিলে?"

"সেটা সারতে গেছে কাল?"

"সারতে? তুমি ভেঙ্গেছিলে বুঝি? তোমার তো ঐ কাজ—"

"হ্যাঁ, অফিস থেকে এসে জামা খুলতে ধপাস করে পড়ে গেছল—আমারি হাতে, নয়? হাতের ঘড়ী খুলে যে কেউ বুক-পকেটে রাখে এ আর কখনও দেখি নি—"

"ওঃ তা বটে, কাল অফিসে গিয়ে দেখি ঘড়ী পনের মিনিট শ্লো। পাঁড়েকে দিলাম মিলিয়ে আনতে, আর হাতে বাঁধা হয় নি, আসবার সময় পকেটে—"

"তা ও নতুন নয়। আছাড় খেতে খেতেই ওটা গেছে। একশো টাকা যে দাম—বার তের বার সারাতে দামের অনেক বেশী উঠে গেছে। এবার কিনে ফেল একটা। সেদিন অফিস থেকে ফিরেই ঘড়ীশুদ্ধ কোট দিলে ইস্ত্রী করতে ধোপার হাতে।"

"এ সব দেখা তো তোমার কাজ -"

আমি বাড়ীতে দেখতে পারি—অফিসেও যাব না কি? না রাস্তা-ঘাটেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলব?"

"পতিব্রতা স্ত্রী হলে তা করে।"

ইলিশ মাছ

বর্ষাকাল।

ক'দিন ধরিয়া বৃষ্টি নামিয়া বেশ শীত পড়িয়াছে, এই হঠাৎ ঠাণ্ডায় অনেকেরই অসুখ-বিসুখ হইতেছে। সুরুচি সাত আট দিন জ্বরে পড়িয়াছেন। দিন দুই হইল অহিরও অল্প জ্বর হইতেছে। আবার গত রাত্রে বিশ্বকর্ম্মার জ্বর হইয়াছে; আজ তিনি আহার করেন নাই, লঙ্ঘন দিয়া আছেন।

নিশি বাজারে গিয়াছিল। সস্তা পাইয়া একটা বড় ইলিশ মাছ আনিয়াছে। বাড়ীশুদ্ধ সকলের জ্বর,—তাই ফলমূলগুলি টেবিলে রাখিয়া কুণ্ঠিত ভাবে সুরুচিকে বলিল।

সুরুচি বলিলেন, "বেশ তো, কি হয়েছে? তোমরা খাবে, অহিও রুটী দিয়ে খেতে পারবে।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "খিচুড়ী হোক—"

বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া মোটা একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া স্থির হইবার উদ্যোগ করিলেন। সুরুচি বলিলেন—"তুমি যে?"

"নিশ্চয়। আমার তেমন কিছু হয় নি।" বিশ্বকর্ম্মার জন্য একটু ঘুরিয়া বেড়াইবেন। বৃষ্টির জন্য সারাদিন ঘরে আছেন। নহিলে যত অসুখই হোক্, সহজে ঘরে শুইয়া থাকিবার পাত্র তিনি নন।

বৃষ্টি একটু ধরিয়াছিল, আবার নামিল। সুরুচি আস্তে আস্তে উঠিয়া ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া চাল, ডাল, কিসমিস, মশলা সব ঠিক করিয়া দিলেন। একটা ছাতা খুঁজিলেন, পাইলেন না। গামছা মাথায় দিয়া রান্নাঘরে আসিয়া বলিলেন—"নিশি, কয়লায় আঁচ দিয়ে তারপরে ঘরে আলো জ্বাল্। মাছ আমি কুটে দিচ্ছি।"

ইলিশ মাছ কাটা একটু কঠিন—সকলে পারে না। মাকে দেখিয়া সকলে ভরসা পাইল, বিশ্বকর্ম্মা যে ভোজন-বিলাসী, বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলে কারও কাঁধে মাথা থাকবে না।

সুরুচি বলিলেন, "শীগ্‌গির রান্না করে ফেল, মাছ ভাজী, মাছের ঝোল আর ডিমের অম্বল।"

বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে যাইতে পারেন নাই, কিছুক্ষণ বাহিরের বারান্দায় বসিয়া থাকিয়া ভিতরে আসিলেন। রান্নাঘরের বারান্দায় সুরুচিকে মাছ কুটিতে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি করছ কি?"

সুরুচি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "মাছ কুটছি।"

"তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কেন? তোমার না সাত আট দিন জ্বর?" স্বর কঠোর।

"দেরী হবে বলে আমি এসেছি, এই তো হয়ে গেল।"

"কেন দেরী হবে? সব কাজ যদি তুমি করবে, তবে ব্যাটারা আছে কি করতে? মাইনে খাবে কাজ পারবে না? আলবৎ পারতে হবে! তুমি উঠে এস।"

"এই এলাম আর দেরি নেই।"

"কি? তবু উঠবে না? কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? সব তা হলে নর্দ্দমায় ফেলে দেব বলছি। ভাল চাও তো ওঠ।"

সুরুচি বলিলেন, "কি যে রাগ কর। বলছি হয়ে গেছে।"

"তবু এলে না? আচ্ছা!" বিশ্বকর্ম্মা দ্রুত রন্ধনশালার বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া মাছ কাটা দেখিতেছিল, নিশি আলো সাফ করিতেছিল, দু'জনেই ঘরের ভিতর গিয়া পলাইল।

সুরুচি সবেমাত্র মাছের আঁশ ছাড়াইয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা মাছটার লেজ ধরিয়া টানিয়া লইলেন এবং প্রাচীর ডিঙাইয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

সুরুচি নিরুত্তরে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া হাত-পা ধুইয়া ও কাপড় ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

নিশি ঘরে আলো দিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বকর্ম্মাও আসিয়া অদূরে চেয়ারে বসিলেন এবং শয্যা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেবল বাড়াবাড়ি!—কেবল বাড়াবাড়ি! স্ত্রীলোকের এত জেদ?—এ কি ভাল? এ ঘোর অমঙ্গলের লক্ষণ! পঞ্চাশ বার বললাম উঠে এস। তা শোনা হলো না। ভয়ঙ্কর কুঅভ্যাস হয়েছে কথা না শোনা! নিজের স্ত্রী কথা শুনবে না? কি হবে অমন স্ত্রী দিয়ে? জ্বরে উঠতে পারেন না, আবার গেছেন গিন্নীপনা করতে, ওঃ ভারি গিন্নী! এর পর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসুক, আর আমি ভুগে মরি। আবার বলা হয়—'আঁমি সাঁগু খাঁব নাঁ'!"—

ঘর নিস্তব্ধ, কোনই জবাব হইল না।

বিশ্বকর্ম্মা আরও কিছুক্ষণ কঠোরস্বরে শাসাইলেন, বিদ্রূপ করিলেন, বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু অপর পক্ষের কোন সাড়া না পাইয়া উৎসাহ ক্রমেই মন্দা হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে থামিলেন।

ক্ষণকাল পরে বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এই অবসরে পাচক দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মা আর কি রাঁধব?"

সুরুচি মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "যেমন বরাত, মুখের জিনিষ চলে গেল! হাঁসের ডিম কয়েকটা রয়েছে, ভাজা আর সিদ্ধ করে দাও। আলু-পটলও ভাজবে। খিঁচুড়ী নেমেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে শীগ্‌গির কর। সমস্ত দিন উপোস গেছে। আর নেবু কেটে দিয়ো পাতে।"

এ দিকে বিশ্বকর্ম্মা ছাতা মাথায় দিয়া খিড়কী দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। নিশিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাছটা কোন্ দিকে পড়েছিল রে?"

নিশি দেখাইয়া বলিল, "এই দিকে।"

"দেখ্ তো খুঁজে পাস না কি? আলো নিয়ে আয়।"

লণ্ঠন আনিয়া নিশি মাছ খুঁজিতে লাগিল। ছোট ছোট জঙ্গল—ঘাসে জল ছপ্ ছপ্ করিতেছে। নিশি সমস্ত ঝোপ-ঝাড়, [illegible]—পথের ধার, বিস্তর স্থান পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মাছ পাইল না। বলিল, "বিড়ালে নিয়ে গেছে—কি কুকুর শিয়াল—"

বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তো বেটাদের রাখা মানে পয়সা জলে ফেলে দেওয়া! উল্লুক বাঁদর! সেই সময় মাছটা খুঁজে দেখলিনে কেন? আমি ফেলেই দিয়েছিলাম, তুলতে তো বারণ করি নি? এতক্ষণ কখনো থাকে? নেবে না বিড়ালে হতভাগা শয়তানের দল! এখন ছাই খাও!"

ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বকর্ম্মা আবার চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়াই সুরুচি মুখ ঢাকিয়াছেন।

নিশি বারান্দায় খাবার জায়গা করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "রান্না হয়নি না কি?"

"আজ্ঞে হয়েছে।"

"তবে দেরি কেন? যে ছাই রেঁধেছে আনতে বল্। ছাই খাবার অদৃষ্ট তাই খাওয়া যাক।"

ঠাকুর খাবার দিল। বিশ্বকর্ম্মা ভোজনে বসিলেন। যদিও মাছটা গিয়াছে, কিন্তু খাবার আয়োজন মন্দ হয় নাই। কিন্তু অনেক দিন পর ইলিশ পাওয়া গিয়াছিল, এই জন্যই প্রতি গ্রাসে মাছের শোকটা নূতন হইয়া জাগিতেছে। দুরদৃষ্ট আর কি!

অন্যমনস্কতা বা অশান্তির জন্যই বোধ হয় আহারের মাত্রা—মাত্রা ছাড়াইয়াছে। আসন হইতে বিশ্বকর্ম্মা উঠিতে গিয়া আর উঠিতে পারেন না, শরীর ভারি হইয়া গিয়াছে! যাই হোক শেষে আচমন করিয়া ঘরে আসিলেন। ঠাকুর চাল-ডাল মাপিয়া লইয়া আবার নিজেদের জন্য রান্না চড়াইল—তাহাদেরটা কম পড়িয়াছে। বৃষ্টি থামিয়াছে, পাতলা মেঘের আড়ালে চাঁদ উকি দিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা জানালা খুলিয়া দিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন। নিশি পান দিয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা কথা বলিলেন, "শুনছ?"

খানিক অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেখ, কি সুন্দর জ্যোছনা উঠেছে, দেখ এসে, শীগ্‌গির এস।"

কোন সাড়া শব্দ নাই। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঘুমিয়েছ?"

উত্তর নাই।

"উ হুঃ—ঘুম নয়।"—বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে উঠিয়া সুরুচির

মুখের আবরণ সরাইতে গেলেন, সুরুচি এক ঝটকায় তাঁহার হাত সরাইয়া দিয়া আবার ভাল করিয়া ঢাকা দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা কাছে বসিলেন। বলিলেন, "রাগ করেছ? তোমার বড় রাগ। স্ত্রীলোকের এত রাগ ভাল নয়। এই দেখ আমার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তবু আবার কথা বলছি। তুমি হলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে।"

কোন উত্তর বা প্রতিবাদ হইল না।

বিশ্বকর্ম্মা কম্বলের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "শোন গো শোন, আর রাগ করতে হবে না! একটা কথা কি মনে করে থাকতে আছে? যা হয়েছে—হয়েছে। তুমি ওঠ, খিচুড়ী খাবে?"

এবার হাসির শব্দ শোনা গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঠাট্টা নয়। বেশ রান্না হয়েছে। তুমি খাও—কিছু হবে না। দিতে বলি? —ঠাকুর!"

সুরুচি মুখ খুলিয়া বলিলেন, "ক্ষেপেছ? এখনও জ্বর রয়েছে। আমি একটু চা খাব, আর কিছু নয়। তুমি খেয়েছ ভাল করে?"

"খেয়েছি। শুধু চা কেন? আর কিছু—"

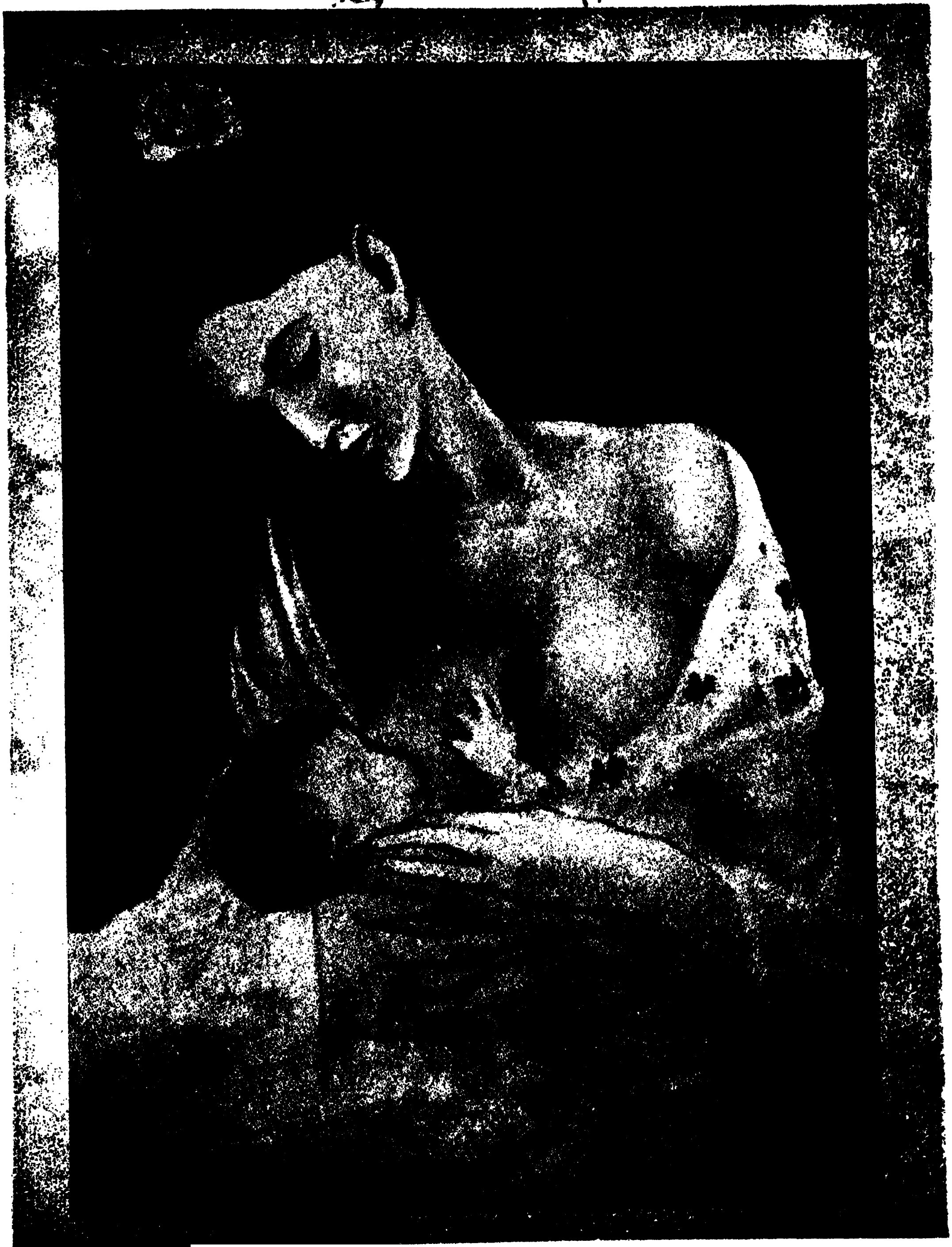
"আর কিছু না—রুচি নেই।"

"তবে চা এনে দিক্—ওরে—"

"থাম—থাম, অত বেশী যত্ন নিয়ো না; 'যা সয় তাই রয়' বুঝলে?—কি ঠাকুর? না, এখন না, অহির খাওয়া হোক্—তার পর তোমরা খেয়ে দেয়ে যাবার সময় আধা দিয়ে এক পেয়ালা চা আমায় দিয়ে যাবে।"



দুই দিক্



মা ও ছেলে।

ফরাসী চিত্রকর পাবলো পিকাস্সো কর্তৃক অঙ্কিত। এই ছবিখানি পিকাস্সোর শিল্প-প্রতিভার সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশের অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে 'মা ও ছেলে' দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয় যে, এই পিকাস্সোই চিত্রাঙ্কনে 'কিউবিজম'-এর আমদানী

আধুনিক শিল্পকলায় রূপবিচার

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বাঙ্গালা দেশে শিল্পকলার আলোচনা একেবারেই হয় নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। জাতির



ফাঁসোয়া ক্লুয়ে (১৫১৬-৭২) অঙ্কিত এলিজাবেথ অব্ অষ্ট্রিয়া।

অন্তরের যে ঐশ্বর্য্য তাহার শিল্পকলায় প্রকাশ পায়, যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে যুগে যুগে শিল্পকলার বিশিষ্ট প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে পড়িয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অত্যুগ্র দীপ্তিতে দৃষ্টিহীন বাঙ্গালী সেরূপ কোন আত্মিক প্রয়োজনের প্রেরণা অনুভব করিতেছে না। তাই তাহার শিল্প-সৃষ্টি হইতেছে সম্বন্ধহীন, অপ্রয়োজনীয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ অনুকরণ। জীবনের সহিত আমাদের দেশের বর্ত্তমান চিত্রকরের কোন যোগাযোগ নাই বলিয়াই বোধ হয় আমাদের প্রতিভাবান্ চিত্রকরেরাও এই সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

ইহার কারণও আছে। আমাদের দেশে চিত্রকলা ছিল, অজন্তা প্রভৃতির ফ্রেস্কো, সুপ্রাচীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন স্মরণ করিলে এ কথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ থাকে না। রাষ্ট্র-বিপ্লব, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি বিপর্য্যয়ে এই সংস্কৃতির কথা জাতি ক্রমে ভুলিয়া যায় এবং একদিন রাজপুরুষদের অনুগ্রহে পুরাতন শিল্পকলার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারে। যাহারা এই শুভসংবাদ বহন করিয়া আনে, বিজাতীয় রূপতত্ত্বের মানদণ্ডে বিচার করিয়া তাহারা তাহার উচিত মূল্য দিতে পারে নাই। শিল্প-বিচারে যে অন্য মানদণ্ড প্রয়োজন হইতে পারে, ইহা তাহাদের মনে হয় নাই। তাহাদের সেই বিচার-পদ্ধতি ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়।



এম. কিউ. দ লা তুর (১৭০৪-৮৮) অঙ্কিত মাদময়সেল ফেল।

ইউরোপীয় চিত্রকলা পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি তিনটি আয়তনের সম্যক্ প্রকাশ, আকারের (form) সমস্যা লইয়া

ব্যস্ত ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পরিপ্রেক্ষণ (perspective) সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হওয়ার পর তাহার এই আকার-সমস্যার সমাধান হয়। ভারতীয় চিত্রে ঐ পরিপ্রেক্ষণের ক্রিয়া দেখিতে না পাইয়া তদ্দেশীয় রসবেত্তারা কৃপার চক্ষেই ভারতীয় চিত্রকরদের দেখিতেন এবং আকারের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লই। ভারতীয় চিত্রকলার রূপাতীতের সাধনার কথা স্মরণ করিলে রবিবর্ম্মা প্রভৃতির চিত্রদর্শনে এই সংস্কৃতির সংঘাতে পরাজয়ের গভীরতার কথা ভাবিয়া হতাশ হইতে হয়। বাঙ্গালাদেশের মাসিক-পত্রে এই



এইচ. দোমিয়ে (১৮০৮-৭৯) অঙ্কিত তৃতীয় শ্রেণীর রেলের কামরা।

বিজাতীয় চিত্রকর-গোষ্ঠীর প্রাধান্য এখনও কতদিন চলিবে কে বলিবে?

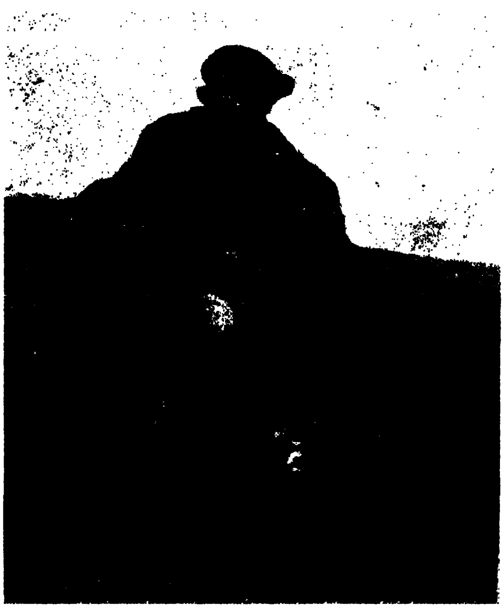
অবনীন্দ্রনাথ যে নব পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীনন্দলাল বসু সে পথে বহুদূর অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী আজও তাঁহারই স্বমহিমা প্রকাশ করিতেছে। শ্রীযামিনী রায় মহাশয় বাঙ্গালার পটের মধ্যে বাঙ্গালীর নিজস্ব রূপের সন্ধান পাইয়াছেন। কে জানে কালে তাহা হয়ত অষ্টাদশ শতাব্দীর জাপানী রঙীন ছবির মত সারা দেশে জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে পারে। জাপানী ছবির মত তাঁহার এই ছবিগুলির কমদামী প্রিণ্ট একদিন হাটে বাজারে পটের মত চলিতেও পারে। অন্যদিকে "রিবেল আর্ট সেণ্টারে"র কার্য্য বন্ধ হইলেও তাহার শিল্পীরা এখনও সজাগ রহিয়াছেন—পাশ্চাত্য শিল্পকলার সাদৃশ্য বর্জ্জন করিয়া বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপকে ধরিবার জন্য যে ব্যগ্রতা, তাহা তাঁহাদের মধ্যেও দেখা যায়। উগ্র বিদেশী আবহাওয়ার প্রভাব কাটাইলে সে চিত্রকলা যে আমাদের অতি প্রিয়রূপ প্রকাশ করিবে না—এ কথা বলা যায় না।

এই সব প্রতিভাশালী শিল্পীদের নিজস্ব দান অস্বীকার না করিলেও এ কথা নির্ব্বিঘ্নে বলা যায়, আমাদের মনে এখনও পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার রূপবিচারের সূত্রগুলি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আজও গৃহে সাজসজ্জার সহিত বিদেশী নগ্নচিত্র কিংবা তাহার স্বদেশী অনুকরণ নির্ব্বিঘ্নে স্থান পাইতেছে—রূপের মোহ এখনও মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, রূপাতীত রূপের সংজ্ঞা নিরূপণে আমাদের কতিপয় চিত্রকরদের চেষ্টা এখনও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। শিক্ষিত জনতাও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের এই চেষ্টাকে সুস্থ মনে বিচার করিতে পারিতেছে না।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে, চোখকে যাহা তৃপ্তি দান করে, তাহাই সুন্দর। চোখকে তৃপ্তি দিবার জন্য যাহা রচিত, তাহাই চিত্রকলা। কিন্তু ইদানীং ইউরোপে এবং তদনুকরণে এ দেশেও এক শ্রেণীর চিত্র দেখা যাইতেছে, যাহা দেখিলে মনে হয়, উহা চোখের পীড়া দিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যাঁহারা এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন এবং আঁকিতেছেন, তাঁহারা কেহই অখ্যাতনামা নহেন, সুন্দর চিত্র আঁকিয়াই তাঁহারা নাম করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ পাব্‌লো পিকাস্তোর (Pablo Picasso) নাম করা যাইতে পারে। এখানে তাঁহার দুই প্রকার চিত্রের নমুনাই উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে।

এ দেশের শিক্ষিত জনতার অবস্থা আরও শোচনীয়

করিয়াছে পাশ্চাত্ত্যের শিল্পকলার এই অদ্ভুত প্রগতি। পরিপ্রেক্ষণ-জ্ঞান লাভ করিবার পর সপ্তদশ শতাব্দী হইতে



জে. এফ. মিলো (১৮১৪-৭৫) অঙ্কিত বীজবপনকারী চাষী (The Sower)।

আলো-ছায়ার অপরূপ সৌন্দর্য্য পাশ্চাত্ত্যের মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকে ফটোগ্রাফী এবং আলোক-বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত চিত্রকলায় পরিবর্ত্তন দেখা গেল। Impressionist, প্রতিচ্ছায়াবাদীরা তাঁহাদের চিত্রকলায় বর্ণের সমাবেশে আত্মনিয়োগ করিলেন। কথাটা হেঁয়ালীর ন্যায় শুনাইলেও বলিতে হয় যে, দৃষ্ট পদার্থে যে অদৃষ্ট বর্ণ দৃষ্টির অগোচরে থাকে, তাহারই প্রকাশ তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু ইহাতেও সকল শিল্পী সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না।

এ পর্য্যন্ত পুরাতন শিল্পীরা চোখে যাহা দেখিতেন, হুবহু তাহাই আঁকিতেন, এ কথা বলা চলে। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত সাদৃশ্য সকল চিত্রেই থাকিত। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই চোখে দেখার বিষয় লইয়া চিত্রকররা বহু গবেষণা করেন, তাহার ফলে বর্ণ-সন্নিবেশের অভিনব রীতি প্রচারিত হয় সারে (Seurat), সিইয়াঁক (Signac) প্রভৃতির চিত্র ইহারই একদিক। এইরূপ বিজ্ঞানের প্রভাবে শিল্পকলা যখন প্রাণহীন হইতেছিল, তখন প্রতীচ্যের চিত্রকলা অরূপ-বাদের প্রতি প্রাচ্যের শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোগাঁ (Gauguin) এই দিকে প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেও প্রসিদ্ধ চিত্রকর সেজানে (Cezanne) তাঁহার চিত্রকলায় এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপে যে রীতি চলিয়া আসিতেছিল, তাহার গতি সম্পূর্ণ বিপরীতগামী করিলেন। তিনি চাহিলেন, তাঁহার চেতনায় দৃষ্টবস্তুর যে রূপ ধরা পড়িয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিতে। বাহিরে যে জগৎ রহিয়াছে, চক্ষু দ্বারা যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার সেই বাহ্য জগতের নির্বিচার (mechanical) প্রতিবিম্ব, দৃষ্টিমাত্রেই যাহা নয়নে প্রতিফলিত হয়, তাহা যেন তাঁহার রচনায় আর স্থান না পায়। তাঁহার প্রখর



এইচ. জি. ই. দেগাস (১৮৩৪-১৯১৭) অঙ্কিত দি ব্যালো।

চেতনাবোধে যাহা রহিল, তাহাই সত্য, তাহাই প্রকাশ-যোগ্য। তাঁহার নিজের ধারণা, প্রবৃত্তি, বিশ্বাস যেন পূর্ব্ব-

বর্ত্তীদের মত চিত্রকলায় প্রকাশ না পারি। বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির (emotion) অনধিগম্য চিত্রকরের চেতনা-বোধেই বস্তুর সত্যরূপ রহিয়াছে। তাহার প্রকাশই বাহ্যবস্তুর প্রকৃত প্রকাশ, তাহাই সর্ব্বমনোবৃত্তি ও ধারণার মূলাধার। সেজানে এই 'সত্যরূপ' প্রকাশে তপস্যা সুরু করিলেন—বাহ্যবস্তুর আকার এবং বর্ণ বিশ্লেষণ করিলেন,



পাবলো পিকাস্তো (১৮৮১-) অঙ্কিত উপবিষ্টা।

—যতক্ষণ না তাহার চিত্রপটে 'সত্যরূপে'র পূর্ণ প্রকাশ হয়।

সেজানের এ তপস্যা সেজানের পক্ষেই সম্ভব। চেতনায় এই রূপ উদ্ভাসিত হয় ক্ষণকালের জন্য, তাই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বতঃপ্রকাশ বাঞ্ছনীয়। মতীশ Matisse চিত্রাঙ্কন করেন সেজানের ন্যায় বহুকাল ধরিয়া নয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়ত তাঁহার আঁকা ছবি সার্থক বা ব্যর্থ হয়। সে সকল ছবিতে বিষয়বস্তু অধিকাংশ সময়ে নগণ্য। আধ্যাত্মিকতা, মানবতা, জীবনজিজ্ঞাসা, বাস্তবতা, অতীতের চিত্রকলার এ সকল, বৈশিষ্ট্য এমন কি সেজানের চিত্রেও যাহা পাওয়া যায়, মতীশের চিত্রে তাহার বিন্দু-মাত্র সন্ধান পাওয়াও দুর্লভ। মতীশের চিত্রের মূলে রহিয়াছে অখণ্ড দৃষ্টি (Integral vision), আমরা যাহা দেখি, তাহার সহিত বিচারলব্ধ জ্ঞানযোগে বস্তুর পরিচয় পাই। যেমন কোন পরিচিত বস্তুর একাংশ দেখিলেও অপরাংশও নিরীক্ষণ করি। আমাদের চক্ষু বস্তু হইতে বস্তু পরিভ্রমণ করিয়া মনকে এক সম্পূর্ণ চিত্র গঠন করিতে উপাদান দেয়। পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকররা এইরূপ মানস-মূর্ত্তিরই গঠিত মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে দেখিবার সময় স্বতঃই একটি কোন প্রধান বস্তু বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহারি চারি পার্শ্বে অন্যান্য বস্তুর বিশিষ্ট সমাবেশ হয়। যদি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ-কারী বস্তুর বাহুল্য দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিবার কষ্ট হয়। সৌন্দর্য্য আর কিছুই নয়, যাহা নয়নকে তৃপ্তি দেয়। কি চিত্রবিদ্যায় রেখার সমাবেশে, কি গঠনশিল্পে নয়নের তৃপ্তি অপরিহার্য্য। মতীশ চিত্রাঙ্কন করেন কেন্দ্রস্থ বস্তুর চারিপার্শ্বে অতি দ্রুতগতিতে দৃষ্ট বস্তুগুলির সংস্থান করিয়া। কেন্দ্রবস্তুতে চক্ষু নিবিষ্ট করিলে আবছায়ার মত যাহা দেখা যায় কেবল তাহাই তাঁহার চিত্রে স্থান পায়। তাই তাঁহার চিত্র দেখিতে হইলে ঐরূপ দৃষ্টি প্রয়োজন। শিশুর দৃষ্টির মত তাঁহার এই দৃষ্টিও বুদ্ধি দ্বারা অবিকৃত।

মতীশের চিত্রে কেন্দ্রস্থ বস্তুর চারি পার্শ্বে সজ্জিত বস্তু-সন্নিবেশে যে রূপ প্রকাশ পায়, তাহা 'নৈরূপ্যবাদের'ই কথা। এই রূপ স্রষ্টার মনোগত। রূপস্রষ্টা যখন বুঝিতে পারেন, বস্তুর স্বরূপ বুদ্ধিগত, তখন মনে মনে বুদ্ধির বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় ক্রিয়াটি মানিয়া লইলেও সেই রূপকে বর্ণ ও রেখার বন্ধনে প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁহার না হইতে পারে। আকারের (form) নিয়ম মানিয়া এই বস্তুকে অবলম্বন করিয়া, তাহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করার ইচ্ছাকে Art of Abstract Form, নিছক সম্বন্ধহীন রূপসৃষ্টি বলা হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের মূল বস্তু, সুসন্নিবেশ, সমতা (symmetry) এবং নির্দ্দিষ্টতা, এতদিন ধরিয়া রূপবিচারে ইহাই নির্ব্বিকারে মানিয়া লওয়া হইতেছিল। এই নৈরূপ্যবাদের প্রচারে তাহা বর্জ্জিত হইল। Cubism, চতুষ্কোণবাদ

ইহারই একরূপ। Cubist বস্তু হইতে কেবলমাত্র তাহার **অন্তর্নিহিত সরল** রেখা, বক্র রেখা, ঘন রূপ প্রভৃতি পৃথক



ফারনান্দ লেজের (১ ৮১-) অঙ্কিত উপবিষ্টা।

করিয়া লন; রেখা-সমষ্টি যে আনন্দ দেয়, বস্তুর রূপের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সে বস্তুর ব্যবহার বা স্মৃতির সহিতও তাহার সম্বন্ধ নাই, চিত্রটি সর্ব্বদা স্বতঃই এবং অনন্যসংবদ্ধ ভাবে সুন্দর।

কিন্তু মনের মধ্যে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পর চিত্রকর ভিন্ন পথগামীও হইতে পারেন। বস্তুর এই মনোগত অস্তিত্ব মানিয়া লইবার পর তিনি বস্তুকে চিত্রিত করিবার ইচ্ছা সর্ব্বোতভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন। চোখে যাহা দেখা যায়, তাহা অঙ্কন না করিয়া চিত্রপটে রেখা এবং বর্ণের সম্পূর্ণ মনোগত সন্নিবেশে নিযুক্ত হইতে পারেন—সে রেখা এবং বর্ণ যে নিয়ম মানিয়া চলিবে তাহা চিত্রকরের নিজস্ব। ইহাকেই Theory of Subjective Form বলে। এতদিন ধরিয়া বাহ্য (concrete) বস্তুই ছিল শিল্পকলার পরম প্রিয় বস্তু। এখন হইতে শিল্পী চক্ষুর পরিবর্ত্তে সহজ জ্ঞান (intuition), বিশ্লেষণের পরিবর্ত্তে সংযোগ এবং বাস্তবতার পরিবর্ত্তে প্রতীক ব্যবহার করিতে শিখিলেন। পিকাসো (Picasso) প্রভৃতি চিত্রকররা এই মতবাদের পথ-প্রদর্শক।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিত্রকলায় প্রগতির মূলে যে মতবাদ রহিয়াছে, তাহার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, নৈরূপ্যবাদ, ওখাকার প্রাচীন সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছে। আর্ট বাস্তব-অনুগামী নয়, বিষয়-বস্তুর মহত্ত্বের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। শুদ্ধ অঙ্কন-ক্ষমতাই প্রধান। মানস-সৃষ্টিকে রেখার ও বর্ণের ছন্দে প্রকাশই সব—শিল্পীর নিজের হাতের লেখাই মূল। এই লেখার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আত্মিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। আর কিছুই দেখিবার বা বুঝিবার নাই। কোন জাতির মতবাদই এ অবস্থায় অধিক দিন থাকিতে পারে না, ইউরোপীয় চিত্রকলাও নিশ্চয় এই মত-বিরোধ অতিক্রম করিয়া উঠিবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজকে ইউরোপের এই অভিনব নৈরূপ্যবাদের



জোয়াঁ মিরো (১৮৯৩-) অঙ্কিত চিত্র।

কথা শিক্ষা করিতে হইবে এমন কি কথা আছে? অন্তরালে অরূপের সন্ধান আমাদের দেশই ত সর্ব্বাগ্রে করিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসে ভারতীয় যোগী

—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সীমান্তের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে-সকল রাজা আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। আবার যে-সকল দেশ তখনও আলেকজাণ্ডারের অধীনে আসে নাই, তাঁহারা সেই সব দেশের রাজাদিগের নিকট ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলিতেন। ম্যাসিডোনিয়ানগণকে তাঁহারা এরূপ বিব্রত করিয়া তুলিলেন যে, আলেকজাণ্ডার কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।*

রাজা সাব্বাস আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকেও উত্তেজনা দিয়া বিদ্রোহী করিলেন।

আলেকজেণ্ডার শুনিতে পাইলেন, এ-বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইয়াছে ব্রাহ্মণেরা। তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে দশজনকে ধরাইয়া আনিলেন। যাঁহাদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তাঁহারা সকলেই যোগী ও জ্ঞানী। আলেকজাণ্ডার বহু পূর্বেই ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞান-গরিমার কথা অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহারাও জ্ঞানী লোক শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'আমি আপনাদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। যিনি প্রথম যথার্থ উত্তর দিতে অক্ষম হইবেন, প্রথম তাঁহাকে হত্যা করিয়া পর পর আর সকলকে হত্যা করিব।'

তিনি প্রথম একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আগে দিন হইয়াছিল, না আগে রাত্রি হইয়াছিল, কি আপনার ধারণা?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, 'দিন একদিন আগে হইয়াছিল।'

এই উত্তর শুনিয়া আলেকজাণ্ডার একটু বিস্মিত হইলেন। কারণ এ-রকম উত্তর হয় না। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিলে যোগী কহিলেন, 'যেমন অসম্ভব প্রশ্ন, তেমন অসম্ভব উত্তর।'

আর একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন করিয়া মানুষ সকলের প্রিয় হইতে পারে?' উত্তরে ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিতেও মানুষ যদি নিজেকে ভয়ের বস্তু করিয়া না তোলে।'

অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'মানুষ দেবতা হইতে পারে কেমন করিয়া?' তিনি উত্তর করিলেন, 'মানুষের পক্ষে যাহা কঠিন, তেমন কাজ করিয়া।'

আর একজনকে আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জীবন ও মৃত্যু, ইহাদের ভিতর কে বলবান্?' উত্তর হইল, 'জীবন, কারণ জীবন কষ্ট সহ্য করিতে পারে।'

অন্য একজন যোগীকে প্রশ্ন করা হইল, 'মানুষ কতদিন সসম্মানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?' যোগী উত্তর করিলেন, 'যতদিন বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই বাঞ্ছনীয় না হয়।'

আলেকজাণ্ডার এই সকল উত্তরে যেমন বিস্মিত হইলেন, তেমনই সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এরূপ ধীর ভাবে যে কেহ উত্তর দিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। তিনি তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কেন সাব্বাসকে বিদ্রোহে উত্তেজনা দিয়াছেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি সাব্বাসকে বলিয়াছিলাম, —হয় সসম্মানে জীবন ধারণ কর, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।'

ব্রাহ্মণদিগের বিচারের জন্য আলেকজাণ্ডার একজন বিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া তিনি বিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইঁহাদের উত্তর সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?'

বিচারক ভাবিলেন, ইহাদের যাহাতে মৃত্যু হয়, এমন অভিমতই তাঁহার প্রকাশ করা উচিত। সেই জন্য তিনি কহিলেন, 'প্রত্যেকের উত্তরই অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে।'

আলেকজাণ্ডার শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'তোমার যখন এইরূপ অভিমত, তখন তোমাকেই প্রথম হত্যা করা হইবে।'

---

* J. W. McCrindle--Invasion of India by Alexander the Great, as described by Arrian, Q. Curtius, Diodoros, Plutarch and Justin. P.—306.

কিন্তু বিচারক অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া মার্জ্জনা লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি অনেক উপহার দিয়া ব্রাহ্মণগণকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।*

এই যোগী কয়টির সহিত কথা বলিয়া ভারতীয় যোগিগণের সহিত আলাপ করিবার জন্য আলেকজাণ্ডারের প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা হইল। তিনি যোগিগণকে ডাকিয়া আনাইবার জন্য কয়েকজন লোককে পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই নির্জ্জন সাধনা পরিত্যাগ করিয়া রাজ-দরবারে যাইতে সম্মত হইলেন না।

এক দিন কয়েকজন ভারতীয় যোগী, নিজেদের অভ্যাস মত মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের কয়েকজন অনুচর তাঁহাদিগকে ধরিয়া আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে লইয়া গেল। সম্রাটের নিকট আসিয়া তাঁহারা বসিলেন না। তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভূমিতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

আলেকজাণ্ডার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা ঐরূপ করিতেছেন কেন?'

তাঁহাদের একজন কহিলেন, 'হে সম্রাট্, মানুষ যে-টুকু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকে, সে-টুকুই মাত্র তাহার প্রয়োজন। আপনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, তখন আপনাকে যে-টুকু ভূমিতে সমাধি দেওয়া হইবে, তাহা অপেক্ষা অধিক ভূমি আপনার অধিকারে থাকিবে না। কিন্তু ভূমি-জয়ের মোহে আপনি পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিতেছেন এবং নিজেও যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছেন।'

আলেকজাণ্ডার তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ অনুসরণ করিতে সম্মত হইলেন না।†

সম্রাট্ যখন তক্ষশীলায় গিয়াছিলেন, তখন সেখানে অনেক যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এক জনকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। কারণ তাঁহাদের সহিষ্ণুতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

তিনি শুনিতে পাইলেন, যোগী দন্দমিস খুব বড় সাধক। তিনি অনিসিক্রেটস্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত অনুচরকে দন্দমিসের নিকট পাঠাইলেন। সহর হইতে অনেকটা দূরে তিনি ও আরও কয়েক জন যোগী সাধনা করিতেন। অনিসিক্রেটস্ ঐ স্থানে গিয়া দেখিলেন, প্রায় পনের জন যোগী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দ্বিপ্রহরের সূর্য্যতাপে পাথরের উপরে শুইয়া বা বসিয়া আছেন। সূর্য্যতাপে মাটি তখন এত তাতিয়া গিয়াছে যে, নগ্নপদে মাটির উপর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ান কঠিন। অনিসিক্রেটস্ ধীরে ধীরে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং দন্দমিসের নিকটে যাইয়া কহিলেন, 'আমি সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে আসিয়াছি, তিনি সমস্ত মানবের প্রভু। তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত দেখা করি-করিবার জন্য বলিয়াছেন। আপনি যদি যান, সম্রাট্ আপনাকে বহুমূল্য উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন, কিন্তু আপনি যদি না যান, তবে সম্রাট্ আপনাকে হত্যা করিবেন।'

যোগী দন্দমিস অনিসিক্রেটসের কথা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নীরবে শুনিলেন। তাঁহার মুখের উপর দিয়া একটা স্নিগ্ধ হাসির আভা খেলিয়া গেল। তিনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। সে ভাবেই থাকিয়া কহিলেন, 'আপনি বলিতেছেন, আলেকজাণ্ডার সমস্ত মানবের প্রভু! কিন্তু সমস্ত মানবের যিনি প্রভু, তিনি মরেন না। আলেকজাণ্ডার একদিন মরিবেন। সমস্ত মানবের প্রভু দয়াময় ও প্রেমস্বরূপ, কিন্তু আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবীকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রভু নহেন। মানবের একমাত্র প্রভু ঈশ্বর। সম্রাট্ আমাকে উপহার দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজেই অভাববোধ হইতে জল ও স্থলে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার ভ্রমণের এবং অভাবের শেষ হইতেছে না। যিনি নিজেই অভাবগ্রস্ত, তিনি আমাকে কি দান করিবেন? সম্রাট্ যাহা দান করিতে পারেন, তাহা আমি চাহি না। কোন বিলাস-দ্রব্যেই আমার লোভ নাই। আমার যাহা আছে, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকি। আমার যাহা আছে, সম্রাট্ যদি তাহা গ্রহণ করেন, তাহাতেও আমি দুঃখিত হইব না, আমার জীবন গ্রহণ করিলেও না। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার দেহ যদি

* Ibid, P. 314

† Ibid, P. 387।

ধ্বংস হয়, তাহা হইলে সাধনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী নূতন দেহ আমি লাভ করিব।'*

আলেকজাণ্ডার যদিও বিশাল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ভিতর কোমল বৃত্তির অভাব ছিল না। যখন তিনি তাঁহার অনুচরের মুখে দন্দমিসের এই সকল কথা শুনিলেন, তখন এই সাধুদিগের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য তাঁহার বাসনা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রবল হইল। দন্দমিসের কথা শুনিয়া আজ তাঁহার মনে হইল, যদিও দন্দমিস বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল, তথাপি বিশ্বজয় করিয়া আসিয়া এমন একজন প্রতিযোগী তিনি পাইয়াছেন, যাঁহাকে তিনি জয় করিতে পারিবেন না এবং তাঁহার নিজের চেয়েও যিনি অনেক বড়।†

আলেকজাণ্ডার আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু একজন যোগীকে যে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, এ-ইচ্ছা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল হইল। তিনি আবার অনিসিক্রেটস্‌কে যোগীদের নিকট পাঠাইলেন।

দন্দমিস নিজে ত' সম্রাটের নিকট যানই নাই, বরং আর কেহ যাহাতে না যায়, তাহার জন্য সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের আদেশে আবার অনিসিক্রেটস্ তাঁহাদের নিকট গেলেন। এবারও তিনি গিয়া দেখিলেন, যোগীরা পূর্ব্বদিনের মত রৌদ্রের ভিতর উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি কালানস নামে এক জন সাধুর নিকট যাইয়া কহিলেন, 'আমি আবার আপনাদের নিকট আসিয়াছি। সম্রাট্ আপনাদের জ্ঞানের কথা শুনিয়া আপনাদের তত্ত্বকথা জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।'

কালানস্ কহিলেন, 'তত্ত্বকথা শুনিবার অধিকারী হওয়া চাই। যে আমাদের তত্ত্বকথা শুনিবে, তাহাকে পূর্ব্বে উলঙ্গ হইয়া আমাদের পার্শ্বে আসিয়া বসিতে হইবে।'

কিন্তু পুনঃ পুনঃ আলেকজাণ্ডারের আগ্রহাতিশয্যের কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর কালানস্ সম্রাটের সহিত দেখা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার ও অন্যান্য যোগীদের ইহাই খুব বিস্ময়কর মনে হইল যে, সে-লোকটা এত বড় যোদ্ধা, সে আবার ধর্ম্মপ্রাণ হয় কেমন করিয়া।

* J. W. McCrindle—Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian, P. 123—129.

† Ibid, P. 127.

সম্রাটের সহিত যখন কালানসের দেখা হইল, তখন তিনি তাঁহার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

কিন্তু তিনি আলেকজাণ্ডারের সহিত গেলেন বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুর্নাম হইল। যোগিগণ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার আত্মসংযম নাই। তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া আলেকজাণ্ডারকে প্রভুত্বে বরণ করিয়াছেন।*

তথাপি কালানস্ যে খুব বড় একজন সাধু ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম স্ফিনিস্। কিন্তু গ্রীকগণ তাঁহাকে কালানস্ বলিয়া ডাকিতেন। কারণ তিনি যখন লোককে অভিবাদন করিতেন, তখন 'কল' শব্দ উচ্চারণ করিতেন। কল শব্দ 'কল্যাণ' শব্দেরই অপভ্রংশ। তিনি কল শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিতেন, 'কল্যাণ হউক'।

আলেকজাণ্ডার তাঁহার নিকট সাম্রাজ্য-পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি এক খণ্ড শুষ্ক চর্ম্ম ভূমিতে ফেলিয়া তাহার এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অমনি চর্ম্মের অপর সকল দিক্ উঁচু হইয়া উঠিল। তিনি চর্ম্মখণ্ডের চারিদিকে বার বার পা রাখিয়া দেখাইলেন, যে কোন প্রান্তে দাঁড়াইলেই অপর সকল দিক্ উঠিয়া পড়ে। তাহার পর তিনি মধ্য-স্থানে পা রাখিলেন। তখন চামড়াখানি মাটির উপর সমতলভাবে রহিল।

কালানস্ উহা দ্বারা এই উপদেশ দিলেন যে, আলেকজাণ্ডার যেন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করেন এবং কখনও যেন দূর প্রান্তে না আসেন।

কালানসের সহিত সম্রাটের সত্বরই গভীর বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে বহু সময় একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কালানস যখন পারসিসে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার ভয়ানক শূল-বেদনা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পর তিনি দেখিলেন যে, রোগের জন্য তিনি আর যথাযথ ভাবে পূর্ব্বের জীবন-যাত্রা-প্রণালী অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না এবং

* McCrindle—Ancient India—as described in Classical Literature, P. 70.

তাঁহার সাধন-ভজনে অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, তাঁহার রোগ আর আরোগ্য হইবার নয়, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে তিনি তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন করিবেন।

ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে মৃত্যু বরণ করিবেন, তাহার নির্দ্দেশ মনুসংহিতায় আছে। মনু বলিয়াছেন যে, জীবনের শেষ অবস্থায় কঠোর সাধনা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ যদি অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে যে-পর্য্যন্ত না দেহের পতন হয়, তাবৎকাল বায়ুভক্ষণ করিয়া যোগনিষ্ঠ হইয়া ঈশান কোণে সরল ভাবে গমন করিবেন।*

কি ভাবে দেহ ত্যাগ করা যাইতে পারে, স্মৃতিকার তাহার আরও অনেক বিধান দিয়াছেন। কালানস্ স্থির করিলেন, শাস্ত্রীয় বিধানের মর্ম্মানুযায়ী প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিবেন।

আলেকজাণ্ডার তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কালানস্ কিছুতেই মত পরিত্যাগ করিলেন না। তখন তিনি টমেলী নামক একজন শ্রেষ্ঠ অনুচরকে ডাকিয়া কালানসের জন্য চিতা সজ্জিত করিতে বলিলেন।

লিথিমাক্স নামে একজন গ্রীক তাঁহার নিকট দর্শন শিক্ষা করিতেন। কালানস্ অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া তিনি তাঁহার জন্য একটি ঘোড়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি তখন এত দুর্ব্বল হইয়াছেন যে, ঘোড়াতেও আরোহণ করিতে পারিলেন না। তখন ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁহাকে একখানা শিবিকায় তুলিয়া লওয়া হইল। যখন তিনি শিবিকায় উঠিলেন, তখন একদল লোক ভারতীয় ভাষায় স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। তিনি নিজেও স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

আলেকজাণ্ডার তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহার চিতায় নিক্ষেপ করিবার জন্য অনেক মূল্যবান্ জিনিষ পাঠাইয়াছিলেন। কালানস্ তাঁহার সঙ্গের লোকদিগকে ঐ-সকল জিনিষ বিলাইয়া দিলেন।

চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠা মাত্র সম্রাটের পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে অস্ত্রধারী ও গন্ধবহনকারী সৈন্যগণ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। তুরীবাদকগণ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা তুরীধ্বনি করিতে লাগিল এবং কালানস্‌কে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সমস্ত সৈন্যগণ এমন ভাবে ধ্বনি করিয়া উঠিল, যেন তাহারা যুদ্ধযাত্রা করিতেছে।

চিতায় আরোহণের পূর্ব্বে কালানস্ তাঁহার গ্রীক বন্ধু ও সঙ্গিগণকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁহার কাছে আসিলেন না। কালানস্ তাঁহার বন্ধু ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহার মৃত্যুর দৃশ্য দেখিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। আলেকজাণ্ডার যখন আসিলেন না, তখন কালানস্ বলিলেন, 'আচ্ছা আলেকজাণ্ডারের সহিত আমি ব্যাবিলনে সাক্ষাৎ করিব।' তখন তাঁহার সেই কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। তাহার কিছুকাল পর আলেকজাণ্ডারের যখন ব্যাবিলনে মৃত্যু হইল, তখন সকলে কালানসের এই উক্তি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে করিলেন।

কালানস্ এরূপ ভাবে চিতা আরোহণ করিলেন, যেন ইহা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। চিতায় উঠিয়া তিনি একটুও আর্ত্তনাদ করিলেন না বা আগুন হইতে হাত বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরাইয়া লইলেন না। তিনি কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া চিতার উপর বসিয়া রহিলেন। তাহার পর অগ্নি তাঁহাকে গ্রাস করিল। চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান জনসমুদ্রের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তাহারা বার বার শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতে লাগিল।*

* মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১—৪৫ শ্লোক।

* J. W. McCrindle—Invasion of India by Alexander the Great, as described by Arrian etc, P, 388.

মৃত্যু

—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত সাধক রামজয় সার্ব্বভৌমের কন্যা মহামায়ার বিবাহ হয় রামনগরের জমিদার বিপ্রদাস বাবুর সহিত। তখনকার দিনে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নাম জানিত না এমন লোক খুব কমই ছিল। তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবল ও অপূর্ব্ব সাধনার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। তিনি নিজে বিশেষ যত্নসহকারে কন্যাকে লেখাপড়া ও সাধনা শিখাইয়াছিলেন। পিতার চরিত্রের প্রভাবেই মহামায়ার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। সাধনা দ্বারা তিনিও অসাধারণ মানসিক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, জীবনের সকল অবস্থাতে তিনি সংযত থাকিতে পারিতেন, কখনও বিচলিত হইতেন না।

বিপ্রদাস বাবু ও মহামায়া পরমানন্দে দাম্পত্য জীবন যাপন করিতেন। এমন একটি নির্ম্মল অনাবিল আনন্দ-প্রবাহ তাঁহাদের জীবনে প্রবাহিত হইত যে, অতি দুঃখী মানুষও তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া দুঃখ ভুলিয়া যাইত। তাঁহাদের মুখে সব সময় হাসি লাগিয়াই থাকিত। তাঁহাদের ব্রত ছিল পরোপকার, নিজেদের বিলাইয়া দিয়া পরের সেবা!

তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া বিপ্রদাস বাবু একদিন আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহামায়াকে বলিয়া গেলেন, "আমি তো চললাম। তোমার জন্ম অপেক্ষা করব। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার ভার তোমায় দিয়ে গেলাম। মাকে ডেকো, মা'ই তোমাদের রাখবেন, শক্তি যোগাবেন।"

স্বামীর মৃত্যুকালীন আদেশ মহামায়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিলেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা এবং মাতৃসাধনা—এই হইল তাঁহার ধ্যান, জীবনের ব্রত। শুভ্র বেশধারিণী এই মহীয়সী মহিলার ব্যক্তিত্ব, তেজ ও নিষ্ঠা সকলের মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিল। মনে মনে সকলেই স্বীকার করিয়া লইল, এরূপ অসাধারণ মানুষ সংসারে সত্যই দুর্লভ।

তারপর ক্রমে ক্রমে বড় ছেলে সুপ্রিয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জয়পুর কলেজে প্রফেসারের পদ পাইয়া সেখানে চলিয়া গেল। মেজ ছেলে অসীম হইল ডাক্তার। অসীম সহরেই ডাক্তারি করা স্থির করিল। ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুবিধার জন্ম ও অসীমের ঐকান্তিক আগ্রহে মহামায়া গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া সহরে বাস করা স্থির করিলেন। রামপুর মহল্লায় কলনাদিনী গঙ্গার ধারে একটি দোতলা বাড়ী ভাড়া করা হইল। স্থানটি মহামায়ার খুব পছন্দ হইল।

অসীম ডাক্তারি আরম্ভ করিল। মনে হইল, ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য যেন তাহার নাই, সে যেন তাহার পিতার সেবাব্রতই গ্রহণ করিয়াছে। গরীব দুঃখীর কাছে ভিজিট গ্রহণ করা দূরে থাক, দরকার হইলে নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া তাহাদের সে সাহায্যও করে। অসীমের প্রতিভা ছিল, সৌজন্য ছিল, ডাক্তারি সে ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল, তারপর তাহার অসীম কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিক সেবাব্রত,—অল্পদিনেই তাহার যশও যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, পশারও সেই রকম বাড়িয়া গেল। কিন্তু সুনাম ও প্রতিপত্তি তাহার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল না। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া মাকে প্রণাম করিতে যেমন তাহার একদিনের জন্ম ভুল হইল না, তেমনি নিজের কর্ত্তব্য এবং সেবাধর্ম্মও সে একদিনের জন্মও ভুলিয়া গেল না।

স্ত্রী মণিমালা রহস্য করিয়া বলিত, "দিন দিন তোমার কাজ যে রকম বেড়ে যাচ্ছে, দু'দিন পরে দিনে রাতে তোমার টিকিটিও দেখতে পাব না। কেমন মানুষের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন?"

অসীম বলিত, "মালা, কর্ত্তব্যের চেয়ে বড় মানুষের কিছু নেই। তুমি কি চাও কাজ ফেলে তোমার সঙ্গে বসে হাসি-গল্প করে দিন কাটাই?"

মণিমালা বলিত, "না গো, না,—আমি তামাসা কর-

ছিলাম। এতদিন এ বাড়ীতে এসেছি, মার প্রভাব কি একটুও কাজ করে নি আমার মধ্যে ভেবে নিয়েছ? ছেলেবেলা থেকে আমি যদি মার কাছে থেকে মানুষ হতে পারতাম! সত্যি বলছি, বিয়ের আগে আমি ভাবতেও পারি নি আমার এমন ভাগ্য হবে, আমি এমন শাশুড়ী পাব।"

সুখে আনন্দে পরিপূর্ণ এই সংসারে একদিন কালের কুটিল কটাক্ষপাতে নিরানন্দের আবির্ভাব ঘটিল। মনে হইল, মহাকাল যেন মহামায়ার সাধনার শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহেন, স্বামীর মৃত্যু দিয়া পত্নী মহামায়ার একবার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবার জননী মহামায়ার পরীক্ষা।

সহরে হঠাৎ মহামারীরূপে বসন্ত দেখা দিল। বহুকাল এই নিদারুণ রোগের এরূপ প্রকোপ দেখা যায় নাই। রোগ ক্রমে ক্রমে সহর ও সহরতলী ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। সহরময় শোনা যাইতে লাগিল মড়াকান্না—একটা মর্ম্মভেদী হাহাকার! দলে দলে লোক সহর ছাড়িয়া পালাইয়া যাইতে লাগিল।

কয়েক ঘর প্রতিবেশী সহর ছাড়িয়া যাওয়ার আগে মহামায়াকে উপদেশ দিতে আসিল যে, তাঁহারাও কেন বসিয়া আছেন? তাঁহাদেরও পালাইয়া যাওয়া উচিত।

মহামায়া মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "সুখের সময় যাদের মধ্যে ছিলাম, দুঃখের সময় তাদের ফেলে চলে যাব? তা' ছাড়া, আমার ছেলে ডাক্তার, সে তো কোন অবস্থাতেই এখন চলে যেতে পারে না। দরকারের সময় যদি তার শিক্ষা কাজে না লাগে, তবে সে কিসের ডাক্তার?"

অসীম সেবার কাজে লাগিয়া গেল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সেবাশ্রমের যুবকদের সঙ্গে এক হইয়া ঘরে ঘরে রোগীর সেবা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহামায়া নিঃশব্দে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে জগন্মাতার চরণে পুত্রের ও সহরবাসী সকলের কল্যাণের নিবেদন জানাইলেন।

মণিমালা কেবল একদিন স্বামীকে বলিল, "ওগো তুমি এ রোগের চিকিৎসা নাই বা করলে?"

অসীম বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সে বলিল, 'মালা, তুমি ত' জান না এ কি নিদারুণ রোগ। যাকে এ রোগে ধরে, কেউ তার কাছে যেতে চায় না, সেবা যত্ন করতে সাহস পায় না। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন পর্য্যন্ত রোগী ফেলে পালিয়ে যায়। রোগীর যে কি যন্ত্রণা, কি ভীষণ কষ্ট, চোখে না দেখলে বুঝা যায় না। মানুষের এ বিপদে মানুষ হয়ে যদি আমার যতটুকু ক্ষমতা করবার চেষ্টা না করি, তবে আমার মনুষ্যত্ব কিসের?"

মালা আর কিছুই বলিল না।

সহরে রোগ-দমনের অনেক ব্যবস্থাই হইল, কিন্তু কোনটিই কার্য্যকরী হইল না। দিনে দিনে সহর যেন মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। এমন অবস্থা হইল যে, মৃতদেহ দাহ করিবার লোকেরও অভাব ঘটিতে লাগিল।

একদিন অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া অসীম বিছানায় শুইয়া পড়িল। সকলের শঙ্কিত প্রশ্নের জবাবে মৃদু হাসিয়াই সে বলিল, "গা, হাত, পা খুব ব্যথা করছে, কিন্তু ভাবনার কিছু নেই। একটু ঘুমিয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু ঘুমাইয়া কিছু হইল না। ক্রমে ক্রমে অসীমের সমস্ত শরীরে গুটি ছড়াইয়া পড়িল। খবর পাইয়া ভাইয়েরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। মহামায়া কিন্তু তাহাদের সকলকে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমরা এসেছ ভালই, কিন্তু অসীমের সেবার জন্য তোমাদের দরকার হবে না। আমি আর বৌমাই পারব। বাইরে অনেকেই এ রোগে ভুগছে, তোমরা তাদের সেবা করগে যাও। অসীমের অভাবে সেবা-কাজের যেটুকু ক্ষতি হত, তোমরা যদি তা হতে না দাও তা হলেই যথেষ্ট হবে।"

মণিমালার সঙ্গে মহামায়া অসীমের সেবা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিপ্রদাস বাবুর মৃত্যুর মধ্যে মহামায়ার জীবনে যে পরীক্ষা আসিয়াছিল, মণিমালা তাহার পরিচয় রাখিত না। স্বামীর রোগ-যন্ত্রণা দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে, মহামায়ার বিস্ময়কর ধৈর্য্য দেখিয়া সে আত্মসম্বরণ করে, বিপদের সময় এলাইয়া পড়া অপেক্ষা কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই যে বেশী দরকারী তাহা বুঝিতে পারে।

অজ্ঞান অচেতন পুত্রের শিয়রে বসিয়া মহামায়া যখন চণ্ডীপাঠ করেন, মণিমালা সজল চোখে অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

মাঘের শেষ। অন্ধকার রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বদিক হঠাৎ রক্ত-রাঙ্গা হইয়া উঠিল। পথে কিছু কিছু লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু চারিদিকে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক স্তব্ধতা,—এমন কি পাখীর ডাক পর্য্যন্ত যেন শোনা যাইতেছে না। সহরের রামপুর মহল্লায় কলনাদিনী কলুষবিনাশিনী গঙ্গার তীরবর্ত্তী একটি দোতলা বাড়ীর সম্মুখে ভিড় জমিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই যেন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে যে, কখন কি হয়!

বাড়ীর ভিতরে একটি ঘরে আলো জ্বলিতেছে। নির্ব্বাপিতপ্রায় স্তিমিত প্রদীপশিখা! রোগশয্যায় যে মানুষটি শয়ন করিয়া আছে, তাহার জীবন-প্রদীপও যে নিবিয়া আসিতেছে, দীপের শিখায় কি তাহারই ইঙ্গিত?

অসীমের অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। অতিকষ্টে একবার সে ডাকিল, "মা!"

মহামায়া শিয়রের দিকে বসিয়া রুগ্ন সন্তানের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি বাবা?" অসীম বলিয়া উঠিল, "বড় কষ্ট!"

মহামায়া বলিলেন, "বাবা ভগবানকে ডাক। নাম কর।" বলিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অসীম হাঁ করিল। মহামায়া এক ঝিনুক গঙ্গাজল দিলেন। কোনমতে ঢোক গিলিয়া অসীম আবার বলিয়া উঠিল—"যাই-যে মা।" তাহার পর বিস্তৃত নয়নে চাহিয়া রহিল।

পায়ের দিকে বসিয়া মণিমালা মরণোন্মুখ স্বামীর প্রাণপণ সেবা করিতেছিল। আজ কয়দিন ধরিয়া দেহমনের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চলিতেছে, স্বামীর যন্ত্রণাকাতর করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে আর সহ্য করিতে পারিল না, মাথার মধ্যে এমন ভাবে ঝিমঝিম করিয়া উঠিল যে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। মহামায়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বেও কি বিস্ময়কর মহামায়ার ধৈর্য্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব! এক পাশে মাদুর বিছান ছিল, মূর্চ্ছিতা পুত্রবধূকে তিনি ধীরে ধীরে সেখানে শোয়াইয়া দিয়া অসীমের শয্যা-প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন। একবার পুত্রের যাতনা-বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া, দৃষ্টি তুলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিয়া উঠিলেন,—"ওগো তোমার বাছাকে নিতে এসেছ, নিয়ে যাও। আর কষ্ট দিও না।"

অসীমের কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিল। আবার বলিল, "মা যা—ই মা—।" প্রাণবায়ু কি বাহির হইল? মহামায়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহার পা অসীমের মাথার নিকট রাখিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "অসীম, তোমার বাবা, গুরুদেব, তোমায় নিতে এসেছেন। তোমার সব কষ্ট এই মুহূর্ত্তে দূর হয়ে যাবে। মা'র নাম কর তো বাবা, বল মা কালী।" হাত দুইটি জপের ভঙ্গী করিয়া অসীম বলিল,—"কা-লী-মা"।

পর মুহূর্ত্তে অভূতপূর্ব্ব ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিয়া অসীমের মুখে ধীরে ধীরে বিমল হাস্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। কোথায় গেল রোগযাতনা, কোথাই বা ক্লিষ্ট কাতর মুখ,—মৃত্যুকষ্ট! ভগবান্‌ যেন স্বয়ং তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়াছেন। মা প্রাণপণে গাহিয়া উঠিলেন, "কোলে তুলে নে মা কালী" কি অপূর্ব্ব সে গান! সমস্ত প্রাণমন নিংড়াইয়া যেন পুত্রের জন্য তিনি অন্তিম প্রার্থনাই জানাইয়াছেন যে,—মা গো, ছেলেকে তোমার কোলে তুলে নাও। অভূতপূর্ব্ব অব্যক্তব্য, মহান্ দৃশ্য!

ইতিমধ্যে অসীমের ভাইবোনেরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সঙ্গে ছিল অসীমের সাত বছরের ছেলে সুদর্শন ও চার বছরের মেয়ে সুব্রতা। অসীমের দাদা সুপ্রিয় সুদর্শনকে ও অসীমের ছোটভাই অসিত সুব্রতাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

সকলেই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। এইমাত্র এ ঘরে একজনের শেষ নিশ্বাস পড়িয়াছে, কিন্তু কাহারও গগনভেদী কান্নার রোল নাই, কাহারও চোখে জল নাই। সকলের চেয়ে শান্ত ও নির্ব্বিকার মহামায়া, ছেলের শেষ নিশ্বাস পড়িবার সময় তিনি যাহাকে কালী-সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইয়াছেন। অন্যান্য সকলের মধ্যে যদি বা কাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল, মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সেও কাঁদিয়া উঠিতে ভরসা পাইতেছিল না। কান্না চাপিয়া রাখিতে পারিলেও সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছিল, সকলের মনেই যে

প্রবল ঝড় উঠিয়া তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল।

সকলের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া মহামায়া বলিলেন, "তোমরা শান্ত হও।" তারপর মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বৌমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গেনি, ওকে ধরাধরি করে অন্য ঘরে নিয়ে যাও। ছেলেমেয়েদেরও এখান থেকে নিয়ে যাও।"

মেয়েরা কিছুক্ষণ নড়িতে পাড়িল না, তার পর কয়েক জন মণিমালাকে ধরিয়া তুলিয়া এবং কয়েকজন ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে মহামায়ার উপস্থিতির জন্যই যে কান্না তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, ঘরের বাহিরে গিয়া সেই কান্নাই তাহাদের সকলের সমবেত আর্ত্তস্বরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

বড় ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মহামায়া বলিলেন, "সুপ্রিয়, চল আমরাও এ-ঘর থেকে যাই! আর এ-ঘরের মায়া কি? না বাবা, অস্থির হয়ে পড়লে চলবে না, আত্ম-সম্বরণ কর। মার নাম কর, বল, মা-কালী। মৃত্যু বলে কি কিছু আছে বাবা? আত্মার তো মরণ নেই! মা-কালীকে স্মরণ করে মনে জোর করে নাও, কর্ত্তব্য করবার জন্য প্রস্তুত হও।"

বেলা বাড়িয়া উঠিল। সহরময় এই নিদারুণ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। বহু তপ্ত শ্বাস, বহু অশ্রুজল পড়িল।

বন্ধুরা অসীমকে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। সকলেই নিস্তব্ধ, মুখে কাহারও কথা নাই, কেবল চোখে জল। কথা বলিবার মত অবস্থা কাহারও ছিল না। কি করিয়া মায়ের বুক হইতে পুত্রের মৃতদেহ ছিনাইয়া লইয়া যাইবে!

মহামায়া তাহাদের দ্বিধার কারণ বুঝিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবারা আর দেরী কেন! বল, হরি হরিবোল।—"

সমবেত ব্যক্তিদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া গভীর আর্ত্তনাদ বাহির হইল—"বল হরি—হরিবোল।"

শ্মশান-প্রদীপ

—শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত

জীবন-প্রদীপ নিভে গেল যার কালের অন্ধকারে,
সন্ধ্যা-আঁধারে মাটির প্রদীপে বন্দনা একি তারে!
আগাছায়-ঘেরা তুলসী-তলায় এই যে মাটির নীচে
জানিস্ কি এক বিরাট স্বপ্ন নিমেষে হয়েছে মিছে!
নিমেষে নিভেছে গগন-বিথার হাজার আশার বাতি,
ঝরিয়া পড়েছে নব-মুকুলিকা রাঙা-কল্পনা-পাঁতি,—
নীরব হয়েছে দুঃখসুখের স্পন্দনময়ী ভাষা,
মাটির কবরে নির্ব্বাণ লভে জীবনের কাঁদা-হাসা!
কত যে বাসনা—স্নেহ-ভালবাসা—
　　　　দেহ ও মনের ক্ষুধা,—
মান-অপমান—জয়-পরাজয়—কত বিষ, কত সুধা,—
এ মাটির নীচে হারায়েছে আজ সকল অর্থ তার,
সমুখে পিছনে ঘনায়েছে শুধু নিবিড় অন্ধকার!

ধরণীর বুকে ক্রন্দন জাগে,—কোথা যায়—কোথা যায়,
স্তব্ধ রহে যে কালের আঁধার সাড়া নাহি দিল হায়!
শুধু যে আঁধার—শুধু নীরবতা—কিছু নাহি জাগে আর,
নির্ভান প্রদীপ রেখে যায় শুধু অসীমের বিস্তার!

সন্ধ্যায় আজি ঘনায়ে এসেছে নিবিড় অন্ধকার,—
দিনের কথাটি ফুরায়ে এসেছে, স্তব্ধ যে চারিধার,—
নিশ্চল শুধু দাঁড়ায়ে রয়েছে তন্দ্রামগন শাখী,
কুলায়ের মাঝে ফিরিয়া আসিয়া নীরব হয়েছে পাখী;
কেন আর তবে মাটির প্রদীপ ক্ষীণ তোর কম্পনে
ব্যর্থ প্রয়াসে জীবনের স্মৃতি টেনে রাখ প্রাণপণে!
কালের অতলে হারায়েছে যার ব্যর্থ অর্থ ভার,
তাহারে ঘিরিয়া জাগুক শুধুই নীরব অন্ধকার!

কর্ণেল বুরক্যাঁর আত্মজীবনী

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধিয়া যখন যশোবন্তের নিকট রাণীদিগকে ধরিয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে তোয়াজ করিয়া বেশ একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে রাণীদেরও যাত্রায় উৎসাহ দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার যাহা সাধ্যায়ত্ত তিনি করিবেন। উজ্জয়িনীতে উহাঁরা আসিয়া উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদের যাবতীয় ধনসম্পত্তি, মূল্য তিন কোটি টাকার কম হইবে না, হস্তগত করিয়া তাঁহাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জগুবাবু এবং লকবা উহাঁদের সহিত মিলিত হইবার জন্য সসৈন্যে যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, হৃতসর্ব্বস্ব রাণীদের তাঁহারা সঙ্গে করিয়া দাতিয়াধিপতির নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারা তখন প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন ; অনন্তর তাঁহারা দশ সহস্র সৈন্যসহ সমগ্র জনপদ উৎসাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি যখন কোয়েলে আসিয়া পৌছি, ঘটনাচক্র তখন ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল। আমি জেনারেল পের‍ঁকে হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রধান আধিপত্যভূষিত দেখিলাম। অম্বাজীও ঐ কার্য্যে তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সুপ্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা আবশ্যক ছিল। উক্ত মারাঠাসর্দ্দারের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল তিন ক্রোর টাকা ; তদ্ভিন্ন তাঁহার বার্ষিক ক্রোর টাকা আয়ের জনপদ ছিল এবং গোয়ালিয়র হইতে দাক্ষিণাত্যের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রয়োজনীয় দুর্গ তাঁহার দখলে ছিল।

জেনারেল পের‍ঁ আমাকে মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে সর্ব্বপ্রথম লেফটেনাণ্ট পদ দিয়াছিলেন। পরদিবস তিনি আমাকে মেবাং প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় পুনরায় গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। চারিমাস কাল পরে আমি মথুরায় আহূত হইয়াছিলাম। সেখানে তখন পের‍ঁ ও অম্বাজী ছিলেন। তাঁহারা দিল্লীদুর্গের তদানীন্তন প্রভু জগুবাবু এবং লকবা দাদার অনুচরবৃন্দের হস্ত হইতে উহা অধিকার করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। মেজর পেড্রঁর পরিচালনাধীনে একটি নূতন ব্রিগেড এই অভিযানে প্রেরিত হইল এবং আমিও উহাতে যোগদানে আদিষ্ট হইলাম। সতের দিন অবরোধের পর উক্ত স্থানের পতন হইয়াছিল এবং এক মাসের জন্য আমি দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলাম। কিল্লাদাররূপে আমি মহাদজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক বৃদ্ধ সম্রাট্ সাহ আলমের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। "সালাতীন" নামে অভিহিত একটি কারাগৃহের তদারক করাই আমার প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল। উহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের প্রায় ৫০০ পুত্র ও বংশধর সস্ত্রীক বন্দীভাবে রক্ষিত ছিল। এ দেশের প্রথামত বাদশাহেরা নয়টি বৈধ পত্নী এবং যতগুলি ইচ্ছা রক্ষিতা গ্রহণে অধিকারী। এই শেষোক্ত ধরণের পদ্ধতি 'নিকা' নামে পরিচিত ; তাহার নানা প্রকারভেদ আছে এবং সবগুলিরই বিশিষ্ট নিয়ম আছে। সময় সময় কোন কোন রাজার তিন চারিশত নিকা-পত্নী দেখা যায়। বৈধপত্নীজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়া থাকে। যখন যে সম্রাট রাজত্ব করেন, তাঁহার বংশ স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করে। রাজার দেহান্ত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনারোহণ করে এবং অপর সকলে "সালাতীন" মধ্যে প্রবেশ করে। জীবনে তাহারা আর উহার বাহিরে পদার্পণের অধিকারী হয় না। এসিয়ার প্রথামত যে বন্দীদশা ভোগ করিতে তাহারা বাধ্য, তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত সাহজাদাগণ হিন্দুস্থানের অবস্থানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল সতর্কতাসূচক ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাও সহ্য করিতে বাধ্য। আমাকে যে নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তদনুসারে আমি উহাদের সকলকার পিছনে লোক লাগাইয়াছিলাম। ইহারা উহাদের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিত, সকলই পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে

আমাকে রিপোর্ট দিত। এমন কি স্বয়ং সম্রাটও যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তাহাও আমার হাত এড়াইয়া যাইতে পারিত না। মারাঠা দরবারের পক্ষে আবশ্যকীয় কোন জ্ঞাতব্য তথ্য যাহাতে থাকিত, আমি তাহা জেনারেল পের্‌ঁকে পাঠাইয়া দিতাম। দুর্গদ্বারের প্রহরীগণ, যাহারা যে কেহ ভিতরে যাইত বা আসিত তাহাদেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তদ্ভিন্ন খোজা প্রহরীও ছিল; রমণীবৃন্দের বস্ত্রাবৃত যানগুলি তল্লাসী করা তাহাদের কার্য্য ছিল; যাহাতে কোনমতে শত্রুপক্ষের সহিত সংবাদ আদান প্রদান না হইতে পারে, তাহাই অভিপ্রায় ছিল। অন্ধ সম্রাট্ দুর্গ-প্রাকারাভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদ অথবা নগরোপকণ্ঠবর্ত্তী অপর কোন ভজনালয়ে যাওয়া ভিন্ন তাঁহার প্রাসাদ কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। এতদুপলক্ষ্যে তিনি এবং তাঁহার দলের রাজকুমারগণের সমভিব্যাহারে অশ্বারোহী ও পদাতিক যে সৈন্যদল যাইত, আমি স্বয়ং তাহাদের অধ্যক্ষতা করিতাম। যাহাতে কোন ব্যক্তি পলায়ন না করে, সে বিষয়ে আমার তীব্র লক্ষ্য থাকিত।

সে যাহা হউক, অবশেষে আমি এ কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তৃতীয়বারের মত মেবাৎ প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে উক্ত জনপদ পরিত্যাগ করিয়া আসিবামাত্র তথায় আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দুইমাস পরে আমি মথুরায় পের্‌ঁ ও অম্বাজীর নিকট যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। আমার আগমনের অষ্টাহ কাল পরে পের্‌ঁ আমাকে আগ্রা হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে রক্ষীসেনা ভিন্ন একাকী অশ্বারোহণে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং তথায় যে চার ব্যাটালিয়ন সিপাহী ছিল, তাহাদের লইয়া আগ্রা গমন করিতে আমাকে বলা হইয়াছিল। নির্দ্দেশমত আমি সকল কার্য্য যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলাম। নিশাকালে জেনারেল স্বয়ং কতকগুলি অশ্বারোহী লইয়া আগ্রা হইতে দুই ক্রোশ দূরে আমার সহিত যোগ দিলেন। জগুবাবু ও লকবা দাদা অধিকৃত আগ্রা দুর্গ হস্তগত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, নগরে তখন সকলে সুপ্তিমগ্ন। নিঃশব্দে প্রাচীর-গাত্রে মই লাগাইয়া আমরা তাহা উল্লঙ্ঘন করিলাম। ভিতরের নিদ্রোত্থিত প্রহরী-সেনা আমাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমরা কয়েকজনের প্রাণবধ করিয়া অবশিষ্টগুলিকে বন্দী করিলাম। তখনও আমাদের দুর্গাধিকার করা বাকী রহিল। কয়েকজন উচ্চপদস্থ মারাঠাসর্দ্দার নগরমধ্যে একটি গৃহাভ্যন্তরে তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে আট ঘটিকার সময় ৮০০ শত দুর্গরক্ষী সেনা তাহাদের উদ্ধারের জন্য অকস্মাৎ কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল। এই অতর্কিত আক্রমণ আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। দুর্গদ্বারের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী রাজপথের প্রান্তে আমি যে দুইটি কামান বিন্যাস করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার আশ্রয়ে আমাদের সৈনিকগণ বিশৃঙ্খলভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। এইরূপে তাহারা দ্রুতপদে পশ্চাদনুসরণরত শত্রুসেনার মধ্যে এক অন্তরাল রচিয়াছিল। কামান দুইটি হস্তচ্যুত হইলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য ছিল। যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমরা ছিলাম, তাহাতে একটি প্রাণীও রক্ষা পাইত না। আমি আমাদের নিজেদের লোকদের উপরই গ্রেপ-শট চালাইতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে কয়েকজন হতাহত হইল বটে, কিন্তু শত্রুসেনা দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর আমরা বিধিমত দুর্গাবরোধে প্রবৃত্ত হইলাম; দীর্ঘ দুইমাস পরে দুর্গের পতন হইল।

অবরোধকার্য্যের প্রথম হইতে শেষাবধি আমিই তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম; সে কারণ পের্‌ঁ আমাকে পুরস্কার-স্বরূপ কাপ্তেন পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে আমি ঝাঝারের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলাম জর্জ্জ টমাস যে রাজ্যটি গঠন করিয়াছিলেন, উহা তাহারই একটি নগর। তথাকার সর্দ্দার একশত গাড়ী চিনি বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিল। বৃথাই আমি তাহার প্রত্যর্পণ দাবী করিলাম। আমি উক্ত স্থান আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলাম। পনের দিন অবরোধের পর আমি সম্মুখ আক্রমণে নগর অধিকার করিলাম, যদিও ৩০০০ সৈন্য উহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। উপযুক্ত একজন নেতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে উহারা দৃঢ়ভাবে বাধা প্রদান করিতে পারিত। অতঃপর আমি

জেনারেল পের ঁ ও অম্বাজীর দলে পুনরায় যোগ দিলাম এবং আমরা সসৈন্যে জণ্ড বাবু ও লকবা দাদার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা···পর্য্যন্ত * তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহাদের ধরিতে পারিলাম না। পরিশেষে পের ঁও অম্বাজী সিন্ধিয়াকে এবং ভাও বক্সীকে কারামুক্ত করিতে ও তাঁহাকে এবং জণ্ড বাবু ও লকবাকে স্ব স্ব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিলেন; যাহাতে তিনি ভবিষ্যতে অনায়াসে উহাদের তিনজনকে আয়ত্তে পাইতে পারেন। এই নীতি অনুসৃত হইল এবং জণ্ডবাবু ও লকবা এক বৈঠকে আহূত হইলেন। তাঁহারা আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ সকল আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং উহঁাদের আন্তরিকতায় যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাহা স্পষ্টভাবে ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও একটা রফা করা সম্ভব হইয়াছিল। অম্বাজী হিন্দুস্থানে কর্ত্তৃত্বের অংশগ্রহণের দাবী পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর উহা জেনরেল পের ঁ, জণ্ডবাবু এবং লকবা দাদার মধ্যে বিভক্ত হইল। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি নর্ম্মদা নদী হইতে সরমপুর (? সাহারাণপুর) পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের শাসনভার পাইলেন; অবশিষ্টাংশ পের ঁর অধীনে প্রদত্ত হইল। তাঁহার ভাগে তিনটি জেলা পড়িল; ব্রিগেডগুলির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বিশেষভাবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। কোয়েল নগর উহার রাজধানী ছিল। পের ঁ তথায় গিয়াছিলেন। জণ্ডবাবু এবং লকবা দাদা দ্বিতীয় ব্রিগেড লইয়া জজগড় অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এইদলে আমিও ছিলাম। কাপ্তেন সাদারলণ্ড আর এই ব্রিগেডের অধ্যক্ষ ছিলেন না। তাঁহার স্থলে মেজর পলমান নামক জনৈক ইংরাজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।†

জজগড় যোধপুরের রাঠোরদের অধিকৃত ছিল। উহাদের বিরুদ্ধে সমর তখনও অবসান হয় নাই। ইহা একটি গিরিশৃঙ্গোপরি নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। আমরা ইহা অবরোধ করিলাম; ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যকলাপের ভার আমার উপর পড়িল। আটাশ দিন অবরোধ চলিবার পর সম্মুখ আক্রমণে দুর্গাধিকারের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে জণ্ড বাবু এবং লকবা আমার সহিত পরামর্শ করিলেন। আমি জানিতাম যে অবরুদ্ধগণের আহার্য্যদ্রব্য নিঃশেষিতপ্রায়, সে জন্য আমি উহঁাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; বলিলাম, যে-স্থান অনতিকালমধ্যে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে, তাহা অধিকারের জন্য বহুসংখ্যক মূল্যবান জীবন অকারণ বিপদের মুখে ফেলা অসমীচীন অপেক্ষাও অনুচিত কার্য্য হইবে। কিন্তু সে কথা শুনে কে? আমি যেটি এড়াইতে চাহিতেছিলাম, ঠিক সেই জিনিসটিই তাঁহারা ঘটাইতে চাহিতেছিলেন। দুই পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত মিটমাট সমানরূপে শূন্যগর্ভ ছিল। তাঁহারা নিজেরা বলি নির্ব্বাচন করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন অপব্যয় করা অপেক্ষা আর কিছু তাঁহাদের অধিকতর প্রিয় কার্য্য ছিল না। মেজর পলমানও উহঁাদের সহিত একমত হইয়াছিলেন এবং সম্মুখ আক্রমণে দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করা স্থির হইয়াছিল। ঐ কার্য্যভার ব্রিগেডের এবং অন্যান্য সেনাদলের যে অংশ সিন্ধিয়ার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল, তাহাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। ব্রিগেডের ৮০০ এবং অপর অংশের ২০০০ হতাহত লইয়া আমরা প্রতিহত হইয়াছিলাম। দুই দিন পরে দুর্গরক্ষী ৫০০০ রাজপুত ক্ষুধার তাড়নায় এবং অহিফেন সেবনে মরিয়া ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাদের পংক্তি ভেদ করিয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছিল; যাহারা তাহাদের বাধাদানে অগ্রসর হইবে সকলকারই প্রাণবধ করিবে বলিয়া জানাইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সাত বা আট শত ব্যক্তি বাস্তবিকই বাহির হইয়াছিল। পর্ব্বতের পাদদেশে উহারা সমূলে বিনিষ্ট হইয়াছিল; তথাপি এক প্রাণীও আত্মসমর্পণ করে নাই। এদিকে ব্রিগেড এই সময় পর্ব্বতের অপর পৃষ্ঠ অধিকার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। বারুদযোগে দুর্গের একটি বুরুজ চূর্ণ করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশলাভে সমর্থ হইয়াছিলাম।

* পাণ্ডুলিপিতে এই অংশে ছাড় দেখা যায়।

† পলমান জাতিতে ইংরাজ ছিলেন না। তিনি হ্যানোভার দেশের অধিবাসী জার্ম্মান ছিলেন। অবশ্য এ সময় ইংলণ্ডাধিপতিগণ হ্যানোভার রাজ্যেরও অধিকারী ছিলেন। মেবার রাজ্যে সাহপুরা হইতে ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত রাহাজ গড়ই বুরক্যার জজগড়। পলমান-প্রসঙ্গে তাঁহার এখানে সংঘটিত ভীষণ যুদ্ধে বিজয়লাভের কথা বলা হইয়াছে।—অনুবাদক

এক ঘণ্টা ধরিয়া হত্যাকাণ্ডের পর দুর্গরক্ষিগণের মধ্যে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের শিবিরে আনয়ন করা হইয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের প্রথা এই যে, অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিগণ, যাঁহারা বিজেতৃগণকে যুদ্ধ-ব্যয় বাবদ মুক্তি-পণ দিতে সমর্থ, সুধু তাঁহাদিগকে বন্দী করা হয়; সাধারণ সৈনিকগণকে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যাদিসহ যদিচ্ছা গমনের অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, উহাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইয়া তাহারা বিজেতৃপক্ষের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক যুদ্ধজয়ের সহিত তাহাদের সেনাদল পুষ্টিলাভ করে। এই ভাবেই এবং প্রতিমাসে ঠিক সময়ে সৈনিকগণকে বেতন দিয়া পের্ঁ তাঁহার বাহিনী ২০০০০ নিয়মিত অশ্বারোহী সেনায় এবং প্রতি ব্রিগেডে ৮০০০ করিয়া ৭টি ব্রিগেডে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে জর্জ্জ হেসিঙ্গের ব্রিগেডটিও ধরা হইয়াছে। পের্ঁ উহাঁর মাতৃস্বসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জজগড় অধিকার করিবার পর জগু বাবু এবং লকবা দাদা,—সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে শত্রু সৃষ্টি করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জয়পুরের রাজার সহিত বিরোধ বাধাইয়াছিলেন। উক্ত নৃপতির যুদ্ধক্ষম ৫০০০০ সৈনিক ছিল। তিনি আমাদের উপর নিপতিত হইয়াছিলেন এবং কুড়ি ক্রোশ পথ আমাদের তাড়া করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে আমরা তাঁহাকে যুদ্ধদানের জন্য থামিয়াছিলাম। জগু বাবু এবং লকবা দাদা ম্যঁসিয়ে দ্রেনেককে তাঁহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। হোলকারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর তিনি দাদার নিকট হইতে রামপুরা দুর্গ কিনিয়া তথায় নিজ ব্রিগেডসহ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কোটার রাজাও আমাদের দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের সর্ব্বসমেত ৪০০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল। একটি বৈঠক আহুত হইল, তাহাতে আমিও আমন্ত্রিত হইলাম। আমি যে যুদ্ধের প্ল্যান করিয়াছিলাম, তাহাই গৃহীত হইল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করার ভার আমাকেই দেওয়া হইল। আমি ইহাতে নিতান্ত বিব্রত বোধ করিলাম; কারণ, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমি এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে সেনা পরিচালনা করি নাই। কিন্তু উৎসাহ অভিজ্ঞতার অভাব পূর্ণ করিল। আমি বামপ্রান্তে দ্রেনেকের ব্রিগেড, কোটার দুইটি এবং লকবা দাদার দুইটি ব্যাটালিয়ন সন্নিবেশ করিয়া উহাদের উভয় পার্শ্বে জগু বাবু এবং লকবা দাদার অশ্বারোহীদিগকে রক্ষা করিলাম এবং দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের ব্রিগেড লইয়া স্বয়ং অবস্থিত রহিলাম; উহার দুই ব্যাটালিয়ন দ্বিতীয় লাইনরূপে আমি পিছনে রাখিয়া দিলাম এবং আমার পার্শ্বদেশ-রক্ষার ভার, যে অশ্বারোহীদলের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভর করিতে পারিতাম, তাহাদেরই উপর দিলাম। পরদিবস প্রত্যূষে আমরা এই ভাবে জয়পুরী সেনাদলের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। উহারা আমাদের নিকট হইতে চারি মাইল দূরে যুদ্ধার্থ সজ্জিত ছিল। আমাদের আগমন উহারা বুঝিতে পারার পূর্ব্বেই আমরা শত্রুসেনার পাল্লার মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমাদের মার্চ্চ করিবার শব্দ প্রাতঃকালীন নহবতের শব্দে ডুবিয়া যাওয়ায় উহারা তাহা শুনিতে পাইল না। কামান হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া আমাদের ব্রিগেড আক্রমণ করিল; বন্দুকধারিগণ পরে তাহাতে যোগ দিল। শত্রুসেনা ধীরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পাল্টা জবাব দিল। এক ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ যুদ্ধ চলিবার পর তাহারা আমাদের বামপ্রান্ত আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। যে অশ্বারোহী সেনাদলের উপর উহাদের আক্রমণের বেগ পড়িয়াছিল, তাহারা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দ্রেনেকের তোপখানা অধিকৃত হইয়া স্থানান্তরিত হইল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের ব্রিগেড অগ্রসর হইতেছিল। দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর উহারা রাজার পদাতিক দলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সমগ্র তোপখানা দখল করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহারা পরাক্রান্ত একদল প্রতিপক্ষীয় অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিতে বাধ্য হইল। দক্ষিণের ব্যাটালিয়নগুলি দৃঢ় মুষ্টিতে সঙ্গীণ ধরিয়া অচঞ্চলভাবে তাহাদের আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করিল। অচিরেই উহারা রণস্থলে বহু সংখ্যক হতাহত ফেলিয়া রাখিয়া উভরড়ে পলাইতে বাধ্য হইল। আক্রমণ

আরম্ভ হইবামাত্র রাজা স্বয়ং কতকগুলি অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। উহারা এই ধরণের কার্য্যে অভ্যস্ত ছিল। আমি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলাম না, কারণ আমার আর সওয়ার পল্টন অবশিষ্ট ছিল না। আমাদের বামপ্রান্তের বিপদ দেখিয়া দক্ষিণের দলও মহা ভয়ে উহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়াছিল। তিন ঘণ্টাকাল আমি স্থান ত্যাগ করিতে সাহস না করিয়া এক ভাবে অবস্থান করিলাম; ভয় ছিল পাছে শত্রুসেনা পুনরাক্রমণ করে। অবশেষে ব্রিগেডের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া আমাদের ছত্রভঙ্গ সৈনিকগণ চতুর্দ্দিক হইতে পুনরায় সমবেত হইতে আরম্ভ করিল এবং মহা গর্ব্বের সহিত রাজপুত শিবির দখল করিতে গেল। ঘটনাচক্র যেরূপ অনুকূল ভাবে আবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার সুযোগে আমি জগুবাবু এবং লকবা দাদার নিকট জয়পুরাধিপতির পশ্চাদ্ধাবন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম! কিন্তু সিন্ধিয়ার অস্ত্রসাফল্য পণ্ড করিবার তাঁহাদের যে পদ্ধতি ছিল তদনুসারে তাঁহারা উত্তর দিয়াছিলেন যে, রাজা একজন সাধুপ্রকৃতি লোক* এবং ঐ ধরণের লোক যখন পলায়ন করিতে চাহে, তখন তাহার অনুসরণ করিতে তাঁহাদের ধর্ম্মে নিষেধ আছে। রণভূমে নিদ্রা যাওয়ারূপ সম্মান ভিন্ন অপর কিছু আমরা এ যুদ্ধের ফলে লাভ করিতে পারি নাই। রাজার কামানসমূহ দুদ্রেনেকের ক্ষতিপূরণ করিয়াছিল। সুতরাং উভয় বাহিনীতে তোপখানা বদল ভিন্ন অপর কিছু হয় নাই।

কয়েক দিন পরে জগু বাবু এবং লকবা দাদা সংবাদ পাইলেন যে, ভাওবক্সী পুনরায় পুণাতে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের অনুচরবৃন্দসহ পলায়ন করিলেন। কয়েক জন মারাঠা সর্দ্দার, যাঁহারা সিন্ধিয়ার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি জেনারেল পেরঁর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিজেদের সৈন্যগণ লইয়া দ্বিতীয় ব্রিগেডের সহিত রহিলেন। পেরঁর আগমনের পর জয়পুররাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিল। অম্বাজী আবার রঙ্গভূমে দেখা দিলেন। দ্বিতীয় ব্রিগেডের দুইটি ব্যাটালিয়ন এবং ২৫০০০ উৎকৃষ্ট মারাঠা অশ্বারোহী সৈনিক তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। আমিও এই দলে ছিলাম এবং লকবা দাদাও জগু বাবুর অনুসরণে অম্বাজীকে যথাসম্ভব তৎপর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। প্রধান অংশ লইয়া পেরঁ সাহারাণপুর অভিমুখে ফিরিয়া গেলেন। দিল্লীর নিকটে তিনি জগু বাবু এবং লকবা দাদার অন্যতম প্রধান সহযোগী মির্জা ইমামবক্স শিখদিগের সাহায্যে যে ৪০০০০ সৈনিক সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এই সময় যখন মিশর এবং সন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপ মহৎ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবার এক সুদুর্লভ সুযোগ পেরঁর সম্মুখে দেখা দিয়াছিল। উক্ত প্রসিদ্ধ জনপদ সমূহে তখন ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক-পরিচালিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্যদল উপস্থিত ছিল। ইংরাজরা বোনাপার্ট, পেরঁ এবং টিপুর মধ্যে পত্রের আদান প্রদান বন্ধ করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অচিরেই এই অভিযানের খ্যাতি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছিল। কয়েকজন ফরাসী পেরঁর সহিত বোনাপার্টের অভিযান এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। তন্মধ্যে ফোর্ত্তিয়ে (fortier) নামক জনৈক উৎসাহশীল কর্ম্মঠ সৈনিক বোনাপার্টের নিকট পেরঁর কৃত প্রস্তাব লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। প্রহরীরূপে সুধু ৪ দল সৈনিক ঐ ব্যক্তি কামনা করিয়াছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পেরর নাম-মাহাত্ম্যেই পারস্যের অভ্যন্তর দিয়া পথ উন্মুক্ত হইত। সিরিয়া পৌছিতে তাহাকে শুধু পারস্য ও আফগান-জনপদের কিয়দংশ অতিক্রম করিতে হইত, কারণ শিখরাজ্য, যাহা প্রায় পারস্য দেশের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা পেরঁর করপ্রদ ছিল। শিখেরা, যাহাদের জনপদ নিতান্ত সমৃদ্ধিশালী ও উর্ব্বরা, যদি তাঁহাকে পারস্য অতিক্রম করিবার জন্য

* তাঁহার নাম প্রতাপ সিংহের না কি ইহাই অর্থ।

লোকজন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইত এবং জেনারেল বোনাপার্ট আলেকজাণ্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, —তবে তাঁহার মত ধ্বংসকারী বিজেতৃরূপে নহে, পরন্তু মুক্তিদাতারূপে,—ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেন, তবে তিনি এ দেশ হইতে চিরকালের মতই ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিতেন ; এক প্রাণীও আর এ দেশে থাকিত না এবং এই বিশাল দেশের অফুরন্ত ধনরাশি হইতে উহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া এসিয়া, ইউরোপ এবং সমগ্র পৃথিবীতে স্বাধীনতা, শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠা করিতেন।

এ সকল পরিকল্পনা কেবল যে অলীক স্বপ্ন ছিল তাহা নহে। পের্ঁ কুড়ি দিনের মধ্যে তিন লক্ষেরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষের সকল দেশীয় রাজাই ফরাসীদিগের হস্তক্ষেপের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজদিগের উৎকট শত্রু টিপু সাহেব তখনও জীবিত ছিলেন। সুধু পারস্য দেশটি পের্ঁকে অতিক্রম করিতে হইত। উহাও আবার দলাদলির প্রভাবে বহু স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল ; উহারা তাঁহার মিত্রতা অথবা আশ্রয়লাভে তৎপর হইত। পের্ঁ যাঁহার কর্ম্মনিরত ছিলেন,সেই সিন্ধিয়াও কোন মতে ফরাসীদিগের প্রতিকূলাচরণ করিতেন না। পরিকল্পনাটির কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একমাত্র পের্ঁর নিজের অভিপ্রায় ভিন্ন অপর কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষটিরই অভাব হইল। এ বিষয়ে যত প্রস্তাব তাঁহার নিকট করা হইয়াছিল কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্যমধ্যে আনিলেন না এবং টিপুকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে কিছুই করিলেন না। উক্ত নরপতি মহিমাময় নাম ও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু পের্ঁর অদৃষ্টের চিরকলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না। সে কথা যাক্, এক্ষণে আবার ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হোক। যখন … … … * উক্ত রাজ্যের অধিবাসী, চৌর্য্যবৃত্তি যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা, রাত্রিতে গুলিবারুদ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। মধ্যাহ্ন দুই ঘটিকার সময় আমি শত্রুসেনাকে দুই অংশে ভাগ করিয়া ফেলিবার জন্য আমার সৈন্যদলকে অগ্রসর করিলাম। পূর্ব্বোক্ত গণ্ডশৈলের বামপার্শ্বে এক সহস্র অশ্বারোহী ও দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী পাঠাইয়া দিয়া আমি স্বয়ং ছয় ব্যাটালিয়ন সৈন্য লইয়া দক্ষিণপ্রান্ত আক্রমণ করিলাম। সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল আমরা পিস্তলের গুলির পাল্লা যতদূর পাহাড়টির তত নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, কিন্তু তখন আমাদের ত্রিশটি তোপের মধ্যে মাত্র পাঁচটি গোলাবর্ষণোপযোগী ছিল ; সৈনিকগণের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। জর্জ্জ টমাসের ক্ষতির পরিমাণও ইহাপেক্ষা কম হয় নাই এবং আমাদের কাহারও পুনরায় আক্রমণ করিবার মত অবস্থা ছিল না ; সে জন্য আমরা উভয়েই যে যেখানে অবস্থিত ছিলাম, সেইখানে পরিখা কাটিয়া সুরক্ষিত করিয়া লইলাম। এইভাবে পরস্পরকে লক্ষ্য করিতে করিতে আমাদের দেড় মাস কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে প্রায় সব সময় উভয় দলের কামান যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। পরিশেষে পের্ঁর প্রেরিত সাহায্য পাইয়া আমার পক্ষে গণ্ডশৈলটি সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলা সম্ভব হইল। চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তখন টমাস স্বীয় অশ্বারোহীদলসহ হান্সিদুর্গে পলায়ন করিছিলেন ; তাঁহার তোপখানা, পদাতিক সেনা ও রসদাদি সবই আমাদের করায়ত্ত হইল। তাঁহার বলদগুলি আমাদের খুব উপকারে লাগিল। উহারা আমাদের বলদগুলি অপেক্ষা বলবান এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া আমাদের এ যাবৎ যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াও আমরা লাভবান হইয়াছিলাম। আমার ব্রিগেড পুনরায় সজ্জিত করিয়া আমি প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি কোয়েলে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং হান্সি যাত্রা করিলাম। সেখানে আসিয়া দেখিলাম যে, সমস্ত কূপ বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুধু দুইটি পুষ্করিণী ভিন্ন আর কোন জলশয় নাই ; তন্মধ্যেও আবার টমাসের আদেশে বহু বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন ঘৃণা মানে না। হিন্দু ও মুসলমান সকল সৈনিকই অষ্টাহকাল ধরিয়া অর্থাৎ যতদিন না তাহারা কূপগুলি পরিষ্কার করিতে পারিয়াছিল, ততদিন ঐ দূষিত জল পান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর আমি হান্সি অবরোধ করিয়া সম্মুখ আক্রমণে

* এইখানে পাণ্ডুলিপির চারি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না।

দুর্গ অধিকার করিলাম। কাপ্তেন বার্নিয়ে একটি গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইলেন। তিনি আমার ব্রিগেডের এগার জন ইউরোপীয় অফিসারের মধ্যে শেষ জীবিত ব্যক্তি ছিলেন, অপর দশজন জর্জ্জগড়ের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। জর্জ্জ টমাস, যিনি দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ২২ দিন পরে আত্মসমর্পণ করেন।* তাঁহাকে নিজ ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিসহ, যাহার পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকা ছিল, বৃটিশ রাজ্যমধ্যে রক্ষিগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি পরে বঙ্গদেশে গমন করেন, তথায় তিনি এক ইংরাজ মহিলার পাণিপীড়ন করেন এবং তিন মাসকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।†

এই অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তির দপ্তরমধ্যে আমি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার যে সকল পত্রব্যবহার হইয়াছিল, তাহা পাইয়াছিলাম। উহারা তাঁহাকে প্রশংসা এবং সাহায্যের দ্বারা তাঁহার উদ্যমসমূহের অনুসরণে উৎসাহিত করিয়াছিল এবং তিনিও তাঁহার পক্ষ হইতে অনতিকাল মধ্যে সমগ্র হিন্দুস্থানের আধিপত্য উহাদিগকে প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্য যে একেবারে সম্ভাবনার বাহিরে ছিল তাহা নহে, কারণ নৃপতিবর্গের মধ্যে টমাসের পক্ষভুক্তগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, উহারা তাঁহার স্বপক্ষে থাকার কথা সানন্দে ঘোষণা করিত, যেহেতু টমাসের কৃতিত্ব, সাহস এবং একনিষ্ঠতায় তাহারা মুগ্ধ ছিল; পক্ষান্তরে পের°র যথেচ্ছাচার তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

জর্জ্জ টমাসের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত শিখরা প্রতিশ্রুত তিন লক্ষ টাকা (নয় লক্ষ লিভ্র) প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের সর্দ্দারগণের অনুরোধে আমি রাজস্ব-গ্রহণের জন্য তাহাদের দেশে গমন করিয়াছিলাম। এ দেশের প্রথা এই যে, বেয়নেট ব্যবহার ভিন্ন রাজকর আদায় হয় না। মোট সাত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। জেনারেল পের°র যাহা প্রাপ্য ছিল, তাহা উহারা আমার নিকট দিল, সে টাকা আমি তাঁহাকে ঠিক ঠিক পাঠাইয়াছিলাম। বক্রী অর্থ উহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল, তাহাদের সৈন্যদলের সংরক্ষণ ও বেতনে উহা ব্যয় হইল। এই অভিযানে আমি লাহোর এবং কাশ্মীর জনপদের প্রান্তে শতদ্রুনদীর তটভূমি অবধি পৌছিয়াছিলাম। এই সময় চারিজন সন্নিকটবর্ত্তী নৃপতি পের°র মিত্রতা ও আশ্রয় কামনা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। উঁহার নাম এসিয়ার সুদূরতম রাজ্যসমূহেও পৌছিয়াছিল। উহাদের সকলে আমাকে তাঁহাদের রাষ্ট্রমধ্যে গমন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে, কেহ নব নব বিজয়ে, কেহ বা আবার বক্রী রাজকর আদায় করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। নবতিপর বৃদ্ধ শিখসর্দ্দার তারাসিংহ শেষোক্ত দলে ছিলেন। তাঁহার রাজ্য, যাহার রাজধানীর নাম ছিল রাহোর্ণ, শতদ্রু নদীর উভয়তটে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রভূত ধনসম্পত্তি ব্যতীত তাঁহার ৬০০০০ অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। তাঁহার রাজ্য হইতে বক্রী কর আদায় করিবার জন্য আমার ব্রিগেডকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব তিনি আমার নিকট করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য আমাকে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন।‡

* লেখকের নিকট উক্ত আত্মসমর্পণ-পত্র আজিও রক্ষিত আছে।

† বুরকীঁয়ার এ কথা কিন্তু সত্য নহে।—অনুবাদক।

‡ দলবালা মিশলের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত তারাসিংহ ঘইবা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক বিশদ বিবরণ "Gazetteer of the Jullunder District" (1904) গ্রন্থে দেখিতে পারেন। জালন্ধর, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, আম্বালা ও লুধিয়ানা জেলার অধিকাংশ উহাদের অধিকারে ছিল। উক্ত গ্রন্থের মতে উহাদের সৈন্যসংখ্যা সাত হইতে আট হাজারের মধ্যে ছিল। বুর্কীঁয়া প্রদত্ত সংখ্যা নিতান্ত অতিরঞ্জিত।

আলোচনা

দ্বারকা বা দ্বারাবতী

। বলিলেন, "হে মহাভাগ সমুদ্র! আমাকে শত যোজন পরিমিত স্থল দাও, আমি তোমায় পরে নিশ্চয়ই ঐ পরিমিত স্থান দিব। 'হে সমুদ্র মহাভাগ স্থলঞ্চ শতযোজনং, দেহি মে নগরার্থং পশ্চাদ্দাস্যামি নিশ্চিতং' "

ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলে তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন—

'নগরং কুরু মে হো কারো ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং। রমণীয় সর্ব্বাং কমনীয় যোষিতাং॥ বাঞ্ছিতঞ্চাপি ভক্তানাং। বৈকুণ্ঠসদৃশং পরাণাং। সর্ব্বেষামপি স্বর্গং পরং পরমভীপ্সিতং।' ত্রিভুবনের দুর্লভ, রমণীগণের মনোমুগ্ধকর ও সকল প্রকারে রমণীয় ভক্তগণের বাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠসদৃশ ঐ নগর নির্ম্মাণ করিতে ভগবান্ আদেশ দিলেন। ভগবান্ আরও বলিলেন, 'শতযোজনপর্য্যন্তং নগরং সুমনোহরং' অর্থাৎ নগরটি হইবে শতযোজনবিস্তৃত ও সুমনোহর। 'পদ্মরাগৈর্ম্মরকতৈরিন্দ্রনীলৈ রঘুত্তমৈঃ॥…সূর্য্যকান্তাদিভিশ্চৈব পুষ্পৈশ্চ স্ফটিকা-কৃতৈঃ। হরিদ্বর্ণৈশ্চ মণিভিঃ শ্যামৈ গৌরমুখৈশ্চ বৈ। গোরচনাভৈঃ পীতৈশ্চ দাড়িম্ববীজরূপকৈঃ। পদ্মবীজনিভৈশ্চৈব নীলৈঃ কমলবর্ণকৈঃ। মণিভিঃ কজ্জলাকারৈরুজ্জ্বলৈশ্চ পরিষ্কৃতৈঃ॥ শ্বেতচম্পকবর্ণাভৈস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভৈঃ॥ স্বর্ণমূল্যশতগুণৈরীষদ্রক্তৈশ্চ রূপকৈঃ॥ গরিষ্ঠৈশ্চ বরিষ্ঠৈশ্চ মণিশ্রেষ্ঠৈশ্চ পূজিতৈঃ॥' অর্থাৎ যত প্রকার বর্ণের মণি হইতে পারে তত প্রকার বর্ণের মণি দ্বারা যাহাতে ঐ স্থান সুশোভিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন।—আরও বলিলেন, 'কুরু দিব্যঞ্চ পত্নীনাং সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ। অন্যপত্নীজনস্যাপি চাষ্টাধিকশতস্য চ।' অর্থাৎ ষোল হাজার দিব্য পত্নী ঐ নগরীতে থাকিবে ও ইহা ব্যতীত ১০৮ অন্য পত্নীও থাকিবে।

আবার—

'শিবিরং পরিখাযুক্তমুচ্চৈঃ প্রাকারবেষ্টিতং। যুক্তং দ্বাদশসারঞ্চ সিংহদ্বার-পুরস্কৃতং।' ইহার শিবিরের প্রাকারগুলি উচ্চ হইবে ও সিংহদ্বার ছাড়া দ্বাদশটি দ্বার সারি সারি ভাবে থাকিবে।

আরও বলিলেন—

'আশ্রমং সর্ব্বতোভদ্রং বসুদেবস্য মৎপিতুঃ। কথিতং লোকশিক্ষার্থং কুরু কাষ্ঠং বিনা পুরীং।' এই পুরী কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে না, ইহাও বলিয়া দিলেন।

পুনরায় বলিলেন—

'তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যাং রত্নানাঞ্চ পরিষ্কৃতাং।' সূর্য্যতেজ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে। সুন্দর স্বচ্ছ রত্নাদি দ্বারা সুশোভিত হইবে।

এইরূপ সহরের নাম হইবে দ্বারকা ও ইহা হইবে, 'সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা। যস্যাং প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনং।' ইহা হইবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, ইহাতে প্রবেশ করিলেই দেহীর জন্ম খণ্ডন হইবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ)

সদাই শোনা যায় সাধুরা ষট্‌চক্র ভেদ করেন। কিন্তু এই ষট্‌চক্রটি কি তাহা অনেকেই জানেন না; অথচ অনেকেই কথায় কথায় বলিয়া থাকেন ষট্‌চক্রভেদ, ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে সামান্য সামান্য একটু আলোচনা করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না, কারণ, তাহা হইলে অন্তর্জগতের দ্বারকার অল্প আভাষ পাওয়া যাইবে। আমাদের শরীরের পশ্চাৎ দিকে শির-দাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে। এই মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটি নাড়ী আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্ণা। ব্রহ্মনাড়ী, চিত্রানাড়ী ইত্যাদিও আছে, সে সকলের কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিবার অসুবিধা করিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, এই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্ণার অন্যনামও আছে: যেমন ইড়াকে গঙ্গা বলা হয়, পিঙ্গলাকে যমুনা ও সুষুম্ণাকে সরস্বতী বলা হয়। এই তিনটি নাড়ীকে কেবল যে মেরুদণ্ডের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে, ইহা-দিগকে গলা বা কণ্ঠ ছাড়াইয়া জ্রদ্বয়ের পশ্চাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আবার সুষুম্ণাটি অল্প বাঁক দিয়া (সহজে নজরে আসে না) একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছেন; আবার প্রথমটি অর্থাৎ ইড়াটি ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে জলপ্রপাতের মত পতিত হইয়া ঐ জ্রদ্বয়ের পশ্চাতে সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাই দেখা যায়।

যেখানে ঐ তিনটি নাড়ী প্রথম মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ জ্রদ্বয়ের পশ্চাতে, তাহাকে প্রয়াগ বলে ও যোগী সাধকেরা ঐ স্থান ও তৎসংলগ্ন স্থানকে আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদল বলেন। এই আজ্ঞাচক্র হইতে তিনটিই নীচের দিকে,—যাহাকে বলা হয় শরীরের দক্ষিণ দিকে—নামিয়াছে। এই তিনটির মধ্যে সুষুম্ণা নামিয়াছে সোজা সরল রেখার ন্যায়, নীচের দিকে, ও অপর দুইটি ইড়া ও পিঙ্গলা, নামিয়াছে আঁকিয়া বাঁকিয়া, যেন মাথার তিনটি বেণীগুচ্ছের মধ্যে একটি মধ্যে চলিয়াছে ও অপর দুইটি গুচ্ছ প্রথমটির অর্থাৎ সুষুম্ণার একবার এপাশ অন্যবার ওপাশ করিয়া চলিয়াছে। যে যে স্থলে তাহারা মিশিয়াছে সেই সেই স্থলে একটি করিয়া পদ্ম আছে। ঐ পদ্মকে এক একটি চক্র বলে। প্রথম পদ্মটির নাম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আজ্ঞাচক্র; দ্বিতীয়টির নাম—কণ্ঠের কাছে বিশুদ্ধাখ্য; তৃতীয়টির নাম—বুকের পশ্চাতে অনাহত; চতুর্থটির নাম—নাভির পশ্চাতে মণিপুর; পঞ্চমটির নাম—নাভির নিম্নে—স্বাধিষ্ঠান ও সর্ব্বনিম্নে ষষ্ঠটি মেরুদণ্ডের আধারস্বরূপ হইয়া আছে; ইহার নাম সেই জন্য মূলাধার। এই ছয়টি চক্র ছাড়া আরও তিনটি চক্র আজ্ঞাচক্রের উপরে আছে, তাহাদের নাম (১) ললনাচক্র, (২) মনশ্চক্র, (৩) সোমচক্র; চতুর্থ চক্রটি সর্ব্বোপরি আছে যাহার নাম সহস্রার। এই সহস্রার পদ্মটি উপরের ব্রহ্মবিন্দু হইতে যেন সুষুম্ণা নাড়ীরূপ লতা হইতে নীচের দিকে মুখ নীচু

করিয়া একটি 'উল্টান' বাটীর মত (?) ঝুলিতেছে, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র হইতেছে ঐ পদ্মটির 'বোঁটা'।

সহস্রার অর্থে স্বতঃই মনে হয় 'হাজার পাপড়ীবিশিষ্ট একটি পদ্ম'। এই পাপড়ীগুলি ২০টি দলে সন্নিবেশিত, কাজেই এক এক দলে পঞ্চাশটি করিয়া পাপড়ী আছে। প্রতিদলের পাপড়ীগুলিতে পঞ্চাশটি করিয়া মাতৃকাবর্ণ আছে—'অ' হইতে 'ক্ষ' অবধি অক্ষরকে মাতৃকাবর্ণ বলা হয়। এই বিশটি দলকে আবার বিভক্ত করা যায়—সর্ব্বনিম্ন হইতে ধরিলে প্রথম তিনটি দল, বর্ণ নীল বড়ির মত নীল, যথাক্রমে গাঢ়তম, গাঢ়তর ও গাঢ়; তদুপরি দ্বিতীয় তিনটি দল, বর্ণ নীল (আকাশের মত) যথাক্রমে গাঢ়তম, গাঢ়তর, গাঢ়; তদুপরি তৃতীয় তিনটি দল, বর্ণ সবুজ, যথাক্রমে গাঢ়তম, গাঢ়তর, গাঢ়; তদুপরি চতুর্থ তিনটি দল, বর্ণ বেগুণে, যথাক্রমে গাঢ়তম, গাঢ়তর, গাঢ়; তদুপরি পঞ্চম তিনটি দল, বর্ণ লাল, যথাক্রমে গাঢ়তম, গাঢ়তর ও গাঢ়; তদুপরি ষষ্ঠ তিনটি দল, বর্ণ কমলা নেবুর মত, যথাক্রমে গাঢ়তম, গাঢ়তর, গাঢ়। তদুপরি শেষ সপ্তম থাকে দুইটি মাত্র দল, বর্ণ হরিদ্রা বা হলুদের মত, যথাক্রমে গাঢ়তর, ও গাঢ়; সর্ব্ব উপরে শ্বেত-স্বচ্ছ অতীব উজ্জ্বল, সহস্রসূর্য্য প্রভাবিশিষ্ট কিন্তু চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ ব্রহ্মবিন্দু। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সর্ব্বসমেত ৬×৩+২×১=২০টি থাকে ঐ দলগুলি আছে। প্রতি থাকে ৫০টি করিয়া পাপড়ী আছে; একুনে ২০×৫০, এক হাজার বা এক সহস্র পাপড়ী আছে। এই এক সহস্রদল বা পাপড়ীবিশিষ্ট পদ্মকে সহস্রার বলা হয়। প্রতি পাপড়ীতে এক একটি মাতৃকাবর্ণ আছে। প্রতিদলের যে বর্ণ উহাতে অবস্থিত মাতৃকাবর্ণও তদ্বর্ণবিশিষ্ট; কিন্তু প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণই অতি উজ্জ্বল ছটা বা প্রভা বা কিরণবিশিষ্ট। পাপড়ীগুলি হইল পূর্ব্বোক্ত নীল পদ্মরাগ ইত্যাদি মণি, মাতৃকাবর্ণগুলি হইল নারী বা পত্নী। ব্রহ্মবিন্দুই তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যাং ইত্যাদি বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

এই সহস্রারের নিম্নে নিরালম্বরূপে অর্থাৎ অবলম্বনহীন অবস্থায় একটি দ্বাদশদলপদ্ম আছে, অর্থাৎ ঐ পদ্মে দ্বাদশটি পাপড়ী আছে। প্রতি পাপড়ীতে একটি করিয়া মাতৃকাবর্ণ আছে। এই পদ্মটি নিরালম্বপুরী নামে সাগরের উপর ভাসিতেছে। এই পদ্মই হইতেছে বৈকুণ্ঠসদৃশ ভগবানের পৃথিবীস্থ দ্বারকাপুরী। বারটি পাপড়ী হইতেছে বারটি দ্বার, কাজেই ঐ নগরের নাম হইল দ্বারাবতী অর্থাৎ দ্বারবিশিষ্ট নগরী। তোরণদ্বার হইতেছে ঠিক কেন্দ্রস্থলে। সাধক যখন কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধার হইতে কেবলীমুদ্রা সহযোগে উপরে উঠেন, তখন তিনি এই তোরণদ্বার দিয়াই ঐ দ্বারকায় প্রবেশ করেন। মাতৃকাবর্ণগুলি হইতেছে যেন বারটি দ্বারপাল।

এই দ্বাদশ দলের উপরে পরমব্রহ্মদেব বরাভয়রূপে উপবিষ্ট আছেন। এই পরমব্রহ্মই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষির্ভূবাচকো শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরমব্রহ্মে কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

এই কৃষ্ণে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও ফলে নিবৃত্তি অথবা ইনিই পরমব্রহ্ম। এই কৃষ্ণই অন্তর্জ্জগতের দ্বারকায় মণিময়খচিত মণ্ডপের তলে দ্বাদশ দলবিশিষ্ট আসনের উপরে দ্বাদশটি দ্বার ও তোরণদ্বারবিশিষ্ট পুরীতে, শুভ্রোজ্জ্বল নরনারায়ণ তেজোবিশিষ্ট ব্রহ্মরন্ধ্রের তলে বসিয়া আছেন। এই অন্তর্জ্জগতের দ্বারকা সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে, যেন একটি দ্বীপ। আজকালকার দ্বারকা সমুদ্রতীরে অবস্থিত; পূর্ব্বে এই দ্বারকা ছিল আধুনিক দ্বারকার সন্নিকটে সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে, যাহা কোনও কারণে মহামারীতে ধ্বংস হইয়া ভূমিকম্পে সাগরতলে চলিয়া গিয়াছে।

স্বাধিষ্ঠানের বা রসতত্ত্বের অধিপতি হইতেছেন নকুল। নকুলের স্থান হইতেছে শরীরের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে। যে সময়ে চারিটী পাণ্ডবভ্রাতা দিগ্বিজয়ে নির্গত হন, নকুলের উপর পশ্চিম দিক্ জয় করিবার ভার পড়িয়াছিল। তিনি দ্বিদলস্থ স্কন্ধাবারে থাকিয়াই দ্বারকা জয় করিতে যান ও যদুবংশীয়েরা আনন্দে যুধিষ্ঠিরকে কর দিতে স্বীকৃত হন। দ্বারকাও ভারতবর্ষের পশ্চিমেই অবস্থিত। দ্বাদশদল কমলই হইতেছে অন্তর্জ্জগতের দ্বারকা পুরী।

—শ্রীশরদিন্দু রায়

ব্যর্থ

—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জীবনেরে মাঝে মাঝে প্রদানি ধিক্কার!
এ মোর মানব-জন্ম—কোন্ অর্থ তার,—
কোন্ সার্থকতা? শুধু চক্রনেমি প্রায়
অবিশ্রাম ঘুরাইবে তুমি কি আমায়—
হে অদৃশ্য বিশ্বের পালক? তারপর
মৃত্যু এসে করে দিবে নিশ্চল নিথর
তুহিন-শীতল মোর এই দেহখানি।
তারপর?—অন্ধকার! কিছু নাহি জানি
এর লাগি' এ জীবন—চির চঞ্চলতা—
এই ক্ষিপ্ত হাহাকার—মত্ত ব্যাকুলতা
অহর্নিশ? ব্যর্থ তবে রক্ত-মাংসভার,
সার্থকতা নাহি যদি মানব-আত্মার!

বায়ুমণ্ডল

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

আমরা নিরন্তর বায়ুমণ্ডলে ডুবিয়া রহিয়াছি, সুতরাং বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে কৌতূহল নিতান্তই স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্রীকগণই প্রথমে বায়ু সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা আরম্ভ করেন, কিন্তু এতকাল গত হওয়া সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি বিভিন্ন মতে ভূপৃষ্ঠ হইতে ২০০ হইতে ৫০০ মাইল পর্য্যন্ত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সামান্য কয়েক মাইল উপরেই বায়ুর বিরলতা এত অধিক যে, ঐ সকল অংশ প্রায় বায়ুশূন্য বলা চলিতে পারে।

সমগ্র বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ভূমি হইতে অল্পাধিক ৭ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে ঝটিকামণ্ডল বা 'ট্রপোস্ফিয়ার' (tropcsphere) এবং তদূর্দ্ধে আরও প্রায় ৩০ মাইল উচ্চ স্তরকে স্তরমণ্ডল বা 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার' (stratosphere) বলা হয়। ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ঝটিকমণ্ডলের মধ্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও কমিয়া যায়, কিন্তু ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে এই নিয়ম খাটে না এবং ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরের উচ্চতা-বৃদ্ধির সহিত উত্তাপ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি পায়।

বেতার-তরঙ্গ লইয়া পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৫-৩৫ মাইল উচ্চে 'কেনেলী-হিভিসাইড' স্তর নামে একটি বিদ্যুৎ-পরিচালক স্তর আছে। রাত্রিকালে এই স্তরের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, দিবাভাগে ঐ স্তরের গ্যাসসমূহের উপর সূর্য্যের আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মির ক্রিয়ায় গ্যাসের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকার সৃষ্টি হয় এবং আবিষ্ট কণিকাগুলিই বিদ্যুৎ-পরিচালনার সহায়তা করে। কিন্তু রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মির ক্রিয়া হইতে পারে না, কাজেই ঐ স্তরে এমন কোন বস্তু এরূপ অবস্থায় আছে যে, উহা সহজেই বিদ্যুতের পরিচালক হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ স্থানে ওজোন গ্যাস বর্ত্তমান আছে। ওজোন ভাঙ্গিয়া গিয়া বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকার সৃষ্টি হইতেছে এবং এই কণিকাগুলিই বিদ্যুৎ-পরিচালনের সহায়তা করে।

মেরুজ্যোতির বর্ণচ্ছত্রের ফটোগ্রাফ তুলিয়া বহু উচ্চ স্তরের বায়ুর উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বহু উচ্চে অক্সিজেন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নিয়ন ও নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। ঝটিকামণ্ডলে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির যে অনুপাত দেখা যায়, উচ্চতর স্তরে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে।

বর্ত্তমানে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরের মধ্য দিয়া বিমান চালনার পরিকল্পনা চলিতেছে এবং এ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রাথমিক চেষ্টাও চলিতেছে। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এই দিক্ দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। আবহবিদ্যার প্রসার ও নির্ভরযোগ্যতাও বায়ুমণ্ডলের জ্ঞানের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বেতার-তরঙ্গের প্রচলন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বায়ুমণ্ডলের সকল তথ্য আলোচিত হয় নাই; প্রধানতঃ ঝটিকামণ্ডলের বায়ুর রাসায়নিক তথ্য সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অবশ্য, বায়ুমণ্ডলের সম্পূর্ণ জ্ঞান কেবলমাত্র রসায়নেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না, উহার আরও বহু দিক্ রহিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল তথ্য আলোচিত হওয়া সম্ভব নহে।

পৃথিবীর উপরিতন স্তরই ইহার শেষ সীমা নহে, অর্থাৎ পর্ব্বতচূড়া ও সমুদ্রবক্ষ পৃথিবীর প্রকৃত পরিধির পরিমাণ নহে। ইহার উপরে বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীরই অংশ। বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না ও পৃথিবীর সহিতই নিরন্তর ঘুরিতেছে।

বায়ুমণ্ডল যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। পৃথিবী হইতে পাঁচ ছয় শত মাইল উর্দ্ধে সুমেরু-জ্যোতি (aurora borealis) দৃষ্ট হয়। উহা বায়ুমণ্ডলের কতকগুলি অতি বিরল গ্যাসের উপর ইলেক্ট্রনের

ক্রিয়ার ফল, সুতরাং বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি অতদূর উচ্চেও বর্ত্তমান, তবে তথায় বায়ুচাপ অত্যন্ত কম। বায়ু যে কেবল পৃথিবীর ঊর্দ্ধেই বর্ত্তমান আছে তাহা নহে, ইহার নীচেও বায়ু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, কূপজল ইত্যাদি যে সমস্ত জল স্বভাবতই পাওয়া যায়, তাহাতে দ্রবীভূত অবস্থায় বায়ু থাকে। ঐ জল গরম করিলেই দ্রবীভূত বায়ু বাহির হইয়া আসে।

বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি পৃথিবীর অশেষ হিতসাধন করে। ·গুলি না থাকিলে দিবাভাগে সূর্য্যতাপে সমস্ত পৃথিবী অত্যন্ত তপ্ত হইয়া উঠিত ও রাত্রিতে সূর্য্যতাপের অভাবে হিমশীতল ইয়া যাইত সুতরাং জীবনধারণ করা সম্ভব হইত না। বায়ু-গুলের গ্যাসগুলি সূর্য্যতাপের কিয়দংশ শোষণ করিয়া লইয়া বসের উত্তাপ কমাইয়া দেয় ও রাত্রে ঐ উত্তাপ বিকিরণ রিয়া শৈত্য কমাইয়া দেয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, মনীষী রবার্ট বয়েল (Robert oyle) বলিয়াছিলেন যে, বায়ু বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ণিকার দ্বারা গঠিত। ঐ কণিকাগুলি সর্ব্বদাই অত্যন্ত গে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। সেই জন্য এই বিভিন্ন ব্যগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। এই মিশ্রণের লে বায়ু একটি অখণ্ড পদার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ, ত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সংমিশ্রণজাত পদার্থ পৃথিবীতে আর াছে কি না সন্দেহ। বয়েলের এই কথা হইতেই মনে হয় , বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে; ইহা কয়েকটি গ্যাসের সংমিশ্রণ ত্র। আজকাল এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। ৌগিক ও মিশ্রণের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, বিভিন্ন ান হইতে সংগৃহীত একই যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ রিলে দেখা যায় যে, উহাতে যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ াছে, সেইগুলির ভারের অনুপাতে তারতম্য নাই। া, পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া জল শ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ৯ ভাগ জলে, ১ ভাগ াইড্রোজেন ও ৮ ভাগ অক্সিজেন আছে, অর্থাৎ জলের $\frac{1}{9}$ অংশ াইড্রোজেন ও $\frac{8}{9}$ অংশ অক্সিজেন। মিশ্রণে যে মৌলিক দার্থগুলি থাকে, তাহাদের আনুপাতিক পরিমাণ সর্ব্বদাই ক থাকে না। বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত বায়ুর বিশ্লেষণ রিয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়ুতে বর্ত্তমান পদার্থগুলির ভারের আনুপাতিক পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই, সামান্য পার্থক্য আছে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, বায়ু একটি মিশ্রণ মাত্র, যৌগিক পদার্থ হইতেই পারে না।

বায়ুতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস থাকে। ইহা ব্যতীত সামান্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আর্গন, হিলিয়ম, নিয়ন্, জেনন্, ক্রিপ্টন্, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড, এমোনিয়া এবং নাইট্রিক অম্ল আছে। ধূলিকণা ও জীবাণুও বায়ুতে বর্ত্তমান থাকে।

১০০ ঘন ফুট বায়ুতে বর্ত্তমান, বিভিন্ন পদার্থগুলির পরিমাণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

অক্সিজেন	২১ ঘনফুট
নাইট্রোজেন	৭৮ „
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	০·০৩
আর্গন ...	০·৯৩
হিলিয়ম, নিয়ন্, জেনন্, ক্রিপ্টন্, হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড, হাইড্রোজেন, এমোনিয়া ও নাইট্রিক অম্ল ...	লেশমাত্র
জলীয় বাষ্প ...	পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সুইডেনবাসী রাসায়নিক শেলে (Scheele) অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাসায়নিক প্রিষ্ট্‌লি (Priestley) লাল পারদ অক্সাইড উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন গ্যাস প্রাপ্ত হন। প্রিষ্ট্‌লি তাঁহার পরীক্ষার ফল শেলের পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে অক্সিজেনের আবিষ্কর্ত্তা বলা হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, বায়ু অপেক্ষা অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে দহনক্রিয়া অনেক অধিক উজ্জ্বলভাবে সম্পাদিত হয়। ইঁদুর এই গ্যাসের মধ্যে অনেক ভালভাবে বাঁচিতে পারে। তিনি নিজেও এই গ্যাস প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া, স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক সুস্থ বোধ করেন। প্রিষ্টলির অক্সিজেন আবিষ্কারের কয়েক বৎসর পরে ফরাসী রাসায়নিক লাভোয়াজিয়ে (Lavoisier) বায়ু বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে অক্সিজেনের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন। অক্সিজেনের বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ নাই। বায়ুর ভারের $\frac{1}{5}$ অংশ ও জলের ভারের $\frac{8}{9}$ অংশ অক্সিজেন। পৃথিবীর উপরিতন স্তরের প্রায়

অর্দ্ধাংশ অক্সিজেন। জল ও পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে অক্সিজেন অন্যান্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় আছে। জীবনধারণের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। বায়ু হইতে প্রশ্বাসের সহিত এই গ্যাস লইয়াই জীবগণ জীবিত থাকে। মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন জলের ভিতর হইতে গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে। বায়ুতে অক্সিজেন আছে বলিয়াই ইহার মধ্যে দহনক্রিয়া সম্ভব হয়। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যে দহনক্রিয়া আরও উজ্জ্বলভাবে সম্পাদিত হয়। একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি প্রায় নির্ব্বাপিত করিয়া বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে লইলে উহা পুনরায় উজ্জ্বলভাবে জলিয়া উঠে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অক্সিজেনের পরিমাণে অতি সামান্যই পার্থক্য হয়। বিভিন্ন স্থানের বায়ুতে শতকরা ২০.৬ ভাগ হইতে ২১ ভাগ পর্য্যন্ত অক্সিজেন পাওয়া গিয়াছে।

উচ্চস্তরের বায়ুতে সাধারণ অক্সিজেন গ্যাস অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট আর এক প্রকার গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে ওজোন বলা হয়। এই গ্যাসও অক্সিজেন পরমাণুদ্বারাই গঠিত, তবে অক্সিজেন গ্যাসের এক একটি অণু দুইটি পরমাণুদ্বারা গঠিত, ওজোনের এক একটি অণু তিনটি অক্সিজেন-পরমাণুদ্বারা গঠিত। ওজোন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসের ন্যায় গন্ধহীন নহে; ইহার একটি বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ আছে। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বায়ুর মধ্যে দিয়া যাইলে বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস হইতে কিঞ্চিৎ ওজোন প্রস্তুত হয়। অক্সিজেনের মধ্যে ফস্‌ফরাস্ দহন করিলেও এই গ্যাস প্রস্তুত হয়। ওজোন অত্যধিক ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট। বায়ুতে যে সকল জীবাণু ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারা ওজোনের সংস্পর্শে আসিলেই বিনষ্ট হয়। উচ্চস্তরের বায়ুতে ওজোন বেশী আছে বলিয়া তথাকার বায়ু নিম্নস্তরের বায়ু অপেক্ষা বিশুদ্ধ। ওজোনের এই জীবাণু-ধ্বংসকারী গুণের জন্য ইহা লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় সহরে জল ও বায়ু বিশুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে ফান হেল্‌মণ্ট (Van Helmont) বায়ু হইতে সর্ব্বপ্রথম কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বা অঙ্গারক বাষ্প প্রাপ্ত হন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যাক্ (Black) এই গ্যাসকে "gas sylvestre" নামে অভিহিত করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনিই সপ্রমাণ করেণ যে, অঙ্গারের সহিত অক্সিজেনের সংযোগে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ নাই। ইহা বায়ু অপেক্ষা প্রায় ১½ গুণ ভারী। বায়ুতে অঙ্গার দহন করিলে এই গ্যাস প্রস্তুত হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দেহের কোষে সংযুক্ত অবস্থায় অঙ্গার আছে। প্রশ্বাসের সহিত যে অক্সিজেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা ঐ কোষগুলির অঙ্গারের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে। নিঃশ্বাসের সহিত এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া আসে। দেহকোষের অঙ্গারের সহিত অক্সিজেনের সংযোগ রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রাসায়নিক ক্রিয়া উত্তাপ উৎপাদন করে। দেহের উত্তাপের ইহাই কারণ।

অনেক স্থানে মৃত্তিকার ভিতর হইতে এই গ্যাস বাহির হইতে দেখা যায়। যে সকল স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে, তথা হইতে আরও অধিক পরিমাণে এই গ্যাস নির্গত হইতে দেখা যায়। এই গ্যাস জলে দ্রবণীয়, সুতরাং দ্রবীভূত অবস্থায় জলেও ইহা বর্ত্তমান থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রস্তর, শিলা ইত্যাদির উপর এই দ্রবণের ক্ষয়কারী ক্রিয়া আছে।

বৃক্ষের সবুজ পত্রগুলি বায়ু হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। সবুজপত্রে যে পত্রহরিৎ বা 'ক্লোরোফিল' আছে, তাহা এই গ্যাস বিশ্লিষ্ট করে ও ইহা হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে। নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা এই অঙ্গার হইতে উদ্ভিদ-দেহে অনেক প্রকার জটিল পদার্থ উৎপন্ন হয় ও প্রাণীরা এই সকল পদার্থ ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। কেবলমাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে রাখিলে কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না, শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী দিবাভাগে যে উত্তাপ গ্রহণ করে, বায়ুতে বর্ত্তমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড সেই উত্তাপ পুনর্বিকিরণে বাধা দিয়া রাত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপ রক্ষা করে। আরেনিয়ুস (Arrhenius) গণনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বায়ুমণ্ডলের সমস্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড যদি কোন উপায়ে অপসারিত করা যাইত, তবে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপ বর্ত্তমান তাপ অপেক্ষা ২১° সেন্টিগ্রেড কম হইয়া যাইত।

পরিষ্কার চুণের জলের ভিতর দিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালনা করিলে ঐ জল সাদা হইয়া যায়। একটি কাচের নলের একদিক মুখে দিয়া অপরদিক পরিষ্কার চুণের জলে ডুবাইয়া মুখ দিয়া ঐ জলের ভিতরে নিঃশ্বাস চালনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ জল সাদা হইয়া যায়। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে নিঃশ্বাসের সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হইতেছে।

মুক্ত বায়ুতে প্রায় সকল স্থানেই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সমান থাকে, কিন্তু যে সকল শহরে অধিকসংখ্যক কারখানা আছে সেখানে, কিংবা রঙ্গালয় প্রভৃতি বহুজনাকীর্ণ স্থানের বায়ুতে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নাইট্রোজেন গ্যাসের বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ নাই। ইহা কোন পদার্থের সহিত সহজে সংযুক্ত হয় না। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইলে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহা হইতে নাইট্রোজেন-অক্সাইড প্রস্তুত হয় ও তৎপরে জলীয় বাষ্পের সংযোগে নাইট্রিক অম্ল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত অবস্থায় নাইট্রিক অম্ল পৃথিবীতে পতিত হয় ও নানা প্রকার পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া কোন কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় এবং নাইট্রেট উৎপাদন করে। এই সকল নাইট্রেট জলে দ্রবীভূত হইয়া মৃত্তিকায় শোষিত হয় ও তথা হইতে উদ্ভিদ্ নাইট্রেট গ্রহণ করে। উদ্ভিদের পক্ষে নাইট্রেট অত্যাবশ্যক। মটরশুটি, সিম প্রভৃতি এক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ আছে, যাহাদের উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ legumimous plants বলেন, কেবল তাহারাই বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করিতে পারে; ইহা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর উদ্ভিদেরা নাইট্রেট হইতেই আবশ্যকীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

আর্গন, হিলিয়ম, জেনন্ এবং ক্রিপ্টন্ অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ইহারা কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় না। স্যর উইলিয়ম র‍্যামজে (Sir William Ramsay) বায়ু হইতে এই গ্যাস গুলি পৃথক্ করিয়াছিলেন। বরফের তাপ অপেক্ষা আরও ১৯০° সেণ্টিগ্রেড ঠাণ্ডা করিলে বায়ু তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অত্যধিক শীতল করা অন্য উপায়ে সম্ভব হয় না বলিয়া বায়ু তরল করিবার নিমিত্ত উহা প্রবল চাপবশে একটি নলের ভিতর চালিত করা হয়। তৎপর এই বায়ু প্রসারিত হইতে দেওয়া হয়। এই প্রসারণের ফলে উত্তাপ ক্ষয় হইয়া বায়ুপ্রবাহের উত্তাপ কমিয়া যায়। যন্ত্রে আগমনোন্মুখ বায়ুপ্রবাহ যে নল দিয়া আসিতেছে, সেই নল বেষ্টন করিয়া আর একটী নল থাকে, তাহার ভিতর দিয়া এক্ষণে এই শীতল বায়ু চালিত হয়, সুতরাং আগমনোন্মুখ বায়ু আরও অধিক ঠাণ্ডা হয়। এইরূপ কয়েকবার করিলেই বায়ু ক্রমশঃ শীতল হইয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আংশিক তির্য্যকপাতনে (fractional distillation) তরল বায়ু হইতে স্যর উইলিয়ম র‍্যামজে আর্গন্, হিলিয়ম, নিয়ন, জেনন্ এবং ক্রিপ্টন পৃথক্ করেন। আজকাল এই উপায়ে বায়ু হইতে হিলিয়ম সংগ্রহ করিয়া বিমানযানে পূর্ণ করা হয়, কারণ হিলিয়ম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং আগুন লাগিবার ভয় নাই এবং বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া বিমানযানটিকে উড়িতে সাহায্য করে। নিয়ন বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌বে পূর্ণ করা হয়, কারণ নিয়ন ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়ে অধিক আলো পাওয়া যায় ও বাল্‌বের জীবন কিছু দীর্ঘ হয়। বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনী "নিয়ন সাইন" (neon sign) গুলিতে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন, আর্গন প্রভৃতি গ্যাস ব্যবহৃত হইতেছে।

জলীয় বাষ্প সর্ব্বদাই বায়ুতে বর্ত্তমান আছে, তবে সকল স্থানে বা সকল সময়ে ইহার পরিমাণ সমান থাকে না। জল হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। জলে উত্তাপ দিলে দেখা যায় যে, তাপ যত বৃদ্ধি পায়, জলীয় বাষ্পও ততই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং বায়ুর তাপ যত অধিক হইবে, জলীয় বাষ্পও ততই অধিক পরিমাণে বায়ুতে থাকিবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট তাপে বায়ু একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না, তবে এই পরিমাণ অপেক্ষা কম জলীয় বাষ্প বায়ুতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ঊর্দ্ধতম পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে বর্ত্তমান থাকিলে সেই বায়ুকে সংতৃপ্ত (saturated) বলা হয় ও তদপেক্ষা কম জলীয় বাষ্পবিশিষ্ট বায়ুকে অসংতৃপ্ত (unsaturated) বলা হয়। বায়ুর সংতৃপ্ত অবস্থায় হঠাৎ কোন কারণে তাপহ্রাস হইলে কিছু জলীয় বাষ্প জমিয়া গিয়া কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি অথবা শিশিরের সৃষ্টি হয়, কারণ তাপ কমিয়া গেলে বায়ু সংতৃপ্ত হইতে কম জলীয় বাষ্পের আবশ্যক। সুতরাং অধিকতর তাপে সংতৃপ্ত

বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ছিল, তাহা এক্ষণে এই অবস্থায় বায়ু ধারণ করিতে পারে না। এই শীতলতর অবস্থায় সংতৃপ্ত হইতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আবশ্যক, তাহাই এখন বায়ুতে থাকিবে, অবশিষ্ট বাষ্প বায়ু হইতে পৃথক্ হইয়া মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি, অথবা শিশিরে পরিণত হইবে।

আবহবৈজ্ঞানিকগণ বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয় করিয়া আবহাওয়ার অবস্থা জ্ঞাত হন। নির্ণয়কালে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে নিরপেক্ষ আর্দ্রতা বলে এবং তৎকালেই বায়ু সংতৃপ্ত অবস্থায় থাকিলে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকা উচিত, সেই পরিমাণের সহিত নিরপেক্ষ আর্দ্রতা—যাহা নির্ণীত হইয়াছে—তাহার অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। মস্তকে একখণ্ড আর্দ্রবস্ত্র জড়াইয়া রাখিলে মস্তক ঠাণ্ডা বোধ হয়, কারণ আর্দ্রবস্ত্র হইতে উপসরণ (evaporation) দ্বারা জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। উত্তাপ গ্রহণ না করিয়া জল বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও উত্তাপ গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে। মস্তক এবং নিকটস্থ বায়ু এই উত্তাপ প্রদান করিতেছে ও এই জন্যই মস্তকের তাপক্ষয় হইয়া উহা ঠাণ্ডা বোধ হয়। বায়ু সংতৃপ্ত অবস্থার যত নিকটে থাকে, উহার জলীয় বাষ্পগ্রহণক্ষমতাও ততই কম হয়, সুতরাং উপসরণও কম হইবে। দুইটি তাপমান যন্ত্র পাশাপাশি রাখিয়া একটির বাল্‌ব ভিজা কাপড়ে জড়াইয়া দিলে এই যন্ত্রটি অপরটির অপেক্ষা কম তাপ নির্দ্দেশ করিবে। এই দুইটি তাপমান যন্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক বায়ুচাপ একটি চাপমান যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করিলে সহজেই নিরপেক্ষ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করা যায়।

উচ্চস্তরে ক্রমশই বায়ুর ঘনত্ব এবং উত্তাপ কমিয়া যায়। উত্তাপহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যত উচ্চে উঠা যায় বায়ু ততই শুষ্ক বোধ হয়।

জলীয় বাষ্পের উত্তাপ শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে ও এই ক্ষমতার জন্যই ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ রক্ষা করিয়া অশেষ হিতসাধন করে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে শীতও কম হয় কারণ তখন বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিক থাকে, সুতরাং অধিকতর উত্তাপ শোষণ করিয়া ধারণ করিয়া রাখে। শুষ্ক আবহাওয়াবিশিষ্ট স্থানে, আর্দ্র আবহাওয়াবিশিষ্ট স্থান অপেক্ষা রাত্রিতে তাপহ্রাস অনেক অধিক হয়।

একটী স্থূল কাচনলের একপ্রান্তে রবারের আচ্ছাদনী সংলগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত হইতে বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা ভিতরের বায়ু নিষ্কাশন করিলে রবারের আচ্ছাদনটী বহির্দ্দেশের বায়ুচাপ বশতঃ ভিতরদিকে ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে ও অবশেষে সশব্দে ফাটিয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুর চাপ আছে। প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্রের উপর বায়ুচাপ প্রায় ১৫·২ পাউণ্ড (প্রায় ৭॥ সের) ভারের সমান। আমাদের দেহের ক্ষেত্র-পরিমাণ প্রায় ১০ বর্গফুট ও ইহার উপর বায়ুর চাপ প্রায় ২৭০ মণ, কিন্তু দেহের ভিতরে ও বাহিরে বায়ুর অবাধ গতির জন্য চাপের সমতা বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং এরূপ ভীষণ চাপও আমরা বোধ করিতে পারি না।

আবহাওয়ার অবস্থা জানিবার জন্য বায়ুর চাপ পরিমাণ করিবার যন্ত্রকেই চাপমান যন্ত্র বলা হয়। বায়ুশূন্য নলে জল প্রায় ৩০ ফুট উচ্চে উঠিতে দেখিয়া তরিচেল্লী (Torricelli) চিন্তা করেন যে, এইরূপ নলে পারদ প্রায় ২৭ ইঞ্চি উঠিবে, কারণ পারদ জল অপেক্ষা প্রায় ১৩½ গুণ ভারী। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তরিচেল্লী নিম্নলিখিত পরীক্ষাদ্বারা বায়ুচাপ নির্ণয় করেন :—

প্রায় ৫০ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ½ ইঞ্চি ব্যাসের একটী একপ্রান্তবদ্ধ কাচের নল লইয়া তিনি উহা বিশুদ্ধ পারদে পূর্ণ করেন। একটী পাত্রে কিছু বিশুদ্ধ পারদ রাখিয়া উহার ভিতর নলের উন্মুক্ত প্রান্ত অঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া বন্ধ করিয়া প্রবিষ্ট করেন ও তৎপর অঙ্গুলি সরাইয়া লন। এরূপ করিবার পর তিনি দেখিতে পান যে, নল হইতে কিছু পারদ বাহির হইয়া পাত্রে চলিয়া আসে ও অবশিষ্ট পারদ পাত্রস্থিত পারদপৃষ্ঠ (mercury surface) অপেক্ষা নলের ভিতর প্রায় ৩০ ইঞ্চি উচ্চে স্থির হইয়া অবস্থান করে। পারদ নির্গত হইয়া যাওয়াতে উপরিস্থিত যে অংশ পারদশূন্য হইল, তথায় কেবলমাত্র পারদ বাষ্প আছে; উহা বায়ুশূন্য। ইহাকেই তরিচেল্লীর শূন্য (Torricellian vacuum) বলা হয়। পাত্রস্থিত পারদপৃষ্ঠে বায়ুচাপের জন্যই নলের মধ্যে পারদ পাত্রস্থিত পারদ অপেক্ষা

উচ্চে অবস্থান করে। বায়ুচাপ যত অধিক হইবে নলের মধ্যে পারদও ততই অধিক উচ্চে উঠিবে। এই উচ্চতা পরিমাণ করিলে বায়ুচাপ জানা যায়, সুতরাং ইহা চাপমান যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধুনা নানা প্রকার চাপমান যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ ফোর্টিনের চাপমানযন্ত্র (Fortin's barometer) ব্যবহার করা হয়। টরিচেল্লীর আবিষ্কৃত মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিয়াই ইহা নির্ম্মিত।

বায়ুতে ধূলিকণা সামান্য পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। ধূলি-কণা আলোক বিক্ষেপ করিয়া দেখিবার সুবিধা করিয়া দেয়, কারণ আলোকরশ্মি সরল রেখা অনুসরণ করিয়া চলে, সুতরাং বাধার জন্য সকল স্থানে পতিত হইতে পারে না।

বায়ুতে অসংখ্য জীবাণু বর্ত্তমান। ইহাদের অধিকাংশই আমাদিগের পক্ষে অপকারী নহে। নানাবিধ কারণে কখনও কখনও স্থান বিশেষে অপকারী জীবাণু অধিকসংখ্যক জন্মিলে সেই স্থানে মহামারী প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

মরু ও মধুপ

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আমরা বন্ধু মেঘের বলাকা মরুর আকাশে গাঁথি,
উল্লাসে নাচে বিদ্যুৎ-ভরা কাজল বর্ষারাতি।
দুর্য্যোগ-ঘন ঝঞ্ঝার সাথে করেছি মিতালী ভাই,
বজ্র-আগুণ আঁধারের বুকে আমরা জ্বালাতে চাই।
মলয়-বাতাস তোমাদের ঘিরে থাকুক রাত্রি দিন,
রক্ত-প্রদীপে বাসর রচিয়া বাজাই রুদ্র-বীণ।
উল্কার সাথে করি উৎসব, ধূমকেতু ভালবাসি,
উনপঞ্চাশী বায়ু যে মোদের হয়েছে বিশ্বগ্রাসী।

তুরাণী দস্যু আমরা সেজেছি তীক্ষ্ণ বর্শা হাতে,
বেদুঈন সম নিষ্ঠুর মোরা ফুল-ফুটিবার রাতে।
তুড়িতে মোদের তুব্‌ড়ির শিখা অগ্নি-ফোয়ারা হয়,
তোমাদের মত আমাদের হৃদি বীর্য্যবিহীন নয়।
মেঘের বলাকা তোমরা দেখিয়া যক্ষ-বধূর লাগি
কাঁদিয়া ভাসাও, বিরহ-বেদনে ভাবো তারে হতভাগী।
মেঘদূত নিয়া কর উৎসব প্রেমিক-সম্প্রদায়,
কামী যক্ষের বন্ধু তোমরা, রমণী-ভিখারী হায়!

যাজ্ঞসেনীর বস্ত্রহরণে দারুণ ক্ষেপিয়া উঠি
দুঃশাসনের রক্তপানের নেশায় আমরা ছুটি।
সীতার লাগিয়া সোনার লঙ্কা করিয়াছি ছারখার,
ভাঙিয়াছি মোরা মথুরাপুরীর কংসের কারাগার।
তোমাদের মত শ্রীখোল লইয়া কাঁদি নাই পথে পথে,
ভগবান সাথে ভগবত গীতা গাই অর্জ্জুন-রথে।
তোমাদের ভালে শ্বেতচন্দন, কণ্ঠে তুলসী-গাথা,
আমরা সিঁদুর পরি যে ললাটে ধ্বংসের উদ্‌গাতা।

আমাদের প্রভু ননী-চোরা নয়, পার্থ-সারথী সে যে,
আমাদের মিতা মৃত্যু-দেবতা বেড়ায় শ্মশানে নেচে।
জননী মোদের রণ-রঙ্গিনী ভৈরবী শবাসনা,
চরণে তাহার লুটায়ে পড়িছে কালের কুটিল ফণা।
সর্ব্বহারার বন্ধু আমরা, সর্ব্বনাশের সনে
ভবিষ্যতের স্বর্গ রচিব সুদূর প্রভাতী মনে।
ভাঙন-নদীর মতই আমরা আপন খেয়ালে চলি,
বন্ধন মোরা খুলিয়া ফেলেছি দু'পায়ে সমাজ দলি।

তোমরা প্রাসাদ রচিছ নিত্য ভোগ-বিলাসের তরে,
আকাশের চাঁদ কাননের ফুল তব পালঙ্ক 'পরে—
প্রেয়সীর প্রাণে জাগায় স্বপ্ন চোখ ভেঙে আসে ঘুমে,
দয়িত পরশে গালের উপর পড়িছে হর্ষ চুমে।
সদা মিহি সুরে কথা ক'হ সবে ভীরু মানবের দল,
মোদের কণ্ঠ-ধ্বনিতে কাঁপিছে গিরিদরী ভূমিতল।
আমাদের হেরি তোমাদের জাগে হৃদয়-কুঞ্জে ত্রাস,
মরু-বেদনায় জন্ম লভেছি, মোদের নাহিক নাশ।

কালকূটে মোরা পান করে' করে' শক্তি লভেছি ভবে,
ভয়াল সাপেরে জড়ায়েছি গলে, ভস্ম মেখেছি সবে।
ক্ষুৎপিপাসায় আর্ত্ত যাহারা, রোগে শোকে কঙ্কাল,
তাহাদের লাগি উড়াব এবার এ যুগের ঝঞ্ঝাল।
সাম্যের বীজ ছড়াব আমরা মানবজাতির প্রাণে,
আগামী যুগের সূর্য্য উদিবে আমাদের গানে গানে।
সুদূর কালের অস্তাচলের অবগুণ্ঠন টানি
আমরা শুনাব ভুবনে ভুবনে মৃত্যু-জয়ের বাণী।

বিজ্ঞান-জগৎ

শরীরবিজ্ঞান

§ একটি অজ্ঞাত অধ্যায়

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

মনুষ্যদেহ একটি বিচিত্র এবং বিস্ময়কর যন্ত্র। ইহার বহু ক্রিয়াই বৈজ্ঞানিকদের বোধগম্য নহে। জীবনধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহা শরীরের মধ্যে একটি বিশেষ পথ দিয়া ভ্রমণ করে এবং এই পথ অতিক্রম করিবার কালে পরিপাক হইয়া খাদ্যের সারাংশ শরীরের পুষ্টিতে নিয়োজিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। খাদ্য ব্যতীত শরীরের মধ্যে অহরহ বাতাস এবং রক্তেরও চলাচল হইতেছে। খাদ্যের ন্যায় বাতাসের ও রক্ত সঞ্চালনেরও নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। খাদ্যদ্রব্য তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাইলেই বিপত্তি উপস্থিত হয়। শ্বাস-নলিকা ও খাদ্য যাইবার পথ গলার ভিতর হইতে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে, খাদ্যের সামান্য কণাও কোন প্রকারে শ্বাসনলিকার মধ্যে উপস্থিত হইলে "বিষম" লাগিয়া থাকে; অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য শ্বাসনলিকায় পৌছাইলে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ খাদ্য-দ্রব্যের ভারে শ্বাসনলিকার দ্বার বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু কোন প্রকারে একই সময়ে দুইটি নলের প্রবেশ-পথ খোলা থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।



বামে: চিকিৎসক ব্রংকোস্কোপ সাহায্যে গলার ভিতর হইতে সেফ্‌টি-পিন বাহির করিতেছেন।



দক্ষিণে: এক্স-রে সাহায্যে নির্ণীত খোলা সেফ্‌টি-পিনের অবস্থান।

এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শ্বাসনলিকা কাটিয়া যে জিনিষটির জন্য শ্বাসরোধ হইতেছে, তাহা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের মতে এই প্রকার অস্ত্রোপচার খুব কঠিন বা বিপজ্জনক নহে। বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষা আরও উন্নততর উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক মার্কিন চিকিৎসক, ডক্টর জ্যাক্‌সন 'ব্রংকোস্কোপ' (bronchoscope) নামে এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসনলিকা, ফুস্‌ফুস্ এবং ফুস্‌ফুস্ ও শ্বাসনলিকার মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলিকার মধ্য হইতে অস্ত্রোপচার না করিয়া উহাদের মধ্যে নিবিষ্ট যে কোন জিনিষ বাহির করা যায়। প্রায় ত্রিশ বৎসরের চেষ্টার ফলে যে যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নির্ম্মাণকৌশল এইরূপ যে, তাহাতে শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত সেফ্‌টি-পিন বন্ধ করা যায়, ইচ্ছামত চামচের

ন্যায় ব্যবহার করিয়া কোন জিনিষ উঠান যায়, সাঁড়াশির মত ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজন হইলে শরীরাভ্যন্তরস্থ ধাতব দ্রব্য কাটিয়া খণ্ডে খণ্ডে বাহির করা যায়।

শিশুরা সাধারণতঃ সকল জিনিষই খাইতে চেষ্টা করে। সূতার কাটিম, সেফটি-পিন, সূচ প্রভৃতি শিশুদের প্রিয় খাদ্য বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। এই প্রকার বহু ক্ষেত্রে ডক্টর জ্যাকসন তাঁহার যন্ত্র ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। একটি পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুর গলা হইতে এক সঙ্গে পাঁচটি খোলা সেফটি-পিন পাওয়া গিয়াছে এবং আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে,সকলগুলির খোলা প্রান্ত বিভিন্নমুখী। সংপ্রতি একটি বালক অষ্ট্রেলিয়া হইতে নয় হাজার মাইল দূরে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ডক্টর জ্যাক্‌সনের নিকট আসে। বালকটির ফুস্‌ফুসের



একটি কানাডাবাসী স্ত্রীলোকের পাকস্থলী হইতে এই ধাতুখণ্ডগুলি অস্ত্রোপচার করিয়া বাহির করা হইয়াছে. ধাতুখণ্ডগুলির সংখ্যা ২৫৩৩!

ভিতর হইতে সাত মিনিটের মধ্যে একটি পেরেক বাহির করা হয়। ডক্টর জ্যাক্‌সন প্রায় চল্লিশ বৎসর 'প্রাক্‌টিস' করিতেছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার রোগীদের শরীরের ভিতর হইতে যে সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একটি যাদুঘর স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে কৃত্রিম দাঁত, চুলের কাঁটা, পেরেক, পয়সা, মেডাল, বঁড়শি, জুতার বোতাম, পেন্‌সিলের ক্যাপ প্রভৃতি বহু দ্রব্য আছে। শরীরের ঠিক কোন্ স্থানে কোন্ জিনিষ আছে, তাহা সাধারণতঃ এক্স-রে সাহায্যে ফটো তুলিয়া নির্ণয় করা হইয়া থাকে। সঠিকভাবে অবস্থান নির্ণয় করিবার জন্য জনৈক চিকিৎসক এবং জনৈক পদার্থবিদ্ একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি কতকগুলি রেখা অঙ্কিত দুইটি পর্দ্দার মধ্যে রোগীকে রাখিয়া এক্স-রে যন্ত্র সামান্য সরাইয়া দুইটি পৃথক্ ছবি লওয়া হয়। পর্দ্দার রেখাগুলি এইরূপ যে, এক্স-রে ফটোগ্রাফে তাহার ছায়া পড়ে। দুইটি ছবির উপর সামান্য ব্যাবহারিক জ্যামিতি প্রয়োগ করিলে কোন বস্তুর সঠিক অবস্থান এই যন্ত্রসাহায্যে নির্ণয় করা যায়। সময়ে বহু বৎসর ধরিয়া স্থিত দ্রব্য ফুস্‌ফুসের ভিতর হইতে বাহির করা সম্ভব হইয়াছে।

খাদ্যের কথা ধরিলে দেখা যাইবে যে, বহুলোক এরূপ দ্রব্য খাইতে পারে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। জনৈক যুক্তপ্রদেশবাসীর পাকস্থলী হইতে অস্ত্রোপচার করিয়া প্রাপ্ত অনেকগুলি ছুরির ছবি অল্প কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। কাচের গেলাস, লোহার পেরেক, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি খাইতে পারে এরূপ ব্যক্তি বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। কানাডায় একটি স্ত্রীলোকের ধাতব দ্রব্য খাইবার এরূপ বাতিক ছিল যে, তাহার পাকস্থলীর এক্স-রে ফটোগ্রাফ লইয়া ২৫৩৩টি বিভিন্ন দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বোতাম, সূচ, আলপিন, নিব, পয়সা প্রভৃতি বহু দ্রব্য এক বৎসরের উপর তাহার পাকস্থলীর ভিতর ছিল, কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকটির বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে কাচ বা পেরেক খাওয়া প্রাণঘাতক হইবে, কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন ক্ষতি না হইবার কারণ কি, তাহা কোন শরীরতত্ত্ববিদ্ বলিতে পারেন না।

অনেক সময় দেখা যায় যে,কোন জিনিষ খাদ্যবহা নলিকার মধ্য দিয়া যাইয়া স্বাভাবিকভাবে মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। টিন খুলিবার যন্ত্র, জুতা সেলাই করিবার ফোঁড় প্রভৃতি বড় বড় জিনিষও এই ভাবে নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ সময় এই সকল দ্রব্য পাকস্থলীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রোপচার করিয়া বাহির করিতে হয়। একটি শিশু একবার একটি সূতার কাটিম এবং তৎসংলগ্ন একটি সূচ খাইয়া ফেলে। সূতার কাটিম নির্গত হইয়া যায়, কিন্তু সূচটি পাকস্থলীর ভিতর থাকিয়া যায় এবং শেষে এক্স-রে ফটোগ্রাফের সাহায্যে তাহার অবস্থান নির্ণয় করিয়া অস্ত্রোপচার করিয়া তাহা বাহির করিতে হয়।

শ্বাসনলীর ভিতর দিয়া যে সকল দ্রব্য বিচরণ করে, তাহাদের আচরণ অতীব বিচিত্র। জনৈক বালকের শ্বাস-

নলীর ভিতর একবার তীক্ষ্ণ ঘাসের প্রায় পৌনে দুই ইঞ্চি লম্বা একটি ডগা আকস্মিক ভাবে চলিয়া যায়। ক্রমশঃ প্রশ্বাসের সহিত তাহা ফুস্‌ফুসের ভিতর পৌছায়। ভিতরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বালকটির ভীষণ জ্বর এবং কাসি হয়। কিছুদিন পরে তাহার বুকের উপর একটি স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। ক্রমশঃ ফুলা বাড়িতে থাকে এবং একদিন চামড়া ভেদ করিয়া ঘাসের ডগাটি বাহির হইয়া আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জ্বর কমিয়া যায় এবং সে সত্বর আরোগ্য লাভ করে। ঘাসের ডগাটি কিরূপে ফুস্‌ফুসের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দেহের ত্বক ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল, তাহার কোন কারণ চিকিৎসকেরা দিতে পারেন না। আর একটি ক্ষেত্রে একটি চাষীর দেহ হইতে এইরূপে একটি শস্যের তীক্ষ্ণ ডাঁটা নির্গত হইতে দেখা যায়। গলার ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রায় ১৫ দিন পরে দুইটি পাঁজরের মধ্য হইতে ইহা নির্গত হয়। চিকিৎসকেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, শ্বাসনলিকার মধ্যে প্রবেশ করিলে কোন দ্রব্য সাধারণতঃ ফুস্‌ফুসে যাইয়া পৌছায়, কিন্তু ফুস্‌ফুসের আবরণ ও দেহের মাংসপেশীসমূহ ভেদ করিয়া কিরূপে সেগুলি ত্বক ছিদ্র করিয়া বাহিরে আসে, তাহার কোন কারণ তাঁহারা দিতে পারেন না।

দেহের কোন স্বাভাবিক নলিকার মধ্যে না যাইয়া কোন বস্তু দেহের পেশীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও সেগুলি একস্থানে না থাকিয়া ক্রমাগতঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়। একজন শ্রমজীবীর হাতে চোঁচ ফুটিয়া যাওয়ায় সে একটি ছুঁচ দিয়া চোঁচটি বাহির করিয়া ফেলে এবং ছুঁচটি পকেটে রাখিয়া নীচু হইয়া কাজ করিবার সময় বুকে ছুঁচ ফুটিবার মত বেদনা অনুভব করে। ছুঁচটি পাওয়া গেল না এবং দেখা গেল যে, তাহার বুকে একটি লাল দাগ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক্স-রে সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল এবং দেখা গেল যে, ছুঁচটি ক্রমশঃ তাহার হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অস্ত্রোপচার করিয়া বাহির করিবার পূর্ব্বেই ছুঁচটি হৃৎপিণ্ডের একটি প্রকোষ্ঠ ভেদ করিল। অস্ত্রোপচার করিয়া ছুঁচটিকে যথাস্থানে পাওয়া গেল না; তখন পুনরায় এক্স-রে সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ছুঁচটি হৃৎপিণ্ডের অন্য দিক্ ভেদ করিয়াছে। দৈনিক একটু একটু করিয়া সরিয়া ছুঁচটি সম্পূর্ণভাবে হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া পিঠের কাছে শিরদাঁড়ায় গিয়া বাধা পাইল। তাহার পরে সেটি বাহির করা সম্ভব হয়। এই লোকটি আজও বাঁচিয়া আছে। হৃৎপিণ্ড ফুটা হইয়া যাইবার পরও যে বাঁচা সম্ভব তাহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সের একটি ছোট মেয়ে কাঠের ঘোড়া লইয়া খেলা করিতে করিতে একটি বালামচি খাইয়া ফেলে। কাঠের ঘোড়াটিতে আসল বালামচি লাগান ছিল। বার বৎসর পরে, মেয়েটির যখন ১৭ বৎসর বয়স, তখন একদিন সকালে সে দেখিল যে, তাহার পায়ের বুড়া আঙ্গুলে



চিত্রে প্রদর্শিত কুকুরটি একটি হাতঘড়ি, এক জোড়া পাশা এবং আরও অনেকগুলি জিনিস খাইয়া ফেলিয়াছে, বংকোস্কোপ-সাহায্যে সেগুলি বাহির করা হইতেছে।

একটি কাল কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে। ছুঁচ দিয়া কাঁটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গেল যে, উহাকে যতই টানা যায়, ততই বাহির হইতে থাকে এবং সমস্তটি বাহির হইলে দেখা গেল যে, উহা কাঁটা নহে, বার বৎসর পূর্ব্বের সেই বালামচি। বাহির হইবার সময় কোনরূপ যন্ত্রণা বা রক্তপাত কিছুই হয় নাই। বার বৎসর কাল ইহা শরীরের কোথায় ছিল, অথবা কোথায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতই থাকিয়া গেল।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যায় যে, কোন কঠিন জিনিষ শরীরের পেশীর মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু ইহার কারণ কি তাহা

আজও নির্ণীত হয় নাই। শীকার করিতে যাইয়া দুর্ঘটনাক্রমে একটি বালকের উরুতে একটি ছর্‌রা প্রবেশ করে। এক্স-রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া উরুতে কিছুই পাওয়া গেল না। পরে বালকটির হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং পুনরায় এক্স-রে সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ছর্‌রাটি হৃৎপিণ্ডের একটি প্রকোষ্ঠে রহিয়াছে এবং রক্তের তালে তালে উহা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, ছর্‌রাটি প্রথমে পেশী ভেদ করিয়া



উপরে: ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক জোসেফ ব্রয়েল্‌স্ রক্তের রসায়ন সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লুজিয়ানা বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যগণকে বিস্মিত করিয়াছে।



নীচে: ওয়াল্‌শ ও কেনেথ প্লুজ—হাতে ডুবুরীর মুখোস, ইহার সাহায্যে তাহারা জলের নীচে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত নামিতে সমর্থ হইয়াছে।

কোন ধমনীতে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতের সহিত বাহিত হইয়া তাহা হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয়। এই ক্ষেত্রেও অস্ত্রোপচার করিয়া বালকটির হৃৎপিণ্ডের ভিতর হইতে ছর্‌রা বাহির করা হয়।

বাহির হইতে কোন অবান্তর দ্রব্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত কোথায় পৌছাইবে এবং তাহাতে দেহযন্ত্রের কি বৈকল্য ঘটিবে, তাহা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত অধ্যায়। উপরে যে সকল বিচিত্র উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ না ঘটিলেও বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই।

বালক বৈজ্ঞানিক

যে সকল ব্যক্তি উত্তরকালে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে শিশুকাল হইতেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমেই এযুগের বিশ্বকর্ম্মা এডিসনের নাম করিতে হয়। অত্যন্ত অল্প বয়স হইতেই এডিসন তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দেন। এডিসনের ন্যায় এত বড় উদ্ভাবক আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমান এরোপ্লেনের জন্মদাতা রাইট ভ্রাতৃদ্বয় শিশুকালে একটি খেলার হেলিকপ্‌টার পাইয়াছিলেন। এই খেলার হেলিকপ্‌টারই তাঁহাদের আকাশবিচরণ সম্বন্ধে সচেতন করে। সকল ক্ষেত্রে না হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অল্প বয়সের সখ ভবিষ্যতের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবন্ধে জনকয়েক মার্কিন বালক বৈজ্ঞানিকের সংবাদ দেওয়া যাইতেছে।

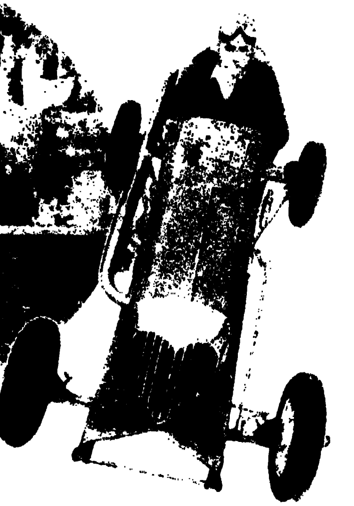
শিশুকালে আকাশের রহস্য যতখানি কৌতূহলের উদ্রেক করে, আর কিছুই বোধ হয় ততখানি করে না, সুতরাং অল্পবয়স্ক বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়। কাজেই প্রথমে বালক জ্যোতির্ব্বিদের সংবাদ দেওয়া যাক।

রবার্ট লুইসের পেশা খবরের কাগজ বিক্রয় করা। এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং এখান ওখান হইতে মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া প্রায় ৯০৲ টাকা খরচ করিয়া সে এরূপ একটি দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, অভিজ্ঞদের মতে ঐ প্রকার দুরবীক্ষণের দাম ৪,৫০০৲ টাকা। এই দুরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করা লুইসের প্রাত্যহিক কর্ম্ম। 'নোভা

হারকিউলিস' নামক একটি নক্ষত্রের দৈনিক ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি প্রথম লক্ষ্য করে এই বালক লুইস। আমেরিকা জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার একটি বড় কেন্দ্র; আমেরিকায় বহু শক্তিশালী দূরবীক্ষণ, আধুনিক বীক্ষণাগার এবং অভিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষক থাকা সত্ত্বেও এই আবিষ্কার যে লুইসের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তাহা অল্প কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বৈজ্ঞানিকদের মতে নোভা হারকিউলিসের অভ্যন্তরে বিরাট বিস্ফোরণের ফলে উহার ঔজ্জ্বল্য প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ, ডক্টর শেপলী বলেন যে, এই ঘটনা মনুষ্যদৃষ্ট সকল নাক্ষত্রিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং লুইসের আবিষ্কার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই আবিষ্কারের পুরস্কারস্বরূপ লুইসকে একটি জলপানী দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে জ্যোতির্বিদ্যা শিখিতে পারে।







উপরে: সানফ্রান্‌সিস্‌কোর জনৈক স্কুলের ছাত্র লিয়ন সালানেৎ, লিয়ন ধারকরা দূরবীণ সাহায্যে একটি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি আবিষ্কার করে।

মধ্যে: লিখিবার কালী-প্রস্তুতকারী রবার্ট ও উইলিয়াম স্নেলিং কালী তৈয়ারী করিতেছে।

নীচে: বিলি বেটারিজ ও তাহার নির্ম্মিত মোটর-গাড়ী; গাড়ীটি ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

সান ফ্রান্‌সিস্‌কোর একটি বালক অপর একটি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পায়। ১০ বৎসরের মধ্যে এই নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

'আমেরিকান মিউজিয়ম অব ন্যাচরাল হিষ্ট্রী'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নিউ ইয়র্কের 'জুনিয়র অ্যাস্ট্রোনমী ক্লাব'এ বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক সদস্য আছে। ইহাদের মধ্যে একজন — রবার্ট মিলার অনেকগুলি দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করিবার জন্য একটি অতিশয় সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। ইহার নির্ম্মিত কার্ডবোর্ডের একটি 'পিন-হোল' ক্যামেরায় সূর্য্যগ্রহণের একটি চমৎকার ছবি উঠিয়াছে। আর একজন সদস্য — রেস অ্যালেন স্বহস্তে নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ সাহায্যে বহু নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে এবং জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করিয়া থাকে। সংপ্রতি এই ক্লাবের সদস্যগণ 'হ্যাণ্ডবুক অব দি হেভেন্‌স' নামে একটি পুস্তক লিখিয়া সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। পুস্তকখানি আমেরিকায় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

গত বৎসর ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. হেইজ নামে একটি স্কুলের ছেলে তাহার উদ্ভাবনী শক্তির জন্য ৫০০ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১,৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে। হেইজ লোহার টুকরা, বাইসাই-

কেলের—'স্পোক', ভ্যাকুম-ক্লিনারের ভাঙ্গা অংশ, ছোট বিজলীবাতি এবং খেলাঘরের বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর 'ট্র্যান্স-ফর্ম্মার'-সাহায্যে এমন একটি যন্ত্রসজ্জা উদ্ভাবন করিয়াছে যে, তাহাতে কোন চুল্লীর উত্তাপ সকল সময়ে সমান রাখা চলে।

প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়েও বালক বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ যথেষ্ট দেখা যায়। জর্জ্জ ফিড্‌লার নামক একটি বালক প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ে এত ব্যাবহারিক জ্ঞান নিজের চেষ্টায় অর্জ্জন করিয়াছে এবং তাহার এরূপ বিচিত্র সংগ্রহ আছে যে, সে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং বহু স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য সে নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকে।

নয় বৎসর ও এগার বৎসর বয়সের দুই ভাই, রবার্ট ও উইলিয়ম স্নেলিং তাহাদের পরীক্ষাগারে বিশেষভাবে স্থায়ী লিখিবার কালী প্রস্তুত করিতেছে। এই কালীর যথেষ্ট চাহিদা আছে। এক বৎসরে এই দুই ভাই দুই হাজার টাকার বেশী লাভ করিয়াছিল বলিয়া শুনা যাইতেছে। রসায়নক্ষেত্রে জোসেফ ব্রয়েল্‌স বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। রক্তের রসায়ন সম্বন্ধে বিশেষ উন্নত গবেষণা-সম্পর্কীয় একটি মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকটি লুজিয়ানার বিজ্ঞান-পরিষদের সদস্যদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ার হলিডেজবার্গের তিনটি স্কুলের ছাত্র যে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই পরীক্ষাগারের মালিক ডিন ওয়াল্‌টার, র‍্যাল্‌ফ ডীল এবং রোল্যাণ্ড ডিল বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ছাপাখানার কাজ, ফটো-গ্রাফীর কাজ এবং রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করিয়া থাকে। নিজেদের তৈয়ারী ছাপাখানায় ছাপিবার জন্য তাহারা নিজেরা 'এনগ্রেভিং' ও 'ইলেক্ট্রো-ব্লক' তৈয়ারী করে। তাহাদের কারখানায় সাবান, ইঁদুর মারিবার বিষ, দাঁতের মাজন, আয়না, আগুন নিবাইবার রাসায়নিক, 'লুব্রিক্যাণ্ট', 'মাইক্রোফোন,' 'ফটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল' প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সংপ্রতি তাহারা কৃত্রিম রবার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে।

বিলি বেটারিজ নামে ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি বালক মোটর গাড়ীর ও এরোপ্লেনের ভাঙ্গা এবং পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করিয়া একটি মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। মোটর গাড়ীটি ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে।

জন ওয়াল্‌শ এবং কেনেথ প্লুজ নিজেদের নির্ম্মিত একটি ডুবুরীর পোষাকের সাহায্যে জলের তলায় ২০ ফুট নীচে নামিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমেরিকায় অল্পবয়স্ক বালকদের জন্য একটি বাৎসরিক বিজ্ঞান-কংগ্রেস হইয়া থাকে। ইহাতে বহু সহস্র বালক শ্রোতা হিসাবে এবং প্রবন্ধপাঠক হিসাবে যোগ দিয়া থাকে। বহু গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-গবেষণাবিষয়ক প্রবন্ধ এই কংগ্রেসে পঠিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনে অনেক সময় এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা এরূপ বিশ্বাসপ্রবণ হইয়া থাকেন যে, কোন বিজ্ঞাপন 'বৈজ্ঞা-নিক' হইলেই তাঁহারা সেইদিকে আকৃষ্ট হন। বিজ্ঞাপন-বিদ্যায় আমেরিকা বোধহয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কাজেই সেখানে বিজ্ঞানের ধোঁকা লাগাইয়া অনেক কিছু চালাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই সব বিজ্ঞাপনে যাহা লেখা থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত।

সংপ্রতি আমেরিকার 'কেল্‌পোডিন ট্যাবলেট' নামক ঔষধের মালিক দণ্ডিত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, আয়োডিন বহু প্রকার রোগে উপকার দেয়। সামুদ্রিক শৈবালে (sea weed) অল্প পরিমাণে আয়োডিন বর্ত্তমান আছে। সামুদ্রিক শৈবালের অপর নাম 'কেল্‌প' (kelp)। এই কেল্‌প চাপযোগে ট্যাবলেট-আকার করিয়া 'কেল্‌-পোডিন' নামে বিক্রয় করা হয়। বিজ্ঞাপনে ছিল যে, এই ঔষধে ৩২টি বিশেষ রোগ এবং 'অন্যান্য অবস্থা' আরাম হইয়া যাইবে। এই ৩২টি রোগের তালিকায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এরূপ রোগ নাই বলিলেও চলে। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়া ক্রেতাকে ঠকাইবার জন্য মালিককে মোটা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

গাত্রচর্ম্ম সুন্দর করিবার জন্য যে সকল 'স্নো' বা 'ক্রীম' ব্যবহার করা হয়,—যে সকল প্রসাধন সামগ্রীর সহিত পাঠকদের অপেক্ষা পাঠিকারাই অধিক পরিচিত,—তাহার অধিকাংশ ক্ষতিকর না হইলেও কোনরূপ উপকার করে না। কিন্তু এরূপ অনেক প্রসাধন-সামগ্রী আছে যাহারা অত্যন্ত ভীষণ ভাবে দেহের ক্ষতি করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি আমেরিকান প্রসাধন-ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁহাদের প্রস্তুত প্রলেপ ব্যবহার করিলে সমস্ত রাত্রি তাহা হইতে সূর্য্যকিরণের 'আলট্রা-ভায়লেট' রশ্মির ন্যায় রশ্মি নির্গত হইয়া চর্ম্ম পরিষ্কার করিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ঐ বস্তুটি ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করিতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে কোন রশ্মি বিকীর্ণ হয় না।

আর একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয় যে, একটি ক্রীমের সহিত খাঁটি সোণার সংমিশ্রণ আছে। কোন গুপ্ত উপায়ে সোণাকে নরম গোলাপী চুর্ণে পরিণত করা হইয়াছে, এই স্বর্ণের কণিকাগুলি 'নেগেটিভ' তড়িতাবিষ্ট এবং সেই জন্য গাত্রচর্ম্মের 'পজিটিভ' তড়িতাবিষ্ট ময়লা টানিয়া বাহির করিয়া গাত্রচর্ম্ম মসৃণ এবং সুন্দর করে। অর্থাৎ চুম্বক সাহায্যে যেরূপে লোহার টুকরা আকৃষ্ট করা যায়, এই ক্রীম সেইরূপে চর্ম্ম হইতে ময়লা আকৃষ্ট করিয়া বাহির করে। স্বর্ণ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা সকলেরই আছে, তাহার উপর এইরূপ 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা, সুতরাং লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মন সাধারণতঃ সন্দিগ্ধ, কাজেই তাঁহারা পরীক্ষা না করিয়া বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, ঐ ক্রীমে অতি অল্প মাত্রায়, শতকরা মাত্র ০.০১৫ ভাগ স্বর্ণ বর্ত্তমান, কিন্তু উহাতে যে কেন চর্ম্ম হইতে ময়লা টানিয়া বাহির করিবে, তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না।

আমাদের দেশেও এরূপ মিথ্যা বিজ্ঞাপনের অভাব নাই। অনেক সময় কোন ঔষধের বা প্রসাধন-সামগ্রীর এরূপ নাম দেওয়া হয় যে, লোকে সহজেই প্রতারিত হয়। লেখকের পরিচিত একটি ভদ্রলোকের ধারণা ছিল যে, কোন ঔষধে রেডিয়ম নামক দুষ্প্রাপ্য ধাতু বর্ত্তমান। রেডিয়ম ধাতুর তেজোবিকিরণের বিষয় অনেকেই জানেন, সুতরাং এই ঔষধ যে বিশেষ উপকারী হইবে, তাহা মনে করিলে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের তথা ঔষধের নামকরণের উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অবশ্য লেখক এই ঔষধের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, হয়ত অনেকে ইহা ব্যবহারে উপকার পাইয়া থাকিবেন। পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে, বিশেষতঃ যৌনব্যাধির ঔষধের বিজ্ঞাপনে এমন অনেক কথা বলা হইয়া থাকে যে, সাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন লোকের তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে, কিন্তু এই সকল ঔষধ প্রকৃত কাযাকরী ঔষধ অপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইয়া থাকে।

রোগা হইবার ঔষধ সম্বন্ধে সকল বিজ্ঞাপনেই লেখা হয় যে, উহাতে কোন ক্ষতিকর পদার্থ নাই। রোগা হইবার জন্য সাধারণতঃ 'থাইরয়েড' গ্রন্থির রস অথবা 'ডাই-নাইট্রো-ফেনল' ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটিই শরীরের পক্ষে উপকারী নহে। বিশেষতঃ দ্বিতীয়টি বিশেষ অপকারী, অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মৃত্যু পর্যান্ত ঘটিতে পারে। পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় 'ডাই-নাইট্রো-ফেনল' ঘটিত অনেক-গুলি বিপজ্জনক 'পেটেন্ট' ঔষধের নাম দেওয়া হইয়াছিল। অনেক বিজ্ঞাপনে প্রকাশ থাকে যে, ঐ ঔষধ ব্যবহারে অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায় না, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে অধিকাংশ বিরেচক ঔষধ শেষ পর্য্যন্ত অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়। এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনে, বিশেষতঃ তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' বিজ্ঞাপনে আস্থা স্থাপন না করাই সঙ্গত।

বিজ্ঞাপনের আর একটি বিপজ্জনক দিক্ আছে; বহু বড় লোক আছেন, বিভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দেওয়া যাঁহাদের পেশা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। একটি আমেরিকান সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে লেখা হয় যে, উহা ব্যবহার করিলে হজম ভাল হয়। সিগারেট যে হজমী-গুলির কাজ করিতে পারে, এইরূপ মতবাদ হজম করা কঠিন ব্যাপার। কোন ভারতে প্রস্তুত বিলাতী সিগারেট সম্বন্ধেও অনুরূপ বিজ্ঞাপন লেখকের নজরে পড়িয়াছে। সিগারেট বা অন্য প্রকার ধূমপান অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করেন না যে, স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য ধূমপান করা আবশ্যক, অথচ সিগারেটের স্বাস্থ্যপ্রদ গুণ বর্ণনা করিয়া প্রশংসাপত্র দিবার লোকের অভাব ঘটে না!

ময়ূরভঞ্জের খনিজ সম্পদ

এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিতেছেন যে, কয়েকটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ জানিবার জন্য ভারতের 'ডিরেক্টর জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স'এর মারফৎ সংবাদ লইতেছেন।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ব-বিভাগ অধুনা-প্রাপ্ত ভ্যানেডিয়ম খনিজের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সঠিকত্ব সম্বন্ধে একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। অনুমান, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ৫০ লক্ষ টন ভ্যানেডিয়ম খনিজ আছে।

ভ্যানেডিয়ম ব্যতীত সোনা, লোহা, তামা, টিটেনিয়ম প্রভৃতি ধাতুর খনিজ এবং ক্রোমাইট, গ্র্যাফাইট প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া চীনামাটি, ফেলস্পার এবং কাচ প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কোয়ার্টজাইট-এরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নানা বর্ণের গিরিমাটিরও সন্ধান মিলিয়াছে।

প্ল্যাটিনামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হইলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই আস্থাবান। তাম্রঘটিত স্বর্ণময় কোয়ার্টজে নিকেলের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বহুকাল হইতেই স্বর্ণ পাওয়া যায় এবং মাটি ধুইয়া স্বর্ণ নিষ্কাশন করিবার প্রণালী সেখানে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতি-বর্গ গজ পলিমাটিতে ১ হইতে ৪ গ্রেন পর্য্যন্ত সোনা পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে ৬ হইতে ২০ গ্রেন পর্য্যন্ত পাওয়ার সংবাদও মিলিয়াছে। সোনা সম্বন্ধে আরও একটি বিচিত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয়ের আকারে সোনা পাওয়া গিয়াছে। উপরে যে সকল খনিজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও বহু প্রকার খনিজ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর ডান সিংহভূম অঞ্চলে যে সকল খনিজের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সেই সকল খনিজের প্রত্যেকটিই পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জের খনিজ সম্পদ বিরাট এবং বিস্তৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, টাটার লোহার কারখানার জন্য বহু খনিজ ময়ূরভঞ্জ হইতে লওয়া হয়।

স্যর সি. ভি. রমণ ও বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌স্টিট্যুট

বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌স্টিট্যুটের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য 'আর্ভিন কমিটী' নামে যে কমিটী গঠিত হয়, তাহার সংবাদ পূর্ব্বে এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে, ইন্‌ষ্টিট্যুটের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য উহার অধ্যক্ষ স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া একজন রেজিস্ট্রার নিয়োজিত হইবে; স্যর সি. ভি. রমণ কেবলমাত্র গবেষণা লইয়া থাকিবেন, তাঁহার কোন বৈষয়িক ক্ষমতা থাকিবে না।

য়ুনাইটেড প্রেস বাঙ্গালোর হইতে সংবাদ দিতেছেন যে, গত ১লা জুন তারিখে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সি. টি. সি. প্লাউডেনের সভাপতিত্বে ইন্‌স্টিট্যুটের গভার্ণিং কাউন্সিল বা পরিচালকমণ্ডলীর যে সভা হয়, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, স্যর সি. ভি. রমণকে ইন্‌স্টিট্যুটের অধ্যক্ষরূপে আর রাখা হইবে না। বড়লাট বাহাদুর ইন্‌স্টিট্যুটের 'ভিজিটর'-রূপে প্রস্তাব করেন যে, একজন রেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় স্যর সি. ভি. রমন আরও এক বৎসর অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন, কিন্তু কাউন্সিল এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কাউন্সিলের মত এই যে স্যর সি. ভি. রমণ ইচ্ছা করিলে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কাজ করিতে পারেন এবং তাহা হইলে তাঁহার বেতন ৩০০০৲ টাকার স্থলে ২০০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। অধ্যাপকতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা স্যর সি. ভি. রমণের থাকিবে না। কাউন্সিল আরও প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমানে অস্থায়ীভাবে একজন রেজিস্ট্রার ও অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হউক।

প্রকাশ স্যর চন্দ্রশেখর কম বেতন লইতে সম্মত, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষমতা খর্ব্ব করার তিনি বিরুদ্ধে এবং অন্য কোন অধ্যক্ষের অধীনে অধ্যাপকরূপে কাজ করিতেও তিনি সম্মত নহেন।

স্যর সি. ভি. রমণ এবং কাউন্সিলের প্রস্তাব বিপরীত-মুখী হওয়ায় স্যর চন্দ্রশেখর বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌স্টিট্যুটের সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। কাউন্সিলও চাহেন না যে, স্যর সি. ভি. রমণ তাঁহার নিজের সর্ত্তে অধ্যক্ষরূপে বহাল থাকেন। এই জন্য কাউন্সিল বড়লাটের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন যে, স্যর সি. ভি. রমণকে অধ্যক্ষের পদ হইতে অপসারিত করা হউক।

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে, স্যর সি. ভি. রমণ বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌সটিট্যুটের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। ইন্‌সটিট্যুট পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের

কথা পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কতদূর সত্য এবং তদন্তের ফল কি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত না হইলে ব্যাপারটি সঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না।

সাঁতার

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, সন্তরণ অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম আর কিছুই নাই, কারণ সাঁতার কাটিলে মোটা লোক যেরূপ রোগা হইতে পারে, সেইরূপ রোগা লোকও মোটা হইতে পারে। সমস্ত দেহের সর্ব্বাঙ্গীন ব্যায়াম সন্তরণ ব্যতীত আর কিছুতে সম্ভব নহে।

হিপোক্যাম্পাস

হিপোক্যাম্পাস একটি অদ্ভুত জন্তু। ইহা একসঙ্গে দুই দিকে দেখিতে পারে এবং জলে সাঁতার দিতে পারে। ইহার মাথা ঘোড়ার মত, লেজ বানরের মত এবং গায়ের আবরণ গুবরে পোকার মত। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার না কি এই যে, হিপোক্যাম্পাসের পুরুষগুলিই সন্তান প্রসব করে।

মাটিরক্ষা

আমেরিকার জমির মাটী যাহাতে রক্ষিত হয় এবং বর্ষার ধুইয়া গিয়া যাহাতে জমির উর্ব্বরতা না কমিয়া যায়, সেই জন্য ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৭॥ কোটী গাছপালা পোঁতা হইবে। ওহায়ো নদীর বন্যায় প্রায় ৩০ কোটী টন সারমাটি ধুইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

দৃঢ় কাচ

সংপ্রতি একরূপ কাচের সূতা প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা ইস্পাত অপেক্ষা বহুগুণ দৃঢ়তর। এই প্রকার কাচের সূত্র মানুষের কেশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর করা যায়। সাধারণ কাচ প্রতি বর্গ-ইঞ্চি হিসাবে প্রায় ২০,০০০ পাউণ্ড ভার সহিতে পারে। নূতন কাচতন্তু প্রতি বর্গ বর্গ-ইঞ্চি হিসাবে প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড ভার সহিতে পারে।

পায়ে-চলা পথ

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

বাঙ্‌লা দেশের ক্রোড়টি আহা
　যে-সব শোভায় আলো-করা,
পায়ে-চলা-পথের ছবিই
　সব চেয়ে তার মনোহরা!

　রেখা-আঁকা দুই দিকে যার
　সবুজ রঙের ঘাসের বাহার,—
টানে এক পড়সীর ঘর থেকে বেশ
　আর্ পড়সীর দ্বারে ত্বরা!

নেই ক' হেথায় হুড়াহুড়ি
　ছায়া-শীতল পথটি আগে,
পরিচয়ের বন্ধনেতে
　সমবেদনাটাই জাগে।

　সম্পদে বিপদে দুর্ত্তা
　নেই কো ইহার কোনো চ্যুতি,—
কবি-মানস-সম্ভূতা কি
　কবিতা এ মধুক্ষরা!

প্রত্যাবর্ত্তন

—শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

তৃতীয় অঙ্ক

[বিকাল। রোদ বাঁকা হয়ে গাছ-পালার মধ্য দিয়ে আভাময়ীর শোবার ঘরে এসে পড়েছে।

অধীর—হাফশার্ট গায়ে, পায়ে চটী, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে এটা, ওটা, সেটা নেড়ে দেখে ফিরে এদিক-ওদিক চাইল। পাশে কি কাছে কথা বলা চলে এমন কেউ ছিল না।]

অধীর। মা! (হেঁকে) এ ঘরে কেউ এসেছিল?

আভাময়ী। (বাইরে থেকে) দেখিনি ত'। কেন?

অধীর। আমার মেঘদূতখানা কে নিলে? (তখনও অধীর একা ঘরে)

আভাময়ী। (বাইরে থেকেই) আমি কি ক'রে জানব? জিজ্ঞেস্ করে দেখ্!

অধীর। মহা মুস্কিল। একখানা বই রেখে সোয়াস্তি নেই। কাকা যদি নিয়ে থাকেন…

সুব্রতা। (ঢুকে) আমি নিয়েছিলাম। (সহজ ক'রে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলে বইখানা অধীরকে। দেশী তাঁতীর বোনা ছাই রঙের একখানা শাড়ী, মাথা অবধি টানা। হাতে বালা, চুড়ি…গলার হার অদৃশ্য-প্রায়) কাকা নিলে বুঝি পাবার আশা খুব কম!

অধীর। অমন ক'রে নিয়ে আমার কত বই যে হারিয়েছেন, ফেলে এলেন ত' আর কথাই নেই, উধাও!…হাঁ, মেয়েদের কাছ থেকে বই বার করা সহজ নয়, ট্রাঙ্কে এক বার পুরতে পারলেই হ'ল! আপনি কখন নিয়েছিলেন?

সুব্রতা। সামান্য কিছু আগে।

অধীর। কোন্ অবধি পড়া হয়েছে?

সুব্রতা। ছবি দেখতে নেওয়া, পড়তে কি? যা হ'ক করে সময় কাটাতে হবে ত'! (অধীর পাতা উল্টাতে উল্টাতে মাঝখানে একটা খড় দেওয়া দেখতেই সুব্রতার পানে চাইল হেসে)

সুব্রতা। ওটা না হয় ফেলে নাই দিলেন! বিশেষ কিছু অনিষ্ট করেনি ত'!

অধীর। ছবি দেখতে দাগ না থাকলেও চলে। (বিরাম)

সুব্রতা। (হাতের চুড়ি নাড়তে নাড়তে) জীবনের অসোয়াস্তির বোঝা বেড়ে যাচ্ছে ভাসুর পো', বইতে পারব না। এ আমায় সাজে না। জানেন…

অধীর। নতুন একটা জীবন আরম্ভ করেছেন, প্রারম্ভে…

সুব্রতা। …কিছুটা অশান্তি থাকাই ভাল! পরে যা হবে বোঝা যায় সহজেই।

অধীর। নিজেই বলেছেন সবাই ভুল বোঝে।

সুব্রতা। হ'তে পারে! (হঠাৎ কি মনে পড়তে সুব্রতা 'আসছি' বলে চলে গেল।)

(আভাময়ীর প্রবেশ)

আভাময়ী। সে আমি আগে থেকেই জানতাম!

অধীর। কি? কিছু হ'য়েছে না কি?

আভাময়ী। না, হয়নি কিছুই, সুবোর ওপর ঠাকুরপোর ব্যবহার আজকাল খুবই ভাল!

অধীর। আনবার বেলা তা হ'লে অমন করলেন কেন?

আভাময়ী। না করে উপায় ছিল? টেঁকাই যে দায় হয়ে দাঁড়াত!

অধীর। কিন্তু ছোট কাকীমাও ত' ভাল ব্যবহারই করেন।

আভাময়ী। না করে তারই বা উপায় কি বল? কিন্তু কতদিন?—যতকাল সুবো ভাল! চোখের জল, অভিমান না হ'য় চেপে রাখতে পারে, কিন্তু মনকে নতুন করে গড়ে তোলা কি সহজ?

(কেশব দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই, ওরা দুজনে ফিরে চাইল)

কেশব। আপনাকেই বলে যাচ্ছি! কাল অনুকে দিয়ে যাব।

আভাময়ী। কবে দিয়ে যাবেন আমি ও সব জানি না, ঠাকুরপো'কে বলে যান—সে যা হয় বুঝে করবে।

কেশব। কোথায় সে? বাড়ীতে কোথাও পেলুম না ত'!

আভাময়ী। না পান ঘুরে এসে সময় মত বলে যাবেন। আমি কিছু বলে দোষের ভাগী হতে রাজী নই।

অধীর। এ সম্বন্ধে মার কিছু বলতে যাওয়া সাজে না। আপনি দেখুন। কাকাকে বলুন গে, তিনি যা বলেন, সেই অনুসারেই কাজ করুন।

আভাময়ী। আজকাল অনু কোথাও থাকা কি উচিত?—তার দিক থেকেই ভেবে দেখুন। শেসে ত' কুরুক্ষেত্র!

বিনয়। কি? (এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়)

আভাময়ী। অনু আজ আসবে না।

কেশব। গেছে এতদিন পরে…

বিনয়। ও অজুহাত পুরান' হয়ে গেছে কেশব, বদলে দিও।

কেশব। কালই দিয়ে যেতে পারি।

বিনয়। আমার কিছুতেই আপত্তি নেই, আছেন থাকুন। যে ক'দিন ইচ্ছে। (বিনয় চলে গেলে পিছনে গেল কেশব। অধীর, আভাময়ী, একে অন্যের দিকে চেয়ে নিলেন।)

অন্য দৃশ্য

(বিনয় এসে বসল নিজের বিছানার ওপর। ধূপদীপ দিতে এসে সুব্রতা দেখল' বিনয়কে। গালে হাত। সুব্রতার নীল শাড়ী পরণে, দেহের প্রায় সব জায়গা আবৃত।)

সুব্রতা। অনু কখন আসবে?

বিনয়। জানবার জন্য উৎসাহ ত' দেখছি খুব। স্বাভাবিক।

সুব্রতা। না' কখন আসবে জিজ্ঞেস করলাম মাত্র। বিকেলে আসবার কথা ছিল না?

বিনয়। হাঁ, সে এলে তার কাছেই সে আসবে কি না জানবারও অসুবিধা হবে না। (ধূপদীপ জ্বেলে দাঁড়িয়েছে সুব্রতা তখন সবেমাত্র।)

সুব্রতা। একটা কথাও সোজা ক'রে নেওয়া যায় না!

বিনয়। পারলে কসুর হ'ত না। (হাসল') কাল আসবে।

সুব্রতা। আজ আসবার কথা ছিল না?

বিনয়। ছিল, কিন্তু এল না। (সুব্রতার পানে চেয়ে) কেন—জিজ্ঞেস করলে না? (খানিক পরে) জীবন বোধ হয় এবার নতুন হয়ে গড়ে চলল।

সুব্রতা। এ জোর করে গড়ে-তোলা কে চায়? কি দরকার? অধিকার পেলেই তাকে উপলব্ধির জন্য যে অপব্যবহারও করতে হবে, তার মানে কি?

বিনয়। নাম যখন কিনেছি, যা সত্যি লোকে যখন বিশ্বাস করে না—তাকে ছেড়ে দিয়ে আমিই বা বৃথা নামের বোঝা বইব কেন? (আভাময়ীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুব্রতা ও বিনয় দুজনেই কতকটা বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে পড়ল, ঘোমটা টেনেই সুব্রতা নিষ্কৃতি পেল, বিনয় অন্যদিকে মুখ ফেরাল।)

আভাময়ী। ঠাকুরপো' নিশ্চয়ই থিয়েটারে যাবেন না, না?

বিনয়। না, বাজে খরচ করবার মত পয়সা নেই!

আভাময়ী। বাড়ীতে থাকা মন্দ নয়, চোর-ডাকাতের ভয়—

বিনয়। দেখি কি করি, খুব সম্ভব যাব না! তবে সবাই যদি যায় আমিই বা ঘরে বসে থাকব কোন্ ভরসায়?

আভাময়ী। সবাই-এর যদি বাজে খরচ করবার মত পয়সা থাকে! (আভাময়ী না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। বিনয় চেয়ে দেখলে আভাময়ী গেলেন। ভাবল—কেন এলেন? মানে আছে, প্রয়োজন নাই বা থাকল)

বিনয়। না, আজ আর যাওয়া চলে না, কি বল? চলে?

সুব্রতা। আমি কি জানি? নিজে যা ভাল মনে কর করবে।

বিনয়। আচ্ছা সে ত' একশ বার, তবু তোমার একটা মতামত……

সুব্রতা। কোন আবশ্যক নেই।

বিনয়। অনু আসছে কাল!

সুব্রতা। এমনি চিরকালই কি ভুল বুঝবে? অমন হলে জীবনটা এতদিন কি হয়ে উঠত বল ত। (হেসে) যে অধিকার ফিরে পেয়েছি, তার দাবী যদি আজ জানাই সংসারে, তা হ'লে কি হয়?

বিনয়। বিনা বাধায় পূরণ।

সুব্রতা। অনুর সামনে সে দাবী স্বীকার করতে পার?

বিনয়। তা তুমি চাইবেই না! সংসারে অশান্তি ত' আর হ'তে দিচ্ছ না।

সুব্রতা। কিন্তু দিলে কই সে কথা রাখতে! অনু আমায় ভাল বাসে কেন? স্ত্রীর অধিকার দাবী করি না বলেই না!

বিনয়। তা বেশ ত', তুমি সত্যি ক'রে তা চাও-ও না।

সুব্রতা। কিন্তু বাড়ীতে থাকতে পারি নি' বলেই এসেছি তোমার আশ্রয়ে, জীবনে অনেক অধিকারকে বলি দিতে হবে জেনেও। এ কথা জেনেও কেন করলে আঘাত? আমি নারী কি করে ভুললে?

বিনয়। কিন্তু সুব্রতা সবাই জানবে, বুঝবে, স্বীকার করবে তুমি আমার স্ত্রী,—অথচ···! আমার এ কি বিড়ম্বনা ভেবেও একবার দেখ।

সুব্রতা। স্বীকার করছি। সুখের আশা আমার কাছে স্বপ্ন। কিন্তু তোমাদের সুখে কেন বাধা দেব? সে আমি হ'তে দেব না।

(বিনয় আস্তে বিমনা ভাবে চলে গেল। সুব্রতা দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। একটু পরে সেও গেল।)

অন্য দৃশ্য

[সন্ধ্যা, গোধূলি। আভাময়ীর ঘরে, সুব্রতা ও আভাময়ী বসে পাশা পাশি]

সুব্রতা। কালকে আমার বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন?

আভাময়ী। এখন যাওয়া কি সঙ্গত হবে সুবো? নিজেই তুমি ভেবে দেখ সব দিক!

সুব্রতা। আমি যাব, অনেকদিন দেখি নি ওদের, দুদিন বাদেই আবার চলে আসছি (হেসে) আনতে লোক পাঠাবেন ত'?

আভাময়ী। কি মনে হয়?

সুব্রতা। না পাঠান, নিজেই আমি আসতে জানি। তাড়িয়ে দেবার ভয় আর নেই ত, আছে?

আভাময়ী। হাঁফ ছাড়তে চললে? (বিরাম)

সুব্রতা। (সহসা) বাক্. তা হ'লে আপনার মত পাওয়া গেল! আপনি রাজী?

আভাময়ী। আমি রাজী হলেই যেতে পারছ না, কর্ত্তাদের অনুমতি নাও, পরে যাবার কথা। (অনিমার প্রবেশ) অনু কি বল? সুবো বাড়ী যেতে চাইছে, দু'দিন থেকেই আসছে আবার।

অনিমা। কেন?

আভাময়ী। অনেক দিন এসেছে ত'।

অনিমা। বেশ, তা হ'লে তাদের এখানে একদিন আনবার ব্যবস্থা করলেই হয়।

সুব্রতা। শুধু তাদের দেখাই সব নয় অনু, আমাকে যেতেই হবে।

অনিমা। মানে—কারণ আমাদের জানবার অধিকার নেই?

সুব্রতা। দরকার নেই যখন, না জানলেও যখন চলে যায়—কি হবে জেনে?

অনিমা। এতে আমাদের কি বলবার আছে? না গেলেই নয়, এমনি যখন প্রয়োজন, আমরা কি বলতে পারি, জানি কতটুকু!

সুব্রতা। আদেশ পাওয়া গেল?

(বিনয়ের প্রবেশ, সুব্রতা মুখ ঢেকে ঘোমটা টেনে দিল।)

বিনয়। বাড়ী যেতে চাইছে বৌদি?

আভাময়ী। আপত্তি আছে?

বিনয়। (নির্লিপ্ত ভাবে) পাঠিয়ে দিন! কবে যেতে চায়?

আভাময়ী। কালকেই!

বিনয়। যা কিছু দরকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

আভাময়ী। দিন কয়েকের মধ্যেই আসছে আবার।

বিনয়। বেশ ত! (সুব্রতা উঠে বেরিয়ে গেল।)

আভাময়ী। ঠাকুরপো, এ অভ্যেস কি আপনার কমবার নয়, সুবো কতটা ব্যথা পেলে জানলেন? অকারণ ব্যথা ওকে দেবার কি দরকার?

বিনয়। অকারণ? হবেও বা! (থেমে সহসা) আপনি জানবেন বৌদি, বাড়ী যেতে পারলে আর আসবে না।

আভাময়ী। আপত্তি থাকলে জানালেই পারেন! (আভাময়ী হাসলেন)

বিনয়। আপত্তি জানাতে……উহুঁ, আমি পারি না, আমায় আজ সাজে না। জানলেন বৌদি, আমার আপত্তি আজ টিকবে না।

আভাময়ী। আচ্ছা আমি সুবোকে ডাকাচ্ছি।

বিনয়। প্রয়োজন নেই, আমি আপত্তি করতে পারি না……করব না।

(বিনয় চলে গেল, একটু দাঁড়িয়ে অনিমাও গেল।)

আভাময়ী। (গমনোন্মুখ অনিমাকে) সুবোকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও ত' অনু! (অনিমা চলে গেল।)

(আভাময়ী কিছুক্ষণ টাকিটুকি কাজ করলেন। খানিক পরে সুব্রতা ঢুকলে)

সুব্রতা। কেন দিদি? আমায় ডাকছিলেন!

আভাময়ী। (চিন্তিত ও গম্ভীর) সুবো, ঠাকুরপো'র আপত্তি, তুমি যেতে পারবে না!

সুব্রতা। আপত্তি করে নি ত' আমি শুনেছি।

আভাময়ী। হলেও তোমার যাওয়া উচিত নয়।

সুব্রতা। আমি যাব!

আভাময়ী। সুবো।

সুব্রতা। যাব! (অবাঞ্ছিত বিরাম)

আভাময়ী। সুবো, সত্যি বল,—কিছু হয়েছে?

(সুব্রতা মাথা নেড়ে জানাল, না।)

আভাময়ী। সুবো!

সুব্রতা। আমি পারব না। বলব না।

আভাময়ী। নিজের পায়ে কুড়োল নিজে…

সুপ্রভা। নিরুপায়!

আভাময়ী। দ্বিধা রেখ না! আমি জানতে চাই। আমায় বল সুবো!

সুব্রতা। যাবার আগে পারব না, যাওয়া তা হলে আটকে যাবে।

আভাময়ী। আমি কাউকে বলব না, কোন বাধা দেব না, বল!

সুব্রতা। দিদি, আশাতীত ভাল ব্যবহার সহ্য করবার সংযম আমার নেই। পারব না। আমায় যেতে হবে! নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যে ছবি এঁকেছিলাম, তাকে সহ্য করতে পারব ততটুকু শক্তি আছে, জেনেই এসেছিলাম। আপনাকে বেশী বুঝিয়ে না বললেও চলবে। আমি যাব কাল। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দেবেন। উপায় নেই, থাকলেও আমায় দিয়ে আজ অসম্ভব।

(আভাময়ীর মুখ চিন্তার গ্লানিমায় জড়িয়ে এল। মুখখানা ফ্যাকাশে মনে হল। আর কথা না বলে, সামান্য দাঁড়িয়ে সুব্রতা চলে গেল। আভাময়ীর সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও বোঝাকে ঠেলে বেরিয়ে এল সশব্দ এক দীর্ঘশ্বাস, কতকটা ভার লাঘব হল হয়ত বা। খুঁটিতে ভর করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, অসাড়, নিস্পন্দ, নির্নিমেষ।)

চতুর্থ অঙ্ক

(সেইদিন। সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাত দণ্ড কয়েক হয়েছে, বিছানায় শুয়ে বিনয়। মেঝেতে হ্যারিকেন জ্বলছে। মশারি গোটান রয়েছে, বিনয় শুয়ে কোলের মধ্যে বালিস জড়িয়ে। অনিমা ঢুকল, কোলে খোকোন্। ঘুমন্ত। খোকোন্‌কে শুইয়ে দিয়ে অনিমা বিনয়ের পাশে বসে ওর পানে চাইল।)

অনিমা। (বিনয়কে) ওদের যে কি করেছি আমি! কেন আমায় সবাই মন্দ বলে!

বিনয়। (মুখ উঠিয়ে) তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই সদুত্তর পেতে!

অনিমা। সুব্রতা যাচ্ছে, নিজে ইচ্ছে করে। কোনদিন, বলতে পার, কিছু বলেছি আমি? কেন তবে দুষছে আমাকে!

বিনয়। যেহেতু আপাতত আর কাউকে পাচ্ছে না।

অনিমা। আমি বাড়ী ছিলুম না, এ ত' আর মিথ্যে নয়!

বিনয়। লোকে বিশ্বাস করতে পারে না, দিন রাত্তের মধ্যে এমন একটা কিছু হতে পারে, যা সুব্রতাকে তাড়িয়েছে।

অনিমা। তুমি যে এত ভালবাস আমাকে—আগে জানি নি!

বিনয়। আজ হঠাৎ বুঝবার কারণ?

অনিমা। আমি চলে গেলে সুব্রতা যা আশা করেছিল…

বিনয়। ঠিক তার উল্টো হয়েছে বলেই যেতে বাধ্য হয়েছে। এ আমি আগে বুঝিনি অনু! (বিনয় উঠে বসল, অনিমা চেয়ে রইল ওর পানে। একটু পরে।) আগে বুঝলে

আঘাত করতাম না! আমি মনে করেছি, জীবনে আর দশ পাঁচটা সাধারণ ঘটনার মত সামান্য ভাবেই নেবে! ভেবেছিলাম ও বুঝি কাঙাল! কিন্তু কি করে বুঝব বল।…সুব্রতা আমার স্ত্রী, অথচ স্ত্রী নয়! (বিরাম) ওর চলে যাবার কারণ আমি অনু! তুমি অপরাধী—লোকে জানে না বলে!

অনিমা। এক দিন চলে গেছি…

বিনয়। (চুলের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে এনে) তুমি ভুল বুঝছ অনিমা। এক দিন এখানে না থাকাতেই এমন কিছু হয় নি! তবে হাঁ, চলে গিয়ে সহজ করে দিয়েছ মাত্র। না হলে এক দিন না এক দিন এ ঘটত-ই, আজ কি কাল। বুঝতে পার না? তোমাকে বলি, এ আমাদের দুজনকার ভুল-বোঝা, ভুল-বোঝা ঠিক নয় বিপরীত-বোঝা, যে ব্যবহার আশা করেছিল, তাকে বইবার মত ধৈর্য্য ওর ছিল ওর। কিন্তু আমার কাছে পেলে যা একেবারে নতুন। অপ্রত্যাশিত। কোন দিন কল্পনায় ও ভাবতে শেখে নি…আমার সঙ্গে ওর সাধারণ সম্বন্ধের স্বাভাবিক পরিণতি, স্ত্রীর প্রাথমিক অধিকার

অনিমা। (চিন্তিত ভাবে) তার মানে স্ত্রীর অধিকার সুব্রতা চায় না?

বিনয়। আমি মনে করেছিলাম এর জন্য কাঙাল হয়েই বুঝি ও এসেছে। কিন্তু কে জানত…আগে বুঝি নি অনু…

অনিমা। এখন কি করবে?

বিনয়। কে? সুব্রতা? জানি না।

অনু। অনুমান।

বিনয়। নিরর্থক। ঠিক হবে না।

অনিমা। থাকবে?

বিনয়। কিসের জন্য?

অনিমা। যার জন্য চলে যেতে ইচ্ছে! (বিনয় চেয়ে দেখল অনিমাকে, আপাদ-মস্তক)

বিনয়। থাকা সম্ভব হলে তাকে চলে যেতে হত না অনিমা! সে থাকবে না! পারলে যেতে চাইত না, না!

অনিমা। আমি যদি রাখি! (বিনয় নির্ণিমেষে চাইল অনুর পানে।) আমি যদি তাকে রাখি, যেতে না দিই!

বিনয়। দেখ যদি পার! আমি জানি না।

(বিনয় চলে গেল)

(অনিমা বসে ছিল একমনে। কি ভাবছিল। জানালায় একবার উঠে 'গিয়ে দাঁড়াল। আবার এল। সুব্রতা ঘরে ঢুকে নিজের খোপে যেতে চাইতেই অনিমা সহসা ডাকল। সুবো! সুব্রতা ফিরে দাঁড়াল। অনিমা চুপ। কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। অবাঞ্ছিত নীরবতা। সুব্রতা এগিয়ে এল। পাশে দাঁড়াল এসে।)

অনিমা। কেন বাড়ী যাচ্ছ আমায় সত্যি খুলে বলবে। আমার অনুরোধ, অধিকার, মিনতি, দাবী। (সহসা হাত দুটো চেপে ধরল সুব্রতার।)

সুব্রতা। নিজে আমি ইচ্ছে করেই যাচ্ছি (সুব্রতা নির্লিপ্ত)

অনিমা। তোমায় যেতে দেব না। আমি জানি কেন যাচ্ছ। আমার জন্যই যাচ্ছ, আমিই তোমায় রাখব।

সুব্রতা। লোকে বললেও সত্যি যখন তা নয়, অকারণ কেন অভিমান করছ! আমি জানি কে এ জন্য দায়ী। একটা অদৃশ্য অন্যায় আমাদের পৃথক করে রাখছে—ভালবাসতে দিচ্ছে না। তুমি, আমি, আর সবাই…আমরা সেই অদৃশ্য অন্যায়ের উপলক্ষ্য হয়ে অসহায় ঘুরে মরছি, ব্যর্থ আমাদের চেষ্টা—তাকে, সেই অন্যায়কে বদলান সম্ভব যখন কিছুতেই নয়, উপায় নেই, আমিই সরে যাচ্ছি। আমার ওপরেই প্রথম অন্যায়টা পড়েছিল, আমাকেই একা ভুগতে দাও। নিজের ওপর অসম্ভব রকমে বিশ্বাস ছিল, তাই দুঃসাহসী হয়ে তাকে বদলাতে এসেছিলাম। পারলাম না। আবার ফিরে যাচ্ছি। এর মধ্যে তোমার ভাগ্য, তোমার সুখ দুঃখকে জড়িয়ে নিও না ভাই!

অনিমা। কিন্তু তবু আমি যদি রাখি, থাকতে পার না? (সুব্রতা শুষ্ক হাসি হাসল, কথা বলা হল না।) আমায় বিশ্বাস কর আমি পারি। পারব। আমি ওকে পেয়েছি চিরকালের জন্য—মিণ্টু রয়েছে। আমাদের ভালবাসা, আমার অনুরাগ—তার জীবন্ত মূর্ত্তি। সেই বিগত সুখের স্মৃতি নিয়েও বাঁচতে আমি পারি।

অনুর আবেদনের করুণ, উদারতা, সুব্রতার দৃঢ়তাকে ভাসিয়ে ওকে দুর্ব্বল করে আনছিল।)

অনিমা। থাকবে, বল! থাকবে! (অনু হাত ধরল সুব্রতার। সুব্রতা অসাড়। বাধা দেবার শক্তি নেই। স্বীকার পেতে চায়, পারে না। কথা ফোটে না।) আমার

এ অহেতুক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাও ভাই ! থাকবে বল ! (জল চোখে ভরে এল । অসতর্ক হাসিও ফুটে উঠল ওষ্ঠাধরে । বিমনা ভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল । এ ওর মনের সম্মতি । তাই টের পাবার সাপেক্ষতা না রেখেই বেরিয়ে এল)

সুব্রতা । তোমার কাছে আমি ঋণী অনু ! স্বীকার কর্‌ছি । তবু উপায় নেই—যেতে হবে ।

(এই নাটকীয় ক্ষণে বিনয় এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায় । ওরা লক্ষ করল এই সবে মাত্র । সুব্রতা আস্তে ঘোমটা টেনে দিল, অনিমা চেয়ে রইল সুব্রতার পানে । বিনয় অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওদের দুজনের পানে চেয়ে)

যবনিকা

বধূ

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মাধবের বংশী হতে কবে কোন্ একখানি গান
ঝঙ্কারিয়া অন্ধকার রাতে,
স্নিগ্ধ এই মৃত্তিকায় মূর্চ্ছা গিয়া পড়েছিল ঝরি'
কোন্ এক নন্দিত প্রভাতে ।
তারি মধু মূর্চ্ছা ভাঙ্গা সচেতন মধুছন্দখানি,
বধূরূপে ধরণীতে মূর্ত্তি বুঝি লভিল কল্যাণী ।
তারি মন্ত্রে জাগা বধূ ছন্দে চলে নন্দি সারা তনু,
অন্তরে শিবের ধ্যান অঙ্গে অঙ্গে নাচে ফুলধনু ।
ডাগর নয়নদুটি অৰ্দ্ধমগ্ন গুণ্ঠনের তলে,
ধরার মানবে হেরি শিহরায় মুখপদ্মদলে ।
বন্দি চাহে পান্থজন ঊর্দ্ধলোকে খোলে স্বর্গদ্বার,
মাঙ্গলিক বাজে বারবার ।
বধূ চাহে বধূ যায়—সব স্বপ্ন ফোটে হয়ে বাণী,
নিত্যমুখরিত তার চিত্তগীতাখানি ।
বিশ্বনারী নম্রতার ধ্যান বহি' নিজ নম্র পিঠে,
অঞ্চলের প্রান্তে ঢাকি' কুন্তলেরে করিয়াছে মিঠে ।
গুণ্ঠনের তল হতে চুপি চুপি ভীত দৃষ্টিখানি,
হঠাৎ বাহিরি' আসে পথে কভু রহস্য সন্ধানি' ।
সরমে কুণ্ঠিতা তবু আঁখি দুটি অতি সাবধান,
ছন্দে তালে বন্দী যেন একখানি সচেতন গান ।
রাখালেরা নিত্য গোঠে বন্দি তারে বাঁশরী বাজায়,
বধূ চাহে—বধূ ঐ যায় ।
রসে রসে টলমল বধূ যায় মধু হাস্য ঢালি,
সারা সৃষ্টি, তার সাথে পাতায় মিতালি ।
তরু লতা পথঘাট ছন্দে তারে বন্দে দলে দলে,
নরের আনন্দযাত্রা নিত্য ওই তারি সাথে চলে ।
যাত্রাপথে ফোটে ফুল বুলবুল গেয়ে ওঠে গান,
নিখিলের কলালক্ষ্মী চরণেতে করে ছন্দ দান ।

ঊষা আসি চুমে গাল সন্ধ্যাবধূ চরণেতে লুটে,
বক্ষের কমলকলি ফোটে—তবু মুখ নাহি ফুটে ।
বৌ-কথা-কও পাখী তাই বুঝি ডাকে বারবার,
তাহারি সারলা মাখি' মাঠে মাঠে ফোটে শস্যভার ।
বিশ্বনারী-চিত্তবধূ নিত্য তারে প্রণতি জানায়,
ঐ যায়—ঐ চাহে—বধূ ঐ যায় ।
আদিম সে দরদী গো রচিল যে বধূ এই নাম,
তারে আজি করি গো প্রণাম ।
তরুণ সৃষ্টির হাসি নৃত্য করে অঙ্গ ঘিরে ঘিরে,
ক্ষুদ্র দুটি স্তনভার পূজারীর ধ্যান বহি শিরে,—
অজানা আনন্দে কাঁপে দেবতার ভোগের মতন,
নারীদেহে চলে ওই একখানি আত্মনিবেদন ।
বধূ করে দীপ দান দেবতারা নামে সন্ধ্যাকালে,
তাহারি ভোরের স্বপ্নে শুকতারা জাগে চক্রবালে ।
তারি পুণ্য মাঙ্গলিকে নেমে আসে লক্ষ্মী-আশীর্ব্বাদ,
নিত্য তুলসীর মূলে হরি তারে বিলান প্রসাদ ।
নারীদের স্বর্গশিরে সতীলোকে খোলে মাতৃদ্বার,
নমস্কার—বধূ নমস্কার ।

বধূ ঐ বিছায় চরণ,
নরনারী-জয়যাত্রা পদে তার দেয় আলিঙ্গন ।
ক্ষুধার নৈবেদ্য রচি তৃষ্ণার সে বহে গঙ্গাধার,
জীবনের সর্ব্বভোগে জমে' ওঠে ত্যাগের পাহাড় ।
আদিম ধরার স্বপ্নে ছোটায় সে মানবের রথ,
জয় বধূ—জয় জয় অম্বর বাজায় নহবৎ ।
কবিরা বাজায় শঙ্খ অকবিরা থমকি দাঁড়ায় ।
ঐ যায়—ঐ চাহে—বধূ ঐ যায় ।

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

মধুসূদন কলেজের সেরা ছাত্র শুধু প্রতিভায় নয়, পয়সাতেও নয়, কারণ কলিকাতার ধনীর সন্তানেরা সেখানে পড়িত,—পয়সার ব্যবহারে। ঐশ্বর্য্যের পেখম কি করিয়া বিস্তার করিয়া দিতে হয়, তাহা যেন মধুর সহজাত বিদ্যা ছিল।

সে প্রতিদিন খিদিরপুর হইতে পাল্কী করিয়া কলেজে আসিত; সঙ্গে থাকিত জন দুই ভৃত্য আর কয়েক রকম বিভিন্ন পোষাক; কলেজেও সে বার দুই পোষাক পরিবর্ত্তন করিত।

এক দিন সে ধুতি-চাদর ছাড়িয়া বুট, ট্রাউজার ও আচকান পরিয়া আসিয়া উপস্থিত। তার পরেই ইংরেজী কোর্ত্তা ধরিল—এ পোষাক আর সে জীবনে ত্যাগ করে নাই।

মধুর দেখাদেখি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উড়ুনি-হীন এক-স্যুটের একটি দল গড়িয়া উঠিল; উড়ুনি-ত্যাগীরা আঁটো কোর্ত্তা গায়ে দিয়া সগৌরবে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিল।

কলেজে মধুর সব চেয়ে প্রিয় ছিল ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজীর অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন। সে ইংরাজীর ঘণ্টায় কখনও অনুপস্থিত থাকিত না; শুধু যে সর্ব্বাগ্রে হাজির হইত তাহা নহে, সকলের অগ্রণীও ছিল বটে।

কাপ্তেন রিচার্ডসন কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যবিষয়ে আদর্শ ছিলেন; তিনি ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে সাহায্য করিতেন, রসমার্গে প্রবেশের সহায়তা করিতেন, যাহারা ইংরাজীতে রচনা করিত, তাহাদের রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং বিশিষ্ট ছাত্রদিগের কবিতা নিজের সম্পাদিত, 'লিটারারি গ্লীনার' কাগজে ছাপিতেন। মধু তাঁহার প্রিয় ছাত্র, মধুর অনেক সনেট তিনি নিজের কাগজে প্রকাশ করিতেন।

গণিতশাস্ত্রে মধুর বড় অনুরাগ ছিল না; কবিত্ব ও গণিতের পারদর্শিতা না কি এক সঙ্গে চলে না; ইহা না কি সর্ব্বজন-স্বীকৃত অতি প্রাচীন নিয়ম; কিন্তু আমার তো মনে হয় কবিত্বের প্রধান অংশটাই গণণামূলক; কিংবা হয় তো সেই জন্যই আত্মঋণ গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই কবিরা গণিতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মধুর এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সাহস হয় নাই। সে গণিতের ঘণ্টায় সংস্কৃত কলেজের একতলার হলে আত্মগোপন করিয়া থাকিত এবং মাঝে মাঝে বন্ধুদের লইয়া নিকটের হিন্দু হোটেলে গিয়া মুর্গীর মাংস ভোজন করিত।

মধু যে অঙ্ক পারিত না তাহা নহে, অন্তত তাহা মধুর মত গর্ব্বিত-স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নহে, অঙ্ক সে পারিত কিন্তু কষিত না, কারণ কবিরা অঙ্ক কষিতে পারে, কিন্তু কষে না। একদিন ভূদেবের সঙ্গে মধুর তর্ক হইল,—কে বড়, নিউটন না সেক্সপীয়র। ভূদেব বলিল, নিউটন, মধু বলিল, সেক্সপীয়র। মধুর মতে সেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছা করিলেও সেক্সপীয়র হইতে পারিতেন না! প্রমাণ কি? প্রমাণ হইল অসম্ভাবিত নূতন এক উপায়ে!

সেদিন গণিতের ক্লাসে দুরূহ একটি অঙ্ক কেহই সমাধান করিতে পারিল না—ভাবী নিউটনের দল নীরব! তখন ভাবী সেক্সপীয়র মধু উঠিয়া গিয়া অঙ্কটি কষিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—প্রমাণ হইয়া গেল, সেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন! কিন্তু আমার অঙ্ক কষা এই পর্য্যন্তই!

কলেজে বাকি সময়টা মধুসূদন সাহিত্য চর্চ্চা করিত। তাহার সাহিত্য-চর্চ্চা দুই রকমের; সে লাইব্রেরি-ঘরের এক কোণে বসিয়া একমনে রিচার্ডসন সাহেবের আঁকাবাঁকা হাতের লেখার নকল করিত। একদিন কার সাহেব ইহা দেখিয়া মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মধু এ কি করিতেছ?

তুমি কি মনে কর, কাপ্তেনের মত হাতের লেখা করিতে পারিলেই তাঁহার মত পণ্ডিত হইতে পারিবে ?

মধুর উত্তর আমরা জানি না ; কিন্তু এত সহজে যে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস হয় না।

মধুর সাহিত্য-চর্চ্চার প্রধান অংশ ছিল স্বরচিত রচনা পাঠ। মধু নিজের লেখা গদ্য-পদ্য পড়িয়া যাইত, আর তাহার উক্ত পার্শ্বচরগণ, ভূদেব, গৌর, বঙ্কু, ভোলানাথ নির্ব্বিচারে শুনিয়া তারিফ করিত। এখানে ভোলানাথ চন্দের উক্তি উদ্ধৃত হইল :—

> "Madhu has taken up to describe a night scene, in which, among other things, he thus alludes to stars, 'Night holds her Parliament'. The happy expression at once became a fond record in the tablet of my memory, and still holds a seat there ; fifty years have not been able to efface it. Shakespeare has, 'the floor of heaven is thick-inlaid with patines of gold'. Byron addresses the stars as the 'poetry of heaven' ! Madhu in his teens, gives a proof of close poetic kinship."

এক নিঃশ্বাসে সেক্সপীয়র হইতে বায়রণ এবং তার পরেই মধুসূদন! ইহাই ছিল সে যুগের, বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী শিক্ষার সত্য-যুগের সাহিত্যিক সমালোচনা। মধুকে আমরা বারংবার 'স্নব' বলিয়াছি, কিন্তু তাহার শ্রোতাদিগকে কি বলিতে ইচ্ছা করে! সাহিত্য-প্রীতির যূপকাষ্ঠে কাণ্ডজ্ঞানের মুণ্ডপাত! কাব্যানুরাগের প্রাবল্যে কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জন করিয়া ইহারা হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে—ইহারা সাহিত্যিক শহিদ্!

[২]

এই সময়ে মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত খিদিরপুরে নিজের বাড়ীতে থাকিতেন ; মধু পিতার সঙ্গে বাস করিত। মধুর এই সময়কার জীবন-যাপনের একটা চিত্র তাহার বন্ধুবান্ধবের চিঠিপত্র ও স্মৃতি-লিপি হইতে পাওয়া যায়।

সে সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া চা-পান করিত এবং কলেজে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের লেখাপড়া লইয়া থাকিত ; বিশেষ সেদিন কলেজে গিয়া বন্ধুবান্ধবকে যে রচনা শোনাইবে, সেগুলির চরম সংশোধন করিত।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ছাদের উপরে সভা বসিত : দু'চার জন বন্ধুবান্ধব আসিত ; কাব্য-পাঠ চলিত ; বায়রণ এবং বিশেষ ভাবে তৎকৃত ডন জুয়ান ; এই সময় হইতেই শয়নের পূর্ব্বে তাহার এক গেলাস মদ পান করিবার অভ্যাস হইয়াছিল। শীত গ্রীষ্ম যে ঋতুই হোক, এক খানা মোটা চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া সে শয্যা গ্রহণ করিত।

তখনকার খিদিরপুর নিভৃত পল্লীমাত্র ছিল, কাজেই মধুর বাড়ী সদর রাস্তার উপরে হইলেও নিস্তব্ধ ছিল। কচিৎ বেড়াইতে বাহির হইত, বন্ধুবান্ধব তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত, সে বড় যাইত না। সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মধু অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়া অর্দ্ধ-পরিচিত ও অপরিচিত লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিত না। বন্ধুরা আসিলে ছাদের উপরে কাব্যপাঠ চলিত ; মাঝে মাঝে গান চলিত ; মধু নিজে ফার্সি গজল গাহিত, এ সময়ে তাহার কণ্ঠ মধুর ছিল, পরবর্ত্তী কালে কণ্ঠের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়াছিল।

এ সময়ে মধুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—কাজেই সে মিতাহারী ছিল। তাহার এক বন্ধু বলেন, তাহার মদ্যপানের অভ্যাস থাকিলেও নারী-বিষয়ে সে এই সময়ে নির্দ্দোষ ছিল ; বন্ধুদের মধ্যে নারী-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইলে মধু তাহাতে যোগ দিত না। সাহিত্যের আলোচনাতেই তাহার উৎসাহ ছিল বেশি।

একদিন চাঁদনী রাত্রে মধু বাড়ীর ছাদের উপরে বসিয়াছিল, এমন সময়ে পথ দিয়া একজন লোক বাঁশী বাজাইয়া যাইতেছিল। বাঁশীর করুণ সুর মধুর হৃদয় স্পর্শ করিল ; সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে পায়চারি আরম্ভ করিল।

সে মাঝে মাঝে কলেজের বন্ধুবান্ধবকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিত। মধুর পিতা ও মাতা পুত্রের বন্ধুগণকে পুত্রের মত স্নেহ ও যত্ন করিতেন।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন অন্যান্য বন্ধু ছাড়া গৌরদাস বসাক ও ভোলানাথ চন্দ উপস্থিত ছিল। মধুর পিতা আলবোলায় ধূম পান শেষ হইলে নলটি পুত্রের হাতে তুলিয়া দিলেন—মধু ধূম পান করিতে লাগিল। পরে গৌরদাস ইহা কেমন ধারা ব্যবহার জিজ্ঞাসা করিলে মধু বলিল—আমার পিতা তোমাদের সামাজিক ও-সব তুচ্ছ আচার গ্রাহ্য করেন না। রাজনারায়ণ দত্ত নিজেই পুত্রের যথেচ্ছাচারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন, কিন্তু মধু যখন সে পথে পিতার ঈপ্সিত সীমা অতিক্রম করিয়া গেল—তখন পিতার চোখ ফুটিল! কোন বিশেষ ধারাকে মানুষে অনায়াসে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু সেই ধারা যখন নিজের সত্তায় সঞ্জীবিত হইয়া চলিতে থাকে, তখন আর মানুষে তাহাকে থামাইতে পারে না। ইহাই সংসারের পরিহাস!

সেদিন আহার্য্যের মধ্যে পোলাও-এর ব্যবস্থা ছিল। বৈষ্ণব পরিবারের গৌরদাসের সেদিন প্রথম ছাগ-মাংস আস্বাদন! আর ভোলানাথও বহুদিন পর্য্যন্ত সে পোলাও-এর স্বাদ ভুলিতে পারে নাই, কারণ,—"His *pilau* was the Czar of dishes" চন্দ মহাশয় শুধু ইংরাজী নয় ইতিহাসও জানিতেন! স্বাদু আহার্য্যের বর্ণনা উপলক্ষ্যে ইতিহাস, সাহিত্য ও খাদ্যতত্ত্বের এমন খিচুড়ি প্রায় দেখা যায় না—ইহাকেই বোধহয় জগাখিচুড়ি বলে।

পুরানো পৃথিবী নাই

—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ

পুরানো পৃথিবী নাই, নাই ধরা 'অজ্ঞানে' মগ্ন,
চরাচরে দিল দেখা নবরূপে অপরূপ সৃষ্টি;
ধরণী-জীবনে এল বিধাতার শুভ এক লগ্ন,
অতীত ডুবায়ে দিল মানবের সভ্যতা, কৃষ্টি!
চারিদিকে জাগরণ, সীমাহীন কল্পনা চক্ষে,
মরণের ভয় নাই দুর্ব্বার যাত্রীর বক্ষে;
তাণ্ডব অভিযান, ক্লীবত্ব ছাড়ি নিল দীক্ষা,
বিজয়ের লালসায় চারিদিকে বাজে রণতূর্য্য!
যন্ত্র-দানব দিল ভবিষ্য-প্রগতির শিক্ষা,
তমিস্রা-জাল ভেদি হাসে ওই নবোদিত সূর্য্য!

অন্তর ভরপুর জাগ্রত-যৌবন-স্বপনে,
বন্ধন নাহি মানে তৃষাতুর অন্তর দেবতা,
গ্রহ-তারা, উল্কায়, নীহারিকা, চন্দ্র ও তপনে
সন্ধানী ছুটে যায় আনিবারে অদ্ভুত বারতা!
বিস্ময় কিবা আর, চাহে ধরা গরিমার বৃদ্ধি,
শাশ্বত সাধনায় সব জিনি আনিবেই ঋদ্ধি!
উর্ম্মি ছুটিয়া চলে ঝঞ্ঝায় উত্তাল সিন্ধু
শেষ নাহি কামনার, শুক্তির নেশায় যে অন্ধ;
উন্মাদ খুঁজে নেয় কোথা সার এক কণা-বিন্দু
পথ-চারী এনে দিল প্রতিভায় প্রগতির ছন্দ।

গর্ব্বিতা ধরা আজ—সৃষ্টির কোলাহলে পূর্ণ,
বিজ্ঞান খুলে দিল জগতের গৌরব দৃষ্টি;
মুহূর্ত্তে প্রলয়ের সুরে হয় পর্ব্বত চূর্ণ,
দিগন্ত কাঁপায় শত অগ্নি-গোলকের বৃষ্টি!
দুর্ব্বল রবে কেন? দৈন্যের কাজ কি এ জগতে?
ক্ষুধাতুর মানবের ঠাঁই নাই আজিকার মরতে।
যত পার গ্রাস কর বঞ্চিত মানবের ভক্ষ্য,
সবলের পদতলে হবে নব ধরণীর সৃষ্টি;
হাহাকার নাহি শোনে দুর্দ্দম সেনানীর লক্ষ্য,
উর্দ্ধ গগনে আজ চলন্ত দুনিয়ার দৃষ্টি।

সভ্যতা এল আজ ঈশানের তাণ্ডব নৃত্যে,
রুদ্রের সাধনায়, তুষ্টিতে ধরা আজ মগ্ন!
সাম্যের বাণী কিগো আসিবে না অশান্ত চিত্তে?
বিপ্লব, কোলাহল প্রাণ কিগো করিবেই ভগ্ন?
"উন্নত হবে ধরা, বিগ্রহে ভরে যাবে সৃষ্টি
বিজ্ঞান এনে দিবে ক্রন্দন, কুগ্রহ, রিষ্টি!"—
সমস্যা নাহি যায়, ভাবনায় অস্থির চিত্ত।
—"কেন আজ দেখা দেয় হাহাকার, মহামারী, বন্যা?
শান্তি কি এনে দিবে অনন্ত সম্পদ, বিত্ত?"
—ধরিত্রী প্রেমে আর কবে হবে গরীয়সী, ধন্যা?

একটি মশা

—শ্রীনিখিল সেন

জোট-পুকুরের পাড়ে অশথ গাছটি অনেক দিনের। বর্ষার জলে পাড়ের মাটী খইয়া গিয়া গাছটির গোড়ায় গুহার আকারে একটি বৃহৎ গর্ত্ত পড়িয়াছে। বাঁশের বেড়া দিয়া গর্ত্তটির সামনের দিক ঘিরিয়া ফেলিয়া সেখানে সম্প্রতি গ্রামের শ্যামাচরণ সাধু তাহার আখড়া পাতিয়াছে।

মোকর্দ্দমা জিতিয়া উত্তরপাড়ার রসিকদাস মুনসেফী আদালত হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। লাল উড়ানী বাঁধা একরাশ নথি-পত্র তাহার বগলের নীচে। তাহার শীর্ণ মুখে বিজয়ের হাসি আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জোটপুকুরের পাড়ে অশথগাছটির নিকট আসিয়া সে তাহার চলার গতি অসম্ভব রকম কমাইয়া দিল। পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে কাহারও দৃষ্টি এড়াইয়া যেন হাঁটিতে লাগিল। কিন্তু রসিকদাসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সে ধরা পড়িয়া গেল। পিছন হইতে ডাক আসিল:

—সব দেখছি রে ব্যাটা, সব দেখছি।

রসিকদাস পথের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল।

—হেঃ হেঃ হে, এ শ্যামাচরণ বাবাজির চোখে ধূলো দিতে হলে বুকের পাটা চাই রে ব্যাটা, বুকের পাটা চাই, বুঝলি?

শ্যামাচরণ সাধু তাহার আখড়ায় বসিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রসিকদাস তাহার আখড়ার মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল:

—তুমি দেখ না বাবাজি, নিজেই দেখ। একটা আধলাও পাবে না আমার গাঁট থেকে!

রসিকদাস তাহার কামিজের দুটি পকেটই উলটাইয়া দেখাইল। টুপ করিয়া জেব হইতে মাটিতে পড়িল:

একটি দেশলায়ের বাক্স, পোড়া ও আধপোড়া গোটা কয়েক বিড়ি, আফিঙের একটা কৌটা, সীস-ভোঁতা একটা ছোট উড্-পেনসিল ও লিখিত-অলিখিত ভাঁজকরা কয়েক টুকরা কাগজ।

রসিকদাস জিনিষগুলি কুড়াইয়া সযত্নে আবার নিজের পকেটে রাখিয়া দিল। কহিল—সাক্ষী-সাবুদ আর উকিলের কি যোগাতেই সব ফুরিয়ে গেল কি না—বাবাজি।

—তাই না কি?

শ্যামাচরণ সাধু তাহার এক মুখ দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে অবিশ্বাসের হাসি হাসিল একটু খানি। কই দেখি, এই দিকে আয় তো।

ফস্ করিয়া শ্যামাচরণ রসিকদাসের কাপড়ের কোঁচা ধরিয়া হেঁচকা একটা টান মারিল। তাহার কোমরে কাপড়ের খুঁটে সযত্নে বাঁধা টাকা ও পয়সার থলেটি হঠাৎ ঝুলিয়া পড়িল।

রসিকদাসের সর্বস্ব বুঝি অপহৃত হইয়া গেল! সে অসহায়ের মত গোঙাইয়া উঠিল:

—দোহাই বাবাজি, তোমার পায়ে পড়ি—সব কটা নিয়ো না। আমাকে দাও, আমিই দিচ্ছি।

রসিক সাধুর দিকে অসহায় শিশুর মত কাতর চোখে তাকাইয়া রহিল। লম্বা দাড়ি ও মাথার কোঁকড়ান জটাগুলি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। ঘোলাটে চোখদুটি আবছা অন্ধকারে জ্বলিতেছে। গুহার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কেবল কেরাসিনের ডিবেটি জ্বলিয়া জ্বলিয়া একরাশ কাল ধোঁয়া উদ্‌গার করিতেছে। দেয়ালে ঠেসান দেওয়া একতারাটির একটা লম্বা ছায়া পড়িয়াছে পিছনের মেঝেতে।

একগাল ধোঁয়া নাক ও মুখ দিয়া ছাড়িয়া শ্যামাচরণ শেষে কহিল, দে না তুই নিজে; তোর টাকা কে নিচ্ছে? ব্যাটা আমার জোরে মোকর্দ্দমা জিতে এসে কি না আমাকেই শেষে ফাঁকি! ব্যাটা নিমকহারাম কোথাকার!

থলে হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া রসিকদাস শ্যামাচরণের পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। কহিল:—ও বেলাও বাবাজি, দু' দু' আনা—

শেষ পর্য্যন্ত রসিকদাসকে দর-কষাকষি করিয়া আরও একটি সিকি বাহির করিতে হইল।

আখড়া হইতে বাহির হইয়া রসিক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে দস্তুর মত ঘামিয়া উঠিয়াছে। দশ-দশটি আনা পয়সা আজ কি না সাধুবাবাজি তাহার বুক হইতে জোঁকের মত চুষিয়া নিল। ওদিকে ঘরে ছেলে-পিলেরা পয়সার অভাবে একটা ভাল দ্রব্য মুখে তুলিতে পারে না। এই দশ আনা পয়সা যদি আজ তাহার থাকিত, মুন্সীর হাট হইতে কিছু ভাল খাবার তাহাদের আনিয়া দিলে কত খুসীই না তাহারা আজ হইত। রসিকদাসের পিতৃ-হৃদয় মুচড়াইয়া একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। আদালতে যাইবার সময় সে ভাবিয়াছিল: আজকে তো মোকর্দ্দমার দিন—সাধুবাবাজিকে একবার দর্শন করিয়া যাই। কিন্তু এমন-তর ঘটিবে জানিলে কে যাইত, বল?

এমন সময় তাহার মাথার উপর গাছ হইতে একটি রাত-জাগা পাখী ডানা ঝাপটাইয়া উঠিল। রসিক চমকিয়া উঠিয়া আকাশের বুকে মুখ তুলিল: রাত্রি অনেক হইয়াছে। তৃতীয়ার ফালি চাঁদ কখন উঠিয়া, কখন ডুবিয়া গিয়াছে।

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে রসিক একবার যোগীন্দ্রদের বাড়ীর উপর চোখ দুটি বুলাইয়া লইল। পাশাপাশি তাহাদের দুইজনের বাড়ী। পূর্ব্বে একই বাড়ী, একই পুকুর ও ঘাট ছিল। কিন্তু বাঞ্ছারাম দাসের আমল হইতে দু'বাড়ীর মাঝখানে প্রাচীর উঠিয়া দুই বাড়ীকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। এখনও যোগীন্দ্রদের বাড়ীর পিছনে পুকুর-পাড়ের উপর তাহার পিতামহের যুগের তেঁতুলগাছটি নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহাদের বাড়ীটির উপর আজ যেন পরাজয়ের অপমানের একটা ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। নিঝুম হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সারা বাড়ীটি। কেবল মাঝের একটি মাত্র ঘর হইতে জানলা দিয়া আলো ঠিকরাইয়া উঠানের ঘাসের উপর একটা চতুর্ভুজের আকার লইয়াছে। যোগীন্দ্র হয়ত এখনও পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া পুরানো জরীপের নথি-পত্রগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতেছে। আর আহত একটি পশুর মত নিজের লেজ নিজে কামড়াইয়া মরিতেছে।

তাহার করুণ অসহায় অবস্থার কথা মনে করিয়া রসিকের আজ মনে বিপুল আনন্দ হইল।—এই যোগীন্দ্র দাস কি তাহাকে কম নাস্তা-নাবুদ করিয়াছে? তাহার পৈতৃক ভিটা জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে একটুও ত্রুটি করে নাই। এমন কি দিনকতক তাহার খাতক আবদুল সেখকে লেলাইয়া দিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিতেও চেষ্টা করিয়াছে।

ছবির মত সমস্ত আজ রসিকের মনে পড়িতে লাগিল।

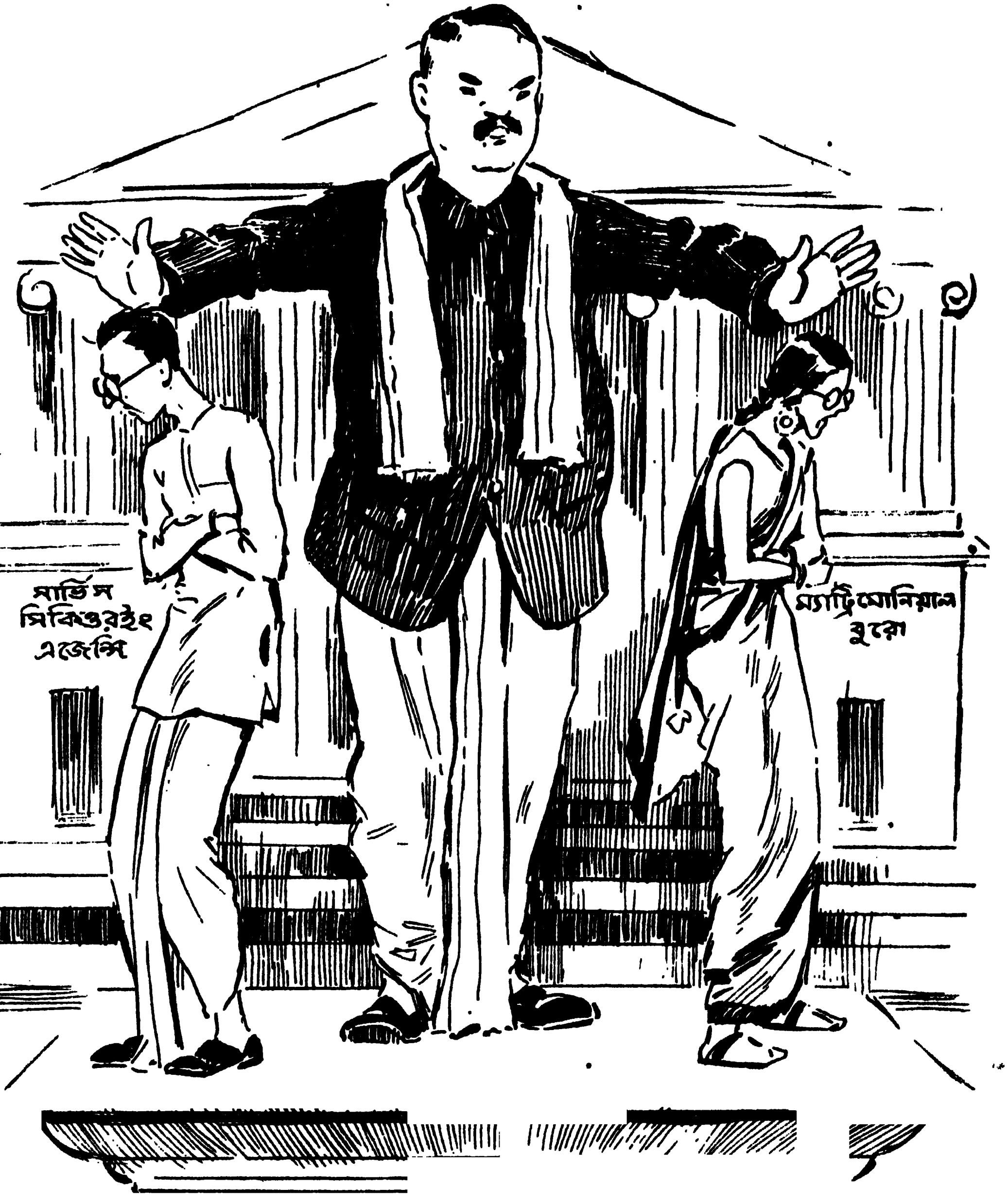
বৈশাখ মাস। সূর্য্যের প্রখর কিরণে ডোবা, বিল সব শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠে ফাটল পড়িয়াছে। পুকুরের জলও তলায় জমিয়া গিয়াছে। রসিক বাহির পুকুরের ঘাটে পা ধুইতে নামিল। পা ধুইতে ধুইতে রসিক তাহার মেজছেলের গলা শুনিতে পাইল। মাণিকের সামনে পরীক্ষা। সে পরীক্ষার পড়া তৈয়ার করিতেছে:

··ম্যালেরিয়া আমাদের পরম শত্রু। এই ম্যালেরিয়ায় দেশের কত লোক যে অকালে মরিয়া যাইতেছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি ভয়ানক সংক্রামক রোগের বীজাণু অপেক্ষা তাই মশাকে অধিকতর মারাত্মক বলিয়া ভাবিবে। এই মশাই ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়াইয়া বেড়ায়। সাধারণ লোক মশার এই শত্রুতা বুঝিতে পারে না।······

মাণিক বাহিরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া পড়িতেছিল। রসিককে আসিতে দেখিয়া পড়া থামাইয়া ডাকিয়া কহিল:

—মা, বাবা এসেছে।

তালপাতার একখানি পাখা লইয়া যোগমায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর স্বামীর হস্ত হইতে ছাতি



মা ভৈঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি একটি চাকুরী-বোর্ড গঠিত হইয়াছে—পরীক্ষায় পাশ করিয়া যাহাতে ছেলেরা চাকুরী পাইতে পারে, এই বোর্ড হইতে সেই ব্যবস্থা করা হইবে। যে-সকল মেয়েরা পাশ করিবে, তাহাদের জন্যও একটি 'ম্যাট্রিমোনিয়াল বিভাগ' হয় তো অতঃপর খোলা হইবে—উপরের পরিকল্পনা তদনুযায়ী। ভবিষ্যতে যখন বর্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলারের মর্ম্মর-মূর্ত্তি গঠনের প্রয়োজন হইবে, তখন যাহাতে ভাস্কর ইহা হইতে অনুপ্রেরণা পান, আমাদের তাহা দেখা দরকার নহে কি?



কালক্রমে

ও দলিলের মোড়কটি নিয়ে একখানি জল-চৌকি দাওয়ায় তাহাকে টানিয়া দিল। উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল :

—হ্যাঁ গা অত দেরী হ'লো কেন ? তোমাকে খুঁজতে তিন-তিনবার আমি শম্ভুকে পাঠালাম চন্দ্র মুহুরীর বাড়ীতে।

রসিক তাহার কামিজটা খুলিয়া যোগমায়ার গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল :

—উঃ কি যে গরম বউ! কই, পাখাখানা দাও তো দেখি।

—না থাক্, আমিই করছি।

যোগমায়া স্বামীর নিকটে আরও আগাইয়া আসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

—তিন কোশ পথ। এ রোগা শরীর নিয়ে কি তা আর হেঁটে আসা যায় ? নৌকা করে এলেই তো পারতে —না হয়, গোটা চারেক পয়সা যেত।

যোগমায়া ব্যস্ত হইয়া মাণিকের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া স্বামীর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিল নিজের আঁচল দিয়া। রসিকদাস কোন উত্তর দিল না। চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর এক সময় স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল :

—সব শুনেছ তো বউ ?

—তা আর শুনি নি! শম্ভু লাফিয়ে লাফিয়ে এসে জানাল—মা, চন্দ্র কা' এক্ষুণি আমায় বললেন—আমরা না কি মোকদ্দমায় এবার জিতে গেছি। কি মজা! ছেলের তো আমার পেটে খুশী ধরে না—দেখ মা, সিঁদুরে আম গাছটি এবার থেকে আমাদেরই হবে।

পুত্রের হর্ষোৎফুল্ল মুখ স্মরণ করিয়া যোগমায়া কিছুক্ষণ গর্ব্বে নীরব রহিল। তারপর স্বামীর মুখের উপর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার কহিল :

—তা' আর হবে না! আকাশে তো এখনো চন্দ্র-সূর্য্যি ওঠেন ; সত্য তো এখনো লোপ হয়ে যায় নি সংসার থেকে!

যোগমায়া একটুখানি দম লইল, তারপর যোগীন্দ্রদের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া দু'বাড়ীর মাঝে প্রাচীরটিকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিল :

—সিঁদুরে গাছটি আমাদের ভাগেই তো পড়েছিল—ছেলেপিলে দু'চারটে পেড়ে খেত। তা লোকের টাকা হলে কি আর গায়ে সয়! কিন্তু ওই যে ওপরে বসে যিনি সব দেখছেন, তাঁর চোখে তো আর ফাঁকি চলে না।

রসিক দু'হাত তুলিয়া যোগমায়াকে থামাইয়া দিল। ক্লান্ত হইয়া কহিল : থাক্ বউ আজ থাক্। ছোট বউ শুনতে পেলে হয়তো এক্ষুণি একটা খামাকা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে।

—বাধাক না দেখি। আমি কি কারো খাই না পরি যে ওদের ডরাতে হবে ?

হাত বাড়াইয়া রসিক জলের লোটাটি টানিয়া আনিল। গামছা দিয়া হাত-মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল :

—কই, ভাত বাড় তো দেখি বউ—যা ক্ষিদে পেয়েছে।

যোগমায়ার সকল রুদ্ধ আস্ফালন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গিয়া জল হইয়া গেল। হেঁসেলের দিকে পা বাড়াইয়া মমতা-ভরা কণ্ঠে সে কহিল : ক্ষিদে তো পাবেই। সেই কোন্ সকালে চারটে ভাত মুখে দিয়েছ, তা কি এখন আর আছে ?

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ প্রচুর পরিপাটী করিয়া থালা সাজাইয়া যোগমায়া ভাত আনিয়া দিল। অপর তরকারী ছাড়া মাছেরও আজ কয়েক পদ হইয়াছে। রসিক তাহাদের উপর একবার চোখদুটি বুলাইয়া লইয়া কহিল :

—অত কি হবে বউ ?

—বেশী আর কই!

যোগমায়া হাসিয়া স্বামীর কথাটিকে হাল্কা করিবার চেষ্টা করিল। মোকদ্দমায় আজ জিতিয়া যাওয়ায় তাহার মনে বিপুল আনন্দ হইয়াছে। এবং আজিকার আয়োজন যে তাহাদের নিকট অশোভন ও প্রচুর ইহা সে ভাল রকমেই জানিত। তথাপি ক্ষুধার্ত্ত ও রোগপাণ্ডুর ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া সে তাহার কোমল মাতৃ-হৃদয়কে আজ কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে নাই। কেন না, গরীবের উৎসব একদিন ভিন্ন দুদিন তো আর হয় না!

রসিক কিন্তু তেমনি ভাবে তরকারীর বাটীগুলির দিকে শূন্য ভাবে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল :—গরীব মানুষের পক্ষে তা বেশী বই কি বউ! যা দিন-কাল পড়েছে, দেখো আর দুদিন পরে নুন-শাকও জুটবে না আমাদের – শম্ভুদের।

কথাটি বলিয়া ফেলিয়া রসিকের বুকের ভিতর হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল। শুধরাইয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া আবার কহিল :

—তুমি তো সবি জান বউ, কি ছিলাম, আর এখন কি হয়েছে! রসিকের স্বর খুব করুণ হইয়া আসিল : ঠাকুরদার ছিল বিপুল জমিদারী। কিন্তু রাগের মাথায় তিনি উড়িয়ে করলেন ছারখার। বাদ বাকীটাও বাবা উড়িয়ে দিলেন সর্ব্বনাশী সেই মকর্দ্দমাটার পেছনে। তারপর এই আমি —তুমি তো দেখছ সব খোয়ালেম। এবার ভেবে দেখ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমাদের শম্ভুরা!

পাতা ভিজিয়া রসিকের চোখে জল আসিয়া পড়িল। যোগমায়ার চোখের পাতাও শুষ্ক ছিল না, তবুও ধরা গলায় কহিল :

—ছেলেদের পাতে তো আর রোজ মাছ পড়ে না। দুপুরে সাবি জেলেনীও এল ; ভাবলাম পোয়াটাক্ কিনে নি—তুমিও তো আসছ হাঁপিয়ে হুঁপিয়ে।

চোখদুটি তুলিয়া রসিক স্ত্রীর দিকে চাহিল। ঠোঁটে একখানি শুষ্ক হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল :

—কই বউ, তোমার ভাত নিয়ে এলে না?

—আনব অখন, তুমি আগে খেয়ে নাও।

—উঁহু।

রসিক হাত গুটাইয়া পিঁড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অভাব-অনাটন ও নিদারুণ মানসিক কষ্ট যদিও তাহাদের অঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের রেখা মাখাইয়া দিয়াছে, বয়স তাহাদের তেমন হয় নাই। বিবাহের পর হইতেই যোগমায়া স্বামীর পাতে খাইয়া আসিতেছে। ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া দিয়া দুজনের ভাত একসঙ্গে বাড়িয়া আনিত ও পরম হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দুজনে আহার করিত প্রচুর তৃপ্তির সহিত।

যোগমায়া হাসিয়া কহিল : যাও এখন কি আরও ছেলে-মানুসি. ভাল লাগে! লোকে দেখলেই বা কি বলবে?

—বলুক গে। আমি তা পোড়াই কেয়ার করি!

মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল রসিক।

অবশেষে যোগমায়াকেও ভাত আনিয়া স্বামীর পাতে বসিতে হইল। খাইবার ফাঁকে যোগমায়া স্বামীকে জানাইয়া দিল, ও বাড়ীর ছোট বউ বিকালে প্রাচীরের নিকটে আসিয়া তাহাদের না কি শুনাইয়া গিয়াছে—মুনসেফী আদালতেই এই মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি নহে ; হাইকোর্ট পর্য্যন্তও গড়াইয়া যাইবে। যোগীন্দ্র তাহার আরও দুহাজার টাকা লইয়া আপীল করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এবার তাহাদের সত্যি-সত্যি বাস্তভিটা ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে। কোন্ ঝোপে যে কোন্ বাঘ রহিয়াছে—রসিকদাস এখনো তাহা টের পায় নাই!

রসিকদাসও রসিকতা করিয়া হাসিয়া কহিল —তুমিও বউ বলতে পারলে না? রসিকদাস আসল বাঘ খুঁজতে বেরিয়ে, পেয়েছে শুধু কেঁদো বাঘ!

টানিয়া টানিয়া রসিক হাসিতে লাগিল। স্ত্রীকে এক সময় উদ্দেশ করিয়া আবার কহিল :—যোগীটার আইনের যদি এককোঁটা মাথা থাকত! খালি টাকা থাকলে আর কি হয়? আজ দেখি কাছারীতে ও শুধু উকিলদের পিছু পিছু হাঁটছে আর বলছে, যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি—মোকদ্দমাটা একবার খালি জিতিয়ে দিন! হেঃ হেঃ হেঃ।

যোগীন্দ্রের অসহায় অবস্থার কথা কল্পনা করিয়া রসিক হাসিতে লাগিল।

—দেখো বউ, ওকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে তবে আমি ছাড়ব, এ আমি বলে রাখলাম—আমি বাঞ্ছারাম দাসের নাতি, হ্যাঁ—আর কেউ নই!

একটুখানি দম লইয়া রসিক আবার সুরু করিল : দাঁড়াও না একটু। সরিকী পেছন পুকুরটা নিয়ে আরো এক তরফা মামলা রুজু করে দিচ্ছি। এ মামলাতে গিয়ে ভায়াকে—

এমন সময় মাণিক ডাকিয়া কহিল : সে এখন ঘুমাইতে যাইতেছে ; যোগমায়া তাহাকে যেন খুব ভোর রাতে কাক জাগিবার পূর্ব্বে জাগাইয়া দেয়। সে উঠিয়া সিন্দূরে আমগুলি সব কুড়াইয়া আনিবে। নইলে ওই বাড়ীর জ্যোৎস্না উঠিয়া আগে হইতে সব আমগুলি লইয়া যাইবে।

যোগমায়া মাণিককে আশ্বাস দিল :—নিক্ না দেখি, কেমন নিতে পারে। চোর সাজিয়ে থানায় নিয়ে যাব না ?

সে স্বামীর চোখের দিকে তাকাইল :—কি বল গো ?

—ঠিকই তো! একেবারে গেলে—প্রি ইয়ারস্ আর-আই। উৎসাহিত হইয়া রসিকদাস মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

—জান বউ, বাবাকে তো ওরা চেয়েছিল ঐ ভাবে জেলে পুরতে !

অতি সাধারণ একটি ব্যাপারই পরিণামে অসাধারণ হইয়া দাঁড়াইল—একটি জটিল গৃহ-বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিল। কচি পরগাছাটি একটি বিরাট বটগাছে উঠিয়াছিল। কিন্তু দিনে দিনে উহা বাড়িয়া যে সেই গাছটিকে ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেলিবে, তাহা কেহ কোনদিন ধারণাও করে নাই। তিনপুরুষ ধরিয়া এই বিবাদের সূত্রপাত চলিয়াছে—ভাই ভাইয়ের বুকে নিজের পাশব-শক্তির চরম বিকাশ দেখাইয়া আসিতেছে—বংশানুক্রমে পরস্পর পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের রেশ টানিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহার গোড়ায় অতি তুচ্ছ একটি কারণ :

জমিদার বাঞ্ছারাম দাস বাহিরের বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসিয়া সরকারের খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় তাঁহার চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি আরও কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া লইলেন। পরের মাসেও একই সংখ্যক ব্যয় সেই খাতে দেখিয়া তিনি ভুঁরু কুঁচকাইয়া তাকাইলেন সরকার মহাশয়ের দিকে।

অনেকদিনের পুরাতন সরকার। অসহায় হইয়া কহিল :

—কি করব কর্ত্তাবাবু, ছোট বাবু যে—

—কে, মাধব ?

—হ্যাঁ, টাকা না দিলে তিনি চটে যান কি না।

বাঞ্ছারাম বাবু চোখদুটি আবার খাতার উপর নামাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন :

—ওকে একবার ডেকে পাঠান তো সরকার মশাই।

মাধব বৈঠকখানায় আসিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল :—আমাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, দাদা ?

বাঞ্ছারাম বাবু মুখ না তুলিয়া উত্তর দিলেন :—হ্যাঁ।

—কেন ?

—এদিকে আয়, দরকার আছে বলছি।

মাধব গাঁট হইয়া সেই ভাবে দাড়াইয়া থাকিয়া বলিল :

—তাড়াতাড়ি বাপু বলে ফেল। আমারও কাজ আছে।

বাঞ্ছারাম বাবু এইবার মুখ তুলিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন :

—তুই এ দু'মাসে দেড় হাজার টাকা নিয়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—অত টাকা তোর কিসে লাগল ?

—দরকার ছিল—···মাধব মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল।

—অত টাকা তোর কিসের দরকার ? কই, আমাকে তো বলিস্ নি ?

—না।

মাধব হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল—তুমি অত কৈফিয়ৎ তলব করছ কেন বল তো ?

—আমি কৈফিয়ৎ তলব করছি! বাঞ্ছারাম বাবু মাধবের কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

—হ্যাঁ, কৈফিয়ৎ তলব করাই তো! টাকা তো খালি তোমার নয় যে, আমাকে মিছেমিছি তোমার চোখরাঙানি খেতে হবে ?

বাঞ্ছারাম বাবু বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন। ইহা যে তিনি মাধবের নিকট হইতে কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, মাধবের এতখানি সাহস বাড়িয়া যাইবে—সে তাঁহার মুখের উপর সাহস করিয়া কথা কহিবে।

পিতার মৃত্যুর পর মাধবের শুষ্ক মুখখানি তাঁহার আজ মনে পড়িল। চারিদিকে বিশৃঙ্খল তছ-নছ কাণ্ড। অবিশ্বাসী নায়েব-গোমস্তারা তাঁহাদের দুজনকে নাবালক পাইয়া

প্রতারণার কপট অভিসন্ধি খুঁজিতেছে। তাঁহার মাথার উপর তখন শকুনের ঝাঁক উড়িতেছে। তেমন দুর্দ্দিনেও তিনি তাঁহার ছোট ভাইটিকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন; ছোট ভায়ের অসংখ্য আবদার-অভিযোগ নীরবে সহিয়াছেন।

অন্তিম শয্যায় পিতার শেষ অনুরোধটিও তাঁহার আজ মনে পড়িয়া গেল: দেখিস্ বাবা, মাধবটা নেহাৎ ছেলে মানুষ; তাকে মানুষ করিস—তোকেই সে ভার দিয়ে গেলাম। বাঞ্ছারাম দাস তাহা হইলে এতদিন দুধকলা দিয়ে সাপ পুষিয়া আসিয়াছেন!

বাঞ্ছারাম বাবু অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিন্তু একবার চটিয়া গেলে একেবারে আগুন হইয়া উঠেন। মাধবের এতখানি ঔদ্ধত্য তিনি প্রথমে স্নেহ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীমাত্রায় বাড়া-বাড়ি দেখিয়া তিনি একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়িলেন:

—বেল্লিক কোথাকার, কী বলছিস তোর খেয়াল আছে?

মাধবের মাথায়ও আজ ভূত চাপিয়া বসিয়াছে। জীবনে যে কখনও দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা কহে নাই, সেই আজ খামাকা জবাব দিয়া বসিল:

—থাকবে না কেন? বাবা টাকা রেখে গেছেন একলা কী তোমার জন্যে? তুমি যা-তা খরচ করতে পার, আর আমি দরকারে কিছু টাকা নিলাম বলে তোমার আর ভাত গেলা যাচ্ছে না?

বাঞ্ছারাম বাবু রাগে অন্ধকার দেখিলেন। তবুও যতদূর সম্ভব নিজের প্রবল উত্তেজনাকে সংযত করিয়া কহিলেন:

—আমি যা-তা খরচ করি?

—করই তো; বৌদি-দের—

বাঞ্ছারাম বাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। হাতের কাছে কলমদানিটা পাইয়া তাহাই তিনি মাধবের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন:

—বেরো তুই, বেরো—বেরো, আমার বাড়ী থেকে। চাষা, গোঁয়ার, অসভ্য কোথাকার! এক্ষুনি আমি আমিন ডেকে তোর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছি।

হাত ছুঁড়িয়া তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন—তোর বৌদিও সেদিন বলছিল আমাকে—তুই আজকাল একদম ইয়ে হয়ে যাচ্ছিস। তা আমি ভাবলাম—ছেলে মানুষ, হ'লোই বা একটুখানি। কিন্তু তলে তলে তুই এ্যাদ্দুর গড়িয়ে গেছিস? দূর হ? দূর হ, দূর হ আমার সামনে থেকে—দূর হ!

সেদিনেই দু' ভাই পৃথক্ হইয়া গেল বিষয়-আশয়ের সমান বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া। এবং দুই বাড়ীর মাঝখানে একটি বিরাট প্রাচীর তুলিয়া দুই বাড়ীর সকল সংস্রব ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু বিবাদটি এইখানেই চুকিয়া গেল না।

ফুলদাখালীর মুখে একটি নূতন চর পড়িয়াছিল। বাঞ্ছারাম বাবুর প্রজারা প্রথম হইতে তাহা দখল করিয়া আসিতেছে। কিন্তু একদিন দেখা গেল, ছোটবাবু তাঁহার জনকয়েক লাঠিয়াল লইয়া তাহাদিগকে বেদখল করিতে আসিয়াছেন। দুদলের মধ্যে একটা ছোট-খাট দাঙ্গা হইয়া গেল। ছোটবাবুর অল্পসংখ্যক লাঠিয়াল গ্রামবাসীদের নিকট হটিয়া গেল। তিনি ফৌজদারী করিতে সহরে ছুটিলেন।

বাঞ্ছারাম বাবু এই মোকর্দ্দমার শেষ নিষ্পত্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। একটি জটিল মোকর্দ্দমার আপীল হাইকোর্ট জারী করিয়াই তিনি চিরতরে চোখ বুঁজিলেন। তাঁহার পুত্র পিতার অপূর্ণ ইচ্ছা পূরাইতে অগ্রসর হইল।

এইরূপে তিন-পুরুষ ধরিয়া বিবাদের সুরু—পরম্পর তাহারই রেশ টানিয়া আসিতেছে!

বহুদিনের সংস্কারের অভাবে বাঞ্ছারাম দাসের পাকা-দালানটি আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার একখানি ঘর থাকিবার জন্য রসিকদাস কোনরকমে একটুখানি দোরস্ত করিয়া লইয়াছে। একটি মাত্র ঘর। সংসারের জিনিস-পত্রগুলি তাহার মধ্যে গিস গিস করিয়া ঠেসিয়া আছে। রসিকের পৈতৃক খাটখানিমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। তাহার জায়গা হইতে শম্ভুকে একটুখানি সরাইয়া দিয়া রসিক শুইয়া পড়িল। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে, এদিক ওদিক সাক্ষী, বাড়ী হাঁটাহাঁটিতে তাহার আজ বড়

ক্লান্তি বোধ হইল। আবার গ্রীষ্মের গুমোট গরম;—রসিকের অসহ্য বোধ হইল। বাহিরের কোথাও একটি গাছপালা নড়িতেছে না—সবাই অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তালপাতার পাখাখানা দিয়া রসিক নিজকে খানিকক্ষণ হাওয়া করিল। তবুও তাহার চোখে একফোঁটা ঘুম আসিল না। তাহার চোখের উপর আসিয়া উঠিল কাছারির প্রত্যেক লোক: মুনসেফবাবু রায় লিখিতেছেন। উকিলবাবু তাহার হইয়া জেরা করিতেছেন। শুষ্ক মুখ লইয়া যোগীন্দ্রদাস মুনসেফবাবুর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।

রসিক ডানপাশ ফিরিয়া শুইল।

ডান হাতে একরাশ মাজা বাসন লইয়া ও বাঁ হাতে একটি কেরোসিনের ডিবে লইয়া যোগমায়া এই সময় ঘরে ঢুকিল। সে খাটের নীচে বাসনগুলি রাখিয়া দিয়া দরজায় খিল আকটাইয়া দিল। স্বামীর দিকে ফিরিয়া তারপর কহিল:

- ওগো, শুনছ?

রসিক কিন্তু শুনিয়াও কোন সাড়া দিল না।

যোগমায়া খাটের নিকট আগাইয়া আসিল। মশারিটি ফেলিয়া দিয়া তাহা বিছানার নীচে গুজিয়া দিতে দিতে কহিল—বাপ রে, কী ঘুম! ছেলেদের এদিকে মশায় গিলে খাচ্ছে, তার যদি একটুখানি খেয়াল থাকত?

যোগমায়া সরিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের উপর একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িল। কহিল: ওগো, ঘুমুলে না কি?

- উঁহু!

—মাথা টিপে দেব? তোমার তো আবার একটু রোদ লাগলেই অমনি মাথা ধরে সসে।

রসিক স্ত্রীর হাতখানি কপাল হইতে সযত্নে তুলিয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল—তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অসহ্য গরম; যোগমায়াও ঘামিয়া উঠিয়াছিল। আঁচল দিয়া কপাল হইতে খানিকটা ঘাম মুছিয়া দিয়া সে রসিককে খানিকক্ষণ হাওয়া করিল, তারপর অবশ দেহে নীচে ঘুমাইয়া পড়িল।

ছেলেদের লইয়া যোগমায়া নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জমাট অন্ধকার ঘরের ভিতর থম-থম করিতেছে। বাহিরে একদল শিয়াল এক সময় ডাকিয়া উঠিল। মাণিকের বাঁধা কুকুরটিও তাহাদের সঙ্গে বার কয়েক ঘেউ ঘেউ করিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। কিন্তু রসিকের চোখে এখনও ঘুম আসিল না। খিল খুলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উঠান পার হইয়া সে বাহিরে গেল। তারপর রাস্তা বাহিয়া যেখানে একদিন বাঞ্ছারামদাসকে পোড়ানো হইয়াছিল সেই খানে গিয়া সে দাঁড়াইল। বাঞ্ছারাম দাসের চিতা যেখানে সাজানো হইয়াছিল, সেখানে সে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর নিথর আকাশে মুখ তুলিয়া দু হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল:—আজকেও ঠাকুরদা, মোকদ্দমায় আর এক তরফা জিতে এলাম। তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে আশীর্বাদ কর যেন এই যোগীন্দ্রদাসের ভিটের প্রদীপ আমি নিবুতে পারি।

রসিক হঠাৎ পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। তাহার এই অট্ট-হাসি রাত্রির নিবিড় নীরবতাকে, পুকুরপাড়ের নিঝুম নিস্তব্ধতাকে কাঁপাইয়া, ফাটাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল।

পুকুরপাড়ের কাঁঠাল গাছটি হইতে কয়েকটি ঘুম-ভাঙ্গা পাখী ভয় পাইয়া উড়িয়া গেল।

রসিক হাসিয়া আবার কহিল:—কেমন, খুশী হয়েছ তো ঠাকুরদা? কালকেই দেখ না, আর এক দফা নালিশ রুজু করেছি। ভায়াকে এবার সত্যি সত্যি গাছ-তলায় নামাচ্ছি। বাঞ্ছারাম দাসের অপমান আমি ঠিক শোধ করবই করব!

পুকুরপাড়ের উপর রসিক খুব জোরে পায়চারি করিতে লাগিল। মনের উত্তেজনায় তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল খুব ঘন ঘন।

তারপর কি মনে করিয়া সে এক সময় ঘাটে গিয়া জলে পা নামাইয়া বসিয়া পড়িল। হাত দিয়া জলে অকারণ দাগ কাটিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে উঠিয়া আসিয়া সিন্দুরে আমগাছটির তলায় সে আবার গিয়া দাঁড়াইল।

বহুদিনের পুরাতন গাছ। অনেকগুলি ডাল-পালা মেলিয়া নীচে একটা বিরাট, ঘন ছায়া ফেলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে গাছটি, বাঁশের বাঁখারি দিয়া যোগীন্দ্রদাস গাছটিকে. ঘিরিয়া নিজের সীমানার মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কাল সকালে সে পেয়াদা আর দফাদার ডাকিয়া এই বাঁখারির বেড়া কাটিয়া ফেলিবে। আইনতঃ গাছটি সে আজ পাইয়াছে।

রসিক মনে অনেকখানি শান্তি পাইল। আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে বাড়ীর দিকে ফিরিল। কিন্তু দাওয়ার উপর উঠিয়াই তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—মাণিক এখানে বসিয়া যেন পড়িতেছে: মশা আমাদের পরম শত্রু।

রসিক কথাটি বিড় বিড় করিয়া বার কয়েক আউড়াইয়া লইল। ম্যালেরিয়ার মশা আমাদের পরম শত্রু! শত্রু বই কি—পরম শত্রু! সম্পূর্ণ সুস্থ একটি লোকের শরীরে সে পারে অপরের দূষিত বীজাণু ছড়াইয়া দিতে। পারে সে তাহাকে ক্রমে ক্রমে কাহিল করিয়া ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতে—পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার সকল আশা ও আশঙ্কা তাহার অকালে ভাসাইয়া দিতে। সে পারে বংশানুক্রমে সংক্রামক রোগের বীজাণু ছড়াইয়া দিতে।

রসিক বাহিরের বারান্দার উপর পায়চারী করিতে লাগিল।—অতি সামান্য একটা কীট; কিন্তু তাহার অসাধারণ বিক্রম দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ বনিয়া যাইতে হয়। সকল চক্ষু ফাঁকি দিয়া অলক্ষ্যে সে কখন আসিয়া তাহাকে দূষিত করিয়া যায়, তাহা বোকা মানুষ টের পায় না। তাহারও নীরোগ দেহে কখন আসিয়া যে সংক্রামক ব্যাধি ছড়াইয়া গিয়াছে—মিশাইয়া গিয়াছে তাহার ঠাকুরদার দূষিত রক্ত—তাহার পিতার কলুষিত রক্ত। হয়ত তাহার এই দূষিত রক্তের বীজাণু মাণিকদের পবিত্র শরীরেরও ছড়াইয়া পড়িতেছে।

রসিক তাহার মুঠাটি কঠোর মুষ্টিবদ্ধ করিল। না, সে মারিয়া ফেলিবে—আজকেই মারিয়া ফেলিবে হিংস্র সেই কীটটাকে—দু'হাত দিয়া পিষিয়া ফেলিবে সর্ব্বনাশী সেই মশাকে। সে যাহাতে আর না পারে মাণিকদের পবিত্র রক্ত কলুষিত করিতে। যাহাতে আর না পারে তাহাদের ঘাড়েও মোকদ্দমার ভূত চাপাইয়া দিতে।

সে দু'হাতে দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সিন্দুকের উপর হইতে সেগুণকাঠের কাল হাতবাক্সটি বাহির করিয়া আনিল। কেরোসিন তেলের ডিবেটি জ্বালিয়া সে বাক্সটি খুলিয়া বসিল। তারপর দু'হাত দিয়া গুচ্ছ গুচ্ছ করিয়া অনেক পুরাণ পঁথি-পত্র, মোকদ্দমার অনেক দামী দলিল-পত্র মাটীতে সে নামাইতে লাগিল। দুহাতে কচলাইয়া লইয়া সেগুলি সে প্রদীপের শিখাটির উপর তুলিয়া ধরিল। সে আজ সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিবে; তিন-পুরুষের মামলা-মোকদ্দমার যবনিকা সে আজ টানিয়া দিবে। পুড়াইয়া সে আজ ছাই করিয়া ফেলিবে গৃহ-বিবাদের সমস্ত রেশা-রেশি। তাহার প্রিয় দলিল-পত্রগুলি।

জ্বলন্ত শিখাটি হইতে রসিক হঠাৎ আধপোড়া দলিল-পত্রগুলি টানিয়া আনিল। তাহার চোখের উপর সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল: বৃদ্ধ বাঞ্ছারাম দাস তাঁহার শীর্ণ দুহাত নাড়িয়া তাহাকে বারণ করিতেছেন—পোড়াস্ নে দাদু, পোড়াস্ নে। ত্মাখ—ত্মাখ ভাই, আমার বুকে এখনো জ্বলছে আগুন দাউ-দাউ করে; প্রতিহিংসায় বুক ফেটে যাচ্ছে ভাই! ও ভিটেয় সাঁঝের প্রদীপ জ্বলতে দিস নে দাদু—কিছুতেই জ্বলতে দিস নে! তাহার পিতাও তাহাকে একই অনুরোধ জানাইয়া বলিতেছেন: কী করিস বোকা, ও কাগজপত্র কি নষ্ট করতে আছে? মোকদ্দমা যে তা হ'লে ওরা জিতে নেবে!

রসিকদাস বাক্সের মধ্যে আবার নথি-পত্রগুলি ঢুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তাহার কানের কাছে সেই মশাটি ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে আর মাণিকের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতেছে। মশাটিকে তাড়াইয়া দিবার জন্য রসিক তাহার ডান হাতখানি কানের কাছে তুলিল। মশাটি একবার উড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। রসিকের শরীরে সে তাহার দূষিত বীজাণু আকণ্ঠ ছড়াইয়া দিয়াছে।

কেরোসিনের ডিবেটি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। নিঝুম বাড়ীটি অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রদীপ-শিখাটির দিকে রসিক হাল্কা ভাবে তাকাইয়া রহিল। সে যেন দেখিতে পাইল: মশাটি তাহার নিকট হইতে উড়িয়া গিয়া সামনের পা-দুখানি দিয়া তাহার ছোট শুঁড়টি বার কয়েক পরিষ্কার করিয়া লইয়া, ঘুমন্ত মাণিকের বুকে উড়িয়া গিয়া বসিয়াছে। আর পরম আনন্দে তাহার কোমল বুকে শত্রুতার বীজাণু শুঁড় দিয়া ঢুকাইয়া দিতেছে!

রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। তারপর ব্যর্থ আক্রোশে দুহাতে মুখ ঢাকিয়া অসহায় ভাবে গুমরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চতুষ্পাঠী

প্রতিভা বনাম অধ্যবসায়

-শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যবসায়

ঊনবিংশ শতাব্দী তখন অনন্ত কালের স্রোতে বিলীন হতে চলেছে। এক ইতালীয় যুবক আপন মনে বাঁশের গায়ে বাক্সর মত কি সব লাগিয়ে দিনরাত নাড়াচাড়া করেন। গাঁয়ের লোকেরা অনেক প্রশ্নের পরও কোন জবাব না পেয়ে তাঁকে ভাবল—পাগল! আজ যে আমি আপনাদের না দেখেও * আমার বক্তব্য শোনাবার সুযোগ পেয়েছি, তা ঐ পাগলেরই পাগলামির ফলে। সেই পাগল আজকের জগৎ-বিখ্যাত মার্কনি। অসীম ধৈর্য্যের সহিত শত গঞ্জনা সয়ে, নানান বাধা-বিপত্তির মাঝ দিয়ে তাঁর গবেষণা চালাতেন, কি করে বিনা-তারে ইথার কাঁপিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পাঠাতে পারা যায়—তারই ফলে আজ ঘরে ঘরে রেডিও বাজছে! মার্কনির প্রতিভা আজ জগতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

তাই-ই হয় অধ্যবসায়ের গুণে। শত বাধা-বিপত্তি ও বারবার বিফলতা সত্ত্বেও সঙ্কল্পসাধনের জন্য যে একনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তা অবশেষে জয়যুক্ত হবেই। প্রতিভা খুবই বড় জিনিস, কিন্তু তেমনি বিরল। প্রতিভা বিশ্ব-জয়ী, তার স্পর্শে সমস্তই হয়ে ওঠে সজীব—সুন্দর। অনেকে বলেন, প্রতিভা কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত সহজাত। কিন্তু এই সহ-জ গুণ নিয়ে পৃথিবীতে ক'জন জন্ম গ্রহণ করেন? আর শুধু এই প্রতিভাবলেই কি সব মহৎ কার্য্য সাধিত হয়েছে? সংসারের পথ তো বিঘ্ন-বহুল—পদে পদে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। যেখানে প্রতিভার সঙ্গে অধ্যবসায়ের মণি-কাঞ্চন যোগ স্থাপিত হয়েছে, সেইখানেই সফলতা এসে মানুষের মাথায় বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। আত্মশক্তিতে আস্থাবান লোকে তাই বলেন, প্রতিভা ঈশ্বর-দত্ত শক্তি নয়,—অধ্যবসায়েরই নামান্তর। "Genius is nothing but the power of lighting one's own fire." কার্লাইল বলেছেন—"Genius is an infinite capacity for taking infinite pains."

মানব-শিশু হাঁটতে শেখে বার বার প'ড়ে আবার উঠবার চেষ্টা ক'রে। যে সব মহৎ কাজ করে মহাপুরুষেরা ঐহিক অমরতা লাভ করেছেন—তাতেও প্রয়োজন হয়েছিল, অদম্য উৎসাহ, অন্তহীন চেষ্টা—অধ্যবসায়।

দিনের পর দিন কলম্বস জাহাজ চালিয়ে চলেছেন অনন্ত সাগরের বুকে—খাদ্যের অনটন ঘটল, ধৈর্য্য হারিয়ে নাবিকরা হ'ল বিদ্রোহী; কিন্তু কলম্বস নৈরাশ্য জানেন না—সঙ্কল্প তাঁর অটল। তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হল। আবিষ্কারক লিভিংষ্টোন, স্বেন হেডিন্, মরু-যাত্রী ন্যানসেন্ ইত্যাদির ভ্রমণ-কাহিনী পড়লে জানা যায় যে, তাঁরা কি করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। এঁদের প্রতিভার কোন দামই থাকত না, যদি না থাকত তার সঙ্গে অধ্যবসায়ের যোগ। বফোঁ (Buffon) এই জন্যে প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—"It is patience." পৃথিবীর কোন বড় কাজই ইচ্ছামাত্র একেবারে গড়ে ওঠেনি - একটির পর একটি বাধা অতিক্রম করে প্রতিভার বিকাশ হয়েছে অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। শ্রীরাম-চন্দ্রের সেতুবন্ধন থেকে সুরু করে আজকালকার পুল বা বাঁধ তৈরীর ইতিহাস ঐ একই কথা শোনায়।

---

* কয়েকদিন আগে বেতারে বিদ্যার্থীমণ্ডলে স্কুলের ছেলেদের নিয়ে কতক গুলি "ডিবেট" বা বিতর্কের আয়োজন হয়েছিল। এই বিতর্কটিও বেতারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিভার স্বপক্ষে বলেন, আদর্শ বাণী-মন্দিরের ছাত্র. শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ সেন এবং অধ্যবসায়ের স্বপক্ষে বলেন, কেশব এমাডেমীর ছাত্র শ্রীমান্ অসীমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিতে গিয়ে লর্ড বীকনস্‌ফিল্ডকে বসে পড়তে হয়েছিল শ্রোতৃবর্গের হাসি ঠাট্টায়। তিনি বলেছিলেন, "এমন একদিন আসবে যেদিন সারা গ্রেট্‌ ব্রিটেন আমার কথা শোনবার জন্যে হাঁ করে থাকবে।" তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী—সফল হয়েছিল তাঁহারই ঐকান্তিক ক্লান্তিহীন চেষ্টায়

গ্রীক্‌ বাগ্মিপ্রবর ডিমস্থিনিসের কথা কে না জানে? অত বড় বাগ্মী বোধ হয় আজও পৃথিবীতে কেউ জন্মান নি। সেই ডিমস্থিনিস বাল্যকালে তোৎলা ছিলেন—স্মরণশক্তিও ছিল ক্ষীণ। বার বার লিখে অভ্যাস করে, জিবের তলায় নুড়ি রেখে চীৎকার করে, পড়বার সময়ে মুদ্রাদোষ দূর করবার জন্যে চারপাশে ধারালো অস্ত্র রেখে, সময় নষ্ট না হয় তারই জন্যে মাথা কামিয়ে ঘরে আবদ্ধ থেকে—একে একে তাঁর সমস্ত দোষগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এই অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে। অনার্য্য বালক একলব্য এমনি কঠোর সাধনায় অস্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অর্জ্জুনের বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভাও তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যেতে পারে ভেবে অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কর্ণ, বিশ্বামিত্র—এদের প্রতিষ্ঠার মূলেও আছে ঐ অধ্যবসায়। আমাদের বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে অধ্যবসায় বলেই আত্মোন্নতি লাভ করে দেশপূজ্য হয়েছেন। রাজপুত-কুল-রবি রাণা প্রতাপের অলৌকিক বীরত্বের সঙ্গে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ছিল বলে, অমিত-প্রতাপ আকবরের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকেও এক চিতোর ছাড়া সমস্ত দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আলফ্রেড, রবার্ট ব্রুস—এদের ইতিহাসও স্মরণযোগ্য।

বাঙালী রাধানাথ সিক্‌দারের প্রতিভা আছে এভারেষ্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারের মূলে। কিন্তু তাঁর প্রতিভা পূর্ণ সফলতা লাভ করবে সেই দিন, যেদিন মানুষ ঐ শিখরে তার জয় পতাকা পুঁতে দিয়ে আসবে। দিনের পর দিন মানুষ চেষ্টা করছে এভারেষ্টে উঠতে, কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরছে। উৎসাহ কমেনি, আবার নবোদ্যমে অভিযান করছে। রাট্‌লেজ্‌ একাধিকবার অভিযান করেছেন—এই সে দিনও গিয়েছিলেন। গাঁইতি গেঁথে, কোমরে দড়ি বেঁধে সেই দুরতিক্রম্য, দুর্গম পাহাড় ঠেলে উঠতে হয় অভিযানকারীদের এক পা এক পা করে। কখনও কখনও পাহাড়ের ধ্বস্‌ নেমে কয়েকজনের চিরসমাধি দেয়—কেউ পা পিছলে হাজার হাজার ফিট্‌ নীচে পড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়, তবুও উৎসাহ কমে না। হিমালয়ের অত্যুত্তুঙ্গতা মানুষ প্রায় জয় করে ফেলেছে। আরভিং, ম্যালোরী ঐ চিরতুষারের রাজ্যে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁদের আত্মা তৃপ্ত হবে সেই দিন, যেদিন কেউ সত্যিই এভারেষ্ট শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে অধ্যবসায়ের জয়েতিহাস সম্পূর্ণ করবে। "শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।"

নীল আকাশে পাখীরা উড়ে বেড়ায় মনের আনন্দে ডানা মেলে। মানুষ কল্পনার জাল বুনত—কবে সেও ঐ রকম উড়ে বেড়াবে। পৌরাণিক যুগ থেকে ওড়বার চেষ্টা হয়ে আসছে। কত রকম যন্ত্র ও উপায় উদ্ভাবন হল প্রতিভা বলে, কিন্তু মানুষের বাসনা চরিতার্থ হতে লেগেছে বহু বৎসরের সাধনা—মন্‌ গলফিয়ের, অটো লিনেলথিয়াল, ষ্ট্রাংলার, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ইত্যাদি কত মনীষীর অধ্যবসায়ের ফলে আজ সেই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

আমেরিকার কোন সহরে একদিন দেখা গেল এক যুবক ল্যাণ্ডো-গাড়ীর ওপর এক ইঞ্জিন বসিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে।

ছেলে বুড়ো সবাই মিলে তাকে ক্ষ্যাপাতে সুরু করলে। সামান্য গৃহস্থের ছেলে, যুবক এখন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী। হেনরী ফোর্ড তাঁর অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেয়েছেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এডিসন—যাঁর প্রতিভার দান গ্রামোফোন বিখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠ-মাধুর্য্য দিয়ে আমাদের অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদন করে—সামান্য পিয়ন থেকে অত বড় বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন, শুধু একনিষ্ঠ সাধনার বলে।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"—কিন্তু একটা মোটা অঙ্কের মূলধন নিয়ে কারবার ফেঁদে বসলেই কি লক্ষ্মী এসে ধরা দেন? ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি বা সফলতা লাভ করতে হলে টাকার চেয়ে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন বেশী। প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ে "লাল বাতি" জ্বলে, যদি অধ্যবসায় না থাকে—অথচ, সামান্য অবস্থা থেকে অধ্যবসায়ের গুণে ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি লাভ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, আবিষ্কারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে—সব তাতেই অধ্যবসায়ের জয় হয়। প্রতিভা নিয়ে বেশী

মানুষ জন্মায় না। জীবন-সংগ্রামে প্রতিভার চেয়ে অধ্যবসায়ের দাম বেশী। অধ্যবসায় ছাড়া প্রতিভাও নিষ্ফল। দুঃসাধ্য কাজ শুধু অধ্যবসায়েরই বলে সাধিত হয়। ছাত্র-জীবনে অধ্যবসায়ের যে কত দাম তা সহজেই অনুমেয়। জীবনের যত জটিল, দুরূহ সমস্যা, তার master-key—open sesame হচ্ছে অধ্যবসায়!

—শ্রীঅসীমনাথ বন্দোপাধ্যায়

প্রতিভা

নিজেকে প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত করবার যে ক্ষমতা, তারই নাম দেওয়া যায় প্রতিভা। নিজেকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করবার এই যে ক্ষমতা—এটা সকলের থাকে না; সুতরাং সকলেই প্রতিভাবান্ নয়। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রতিভা। হয় তো বলতে পারি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির পুণ্যফল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার জন্ম। 'a genius is born'...জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিভার উন্মেষ। প্রতিভা নিজেই নিজের যশের পথ-ক্ষমতার পথ সৃষ্টি ক'রে নেবে।

অধ্যবসায়কে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছিনে; অধ্যবসায়েরও গুণ আছে বৈ কি। আমি শুধু বলতে চাই যে, প্রতিভা আর অধ্যবসায়ের মধ্যে অনেক খানি তফাৎ রয়েছে

কালিদাস আর তরুণ কবি 'কাঙ্গালীচরণে'র মধ্যে যে প্রভেদ···আইনষ্টাইন আর কোন মলম-আবিষ্কারকের মধ্যে যে প্রভেদ···প্রতিভা বহু উর্দ্ধে···অনেক উঁচু স্তরের জিনিস। তাই খুব কম লোকই প্রতিভাবান্। অধ্যবসায় কিন্তু দুর্ল্লভ নয়। মানুষ চেষ্টা করলে অধ্যবসায়ী হতে পারে, কারণ ওটা অভ্যাস-সাপেক্ষ, কিন্তু চেষ্টা করে কেউ প্রতিভাবান্ হতে পারে না···

অধ্যবসায় আজ পর্য্যন্ত অসাধারণ কিছু আমাদের দেয় নি, যাতে মানুষ অক্ষয় যশ লাভ করতে পারে, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পূজ্য হতে পারে—এক কথায় অমরত্ব অর্জ্জন করতে পারে···

জগতে সাহিত্য দিয়েছে প্রতিভা, বিজ্ঞান দিয়েছে প্রতিভা, চারু-শিল্প-কৃষ্টি দিয়েছে প্রতিভা, কাব্য, দর্শন, জ্ঞানের যা কিছু সব প্রতিভার দান। প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হল প্রতিভা··· থেকে, অধ্যবসায় করল তাকে প্রসারিত। প্রতিভার বলে 'সিদ্ধার্থ' হলেন 'বুদ্ধ'···অধ্যবসায়ের দ্বারা অশোক করলেন সেই প্রতিভার সৃষ্টিকে দিকে দিকে প্রসারিত। প্রতিভা করেছে সৃষ্টি; অধ্যবসায় করছে সৃষ্টি রক্ষা। প্রতিভার বলে বিদ্যাসাগর··বঙ্কিমচন্দ্র···হিট্‌লার···মুসোলিনী···অধ্যবসায়ী প্রতিভার প্রদর্শিত পথে চলে···'মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ' এই বাক্য অনুসরণ করে কৃতী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্রতিভাবানের ক্ষমতা, সৃষ্টির ক্ষমতা একটা বড় কিছু দান করবার ক্ষমতা অধ্যবসায়ের নেই···

প্রতিভার বলে ডাক্তার মুমূর্ষু রোগীকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল, অধ্যবসায় শুশ্রূষা ক'রে তাকে সুস্থ করে তুলল। জার্ম্মানীর প্রতিভা সৃষ্টি করল ব্যোমযান···অধ্যবসায় তারই প্রদর্শিত পথে চলে প্রতিভার ইঙ্গিতে কাজ করে আকাশে আজ প্রতিভার বিজয় নিশান উড়িয়েছে। প্রকৃতিকে করতলগত করবার ক্ষমতা বিশ্বমানবকে দিয়েছে প্রতিভা···আজ যে বেতারের সাহায্যে আমার অকিঞ্চিৎকর বক্তব্য আপনাদের শোনাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সেও এই প্রতিভার দান···

অধ্যবসায় দিয়ে বিশ্বকবি শেক্সপীয়ার, বিজ্ঞানাচার্য্য এডিসন, মহাকবি দান্তে, হোমার, মিলটন হওয়া যায় না। ওদিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যাঁরা জগতে অধ্যবসায়ের জন্য বড় হয়েছেন—নিছক অধ্যবসায়ই তাঁদের বড় করে নি। আমি বলব ওই অধ্যবসায়ের ভিতরেও ফুটেছে তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব—তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা। প্রতিভাকে বাদ দিয়ে যে অধ্যবসায় তাকে দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না, তার ক্ষমতা সামান্য। দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্:—

এই যেমন গাড়ীটানা ঘোড়া আর রেসের ঘোড়া। গাড়ীটানা ঘোড়ার অধ্যবসায় আছে প্রচুর—এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু রেসে যে ঘোড়া ফার্ষ্ট হয়—তার আছে প্রতিভা। দ্রুত গমনের প্রতিভা। ধরুন গবুচন্দ্রের কথা। সে একজন পরম অধ্যবসায়ী ছাত্র। দিনে আঠারো ঘণ্টা পড়েও এক এক ক্লাশে দুই তিন বছর থেকে তবে পাকা হয়ে আর এক ক্লাশে উঠে। ছেলেবেলায় তাকে মাষ্টার মশাই 'মাই হেড'এর মানে বলে দিয়েছিলেন—'আমার মাথা'। সে সমস্ত রাত আর সারা সকালটা ভীষণ অধ্যবসায়-

সহকারে মুখস্থ করে স্কুলে গিয়ে বললে, 'মাই হেড'? দাঁড়ান বল্‌ছি—'মাই হেড' মানে "মাষ্টার মশায়ের মাথা"—মাষ্টার মশাই বললেন, তুমি একটি আস্ত গাধা; কিন্তু গবুচন্দ্রের অধ্যবসায় ছিল না এ কথা তার শত্রুও বলতে পারে না।

সঙ্গীতের প্রতিভা যার আছে, সে একটা সুর শুনে অমনি তাকে মনে গেঁথে নিলে, সঙ্গীতের ভেতরে সেই নতুন-শোনা সুরটুকু মিশিয়ে দিলে নিখুঁত ভাবে···অধ্যবসায়ীর সে সুর আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগল ..বহু আয়াস করে—পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করে তুলে যদি বা সেটুকু আয়ত্ত হল, কিন্তু সেটুকু সে নিজের করে নিতে পারলে না···তাই বলছিলাম যে, প্রতিভার সাফল্যের কাছে অধ্যবসায়ের দ্বারা অর্জ্জিত সাফল্য দাঁড়াতে পারে না।

যার অভিনয়ের প্রতিভা আছে, সে খুব কম সময়ের মধ্যে একটা ভূমিকা তৈরী ক'রে নিলে, এমন কি শুধু প্রম্‌টিং শুনে অভিনয় করে গেল···অধ্যবসায়ী বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়ে বহু অভিনেতার অভিনয় বহু রজনী দেখে—শেখার ভেতর শিখলে উচ্চারণ-ভঙ্গী অথবা দু-চারটে অঙ্গভঙ্গী···কিন্তু অঙ্গভঙ্গী তো অভিনয় নয়, স্থানবিশেষে ওটা অভিনয়ের সহায়তা করে মাত্র—আনুষঙ্গিক ছাড়া আর কিছুই নয়··

·· অধ্যবসায়ের জোরে যাঁরা বড় হয়েছেন ব'লে আমরা মনে করি—তাঁদের উন্নতির মূলেও রয়েছে প্রতিভা। অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে...নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতেই হবে·· প্রতিভার এই যে প্রেরণা—এই প্রেরণাই মানুষকে সত্যকারের মানুষ করে তোলে; তাকে অমর করে তোলে।

প্রতিভাবান্ জগতে শুধু সুনামই অর্জ্জন করেন না, তিনি জগৎটাকে একটা বড় কিছু দান করে যান·· শত সহস্র লোককে পথের সন্ধান দিয়ে যান [কারণ সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রতিভা পথ প্রদর্শন করে], প্রতিভাবান্ হয়ে রইলেন চিরস্মরণীয়···আর অধ্যবসায়ী সাধারণ অবস্থা থেকে—সাধারণ মানুষ থেকে বড় জোর খানিকটা উপরে উঠে গেল। অধ্যবসায়ের দ্বারা ঐ টুকুই সম্ভব হল। জীবনটা হয় তো একেবারে ব্যর্থ হল না, কিন্তু জগতকে দেবার তার কিছু নেই, তার কাছ থেকে জগতের নেবারও কিছু নেই···

দুইটি ছেলে—একটির প্রতিভা আছে আর একটির অধ্যবসায় আছে, যার প্রতিভা আছে, সে পড়বার হয় তো সুযোগ পায় না, বহু অসুবিধার ভেতর দিয়ে পড়ে সে বরাবর ক্লাশে ফার্ষ্ট হচ্ছে। আর অধ্যবসায়ী ছেলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে—প্রচুর অবকাশ ও সুবিধে সত্বেও বড় জোর পাশ করে বেরুল।

এর কারণ কি?

কারণ একটির ঐ সামান্য সাফল্যটুকু নির্ভর করছে অধ্যবসায়ের ওপর; আর একটিকে ভগবান দিয়েছেন প্রতিভা।

যার কাব্য-প্রতিভা আছে সে ট্রামে বসেও কবিতা লিখতে পারে; যার কবি হওয়ার সখ আছে ষোল আনা অথচ সম্বল মাত্র অধ্যবসায়--সে কেবল পোষাক-পরিচ্ছদে চাল-চলনের ভেতর দিয়েই কবি হওয়ার সখ মেটায়। আষাঢ়ের নব-মেঘ দেখে কালিদাস লিখেছেন 'মেঘদূত'; তাঁর ছিল সত্যকারের প্রতিভা। অধ্যবসায়ী হরিদাস যদি মেঘের দিকে নিশিদিন তাকিয়ে থাকে, আর নবধারা-জলে স্নান করে মেঘদূত লিখতে যায়—তার কলম দিয়ে কবিতা এক লাইনও বেরুবে না, কিন্তু ডবল নিউমোনিয়ার আশঙ্কা ষোল আনা··· দেখা যায় জগতের বেশীর ভাগ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থার ভেতর দিয়ে জীবনে বহু দুঃখকষ্টের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে মানুষ হয়ে উঠেন। প্রতিভা যাঁর আছে তাঁর শক্তির বিকাশ একদিন না একদিন হবে। কেউ তাকে চেপে বা ধরে রাখতে পারবে না।

এডিসনের এমন একদিন গিয়েছিল, যখন রাস্তায় রাস্তায় কাগজ ফিরি করতেন। অশেষ দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু তবু তাঁর প্রতিভা লুপ্ত হয় নি। কারণ প্রতিভা লুপ্ত হবার বস্তু নয়। উত্তর-কালে এডিসন হলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। সেক্সপীয়রের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল। তাই থিয়েটারের দলে ভিড়ে, সিন ঠেলার কাজ করেও তাঁর সেই প্রতিভা বিলুপ্ত হল না; বরঞ্চ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের উপর তাঁর সহানুভূতি আরও বেড়ে গেল। প্রতিভা তাঁকে ঠিক পথে চালিত করছে বলেই আজ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার··· প্রতিভা কারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না, নির্য্যাতনে দমিত হয় না, আঘাতে বিচলিত হয় না। প্রতিভাবানের জাতি

নেই, দেশকাল নেই, সমাজ নেই, প্রতিভাই তার পরিচয়, "a genius is not confined to any country or race" প্রতিভাকে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না, তিনি সকলের। প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি অসাধারণ। ভগবানের কাছ থেকে নিয়ে আসেন জ্ঞানের আলোক, তাঁর হৃদয়-দর্পণে শ্রীভগবানের জ্যোতি—সত্যের জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করে তোলে।

প্রতিভা নিয়ে আসে ভগবানের বাণী। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত করছে প্রতিভা। প্রতিভার কাছে ঋণী অধ্যবসায়, ঋণী সমস্ত মানব, ঋণী সমস্ত জগৎ…

তাই প্রতিভাবান্ অসাধারণত্ব নিয়ে দেখা দেন; তাঁকে আমরা বলতে পারি অসাধারণ মানব, অতি-মানব, মহা-মানব।

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেন

পুস্তক ও পত্রিকা

এ ও তা—শ্রীপ্রভু গুহ-ঠাকুরতা। প্রাপ্তিস্থান—ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রয়াল আটপেজী ফর্ম্মার ১৮৪ পৃষ্ঠা। মোটা এন্টিক কাগজে সুদৃশ্য ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, মনোরম প্রচ্ছদ। মূল্য দুই টাকা।

বাঙ্গালাদেশে সমালোচক হইবার সুবিধা আছে। কেন না, চোখ বুজিয়া প্রায় অধিকাংশ বই সম্বন্ধেই মন্তব্য প্রকাশ করা যায়—অপাঠ্য। সমালোচকের এই পরিচিত সুখ-শয্যায় অতি দীর্ঘ ব্যবধানে সহসা এক একটি বই কণ্টকের মত আসিয়া উপস্থিত হয়, সমালোচক চক্ষু রগড়াইয়া উঠিয়া বসেন —তাই তো! এদিক-ওদিক চাহিয়া কাঁটাটি কোথায় কিরূপ ভাবে লুকাইয়া আছে—দেখিতে বাধ্য হইতে হয়। আলোচ্য পুস্তকটি এইরূপ একটি কণ্টক —সুঅভ্যস্ত 'অপাঠ্য' মন্তব্যটি ইহার সম্বন্ধে তো খাটেই না, এমন কি পাঠ্য বলিয়া এবং দুই চারিটি কর্ত্তব্য সাঙ্গ করিবার মত বিশেষণের সহিত একটি গুনিতে-ভাল প্যারাগ্রাফ লিখিয়া দিলেও মনে হয়, কর্ত্তব্য করা হইল না। অথচ বইখানি তেমন যুগান্তরকারী কিছু নহে—অতি সামান্য ভাবে ও সরল ভাষায় লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ মাত্র। কিন্তু এই সামান্যত্ব ও সারল্যই—আমাদের মনে হইয়াছে—ইহার বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষায় লিখিত কচিৎ কদাচিৎ কোন প্রবন্ধ-পুস্তকে এই শ্রেণীর সারল্য ও সামান্যত্ব পাওয়া যাইবে সেগুলি সব গভীর গাম্ভীর্য্যের ঠাসবুনানি। অথচ এত গভীরত্ব ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও সেই সব পুস্তকে যে মাল-মসলা আছে, তাহার কোনটি অপেক্ষা ইহার মাল-মসলা কম নহে। প্রবন্ধের বিষয়-সূচী দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। রুশ, জার্ম্মান, ফরাসী, আইরিশ, ইটালীয়ান, ইংরাজী, জাপানী, আমেরিকান ইত্যাদি জাতির যুদ্ধের কিছু পরে ও পূর্ব্বে প্রকাশিত অধিকাংশ লেখকেরই কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য রচনার বিষয়-বস্তুর সন্ধান ইহাতে পাওয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইবে এই সব দেশের সমসাময়িক চিন্তার ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা জ্ঞাতব্য। বইখানি গাইড্-বুকের ভঙ্গীতে লিখিত। মনে হয়, কোন সুগৃহিণী বাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে বাড়ীর কোথায় কি আছে, তাহাই বুঝাইতেছেন,—এ দেরাজে টাই, ও দেরাজে কলার, এখানে সুটগুলি—ওখানে ধুতি, পেঞ্জী, পাঞ্জাবী। রান্নাঘরে—এখানে আধা, ওখানে তেজপাতা—এই সব রহিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের অধিকাংশ গলিঘুঁজির ঠিক-ঠিকানা লেখক এই পুস্তকে সহজে এইরূপ ভাবে সাবলীল ভাষায় দিয়াছেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে পড়ুয়া ছেলের অভাব নাই, যেমন আমাদের দেশে এমন পর্য্যাপ্ত পরিশ্রমী গৃহিণীর অভাব হয় নাই। কিন্তু এই দুয়েরই কাজে পারিপাট্য অপেক্ষা হৈ-চৈ বেশী। লেখক আমাদের প্রেক্ষাগৃহের একটি ছবি আঁকিবার সময় অলক্ষ্যে আমাদের এই মানসিক ও সাংসারিক গৃহস্থালীর সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন:—

"মাটিতে না ব'সে চেয়ারে ব'সে এ যুগে অভিনয় দেখার চল হোয়েছে ব'লেই যে আমাদের অভিনয়োপভোগকালীন জাতীয় অভ্যাসগুলি বদলে গেছে তা নয়। আগে আগে অভিনয়ের সময় মাটিতে ব'সেও আমরা সকলে মিলে যে গোলমাল ও কোলাহল করতুম আজোও তা করি……এই কোলাহলটা যদি শুধু দর্শকের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকতো, তা হোলে না হয় সেটা একটা সংশোধনীয় অপরাধের মধ্যে ধরা যেতো; কিন্তু এই কোলাহলের সঙ্গে যখন পান-বিড়ি—সোডা-লেমনেড্-ওয়ালারা সমস্বরে ঐকতান বাদনের অনুরূপ সঙ্গীতে তাদের সুর মেলায়; তার উপর যখন জাগ্রত কিংবা অজাগ্রত বেয়াড়া খোকা-খুকিরা কখনো বৈবতে, কখনো সপ্তমে তাদের ক্রন্দনরোল তোলে; এবং মহিলা-মহল থেকে থিয়েটারের ঝিরা, "ওগো শ্যামবাজারের হরিপদ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা কই গো,—তোমাদের ডাকছে গো—"।… তখন মনে হয় চুলোয় যাক্ আমাদের হালফ্যাসনে প্রেক্ষাঘর, ঢের ভালো ছিল সেই ঠাকুরদা'র আমোলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ব'সে যাত্রার সেই নির্দ্দোষ আনন্দ-সম্ভোগ—" এইরূপ "গুপ্তবাবুর বাজারে"র মধ্যে লেখকের এই পুস্তকে পড়ুয়াত্বের সহিত পটুয়াত্বের এবং গিন্নীপনার সহিত শ্রীছাঁদের পরিচয় পাইয়া আমরা খুসী হইয়াছি।

লেখকের বোধ হয় এই প্রথম বই, কিন্তু এই যদি তাঁহার শেষ বই হয়,

তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের কথা। এ দেশের বহু দুর্ভাগ্যের একটি এই যে, এখানে কামারের বাজারে কুমারেরা ভিড় করিয়া থাকে এবং এই কুমারেরাই স্যাকরা বলিয়া নিজের পরিচয় দান করে। এই অবস্থায় যদি 'স্যাক্‌রা'রা নিজেদের ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে দুঃখের কথা। উৎসর্গ-পত্রে লেখক "লিখে দু'পয়সা রোজগারের" কাহিনী জানাইয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই দু'পয়সাও তাঁহার লিখিয়া রোজগার হয় নাই। তা হইলেও, ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে, তাহাদের যাহাতে লিখিয়া দু'পয়সা রোজগার হয়, ইহারই জন্য একদল লেখককে নিজেদের স্বার্থ ভুলিয়া আজ গাঁইতি-সাবল লইয়া লাগিয়া থাকিতে হইবে। 'এ ও তা'র লেখককে আমরা সেই কার্য্যে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ জানাইতেছি।

প্রাচীন গীতিকা হইতে—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ডবলক্রাউন ষোল পেজী, ৫৬ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে ছাপা, বাঁধাই ভাল।

বিশী মহাশয় "বঙ্গশ্রী"র পাঠকদের অপরিচিত নহেন। সংপ্রতি তিনি যদিও বঙ্গশ্রীতে আর কবিতা লিখিতেছেন না, তাহা হইলেও তাঁহার উপন্যাস পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন আসলে তিনি কবি। এই কবিতার বইয়ের ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় আছে। বই খানি "মহুয়া", "দস্যু কেনারামের মুক্তি", "মলুয়া"—এই তিনটি কাব্য-কাহিনীর সমষ্টি। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর কাব্যকে 'ব্যালাড্' বলে। 'ব্যালাড্' হইলেও ইহার ভঙ্গী সংস্কৃত, 'ক্লাশিক্যাল্'-চেষ্টা করিয়া নহে, বেশ বুঝা যায়, কবির স্বাভাবিক প্রতিভার রূপ এই, কবি যে সংস্কৃত কাব্যের রস-সাগরে স্নান করিয়া কাব্য-লক্ষ্মীর পূজায় বসিয়াছেন, তাহাও যেমন স্পষ্ট, তেমনই ইউরোপীয় কাব্যকুঞ্জ হইতেও যে তিনি পূজার পুষ্প চয়ন করিয়াছেন—ইহাও পরিস্ফুট—অথচ পূজা করিবার মধ্যে কবির স্বকীয়ত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। যেমন—

চামেলী চমক-লাগা শশী-রাকা নীরব শর্ব্বরী
পাখী-জাগা আলো-আঁকা, ছায়া-ঢাকা পথে,
যুগল ঘোড়ার ক্ষুর রহি রহি উঠিল শিহরি
এ শাখে কোকিল ডাকে কুহুস্বর অন্য শাখা হতে
স্বরের বসনখানি বুনে দেয় স্তব্ধ বায়ুস্রোতে।
ধরণীর রসোচ্ছ্বাস কুসুমের অজস্র বুদ্‌বুদে
অসহ্য প্রাণের ভরে বৃন্তপরে কাঁপে শতে শতে
মৃত্যুর ললাটে দেয় জীবনের পত্রলেখা খুদে।
সৌরভের স্বপ্নঘরে প্রাণস্বপ্নে মরণের নেত্র আসে মুদে।

বিদগ্ধ পাঠক এই নির্য্যাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিবেন।

পদ্মা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। গোলাপ পাব্লিশিং হাউস, ১২নং হরীতকীবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈচিত্র্যপূর্ণ খণ্ড কবিতার একত্র সমাবেশ বাহ্যতঃ দেখা যায় বটে, কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িলে একটা অখণ্ড ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে করুণ সুর এবং বেদনার গান ফুটিয়া উঠিয়াছে তদুপরি কোথাও আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুলতার উন্মেষ দেখিতে পাই। কবিতাগুলি আড়ম্বরপূর্ণ নহে; আন্তরিকতার দ্যোতনায় উপভোগ্য এবং হৃদ্য হইয়াছে। ছন্দ-বৈচিত্র্যে, প্রকাশ-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সংযম-বৈশিষ্ট্যে পদ্মা আমাদের অন্তরকে আনন্দ দিয়াছে, এখানেই ইহার সার্থকতা। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট যুগোপযোগী। কাব্য-পিপাসুগণের নিকট 'পদ্মা' আদরণীয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গত সংখ্যার 'আলোচনা'য় নিম্নলিখিত ভুলগুলি থাকিয়া গিয়াছিল :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ৬৩৯, ৬।৭ পংক্তি "অনেক সময়ে অর্দ্ধরাত্রির পর পশ্চিম গগনে উদয় হয়।"	পৃঃ ৬৩৯, ৬।৭ পংক্তি "অনেক সময়ে অর্দ্ধরাত্রির পর বা পশ্চিম গগনে উদয় হয়।"
পৃঃ ৬৪১, ৮।৯ পংক্তি "৩০০ হইতে ১০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষেও এই ভাবে প্রাচীন বৈদিক অশ্বিন্যাদি প্রবর্ত্তিত হয়।"	পৃঃ ৬৪১, ৮।৯ পংক্তি "৩০০ হইতে '০' খৃঃ পূঃ মধ্যে ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষেও এই ভাবে প্রাচীন বৈদিক অশ্বিন্যাদি পরিত্যক্ত হয়।"

সম্পাদকীয়

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।

জনপ্রিয় হইবার পন্থা

সাগরপারের ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ, অথবা ভারতীয় রাজ-কর্ম্মচারিগণ, অথবা ভাবসঙ্কর মডারেটপন্থিগণ, অথবা অন্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাবানুকরণ-প্রয়াসী খদ্দরধারী কংগ্রেসপন্থিগণ, অথবা ভারতীয় সংবাদপত্রসেবিগণের কে কি করিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহাঁদের অনেকেরই অধিকাংশ আধুনিক কার্য্যের উদ্দেশ্য জনপ্রিয় হওয়া, অথচ উহাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ক্রমশঃ জনসমাজের অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছেন।

উপরোক্ত ধুরন্ধরগণের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা লোকপ্রিয় (popular) হইবার চেষ্টা সত্ত্বেও যে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছেন, তাহার কারণ—প্রকৃত পক্ষে সমগ্র জনসমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে যে পন্থায় অগ্রসর হইতে হয়, উহাঁদের কেহই সেই পন্থায় অগ্রসর হইতেছেন না। পরন্তু উহাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব মস্তিষ্ককে যথোপযুক্ত পরিমাণে আলোড়িত না করিয়া টীয়াপাখীর মত কতকগুলি বুলি আওড়াইয়া সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কিছু না করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

আমরা আমাদের এই পত্রিকায় একাধিকবার প্রমাণিত করিয়াছি যে, সমগ্র জগতের জমী প্রায়শঃ উত্তরোত্তর শুষ্কতা প্রাপ্ত হওয়ায় অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে এবং ঐ অনুর্ব্বরতা প্রায় সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এইরূপ ভাবে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অন্ততঃপক্ষে গত পাঁচশত বৎসর হইতে জগতের স্থানে স্থানে কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্যে লাভবান্ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং যে কৃষক একদিন জগতের সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তথাকথিত সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য দেশে সেই কৃষকগণ প্রায়শঃ ধনিকগণের অধীনে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্তু, যে পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ একদিন কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্ব স্ব দেশের উৎপন্ন খাদ্য-শস্য ও কাঁচামালের দ্বারা নিজ নিজ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, সেই তথাকথিত সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ মুখে স্বাধীনতার আস্ফালন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রায়শঃ খাদ্য-শস্য ও কাঁচামালের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেছেন। তাহা ছাড়া জমীর শুষ্কতাবশতঃ প্রায় প্রত্যেক দেশের বায়ু ও জল বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং টীয়াপাখীর অথবা শৃগালের 'ধরম্' পরিত্যাগ করিয়া লোকগণনার তালিকাগুলি একটু চক্ষু মেলিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বাকী ছিল অ্যাসিয়াখণ্ডের কয়েকটি দেশ। কিন্তু ঐ সব দেশের জমীর অনুর্ব্বরতাও যেরূপ ভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অদূরভবিষ্যতে জমীর অনুর্ব্বরতা যাহাতে অধিকতর হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, তাহা করিতে না পারিলে তথাকথিত সুসভ্য বিজ্ঞানের রাজত্বকালে মনুষ্যজাতির স্বাস্থ্যপূর্ণ অস্তিত্ব (wholesome existence) পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে।

আমাদের মতে মনুষ্যজাতিকে এই দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করিবার সামর্থ্য একমাত্র উপরোক্ত ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যান, ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি, ভাবসঙ্কর মডারেট-পন্থী ইঙ্গো-অ্যাংলো (অর্থাৎ যাঁহারা জন্মতঃ ভারতবাসী, বাক্যতঃ ভারত-প্রেমিক অথচ কার্য্যতঃ ও চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে বিলাতী)

খদ্দরধারী কংগ্রেসপন্থী এবং যে সমস্ত সংবাদপত্র তাঁহাদের জয়ঢাক বাজাইয়া থাকেন, তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে। অর্থাৎ ঐ ধুরন্ধরগণ চেষ্টা করিলে এখনও মনুষ্যজাতিকে অধিকতর খিন্ন অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারেন এবং তাহা করিতে হইলে ঐ ধুরন্ধরগণের বর্ত্তমান কার্য্যপন্থা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য উপরোক্ত ধুরন্ধরগণের অধিকাংশ কার্য্যেরই উদ্দেশ্য যে জনপ্রিয় হওয়া, তাহা পাঠকবর্গকে দেখান।

সাগরপারের ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ কয়েক সপ্তাহ হইতে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে ভারতীয় ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ, ইংলণ্ডস্থ সংবাদপত্রসমূহ এবং প্রথিতনামা ইংরেজগণ ভারত সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাহার দিকে নজর করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে নজর করিলে দেখা যাইবে যে, যে-সমস্ত কংগ্রেস-প্রতিনিধি প্রাদেশিক অ্যাসেমব্লিসমূহে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে সমবেত হইয়া প্রাদেশিক রাজকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন—তজ্জন্য অধিকাংশ ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যে, প্রায়শঃ রাজকার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা, লোকহিতকর দায়িত্বপূর্ণ কোন কার্য্য সম্বন্ধেই ক্ষমতা-সম্পন্ন নহেন, তাহা যে যে স্থানে তাঁহাদের উপর কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা করিলেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। যে জাতীয় বিশৃঙ্খলা, অসততা এবং অবিচার কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের পরিচালিত কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে দেখা যাইবে, সেই জাতীয় বিশৃঙ্খলা ঐ ঐ প্রতিষ্ঠান যখন তথাকথিত বুরোক্রেসীর দ্বারা পরিচালিত ছিল—তখন পরিদৃষ্ট হইত না। কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের হস্তে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিণতি এবংবিধ শোচনীয় আকার অবলম্বন করে কেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস-নেতৃবর্গ প্রায়শঃ ব্যবহারজীবী এবং তাঁহারা কি করিয়া অসৎ মানুষ ও কার্য্যকে সৎ এবং সৎ মানুষ ও কার্য্যকে অসৎ বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়, তাহার বক্তৃতায় অল্পাধিক সিদ্ধহস্ত বটে—এবং তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই প্রতারণা ও দম্ভের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে মানুষের হিতকর শৃঙ্খলিত গঠন-কার্য্যে সুনিপুণ হওয়া যায়, সেই সমস্ত শিক্ষায় বিন্দুমাত্রও শিক্ষিত নহেন। কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের এতাদৃশ অকর্ম্মণ্যতা যে ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের অপরিজ্ঞাত, তাহাও বলা চলে না।

এই অকর্ম্মণ্য মানুষগুলির হস্তে প্রাদেশিক শাসনভার ন্যস্ত হইলে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে যে জনসাধারণ অধিকতর বিপন্ন হইবে, ইহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাজেই, প্রশ্ন হইয়েছে যে, এতাদৃশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের এত ব্যস্ততা কেন?

ইহার উত্তরে হয়ত ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ বলিবেন যে, যাহাতে জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিগণের হাতে কার্য্যভার অর্পিত হয়, তাহা করা প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের যুক্তি-যুক্ততা প্রদর্শন করিতে পারেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অর্থাভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি যাহাতে দূরীভূত হয়, তাহা করাও যে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য এবং অকর্ম্মণ্য লোকের হস্তে শাসনভার অর্পিত হইলে যে ঐ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না, তাহা মানিয়া লইলে কি ইহা বলিতে হয় না যে, জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিগণের হস্তে শাসনভার অর্পণ করা যেরূপ প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, সেইরূপ আবার দেশীয় কোন অকর্ম্মণ্য লোককে যাহাতে জনসাধারণের কেহ প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিবার প্রবৃত্তিসম্পন্ন না হন, তদনুযায়ী শিক্ষাকার্য্য অথবা প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করাও প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য?

কাযেই বলিতে হইবে, লোক-প্রিয় হওয়া ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের যাদৃশ অভীষ্ট, প্রজাসাধারণের যাহাতে অর্থাভাব অথবা অস্বাস্থ্য অথবা মানসিক অশান্তি বিদূরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

এইরূপ ভাবে ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে যেমন দেখা যায় যে, জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর ব্যবস্থাসমূহের সম্ভাবনা বিসর্জ্জিত করিয়া তাঁহারা লোকপ্রিয় হইতে প্রস্তুত, সেইরূপ আবার দেশীয় ষ্টেটস্‌ম্যানগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল কোন্ প্রকারে কি কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের কার্য্যতালিকায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, রাস্তাঘাটের উন্নতি, খাজনাহারের হ্রাস, কৃষি-ঋণের লাঘব করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। কংগ্রেসপন্থিগণও সাধারণতঃ উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের কথাই আওড়াইয়া থাকেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল সাধারণতঃ তাঁহাদের কার্য্যতালিকায় যে যে ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোনটিই যে দেশীয় জনসাধারণের পক্ষে হিতকর নহে, তাহা আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত "সংগঠন-পরিকল্পনা ও তৎসম্বন্ধে বিবেচ্য" শীর্ষক সন্দর্ভে প্রমাণিত করিয়াছি।

যদি দেখা যায় যে, যে-পরিকল্পনা আপাতপক্ষে শ্রুতি-মধুর, অথচ বস্তুতপক্ষে জনসাধারণের হিতকর নহে, সেই পরিকল্পনার কথা একদিকে যেরূপ কংগ্রেসপন্থিগণ অহরহঃ আওড়াইয়া থাকেন, অন্যদিকে আবার প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলও ঐ ঐ পরিকল্পনা তাঁহাদের কার্য্যতালিকায় গ্রহণ করিতেছেন, তাহা হইলে কি বলিতে হয় না যে, কংগ্রেসপন্থিগণ যাদৃশ অদূরদর্শী, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের অর্ব্বাচীনতাও ঠিক ঠিক তাহারই অনুরূপ এবং চিন্তাশীলতাবিহীন অনুকরণের দ্বারা এই মন্ত্রিমণ্ডল জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন?

ভাবসঙ্কর মডারেট-পন্থিগণের নেতৃবর্গ কোন্ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ মহাশয়গণের মুখেও একদিকে যেরূপ প্রায়শঃ কংগ্রেসপন্থিগণের কার্য্যতালিকা উচ্চারিত হইতেছে, অন্যদিকে আবার কংগ্রেসপন্থিগণ যাহাতে সরকারের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টাতেও ঐ মডারেটপন্থিগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মডারেটপন্থিগণের চালচলন পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হইবে যে, তাঁহারা যে কেবলমাত্র কোন চিন্তাশীলতার কার্য্য না করিয়া টীয়াপাখীর ধরম-সম্পাদনের দ্বারা জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নহে, সরকারের প্রিয়পাত্র হওয়াও তাঁহাদের অন্যতম কার্য্য।

কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যে কুত্রাপি দেশের জনসাধারণের প্রকৃত কোন হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা যাহা কিছু করিতেছেন, তদ্দ্বারা যে দেশের জনসাধারণের সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা আমরা একাধিকবার একাধিক সন্দর্ভে প্রমাণিত করিয়াছি।

এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, কি ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ, কি দেশীয় মন্ত্রিসভা, কি মডারেটপন্থী রাজনৈতিক, কি কংগ্রেসপন্থী, ইঁহারা কেহই প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের সমস্যা কোথায়, তাহার সন্ধানে যে বিন্দুমাত্রও সময়ক্ষেপ করিতেছেন, তাহার কোন সাক্ষ্যের অস্তিত্ব নাই, পরন্তু প্রত্যেকেই সস্তায় জনপ্রিয় হইবার উদ্দেশ্যে টীয়াপাখীর মত এক একটী অর্থহীন বাণী প্রদান করিতেছেন এবং তাহার ফলে জনসাধারণ প্রতারিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে।

আমরা এখনও ইঁহাদিগের প্রত্যেককেই মানবজাতির প্রকৃত সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের মতে এখনও সতর্ক হইবার সময় আছে।

রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের ভালত্ব ও মন্দত্ব

কোন একটি রাজ্য যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, অথবা অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কি কি পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহার আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

রাজ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়;

(১) প্রথমতঃ দেখিতে হয়, রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত;

(২) দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হয়, কি পদ্ধতিতে রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত;

(৩) তৃতীয়তঃ দেখিতে হয়, রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা কাহার হওয়া উচিত; এই প্রসঙ্গে রাজতান্ত্রিক অথবা প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহার বিচার করিতে হয়।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, রাজ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে যে, উপরোক্ত ত্রিবিধ আলোচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

রাজ্য-নিয়ন্ত্রণ (Government) বলিতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর কার্য্য বুঝায়, তাহা লইয়া মতপার্থক্য বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু রাজ্য-নিয়ন্ত্রণ বলিতে যে কোন না কোন শ্রেণীর কার্য্য বুঝায়, তৎসম্বন্ধে কোন মতপার্থক্য নাই।

কোন একটি কার্য্য সঠিকভাবে অথবা বেঠিকভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ প্রথমতঃ ঐ কার্য্যটির উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিয়া লইয়া, দ্বিতীয়তঃ ঐ কার্য্যটির অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উদ্দেশ্যানুগ হইতেছে কি না এবং যদি দেখা যায় যে, ঐ কার্য্যটির অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উদ্দেশ্যানুরূপ হইতেছে না, তাহা হইলে তৃতীয়তঃ ঐ কার্য্যের কর্ত্তা যথোপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ কোন একটি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে সাধিত হইতেছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলেও যে, প্রথমতঃ রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, দ্বিতীয়তঃ ইহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উদ্দেশ্যানুরূপ কি না, তৃতীয়তঃ উহার অনুষ্ঠান-কর্ত্তাগণ যথোপযুক্ত বিদ্বান্ কি না, তাহার আলোচনা করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে রাজ্য বলিতে কি বুঝায় এবং উহার প্রয়োজনীয়তা কি তাহার বিচার করিতে হইবে।

রাজ্য বলিতে কি বুঝায় এবং উহার প্রয়োজনীয়তা কি, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন মানুষের জীবন ব্যক্তিগত ভাবে সর্ব্ব রকমের অবিমিশ্র সুখময় করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে তাহার কতকগুলি শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অন্যদিকে সমষ্টিগত ভাবে কতকগুলি সংগঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মানুষ যতই শিক্ষিত ও সাধু হউক না কেন, যাহাতে হিংস্র পশু অথবা হিংস্র মানুষগুলি তাহার জীবনযাত্রায় কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সংগঠিত না হইলে, ঐ মানুষের পক্ষে নিরুপদ্রব জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হয় না। সেইরূপ আবার মানুষ যতই শিক্ষিত ও সৎ হইবার চেষ্টা করুক না কেন, যাহাতে সকলের পক্ষে শিক্ষিত ও সৎ হওয়া সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে কাহারও পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শিক্ষিত ও সৎ হওয়া সম্ভব হয় না।

যে সমস্ত ব্যবস্থায় সকলের পক্ষে শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিরুপদ্রব জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পাদিত করিতে হইলে যে, সঙ্ঘবদ্ধ প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

মানবসমাজের মধ্যে যে বিবিধ রকমের মানুষ বিদ্যমান আছে, তাহাদের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সর্ব্ব স্তরের মানুষই ঐ সঙ্ঘবদ্ধ প্রযত্নের ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত সম্পাদিত করিতেছে। এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রযত্নের ব্যবস্থাকেই মানুষ কখনও সমাজ, আবার কখনও রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

সুতরাং, যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তদন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অবিমিশ্র সুখ লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া সম্ভব হয়, তাহার নাম মানুষের 'রাজ্য'। রাজ্যের উপরোক্ত সংজ্ঞা একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা বুঝিয়া উঠা কোনক্রমেই কষ্টসাধ্য হইতে পারে না।

অতএব প্রত্যেক রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের) উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে কি হইলে সকল মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অবিমিশ্র সুখ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কি হইলে সকল মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অবিমিশ্র সুখ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কি কি লাভ করিতে পারিলে মানুষের

পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া সম্ভব হয়, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের ধারণায় নানারূপ বিরুদ্ধতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যিনি মদ্যপায়ী তিনি যেরূপ মদ্যকে নিজ সুখের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার যাঁহারা সংযমপন্থী তাঁহারা ঐ মদ্যকেই জীবনের সকল সুখের বিঘ্নোৎপাদনকারী মনে করেন। কাজেই কোন্ কোন্ বস্তু যে সমস্ত মানুষের অভীষ্ট সাধনানুরূপ তাহা নির্ণয় করা আপাতদৃষ্টিতে অতীব দুঃসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কি হইলে যে মনুষ্য-সমাজের অথবা কোন রাজ্যের সকল মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া সম্ভব হইতে পারে তাহার নির্ণয় করা আপাতদৃষ্টিতে দুঃসাধ্য হইলেও হইতে পারে বটে, এবং আপাতদৃষ্টিতে বিবিধ মানুষের অভীষ্ট-নির্ব্বাচনে নানা রকমের বিরোধিতা বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু এমন তিনটি বস্তু আছে, যাহা প্রত্যেক মানুষই পাইবার জন্য মুখ্যতঃ কামনা করিয়া থাকেন। ঐ তিনটি বস্তুর নাম :—

(১) স্ব স্ব কার্য্য-নির্ব্বাচনের জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতা ;

(২) বিশ্ব-দুনিয়ায় যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহার কোন্‌টির কি উদ্দেশ্য এবং কোন্‌টি কোন্ অবস্থায় কাহার পক্ষে হিতকর এবং কাহার পক্ষে অহিতকর, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও নির্ব্বাচন-ক্ষমতা ;

(৩) কাম্যবস্তুর প্রাচুর্য্য।

আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় লইয়া যতই বিরোধিতা বিদ্যমান থাক্ না কেন, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কাম্য বস্তুর প্রাচুর্য্য, বিশ্ব-দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর উদ্দেশ্য এবং স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না, এমন একটি মানুষও সমগ্র পরিণতবয়স্ক মানব-সমাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

কি হইলে সর্ব্বতোভাবে মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র সুখ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে একদিকে যেরূপ দেখা যাইবে যে, রাজ্যের মধ্যে যাহাতে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতা লাভ করা, বিশ্ব-দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা, এবং কাম্যবস্তুর প্রাচুর্য্য লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত করিবার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষ যাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী অথবা অকালবৃদ্ধ না হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে, স্বাবলম্বনে, শান্তির সহিত দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

এতাদৃশভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক রাজ্য-নিয়ন্ত্রণের (অর্থাৎ Government-এর) উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ তিনটি, যথা :—

(১) রাজ্যান্তর্গত প্রত্যেক মানুষটি যাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া (অর্থাৎ কাহারও দাসত্ব অথবা চাকরী না করিয়া) অথবা অকালবৃদ্ধ না হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে, শান্তির সহিত দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারে, তদনুরূপ কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতা লাভ করিবার ব্যবস্থা।

(২) বিশ্ব-দুনিয়ায় যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহার কোন্‌টির কি উদ্দেশ্য এবং কোন্‌টি কোন্ অবস্থায় কাহার পক্ষে হিতকর এবং কাহার পক্ষে অহিতকর, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও নির্ব্বাচন-ক্ষমতা লাভ করিবার ব্যবস্থা।

(৩) রাজ্যান্তর্গত প্রত্যেক মানুষটির কাম্যবস্তুর প্রাচুর্য্য যাহাতে রাজ্যমধ্যে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

যে রাজ্যমধ্যে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেই রাজ্য যে উহার প্রত্যেক মানুষটির পক্ষে স্বর্গের মত সুখকর, তাহা ঐ ব্যবস্থা তিনটি একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

সুতরাং, কোন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে কি না তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, ঐ দেশে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে কি না। কোন রাজ্যে যদি দেখা যায় যে, উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কোনটিই বিদ্যমান নাই এবং মানুষের মধ্যে একদিকে যেরূপ স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবার উপযোগী কর্ত্তব্য-নির্ব্বাচনের জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতার অভাব, অন্যদিকে সেইরূপ বিশ্ব-দুনিয়াতে কোন্ বস্তুর কি উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধেও জ্ঞানের অভাব এবং রাজ্যস্থ প্রত্যেক মানুষেরই প্রত্যেক কাম্যবস্তুর অভাব বিদ্যমান

রহিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক মানুষই অর্থাভাবে, শারীরিক অস্বাস্থ্যে এবং মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত, তাহা হইলে ঐ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যে যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপ ভাবে দেখিলে, যে রাজ্যে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা অবিদ্যমান থাকিবে, সেই রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে অসাফল্য প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ঐ রাজ্যের মানুষগুলি কাম্যবস্তুর অপ্রাচুর্য্য এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে জর্জ্জরিত বটে, কিন্তু যাহাতে কাম্যবস্তুর ঐ অপ্রাচুর্য্য এবং জ্ঞানের ঐ অভাব আরও অধিকতর বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ কোন অনুষ্ঠান নাই, পরন্তু যাহাতে উহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে পারে, তদনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রযত্ন আছে, তাহা হইলে ঐ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যে অপেক্ষাকৃত যথাযথ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মানবজাতির যে সমস্ত রাজ্য আধুনিক জগতে দেখা যায়, তাহার যে কোনটিই আমূল ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ না কেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই যে মানুষের পরমুখাপেক্ষিতা অর্থাৎ দাসত্ব, অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, কর্ত্তব্যজ্ঞানের ও কার্য্যক্ষমতার অভাব, বিশ্বদুনিয়া সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং কাম্যবস্তুর অপ্রাচুর্য্য গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। শুধু যে ঐ সমস্ত বস্তুর অপ্রাচুর্য্য দেখা যাইবে তাহা নহে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ অভাব ও অপ্রাচুর্য্য ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে পারে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রযত্নের চিহ্নও কোন রাজ্যে পরিলক্ষিত হইবে না।

এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আধুনিক জগতের কোন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণই (Government) যে অনুকরণযোগ্য—তাহা বলা চলে না।

অবশ্য এইখানে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও আধুনিক জগতের কোন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণই অনুকরণযোগ্য নহে, তথাপি প্রত্যেক রাজ্যেই শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য যে প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহার জন্য প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের রাজ-কর্ম্মচারিগণ শ্রদ্ধার যোগ্য।

মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যাহাতে প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথম সমগ্র মনুষ্যসমাজ যাহাতে সম্ভবযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া স্ব স্ব খাদ্যাভাব-দূরীকরণে মনোযোগী হয় এবং তৎপর স্ব স্ব শিক্ষার উন্নতিবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

তাহা না করিয়া, যে হেতু গভর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকের অর্থা-ভাবাদি দূর করিতে পারিতেছে না, অতএব যাহাতে ঐ গভর্ণ-মেণ্টের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, এতাদৃশ বিতর্ক শুধু যে বালকোচিত, তাহা নহে, উহা আমাদের মতে দণ্ডার্হ, কারণ "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা" এতাদৃশ স্থলে অনেক পরিমাণে মঙ্গলপ্রদ।

বিশ্ব-নেতৃত্ব

গত ৪ঠা জুন রাত্রে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ "সাম্রাজ্যের দায়িত্ব" (Responsibilities of Empire) সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বেতার-যোগে প্রচার করিয়াছেন। উহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) বর্ত্তমান জগৎকে তাহার জগাখিচুড়ী ও সন্ত্রাসজনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে যাহা যাহা করার প্রয়োজন, তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

(There is hardly anything which the Empire cannot accomplish in the way of dragging the world out of its present condition of muddle and menace.)

(২) পরিষ্কার উদ্দেশ্য এবং অবিচলিত অভিপ্রায় সম্মুখে রাখিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে কোন অনিষ্ট না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে বর্ত্তমানে কথঞ্চিৎ বিপদ্ বরণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

(The Empire must, however, have a clear aim and steadfast purpose and be prepared

to take reasonable risk in the present in order to avoid certain catastrophe in the future.)

(৩) আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাহাতে তাহার পূর্ণ ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে, যে সমস্ত জাতি লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত জাতি যাহাতে একযোগে একটি সুচিন্তিত নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(In order that the Empire should exert its full power and authority in international relation, it was necessary he said, that there should be a carefully preconcerted policy between the constituent nations of the Empire.)

(৪) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাহাতে অহরহ পরামর্শ হইতে পারে, তাহার বিরুদ্ধে কোন ভৌগোলিক অসুবিধা বিদ্যমান নাই।

(There was no geographical difficulty between the constituent nations of the Empire.)

(৫) পরিচালনা-নীতি সুচিন্তিত হইলে, উহা, যাঁহারা বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর বিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতা প্রদান করিয়া থাকে।

(A pre-concerted policy would give greater confidence, steadfastness and strength to those who directed British foreign policy diplomatically.)

(৬) যে সমস্ত জাতি সর্ব্বাগ্রে সমরসজ্জায় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সমস্ত জাতির কার্য্যফলে যে মন-কসাকসির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ঐ সমস্ত জাতি যে কথঞ্চিৎ ভীত হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে। কাজেই ইহাকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি সুযোগ বলিতে হইবে।

(There were signs that the more aggressive nations were becoming frightened by the tension they had helped to create. Here therefore, was another chance.)

(৭) বিশ্বনেতৃত্বের পদ খালি রহিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাহসিকতার সহিত উহা গ্রহণ করিতে পারে। জগতের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলির কাছে ব্রিটিশ জাতি যেরূপ বরেণ্য, আর কোন জাতি তদ্রূপ নহে।

(The leadership of nations was vacant. Let the British Empire take it boldly. No other nations would be as welcome to the democratic nations of the world.)

ইয়োরোপের গত মহাযুদ্ধের সময় মিঃ লয়েড জর্জ্জের কর্ণধারত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্দ্দোষ অথবা দোষযুক্ত ছিল, তাহা লইয়া রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু এই কর্ণধারত্বে যে নৈপুণ্য ছিল এবং প্রধানতঃ ঐ নৈপুণ্যের ফলেই যে ব্রিটিশ জাতি পরিশেষে বিজয়ী হইতে পারিয়াছিল, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না।

রাজ্য-পরিচালনার কার্য্যে মিঃ লয়েড জর্জ্জের অতীত নৈপুণ্য বিস্মৃত না হইলে তাঁহার ঐসম্বন্ধীয় কথাগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না।

যাঁহারা সাধারণতঃ সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া, অথবা যাঁহারা ম্যালথাস্ ও মার্শাল প্রভৃতি অর্থনৈতিকগণের অর্থনীতি মুখস্থ করিয়া ভারতের এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ অবস্থার ভীষণতা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু উহা মিঃ লয়েড জর্জ্জের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক জগৎকে তাঁহার ভীষণ অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে, যে যে জাতি লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠিত, সেই সেই জাতিগুলিকে সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইতে হইবে। জগতের আধুনিক অবস্থার ভীষণতা কোথায় এবং কি কর্ম্মতালিকা গৃহীত

হইলে ঐ ভীষণতার অপনোদন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বিশ্ববিখ্যাত মন্ত্রী মহাশয় পরিষ্কার ভাবে কিছুই ব্যক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, মিঃ লয়েড জর্জ্জের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপাদানমূলক যে যে জাতি রহিয়াছে, ঐ জাতিগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে মিলিত হইলে আন্তর্জ্জাতিক সমরক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সমর-সামর্থ্যে বলীয়ান্ হওয়া সম্ভব হইবে এবং তখন ঐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগতের অন্যান্য জাতিকে ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে এবং তাহা করিতে পারিলেই বর্ত্তমান জগৎকে তাহার জগাখিচুড়ীর অবস্থা হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইবে।

আমাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ব-নেতৃত্ব করিয়া মানবজাতিকে তাহার আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যত সহজসাধ্য, অন্য কোন রাজ্যের পক্ষে তাহা তত সহজসাধ্য নহে বটে, কিন্তু সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজনের দ্বারা মানবজাতির বর্ত্তমান বিপদ্ দূরীভূত করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক সামর্থ্য প্রসার করিবার আয়োজন যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই যে যে জাতি লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, সেই সেই জাতির পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহাদের সর্ব্বাস্তিক মিলন ততই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

খবরের কাগজের মারফতে অথবা বক্তৃতামঞ্চস্থিত গলার জোরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত জাতিগুলির সম্বন্ধের অচ্ছেদ্যতা বিষয়ে যতই জাহির করা হউক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধনে যাদৃশ দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিল, তাহা যে এখন আর নাই, এই সত্য কোন প্রকৃত ঐতিহাসিকের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নহে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত যে জাতিগুলির ঐক্য-বন্ধন এত দৃঢ়তা-সম্পন্ন ছিল, সেই জাতিগুলি বিংশ শতাব্দীতে পরস্পরের প্রতি এতাদৃশ ঈর্ষ্যাযুক্ত ও অবিশ্বাসপরায়ণ হইল কেন, তাহার সন্ধান করিলে, সামরিক সামর্থ্য প্রসার করিবার প্রযত্নের অসাফল্য সম্বন্ধে আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা সম্যক্ রূপে অনুধাবন করা যাইবে।

যদি সামরিক সামর্থ্যের প্রসার-সাধনের দ্বারা কোন সাম্রাজ্যের জাতিসমূহের ঐক্যের দৃঢ়তা সাধন করা অথবা কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে যখন সৈন্য বা নৌবল প্রভৃতির বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বহুগুণিত পরিমাণে সম্পাদিত হইতেছে, তখন খাস ইংলণ্ডে লেবার পার্টি ও কন্‌সারভেটিভ্ পার্টির দলাদলির তীব্রতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় কেন?

কোন্ উপায়ে বর্ত্তমান জগৎকে তাহার জগাখিচুড়ী ও শঙ্কাপূর্ণ অবস্থা হইতে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বর্ত্তমান জগৎ কেন এই জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমান জগৎ কেন এই জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইলে, জগতের কোন্ অবস্থাকে তাহারা জগাখিচুড়ীর অবস্থা, আর কি হইলে তাহার শান্তি ও শৃঙ্খলাময় অবস্থার উদ্ভব হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

কি হইলে জগৎ জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আর কখন উহা শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত রহিয়াছে বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহার সম্যক্ আলোচনা অতীব বিস্তৃত একটি দর্শন-বিষয়ক। উহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে।

সংক্ষেপতঃ উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মানুষ বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়গুলি কাম্যবস্তু অথবা অর্থের প্রাচুর্য্যের জন্য, প্রত্যেকের মন শান্তি ও সুখের জন্য এবং প্রত্যেকের বুদ্ধি জগতে কেন কি হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

যখন জগতে মানুষের কাম্যবস্তুর প্রাচুর্য্য, মনের শান্তি ও সুখ এবং জগতে কেন কি হইতেছে, তাহা বুঝিবার মত বিদ্যা ও শিক্ষার উৎকর্ষ বিদ্যমান থাকে, তখন উহা

শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে হয়। আর তদ্বিপরীত অবস্থার নাম জগাখিচুড়ীর অবস্থা।

মানুষের সাধারণ (common) কাম্যবস্তু কি কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের যত কিছু সাধারণ কাম্যবস্তু আছে, তন্মধ্যে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘায়ু সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

কাযেই মানব সমাজ যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত থাকে, তাহা করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুষ যাহাতে খাদ্য ও পরিধেয় প্রভৃতি আর্থিক দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ যৌবন, দীর্ঘায়ু, শান্তি, সন্তুষ্টি এবং প্রকৃত বিদ্যা ও শিক্ষা উপভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষ যে আর্থিক অপ্রাচুর্য্য, পরমুখাপেক্ষিতা, অকাল-বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যু, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, কু-বিদ্যা ও কু-শিক্ষায় জর্জ্জরিত হয়, তাহা কেন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মানুষের ঐ অবস্থা স্রষ্টার প্রদত্ত, অথবা নিজ কর্ম্মফল-প্রসূত, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ অবস্থা সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিজ কর্ম্মফল-প্রসূত। আর্থিক অপ্রাচুর্য্য, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিরুদ্ধাবস্থা যদি স্রষ্টার প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে যে কোন একজন মানুষের পক্ষেও আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি সম্ভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইত না, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কি হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘযৌবন, দীর্ঘায়ু, শান্তি, সন্তুষ্টি, প্রকৃত বিদ্যা ও প্রকৃত শিক্ষা সম্ভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য

প্রথমতঃ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি,

দ্বিতীয়তঃ, পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রার অকৃত্রিমতা,

তৃতীয়তঃ মানুষ যাহাতে অভিমান অথবা অহঙ্কার বিসর্জ্জিত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি প্রভৃতি উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি লাভ করিয়া জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কোন কৃত্রিম সারের ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক বিঘা জমী হইতে ন্যূনপক্ষে বার মণ ধান্য অথবা গম উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে উপার্জ্জনক্ষম লোকের শতকরা ৮৫ জনের পক্ষে বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস পরিশ্রম করিলেই স্বাধীনভাবে তাহাদের নিজ নিজ সমগ্র পরিবারের সারা বৎসরের জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়।

এইরূপ ভাবে কৃষিকার্য্য যাহাতে লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ঐ কৃষকগণই বৎসরের বাকী ৬।৭ মাসের পরিশ্রমের দ্বারা কুটীরশিল্পের সহায়তায় সমাজের সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন সরবরাহ করিতে সক্ষম হইতে পারে। তখন যন্ত্রশিল্পের পক্ষে কুটীরশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপার্জ্জনক্ষম লোকের শতকরা ৮৫ জন যাহাতে কৃষি ও শিল্পের দ্বারা স্বাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে বাকী ১৫ জনের পক্ষে বাণিজ্য ও চাকুরী দ্বারা আর্থিক প্রাচুর্য্য সাধন করা সহজ-সাধ্য হইতে পারে।

পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যাহাতে কৃত্রিম মুদ্রা ব্যবহৃত না হইয়া কড়ি, সর্ষপ প্রভৃতি অকৃত্রিম বস্তু মুদ্রা-রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে মানবসমাজে ধনের অসমান বিতরণ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইতে পারে।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, দুইশত বৎসর আগেও জগতে এখনকার মত কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন বিদ্যমান ছিল না। তখন কথঞ্চিৎ পরিমাণে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন বিদ্যমান থাকিলেও এত অধিক পরিমাণে উহার প্রচলন বিদ্যমান ছিল না এবং কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই অপরিজ্ঞাত ছিল। তাৎকালিক মানুষের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেও জানা যাইবে যে, বর্ত্তমানে যেরূপ মানুষের পক্ষে কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়া ধনী হওয়া এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট হওয়া সম্ভব হয়, তখন

তাহা হইতে পারিত না। তখন দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম-সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে মানুষ ধনী ও নির্ধন হইত।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যথোপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যাহাতে কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহার না হয়, তাহা করিতে পারিলেই মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আর্থিক প্রাচুর্য্য ও স্বাবলম্বন উপভোগ করা এবং অর্থের অপ্রাচুর্য্য-প্রযুক্ত অশান্তি, অসন্তুষ্টি দূরীভূত করা সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে, অপর কোন ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলে মানুষের পক্ষে শারীরিক অস্বাস্থ্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘায়ু উপভোগ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যথোপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা করিতে পারিলেই মানব-সমাজের অস্বাস্থ্যের আশঙ্কাও তিরোহিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমান জগতে অস্বাস্থ্য উত্তরোত্তর কেন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ দুইটি, যথা—(১) বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, (২) বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে হইলে জগতের সমস্ত নদ, নদী ও খাল যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সমস্ত নদ, নদী ও খাল যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে এক দিকে যেরূপ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব তিরোহিত হইতে পারে, অন্যদিকে আবার জল-পরিপূর্ণ নদ, নদী ও খাল হইতে যে জলীয় বাষ্প উদ্‌গত হইবে, তদ্দ্বারা সেবনীয় বায়ুর বিশুদ্ধতাও সম্পাদিত হইতে পারে।

সুতরাং যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যাহাতে কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহার না হয়, কেবল মাত্র তাহা করিতে পারিলেই মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘযৌবন এবং দীর্ঘায়ু উপভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হয়।

ঐ দুইটি ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘযৌবন এবং দীর্ঘায়ু উপভোগ করিবার ব্যবস্থা অধিকাংশ পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তখনও মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও চরিত্রহীন হইয়া অসুস্থ হওয়া ও অশান্তি, অসন্তুষ্টি ভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। মানুষ যাহাতে প্রকৃত বিদ্যা ও শিক্ষা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত করিতে পারিলে উপরোক্ত অসুস্থতা, অশান্তি এবং অসন্তুষ্টির সম্ভাবনাও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়া থাকে।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানবসমাজকে তাহার বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল ও শঙ্কাপ্রদ অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রসার সাধনের দ্বারা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। উহার একমাত্র উপায় নিম্নলিখিত তিনটি, যথা :—

(১) জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যথোপযুক্ত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা।

(২) পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহার যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৩) মানুষ যাহাতে অভিমান অথবা অহঙ্কার বিসর্জ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃত বিদ্যা ও শিক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয়, তাহার ব্যবস্থা।

গত দশ হাজার বৎসরে মানুষের অবস্থায় কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা মানস নেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আমাদের পাঠকবর্গকে এই সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিব।

এই তিনটি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে আরও দেখা যাইবে, উহার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটি সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাটি সম্পাদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অপর দুইটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদিকে যেরূপ অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে অন্যদিকে আবার অগ্রসর হইলেও তাহা মানুষের পক্ষে লাভজনক হইবে না।

জগতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদুচিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা যত সহজ, অন্য কোন দেশের অথবা মহাদেশের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা তত সহজ নহে।

অতএব ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের পক্ষে অথবা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মালিক ব্রিটিশগণের পক্ষে বর্ত্তমান জগতে বিশ্ব-নেতৃত্ব করা যত সহজ, আর কাহারও পক্ষে তাহা তত সহজ নহে।

কিন্তু, আমাদের কথা কি লয়েড জর্জ্জপ্রমুখ আধুনিক ব্রিটিশ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানগণ, অথবা গান্ধিজীপ্রমুখ তাঁহাদের ভারতীয় অনুচরবর্গ বুঝিতে সক্ষম হইবেন?

আমাদের আশঙ্কা হয় যে, উপরোক্ত সত্য কথা কয়েকটী বুঝিবার মত ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে তাহার অত্যধিক খেলাধুলা (sports), নাচগান (saturday dancing), পানভোজন (political dinner) এবং চলচ্চিত্রের দ্বারা অবসর বিনোদন-(recreating pictures)-এর ফলে অন্তর্দ্ধান পাইয়াছে এবং হয় তো বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি যে নাড়া-চাড়া পাইয়াছে, তাহা বুঝি আর সংশোধিত হয় না। আমাদের চোখে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই আমরা উঁহার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা দেখিলে ব্যথিত হই। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণই যে তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতার ফলে পরোক্ষভাবে তিল তিল করিয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিতেছেন, তাহা কে বুঝিবে?

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও আধুনিক পাণ্ডিত্যের নমুনা

"প্রবাসী" পত্রিকার গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "গৌড়পাদ" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধটীর লেখক শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের আশুতোষ-চেয়ারে যে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তিনিই এই প্রবন্ধের লেখক কি না তাহা আমরা খুব সঠিকভাবে বলিতে পারি না বটে, তবে লেখার ভঙ্গী ও বিষয়জ্ঞানের ধারা লক্ষ্য করিলে ঐ লেখকই যে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর নির্ব্বাচিত উচ্চপদস্থ উপযুক্ত (?) সংস্কৃতাধ্যাপক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ঐ প্রবন্ধে দর্শনের ও উপনিষদের কথা আছে বটে, কিন্তু লেখক ঋষিপ্রণীত দর্শন ও উপনিষদের মধ্যে প্রধানতঃ যে কি কি পার্থক্য, তাহা অবগত আছেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। বেদান্তদর্শন, বৌদ্ধদর্শন ও মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ঐ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য। কিন্তু লেখক ঐ তিনখানি গ্রন্থে যে বিন্দুমাত্রও প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই, পরন্তু ঐ তিনখানি গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে যে নিজেকে ভুল বুঝাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহার লেখার প্রায় ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। বেদান্তদর্শন, বৌদ্ধদর্শন এবং মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ছাড়া সাংখ্যদর্শন, দিঙ্‌নাগের আলম্বনপরীক্ষা, ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয়, পূর্ব্বমীমাংসার শবরভাষ্য, শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের মর্ম্মের সহিত পরিচিত বলিয়া লেখক নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থের যে যে অংশ যে যে প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, ঐ সব গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠা ত দূরের কথা, ভাষা সম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান থাকিলে ঐ ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম অন্ততঃপক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও বুঝিতে পারা সম্ভব হয়, তাহা পর্য্যন্ত লেখকের আছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা, যুবকদিগের আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর ধারা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-নির্ব্বাচনের পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে এতাদৃশ লেখকের লেখা উপেক্ষা করাই সাধারণতঃ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু লেখক যেরূপ ভাবে না বুঝিতে পারিয়া পরোক্ষভাবে ভারতীয় ঋষিগণের প্রতি সাধারণ জ্ঞানের (common sense) অভাবজনিত ত্রুটীর দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা সত্য-দ্রষ্টা ঋষিকে সম্যক্ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করাই জীবনের সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা বুঝিতে হইলে পাঠকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের মতে অধুনা জগতের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়াছে। যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্ষার কর্ণধারগণের নির্দ্দেশানুসারে কি করিয়া আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, চাকুরী প্রভৃতির বৃত্তিতে পারদর্শী হইতে হয়, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াও শিক্ষিত যুবকগণ কখনও বা বেকার অবস্থায়, কখনও বা চাকুরী পাইয়াও অর্থাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে, এবং শান্তির অভাবে তিল তিল করিয়া নিজদিগকে বিসর্জ্জিত করিতেছে, যখন দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষগণের পরামর্শানুসারে শিল্পে অথবা বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও কোন দেশের মানুষই আর পূর্ব্বের মত লাভবান্ হইতে পারিতেছে না এবং অধিকাংশ স্থানেই লোকসান-গ্রস্ত হইতেছে, যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন দেশেই কৃষক আর কৃষিকার্য্যে প্রায়শঃ লাভবান্ হইতে পারিতেছে না এবং সর্ব্বত্রই প্রতি বিঘা জমীর বাৎসরিক স্বাভাবিক উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার কার্য্যক্ষমভাবে জীবন ধারণ করিবার জন্য বাৎসরিক মোট যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহাতে পর্য্যন্ত ঘাট্‌তি পড়িয়াছে এবং ঐ ঘাট্‌তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে নারীগণ সর্ব্বদা পুরুষের রক্ষণীয়া ও পালনীয়া, সেই নারীগণ পর্য্যন্ত পুরুষোচিত উপার্জ্জনের কার্য্যে ব্রতী হইয়াও সন্তোষজনক ভাবে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে টলটলায়মান হইয়াছে, তাহা মনে করা কি অমূলক ?

পাঠক, মানসনেত্রে চাহিয়া দেখুন, মানুষের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা চিরদিন এতাদৃশ নৈরাশ্যজনক ছিল না। যতই অতীতের দিকে ফিরিয়া যাইবেন, ততই দেখিতে পাইবেন যে, মানুষের অবস্থা সর্ব্বপ্রকারেই অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। এই-রূপ ভাবে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, সমগ্র জগৎ একদিন সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার ছিল এবং প্রত্যেক দেশের মানুষই সর্ব্বতোভাবে আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে পারিত।

যে জগতে একদিন সমগ্র মনুষ্যসমাজ আর্থিক স্বচ্ছলতা উপভোগ করিতে পারিত, সেই জগতে আজ পিতার সম্মুখে তাহার প্রাণাধিক সন্তানগণ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া pthysis (যক্ষ্মা) বরণ করিয়া লইতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অপ্রাচুর্য্য দূরীভূত হয় না কেন, যে জগতে একদিন মানুষ মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও দুহিতাকে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রক্ষা করিতে পারিত, সেই জগতে আজ মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও দুহিতাগণকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিব্রত হইতে হয় কেন, যে জগতের প্রত্যেক দেশ ও প্রদেশ একদিন এক একটি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজার দ্বারা সুশাসিত ও সুরক্ষিত হইত, সেই জগতে আজ প্রজাতন্ত্রের (Democracyর) নামে কতকগুলি অনুপযুক্ত চরিত্রহীন লোক, যাহারা প্রায়শঃ কখনও কোন রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শিক্ষা ও অভি-জ্ঞতা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহারা কি করিয়া নিজেদের উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সক্ষমতার কোন সাক্ষ্য প্রায়শঃ দিতে পারে নাই, যাহাদের অধিকাংশ কর্ম্মে কৃতজ্ঞতার ও শৃঙ্খলার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, যাহারা মাতার মাতৃত্ব, ভগ্নীর ভগ্নীত্ব, প্রণয়িনীর প্রণয়, দুহিতার দুহিতৃত্ব বিসর্জ্জিত করিয়া অথবা বিসর্জ্জিত করিবার প্রশ্রয় দিয়া নারীর নারীত্ব লইয়া পণ্যদ্রব্যের মত ব্যবহার করিতে প্রায়শঃ কুণ্ঠাবোধ করে না, যাহারা উত্তমর্ণের ঋণ অপরিশোধিত করিতে প্রায়শঃ সঙ্কোচ বোধ করে না, যাহারা প্রভুদ্রোহিতাকে তেজস্বিতা বলিয়া প্রায়শঃ মনে করে, তাহারা আজ রাজ্য-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হয় কেন—ইহা বুঝিতে পারিলে আমরা সত্যদ্রষ্টা ঋষির কোনরূপ অপরোক্ষ নিন্দায় বিহ্বল হই কেন, তাহা বুঝা যাইবে।

আমাদের মতে জগৎ যখন সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার ছিল এবং মানুষ যখন সর্ব্বতোভাবে আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে পারিত, তখন মনুষ্য-সমাজে সর্ব্ববিধ বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান ছিল।

এই বিদ্যাগুলির মধ্যে স্বয়ম্ভু-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও কৌলিক বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

যে শক্তিবলে মানুষ তাহার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিতে পারে, সেই শক্তি মূলতঃ কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে কি কি উপায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সেই দ্রব্য ও সেই সেই উপায় যে বিদ্যার সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষ করা যাইত, তাহার নাম ছিল "স্বয়ম্ভু-বিদ্যা"।

যে শক্তিবলে মানুষ তাহার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিতে পারিত, সেই শক্তি মূলতঃ কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই সেই স্থান ও পন্থার কথা যে বিদ্যার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষ করা যাইত, তাহার নাম ছিল "ব্রহ্মবিদ্যা"।

যে শক্তিবলে মানুষ তাহার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিতে পারিত, সেই শক্তির মূল ভাণ্ডার হইতে স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য উহা কোন্ পন্থায় গ্রহণ করিয়া মানুষ নিজেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তিমান্ করিতে পারে, তাহা যে বিদ্যার দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম ছিল "কৌলিক বিদ্যা"।

এই তিনটী বিদ্যার উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়সমূহ তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার উপর কোন লৌকিক বিদ্যা, অর্থাৎ চিকিৎসা-পদ্ধতি, ব্যবহার-পদ্ধতি, শাসন-পদ্ধতি, শিল্প-পদ্ধতি, বাণিজ্য-পদ্ধতি, দণ্ড-পদ্ধতি প্রভৃতি রচিত হইলে সেই লৌকিক কথা অনায়াসেই সর্ব্বাঙ্গীন (thorough) ও ভ্রমহীন (fallacy-less) হইতে পারে এবং ঐ লৌকিক বিদ্যার প্রচলন থাকিলে মানুষের পক্ষে কার্য্যতঃ তাহার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূর করা সম্ভব হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে উপরোক্ত স্বয়ম্ভূবিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা ও কৌলিক বিদ্যা সম্পূর্ণ ভাবে জাগ্রত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত নির্ভুল লৌকিক বিদ্যাসমূহও প্রচলিত ছিল, এবং মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবও দূর করা সম্ভব হইয়াছিল।

মানুষ তাহার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই মনুষ্যসমাজ একদিন উপভোগের চিন্তায় সময়ক্ষেপ করিতে পারিয়াছিল এবং তাহার প্রাচীন ঐ অমূল্য বিদ্যা তিনটীর (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, কৌলিক বিদ্যার) চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিল। ঐ অমূল্য বিদ্যা তিনটীর চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়াই, ক্রমে ক্রমে উহা বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মনুষ্যসমাজে আবার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দেখা দিয়াছে।

তাহার পর আবার মানুষ ঐ তিনটী বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু সক্ষম হয় নাই। ঐ চেষ্টার ফলে প্রকৃত কোন বিদ্যার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু তৎস্থলে ঐ তিনটী বিদ্যার নামে কতকগুলি কুবিদ্যা মনুষ্য-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বিদ্যার নামে কুবিদ্যার প্রচারের ফলে উহা সমগ্র মনুষ্যসমাজের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারে নাই এবং যে মনুষ্যসমাজে একদিন একমাত্র মানবধর্ম্ম প্রচারিত ছিল এবং যাহা সর্ব্বতোভাবে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিয়াছিল, তাহা পুনরায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ে খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহার ফলে তখনই মানুষ শান্তির ও স্বাস্থ্যের অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মনুষ্যসমাজকে ঐ শান্তির অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব হইতে সাময়িক ভাবে রক্ষা করিয়া-ছিলেন পর পর তিন জন মহাপুরুষ। ঐ তিন জন মহাপুরুষের নাম শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদ।

ঐ তিনটী মহাপুরুষ যে স্বয়ম্ভূবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৌলিকবিদ্যা অন্ততঃপক্ষে আংশিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের তাৎকালিক শিষ্যগণের লিখিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা ঐ তিনটী বিদ্যা পুনঃ প্রচারিত করিবার অবসর পান নাই।

ফলে, যে উপায়ে সহস্র সহস্র বৎসরের জন্য সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূরীভূত হইতে পারে, সেই উপায় আর মনুষ্যসমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পুনরায় টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা একাধিক সন্দর্ভে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছি যে, এতাদৃশ সময়ে যিনি কেবলমাত্র নিজেকে অথবা নিজের পরিবারকে অথবা নিজের বন্ধুবর্গকে অথবা নিজের দেশকে বিপন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, তিনি সাময়িক ভাবে কালের ভৈরব-বেশী তাণ্ডব-নৃত্যের নেতা গান্ধীজী ও জওহর-

লালজীর মত, অপরিপক্ক-বুদ্ধি যুবকগণের নিকট যশস্বী হইলেও হইতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিজেকে অথবা নিজের বন্ধুবর্গকে অথবা নিজের দেশকে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব হইতে সাময়িক ভাবেও মুক্ত করিতে পারিবেন না।

এতাদৃশ বিপজ্জনক সময়ে এমন কি ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিতে হইলে বর্ণ ও 'ধরম'-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মনুষ্যসমাজের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব যাহাতে দূরীভূত হয়, তাহার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

কোন্ কার্য্যের দ্বারা সমগ্র মনুষ্যসমাজের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূর করা যাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের অর্থাভাবাদি দূরীভূত করিতে হইলে একদিকে যেরূপ প্রথমতঃ যাহাতে জগতের সর্ব্বত্র জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া কোন কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিয়া কৃষকগণের স্বাধীন চেষ্টায় জগতের সমগ্র জনসংখ্যার উপযুক্ত খাদ্য ও ব্যবহার্য্য শস্যের প্রাচুর্য্য ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ খাদ্য ও ব্যবহার্য্য শস্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী পরিমাণে পাইতে পারে, তদনুরূপ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেইরূপ আবার স্বয়ম্ভুবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও কৌলিকবিদ্যা যাহাতে মানুষ পুনরায় পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং শিল্প ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যা যাহাতে ঐ স্বয়ম্ভুবিদ্যা প্রভৃতি তিনটী বিদ্যার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

জীবিকার্জ্জনের এবং মনুষ্যসমাজের স্বাস্থ্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য অধুনা যে সমস্ত লৌকিক বিদ্যা প্রচলিত রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত লৌকিক বিদ্যা যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে সহজেই বুঝিয়া উঠা সম্ভব। আধুনিক লৌকিক বিদ্যাসমূহ অথবা তাহার ভিত্তিস্থানীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও নির্ভরযোগ্য হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই মনুষ্যসমাজের স্বাস্থ্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা উত্তরোত্তর জটিলতা প্রাপ্ত হইতে পারিত কি?

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, যে লৌকিক বিদ্যার দ্বারা সমগ্র মনুষ্যসমাজের অর্থাভাব, শান্তির অভাব এবং স্বাস্থ্যের অভাব দূর করা যাইতে পারে এবং তাহার ভিত্তিস্থানীয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ঐ লৌকিক বিদ্যার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা একদিকে যেরূপ প্রাচীন হিব্রু ও আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, অন্যদিকে আবার প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ঋষিপ্রণীত বেদাদি গ্রন্থেও উহা পাওয়া যায়।

আজকালকার অনেক বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি, যাঁহারা জগতের প্রকৃত জ্ঞানভাণ্ডারের এক পৃষ্ঠাও না উল্টাইয়া নিজদিগকে পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিয়া ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধির উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং ঐ সুখ-সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার করিবার পন্থা সম্বন্ধে আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কোন স্থানে হয় তো নিজেদের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য বলিবেন যে, উহার ভিতর অনেক চিন্তার খাদ্য আছে বটে, কিন্তু সমস্ত কথার সহিত একমত হওয়া যায় না, আবার উহাঁরাই হয়ত কোন কোন স্থানে মুচকি হাসিয়া বলিবেন যে, ব্যবহারের অযোগ্য (impractical) ঐ কথাগুলির দিকে নজর না দেওয়াই ভাল। যিনি যাহাই বলিয়া সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারেন, তাহা করুন। তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। যাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অভিমান-ভরে নিমীলিত-চক্ষুবৎ হইয়া পড়েন, তাঁহারা যাহাই মনে করুন না কেন, সর্ব্বনাশী ও সর্ব্বগ্রাসী অন্নাভাব যে মানবসমাজের সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে এবং ঐ অন্নাভাব যে জগতের সর্ব্বত্রই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বাস্তব সত্য।

জগতে একদিন ছিল, যখন কুত্রাপি বিন্দুমাত্র মাত্রায়ও জগতের ঐ অন্নাভাব পরিলক্ষিত হইত না।

অন্ততঃপক্ষে পাঁচশত বৎসর হইতে ঐ অন্নাভাব ইয়োরোপ প্রভৃতি জগতের স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও অ্যাসিয়াখণ্ডে যে পরিমাণ শস্য উদ্বৃত্ত হইত, তদ্দারা সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকলেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারিত।

এখন আর সে অবস্থা নাই। গত ত্রিশ বৎসর আগে সমগ্র জগতে মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কত ছিল ও মোট জন-সংখ্যার পরিমাণই বা কত ছিল এবং তদবধি ঐ উৎপন্ন শস্যের ও লোকসংখ্যার কিরূপ তারতম্য ঘটিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ত্রিশ বৎসর আগে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের খাদ্য ও আহার্য্যের জন্য যে পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন হইত, তাহার তের আনা মাত্র উৎপন্ন হইত, আর গত ১৯৩১ সালে মাত্র নয় আনা পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯০৭ সালেই সমগ্র মনুষ্যসমাজের তিন আনা লোকের অন্নাভাবগ্রস্ত থাকা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তদবধি ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ঐ অন্নাভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র লোকসংখ্যার সাত আনা লোকের অন্নাভাব-গ্রস্ত হওয়া অপরিহার্য্য হইয়াছে। অন্নাভাবগ্রস্ত লোকসংখ্যার যে হিসাব উদ্ধৃত হইল, তাহা আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে। প্রয়োজন হইলে উহা আমরা সরকারী বিবরণ হইতে প্রমাণিত করিতে পারিব।

১৯০৭ সালের অবস্থার সহিত ১৯৩১ সালের অবস্থা তুলনা করিলে যেরূপ দেখা যাইতেছে যে, যে স্থলে ১৯০৭ সালে জগতের সমগ্র জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় মোট আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য শস্যের তের আনা পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিত, সেইখানে ১৯৩১ সনে উহা নয় আনা পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ আবার যে হারে জগতের জমির অনুর্ব্বরতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৪৫ সালে জগতের সমগ্র জনসংখ্যার মোট প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য শস্যের ছয় আনার অধিক উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। অর্থাৎ সতর্ক না হইলে ১৯৪৫ সালে জগতে এমন অবস্থার উদ্ভব হইবার আশঙ্কা আছে, যাহার ফলে জগতের সমগ্র জনসংখ্যার দশ আনা লোকের অনশন ও অর্দ্ধাশনগ্রস্ত থাকিতে হইবে এবং বাকী ছয় আনা লোক ঐ দশ আনা লোককে ছলে ও বলে প্রতারিত করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তির চেষ্টা করিবে। যখন অধিকাংশ লোকের অন্নের সংস্থান থাকে, তখন ঐ অধিকাংশ লোকের পক্ষে অল্পসংখ্যক লোককে ছলে ও বলে প্রতারিত করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু যখন অধিকাংশ লোকের অন্নের অভাব উপস্থিত হয়, তখন অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষে অধিকাংশ লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করা সহজসাধ্য হয় না। কাযেই অদূর ভবিষ্যতে সতর্ক হইতে না পারিলে জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশে মানুষ বুঝুক আর না-ই বুঝুক, একমাত্র অন্না-ভাবের জন্যই অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কা আছে।

পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ আজ আমাদিগের উপরোক্ত কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করুন আর অশ্রদ্ধার সহিত উপেক্ষা করুন, অদূর ভবিষ্যতে যে অন্নাভাবের জন্য জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশে অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কা আছে, তাহা বাস্তব সত্য এবং তখন কি করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার সন্ধান যে মানুষের একমাত্র কাম্য হইয়া পড়িবে তাহাও বাস্তব সত্য। যাহা লইয়া বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিকতা, বর্ত্তমান শিল্পিগণের শিল্প-নিপুণতা, বর্ত্তমান বণিকের বাণিজ্য-নিপুণতা, বর্ত্তমান শিক্ষকের শিক্ষা-নিপুণতা, বর্ত্তমান চিকিৎসকের চিকিৎসা-নিপুণতা, তাহার প্রত্যেকটী যে প্রায়শঃ নিষ্প্রয়োজনীয় এবং মানুষের অল্লাধিক সর্ব্বনাশ-সাধক, তাহা তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে।

কি করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সন্ধান কোন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। উহা কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা আজ মানুষের পরিজ্ঞাত নহে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তাড়নায় অদূর ভবিষ্যতে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, ঐ সন্ধান সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত স্বয়ম্ভূবিদ্যা', ব্রহ্মবিদ্যা', কৌলিক বিদ্যা ও লৌকিকবিদ্যার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। স্বয়ম্ভূবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া ঋষিগণের বেদ, মীমাংসা ও পুরাণ; কৌলিক বিদ্যা লইয়া তাঁহাদের তন্ত্রশাস্ত্র আর তাঁহাদের লৌকিক বিদ্যা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে স্মৃতি প্রভৃতি অপরাপর গ্রন্থে।

সত্যকামী ও সাধনা-নিরত মানুষের পক্ষে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের গ্রন্থ উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ হইলেও অতীব সহজসাধ্য বটে, কিন্তু যাঁহারা আত্মপ্রতারণামূলক সংস্কারাপন্ন এবং যাঁহারা প্রায়শঃ চাটুকারিতা এবং আত্মবিজ্ঞাপনের দ্বারা অপরের মনস্তুষ্টি-সাধনে নিরত, তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র বুদ্ধি-গ্রাহ্য অব্যক্ত তথ্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা কখনও সম্ভব নহে।

ইহারই জন্য বর্ত্তমান কালে যাঁহারা চাকুরী দ্বারা অথবা সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা চাকুরী ও বৃত্তিসংগ্রহের জন্য পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে লালায়িত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের কোন গ্রন্থের কোন প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা প্রায়শঃ সম্ভব হয় না।

যাঁহারা আজকাল মানবসমাজে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা উপরোক্ত কারণে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য অব্যক্ত তথ্যগুলি বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারেন না বলিয়া তৎপ্রতি সম্যক্ ভাবে শ্রদ্ধাও পোষণ করিতে পারেন না এবং ইহারই ফলে ইহাঁরা একদিকে যেরূপ নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়া "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" * এই ব্যাসবাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, সেইরূপ আবার অন্য দিকে মানবসমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। অথচ আজকাল মানুষ গরলকে অমৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকে ও অমৃতকে গরল বলিয়া মনে করে এবং তাহারই ফলে এতাদৃশ পণ্ডিতগণই আজকাল মানবসমাজের শ্রদ্ধালাভ করিতে সক্ষম হয়।

কাযেই এতাদৃশ পণ্ডিতগণের কোন উক্তির ফলে যখন মানবসমাজের কাহারও ঋষিগণের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধার কারণ উপস্থিত হয়, তখন এই পণ্ডিত যতই নগণ্য হউন না কেন, উহাঁর উক্তি যে অজ্ঞতামূলক, তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি।

আমাদের মতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রতি অশ্রদ্ধার উৎপাদক অনেক কথা এ যুগের তথাকথিত অনেক মহাত্মার লেখনী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহাত্মাগণ প্রায়শঃ শূদ্রবংশধর। কোন কোন ব্রাহ্মণবংশধরও ঐ তালিকাভুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ব্রাহ্মণবংশধরগণও শূদ্রভাবাপন্ন। প্রকৃত বেদান্তদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শন পরিজ্ঞাত হইয়া যদি কেহ বিবেকানন্দ স্বামী এই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, স্বামীজী সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের অলৌকিকতার হানিকর অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ঋষিদিগের গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রবেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। সেইরূপ আবার ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ও ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির লেখনী হইতে ঋষিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক অনেক কথা প্রসূত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঋষিদিগের গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই শূদ্রসন্তানগণের ভাগ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। যখন প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা পর্য্যন্ত মানবজাতি বিস্মৃত হইয়াছে, যে পাশ্চাত্য জাতির তথাকথিত সভ্যতার অভ্যুদয়-কালে মানুষের দুর্গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পাশ্চাত্যের প্রভাবকালে উপরোক্ত শূদ্রবংশধরগণের কেহ কেহ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইহাঁরা যে যে বংশ হইতে প্রসূত, সেই সেই বংশে দেড় শত কি দুই শত বৎসর আগে অনেক নিষ্ঠাবান্ শ্রমজীবীর পরিচয় পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু কাহারও বংশে ব্রহ্মবিদ্যাদির মত কোন বিদ্যাচর্চ্চার কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না। যিনি যে বিষয়ের অধিকারী নহেন, তাঁহাকে অপ্রতিহতগতিতে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে অনুমতি দেওয়া মানবসমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের প্রতি অনধিকারিগণের অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা অপ্রতিহতগতিতে চলিতে পারিতেছে বলিয়াই আমাদের মতে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান এতাদৃশ নিন্দনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং মানবজাতি এতাদৃশ দুঃখসমুদ্রে হাবু-ডুবু খাইতেছে।

শাস্ত্রী-মহাশয়ের রচিত গৌড়পাদ নামক প্রবন্ধ যে সমস্ত দোষে দুষ্ট বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যে যুক্তিযুক্ত, ইহা প্রমাণিত করিতে হইলে ঐ প্রবন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাক্যগুলি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে।—

নিম্নে ঐ উল্লেখযোগ্য বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইতেছে :—

ক-অংশ

(১) শঙ্করের পূর্ব্বেও বেদান্তের বহু ব্যাখ্যাতা ছিলেন, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি বা ভাষ্যের রচয়িতা অনেকে ছিলেন।

* অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(২) শঙ্করের পূর্ব্বের ও পরের বেদান্তকে আমরা যথাক্রমে প্রাচীন ও নব্য নাম দিতে পারি।

(৩) শঙ্করের পূর্ব্বে যে সমস্ত বেদান্তব্যাখ্যাতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর একজন হইতেছেন গৌড়পাদ। প্রাচীন বেদান্তে গৌড়পাদের স্থান অতি অপূর্ব। ইহাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আগমশাস্ত্র, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকা নামে প্রসিদ্ধ।

(৪) আগমশাস্ত্র, বিশেষত ইহার চতুর্থ প্রকরণ (অলাতশান্তি) বৌদ্ধভাবে পূর্ণ। কেবল ইহাই নহে, তাহাতে অনেক বৌদ্ধ শব্দ আছে, এমন কি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহাতে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(৫) এই গ্রন্থখানির ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। আমার মনে করিবার কারণ আছে যে, ইনি বেদান্তসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য নহেন। ইনি এবং ইহাঁর অনুগামিগণ ব্যাখ্যা করিয়া সমগ্র আগমশাস্ত্রে বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন।

(৬) যদিও প্রথম তিন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহা সত্য, তথাপি আমার মনে করিবার কারণ আছে যে, চতুর্থ প্রকরণে তাহা বলা যায় না।

(৭) এই চতুর্থ প্রকরণটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয়, চতুর্থ প্রকরণটি যে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং উহা যে বৌদ্ধভাবে পরিপূর্ণ, তাহা সপ্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে অলাতশান্তি প্রকরণের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ঐ ব্যাখ্যায় তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ শ্লোকটি বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

খ-অংশ

(৮) জ্ঞান হইতেছে আকাশের সমান,

(জ্ঞানেন আকাশকল্পেন.)

(৯) এই জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

(জ্ঞেয়াভিন্নেন)

(১০) ধর্ম্ম অর্থাৎ বিষয় বা পদার্থসমূহও আকাশের সমান।

(ধর্মান্ যো গগনোপমান্)

গ-অংশ

জ্ঞান যে আকাশের সমান তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন :—

(১) আমাদের গ্রন্থকার (অর্থাৎ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ) ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ উভয়ের মতে জ্ঞান হইতেছে "অসঙ্গ" অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না ; অর্থাৎ উহা কোন বস্তুকে গ্রহণ করে না ("অগ্রহ")।

জ্ঞান যে "অসঙ্গ" তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি লঙ্কাবতারসূত্র হইতে "অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন :—

(২) যেমন আকাশ অসঙ্গ, কাহারো সঙ্গে আকাশ লাগে না, জ্ঞানও সেইরূপ অসঙ্গ। এই জন্যই বলা হইয়াছে "জ্ঞান আকাশসদৃশ"।

ঘ-অংশ

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন :—

(১) জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সম্বন্ধে এ কথা অনেকেই জানেন যে, ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত। তাঁহাদের মতে বাহিরে বস্তুত কোনো কিছু নাই।

বৌদ্ধগণের মতে যে বাহিরে বস্তুত কোন কিছু নাই তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি দিঙনাগের আলম্বনপরীক্ষা হইতে "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভাসতে" এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ বচনটির অর্থে তিনি বলিয়াছেন "জ্ঞেয়ের আকারে যাহা ভিতরে আছে তাহা বাহিরের মত বলিয়া প্রকাশ পায়"।

ঙ-অংশ

ধর্ম্ম অর্থাৎ বিষয় বা পদার্থসমূহ যে আকাশের সমান, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন :—

(১) পরমার্থত বাহ্য বিষয়সমূহের কোনো অস্তিত্ব নাই বলিয়া তাহারা আরোপিত আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাই তাহাদের স্বভাব বলিয়া কিছুই নাই (নিঃস্বভাব) এবং সেই জন্যই তাহারা শূন্য।

(২) আর এই কারণেই তাহারা আকাশের সদৃশ।

(৩) জ্ঞান যেমন অসঙ্গ বলিয়া আকাশসদৃশ, ধর্ম্মসমূহও সেইরূপ অসঙ্গ, কারণ তাহাদের বস্তুত অস্তিত্ব না থাকায় কাহারো সহিত সংসর্গ হইতে পারে না এবং এই জন্যই আকাশসদৃশ।

(৪) ধর্মসমূহ অসংখ্য, উহাদিগকে গণনা করা যায় না। এই জন্যও তাহাদিগকে আকাশসদৃশ বলিতে পারা যায়।

(৫) স্বভাবতঃ ধর্মসমূহের উৎপত্তিও নাই, নিরোধও নাই, সেই হেতু তাহারা আকাশসদৃশ।

(৬) ধর্মসমূহ "নিঃস্বভাব", স্বভাব বলিয়া ইহাদের কিছুই নাই। যাহার স্বভাব নাই তাহা আকাশসদৃশ।

চ-অংশ

ধর্ম শব্দের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন :—

(১) ইহার ভাবার্থ হইতেছে, "বস্তু" "বিষয়", "যাহা আমরা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করি", "অর্থ" "পদার্থ", অথবা "প্রমেয়"।

(২) আর মূলার্থ হইতেছে "লক্ষণ" বা "স্বলক্ষণ", "স্বভাব"। ধর্মের মূলার্থ যে "স্বলক্ষণ" এবং উহা যে ধৃ-ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় অভিধর্ম্মকোষভাষ্যের "স্বলক্ষণধারণাদ্ ধর্মঃ" এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ছ-অংশ

ধর্মপ্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন :—

(১) বৌদ্ধমতে রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম এবং কেবল ইহারাই আছে, ধর্মী ("যাহার ধর্ম আছে") বলিয়া কিছু নাই।

বৌদ্ধমতে ধর্মী বলিয়া যে কিছুই নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য

"কঠিনা দৃশ্যতে ভূমিঃ সাপি কায়েন গৃহ্যতে।
তেন হি কেবলং স্পর্শো ভূমিরেবেতি কথ্যতে॥"

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটির অর্থের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "ভূমিকে কঠিন বলিয়া দেখা যায় এবং ইহা শরীর দ্বারা গৃহীত হয়। অতএব বলা হইয়া থাকে যে, এই ভূমি হইতেছে কেবল স্পর্শ।"

(২) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ধর্মী আর কাঠিন্য প্রভৃতি তাহার ধর্ম, উভয়ই পরস্পর স্বতন্ত্র।

(৩) সাঙ্খ্যদর্শনে গুণ ও গুণী অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই (গুণদ্রব্যয়োস্তাদাত্ম্যম্) অথবা ধর্ম-ধর্মীর মধ্যে যে কোন ভেদ নাই (ধর্ম-ধর্মিণোরভেদঃ) তাহা সুপ্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে তিনি অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধচরিতের

"গুণিনো হি গুণানাং চ ব্যতিরেকো ন বিদ্যতে।
রূপোষ্ণাভ্যাং বিরহিতো ন হ্যগ্নিরুপলভ্যতে।"

সমালোচনার সুবিধার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের উপরোক্ত কথাগুলি আমরা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ এবং ছ এই সাতটি অংশে বিভক্ত করিয়াছি।

আমরা আমাদের বর্ত্তমান সন্দর্ভের সূচনাতেই পাঠক-বর্গের সম্মুখে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের মতে গৌড়পাদ নামক প্রবন্ধের লেখক যে শাস্ত্রী মহাশয় তিনি মাণ্ডূক্যোপনিষৎ বিন্দুমাত্রও বুঝিতে না পারিয়া উহার বক্তব্য সম্বন্ধে অযথা কতকগুলি মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন এবং নিজের বিবিধ রকমের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাসমূহের উপরোক্ত "খ-অংশ" সর্ব্বপ্রথমে সমালোচনা করিব।

এই অংশে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রথম উক্তিতে বলিতেছেন "জ্ঞান হইতেছে আকাশের সমান" (৮নং উক্তি)।

জ্ঞান যে আকাশের সমান, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার উক্তিসমূহের "গ-অংশে" বলিতেছেন—

"জ্ঞান হইতেছে অসঙ্গ", অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না (গ অংশ, ১নং

উক্তি) এবং আকাশও অসঙ্গ, অর্থাৎ কাহারো সঙ্গে আকাশ লাগে না (গ-অংশ, ২নং উক্তি)। আমরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জ্ঞান ও আকাশের এই "অসঙ্গতা" লইয়াই ঐ দুইটি বস্তুর, অর্থাৎ জ্ঞান ও আকাশের সমানতা অথবা সাম্য।

যদি দেখা যায় যে, জ্ঞানের ও আকাশের "অসঙ্গতা" সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়কে পণ্ডিত ছাড়া আর কোন বিশেষণে বিভূষিত করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

জ্ঞান অসঙ্গ ইহা বলিতে কি বুঝায়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, জ্ঞান অসঙ্গ, ইহা বলিতে বুঝায় যে, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয় বা বস্তুর কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না। পাঠক, আপনি একটি বানরকে লিখিতে দেখিতেছেন, এবং উহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং কি করিয়া বানরের লেখা সম্ভব হইতে পারে, তাহার জ্ঞানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

এইখানে, "বানরকে যে লিখিতে দেখিতেছেন", ইহাই আপনার "জ্ঞান", আর "কি করিয়া বানরের পক্ষে লেখা সম্ভব হইতে পারে", তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া আপনার "জ্ঞেয়", অথবা "জ্ঞানের বিষয়"।

এক্ষণে পাঠক আপনি চিন্তা করুন যে, "বানরের লেখা" সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান না হইলে জ্ঞেয় বস্তু অথবা বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উদ্ভব হইতে পারে কি? যদি দেখা যায় যে, পরিদৃশ্যমান জগতে জ্ঞানের উদ্ভব না হইলে জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না, ইহা বলা চলে না। এতৎসত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে, "জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না", তাহা হইলে তিনি যে-ই হউন, তাঁহার মানসিক অথবা দৈহিক সুস্থতা কি সন্দেহজনক নহে?

পরিদৃশ্যমান জগতের কোন বাস্তব ঘটনা হইতে যেমন জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানের সম্বন্ধহীনতা প্রতিপন্ন হয় না, সেইরূপ আকাশও যে অসঙ্গ, অর্থাৎ কাহারও সঙ্গে আকাশ যে লাগে না, তাহাও প্রতিপন্ন হয় না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লোকতঃ আকাশ বলিতে কি বুঝায়, তাহা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, জগতে এমন কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নাই, যাহা আকাশ ছাড়া থাকিতে পারে।

কাজেই বলিতে হইবে যে, জ্ঞানকে অথবা আকাশকে যেরূপ অর্থে শাস্ত্রী মহাশয় অসঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থে উহাদিগকে অসঙ্গ মনে করা, অথবা জ্ঞানকে আকাশের সমান মনে করা সম্পূর্ণ অলীক।

জ্ঞান যে অসঙ্গ, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি লঙ্কাবতার-সূত্র হইতে "অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "অসঙ্গ" এই শব্দটীর অর্থ যে 'শব্দহীনতা" অথবা সম্বন্ধশূন্যতা, তাহা তিনি কোন ঋষি-প্রণীত "ভাষাবিজ্ঞান" অথবা ব্যাকরণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন কি?

বেদাঙ্গের শিক্ষা, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ এবং নিরুক্তে যদি প্রবেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, "অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই বচনটীর অর্থ তিনি যাদৃশ ভাবে "সঙ্গহীনতা জ্ঞানের লক্ষণ" বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা যথাযথ নহে। "সঙ্গহীনতা জ্ঞানের লক্ষণ" এবংবিধ বাক্যে কোন উপলব্ধিযোগ্য অর্থ হয় না। বেদাঙ্গানুসারে বাঙ্গালায় ঐ বচনটীর অর্থ হইবে, "যে কার্য্যে কি করিয়া ব্রহ্মরূপ হইতে জীবের মেদাবরণের উদ্ভব হইতেছে এবং ঐ মেদাবরণ (the coating of mucus membrane) হইতে নয়নের উদ্ভব হইতেছে, তাহা উপলব্ধিযোগ্য হয়, সেই কার্য্যের নাম জ্ঞান।"[1]

"অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই কয়েকটী পদ-সমন্বয়ের মধ্যে কি করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে শাস্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লৌকিক ভাষার অথবা ভাবের প্রকাশ যেরূপ ভাবে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সংযোগে সাধিত হইয়া থাকে এবং লৌকিক ভাষার অথবা ভাবের অর্থ যে রকম প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সংযোগের বিধানের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, প্রকৃতির অথবা শক্তির উদ্ভব

(১) জ্ঞানের এই সংজ্ঞা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এই সংখ্যায় প্রকাশিত "ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কলিকাতায় বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলন" শীর্ষক প্রবন্ধে মনের ও বুদ্ধির সংজ্ঞা সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগকে পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

কিরূপ ভাবে হয়, তাহা বর্ণনা করিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই ভাষার অর্থোদ্ধার উপরোক্ত উপায়ে সম্ভব হয় না। তাহার কারণ, শব্দের প্রকৃতির উদ্ভব হইবার পর ঐ প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের সংযোগ সম্ভব-যোগ্য হয় বটে এবং তখন প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সংযোগের বিধানানুসারে ভাষার অর্থোদ্ধার করাও সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন শব্দের প্রকৃতির উদ্ভব হয় নাই এবং শব্দ তাহার প্রকৃতিতে উপনীত হইবার রাস্তায় রহিয়াছে, তখন যে ভাষায় শব্দের প্রকৃতিতে উপনীত হইবার ভাবগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই ভাষার অর্থোদ্ধার করা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সংযোগের বিধানানুসারে সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদের এই কথা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাণিনীয়া শিক্ষার "আত্মা বুদ্ধ্যা সমর্থ্যার্থা"-প্রভৃতি কারিকাগুলি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে।

পাণিনীয়া শিক্ষার ঐ অংশ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই বচনের 'অসঙ্গ' পদটী কোন ধাতুপ্রকৃতির সহিত কোন প্রত্যয়ের সংযোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই। পরন্তু ঐ পদটী 'অ', 'সং' এবং 'গ' এই তিনটী বর্ণের সংমিশ্রণে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং ঐ তিনটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণটী এক একটী জ্ঞানের সংস্কার সাধন করিয়া সম্পূর্ণ পদটীর অর্থোদ্ধার করিবার সহায়তা করিতেছে।

> বর্ণাঃ স্বজ্ঞানসংস্কারৈঃ সংভূয় স্মৃতিকারিভিঃ।
> ক্রমেণৈকস্মৃতৌ বুদ্ধ্যা বোধয়ন্ত্যর্থমঞ্জসা ॥
>
> —শব্দ-নির্ণয়

বস্তুর ব্যক্ত অবস্থা যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুর "অব্যক্ত" এবং "জ্ঞ" অবস্থা যে কখনও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং তাহা যে একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা যে ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার অর্থ যে পন্থায় উদ্ধার করা যাইতে পারে, বস্তুর বুদ্ধি-গ্রাহ্য অবস্থা সেই ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না ও তাহার অর্থও সেই পন্থায় উদ্ধার করা যাইতে পারে না, এই কথা কয়েকটি উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত উক্তি বুঝিতে পারা সহজসাধ্য হইবে।

"অসঙ্গ"—এই পদটীর অকারের অর্থ "ব্রহ্মরূপ," ("অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যাৎ"—নন্দিকেশ্বরের কাশিকা)—"সং" এর অর্থ "মেদাবরণ,"[২] (the coating of mucus membrane), "গ"এর অর্থ নয়ন (নন্দিকেশ্বরের কাশিকা)।

"অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই বচনটীর "যে কিরূপে যে কার্য্যে কি করিলে ব্রহ্মরূপ হইতে জীবের মেদাবরণের উদ্ভব হইতেছে এবং মেদাবরণ হইতে নয়নের উদ্ভব হইতেছে তাহা উপলব্ধি-যোগ্য হয়, সেই কার্য্যের নাম "জ্ঞান" " এতাদৃশ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারুন আর না-ই পারুন, উপরোক্ত ভাবে অর্থ সাধিত হইলে যে একটা ধারণার যোগ্য অর্থ নিষ্পন্ন হয়, আর "সঙ্গহীনতা যাহার লক্ষণ তাহার নাম জ্ঞান" ইহা বলিলে জ্ঞান সম্বন্ধে যে কোন ধারণাযোগ্য অর্থ নিষ্পন্ন হয় না, তাহা যাঁহারা যুক্তি-যুক্ততার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য।

কাজেই বলিতে হইবে যে, জ্ঞানকে আকাশের সমান মনে করা যেরূপ অলীক, সেইরূপ আবার ঐ প্রসঙ্গে "অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্" এই বচনটিও অপ্রাসঙ্গিক

"জ্ঞানেনাকাশকল্পেন" ইহার অর্থ যে "আকাশসদৃশ জ্ঞান" নহে, তাহা আমরা প্রবন্ধের শেষ ভাগে দেখাইব।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "খ-অংশের" দ্বিতীয় উক্তিতে বলিতেছেন যে, "এই জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই

"জ্ঞান" কাহাকে বলে ও "জ্ঞেয়"ই বা কাহাকে বলে, তাহা জানা থাকিলে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে কতখানি তফাৎ, তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

সংস্কৃত তত্ত্বভাণ্ডারের প্রথম কথা, প্রমাণ, প্রমাতৃ ও প্রমেয়ের পার্থক্য কোথায়, তাহা লইয়া। প্রমাণ, প্রমাতৃ, ও প্রমেয়ের মধ্যে যে তফাৎ, বিদ্যা, বেত্তৃ ও বেদ্যের মধ্যে এবং জ্ঞান, জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়ের মধ্যেও সেই তফাৎ, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। "খ"-অংশের সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে,

---

(২) "সং" এই শব্দটীর অর্থ যে মেদাবরণ তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে, কি রূপ ভাবে উপসর্গসমূহের উদ্ভব হয়, তাহা বেদের যে সমস্ত দ্যোতক মন্ত্রের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সেই সমস্ত মন্ত্রে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হয়। নিরুক্তের "সমাম্নায় সমাম্নাত" অথবা প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ের "স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি" এই দুইটি সূত্র যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলেও "সং" এই শব্দটির অর্থ যে জীবের "আভ্যন্তরীণ মেদাবরণ তাহা বুঝা সম্ভব হয়।

একটি বানরকে লিখিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বানর কিরূপ ভাবে লিখিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মানুষের যখন অনুসন্ধিৎসার উৎপত্তি হয়, তখন "বানর যে লিখিতে পারে", ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া মানুষের "জ্ঞান", আর "কিরূপ ভাবে বানরের লেখা সম্ভব হয়", তাহা মানুষের "জ্ঞেয়"। পাঠক, "জ্ঞান" ও "জ্ঞেয়ের" মধ্যে ভেদ আছে কি না তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখুন।

আরও লক্ষ্য করুন যে, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার উক্তির "গ-অংশে" একবার বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না," আবার ঘ-অংশের দ্বিতীয় উক্তিতে বলিতেছেন যে, "জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই"।

যে দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নাই, তাহাদের মধ্যে ভেদ-হীনতা আসে কি করিয়া, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অন্যতম গুরুদেবকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন। এতাদৃশ বিরুদ্ধ উক্তি কি মস্তিষ্কহীনতা অথবা তাঁহার তৎসদৃশ অসুস্থতার পরিচায়ক নহে?

আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপকের পদে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পরিচালিত সিণ্ডিকেট সংস্কৃত তত্ত্বজ্ঞানের "ক"-"খ"র সহিত অপরিচিত মস্তিষ্কহীন একটি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন?

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ঘ-অংশে বলিতেছেন যে, ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের যে ঐ মত, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য, তিনি দিঙ্‌নাগের আলম্বনপরীক্ষা হইতে "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভা-সতে" এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ বচনটীর অর্থ করিয়াছেন, "জ্ঞেয়ের আকারে যাহা ভিতরে আছে তাহা বাহিরের মত বলিয়া প্রকাশ পায়।"

দিঙ্‌নাগের আলম্বনপরীক্ষা বলিয়া কোন গ্রন্থ আছে কি না, অথবা ঐ গ্রন্থে উপরোক্ত বচনটী আছে কি না, তাহা আমাদের সঠিক জানা নাই

Randle সাহেবের "Fragments from Dinnag" নামক যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, ঐ গ্রন্থের অনেক বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে বলিয়া আমাদের অনুমান। ইয়োরোপীয় তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞগণ যে বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তক-সমূহের ভাষা ও ভাব না বুঝিতে পারিয়া প্রায়শঃ ঐ সমস্ত পুস্তকের "ঘণ্ট" প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অদূরভবিষ্যতে লোকসমাজে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আলম্বনপরীক্ষার অস্তিত্বে অথবা আলম্বনপরীক্ষায় যে "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভাসতে" এই বচনটী আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ না করিলেও, "জ্ঞেয়ের আকারে যাহা ভিতরে আছে, তাহা বাহিরের মত বলিয়া প্রকাশ পায়", এতাদৃশ অর্থ যে কি প্রকারে ঐ বচনটী হইতে আসিতে পারে এবং ঐ বাঙ্গালা অর্থের মর্ম্মই বা যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"জ্ঞেয়ের আকারে যাহা ভিতরে আছে তাহা বাহিরের মত বলিয়া প্রকাশ পায়", এতাদৃশ বাঙ্গালার একদিকে যেমন কোন অর্থ নাই, অন্যদিকে আবার "জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কোন ভেদ নাই" এবংবিধ বচনের সহিত যে উহার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, তাহাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভাসতে" এই সংস্কৃত বচনটী বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিতে হইলে আমাদের মতে বলিতে হইবে, "জীবের অন্তর সম্বন্ধে যাহা জ্ঞেয়, তাহার যে রূপ, সেই রূপই জীবের বাহিরেও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে।" এই অনুবাদটীর ভ্রমহীনতা স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যাইবে যে, উহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল বক্তব্যের কোন প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান নাই।

উপরোক্তভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, শাস্ত্রী মহাশয়ের এতাদৃশ উক্তি তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সপ্রমাণিত করিতে পারেন নাই। পরন্তু কখনও তাহা তিনি সঠিক ভাবে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বৌদ্ধ দার্শনিকের মত যে তদ্বিপরীত, প্রয়োজন হইলে আমরা তাহা সপ্রমাণিত করিতে পারিব। কাযেই বলিতে হইবে যে, শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, তেমনি বাঙ্গালা-ভাষায়ও তাঁহার অধিকার। আবার উপনিষদের তত্ত্বেও যেমন তিনি প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন, বৌদ্ধ দর্শনেও তাঁহার তেমনই পাণ্ডিত্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশেষ নিপুণতার সহিত

অধ্যাপকের নির্ব্বাচন-কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবসর ইহার পর আর পাঠকবর্গের থাকিতে পারে কি ?

খ-অংশের তৃতীয় উক্তিতে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, "ধর্ম অর্থাৎ বিষয় বা পদার্থসমূহও আকাশের সমান"।

ধর্ম যে আকাশের সমান তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি তাঁহার উক্তির চ-অংশে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যায়, "স্বলক্ষণধারণাদ্ ধর্মঃ" এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্মের মূলার্থ হইতেছে "লক্ষণ" বা "স্বলক্ষণ", "স্বভাব"। আর উহার ভাবার্থ হইতেছে বস্তু, বিষয়, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করি, অর্থ, পদার্থ অথবা প্রমেয়। স্ফোটবাদ সম্বন্ধে যাঁহারা আনুপূর্ব্বিক অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন যে, ঐ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট গ্রন্থ দ্যোতক-মন্ত্র-সংবলিত বেদ ও বেদাঙ্গ এবং তৎপরে ঐ বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ ভর্ত্তৃহরির "বাক্যপদীয়"।

বেদ, বেদাঙ্গ ও বাক্যপদীয়ে যাঁহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ফোটবাদ নির্ভুল ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। ঐ প্রবেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না তাহা সত্য, কিন্তু কুমারিল ভট্টের "শ্লোকবার্ত্তিক", নাগেশ ভট্টের "বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জুষা", ভট্টজী ভট্টের "শব্দকৌস্তুভ" কোণ্ডভট্টের "বৃহদ্ বৈয়াকরণ-ভূষণ", বিশ্বেশ্বর সূরির "ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি" অধ্যয়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে স্ফোটবাদ-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আনুপূর্ব্বিক পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলেও মোটামুটি যাহা জানা যায়, তদ্দ্বারা শব্দ অথবা পদবিশেষ দ্রব্যার্থক, অথবা কর্ম্মার্থক, অথবা গুণার্থক তাহা বুঝিতে পারা যায়। শ্লোকবার্ত্তিক প্রভৃতি উপরোক্ত গ্রন্থ কয়খানির কোন একখানির স্ফোটনিরূপণাধ্যায় পড়া থাকিলে 'ধর্ম' যে কর্ম্মার্থক শব্দ এবং লক্ষণ, স্বভাব প্রভৃতি শব্দ যে দ্রব্যবিশেষের গুণার্থক অথবা অবস্থাবাচক শব্দ, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারা যায়।

কাযেই "ধর্ম্মে"র অর্থ "লক্ষণ", "স্বলক্ষণ" অথবা "স্বভাব" বলিলে গুণার্থক অথবা অবস্থাবাচক শব্দের দ্বারা কর্ম্মার্থক শব্দের অর্থ নিরূপণ অথবা প্রতিশব্দ সাধিত হয়।

কোন কর্ম্মার্থক শব্দের অর্থ যে গুণার্থক অথবা অবস্থাবাচক শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও বুঝা সম্ভব হয়। কাযেই ধর্মের অর্থ যে লক্ষণ ও স্বলক্ষণ, অথবা স্বভাব হইতে পারে না, তাহা শব্দার্থনির্ণয়ের ক-খ জানা থাকিলেও বুঝা সম্ভব হয়।

আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত শব্দার্থনির্ণয়ের ক-খ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত না হইয়া আজকালকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লোকের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করার নিপুণতা লাভ করিয়াই পণ্ডিতের তালিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন ?

ধর্ম্মের অর্থ যে লক্ষণ, স্বলক্ষণ ও স্বভাব, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় যে সংস্কৃত বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যথাযথ অর্থে বুঝিতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই জ্ঞান পর্য্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। ঐ বচনটী বুঝিতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের থাকিত, তাহা হইলে ঐ বচনটী উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতে পারিতেন না যে, ধর্মের অর্থ লক্ষণ অথবা স্বলক্ষণ ইত্যাদি। যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, "স্বলক্ষণধারণাদ্ ধর্ম্মঃ" এই বচনটীকে বাঙ্গালায় অনুদিত করিতে হইলে বলিতে হয় যে, স্ব-(সু+অ)-এর লক্ষণ অর্থাৎ সু এই উপসর্গ অথবা উপসৃষ্টিটি হইতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার চিহ্ন ধর্মের কার্য্যে বজায় থাকে বলিয়া ধর্মকে ধর্ম বলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন যে, "সু" এই উপসর্গটির অর্থ জীবের সেই অবস্থা, যে অবস্থা হইতে তাহার অনুভূতি অথবা চিতির উদ্ভব হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে বলা হইয়াছে যে, "চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" অর্থাৎ কিরূপে অনুভূতির উদ্ভব হইতেছে, তাহা আভ্যন্তরীণ মেদাবরণে উপলব্ধি করিতে পারিলে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কি রূপে হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়।

"স্ব" সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইল, তাহা "কর্ম্মী" না হইলে বুঝা সহজসাধ্য নহে বটে, কিন্তু উহা

বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ধর্মকার্য্যে যে কেবল মাত্র স্ব-এর লক্ষণই বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে। উহাতে স্ব-এর লক্ষণ ছাড়া আরও কিছু পরিলক্ষিত হয়। উহাতে যেরূপ "স্ব"-এর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অন্যান্য অবস্থার লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্ব-মীমাংসার "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ", এই সূত্রের অর্থ যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, যে যে কার্য্য দেখিয়া জীবের ধর্ম কি তাহা নির্ণীত হয়, সেই সেই কার্য্যে যেমন জীবের প্রেরণার চিহ্নসমূহ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার জীব কি চাহিতেছে, তাহার জন্য কার্য্যের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়। কাজেই কোন কোন লক্ষণ জীবের ধর্মের অন্যতম পরিচায়ক হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ লক্ষণকেই তাহার ধর্ম বলা চলে না।

কোন তত্ত্বকথার মূলার্থ ও ভাবার্থের মধ্যে কোন্ কোন্ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তাহা যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, ভাবার্থে এমন কোন কথা বলা চলে না, যাহা মূলার্থের বিরোধী, অথবা উহার সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সম্বন্ধহীন।

মূলার্থে যদি বলা হয় যে, অমুক শব্দটির মূলার্থ লক্ষণ, অর্থাৎ দ্রব্যের কোন গুণবাচক অবস্থা, আর তাহার ভাবার্থ "বস্তু" অর্থাৎ কোন গুণসংবলিত দ্রব্য, তাহা হইলে ঐ দুইটি অর্থ সম্বন্ধবিহীন হইয়া পড়ে। কাজেই যে শব্দের মূলার্থ লক্ষণ অথবা স্বভাব, তাহার ভাবার্থ বস্তু অথবা বিষয় হইতে পারে না।

কাজেই বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষানুসারে ধর্মের সংজ্ঞা যে কি, তাহার কোনরূপ সঠিক ধারণা শাস্ত্রী মহাশয়ের নাই।

ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানা থাকিলে শাস্ত্রী মহাশয় বুঝিতে পারিতেন—যে, ধর্ম কখনও আকাশের সমান হইতে পারে না। ধর্ম একটি কার্য্যবাচক শব্দ আর আকাশ একটি গুণসংবলিত দ্রব্যবাচক শব্দ। একটি কার্য্য অপর কোন একটি কার্য্যের সহিত উপমেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু একটি কার্য্য যে কোন দ্রব্যের উপমেয় হইতে পারে না, তাহা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে।

"ধর্মান্ যো গগনোপমান", ইহার অর্থ যে "আকাশসদৃশ ধর্ম" এবংবিধ কোন বাক্য হইতে পারে না, তাহা আমরা এই সন্দর্ভের শেষ ভাগে দেখাইব।

ধর্ম যে আকাশের সদৃশ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ৮-অংশে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, যাঁহারা বাস্তব জগতে চক্ষু মেলিয়া চলাফেরা করেন, অথবা সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহার যথাযথ ধারণা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের লেখনী হইতে ঐ সমস্ত কথা নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের কথা ঠিক কি না তাহা বিচার করিবার ভার পাঠকবর্গের হস্তে অর্পণ করিতেছি।

এই ৮-অংশের তাঁহার প্রথম কথায়—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, (১) পরমার্থতঃ বাহ্যবিষয়সমূহের কোন অস্তিত্ব নাই এবং (২) বাহ্য-বিষয়ের কোন স্বভাব নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরোক্ত কথায় আমরা ধরিয়া লইব যে, বাহ্য বিষয়ের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ ঐ বাহ্য বিষয়ের মূলে কি আছে, তাহার সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে আর বাহ্য বিষয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন দেখা যায় যে, বাহ্য বিষয়ের যাহা কিছু স্বভাব তাহা তাহার মূলে যে অন্তর্বিষয়সমূহ রহিয়াছে, তাহাদের স্বভাব লইয়া। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার উপরোক্ত অর্থ ছাড়া আর কোন সঙ্গত অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। কারণ চোখে যাহা দেখা যায়, অথবা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, তদনুসারে বাহ্য বিষয়ের যে অস্তিত্ব আছে এবং তাহার কোন কোন স্বভাবও যে বিদ্যমান আছে, তাহা ইন্দ্রিয়সংবলিত কোন মানুষ অস্বীকার করিতে পারেন না।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা তদুচিত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিবেন যে, পরমার্থতঃ ঐ বাহ্য বিষয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রকৃত চৈতন্য না হইলে যে, বাহ্য বিষয়ের মূলে কি আছে, তাহা বুঝা যায় না, চিৎ, চিত্ত ও চেতনা কি তাহা না বুঝিতে পারিলে যে, চৈতন্য কি তাহা বুঝা

যায় না, এবং বাহ্য বিষয় অর্থাৎ জড়ের উদ্ভব না হইলে যে, চিৎ অথবা চিত্ত অথবা চেতনার উদ্ভব হয় না, তাহা ঐ বিষয়ক ঋষিপ্রণীত যে কোন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে।

পাঠক, আপনার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহ্য বিষয় কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে অর্থাৎ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, কর্ণের শ্রবণশক্তি প্রভৃতির উৎপত্তি কিরূপ ভাবে হইল, তাহার উপলব্ধি যে বাহ্য চক্ষু ও কর্ণ ব্যতীত হইতে পারে, তাহা আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি? কাযেই বলিতে হইবে যে, বাস্তবতঃ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব যেরূপ অস্বীকার করা যায় না, পরমার্থতঃও ঐ বাহ্য বস্তুগুলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

যে কারণ হইতে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, কর্ণের শ্রবণশক্তি প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে, সেই কারণের সন্ধান পাইলে, অর্থাৎ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ কারণের স্বভাব ও বাহ্য চক্ষুর স্বভাবের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে, কারণ বাহ্য চক্ষু বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি অপরাপর বাহ্য বস্তুর দ্বারা যেরূপ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, ঐ আভ্যন্তরীণ কারণ সেইরূপ ভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

কাযেই বাহ্য বিষয়সমূহের কোন স্বভাব নাই, তাহাও বলা চলে না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রেণীর কোন কোন পণ্ডিতের লিখিত কোন কোন ভাষ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরোক্ত কথার পরিপোষকতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোন সত্যদ্রষ্টা ঋষি-প্রণীত মূল গ্রন্থে ঐ শ্রেণীর অবাস্তব কথা পাওয়া যাইবে না।

অধিক কি, মাণ্ডুক্যোপনিষদের অলাতশান্তি প্রকরণ, যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য, তাহা তথাকথিত পণ্ডিতগণের প্রণীত ব্যাকরণের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, অজড় হইতে জড়ের, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি কিরূপ ভাবে হইতেছে এবং জড় ও অজড়ের মিলনে কিরূপ ভাবে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার আলোচনাই ঐ প্রকরণের অন্যতম বিষয়।

যদি দেখা যায় যে, জড় ও অজড়ের মিলনে চৈতন্যের উদ্ভব হইতেছে, তাহা হইলে পরমার্থতঃ জড়ের অস্তিত্ব অথবা প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা বলা যায় কি?

জড় বস্তুর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই—ইহা যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উক্তি, সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যে সত্যদ্রষ্টা ঋষি-গণের অনুবর্ত্তিতার নামে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়া থাকে এবং তাহারাই যে মানবসমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতাদৃশ পতনের অন্যতম কারণ, তাহা মানুষ আজ বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে প্রকৃতি দেবী যে উহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

ঙ-অংশের তৃতীয় কথায় শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, তাঁহার মতে ধর্মের বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই।

সংস্কৃত ভাষায় যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, অথবা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের আস্বাদ যিনি বিন্দু-মাত্রও লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতে "ধর্ম্মের বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই", এতাদৃশ কথা যে কিরূপ ভাবে নির্গত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এতাদৃশ ব্যক্তির উপর ছাত্রদিগের অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত থাকিলে ছাত্রদিগের চরিত্রের পরিণতি কিরূপ হইতে পারে, যিনি প্রসঙ্গতঃও ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার দ্বারা ভারতের তথা মানবজাতির জাতীয় গৌরবের উৎস ঐ ঋষিগণের সম্মান বজায় রাখা কিরূপ ভাবে সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমরা পাঠক-বর্গকে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। এতাদৃশ মানুষ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা কি সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুপযুক্ততার সাক্ষ্য নহে?

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার ছ-অংশের প্রথম উক্তিতে বলিতেছেন যে,

"বৌদ্ধমতে রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম, এবং কেবল ইহারাই আছে, ধর্মী (যাহার ধর্ম আছে) বলিয়া কিছু নাই।"

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য "কঠিনা দৃশ্যতে ভূমিঃ," ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্লোকটির অনুবাদে লিখিয়াছেন "ভূমিকে কঠিন বলিয়া দেখা যায় এবং ইহা শরীরের দ্বারা গৃহীত হয়। অতএব বলা হইয়া থাকে যে, এই ভূমি হইতেছে কেবল স্পর্শ।"

পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে সংস্কৃত অনুবাদের প্রচলিত পদ্ধতি পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে কি না। "সাপি কায়েন গৃহ্যতে," ইহার অনুবাদে যদি বলা হয় যে, "ইহা শরীরের দ্বারা গৃহীত হয়," তাহা হইলে "সাপি"র 'অপি' শব্দটি অননূদিত থাকিয়া যায় না কি

"তেন হি কেবলং স্পর্শে, ভূমিরেষেতি কথ্যতে", ইহার অনুবাদে যদি বলা হয় "অতএব বলা হইয়া থাকে যে, এই ভূমি হইতেছে কেবল স্পর্শ", তাহা হইলে মূলে যে "স্পর্শে" শব্দটী অধিকরণে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে কর্ত্তা করিয়া অনুবাদ করা হয় না কি? অধিকরণকে কর্ত্তা করিয়া অনুবাদ করা বিধিবহির্ভূত নহে কি? "কঠিনা দৃশ্যতে ভূমিঃ", ইত্যাদি শ্লোক নির্ভুল ভাবে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে বলিতে হইবে, "ভূমি কঠিন বলিয়া দেখা যায়, উহা যে কঠিন তাহা প্রতীয়মান হয় শরীরের দ্বারা। শরীরের দ্বারা ভূমির কাঠিন্য প্রতীয়মান হয় বলিয়াই কেবল স্পর্শাধিকরণেই এইটা ভূমি ইহা বলা যাইতে পারে"।

আমাদের মতে কি করিয়া কোন্‌টি ভূমি, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে এবং কেবল মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারাই যে কোন্‌টি ভূমি, তাহা জানা যাইতে পারে, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা সঠিক ভাবে জানা যায় না, তাহাই ব্যাখ্যা করা উপরোক্ত শ্লোকটির প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের মতে শাস্ত্রী মহাশয় এই শ্লোকটীর মূল উদ্দেশ্য কি, তাহাই ধরিতে পারেন নাই বলিয়া একে ত' অসঙ্গত ভাবে উহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার পর আবার বাঙ্গালা হিসাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন অর্থ হয় না। "ভূমি হইতেছে কেবল স্পর্শ", ইহা বলিলে কোন শব্দবিজ্ঞানের বিধিসঙ্গত বাক্য নিষ্পন্ন হয় কি? এবং তাহাতে কিছু বুঝা যায় কি?

পাঠকগণ, তাহার পর আবার চাহিয়া দেখুন, "ধর্ম্মী বলিয়া কিছু নাই" ইত্যাদি বিষয়ের সহিত এই শ্লোকের কোন প্রাসঙ্গিক তার অস্তিত্ব নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় যাহাকে ধর্ম ও ধর্মী বলিতেছেন, তদনুসারে "ধর্মী বলিয়া যে কিছু নাই", তাহা প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং স্পর্শের কারণ যে 'কায়' এবং প্রত্যেক কার্য্যের যে একটি কর্ত্তা অথবা করণ (বাঙ্গালায় কারণ) বিদ্যমান থাকে, তাহাই ঐ শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

বৌদ্ধ মতে যে রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যাদিকে ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে, ইহা জ্যোতির্বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত করা যায় না।

প্রয়োজন হইলে আমরা প্রতিপন্ন করিব যে, বর্ত্তমান ইতিহাসানুসারে শাক্যসিংহের যাহা জীবিতকাল বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ মতবাদ বলিয়া একটি মতবাদ অধিকারিবিশেষের জন্য সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ মতবাদ বেদের বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, উহা সম্পূর্ণ বেদের অনুবর্ত্তী। শাক্যসিংহ বলিয়া একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া তৎকালোচিত মানুষের পক্ষে ঐ মতবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা মনে করিয়া কেবল মাত্র ঐ মতবাদের প্রচার যে সাধন করিয়াছিলেন এবং উহার রচনা যে করেন নাই, তাহাও প্রয়োজন হইলে প্রমাণিত হইতে পারিবে। আজকাল যেরূপ দুইটা মীমাংসাকে দর্শনের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ষড়্‌দর্শনের হিসাব করা হয়, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের অনুবর্ত্তী প্রাচীন পণ্ডিতগণ মীমাংসাকে দর্শন বলিয়া ধরিতেন না, তাঁহাদের কথানুসারে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ষড়্‌দর্শনের অন্যতম দুইটি দর্শন।

প্রকৃত বৌদ্ধ দর্শনে রূপবান্ হওয়া, বলবান্ হওয়া, স্পর্শবান্ হওয়া প্রভৃতি কার্য্যকে প্রকৃতির ধর্ম বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কুত্রাপি রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যা-

দিকে ধর্ম বলা হইয়াছে, অথবা ধর্মী-হীন ধর্মের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, এতাদৃশ কথা ঐ দর্শনে আছে বলিয়া কাহারও পক্ষে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে।

কতকগুলি তথাকথিত পণ্ডিতের এবং ঐতিহাসিকের অনাচারে বৌদ্ধ-দর্শন বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত জগাখিচুড়ীতে পরিণত হইয়াছে। বেদে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বৌদ্ধ-দর্শন যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা ঐ দর্শনের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারিলে মানুষ বুঝিতে পারিবে। অথচ পণ্ডিতগণের যে সম্প্রদায়কে আধুনিক মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যই যে প্রকৃত বৌদ্ধ-দর্শন পরিজ্ঞাত না হইয়া উহার এতাদৃশ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজন হইলে সপ্রমাণিত করা যাইবে।

শঙ্করাচার্য্য যে কোন্ শ্রেণীর পণ্ডিত, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আজ তমসার অন্ধকারে লুক্কায়িত। ইহার কারণ দুইটি, যথা—

(১) সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বস্তুর অব্যক্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ বুদ্ধি-গ্রাহ্য) এবং "জ্ঞ" (অর্থাৎ যাহার জন্য জীবের চৈতন্যের উদয়) অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ কিরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হয় এবং উহা কিরূপ ভাবে বুদ্ধিগম্য হয়, তাহা স্থির করিয়া যে ভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই ভাষার বিস্মৃতি।

(২) বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের অনাচার।

জগতের রূপ কি এবং ভারতের, শুধু ভারতের কেন, জগতের ইতিহাস, যুগে যুগে কি রূপ ধারা অবলম্বন করে, তাহা উপরোক্ত সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মানুষ যখন ঐ ভাষা পুনরায় বুঝিতে পারিবে, তখন ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পাঠকগণই আমাদের কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বর্ত্তমানে এখন আর কেহ ঐ ভাষা বুঝিতে পারেন না বলিয়া, ঐ মহাপুরাণগুলি কতকগুলি আজগুবি অবাস্তব গল্পের ভাণ্ডার হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ মহাপুরাণগুলির প্রণেতা সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহাদের লেখনী হইতে কখনও অবাস্তব অথবা অসত্য কথা নির্গত হইতে পারে না। ব্যাকরণের যে পদ্ধতি অনুসারে ঐ মহাপুরাণের অবাস্তব অর্থ স্থিরীকৃত হয়, সেই পদ্ধতি অবিশ্বাসযোগ্য, ইহা বুঝিতে হইবে। কতকগুলি পাপিষ্ঠ তথাকথিত পণ্ডিত এই সরল সত্যটুকু বুঝিতে পারেন না এবং না বুঝিতে পারিয়া একদিকে যেরূপ ঋষিদিগের প্রতি মানবসমাজের অশ্রদ্ধার কারণের সৃষ্টি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ নিজ নিজ বংশের হতশ্রী সাধন করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, অথবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত করা যায় না। ভারতের ঋষিকে অথবা তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া ভারতের কোন প্রাচীন ইতিহাস যে রচিত হইতে পারে না, তাহা সহজেই বোধগম্য। কাযেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে যে ঋষি-প্রণীত সমগ্র গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইয়োরোপেরই হউন অথবা এতদ্দেশীয়ই হউন, যাঁহারা বর্ত্তমান কালে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ভারতীয় ঋষির সমগ্র গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়া তো দূরের কথা, ঐ গ্রন্থসমূহের নাম পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহেন। ফলে, পরীক্ষা করিলে যাহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাই প্রায়শঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এতাদৃশ আত্মপ্রতারক ঐতিহাসিকগণ ঐতিহাসিকের গর্ব্বানুভব করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টও এতাদৃশ অবিশ্বাসযোগ্য কথার প্রচারক এই ঐতিহাসিকগণকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এবংবিধভাবে পণ্ডিতগণের বুদ্ধি মলিন না হইলে মানবজাতি এতাদৃশ দুর্দ্দশায় উপনীত হইতে পারিত না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃত ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের রচনাকাল, অথবা বিভিন্ন পণ্ডিত-

গণের জীবিতকাল বলিয়া যাহা বর্ত্তমান পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ।

বস্তুতঃ পক্ষে শঙ্করাচার্য্যের জন্মকালের বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় ঋষির বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থরাশির প্রকৃত মর্ম্ম এবং গ্রন্থরাশির মূল ভাষা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল। আধুনিক শ্রুতবোধের সহিত দুঃখভঞ্জন প্রণীত বাগ্‌বল্লভের পার্থক্য কোথায়, আধুনিক কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের সহিত ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও বাগ্‌ভট্টের কাব্যানুশাসন শ্রেণীর গ্রন্থের পার্থক্য কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে।

শঙ্করাচার্য্যের জীবিতকালের অন্ততঃ পক্ষে হাজার বৎসর আগে ভারত এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। শারীরিক ও মানসিক অবস্থার তাড়নায় শঙ্করাচার্য্যের জন্মের সাত আট শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং উহার ভাষার জ্ঞান উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। এই সময়েই নানাবিধ ব্যাকরণের প্রণয়ন-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। অথচ ভারতে একদিন ছিল, যখন মানুষ ভারতীয় ঋষির ভাষা বুঝিবার জন্য একমাত্র বেদাঙ্গের উপর নির্ভর করিত। "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে মানুষের মধ্যে কোন মতভেদের বিদ্যমানতা থাকে না, আর যখন প্রকৃত জ্ঞান লুপ্ত হয়, তখনই এক একটি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়। এইরূপে যখন বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যাকরণের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন যে প্রকৃত ভাষা-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, আর যখন একমাত্র বেদাঙ্গের উপর মানুষ ভাষাজ্ঞানের জন্য নির্ভরশীল ছিল, তখন যে প্রকৃত ভাষাজ্ঞান বিদ্যমান ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বেদাঙ্গের ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে এবং তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে পাঁচ ছয় বৎসরেই ঋষিপ্রণীত গ্রন্থরাশি সম্পূর্ণ ভাবে অভ্যাস করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়। আর, বেদাঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে সমগ্র জীবনেও ঋষিপ্রণীত গ্রন্থরাশির সহস্রাংশের একাংশেরও যথাযথ মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, শঙ্করাচার্য্য যখন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষে বেদাঙ্গের মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং শঙ্করের পক্ষেও তাহা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। বেদাঙ্গের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ভারতীয় ঋষির বেদাঙ্গের ভাষা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ব্রহ্মসূত্রের অথবা বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন ভাষ্যে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সূত্রের অথবা মন্ত্রের মূল কথা হইতে যে কিরূপে তাঁহার ভাষ্যের কথার উদ্ভব হইতে পারে এবং ঐ ভাষ্যের কথা যে মূলের কথার অনুরূপ, উহা বেদাঙ্গের কোন্ ধারার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা প্রায়শঃ তিনি দেখাইতে সক্ষম হন নাই। বেদাঙ্গে প্রবেশ লাভ করিতে যদি তিনি পারিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহার ভাষ্যের নিভুর্লতা উপরোক্ত ভাবে প্রমাণিত করিতে পারিতেন। বেদাঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়া এখনও তাঁহার ভাষ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা প্রায়শঃ ঋষিপ্রণীত মূলকথার সহিত সংস্রবহীন এবং অনেক স্থানে ঋষিবাক্যের বিরোধী। যে সমস্ত পণ্ডিত ঐ শ্রেণীর ভাষ্য পড়িয়া অথবা তাহার পরীক্ষায় পাশ করিয়া পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন।

শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে বেদাঙ্গে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া ঋষিপ্রণীত সকল বিষয়ের সমগ্র গ্রন্থের সহিত পরিচয় লাভ করাও সম্ভব হয় নাই এবং ঋষিপ্রণীত সকল বিষয়ের সমগ্র গ্রন্থের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়াই, কোন বিষয়ই সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব হয় নাই। কারণ, ঋষিপ্রণীত কোন বিষয়ে সম্যক্ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে হইলে তাঁহাদের প্রণীত

প্রত্যেক বিষয়ের মোটামুটি ধারণা অর্জ্জন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যে সন্দেহের অবসর আছে, তাহা উপরোক্ত ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে।

প্রাচীন মূল বৌদ্ধ-দর্শন যাঁহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বৌদ্ধ মতবাদ বলিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ প্রাচীন বৌদ্ধ-দর্শনের কথা জানা তো দূরের কথা, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিজ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাওয়ায় উহা এই সংখ্যায় সমাপ্ত করা সম্ভব হইল না।

আগামী সংখ্যায়, ছ-অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথা এবং 'ক'-অংশের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। ইহা ছাড়া অলাতশান্তি প্রকরণের প্রথম শ্লোকটির প্রকৃত মর্ম্ম যে কি এবং মাণ্ডূক্যোপনিষদের বক্তব্যই বা কি, তাহাও পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। উহাতে দেখা যাইবে যে, মাণ্ডূক্যোপনিষৎ মানুষের কত নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ভাষ্যকার তাহা না বুঝিতে পারিয়া উহাকে কত আবর্জ্জনার স্তূপে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

সংবাদ ও মন্তব্য

সাম্রাজ্য-দিবস

লণ্ডনের ২৯শে মের সংবাদ:—সাম্রাজ্য-দিবস উপলক্ষে বিমান-পোতসমূহের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইবার যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই সময় বিমান দুর্ঘটনার ফলে আটজনের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। লণ্ডন হইতে "আইল অব ম্যান" পর্য্যন্ত বিমান-প্রতিযোগিতাতেও দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আট সহস্র নরনারী সমবেত হইয়া এই শোচনীয় দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য ঘটনার দ্বারা অদূরভবিষ্যতের কোন বৃহত্তর ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। সমগ্র জগদ্ব্যাপী যে শিল্প-বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইবার রব পড়িয়াছে, কোটি কোটি নরনারী সমবেত হইয়া হতবাক্ হইয়া যে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত ও পুলকিত হইতেছে, তাহাদের মোহ কাটিবার জন্য এমন একটি 'দুর্ঘটনা' ঘটিতে এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগিবার কথা নয়। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বেই কি কোন দূরদর্শী নায়ক দ্বারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারিগণ সচেতন হইবেন না?

নূতন আইন

আসাম আইন-সভার আগামী বৈঠকে আলোচনার জন্য সদস্যগণ ক্রমাগত নূতন নূতন প্রস্তাব আমদানী করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি আফিমখোরদের রোগী হিসাবে হাসপাতালে রাখিয়া আফিম খাওয়ার রোগটা সারান এবং আফিমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

দোষ কি কেবল আফিমের? আমরা তো চারিপাশে চাহিয়া দেখিতেছি কেবলই বিভিন্ন ব্যাধির প্রশেসন। কে জানে হয় তো কোন একটি বিশেষ ব্যাধির নিরাময়ের জন্যই অ্যাসেম্ব্লি-রূপ হাসপাতালসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে কি না!

গো-মড়ক

সান্দুর নামক দেশীয় রাজ্য গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিস্তর গরু ভীষণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 'রিণ্ডার-পেষ্ট' নামক বীজাণুই না কি ইহার জন্য দায়ী।

যদি কোন গতিকে দেশীয় রাজ্যের বাহিরে রোগটা সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে 'রিণ্ডারপেষ্টে'র পক্ষে ভীষণ মুস্কিলের কথা। কোন্‌টি মানুষ, কোন্‌টি গরু ইহা বাছিতেই বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইবে। শেষাশেষি এই গো-ব্যাধিতে মানুষ না মরিতে সুরু করে!

পরীক্ষা-পত্র-চোর

কানপুরে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীর এবং আইনের প্রশ্নপত্র চুরি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল অপরাধীদের শাস্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে ভাইস-চ্যান্সেলারের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

চুরি যাহারা করিয়াছে, তাহাদের চাইতে চুরি যাহারা করিতে শিখাইয়াছে, তাহাদের দোষটাই কি অধিক নহে? সুতরাং অপরাধের শাস্তি ঠিক করিবার সময় ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয় বিপদে না পড়েন!

চীনে দুর্ভিক্ষ

সাংহাই হইতে ২০শে মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল:—লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে, এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অনেকে ঘাস, গাছের বাকল ও কাদা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ কেবল পরাধীন দেশেই নহে, অন্যত্রও হইতেছে।

আশ্রয়হীনের দল

প্যারিসের ৬ই জুন তারিখের সংবাদ:—স্পেন সরকারের হাভানা নামক জাহাজ বিলবাও হইতে পাঁচ হাজার আশ্রয়প্রার্থী নরনারী লইয়া ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই শিশু।

স্বাধীন দেশের এই নমুনা দেখিয়া পরাধীন দেশের কিছুই কি শিক্ষা করিবার নাই?

ইতিহাসের পাঠ

লণ্ডন হইতে ১০ই জুনের একটি সংবাদ:—বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় এই বৎসর আন্তর্জ্জাতিক মনোমালিন্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

ইডেন সাহেব গত বৎসরের কথা স্মরণে আনিলেও গত শতাব্দীর এই সময়ের কথা বক্তৃতায় স্মরণ করেন নাই। সেই ইতিহাস এবং তাহারও পূর্ব্বের শতাব্দীর ইতিহাস স্মরণ করিলে তিনি স্বীকার করিতেন, এই মনোমালিন্যের কারণটা পৃথিবীতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ছিল না— ইতিহাসের এই পাঠ।

সোভিয়েট সংবাদ

মস্কো-এর ১০ই জুন তারিখের সংবাদ:—প্রায় প্রতি সপ্তাহে রুশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ষ্টালিন সৈন্যদল হইতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারীকে বাহির করিয়া দিতেছেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন কর্ম্মচারী সংপ্রতি বিতাড়িত হইয়াছেন।

১২ই জুন তারিখের সংবাদ:- রুশিয়ার আটজন বিশিষ্ট সামরিক কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

বহিষ্করণ ও প্রাণদণ্ডের যে-পরিমাণ সংবাদ রুশিয়া হইতে নিত্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে শেষ অবধি সমগ্র রুশিয়া ষ্টালিন নিজেই নিজের বহিষ্করণের আদেশ ও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার চরম কৃতকার্য্যতা প্রমাণ না করেন!

সিংহলে বন্যা

কলম্বোর ৭ই জুন তারিখের সংবাদ:- সিংহলের নানা স্থানে ভীষণ প্লাবন দেখা দিয়াছে। কয়েকটি গ্রাম একেবারে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। গভর্ণমেন্ট ও স্থানীয় সমাজতন্ত্রীরা আর্ত্তের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট না হয় আর্ত্তের সেবা করিলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা শেষ অবধি 'বুর্জ্জোয়া' আর্ত্তের সেবা করিয়া পাপের ভাগী না হন।

নারীর স্থান

১লা জুন তারিখে কলিকাতার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক লঞ্চ-সভায় রায় বাহাদুর পি. এন. মুখার্জ্জি বলিয়াছেন:- জাতির কৃষ্টিগত বিকাশ ও আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীবৃদ্ধির জন্য মহিলারা সাহায্য করিয়াছেন।

রামায়ণের কাহিনী ও ট্রোজান যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিয়া বোধ হয় তাহাই মনে হয়? তবে আধুনিকতম হোলিউডী নারী স্ক্রীন-ষ্টারগণ নিশ্চয়ই মৈত্রীবৃদ্ধির কার্য্য করিতেছেন!•




"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL
বোর্ন্‌-ভিটা সেবনে উপকার পাইয়াছি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
RABINDRANATH TAGORE
বোর্ণ-ভিটা সেবনে উপকার পেয়েছে হাজার হাজার লোক
তার ওপর বিশ্বকবির এই বাণী—বোর্ণ-ভিটার স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তি
সমর্থন করায় সে শক্তির ভিত্তি হ'ল দৃঢ়তর।
দৈহিক ও মানসিক অটুট স্বাস্থ্য লাভের একমাত্র উপ
উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ। দেহ ও মনের যথাযথ পরিপ
বিনা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। অ
আমাদের নিত্যকার আহারে এই স্বাস্থ্যপ্রদ পুষ্টিকর অংে
অভাব অত্যন্ত বেশী।
বোর্ণ-ভিটা সব দিক্ থেকেই পুষ্টিকর খাদ্য। স্বাস্থ্যপ্রদ
ভিটামিন আর খনিজ লবণ, বোর্ণ-ভিটায় তাদের উপস্থি
প্রচুর পরিমাণে। তাই বোর্ণ-ভিটার নিয়মিত সেবনে পাও
যায় অসীম কর্ম্মশক্তি আর অফুরন্ত জীবনীশক্তি।
Cadbury's
BOURN-VITA
TRADE MARK
THE IDEAL FOOD DRINK
MADE AT BOURNVILLE BY CADBURY BROS. LTD.
SPECIALISTS IN FOOD DRINKS FOR 100 YEARS
1 LB. NET
Cadbury
Cadbury's
BOURN-VITA
সমস্ত দিনের কর্ম্মশক্তির জন্য
বড় বড় দোকানে বা ডাক্তারখানায় এক পাউণ্ড বা আধ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়। তৈরীর সময় হাতে ছোঁয়া হয় না।
বোর্ণভিল্‌এ ক্যাড্‌বারী কোম্পানী তৈরী ক'রেছেন

বিষয়সূচী

বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা]

[আষাঢ়—১৩৪৪

চিত্রসূচী

বঙ্গশ্রী—আষাঢ়, ১৩৪৪